CUK-HA864-55-P35952

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

৭ মে ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়

অমৃত
বর্ষ – ১৬
সংখ্যা- ১-১৭
১৩৮৩

রোলীন যার সহায়
তার ভয় কি?

[illegible] আপনাকে সারাদিন এই [illegible]
[illegible] চলতে ফিরতে হবে। শরীরের [illegible]
[illegible] ঝলসে যাবে। দেহ দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি [illegible]
[illegible] অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব [illegible]
[illegible] ওঠ বাইরের ধুলো-ময়লা বা রোদ-জলে।

[illegible] রক্ষিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার [illegible]
[illegible]-কাট। অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

[illegible] প্রাঃ লিঃ রোরোবীন হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

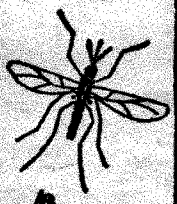

তাহলে ব্যবহার করুন ওডোমস

শরীরের ক্ষতিকর মশা বিতাড়ক

লক লক লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা আর্থ কেমিক্যাল (ইন্ডিয়া) লিঃ
৬৩,নারিমান ব্যাঙ্কার মেন্স,বোম্বাই ৪০০ ০২১।

CHAITRA BLS 45 BEN

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম কুড়ি টাকা।

॥ আমাদের কিশোর সাহিত্য ॥

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
কিশোর গ্রন্থাবলী ৪॥০
ঠাকুরমার ঝুলি ৯৲

সুখলতা রাও
কিশোর গ্রন্থাবলী ১০৲
গল্প আর গল্প ১০৲
নানান দেশের রূপকথা ৬৲
সোনার ময়ূর ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্র
ছেলেদের আরব্য উপন্যাস ৬৲
কিশোর গ্রন্থাবলী ৫৲

সুমথনাথ ঘোষ অনূদিত
ছোটদের বিশ্বসাহিত্য ২॥০
ডেভিড কপারফিল্ড ২॥০
সুইস ফ্যামিলি রবিনসন ১॥০

লীলা মজুমদার
নেপার বই ৩॥০

প্রবোধকুমার সান্যাল
ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে ৪৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হীরা মাণিক জ্বলে ৫৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
কৈলাসের পাটরাণী ৩৲

বেনু গঙ্গোপাধ্যায়
স্বাধীনতার দুর্গপ্রহরী ১॥০

মৌমাছি
রূপকথার ঝুলি ৪॥০

যামিনীকান্ত সোম
শ্রীনেহরু ২৲

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোট থেকে বড় ১॥০

স্বামী বেদান্তানন্দ
শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা ২॥০

— পেপার ব্যাক ক্লাসিকস্ —

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পথের পাঁচালী (৩য় মুদ্রণ) ৬৲
ইছামতী ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই (২য় মুদ্রণ) ৬৲
উপকণ্ঠে ১০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস
আরণ্যক
(লাইব্রেরী সংস্করণ)
নূতন একাদশ মুদ্রণ—ষোল টাকা

আরণ্যক
(পেপার ব্যাক ছাত্রপাঠ্য সংস্করণ)
প্রথম মুদ্রণ—ছয় টাকা

নারায়ণ সান্যালের
নতুন স্বাদের গ্রন্থ
55
অ্যাইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও space-time continuum যে বিজ্ঞান-ভিত্তিক কোনও বাঙলা উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে এ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তা বিশ্বাসই করা যায় নি। সেই অত্যন্ত দুরূহ তাত্ত্বিক আলোচনা উপন্যাসের রসে অভিষিক্ত হয়ে বাঙলা হরফে এই প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি করল।

বিমল মিত্রের
নবতম উপন্যাস
যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲

বাণী রায়ের
নবতমা
জনারণ্যে একমুখ ১২৲

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দাম কুড়ি টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

একদিন টাটকা দুধ পাওয়া সম্ভব না হতেই শ্রীমতী দাসকে আমূল মিল্ক পাউডার কিনতে হয়েছিল

এখন উনি কেবল আমূল মিল্ক পাউডারই কেনেন !

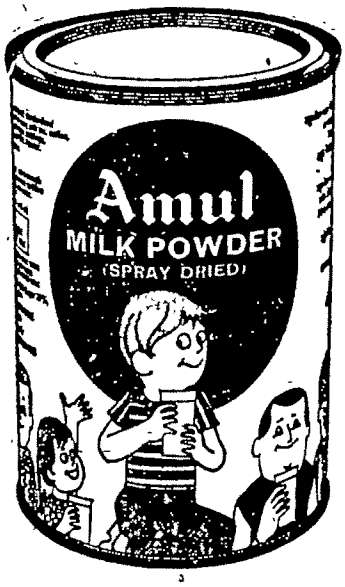

একসময়ে শ্রীমতী দাস বিশ্বাস করতেন গোয়ালার দুধ টিনের দুধের চেয়ে অনেক বেশী ভাল। একবার যখন টাটকা দুধ পাওয়া সম্ভব হোলনা তখনই উনি আমূল মিল্ক পাউডার কিনে এর দুধ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ! একটি আমূল মিল্ক পাউডার ওঁর পুরোনো ধারণা চিরকালের মতই বদলে দিয়েছিল। হাঁ, আপনারও তাই হবে।

আপনি শুধু একবার আমূল মিল্ক পাউডার ব্যবহার করলেই বুঝতে পারবেন এটি কত বেশী ভাল, আর এতে কত বেশী সুবিধে। পাউডারে পরিণত করা-এটি চমৎকার খাঁটি ও পুষ্টিকর দুধ। তৈরী করে নিতে পারবেন কয়েক মিনিটেই। আর ব্যবহার করাও অনেক সহজ। এ দিয়ে চা কফি হবে অনেক বেশী সুস্বাদু। যত খুশী দই, মিষ্টি আর মিষ্টান্ন তৈরী ক'রে নিতে পারবেন। ক্রীমের বদলে এটিই চমৎকার কাজ দেবে।

এখন শ্রীমতী দাসের মত আধুনিক ঘরণীরা যে আমূল মিল্ক পাউডারের ওপর এত আস্থা রাখেন তা'র ন্যায়সঙ্গত কারণও আছে। আমূল মিল্ক পাউডার অনেক বেশী টাটকা, বিশুদ্ধ আর সুস্বাদু। এই দুধে সুবিধে অনেক আর পাওয়াও যায় সহজে।

আমূল
মিল্ক পাউডার
যেন ঘরেই মজুত দুধের ভাণ্ডার

বাজারে ছেড়েছে : গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ, আনন্দ ৩

ASP-AMP-88

১৬ বর্ষ

অমৃত

১ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 7th May, 1976 শুক্রবার ২৪ বৈশাখ, ১৩৮৩

P 35,982

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	নাম	(গল্প)	শ্রী শ্রীলেখা বসু
১৫	সাহিত্যের নেপথ্যে		শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
১৭	এই বাংলার খবর		শ্রীদেবদত্ত
১৮	বিদেশের কথা		শ্রীপুণ্ডরীক
১৯	গোধূলিলগ্ন	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২১	নতুন বই		
২১	সাহিত্যের খবর		শ্রীচাবাক
২২	সুরের আগুন		শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৬	প্রকৃতিক	(কবিতা)	শ্রীমানস রায়চৌধুরী
২৬	ভূমি চাও	(কবিতা)	শ্রীশান্ত রায়
২৬	তোমার স্মৃতির প্রতি	(কবিতা)	শ্রীস্নেহাকর ভট্টাচার্য
২৭	অন্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

৬মে থেকে ২০মে

সুলভমূল্যে—শতকরা ১২½ টাকা বাদ দিয়ে—রবীন্দ্রনাথের সমুদয় গ্রন্থ এবং বিশ্বভারতী প্রকাশিত অন্যান্য যাবতীয় গ্রন্থ বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। রবীন্দ্রপ্রেমিক সকলেই যাতে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সুলভে কেনবার সুযোগ পান তার জন্য এই উদ্‌যোগ। যে-কোনো পুস্তকালয়ে সর্বসাধারণ এই সুযোগ পাবেন।

এইজন্য পুস্তকবিক্রেতাগণ ৩ মে থেকে অতিরিক্ত কমিশন পাবেন এবং এই কয়টি কেন্দ্রে পুস্তক সংগ্রহ করতে পারবেন—

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ কলেজ স্কোয়ার। কলিকাতা-১২

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০ বিধান সরণী। কলিকাতা-৬

জিজ্ঞাসা
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-২৯

জিজ্ঞাসা
৩৩ কলেজ রো। কলিকাতা-১২

বিশ্বভারতী শিল্প সদন
শান্তিনিকেতন। বীরভূম

দামোদর পুস্তকালয়
২৪ বিজয়চাঁদ রোড। বর্ধমান

ভারতী ভবন
গোবিন্দ মিত্র রোড। পাটনা-৪

ওরিয়েণ্ট বুক সোসাইটি
অশ্বউড়া রোড। আগরতলা

চিঠিপত্র অগ্রিম ও মফস্বল থেকে অর্ডার পাঠাবার ঠিকানা

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ
১০ প্রিন্টোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-৭১

মফস্বলের পুস্তকবিক্রেতাদের কাছ থেকে ১৯ এপ্রিল থেকে ১৫ মে পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্ডারে অতিরিক্ত কমিশন দেওয়া হবে।

মফস্বলের পুস্তক বিক্রেতাগণ মোট পুস্তক-মূল্যের ২৫% ও সাধারণ ক্রেতাগণ ৫০% অগ্রিম পাঠাবেন।

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।
অষ্টম মুদ্রণ চলিতেছে

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।
সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।
ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা
শ্রীনরেন্দ্রপুরী দেবী রচিত।
কেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনলেখ্য
অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা।

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।
পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর নিখুঁত সরঞ্জাম এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

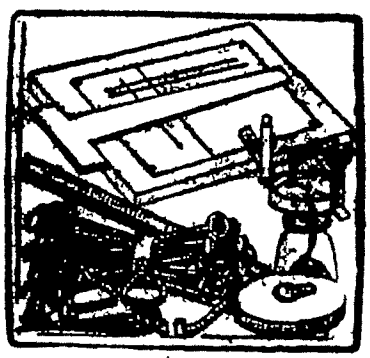

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য অনাতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ ১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৪৬৮
গ্রাম: অন্নাবিপন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কামলিন প্রডাক্টস (স্টেশনারী বিভাগ)

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩২	বসন-বিলাস	শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
৩৫	বিজ্ঞানের কথা	শ্রীঅয়স্কান্ত
৩৮	পুনশ্চ	শ্রীক্ষণিক
৩৯	সময়ের মুখোমুখি (গল্প)	শ্রীসুজিত দাশগুপ্ত
৪২	প্রদর্শনী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৩	রণী বাঁধের হাতী	শ্রীবংশী মান্না
৪৫	ফুটবলে চীনের প্রচার	শ্রীঅজয় বসু
৪৬	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৪৯	খেলাধুলো	শ্রীদর্শক
৫০	সিনেমা টিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৪	ফোয়ার থেকে বলছি	মুসাফির
৫৬	নটমঞ্চ	নাট্যসমালোচক
৫৮	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬০	চিত্র সমালোচনা (দশ নম্বরী)	চিত্রদূত
৬০	চিত্র সমালোচনা (হেটেল সেনো-ফকস)	চিত্রবিদ
৬১	প্রেক্ষাগৃহ	
৬২	বিদেশী ছবি	শা-র-চ
৬৩	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকৃলীশ মুখোপাধ্যায়
৬৪	বিবিধ সংবাদ	

প্রচ্ছদ : ভবানীন্দ্র দত্ত

ডাঃ প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
লিখিত

আধুনিক চিকিৎসা

একমাত্র নির্ভরশীল হোমিও বই

মূল বিক্রয়কেন্দ্র — আমাদের কলিকাতার চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় ও হেড অফিস।

চিকিৎসা কেন্দ্রদ্বয় : ১১৪-এ আশুতোষ মুখার্জি রোড কলি-২৫ এবং ৫৩ গ্রে স্ট্রীট, কলি-৬

হেড অফিস: ৩৬বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড কলিকাতা-২৫

পাইকারী ক্রেতা / বিক্রেতাগণ হেড অফিসে যোগাযোগ করিবেন

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৪৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAN—KCD-74

আমাদের নববর্ষ

অমৃত তার সাহিত্য সংস্কৃতি সেবার পনেরো বছর পূর্ণ করে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করল। এই শুভ দিনে সর্বাগ্রে আমরা প্রীতিপূর্ণ নমস্কার এবং অভিবাদন জানাই অমৃতের অগণিত লেখক পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের। দীর্ঘ পনেরো বৎসর তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে অমৃত ধন্য হয়েছে। আমাদের আশা আগামী বৎসর-গুলোতেও সেই প্রীতির বন্ধন থাকবে অক্ষুণ্ণ। অমৃত তার সাধ্যমত বাংলার এবং বাংলার বাইরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমীদের সেবা করে যাবে। এই দায়িত্ব পালনে বাংলার প্রবীণ ও তরুণ লেখক-লেখিকাদের অকৃপণ ও আন্তরিক সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। পাঠকদের কাছ থেকেও পেয়েছি আমরা অভূতপূর্ব সাড়া। শুভানুধ্যায়ীরা সাহায্য দিয়েছেন বিনা দ্বিধায়। তার ফলে এই সময়ের মধ্যে বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও অমৃত অর্জন করেছে সাহিত্যানুরাগীদের প্রীতি ও ভালবাসা। আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে আমরা সেই ঋণ স্বীকার করছি।

ষাটের দশকের সূচনাতে অমৃত যাত্রারম্ভ করে। সত্তরের দশকের অর্ধাংশ আজ আমরা পেরিয়ে এসেছি। এই পনেরো বছরে বাংলার সমাজ জীবনে অনেক পরিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে। প্রবীণ শিল্পী যাঁরা রয়েছিলেন তাঁদের রচনা প্রকাশের সৌভাগ্য পেয়েছি আমরা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বুদ্ধদেব বসু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতো খ্যাতিমান কবি ও কথাশিল্পী গোড়া থেকেই অমৃতকে তাঁদের রচনা দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন। আজ তাঁরা আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁদের অসামান্য রচনার পরিচয় ছড়িয়ে আছে অমৃতের পাতায় পাতায়। এই পনেরো বছরের ইতিহাস বস্তুত বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রগতিরই ইতিহাস।

অমৃত তার সারস্বত সাধনায় কোনো দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেয় নি। বা সুন্দর সু [illegible] বিশ্বাস এবং উন্মুখ তাকেই প্রকাশের সুযোগ দিয়েছে অমৃত তার পৃষ্ঠায়। প্রতিষ্ঠিতদের সে দিয়েছে সম্মান। নবাগতকে জানিয়েছে সাদর আমন্ত্রণ। স্বীকৃতি ও আবিষ্কার সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রেরণা। জীবনের চলমানতা প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে ও শিল্পে। অমৃত এই চলমান জীবনের সহযাত্রী। সৃষ্টির বিচিত্র দিকেই তার আগ্রহ। বস্তুত গোটা সমাজজীবনের কর্মকাণ্ডকেই রূপায়িত করতে চেয়েছে সে। গল্প উপন্যাস কবিতার মধ্যে চিন্তাশীল মানুষের মনের ছায়া যেমন প্রতিফলিত শিল্পকর্মে চলচ্চিত্রে হাতের কাজেও তেমনি সৃষ্টির অন্য রকম বিকাশ। অমৃত চেয়েছে এই বৃহত্তর ও ব্যাপকতর সৃষ্টিকর্মকেই আলোকচিত্রে রেখায় ও অক্ষরের মধ্যদিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করে পাঠকদের সামনে পরিবেশন করতে। সাময়িকপত্র নামের মধ্যেই রয়েছে সমসাময়িকতার প্রতি তার অঙ্গীকার। সময়কে ধরে রাখার জন্যই একালের সাময়িক পত্রের আবির্ভাব। সুতরাং সে শুধু সাহিত্যপত্র নয় তার গন্ডী আরও বেশি ছড়ানো। তাতে বিচিত্র সৃষ্টিকর্ম ধরা দেয়।

অমৃত তার সাময়িকীর সংজ্ঞা অনুসারেই রাজনীতি অর্থনীতি সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়কে যথাযোগ্য স্থান দিয়েছে। বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিকদের কলমে তার বিশ্লেষণ করে প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার পৃষ্ঠাকে নেহাৎ রাজনীতি-নির্ভর না করে সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির আলোকে উদ্ভাসিত রাখার প্রয়াসী। তরুণ সমাজ ছাত্র, কর্মপ্রার্থী তাদের প্রতিও অমৃতের মনোযোগ বরাবরই ছিল গভীর। তরুণরা তাই অমৃতকে নিজেদের পত্রিকা বলে গণ্য করে। তরুণ শিল্পী সাহিত্যিকদের রচনা ছাড়াও তরুণদের নানাবিধ কৃতিত্ব খেলাধূলোর, অভিনয়ে, চলচ্চিত্রে বা গবেষণায় অমৃতের পৃষ্ঠায় স্থান পায়। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছি বাংলার সৃষ্টিকে যথাযোগ্যভাবে ধরে রাখতে। এ জন্য সাধ ও সাধ্যের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টাও চলেছে অবিরত।

বাংলাভাষার জন্য আমরা গর্বিত। বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারে বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকীসমূহের দান কম নয়। বাংলার বাইরে দূর দূরান্তরে যেখানেই বাংলাভাষী আছেন তাঁদের কাছে অমৃত পৌঁছে দেয় আজকের বাংলার বাণী। বাংলার অধিবাসীরা এবং বাংলা ভাষীরা সে কারণেই অমৃতকে গ্রহণ করেছে নিজেদের পত্রিকারূপে। আমাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলো বাংলাভাষীদের এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এই আমাদের আশা। আমাদের নববর্ষের নতুন যাত্রা শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছায় ও সহযোগিতায় সার্থক হোক, এই আমাদের প্রার্থনা।

রমি

শ্রীলেখা বসু

রমি ডাকলো ওবিয়ন, ও-বিয়ন—

কর্ত্রীর ডাক শুনে বিবাট অ্যালসেশিয়ান চোখ খুলে তাকালো, তারপর তার মস্ত বাদামী শরীরটায় ঢেউ খেলিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আর তাকে উঠতে দেখে চাঁদুকা সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন, এই মরেছে।

অজু কি যেন লিখতে লিখতে গম্ভীর-ভাবে বললো, মরেছে বললে তো চলবে না কান্টিভেট করুন কান্টিভেট করুন।

চাঁদুকা আশ্চর্য হয় বললেন, বলো কি অজু? মরাটাও কান্টিভেট করতে হয় নাকি?

ওঃ—অজু মুখ তুলতে বাধ্য হলো, মরার কথা কে বলছে? বাল নাতনীকে স্কুলে ভর্তি করাবার জন্যে রমিকে ধরতে এসেছেন তো? তবে রমির প্রিয়পাত্র ওই ওবিয়নকে একটু বশ করুন।

প্রিয়পাত্র ওই ওবিয়ন? চাঁদুকা নাক সিঁটকোলেন। কেন বল্ দিকি? মেয়েটার টেস্ট এমন কেন?

এই যে চাঁদুকা, রমি এগিয়ে এসে একটা বেতের চেয়ারে বসলো তুমি কখন এলে?

ওবিয়নের দিকে চোখ আটকে রেখে চাঁদুকা অন্যমনস্কভাবে বললেন এই খানিক-ক্ষণ। তারপর সশঙ্কিতভাবে ওবিয়নের মাথায় একটু হাত ছুঁইয়ে বললেন, তোর কুকুরটাকে খাশা দেখতে হয়েছে তো?

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতো স্নেহগর্বে ছলছলিয়ে রমি বললো, কী যে বলো।

তারপর রমি বললো, তোমার চাঁদুকা চোখ আছে তাই তুমি একথা বললে। কিন্তু অন্য স্কলে—রমির মুখে একটু ব্যথাবিদ্ধ হাসি ফুটলো—বিশ্বের অজ্ঞতা দেখে যুগে যুগে মহাপুরুষরা যেমন করুণাপূর্ণ হাসি হাসেন—সেইরকম। সেই করুণা বর্ষণ করে

রমি বললো, এই তো সেদিন মার সঙ্গে এই কথা নিয়ে একপ্রস্থ হয়ে গেল।

বলিস কি?

তবে আর বলছি কি! দোষের মধ্যে আমি বলেছিলুম যে ওরিয়নের চোখদুটো —তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখ চাঁদুকা—কেমন একটা পয়েন্যান্ট ভাব, কেমন একটা দুঃখী প্রলেটারিয়েট চাউনি কেমন একটা ক্রনিক মেলাংকলিয়ার লক্ষণ—ঠিক ভাইয়ার চোখের মতো নয় কি? এই শুনে মা...হাঁ হয়ে গেলে কেন? আমার ছোট ভাইকে ভাইয়া বলি তা জানো না?

হাঁ কষ্ট করে চাঁদুকা বললেন, হ্যাঁ তা জানি।

তাছাড়া অবিশ্যি নাকের কথাও বলেছিলুম। বলেছিলুম নাকটা যেন—মানে পিসীর নাকের মতো অ-তোটা উঁচু নয় কিন্তু তা হলেও আদল বলে একটা কথা আছে তো? এই শুনে মা.....

মাত্র এই শুনেই তোর মা চটে গেল?

রমি বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লো, তারপর বললো, অবিশ্যি আমি এসব তেমন মাইন্ড করি না। জানি তো—আবার একটু করুণাঘন হাসি হাসলো রমি—জানি তো কেমন স্নেহান্ধ হয় এরা সব।

চাঁদুকা মুখভাবে যৎপরোনাস্তি সহানুভূতি ফুটিয়ে বললেন খুব অন্যায়।

রমির পিসে, যিনি রান্নাঘরে বামুনঠাকুরের নানা উৎপীড়নের কারণ হয়ে কিছুদিন ছোল শ্বশুরালয়ে আগমন করেছেন তিনি উৎকর্ণ হয়ে সব শুনছিলেন। ডিস্টিলেশানের ওপর লেখা তাঁর একটা প্রবন্ধ কোনো সায়েন্টিফিক জার্নালে বেরিয়েছে বলে সম্প্রতি তাঁর মেজাজটি বড়োই প্রসন্ন। রসিকতা করার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন কিন্তু উপযুক্ত শ্রোতা পাকড়াতে পারছেন না। এখন সপ্রশংসভাবে বললেন, ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে গোলমেলে জায়গাগুলোতে আপনাকে অ্যামব্যাসাডর করে পাঠায় না কেন চাঁদুকা? আপনি তো ভালোই ম্যানেজ করেন দেখছি।

বুলু বললো কিংবা ধরুন আমাদের আপিসে যদি পাবলিক রিলেশান অফিসরের পোস্টটা নেন আপনার উন্নতি ঠেকায় কে!

চাঁদুকা শুধু বিষণ্ণ একটু হাসলেন।

রমির পিসের পুলকের জের তখনো কাটেনি। বললেন আর ওই যে নাকের কথাটা —ওটা তো আমার আগে মনে হয়নি। কি যেন নাম কুকুরটার?

ওরিয়ন।

ওরিয়ন?

রমি অত্যন্ত শীতলভাবে বললো, তবে কি আপনি ভেবেছিলেন হাবু কিংবা ভুতো কিংবা কেলো?

রমির পিসে আমতা আমতা করে বললেন না ঠিক তা ভাবিনি—

তবে কি কুকুর বলে রাইট রয়্যাল ব্রিটিশ নাম দেখেছিলেন টমি?

রমির পিসে আরো বিমূঢ়ভাবে বললেন না তাও ভাবিনি। তবে ওরিয়ন নামটা মানে কুকুরের পক্ষে নামটা—

রম একটু সামনে ঝুঁকে খুব শান্ত গলায় বললো হ্যাঁ বলে ফেলুন।

অজু বুলু ব্যাপারটা সানন্দে উপভোগ করছিল। বাড়ীর জামাই বলে ভদ্রলোক যখন তখন তাদের ধরে তাঁর উদ্ভট থিয়োরীগুলো শোনান বেচারারা প্রতিবাদ করতে পারে না। এখন তাই তাঁকে বিপাকে পড়তে দেখে তারা যদি একটু নির্মল আনন্দ অনুভব করে তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

রুণু দূর থেকে পরিস্থিতিটা লক্ষ্য করছিল এখন গুটি গুটি এসে দাঁড়ালো। চাঁদুকাকে উদ্দেশ্য করে বললো এবারে আপনি অনেকদিন পরে এলেন চাঁদুকা।

আর বলো কেন মা চাঁদুকা খেদোক্তি করলেন, এইসব আপিস যাওয়া-টাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করে জীবনে আর সুখশান্তি থাকতে দিল না। টাইমে হাজির হও পুরো পাঁচটা অবধি কাজ করো আর তার চেয়েও বিপদ—মাঝের সারা সময়টাও আপিসে কাটাও। বেটাচ্ছেলে জেনারেল ম্যানেজারের আনন্দ দেখে কে!

রমি মুখ লাল করে বললো এমন একটা কথা বলো চাঁদুকা যে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে। কাজে ফাঁকি দেবে কিগো?

চাঁদুকা মুখ খিঁচিয়ে কি-যেন বলতে যাচ্ছিলেন, চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। রুণুর দিকে চেয়ে আগের কথার জের টেনে বললেন তাই বোববার দেখে নাতনীটাকে ভর্তি করার ব্যাপারে রমিমার কাছে এলুম। ওরই পুরোনো ইস্কুল তোর যদি একটু বলে-টলে দেয়। চাঁদুকা স্নেহস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে রমির দিকে তাকালেন।

বুলু জিজ্ঞেস করলো নাম কি নাতনীর?

হুঁ।

বুলু চমকে উঠে বললো ও আবার কি নাম? বদলে ফেলুন শীগগির নইলে উচ্চারণ করতে দাঁত ভেঙে যাবে।

রমির পিসে আবার উজ্জীবিত হয়ে বললেন, তা কুকুরের নাম যদি হয় ওরিয়ন তবে নাতনীর নাম হুঁ হতে বাধা কি? তাছাড়া কি-বেদ বলে না? নামেতে কি করে বাপু নামেতে কি করে, গোলাপ যে নামে ডাকো.....তারপর যেন কি? ভদ্রলোক আর শেষাংশটা মনে করতে পারলেন না।

রমি অন্যদিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

চাঁদুকা কি-যেন ভাবছিলেন শেষ কথাটা কানে যেতে প্রতিবাদ করে বললেন না বাপু এটা তুমি ঠিক বললে না। নাম জিনিসটা মানুষের ভীষণ ইনফ্লুয়েন্স করে। আমার চেনা একটি পাঞ্জাবী ছেলে.....

বেশ জমাটি একটা গল্পের আশায় সবাই গুছিয়ে বসলো। রমি তার পিসের দিকে চেয়ে বললো, আপনার রসিকতাগুলো, প্লীজ, গল্পটা শেষ হওয়া অবধি জমায়ে রাখবেন। খুব কষ্ট হবে আপনার, তবু প্লীজ!

ছুটির দিনের অলস প্রশান্ত সকাল। চাঁদুকার মেজাজটাও বেশ প্রসন্ন। আপাতত পুরো পৃথিবীটার সঙ্গেই তাঁর টার্মস বেশ ভালো এইরকম একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে তিনি বললেন গল্পটা বলতে পারি একটা পাঞ্জাবী পরিবারের তিন পুরুষের গল্প। প্রথম পুরুষ থেকেই আরম্ভ করা যাক।

মনে কর একশো কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে রাওয়ালপিন্ডির একটা রাস্তা। একটি গ্রাম্য অল্পবয়সী ছেলে, দেখলেই বোঝা যায় সে সবে এই শহরে এসেছে, আপনমনে হাঁটছিল। এমন সময় অন্য কয়েকটি শহুরে ছেলে তাকে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

ছেলেটি ফিরে তাকাতে তারা একটা রঙীন চিত্রকরা হাঁড়ি দেখিয়ে বললো, এই মিঠাইয়ের হাঁড়িটা মাথায় করে আমাদের সঙ্গে যাবি? পয়সা দেব।

এ আবার একটা কাজ নাকি। ছেলেটি এক কথায় রাজী হয়ে এসে হাঁড়িটা মাথায় তুলে নিল। মিষ্টিগুলোর কথা ভেবে একটু লোলুপও হোল বোধহয়। তারপর সবে সে দুপা এগিয়েছে এমন সময়—

চাঁদুকা সাসপেন্সের জন্যে একটু গ্যাপ দিয়ে বললেন, এমন সময় দুটো টিল এসে মোক্ষমভাবে হাঁড়িটায় লাগলো। হাঁড়িটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল আর ভেতর থেকে বেরুলো—মিষ্টি নয়—অকথ্য রকম নোংরা সব জিনিস বেচারী গ্রাম্য ছেলেটির সমস্ত শরীর ভিজিয়ে দিল।

শহুরে ছেলেগুলো হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো। বুঝতেই পারছিস বড়লোকের আপাগন্ড ছেলেপুলের দল। বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন তাও আঁচ করতে পারছিস নিশ্চয়ই। গ্রাম্য ছেলেটিকে হেনস্তা করবে বলে সারা সকাল ধরে তারা নিজেরাই সেই নোংরা ঘেঁটেছে—একি সাধারণ বুদ্ধিতে সম্ভব? যাইহোক তারা হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো আর তাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কদাকার অবস্থায় সেই গ্রাম্য ছেলেটি তাদের উদ্দেশে কতকগুলো বাক্য মনে মনে প্রয়োগ করলো। সেই চয়েসেস্ট একসপ্লেটিভগুলো আর অনুবাদ করলুম না—জানিসই তো বাংলাভাষা এ ব্যাপারে কিরকম দরিদ্র। তারপর গালাগালির পুঁজি শেষ করে সেই তরুণ ছেলেটি একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলো : এই শহর যা আমাকে আজ এমন হেনস্তা করলো তা আমাকে একদিন মাথায় করে রাখবে। আর তোরা সব খোতে কা পুতের কুত্তে কী দুম..... তোরা সব আমার পা চাটবি—এই কথা আমি আজ বলে গেলুম।

তা সে প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন হুশনাথ রায়। তিনি হিন্দু ছিলেন না মুসলমান

তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু ভূপিন্দর মানে তাঁর নাতি, যার সঙ্গে আমার জানাচেনা ছিল, সে এসব নিয়ে মাথা ঘামাতো না। ব্যবসা করতে গেলে পীর-বাবার দরগায় অগরবত্তি জ্বালতে হয় মহা-লক্ষ্মীর পুজোও করতে হয়। উপরি যদি গীর্জায় দুটো মোমবাতি অফার করতে হয় তবে তাতেই বা ক্ষতি কি? ব্যবসাটা ভালো চললেই হোল। সত্যি ধর্ম সম্বন্ধে এরকম উদার মনোভাব এবং ট্রীটিং অল ধর্মস্ অ্যাজ মীনস্ টু দ্য সেম এন্ড—এটা ভূপিন্দরের ক্ষেত্রে যেমনটি দেখেছি সেরকমটি আর দেখিনি একথা আমাকে মানতেই হবে। তা ভূপিন্দর বলেছিল যে হুশনাথ রায় যখন দীওয়ান উপাধি পেলেন এবং মন্দির-টন্দিরে পুজো দিতে আরম্ভ করলেন তখন প্রকাশ্যে কেউ তাঁর ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। আর তুলবেই বা কি করে? তখন তিনি লালকুর্তী জমিদারীর একচ্ছত্র মালিক অসংখ্য গায়-ভাঁয়স, হাতী-ঘোড়া, তিন-চারটি ধর্মপত্নী এবং অগুন্তি—চাঁদকা গলাধাক্কা দিলেন—মানে তাদের জন্যে একটা পুরো বিবি মহল্লাই করতে হয়েছিল। এ সমস্ত লুঠতরাজ এবং ডকতি করে তিনি উপার্জন করেছিলেন। সারা মাওয়ালাপিণ্ডি তখন তাঁর নামে থরহরিকম্প। সাড়ে ছ-ফিট লম্বা দশাশাই চেহারা টকটক করছে গায়ের রঙ এ—ই গোঁফ এ-ই জুলপি—মানে একটা খাঁটি পুরুষসিংহ যাকে বলে।

এহেন হুশনাথ রায় চৌষট্টি বছর বয়সে একটি উনিশ বছরের কন্যাকে দেখে একে-বারে তাঁর দিল হারিয়ে ফেললেন। মেয়ের বাবার কাছে সন্দেশ পাঠালেন যে এই মেয়েকে তিনি বিবাহ করতে উৎসুক। মেয়ের বাপ তাঁর সুন্দরী মেয়ের জন্যে এমন পাত্র কল্পনাও করেন নি। প্রস্তাবটি নাকচ করেই পাঠাচ্ছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাধা এলো স্বয়ং পাত্রীর কাছ থেকে।

বুলু-বুলির দিকে তাকিয়ে চাঁদকা হতাশভাবে বললেন নারীচরিত্র যে কি তা তোরাই জানিস কিংবা হয়তো তোরাও জানিস না। কোন তাড়নায় কাবতী হয়ে সেই অল্পবয়সী সুন্দরীটি বহুপত্নীক হুশনাথ রায়কেই পতি হিসেবে মনোনীত করলো তা তোরাই বলতে পারিস। মোট কথা কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সেই সবলা কিশোরীটি তার বাবাকে লালকুর্তী জমিদারীর অপব্যয়ের একটা সম্ভাবিত হিসেব বোঝাচ্ছে। আমাদের ভূপিন্দর তার বিজনেস অ্যাকিউমেন তার দাদার থেকে পেয়েছিল না দাদীর থেকে সে বিষয়ে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নেই। মেয়ের বাপও বাজী হয়ে যেতে দেরী করলেন না। অবিলম্বে হুশনাথ রায়কে সখেবরটি পাঠানো হোল কিন্তু সেই সঙ্গে বলা হোল যে পাত্রীর একটি শর্ত আছে।

বমি বিরক্ত হয়ে বললো, যেন রূপকথা বলছো তুমি চাঁদ কা।

হুঁ—হুঁ চাঁদকা একটু মুচকি হাসলেন। তোরা সব আজকালকার মেয়েরা

॥ প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশেষ কমিশন ॥

৩রা মে সোমবার আমাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে পাঠক ও পুস্তক বিক্রেতাদের সুবিধা দেওয়া হবে। ঐদিন পাঠকরা যে কোন বই কিনলে ২০% পাবেন। পুস্তক বিক্রেতারা নির্দিষ্ট কমিশন ছাড়াও ৫% অতি-রিক্ত পাবেন। কলকাতার বাইরের ডাকযোগে পাওয়া অর্ডারে এই বিশেষ সুবিধা ১০ই মে পর্যন্ত দেওয়া হবে। অগ্রিম মূল্য পাঠানো বিশেষ প্রয়োজন।

॥ প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রকাশিত হচ্ছে ॥

সুনীল গঙ্গোপধ্যায়ের

রাতপাখি ৮·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-এর

নৃশংস ৯·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়-এর

সতী-অসতী ৮·০০

শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর

কুমারসম্ভব কাব্য ৮·০০

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯

ভারী প্রগতি-টগতি করিস, ভাবিস না-জানি কি নতুন কাণ্ডটাই করছিস। আরে সেকালে ঘোমটার আড়ালে মহিলারা কিরকম আয়রণ হ্যাণ্ডে রুল করতেন তা জানলে তোরা চমকে যেতিস। কোথায় লাগে স্ট্যালিন।

যাইহোক হুশনাথ রায় তো মশগুল হয়ে গেলেন কি শর্ত? কি শর্ত আমার মহব্বত কি রাণীর? সে চাইলে তিনি হুশন থেকে চাঁদ পেড়ে আনবেন, দিল থেকে খোয়াব তুলে আনবেন। শুধু একবার মুখ ফুটে বলুক সে কি তার শর্ত।

মেয়ে বলে পাঠালো, সমস্ত পত্যাদির —ধর্ম অ্যাণ্ড আদারওয়াইজ—আগে তালাক দিতে হবে। তবে আর শুধু তবেই, সে তাঁর গৃহে পদার্পণ করবে।

হুশনাথ রায় তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এরাও তো এককালে তাঁর দিলের অধিকারিণী ছিল, আর সেসব আলতু ফালতু কথা ছেড়ে দিলেও তাদের এখন কোথায় তিনি রিহ্যাবিলিটেট করেন? ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের রেফিউজি প্রবলেমের থেকে তাঁর প্রবলেমটা কিছু কম ছিল না। অনেক কাকুতি মিনতি করলেন কিন্তু তাঁর প্রেয়সী দেখা গেল নিতান্তই অনমনীয়। অগত্যা একটা ব্যবস্থা করলেন তিনি। ঠিক কি ব্যবস্থা করলেন তা আমাকে জিজ্ঞেস করিসনি তবে এইটুকু বলতে পারি যে ভূপিন্দরের বিজনেস অ্যাকিউমেন সবটাই তার দাদীর কাছ থেকে আসেনি, দাদারও কিঞ্চিৎ কণ্ট্রিবিউশান ছিল।

আর কোনো বাধা রইলো না তারপর এলো সেই রাত...আকাশে চাঁদ ঘরে ফুলের শেজ, তার এককোণে জড়সড় হয়ে নমমুখী বধূ...

হয়েছে হয়েছে বমি চাঁদুকাকে থামালো কতকগুলো বস্তাপচা বর্ণনা না দিলেই নয়? ঠিক যেন হিন্দী ফিল্মের সুহাগ রাত —একবার ক্যামেরা জানলা দিয়ে প্যান করে চাঁদটাকে ধরে আর একবার ফিরে এসে হিরোয়িনের মুখটাকে ক্লোজ আপ নেয়—যতো সব!

না তা নেবে কেন, চাঁদুকা খিঁচিয়ে উঠলেন যতো পচা পাঁক আর নর্দমা দেখাবে। আচ্ছা জীবন থেকে বাবতীয় লজ্জার লালিমা আর নীলাম্বরীর নীলিমা বাদ দিয়ে তোদের লাভ কি হয়েছে বল তো? এ-সব বাদ দিলে জীবনে আর রইলো কি?

রমির পিসে ব্যাপারটা অনুধাবন করে বললেন, সবটা যেন কেমন ডিস্টিলড হয়ে গেল তাই না?

চাঁদুকা গুম হয়ে বসে রইলেন।

গল্পটা মাঠে মারা যায় দেখে সকলেই বিচলিত হয়ে পড়লো। রুনু বললো, রমির কথায় কান দেন কেন? অজু বললো চাঁদুকার চা কই? রমির পিসে বললেন প্রোসেসিং-এর সময়ও তো বিভিন্ন টেম্পারেচারের মধ্যে দিয়ে মেটেরিয়ালটা পাস করাতে হয়। আপনি শুধু বয়েলিং পয়েণ্টেই দাঁড়িয়ে থাকলে কি চলে।

আর বুলু থেই ধরিয়ে দিয়ে বললো আকাশে চাঁদ আর ঘরের কোণে চাঁদপানা বৌ...

চাঁদুকা একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে বললেন, হুশনাথ রায় সবে আরম্ভ করেছেন, মেরী লায়লা, মেরী রাণী...এমন সময় জরির চুমকি বসানো ওড়নার আড়াল থেকে খুব স্পষ্ট গলায় স্যাওয়াজ এলো ওসব ফালতু বাত ছাড়ুন এখন। আগে দরকারী কথা-গুলোর ফয়সালা হয়ে যাক, তারপর জিন্দগীভর লায়লা মজনুকে ইয়াদ করা যাবে।

হুশনাথ রায় বিলক্ষণ শক খেলেন বটে —প্রচুর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও ঠিক এইরকম প্রেমালাপ তিনি কল্পনাও করেননি—কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন দুলহন সম্বন্ধে ক্রমেই তাঁর শ্রদ্ধা বাড়তে লাগলো। সনির্বন্ধ হয়ে বললেন, বোলো প্যারী।

প্যারী প্রথমে লালকুর্তী জমিদারীর আয়ব্যয় সম্বন্ধে কতকগুলো পয়েণ্ট কনফার্ম করিয়ে নিলেন। সম্পত্তির কতো-খানি তাঁর নামে ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার করা হবে কতোটা কর্তা গত হলে, সেসবও খোলসা করে নিলেন। তারপর ওড়না সরিয়ে কালো চোখে কটাক্ষ হানলেন।

শুনেছি বিবি মহল্লায় এখনো দু-চারজন বিবি রয়ে গেছেন। তিনদিনের মধ্যে ওই এলাকা আমি সাফ করিয়ে দেব। বাঁদীর এই কথাটা খেয়াল রাখবেন জনাব।

যেমন কথা তেমনি কাজ। বিয়ের তিন-দিনের মধ্যে হাতী দিয়ে বিবি মহল্লা সমতল করে দিলেন তিনি। হুশনাথ রায় তাঁর বিবিদের এবং অসংখ্য সন্ততিদের যে কি ব্যবস্থা করলেন তা একটা মিস্ট্রী রয়ে গেছে। তবে ভূপিন্দর বলে যে ওই অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকের চেহারাই নাকি তার মতো। হবেও বা। কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন হুশনাথ রায়।

বিশ-বাইশ বছর ধরে সগৌরবে স্বামী নিয়ে সংসার করলেন ভূপিন্দরের দাদী। ছেলেপুলে বৌ-জামাইয়ে জমজমাট সংসার। তারপর কর্তা গত হলেন কিন্তু জমিদারীর কাজকর্ম সমান তেজেই চলতে লাগলো। অতিশয় যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন ভদ্র-মহিলা—কোথায় লাগেন রাণী ভবানী।

ছেলেপুলেরা বুঝতেই পারছিস, মাকে দেবী জ্ঞানে পুজো করতো। ভয় বা ভক্তি কোনটা বেশী ছিল তা বলা মুস্কিল। কিন্তু এরই একটা কাউণ্টার এফেকট হিসেবে ভূপিন্দরের বাবা হঠাৎ শিল্পভক্ত হয়ে উঠলেন। বিজনেসে মন নেই, উদাস উদাস চাউনি কবিতা-টবিতা পড়েন... কিরকম একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড মনে কর একটা পাঞ্জাবী ফ্যামিলিতে। —না না রমি, তুই বাধা দিসনি। পাঞ্জাব থেকে কতো শিল্পীর অভ্যুদয় হয়েছে সে সব আমি জানি। কিন্তু তুই আমাকে ন্যারো মাইণ্ডেড বা প্রোভিন্সিয়াল যাই বল না কেন একথা আমি বলবোই যে পাঞ্জাবী ভিরিলিটির সঙ্গে ওই কাব্যি-টাব্যির ব্যাপারগুলো কেমন যেন যায় না। এই তো সে বছর দার্জিলিংয়ে গিয়ে মাউণ্ট এভারেস্টে উঠেছি খেতে গিয়ে দেখি লীড গাইয়ে একটি শিখ ছেলে। মনটা খুশি হোল ভাবলুম বেশ একটা প্রাণোচ্ছল পরিবেশ পাওয়া যাবে। কাকস্য পরিবেদনা! সেই টিমটিমে আলোজ্বালা ঘরে ছেলেটি ঘ্যান-ঘ্যান করে কেবলই জানায় যে যদিও আকাশে থালার মতো চাঁদ উঠেছে, আর যদিও তার বুকের শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে তবুও তার প্রিয়া তার প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ ইণ্টারেস্ট নিচ্ছে না। কি আপদ বল দিকি! ছেলেটিকে ভালো করে স্টাডি করলুম, হার্ডওয়ারের বিজনেস না গিয়ে ছোকরা এইসব মধু আর মাধবী করে বেড়ায় কেন? কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়লো—আমাদের ভূপিন্দরের কেস আর কি। বাবার ইচ্ছেয় ছেলে শিল্পী হয়েছে তাও কি আবার স্বজাতির আদর্শে? বাপ নিজের অপূর্ণ সাধ মেটাতে ছেলের পাঞ্জাবী ফেমে বাঙালী মডেল সুপার ইমপোজ করেছেন উইথ ডিসাসটারাস কনসিকোয়েন্সেস। বড়ো মায়া হোল, বুঝলি? পিঠে হাত বুলিয়ে বললুম আজ একটা ভাঙ্গরা হয়ে যাক। ছেলেটির চাউনিই বদলে গেল, বললো সত্যি? তারপর এক লাফে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলো। সেই সন্ধ্যেটা—কি আর বলবো তোকে—জমজমাট হয়ে উঠলো। ছেলেটি পরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, থ্যাঙ্ক ইউ ইয়ার—। বুঝলুম আইডেণ্টিটি ক্রাইসিস কেটে গেছে। নিজেকে খুঁজে পেয়েছে আর সেই সঙ্গে ভাষাও।

যাইহোক ভূপিন্দরের বাবা তাঁর মাকে বললেন ব্যবসা যদি করতেই হয় তো কলকাতায় করবে। এই বলে সোজা রাওয়ালপিণ্ডি থেকে কলকাত্তা। এসে ব্যবসা-ট্যবসা যেমন তেমন করে চললো আর ভদ্রলোক ডুবে রইলেন রামকিঙ্কর আর নন্দলাল বোস নিয়ে। বাড়ী ভরতি কাদা আর পাথরের কুচি কিন্তু কার সাধ্য প্রতিবাদ করে। ভূপিন্দরের মা আতঙ্কিত হয়ে দেখলেন তাঁর স্বামী ক্রমেই বাঙ্গালী হয়ে যাচ্ছেন। লস্যর বদলে চা, চাপাটির বদলে ভাত এসব তবু সহ্য হচ্ছিল কিন্তু তারপর তিনি ছেলেদের নামগুলোও বদলে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। বড়ো ছেলে বলবন্তর নামটা বদলানো গেল না বটে তবে ভূপিন্দর ও তার ভাই বিচারবিন্দর নতুন নামকরণ হোল মলয় ও কিশলয়। তারপর একদিন তাদের বাবা তাদের শান্তিনিকেতনে রেখে এলেন।

জানিস তো ওখানে নাচ-গানটা মোটা-মুটি কম্পালসারি ব্যাপার। ভূপিন্দরের— বলতে নেই—তখনই বেশ আড়েবহরে ইমপ্রেসিভ চেহারা। নীচের ক্লাসে মাস্টারমশাই তাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলেন, তারপর বললেন ঘুঙ্গুর কই? —ঘুঙ্গুর কেনা হয়নি। কি আর করা যায়, ভূপিন্দর খালি পায়েই সেদিন তা তা থৈ থৈ করলো। —ইমপ্যাকট যা হোল তা অবর্ণনীয়।

শান্তিনিকেতনে অবিশ্যি তাদের বেশীদিন থাকতে হয়নি। কলকাতায় মা কান্নাকাটি শুরু করে দেওয়াতে তার বাবা শেষ অবধি ছেলেদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন তার চুত মুকুলের গন্ধ আর আম্রকুঞ্জের ছায়া-টুকু নিয়ে ভূপিন্দরের মনে বেশ একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। নিজের অজান্তেই তার মনোভূমি কেমন স্যাঁৎসেঁতে হয়ে উঠেছিল। ইস্কুল থেকে যতদিনে কলেজে পৌঁছলো ততদিনে ভূপিন্দরের মনের গলিঘুঁজিতে মানসী প্রিয়ার একটা রূপ যেন ফুটি ফুটি করছিল।

নরম সলাজ হবে তার চাউনি, গলার আওয়াজ হবে বাতাসের মতো, দেখলেই মনে হবে স্রেফ ফুলের মধু আর বৃষ্টির জল খেয়ে বেঁচে আছে। আর তারপর তার দাদার বিয়ের সময় মানসী প্রিয়াটি বাস্তবে মেটিরিয়ালাইজ করে গেল।

রমির পিসে উৎসাহিত হয়ে বললেন ভালো ক্যাটালিটিক এফেক্ট আর কি।

সিচুয়েশনটা কিন্তু বেশ ট্র্যাজিক ছিল, কমিকও বলতে পারিস কিংবা চাঁদকা চিন্তা করে বললেন, ট্র্যাজি কমেডিই বলা যাক। ভূপিন্দরের দাদার বিয়ে লাগলো। খুব ধুমধাম খুব রোশনী, খুব মেহফিল চললো কদিন ধরে। রাওয়ালপিন্ডি—না তখন তো দাদী পাততাড়ি গুটিয়ে অমৃতসরে চলে এসেছেন—সেখান থেকে আত্মীয়স্বজনরা কলকাতায় এলেন। স্বয়ং দাদী এসে হাল ধরলেন যাতে বঙ্গালদেশে বিয়েটা অনুষ্ঠিত হলেও রীতিনীতির কোনো ভুলচুক না থেকে যায়।

বিয়ের রাত্রে ভূপিন্দরের দাদাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। ভূপিন্দরের থেকেও চার আঙুল লম্বা সে, আট আঙুল চওড়া। তার মাথায় ফুলের সেহরা পরিয়ে রাজছত্র দিয়ে, তাকে ঘোড়ার ওপর তুলে দেওয়া হোল। ব্যান্ড বাজিয়ে আলো জ্বালিয়ে সবে বারাত রওনা হয়েছে আর সবে ভূপিন্দরের মা আর দাদী ওড়নার খুঁটে আনন্দাশ্রু মুছছেন, এমন সময় সওয়ারী শুদ্ধু ঘোড়াটা হুড়মুড়িয়ে পা দুমড়ে পড়ে গেল। গেল যে গেলই সে আর ওঠে না। যতই হোক বাঙ্গালী ঘোড়া তো, আরোহীকে দেখেই তার সন্দেহ হয়েছিল তারপর পিঠের ওপর ওজনটা অনুভব করে সে সোজা অসহযোগ আরম্ভ করে দিল। —এদিকে কি বিচ্ছিরী ব্যাপারটা বোঝ, বাজনায় আকৃষ্ট হয়ে বাবাদায় রাস্তায় সার দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেছে আর ক্ষুদ্র-স্থলে ভূপাতিত ঘোড়া আর ভূপাতিত স্বয়ং পাত্র। ফ্লাডলাইটের তীব্র আলো দৃশ্যটাকে বেশ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

এরকম ক্ষেত্রে কি হয় তা তো জানিসই। যে বেচারা ভুঁয়ে পড়ে গেছে তার প্রতি অন্তরঙ্গজনেরাও তাকে চেনে না এরকম একটা ভাব দেখায়। ভূপিন্দরের যে দাদার জন্যে দুঃখ হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু অবস্থা দেখে সে পিছু সরতে সরতে একটা বাড়ীর গেটের কাছে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ হাসির শব্দে চমকে চেয়ে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি তরুণী একেবারে হাসির দমকে লুটোপুটি খাচ্ছে। মহা বাচাল মেয়ে। কিন্তু ভূপিন্দরের তখন তা বোঝার মতো অবস্থাই নয়। একে তো বয়সটাই গোলমেলে তার ওপর কচি কচি নার্ভের ওপর বিয়েবাড়ীর একটা পিকিউলিয়ার এফেক্ট আছে তা নিশ্চয়ই জানিস। যতো বৌদির বোন আর জামাইবাবুর ভাই একত্র হয়ে একটু চোখে চোখে চায়, বাড়ী গিয়ে কবিতা লেখে তারপর অবিশ্যি বেমালুম ভুলে যায়। যাইহোক মেয়েটিকে দেখে ভূপিন্দর অবাক হয়ে ভাবলো বাড়ীর পাশেই এমন জলজ্যান্ত একটি সুন্দরী তরুণী থাকতে তার মনটা কি অনর্থক হায়রানিই না ভোগ করেছে।

শুদ্ধ বাংলায় যাকে বলে তরুণীর লীলাচাপল্য কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে অবলোকন করে ভূপিন্দর গলা পরিষ্কার করে জিজ্ঞেস করলো, ইয়ে—মানে—তোমার নাম কি...?

তরুণী একটু কটাক্ষ করে বললো তুতুল।

...আ—হা, তুতুল! নামটা যেন তুলতুলে নরম। ভূপিন্দরের যেটুকু বাকি ছিল, সে সর্বনাশটুকুও হয়ে গেল। রক্তের মধ্যে তার রিমঝিম করতে লাগলো শিরায় শিরায় চাঞ্চল্য জাগলো, সারা শরীর মন উদ্বেল হয়ে উঠলো।

রমির পিসে বললেন কৃষ্ণ মেননের নাম শুনলে মোরারজী দেশাইয়ের যা হোত আর কি।

সকলেই সামান্য চমকে উঠলো। অজু বেচারার পাঁচ বছর বিয়ের পরও ঘোরটা এখনো কাটেনি। সে যেভাবে রমির পিসের দিকে তাকালো তা ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, আপনি তো মশাই মানুষ খুন করতে পারেন দেখছি।

রমির পিসে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে খোশমেজাজে আরেকটা উদাহরণ দিলেন কিংবা ধরো প্রণব মুখার্জির নাম শুনলে হাজি মস্তানের রিঅ্যাকশান হয়—সেইরকমই ব্যাপারটা।

রুণু চা ঢালতে ঢালতে আড়চোখে রমির দিকে তাকালো। নীচু গলায় বললো বেচারা পিসী। এইজন্যেই ওর গায়ে গন্ধ লাগে না। এইরকম সব রসিকতা—

রমিও ব্যথিতভাবে বললো, কি সাংঘাতিক টেনশান ভাবো। কখন রসিকতা আরম্ভ হবে সেই ভয়ে বেচারা সিঁটিয়ে থাকে।

পিসীর দুঃখে অভিভূত হয়ে ওরা যুগপৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, বেচারা

গরম চায়ে চুমুক দিয়ে চাঁদকা একটা আরামের শব্দ করলেন, আঃ—! তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে রমিকে বললেন তোদের ইস্কুলটায় হয়ে যাবে, কি বলিস?

রমি সংক্ষেপে বললো চেষ্টা করবো।

চাঁদকা প্রসন্ন হয়ে বললেন, চেষ্টায় কী না হয়। বড়ো লক্ষ্মীমেয়ে তুই রমি যেমন শান্ত তেমনি নম্র, আর মুখে একটি কথা নেই।

রমি আবারও সংক্ষেপে বললো বাজে বোকো না।

চাঁদকা একটু থতমত খেয়ে বললেন, হ্যাঁ মানে তাই বলছি চেষ্টায় কী না হয়। ওই ভূপিন্দরের কথায় বলছি আর কি। বেচারা রাত্তির জেগে যতো রাজ্যের আধুনিক কবিতা মুখস্থ করে। কখন তাকে বুঝে সেগুলো আওড়াবে এই চিন্তায় তুতুলের সঙ্গটা তার ভালো করে এনজয় করাই হয় না। বেচারা বড়ো সন্তর্পণে তুতুলের সঙ্গে ব্যবহার করে, তার তুলোর মতো হাত দুটি ধরে—ব্যস আর কিছু না। তুতুলের জন্যে সে মনেপ্রাণে মলয় হতে চায়, ধরণধারণে যাকে বলে একটা সৌকুমার্য আনতে চায় কিন্তু সমানে একটা বিপরীত ভাব যেন তার ভেতর থেকে ঠেলা মারতে থাকে। এই কি সেই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস?

অথচ তার ছোটোভাইয়ের কোনো প্রবলেম নেই। সে নামমাত্র পাঞ্জাবী জানে দাদী এলে পারতপক্ষে কাছেই ঘেঁষে না। একদিন একটা গুরুমুখী স্ক্রিপ্টে লেখা চিঠি হাতে করে সে ভূপিন্দরের কাছে এলো।

ভাইজী চিঠিটা পড়ে দেবে?

ভূপিন্দর দু-লাইন পড়েই একটু লাল হয়ে বললো এতো প্রেমপত্র রে।

ছোটোভাইও লাল হোল.—না দুই ভাইয়েরই ভদ্রতা সভ্যতার বালাই আছে সে কথা মানতেই হবে। সে বললো, এক সর্দারিন লিখেছে। কার কাছেই বা যাই চিঠি পড়াতে তাই—।

অগত্যা দুভাই দুজনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো এবং চিঠিটা পড়া হোল। নাচার হলে মানুষকে কতো কী না করতে হয়, তাই বলে শালীনতা বিসর্জন দিলে কি চলে?

চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে ভূপিন্দর নতুন করে চিন্তায় বসলো। এইটুকু ছেলে সেও প্রেমপত্র পাচ্ছে, অথচ কয়েকটা বছরের গ্রেস পেয়েও সে এখনো স্টার্টিং পয়েন্ট ছাড়াতে পারছে না। এতো টেননাশ ভুগে সন্ধ্যেটা কাটায় অথচ বিদায় নেবার সময় তুতুল কেমন যেন হতাশভাবে চোখ তুলে চায়। সে-চাউনিতে কেমন যেন একটা অভিযোগ একটা ক্ষোভ থাকে, ভূপিন্দর কিছুতেই তার অর্থ বের করতে পারে না।

অনেক জিনিসেরই অর্থ বের করতে পারে না বেচারা। কোথায় যেন তার মানসীপ্রিয়ার সঙ্গে মেটিরিয়ালাইজড প্রিয়ার গণ্ডগোল বেধে যায়। এতো করে কবিতা আওড়ায় সে কিন্তু তুতুলের রি-অ্যাকশানগুলো খুবই আনপ্রেডিকটেবল হয়।

একদিন সব নির্জনে বসে তুতুলের দিকে চেয়ে ভাবগভীর গলায় সে আবৃত্তি করছিল,

সুরঞ্জনা ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি
বোলো নাকো কথা ঐ বকুলের সাথে;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা;
নক্ষত্রের রুপালি আগুনভরা রাতে;

আর তক্ষুনি কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। তুতুল কেঁদে-কেটে অস্থির। ও তো আমার মামাতো ভাই তুতুল কাঁদতে কাঁদতে বললো, ঠিক জানি তুমি ওকে দেখেই সন্দেহ করবে। ভূপিন্দর যতো বোঝাতে যায় কিছুতেই তুতুল কান দেয় না। তারপর নাকটাক ঝেড়ে বললো আর সুরঞ্জনা নামটা কি বিচ্ছিরি করে উচ্চারণ করলে তুমি, সব নাম কি আর সব জিভে আসে?

ভূপিন্দর নিজেও সেটা বোঝে। বাংলা নিয়ে যতই ধ্বস্তাধ্বস্তি করুক না কেন উচ্চারণে একটু গোলমাল হয়ে যায়ই। তার ভাইয়ের উচ্চারণ কিন্তু খুবই সড়গড়। অথচ কপাল দেখ তারই প্রেমপাত্রী জুটলো কিনা এক সর্দারিন?

ভাইকে সে জিজ্ঞেস করলো একদিন, অনেক গলাখাঁকারি দিয়ে ইয়ে—মানে তুই কি মেয়েটাকে বিয়ে করবি নাকি?

কোন মেয়ে? ভাই জানতে চাইলো।

ওই যে, ভূপিন্দর আবার একটু গোলাপী হোল ওই যে চিঠি লিখেছিল।

ভুরু কুঁচকে একটু ভেবে বিচারবিদ্ বললো, সে—ই মেয়ে? না না. সে তো কবেই চুকেবুকে গেছে।

ভূপিন্দর খুশি হয়ে বললো, তা ভালোই হয়েছে। কিন্তু কিরকম মেয়ে তোর পছন্দ?

তা কি বলা যায় নাকি? ভাই কথাটা উড়িয়েই দিল, ওরকম কোনো প্রিকনসিভড নোশন আমার নেই।

ভাই তো শিস দিতে দিতে চলে গেল। ভূপিন্দর নতুন করে চিন্তায় পড়লো। তবে কি তুতুল সম্বন্ধে তার প্রিকনসিভড নোশনগুলোই তাকে নাচাচ্ছে? আসলে তুতুল কেমন মেয়ে? তারপর তুতুলেরও কি প্রিকনসিভড নোশন আছে নাকি? সেগুলো কেমন? ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে গেল। একটা হেস্তনেস্ত না করলে আর চলে না।

গঙ্গার ধারে বসে যখন জল ছলছল করে তীরে ধাক্কা মারছে আর সূর্যটা যখন ডুববো ডুববো করছে তখন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড এফেক্ট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে মলয় তুতুলকে তার প্রাণের কথাটা বলে ফেললো। বেশ কাব্যি করেই বললো—তোমারই জন্যে এতোদিন বসেছিলুম, পথ চেয়ে আর কাল গুণে এখন যখন সময় হোল তখন কংকা শংকা কোর না।

তুতুল ভুরু কুঁচকে বললো, কী গাছের কতকগুলো নামে ডাকো আমায়। কেন আমার নামটা বুঝি তোমার পছন্দ হয় না?

পছন্দ হয় না? ভূপিন্দর অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি। তুতুল আমার তুলতুল, ইউ আর দ্য গার্ল ফর মী।

তুতুল এবার বুঝলো, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মল—য়, ওঃ মলয় আমি তো এখনো নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না যে, ইউ আর দ্য ম্যান ফর মী। আর সে সম্বন্ধে যতদিন না সিওর হতে পারছি ততদিন—বলে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো তার ডাগর চোখদুটি তুলে মলয়ের মুখের পানে চেয়ে রইলো।

বাড়ী ফিরে ভূপিন্দর গুম হয়ে বসে রইলো।

তার মা কিছুক্ষণ দেখে বললেন, তুই বরং কিছুদিন তোর দাদীর কাছে ঘুরে আয় বেটা। তোরও হাওয়া বদল হবে আর তারও ভালো লাগবে। একলা পড়ে গেছেন—বুড়ো বয়সে লড়কাপোতাদের সহারা তো চায় মানুষ।

রমির পিসে অনেকক্ষণ থেকে উসখুস করছিলেন এখন ফাঁক পেয়ে একটা শিরামীয় রসিকতা ঝেড়ে দিলেন সে সহারা না পেলে তার জীবনটা সাহারা হয়ে যাবে এই তো?

সকলেই একটু কণ্ঠহাসি হাসলো। বলু বললো, এই তো দুদিন পরেই আপনি চলে যাবেন আর এইসব হাসি-ঠাট্টাও আমরা আর শুনতে পাবো না। আচ্ছা ঠিক কবে যাবেন বলুন তো?

এখনো ঢের দিন বাকি আছে, বলে রমি চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে পিসের দিকে ফিরলো। গম্ভীরভাবে বললো এই-রকম রসিকতা কি না করলেই নয়?

রমির পিসে থতমত খেয়ে বললেন, কেন মন্দ কি? সবাই তো হাসলো।

রমি আরো গম্ভীরভাবে বললো, আপনি তো জানেনই যে আমরা সবাই খুব ভদ্র। কিন্তু আপনার কি সেই অ্যাড-ভান্টেজটা নেওয়া উচিত?

বড়ো বড়ো নীলচোখে তিরস্কার ভরে রমি কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো, তারপর যখন দেখলো ভদ্রলোক যথেষ্ট বিবেক-পীড়িত অবস্থায় ইতিউতি চাইছেন তখন চাদরটার দিকে ফিরে বললো, বলো এবার।

চাঁদরটা বললেন তা সেই প্রথম—মানে অমৃতসরের পথে—ভূপিন্দরের তার নিজের জাতভাইদের সঙ্গে একটা যাকে বলে কনফ্রান্টেশান হোল। এফেকটটা খুব ভালোই হোল—শক ট্রিটমেন্টের মতো আর কি।

রাত্তিরে ট্রেনে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিল ভূপিন্দর, বা মলয় যা বলিস। রিজার্ভড বার্থ তার কোনো গোলযোগের আশংকা ছিল না। মাঝরাত্রে একটা স্টেশন থেকে একটি দল উঠলো, সকলেই ভূপিন্দরের জাতভাই—আর বাংলাদেশের জলহাওয়া খাওয়া ডিসপেপটিক মূর্তি নয়—বেশ আদত র' চেহারা যাকে বলে। উঠে নিজেদের মালপত্র গোছগাছ করে নিয়ে তারা ভূপিন্দরকে ধাক্কা মেরে বললো এ মুন্ডে, উঠ, একপাশে সরে বোস। এখানে আমরা আমাদের বাকস রাখবো।

ভূপিন্দর বা মলয় পরিশীলিত এবং সুকুমার মলয়, বাঙ্গালীদের মতো চুলচেরা তর্কে অভ্যস্ত মলয় বললো বাঃ এটা তো আমার রিজার্ভ-করা বার্থ।

তারা শুধু মাথা নেড়ে বললো, উঠ উঠ নইলে তোর ওপরেই বাকস রাখবো।

তাই রাখো বলে মলয় গোঁভরে শুয়ে রইলো। আমার রিজার্ভ-করা সীটে আমার রাইট আছে।

সে যতক্ষণ তার রাইট বাঝাচ্ছিল, ততক্ষণ তার সঙ্গীরা, বিনা বাক্যব্যয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। এখন একটা বিরাট বেডিং মলয়ের পিঠের ওপর ধমাস করে ফেলে দিয়ে তারা একটা প্রকান্ড ট্রাঙ্ক তুলে ধরলো। সেটা মলয়ের পায়ের ওপর নামিয়ে রাখবে এই তাদের ইচ্ছে।

মলয় আর্তনাদ করে কোমোমতে হাঁচড়ে পাঁচড়ে বেডিংটার তলা থেকে বেরিয়ে এলো। কিরকম অবিশ্বাসী চোখে সে তার সহযাত্রীদের দিকে চেয়ে রইলো। তারা কিন্তু নির্বিকার। বাকস-বিছানা গুছিয়ে তারা শুয়ে পড়লো আর মলয় সারারাত বিস্ফারিত চোখে চেয়ে ঠায় বসে রইলো। এই প্রথম সে অনুভব করলো যে দাবীর একটা অন্য চেহারাও আছে।

আর আশ্চর্য ওর খুব একটা খারাপও লাগলো না। সকালবেলা সহযাত্রীদের সঙ্গে দিব্যি ভাব হয়ে গেল। অমৃতসরে পৌঁছে তারা মলয়ের পিঠে সশব্দে চাপড় মেরে আদর করলো, গলা জড়িয়ে চুমু খেল, তারপর বিদায় নিল। অন্যমনস্কভাবে কি-যেন ভাবতে ভাবতে মলয় দাদীর কাছে পৌঁছলো।

তার মায়ের চিঠিতে দাদী বোধহয় সবকিছুই জেনেছিলেন। নাতিকে আদর করার বদলে ভদ্রমহিলা একেবারে যাচ্ছেতাই রকম বকুনি আরম্ভ করে দিলেন। গালাগালির মোক্ষম ভগটা অবিশ্যি নিজের ছেলের উদ্দেশেই ঝাড়লেন। ন্যানারকম চতুষ্পদের পুত্র বলে তার পরিচয় দিয়ে বললেন সে খসমখান, শুয়ের দা পুতুর, তোদের নাম বদলেই এই সর্বনাশটা করেছে? কিরকম সব নাম রেখেছিলুম তোদের! সেই নাম শুনে শত্তুরা কাঁপতো। তার বদলে কিনা মেলো-য়! আর অন্যটার কি যেন নাম?

কিশলয়।

কিস্‌সো-লয়, শোন একবার। আক্কেল-মারীটা দেখ। আর তুইও কিনা একটা বঙ্গালীনের প্রেম পড়লি আর তাও আবার এমন অজীব নামের লড়কির সঙ্গে!

ওর নাম তুতুল, মলয় জানালো।

দাদী গালে হাত দিয়ে বললেন, জিন্দগীতে কখনো ইনসানের নাম এমন হয় তা শুনিনি। তোর পিসীদের নাম হোল হরচরণ স্মরণাগত আর যতীন্দর। তোর দিদিদের বেলা নয়াচালের নাম রখা হোল সন্তোষ আর প্রেম। আর তুই কিনা এমন মেয়ে পছন্দ করলি যার নাম হোল তু—তুল?

ভূপিন্দর দাদীর কথার যাথার্থ্য উড়িয়ে দিতে পারলো না। পরিবেশটাই যেন কেমন অন্যরকম। সেখানে কলকাত্তাইয়া জিনিসগুলো ঠিক খাপ খায় না। অথচ এই পরিবেশটা তার সঙ্গে যেন কেমন খাপ খেয়ে যেতে লাগলো, কেমন একটা সেন্স অভ বিলংগিং যেন দানা বাঁধতে লাগলো, সে যে ভূপিন্দর খাল্সা এই বোধটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। লক্ষ্য করে দাদী ঘাড় নাড়লেন।

একমাস এখন তুই দেহাতে গিয়ে চাষবাস দেখবি। মনে রাখিস বঙ্গালীদের মতো ভুঁড়ি বানিয়ে আরামসে জমিদারী দেখা নয়, রীতিমত কামকাজ করতে হবে। কুয়া থেকে পানী তুলবি, ট্রাকটর চালাবি আর রবিবারে

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অমৃত

নববর্ষ সংখ্যা ১৩৮৩

সংখ্যাটি অপরিহার্য কেন? কারণ

১। পৃথিবীর অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য লেখা হয়েছে বিদেশী ভাষায়। ২। সব ভাষা সকলের শেখা সম্ভব না। ৩। ইংরেজি অনুবাদে যা পাওয়া যায় তাও সকলের পড়া সম্ভব নয়। ৪। ভাষার অসুবিধা ছাড়াও আজকের ব্যস্ত মানুষের সময় কোথায়? ৫। সে জন্যেই আমরা ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে বার করছি এবার

বিশ্বের ৫খানি ক্লাসিক উপন্যাস

রেজারেকশান লিও তলস্তয়

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেণ্ট ফিদর দস্তয়েভস্কি

মাদাম বোভারী গুস্তভ ফ্লবেয়ার

এ টেল অব টু সিটিজ চার্লস ডিকেন্স

ফাদার গোরিও অনর দা বালজাক

অনুবাদ করেছেন অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তিরা যেমন—কবি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের রীডার জগন্নাথ চক্রবর্তী কবি ও বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপক আনন্দ বাগচী প্রাবন্ধিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার উজ্জ্বল মজুমদার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের রীডার ও লেখক চিত্তরঞ্জন ঘোষ এবং হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক ও গল্পকার বীরেন্দ্র দত্ত।

এই উপন্যাসগুলি বই হয়ে বেরোলে প্রত্যেকটির দাম হত ৫ টাকা। কিন্তু একখানির দামে এবার অমৃতে পাবেন ৫খানি। এবং সেই সঙ্গে

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙিন সুতোয় বোনা (উপন্যাস)

—প্রফুল্ল রায়

অপ্রকাশিত ডায়েরি—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দাম ৫ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র ১ টাকা ৫০ পঃ

ক্ষেতাঁতে চৌকি দিবি। একমাস পরে একটা মরদ হয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াবি।

যাকে বলে একটা ক্র্যাশকোর্স ইন হ্যী-ম্যানশিপ। প্রায় একটা মিরাকল্ হয়ে গেল, বুঝলি। ভদ্রমহিলা অতিশয় শক্ত মানুষ। কোথায় লাগেন আমাদের—

চুপ, চুপ, চুপ, সবাই মিলে চাঁদুকাকে চুপ করিয়ে দিল।

চাঁদুকা ঢোঁক গিলে বললেন না বলছিলুম যে কোথায় লাগেন সর্দার প্যাটেল। একমাস নয় প্রায় সওয়া তিনমাস পরে 'দাদী'—বলে হাঁক ছেড়ে যে নওজওয়ান বাড়ীর ভেতরে এসে ঢুকলো তাকে দেখে দাদী আর চিনতে পারেন না। আরে দাদী, মেরী দাদী, বলে বৃদ্ধাকে কোলে নিয়ে দুপাক ঘুরলো ভূপিন্দর, তারপর নামিয়ে দিয়ে বললো, কেমন দেখছো?

দাদী মুখ টিপে হেসে বললেন ঠিক তোর দাদুর মতো। তারপর নাতিকে প্রাণভরে আদর করে একটা কাজের কথা মনে

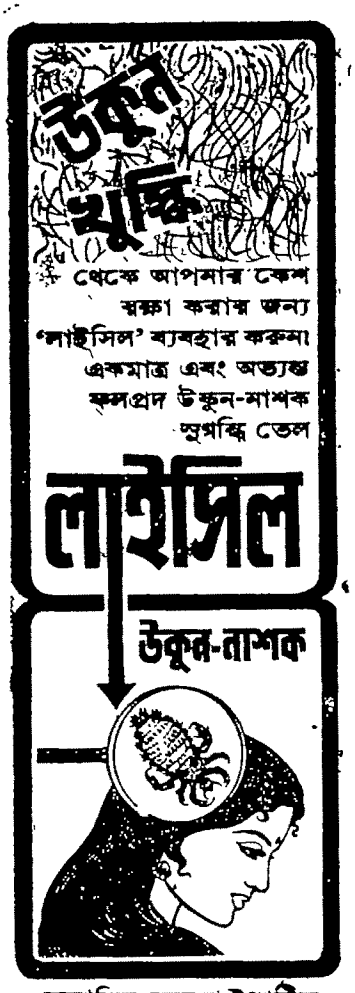

সুজানিল কেমো ইণ্ডাষ্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

পড়তে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে চার বস্তা বজরা আনতে বলেছিলুম, এনেছিস?

কাকে বলেছিলে?

কেন বিষুণকে।

সে তো আমায় কিছু বলে নি, বলেই প্রচণ্ড এক হাঁক দিল ভূপিন্দর, বিক্কু—ণ আরে এ উল্লু কা পাঠ্ঠা, এদিকে আয়।

বিষুণ এসে দাঁড়াতেই গালাগালির যে স্রোত বইলো সেখানে উল্লু কা পাঠ্ঠা তো বুদবুদ মাত্র। শুনতে শুনতে দাদীর চোখে আনন্দে জল এলো। ওড়নায় চোখ মুছে অস্ফুটে বললেন, একেবারে ওঁর মতো—হুবহু!

তারপর ভূপিন্দর বললো, দাদী আমি এবার বঙ্গালীনকে আনতে যাবো।

দাদী দুষ্টু হেসে বললেন আর যদি সে তোর সঙ্গে আসতে না চায়?

আসতে চাইবে না? ভূপিন্দর প্রাণ খুলে হাসলো। নিজের হাঁটুতে দুটো চাপড় মেরে বললো, আসতেই হবে। না-কমানো তামাটে মুখে ঝকঝকে দাঁতের হাসিটা বড়ো সুন্দর দেখালো। —চাঁদুদা এবার এলিয়ে পড়ে বললেন, রুণুমা চায়ের সঙ্গে এবারে একটু টনিকের ব্যবস্থা করো, আর পারা যাচ্ছে না। রুমি বললো, কি যে সবক্ষণ খাই খাই করো চাঁদুকা, যতোই হোক তুমি অস্ট্রীয় তো—

পরিচয় দিসনি, চাঁদুকা এক কথায় কেটে দিলেন, এ ব্যাপারে তোর সঙ্গে আমার কোনো আত্মিক যোগাযোগ নেই।

রুণু বললো গল্পটা শেষ করুন না।

শেষ তো হয়েই গেল রে, চাঁদুকা অবাক হয়ে তাকালেন, ইম্যাজিনেশান বলে কি কিছুই নেই তোদের? এই তো গত বছরে অমৃতসরে গেছলুম। ভূপিন্দরের সঙ্গে দেখা করলুম। মস্ত মানুষ এখন সে, তিন-তিনটে মিলের মালিক, কিন্তু ঠিক আগের মতই আছে। আমাকে দেখেই লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলো। তখনো ওর ঘাম শুকোয়নি কিন্তু কে কার কথা শোনে। তারপর প্রাথমিক উচ্ছ্বাস শেষ হতে চিৎকার করে ডাকলো, সুরিন্দর, দেখে যাও কে এসেছেন।

ডাক শুনেই ফুটফুটে একটা বাচ্চা কোলে নিয়ে মেটাসোটা এক পাঞ্জাবী মহিলা বেরিয়ে এলেন। ধবধব করছে রঙ, গায়ে প্রচুর মাংস আর প্রচুর গয়না, আর মুখ থেকে তৃপ্তি ঝরে পড়ছে।

আমি কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম বুঝলি? তুতুলের সঙ্গে কবে ছাড়াছাড়ি হোল? কিছুই তো টের পাইনি? একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়লো, ভাবলুম প্রেম-ট্রেম যাই হোক আইডেন্টিটির গোলমাল হলে বেশীদিন টিকে থাকা শক্ত।

এমন সময় মহিলাটি কাছে এসে কণ্ঠে নীচু হয়ে প্রণাম করে বললেন, দাদু, চিনতে পারছেন না? আমি তুতুল।

এরকম শক্ খাবনে কমই খেয়েছি। সামনে দাঁড়ানো মহিলাটির নাম যতীন্দর সুরিন্দর যা-ইচ্ছে হতে পারে, কিন্তু তুতুল কিছুতেই নয়। শুনলুম দাদীজী শখ করে নাম পাল্টে দিয়েছেন নাতবৌ তাঁর চোখের মণি। ভাগ্যিস পাল্টে দিয়েছেন!

সুরিন্দরের পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বললুম, এ ছোকরাকেই শেষ অবধি পছন্দ করলে?

সে সলজ্জ হেসে বললো, ও তো মত চাইতে আসেনি, তারিখ ঠিক করতে এসেছিল।

আমি মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম সেই নতুন মলয়কে দেখে তুতুলের একস-প্রেশানটা কেমন হয়েছিল। এতোদিনে তার স্বপ্নের পুরুষটি বাস্তবে দেখা দিয়েছে। ঢলো ঢলো চোখে তাকিয়ে সবে সে ডেকেছিল মল—য়!

কে মলয়? ভূপিন্দর এক ধমক দিয়েছিল তাকে, আমি ভূপিন্দর খান্না। তোমার বাবা মা যেন খবরদার আমাকে অন্য নামে না ডাকেন। আর স্বামীর নাম ধরা যেহেতু আমাদের ওদিকে চলে না তাই তুমি এখন থেকে 'সুনোজী' বললেই চলবে বুঝেছো?

তুতুল ঘাড় নীচু করে বলেছিল, হাঁ জী।

তারপর আর কি, দেখলুম আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মলয়-তুতুল বা ভূপিন্দর ও সুরিন্দর, যা বলিস। আর ওদের দুজনের চোখে সেই ভালোবাসার ভাষা দেখলুম যা বাঙালী-পঞ্জাবী, সকলের চোখেই ফোটে।

চাঁদুকা রোম্যান্টিকভাবে চুপ করলেন। অজু উসখুশ করে ওর বৌকে ফোন করতে গেল। রুমির পিসে বললেন টেকনিক্যাল ব্যাপারেও এই ওয়ন ল্যাঙ্গোয়েজ ফর্মুলাটা খুব সহায্য করে।

রুমি ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিল বললো, তা এদিকে তুতুলের সুরিন্দর হয়ে যাওয়াতে কোনো আইডেন্টটি প্রবলেম হোল না?

চাঁদুকা হাত বাড়িয়ে রুমির মাথায় আস্তে করে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, রাগ করিসনি রুমি, ইস্কুলের কথাটাও ভুলিসনি, কিন্তু তুইই বল প্রবলেম হবে কি করে? মেয়েদের কি কোনো নিজস্ব আইডেন্টটি আছে?

এমন সময় এতোটুকু একটা শাদা-কালো কুকুর এসে ওরিয়নের সঙ্গে হুটোপাটি করতে লাগলো। রুমির পিসে অবাক হয়ে বললেন, আরে এটা আবার কবে এসেছে? নামকি এটর?

রুমি বললো, ডাক্স্।

ডাক্স্? ডাক্? মানে হাঁস?

রুমি ঠাণ্ডা গলায় বললো, ডাক্ মানে হাঁস।

ভদ্রলোকের মুখে আর কথা সরলো না।

সাহিত্যের নেপথ্যে

রূপা অ্যান্ড কোম্পানী

শুধুমাত্র নিছক গল্প উপন্যাস নয় প্রকাশন সংস্থার দায়িত্ব থাকা উচিত মানুষের রুচিবোধ পাল্টে দেবার। তাই উপন্যাস ছাড়া এমন কিছু বই প্রকাশ করার দরকার যা সমাজের কাঠামো পাল্টে দেবার কাজে সহায়ক হয়।

অমুক মেহেরা বলতে কি বুঝবেন? পাঞ্জাবের লোক তো? আর পাঞ্জাবের লোক মানেই কলকাতা শহরে আর দশটা ব্যবসার মালিক বা অংশীদার যা বই পাড়া থেকে অনেক দূরে। হঠাৎ ভারতের এক নামজাদা পুস্তক প্রকাশন সংস্থার মালিক পাঞ্জাবী শুনলে একটু অবাক হয়ে যেতে হয়। তাই না?

কিন্তু মেহেরাজীর সঙ্গে আলাপ করলে বুঝবেন মনে প্রাণে এমন একজন বাঙ্গালী বাঙ্গালীদের মধ্যেই দু-একটা খুঁজে পাওয়া যাবে। কবে থেকে যে শুরু হয়েছিল তাঁর দোকানে শনিবার শনিবার সাহিত্যের আড্ডা আজও তা চলছে। শনিবার দুটোর পর আর কোনো কাজ করা নেই। বই পাড়ার ব্যস্ততম এ পুরুষ সরে আসেন হিসেব-পত্তর, দেনা পাওনা বিল ভাউচার থেকে। অপেক্ষা করেন সাহিত্যের বন্ধুদের জন্যে। এসেছেন অনেকে এবং আজো সে আসার বিরাম নেই।

তবু শুনে চমকে যেতে হয়, রূপার স্টোকানে প্রথম বিক্রি হয়েছিল বিদেশ থেকে আনা রুমাল আর টাই। একথা বই পাড়ার পুরনো লোকেরা সবাই জানেন। দোকানটা ছিল ১৮-বি শ্যামচরণ দে স্ট্রীটের শরৎ বুক হাউসের ঠিক উপরে। বিদেশ থেকে রুমাল আর টাইয়ের সঙ্গে ১৯৩৮-য় এলো চেম্বারস ডিকসেনারী। দাউ দয়াল মেহেরা নিজেই তখন মোবাইল দোকান, একইসঙ্গে সেলসম্যানশিপ, বিল আদায় ক্যাশ রাখা। ঘুরে ঘুরে মেহেরাজী ডিকসেনারী বিক্রি করেন। ১৯৪১এ এলেন জ্যোতি সেনগুপ্ত সহকারী হিসেবে। ভাইপো নারায়ণ দাস মেহেরা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন—জানেন? উনি আমার চেয়েও বড় আই মিন কিনিয়ার। নারায়ণ দাসজীর মাথার সব চুলগুলো সাদা।

যাক যে ব্যাপারটা বলতে যাচ্ছিলাম, —আচ্ছা মেহেরাজী পাঞ্জাব থেকে এলেন কবে? আর যদি এলেনই তবে বই বিক্রির ব্যবসা এলো কেন?

—পাঞ্জাবী বলতে পারেন, তবে পাঞ্জাব থেকে আসিনি এসেছি বেনারস থেকে। পাঞ্জাবে হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষ থাকতে পারে তবে তিন পুরুষ ধরে আমরা বেনারসে। সেখান থেকেই কলকাতায়। ভাঙ্গা পরিষ্কার বাঙ্গলা আর ইংরেজী মিশিয়ে নারায়ণদাসজী কফি হাউসে সবচেয়ে উপরতলায় রূপার অফিসে বসে স্মৃতিচারণ করছিলেন। কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের প্রায় সব কটা তলাতেই রূপা। তিনতলায় সুসজ্জিত বিদেশী কায়দায় সাজানো শো-রুম। কি নেই সেখানে। সেকসপীয়ার আইনস্টাইন থেকে শুরু করে মুস্তাক আলী বিজয় হাজারে পর্যন্ত। ঝকঝকে পুরোদস্তুর অফিসে ব্যস্ত সবাই। তলার ঘরে প্রচণ্ড ব্যস্ত, প্রবীণ দাউদয়ালজীর তখন দম ফেলার সময় নেই।

—যাক যা বলছিলাম—কাকার অনেক বন্ধু তখন বই ব্যবসায় জড়িয়ে ছিলেন। একজন ছিলেন—খান্নাজী। খান্নাজী কাকাকে বইয়ের ব্যাপারে পরামর্শ দিলেন। ইতিমধ্যে ডিকসেনারী বিক্রি হচ্ছে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে লোকের চাহিদা হোলো নিউ জেম, অকসফোর্ড ডিকসেনারী। এই সময়ে আমরা ২৫ পার্সেন্ট কমিশনে পেঙ্গুইনের বই বিক্রির একটা সুযোগ পেলাম। পেঙ্গুইন পেপার ব্যাকের তখন দাম আর কতো হবে, তা ধরুন—ছ' পেন্স মানে ছ' আনা।

এরপর ২য় বিশ্বযুদ্ধ লেগে গেল। সবাই তখন কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। আমরাও বইপত্তর কিছু বেনারস কিছু এলাহাবাদে সরিয়ে নিয়ে এলাম। বই বেশ বিক্রি হচ্ছিল। তবে একটা অসুবিধের মুখোমুখি হতে হোলো। তখন বিদেশী বইয়ের বাজারের কলকাতার প্রকাশন সংস্থার মালিক সবাই সাহেব। আমাদের এজেন্সী দেওয়া দূরের কথা রেকগনাইজই করতো না। ঠিক এই সময়ে উইলিয়ম কলিনস প্রকাশন সংস্থার প্রতিনিধি কে জ্যাকসন মার্শাল আর জন ক্লার্ক আমাদের ধারে বই দিয়ে সাহায্য করলেন। ওঁদের ঋণ ভোলার নয়। কারণ বই নেবো অত টাকা আমাদের কোথায়? ফলে এই ব্যবস্থায় আমাদের এত সুবিধে হোলো বলার নয়। তখন আমরা অর্ডার দিচ্ছি আর ওরা সাপ্লাই দিচ্ছেন, আমরা বিক্রি করছি ২৫ পার্সেন্ট কমিশনে।

৫১০ টাকা ধার নিয়ে সাড়ে পাঁচ ডজন বিদেশী 'পিরামিড' রুমাল ৮৬ ডজন 'টুটাল' টাই নিয়ে যে দোকান শুরু হয়েছিল—১৯৬০ সালে তাদের প্রকাশনী শুরু হোলো

গোড়া থেকেই কাকার একটা লক্ষ্য ছিল যে, আমরা সব সময় ভালো বই ছাপাবো। ছাপা হোলো হেরম্মান হেস-এর 'সিদ্ধার্থ'। চার পাঁচটা এডিশন বেরিয়ে গেল। কাকা বিদেশী বই খুব পড়েন তাছাড়া আমরা বিদেশী বইয়ের পরিবেশক ফলে ঝোঁকটা কাকার বিদেশী সাহিত্যের উপর বেশী ছিল। এর পর বেরুলো—সিক্রেট অফ সোভিয়েট সায়েন্স' 'আঁদ্রে মালরোর ক্লিনেটেশ অফ লভ' সঙ্গে সঙ্গে ছাপা হোলো বিদেশী বইয়ের বাঙলা অনুবাদ—বোরিস পাস্তারনাকের—'শেষ প্রীষ্ম' আর স্তেফান জোয়াইগের গল্প গ্রন্থ।

আমার কাকা বাঙালীদের ভালোবাসেন বাঙালীদের সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসেন বাঙলা সাহিত্য ভালবাসেন, তাই সব সময় কাকা একটা কথা বলেন—এদেশের টাকায় যখন আমাদের প্রকাশনীর এত শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তখন এভাবাকে আমরা আরো ছড়িয়ে দেবো না কেন নানা বইয়ের মধ্যমে। কাকা শুধু ভাবেন নি, করেছেন কাজেও. আমরা দেড়শো বাঙলা বই ছেপেছি। লিস্টের মধ্যে—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুকুমার সেন দলীপকুমার রায় থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, চিত্তরঞ্জন মাইতি অদি সবাই আছেন।

সরলা দেবীচৌধুরাণীর 'জীবনের ঝরাপাতা' যখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, পুনর্মুদ্রণ করেন রূপা। বইয়ের পুনঃপ্রকাশ দেখে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখে জানিয়েছিলেন—'উনিশ শতকের শেষ দুই দশক ও বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের ইতিহাসের সঙ্গে বিচিত্র টানাপোড়েনে জড়ানো।—সুদীর্ঘ এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস যারা জানতে চান বুঝতে চান লিখতে চান তাঁরা কি কেউ পারবেন সুলিখিত সুপাঠ্য এই গ্রন্থটিকে অবহেলা বা অবজ্ঞায় একপাশে সরিয়ে রাখতে। শুধু তথ্যের দিক থেকেই নয়, সাহিত্য গুণে সমৃদ্ধ বহুদিন নিঃশেষিত মূল্যবান এই গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশে ব্যক্তিগতভাবে আমি আনন্দিত বোধ করছি এবং এজন্য 'রূপা'র কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

আমাদের একটা কথাই এই প্রকাশনীর শেষ কথা ছিল যা কিছু ভালো এবং নতুন সবদের, তাই ছাপাবো বিক্রি না হলেও ছাপবো। হয়তো ৫।১০ বছরে গিয়ে হয়তো কোনো বইয়ের প্রথম মুদ্রণ কটবে তা জেনেও আমরা সে বই বের করেছি। আজো তা করছি।

আস্তে আস্তে রূপা পূর্বাঞ্চলে বিদেশী বইয়ের সব চেয়ে বড় পরিবেশক হয়ে উঠলো ১৯৩৬-এ যা শুরু। ১৯৫২-এ খোলা হোলো এলাহাবাদ রূপা। ১৯৫৫-তে বম্বাই এবং ১৯৭০ সালে উদ্বোধন হল দিল্লীর দোকান।

স্বাধীনতার আগে যে ভারতীয় পুস্তক বিক্রেতাকে এজেন্সী দূরের কথা সাহেবরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি, সেই সেদিনকার প্রায় মোবাইল পুস্তক বিক্রেতা রূপা এখন—শ্রেষ্ঠ স্টকিষ্ট। বুটেনর—কলিনস। ফেবার এ্যান্ড ফেবার। জর্জ এলেন অ্যান্ড সানউইন লেডি বর্ড। পেগুইন। পিটম্যান—

জাপানের—ইগাকু শোইন। ম্যাগাজা হিল কাগকুশা। তেপান।

ভারতের—এ্যাপিলেটেড ইষ্ট ওয়েষ্ট প্রেস। ডি বি তারাওয়ালে। প্রেন্টিস হল (ভারত), টাটা ম্যাগ্রো হিল, উইলি ইষ্টার্ণ।

এবং ১৮।১৯টা কোম্পানির প্রতিনিধি যার মধ্যে অর্মস এ্যান্ড আর্মর, লরীমার পাবলিশিং থেকে ডাবলু, এইচ অ্যালেন পর্যন্ত।

৫৯০ টাকা ধরে নিয়ে যে সংস্থা শুরু আজ তার আকার ধারনার বাইরে। ৭৫ জন কর্মী এ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত; ফোন অফিস টাইপিষ্ট স্টেনো সে এক এলাহী ব্যাপার। ভাবই যায় না, কলকাতার কোনো প্রকাশন সংস্থায় বসে আছি। আগে এখনকার শো-রুমে খুচরো বিক্রি হতো না। ক্রমশঃই অধ্যাপক, ছাত্র, গবেষককরা বই কিনতে আসতে লাগলেন, প্রথম দিকে এখানে খুচরো বিক্রি করবো না ভেবেছিলাম পরে সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। দাদার লজ্জার দুই ছেলে চন্দ্রকুমার মেহেরা সিধুকুমার মেহেরাও এখন এ সংস্থার বিভিন্ন দিক দেখছেন। সম্পাদনার দিকটা দেখছেন চিত্তরঞ্জন মাইতি। রূপা অনেক পাল্টে দিয়েছে বইয়ের চেহারা প্রথম লেখকের ছবি আর জীবনীর সঙ্গে অনুবাদকের জীবন চরিত দিয়ে।

—একবার কাকার মনে হোলো অ্যারিয়ান নাইটস-এর বাংলা অনুবাদ চওয়া দরকার। যে কথা সেই কাজ। তরাপদ বাবাকে গিয়ে কাকা ধরলেন অনুবাদ করে দিতে হবে। তরাপদবাবু রাজী হলেন। শুরু হোলো ছাপা।

—আসলে কি জানেন বই প্রকাশনা ছাড়াও সংস্থার কিছু দায়িত্ব থাকে। দেশের নৈতিক, আর্থিক সামাজিক দায়িত্ব থেকে সে বিচ্যুত হতে পারে না। এমন কিছু ঘটনার সাক্ষী থেকে যেতে হয়েছে এই সংস্থার সঙ্গে থেকে। একবার আমাদের কাছে একটা বই পরিবেশনার ভার এলো। বইটার নাম—এরিয়া অফ ডারকনেস। পড়ে দেখা গেল ভারতের বিপক্ষে যার মতামত। তবু কাকা আরো দুজনকে বইটা পড়তে দিয়ে জানতে চাইলেন তাঁদের মতামত। নাম বলছি না, তবে বিখ্যাত লোক; যাকে আপনারা একডাকে চিনবেন। আশ্চর্য! যাদের মতামতের উপর নির্ভর করে জনগণের কাছে বইটা পৌঁছে দেবো। তাঁরা বললেন—আন্টি ইন্ডিয়া হতে পারে অ্যান্টি ন্যাশানালিজম নয়। তবুও আমরা পরিবেশন করলাম না। তরপরে ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করে জেনে নিলাম পরিবেশন করা যাবে কি না। এবং শেষ পর্যন্ত করা হোলো।

—আচ্ছা মেহেরজী, একটা কথা মনে হয়, বিদেশী ভাষার বই এদেশে অনুবাদ করে যদি বিশ্বসাহিত্যকে আমাদের কাছে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করেন, তা হলে এটুকু কি মনে হয়নি যে, এদেশের পুরোধা সাহিত্যিক যাদের বই ইংরেজীতে অনুবাদ করলে আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেতো? সে ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আপনাদের কাছে বেশ কিছু আশা করেছিলাম।

—ঠিকই বলেছেন, তবে একেবারে যে চেষ্টা করিনি তা নয়, তবে দুএকটি বই করে দেখেছি তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি,

রূপার শো-রুমে গিয়ে দেখবেন, গোটা বিশ্বসাহিত্য আপনার হাতের মুঠোয়। আর রূপার নিজস্ব বই কি নেই, ক্যামেরা রান্না, ফিল্ম থেকে শুরু করে ফুটবল, ক্রিকেট। মেহেরাজী হেসে বললেন—আমরা যা বিখ্যাত ক্রিকেটারদের বই বের করছি সেগুলো সাজালে একটা বিশ্ব একাদশ হয়ে যায়। বের হচ্ছে—'ইন্ডিয়া বাই ইন্দিরা গান্ধী' আর 'গোল্ডেন গেট'।

রূপা আরো বাড়ছে। তিন হাজার স্কোয়ার ফুট নিয়ে নতুন শো-রুম হচ্ছে ঐ বাড়িতে। কি করে যে হবে, তা আমার মাথায় এলো না। শুধু একটা কথা মনে হোলো নিজের চেম্বারে বসে যে মানুষটি পরিণত বয়সেও নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁর চোখে রয়েছে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন আর প্রতিটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সৎ মানসিকতা।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

শরৎ অমৃতের বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সংগ্রহযোগ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-১৮৲ মহাজীবন-অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-০৬৩৬

এই বাংলার খবর

খরার আশঙ্কায়

চৈত্র পার হয়ে বৈশাখেরও বেশ কিছুদিন পার হয়ে গেল, তবু এখনও আকাশ আগুনে বৃষ্টির দেখা নেই। এই আবহাওয়া এই সময়ে এই বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক কিনা অথবা কতোটা স্বাভাবিক তা নিয়ে আবহাওয়া অফিস রোজই খবর দিয়ে যাচ্ছে। খবর নেই শুধু বৃষ্টির। তাপমাত্রা উঠছে কখনও পড়ছেও সামান্য। তাতে সাধারণ মানুষের কিছু যায়-আসে না। সকলেই বৃষ্টি প্রার্থী। রাজ্য জুড়ে এইভাবে বৃষ্টি না হওয়ায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে সরকারী মহলেও। '৭২-৭৩ সালের খরার স্মৃতি খুব দূরের নয়। মাঝের দু'বছর অবশ্য খরা নিয়ে কোনো শঙ্কা দেখা দেয় নি। এ-বছরও যে খরা হবেই এমন কথা বলার সময় এখনও আসে নি। তবু রাজ্য সরকার এখন থেকেই সতর্ক থাকতে চান। কারণ বিভিন্ন জেলায় সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা যে ছবি দেখেছেন তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। দার্জিলিংয়ে পদযাত্রার সময় মুখ্যমন্ত্রী সেখানকার অবস্থা দেখে শংকিত হয়ে ওঠেন। মুখ্য সচিবকে টেলিফোন করে তিনি এ-ব্যাপারে আরো খবর যোগাড় করতে বলেন এবং একটি বৈঠক ডাকার ব্যবস্থা করতেও বলেন। দার্জিলিং জেলায় কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেও সারা জেলা তাপ প্রবাহের কবলে। পানীয় জলের খুবই অভাব। কৃষিমন্ত্রী আবদুস সাত্তার এবং সমবায়মন্ত্রী জয়নাল আবেদিনেরও নিজ নিজ জেলায় ঘুরে একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। ভূমি ব্যবহার দপ্তরের মন্ত্রী গুরুপদ খান বাঁকুড়া ঘুরে এসে বলেছেন, ঐ জেলার অধিকাংশ ব্লকেই জলের অভাব। কুয়ো-পুকুর শুকিয়ে যাচ্ছে। শুকিয়ে-যাওয়া কুয়ো-পুকুর নতুন করে খোঁড়ার জন্যে তিনি জেলা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে শিল্পনগরী দুর্গাপুরেও দেখা দিয়েছে জলকষ্ট। সেখানে এক বালতি জল এক টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে।

২১ এপ্রিল সম্ভাব্য খরার অবস্থা মোকাবিলা সম্পর্কে আলোচনার জন্যে মুখ্যমন্ত্রী এক বৈঠক ডাকেন।

এই বৈঠকে হাজির ছিলেন ত্রাণ, কৃষি, সমবায় স্বাস্থ্য ও ভূমি সদ্ব্যবহার দপ্তরের মন্ত্রীরা এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার। বৈঠকে ঠিক হয়, যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সম্ভাব্য খরা পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে। বিভিন্ন জেলায় মোট ৩২৭০টি নতুন নলকূপ বসানো ও কুয়ো খোঁড়া হবে। তাছাড়া ৬৫৪০টি অকেজো নলকূপ ও কুয়ো সংস্কার করা হবে। এর জন্যে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দেড় কোটি টাকা। রাজ্যে মোট ব্লকের সংখ্যা ৩৩৫। দার্জিলিংয়ের আটটি ব্লক বাদ ৩২৭টি ব্লকের মধ্যে ২৫৭টিতে ১০টি করে নতুন নলকূপ বসবে। বাঁকুড়া পুরুলিয়া, বীরভূম মালদহ পশ্চিম দিনাজপুর, মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম এবং বর্ধমানের আসানসোলের ৪০টি ব্লকে ১০টি করে রিগ নলকূপ বসবে। বাকি ৩০টি ব্লকে খোঁড়া হবে দশটি করে কুয়া। দার্জিলিং জেলার তিনটি মহকুমায় (দার্জিলিং সদর, কালিম্পং ও কার্সিয়াং) জরিতে করে জল যোগানোর জন্য মঞ্জুর হয়েছে এক লাখ টাকা। মুখ্যমন্ত্রী নিজে এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা জেলা সফরে বেরিয়েছেন। নলকূপ ও কুয়ো খোঁড়ার কাজ কীভাবে এগোচ্ছে তা তাঁরা দেখবেন।

সুন্দরবন

এই রাজ্যের যে-সব পিছিয়ে পড়া এলাকা আছে তার একটি হলো সুন্দরবন। মূল ভূখণ্ডের অংশ ছাড়া ৫৪টি দ্বীপ নিয়ে সুন্দরবন। ১১ লাখ লোকের বাস। এই সব মানুষের জীবনযাত্রার মান যাতে উন্নত হয়, তাদের রুজি-রোজগারের পথ বাড়ে সেদিকে নজর দেওয়া হচ্ছে কয়েক বছর ধরে। রাজ্য সরকার একটি সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছেন। তা ছাড়া মন্ত্রিসভার এক জন জ্যেষ্ঠ মন্ত্রীর (শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের) ওপর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই এলাকার উন্নয়নের দিকে নজর রাখার জন্যে। কিন্তু এই বিরাট এলাকার উন্নয়নে এখন প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে টাকার অভাব। ১৯৭৫-৭৬ সালে রাজ্যের বার্ষিক যোজনা অনুযায়ী সুন্দরবনের ভাগে যে টাকা পড়েছে তা তো খরচ করা হয়েছেই। তা ছাড়া রাজ্য সরকার খরচ করেছেন আরো ৬০ কোটি টাকা। কিন্তু সুন্দরবনের প্রয়োজনের কথা মনে রাখলে এই বরাদ্দও যথেষ্ট নয়। দার্জিলিং জেলার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার পড়ে তিন কোটি টাকা বিশেষ সাহায্য হিসেবে মঞ্জুর করেছেন। অথচ তুলনা করলে দেখা যাবে, দার্জিলিং জেলার তুলনায় সুন্দরবন এলাকার লোকসংখ্যা তিনগুণ। সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। সুন্দরবন এলাকার প্রধান কয়েকটি সমস্যার মধ্যে রয়েছে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি। এই এলাকার উন্নয়নের জন্যে জেটি তৈরি অবশ্যই দরকার। ১৯৭৫-৭৬ সালে উন্নয়ন পর্ষদ মোট ১৬টি জেটি তৈরি করেছে। রেল লাইনের সম্প্রসারণ খুব দরকার। রেলওয়ের তরফ থেকে ঐ এলাকায় সমীক্ষা করা হয়েছে। সুন্দরবনে আর একটা বড় দরকার বাড়তি জল বার করে দেওয়া এর জন্যে চাই স্লুইস গেট। গত আর্থিক বছরে ছটি স্লুইস গেট তৈরির জন্যে সোয়া লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আরো সাড়ে চার লাখ টাকার মতো দরকার।

পরিবেশ

রাজ্যের শিল্পাঞ্চলের পরিবেশের বিকার নিয়ে সরকারি-বেসরকারি মহলে চিন্তাভাবনা সুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন ধরেই। এপ্রিলের ১৯ তারিখে রাজ্য যোজনা পর্ষদের এক বৈঠকে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হলো। জনস্বাস্থ্য দপ্তর, সি এম ডি এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্মোক নুইসেন্স অথরিটি জাতীয় পরিবেশ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন এই বৈঠকে। কী করে পরিবেশকে বিষমুক্ত করা যায় তাই নিয়েই আলোচনা। উন্নয়ন ও অর্থমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানান যে, পরিবেশের বিকার রোধ করার জন্যে রাজ্য সরকার একটি সুসংহত কর্মসূচী হাতে নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে স্মোক নুইসেন্স আইন (১৯৬৫) সংশোধন করা হবে। পরিবেশ বিকার নিয়ে খোঁজখবর করার জন্যে কিছু দিন আগে যে বিশেষ সমীক্ষক গোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল তার প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়া গেছে। জল ও বাতাসের বিকার সমস্যা সম্পর্কে একটি কমিটিও তৈরি হচ্ছে। কলকারখানা, মোটর গাড়ি আর উনুনের ধোঁয়ার সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা হয়। ধোঁয়াহীন কয়লার চলন বাড়াবার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। শুধু কলকাতার জন্যেই হাজার টন ধোঁয়াহীন কয়লা দরকার হবে। এই ধোঁয়াহীন কয়লা তৈরির আগে যে সব শিক্ষিত যুবক এগিয়ে আসবে তাদের ব্যবসা সুরু করার জন্যে রাজ্য সরকার আর্থিক সাহায্য দেবেন। দামোদর, গঙ্গা প্রভৃতি নদীর জল পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কলকারখানার ও অন্যান্য আবর্জনা নদীর জলে এসে পড়া নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হাওড়া ও কলকাতার বাতাসও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে বোম্বাইয়ের চেয়ে কলকাতার বাতাসে ধুলো বেশি।

দেবদত্ত

২১।৪।৭৬

বিদেশের কথা

মাও-এর উত্তরাধিকারী ?

চীনে যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তেং সিয়াও-পিং ক্ষমতাচ্যুত হলেন এবং অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী হুয়া কুও-ফেং স্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলেন তাতে আজকের চীন সম্পর্কে অনেকেরই হিসাবের গরমিল হয়ে গেল।

পিকিং-এর তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে চীনের মৃত প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাইয়ের উদ্দেশে নিবেদিত বাসি ফুলের মালা সরান নিয়ে যে কাণ্ডটা হয়ে গেল সেটা শুধু চীনে কেন, যে কোন কম্যুনিষ্ট দেশেই অভূতপূর্ব ঘটনা। কয়েক হাজার বিক্ষুব্ধ মানুষ সেদিন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর লোকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়েছে সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডিক্যাল ছাত্রদের উপর চড়াও হয়ে "খুন করে ফেল" বলে জিগির তুলেছে, সেনা-বাহিনীর একটি জিপে আগুন লাগিয়েছে, আরও কয়েকটি গাড়ি উল্টে দিয়েছে, সৈন্যদের একটি ব্যারাক বাড়ি তছনছ করে দিয়েছে, দমকল আগুন নিভাতে এলে বাধা দিয়েছে। পিকিং-এর মতো শহরে, বিদেশী পর্যবেক্ষকদের চোখের সামনে এমন একটা বিক্ষোভ প্রদর্শন ও উচ্ছৃঙ্খলতার ঘটনা চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দিনেও আর ঘটে নি।

এই ঘটনা সম্পর্কে যে সরকারি ভাষ্য দেওয়া হয়েছে ও সিনহুয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশ করেছে তাতে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনার জন্য "প্রতিবিপ্লবী", "মাও বিরোধী" ও 'তেং-এর সমর্থক'-দের দায়ী করা হয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি এটা তেং-এর সমর্থকদের কাজ ছিল? তেং-এর অনুগামীরা কি সুপরিকল্পিতভাবে এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেছিলেন? অথবা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভ দেখান হয়েছিল? এভাবে বিক্ষোভ দেখিয়ে তেং ও তাঁর সমর্থকরা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন?

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পশ্চিমী চীন-বিশেষজ্ঞদের নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করছেন। মোটামুটি তিন রকম থিয়োরি দাঁড় করান হয়েছে। এগুলি হল:—

(১) তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনাটা আসলে তেং-এর অনুগামী নরম-পন্থীদের ধরার জন্য র‍্যাডিক্যালদের তৈরি একটি ফাঁদ। তেং সিয়াও-পিং-এর উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য বেশ তৈরি হয়েই ফুলের মালাগুলি সরিয়ে নিয়ে প্ররোচনার সৃষ্টি করা হয়েছিল। তেং-এর সমর্থকরা ঐ ফাঁদে পা দিয়েছিলেন।

(২) প্রয়াতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের চিরাচরিত চীনা পরব চিং মিং উপলক্ষে চু এন-লাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের অছিলায় তেং-এর অনুগামী নরমপন্থীরা আসলে তেং-এর পিছনে জনসমর্থনের একটা প্রকাশ দেখাতে চেয়েছিলেন। "ধনতন্ত্রপন্থী" তেং সিয়াও-পিং-এর বিরুদ্ধে কিছুকাল যাবৎ যে তীব্র প্রচার চলছিল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তেং-কে ক্ষমতায় আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখাই ছিল এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের আসল উদ্দেশ্য।

(৩) তৃতীয় আর একটি অনুমান এই যে, তেং-এর পতন অনিবার্য জেনেই নরম-পন্থীরা এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বয়ং মাও সে-তুং যেখানে তেং-এর বিরুদ্ধে নেমে পড়েছেন সেখানে তাঁকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত রাখা অবশ্য সম্ভব নয়, এটা নরমপন্থীরা ভালই বুঝেছিলেন। তবু তাঁরা রাস্তায় বেরিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, নিজেদের ক্ষমতা দেখাতে পারলে মাওপন্থী র‍্যাডি-কালরা তাঁদের সমস্ত ক্ষমতার পদ থেকে এক সঙ্গে হটিয়ে দিতে পারবেন না, অন্তত কিছু পদ তাঁরা নিজেদের দখলে রাখতে পারবেন।

তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনার মধ্য দিয়ে যদি মাও-এর বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের প্রচেষ্টা প্রকাশ পেয়ে থাকে তাহলে সেই বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পিকিং-এর ঘটনার ঢেউ চীনের অন্য কোথাও পৌঁছেছিল এমন প্রমাণ নেই। পিকিং রেডিও মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করে জানিয়েছে, চেংচাউতে দাঙ্গাকারীদের হাতে একজন খুন হয়েছে।

অন্যদিকে তিয়েন আন মেন স্কোয়ারের ঘটনার মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটি জরুরি বৈঠকে মিলিত হয়ে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির পোলিটব্যুরো "চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর ইচ্ছা অনুসারে" তেং সিয়াও-পিংকে সরকার পার্টি ও সেনাবাহিনীর সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিল এবং অপেক্ষাকৃত অপরিচিত, পিছনের সারির মানুষ ৫৬ বৎসর বয়স্ক হুয়া কুও-ফেংকে শুধু প্রধানমন্ত্রীর আসনেই বসাল না, চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ দিয়ে তাঁকে মাও-এর পরেই দ্বিতীয় স্থানে বসাল তাতে চীনের ঘরোয়া রাজনীতিতে অশীতিপর মাও সে-তুং-এর অবিসম্বাদিত নেতৃত্বের প্রমাণ আরও একবার পাওয়া গেল।

হুয়া কুও-ফেং চু এন-লাই-যের মন্ত্রি-সভায় জননিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। চু এন-লাইয়ের মৃত্যুর পর যখন তাঁকে অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়া হয় তখন থেকেই কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, তিনিই হবেন চীনের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কিন্তু প্রধানমন্ত্রী করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যে পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করে কার্যত মাও-এর নির্বাচিত উত্তরাধিকারীর আসনে বসান হল, এতে চীনতত্ত্ববিদদের অনেকে পরম বিস্মিত হয়েছেন। হুয়া কুও-ফেং সম্পর্কে বাইরের দুনিয়ার লোক খুব কম খবরই রাখে। চীনের যেসব প্রবীণ রাজ-নৈতিক ও সামরিক নেতা ত্রিশের দশকের লং মার্চের দিন থেকে মাও সে-তুং-এর পাশে ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম বয়স্ক হুয়া তাঁদের একজন নন। তিনি চীনের কোন্ অংশের মানুষ, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা কি, তিনি বিবাহিত অথবা অবিবাহিত এসব কোন খবরই এতদিন পশ্চিমের চীনা বিশেষজ্ঞদের নখদর্পণে ছিল না। চীনের "দুই লাইনের লড়াইয়ে" হুয়ার স্থান কোথায় সেবিষয়েও সুনির্দিষ্ট কোন খবর চীনা বিশেষজ্ঞদের কাছে নেই।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার কখনও হুয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন বলে মনে করতে পারেন নি।

বাইরে থেকে যা দেখা যাচ্ছে, চীনের উপরতলার দুই নম্বর আসনে হুয়া কুও-ফেংকে বসান হল পলিটব্যুরোর অধিকতর কট্টর র‍্যাডিক্যাল সদস্য ওয়াং হুং-ওয়েনের দাবি উপেক্ষা করে। তেং সিয়াও-পিংকে অপবাদ দিয়ে যখন সরিয়ে দেওয়া হল তখন লিউ শাও-চি বা লিন-পিয়াও-য়ের মতো তাঁকেও "বুর্জোয়াঘাতক" আখ্যা দেওয়া হল না কেন, পার্টির সদস্য হিসেবে জিইয়ে রেখে তাঁকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হল কেন, আরও বেশি র‍্যাডিক্যাল, মাও-এর ঘনিষ্ঠতর কোন নেতাকে দুই নম্বর আসনে না বসিয়ে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ হুয়াকে সেই আসনে বসান হল কেন, তেং-কে বিদায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর নরমপন্থী উপপ্রধানমন্ত্রী শি সিয়েন-নিয়েন'ক আবার অকস্মাৎ জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করতে দেওয়া হল কেন, এসব প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

হুয়া কুও-ফেং চীনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই চীন ও ভারতের মধ্যে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ করা হয়েছে, এ দুটি ঘটনার মধ্যে বিশেষ কোন যোগ হয়তো নেই। পিকিং-এ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পাঠাবার ও চীনের তরফ থেকে সাড়া দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই নেপথ্যে দীর্ঘ আলোচনার ফল। এতে নতুন চীনা প্রধান-মন্ত্রীর আমলে নীতি পরিবর্তনের কোন আভাষ পাওয়া যায় না। অন্তত সোভিয়েট ব্লক সম্পর্কে চীনের নীতি যে বদলাবে না সেটা নতুন প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বক্তৃতাতেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে।

২১-৪-৭৬ পুণ্ডরীক

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

— পনের —

কখন আমি ওর কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছি আর কখন ও আমার মাথা বালিশের উপর রেখে, গায় চাদর ঢাকা দিয়ে নিজের ঘরে শুতে গেছে, আমি কিছুই জানতে পারি নি। অন্য দিন জানলা দিয়ে ঘরে রোদ্দুর এলেই ঘুম ভেঙ্গে যায় কিন্তু আজ প্রথম যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ঘর অন্ধকার দেখে আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম পাতলা হয়ে এলে কাদের যেন কথাবার্তা কানে এলো। প্রথমে ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে সবই শুনতে পেলাম।

হ্যাঁরে, সত্যি বলছিস প্রদীপ চলে যায় নি?

বললাম ত যেতে চেয়েছিল কিন্তু দিদি কিছুতেই মত দিলেন না।

কিন্তু তাই বলে কেউ এত বেলা অবধি ঘুমুতে পারে? ও নিশ্চয়ই চলে গেছে।

তুমি বিশ্বাস কর পিসী, তোমার সোনা বউয়ের ছেলে এখনও ঘুমুচ্ছে।

এত বেলা অবধি ঘুমোবে কেন? ওর কি শরীর খারাপ?

হয়ত কাল রাই-টাই পড়ে অনেক রাত্রে শুয়েছেন।

ও ঘরে যা রোদ্দুর আসে তাতে কেউ এত বেলা পর্যন্ত ঘুমুতে পারে না।

বোধহয় ভোরবেলার দিকে জানলা বন্ধ করে দিয়েছে।

আমি আর দেরী না করে বিছানা ছেড়ে ঘরের বাইরে আসতেই পিসী অবাক হয়ে বললেন, তুই তাহলে আছিস?

কি করব বল? দিদি কিছুতেই.....

আসতে না আসতেই কেউ যেতে দেয়?

তুমি সাত-সকালে কি আমার খবর নিতে এসেছ?

পিসী একবার দেবীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন ক'টা বাজে জানিস?

ক'টা?

দশটা বেজে গেছে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, দশটা বেজে

দেবী কোন মতে হাসি চেপে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এত বেলা হয়ে গেছে অথচ আমাকে একটু ডাকতে পারলে না?

আপনি ঘুমুচ্ছেন আমি ডাকব কেন?

পিসী জিজ্ঞাসা করলেন, তোর শরীর ভাল আছে ত?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

পিসী বললেন, আমি যাচ্ছি। তুই একবার আসিস।

আচ্ছা।

পিসী চলে যেতেই দেবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায়?

আজ অমাবস্যা বলে কালীবাড়ী গিয়েছেন।

চা খাওয়াবে না?

তুমি চোখে-মুখে জল দিয়ে এসো। আমি চা নিয়ে আসছি।

আমি বাথরুম ঘুরে ঘরে আসার পর পরই দেবী দু'কাপ চা নিয়ে এলো। ওর হাত থেকে এক কাপ চা নিতে নিতেই বললাম, তুমি আমাকে বিপদে না ফেলে ছাড়বে না।

ও চা নিয়ে মোড়ায় বসতে বসতে বললো, কেন?

তুমি যা শুরু করেছ তাতে ধরা না পড়ে উপায় নেই।

ধরা ত পড়বেই।

তার মানে?

শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? একদিন না একদিন ধরা ত পড়তেই হবে।

দিদি বা পিসী জানলে কি কেলেঙ্কারী হবে, ভাবতে পারো?

যখন জানবে তখন ভোবে দেখব।

দুজনে চা খাচ্ছি। চা খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে দেবী বললো, আজ রাত্রিরে ত তুমি কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লে কিন্তু যখনই তোমাকে ঠিক করে শুইয়ে দিতে গিয়েছি তখনই ...

দেবী কথাটা শেষ না করে শুধু হাসল।

আমিও হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, তখনই কি হয়েছে?

তুমি এমনভাবে আমাকে আঁকড়ে ধরেছ যে প্রায় সারা রাতই.....

সত্যি?

দেবী সারা মুখে একটু মিষ্টি হাসির আবীর ছড়িয়ে বললো, ছোটবেলায় মাকে হারিয়ে তুমি শুধু ভালবাসা চাও না, আদরের কাঙাল।

দরজার ওপাশ থেকে হঠাৎ বামুন দিদির গলা শোনা গেল, দেবী, দাদাকে জলখাবার খেতে দেবি না?

দেবী বললো, তুমি ঠিক কর। আমি আসছি।

জলখাবার খেতে শুরু করতে না করতেই দিদি এসেই আমার হাতে একটা পোস্টকার্ড দিয়ে বললেন, তোর এই চিঠিটা পিসীর বাড়ীতে এসেছে।

আমার চিঠি? আমি অবাক হয়েই পোস্টকার্ডটা হাতে নিলাম। ঝড়ের বেগে চিঠিটা পড়েই আমি চমকে উঠলাম। মুখ ফসকে বলেই ফেললাম কি সর্বনাশ!

দিদি আর দেবী প্রায় একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে?

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, আমাদের মেসের মালিক কার্তিকবাবু লিখেছেন আমার এক ছাত্রীর বাবা হঠাৎ হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন। জরুরী কারণে ওরা আমাকে পদ্মপাঠ কলকাতা ফিরে যেতে.....

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দেবী জিজ্ঞাসা করল, কোন ছাত্রীর বাবা মারা গিয়েছেন?

কল্পনার বাবা।

শিবনাথবাবু?

হ্যাঁ।

দিদি জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রলোকের কত বয়স হয়েছিল?

বছর পঞ্চাশেক হবে।

মাত্র?

হ্যাঁ, তাছাড়া স্বাস্থ্য খুবই ভাল ছিল।

উনি কি চাকরি করতেন?

না, উকিল ছিলেন।

ক'টি কাচ্চা?

দুটি মেয়ে। একটি বি. এ পরীক্ষা দেবে আর ছোটটি ত ক্লাশ সিকসে পড়ে।

দিদি আপন মনে বললেন, কখন যে কার কি সর্বনাশ হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

এবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি আজই বওনা হবি?

হ্যাঁ দিদি, আমি আজই বওনা হবো। ওরা সত্যি আমাকে খুব স্নেহ করেন। সুতরাং এ সময়ে না যাওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই চলে যা। রাত্রে মোগলসরাই থেকে অনেক গাড়ী পেয়ে যাবি।

দিদি ভিতরের দিকে চলে যেতেই দেবী জিজ্ঞাসা করল মেসের কার্তিকবাবু পিসীর ঠিকানা জানলেন কেমন করে?

মেসের যে কোন বোর্ডার বাইরে গেলেই কার্তিকবাবু ঠিকানা জেনে নেন।

দু এক মিনিট চুপ-চাপ থাকার পর দেবী জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা, তোমাকে ওরা ডাকছেন কেন?

ঠিক বুঝতে পারছি না। নিশ্চয়ই কোন জরুরী কারণ আছে।

তা ত বটেই কিন্তু ওদের ত অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন?

আত্মীয়-স্বজন থাকলেও তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি একবার পিসীর সঙ্গে দেখা করে আসি।

চল, আমিও যাই।

দিদিকে বলে এসো।

আমি চট করে একটা বিনুনি করে নেব। তুমি একটু দাঁড়াও।

বেশ ত দেখাচ্ছে। আর বিনুনি করতে হবে না।

হঠাৎ পিছন ফিরে থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে ও বললো, তুমি যে চোখে আমাকে দেখছ, সে চোখে ত অন্যরা দেখবে না।

আমি বসে পড়লাম। দেবী ভিতরে চলে গেল। বেশীক্ষণ নয়, পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই ও তৈরী হয়ে ফিরে আসতেই নিজের সর্বাঙ্গের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল ঠিক আছে?

আমি একবার ওর দিকে তাকিয়েই দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়ে বললাম, কেন যে আমাকে এভাবে জ্বালিয়ে মারতে চাও, তা বুঝতে পারছি না।

তার মানে?

আর মানে জানতে হবে না। চলো।

ও কথা কেন বললে, তা তোমাকে বলতেই হবে।

ঘড়ি

ও

গ্যারাণ্টিসহ ঘাড় মেরামত

রায় কাজিন এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স

৪ বি, বি ডে বাগ কলি—১

ওমেগা ও টিসট ঘড়ির

অফিসিয়াল এজেন্টস্

আর রূপের প্রশংসা শুনতে হবে না। চলো, তাড়াতাড়ি ঘুরে আসি।

শুধু তুমিই আমার রূপ দেখতে পাও। আর ত কেউ. ...

আবার কে তোমার রূপের প্রশংসা করবে? এ অধিকার ত আর কেউ পেতে পারে না।

আমিও দিতে চাই না।

আমি হেসে ওর একটা হাত ধরে একটু টান দিয়ে বললাম, চল, আর দেরী করো না।

দেবী দরজার বাইরে পা দিয়েই একটু জোরে বললো, দিদি, আমরা বেরুচ্ছি।

দিদি নিজের ঘর থেকেই বললেন, খুব বেশী দেরী করিস না।

দেবী বললো, আচ্ছা।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেবী বললো এবার টিউশানি করা ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরি নাও।

ইচ্ছে করলেই কি চাকরি পাওয়া যায়? টিউশানি জোগাড় করতেই কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে, তা জান না।

ইচ্ছে করলেই চাকরি পাওয়া যায় না, তা জানি কিন্তু এবার থেকে একটু জোর দিয়ে চেষ্টা কর।

কল্পনার বাবাই কাকাবাবুকে বলেছিলেন হয়ত কয়েক মাসের মধ্যে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবেন, কিন্তু এমনই কপাল যে

উনি মারা গিয়েছেন বলে কি আর তোমার চাকরি হবে না?

না, তা নয়।

রাস্তায় নেমে চলেছি। এক মিনিট পর দেবী বললো, তোমার ছাত্রছাত্রীদের ছুটি হলেই চলে এসো।

ওদের ছুটি হলেই কি আমি চলে আসতে পারি?

কেন?

আমি ত স্কুলে মাষ্টারী করি না, বাড়ীতে প্রাইভেট পড়াই।

প্রাইভেট পড়াও বলে কি তাদের কেনা গোলাম হয়ে গিয়েছ?

আমি হাসি। বলি, গোলাম না হলেও আসা যায় না।

তুমি না এলে আমি টেলিগ্রাম করব, বাম সার্প।

আমি হাসতে হাসতে থমকে দাঁড়িয়ে বললাম না, না ওসব পাগলামি করা না। শেষকালে সত্যি সত্যি পালে বাঘ পড়লেও আমি আসতে পারব না।

তুমি না এলেই আমি টেলিগ্রাম করব।

কিন্তু ..

কোন কিন্তু নয়। টেলিগ্রাম পাবার আগে চলে এলেই কোন ঝামেলা থাকবে না।

তুমি ত আচ্ছা মেয়ে!

খুব সাধারণ মেয়ে যে আমি না, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

আমি হাসতে হাসতে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, একটু একটু।

আর একটা কথা বলে দিই।...

কোন কথা?

নিয়মিত চিঠি না পেলে আমি একদিন হঠাৎ কার্তিকবাবুর মেসে গিয়ে হাজির হবো।

এসো, কিন্তু তাহলে প্রবন্ধের চরিত্রহীন কে আবার নতুন করে লিখবে?

ওসব ঠাট্টা বেরিয়ে যাবে।

না, না, দেবী, পাগলামী করো না। সময় সুযোগ পেলেই আমি চলে আসব।

কথা দিচ্ছ?

হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।

পিসীর বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখে অবাক হলাম। খুব জোরে কড়া নড়তেই পিসী নেমে এসে দরজা খুলে দিলেন। কোন প্রশ্ন করার আগেই বললেন, আজ এরা সবাই মধু চক্রবর্তীর দিদিমার নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাহলে ত আজ তোমার বাড়ীতে ডাকাতি করা সম্ভব।

পিসী হাসতে হাসতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন তোর মত একটা ডাকাত সব লুঠ করে নিলে ত শান্তিতে মরতে পারতাম।

দেবী দরজায় খিল দিয়ে বললো পিসী, তুমি আর দিদি এই ছেলেটাকে আর তুলো না। অনেক হয়েছে।

উপরে উঠতে উঠতে পিসী বললেন, কেন তোর কি হিংসে হচ্ছে।

না হওয়াটাই ত আশ্চর্যের ব্যাপার।

পিসী এবার আমার দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর কাছে কার চিঠি এলো?

আমার এক ছাত্রীর বাবা মারা গিয়েছেন বলে আমি আজই কলকাতা যাচ্ছি।

আজই?

হ্যাঁ আজই। তাই ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

হা ভগবান! লোকটা মরার আর সময় পেল না?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পিসী, ভদ্রলোকের মৃত্যুটা বেশী দুঃখের নাকি আমার চলে যাওয়াটা?

পিসী নির্বিবাদে বললেন, আমার কাছে তোর চলে যাওয়াটাই বেশী দুঃখের।

পিসীর ওখানে গল্পগুজব আর টুকটাক খাওয়া-দাওয়া করতে করতে বেশ বেলা হয়ে গেল। তারপর দিনটা যে কোথা দিয়ে কেমন করে কেটে গেল, তা নিজেই টের পেলাম না। বওনা হবার ঠিক আগে পিসী এবাড়ী এলেন। আমি দিদি আর পিসীকে প্রণাম করে বেরুতেই দেবী বললো, দিদি আমি ওকে রিকসায় চড়িয়ে দিয়ে আসছি। গলি দিয়ে যেতে যেতে কেউ কোন কথা বললাম না। তারপর মোড়ের মাথায় এসে রিকসায় উঠতেই দেবী আমাকে প্রণাম করে আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললো পরে খুলে দেখো।

নতুন বই

মা আজও আছেন : পশুপতি ভট্টাচার্য শ্রীঅরবিন্দ পাঠ মন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : চার টাকা।

আন্তর্জাতিক মহাতীর্থ পণ্ডিচেরীর প্রাণকেন্দ্র স্বরূপিণী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ-শিষ্যা শ্রীমা; ভগিনী নিবেদিতার মত ঐ বিদেশিনীও ছিলেন আমাদের পরম পূজ্যা: সেই মহীয়সী সাধিকার জীবন-ভাষ্য ও বাণী প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেছেন ভক্তিমান লেখক। মিতায়তন গ্রন্থটির ভাষা সরস প্রেরণাদায়িণী এবং ভক্ত-অভক্ত নির্বিশেষে সমস্ত গৃহী মানুষেরই এই বই পড়া দরকার। জীবনের মত্ত কোলাহল ও অর্থহীন উত্তেজনার মধ্যে এই বইটি শান্তিবারি সিঞ্চন করবে। বিশেষ করে মাকে ডাকা, প্রার্থনা, নির্ভরতা মায়ের ভালবাসা, আমাদের ভালবাসা, রোগ পীড়া ও দুর্ঘটনা, দেহ চেতনার কবল ইত্যাদি অধ্যায়সমূহে লেখক সংক্ষিপ্ত পরিসরে শ্রীমায়ের উপদেশ ও আদর্শ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করছেন। শ্রীমায়ের জীবনাদর্শ ও দর্শন আরও নিবিড় ভাবে জানতে হলেও এই বইটি অবশ্যই পড়তে হবে। শ্রীমায়ের চিত্রটিও সুমুদ্রিত। ছাপা-বাঁধাই পরিচ্ছন্ন।

কথা সরিৎ সাগর—সোমদেব ভট্ট। অনুবাদ : হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস। অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স। ৫এ ভবানী দত্ত লেন কলকাতা-৯। দাম সাড়ে আট টাকা।

একাদশ শতকে সোমদেব ভট্ট রচিত কথাসরিৎ সাগর একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ। কেবল ভারতে নয়, বহু বিদেশী ভাষায় এর অনুবাদ ও সমাদর হয়েছে। এযাবৎ এর কোন মূলানুগ বাংলা অনুবাদ বেরোয় নি। সম্প্রতি হীরেন্দ্রলাল বিশ্বাস এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে এগিয়ে এসেছেন। প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে তিনটি লম্বকের কুড়িটি তরঙ্গে বহু কাহিনী আছে। এই সব কাহিনীর আকর্ষণ এখনও রয়েছে। অনুবাদের ভাষা আরও আধুনিক হওয়ার দরকার ছিল।

রায়বাড়ী—গিরিবালা দেবী। গ্রন্থ বিকাশ, ২২।১ বিধান সরণী কলকাতা-৬। ছোদ্দ টাকা।

এটি একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস সত্তর-আশী বছর আগের পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশ) এক বনেদী জমিদার পরিবারের বালিকা বধূর বেড়ে ওঠার ও স্বামী সংসারের কাছ থেকে পূর্ণ স্বীকৃতি গুরুত্ব পাওয়ার কাহিনী। এর মধ্যেই সেকালের বিবাহিতা নারীদের অবস্থা মূলে পল্লীর বিভিন্ন ছবি আচার অনুষ্ঠান জীবনযাত্রা আরও অনেক কিছুই এসেছে। [illegible] সেকালের গ্রাম বাংলার এক সামাজিক ইতিহাসও হয়ে উঠেছে।

আরব্য রজনী (একাদশ খণ্ড) : তারাপদ রাহা। রূপা। ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম আট টাকা।

আরব্য রজনীর কাহিনীগুলি দীর্ঘ দিন ধরে অনুবাদ করছেন তারাপদ রাহা। এই অসামান্য গল্প জগতের স্বাদ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা বার বার পড়ে থাকেন। বর্তমান গ্রন্থখানিও আগেকার খণ্ডগুলির মতই সমাদৃত হবে।

একনাথী ভাগবত। প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির শ্রীভূমি, কলকাতা-৪৮। ছয় টাকা।

কৃষ্ণভক্তদের জন্য প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী রচিত একনাথী ভাগবত-এর দ্বিতীয় খণ্ড সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে দ্বারকায় কৃষ্ণদর্শন থেকে শুরু করে কৃষ্ণের জীবনের পরবর্তী স্তবগুলি সংস্কৃত উদ্ধৃতি ও তার সহ টীকা-ভাষ্যে বোঝান হয়েছে। বৈষ্ণব ভক্তরা এবং অনুরাগী পাঠক এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন।

সাহিত্যের খবর

এবছরের সাহিত্য পুরস্কার

অন্যান্য বছরের মত এবারও অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর এবং অমৃত পত্রিকার পক্ষ থেকে সাহিত্যিকদের বিভিন্ন পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হচ্ছে। পুরস্কার প্রাপকদের নাম ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। অমৃতবাজার পত্রিকা যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকার পক্ষ থেকে দেওয়া শিশির কুমার এবং মতিলাল পুরস্কার পাচ্ছেন যথাক্রমে অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কথাশিল্পী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরস্কার দুটির সম্মানমূল্য এক হাজার টাকা।

শিশু-সাহিত্যের জন্য মৌচাক পত্রিকার দেওয়া সুধীরচন্দ্র পুরস্কার পাবেন ইন্দিরা দেবী।

স্বর্গত কবি দুর্গাদাস সরকার পাবেন প্রসাদ পুরস্কার। গিরিশ পুরস্কার এবং প্রাণতোষ ঘটক স্মৃতি পুরস্কারের জন্য যথাক্রমে ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুধা বসুর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

শৈব্যা পুস্তকালয়ের রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কার এ-বছর শিবশঙ্কর মিত্রকে দেওয়া হবে। এই পুরস্কারগুলির প্রত্যেকটির সম্মানমূল্য পাঁচশো টাকা।

দিনাজপুর জেলায় কবি সম্মেলন

সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুর জেলা কৃষি-শিল্প ও সংস্কৃতি মেলা আয়োজিত জেলা-কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর বসেছিল রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায়। সেই আসরে জেলার কবিদের উৎসাহ দেবার জন্য আমন্ত্রিত কবি তারাপদ রায়, কবিতা সিংহ কবিতা পাঠ করেন। মণীন্দ্র রায় লিটল ম্যাগাজিন বিষয়ে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন। জনার্দন বর্মণ জেলার ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। রায়গঞ্জের হরিশ দেবনাথ ব্রততী ঘোষবায়, নবীদ রায় স্বপনরঞ্জন মজুমদার, শ্যামল চক্রবর্তী তুহিনশংকর চন্দ রাজকুমার বণিক, কালিয়াগঞ্জের ধনঞ্জয় রায়, শরদিন্দু দাশগুপ্ত উৎপল রায়, সুধেন্দু রায় করণাদিঘির কিরণগোপাল দেসরকার এবং বালুরঘাটের একমাত্র উপস্থিত কবি দিলীপ কুন্ডু স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। জেলার কবিদের সঙ্গে আমন্ত্রিত কবিদের পরিচয় করিয়ে দেন শিশির মজুমদার। মেলা সমিতির পক্ষ থেকে উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানান মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক।

P 35752 চার্বাক

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীআমিয়নিমাই চরিত (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড) প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

LORDGOURANGA (vol. 2) Per Vol. Rs. 6.00

কালাচাঁদ গীতা প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH Per Copy Rs. 6.50

নরোত্তম চরিত প্রতি কপি—২-০০

প্রাপ্তিস্থান : পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ) ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

কনক বিশ্বাস

"রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর তপস্যার ধন। এ সুর হারিয়ে যেতে পারে না।"

সুরের আগুন শেষ করছি কনক বিশ্বাসকে দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম যুগে যখন এ গানের ব্যাপক প্রচার হয়নি সেই যুগেও (তখন তিনি কনক দাস) এই গানই তাঁর মর্মে দোল দিয়েছিলো। সে যুগে তিনিই একমাত্র শিল্পী, যিনি আটষট্টিটি গান রেকর্ড করেছেন—প্রেম পূজা প্রকৃতি তথা সকল রকমের রবীন্দ্রনাথের গান (তখনও রবীন্দ্রসংগীত পরিভাষার সৃষ্টি হয়নি)।

রবীন্দ্রসংগীতের, উষা-লগ্নে সূর্যোদয়ের আভাস মাখানো বক্তরাগ সেদিনের কিশোরীর চিত্তে জাগালো অনুরাগ। আজ পূর্ণ-সূর্যের দীপ্তিতে ধরণী উদ্ভাসিত তরুণ মনের সেই রঙিন আবেগ কিন্তু আজও প্রচন্ড শক্তির প্রখরতা জাগেনি। পূর্বরাগের আবেশে সে মন তেমনই রাঙা। কনক বিশ্বাসের সংগে স্বল্প কয়েক মুহূর্তের সাক্ষাৎকারে এই কথাটিই যেন মধুর সুরে হৃদয়ে বেজেছিলো।।

তখনকার যুগে পিপলস সং বলতে ছিলো মঞ্চের গান এবং ছবিরও। সংগীত তখনও উচ্চাংগের আর্টরূপে স্বীকৃতি পায়নি। সু-কণ্ঠের অধিকারী হয়ে যাঁরা গানকে জীবিকারূপে গ্রহণ করতেন তাঁরা মঞ্চ বা চলচ্চিত্রে চলে যেতেন। এবং গানকে মর্যাদা দেবার মত মানসিকতা তখনও সমাজের বড়ো অংশেই তৈরী হয়নি।

অভিজাত-ধনী সমাজে ছিলো উচ্চাংগ সংগীতের অনুষ্ঠান। এবং সেটাও ছিলো সম্পূর্ণ বাইরের মহলের ব্যাপার।

গানকে ভালবেসেই গান শেখা ও চর্চার রেওয়াজ সমাজের যে কটি অতিবিদগ্ধ পরিবারে সীমিত ছিলো কনক দাস সেই স্বল্প কয়েকজনেরই অন্যতমা। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছোটো মাসীমা ও মেসোমশায় সুবালা আচার্য ও প্রণকৃষ্ণ আচার্যের উৎসাহেই বাড়ীতে ছিলো কবির গানের অবাধ প্রবাহ। জ্ঞান হবার সংগে সংগেই চেতনা ছুঁয়েছিল সেই প্রবাহ।

তখন গান গাইতাম শুনে শুনে শিখে। এ গান সম্বন্ধে সিরিয়াস হলাম রবীন্দ্রনাথকে দেখার পর। ঝুনুদি (সাহানা দেবী) আমায় প্রথম জোড়াসাঁকোয় নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই প্রথম তাঁকে দেখি। গানও শোনালাম, ভয়ে ভয়ে। অনেক তাগাদার পর লাজুক শিল্পী এই কটি কথাই বললেন।

"শুনে কি বললেন?"

অতশত জানি না' কুঞ্চিত ভ্রু, কিন্তু মুখে হাসি, পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমার প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে। মনটা অনেক বছর আগে পিছিয়ে গেলো বলেই কি মুখে ফুটে উঠলো অমন সলাজ হাসির মধুরাভাস? তারপর থেকেই জোড়াসাঁকোর সকল উৎসবে ডাক পড়তো। জোড়াসাঁকোতেই প্রথম বর্ষামংগল উৎসবে গেয়েছিলাম অশ্রুভরা বেদনা।

একবার বেলজিয়ামের মহারাণী এসেছিলেন। তাঁরই সম্মানার্থে ঠাকুরবাড়ীর মেয়েরা নটির পূজা অভিনয় করেছিলেন। সেখানে প্রথমদিন আমি অন্যদিন তখনকার বিজয়া দাস (শ্রীমতী সত্যজিৎ রায়) গেয়েছিলাম 'বন্ধু রহো রহো সাথ'।

ঝুনুদি এবং বুলাদা (প্রফুল্ল মহলানবীশ) এঁদের সংগে প্রায়ই জোড়াসাঁকো যেতাম। গ্রামোফোন কোম্পানীর সংগেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন বুলাদাই। বুলাদার সংগে মেজদির (সতী দেবীর মা) ননদের বিবাহ হয়েছিলো এবং সেই সূত্রেই আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠতা।

যতদূর মনে পড়ছে বুলাদার উদ্যোগেই গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ভগবতী-চরণ ভট্টাচার্য আমায় রেকর্ড করতে নিয়ে যান। তখন বেলঘরিয়ায় রেকর্ড হোতো। মাইক্রোফোন ছিলো না। ফানেল কাজ হোতো। আমার প্রথম রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার। তারপর একেবারে আটটা করে রেকর্ড হোতো।

'সবই রবীন্দ্রসংগীত?'

'প্রায় সবই। অন্য গানও গাইতাম। রেকর্ডও করেছি দু-একটা। তবে সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম।

যথা?

ঝুনুদিই দিলীপদার (দিলীপকুমার রায়) সংগে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। লক্ষ্ণৌতে থাকতে তাঁর কাছে কিছু গান শিখেছিলাম। সুরসাগর হিমাংশু দত্তেরও অনেক গান গাইতাম। চারখানা গান রেকর্ডও করেছিলাম। তবু স্মরণখানি জানি না সে অজানাবে বাকী দুটো গান মনে পড়ছে না। এইটুকু শুধু মনে আছে এই গানগুলির সংগে সুজিতনাথ কি সুন্দর গীটার বাজিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রসংগীত দিয়েই গান গাওয়া সুরু হয়েছিলো। সারাজীবন ধরে গেয়েছি তাঁরই গান। মাঝে অন্য যা গান গেয়েছি সে শুধু স্বাদবৈচিত্র্যের তাগিদেই।

ক্লাসিক্যাল গানের তালিম পেয়েছিলাম গিরিজাবাবু, সত্যকিংকরবাবু ও যামিনী-বাবুর কাছে।

'আপনি এত রবীন্দ্রসংগীত কোথা থেকে শিখলেন?'

প্রথমতঃ ব্রাহ্ম সমাজের অনুষ্ঠান শুনে এবং গেয়ে। তারপর রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসবার পর থেকে জোড়াসাঁকোর উৎসব-গুলোয় গাইতে গাইতে অনেক গান শেখা হোতো। উৎসবের আগে অনেকদিন ধরে বিহার্শ্যাল চলত দিনুদার পরিচালনায়। শিক্ষা ও রেওয়াজের প্রশস্ত অবকাশ ছিলো সেইখানেই। দিনুদা যেমন উদার প্রকৃতির মানুষ ওঁর শিক্ষাদান এবং সংগীত চিন্তাও

ছিলো তেমনই উদার। উনি গানের সুরটা তুলিয়ে দিতেন এবং সেই স্ট্রাকচারটা বজায় রেখে নিজের ভাবের ইংগিতে গাইবার স্বাধীনতা দিতেন। যে গাইবে তার গাইবার বৈশিষ্ট্যও যেন গানে খুঁজে পাওয়া যায়। এইটেই ছিলো তাঁর মত।

জীবনে পরম লগন শিখেছিলাম তাঁরই কাছে। শৈলজাদার ট্রেনিং-এ রেকর্ড করেছিলাম ডেকোনা আমারে জানি তুমি ফিরে আসিবে আবার।' এ গান এপ্রুভড্ হবার জন্য কবির কাছে স্যাম্পেল কপি গিয়েছিলো। উনি শুনে বলাদাকে বলেছিলেন বলে দিস পাসড উইথ অনারস।'

আস্তে আস্তে অনেক রেকর্ডই হোলো। জর্জের সঙ্গে ডুয়েট গানও কয়েকটি রেকর্ড হয়েছিলো। কটা? ঠিক মনে নেই। যতদূর মনে পড়ছে হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী ঐ ঝঞ্ঝার ঝংকারে ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা এবং সংকোচের বিহ্বলতা। শান্তিনিকেতনে একবার গিয়ে একমাস ছিলাম। আমার নিজের কিন্তু গান গাইবার চেয়ে শুনতেই বেশী ভালো লাগতো। গুরুদেবের আগ্রহেই আমার অনেক গান গাইতে হয়েছিলো এবং এই সময় আমার গানের ঝুলি ভাবী হয়ে উঠেছিলো তাঁরই দাক্ষিণ্যে। দিনুদার কাছে রোজ গান শিখতাম। কবি শান্তিনিকেতনের ওস্তাদদেরও বলে রেখেছিলেন আমি যতদিন থাকব গান শেখাতে। এছাড়াও তাঁর মনে গান গুনগুনিয়ে উঠলেই আমার ডাক পড়তো। এই সময়েই উনি শিখিয়েছিলেন সখি আঁধারে একেলা ঘরে। আর একদিনের কথা মনে পড়ে। বৃষ্টি নেমেছে। হঠাৎ একজন ছাতা মাথায় দিয়ে নিয়ে এলো কবির একটি চিরকুট কল্যাণীয়াসু শীগ্গির চলে এস। একটা নতুন গান লিখেছি। দেখো বৃষ্টিতে ভিজে যেন গলা খারাপ কোরো না। সেইদিনই শিখিয়েছিলেন ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে।

উনি যে এতবড় মানুষ। কাছে গেলে কিন্তু সে কথা একেবারেই বোঝা যেতোনা। ওঁর মত অত বড় না হলে বোধহয় অমন সহজ হওয়া যায় না। একবার অটোগ্রাফ নিতে গেছি ভয়ে ভয়ে। উনি বললেন রেখে যাও। পরের দিন যেতেই হাতে দিলেন খাতাটি। দেখলাম ওঁর ছবির মত লেখায় একটি ছোট্ট কবিতা—

"কি সুর তুমি জাগালে উষা
কনকবীণা তারে।
নবজীবন লহরি ওঠে
সুপ্তি পারাবারে।"

আর কি? বলবার মত আর কোনো ঘটনা অভিজ্ঞতা কিছুই আমার নেই।'

"কনকদি সেই কথাটা? বলুন না? গীতা সেনের কণ্ঠে মিনতি ঝরে।

"কোন্‌টা?"

সেই কৃষ্ণকলি গান লিখেছিলেন আপনাকে.....

"না, না, ওসব বাজে কথা উনি শশব্যস্ত দু হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করেন।'

কি ব্যাপার শুনিনা—

'জানো সন্ধ্যা, কনকদির চোখ দুটো খুব সুন্দর ছিলো তো? সেই দেখেই রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি—

'না, না, মোটেই নয়। গীতা ওসব বাজে কথা বোলো না' গীতাদিকে কনকদি প্রায় মারতে যান আর কি।

শুনেছি এই সংকোচ ও লজ্জার জন্যই কনক বিশ্বাসকে দিয়ে সহজে গাওয়ানো বা রেকর্ড করানো যেত না। জোড়াসাঁকোর উৎসবে গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কথাকে ভগবানের আদেশ বলে মনে করতেন তাই। এখনকার গানের প্রসঙ্গে বললেন—যাঁরা গাইছেন তাদের তাল, মান, লয় আগের চেয়ে অনেক উন্নত সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবের সেই ছোঁওয়া কই? তার কারণ হয়ত স্বরলিপি-নির্ভরতা। ভারতীয় অন্য সকল গানের ধারার মত রবীন্দ্রসঙ্গীতও গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর কাছ থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের আবেগ মিশিয়ে গাইলে তার যে রূপ ফোটে, স্বরলিপি দেখে সুর তুলে তালের সঙ্গে সেট করে নিয়ে নিভৃতভাবে গাইলে সে রূপ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ প্রথমটিতে থাকে একটা ভাবকে নিজের অনুভবলোকে সত্য করে তোলার আকুলতা, অন্যটিতে সতর্ক মনের সচেতন পাহারাদারী—এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে দেখে পা টিপে টিপে চলা। যেন ভুল না হয়। অন্তরমুখী চেতন ও বহির্মুখী যতন—এ দুয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাকবেই।

তাছাড়া আমরা গান গাইতাম গাইবার আনন্দেই। এর মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিলো না। এখনকার শিক্ষার্থীরা দু-চারখানা গান শিখতে না শিখতেই কি করে ফাংশনে গাইবেন অথবা রেকর্ড করবেন সেই চিন্তাতেই ব্যস্ত।

আমরা যখন রেকর্ড করতাম তখন মিউজিক বোর্ড, অথবা সঙ্গীতগুরুদের অনুমোদন এ সবের কোনো বালাই ছিলো না। তার ফলে অনেক বেসুরো বেতালা গানও রেকর্ড হয়ে বেরোতো। মনে আছে আমার 'ওগো কাঙ্গাল আমারে কাঙ্গাল করেছ' গানটা রেকর্ডে শুনে গুরুদেবের ক্ষুণ্ণ 'তবস্কার এ গান শুনে অনুতাপ কর। কার কাছে এভাবে শিখলে কে জানে? এসব গানের সুর আমি ভুলি না।'

রেকর্ডের দু-চারখানা গান উনি অনুমোদন করেছিলেন। বাদ বাকী গান তখনকার নিয়মেই বেরিয়েছে। বহুযুগের ওপার হতে গানটি ওঁর এপ্রুভড। আমাদের সময়ের গান তালে বড় একটা গাওয়া হোতো না। অধিকাংশ রেকর্ডের গানই তালবিহীনভাবে গাওয়া হয়েছে। পরে অবশ্য কিছু গানের রেকর্ড তালেই বেজেছে। সবরকম গানই গেয়েছি। কিন্তু পূজা, প্রকৃতি ও বর্ষার গানে মনটা যে-ভাবে সাড়া দিয়ে উঠেছে এমন আর কোনো গানে নয়। সহসা ডালপালা তোর' শেখাবার সময় কবি বারবার বলেছিলেন মনে রেখো সহসা কথাটা তিনবার হবে।

এইসব খুঁটিনাটি কথা মনে রেখে গানের আইডিয়াটাকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা সব সময় থাকতো। টাকার জন্য গান গাওয়াটায় বাড়ীর সকলের খুব আপত্তি ছিলো। গান গাইতাম গানেরই জন্য। রেকর্ড করা সুর করবার পর এক বছর আমি কোনো দক্ষিণা অথবা রয়্যালটি নিইনি। এখন শুনেছি শ্রাদ্ধে গান গেয়েও অনেকে দক্ষিণা নিয়ে থাকেন। আমরা এ বস্তু কল্পনাতেও আনতে পারতাম না।

আর যে কোনো গানকে তার যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠা শুধু আমার নয় সে যুগের সকল গায়ক-গায়িকারই ধ্যান-জ্ঞান জপমন্ত্র ছিলো বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঋনুদির কথাই ধরনা? ওঁর কণ্ঠের রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের উক্তি মনে আছে ত? ঐ একই অনুরাগ নিয়ে উনি গাইতেন অতুলপ্রসাদ, ডি এল রায় ও দিলীপদার গান। যখন যাঁর গানই গাইতেন তাঁর ভাবকল্পনায় মনকে রাঙিয়ে নিতেন। সেইজন্য ভিন্ন সুরকারের গান আপনাপন বৈশিষ্ট্যেই তাঁর কণ্ঠে ধরা দিয়েছে। কোনো ম্যানারিজম অথবা প্রকাশভঙ্গির ইংগায়-

প্রকাশিত হয়েছে

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু

দীর্ঘ পরিশ্রমসাধ্য বৌথ গবেষণায় রচিত এই চরিতাভিধানে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর যাঁদের বাঙলার সংস্কৃতিজগতে কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য অবদান আছে, তাঁদের জীবনচরিত সংগৃহীত হয়েছে। জন্মসূত্রে বাঙালী নন, তাঁদেরও জীবনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বাঙলা ভাষায় চর্চাকারী ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, গবেষক, অনুসন্ধিৎসু পাঠক, সকলের পক্ষে অপরিহার্য জীবনীকোষ। ৬৪৮ পৃষ্ঠা, লাইনো হরফে বরঝরে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। [টাঃ ৪০-০০]

আসন্ন প্রকাশ : (১৫ মে ১৯৭৬)
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড [টাঃ ৪০-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা-৯, (৩৫-৭৬৬৯)

জন্য তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণের পথ আগলে দাঁড়ায়নি। সুরকারের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে না গাইলে গানে প্রাণ সঞ্চার হয় না। তখনকার প্রফেশ্যনাল গাইয়েরাও এই শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁরা কালজয়ী হয়ে আছেন। স্যায়গল অথবা কাননের গানে হয়তো পঙ্কজবাবুর ও রাইবাবুর অবদান অনেক। কিন্তু তাঁদের প্রতিভা ও ভাব-গভীরতা ছিলো জন্মগত সম্পদ। এ বস্তু কেউ কাউকে দিতে পারে না।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে পঙ্কজবাবুর নিজের বিধিদত্ত কণ্ঠ ও আরাধনা ত ছিলোই। সঙ্গে সঙ্গে এ দুটি শিল্পীর ভূমিকাও কম নয়। স্যায়গলের দরাজ কণ্ঠ কাননের একসপ্রেশন তাঁদের অনন্য করে রেখেছে। মানুষের চরিত্রের গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ তার গানের প্রতিফলিত হয়। এটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম কাননের গান শুনে। ওর জীবনীতেও দেখেছি আমি কিছু জানিনা। আমায় শিখতে হবে—এই বোধটা ওর মধ্যে সদাজাগ্রত ছিলো বলেই ওঁর অন্তর এমন গ্রহণশীল হয়ে উঠেছিলো। রাণীদি ভুলাদারা কি সাধে ওকে এত ভালোবাসতেন?

আমায় ঠিক ক'রে গাইতে হবে, শিখতে হবে এই তাগিদের জন্যই ও যা কিছু গেয়েছে সবই ওঁর নিজের গান হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের গান থাকবে নিশ্চয়ই। প্রকৃতির নিয়মেই মাঝে মাঝে ভাটার টান আসবে। কিন্তু তারপরেই আসবে প্রবল জোয়ার। এ-সঙ্গীত তাঁর তপস্যার ধন। এ সুর হারিয়ে যেতে পারে না।

নীহারবিন্দু সেন

রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রীতির বিষয়ে আমার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। রচিত গীত-কবিতার মর্মে পৌঁছতে না পারলে শিল্পী কখনও এই গানের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। সুর ও ছন্দ বাণীর প্রয়োজনেই সংযোজিত।

সযত্ন শিক্ষায় রবীন্দ্র সংগীতের বিস্তারকে যে কজন সংগীত গুরু এবং যে কটি প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় প্রসারী করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে নীহারবিন্দু সেন এবং গীত বিতান শিক্ষা কেন্দ্রের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়।

জীবনের বহুধা বিস্তৃত অভিজ্ঞতা তাঁর সঙ্গীত মানসের পটভূমি রচনা করেছে। আজকে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গান যাঁর চিত্ত ও চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন বাজনীতির বন্ধুর পথের পথিক। যদিও চেতনার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই গান তাঁর সঙ্গী। তাঁরই ভাষায় গুরু-দেবের কথাকে অনুসরণ করেই বলতে ইচ্ছে করে কবে যে গান গাইতে শুরু করেছিলাম সে কথা মনে পড়ে না। ছোট বেলায় মুকুন্দদাসের যাত্রা দেখে এসে তাঁরই মতন মাথায় পাগড়ী বেঁধে দুলে দুলে গাইতাম ভাইরে মানুষ নাহি এ দেশে অথবা দেশের উল্টে গেছে হাওয়া। কখনো বা সাধারণ পোষাকেই গান গাইতাম সারা রাত ঘুমিয়ে কেটে সকাল বেলা উঠি হঠাৎ দেখি আজ আমাদের হয়ে গেছে ছুটি।'

তারপর হঠাৎই একদিন নীহারবাবু কোলকাতায় এসে পড়লেন যাদবপুর কলেজ অফ ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ভর্তি হতে।

সেই সময়ই শুনে শুনে তিনি অনেক গান শিখতেন, গান লিখতেন এবং সুরও দিতেন। ওঁর গান ও সুর-রচনার কথাটা সংবাদটা পরিচিত রসগ্রাহী বন্ধুদের উৎসাহে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এবং হঠাৎই একদিন হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে আমন্ত্রণ এলো তাঁরই কথা ও সুরে দুজন নতুন শিল্পীর রেকর্ড করানোর জন্য।

সেই রেকর্ড যখন বাজারে বেরোলো তখন আমার অনুভূতির রামাশ্যাম আমি ভঘর প্রকাশ করতে পারব না। তারপর এমন একটা অবস্থা দাঁড়ালো যে অজয় ভট্টাচার্য ও শৈলেন রায়ের রচিত গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার গান চলতো। দু বছর পরে যাদবপুর কলেজ ছেড়ে দিলাম। পাইওনিয়ার রেকর্ড কোম্পানীতে ট্রেনার ও কম্পোজার হিসেবে যোগ দিলাম।

এখানে স্ব-রচিত গানের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু রবীন্দ্রসংগীতের রেকর্ডেরও ট্রেনিংও নিতে লাগলাম। গুরুদেব তখনও জীবিত। আমার আনন্দ এই যে আমার ট্রেনিং-এ একটি গানও রেকর্ড হয়নি। শৈল দেবী, মাধুরী চৌধুরী নমিতা সেনগুপ্ত, বেচু দত্ত, সুপ্রীতি ঘোষ, প্রতিমা গুপ্ত—এঁদের সবার রেকর্ডগুলি আমার শিক্ষকতায় হয়েছিলো। পরবর্তীকালে দেবব্রত বিশ্বাস শ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, বিমলভূষণ গীতা সেন, সাবিত্রী নাগ, আরও অনেক শিল্পীর রেকর্ড করিয়েছিলাম।

কোলকাতাতে এসেই নীহারবাবুর স্বর্ণ-কুমারী দেবী, সরলা দেবী চৌধুরাণী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। সরলা দেবীর অনুরোধে তাঁরই সুরারোপিত ত্রিশটি গানের একটি স্বরলিপি বই তিনি সম্পাদনা করে ছিলেন। বইটির নাম গীতিত্রিংশতি। পরে পুলিন সেনের আগ্রহে কবি অতুল-প্রসাদ সেনের গানের স্বরলিপি পুস্তক এখন পর্যন্ত পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত কাকলির সম্পাদনাও করেছেন। কাকলির প্রকাশক সুধীরঞ্জন ব্রাহ্মসমাজ।

গীতবিতানের প্রসঙ্গে নীহারবিন্দুবাবু বলেন, ১৯৪১ সালে গীতবিতান প্রতিষ্ঠার সময়ে আমি ছিলাম সে উৎসবের আমন্ত্রিত দর্শক। গীতবিতান সুরু হতে না হতেই জাপানী বোমার দাপটে বন্ধ হয়ে গেলো। অনাদিকুমার দস্তিদার তখন দেশে পলাতক। ঠিক কিছুকাল আগে থেকেই শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুম-দারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। রবীন্দ্র সংগীতের অঙ্গনে সকলের প্রতিই তাঁর উদার আহ্বান ছিল। তাঁরই আগ্রহে ১৯৪২ সালে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে আমি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। এ বছরই যখন গীতবিতান আবার আশুতোষ কলেজে সুরু হোলো—কনকদি আমি ও স্বর্গত সুজিতরঞ্জন রায় গীতবিতানের শিক্ষকতার কাজ বহাল হলাম। ১৯৪৩ সালে গীতবিতান স্থানান্ত-রিত হোলো ২৫বি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে। এখন গীতবিতান শুধু বাংলা

দেশেরই নয় সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড় সংগীত প্রতিষ্ঠান। জানিনা সারা পৃথিবীতে এরচেয়ে বড় সংগীত প্রতিষ্ঠান আছে কিনা। শুধু মাত্র কোলকাতাতেই গীতবিতানের চারটি কেন্দ্র, ভবানীপুর, উত্তর কলিকাতা ও বালিগঞ্জ। এই চারটি কেন্দ্রে বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা তিন হাজার। তাছাড়াও কোলকাতার বাইরে আরো ছটি অনুমোদিত রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষায়তন আছে।

নীহাররবিন্দুবাবুর কর্মজগৎ আনন্দ-জগৎ সব কিছু গীতবিতানকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। বিশ্বভারতী, রবীন্দ্র-ভারতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, হায়ার সেকেণ্ডারী বোর্ডের পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারেও তিনি সহযোগিতা করেন।

আপনি নিজে গীতিকার এবং সুরকার। তাছাড়া সবরকম গান সমান আগ্রহে ও যত্নে আহরণ করেছেন এবং গেয়েছেনও। তবু রবীন্দ্র সংগীত সমর্পিত প্রাণ হয়ে ওঠবার কারণ কি? নীহারবাবুর মুখে সংগীতজীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কাহিনী শোনবার পর এইটেই ছিলো আমার প্রথম প্রশ্ন।

এর উত্তরে আমার ছাত্রী লতিকা সেনের একটা মন্তব্য উল্লেখ করছি—নীহারবাবু হেসে বললেন সে এখন এ আই আর দিল্লীতে আছে। একবার খুবসম্ভব ১৯৭১ সালে কোলকাতায় এসেছিলো। সেই সময় রেডিও ষ্টেশনে ওর সংগে দেখা হতেই সংগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের (তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি) আমায় দেখিয়ে বললেন এই যে মানুষটাকে দেখছো এর মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ছিলো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ একে গ্রাস করেছেন।

কথাটার মধ্যে ওর একটা স্নেহের অভিযোগ ছিলো। কিন্তু আমার কাছে ও কথাটা একটা মস্তবড় কমপ্লিমেণ্ট বলে মনে হয়েছিলো। কারণ ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্র-সংগীতের ওপর আমি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতাম। যা একটু আধটু শুনতাম তাই সারাদিন গাইতাম। আমার বাবার ধর্মাচরণ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন ছিলো। একটু বড় হয়েই বাবার সংগে ব্রহ্মসমাজে যেতে হোতো। সেখানে তারিণীবাবুর সংগে ব্রহ্মসংগীত গাইতাম। ঢাকাতে ব্রাহ্মসমাজে আমিই ছিলাম একমাত্র গায়ক। তুমি যত ভার আরও গান গাইতাম। দাড়িওয়ালা গম্ভীর প্রকৃতির আচার্যও আমার কাছে এসব গান শিখতেন। গানের কোনো রীতিগত শিক্ষা আমি পাইনি। প্রধানতঃ শুনে শুনেই শেখা—বললাম ত একটু আগেই এই প্রসংগেই আমার বোন অশ্রুর কথা মনে পড়ছে। তার কণ্ঠ ছিলো খুবই মিষ্টি। সেও শুনে শুনেই গান শিখতো। একটু রীতিগত শিক্ষা পেলে ও খুবই ভালো গাইয়ে হয়ে উঠতো বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু গানের শিক্ষক রেখে গান শেখাবার প্রথা তখন আজকের মফস্বল সহরে প্রচলিত ছিলো না। প্রথম জীবনে বেশ কিছুদিন আমি স্বদেশী সভায় গান গেয়েছি। রবীন্দ্রসংগীতের ওপর অকৃপণ আমার অন্য সব গানের আকর্ষণকে ছাপিয়ে উঠেছিলো। একসময় রবীন্দ্রসংগীতের সুর সংগ্রহ করতে পারিনি বলে নিজেই সুর তৈরী করে গাইতাম। এখনও গান দিয়ে যে তোমায় খুঁজি—গানটির সুর নেই। পরবর্তীকালে 'এই ত তোমার প্রেম ইত্যাদি গানের স্বরলিপি যখন বেরোলো অথবা কোনো শিল্পী গাইলেন আমার রচিত সুর শিখে ঐসব গানযারা গাইতেন তাঁরা সকলে ঠাট্টা করতো 'এ কি সব শিখিয়েছেন?.....এইসব ঘটনা থেকেই বুঝতে পার আমার মনটা কি পরিমাণ রবীন্দ্র সম্মুদ্রমুখী হতে আকুল হয়েছিল এবং তার গানের অন্তহীন প্রবাহে মিশে যেতে চাইছিল। কথা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন। সুর ও ছন্দের তুলি দিয়ে রং ফলিয়েছেন। যখন গান গাইনি শুধু কবিতা আবৃত্তি করেই একটা অনির্বচনীয় আনন্দ পেতাম। সেই আনন্দই আমায় রবীন্দ্রসংগীতের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

গীতবিতানে কাজ করবার সুযোগ আমার কাছে যেন বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে এলো।

গীতবিতানের প্রথম যুগ থেকেই যে কোনো সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠানে আমি শৈলজাদা ও অনাদিদার সহযোগী রূপে কাজ করেছি। এখনকার অনুষ্ঠানে সেই আমার পরিকল্পনা এবং তার সার্থকতার মূলে তাঁদের চিন্তার প্রভাব অনেকখানি। এসব অনুষ্ঠানে আমার প্রধান সহায় গীতবিতানেরই অন্যতম শিক্ষক তরুণ মিত্র। আর সবচেয়ে বড় কর্মী শিক্ষক শিক্ষিকার দল—যাঁদের অধিকাংশই আমার ছাত্রছাত্রী।

শিক্ষক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা এই যে শিক্ষক যদি তাঁর ভাবনায় আন্তরিক হন তবে তার সিরীয়াসনেস শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বর্তাবে। যাঁরা আন্তরিক নন তারা আপনা থেকেই সরে যাবে।

গীতবিতানের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আমাদের ভূমিকা যতখানি থাকে ঠিক ততখানিই শিক্ষার্থীদের। আমার পরিচালনায় গীতবিতানের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হোলো গীতিনাট্য মায়ার খেলা বাল্মীকি প্রতিভা কালমৃগয়া (নৃত্যনাট্য) ১৯৫৯ সালে বর্ষামঙ্গল ১৯৬০ সালে শ্রাবণ গাথা ১৯৭৩ সালে রবীন্দ্রসংস্কৃতি পরিক্রমা ও ১৯৭৫-এ রবীন্দ্রসংগীত রচনার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে গীতোৎসব। রবীন্দ্রনাথের গ্রীষ্মপ্রধান ঋতুর গান নিয়ে আমার নিজস্ব রচনা ও প্রযোজনা হোলো তপোবাহি। গীতবিতানের সুদীর্ঘ ৩৫ বছরের মধ্যে আমরা কখনও চণ্ডালিকা চিত্রাংগদা বা শ্যামা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করিনি।

গত বছরের উৎসব আমায় খুব আত্মবাদী করে তুলেছে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতিষ্ঠা ও জয়যাত্রা সম্বন্ধে। দেখলাম রবীন্দ্রনাথের নামের অনুষ্ঠান সকল শিল্পীই অকুণ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং সকলের এই মিলিত উৎসবে আমি অনুভব করেছি গুরুদেবের প্রসন্ন মুখের দীপ্তি। আর এই মিলনেই আমি রবীন্দ্রসংস্কৃতির বিশ্ববিজয়ী প্রতিষ্ঠার আশ্বাস পেয়েছি।

রবীন্দ্রসংগীতের প্রসংগে আর একটি নীরব রবীন্দ্রপ্রেমিকের কথা আজ মনে পড়ছে। তিনি হলেন সুকমলকান্তি ঘোষ। বহুদিন আগে ওয়াই ডবলিউ সি এ তে রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমপর্যায় নামে একটি অনুষ্ঠান করার সময় সুকমলদার সংগে পরিচয় হয়েছিলো। সেদিন থেকে সুরু করে আজ অবধি সকল কাজেই তাঁর অকৃপণ সহযোগিতা পেয়ে আসছি।

একজন বড় শিল্পী যদি সত্যিকারের বড় হন তিনিই অনেক প্রতিভাকে এগিয়ে আসার পথ করে দেন। এই প্রসংগেই মনে পড়ে মায়ার খেলার একটি ঘটনা। প্রথম তিনটে শো-তে রাজেশ্বরী গেয়েছিলো প্রমদার গান। মাঝখানে আর কেন আর কেন কেন এলিয়ে-র পর এক সখির গানের জন্য আমি একজনের নাম প্রোপোজ করেছিলাম। রাজেশ্বরী বলল যদি অন্য কাউকে দিতেই হয় গীতাকে দিন। ইস সিংগস উইথ ফিলিংস এণ্ড মেলোডি—

সেই থেকে মায়ার খেলায় গীতার গান বাঁধা হয়ে গেলো। পরে বড় রোলেও গীতা গেয়েছে এবং সে গান প্রশংসিতও হয়েছিলো। তবে গীতাকে এ স্বীকৃতি প্রথম দিয়েছিলো রাজেশ্বরী ইদানীংকালে দিয়েছেন সুকমলদা। সেদিন শ্মশানে ওঁকে অগ্নিশয্যায় তোলার সময় ওরা যখন (গীতা অশোক বাণী মায়া) তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে গানটি গাইছিলো সেই কথাটিই বারবার মনে পড়ছিলো।

আপনার কাছে এবার আমি শুনতে চাই রবীন্দ্র গায়কী সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য।

গীতরীতি বা ঘরাণাকে আমরা একাকার করে ফেলি। কিন্তু একটার সংগে অন্যের তফাৎ আছে। গায়কী কথাটা ব্যক্তিগত কিন্তু ঘরাণা হচ্ছে একটা বিশেষ পদ্ধতিনির্ভর। ফৈয়াজ খাঁর গায়কী হতে পারে কিন্তু ঘরাণা? সেটা সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রসংগীতের রূপ ও রীতির বিষয়ে আমার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। রচিত গীতিকবিতার মর্মে পৌঁছতে না পারলে শিল্পী কখনও এই গানের প্রকৃত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারবেন না। সুর ও ছন্দ বাণীর প্রয়োজনেই সংযোজিত। এই জন্যই আমি গুরুদেবের শেষ জীবনের গানগুলিকে উচ্চাংগ রবীন্দ্র-সংগীত বলি।

সুরের আগুন গত এপ্রিলে জর্জ বিশ্বাসকে দিয়ে সুরু হয়েছিলো। শেষ করলাম রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম-যুগের শ্রদ্ধেয় শিল্পী ও অন্যতম একালের সার্থক সংগীত গুরুকে দিয়ে। এতদিন ধরে সুরের আগুনের বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের অনুগ্রহই আমার প্রেরণা ও পুরস্কার। সকলে আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

সন্ধ্যা সেন

প্রাকৃতিক॥

মানস রায়চৌধুরী

কিছুই করার নেই মেনে নেওয়া ছাড়া
এইভাবে সব কিছু মেনে নিতে হয়।
রৌদ্রও নিয়েছে মেনে তরল ছায়ার অবিচার
বৃষ্টিতে গিয়েছে গলে পৃথিবীর সঠাম লাবণ্য
আমাদেরও পায়ে হেঁটে উঠে যেতে হবে সাততলা
বিদ্যুৎ উপচানো এই শহরে সহসা নেই তড়িৎপ্রবাহ
সিঁড়িতে হৃৎপিণ্ড ভাঙে চার— পাঁচ— ছয়— সাত— আরো...
দূরে কোন জানলায় পশম দিয়েছে মেলে সাবধানী নারী
শেষ হয়ে আসে রৌদ্র, মেনে নিতে হয় বয়সের
ধবল কেশর আর ইতঃস্তত মেদ, মুখে কুঞ্চিত রেখার
উপদ্রব মেনে নিতে হয়
একদা আঙুলে ধরেছিলে
বারুদের মত তপ্ত বসন্তের ছবি
ছায়া আর মেঘ এসে বুকে পিঠে শ্লেষ্মা দিয়ে যায়
সব কিছু মেনে নিতে হয়
মেনে নিতে হয় তার শবাধারে আমার ললাট নুয়ে আছে
শাদা ফুলে লাল ফুল আশিতে ধুলোর সাদা সর
মেনে নিতে হয় শুকনো কুঁজাটিকে
কবে শেষবার জল ভরা হয়েছিল।

তুমি চাও॥

শান্ত রায়

তুমি চাও স্বার্থহীন ভালোবাসা দিতে
স্বার্থমুক্ত সব ভালোবাসা?
তুমি বলো, পৃথিবীতে বেড়ে-ওঠা ভুল-বোঝাবুঝির
শেকর যতো পারি ছিঁড়ে দেবো

সাগরের জলের মতন
অফুরাণ ভালোবাসা তুমি দিতে চাও
তোমার হৃদয় বড়ো, আমি মানি, কিন্তু এই প্রেম
সবাইকে সম-পরিমাণ দেয়া যায়?

টগবগে তরুণ,
ঔদার্য তোমাকে দেয় উজ্জ্বলতা,
অনাবিল ভালোবাসা বুকে, ফেতে-যেতে
পা জড়িয়ে যায় কেন ভুল-বোঝাবুঝির লতায়, কিংবা
বিষাক্ত শেকড়?

তোমার বয়স বাড়ে;
বৃষ্টি-করা রাতে দেখতে পাও ঃ
রেলিঙের একপাশে অসহায় ভিজে কবুতর
যার দু'ডানার স্পর্শে ভরে থাকে অনন্ত আকাশ...।

তোমার স্মৃতির প্রতি॥

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

তোমার স্মৃতির প্রতি কেবলি রক্তের পাপ দ্রুত জমে ওঠে।
যতক্ষণ হাত পেতে থাকি আমি মানুষের অনর্থক আত্মীয়তা চেয়ে
রাত হলে যতক্ষণ কোনোমতে ভর রাখি দলবদ্ধ মত্ততার ক্রাচে
তুমি যে তখন
দূরে থাকো। আমি নই—রক্তমাংসে নিহিত নিয়তি
আমাকে নিঃশেষ করে, প্রতিটি স্খলনে
তাও কি বিশ্বাসযোগ্য? তুমি সরে যাও, পদতলে
রেখে-আসা আমার অতীত উপহার
বৃষ্টিভেজা কোনো বিকেলের রামধনুর রিবনে বাঁধা সমগ্র পৃথিবী
নষ্ট হয়, এক আকাশ অন্ধকার মহাকাশে অন্য পৃথিবীর অন্ধকারে
মিশে যায়। মানুষ আসে না কাছে, কেননা ইঁদুর হয়ে তারা
চোখের আড়ালে কাটে নির্ভরতা বন্ধুত্ব প্রত্যাশা। রমণীরা
আলিঙ্গনে
জোঁকের চেহারা নিয়ে অসম্ভব ফলে ওঠে। তখন দুর্বল
এবং নিজের প্রতি আস্থাহীন মানুষের মতোন আমিও
ঝড়ো অসহায়—একা। অশ্রুর অ্যাসিডে
দু'চোখের মণি গলে, তরল আগুনে
প্রসাবিত জিভে চাটে ত্বক, মেদ, হাড়ের নলির মজ্জা।
গোপন গ্যাংগ্রিনে
ক্রমশ পচনশীল বিশ্বাসের গন্ধে বমি আসে। আর, সমস্ত জীবন
দু'এক মিনিটে যেন পুনর্বার অনুভব করে
সব স্মৃতি উপলব্ধি স্বপ্ন চিন্তা কল্পনা এবং জন্মমৃত্যুর ওপার
এ-জীবন খোঁজে
অন্য কোনো পৃথিবীর রৌদ্র নয় রাত্রি নয়, শুধু জননীর
চিরগর্ভের গোধূলি।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(দশ)

—'তোমার বাবা ফেরেন নি খোকন?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো খোকন। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মা।' এবার মায়ের দিকে ভাল করে তাকালো খোকন। 'মেক-আপ তুলে এসো। আমি খেতে দিচ্ছি।'

—'তোরা খেয়েছিস তো? আমার খিদে নেই। বাইরে খেয়েছি।'

—'একদম খাবে না?'

—'না রে। তোদের বাবা কোথায় খেতে পারেন বল তো?'

—'ফড়েপুকুরে দাদুর ওখানে গিয়েছিলাম। তারাও বলতে পারল না। কোথায় খেতে পারে?'

—'আমিও তো তাই ভাবছি। এক মাস হয়ে গেল। নে শুয়ে পড়।'

—'কিচ্ছু খাবে না মা?'

—'না রে।'

—'পেট উপোসে হাতি মরে কিন্তু।'

—'আমি তো আর হাতি নই।'

—'তুমি তো খুব শুকিয়ে গেছ।'

আলো নিভিয়ে দুঘরে দুজন শুয়ে পড়ল। খালি পেটে শুয়েছিল বলে অন্ধকারের ভেতর রজনীকে স্বপ্নে পেল।

...ভরত হলের সামনে পুলিশ লাঠি চার্জ করছে। ভিড় সামলাতে। হাউস ফুল। শুধু তিন টাকার টিকিট লাইন দিয়ে কেনা যাচ্ছে। শোয়ের আগে গাড়ি থেকে নামতেই মেইন গেটে রজনীর চোখ গেল। একখানা টিকিটের জন্যে প্রচণ্ড ঠেলাঠেলি চলছে। ভিড়ের চাপে লাইন বেঁকে যাচ্ছে। ভরত হলের দুজন দারোয়ান মিলেও সে লাইন সোজা করতে পারছে না। লোকের চাপে লাইন থেকে যে প্রথম ছিটকে পড়ল সে আর কেউ নয়—'কবিরাজের' রাজন—তৃপ্তি। পড়েই উঠবার চেষ্টা করল তৃপ্তি। পারল না। তার ওপর আরও দুজন ছিটকে এসে পড়ল।

...ফার্স্ট বেলের আওয়াজ। আর দাঁড়ানোর মানে হয় না। এখুনি সাজঘর যাওয়া দরকার। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। ভরত হলের উল্টোদিকেও ট্রাম লাইনের ওপারে লোক দাঁড়িয়ে। অনেকেই টিকিট পায়নি। তাদের ভিড়। ফুটপাথে। ট্রাম লাইনে। রাস্তার ওপর। ঝিজঝিজ

পরবর্তী

...রজনী যতবার গেটে ঢুকতে যায়—ততবারই কোন না কোন ভিড়ে সে জড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই গেটের কাছে এগোতে পারছে না। পা আটকে যাচ্ছে বারবার। এই সামান্য দু পা সে পার হতে পারছে না। গুণগ্রাহীর নমস্কার প্রতি-নমস্কার, অটোগ্রাফের খাতায় সই দিতে দিতে রজনী বুঝলো এ ভিড় থেকে সে আর বেরোতে পারবে না কিছুতেই। অথচ এখুনি গিয়ে মেক-আপে বসা দরকার। এই যাঃ! সেকেণ্ড বেলও পড়ে গেল।

...রজনী পাড়ি মরি করে এগোতে গেল। ভিড়ের চাপে তার দম আটকে আসছে। একটু এগোয় তো আবার ভিড়ের চাপে চার হাত পিছিয়ে যায়। সর্বনাশ হয়ে যাবে আমাদের। এখুনি আমাকে একটু পথ দাও। পার্ট মুখস্ত আছে আমার। মেক-আপ নেওয়ার দরকার নেই। আমি ছুটে গিয়ে স্টেজের বাঁ দিক থেকে এনট্রান্স নেব। ত্রিদিববাবুরা মিউজিকে বসে গেছেন। এখুনি ড্রপ উঠবে। আঃ! অমিয় আমি যাচ্ছি—

...এতক্ষণের ভিড় ঠেলাঠেলিতে রজনী এই প্রথম একটু মুক্তি পেল।

চোখ মেলে দেখল এখন খুব সকাল। ভোর হতে শুরু হয়েছে। বসার ঘরের টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। আস্তে উঠে গিয়ে ধরল। তা হলে সেকেণ্ড বেল নয়। ফোন বাজছিল।

—'আমি অমিয় বলছি। একটা বিজ্ঞাপন মাথায় এসেছে। লিখে ফেলেছি—'

রজনী তাকে থামিয়ে দিল। 'রাতে ঘুমোওনি?'

—'ঘুমিয়েছিলাম। অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। বসে বসে লিখে ফেললাম। এ বিজ্ঞাপনে অন্তত হাজার তিনেক টাকা চাই। পর পর তিনদিন রিপিট করতে হবে।'

—'উফ বাবাঃ! ভালো কথা বলেছো। অত টাকা কোত্থেকে আসবে!'

—'লীলা কিছু দিচ্ছে। আজই ওদের টিচার্স কোঅপারেটিভ থেকে তুলে দেবে। দরটোর ভেতর। তুমি দ্যাখো না কিছু। আমি বলছি—এ কাপি ক্লিক করবেই। আমি জানি।'

—'আগে তো ম্যাটারটা দেখি। হলে আসছো কখন?'

—'যখন বলবে।'

—'আহা! এখন টাকার বেলায় খুব বাধ্য ছেলে। দেখি—হলে গিয়ে সব বলবো।'

—'শশাঙ্কবাবুর ঘুম ভাঙ্গাইনি তো?'

—'হ্যাঁ। ভাঙ্গিয়েছো।' বলেই ফোন রেখে দিল রজনী।

অমিয় ফোন করে বাড়ি ফিরতেই লীলা বলল, 'এই দেখলাম—আলো জ্বালিয়ে লিখছো। এর ভেতর কোথায় গেলে? চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

অমিয় বলল, 'যে টাকাটা দেবে বলেছো—দেবে তো?'

—'বললাম তো দেব। ওই কটা টাকাই আছে আমার কোঅপারেটিভে। শেয়ারের জন্যে কিছু হয়ত কেটে রাখবে।'

—'আমি তোমার সব নিয়ে নিচ্ছি।'

—'আরও থাকলে দিতাম।' তারপর অন্য জায়গা থেকে শুরু করল লীলা। 'কতকাল পরে আমরা এমন ভোরে উঠে চা খাচ্ছি আবার। তোমার থিয়েটারই তোমাকে অনেকটা নিয়ে গেছে।'

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অমিয়র চোখ গিয়ে পড়ল টেবিলের ওপরের প্যাডে। পাশের ডটপেন থেকে রিফিল বেরিয়ে আছে। অন্ধকার থাকতে থাকতে আলো জ্বালিয়ে ভূতে প্যাওয়ার মত লিখে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে টাইপের সাইজ পর্যন্ত মাথায় এসে গিয়েছিল।

ভরত

পঞ্চমুখ

পঞ্চাশ রজনীর পথে

সুজাতা

প্রতিটি দৃশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য

আজ, কাল ৩ ও ৬।।×বৃহ ৬।।

রজনী অমিয় কল্যাণী শঙ্কর

নাটক ও নির্দেশনা ।। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বপ্রকার ফ্রি পাশ বন্ধ

খালি চায়ের কাপ কলঘরে নিয়ে যেতে যেতে লীলা বলল শঙ্করকে দুটোর ভেতর পাঠিয়ে দিও। আমি টাকা তুলে রাখবো।

আজকাল অফিসবাড়ীর মতই অমিয় সকাল সকাল চান করে। দুটি মুখে দিয়ে ভরতে ছোটে। সেখানে আগের দিনের বকেয়া পেমেণ্ট থাকে। রিহার্সেল থাকে। বিজ্ঞাপনের টাকা পাঠানো থাকে। থাকে কাগজের লোকজনদের কিছু কিছু অনর্থক ফোন করা। কেউ তো এগিয়ে এসে একটি রিভিউও করল না। রজনী সেদিন মেঝের দিকে তাকিয়ে নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল সাজঘরে। কত প্রাইজ অজকাল, কত সভা সম্বর্ধনা। আমায় কিন্তু কেউ কোনদিন কোথাও ডাকেনি। অথচ প্রায় তিরিশ বছর হল একটানা স্টেজে আছি। কি যে ব্যাপার বুঝি না।

আজ কিছু আগেই এসে সাজঘরে ঢুকলো অমিয়। গম্ভীর থমথমে সাজঘর তখন একটি গানে গম গম করছে। মিউজিকের লোক কেউ আসেনি। রজনী অরগ্যানে বিড টিপছে। চণ্ডীদা তিন রঙের তিনটে পাঞ্জাবি নিয়ে পড়ছে ইস্ত্রি করতে।

রজনীর একার গলায় সারা হল বোঝাই হয়ে গেল।

'বাঁধিয়া বিনোদ বেণী—'

'বিনোদে' এত সুন্দর একটা টান। কোন জানান না দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল অমিয়। নতুন বেকসনের প্রতিটি শূন্য সীট যেন এই মুহূর্তে দর্শকে ভরে গেছে। গানের শেষে অমিয় তিনটি পজ দিয়ে আলাদা করে তিনটি ক্ল্যাপ দিল।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

রজনীকে লজ্জা অনেকদিন পর আক্রমণ করে কাবু করে ফেলল। কোন মতে মাথা তুলে বলল, 'কখন এলে?'

—'এই তো। তুমি কখন?'

—'অনেকক্ষণ। প্রভাতের বার্তা পেয়েই—'

—বন্ধকের দোকানে চলে গেলে! কত এনছো?

—সতেরো শো। হবে তো?

—খুব হয়ে যাবে। শশাঙ্কবাবুর ঘুম ভাঙ্গাইনি তো সকালে?

—নাঃ!

—উনি বুঝি দেরিতে ওঠেন।

—হ্যাঁ' তারপর অমিয়র দিকে ঘুচ করে ঘুরে তাকিয়ে রজনী বলল সে তো সেই ফার্স্ট নাইটের পরদিন থেকে হাওয়া। কোথায় গেছে কিছু বলেও যায়নি।

—কি বলছো তুমি! এত দিন বলোনি কেন?

—বলে কি হবে? কাছাকাছিই আছে। মনে হয়, আমি বেরিয়ে এলে ছেলেমেয়েদের দেখতে আসে। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি—বসার টেবলের ছাইদানিতে আধপোড়া সিগারেট জ্বলছে—টাবলয়েডের কাগজ খোলা। হয়ত বসে বসে পড়ছিল—

নিজ ধরিয়ে অমিয় বলল একটা সিগারেট খাবে?

উঁহু। আমি তো বৃহস্পতি, শনি, রবিবার শুধু সিগারেট খাই।

বলেই দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলো। এই তিনদিনে পাঁচটি শোয়ে সারা হপ্তায় মোট দশবার দর্শকদের সামনে সুজাতাকে বারবনিতার রোলে সিগারেট ফুকতে হয়।

—'কই? ম্যাটার দেখি।'

অমিয় বুকপকেট থেকে বের করে দিল। রজনী খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলো খানিকক্ষণ। তারপর বলল আমাদের তো বন্ধু চারদিকে! এই বিজ্ঞাপন বেরোলে সবাই আমাদের গায়ে অশ্লীল বলে দাগ মেরে দেবে না তো?

—'দেওয়ার কি কিছু বাকি আছে রজনী? এখন যেভাবে নাটক চলছে—তাতে টিকিট সেল থেকে কোনদিনই ধার শোধ হবে না। বরং সুন্দর পাহাড়টাই উঁচু থেকে আরও উঁচু হতে থাকবে। একটা কিছু তো করতেই হবে আমাদের। থেমে থাকলে তো চলবে না। কোথাও তো ঝুঁকি থাকবেই।'

—'এতগুলো টাকা!'

—তার ঝুঁকি নিও না।' ধুক ধুক করে চলতে থাকো। তারপর একদিন নিভে যাবে। কেউ টেরও পাবে না।

—'বেশ। দাও বিজ্ঞাপন।' বলে রজনী গুন গুন করে গান ধরল। খুব চাপা স্বরে। গ্রুপের কেউ এখনো আসেনি। তাই নির্জনে। চণ্ডীদার মুখে তো কথাই নেই। সেই চাপা সুর থেকে যে-গানটি উঠে আসছিল, তা হল—

'নতুন এ পথ চলতে
চরণ কাঁপে—'

চণ্ডীদার ইস্ত্রি থেমে গেল। সাবধানী লোক। পাছে গানে তন্ময় হয়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবিগুলো পুড়িয়ে বসে—তাই প্লাগ খুলে ইস্ত্রিটা সোজা দাঁড় করিয়ে রাখল। তারপর বাবুর বাড়িতে যেভাবে চাষী এসে বসে থাকে—ঠিক সেইভাবে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসল।

অমিয়র কান ছিল গানে। তাতে মাথার ভেতর যেখানে বেটুকু আনন্দ হওয়ার তা হচ্ছিল। কিন্তু মন ছিল অন্য জায়গায়। মন বলছিল, আমি দুজন মেয়র শেষ টাকা কটি নিয়ে নিচ্ছি—তা কি ফেরৎ আনতে পারব? যদি না পারি? তা হলে কি হবে? কোত্থেকে দেব? গান থামলে অমিয় বললে 'কাজ নেই। থাকগে!'

রজনী অবাক হয়ে বলল কি থাকবে?

—বিজ্ঞাপন দিয়ে দরকার নেই। অতগুলো টাকা। বিজ্ঞাপনের পরেও যদি টিকিট বিক্রী না বাড়ে তখন কি হবে?

—'অত ভাবলে চলে! এর নাম হল গিয়ে শো বিজনেস—। বলতে বলতে রজনী দেখলো ভরত হলের পুরনো বাসিন্দা সেই পায়রা দুটি নিজেদের মধ্যে প্রেম বিনিময়ে ব্যস্ত। ঠোঁটে ঠোঁটে নানান কিছু হয়ে যাচ্ছে। হয়ত পুরুষ পায়রাটি ঠোঁটে করে কোন সুস্বাদু পোকা এনেছে—বউকে খাওয়াবে বলে। বউ রেলিশ করে খাচ্ছে আর স্বামীর শিকারের তারিফ করছে খেতে খেতে।

পরদিন সকালে অমিয় বিছানায় বসে চায়ের সঙ্গে কাগজে প্রায় চার হাজার টাকার বিজ্ঞাপনটি বারবার পড়ল। লীলাকে ডেকে ডেকে দেখালো।

বেলা এগারোটায় খেতে বসেছে অমিয়। এমন সময় বুকিংয়ের রবি এসে হাজির! এক রকম ছুটতে ছুটতে। উদভ্রান্ত চেহারা। বুকপকেট ছিঁড়ে গিয়ে ঝুলে পড়েছে।

—কে মারলো তোমার? অমিয় খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—মারেনি কেউ। আপনি দাদা আগে পুলিশে খবর দিন।

—কী হয়েছে বলবে তো।

—বেলা সাড়ে নটার ভেতর বুকিং শেষ। আজকের পর পর দুটো শো-ই হাউস ফুল।

—কি বললি?

—হাউস ফুল।

—কি ম্যাটিনির?

—ম্যাটিনি, ইভনিং—দুটোই দাদা। পাবলিক ভেঙে পড়ছে ওইটুকু বুকিংয়ের ওপর। আপনাদের ছবি টানা না কাচের বাকস ভেঙ্গে পড়েছে। এখন লোক সামলাবে কে? পুলিশ দরকার। বাইরে তিন টাকার টিকিট বাইশ টাকায় ব্ল্যাক হচ্ছে। আমি চণ্ডীদাকে বসিয়ে ছুটে

বাচ্চাদের বড়সড় করে গড়ে তুলুন ইনক্রিমিন* দিয়ে

ছেলেবেলার দিন—হেসে খেলে ঠিকমত বেড়ে ওঠার দিন! এই সময়ে ওকে ইনক্রিমিন সিরাপ নিশ্চয়ই দেবেন। তারপর দেখবেন ওর খাওয়ার আগ্রহ! খাওয়া নিয়ে আলাতন তো দূরের কথা, খিদে বেড়ে গিয়ে যেমন খুশি করে খাবে তেমনি চটপট বেড়ে উঠবে! ইনক্রিমিন উপকারী ভিটামিন আর আয়রনে ভরপুর তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা— এতে যে বিশেষ অ্যাদিনো অ্যাসিড, লাইসিন আছে—তা আপনার বাচ্চাকে আহারের পুরো পুষ্টি গ্রহণ করতে সাহায্য করে।

ইনক্রিমিন* টনিক

ড্রপস্—২ মাস থেকে ২ বছরের বাচ্চাদের জন্যে
সিরাপ—১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের জন্যে

বাড়তি আহারকে বাড়তি বৃদ্ধিতে পরিণত করে

ডাক্তারের কাছে নির্ভরযোগ্য নাম Cederic

ল্যাবরেটরিজ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি বিভাগ *আমেরিকার ল্যাবরেটরিজ কোম্পানীর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

Sista's-INC-3631-R/76 Ben

বসন বিলাস

ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

যক্ষ্মী : প্রথম শতাব্দীর পাটনা ম্যুজিয়াম

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'কাপড়ের উপর মানুষ নির্ভর করে না, মানুষের উপর কাপড় নির্ভর করে।' (কোট বা চাপকান প্রবন্ধে) তবু নিছক লজ্জা বা শীতাতপ নিবারণের জন্যে যে মানুষ কাপড় পরে এমন কথা বলা যায় না। এছাড়া যুগে যুগে এমন অনেক বিখ্যাত নর-নারীর জন্ম হয়েছে যাঁরা সকলেই ছিলেন বসন-বিলাসী। তাঁরা মনীষী ফ্রাঙ্কলিনের মত বিশ্বাস করতেন, সভ্য মানুষ আহার-পর্ব সমাধা করেন নিজের রুচি অনুযায়ী কিন্তু পোশাক নির্বাচনকালে তাঁকে নির্ভর করতে হয় অন্যের রুচির উপর অর্থাৎ 'আপ রুচি খানা পর রুচি পরনা!' যথাযোগ্য পরিধেয় নির্বাচনের মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে বিশেষ ফ্যাশনের আদর্শ শেষ পর্যন্ত তাই রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন: 'সকল দেশেই বেশভূষার একটা ভদ্রতার আদর্শ আছে; (তবেও) তাঁর মতে যে দেশের মানুষ গায়ে উল্কি এঁকে কোন মতে লজ্জা নিবারণ করে 'লেখার উল্কির ইতর বিশেষে ভদ্র-অভদ্র চিহ্নিত।' সমাজতাত্ত্বিক বোঁডি বলছেন, পরিচ্ছদ নির্বাচন কালে লক্ষ্য রাখতে হবে তিনটি জিনিসের দিকে; দেখতে হবে সে পোশাক কতটা আরামদায়ক কতটা রুচিকর আর কেমন সস্তা!' রবীন্দ্রনাথের ধারণায় 'নিজের দেশ নিজের পরিবেশ, নিজের পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বেছে নিতে হবে বেশভূষা; কারণ বেশভূষায় কেবলমাত্র অঙ্গাবরণের প্রয়োজন সাধন করে না তা ভদ্রাভদ্র দেশী-বিদেশী স্বজাতি বিজাতির পরিচয় দেয়। (নকলের নাকাল প্রবন্ধে)

সম্ভবত পোশাকের ঐ গুরুত্বের কথা চিন্তা করেই কবি গোল্ডস্মিথ লিখেছিলেন 'মুকুট আর রাজকীয় বসন ছেড়ে সম্রাট যদি রাতের পোশাক পরে' প্রজাদের দেখা দেন তবে তিনি হয়তো অর্ধেক খাতিরও পাবেন না।' রবীন্দ্রনাথও বলছেন: 'উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা কেউ বা ভিখারী। (রক্ত-করবী নাটকে) পুরোহিতের নামাবলী পুলিশের ইউনিফরমের মত রাজার মুকুট-চাপকানও বুদ্ধি প্রায় অপরিত্যাজ্য! জটা দেখে তাপস চেনার মত অনেক সময় পোশাক দেখেই আমরা অনুমান করতে পারি একজনের জীবিকা ও জীবনধারা। জানতে পারি রুচি ও এটিকেট-প্রীতির কথা। অবশ্য 'নব নব উন্মেষশালী ফ্যাশনের সঙ্গে তাল রেখে পোশাকের আকার-প্রকার-বর্ণও নিত্য পালটায়। তবু বেশভূষার মধ্যে দিয়ে ঠিকই ফুটে ওঠে একটি মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মহাকবি শেকসপীয়র তাই যথার্থই বলেছেন: পোশাকই অনেক সময় ঘোষণা করে একটি মানুষের ব্যক্তিত্বকে! অর্থাৎ বেশের আমি বেশের তুমি বেশ দিয়ে যায় চেনা।

সত্যি কথা বলতে কি বিদ্যাসাগরের মোটা চাদর ও শুঁড়তোলা চটি যেমন তাঁর দৃপ্ত ব্যক্তিত্বেরই পরিপূরক অথবা রবীন্দ্রনাথের ঋজু, গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেহটির সঙ্গে তাঁর ঢিলেঢালা রেশমী জোব্বা কেমন চমৎকার ভাবেই না মানিয়ে গেছে। ঐ পোশাকও তাঁর কবিব্যক্তিত্বেরই অঙ্গ। তেমনই বঙ্কিমচন্দ্রের পাগড়ী বিবেকানন্দের গেরুয়া বেনিয়ান-পাগড়ী, নেতাজীর টুপি নেহরুজীর জহর কোট, মাও সে-তুঙের চীনা কোট তাঁদের ব্যক্তিত্বেরই প্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন চার্চিল ব্রুটেই চেনা দেন তেমনই অনেক মনীষী বেশ স্বাতন্ত্র্যেই বিশিষ্ট। ক্রিমিয়া যুদ্ধের সেনাপতি আর্ল অব কার্ডিগ্যানকে কজনই বা মনে রেখেছেন অথচ তিনি যে পশমের জামাটি প্রথম সারে দিয়েছিলেন সেই কার্ডিগ্যান এখনও সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। ঐভাবেই বিখ্যাত হয়ে আছেন ১৮শ শতকের ম্যাকিনটস, ১৬'শ শতকের ক্যাথারিন ডি মেডিচ জার্সি, ম্যাঞ্চেস্টার, ঢাকা বেনারস কাঞ্চীপুরে ফরাশডাঙ্গা মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের নামও জড়িয়ে আছে নানা বস্ত্রের সঙ্গে।

আসলে বেশভূষা প্রায় মানব-সভ্যতার সমবয়সী। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বাকল ঘাস পাতা পশুচর্ম বা লোম দিয়ে লজ্জা বা শীত নিবারণ করতেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। ভারতের চম্বল উপত্যকায় ছত্তিসগড়ের সিংহল-পুরে আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে স্পেনের আলতামিরায় ফ্রান্সের লা মথে যে সব প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি এই ধারণার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।

প্রাগার্য মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতা, প্রাক-কলম্বীয় সভ্যতাও (দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার) উন্নত বেশভূষার দৃষ্টান্ত বহন করছে। মহেঞ্জোদড়োতে উৎখননের মাধ্যমে যে রাজপুরুষ বা পুরোহিতের প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে (২০০০ খৃঃ পূঃ) তার গায়ে দেখা যায় নকসা করা উত্তরীয়। দিল্লীর জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত টেরাকোটা ও ব্রোঞ্জের মাতৃ ও নর্তকী মূর্তিগুলিও সিন্ধু সভ্যতার বয়ন-শিল্পের অগ্রগতির পরিচায়ক। মাতৃ-মূর্তির শিরোভূষণটিও দেখবার মত।

তবে আর্যেরা ছিলেন অনাড়ম্বর বেশভূষার ভক্ত। ঋকবেদে নারী-পুরুষের ব্যবহার্য পরিচ্ছদের বিবরণ আছে। যেমন পুরুষের অধোবাস ছিল বাসস (১।৩৪।১) বা বসন (১।৯৫।৫) বা বস্ত্র (১।২৬।৭) নারীদের

ক্ষেত্রে অধোবাসের নাম ছিল নীবি বা 'নীবী'। পুরুষেরা গায়ে যে চাদর দিতেন তার নাম ছিল অধিবাস (১।১৪০।৯)। বস্ত্র বা অধিবাস বয়ন করা হত 'উর্ণা' (৪।২২।২) বা ভেড়ার লোম দিয়ে। গান্ধার দেশের ভেড়া ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত (৪।২২।২)। সূচের কাজ করা ওড়নাকে বলা হত পেসস (২।৩।৬)। ঐ পেসসের গায়ে অনেক সময় বসানো থাকতো সোনার 'চুমকি' (৫।৫৫।৬)। ঋষিরা গলায় পরতেন মালা; তাঁদের অধোবাস ছিল অজিন বা হরিণের ছাল। আর্যের 'বসন' থেকেই বাঙালীর 'ধুতি' মাদ্রাজের 'বৌল্টি' বা কেরালার 'ভোট্টি' পঞ্জাবের 'টবার' উদ্ভব। অধিবাস থেকে জন্ম হয়েছে হিমাচলের পজ বা ফেরানের।

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বেশভূষার ক্ষেত্রে অবশ্য ক্রমে ক্রমে নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতা দেখা দেয়। সমকালীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নানা শাস্ত্রে স্তূপ মন্দির ও গুহার গায়ে ক্ষোদিত নানা মূর্তিতে এবং অজন্তা বাঘ প্রভৃতির মুরাল চিত্রে বেশ-বিলাসী ও বিলাসিনীদের খুঁজে পাওয়া যাবে। যেমন খৃষ্ট পূর্ব প্রথম শতকে ক্ষোদিত দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত চমর হাতে যক্ষী মূর্তিটির কথা বলা চলে (পাটনা যাদুঘর)। তার নীবীর উপর দেখা যাচ্ছে রসনা (রজ্জু) ও 'মেখলার' (কোমর-বন্ধ) বন্ধন। কোঁচানো শাড়ীর মতই তার নীবীটি সুরচিত ও সুসজ্জিত। এছাড়া পুরুষেরাও যে অনেকটা একালের কায়দায় কোঁচানো ধুতি পরতেন এবং তার প্রলম্বিত কোঁচাটি ধরা থাকতো বাঁ হাতে তার প্রমাণও পাওয়া যাবে কার্লা গুহা গাত্র দাতা দম্পতির মূর্তিতে (খৃষ্টীয়) ২য় শতাব্দী)। সেকালেও শীতের সময় ব্যবহার করা হত প্রাবার বা শাল। দরিদ্র মানুষেরা পরতেন খাটো ঝুলের বসন; কিন্তু অভিজাত নাগরিক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা পরতেন আগুলফবিলম্বিত বসন। খৃষ্টীয় প্রথম শতক ক্ষোদিত ভারহুতের যোদ্ধামূর্তিটি দেখলে সেকালের শিষ্ট পুরুষের বেশভূষার আন্দাজ পাওয়া যাবে। নারী সমাজে তখনও 'চোলক', 'কঞ্চুক' তথা কাঁচুলি ব্যবহার তেমন ব্যাপক ছিল না। তাঁরা অনেকেই ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখতেন। খৃষ্টীয় ১ম—৩য় শতকের মধ্যে মধ্য-এশিয়া থেকে যে কুষাণ ও শকেরা ভারতে হানা দিয়েছিলেন তাঁরাই প্রথম সঙ্গে করে আনেন কোট প্যান্ট ও চামড়ার জুতো। মথুরা যাদুঘরে কুষাণ রাজ কণিষ্কের (৭৮—১০১ খৃঃ) যে মুণ্ডহীন মূর্তি রাখা আছে তার পরণে দেখা যাবে লম্বা ওভার কোট চুড়িদার পাজামা ও বুট জুতা। কুষাণ বংশীয় আর এক রাজার টুপিও দেখবার মত (দ্রষ্টব্য মথুরা যাদুঘরে রক্ষিত ভগ্ন মুণ্ড)। গুপ্ত যুগের সম্রাটেরাও যে অনেকে পাৎলুন বা প্যান্ট পরতেন তা সমকালীন স্বর্ণমুদ্রার গায়ে ক্ষোদিত চিত্রাবলী দেখে বোঝা যায়। যেমন একটি মুদ্রায় দেখা যাবে চুড়িদার প্যান্ট পরে রাজা প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৫-৫৪ খৃঃ) গণ্ডার শিকার করছেন, অন্য আর একটিতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬—৪১৫ খৃঃ) অনেকটা ঐ পোশাকেই শিকার করছেন সিংহ। দক্ষিণ ভারতে প্রাপ্ত কোন কোন প্রাচীন ব্রোঞ্জ মূর্তির পরণেও দেখা যায় পাতলা কাপড়ের পাজামা। মাদ্রাজ যাদুঘরে রক্ষিত খৃষ্টীয় ৯ম শতকের পার্বতী মূর্তিটি এই সূত্রে দেখা যায়। এছাড়া সেকালে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠী প্রমুখেরা মাথায় বাঁধতেন বাহারী পাগড়ী। খৃষ্টীয় ২য় শতকে ক্ষোদিত অধুনা কলকাতা যাদুঘরে রক্ষিত, ভারহুতে প্রাপ্ত রাজপুরুষের রিলিফ মূর্তি অথবা খৃষ্টিয় ২। শতকে ক্ষোদিত কানহেরী গুহার দম্পতি মূর্তি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

মধ্যযুগে উত্তর পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরে যে সেলাই করা কামিজ ও পাজামা ব্যবহার করা হত তারও কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ পওয়া যায় (দ্রষ্টব্য ব্যাশমের লেখা 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়জ ইণ্ডিয়া' পৃঃ-২১৩)। কার্পাস বস্ত্রের থেকে পশম ও পট্ট বস্ত্রের ব্যবহার ছিল বেশী। অজন্তা ও বাঘের মুরাল চিত্রগুলি দেখলে (খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) বোঝা যায় বস্ত্র রঞ্জন ও বয়নের ব্যাপারেও সেকালের তন্তুবায়েরা ছিলেন যথেষ্ট দক্ষ। বৈচিত্র্য নকসার নীবী, মেখলা শিরোভূষণ, উত্তরীয় চোলকও লক্ষ্য করা যায় ঐসব গুহাচিত্রে।

তবে মুসলিম যুগের পূর্বে অধিকাংশ হিন্দু রমণী কোন প্রকার চোলক বা কাঁচুলি ব্যবহার করতেন কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতজনের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কারণ প্রায় সমস্ত প্রাচীন মূর্তি, রিলিফ ভাস্কর্য, মুরাল চিত্রে দেখা যায় যে মেয়েদের ঊর্ধ্বাঙ্গে নানা অলঙ্কার শোভা পেলেও সেখানে কোন বস্ত্রাবরণ নেই। কাঁচুলি পরিহিতা রমণীমূর্তি একান্ত দুর্লভ। জেমস ফারগুসন তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে হিন্দু যুগে রমণীরা ঘরে বাইরে অনাবৃত-বক্ষা হয়েই ঘুরে বেড়াতেন (ফারগুসনের লেখা 'ট্রি এ্যাণ্ড সারপেণ্ট ওয়ারশিপ', পৃঃ ১০২—৩)। কিন্তু আলটেকর ঐ মতের বিরোধিতা করে বলেছেন যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্পকীর্তিগুলি দেখলেও দেখা যাবে যে সেখানেও প্রায় সব নারীমূর্তি হয় নগ্ন নয়তো অর্ধনগ্ন; অথচ বাস্তবে গ্রীস ও রোমের মেয়েরা সারা দেহ আবৃত করে রাখতেন 'হিমাটিয়ন' বা টোগায়। আসলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন গ্রীসের মানুষ। তাঁরা সেই সৌন্দর্যেরই পরাকাষ্ঠা খুঁজেছেন নগ্নিকা বা নিউডের মধ্যে। আমাদের ভাস্কর-শিল্পীরাও সৌন্দর্যের

নবম শতাব্দীর এই পার্বতী মূর্তির পায়জামাজাতীয় পোষাক লক্ষ্যণীয়

পূজারী। তাঁরা তাই দেবী, যক্ষী, নায়িকার মূর্তি গড়তে গিয়ে দেহসৌন্দর্যকে ঢেকে দেন নি। সংস্কৃত সাহিত্যে তাই নিবিড়, আবর্জিত, 'স্তোককনম্র' স্তনের বহু রসগ্রাহী বর্ণনা পওয়া যাবে।

অবশ্য সমাজজীবনে ভারতীয় নারীরা (বিশেষত অনভিজাত সম্প্রদায়ের) সতাই কোন কাঁচুলি পরতেন কিনা তার পক্ষে প্রমাণও সুপ্রচুর নয়। বরং বিপরীত দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। যেমন অজন্তার গুহা-গাত্র, সাঁচীর রেলিঙের গায়ে অনেকগুলি বাস্তবধর্মী জনতা দৃশ্যের রূপায়ন লক্ষ্য করা যায় (জাতক কাহিনী থেকে)। ঐ সব দৃশ্যে দেখা যাবে বিভিন্ন শ্রেণীর নারী উদ্যানে, পথে, অলিন্দে দাঁড়িয়ে বা বসে রয়েছেন। তাঁদের প্রায় সকলের কোন বক্ষ-বন্ধনী নেই। অথচ এসব দৃশ্যে মানুষের

বিন্দুমাত্র আদর্শায়িত করা হয় নি। না চেহারায় না ভাবে। তাই মনে একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

প্রাচীন মিশরেও অনাভিজাত রমণীরা যে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত রাখতেন তার বহু প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ভাস্কর্যে ও চিত্রকলায়। যেমন, থিবসে অবস্থিত উজির রমোসের সমাধিসৌধে রয়েছে কয়েকটি মনোরম চিত্র। সেখানে দেখা যায় রমোসের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীদাসী ও উপপত্নীরা বিলাপ করছে। তাদের সকলেরই বক্ষ অনাবৃত। সেদেশে অভিজাত পুরুষেরা এমন কি রাজারাও কটি মাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে পথে বার হতেন। রানীরা পরতেন আলখাল্লা। (খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ রাজবংশীয় রহেটেপ ও রানী নোফ্রেতের রঞ্জিত প্রস্তরমূর্তি কায়রো যাদুঘর)। তবে মিশরীয় রাজারানীরা সকলেই ব্যবহার করতেন সুদৃশ্য মেখলা ও সুরঞ্জিত, বিচিত্র শিরোভূষণ। বার্লিনের যাদুঘরে রানী নেফারতিতির (১৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ) যে আবক্ষ মূর্তি রাখা আছে তার টুপিটি দেখবার মত। ১৯শ রাজবংশীয় ২য় রামেসেসের যেসব প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে তার শিরোভূষণও দর্শনীয়।

ব্যাবিলোন ও অ্যাসেরিয়ার মানুষেরাও খুব একটা বসনবিলাসী ছিলেন না। তবে তাঁদের পোশাকও ছল রুচিসম্মত। প্রায় সারা দেহ তাঁরা ঢেকে রাখতেন পশমী আলখাল্লায়; হত দুটি অবশ্য থাকতো মুক্ত। চামড়ার জুতা ব্যবহারের উদ্যোগ প্রথম ব্যাবিলোনীয়রাই করেছিলেন। শিরস্ত্রাণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁরা অগ্রণী। ১৯৫০-১৮৬০ খ্রীঃ পূঃ-এর মধ্যে ক্ষোদিত সুসার রাজকুমারের মূর্তিটি চমৎকার শিরস্ত্রাণে শোভিত (লুভর যাদুঘর, প্যারী)। প্রাচীন-কাল চীনারাও ছিলেন আরামদায়ক ও রুচিকর রেশমী বসনের ভক্ত। মেয়েরা প্রায় সারা শরীর ঢেকে রাখতেন নানা বস্ত্রে; তবে শিশুরা পরতো বিচিত্র নকসার বর্ণাঢ্য পাজামা, কুর্তা কোমরবন্ধনী (১১১৯ খ্রীঃ পূঃ-তে অঙ্কিত 'সু হান-চেন'-এর চিত্র ক্রীড়ারত শিশু, কোবে যাদুঘর)। জাপানের 'কিমানো' যে চীনা সংস্কৃতিরই দান তারও প্রমাণ মিলবে পঞ্চদশ শতকের চৈনিক শিল্পী জাং উইন-এর আঁকা গার্হস্থ্য চিত্রাবলীতে (ভাইওয়ান যাদুঘর)। বিচিত্র নকসার কিমানো পরিহিত বেশ কিছু নরনারী ঐ চিত্রপটে ভিড় করেছেন। প্রসঙ্গত চীনা কাঠের জুতোর কথাও ঐ ছবি দেখে মনে পড়ে।

খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ বাইবেল কি ভাবে পরিচ্ছদের প্রথম উদ্ভব হল তার কাহিনীও পাওয়া যায়। সেখানে দেখি আদম ও ইভ প্রথমে ডুমুর পাতা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করছেন। অবশ্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে গাছের বাকল-পাতাই ছিল মানুষের বসন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও ঘটেছিল। যেমন পেরু ও ইকুয়েডরের আদিম অধিবাসীরা বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনে আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ওয়াশিংটনের যাদুঘরে প্রায় ২ হাজার বছরের পুরানো পেরু দেশীয় এক সচিত্র ও সুরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড এখনও রাখা আছে। সেখানে লাল জমির ওপর হলদে, সবুজ, কালো রঙের মনুষ্য মূর্তিগুলি সূক্ষ্ম সূচি-শিল্পেরও নিদর্শন।

ওল্ড টেস্টামেন্ট রচনার যুগে ইহুদীরা গায়ে দিতেন ফতুয়া বা ভেস্ট; তার ওপর পরা হত নীল রঙের পড় বসানো চতুষ্কোণ চাদর। উৎসবের দিনে পরা হত গোলাপী রঙের আলখাল্লা, শোক বা অনুশোচনা প্রকাশ কালে কালো রঙের।

তারও আগে প্রাচীন গ্রীসে ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে প্রথমে সকলেই পরে পরতেন আঁটোসাঁটা 'চিটোন' বা জামা, তার উপর চাপানো হত একপাশ খোলা আজানুলম্বিত ডিলেডলা 'হিমাটিয়ন' বা জোব্বা। মেয়েরা কোমরে বাঁধতেন মেখলা বা কোমরবন্ধনী। শীতের দিনে গায়ে দেওয়া হত 'পেপলোস' বা শাল। এছাড়া মেয়েরা মাঝে মাঝে ব্যবহার করতেন একফালি বস্ত্র দিয়ে বানানো অন্তর্বাসি বা কাঁচুলি। অতীতে রোমের পুরুষেরা গায়ে দিতেন 'টিউনিকে' বা জামা; ঐ টিউনিকের উপর পরা হত 'টোগা' বা আলখাল্লা। এছাড়া মাথায় থাকতো ফুল-পাতার শিরোভূষণ, পায়ে পাদুকা।

রেনাসাঁসের কালেই পাশ্চাত্যের মানসে প্রথম হয়ে উঠলেন বসন-বিলাসী। তখন থেকেই দেখা যায় বস্ত্র-বৈচিত্র্য। বাতিচেল্লী মাইকেল এঞ্জেলো, দা ভিঞ্চি, রাফায়েল তিশান ভেরোনেজ প্রমুখ শিল্পীর চিত্রমালায় দেখা যায় নানা রকম পোশাকের সমারোহ। ১৬শ শতকে চার্চের নির্দেশে বন্ধ হয়ে গেল হেনিন ও মিটারের মত বর্বর পোশাকের ব্যবহার। রেনাসাঁসের অন্যতম প্রবক্তা ক্যাথারিন ডি মেডিচির আমলে (১৫১৯-৮৯ খ্রীঃ) ইটালীর মেয়েরা ব্যবহার করতে থাকেন 'কর্সেট' বা দেহ-বন্ধনী। প্রায় ঐ সময়েই আবিষ্কৃত হয় কাপড়ে মাড় দেওয়ার কৌশল; পঞ্চদশ শতকের শেষেই কড়া মাড় ও কুঁচি দেওয়া চক্রাকার 'রাফ' বা গলবস্ত্র প্রচলিত হয়েছিল। ঐ সময়ে ফ্ল্যান্ডার্স অঞ্চলে শুরু হয় 'লেস' ও 'ক্রচেটে'র ব্যাপক ব্যবহার। 'ফার্দিং গেলা' নামের তারের কাঠামোর সাহায্যে মেয়েরা বাড়িয়ে দিলেন ফ্রকের 'ঘের' ও 'আয়তন'। অন্তর্বাস রূপে সেমিজের ব্যবহার শুরু হয় ১৮শ শতকে। রেনাসাঁসের কালে ছেলেরা পরতেন গায়ে এঁটে বসা চেস্ত বা প্যান্ট কোমরে চওড়া বেল্ট, স্বোতাম লাগানো হাতলম্বা কুর্তা ও রাফ থাকতো ঊর্ধ্বাঙ্গে। রানী এলিজাবেথ ও ওয়ালটার রালের (১৬শ শতক) তৈল চিত্রগুলি সেকালীন পরিচ্ছদের পরিচয় দেবে।

ফরাসী বিপ্লবের পরে অষ্টাদশ শতকে আরও আড়ম্বরময় ও বিচিত্র বেশভূষার দেখা পাওয়া গেল। শিল্পশাস্ত্রের পরিভাষায় ঐ যুগের নাম রোকোকো (১৭২০—৭০ খ্রঃ)। ঐ রোকোকো শৈলীর বৈশিষ্ট্য চটুলতা জটিল অলঙ্করণ উচ্ছ্বাসময়তা ও চাকচিক্য। পোশাক পরিকল্পনাতেও দেখা গেল ঐ সব বৈশিষ্ট্য। উটপাখির পালক মিঙ্কের লোম স্যাময়ের চামড়া জরি মণি-মুক্তা লেস খচিত ঝলমলে পোশাকের শুরু হল জয়যাত্রা। ফরাসী দেশের লুই রাজারা (১৭১০—৯৩ খ্রঃ) ছিলেন ঐ রোকোকো রীতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ঐ সময়ের অস্ট্রিয়ার ড্যান্ডি চ্যান্সেলর কাউনিৎস রিয়েটবুর্গ (১৭১১—৯৪ খ্রঃ) শোনা যায় দিনের মধ্যে ৩০ বার পোশাক বদল করতেন। তিনি ছিলেন ড্যান্ডি যুবকদের আদর্শ।

১৮৭৩ সালে জার্মানীর ক্রাউন প্রিন্স অব স্যাকসনী প্রথম শুরু করেন মেয়েদের অস্বাস্থ্যকর পরিধেয়ের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন। ঐ বছরেই বসন সংস্কারের উদ্দেশ্যে বোসটনে (আমেরিকায়) গঠিত হল এক সংঘ। ঐ সংঘের সদস্যেরা কর্সেটং হিল তোলা ও পা চাপা জুতা স্বাস্থ্যরোধী কোমর বন্ধনীর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। প্রায় সেই সময় থেকেই পাশ্চাত্যে পুরুষদের পোশাকের ফ্যাশন নির্ধারণ করে আসছেন লন্ডনের দর্জিরা; আর মেয়েদের পোশাকের ফ্যাশন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে প্যারিসের দর্জিদের দ্বারা। জাপানের কিমোনো, ভারতের কুর্তা এখন হয়ে উঠেছে প্রায় আন্তর্জাতিক পরিচ্ছদ। এই সূত্রে বাঙ্গালীর পোশাক সম্পর্কেও দু-এক কথা বলি। ১৯ শতকের বসনবিলাসী বাঙ্গালীবাবুর ছবি দেখতে পাওয়া যাবে হুতোম ও আলালের সুখপাঠ্য নকসায়। কালীঘাটের পটেও চুনট করা ধাক্কা পাড়ের ধুতি পরা গিলে করা পাঞ্জাবি পরিহিত বাঙ্গালীবাবু ছাতা লাঠি চাদর বাবড়ি চুটি সমেত একান্তই জীবন্ত। তাঁর পার্শ্ববর্তী বিবি বা বধূও যথেষ্ট মোহিনী। এই সূত্রে প্রাচীন বাঙ্গালীর বেশভূষা সম্পর্কেও দু-এক কথা বলা যায়। কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশোপদেশে প্রবাসী গৌড়ীয় শিক্ষার্থীর বর্ণনা আছে; তাতে দেখা যায় যে তাদের পরনে থাকতো ধুতি গায়ে উত্তরীয় কোমরে লাল কোমরবন্ধ আর পায়ে ময়ূরপঙ্খী জুতো। সেসময় সেলাইবিহীন বস্ত্র পরিধানই ছিল প্রচলিত রীতি। নারীর অধোবাস ছিল লম্বা ঝুলের শাড়ী। উত্তরবাস রূপে ব্যবহৃত হত ওড়না। ঐ ওড়না দিয়েই তাঁরা গা ঢাকতেন, ঘোমটা দিতেন। স্তনপট্ট বা কাঁচুলির ব্যবহার ছিল সীমিত। পুরুষেরা হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের কাপড় পরতেন কাছা দিয়ে। সৈনিকরা পরতো খাটো ঝুলের পাজামা। নর্তকীরা পরতেন চোস্ত ও কাঁচুলি। বাচ্চারা পরতো রঙিন ধটি বা জাঙ্গিয়া। সকলেই পায়ে দিতেন ফিতাবিহীন জুতা। জীমূতবাহনের দায়ভাগে সভা-সমিতির জন্যে স্বতন্ত্র পরিচ্ছদের বিধানও দেখা যায়। মেয়েদের মধ্যে নানা নকসার ছাপা শাড়ী ও উত্তরবাস পরারও রেওয়াজ ছিল। প্রাচীন পুঁথি চিত্রে ময়নামতী চরকেতুগড় পাহাড়পুরের মৃৎফলকেও তার প্রমাণ মিলবে।

বিশ্বের প্রথম মানুষ য়ুরি গাগারিন যিনি মানুষের মহাকাশ জয়ের প্রবর্তক।

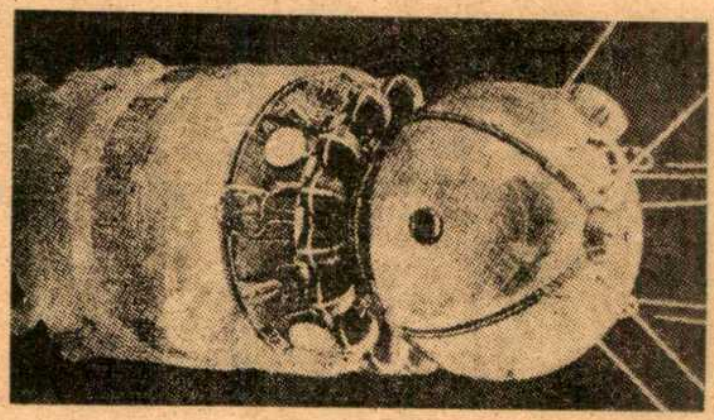

ভোস্তক মহাকাশযান যা বিশ্বের প্রথম মানুষকে নিয়ে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

বিজ্ঞানের কথা

*মহাকাশ গবেষণার পনেরো বছর
*চিলির সামরিক জুন্টার আমলে
*গর্ভরোধী ভ্যাক্সিন
*মেডিকেল পরীক্ষা কার্যের জন্য মানুষকে জন্তু জানোয়ারের মত ব্যবহার

পনেরো বছর আগে ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে সেই অসাধারণ ঘটনাটি ঘটেছিল—মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা। গোটা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনার সামনে।

বিশ্বে সেই প্রথম সে মনুষ্য এক মহাকাশযান মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ছিন্ন করে পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত। মানুষ চূর্ণ করেছিল নিজের মর্তসীমা। অসাধারণ সেই ঘটনার নায়ক ছিলেন য়ুরি গাগারিন—প্রথম সে-মনুষ্য মহাকাশযানের একক যাত্রী।

মানব-সংস্কৃতির ইতিহাস দীর্ঘ ও অসাধারণ সব ঘটনায় পরিপূর্ণ। প্রতিটি কৃতিত্ব—লিখিত ভাষার প্রথম হরফের উদ্ভাবনা হোক বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার হোক, কিংবা ভূ-গোলকে প্রথম আবর্তন হোক—মনুষের ইতিহাসকে নতুন পর্বে উন্নীত করেছে। তার ফলে জোর পেয়েছে প্রগতির শক্তি ও সৃজনমূলক বিকাশ।

মানুষকে মহাকাশে যাত্রার পথ প্রথম দেখিয়েছিলেন রাশিয়ার এক মনস্ত বিজ্ঞানী কে ই ৎসিওলকোভস্কি। সময়টা তখন ছিল বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক। তাঁর রচনা থেকেই পাওয়া গিয়েছিল **কসমোনাটিকস** বা **নভশ্চারণবিদ্যার** ভিত্তি। তিনি **লিখেছিলেন,**

মহাকাশ-গবেষণার পনেরো বছর

'পৃথিবী হচ্ছে মেধার লালনাগার, কিন্তু মানুষ চিরকাল এই লালনাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকবে এমন হতেই পারে না।'

গাগারিনের মহাকাশযাত্রার কয়েক মাস পরেই আরো একটি সোভিয়েত মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষে স্থাপিত হয়েছিল, তার নাম ভোস্তক-২। এক বছর পর ঘটেছিল বিশ্বের প্রথম সম্মিলিত মহাকাশযাত্রা। যাত্রী দুজন—এ নিকোলায়েভ ও পি পপোভিচ।

১৯৬৩ সালে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন একজন মহিলা—ভালেনতিনা তেরেশকোভা।

এমনিভাবে মহাকাশ-অভিযানে প্রতি বছরই নতুন নতুন অগ্রগতি ঘটেছে। প্রথম অভিযানের নায়ক পরবর্তী সমস্ত অভিযানে প্রেরণা হয়ে থেকেছেন।

আমাদের কালের একটি লক্ষণ এই যে বিপুল পরিমাণ তথ্যের আদানপ্রদান করার দরকার হয়ে পড়ে। প্রতিটি মহাকাশ-অভিযানের সঙ্গে তাই ভূপৃষ্ঠে ব্যাপক একটি ব্যবস্থা ও আয়োজন ঠিক রাখতে হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা ও আয়োজন এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়। যতোখানি করা দরকার তার সবখানি এখনো পর্যন্ত করা যাচ্ছে না। তার পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে যোগাযোগ-ব্যবস্থার মান তৎক্ষণকতা ও নির্ভরতা অনেকখানি বাড়িয়ে তোলা গিয়েছে।

মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর অনুশীলনে ও পর্যবেক্ষণে বিরাট সাহায্য পাওয়া সম্ভব। মহাকাশযান থেকে পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া গিয়েছে পৃথিবীর পুঙ্খানুপুঙ্খ মানচিত্র—রাজপথ ও পাওয়ার-স্টেশন নির্মাণ এর জন্য যা প্রয়োজন। জানা গিয়েছে পৃথিবীর কোথায় অরণ্যে আগুন লেগেছে, কোথায় আছে জলের নতুন উৎস এবং কোন দিকে সেই জলের প্রবাহ। জানা গিয়েছে সমুদ্রের খবর, সমুদ্রের স্রোতের প্রবাহ, লবণতা, স্বচ্ছতা ও সমুদ্রতলের খাদ ও পাহাড়ের হদিশ। জানা গিয়েছে সমুদ্রের কোথায় কোথায় আছে মাছের ঝাঁক এবং এমনকি কোন প্রজাতির মাছ। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত এই সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যেই ধীবররা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন।

আবহওয়ার পূর্বাভাস দেবার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার ইতিমধ্যেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। তা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছেন কৃষক বিমানচালক ও জাহাজচালকরা। কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ ঝড় ও টাইফুন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সম্পর্কে

আগে থেকেই খবর পাওয়া যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানি হ্রাস করা যাচ্ছে।

বহু দেশের বিজ্ঞানী এখন মহাকাশ-অভিযানে ব্যাপৃত। তাঁদের প্রয়াস প্রভূত পরিমাণে ফলপ্রসূ। পৃথিবীর কাছাকাছি বহু সামনুষ্য মহাকাশযান স্থাপিত হয়েছে এবং তার সহায্যে বহু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রিত লুনোখোদ-১ ও লুনেখোদ-২ চাঁদের মাটিতে অনুসন্ধানী কাজ চালিয়েছে। আমেরিকান নভশ্চরেরা চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছেন। বিশেষ উল্লেখের বিষয়, সোভিয়েত আন্তঃগ্রহ স্বয়ংক্রিয় স্টেশন ভেনেরা-৯ ও ভেনেরা-১০ এই প্রথম শুক্রগ্রহের কৃত্রিম উপগ্রহ হতে পেরেছে এবং তা থেকে অবতরণ-যান অলতোভাবে শুক্রগ্রহের মাটিতে নেমেছে। অবতরণ-যান থেকে এই প্রথম শুক্রগ্রহের উপরিতলের আলোকচিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

মহাকাশ-গবেষণার বিরাট সম্ভাবনা ও পরীক্ষাকার্য, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তার গুরুত্ব, মহাকাশ-অভিযানের নিরপত্তা ইত্যাদি তোলা ও এমনি আরো অনেক কিছুর জন্য মহাকাশ গবেষণার কর্মসূচীকে সমর্থিত করার প্রয়োজনীয়তা আছে। এথেকে বোঝা যায় মহাকাশ-অভিযানে কেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও ভারতের সহযোগিতা ক্রমবর্ধমান।

য়ুরি গাগারিন লিখেছিলেন 'কক্ষপথে স্থাপিত মহাকাশযান পৃথিবীকে আবর্তন করতে গিয়ে আমি দেখেছি আমাদের এই গ্রহ কত সুন্দর। অসুন, এই সৌন্দর্যকে আমরা রক্ষা করি ও বাড়িয়ে তুলি এবং কখনো যেন ধ্বংস না করি!'

পনেরো বছর আগে মহাকাশের দিকে মানুষের যে জয়যাত্রার শুরু তার প্রবর্তক তিনি। যে মহাকাশযানে তাঁর যাত্রা, সেটাকে আজ থেকে কয়েকশো বছর পর হয়তো খুবই ছোট মনে হবে, পৃথিবীর চারদিকে তাঁর একটি আবর্তনকে মনে হবে খুবই সামান্য—তখনো কিন্তু অন্য জগতের উদ্দেশে যাঁরা যাত্রা করছেন তাঁদের কাছে একটি স্মরণীয় নাম হয়ে থাকবে য়ুরি গাগারিন। (সোভিয়েত বিজ্ঞানী ওয়েবসাইটের একটি লেখা থেকে)।

য়ুরি গাগারিনের একটি উক্তি

১৯৬১ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে য়ুরি গাগারিন ভারত সফর করেন। সে-সময়ে ভারতীয় তরুণদের একটি সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, আমি এমন এক মহাকাশযান চোখে মহাশূন্যে পাড়ি দিতে চাই যার যাত্রীদের মধ্যে থাকবে বহু দেশের তরুণ। এটি হবে এক শান্তিপূর্ণ গবেষণা-মূলক মহাকাশযান। আসুন আমরা এই স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার জন্য একসঙ্গে কাজ করি। হয়তো আমাদের পৃথিবীও মহাশূন্যে ধাবমান এমনি এক মহাকাশযান ছাড়া কিছু নয়। এই মহাকাশযানে আমাদের সকলের সকল মানুষের। একই মহাকাশযানের যাত্রী হিসেবে আমরা যেন শান্তি ও মৈত্রীতে থাকতে পারি।

চিলির সামরিক জুন্টার আমলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ লুপ্তপ্রায়

চিলিতে সামরিক জুন্টার শাসনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বহুলাংশে খর্ব হয়ে গিয়েছে। এই খবর দিয়েছেন বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় সার্ভিস ও চিলি অ্যাকাডেমিকস। 'নিউ সায়েন্টিস্ট' পত্রিকায় ১৮ মার্চ তারিখের সংখ্যায় খবরটি প্রকাশিত।

খবরে জানা যায়, জুন্টার শাসনের প্রথম বছরে ৪২ শতাংশ ইঞ্জিনীয়র ও ১৪ শতাংশ বিজ্ঞানী কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। এঁদের এক-তৃতীয়াংশ দেশত্যাগী। যাঁরা থেকে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৮২ শতাংশ অ-কারিগরী কাজ নিয়েছেন। চিলির বিখ্যাত রয়্যালজি সোসাইটির ৩০ শতাংশ সদস্য এখন আর দেশে থাকেন না।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এত অধিক ব্যক্তির কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ সৃষ্টি হয়েছে জুন্টার এই সিদ্ধান্ত থেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলিত হবে অর্থনীতির অন্যান্য শাখার মতো অবাধ বাজারের নীতিতে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সরকারি অনুদান প্রায় বন্ধ এবং ছাত্রদের বেতন প্রচণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানকভাবে কমে গিয়েছে শিক্ষা জগতে কর্মনিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন। খবরে জানা যায়, যে-সব ইঞ্জিনীয়র কাজ ছেড়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ ছেড়েছেন রাজনৈতিক কারণে, ৬০ শতাংশ কম বেতনের জন্য, ১২ শতাংশ গবেষণার উপকরণ না থাকার জন্য।

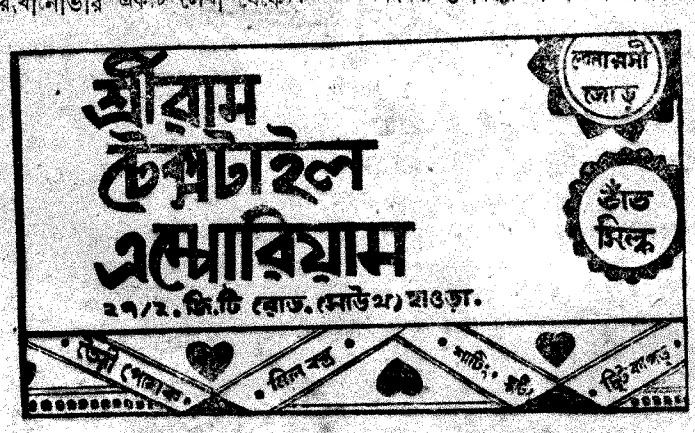

চিলির স্বাধীন প্রযুক্তিবিদ্যা গড়ে তোলার যে প্রয়াস গত এক-দশক ধরে চলছিল—যেমন দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, তামার খনিতে কাজ করার নিজস্ব কৃৎকৌশল—তার অবসান ঘটছে।

এই অবস্থার মূলে অর্থনৈতিক কারণ তো আছেই, কিন্তু রাজনৈতিক নির্যাতনও কম দায়ভারে ধারণী নয়। সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করতে শিক্ষকদের নিষেধ করা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠছে সেই সমাজের এক অন্ধকার রমরমার প্রতিফলন যথা স্বেচ্ছাচারিতা, বিধিনিষেধ, মনন-বিরোধিতা অসহনশীলতা ও শাসকদের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগতাই হচ্ছে নীতি।'

রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে, বিচ্ছিন্নভাবে দু-একটি বৈজ্ঞানিক কাজ হচ্ছে বটে, কিন্তু তাও লোপ পাবার দিকে। যে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার ও ব্যক্তিগত মালিকানার একাধিপত্য সেখানে এমনটিই হয়ে থাকে।

গর্ভরোধী ভ্যাকসিন

কোনোরকম কাটাছেরা নয়, রোজ পিল খাওয়া নয়, শুধু একটি ইঞ্জেকশন নিয়েই বছরখানেকের মতো গর্ভধারণ করা যাবে—এমনি একটি গবেষণা সফলতার দিকে চলেছে। খবরটি জানিয়েছেন সারা ভারত চিকিৎসা বিজ্ঞান ইন্সটিটিউটের ডাঃ জি পি তলওয়ার ও তাঁর সহকর্মীরা।

এই ইঞ্জেকশন নেবার পরেও জরায়ুতে ডিম্ব নিষিক্ত হবার ব্যাপারটি ঠিকই ঘটে, মেটি ঘটলে পরে তবেই গর্ভসঞ্চার। কিন্তু ইঞ্জেকশন নেবার ফলে এমন একটি হরমোন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় যে পরবর্তীকালে গর্ভাবস্থা বজায় থাকতে পারে না। এই হরমোনটিকে সংক্ষেপে বলা হয় এইচ সি জি। গর্ভাবস্থা বজায় রাখা ও তাকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজ এই হরমোনটির দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই হরমোনের নিঃসরণ সাধারণত ডিম্ব নিষিক্ত হবার ৬ থেকে ৮ দিন পরে।

গবেষণার বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে হরমোনটিকে নিষ্ক্রিয় করা হয় হরমোন-বিরোধী একটি অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। কাজটি সহজ ছিল না। এমনিতে হরমোনটি শরীরের মধ্যেই নিঃসারিত হচ্ছে, অতএব শরীরের পক্ষে স্বাভাবিক পদার্থ। অতএব বর্জিত হতে পারে না। পদার্থটি যদি বহিরাগত হয় একমাত্র তখনই বর্জিত হতে পারে। অর্থাৎ শরীরের মধ্যে বর্জনের একটি আয়োজন তৈরী হয়ে যায়। এই আয়োজনটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি।

তখন এইচ সি জি হরমোনকে বহিরাগত একটি পদার্থ হিসেবে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হয়। কিভাবে? না, অ্যাটিটিটনাস ভ্যাকসিনে যে পদার্থটি ব্যবহৃত হয় যার নাম টিটেনাস টকসায়েড, সেটির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় এইচ সি জি হরমোনের একটি টুকরো। এমনভাবে বহিরাগত পদার্থের ছদ্মবেশ নিয়ে এইচ সি জি হরমোন শরীরে প্রবিষ্ট হবার পর তার বিরোধী অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়ে থাকে।

ডাঃ তলওয়ার বলছেন, উৎপন্ন এই

পুনশ্চ

পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজে বার্ধক্যে বারাণসী প্রভৃতি বচন প্রাচীন গ্রন্থসমূহে কথিত আছে। সংসার বা গার্হস্থ্য আশ্রম থেকে আউট হয়ে যাওয়ার কথাই প্রকৃত-পক্ষে এর মধ্যে ব্যক্ত করেছেন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা

মানুষের শরীরজ দশদশা, যথা—গর্ভ-বাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থাবীর্য জরা প্রাণরোধ ও বিনাশ প্রভৃতির মধ্যেও অবশ্য বৃদ্ধ (জরা) বয়সের মর্যাদা যে উল্লিখিত হয় নি তা নয়—তিন মাথা যেখানে বুদ্ধি নেই সেখানে, বুড়ো হাড় ভেল্কি খেলে, বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে উপস্থিত, প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচনের দৃষ্টান্তও আছে ভূরি-ভূরি।

কিন্তু আসলে জীবনের এই শেষ পরিণতি বার্ধক্যের দশা যত প্রকার অভিজ্ঞতা-পুষ্টই হোক আর যত সম্মানেরই হোক, সাধারণ মানুষ একে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। শাশ্বত যৌবনের আকৃতি নিয়ে তখনও সে জরাকে জয় করতে চায় ঢাকতে চায় তার শুভ্র কেশ ও লোল চর্মকে। কায়ক্লেশের সাহায্যে, আধুনিক হরমন প্রভৃতি চিকিৎসার মাধ্যমে অথবা কোন যৌগিক প্রক্রিয়ায় চায় দেহা-বয়বের উপর পরিণত বয়সের সকল প্রকার ছাপকে বিনষ্ট করে তারুণ্যকে প্রকট করে তুলতে। এর জন্যে সমগ্র পৃথিবী জুড়েই হাহুতাশের যেমন অন্ত নেই তেমনি আছে অনন্তকাল যৌবনকে ধরে রাখার জন্য উদভ্রান্ত প্রচেষ্টা।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এই পঞ্চভৌতিক দেহ দু দিন আগে বা পরে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে ক্ষীয়মাণ জগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই একদিন আবার পঞ্চভূতেই মিশে যাবে তাতে আর ভুল কি!

তবু মানুষের যে বার্ধক্য সম্পর্কে নিদারুণ ভীতি যে বার্ধক্যকে সে অস্বীকার করতে চায়, সেই বার্ধক্য সম্পর্কে একটি উপভোগ্য, নিবন্ধের অংশবিশেষ এখানে আমরা প্রাচীন প্রবাসী পত্রিকার ১৩১৭ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি বিশেষভাবে আমাদের প্রবীণ পাঠকবর্গের জন্য। নিবন্ধটির লেখক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ঘোষ।

। বার্ধক্য ।

চাহার দর্বেশ নামক প্রসিদ্ধ উপন্যাস-গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে রুমের বাদশাহ আজাদ বখত দর্পণে মুখ দেখিতে দেখিতে একদিন একগাছি চুল দর্শনে মৃত্যুর দূত উপস্থিত ভাবিয়া বিষম শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। এই গল্পটি নিতান্ত অমূলক নহে। এমন মধ্যবয়স্ক বা প্রৌঢ় ব্যক্তি নাই যাঁহার জীবনে আজাদ বখতের দশা কিয়ৎ পরিমাণে ঘটে নাই। মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র জরা রাক্ষসীর ক্রোড়ে আশ্রয়লাভ করে বটে এবং জন্মদিন হইতেই তিল তিল করিয়াই মৃত্যুর অভি-মুখে অগ্রসর হইতে থাকে বটে কিন্তু শিশুর সুকোমল কপোলে কিম্বা তরুণের নিটোল ললাটে মৃত্যুর পদাঙ্ক সহজে দৃষ্ট হয় না। অতুল বিভবের উচ্ছৃঙ্খল উত্তরাধি-কারী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না এবং মনেও ভাবে না যে অপব্যয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও একদিন রিক্ত হইতে পারে, সেই-রূপ জীবনের নববসন্ত-সমাগমে মানুষ জীবন-ব্যাঙ্কের উপর অবাধে চেক কাটিতে থাকে এবং ওভার-ড্রায়িংএর আশঙ্কাকে মনেও স্থান দেয় না।

এই রমণীয় ঋতুর প্রভাবে মানুষ অজ-রামরবৎ অদম্য উদ্যমের সহিত সংসার-ক্ষেত্রে ধাবমান হয় ও অপরিসীম আশার ভিত্তির উপর বিচিত্র কল্পনাপুরী নির্মাণ করিতে থাকে। মনে করে সে বুঝি কালের একাধিপত্যের বহির্ভূত। কিন্তু হায়! এক দিন হঠাৎ তাহার এই ভ্রম দূর হয়। হঠাৎ দেখে তাড়মান বীণার তার ছিঁড়িয়াছে হঠাৎ অনুভব করে বাহুবল শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, দৃষ্টির আর সে তীক্ষ্ণতা নাই, পদযুগের আর সে ক্ষিপ্রগতিত্ব নাই মস্তিষ্কের আর সেরূপ কার্যকারিতা নাই আশার আশুগতিও মন্দীভূত হইয়াছে, জীবনের খরস্রোতে ভাটা পড়িয়াছে। সংক্ষেপতঃ সে বার্ধক্যের সীমান্তে পদার্পণ করিয়াছে।

এই পদার্পণ যে একদিনে ঘটে তাহা বলিতেছি না—ইহা নিশ্চয়ই বহুদিন-সাপেক্ষ কিন্তু ইহার উপলব্ধি অত্যন্ত অতর্কিতভাবে ও সহসা ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে আমরা সচরাচর কর্ম-ক্ষেত্রে নিজশক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করি না উহার চরম সীমার পরিচয় কেবল নিতান্ত দুরূহ ব্যাপারেই পাওয়া যায় সুতরাং সামর্থ্যের সমধিক অপচয় না হইলে শনৈঃসঞ্চিত শক্তির লাঘব সহজে ধরা পড়ে না এবং তাহাও কোন বিশেষ ঘটনা-সাপেক্ষ।

আর এক কথা—মানুষ -প্রকৃতিই এই যে নিজের হীনাবস্থা কেহ সহজে বিশ্বাস বা উপলব্ধি করিতে প্রস্তুত নহে এরূপ অপ্রীতিকর সত্য অনেক সময়ে আমরা অপরের মুখ হইতে প্রথমে অবগত হই। আমার নিজের জীবনী হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। কয়েক বৎসর অতীত হইল আমি একদিন সায়ংকালে লালদীঘির ধারে ট্রামগাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। গাড়ী আসিলে উহাতে উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলাম ও চালককে গাড়ী থামাইতে বলিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রম অথবা চালকের অনবধানতা-বশতঃ গাড়ীর বেগ একেবারে থামিল না এবং আমারও গাড়ীতে উঠা অসম্ভব হইল। আমার দুরবস্থা দেখিয়া একজন দয়াশীল আরোহী কণ্ডাকটারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, গাড়ী একেবারে বাঁধো দেখিতেছ না বুড়া মানুষটি উঠিতে পারিতেছে না।

কথাগুলি আমার কর্ণে শেল বিদ্ধ করিল এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে আমার হৃদয় বিরাগে ভরিয়া গেল। আমি আজাদ বখতের ন্যায় সহসা মৃত্যুর ছায়া দেখিতে পাইলাম। এই ঘটনার অল্পদিন পরে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যদ্দ্বারা নিজের বার্ধক্যকল্পনা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া গেল। এখন বার্ধক্যের বিজয়-পতাকা শিরোদেশে বাঁধিয়া প্রশান্তচিত্তে এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি।

একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বলেন যে যৌবনই মনুষ্যের স্বাভাবিক ও নিত্য অবস্থা যৌবনের বহ্নি বার্ধক্যের ভস্ম-দ্বারা কেবল ঢাকা থাকে মাত্র। এই সত্যটির পূর্ণ পরিচয় প্রতিভাশালী ব্যক্তিমাত্রের জীবনে পাওয়া যায়। কি এক চির-বিকশিত সৌন্দর্যবোধ লইয়া তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন যে, বিশ্বসংসার তাঁহাদের চক্ষে নিত্য নবীন—'নবের নব নিত্যই নব।' তাঁহাদের চিরপ্রজ্বলিত উৎসাহানল রোগে, শোকে দারিদ্র্যে বার্ধক্যে কিছুতেই নির্বাপিত হয় না। বাস্তবিক উৎসাহ-শীলতা যেমন যৌবনের একটি প্রধান লক্ষণ তেমনি উৎসাহহীনতা বার্ধক্যের শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। মানুষ উৎসাহ-ভঙ্গে যত বুড়া হয় এমন আর কিছুতেই নয়। মিসরের প্রাচীন রাজ-সমাধির মধ্যে পরচুলা পাওয়া গিয়াছে। অতি প্রাচীনকালেও চুল কলপ লাগাইয়া লোকে বার্ধক্য ঢাকিবার চেষ্টা করিত। বরাহ-মিহির-কৃত সংহিতাতে কলপ প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে বিবৃত আছে। কিন্তু যদি যথার্থ চিরযৌবন লাভ করিতে চাও, তবে কলপ বর্জন করিয়া যত্নপূর্বক হৃদয়ে উৎসাহ ও আনন্দ পোষণ কর। (ক্রমশঃ)

সম্পাদক

ডাঃ রেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌন বিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী • ৩৫ এ, সুরেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
আজকাল ৮৲ টাকায় পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

আর নতুন করে কিছু হওয়ার আশা নেই।

মা অনিষ্ঠ স্নেহভাজনের সুরে বলেছিল, আহা চেষ্টা করলে তুমি যেন আর পার না কিছু করতে।

একটা 'শমীর পৃথিবী' তৈরী করার অনুরোধ জানিয়ে পরলোক থেকে রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ তনয় পিতার প্রতি ঠিক এইরকম নির্ভরতা প্রকাশ করেছিল, 'আহা তুমি আবার পার না।'

বাবা খানিকক্ষণ চুপচাপ তাকিয়েছিলেন মায়ের দিকে। আমি কাছাকাছি ছিলাম। আমাকে হাত বাড়িয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই পাশে বসালেন। মা বলল—ওকে ছেড়ে দাও। ও খেলতে যাবে।

তখন আমার খেলতে যাওয়ার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। বাবার পাশে বসলাম।

শীত-সম্পর্কিত
রূপসী
মেরারসী ও সিল্ক শাড়ী
৩২ জি. টি. রোড (সেরামপুর) হুগলী

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা দূরত্ব তৈরী হয়ে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে আমার বিরোধ ছিল না কোনো। তবুও। সেই ক্লাস নাইন-টেনের সময় থেকে আর কখনো বাবার শরীর ঘেঁষে বসিনি। বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা অজ্ঞাত বিপদের চিত্র এঁকে নিয়ে মনে মনে খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন—কষ্ট করতে পারবি তো?...জামা-প্যান্ট যদি কম হয়, শুধু ডাল-ভাত যদি জোটে...

বুকের ভেতর হু-হু করে উঠল। বাবা এই স্বরে এমনভাবে এবং এই-রকম অজ্ঞাত বিষয় নিয়ে কখনো কোনো প্রশ্ন করেননি। কিছু না ভেবেই বললাম?হ্যাঁ পারব।—

আমি তখন অবুঝ নই। ষোলো-সতের বছর বয়স। সাব কলেজে ভর্তি হয়েছি।

লক-আউট হলে যা হয় কোনো টাকা-পয়সাই পাওয়া গেল না। বাবা অনেক ভেবে-চিন্তে গুড়-মুড়ি চিড়ের দোকান দিলেন আমাদের স্টেশনে যাওয়া-আসার পথের ধারে। এতকাল যারা ট্রেনে যাতায়াতে সহযাত্রী ছিল সহানুভূতি দেখিয়ে তারাই এগিয়ে এল সবার আগে। কেউ গুড় কিনল। কেউ মুড়ি কিনল। কেউ অফিসে রুটি আর বাতাসা খায়। বাতাসা নিয়ে গেল বাবার দোকান থেকেই। চশমা চোখে ফর্সা নতুন ব্যাঙ্কের সেই অফিসার ভদ্রলোক বলল—দিন তো বোসবাবু পাঁচ'শ চিঁড়।...আমার আবার সাংঘাতিক কন্সটিপাসন কিন্তু কি করব চিঁড়েটা আমার অনেকদিনের অভ্যেস।

প্রথম প্রথম দোকানটা চলছিল বেশ ভালই। কিন্তু মধ্যবিত্তের ঘরে তো আর জমা টাকা খুব একটা থাকে না অতএব দোকানটা দেওয়ার সময় বাবা কিছু ধার দেনা করেছিলেন। এবং মালিকপক্ষ কবে লক-আউট তুলে দেয় মনে মনে সেই আশায় তা দিচ্ছিলেন। দোকানের বিক্রির থেকে ধারের সমস্ত টাকা একবারে শোধ করা যায় না, তা হলে মূলধন কমে আসে। আবার এদিকে অনেকে বাকিতে জিনিস কেনা শুরু করেছে। তাদেরও দেব না বলা যায় না। বললে খদ্দের কমে। অতএব দোকান থেকে লাভের পরিমাণ একদম কমে যেতে লাগল। আর কবে আবার অফিস খুলবে সেই আশায় দিন গুণতে লাগল বাবা। মায়ের প্ররোচনায় এতদিনকার কাজের দক্ষতার কথা উল্লেখ করে নতুন নতুন জায়গায় চাকরীর দরখাস্ত করতে লাগল সেই সঙ্গে।

প্রত্যেক দিনান্তের সঙ্গে আমার ওপরের দিদি এবং আমার ছোট বোনের আগামী সুখের দিনগুলো কোথায় যে ভেসে যেতে লাগল। আমি তখন কলেজে পড়ি। ফার্স্ট ইয়ার। আমার কলেজের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হলুদ রঙা গঙ্গা। আমার দিদি আর দুটো বেশী টিউশনি করছিল। আমার বোন অনর্গল পড়ছিল পরীক্ষা দেবে বলে। আর আমি চকচকে চোখে তাকাচ্ছিলাম সেই সব ছেলেদের দিকে, যাদের বাবা-দাদারা ভাল চাকরী করে, সেইসব ছেলেদের দিকে যারা ভাল জামাকাপড় পরে সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার লোভে। আমার তখন সতের বছর বয়স।

বাবাদের সঙ্গে চাকরী করতেন সান্যাল বাবু। তিনি একদিন ভুল করে আমাদের বাড়ীতেই চলে এসেছিলেন ভিক্ষে চাইতে। ভুল করেছিলেন কি?—মনে হয় না। আমিই তাঁকে কাকা বলে ডেকেছিলাম। মা আসন পেতে বসিয়েছিল। আমাদের সেই পুরনো বড় কাঁসির থালায় মোটা ভাত ডাল শাক-ভাজা এইসব খাইয়েছিল। বেশ কিছুকাল বাদে সেই সান্যালবাবুকে দেখেছিলাম, তিনি তখন পাগল। ছেলেরা তাঁর দিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। অন-

সংগ্রহ করুন
রবীন্দ্রপক্ষে বিশেষ সুযোগ
গিরিশ রচনাবলী
(পাঁচ খণ্ডে সমগ্র রচনা)
মহাকবি নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন্দ্র রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য; অন্য খণ্ডগুলি ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। জীবনী, সাহিত্য-সাধনা ও কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ খণ্ডে খণ্ডে সন্নিবিষ্ট, প্রতি খণ্ডে কয়েকটি আর্টপ্লেট। লাইনো হরফে ম্যাপলিথো কাগজে সুন্দর ছাপা, মনোরম প্রচ্ছদ। প্রতি খণ্ডের মূল্য পঁচিশ টাকা। কবিপক্ষে, অর্থাৎ ৬ মে হইতে ২০ মে'র মধ্যে মোট একশ' টাকায় পাঁচ খণ্ড পাবেন, অথবা যে-কোন খণ্ড কুড়ি টাকায় পাবেন।
এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বইগুলিতে শতকরা পনর টাকা হারে ছাড় পাবেন :
* রবীন্দ্র চিত্রকলা—মনোরঞ্জন গুপ্ত [১৫-০০] * রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী—তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় [৪-৫০] * রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি—ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া [১০-০০] * ঠাকুরবাড়ীর কথা—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় [১২-০০]।
সাহিত্য সংসদ ঃ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা ৯। (৩৫-৭৬৬৯)

অরুণ দাসগুপ্তের চিত্রকলা

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরবার পর অধিকাংশ শিল্পীর জীবনে যা ঘটে থাকে অরুণ দাশগুপ্ত তার ব্যতিক্রম নন। কৃতী ছাত্র হিসেবে কলেজে অনেক পুরস্কার প্রশংসা কুড়িয়েছেন। কিন্তু কলেজের চৌকাঠ পেরিয়ে পুরো একটা বছর কাটিয়েছেন কাজের অন্বেষণে। এখন মোটামুটি স্থিতাবস্থা। প্রতিষ্ঠিত। বোম্বাইয়ের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে নামডাকও যথেষ্ট।

সম্প্রতি অরুণ কলকাতার অ্যাকাদমি অফ ফাইন আর্টসে তৃতীয় একক চিত্রপ্রদর্শনী করে গেলেন। এর আগে ১৯৭০ সালে বোম্বাইয়ের কুমারস্বামী হলে ও ১৯৭৪ সালে তাজ আর্ট গ্যালারীতে শিল্পীর ওয়ানম্যান শো হয়েছে। স্থায়ীভাবে না হলেও অরুণ এখন মোটামুটি বোম্বাইয়ের বাসিন্দা।

ওয়াটার কালারের কাজে ও স্কেচ অঙ্কনে পারদর্শী হলেও সম্প্রতি অরুণ তৈলচিত্রাঙ্কনের দিকে ঝুঁকেছেন। এই প্রদর্শনীতে বেশ বড় আকারের দশটি তৈলচিত্র তিনি সাজিয়েছিলেন। ব্যথাদীর্ণ শূন্য জীবনের মধ্যে তিনি সংগীতের যে সুরঝঙ্কার শুনেছেন তাকে ব্যঞ্জনায় মন্ডিত করেছেন চিত্রে। শিল্পী অপ্টিমিস্টিক বলে অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়েছেন। আলো পেয়েছেন সূর্যের কাছ থেকে। এই আলোতেই শিল্পীর চেতনা রঙীন এবং আলোকিত চেতনার রূপান্তর ঘটেছে প্রতীক হিসেবে। যেন সূর্যের সাত ঘোড়ার গতির প্রেখ্যাপণ লক্ষ্য করা যায় দ্রুতচারী রেখার বিন্যাসে। দরিদ্র মেয়েদের অন্তঃপুরের অন্তর্বেদনার সকরুণ চিত্র মুক্তিলাভ করেছে শিল্পীর তুলিতে। ফলওয়ালী মাছওয়ালী, অসহায় বিধবা মা ইত্যাদি শিল্পীর চিত্রকল্পনার চরিত্র। ডেসপেয়ারে দেখিয়েছেন কয়েকটি শূন্য খাঁচার সামনে এক বর্ষীয়া মহিলার বিবর্ণ চেহারা। অর্থাৎ তার মনের মণিকোঠায় যেসব উজ্জ্বল আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল আজ তা অন্তর্হিত। গসিপ-চিত্রে তিন মহিলার অস্ফুট যন্ত্রণাকাতর কানাকানির মধ্যে অসহায় ভাবটি সার্থকরূপে ফুটে উঠেছে। কোয়েসট-এ আলোকিত পিপাসায় ক্রন্দসীর করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। ভয়েড-এ শূন্য কলসীকে প্রতীকরূপে

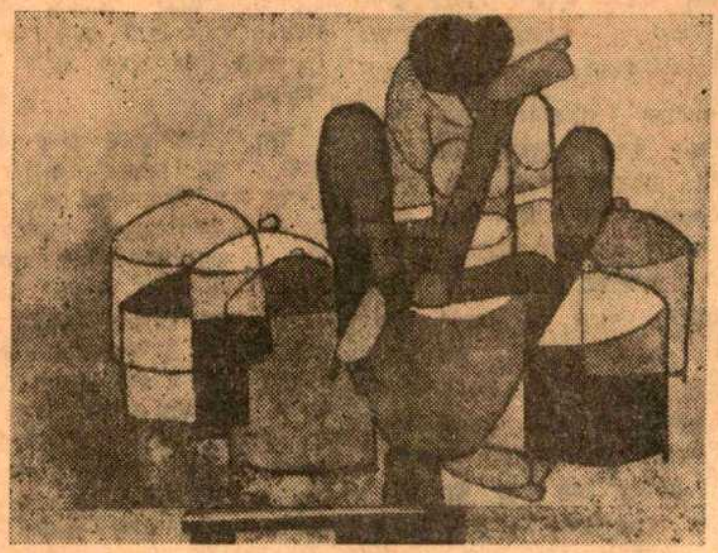

ডেসপেয়ার শিল্পী : অরুণ দাশগুপ্ত

ব্যবহার করে শিল্পী দেখিয়েছেন কেমন করে মানুষ ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হয়ে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে ধীর ধীরে।

তবে আগেই বলেছি শিল্পী আশাবাদী। নিদারুণ হতাশার মধ্যেও শিল্পী সূর্যস্নাত হয়ে নতুন জীবনের অন্বেষণ করেছেন। অধিকাংশ চিত্রেই তাই শিল্পী ব্যবহার করেছেন সূর্যকে বাঁচার প্রতীকরূপে। আশার আলোরূপে।

চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী হলে চৈতন্য কলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল। মোট প্রায় ত্রিশজন শিল্পীর কাজ ছিল এখানে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লীর ললিতকলা অ্যাকাদমি অনুমোদিত উত্তরপাড়ার এই শিল্পসংস্থার নামকরণ হয় অবনীন্দ্রঅনুরাগীদের অন্যতম শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের নামানুসারে। তিনিই এই সংস্থার আচার্য এবং শিক্ষক।

শ্রীচৈতন্যদেবের শিল্পশিক্ষার হাতেখড়ি এবং ক্রমবিবর্তন ঘটে অবনঠাকুরের হাতে। কিন্তু তাঁর রূপবিদ্যার পরিণতি হয় সত্যের সন্ধানে, সত্য দর্শনে। তাঁর সাম্প্রতিক চিত্রাবলী সজ্ঞান কল্পিত নয়। ধ্যানলব্ধ। রূপের আড়ালে অরূপকে তিনি অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত করেছেন তাঁর চিত্রে। তাঁর আইকন পর্যায়ের চারটি কাজ চোখ মেলে দেখার মত। অসাধারণ এসব চিত্রাবলী ড্রইং ব্যতীতই প্রত্যক্ষভাবে তুলির টানে বাঙময়। চৈতন্যবাবু কয়েক বছর সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রকৃতই সাধকশিল্পী। এখন থাকেন গঙ্গার ধারে এক গৃহে। সাধন ভজন করেন। ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কনবিদ্যা শেখান। আর তাপস মনের অবচেতনে যে ধ্যানলব্ধ রূপ দর্শন করেন তাকেই চিত্রিত বিচিত্রিত করেন চিত্রপটে ঐকান্তিক সাধনায়।

এই প্রদর্শনীতে অধিকাংশ শিল্প নিদর্শনে চৈতন্যবাবুর প্রভাব চোখে পড়ে। বৈদ্যনাথ দাসের কালবৈশাখী, বসন্ত কিংবা বাণীনাথ ঘোষের কালী মহাকালী প্রভৃতি চিত্র চৈতন্যবাবুর প্রভাব লক্ষ্য নয়। কাজগুলো অবশ্যই ভাল। শুকদেব চট্টোপাধ্যায় জলরংয়ের প্রতিকৃতি অঙ্কনে কৃতী শিল্পী। তাঁর আঁকা প্রতিকৃতি—দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ও প্রভাতমোহন মনে দাগ টানে। সুপ্রিয় রাহার পেন এ্যান্ড ইনক-এর চিত্রটি বলিষ্ঠ ড্রইং এ শিল্পগুণসম্পন্ন। সুমন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের এক ধুগল ও ভাগবতের আসর রসিকজন তৃপ্তি দেবে। সমীর মল্লিকের নিসর্গচিত্র ও সুনীল মুখোপাধ্যায়ের গ্রাম্যদৃশ্য সরস ও সুন্দর। অরুণকুমার গাঙ্গুলী ও মিহির রাহা হাত পাকিয়েছেন কোলাজের কাজে। মানিক সরকারের বিশ্রাম, মেছুনী কিংবা নীহাররঞ্জন বসুর রূপমুগ্ধা ও কালী সম্ভাবনার রীতিমত উজ্জ্বল। সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়ের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ভাল কাজের নমুনা। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের কতিপয় চিত্র দেখলাম স্কেচ খাতায়। তাঁর বলার নিজস্ব ভঙ্গী আছে। অঙ্গিকও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। দিলীপবাবুর ছেলে শ্রীমান বুম্বা প্রদর্শনীর কনিষ্ঠতম শিল্পী। বয়স ছ' বছর। আরও কিছু হস্তশিল্পও ছিল এই প্রদর্শনীতে।

মফঃস্বল কিংবা গ্রামাঞ্চলে চিত্র প্রদর্শনী ও শিল্পমেলার মাধ্যমে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে শিল্প সংস্কৃতির আদান প্রদান ও শিল্প পরিবেশ গঠনের অভিপ্রায়ে এই শিল্পসংস্থা বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করে থাকেন প্রতি বছর।

প্রশান্ত

বামনিসিনান পাহাড়ের ওপর থেকে দেখা হাতীর দল

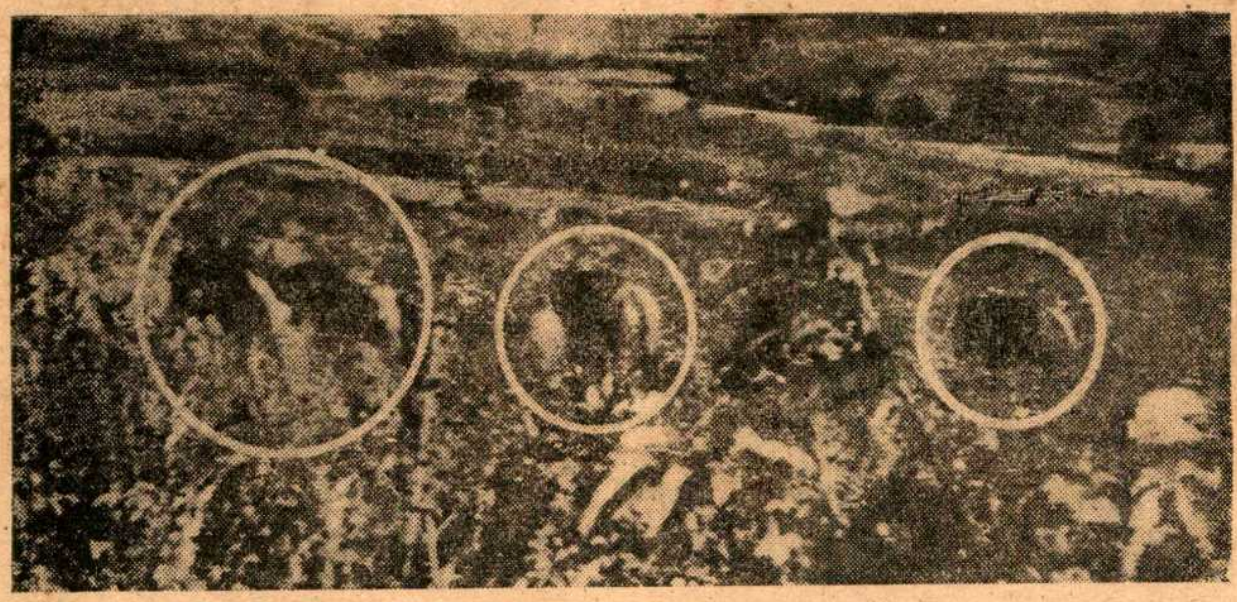

সরেজমিন সমীক্ষায় জানা গেছে যে হাতীগুলোর স্থায়ী ঠিকানা জামসেদপুরের কাছাকাছি দলমা অঞ্চলের পাহাড়। গত জুন মাসে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বাঁশপাহাড়ী জঙ্গলে হাতীর পাল পশ্চিম-বাংলায় ঢোকে। প্রথমে একটা বড় দাঁতাল এলাকাটা মোটমুটিভাবে ঘুরে দেখে যায়। কোনো কোনো গ্রামবাসী বলেছে ওটা নাকি সারা বছরই ওই অঞ্চলের বনে থাকে কিন্তু কখনো কারুর ক্ষতি করেনি। সেপ্টেম্বর মাসে বাংলা-বিহার সীমান্ত অঞ্চলে প্রথম বড় হাতীর দলের কথা শোনা যায়। দলটা মেদিনীপুরের বাঁশপাহাড়ী অঞ্চল থেকে বাঁকুড়া জেলায় ঢোকে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি। আন্দাজ ৪০—৪২টা হাতীর দল প্রতিদিন দলের জন্যে চাই প্রচুর খাবার অথচ এ অঞ্চলের বনে কোথাও যথেষ্ট হাতীর খাদ্য পাওয়া যায় না। বাঁকুড়ার খাতাম (বা খাটাম) অঞ্চলে এসে মূল দল চারটা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম দল বাঁকুড়ার ধানঝাড় অঞ্চলে যায়। দ্বিতীয় দল ছালতা-বেথুলার জঙ্গল হয়ে পুরুলিয়ার বড়রঙ্গ অঞ্চল ঘুরে ফেরার পথে রাণীবাঁধের উত্তরে বামনিসিনান পাহাড় পর্যন্ত যায়। তৃতীয় দল খাতামে থেকে যায় এবং চতুর্থ দলটা বাঁশপাহাড়ীর দিকে ফিরে যায়। কিন্তু কোথাও জঙ্গলে যথেষ্ট হাতীর খাবার নেই বলে সবকটা দলই এখানে-ওখানে ধানক্ষেতে নামে এবং মানুষদের তাড়া খায়।

সাধারণতঃ হাতীগুলি সারাদিন পাহাড়ী জঙ্গল থেকে দল বেঁধে চারদিকে নজর রাখে। মানুষজন কাছাকাছি এলেই তাড়া করে স্থানীয় লোকেরা কখনো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের আক্রমণ করেনি। হাতীগুলো সারাদিনের মধ্যে সামান্যই খাদ্য পায় অথচ জঙ্গলের সীমান্তে তখন মাঠে মাঠে পাকা ধান—হাতীর লোভনীয় খাদ্য। তাই সন্ধ্যেবেলা জঙ্গলের লাগোয়া ধানক্ষেত হাতী দলের প্রথম লক্ষ্য হয়। কিছু ধান (খড়সহ) খায় কিন্তু তার চেয়ে বেশী ধান ওদের গোদা-গোদা পায়ের চাপে মাড়িয়ে নষ্ট হয়। এদিকে সন্ধ্যেবেলা ওরা ধানক্ষেতে নামলেই তখন গাঁয়ের লোকজন ওদের তাড়া করে। এ সময় একদিন দুপুরে রাণীবাঁধের উত্তরে বামনি-সিনান পাহাড়ের ঢালে ওদের দ্বিতীয় দলটার সঙ্গে বর্তমান লেখকের 'দেখা' হয়ে গেল, ক্যামেরাও সে দৃশ্য ধরে রাখল।

খুনে প্রথম দলটাতে ছিল মোট বারোটা হাতী। ২৩ নভেম্বর রাতে দলটা ধানঝাড় হয়ে নিশ্চিন্তপুরের জঙ্গলে পৌঁছায়। এখানকার জঙ্গলে গাছগুলো ছোট ছোট, হাতীর পাল লুকিয়ে থাকার যোগ্য নয়। ইতিমধ্যে রাতারাতি চারদিকে খবর চলে গেছে যে বন হাতীর পাল এসেছে ফলে ২৪শে সকালের মধ্যে আশেপাশের গ্রাম থেকে প্রায় তিন-চার হাজার মানুষ হাতী দেখতে জঙ্গলের ধারে এসে জুটল। তাদের মধ্যে কেউ ঢোল বাজায় কেউ ঢল ছোঁড়ে কেউবা হাতীগুলোকে লক্ষ্য করে পটকা ফাটায়—দিনভর এমনি চলল। হাতীগুলো সারাদিন খাওয়া তো দূরের কথা ভালমত নড়াচড়া করারও জায়গা পায়নি। যে সব লোক হাতী দেখে মজা করতে এসেছিল সন্ধ্যার মুখে তারা পালাল। তখন হাতীর দল ফিরে যাবার পথ ধরেছে, মোটগদা-রাণীবাঁধ টেস্ট রিলিফ রোডে রাত্রি প্রায় আটটার সময় সেই ক্ষুধার্ত-বিরক্ত দলের সামনে পড়ল সুধীর ও কাঙ্গালী দাস। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কাঙ্গালী দৌড়ে পালাল। সুধীর পালালো না। হাতী তাকে আহত করে রাস্তার পাশে ফেলে চলে যায়। স্থানীয় মোটরচালক অশ্বিনীবাবুর জবানীতে 'হুবেক নাই কেনে—সুধীর যে নিশা খাঁয় ছিল এঁজ্ঞে। উগুলা যে হাতী উয়ার কি খিয়াল ছিলা?' কাঙ্গালী দাস পরে বলেছে যে সুধীর নাকি একটা হাতীর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। যাইহোক, আহত সুধীর পরেরদিন মারা যায়।

এছাড়া সব মিলিয়ে প্রায় চাল্লিশ একর জমির ধানের ক্ষতি হয়েছে। রায়পুরের দারোগা বলেছেন 'হাতীর দল প্রতিবছরই আসে। এ বছর একটা দুর্ঘটনা হয়েছে ঠিকই তবে ধানের ক্ষতি খুব বেশী হয়নি।' যে সব চাষীর জমির ধান হাতীর দল নষ্ট করেছে তাঁরা বলেছেন সরকার যেন লেভী ছাড় দেন এবং অসময়ে রিলিফের ব্যবস্থা করেন। এখানকার সাধারণ মানুষ হাতীকে দেবতা বলে মনে করে। হাতী যতই চাষ-বাসের ক্ষতি করুক তার প্রতিশোধ নিতে হাতী ধরা মারায় তাঁদের সকলেরই তীব্র আপত্তি আছে।

ডিসেম্বর মাসের শেষেরদিকে উত্তর-বাংলার বিখ্যাত হাতী-বিশেষজ্ঞ প্রকৃতীশ বড়ুয়া (লালজী কে বাঁকুড়ার উপদ্রুত অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখানো হয়েছিল। তিনি 'মেলা-শিকার' করে কিছু হাতী ধরে দিতে পারবেন কিন্তু তাতে অনেক খরচ পড়বে। তাঁর মতে এখানকার হাতীগুলি উত্তর-বাংলার হাতীর চেয়ে অনেক শান্ত। মেলা শিকারের ফলে এখানকার হাতীর দল উত্তাক্ত হলে বিপদ বাড়তে পারে।

হাতী সংরক্ষণ বিষয়ে বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিলের বিশেষজ্ঞ দল এ অঞ্চল ঘুরে দেখতে চেয়েছেন, কারণ এখানে হাতীর অভয়বন (এলিফ্যান্ট স্যাংচুয়ারী) তৈরী করার জন্যে আর্থিক সহযোগিতা করতে তাঁরা রাজি হতে পারেন, অবশ্য সে অভয়-বন তৈরী হলে বিহারও পশ্চিমবাংলা দুরাজ্যেরই কিছু অংশ জুড়ে সেটা তৈরী হবে।

ফুটবলে 'চীনের প্রাচীর'

গোষ্ঠ পাল নেই। চিরকালের মতো চলে গেলেন। ভাবতেই যেন কেমন লাগে! বয়স হয়েছিল সাতাত্তর, তবুও তিনি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন। মাঠের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছিল বটে। কিন্তু তাঁর কায়িক উপস্থিতি ঘিরে আশ্বাস কিছু কম ছিল না। পরিবারের কর্তা বিদেশ গেলেও তাঁর কর্তৃত্ব শিথিল হয় না। গোষ্ঠ পাল মাঠ থেকে সরে গেলেও মাঠের অভিভাবকত্ব তাঁর হাত থেকে অন্যত্র সরে যায়নি।

হঠাৎ দেখা হয়ে যেত তাঁর শারীরিক কুশল সংবাদ জানতে যাওয়ার আগে তিনি নিজেই মাঠের খবর জেনে নিতেন। খেলা-ধুলো কেমন চলছে? ভাল খেলছে কারা? মাঠের আবহাওয়া ভালর দিকে এগোচ্ছে তো? কতো প্রশ্নই যে তিনি রাখতেন। শরীর যেমন হোক, দু' চোখ তাঁর খোলা ছিল মাঠের দিকে চেয়েই। শেষ দিকে বৎসরান্তে একবার গড়ের মাঠে হাজিরা দিতেন ভেটারেন্স স্পোর্টস ক্লাব মনোনীত বর্ষশ্রেষ্ঠ ফুটবলার ও স্কুলের সেরা খেলোয়াড়ের হাতে পুরস্কার তুলে দিতে। এইটুকুই ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তবু মাঠের মানুষ আমরা সদাই তাঁর উষ্ণ অস্তিত্ব অনুভব করতাম। জানতাম, মাঠের ভালমন্দ নিয়ে দূরে থেকেও তিনি ভাবছেন। মন্দ কিছু ঘটে গেলে মৌন তিরস্কারে গড়ের মাঠকে গার্জেন হিসেবে দেখছেন। মাঠের এমন অভিভাবক আর কোনো দিন চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যাবে না। এ কি কম দুর্ভাগ্যের কথা!

গোষ্ঠ পালের নাম তো শুধু আমাদের খেলার জগতের সঙ্গেই নয়, বাঙ্গালীর মূল জীবনের সঙ্গেই একান্ত হয়ে গেঁথে গেছে। তাই দুঃসংবাদকে চরম সত্য জেনেও মেনে নিতে গিয়ে বার বার হোঁচট খেতে হয়।

গোষ্ঠ পালের জয়ধ্বনি প্রথম উঠেছিল এই শতাব্দীর গোড়ার পর্বে। তারপর কতো কাণ্ডই না ঘটে গেল। মাঠ থেকে তিনি ছুটি নিলেন। ইংরাজ-গোরারা এদেশ ছাড়লো। ভারতীয় ফুটবলের আধুনিকীকরণ হলো সম্পূর্ণ। দেখতে দেখতে বিংশ শতকও ফুরিয়ে যেতে চললো। কিন্তু গোষ্ঠ পালের নামডাক এতোটুকু স্তিমিত পড়লো না। একজন খেলোয়াড় ও নামমাত্র একজন মানুষ অর্ধশতাব্দীরও বেশিকাল ধরে বাঙ্গালীকে যে কিভাবে প্রভাবিত করে রেখেছিলেন তা ভাবতে গেলেই অবাক হতে হয়। ব্যক্তিসত্তার এমন প্রতিষ্ঠা, এ-দেশ তো বটেই অন্য দেশের ইতিহাসেও বুঝি বিরল দৃষ্টান্ত।

'দেহ পট সনে নট, সকলি হারায়!' কবির এই কথাটি খেলোয়াড়দের সম্পর্কেও খাটে। কিন্তু এমন সত্যোপলব্ধিকে কোনো খেলোয়াড় যদি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকতে পারেন, তাহলে তাঁর নাম হলো ওই গোষ্ঠ পালই। খেলা ছেড়ে চোখের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন করে, কিন্তু ফুটবল-পাগল বাঙ্গালীর মন থেকে তিনি মুহূর্তের জন্যেও ছুটি নিতে পারেননি। কথায়, চিন্তায়, আলোচনা-বাসরে, মাঠে-ঘাটে-পথে গোষ্ঠ পাল বার বারে ফিরে এসেছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী তাঁকে প্রতিনিয়তই স্মরণ করছে।

এক কথায়, তিনি হলেন ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নায়ক। ফুটবলে কিংবদন্তী। এই দুনিয়ার দেনাপাওনা মিটিয়ে তিনি চলে গেলে কি হবে, তাঁকে ঘিরে আরও কতো উপাখ্যান যে রচিত হবে, প্রচারিত গল্পকথায় কিংবদন্তীর কাঠামো যে আরও শক্ত হয়ে উঠবে, অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলি যে জীবন্ত অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হবে, তারই বা ঠিক-ঠিকানা কি! মানুষ নশ্বর বটে কিন্তু কিংবদন্তীর পরমায়ু যে অনন্ত।

গোষ্ঠপাল কে? এ-প্রশ্ন বাঙ্গালীর কাছে নেহাৎই অবান্তরের মতো। যাঁরা তাঁর খেলা দেখেছেন কাছ থেকে মানুষটিকে দেখেছেন, তাঁদের কথা না হয় বাদই দিলাম। যাঁরা দেখেননি তাঁর খেলা এবং স্বয়ং মানুষটিকে, তাঁরাও এই বিশ্বাস অবিচল যে গোষ্ঠ পাল হলেন মস্তো মস্তো খেলোয়াড় এবং বড় মাপের মানুষ। তাঁকে উপলক্ষ্য করে প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার তাগিদ কখনো অনুভূত হয়নি। সকলেই তাঁর বিরাটত্বকে মেনে নিয়েছে। সকল প্রশ্ন ও সংশয়ের দ্বিধাকে তিনি অতিক্রম করতে পেরেছেন নিজস্ব ক্রীড়াকৃতির বৈভব ও চরিত্রগুণে। তাঁর সম্পর্ক সেকাল ও একাল একই বিশ্বাসের বন্যায় ভেসে গিয়েছে।

গোষ্ঠ পালের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় আই এফ এ শীল্ড বা লীগ অথবা রোভার্স ডুরাণ্ড কাপের মতো ভারতের একেবারে সামনের সারির প্রতিযোগিতা জয়ের প্রতীক পদক জমা নেই। তবু তাঁর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ফুটবল অনুরাগীরা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়েন। কেন?

হেতুটি অনুধাবন করা যাক।

গোষ্ঠ পালের যৌবন, সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল এবং বিশের দশকে কলকাতা তথা ভারতের ফুটবল মাঠে প্রথম পুরুষ ছিল ইংরাজ-গোরা খেলোয়াড়েরাই। ইংরাজদের শেখানো বিদ্যা অধিগত করে নগণ্যপদ বাঙ্গালী সবে তখন তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেষ্টা করছে। ১৯১১ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয় করার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবদের খেলায় সাহেবদের হারানোর স্বপ্ন প্রথম সফল হয়। সেই থেকে ভারতীয় ফুটবলারদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ে এবং ফুটবলে বাঙ্গালীর গৌরবময় ঐতিহ্য ধারণে দেশজুড়ে তোড়জোড় পড়ে যায়। এই অধ্যায়ে বাঙ্গালীর তথা ভারতীয়দের ফুটবলে অবিসম্বাদী নায়ক ছিলেন গোষ্ঠ পাল। যেহেতু বাঙ্গালীর ফুটবল ঐতিহ্য বহনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন এই বঙ্গজ খেলোয়াড়। এবং সে-কাজে তিনি নিরুৎসাহিত বোধ করেননি। একটানা দীর্ঘ দশ বছরে।

ওদিকে বৃহত্তর জীবনে পরাধীনতার শৃঙ্খল মেচনে স্বাধীনতা সংগ্রামও আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের ঢেউও আছড়ে পড়ে কলকাতার ফুটবল মাঠে। যেহেতু মাঠ থাকতো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয় ইংরাজ ও ভারতীয় দলগুলি—সেকালের কালীকাটা, ডালহৌসী ও গোরা দল এবং অপরপক্ষে মোহনবাগান। ফুটবলের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে শাসক ইংরাজের সঙ্গে পরাধীন ভারতীয়দের মুখোমুখী সংঘর্ষের প্রতীক বলে মনে করা হোত।

ইংরাজের সঙ্গে ফুটবল মাঠের এই লড়াইয়ে এক পক্ষে নেতৃত্ব দিতেন গোষ্ঠ পাল। সাথসঙ্গীরা থাকতেন বটে কিন্তু তিনি একাই একশ। যেমন সবল চেহারা, তেমনি দৃপ্ত ভঙ্গী। মিলিটারী ফুটবলের ধাক্কা সইতে যেমন, প্রয়োজন তেমনি কাঁধের ধাক্কায় ছুটন্ত গোরা খেলোয়াড়কে ছিটকে দূরে ফেলে দিতেও ওস্তাদ। অপরের পায়ের বল কেড়ে নিতে প্রতিমুহূর্তে মাথা টপকে লাফিয়ে হেড করে বলটিকে বিপক্ষ সীমানার বাইরে পাঠাতে পারলেই নিশ্চিন্ত কর্ম। এক কথায় উন্নত মানের মিডফিল্ডার-সই প্রতিমূর্তি। পোরুষের চূড়ান্ত পরিচয়। তেজী বাঙ্গালী—এই অখ্যাতি

ঘোষাতে গোষ্ঠ পাল যেন কঠিন শপথ নিয়েছিলেন। আর সেই অঙ্গীকার তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন বিশেষতঃ ইংরাজ ও গোরা দলের মোকাবিলার সময়। বহুত্তর জীবনে শাসক ইংরাজের হাতে সদাই অত্যাচারিত ভারতীয়েরা গোষ্ঠ পালের মাঠের আচরণে ইংরাজের অবিচার কুবিচারের যোগ্য দণ্ড দেবার স্পর্ধিত ও সার্থক প্রচেষ্টা দেখতে পেয়ে মনে-প্রাণে তাঁকে নেতা বলে বরণ করে নিয়েছিল। মাঠের নেতা এমনি করেই একদিন নিজের অজ্ঞাতে বাঙ্গালীর জনমানসে জাতীয় নেতার আসনে সমাদৃত হয়ে পড়েছিলেন। সে-আসন কোনো দিন টলেনি। আত্ম-বিস্মৃত জাতি বলে যতোই দুর্নাম থাক, বাঙ্গালী কিন্তু তার ফুটবল মাঠের 'হিরো' গোষ্ঠ পালকে কোনো দিন ভুলতে পারেনি। ভুলতে চায়ওনি।

১৯১১ সালের শীল্ড জয়ে উৎসাহিত হয়ে ফুটবলে ভারতীয় সামর্থ্যের পুরোধা মোহনবাগান যখন মাঠ ময়দানে ইংরাজ-গোরাদের সঙ্গে চোয়াল কষে লড়ছে তখন মোহনবাগানের সব শক্তিই সংহত হয়েছিল ওই গোষ্ঠ পালকে ঘিরেই। সেদিনের সেই ছবিটি সঠিকভাবে আঁকা রয়েছে কথা-শিল্পী-কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখনীতে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, দেউলের শোভা যেমন চূড়ো, তেমনি মোহনবাগানের শোভা গোষ্ঠ পাল। যাকে বলে নায়ক নাটকের প্রধান পুরুষ। ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধত, ধীর প্রশান্ত। সাহেবরা যাকে বলে চাইনিজ ওয়াল!'

এই 'চাইনিজ ওয়াল' নিজের ঘর সামলাতেন। ও পক্ষের হাতে গড়া হাতিয়ার প্রত্যাঘাতে গুঁড়িয়ে দিতেন। বেপরোয়া অবোধকে নিজের বৃষস্কন্ধে তুলে ব্যক্তিত্বের সমীহ জাগানো শাসানিতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তাকে চুপ করিয়ে রাখতেন।

'চাইনিজ ওয়াল'—শব্দ দুটি শুনেই মনে পড়ে গেল কবে থেকে কিভাবে ওই দুটি বিশেষণ গোষ্ঠ পালের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সেবার বর্মার লীগ চ্যাম্পিয়ন রেঙ্গুন ক্রাস্টমস দল কলকাতায় শীল্ড খেলতে আসে। খুব নামকরা দল। কিন্তু মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের খেলার দিনে গোষ্ঠ পাল যেন সারা মাঠ জুড়ে একাই খেলে গেলেন। একতরফা খেলা হলে কি হবে গোষ্ঠ পালের বেড়া ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে যাওয়া ডাকসাইটে দল রেঙ্গুন কাস্টমসের পক্ষেও অসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। পরের দিন সকালে তদানীন্তন পত্রিকা 'ইংলিশম্যানে' বড় হরফে গোষ্ঠ পাল 'চায়নিজ ওয়াল' বলে অভিনন্দিত হয়ে গেলেন। সেই থেকেই গোষ্ঠ পালের অনন্যসাধারণ ফুটবলে চীনের প্রাচীর।

ফুটবলে ভারতীয়েরা যাদের কাছ থেকে প্রথম ও উচ্চতর পাঠ গ্রহণ করেছিল সেই ইংরাজদের কাছ থেকে এমন একটি 'অভিধা' আদায় করে নেওয়া বড় কম কথা নয়। আমাদের ফুটবলের দীর্ঘ ইতিহাসে গোষ্ঠ পাল ছাড়া নামমাত্র আর একজন ভারতবাসীই ইংরাজদের ভাষ্যে চিরায়ত চিহ্নিত হয়ে আছেন। তিনি হলেন পূর্বসূরী শিবদাস ভাদুড়ী। সাহেবরা ওঁকে বলতেন 'শিলপারি শিবদাস'— পাকাল মাছের মতো বিপক্ষের শক্ত বাঁধন শিথিল করে ফসকা গেরোতে গলে পড়তে জানতেন শিবদাস। তাই তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন 'শিলপারি' নামে। আর দুর্ভেদ্য পাহাড়ের মতো অবিচল দাঁড়িয়ে থেকে ও-পক্ষের আক্রমণ রুখে তাকে অকেজো করে তুলতেন বলে গোষ্ঠ পাল হতে পেরে-ছিলেন 'চাইনিজ ওয়াল'।

ফুটবল খেলায় মূল লক্ষ্য পরের ঘর ভাঙ্গা। নিজের ঘর আগলে রাখা। এই দুটি কাজেই সিদ্ধকর্ম ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ী ও গোষ্ঠ পাল। দুজনেই ভারতীয় ফুটবলের প্রথম যুগের নায়ক। বলতে পারি যে ব্রহ্ম-মুহূর্তে এই যুগল নায়ক ভারতীয় ফুট-বলকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন। এই শতাব্দীর গোড়ার পর্বে মাঠে ময়দানে ওঁদের আবির্ভাব না ঘটলে, এতো-দিনেও ভারতীয় ফুটবলের শৈশবস্থা অতি-ক্রান্ত হোত কিনা কে জানে!

যেমন ক্রীড়ানিপুণতা তেমনি চারিত্রের দৃঢ়তা—গোষ্ঠ পালের মূল জীবনই যেন চীনের প্রাচীরের প্রতীক। অল্প কথার মানুষ ছিলেন। ব্যক্তিত্ব ছিল সমীহ জাগানো। যে-কালে সাহেবদের ভয়ে সবই তটস্থ ঠিক সেইকালে ইংরাজী অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানাতে তাঁর কণামাত্র কুণ্ঠা জাগেনি। দু একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ পরে রাখবো। আজ শুধু তাঁর লড়িয়ে মেজাজ সহনশীলতা ও ইস্পাতকঠিন মান-সিকতার কিঞ্চিৎ নমুনা রাখছি।

মৃত্যুর (৮ই এপ্রিল, ১৯৭৬) দুদিন আগে রক্তের উচ্চচাপে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে আসছে। যকৃতেও গোলমাল দেখা দিয়েছে। সারা শরীরের ভেতরটা যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। চিকিৎসক পরীক্ষা করতে এসে শুধোলেন কেমন আছেন?

তখন তিনি অচৈতন্য প্রায়। অর্ধ-নিমীলিত চোখের পাতা মেলে চিকিৎসককে চিনতে পেরে অস্ফুট কণ্ঠে গোষ্ঠবাবু বললেন, ভাল আছি।

চিকিৎসকের আরও প্রশ্ন, কি কষ্ট হচ্ছে? যন্ত্রণা কোথায়?

গোষ্ঠ পালের তাৎক্ষণিক উত্তর কোনো কষ্ট নেই। যন্ত্রণা হচ্ছে না।

শুনে তো চিকিৎসক অবাক! ঘরের বাইরে এসে বললেন, এমন রোগীকে নিয়ে কি করি বলুন তো! বুঝতে পারছ জ্বালা যন্ত্রণায় ওঁর ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। অবস্থা থরাপা। তবুও মুখে কিছুতেই স্বীকার করবেন না। উনি যে কিভাবে মৃত্যুর সঙ্গে একাই লড়ে যাচ্ছেন, তা আপনাদের বলে বোঝাই কি করে!

বোঝাবার দরকার ছিল না। বাইরে যাঁরা অপেক্ষা করছিলেন সেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, গুণানুরাগীর দল জানতেন যে জীবন-ভোর এই মানুষটি শুধু সংগ্রামই করে গেছেন। একার হাতেই লড়াই চালিয়েছেন। মাঠের খেলায়। মাঠের বাইরে জীবন খেলায়। বড় সংসারের বড় কর্তা। আর্থিক দায়দায়িত্ব অনেক ছিল। দেশ বিভাগের পর সে দায়িত্ব গলায় চেপে বসেছিল নির্দয় ফাঁসের মতো। সেই ফাঁস শিথিল করতে অন্যায়, অসম্মানের সঙ্গে তিনি কোনদিন আপোষ করেন নি।

সারাজীবনই মাথা উঁচু করে থেকেছেন। শিয়রে মৃত্যু জেনেও মাথা নোয়াতে চান নি। এমন অনমনীয় পুরুষ সংসারে বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই বিরল পুরুষ **গোষ্ঠ পাল সংসারে মহনীয়।** **অজয় বসু**

(আরও পরের বারে)

মাঠ থেকে বলছি

জনতার জয়ধ্বনি

বিজয় আর বিবেক হাজারে, সহোদর যুগল যেন পরস্পরের পরিপূরক। একজন রাণ করেন তো অন্যজন উইকেট কামড়ে পড়ে থাকেন।

সুকুমার ব্যানার্জি ও সোহনীর পেস—সিম বোলিংয়ের ধমক তুচ্ছ। মানকাদ-সি এস নাইডু-সারভাতের স্পিনের ফাঁদও অকেজো। কিছুই তাঁদের নড়াতে, জড়াতে পারে না। দুই ভাই বন্ধি অবিচল পাহাড়। ওপক্ষের বোলারদের অধিগত বিদ্যা সেই পাহাড়ের গায়ে মাথা কুটে কেবলই নিষ্ফল আর্তনাদ তুলেই হেদিয়ে মরছে। দেখতে দেখতে একটি দিন অতিক্রান্ত হলো। বিজয় হাজারের রাণ গিয়ে পৌঁছালো ১২৫ এর কোঠায়।

মতো সময় এগোচ্ছিল, বিজয়ের তো বটেই, বিবেকেরও আত্মপ্রত্যয় নিটোল হয়ে উঠছিল। সহোদরের মনের জোরের ঠাওর পেয়ে বিজয় তাই পরের দিন খেলা সুরু হতে না হতেই হাতখুলে হাতিয়ার শানাতে আরম্ভ করে দিলেন। মারকুটে ব্যাটসম্যান হিসেবে বিজয় হাজারে কোনদিনই পরি-চিত ছিলেন না। কিন্তু সেদিন কি জেবে যেন ধরে বসলেন ভয়ঙ্কর মূর্তি। খেললেন অন্য মেজাজে। সকাল থেকে মধ্যাহ্ন ভোজন পর্যন্ত নিরন্তর ব্যাট চালিয়ে নিজে রাণ করলেন আরও ...১২২টি, অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনের আগেই তিনি নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করে নিলেন। ঘটনাটি টেষ্ট ক্রিকেটে ঘটলে

বহুমুখে এবং উচ্চগ্রামে যে তা প্রচারিত হোত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এতোক্ষণে বিজয় হাজারের রণ পৌঁছেছে ২৪৭এর ঘরে। যে চল্লিশ হাজার দর্শক এই ম্যাচেই বিজয় মার্চেন্টের আড়াইশ রাণ দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন, তাঁরাই এবার সোচ্চারে শুধাতে থাকেন। হাজারে কি মার্চেন্টের রেকর্ডটি ভাঙ্গতে পারবেন?

প্রশ্নটির উত্তর পেতে তাঁদের অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পর খেলা আরম্ভ হতে না হতেই বিজয় হাজারে অড়াইশর গণ্ডী টপকে একরকম ছুটেই এগিয়ে যান তিনশর সীমানায়। মার্চেন্ট নিজেই হাজির ছিলেন মাঠে হিন্দু দলের অধিনায়ক রূপে। জাত স্পোর্টসম্যান তিনি, ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ডটি যে মুহূর্তে হাজারে ছিনিয়ে নিলেন, সেই মুহূর্তে সবার আগে ছুটে তিনিই গিয়ে উষ্ণ আলিঙ্গনে হাজারেকে অভিনন্দন জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু তখনও এই ক্রিকেট নাটকের ওপর যবনিকা নেমে আসে নি। বিজয় তখনও মাঝ মাঠে সক্রিয়। ২৯৫ এর ঘরে এসে ক্ষণিকের জন্যে থমকে দাঁড়ান। তারপরই চওড়া ব্যাটের হাঁক তুলে এক ছটকায় তিনশ'র সীমানা যান পেরিয়ে। সংযত পরিপাটী অতি হিসেবী বিজয় হাজারের ব্যাট থেকে ওভার বাউন্ডারী উপহার পাওয়া এক বিরল অভিজ্ঞতা। তবে আগেই না বলেছি যে বিজয় হাজারের ঘাড়ে সেদিন অন্য মানসিকতার ভূত ভর করেছিল। কাজেই মার শব্দে পরিপার্শ্বে উত্তাপ ছড়াতে তাঁর ব্যাট সেদিন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নি। তবে ব্রাবোর্ণ স্টেডিয়ামে বিজয় হাজারের সেই প্রথম ও সর্বশেষ ওভার বাউন্ডারী। ব্যাট তোলার এই বলাতিকে ব্র্যাবোর্নের অন্য কোনো খেলা উপলক্ষে আর কোনোদিন তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

বিজয় ও বিবেক, দু ভায়ে মিলে ষষ্ঠ উইকেটে পাক্কা তিনশ' রাণ জুড়ে দেবার পর তবেই বিচ্ছিন্ন হন। বিজয় করেছেন রাণ। আর বিবেক তাঁর উইকেট অক্ষত রেখে সহযোগী সহোদরকে রাণ তোলার সুযোগ উপহার দিয়ে গেছেন। বিজয়ের চোখ ঝলসানো ব্যাটিংয়ের পাশে বিবেকের বরাভয় ভূমিকাও নজরে পড়ার মতো। বিবেক কতক্ষণ উইকেটে ছিলেন? নয় নয় করে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। কতো রাণ তিনি করেছিলেন, জানেন? নামমাত্র একুশ! সন্দেহ কি যে গতিমন্থরতার প্রতিক হিসেবে বিবেকের এই ইনিংসটি ভারতীয় ক্রিকেটের রেকর্ড বইয়ে চিহ্নিত হয়ে থাকবে! তবে আফশোষ এই যে, যে প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিবেক এই সাড়ে পাঁচ ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছিলেন তার কোনো হদিশ রেকর্ড বই জানাতে পারবে না। জানবেন শুধু প্রত্যক্ষদর্শীরা। যাঁদের বিচারে বিবেকের এই একুশটি রাণ দৃঢ়তা, নিঃস্বার্থ মানসিকতা এবং অবশ্যই ক্রীড়াদক্ষতার নিদর্শন।

বিবেকের বিদায়ে ক্রমশই সংগীহারা হতে চলেছেন জেনে বিজয় যেন আরও দ্রুত গতিতে রাণ তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। আর তারই পরিণামে ৩০৯ এর মাথায় ক্যাচ তুলে তাঁকে বেলায়ের হাতে ধরা পড়তে হয়। বিজয় আউট মানেই অবশিষ্ট দলের ইনিংসও খতম।

এতো (৪৯০ মিনিটে একাদশটি বাউন্ডারী ও একটি ছক্কাও করে) বিজয় হাজারে নিজের দলকে জেতাতে পারেন নি। জেতা তো দূরের কথা, দলের হার এড়ানোও তার সাধ্যে কুলোয় নি। হিন্দু দলই জিতে যায় ইনিংস ও একষট্টি রাণের ব্যবধানে। তবে নিজের দলের হার এড়াতে বা দলকে জেতাতে না পারলেও হাজারের ওই ইনিংসের বিরাটত্ব ক্রিকেট কাহিনীতে কিংবদন্তীর মর্যাদা পেয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, একটি দলের পুরো একটি ইনিংসের দায়িত্ব বিজয় হাজারে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছিলেন। দলের ৩৮৭র মধ্যে তাঁর একারই সংগ্রহ ছিল ৩০৯ রাণ।

এমন এক বৃহৎকল্প ভূমিকার জুড়ি মেলা ভার। অনুরূপ এক দৃশ্যের সন্ধান পেতে আমাদের পরিসংখ্যান খেতাব হাতড়ে ফিরে যেতে হয় ক্রিকেটের আদ্যিকালে, সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। যেদিন নিজের দলের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ক্রিকেটের জনক' ডব্লিউ জি গ্রেস করেছিলেন ১৫৯এর মধ্যে ১২৬টি রাণ একাই।

বিজয় হাজারের এই ইনিংস ঘিরে সেদিন ভরতীয় ক্রিকেটের অনেকগুলি নতুন নজীরের সৃষ্টি হয়েছিল। যথা দলের মোট রণের শতকরা আশীভাগই তাঁর ব্যক্তিগত অবদান। ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে তিনিই সর্বপ্রথমে ট্রিপল সেঞ্চুরী করেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে দু ভায়ের এক জুটি সেই প্রথম এক উইকেটে তিনশ রাণ জুড়ে দেন—বিশ্ব ক্রিকেটও সহোদরদের গড়া এই নজীর বিরল। একজনের তিনশ রাণ সত্বেও তাঁর দল হেরে গেছে, এই দৃষ্টান্তও ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে ছিল দুর্লভ। যদিও এর সঙ্গে তুলনীয় ১৯০৪ সালে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ডের কউন্টি লীগে এসেকস বনাম ডার্বিশায়ারের খেলাটি। সেই খেলায় পি এ পেরিন একা ৩৪৩ রাণ করলে কি হবে। তাঁর দল এসেকস কিন্তু ডার্বিশায়ারের কাছে হারতে বাধ্য হয়েছিল। মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে হাজারের সেঞ্চুরীও ছিল নতুন নজীরের পর্যায়ে।

১৯৪৩ সালে ব্র্যাবোর্ণ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত পঞ্চদলীয় ক্রিকেট ফাইনালের শেষে প্রত্যক্ষদর্শীর দল বিজয়ী হিন্দু দলকে যতো না অভিনন্দন জানিয়ে থাকুন, তার চেয়ে অঢেল বেশি অভিনন্দন জানান বিজিত পক্ষের এক খেলোয়াড় বিজয় হাজারেকে।

আউট হওয়ার পর গুণমুগ্ধ অনুরাগীদের সস্নেহ আলিঙ্গণ এড়াতে বিজয় হাজারেকে মাঠ থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে হয়। প্যাভিলিয়নে পৌঁছবার পরও তাঁর মুক্তি মেলে না। সেখানেও জনতার ভীড়। বুদ্ধি করে এক কর্মকর্তা কোনের এক ঘরে তাঁকে লুকিয়ে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দিলে তবেই বিজয় হাজারে কিছুকালের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ পান। তবে সে বিশ্রামও স্বল্পকালীন। নাজোড়বান্দা অনুরাগীদের দাবী মেটাতে একটু পরেই হাজারেকে আবার প্যাভিলিয়নের অলিন্দে ত্রাস দর্শন দিতে হয়। তখন জনতার জয়ধ্বনিতে পরিপার্শ্ব মুখরিত। তাঁদের সামনে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে স্বভাব-বিনয়ী বিজয় হাজারে। মুখে তাঁর কথা সরছে না। চোখের জল চাপতে চাপতে অস্ফুট উচ্চারণে শুধু জানালেন 'আপনাদের সস্নেহ অভিনন্দনে আমি অভিভূত। কৃতজ্ঞ। আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ!'

সেই সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভাতেই জনকয়েক ক্রিকেটের বিব্রত হাজারের ওজর-আপত্তিতে কান না পেতে জোর করে তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। বাহকদের দলে থাকেন স্বয়ং বিজয় মার্চেন্ট, তদানীন্তন ভারতীয় দলপতি। হাজারেকে সোৎসাহে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যাওয়ার কালে মার্চেন্ট সবাইকে শুনিয়ে বলেন, লোকে যেমন একদিন ক্রিকেটের কথায় ডন ব্র্যাডম্যানের নাম করতো, ভবিষ্যতে তেমনি করেই আমাদের বিজয় হাজারেকে স্মরণ করতে হবে!

এক বিজয়ের কাঁধে অর এক বিজয়ের ছবি এবং হাজারের ক্রীড়ানিপুণতার মূল্যায়নে মার্চেন্টের সেই সেচ্চার উপলব্ধি, সবই আমাদের দেশের ক্রিকেটে ইতিহাস হয়ে আছে। আর সেই ঐতিহাসিক স্বস্তিবাচনের কিছুটা মূল্য ধরে দিতেই যেন—বিজয় হাজারে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে গিয়ে তাঁরই উপস্থিতিতে এডিলেডের চতুর্থ টেস্টের উভয় ইনিংসেই সেঞ্চুরী ও ১৯৬ ও ১৪৫ করেছিলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে। দেখে স্যার ডনও বলে উঠেছিলেন 'হাজারের নির্ভরযোগ্যতা ও মারের নিখুঁতত্ব চোখে পড়ার মতো। তাঁর নৈপুণ্য প্রশ্নাতীত বলেই অস্কোচে তাঁকে যথাযথই এক বিরাট খেলোয়াড় হিসেবে গণ্য করা যায়।'

১৯৪৩ সলে পঞ্চদলীয় ক্রিকেট ফাইনালে বিজয় হাজারের খেলা দেখে বিজয় মার্চেন্ট মুক্তকণ্ঠে হাজারের প্রশংসা করা ছাড়া তাঁকে কাঁধে তুলে নচানাচি করলে কি হবে, মরশুম ফুরোতে না ফুরোতেই তিনি নিজেই বিজয় হাজারের হাত থেকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ডটি (৩০৯) ছিনিয়ে নিতে ভোলেন নি। শেষ মরশুমে রণজি ট্রফির এক আসরে বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্রের খেলায় মার্চেন্ট অপরাজিত ৩৫৯ রাণ করে হাজারের কৃতিত্বকে ডিঙ্গিয়ে যান।

চল্লিশের দশকের গোড়ার পর্বে ব্যক্তিগত রাণের রেকর্ড গড়ায় দুই বিজয়, মার্চেন্ট ও হাজারে যেন কোমর কষে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠেছিলেন। দুজনের মধ্যে নজীর ভাঙ্গা গড়ার খেলা চলেছিল নিরন্তর। একবার হাজারে এগোন তো পরক্ষণেই মার্চেন্ট এগিয়ে গিয়ে তাঁকে টপকে যান। ১৯৪৮ সালে রনজি ট্রফির মহারাষ্ট্রের বি বি নিম্বলকার ক্যাথওয়াডের

বিরুদ্ধে অপরাজিত ৪৪৩ রাণ করলে দুই বিজয়ের রেকর্ড গড়ার খেলা চিরদিনের তো সাঙ্গ হয়। নিম্বলকারের এই নট আউট ৪৪৩ রাণ ভারতীয় ক্রিকেটার মহলে এখন সর্বকালের রেকর্ড রূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। তবে রেকর্ড করার বিষয়ে দুজনে পরস্পরকে টেক্কা দিতে যতোই চেষ্টা করুন না কেন, মাচেণ্ট ও হাজারে ছিলেন পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু। হাজারের ভাষায় আত্মজ সুহৃদ।'

সেবার পঞ্চদলীয় ক্রিকেট ফাইনালে পুরো একটি দলের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলতে গিয়ে হাজারে যে মহনীয় ইনিংস খেলে-ছিলেন তার বিনিময়ে তাঁর কিছু আর্থিক লাভও হয়েছিল। ব্র্যাবোর্ণ উপস্থিত জনতা নিজেদের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে আট হজার টাকার একটি তোড়া তাঁর হাতে তুলে দেন। আমাদের দেশে এক ক্রিকেটারের অতি উপযুক্ত ভূমিকার তৎক্ষণিত মূল্যায়ন তাঁকে আর্থিক পুরস্কার দেওয়ার সেই বোধহয় প্রথম নজীর। উত্তরপর্বে যা বেনিফিট ম্যাচ বা ম্যান অব দি ম্যাচ এডয়ার্তের রীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অধুনা সে রীতি অনুসৃত হচ্ছে বিপুল উৎসাহেই।

তবে আর্থিক পুরস্কার বা জনতার জয়ধ্বনি এ সব কিছুই বিজয় হাজারেকে সেদিন তেমন আনন্দের যোগান দিতে পারে নি যেমন আনন্দ তিনি পেয়েছিলেন ব্র্যাবোর্ণে শ্রীমতী হাজারের উপস্থিতির সূত্রে। শ্রীমতী সেদিন ক্রিকেট মাঠের ধারে সশরীরে হাজির ছিলেন আর সদ্য পরিণীতা নববধূর সামনে নতুন এক কীর্তি গড়তে পারায় হাজারের খুশীর পেয়ালা যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে পড়ে। এমনিতে তিনি মুখচোরা লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু খুশীর প্রাবল্যে আবেগের টানে মনের এই কথাটি বিজয় হাজারে নিজের মুখেই এক-দিন স্বীকার করে ফেলেছেন।

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

অলিম্পিক হকি

আগামী জুলাই ১৭ তারিখে মন্ট্রিল শহরে ২১তম অলিম্পিক গেমসের অসর বসছে। এই অসরে অলিম্পিক হকি প্রতি-যোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে মোট ১২টি দেশ। তারা দুটি গ্রুপে সমান ভাগ হয়ে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলবে এবং প্রতি গ্রুপের লীগ চাম্পিয়ান এবং রানার্স-আপ দল মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা লাভ করবে। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারত এবং ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক হকির রৌপ্যপদক বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ার খেলা পড়ছে এ গ্রুপে। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক বিজয়ী পশ্চিম জার্মানী এবং রৌপ্যপদক বিজয়ী পাকিস্তান খেলবে বি গ্রুপে।

যোগদানকারী দেশ

গ্রুপ এ : ভারত অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ড, মালয়েশিয়া, আর্জেন্টিনা এবং কানাডা।

গ্রুপ বি : পশ্চিম জার্মানী, পাকিস্তান নিউজিল্যান্ড, স্পেন বেলজিয়াম এবং কেনিয়া।

ভারতের খেলার তালিকা

জুলাই ১৮ : বিপক্ষে আর্জেন্টিনা
জুলাই ১৯ : বিপক্ষে হল্যান্ড
জুলাই ২১ : বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়া
জুলাই ২২ : বিপক্ষে কানাডা
জুলাই ২৪ : বিপক্ষে মালয়েশিয়া

অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারত পর্যায়ক্রমে ছয়বার (১৯২৮, ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬) স্বর্ণ-পদক জয়ের সূত্রে যে স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠা করেছিল তার অবসান হয় ১৯৬০ সালের অলিম্পিক হকির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ভারতের পরাজয়ের ফলে। এরপর ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারত ফিরায় অলিম্পিক হকির স্বর্ণপদক জয়ী হয়। অপর দিকে পাকিস্তান পায় রৌপ্য-পদক। কিন্তু পরবর্তী ১৯৬৮ এবং ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি খেলায় ভারতের ভাগ্যে জুটেছিল ব্রোঞ্জ পদক। ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকি খেলায় পশ্চিম জার্মানীর স্বর্ণপদক জয়ের ফলে অলিম্পিক হকির আসরে এশিয়া মহাদেশের দীর্ঘ ৭৫ বছরের একচ্ছত্র প্রাধান্যের অবসান হয়। ১৯২৮ সাল থেকে দশটি অলিম্পিক হকি আসরে স্বর্ণপদক জয়ী হয়েছে ভারত সাত-বার (এর মধ্যে উপর্যুপরি ছয়বার), পাকি-স্তান দুবার এবং পশ্চিম জার্মানী একবার।

আসন্ন ১৯৭৬ সালের ২১তম অলি-ম্পিক গেমসের হকি প্রতিযোগিতায় যোগ-দানের উদ্দেশ্যে ১৮ জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল গঠন করা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের নেতা অজিত পাল সিং মন্ট্রিলগামী ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত ১৮জন খেলোয়াড়দের মধ্যে আছেন রেলদলের নয়জন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের ৪ জন এবং একজন করে বাংলা, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, পঞ্জাব, সার্ভিসেস এবং উত্তর প্রদেশের খেলোয়াড়। বাংলা থেকে দলে নির্বাচিত হয়েছে গোলরক্ষক বীর বাহাদুর ছেত্রী।

নির্বাচিত খেলোয়াড়বৃন্দ

গোলরক্ষক : অশোক দেওয়ান (রেল) এবং বীর বাহাদুর ছেত্রী (বাংলা)

ফরওয়ার্ড : আসলম শের খান (এয়ার লাইন্স), সুরজিৎ সিং এবং এম কিণ্ডো (রেল)

অজিতপাল সিং
ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক

হাফ-ব্যাক : বারিন্দর সিং ও ভাস্করণ (রেল) অজিত পাল সিং (বর্ডার সিকিউ-রিটি ফোর্স), মেহবুব খান (এয়ার লাইন্স) এবং মহিন্দর সিং (পঞ্জাব)

ফরোয়ার্ড : ডি জে ফিলিপস (রেল), অশোকুমার (এয়ার লাইন্স), অজিত সিং (রেল), বি পি গোবিন্দ (এয়ার লাইন্স) হরচরণ সিং (সার্ভিসেস), প্রভাকরণ (রেল), চাঁদ সিং (রেল) এবং সৈয়দ আলি (উত্তর প্রদেশ)।

দলের নির্বাচিত ১৮ জন খেলোয়াড় ছাড়াও সাতজন খেলোয়াড়কে অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে সদ্য নির্বাচিত ১৮জন খেলোয়াড়ের মধ্যে নবা-গত খেলোয়াড় আছেন এই তিনজন—গোল-রক্ষক বীর বাহাদুর ছেত্রী (বাংলা) এবং ফরোয়ার্ড প্রভাকরণ (রেল) ও সৈয়দ আলি (উত্তর প্রদেশ)। ১৯৭৫ সালের তৃতীয় বিশ্ব হকি কাপ বিজয়ী ভারতীয় হকি দলের ১১ জন খেলোয়াড় মন্ট্রিলগামী বর্তমান ভারতীয় হকি দলে স্থান পেয়েছেন।

রাজ্য কাবাডি প্রতিযোগিতা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নকআউট কাবাডি প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাথলেটিক এসোসিয়েশন ৩৩-৭ পয়েন্টে সাউথ ইস্টার্ন রেল দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি চারবার এবং মোট ১৫বার রাজ্য নকআউট কাবাডি চাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

মেয়েদের নকআউট ফাইনালে নদীয়া জেলা কাবাডি এসোসিয়েশন ১৮-১২ পয়েন্টে মহমেডান স্পোর্টিং দলকে পরাজিত করে।

বালক বিভাগে নতুন বাজার আশোক সঙ্ঘ ২৮-১৪ পয়েন্টে কলিকাতা যুবক সম্মিলনকে পরাজিত করে।

পারিতোষিক বিতরণী উৎসব

বারুইপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের পারিতোষিক বিতরণী অনু-ষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলার ডঃ পি কে বসু এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে সভায় উপস্থিত ছিলেন এক সময়ের নামকরা খেলোয়াড় সুনীল চ্যাটার্জি এবং মনোজ গুহ।

সন্ধ্যার সূর্য

দেবরাজ রায় রাজশ্রী বসু

অনেকে অনেক রকম হতভম্ব হন—আমি মশাই বিরাট হতভম্ব। বাংলা [illegible] সংক্রান্তিতে আমি এই রকম ব্যাপার দেখব—কল্পনাও করিনি। শুনুন ব্যাপারটা; ডিলাকস বাস থেকে নেমে স্টুডিওয় ঢুকব, হঠাৎ বিরাট পুলিশী চ্যালেঞ্জ—কীধার যানা হ্যায়?

স্টুডিওর দারোয়ান অমনি আমতা আমতা করে জনন দিল—এই বাবুকে ছেড়ে দিন, ইনি আমাদের—

আমি সপ্রশ্নে (ভড়কে যাবার পর) তাকাতে দারোয়ান বলল—ভেতর উত্তম-কুমার কুস্তি লড়ছেন কিনা—তাই ইয়ে মানে.....

ক'দিন আগে থেকেই কানাঘুসো শুনছিলাম। বিশেষ করে আর্ট ডিরেকটর সুর্য্য চ্যাটার্জির মুখে—হেঁ হেঁ এমন একটা সেট তৈরী করব যে তোমাদের সব পিলে চমকে যাবে—

—কিসের সেট ভাই?

—কুস্তি—কুস্তির সেট—গুরু ভার্সাস কনডর ওয়াইল্ড বিল—দর্শনীয় একটা লড়াই হবে স্টুডিওতে.....

তাহলে সেই লড়াই আরম্ভ হয়েছে।

নন্দিতা
সৌমিত্র চ্যাটার্জি/আরতি ভট্টাচার্য

স্টুডিওর গেটের সামনে পুলিশের ওয়্যারলেস ভ্যান ডিউটী দিচ্ছে। আর ফ্লোরের সামনে একদল সশস্ত্র পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অফিসার ভদ্রলোক একটা গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে স্টুডিওর কাণ্ডকারখানা দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্ছেন মনে হল।

ফ্লোরের মধ্যে ব্রজবুলি ছবির কুস্তি-যুদ্ধের এরেনা লাগানো হয়েছে। চারিদিকে কাঠের গ্যালারি, শত শত দর্শক হাঁ করে বসে কুস্তির লড়াই দেখছে। মাঝখানে চৌকোণা রিং। আমি যখন গিয়ে উপস্থিত তখন টাইগার যোগীন্দর সিং আর রণধাওয়া সমান্য পায়তাড়া কষছে। ইয়াব্বড়-বড় থাবড়া মারছে নিজের নিজের দাবনায় আর থেকে থেকে মুখে হুফ হুফ শব্দ করছে। সেই আওয়াজেই অনেকে কুপোকাৎ। স্টুডিওর ম্যানেজার হাঁ করে দেখছিল। আমায় দেখে যেন সম্বিত ফিরে পেল। তার ভীষণ দুশ্চিন্তা—এই এদের সঙ্গে লড়বে উত্তমকুমার? যাঃ—

—যাঃ মানে। তাই তো শুনছি।

—তা বলে এই পালোয়ানদের সঙ্গে? দাবনায় থাপড় ঝাড়ছে তাতেই গ্যালারি কাঁপছে আর উত্তমকুমার—

বলতে বলতে ম্যানেজার চলে গেল।

ছবির প্রযোজক দেবেশ ঘোষ চরকীর মত ঘুরছেন। বিরাট খরচা করে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম থেকে এই রিং তুলে আনা হয়েছে—দর্শকের গ্যালারিতে বসার জন্য শত শত একসট্রা আর্টিস্ট হায়ার করা হয়েছে—নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ আনা হয়েছে—এখন সব ভলয় ভলয় উৎরে গেলে, যেন বাঁচা যায়।

জয়ন্ত বোঁ করে ছুটছিল, তাকে থামিয়ে—এই উত্তমদা কোথায় রে? জয়ন্ত জর্দা পানের পিক গিলে পর পর দুটো হেঁচকি তুলে বলল, লাঞ্চে—তারপরই জয়ন্ত প্রস্তুতি নিয়ে সে এখন দুচোখে নাকি ধুতরো ফুল দেখছে।

এখন লাঞ্চ আউয়ার চলছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি পালোয়ানদের খাবারের সন্ধান নিলাম। প্রোডাকশন ম্যানেজার পালবাবুকে জিগ্যেস করতে সে বোমার মত ফেটে পড়ল—শুনবেন লিস্টি? গিয়ে কানাডার পালোয়ানকে জানতে চেয়েছিলাম যে লাঞ্চে কী কী খাবেন স্যার? তা বললে বেশী কিছু না, ইয়ে করুন পাঁচটা মুরগীভাজা, দুটো মুরগী সেদ্ধ, পাঁচটা অমুক পাঁচটা তমুক—শুনে চোখ সেই যে ঠেলে কপালস্থ হয়েছিল এখনো নামেনি—যাই—

বলে পাল ভোঁ করে চলে গেল।

উপস্থিত সবাই কনফার্ম করল—পাল ঠিকই বলছে—দুগাড়ী ঠেসে লাঞ্চ এসেছে—স্টক ক্লিয়ার করে দিয়ে গাড়ী যথারীতি চলে গেছে। সকাল নটা নাগাদ এরা স্টুডিওতে ঢুকেছে—আমার সন্দেহ হলো—আজ স্টুডিও ক্যান্টিনে স্রেফ জল আর চা ছাড়া কিছুই মিলবে না।

তিনজন লড়াকু কুস্তিগীর আর দশাসই একজন রেফারীর—না দাদা, আগ-পশ্চাৎ তলা না জেনে বলব না—তবে আর একটু ক্ষিদে ক্ষিদে ভাব হয়েছে বললেই চিত্তির—আমি শুনেছি—নর্মাল দুজন সিন্ধ ডিম আর সের আড়াই খাঁটি ঘন দুধ হচ্ছে নাকি একেকজনের সকালের পথ্যি। তাহলে আন্দাজ করার চেষ্টা করুন—এদের দুপুরের 'লাঞ্চ' আর রাতের 'সাপার' কীরকম হতে পারে!

ব্রজদার গুলমার্গার ইমাজিনেশানের ওপর এই দৃশ্য। তিনি তাঁর ভক্তদের কুস্তির ফাইটের যে গল্পোটি শুনিয়েছিলেন—তারই ভিসয়্যাল হচ্ছে উপরোক্ত সীন।

কিছুক্ষণের মধ্যে উত্তম ফ্লোরে এলেন। ময়ূরবীর রনধাওয়া টাইগার যোগীন্দর সিং আর কানাডার ওয়াইল্ড বিল ফিরে তাকাল। উত্তমকুমারকে দেখে গ্যালারির দর্শকদের সেকি উল্লাস! মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা—গায়ে গেঞ্জি আর পায় ব্রাউন কেডস জুতো।

রেফারী ভদ্রলোক আর বিলম্ব না করে রিং-এ উঠে পড়লেন হুইসেল মুখে দিয়ে। তারপর ইশারাতে ডাকলেন বিলকে—কাম অন বিল—

বিল তার ওই প্রকাণ্ড গতর কাঁপিয়ে যখন রিং-এর মধ্যে এসে স্রেফ খালি গায়ে দাঁড়াল—যে ভদ্রলোক এই সিনেমার দৃশ্যের জন্যে বিচারক সেজেছিলেন, তাঁর যেন খিল নড়ে গেল।

রেফারী ভদ্রলোক বিলকে অনেকক্ষণ ধরে বোঝালেন—লিসন বিল, দিস ইজ নো রিয়েল ফাইট—দিস ইজ মক ফাইট—ডোন্ট হিট হিম—বলে উত্তমকুমারের দিকে বারবার আঙুল দিয়ে দেখালেন—উই আর গোয়িং টু হ্যাভ এ সিনেমা শুটিং হিয়ার—আন্ডারস্ট্যান্ড?

—ইয়া ইয়া আ-আন্ডারস্ট্যান—উকে উকে খমান (ওকে ওকে কাম অন)।

উত্তমকুমার শট ইম্প্রোভাইজ করছিলেন আপনমনে। দেখি চুপচাপ রিং-এর চার-পাশে ঘুরছেন। বিল ড্যাব ড্যাব করে তার এই সিনেমাটিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখছিল। গড নোস কী ভাবছিল।

হঠাৎ উত্তমকুমার ছবির পরিচালককে ডেকে নীচু গলায় কী যেন বললেন। পরিচালক হোহো করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে তা মেনে নিলেন। তারপর পরিচালক ডাকলেন রেফারীকে—শুনিয়ে সাহাব—

ব্যাপারটা এই—বিল প্রচণ্ড দাবড়ানি দেবে তার প্রতিপক্ষকে। এখন তাকে যুদ্ধং দেহি গোছের হুঙ্কার ছাড়তে হবে। ব্রজদা যেই রিং-এ উঠতে যাবে তখন বিল আচমকা এমন একটা দাবড়ানি দেবে যে—

—স্টার্ট সাউন্ড—

—রানিং—

ব্রজদা হাসি হাসি মুখ করে রিং-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বিল ততই সোরগোল তুলছে—'খামান খামান' আওয়াজ। ব্রজদা সিঁড়িতে যাঁ-তেক পা রাখা—বিল দুম করে এক লম্ফ দিয়ে বিকট এক চিৎকার ছাড়ল—বাস ভয়ের চোটে ব্রজটা কেঁচো হয়ে পাশের এক বাঁশের খুঁটিতে বোঁ করে ঝুলে পড়ল—আই বাপ—কী আওয়াজ—

প্রথমেই উত্তমকুমারের পা ঝাটল কিণ্ডিৎ। উনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। আসলে ব্রজদার এসবে খেয়াল করতে নেই, তিনি আজ বাঙ্গালীর প্রেস্টিজ বাঁচাতে প্রকাশ্যে মল্লযুদ্ধে নেমেছেন—যে কোন উপায়ে সাহেব কুস্তিগীরকে কুপোকাৎ করতেই হবে।

ফ্লোরে দু' দুটো ক্যামেরা চলছে। দুটো আলাদা অ্যাঙ্গেল থেকে।

উত্তমকুমার কুস্তি লড়ছেন—হল বা বারোস্কোপের জন্য—এটা এ যুগের বাঙ্গালী

শেষ কবে তারিখ বিরাট আউটডোরের

সিনেগোয়ারদের কাছে একটা সংঘাতিক ব্যাপার। দর্শকদের মধ্যে মাঝে মাঝেই তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিলাম। মার ব্যাটা সাহেবকে—গুরুবে ধরেছ কি মরেছ—কয়েকটি অল্পবয়সী ছেলে বসে বসে আওয়াজ দিচ্ছিল। চোখে চোখ পড়তেই তারা ফিক্ করে হেসে ফেলল।

নতুন শটের কম্পোজিশান হচ্ছে। ক্যামেরাম্যান তার দুই সহকারীকে নিয়ে আলো সাজাচ্ছেন। সেই ফাঁকে আমি বিলকে ধরলাম—

—এই প্রথম সিনেমায় নামলেন—

বিল তখন হাফ ডজন কোকাকোলার বোতল শেষ করছিল—প্রায় দুর্বোধ্য ইয়াঙ্কি উচ্চারণে সে যা বলল তার মর্মার্থ হল—হ্যাঁ। এখানে বড্ড গরম।

—কোনটা শক্ত? ফাইট করা না অভিনয় করা?

—দুটোই শক্ত।

—কেমন লাগছে শুটিং করতে?

—সোজাসুজি বলতে আমি এর কিছুই মগজে নিতে পারছি না।

—দারা সিং-এর নাম শুনেছ?

—বিলক্ষণ—

—ভদ্রলোক মল্লযুদ্ধ ছাড়া ফিল্মে অভিনয় করেন—আশা করি শুনেছ?

—শুনেছি। বিল একটু থেমে বলল—কী করে ম্যানেজ করে তা ভেবে পাচ্ছি না। একবার দেখা হলে জেনে নেব। শুনেছি এই হিরো (উত্তমকুমার) আমায় কাতুকুতু দিয়ে হারিয়ে দেবে। মুখে চু-কিত কিত কিত কিত কিত আওয়াজ করতে করতে—এ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ লোকে এই ছবি দেখে আমায় গালাগাল দেবে—

বিলের সঙ্গে কথা বলা শেষ হতেই টাইগারকে মনে যোগীন্দর সিংকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করলম। কিন্তু পারলাম না। দর্শক গ্যালারীতে একদল পাঞ্জাবী ছেকরা বসে গুলতানি করছিল—তারা ফাঁক বুঝে টাইগারকে ধরে গপ্পের আসর ফেঁদে বসেছে। গালে বিরাট গালপাট্টা আর ইয়াব্বড় একজোড়া মোচ; টাইগার জাতে পাঞ্জাবী। বেরাদর পেয়ে তার বিরাট উৎসাহ। কবে কোন লড়াইয়ের আসরে কোন কুস্তিগীরকে সে কিচক বধ করেছিল—তার বর্ণনা দিতেই তখন ব্যস্ত। ছোকরাগুলো বিস্ফারিত চোখে শুনছিল সেই কাহিনী। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম দলের একটি ছেকরা টাইগারের গা টিপতে আরম্ভ করে দিল। টাইগার আয়েসে চোখ বুঁজে চুপচাপ বসে রইল খানিকটা। তারপর আবার গুল-গল্প শুরু হল।

ফ্লোরে প্রচন্ড গরম। রণধাওয়া দেখলাম একমাত্র পালোয়ান—বিরক্ত অপ্রসন্ন মুখে চেয়ারে চুপচাপ বসে ছিল। আসলে তার এসব বোধহয় ভাল লাগছিল না। এই প্রকান্ড জশাসই চেহারা, প্রাচীন রোমান সৈন্যদের মত পোষাক তার অঙ্গে—মায় জুতো জোড়াও।

কে বলল রণধাওয়া হেভি লড়াকু। ক্ষেপে গেলে আর রক্ষে নেই।

একটি ফিচেল ছোঁড়া বলল—দে না ব্যাটাকে লড়িয়ে। হয়ে যাক এক হাত। বলে খিকখিক করে খানিকটা হাসল।

রেফারী ভদ্রলোক বেশ। শুটিং করার সব দায়িত্ব তার ওপর। এসব মল্লবীরদের বিশ্বাস নেই। মুডের মাথায় ভট করে প্যাঁচ ঝেড়ে বসলেই সব চিত্তির। ও-সব গরু-টুরু ওরা বোঝে না। ওরা লড়াইটা বোঝে। দু' ঠ্যাঙ্গা করে মাথার ওপর তুলে শূন্যে বাঁই বাঁই করে ক-পাক ঘুরিয়ে এক মোক্ষম আছাড় মারার স্বপ্নে ওরা অনুক্ষণ মশগুল। বেপট পড়ে গেলে ফাদারস নেম ফরগেটফুল করে ছেড়ে দিতে তিলেক দেরী হয় না ওদের। অতএব বুঝতেই পারছেন।

উত্তমকুমার আবার রিং-এ উঠে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে রেফারীর হুইশিল বাজল। তারপরই বিলের বিকট রণহুঙ্কার—খামান খামান—

লোকটা এই এটু আগে এক গ্লাস ঠান্ডা কোকাকোলার বোতল সাবড়ে এসেছে তা এখন ওর ভাবভঙ্গী দেখে বোঝার উপায় নেই।

এমন সময় মেক-আপম্যান এসে বিলের শরীরে খানিকটা রং ঘষে দিল। বিল অবাক। রেফারী তাকে আশ্বস্ত করে যা বলল তার মর্মার্থ হচ্ছে—ব্রজদা তোমায় যে খামচে দিয়েছিল—এটা তার পরের শট্—

—খামচে দিয়েছে মানে? ভ্যাট এ হতেই পারে না—

রেফারী অসহিষ্ণু বিরক্ত মুখে বলল—ওহো এটা বায়োস্কোপের খামচানি—বিল প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড—ব্রজদা তোমার ওপোন্যান্ট—ও কে?

—ওখে—

—বেশ। এখন ব্রজদা যখন দেখল তোমাকে এমনি জুৎ করা যাবে না এবং তুমি ওর ঘেঁটি মটকাবেই—তখন ব্রজদা চান্স পেয়েই তোমাকে জোর খামচে দেবে। এখন মানুষের শরীরে খামচে দিলে কী হয়? দাগড়া দাগড়া দাগ পড়ে যায় না? এ হচ্ছে সেই দাগ। মেক-আপম্যান তোমার

মহুয়া রায়চৌধুরী

শরীরে এখন সেই রকম চিহ্ন এঁকে দিচ্ছে—

বিল মেক-আপম্যানকে থাবড়া মারবে বলে হাত তুলেছিল—এখন বুঝিয়ে বলাতে সে-হাত ডাউন হলো।

রেফারী আরও বুঝিয়ে বলল—এরপর চু-কিৎকিৎকিৎকিৎকিৎ হবে। তারপর ব্রজদা তোমায় কাতুকুতু দিয়ে ফ্ল্যাট করে হারিয়ে দেবে—

সে বিল তা কিছুতেই মানতে চায় না। চু কিৎ কিৎ ইণ্টারন্যাশনাল রেস্টলিং আইনে লেখা নেই। আর কাতুকুতু? আন্তর্জাতিক আইনের ঘোরতর বিরোধী। আই রেফারী তুমি অমর ইজ্জত পাংচার করবে নাকি?

—আরে না না—দিস ইজ বায়োস্কোপ—

—ড্যাম-য়োর-বায়োস্কোপ— আম-আ ফাইটার—আই সে খামান—অ্যান্ড ফাইট—নো জোক—

—ধেত্তেরি— মাথায় বিলকুল ষাঁড়ের গোবর পোরা—বিল বিল—দিজ আর অল ফলস. অ্যাকশান মাইডিয়ার ফেণ্ড, ডোণ্ট ইউ ওরি—উই আর নট গোয়িং টু ব্রেক ইণ্টারন্যাশনাল লজ—কামান—পুপুপুপু পুঁ—

রেফারী বাঁশী বাজিয়ে উত্তমকুমারকে বলল—সমঝানে মে থোড়া টাইম লাগ যাতা হায়—লেকিন কোই ফিকর নহি—বিল ইজ এ ওয়ার্ডারফুল চ্যাপ!

দু' দিকে ক্যামেরা। চারিদিকে আলো বসানো হয়েছে। উত্তমকুমার সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে টাইম নিচ্ছেন সামান্য দুলে দুলে—ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হঠাৎ বিল তেড়ে এল। এবং চোখের নিমেষে গরুর কাঁধ ধরে মোচড় দিতে—

—আঃ আঃ লাগছে লাগছে—ব্রজদার কাতরোক্তি—বিল তখন ব্রজদার ঘেঁটি ঘুরিয়ে দেবার ফন্দী আঁটছে—তখন 'লাগছে' বললে কী আর রেহাই দেয়—বিপদ বুঝে ব্রজদা খ্যাস খ্যাস করে ওকে খানিকটা থামাচ দিল। আই বাপ এ কে রা? গোছের ভঙ্গী করে বিল সভয়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল। ব্রজদা তখন মরিয়া। উত্তমকুমারের একসপ্রেশান দেখে কিছু লোক বত্রিশ পাটি বের করে ফেলার তালে ছিল ডিরেকটরের এক ধমকানিতে তারা গুটিয়ে গেল। যাঃ বাবা এটু হাসবারও উপায় নেই।

প্রযোজক দেবেশ ঘোষ মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসছিলেন। উত্তমকুমারের এই অ্যাকশান দেখে বারমোস আমাশার রুগীর মুখেও হাসি ফুটবে—এটা নিশ্চয়।

ব্রজদা মওকা বুঝে ততক্ষণে চু-কিৎ-কিৎ চালু করে দিয়েছে, বিলের চোখ ছানাবড়া। এমন ধারা ফাইটার সে কখনো দেখে নি।

রেফারী ওস্কাল—কামান বিল—

বিল আবার তেড়ে গেল কিন্তু ব্রজদা ঝট করে পাশ কটল। টাল সামলাতে না পেরে বিল গিয়ে পড়ল স্বয়ং বিচারকের ঘাড়ের ওপর। বেচারি বসে প্রতিযোগিতার নিয়মকানুনের দিকে কড়া নজর রাখছিল—আচমকা তার ঘড়ের ওপর আস্ত একখানা পাহাড় এসে পড়বে—সে কল্পনাও করে নি। বিচারক সেই যে ভুঁইশোয়া হল—আর উঠল না।

যাক যে জন্যে আমি ফ্রেমে অমন ঘেমোনেয়েও দাঁড়িয়েছিলাম সে কথাটা বলি; বয়স যত বাড়ছে উত্তমের প্রতিভা তত খুলছে। ব্রজদার চরিত্র যে কোন কমেডিয়ান করতে পারত। হয়ত ওৎরাতোও ভাল। কিন্তু উত্তমকুমার এই চরিত্রে যা করছেন—তা কেউই করতে পারত না। মানে পারা সম্ভব নয় বলেই।

চার্লি চ্যাপলিন যখন মেকাপের বাইরে থাকেন তখন তাঁকে দেখে কেউ বলতে পারবে না—এই ভদ্রলোক এত রসিক। উত্তমকুমার যখন সিরিয়াস ভূমিকায় অভিনয় করেন—কে বলবে সেই মানুষটি ব্রজদার চরিত্র চর্চিতচর্বণ করতে পারবেন! আমি উত্তমকুমারের সেই অসাধারণ ডিপারচারটা দেখছিলাম। মুগ্ধ। বরং বলা উচিত—বিমুগ্ধ!

রঞ্জন মজুমদার

নানারঙের দিনগুলি
সুমিত্রা মুখার্জি

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রান্সিস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টিরিওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

বন্দী বিধাতা
সোমা দে

ফ্লোর থেকে বলছি

বাংলা ছবির জগতে এখন পুরনো আমলের ছবির পুনঃনির্মাণের ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সম্প্রতি পর পর কয়েকটি বাংলা ছবি মার খেয়ে যাওয়ায় ইন্ডাস্ট্রীতে একটা আতঙ্কের ভাব সৃষ্টি হয়েছে। এখন যেমন তেমন কাস্টিং-এ একটা বাংলা ছবি তৈরী করে রিলিজ করা পর্যন্ত চার থেকে সোয়া চার লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। ফিল্ম তৈরীর প্রতেক্যটি উপকরণের দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। বেড়েছে স্টুডিওর ভাড়া। বলা কুশলীদের পারিশ্রমিক। আর্টিস্টদের টাকা। সুতরাং এখন ছবি মার খাওয়া মানে ইন্ডাস্ট্রীর ক্ষতি ডেকে আনা। তার ওপর রয়েছে রঙীন হিন্দী চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতা। স্টুডিওতে কয়েকদিন আগে আলোচনা হচ্ছিল—যে মাদ্রাজের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রী এতদিন হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে আসছিল—সম্প্রতি সেই মাদ্রাজকে হিন্দী সিনেমার কাছে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। পর পর কয়েকটি বিগ বাজেট তামিল ছবি মার খেয়ে যাওয়ায় ওখানে ছবির বাজারে দারুণ মন্দাভাব দেখা দিয়েছে। একটি খুব বড় স্টুডিও বন্ধ হয়ে গেছে। আঞ্চলিক ভাষায় ছবি তোলার উৎসাহে বেশ ভাটা পড়েছে। এখন বড় প্রযোজকরা দু-তিনজন একত্রিত হয়ে কালার হিন্দী ছবি তুলতে আরম্ভ করেছেন। সেসব ছবির বাজেট শুনলে নাকি হৃৎকম্প হবার কথা।

কিছুদিন আগে আমি বোম্বে গিয়েছিলাম। ওখানে যা দেখে এলাম তাতে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বোম্বেতে এখন যে-কোনও বড় ছবি বলতে বোঝায় কমপক্ষে এক কোটী টাকার প্রোজেকট। এখন বড় ছবিতে মাত্র একজন নায়ক ও একজন নায়িকা দিয়ে ম্যানেজ হচ্ছে না,

অর্জুন
স্বরূপ দত্ত ও রাজশ্রী বসু

হচ্ছে কমপক্ষে চারজন নায়ক এবং চারজন নায়িকা। এবং এঁদের প্রত্যেকেই আবার সুপার স্টার। 'সোলে' ছবির সাফল্যের জন্য আচমকা এই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে। ফলে এ-সব ছবির বাজেট দেড় থেকে দু'কোটী টাকায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। অল ইন্ডিয়া মার্কেট এঁদের জন্যে হাঁ করে রয়েছে। রয়েছে ওভারসিজ মার্কেট।

সেই তুলনায় কলকাতায় 'স্টার' ছবির খরচ বলতে গেলে কিছুই নয়। ঘাড়ে সাত থেকে আট লাখ টাকা মাত্র। তবে কলকাতার ইন্ডাস্ট্রীর পক্ষে ওই টাকা যোগান দেওয়াও সময়ে কষ্টকর। আর এ-সব ছবি মার খেয়ে গেলে যে অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে—সে তো চোখের সামনেই দেখছি।

ফলে ছবি যাতে চলে সেদিকেই এখন প্রযোজক-পরিচালকদের বেশী নজর গেছে। গল্প দুর্বল হলে সুপার স্টার দিয়েও যে ছবি চালানো যায় না সম্প্রতি একটি ছবিতে তার প্রমাণ আরেকবার পওয়া গেল। অতএব ভাল কাহিনী চাই সবর আগে। 'স্টার' আসবে তার পরে। আধুনিক যে-সব গল্প লেখা হচ্ছে—তাতেও ভাল ছবি তৈরী হচ্ছে। ক্ষেত্র-বিশেষ সে-সব গল্পও সুপারহিট-ও হচ্ছে ছবি। কিন্তু কিছু প্রযোজক আরও 'নিরাপদ' থাকতে চান বলে এককালে যেসব গল্প পর্দায় সুপারহিট করেছে—সেইসব গল্পে আবার নতুনভাবে ছবি তুলতে চাইছেন। সম্প্রতি 'সুজাতা' সুপারহিট করেছে। 'স্বয়ং সিদ্ধা' দর্শকদের ভাল লেগেছে। এখন ফ্লোরে রয়েছে মন্ত্রমুগ্ধ ছবি—পরিচালনা অরবিন্দু মুখোপাধ্যায় করেছেন। এছাড়া শুটিং চলছে 'রামের সুমতি' ছবির। শুরু হচ্ছে 'প্রতিশ্রুতি' ছবির কাজ। আরম্ভ হতে চলেছে 'সন্ধি' এবং 'রজনী' ছবির কাজ। প্রত্যেকটি ভাল গল্পের চিত্ররূপ। এক সময় এ-সব ছবি সুপার-সুপার হিট করেছে।

'মন্ত্রমুগ্ধ' বনফুলের কাহিনী। স্বরচিত চিত্রনাট্যে বর্তমানে এটি রিমেক করছেন অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। এতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ মল্লিক, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ এবং শোভা সেন। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

'প্রতিশ্রুতি' বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী। বর্তমানে ছবিটি রিমেক করছেন পিনাকী মুখোপাধ্যায়। জ্বলন্ত ভ্রাতৃপ্রেমের কাহিনী। বড়ভাই ছোটভাইয়ের জন্যে কত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে পারে—প্রতিশ্রুতিতে তারই আশ্চর্য প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে। পাহাড়ী সান্যাল এই বড়ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করে আজও অমর হয়ে আছেন। সম্প্রতি টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে এ-ছবির গান রেকর্ডিং হয়েছে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর গানে সুরারোপ করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গেয়েছেন আরতি মুখার্জি, অনুপ ঘোষাল, তরুণ ব্যানার্জি ও সহশিল্পীগণ, নির্মলা মিশ্র এবং সুরকার স্বয়ং।

'রজনী' ছবি নির্মিত হতে চলেছে পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। উনি এই ছবিটি ছাড়া 'পুজো' নামে আর একটি ভক্তিমূলক রঙীন ছবি করবেন বলে শুনেছি।

এদেশের ছবিতে আর মদ খাওয়ার দৃশ্য দেখানো যাবে না। সম্প্রতি এক সরকারী আদেশে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। শুধু মদ খাওয়াই নয়—মদ্যপানজনিত মাতলামি, বিশেষ ব্র্যান্ডের মদের বিজ্ঞাপন—এসবই ওই আদেশে সিনেমার দৃশ্য থেকে বাতিল করা হয়েছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সার এই আদেশ এখনই কড়াভাবে কার্যকর করতে অগ্রসর হয়েছেন। ফলে চারিদিকে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে। এই নির্দেশ দেবার আগে যে-সব ছবিতে এইসব দৃশ্য তোলা হয়ে গেছে—তাঁরা ভীষণ মুস্কিলে পড়েছেন। আগে তোলা হয়েছে বললে তো সেন্সারে রেহাই নেই। তাই বোম্বের প্রযোজকরা একযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছেন। আদেশ রদ করবার জন্য নয়—এ যাত্রা শুধু রেহাই পাবার জন্যে। সম্প্রতি এক নির্দেশনামা পওয়া গেছে। তাতে সেন্সার বোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন—যাঁদের ছবি ইতিমধ্যেই পুরোদস্তর ভাগ শুটিং হয়ে গেছে একমাত্র তাঁরাই এই

কুমার পৃথিবী
ল চ্যাটার্জি আরতি ভট্টাচার্য। পরিচালনা : বিমল ভৌমিক। অমৃত ফটো

পেতে পারেন যদি তাঁরা সেন্সার কর্তৃপক্ষকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেন যে এদের দাবী ছবির মূল কাহিনীকে এগিয়ে নিয়েছে। বা কাহিনীর নিজস্ব প্রয়োজনেই এর অবতারণা করার দরকার ছিল।

কলকাতায় এই ধরনের কিছু ছবি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। যাদের ছবি ইতিমধ্যেই সেন্সার্ড হয়ে গেছে—তাঁরা বিনা প্রতিরোধেই ছবি রিলিজ করতে পারবেন। কিন্তু যাঁরা এখনও সেন্সর করাতে পারেন নি—তাঁদের ক্ষেত্রে ওই যুক্তি প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা এসে যাচ্ছে।

খ্যাতনামা গায়ক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আগামী ৩ মে এক সঙ্গীত সফরে বিদেশযাত্রা করছেন বলে আমাকে স্টুডিওতে জানালেন। প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে হেমন্তবাবুর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে বলে প্রতি বছরই ওঁকে দেড়-দু মাসের জন্যে বিদেশে যেতে হচ্ছে। এবার উনি প্রথমে যাচ্ছেন কানাডা। সেখানকার প্রবাসী বাঙালীদের সংগঠন 'প্রবাসী'র আমন্ত্রণে উনি টরান্টো ও মন্ট্রিলে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। তারপর সেখান থেকে যাবেন আমেরিকায়। নিউ-ইয়র্কের 'বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ' ওঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিউইয়র্ক ছাড়া হেমন্তবাবু শিকাগো, বোস্টন এবং ওয়াশিংটনের প্রবাসী ভারতীয়দের গান গেয়ে শোনাবেন। আগামী জুন মাসের মাঝামাঝি হেমন্তবাবু কলকাতায় ফিরবেন।

সম্প্রতি টেকনিশান্স স্টুডিওতে রামের সুমতি ছবির দুখানি গান রেকর্ডিং হয়েছে। কালীপদ সেনের দেওয়া সুরে গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জি এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ছবিটি পরিচালনা করছেন গুরু বাগচী। এতে অভিনয় করছেন মাধবী চক্রবর্তী বিকাশ রায় নিমলকুমার ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় গীতা দে সীতা দেবী মাঃ শন্তনু এবং মাঃ দীপঙ্কর।

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এখন নিয়মিত 'বাবুমশাই' ছবির চিত্রগ্রহণ চলছে। বিমল মিত্রর 'নফর সংকীর্তন' কাহিনী অবলম্বনে এটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। এতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্ত, গায়িত্রী মুখার্জি, অলকা গাঙ্গুলী, সুলতা চৌধুরী, দীপ্তি রায়, হারাধন ব্যানার্জি, রত্না ঘোষাল সন্ধ্যা ব্যানার্জি, সুখেন দাস, অতি দাস, শেফালী সেন ও মহুয়া রায়চৌধুরী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মান্না দে।

এখন কালিম্পং-এ 'সিস্টার' ছবির আউটডোর শুটিং হচ্ছে। এই রঙ্গীন ছবিটি পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু। নায়ক-ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া দেবী। অপর দুটি প্রধান চরিত্রে রূপারোপ করছেন উত্তমকুমার ও উৎপল দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন সলিল চৌধুরী।

মুসাফির

দস্যু রত্নাকর
রেহানা সুলতান

নাটমঞ্চ

নাট্যায়ন-এর 'মানুষ রতন'

সমরেশ বসুর 'মানুষ রতন' গল্প হিসেবে খ্যাতিলাভ করলেও, তার নাট্যরূপও যে (নাটক ও পরিচালনা অনিল দে) দর্শককে চমকিত ও অবাক করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে তার অভিনয় দেখে।

রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে যাদের জন্ম, রিকসা চালিয়ে এবং বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতেই যারা অভ্যস্ত, সেই সব মানুষের জীবিকা, সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাংখা 'মানুষ রতন'-এর মূল উপজীব্য।

গল্পের কেন্দ্রবিন্দু একটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ। যাকে নিয়ে ঐ লোকগুলি কিছু চাঁদা তুলে (সৎকারের নাম করে) সেই পয়সায় ফূর্তি করবে এবং শেষ পর্যন্ত মড়াটি গঙ্গায় ভাসিয়ে না দিয়ে সত্যি সত্যি পোড়াবে। কিন্তু তার জন্যে কেউ চোখের জল ফেলে শোক করতে পারে না। সেই দায়টা উদ্ধার করে দেয় স্টেশনারই একটু বয়ে যাওয়া মেয়ে। যারও সাধ-আহ্লাদ ঘর-সংসার পাতার স্বপ্ন ঘুরে কুরে খায় মনকে।

এমন চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বোধহয় খুব বেশী লেখা হয়নি। নাটক তো নয়ই। এজন্য নাট্যায়নকে ধন্যবাদ। অন্ধকারের নীচেও যে অন্ধকার জীবন আছে, তা তাঁরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন লেখকের মতই।

মাত্র দুটি সেটে নাটক। এর মধ্যেই বিচিত্র সব চরিত্রের আনাগোনা ঘটছে, বোম ও ছুরি মারামারির মত উত্তেজনাকর দৃশ্য নারীকে মা, শান্তির প্রতীক এবং শ্মশানের আবেগময় দৃশ্যের অবতারণাও সেখানে ঘটেছে। এবং তার মাধ্যেই দর্শককে একাত্ম করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বড় কম কথা নয়।

অভিনয়ে যিনি দর্শকদের সমানে অবাক করছেন, তিনি নিঃসন্দেহে এ নাটকের একমাত্র নারী চরিত্র যমুনারূপী মঞ্জুশ্রী সেনগুপ্তা। না দেখলে বোঝানো মুস্কিল তিনি কি আশ্চর্য এবং প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনয় যেমন স্বতঃস্ফূর্ত তেমনি স্বচ্ছন্দ।

এরপরই নাম করতে হয় সুপার্শ্ব ভট্টাচার্য, শুভ্রে মজুমদার ও অনিল দে-র।

এঁরা যেন চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন।

তবে কনস্টেবলের অভিনয় আরো একটু স্বচ্ছন্দ হবার অবকাশ ছিল।

অন্যান্য ভূমিকায় শেখর দাশগুপ্ত অরুণ দাস, সন্দীপ দে, সব্রত ঘোষ কালিদাস সরকার সমীর মিত্র, গীতেশ চক্রবর্তী, রথীন ভট্টাচার্য খুবই আন্তরিক।

দেবাশীষ দাশগুপ্তর সংগীত এবং স্টেশনের পরিবেশ রচনা (কণ্ঠ ও ধ্বনি-সহ) রীতিমত চমকপ্রদ।

মঞ্চ পরিকল্পনা (মনু দত্ত) ও আলোর কাজ (শান্তি দে) বিশেষ চিতা জ্বালার দৃশ্যটি সত্যি সুন্দর।

গ্রুপ থিয়েটার-এর অনুষ্ঠান

গ্রুপ থিয়েটার গত ২০ মার্চ ঋত্বিক ঘটক স্মরণ এবং সংশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এক চ্যারিটি শো'র আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্র সদন মঞ্চে।

অনুষ্ঠানে সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও তুলসী লাহিড়ী রচিত ছোট নাটক 'চার্বাকানন্দ' সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়।

সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী গীতা মুখার্জি তাঁর বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল।

মণ্ডভারতীর অনুষ্ঠান

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার অভিনয় শাখা মণ্ডভারতী সম্প্রতি নিবেদন করলেন শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' নাটকটি।

অভিনয়ে ছিলেন মানস দত্তগুপ্ত তাপস দে, নীতেন ব্যানার্জি, বদ্রীনারায়ণ চ্যাটার্জি বিমলেন্দু রায়, শিবসুন্দর সিংহ, কানাই ব্যানার্জি, নিতাই দে, বিজন ঘোষ গোপাল মুখার্জি মাস্টার বিপ্লব, শিবনাথ দত্ত, শিবাণী ভট্টাচার্য, মমতা চ্যাটার্জি সবিতা মিত্র ও লতিকা পাল।

নাটকটি পরিচালনা করেন সুজিত গুপ্ত।

দাপর্ণিক-এর দুটি নাটক

নতুন নাট্য সংস্থা দাপর্ণিক সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন 'অথ স্বর্গ বিচিত্রা' ও 'ইতিহাস কাঁদে' নামক দুটি নাটক (রচনা রাধারমণ ঘোষ)।

দুটি নাটকই মোটামুটি দর্শনীয় হয় অভিনয়ের গুণে। অভিনয়ে ছিলেন রবি দাস, জ্যোতির্ময় বসুবল, মানব রায়, মৃণালকান্ত বড়াল কাঞ্চন ঘোষ, বাসুদেব মান্না, তপন চক্রবর্তী, প্রদীপ পাল, বিমল গাঙ্গুলী, সমর আদিত্য গোপাল মিত্র, তাকর ঘোষ ও সন্ধিতা ব্যানার্জি।

প্রথম নাটকটি মানব রায় এবং দ্বিতীয় নাটকটি পরিচালনা করেন বিমল গাঙ্গুলী।

'সীতাহরণ' অভিনয়

এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের বড়বাজার শাখার কালচারাল ইউনিট সম্প্রতি তাঁদের প্রথম

বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মঞ্চস্থ করলেন শ্রীরতন ঘোষ রচিত 'সীতাহরণ' নাটকটি।

অভিনয়ের গুণে নাটকটি দর্শকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

তপন থিয়েটার

১ বৈশাখ দক্ষিণ কলকাতার নতুন ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চ তপন থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হোলো কল্পতরুর প্রযোজনায় ও ইংগিত গোষ্ঠীর সহযোগিতায় সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত 'মহুবত' নাটকটি দিয়ে।

পি এন বি-র 'লোহকপাট'

সম্প্রতি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক-এর লায়ন্স রেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ষষ্ঠ বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে ক্লাবের সভ্যগণ বিশ্বরূপা মঞ্চে জরাসন্ধর 'লোহকপাট' নাটকটি (নাটারূপ শ্রীজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়) মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন স্বপন ঘোষ, অপূর্ব মন্ডল, ভানুপ্রতাপ সিং, বংশনারায়ণ পাণ্ডে, কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, তুলসী ঘড়াই স্বদেশ দত্তচৌধুরী, সলিল ঘোষ ও মণীন্দ্র মুখার্জি। নাটকের টীমওয়ার্ক প্রশংসনীয়।

পরিচালক শ্রীসুবোধ মিত্র তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অনুষ্ঠান প্রধান অতিথি ও সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সুশীলকুমার ঝুনঝুনওয়ালা ও কৈলাসচন্দ্র মেহরা। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পেশ করেন রম প্রসাদ ঘোষ।

বহুরূপীর নাট্যোৎসব

বহুরূপীর আঠাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১ মে থেকে ৪ দিনব্যাপী এক নাট্যোৎসবের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন দিন রাজা অয়দিপাউস, ঘরে বাইরে, নদি আর একবার ও পুতুল খেলা মঞ্চস্থ হবে। স্থান : এ্যাকাডেমি মঞ্চ।

নাট্যসংবাদদাতা

বাবুমশাই
সৌমিত্র চ্যাটার্জি ও গায়ত্রী মুখার্জি। অমৃত ফটো

মিঃ রুকস ও সিমী। অমৃত ফটো

কনরাড রুকস্

প্রথম দেখা হয় দিল্লীতে। গত আন্তর্জাতিক উৎসবে ওঁর ছবি 'সিদ্ধার্থ' ছিল আমেরিকান এন্ট্রি। বিভিন্ন সভায় এবং সাংবাদিক সম্মেলনে একাধিকবার দেখতে দেখতে প্রায় পরিচিতের পর্যায়ে এসে গিয়েছিলেন ছবিটির পরিচালক কনরাড রুকস। দীর্ঘ চেহারা। চোখে গাম্ভীর্যের ছাপ, কথা বলেন রয়ে সয়ে।

গত বছর কলকাতায় এসেছিলেন অল্প কদিনের জন্য। সেবারও দেখা হয়েছিল। দিল্লীর পরিচয়টা ঝালিয়ে নিয়ে বেশ ঘণ্টা-খানেক মৌতাতে কেটেছিল ওঁর হোটেলে।

আবার এসেছিলেন রুকস এই শহর কলকাতায়। 'সিদ্ধার্থ'র সর্বভারতীয় মুক্তি উপলক্ষে এসেছিলেন তিনি। চোখে চোখ পড়তেই লম্বা হাতখানা দশ গজ দূর থেকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আর মুখে 'ওয়েলকাম' শব্দটির পুনঃপুনরুক্তি।

প্রথম দিনভোজসভার ভিড় ছেঁড়া ছেঁড়া কথায় আনন্দ পাইনি তাই যখন আজি রাখলাম পরদিন সকালে দেখা করার, রুকস এক কথায় রাজী। শুধু এটুকু বললেন—'কাম অ্যাট টেন সাপ অ্যাজ আই হ্যাভ অ্যানাদার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অ্যাট ইলেভেন।'

একে বাঙ্গালীদের সময় জ্ঞান বিশ্ব-বিখ্যাত। সুতরাং সেই সুনামের কথা খেয়াল করেই কাঁটায় কাঁটায় দশটায় যখন হোটেল ঘরের দরজায় টোকা মেরেছি ভেতর থেকে ভরাট গলায় জবাব এসেছে—'ইয়া কাম ইন। ওয়েটিং ফর ইউ স্যার।'

মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সঙ্গীকে পাশের ঘরে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন—'শুরু করুন এবার সময় বড় মূল্যবান।'

আমি ওঁর চোখের তারায় তাকিয়ে আছি। বাদামী রংয়ের মধ্যে উজ্জ্বল আভাষ। চিন্তার ছাপ চোখের আশপাশে। 'সিদ্ধার্থ'র ভবিষ্যৎ নিয়ে হয়তো খুব চিন্তা করছেন। রুকসের চোখের দিকে তাকিয়েই বললাম—'আমার প্রথম প্রশ্ন—ভারতের প্রতি আপনার আকর্ষণ কেন এবং কিভাবে?'

হাসলেন। বুঝলাম এই প্রশ্নের জবাব বোধহয় তাঁকে কাল রাত্তিরে অনেককেই দিতে হয়েছে। একটু থেমে বললেন—আমার দেশ আমেরিকা আজ সভ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু জীবনের পরম-চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি। সব কিছু পাবার পরও কিএক অচেনা-অজানা বস্তু যেন নাগালের বাইরে থেকে গেছে তাঁদের আর সেই পরমের সন্ধানেই আমি এসেছিলাম একদিন সিংহলে তারপর ভারতে।

'এখানকার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, ধর্মীয় দর্শন আমাকে আকৃষ্ট করে। বেদ-গীতা আমি পড়েছি, বুঝেছি এজগৎ মায়াময় অনিত্য সব। একমাত্র সত্য চির সত্য হলো আত্মা। আত্মা অবিনশ্বর। সেই চিরসত্যের সন্ধানে এদেশে আসে ওদেশের লোকেরা। কেউ উপলব্ধি করতে পারে কেউ পারে না।'

শুনলাম আপনার কথা কিন্তু ছবি আমেরিকায় করলেন না কেন, ওখানেতো প্রভূত সুযোগ। একই সুরে তিনি বললেন—'সুযোগ থাকলেও পরিবেশ নেই, আপনা-দের এদেশে এখনও হিউম্যান ভ্যালুজগুলো আছে। বোধগুলো মরে যায়নি। একদিক শহরগুলোর যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ যেমন

কিছুক্ষণ

মিঃ রুকস, মৃণাল সেন এবং তপন সিংহ। অমৃত ফটো

হচ্ছে তেমনি হিমালয়ের গভীর অরণ্যে চলছে সাধু-সন্তদের জীবন সাধনা।'

কনরাড রুকস আসলে কিন্তু কবি। তাঁর হাতে খড়ি হয়েছিল কবিতা দিয়েই। নামডাকও হয়েছিল একসময়। গিনসবার্গ, বারো ছিলেন তাঁর বন্ধুদের দলে। প্রথম ছবি 'চাম্পাকুয়া' নিজেরই এক দীর্ঘ কবিতায় ফসল। এই ছবিটি তাঁকে ভেনিস উৎসবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার এনে দিয়েছিল। মাদকাশক্ত এক তরুণের মানসিক উত্থান-পতনের বিশ্লেষণ আছে সেই ছবিটিতে। আত্মহননের মধ্য দিয়েই ছবির নায়ক বুঝতে পারল—'এ পথ মুক্তির নয়, মৃত্যুর।'

তাই তৈরী করলেন 'সিদ্ধার্থ'। একবারে বিপরীতধর্মী ছবি। জিজ্ঞেস করলাম 'এই কাহিনীটি বেছে নেবার কারণ?' বললেন—'কাহিনীকার হারমান হেসের মতই আমি ফিল করি যে এই জগতে সবই মায়া। সংসারের ধর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পার্থিব সুখ এবং আনন্দ কাউকে কখনও আনন্দলোকে নিয়ে যেতে পারে না। নির্বাণ লাভের জন্য একনিষ্ঠ সাধনার দরকার। ছবিতেও আমি সেকথাই বলতে চেয়েছি এবং এই বক্তব্যটুকু উপস্থিত করার জন্যই আমার এই ছবি করা।'

ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন নিয়ে পড়েছেন প্রচুর। আজ ধর্মের প্রতি অবহেলা তাঁকে খুব পীড়িত করছে। বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের দেশে ধর্মের ধূলিমলিন অবস্থায় একজন আমেরিকান হয়ে রুকস সাহেব যতখানি দুঃখিত ভারতীয়দের মধ্যে কজন এমন গভীরে মর্মাহত জানি না।

শুধু দর্শন নয় যোগশাস্ত্র লোকাচার বেদমন্ত্র তাঁর প্রায় কণ্ঠস্থ। পরবর্তী ছবির কথা প্রসঙ্গে তিনি গীতার সাংখ্যযোগের এই শ্লোকটি গড়গড় করে বলে গেলেন—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি
গৃহ্ণাতি নরোঽপরানি।
তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি
সংযাতি নবানি দেহী।।

এক আমেরিকান আত্মা দেহ পেয়েছে এক ভারতীয় তরুণীর আর এক ভারতীয় আত্মা দেহ নিয়েছে এক আমেরিকানের। এই দুই চরিত্রের আত্মিক সংকটের কথাই নাকি থাকবে ছবিতে। ব্যাক গ্রাউন্ড ভারত। সুটিং হবে বম্বে গোয়া এবং কলকাতায়। ছবির নাম আপাতত ঠিক হয়েছে 'বম্বে ব্লাক।' শোনা যাচ্ছে আনন্দশংকর মিউজিক দিচ্ছেন এই ছবিতে।

'সিদ্ধার্থ' ছবি তৈরীর পেছনে আর যে নামটি কনরাড বারবার উচ্চারণ করেন সেটি হোল স্ত্রী জেনি। বছর কুড়ি আগে এক বর্ষণমুখর বিকালে জেনিই তাঁর কোলের ওপর বইটা ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল—'পড়ে দেখো বইখানা।' কয়েক ঘন্টার মধ্যে শেষ করে রুকস যেন নতুন আলোর সন্ধান পেলেন। জীবনের নতুন অর্থ তাঁর কাছে ধরা দিল। ভারত নিয়ে ভাবনা শুরু হোল রুকসের।

'পনের বছর বাদে ছবি করতে গিয়ে তাই ভারতের কথাই মনে এসেছিল প্রথম। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে শুটিং করার অনুমতি চাইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজী হয়েছিলেন। হৃষিকেশ লছমনঝোলার সৌন্দর্যে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁকে আকৃষ্ট করল। শুটিং শেষ করলেন মাত্র বিয়াল্লিশ দিনে।

দুঃখের বিষয় জেনি আর নেই। রুকসের কথায়—'মহান বুদ্ধের মত পদ্মাসনে বসে তাঁর নির্বাণ লাভ হয়েছে। নেপাল-তিব্বত সীমান্তের পোখরায় প্রায় এগার হাজার ফিট উঁচু চেং বোচেন মনাস্টরিতে জেনি মারা যান। এবং তাঁর মৃত্যুর ঘটনা নিয়েও নাকি কিছু কাহিনী ছড়িয়ে আছে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। জেনি না থাকলেও তাঁর অর্ধদেহ রয়েছে এই মরজগতে আর অবিনশ্বর আত্মাতো আছেই। রুকস সাহেব নিজেও মৃত্যুতে বিশ্বাস করেন না। মৃত্যু তাঁর কাছে নির্বাণলাভের সমান আর নির্বাণ মানেইতো মুক্তি চিরমুক্তি।

এই মুক্তির সন্ধানে রুকস ভারতে বহুবার এসেছেন আর এখনতো বছরের প্রায় অর্ধেক সময় কাটছে এখানে। এদেশের শহর-নগর প্রান্তরে তিনি ঘুরেছেন জীবন দেখছেন উপলব্ধি করছেন।

দীর্ঘদিন এখানে থাকার তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি নিশ্চয়ই ভারী হয়েছে। তাই জিজ্ঞেস করলাম 'আমাদের সমাজের কোন জিনিসটি আপনার সবচাইতে খারাপ লেগেছে?' উত্তর যা পেয়েছি তা থেকে এই আমেরিকান সাহেবের ভারতপ্রীতি এবং ভারতীয় ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর চিন্তার কথাই মনে পড়ে। অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে তিনি বললেন—'ভারতীয় দেবদেবী সম্পর্কে এখনও পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধা আছে প্রচুর। বহুদিন এখানে আছি। ধর্মের প্রতি এখানকার লোকদের আগ্রহ ও ভীতি আমার অজানা নয়। সেই সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ মানুষের কি কি পরিবর্তন করছে সেগুলোও দেখছি। তবুও দেখুন আজকাল দেবদেবীর আদি মূর্তির আদল ভেঙ্গে এসেছে হেমামালিনী রাজেশ খান্নার মুখ। হাউ ফানি অ্যান্ড ডেঞ্জারাস ভাবুনতো? এই পিকিউলিয়ার ব্যাপারটাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বোধহয় প্রেমের বেদনা একেই বলে। পার্থিব প্রেম নয় ধর্মপ্রেম, ঈশ্বর প্রেম। এই অধঃপতনে তিনি যেন খুব চিন্তিত। কিন্তু করার কিছু নেই। নির্বাক দর্শক হয়ে আছেন। আমরাই বা কি করছি!

ভারতপ্রেমী কনরাড রুকস অনেক ভালোবাসা আর কিছু দুঃখের বোঝা নিয়ে কদিন পরই চলে যাবেন নিউইয়র্কে নিজের ঘরে। ভিসার কি নিয়ম অনুযায়ী এখন আর ভারতে থাকছেন না। পরবর্তী ছবির স্ক্রিপ্ট রাইটার্স শেষ করে আবার এদেশে আসতে বোধহয় এ বছর শেষ হয়ে যাবে। যাক তবু তিনি আসবেন। না এসে পারবেন না। বিশেষ করে পোখরায় স্ত্রী জেনির যে শেষ স্মৃতিটুকু রয়েছে সেজন্যও তাঁকে আসতে হবে বারবার। তাঁর প্রিয়তমার নির্বাণলাভের স্থান কি ভুলতে পারবেন কখনো?

কখখনো—না।

নির্মল দত্ত

ভ্রম সংশোধন

গত ৪৮ সংখ্যায় 'নেপথ্য' বিভাগে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারী শিল্পীর নাম গৌর পোদ্দার এর স্থলে গৌর দাস হবে।

দম্পতি রণজিৎ মল্লিক ও মালা সিনহা

দশ নম্বরী

প্রযোজনা ঃ সেভেন আর্ট পিকচার্স

যখন পুলিশ ইন্সপেকটার সদাশিব জাল নোটের চোরা কারবারীদের গ্রেপ্তার করার জন্যে নিয়োজিত ছিল তখন তার বন্ধু দ্বারকাপ্রসাদ নিজের জালিয়াতি চাপা দেবার জন্যে কপটতার আশ্রয় নিয়ে মিথ্যা অভিযোগে শিবপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করলেন। জেল থেকে পালাবার অপরাধে শিবপ্রসাদের জেলের মেয়াদ বৃদ্ধি হয়ে চললো। স্বামীর শোকে শিবপ্রসাদের স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল এবং ছেলে অর্জুন পুলিশের খাতায় 'দশ নাম্বরী' হিসাবে পরিচিত হল।

অর্জুন যৌবনে পদার্পণ করে পিতার জেল হবার মূলে যে সব কুচক্রীরা আছে তাদের একে একে খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হয়। দুই কুচক্রী (পিতার বন্ধু দ্বারকা-প্রসাদ এবং শহরের গণমান্য পুলিশ অফিসারের) স্বরূপ উদ্ঘাটন করার ব্যাপারে ফার্ণান্দজের পাতানো মেয়ে রোসি ওঁকে নানাভাবে সাহায্য করে। বিভিন্ন ঘাত ও প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে কুচক্রীদের হাত থেকে রোসি এবং মাকে উদ্ধার করল এবং দ্বারকাপ্রসাদের দলের লোকদের গ্রেপ্তার করে পিতৃহত্যার বদলা নিল অর্জুন। রোসিকেও জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পেল।

আলি রাজার লেখা কাহিনীকে নিয়ে ইতিপূর্বে বহু ছবি নির্মিত হয়েছে। গল্পের ত্রুটি এবং অবাস্তবতা ঢাকা পড়েছে ধ্রুব চ্যাটার্জীর চিত্রনাট্য, মদন মোহনের পরিচালনা এবং আঙ্গিক ও কলা-কৌশলের কাজ এবং অপূর্ব অভিনয়ের জন্যে। অভিনয়েঃ—মনোজকুমার (অর্জুন) রোসি (হেমামালিনী) মা (কামিনী কৌশল) শিবনাথ (অভি ভট্টাচার্য) পুলিশ ইন-স্পেকটারের দ্বৈত ভূমিকায় প্রেমনাথ ও-সি আই ডি অফিসার (প্রাণ) ও দ্বারকাপ্রসাদের ভূমিকায় ওম শিবপুরী বেশ সাবলীল। সম্পাদকের কাঁচি মাঝে মাঝে আরো নির্মম হতে পারতো। সঙ্গীত পরিচালনায় লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলাল তাঁদের সুনাম বজায় রেখেছেন। আলোকচিত্র গ্রহণে মদন সিনহার কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। **চিত্রদূত**

হোটেল সেনা-ফক্স্

পরিচালনা—যান্ত্রিক

হোটেল সেনা-ফকস-এর নায়ক কৃষ্ণেন্দু কার্লেকারের আসল কাজ হল ধনী ব্যবসায়ীদের ব্ল্যাকমেল করা। অবশ্যই সেই টাকা দিয়ে সে তার দলের অসহায় মেয়েদের সাহায্য করে। চাকরি চলে গেলে ললিতাও নানা ঘটনার মাধ্যমে এই দলে যোগ দেয়। কে কে-র স্নেহ ভালবাসা পাওয়া সত্ত্বেও এই চোরাপথে অর্থ উপার্জন করতে ললিতার ক্রমশ ভাল লাগে না। তাই এক-দিন সে কাজে ইস্তফা দিতে যায়। আর সেদিনই সেনা-ফকস-এ সে সাকসেনার দেখা পায় যে লোকটি তার বাবাকে মেকিয়ে তাদের বাড়িটা দখল করেছে। কে কের সাহায্যে কিভাবে সাকসেনাকে ব্ল্যাকমেল করে সে তাদের বাড়ি ফিরে পায় ছবিতে তারই পরিচয় মেলে। এরই ফাঁকে জনৈক মিস্তিরের সঙ্গে তার প্রেম ঘটে। আর এই শেষ ব্ল্যাকমেল-এর পর কে কেও সেনা-ফকস থেকে বিদায় নেয়।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা ইত্যাদির বিচারে ছবিটি অত্যন্ত সাধারণ স্তরের। অনর্থক দীর্ঘ ছবিটি প্রায়শঃই ক্লান্তিকর। আমোদ উপকরণ হিসাবে ক্যাবারে নাচ ও গান দিয়ে ছবিটিকে জমাবার চেষ্টা করা হয়েছে বটে কিন্তু অন্যান্য পর্যায় দুর্বল হবার ফলে কোনো কিছুই তেমন গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। নাচ ও গানের প্রাচুর্য ছবির মূডকেও ব্যাহত করে। ধনী ব্যবসায়ীদের যেভাবে ব্ল্যাকমেল করা হয় তা বোধহয় একমাত্র ছবিতেই সম্ভব। হোটেলের পরিবেশও আর একটু ভাল হতে পারত। সুলতা ও মিস্তিরের চরিত্র দুটি কেমন যেন অসম্পূর্ণ ও খাপছাড়া। অন্যান্য অনেক ঘটনার সঙ্গেই বাস্তবের যোগাযোগ কম। প্রাক্তিক গোষ্ঠীর কাছে আর একটু ভাল ছবির আশা ছিল।

কলাকুশলীদের কাজ একরকম এবং নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দের কণ্ঠে মোট সাতখানি গান মোটামুটি ভাল।

তবে ছবির অনেক দুর্বলতা ঢাকা পড়ে গেছে কে কের চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয়-নৈপুণ্যে। প্রথমার্ধে অভিনয়ের সুযোগ কম হলেও শেষের দিকে তিনি একতরফা অভিনয় করে গেছেন। ললিতা চরিত্রে মিঠু মুখোপাধ্যায়ের নাচ ও অভিনয় দুই-ই ভাল। অন্যান্য যাঁরা সুঅভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন শমিতা বিশ্বাস বিজু অসিত-বরণ ও অমরনাথ মুখার্জি।

চিত্রবিচিত্রা

সিমির সঙ্গে

ষোলই এপ্রিলঃ শুক্রবার রাত গভীর হচ্ছে। চারদিকে নিঝুম নিস্তব্ধতা। লাইট হাউসের সামনে এসে দাঁড়াল ক্রিম রংয়ের একখানা গাড়ী। ধবধবে সাদা শাড়ী পরা দুই মহিলা নামলেন। ত্রস্ত পায়ে উঠে এলেন তাঁরা নির্জন নিস্তব্ধ লবিতে। হলের মধ্যে তখন দর্শক পলকহীন চোখে ছবি দেখছে। ডান দিকের কোণের দরজায় এসে দাঁড়ালেন সিমি আর তাঁর মা। ভেতরে পর্দায় তখন 'সিদ্ধার্থ' ছবি চলছে। দরজা একটু ফাঁক করে, রুদ্ধশ্বাসে ছবি দেখছেন সিমি। মাঝে মাঝে হয়ত দর্শকের মাথাও তাঁর চোখ দুটো নড়ছে।

পর্দায় নিজের নগ্ন চেহারা দেখে হয়তো বা সিমি নিজেই কিঞ্চিৎ লজ্জিত শঙ্কিত। দর্শকরা কিভাবে ঐসব দৃশ্যগুলিকে গ্রহণ করবে তাই নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলেন তিনি। ঘন্টাখানেক ছবি দেখার পর একবুক দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ফিরে এলেন লবিতে। চোখে মুখে চিন্তার ছাপ তখনও ছড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলাম তাঁর রি-অ্যাকশান।

পরদিন সিমির সঙ্গে আবার দেখা পার্ক হোটেলের এক পার্টিতে। ছবির ভবিষ্যতের চাইতে নিজের সম্পর্কে বোধ হয় চিন্তা চলছে তখনও। কাঁপা কাঁপা চাউনি আর চোখে আগের রাতে দর্শকদের প্রতিক্রিয়াগুলো মন থেকে মুছে যায়নি।

এত চিন্তার বোঝায় তিনি কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বুঝি। তাই প্রথম প্রশ্নটা শুনেই একটু হাসলেন। হাসিতে স্বতঃস্ফূর্তভাব কতখানি ছিল জানি না। তবে উত্তরে বললেন—'কেন এই রোলটা নিলাম জিজ্ঞেস করছেন তো? শুরুতেই বলে রাখি আমার ছোটবেলা এবং লেখাপড়ার সময়টা কেটেছে বিদেশে নিজের দেশ সম্পর্কে তাই একটু বেশী দুর্বলতাই বোধহয় আছে। এই রোলের অফারটা যখন এলো তখন একটা ভালো ভারতীয় চরিত্র করবো এই আশাতেই নিয়েছিলাম। উপরন্তু ইংরেজী ভাষার ছবি যে ভাষায় আমি স্বপ্ন দেখি চিন্তা করি। সেই সঙ্গে বহুল প্রচারের আসা যে একবারে করিনি তা নয়'।

ঃকাজ করতে গিয়ে কেমন লাগলো?

এবারের হাসিতে সোনা ঝরানো রূপ ছিলো। চড়া মেক-আপের মধ্যেও সিমির সেই হাসি বুক থেকেই উঠেছিল! হাত নাড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে তিনি বলে উঠলেন—'দারুণ লেগেছে। ফ্যাসিনেটিং। ইউনিটের সবার মধ্যে টিম স্পিরিট ছিল দারুন। উপরন্তু পরিচালক বুকসের সঙ্গে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গিয়েছিল খুব।'

অভিনয় করতে করতে সিমি নাকি অনেক সময় 'কমলা'র চরিত্রে ডুবে যেতেন। চরিত্রটি তাঁকে মাঝে মাঝে উজ্জীবিত করে তুলেছিল কেন।

ঃ নগ্ন দৃশ্যগুলিতে অভিনয় করতে গিয়ে কোনো সংকোচ বোধ করেছিলেন কি?

উত্তরে অনেক কথা বললেন তিনি। মোদ্দা ব্যাপারটা হোল প্রথমে ঐসব দৃশ্য করতে রাজী হননি। ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কি করবেন তাই নিয়ে। ছবির কাজ অর্ধেক হয়ে গেছে তখন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি তখন চলে যান রাজ কাপুরের কাছে। পরামর্শ চান। বুঝিয়েসুঝিয়ে রাজ কাপুরই রাজী করান সিমিকে। বলেন—'চিন্তার কিছু নেই। তাছাড়া তুমি বুকসের কাছে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট কমিটেড। না করে উপায় কি?

তবে দৃশ্য গ্রহণের আগে বুকস আর সিমির মধ্যে ঠিক হোল সুরুচি ও শিল্পসম্মতভাবে দৃশ্যগুলির চিত্রগ্রহণ করতে হবে। হলোও তাই। কোনো অসুবিধে হলো না। সিমি তাই এখন খুশী।

তবুও চিন্তা ছিল দর্শকরা কিভাবে নেবে তাঁর স্বামী বাড়ীর লোকরাই বা কি ভাববে, ভারতীয় সেন্সর বোর্ড এসব দৃশ্য আলাউ করবে কিনা। ছবি দেখার পর উদ্বেগ না গেলেও কিঞ্চিৎ স্বস্তি এসেছে সিমির।

একটু দ্বিধান্বিত চিত্তে তিনি তাই জিজ্ঞেস করলেন—কি মনে হচ্ছে আপনার? ইমেজের কোনো ক্ষতি হবে?

বললাম—আমার তো মনে হয় না। দর্শকরাতো ভালোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করেছে মনে হোল।

দ্বিধা তবুও গেল না সিমির আস্তে আস্তে বললেন—'সব শহরতো কলকাতা নয়। বম্বে এখনও বাকি।' দরদর বুকে সেই পার্টিতে আরও কজনের কাছে সিমি এই প্রশ্ন রেখেছিলেন জানি না কিন্তু বিদায় মুহূর্তে তাঁর চোখে উৎকণ্ঠার আভাষ দেখেছি।

—রাগীশ্বর ঝ

স্বদেশী ছবি

উল্লেখযোগ্য ছবি 'সিদ্ধার্থ'

ষাটের দশকে যখন পাশ্চাত্য দেশে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের শূন্যতার সৃষ্টি হয় তখন সেখানকার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে অনীহার ফলে তাদের মধ্যে যে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয় তারই ফলস্বরূপ বিটলস হিপি ইত্যাদি সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। যারা কালক্রমে ভারতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং এদেশের অধ্যাত্মবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের ধারণা হয় ভারত এবং তার আশ-পাশের হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী দেশ-গুলিতে ধর্মের এমন একটা মাদকতা আছে (হিন্দু ধর্ম যার মূল) এমন একটা আকর্ষণ এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার উত্তরণ আছে যা অন্যত্র কোথাও নেই।

হিন্দুধর্মের সেই অন্বেষণ যাকে বলা যায় আত্মানুসন্ধান তাই 'সিদ্ধার্থ' ছবিরও মূল বক্তব্য। এ কাহিনীর সময় দু হাজার বছর আগের ভারত।

ছবির নায়ক সিদ্ধার্থ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান। যে কৈশোরের সুখের দিনগুলি অতিক্রান্ত করে একদিন পিতা মাতাকে ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সাধুসঙ্গের বাসনায় জীবনের সত্যিকারের অর্থ কি তাই উপলব্ধি করতে। এই অধ্যাত্ম-জীবনের অন্বেষণে তার সঙ্গী ছিল আবাল্য বন্ধু গোবিন্দ।

সিদ্ধার্থ চিত্রে সিমি

ছ বছর কৃচ্ছ্রসাধন ও অনুসন্ধানের পর সে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হোলো। কিন্তু একদিন তার মনে হোলো এখানেও তার অন্বেষণ বা আত্মানুসন্ধানের শেষ নয়। তাই আবার সে পথে নেমে এলো; এবার সে একা।

এই সময় কমলা নামের একটি সুন্দরী ধাবমানার সঙ্গে দেখা হোলো। সুন্দরীর রূপ তাকে মুগ্ধ করল। তখন তার মনে হোলো কামনা বাসনা চরিতার্থ করাই বুঝি জীবনের ধর্ম। সে কামে বশ হোলো ক্রমে বিলাস সুখ সবই সে এক এক করে ঘুরে পেলো এবং তাতে গা ভাসিয়ে দিল।

সেই সুখ যখন একদিন ভাঙ্গল তখন মনে হোলো যা সে চায় যে আত্মানু-সন্ধানের জন্য তার এই সংসার ছেড়ে অস্থির হয়ে ছুটে বেড়ানো তা যেন সে পায়নি। তাই সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবার সে বাইরে বেরিয়ে এলো একাকী দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে।

সেই পথ চলতে একদা দেখা হোলো এমন একজন বৃদ্ধর সঙ্গে যার নাম বাসুদেব যার কাজ যাত্রীদের নদী পারাপার করানো। তার কাছে সে শিখলো অতি সাধারণ জীবনযাপনের আনন্দ।

সেই ফেরীঘাটেই আকস্মিকভাবে এক-দিন কমলার সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলো তার সঙ্গে তখন সিদ্ধার্থরই সন্তান। সে চলেছে তীর্থ দর্শনে। কিন্তু কমলার সে বাসনা পূর্ণ হয় না আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় (এটাই কি নিয়তি?) অর্থহ সন্তান [illegible] যায় সিদ্ধার্থর

শিশুনাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে একটি অমূল্য বই সমর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা

রঙ্গালয়ের রঙ্গকথা — ৮

এই বই সম্বন্ধে অহীন্দ্র চৌধুরী বলেছেন : শিশু ও কিশোর মনের একটি পুরনো অভাব পূরণ করবে। মন্মথ রায় বলেন : নাট্য প্রযোজনা ও নাট্যাভিনয়ের পক্ষে একটি অমূল্য ও অপরিহার্য অবদান।
দেবনারায়ণ গুপ্ত বলেন : শুধু কিশোররাই নয় বড়োরও উপকৃত হবেন।

শিশু রংমহল প্রকাশনী

অরুণ মহল ০ গড়িয়াহাট রোড
কলিকাতা—২৯
ফোন : ৪৬-১২০০

কোলে। সিদ্ধার্থ তখন তার সেই সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু সে সিদ্ধার্থকে অস্বীকার করে ঘৃণায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। সিদ্ধার্থের সেই আত্মানুসন্ধান আবার পথ পরিবর্তন করে।

শেষ পর্যন্ত সেই ফেরীঘাটের বৃদ্ধ তার ওপর ফেরী পারাপারের দায়িত্ব দিয়ে দেবতার উদ্দেশে চলে গেলে সিদ্ধার্থ সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যায়। তখন সে প্রশান্ত স্থিতধী জীবন আর আধ্যাত্মিকতার সত্যিকারের মূল যেন খুঁজে পায় সেই জীবনের মধ্যে।

সিদ্ধার্থর মূল গল্পের কাঠামো এই। এর মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের রূপ দেখানো হয়েছে যার মধ্যে সত্যিকারের জীবনদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় হিন্দুধর্ম অধ্যাত্মবাদ খুঁজে পাওয়া যায়।

পরিচালক কনরাড রুকস (যিনি একাধারে এ ছবির প্রযোজক এবং চিত্রনাট্যকারও বটে) ভারতীয় নন আমেরিকান। তবু তিনি এমন একটি দুরূহ ছবি করতে সাহসী হয়েছেন বলে তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ।

এই সঙ্গে মিঃ রুকস আর একটি জিনিষ দর্শকদের উপহার দিয়েছেন সেটা হোলো তাঁর সৌন্দর্যবোধ। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে ভূমিকা তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যামেরার চোখে রঙীন তুলিতে। এ ছবির ক্যামেরার কাজের প্রশংসা করা যায় না। (ক্যামেরা সভেন নীকভিস্ট। ইনি সুইডেনের লোক এবং খাঁতনাম্মা)।

আর অভিনয়? এ ছবির নায়ক শশী কাপুর। যার অভিনয় যেন কখনোই অভিনয় বলে মনে হয়নি। (শেষদিকে তার মেক-আপ অবিশ্বাস্য বললেও যেন সঠিক বলা হয় না)। শশী কাপুর চরিত্রটি আশ্চর্যভাবে বিশ্বাস করে তুলেছেন।

সিমি গারেওয়ালের কমলা রূপে লাবণ্য প্রণয়ে সর্বোপরি সুন্দর বাচন-ভঙ্গীতে অত্যন্ত সজীব।

আর একটি ছোট্ট চরিত্র অবাক করেছে তিনি ফেরীঘাটের মাঝি (জুল ভেল্লানী)। চরিত্রটি খুবই স্বাভাবিক।

সিদ্ধার্থর অধ্যাত্ম সঙ্গী গোবিন্দর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন রমেশ শর্মা, যেমন দর্শকদের ভালো লাগবে ব্যবসায়ীর চরিত্রে পিন্কু কাপুরকে।

সঙ্গীত হেমন্তকুমারের। তাঁর দুটি বাংলা গানের (পথের ক্লান্তি ভুলে—মরুতীর্থ হিংলাজ এবং ও নদীরে—নীল আকাশের নীচে) দীর্ঘ অংশ এ ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে। সিদ্ধার্থ যখন গৃহের গণ্ডী ছেড়ে পথে নেমে এলো তখন 'পথের ক্লান্তি ভুলে' গানটি সুন্দর এক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল এবং শেষের দিকে নদীর সঙ্গে যখন জীবনকে তুলনা করা হয় তখন 'ও নদীরে' গানটি জীবনের অন্য এক অর্থ দর্শকদের কাছে তুলে ধরার সহায়ক হয়েছে। তবে দুটো গানই বিশেষ করে প্রথম গানটির পুনঃ পুনঃ ব্যবহার এবং একটু উচ্চরবে সেই সঙ্গে অনেক জায়গায় বাঁশীর ঘন ঘন প্রয়োগ কাহিনীর গাম্ভীর্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছে।

মিঃ রুকসের এই ছবি একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

শা, র, চ

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী—৪

১৯৩০ খৃষ্টাব্দটিও বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য নানাদিক দিয়ে। দীর্ঘদিনের স্টার থিয়েটার (মনমোহন মঞ্চ) চিত্তরঞ্জন এভেনিউর গর্ভে যেন বিলীন হয়ে যায়, তেমনি নতুন দুটি দুটি নাট্যগৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়। বর্তমান বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের স্থানে রাজা রাজকিষণ স্ট্রীটে গড়ে ওঠে—নাট্যনিকেতন আর কর্নওয়ালিশ অর্থাৎ বর্তমান বিধান সরণিতে নির্মিত হয় রঙমহল রঙ্গমঞ্চ। শিশিরকুমার যাত্রা করেন মার্কিন মুলুকে। অন্যান্য রঙ্গমঞ্চেও নানা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। শিশিরকুমারের শিষ্য ও ছাত্র যশস্বী অভিনেতা রবীন্দ্রমোহন রায় সংগীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে-র উদ্যোগেই মূলতঃ গড়ে ওঠে রঙমহল লিঃ। পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন এরা ছাড়া ষষ্ঠীকুমার গাঙ্গুলী, ডি এন ঘর হেমচন্দ্র দে এফ আমেদ এন সি চন্দ্র প্রভৃতি। ১৩৩৮ সালের ১৭ই বৈশাখ (১৯৩১) অপরেশচন্দ্রের সভাপতিত্বে রঙমহল রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন উৎসব সম্পাদিত নাট্যবিদ শিশির মল্লিক ও যামিনী রঙমহলের সঙ্গে যুক্ত হন ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে। শিশির মল্লিকের উদ্যোগে সত্য সেনের নির্দেশে রঙমহল বাংলার সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়। রবি রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে শেষপর্যন্ত রঙমহলের যোগ ছিন্ন হয়। ১৯৩১। আমেরিকা থেকে দিল্লী হয়ে শিশিরকুমার কলকাতায় এলেন। সত্য সেন ফিরে এসেছেন আমেরিকা থেকে। কলকাতাতে কোন মঞ্চই শিশিরকুমার পেলেন না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন শুভানুধ্যায়ীদের চেষ্টায় পুরোন নাটক নিয়ে হাওড়ায় অভিনয় করলেন। রঙমহলের পরিচালকরা শিশিরকুমারকে শেষ পর্যন্ত রঙমহলে নিয়ে এলেন। শিশিরকুমারকে দশ হাজার টাকা বোনাস দেওয়া হল। ৮ই আগষ্ট ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হল যোগেশ চৌধুরীর বিকৃপ্রিয়া। আমেরিকা প্রত্যাগত সত্য সেন আলোর বিন্যাসে মুগ্ধ করলেন। নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে অলোক-সঙ্গীতের নেপথ্যও পৃথক সত্তা নিয়ে দেখা দিল। অভিনয়ে রইলেন শিশিরকুমার—নিমাই নৃপেন রায়—নিতাই শীতল পাল—শ্রীবাস। কৃষ্ণচন্দ্র দে—পাগল কার্তিক দে—রামরূপ, অমলেন্দু লাহিড়ী—আচার্য, প্রভা—বিকৃপ্রিয়া কঙ্কাবতী—শচীমাতা রাজলক্ষ্মী—মালিনী সরযূ—নারায়ণী, তাছাড়া আরো অনেকে রইলেন। রবি রায় একমনে ভূতের চরিত্রে অভিনয় করেন। বিকৃপ্রিয়া এক মধুর নাট্য সৃষ্টি হয়েই কীর্তিত হয়। তবে রঙমহলে বেশী দিন শিশিরকুমারের পক্ষে যুক্ত থাকা সম্ভব হয় না। রঙমহলে দেখা দেয় নানান বিশৃঙ্খলতা। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমারকে বহু বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। নাটঘর পত্রিকার শচীন সেনগুপ্ত, হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর কয়েকটি প্রবন্ধেও কিছু কিছু বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায়। অথচ এঁরা সবাই ছিলেন শিশির অনুরাগী। শিশির প্রতিভার কাছে যে প্রত্যাশা ছিল সেই প্রত্যাশা পূর্ণ না হওয়াতেই তারা মাঝে মাঝে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। ১৯৩১-৩২ সালে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বিকৃপ্রিয়া কিন্তু সেখানেও ভাঙ্গন ও অনিশ্চয়তা। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রবোধচন্দ্র গুহমশায় শিশিরকুমারকে নাট্যনিকেতনে নিয়ে এলেন। এখানে চন্দ্রগুপ্ত ষোড়শী প্রভৃতি নাটকের সম্মিলিত অভিনয়ে শিশিরকুমার অংশ গ্রহণ করেন। চন্দ্রশেখর নাটক শিশিরকুমার চন্দ্রশেখর আর প্রতাপ চরিত্রে অভিনয় করেন দুর্গাদাস। শিশিরকুমারের পরিচালনায় নাট্যনিকেতন মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত লিখিত মহাপ্রস্থানে। অভিনয় শিশিরকুমার শ্রীকৃষ্ণ। ভীমসেন ঘোষ—জরাসন্ধ শৈলেন

সেই চোখ । উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী

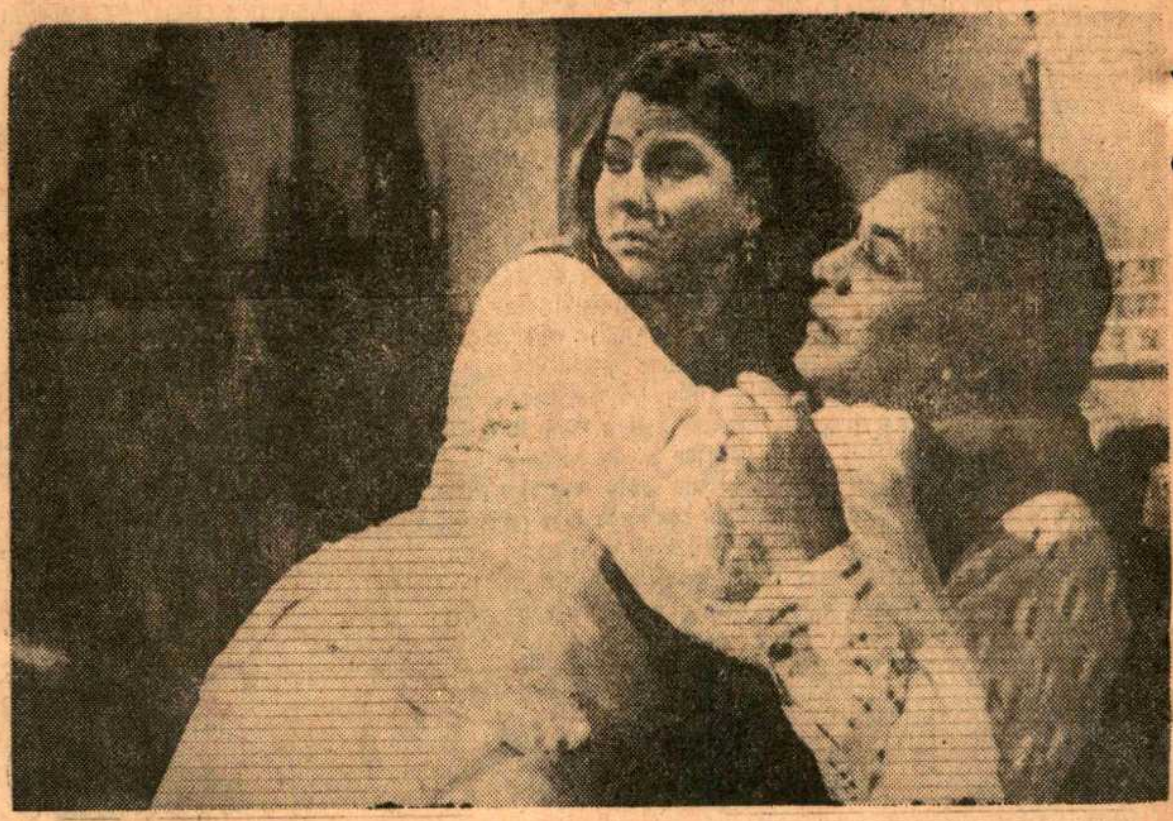

চৌধুরী—অর্জুন, যোগেশ চৌধুরী—বসুদেব, মণি ঘোষ—বলরাম, কঙ্কাবতী—গান্ধারী ও রুক্মিণী নীহারবালা— লক্ষ্মন ময়াবতী—পতুল উষাবতী—বন্ধ্যা ঠাকুরাণী। মহা প্রস্থান শিশিরকুমারের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। সম্মিলিত এবং মফঃস্বলে অভিনয় করে শিশির সম্প্রদায়কে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলো। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে শিশিরকুমার এলেন ষ্টার থিয়েটারে। ১ জুলাই ১৯৩৩ কবিগুরুর বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার চরিত্র অংশ গ্রহণ করে সদলবলে আত্মপ্রকাশ করেন। ২৫ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় যদুনাথ খাস্তগীরের অভিমানিনী। বালা চরিত্র কঙ্কাবতী প্রশংসিত হন। নরেন দেব রচিত ফুলের আয়না এই সময় মঞ্চস্থ হয়।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অবলুপ্তি ঘটলে শিশিরকুমার ষ্টার থিয়েটার লীজ নিয়ে নবনাট্য মন্দির নামে আত্মপ্রকাশ করেন নতুনভাবে। আমেরিকা থেকে প্রত্যাগমনের পর রাহুকবলিত সূর্য রাহুমুক্ত হয়ে নতুন করে নাট্যগগনে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। বিরাজবৌ শরৎচন্দ্রের পরিণত বয়সের রচনা নয়। কিন্তু এই বিরাজবৌ-র নাট্যরূপই সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ষ্টার রঙ্গমঞ্চে ৩ আগষ্ট ১৯১৮ সালে। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নাট্যরূপে শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। শিশিরকুমারের নির্দেশে বিরাজবৌ নতুন রূপ নিয়ে মঞ্চস্থ হল ২৮ জুলাই ১৯৩৪ সালে। অভিনয়ে রইলেন শিশিরকুমার—নীলাম্বর প্রভাত চ্যাটার্জি—পীতাম্বর কানু ব্যানার্জি—নিতাই গাঙ্গুলী শান্তশীল—গাঙ্গন সন্ন্যাসী কঙ্কাবতী—বিরজবৌ রাণীবালা—মাহিনী রাধারাণী — সুন্দরী চরিত্রেঅভিনয় করেন

বিরাজবৌ নিয়ে আত্মপ্রকাশের পূর্বে শ্রীরামপুর টকীজ-এ একবার আলমগীর অভিনয় করেন এই অভিনয়ই কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বিক্রম সোলাঙ্কির চরিত্রে সর্বপ্রথম শিশিরকুমারে সঙ্গে মঞ্চাবতরণ করেন। বিরাজবৌর মধ্য দিয়ে শিশির প্রতিভার স্পর্শ আবার নাট্যামোদীরা শহরিত হয়ে উঠলেন।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

শিশু উৎসব

সম্প্রতি কলকাতাস্থ ফরাসী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশু উৎসব প্রস্তুতি কমিটি আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিশেষ কৃতী প্রতিযোগীদের বেতার দূরদর্শন সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীপার্থ ঘোষ বলেন আজকের এই শিশু শিল্পীরাই আগামীদিনের সাংস্কৃতিক জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। কৃতী প্রতিযোগী কুমারী সুজাতা রায় ও কুমারী সর্বাণী সেনগুপ্তা রবীন্দ্রসঙ্গীত শ্রীমান সারথি চট্টোপাধ্যায় ও কুমারী মহুয়া চট্টোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গসঙ্গীত ও ভজন কুমারী মধুমিতা ভট্টাচার্য ও শ্রীমান সুতনু মুন্সী আবৃত্তি পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন জয় করে। উদ্যোক্তারা জানান কলকাতাসহ পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন শিক্ষায়তনের প্রায় ৫০০ শতাধিক প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এর বিশেষ সাহায্য এই উৎসবকে সমৃদ্ধ মণ্ডিত করেছে।

ক্লান্ত রূপকার

গত ১৪ এপ্রিল '৭৬ অবনমহলে শ্যামল স্মৃতি পরিষদের সভ্যবৃন্দ শৈলেন গুহনিয়োগীর ক্লান্ত রূপকার অভিনয় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। একক ও দলগত অভিনয়ে শিল্পীদের চাতুর্যপূর্ণ অভিনয়ে অনুষ্ঠানটি বিশেষ উপভোগ্য হয়।

আশু বন্দ্যোপাধ্যায় (রঞ্জিত) সমর হালদার (নিধু) পার্থ গোস্বামী (আবদুল) নিজ নিজ চরিত্রে অপূর্ব অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্র সুঅভিনয় করেন তরুণ ঘোষ অশোক গুহ মুখোপাধ্যায় পিনাকী ব্যানার্জী ঘোষ।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

UNIVERSITY 2 MAY 1976

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 7th May, 1976
Phone : 55-6231 (14 lines)

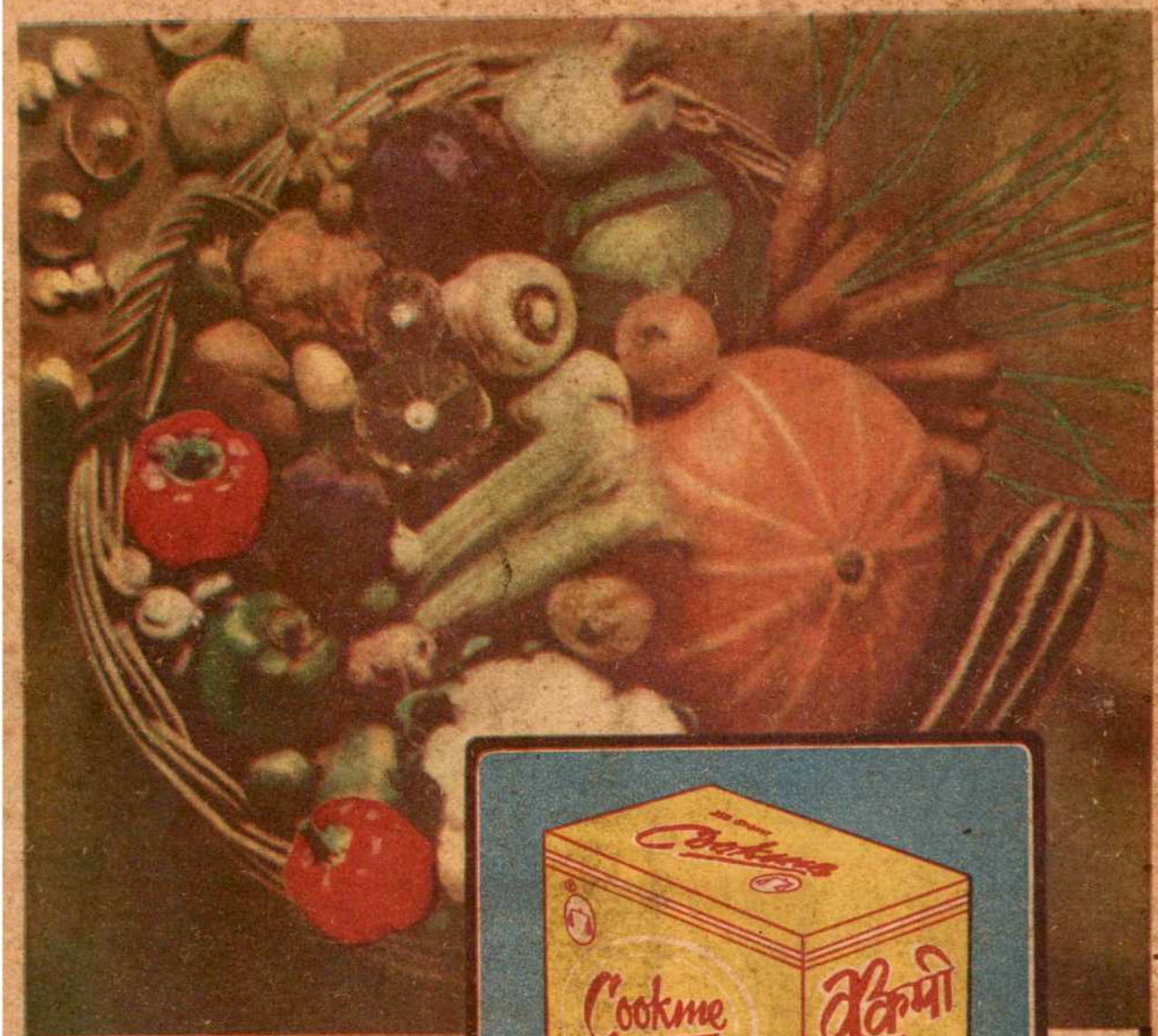

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
এন) কোন ব্র্যাণ্ড
ও
আপত্তি নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা:- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :– বড়বাজার ৬৮৮৫

aaa/KCD-176

3 MAY 1976
CALCUTTA UNIVERSITY

অমৃত
সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /
২১ মে ১৯৭৬ ॥
মূল্য ৭৫ পয়
অতিরিক্ত [illegible] মাশুল ৭ পয়

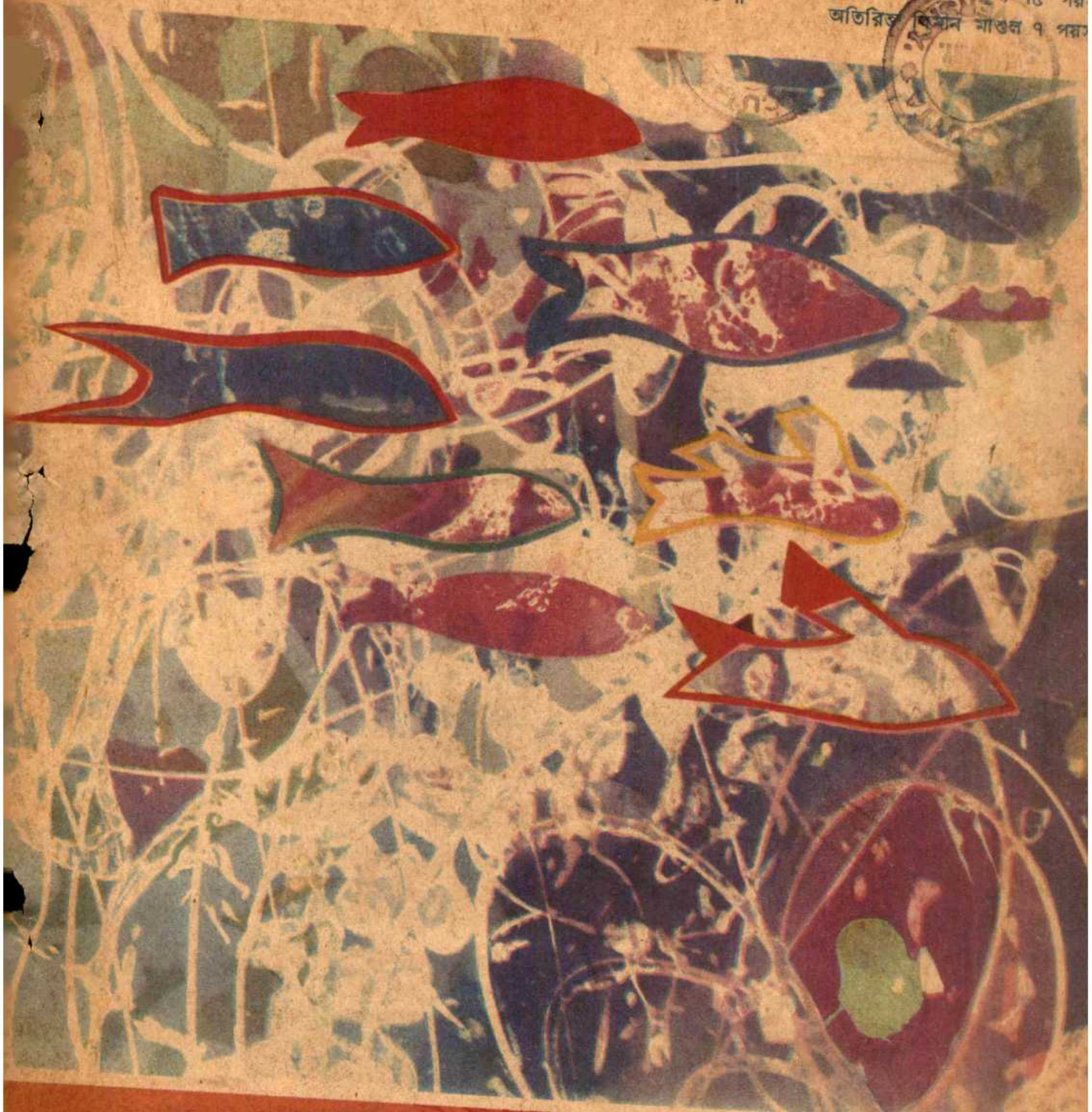

বোরোলীন যার সহায়
[illegible]ম্মে তার ভয় কি?
যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই অকৃপণ সৃষ্টির নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সুন্দর আগে তুলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও ত্বকের প্রকাশ্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতগুলো দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।
বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের [illegible]রে কাটা-ছেঁড়া-ক্ষত অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।
ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাঃ লিঃ বোরোলীন হাউস, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

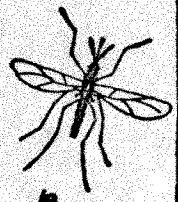

সবচেয়ে বেশী ক্ষতির মশা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমস

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন ● শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA

CHAITRA BLS 45 BEN

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুজাতকের নতুন সৃষ্টি

১৩৮৩ কেমন যাবে ও বর্ষফল পঞ্জিকা

জন্মসময় রাশি লগ্ন সব কিছু মিলিয়ে নিজের ভাগ্যকে জানবার
একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। দাম চার টাকা মাত্র।

॥ সদ্য প্রকাশিত নতুন বই ॥

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের — গজেন্দ্রকুমার মিত্রের — আশাপূর্ণা দেবীর

রঙীন সাঁকো ১০, হায়নার দাঁত ৬, পলাতক সৈনিক ৭॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর — নারায়ণ সান্যালের

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ৯, নক্ষত্রলোকের দেবতা ১৪,

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের — হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের — বাণী রায়ের

মনে মনে খেলা ৬॥ বন্ধনে ফেরা ৭॥ জনারণ্যে একমুখ ১২,

বিভূতি মুখোপাধ্যায় রচনাবলী
৪র্থ খন্ড পাওয়া যাচ্ছে।
ঃ কুড়ি টাকা ঃ

সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী
৬ষ্ঠ খন্ড পাওয়া যাচ্ছে।
ঃ কুড়ি টাকা ঃ

— শ্রেষ্ঠ ক্লাসিক্স্ গ্রন্থের পেপার ব্যাক সংস্করণ —

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের — প্রবোধকুমার সান্যালের

কলকাতার কাছেই ৬, উপকণ্ঠে ১০, মহাপ্রস্থানের পথে ৩॥

প্রমথনাথ বিশীর — বনফুলের — আশুতোষ রায়ের

কেরী সাহেবের মুন্সী ৬, স্থাবর ৬, পথে প্রবাসে ৩,

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরণ্যক ৭, পথের পাঁচালী ৬, ইছামতী ৮,

বিমল মিত্রের
নবতম উপন্যাস
যে অঙ্ক মেলেনি ১২,

সমরেশ বসুর
সদ্য প্রকাশিত উপন্যাস
সূর্যতৃষ্ণা ৯,

তারাশঙ্কর রচনাবলী
দ্বাদশ খন্ড পাওয়া যাচ্ছে।
ঃ কুড়ি টাকা ঃ
গ্রাহকরা বই সংগ্রহ করুন।

সুমথনাথ ঘোষের
সদ্য প্রকাশিত পকেট বই
মরণের পরে
দাম তিন টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

পি এন বি-তে আসুন, প্রত্যেকের পছন্দমতো অনেক আকর্ষণীয় জমা প্রকল্প আছে

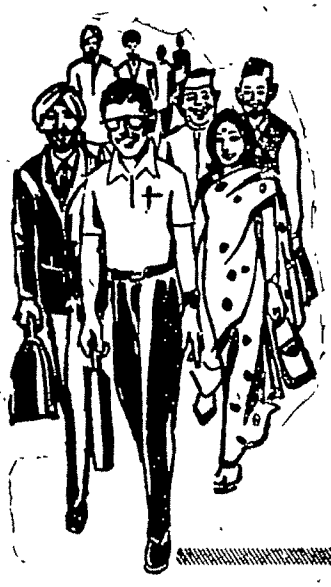

হোল লাইফ মান্থলি ইনকাম : প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সাত বছরের জন্যে জমান; তারপর সারা জীবন ধোরে কিস্তির সমপরিমাণ টাকা 'পেনসান' নিন এবং উত্তরাধিকারীদের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করুন—আপনার আসল টাকায় হাত পড়বে না।

মাল্টি-বেনিফিট অ্যাণ্ড ওল্ড এজ ডিপজিট : কুড়ি বছরের জমায় আপনার টাকা বছরে 31.6% হারে বাড়বে; পাঁচ হাজার টাকা দাঁড়াবে 36,640 টাকায়। একশো বা তার বেশি টাকা 13 থেকে 241 মাসের জন্যে জমা দেওয়া যায়।

রেকারিং ডিপজিট : আজই ভবিষ্যতের সংস্থান করুন। 12 থেকে 252 মাসের জন্যে পাঁচ টাকা বা তার গুণিতকে কিস্তি জমা দিতে পারেন।

স্পেশাল ফিক্সড্ ডিপজিট : আপনার ফিক্সড্ ডিপজিটের ওপর মাসিক সুদ নিন; 61 মাসের জন্যে 30,000 টাকা জমা রাখলে মাসে মাসে 250 টাকা সুদ পাওয়া যায় অথচ আসলে হাত পড়ে না।

অটোমেটিক এক্সটেনশান ডিপজিট : আপনার ফিক্সড্ ডিপজিটের সুদ ছাড়বেন না। আমাদের স্থায়ী নির্দেশ দিয়ে রাখুন, মেয়াদ শেষ হোলে আমরা নিজেরাই 'রিনিউ' করিয়ে দেব।

ডিপজিট-লিঙ্কড্ হাউসিং লোন : নিজের বাড়ী করার স্বপ্ন থাকলে তা সাকার করার জন্যে আজ থেকে নিয়মিতভাবে মাসে মাসে কিস্তিতে টাকা জমিয়ে যান; মেয়াদশেষে আপনি যত টাকা জমা দিয়েছেন আমরাও ঠিক সেই পরিমাণ টাকা বাড়ী করার জন্যে আপনাকে ধার দেব।

স্টুডেন্ট ডিপজিট : ছাত্রছাত্রীদের বয়স চোদ্দ বা তার বেশি হোলে তারাও নিজেদের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে আর নিজেরাই চেক কাটতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্যে আমাদের নিকটতম শাখায় চোলে আসুন :

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

DAVP 76/8

১৬ বর্ষ

অমৃত

২ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 21st May, 1976 শুক্রবার ৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	দুপুরের অতিথি		শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
১০	প্রেমেন্দ্র মিত্র		শ্রীরেখা বড়ুয়া
১০	জীবন-সীমানায়		শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
১৪	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৫	বিজ্ঞাপন-বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
১৭	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২০	কুয়াশার মধ্যে	(কবিতা)	শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্তী
২০	চৈত্রদিনের বৃষ্টি	(কবিতা)	শ্রীমনোরমা সিংহ রায়
২০	এখন ভাল আছি	(কবিতা)	শ্রীনারদ রায়
২১	অবিশ্বাস্য	(গল্প)	শ্রীশঙ্করীদাস চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতি প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছন্দ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত

বহু নূতন তথ্য-সম্বলিত সচিত্র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থের সর্বাংশেই প্রভূত উন্নতি সাধনের প্রয়াস করা গিয়েছে। বিস্তৃত নির্দেশিকায় 'দৃষ্টান্ত-সংকলন' ও 'শব্দ-সংকলন' উল্লেখযোগ্য।

মূল্য : লিম্প বাঁধাই ২০·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

বর্ষ ২৮ • সংখ্যা ৪

রচনা ও লেখকসূচি : চিত্রলিপি কবিতিকা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চিঠিপত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মেঘনাদবধ কাব্যে চিত্ররূপ : জগন্নাথ চক্রবর্তী। গঙ্গামঙ্গল কাব্য ও প্রাণবল্লভের 'জাহ্নবীমঙ্গল' : প্রণব রায়। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ডায়ারির উপকরণ : গোপিকানাথ রায়চৌধুরী। গ্রন্থপরিচয় : দেবীপদ ভট্টাচার্য, বিজিতকুমার দত্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রবলিপি : 'ধূসর জীবনের গোধূলিতে' : শৈলজারঞ্জন মজুমদার। চিত্রসূচী : ভূদৃশ্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুখচ্ছবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। জাহ্নবীমঙ্গল পাণ্ডুলিপিচিত্র। মূল্য : ১-৫০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট। কলিকাতা-৭১

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক নিবন্ধ গ্রন্থ

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ মূল্য—৫০-০০

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড : মূল্য ৪৫-০০

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড : মূল্য ৩৫-০০

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

বাংলা সাহিত্যের নবযুগ ৮·০০

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের

বাংলা সমালোচনা পরিচয়

১৫·০০

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল ৮·০০

ডি, এল, রায় রীডারশীপ বক্তৃতামালা

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের

সাহিত্য ও শিল্পলোক ৭·৫০

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র পালের

সমালোচনা সাহিত্য ১৬·০০

শরৎ সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের

শরৎচন্দ্র ১০·০০

নারায়ণ চৌধুরীর

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১০·০০

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য

ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

১৬·৫০

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সম্পর্কে

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের

কবি যতীন্দ্রনাথ ও বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায় ১০·০০

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য

ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর

দাশরথি ও তাঁহার পাঁচালী

১৫·০০

এ, মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দুখানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
২৪	নতুন বই	শ্রীউষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২৫	একালের গান	শ্রীসন্ধ্যা সেন
২৯	গোধূলিয়া (উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩২	একালের চিত্রশিল্পী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩৫	অন্য শেষ রজনী (উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৩৯	সাহিত্যের নেপথ্যে	শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৪২	পুনশ্চ	শ্রীক্ষণপর্শক
৪৩	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৪৪	প্রদর্শনী	শ্রীচিত্ররসিক
৪৫	গোষ্ঠ পাল বাঙালীর গর্ব	শ্রীঅজয় বসু
৪৭	খেলাধূলা	শ্রীদর্শক
৪৮	খেলার জগতে মেয়ে	শ্রীঅময়
৪৯	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫২	ফ্লোর থেকে বলছি	শ্রীমুসাফির
৫৫	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৫৮	নাটমঞ্চ	
৫৯	চিত্রসমালোচনা	শ্রীচিত্রদূত
৫৯	বিদেশী ছবি	শ্রীশা-র-চ
৬২	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রীকুমকুম মুন্সী

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নির্খুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

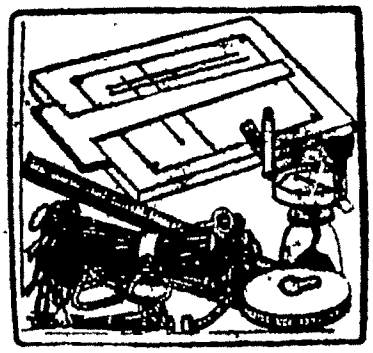

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কার্বন ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক স্টেশনারী স্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার স্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : অয়ারপিন, পোস্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মালন প্রডাক্টস
(স্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে যোগাড় করে
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নার
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAN—KCD-74

এবারের কবিপক্ষ

এখন চলছে কবিপক্ষ। সারা শহর জুড়ে এখন রবীন্দ্রউৎসব। এবং শুধু কলকাতাতেই নয়, শহর ছাড়িয়ে এ ঢেউ এখন ছড়িয়ে পড়েছে দূরে-দূরান্তের মফস্বলেও।

কবির প্রতি এই শ্রদ্ধা খুবই স্বাভাবিক, কেননা রবীন্দ্রনাথ অনন্য।

কিন্তু শুধুই কি তিনি কবি? সাহিত্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দিয়েছেন আমাদের জাতীয় জীবনের কতো বিভিন্ন দিকে নতুন চিন্তার নেতৃত্ব। তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির শিক্ষানীতি, গ্রামীণ আর্থিক ব্যবস্থার বিষয়ে তাঁর অত্যন্ত সাহসী এবং মৌলিক চিন্তাধারা, সমবায়-পদ্ধতির প্রবর্তন— এই ধরণের নিতান্ত অ-সাহিত্যিক অবদানের ক্ষেত্রেও কবির নাম সগৌরবে ঘোষণা করার মতো। আবার জাতীয়তা ও বিশ্বমানবিকতার বিষয়ে তিনি প্রায় ষাট বছর আগেই যা বলেছেন তার নিহিত সত্য যেন দিনের পর দিন আরো বেশি ভাস্বর হচ্ছে।

একজন বিশ্ববরেণ্য কবি যে জীবনের এতগুলি জটিল এবং প্রায় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয়ে চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন, এর একমাত্র ব্যাখ্যা বোধকরি প্রতিভা। কেননা প্রতিভাকে বলা হয়েছে নতুন নতুন উন্মেষশালী বুদ্ধি। তবু বলা যায়, আধুনিক কালে এক মহাকবি গ্যেটে ছাড়া এরকম বিচিত্রগামী প্রতিভাই বা দেখা গেছে কয়জনের মধ্যে!

কিন্তু আত্মগরিমা এই পর্যন্তই। এবার একটু আত্ম-সমালোচনার দিকে চোখ ফেরানো যাক।

কিছুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করার মুখ্য

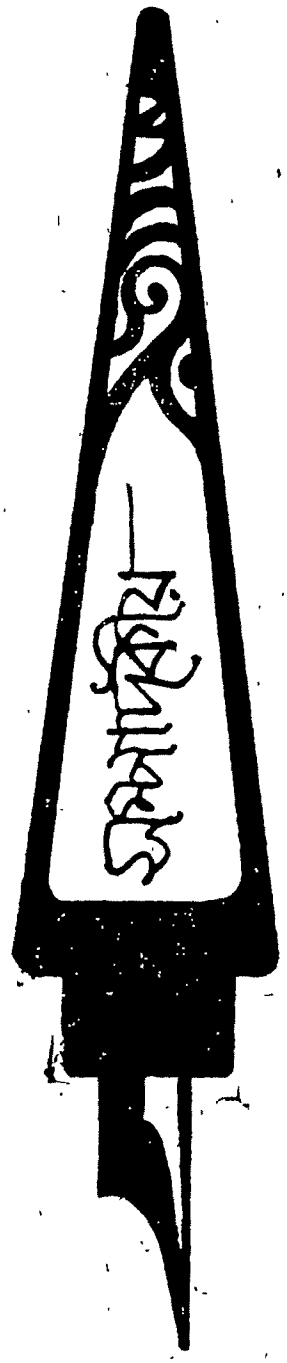

এবং সত্যের খাতিরে স্বীকার করাই ভালো, প্রায় একমাত্র উপাচার হয়ে দাঁড়িয়েছে নাচ-গান আর অভিনয়। আয়োজন যা কিছু তা ঘুগিয়ে গেছেন কবি নিজেই। ঘরের মধ্যেই হোক আর খোলা জায়গায় মেরাপ বেঁধেই হোক গোটা বৈশাখ মাস ধরে এমনকি জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রনাটকের আসর। চলুক তাতে ক্ষতি নেই। এতবড় ফিলিস্টাইন কে যে নির্বিচারে সমস্ত রকম রসবস্তুকে অস্বীকার করাতে হবে তার তৃপ্তি। রবীন্দ্রনাথের গান যে আজকের এই উৎপীড়িত-স্নায়ু মানুষের মনে কী গভীর শুশ্রূষার কাজ করে তা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের জীবনের বহু মৌলিক সমস্যার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে এ যুগের আত্মিকসংকট থেকে পরিত্রাণের ইশারা দেয়। তাছাড়া এসব আয়োজন-উদ্যোগের ভিতর দিয়ে আমাদের সমাজ জীবনে একটি সুস্থতার বাতাবরণ তৈরি হয় সে কথাও খুবই জানি। কিন্তু কথা তো তা নয়। রবীন্দ্র-নাথের শিল্পীসত্তাকে অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে গ্রহণ করেও ভুলে যাওয়া উচিত নয় চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথকে এবং বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দিকে গভীর সম্ভাবনাময় তাঁর কর্ম-পন্থাকেও।

বিশেষ করে আজকের দিনে। শহরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রাকে গ্রামের দিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে যে সচেতনতা আজ জরুরী হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে নিঃসন্দেহেই পেতে পারি আমরা তার ব্যাপক প্রেরণা।

এবারের কবিপক্ষ যাতে এ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, আমাদের আনন্দ-অনুষ্ঠান-গুলির ফাঁকে ফাঁকে সে রকম আলোচনার ব্যবস্থাও থাক না। তাতে দেশেও একটা সুস্থ চিন্তার পরিবেশ তৈরি হবে, আর অন্ধের হস্তিদর্শনের মতো রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও একপেশে ধারণা থেকে হয়তো কিছুটা মুক্ত হতে পারব।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

দুপুরের অতিথি

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কড়াটা একবার দুবার তিনবার কে দাড়ল নিচের দরজায়।

প্রথমবারটা একটু মৃদু দ্বিতীয়বারটা তা নয়; আর তৃতীয়বারটা বেশ কর্কশই।

তৃতীয়বার কড়া নাড়ার সঙ্গে দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালাম।

একটা বেজে সাত মিনিট।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে চৈত্রের দুপুরের রোদ্দুর। দক্ষিণের বন্ধ জানলার খড়খড়ি-গুলোর ফাঁক দিয়েই বাইরের হকলার নমুনা পাচ্ছি।

এমন সময় কে আবার এল দেখা করতে?

ডাকঘরের পিয়নটিয়ন হলে দুবার কড়া নড়বার পর সরব ঘোষণাটাও শুনতে পেতাম। না সেরকম কিছু নয়। এই দারুণ দুপুরে কেউ অন্য কোনো কারণে সাক্ষাৎ-প্রার্থী।

কারণটা যা-ই হোক আপাততঃ দেখা দিতে না চাইলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। আগন্তুককে অনায়াসে অন্য কোনো অনুকূল সময়ে আসতে বলতে পারি।

কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না।

নিচে থেকে আমার পরিচারিকা জানালে যে পাটনা থেকে কে দেখা করতে এসেছেন।

কাছাকাছি কলকাতার লোক হলে যা বলা যায় পাটনার নাম শোনার পর তা আর মুখে আসে না। বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে ওপরে পাঠিয়ে দিতে বললাম।

বাইরের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে খোলা ছাদ থেকে ওপরের ঘরে ঢুকে ভদ্রলোক ঈষৎ হেসে বললেন—চিনতে পারছেন?

পাটনার পটভূমিকায় মনটাকে চালান করে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও তাঁর পরিচয়টা স্মরণ করতে না পেরে একটু 'যা বোঝেন' গোছের হাসি হাসলাম। পারলাম না : ভদ্রলোকের বছর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বয়স। পাকানো শুকনো গোছের চেহারা। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন নয়। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী আর মুখের একটা রুক্ষ কাঠিন্যে একটু যেন ছোটখাট দাদা-গিরির ছাপ আছে।

আমি সুবিমল ধরের ভাই সুকোমল।—বল্লে ভদ্রলোক আমার অনুরোধের অপেক্ষা না করে নিজেই তখন সামনের সোফাটায় বসেছেন।

পাটনার সুবিমল ধরকে আমার খুব চেনা উচিত তা বুঝেও কোনমতেই মনে করতে না পেরে নিজের অস্বস্তি ঢাকতে একটু অপ্রস্তুত হাসির সঙ্গে বললাম, —ও পাটনার। সুবিমল ধর, তিনি —ত. .....

ভদ্রলোক, অর্থাৎ সুকোমল ধর, পাদ-পূরণ করে আমার অস্বস্তি ঘোচালেন, —হ্যাঁ এখানা ন্যাশনাল নিউজ-এই আছেন। তবে কতদিন আর থাকবেন তা বলা শক্ত।

কেন, কেন বলুন তো—এই একটু খুঁই ধরেই কোথাও পৌঁছোন যায় কি না তার চেষ্টা করলাম।

কেন জিজ্ঞাসা করছেন? —সুকোমল ধর কিন্তু আমায় অপ্রস্তুতই করলেন আবার,—এই এক হপ্তা আগেই বাড়ি-ঘর সব খানা-তল্লাসীতে তছনছ করে গিয়েছে তা পড়েন নি।

না, পড়ার অপরাধটা স্বীকার করতেই হল। একটা খোঁড়া কৈফিয়তও খাড়া করতে, —মানে ক-দিন একটু কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল কি না। কাগজটাগজগুলো ভালো করে পড়বার সময় পাইনি।

ও। —বলার ধরনেই আমার কৈফিয়তটা যে মিথ্যে জেনেও ক্ষমা করছেন তা বুঝিয়ে দিয়ে সুকোমল ধর আবার বললেন,—কাগজই হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। আর তা যদি না হয় তাহলেও দাদা ও কাগজে আর থাকবেন(না।

ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের। সুবিমল ধরের ন্যাশনাল নিউজ-এ না থাকার সম্ভাব্যনায় একটা উপযুক্ত মন্তব্য করা উচিত বুঝতে পারলাম। কিন্তু মাথায় কিছুই তখন যোগাচ্ছে না।

কোনরকমে শুধু বললাম,—কিন্তু এত-দিনের সংশ্রবের পর.....

কথাটা শেষ করতে হল না। সুকোমল ধর প্রায় একরকম ধমক দিয়ে আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন,—এতদিনের মানে?

মানে করতে আমি অবশ্য পারাবেই পড়তাম। কিন্তু সুকোমল ধর আমায় সে বিপদে ফেললেন না। উত্তেজিতভাবে বলে গেলেন, —এতদিনের কি বলছেন? ন্যাশনাল নিউজ-এর পত্তন কে করেছে? ও নামটা কার দেওয়া? আজ ত্রিশ বছর আগে হনুমান

মহল্লার বস্তির একটা খাপরার চালের ঘরে কারা ও কাগজ একটা ভাঙা ফ্ল্যাট মেসিনে প্রথম ছেপে বার করে..., দাদা আর আমি! সুবিমল আর সুকোমল ধর! দাদা লিখেছে আমি কম্পোজ করেছি, দাদা কম্পোজ করেছে আমি লিখেছি। সেই কাগজের আজ কি অবস্থা হয়েছে আপনি ত নিজে দেখে এসেছেন সেদিন। মালিকানা বদল হয়ে গেলেও কলম এখনও দাপায়। সে কলম ত্রিশ বছর বাদে থেমে যাবে।

কিন্তু — কিন্তু..... এক দৃষ্টে তন্ময় হয়ে সুকোমল ধবের কথা শুনতে শুনতে যেন চটকা ভেঙে ওই কিন্তুর ওপরই খানিক ঝুলে থেকে বেশ একটু সহানুভূতির সঙ্গেই বলে ফেললাম,—কিন্তু মনোহর পোখরার ওই বাড়িটাও কি সুবিমলবাবু তাহলে ছেড়ে দেবেন—

মনোহর পোখরার বাড়িটা! —সুকোমল ধর একটু যেন চমকে আমার দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীরভাবেই বললেন, —ও হ্যাঁ, আপনি ত সে বাড়িতেও গেছলেন!

গেছলাম মানে! —এবার সুকোমল ধবের ওপরই গলাবাজি কবার সুযোগ পেলাম, — পুরো তিনটে দিন ওখানে রাজার হালে কাটিয়ে আসি নি! সেইজন্যেই ত জিজ্ঞেস করছি, ও বাড়িও কি ধর মশাই ছেড়ে দেবেন?

সুকোমল ধর খানিক চুপ করে থেকে আমার দিকে একটু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, —হ্যাঁ ও বাড়ি ছাড়তে হবে বই কি! বাড়ি ত আর দাদার নিজের নয়। অমন পাঁচখানা বাড়ি যখন কিনতে পারতেন তখনও বাড়ি কেনার কথায় বন্ধুবান্ধবদের কি বলতেন জানেন?

তা আর জানি না! —দুঃখের সঙ্গেই বললাম, —আমাকেই ত বলেছেন, বাড়ি কিনে কি, নিজে কেনা হয়ে যাব নাকি! বাঁধা ঠিকানা হওয়া মানে নিজেও বাঁধা পড়া।

সহানুভূতির একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস চাপবার চেষ্টা না করে আবার বললাম, —আমি শুধু ওঁর চিড়িয়াখানাটার কথা ভাবছি। বিশেষ করে ওঁর পোষা উটু-দুটোর কথা।

আপনি পোষা উটু দুটোর কথা ভাবছেন! —সুকোমল ধরকে এবার আমার সহানুভূতিতে যেন একটু বিব্রতই মনে হল। কথাটা ফেরাবার জন্যে বললেন, —ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওসব ভাবনা!

ছেড়ে দেব কি! —আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, —ও বাড়ির কথা মনে হলে ওই দুটোর কথাই ত আগে মনে পড়ে! অন্য কিছু নয়, উটু! ও রকম দুটো অদ্ভুত জানোয়ার পোষার সখ আর মুরোদ দুনিয়ার কটা লোকের আছে। তাই ভাবছি, বাড়ি বদলালে কোথায় ওদের নিয়ে গিয়ে রাখবেন! জাল দেওয়া অমন বড় বাগান না হলে ছোটখাট খাঁচায় ওগুলো ত মরেই যাবে।

তবে হ্যাঁ, —নিজেই সমস্যাটার সমাধান করে বললাম, —চিড়িয়াখানায় ওগুলো দান করতে পারেন বটে!

তাই করবেন দাদা। নিশ্চয় তাই করবেন! —সুকোমল ধর এই প্রস্তাবটা এক কথাতেই মেনে নিলেন। তারপর মুখখানা একটু তেতো করে ক্ষুব্ধ গলায় বললেন— কিন্তু শুধু বাড়ি ছাড়ার ঝামেলাই ত নয়, তার সারাজীবনের ঘাড় বেঁকানো রাজনীতিতে কি সব জট যে পাকিয়ে তুলেছেন। নইলে এই ভব দুপুরে আপনাকে বিরক্ত করতে আসব কেন?

তাইত ভাবছি — ঘাড় বেঁকানো রাজনীতি করে যিনি সব খোয়াতে বসেছেন পাটনার ন্যাশনাল লিউজ-এর সেই সুকোমল ধরের নিজের কর্মফলের জট ছাড়াতে আমার কাছে আসা-ই স্বাভাবিক বলে বুঝতে দিয়েও আমার বিস্ময়টুকু জ্ঞাপন করলাম, —আপনি ত যেখানে সেখানে যার তার কাছে যাবার মানুষ নয়। সেবারে সেই পাটনায় আপনাদের বাড়ি থাকবার সময় দাদার সঙ্গে আপনার ঝগড়াটাই মনে পড়ছে। সেন্টাব থেকে খোদ অর্থমন্ত্রী কি কাজে সেবার পাটনায় এসে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছিলেন কি যেন প্রজেকট নিয়ে আলোচনা করতে। আপনার ঘাড়বেঁকানো রাজনীতির দাদা পর্যন্ত কত করে বোঝালেন। তবু আপনি কিছুতেই আপনার ঘাড় নোয়াতে পারলেন না মনে আছে তারপর.....

না, না! —সুকোমল ধর বেশ একটু অধৈর্যের সঙ্গেই বাধা দিলেন —সে আলাদা ব্যাপার। ও সব রাজা গজার কাছে না গেলেও আপনার কাছে আসব না কেন! আর আপনার কাছে কি জন্যে এসেছি তা যদি শোনেন.....

শোনার আগেই একটু হেসে বললাম, —কি জন্যে এসেছেন তা আমি জানি। কিছু টাকা ত?

টাকা! —সুকোমলবাবু অপমানিত হাবেই অমন চমকে উঠলেন কি না জানি না। কিন্তু তারপর নিজেকে যেন সামলে নিয়ে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন,—হ্যাঁ টাকা! কিন্তু আমার জন্যে নয়। বৌদির জন্যে!

বৌদি! —অবাক হয়ে বললাম, —আপনার বৌদি মানে সুবিমলবাবুর স্ত্রী? কিন্তু তিনি ত মারা গেছেন! সেই পাটনায় আপনাদের লাইব্রেরী ঘরের দেয়ালেই তাঁর মালাজড়ানো প্রকান্ড ছবিটাও দেখেছি।

হ্যাঁ, তিনি মারা গেছেন ঠিকই। —সুকোমল ধর সে দুঃখের স্মৃতি যেন মুছে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে বললেন,—ইনি তাঁর পরের জন!

পরের জন! —আমি যেন বেশ একটু ব্যথা পেয়ে বললাম, —সেই স্ত্রী মারা যাবার পরসু বিমল ধর মশাই আবার বিয়ে করেছেন, আর এত তাড়াতাড়ি!

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ*

আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা

- কয়েক মিনিটেই ফুলকানি বন্ধ করে
- সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
- খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
- পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-৪৪ পোঃ অঃ বক্স ১০১৩০, বম্বে ৪০০ ০০১

*Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-92 BEN

তা আমি কি করতে পারি বলুন! —সুকোমল ধর এবার স্পষ্ট হতাশার সঙ্গে বললেন। —দাদার বেয়াড়া রাজনীতি যেমন এও তাঁর তেমনি নিজের ব্যাপার। এসব নিয়ে কিছু বলার করার অধিকার ত আমার নেই।

আলবৎ আছে! আমি জোর গলায় প্রতিবাদ জানালাম—রাজনীতি আর জীবননীতি কি আলাদা? রাজনীতিতে কড়া প্রগতিবাদী আর নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে সংকীর্ণ স্বার্থপর ওই কি বলে...

আমি আর উপযুক্ত বিশেষণ না পেয়েই একটু থামলাম। সুকোমল ধর সেই ফাঁকটুকু যেন ঝাঁপ দিয়ে ধরে বললেন, —ঠিক! ঠিক! যা বলেছেন সব ঠিক। কিন্তু এ বৌদির আসল ব্যাপারটা যে হয়েছে তা একটু আগে শুনুন।

শুনতে হবে না।—আমি এবার শান্ত গম্ভীর স্বরে বললাম,—আমি জানি যা হয়েছে।

আপনি জানেন!—সুকোমল ধর কয়েক সেকেণ্ডের জন্য যথার্থই হতবাক।

হ্যাঁ জানি!—গলার স্বরটা আপনা থেকেই আরো গাঢ় গম্ভীর হয়ে এল,—এসব ব্যাপারে শেষপর্যন্ত এইটেই হয়। আপনার বৌদি পালিয়ে এসেছেন। কেমন তাই না?

সুকোমল ধরের উত্তর দিতে বেশ একটু দেরী হল এবার। আমার দিকে খানিকক্ষণ একটু কেমন অসন্তুষ্টভাবেই চেয়ে থেকে শেষে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত যেন লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করলেন—হ্যাঁ ঠিকই অনুমান করেছেন। বৌদি পালিয়েই এসেছেন।

যা বলতে যাচ্ছিলাম তা আর বলা হল না। সুকোমল ধর এবার একেবারে ঝড়ের মত বলে গেলেন—তবে এ সাধারণ পালানো নয়। বৌদি দাদাকে বাঁচাতেই পালিয়ে এসেছিলেন। দাদা সারাজীবনে নিজের জন্যে কিছুই করেননি। এই ন্যাশনাল নিউজ-এর কাজ ছাড়বার পর ওঁকে একেবারে পথে বসতে হবে। বৌদি তাই গয়না-গাঁটি থেকে সঙ্গে নেবার মত যা-কিছু ছিল সব নিয়ে লুকিয়ে পাটনা থেকে পালিয়ে আসছিলেন। শেষ মুহূর্তে খবর পেয়ে আমিও কোনরকমে ছুটে এসে সেই ট্রেনেই উঠি। তবে আমি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর বৌদি ফার্স্ট ক্লাসের একটা কামরায়। কিউল থেকে ছাড়বার পর আসানসোলের আগে সেই কামরায় ডাকাতি। যে ক'জন যাত্রী ছিল তাদের পরনের কাপড়টুকু বাদে আর সব লুট করে ডাকাতরা চেন টেনে নেমে গেছে। সেই আসানসোল স্টেশনে পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামার পর বৌদিকে নিয়ে কোনরকমে কলকাতায় এসে পৌঁছেছি। আমার কাছে সামান্য যা ছিল তাতে কালিঘাট পর্যন্ত এসে বৌদিকে মন্দিরেই বসিয়ে আপনার বাড়িটাই কাছে বলে এখানে এসেছি। এখন কি করবেন বলুন!

কি আর বলব?—উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরের দিকে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম,—বৌদিকে কালিঘাট থেকে এনে আমার বাড়িতেই ক'দিন থেকে যান।

সুকোমল ধরের মুখের চেহারাটা দেখে নিজেই আবার আগের প্রস্তাবটা বাতিল করে বললাম,—না, তা হয় না। বৌদি লজ্জায় এখানে আসতে পারবেন না, কেমন? আচ্ছা তাঁকে আনতে হবে না। আপনাদের পাটনা ফিরে যাওয়ার খরচ দিতে না পারলেও ক'দিন এখানে অন্য খোঁজখবর করার জন্যে থাকার মত কতটুকু কি দিতে পারি দেখি।

ভেতর থেকে কিছুক্ষণ বাদে একটা বাঁধ খাম সুকোমলবাবুর হাতে এঁন দিয়েছিলাম। বলেছিলাম—যতটুকু পারি দিলাম। এখানে নয় কালিঘাটে বৌদির কাছে গিয়েই খামটা খুলবেন।

আমার দিকে চেয়ে কি বলতে গিয়ে থেমে গিয়ে সুকোমল ধর নীরবেই খামটা নিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

তাঁকে যা দিয়েছি সেটা ফাঁকা খাম নয়। সেখানেই গিয়ে সেটা তিনি খুলবেন সামান্য কিছু তার মধ্যে তিনি পাবেন। আর পাবেন একটি ছোট চিঠি। তাতে লেখা,—সুকোমলবাবু! নামটা আপনার যথার্থই এই হলে এবার পাল্টে ফেলুন। আপনার চেহারা চরিত্র আর ওই নামে কুলোচ্ছে না। আমার সঙ্গে কোলাকুলি আপনার কি রকম লেগেছে জানি না, আমি কিন্তু অনায়াসেই পেরেছি। এ কোলাকুলির পর সব রকমেশনেও আপনাকে সামান্য কিছু সেলামী কেন যে দিচ্ছি, সেটা জেনে রাখুন। আমি পেশাদার লেখক কলম চালিয়ে খাই। আমার কাছেও আপনি যে গল্প ফেঁদে শোনাতে এসেছেন আপনার সেই সাহসেরই এটা তারিফ। তবে এত কষ্ট না করলেও পারেন। আপনাকে একটু আধটু বাজিয়ে দেখার জন্যে যেটুকু পরীক্ষা করেছি তাতে আপনি ভালোভাবেই উৎরে গেছেন। সুতরাং নতুন পেশা হিসেবে কলম ধরলেও পারেন। পাটনার ন্যাশনাল নিউজ-এ সুবিমল ধর নাম দাদাকে ফাঁপাবার তাহলে আর দরকার হবে না।

আমার কাছে ভরসা করে লেখা পাঠালে আমিও যথাসাধ্য দেখেশুনে নিতে রাজী। ইতি—

প্রকাশিত হয়েছে

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। কথাকোবিদ তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল, তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ। (মূল্য : প্রতি খণ্ড টা ৪০-০০ ॥ তিন খণ্ডের অগ্রিম মূল্য টা ৮০-০০)

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : শ্রীতপতি বসু। ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারী ৭৬ পর্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতি জগতের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য দান এমন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর জীবনচরিত যৌথ গবেষণা ও প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে, জন্ম-সনে বাঙালী নন তাঁদেরও জীবনী সন্নিবিষ্ট। ৬৪৮ পৃষ্ঠা লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা মজবুত বাঁধাই। (মূল্য : টা ৪০-০০)

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তথ্য-সমৃদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত। (মূল্য : টাঃ ২৫-০০)

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রকের মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ প্রণীত ঐ বিষয়ের সমৃদ্ধ আলোচনা। (মূল্য : টা ২০-০০)

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলকাতা-৯ (৩৫-৭৬৬৯)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমি আছি—এ অনুভব ত' এসেছে শৈশবকালে চেতনার প্রথমক্ষণ থেকে। তবু নতুন করে উপলব্ধি জাগে হঠাৎ একদিন যখন মনের সূক্ষ্ম অনুভূতির তারটিতে ঘা পড়ে, এলোমেলো আনন্দ বেদনার বাতাসে হৃদয়ের দরজাটা আচমকা খুলে যায়। তখনই মানুষ চেনে নিজেকে।

এমনি দমকা হাওয়া সেদিন লেগেছিল সদ্য কৈশোর পেরোনো এক তরুণের প্রাণে, উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল তার জীবনের বহু যত্নে তৈরী হিসেব করে বাঁধা ছকটা।

অভিভাবকের আকাঙ্ক্ষা ছিল, ছেলেটি চিকিৎসক হবে। একমাত্র সন্তানের দামী শিক্ষার সমস্ত রসদই মজুদ ছিল পরিবারের ভাঁড়ারে। তবু হল না। একটা ইচ্ছে একটা আবেগের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। সে চাইল নিজের ভাবনাকে প্রকাশ করতে কালির আঁচড়ে, ভাবল, দেখিনা পারি কিনা। পারলও, আর সেই পারার সূত্র ধরেই তৈরী হল এক নতুন ইতিহাস।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কবি, সমালোচক, গল্প-উপন্যাস রচয়িতা, শিশুসাহিত্যিক। বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের আসরে তিনি ভাস্বর রূপে বিরাজ করছেন দীর্ঘকাল। কল্লোল গোষ্ঠীর কবি সাহিত্যিকদের প্রথম সারিতে একটি শ্রদ্ধার আসন তাঁর অধিকারে রয়ে গেছে এ যাবৎ।

শুরুটা হয়েছিল হঠাৎ ভালো লাগার খেয়ালে, তা বলে এ প্রতিষ্ঠা একদিনে আসেনি। তিল তিল করে তা গড়ে উঠেছে বহু দিনের সাধনার ফলে। প্রতিটি রচনা অনেক চিন্তা অনেক ভাবনার ফসল. নতুন ভাবনা, স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনা নিয়ে এসেছে তারা। নিজেরও যেন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। এ যেন নতুন করে জন্ম নেওয়া, নতুন করে আবিষ্কার করা নিজেকে।—আমি এমন করে অনুভব করতে পারি, ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারি এ ত' জানা ছিল না।

প্রথম বিস্ময় কেটে যাবার পর এলো প্রত্যয় এলো আনন্দ। দৃষ্টি স্বচ্ছ হল, প্রতিদিনের দেখা ছোট ছোট ঘটনা, টুকরো টুকরো অকিঞ্চিৎকর ছবি নতুন অর্থ নিয়ে ভিড় করে এসে দাঁড়ালো কলমের মুখে। পথ চলতে দেখা সমাজ তাড়িতা বারবণিতার দীন লোলুপ কুৎসিত মুখখানি ধরা রইল স্মৃতির পটে। দুর্গম পথের মাঝে ক্লান্ত ক্ষীণপ্রাণ সাঁকোটুকু পার হতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে, মনে হয়েছে, এমন ত' হতে পারে, হয়ত' কোন রাতে—!

হয়ত ঘটতে পারত কিছু। কি সে, তার হদিশ খুঁজতে গিয়ে মন ডুব দিত কল্পনার সাগরে। কি উঠবে শূন্য শুক্তি অথবা মুক্তা সে চিন্তা তখন অবান্তর। প্রাণ বলছে দেখিস কি পাই।

সেই ভাবনা সেই কল্পনারা আসে স্বপ্নের মত, কিন্তু তবু তারা শুধু স্বপ্ন নয়। স্মৃতির ঝুলিতে পড়ে থাকা একটুখানি পুঁজি। তাই নিয়ে আরম্ভ। তারপর যেন একটি একটি করে স্বর সাজিয়ে গড়ে তুলেছেন নিটোল একটি সুরের কলি।

'জীবন সীমায়' দাঁড়ানো মাধব একটি আদি ও অকৃত্রিম মানুষ। তার ওপর সভ্যতার মসৃণ প্রলেপ পড়েনি, প্রকৃতির পটভূমিতে তার উন্মুক্ত অনাবৃত রূপটি স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। সে সরলবিশ্বাসী, আবার সেই বিশ্বাসে আঘাত পড়লে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বিশ্বসংসার ধ্বংস করে ফেলার দুর্মদ ইচ্ছা জাগে তার। অপরাধীদের শাস্তি-বিধানে সে বিধাতার মত নির্মম।

কিন্তু যে উদ্যত প্রহরণ তর প্রতিহিংসা বহন করেছিল প্রকৃতির রুদ্ররূপের মধ্যে তা

জীবন-সীমানায়

মাধব যখন ঘরে ফিরিল রাত তখন সত্যই অনেক হইয়াছে। মুখুজ্জেদের বাড়ীর চন্ডীমন্ডপে পর্যন্ত তখন আর আলো নাই,— দাবার আসর ভাঙ্গিয়াছে অনেক আগেই। দুর্যোগের রাত বলিয়া আজ সম্ভবতঃ একটু সকাল সকাল সকলে বাড়ি গেলেও এগারটার আগে আসর যে ভাঙ্গে নাই তাহা ঠিক।

দুর্যোগ অবশ্য নিতান্ত সামান্য নয়। কদিন ধরিয়া আকাশ একেবারে মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মুষলধারে এক পশলাও ঢালে নাই অবশ্য কিন্তু টিপ টিপ করিয়া সেই যে পড়িতেছে তাহার আর বিরাম নাই। আজ সন্ধ্যায় আবার আকাশের চেহারা বেয়াড়া রকম হইয়া উঠিয়াছে। ঝড়ের সূচনা তাহাকে বলা যায় না, তার চেয়েও বেশী কিছু যেন সেখানে আছে। বৃষ্টি অবশ্য আর বাড় নাই. কিন্তু তবু সবসুদ্ধ আকাশের গতিটা এখনও মোটেই ভালো নয়।

বাঁধের উপর দিয়া তারপাশি হইতে আসিবার সময় মাধব আকাশের দিকে চাহিয়া কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। কৃষ্ণপক্ষের আকাশ আটপৌরে মেঘে মোড়া হইলেও কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আলো সেখান হইতে এই মধ্যরাত্রি বিচ্ছুরিত হইয়া বাঁধ পর্যন্ত কালিমা কালো ভরা উত্তাল নদীর জলকে একরূপ একটা ভয়াবহ ব্যঞ্জনা দিয়াছে।

মাধব ভয়-ডরের অবশ্য বিশেষ ধার ধারে না। বেপরোয়া গোঁয়ার বলিয়া গ্রামে তাহার একটা অখ্যাতিই আছে। নিশুতি রাত্রে তারপাশি হইতে এই নির্জন বাঁধের পথে ফুলজুড়ির শ্মশানের পাশ দিয়া নেহাত দায়ে না পড়িলে কেহ আসে না কিন্তু মাধবের তাহা নিত্যকর্ম।

বাঁধের পথ পার হইবার আগেই ঝড়টা না আসিয়া পড়ে, ইহাই বুঝি আজ তাহার ভাবনা। বৃষ্টির জলে পিছল বাঁধের উপর দিয়া মাধব যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পা চালাইয়াছে।

কিন্তু ঝড়ের ভাবনার চেয়ে তাহার অবশ্যতর অন্য গুরুতর কারণও আছে।

আজ দুপুরে যে তুমুল কান্ড হইয়া গিয়াছে তাহার পর এত রাত করিয়া বাড়ি ফিরিবার ইচ্ছা সত্যই তাহার ছিল না। মনটা তাহার খুঁতখুঁত করিতেছে তাই। ছিদামের অনুরোধে এতটা রাত না করিলেই হইত। বিশেষ আজ দিনটা যে বকম খারাপ। আর একটু হইলে আজ রাত্রের মত বাড়িতে আসাই ত তাহার বন্ধ হইত। ফুলজুড়ির শ্মশান ছাড়াইবার পর বাঁধের উপর দিয়া আসিতে আসিতে হঠাৎ পিছনে ঝপ করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া সে সচকিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। বাঁধের উপর হইতে ঠিক যেন একটা মানুষ জলে পড়ার শব্দ! জলের বা তোড়, একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। ভীতভাবে মাধব পিছন ফিরিয়া ব্যাপারটা তাহার পর বুঝিয়াছে—না মানব নয়, বাঁধেরই খানিকটা মাটির চাঁই জলে ধসিয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু আর কয়েক সেকেন্ড আগে সেটুকু পড়িলেই আর রক্ষা ছিল না। হয় মাধব তাহার সঙ্গেই তলাইয়া যাইত, কিম্বা ওধারে বাধা পাইলে পশ্চিমপাড় দিয়া ঘুরিয়া আরো ঘন্টা তিনেক পরে তাহাকে বাড়ি ফিরিতে হইত। সত্যই এত রাত করিয়া রোজ রোজ ফেরাটা তাহার ভাল নয়।

সৌরভী এই রাত করিয়া বাড়ি ফেরা লইয়াও আজ টিটকারী দিয়াছে,—অত যদি মনে ধোকা ত ঘরে বসে আগলাতে পারিস না। রাত দুপুর করে ঘরে ফিরিস কোন ভরসায়।"

মাধব তখন পুঁইগাছের মাচা বাঁধিবার জন্য কটারী দিয়া বাঁশের বাখারি কাটিতেছিল। লম্বা বাঁশের মোটা গাঁটের ধারে জোরে একটা কোপ লাগাইয়া সে বলিয়াছে, 'এই হাত দুটো আর এই অন্তরের ভরসায়! মাধব পাজীর মাথা হেঁট করে কাউকে আর গর্দানে মাথা রাখতে হবে না।'

ইস, আর সাউখুড়িতে দরকার নেই। মাথা সব লাউ কুমড়ো কিনা তাই তোর কোপে গড়াগড়ি যাচ্ছে।'

উত্তরে মাধব গলা হইতে একটা অব্যক্ত-সূচক ধ্বনি বাহির করিয়াছিল মাত্র। তখন আর কিছু কথা হইয়া লইয়া হয় নাই।

কখন খসে পড়েছে তা সে নিজেও বোঝেনি। নিতান্ত জৈবিক প্রেরণায় নিজেকে রক্ষা করবার তাগিদ তখন তার কাছে সবার বড় হয়ে উঠেছে।

আবার মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পায়ের তলায় একটা আশ্রয় অনুভব করা মাত্র তার জান্তব প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি আবার জেগে উঠেছে আহত পশুর জিঘাংসায় সে নখে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চেয়েছে কল্পনায় নারী-পুরুষ দুটিকে।

তার এই বিক্রমের মুহূর্তে আবার প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে প্রকৃতি। দিগন্তব্যাপী তার সংহাররূপের মাঝখানে ক্ষুদ্র কীটের মত মনুষ্য মূর্তির পৌরুষের স্পর্ধিত আস্ফালন সে ক্ষমা করেনি। আর সেই শেষ অঘাত টুকু মাধবের চৈতন্যের মূলশুদ্ধ নাড়া দিয়েছে, ওকে পৌঁছে দিয়েছে এক বিচিত্র অনুভূতির জগতে।

বিশাল এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে কত ক্ষুদ্র কত তুচ্ছ মানুষ। সে কে কোথায় তার আদি, কোথায় অন্ত? প্রতিদিনের একটু একটু করে গড়া এ খেলার স্বর্গে কত সামান্য সুখ, সামান্য দুঃখকে অলীক কল্পনায় সাজিয়ে সে সুখে বিভোর দুঃখে কাতর হিসেবে উন্মাদ হয়ে ওঠে। অথচ তার এ বোধ নেই যে কি বিরাট এক শক্তির মুখোমুখি সে দাঁড়িয়ে আছে। এ শক্তির পরিমাপ করা একে প্রতিরোধ করা তার সাধ্যের অতীত।

মাধব শিক্ষাদীক্ষাবুদ্ধিহীন এক গ্রাম্য মানুষ। এমন করে চিন্তা করবার শক্তি তার নেই। তার আছে শুধু এক অনুভব যে অনুভব সভ্যতার আদি যুগে প্রাগঐতিহাসিক মানুষকে নতজানু হতে শিখিয়েছিল গগনচুম্বী পর্বত আর উত্তাল সাগরের কাছে।

কোন এক নিস্তব্ধ রাতের নিশ্চিন্ত অবসরে হয়ত এই অনুভব আচ্ছন্ন করেছিল লেখকের মনকেও। একটি ছোট গল্পের আধারে দুটি একটি চরিত্রের মাধ্যমে ধরে রেখেছিলেন সেই উপলব্ধি। তারপর? তারপর এসেছে আরও কত কাহিনী, কত ঘটনা, অনেক চিন্তা ভাবনার ফসল। সেই নিত্য নতুন ঘটনা প্রবাহের মাঝখানে ভুলে গেছেন কখন আনমনে লিখে ফেলা একটি গল্পকে।

আর না ভুলেই বা উপায় কি? বাস্তব জীবনে কাজের দাবীও ত কম নয়। পৃথিবীটা অনেক বড়। জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি ধ্বংস, উত্থান পতন কত কিছু ঘটছে এখানে নিয়ত। সেই নিত্যবহমান ঘটনাস্রোতের সঙ্গে সদা পরিচিত থাকতে হয়েছে, ওয়াকিবহাল থাকতে হয়েছে নিত্য নতুন আবিষ্কৃত মত আর স্বীকৃত তথ্যের সঙ্গে। সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের ব্যক্তিত্বের এই দ্বিতীয় সত্তা তাঁর সময়ের অনেকখানি কেড়ে নিয়েছে। তাই দিনের কাজের হিসেব মিটলে যখন সংসার ঘুমে মগ্ন তখন তিনি খুলেছেন তাঁর সাহিত্যের কাঁপি বুদ্ধির এলাকা থেকে চলে গেছেন অনুভবের জগতে। এমনি করে মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের দ্বৈত শাসনে কেটে গেছে তাঁর জীবনের দীর্ঘ অনেকগুলি বছর। তবু তৃপ্তির অভাব ঘটেনি কোন। সাহিত্যিক জানতেন যা অনুভব করেছেন যা বিশ্বাস করেছেন শত কাজের মাঝেও সময় করেও তা শোনাতে পেরেছেন সবাইকে। তাদের ভালো লেগে থাকলে তা লেখকের উপরি লাভ, নইলে নিজেকে মুক্ত করে দেবার আসল আনন্দটুকু ত রইলই ষোল আনা।

কিন্তু সেই লাভের অঙ্কটুকুতেও টান ধরেছে আজ। জগৎ জুড়ে বইছে এলোমেলো হাওয়া সুখ আর সমৃদ্ধির উগ্র আকাঙ্ক্ষা বিভ্রান্ত করেছে মানবসমাজকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার সব মূল্যবোধ। আর সাহিত্য উপভোগ? তার জন্য অবসর কোথায়, মনই বা কোথায় মানুষের? এই হাঁফ ধরানো গতির মাঝে তবে কেমন করে মন খুলবেন কবি শিল্পী সাহিত্যিক? প্রতি মুহূর্তেই ত বাধা, প্রতি পদেই থমকে দাঁড়াতে, সংযত করতে হবে লেখনীকে মনে হবে থাকনা—

আর সেইটাই বোধহয় মহৎ শিল্পস্রষ্টার জীবনে এক গোপন গভীর প্রতিকারহীন বঞ্চনা।

রেখা বড়ুয়া

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আর কোন কথা ইহা লইয়া নাও হইতে পারিত। মাধবের চেহারাটা দুশমনের মত হইলে কি হয়, সে মানুষ হিসাবে নিতান্ত সোজা। মনে যাহা হয় খানিকটা হাঁকি ডাক করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিবার পর আর কোন গলদ তাহার ভিতর জমা থাকে না।

সম্প্রতি গোলযোগ যাহা লইয়া বাধিয়াছে, সৌরভীকে গেড়ায় খুব খানিকটা শাসন করিয়া ও রাঙাঘাটে দু একদিন আস্ফালন করিয়া সে ব্যাপারটাও মাধব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। ব্যাপারটাতে সত্যই এমন কিছু গুরুত্ব আরোপ বুঝি করা যায় না।

সৌরভীর সঙ্গে তার দু একদিন ত নয়, পাঁচ পাঁচ বৎসর সে ঘর করিতেছে। লোকের মুখের একটা কথায় তাহাকে অবিশ্বাস সে করিয়া বসিবে কোন দুঃখে। গাঁয়ের লোকের স্বভাব সে জানে, তিল না হইতেই তাহারা তাল করিতে কোন দিনই পেছপাও নয়। তবে এই নোংরা কথা লইয়া পাঁচজনকে আলোচনার সুযোগ দেওয়া সে পছন্দ করে না। সৌরভীকে তাই সে ধমক দিয়াছে সাবধান হইবার জন্য। ধনকলের সেই নতুন ছোকরা কেরাণীকেও একদিন এ-পথে ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়া শাসাইয়া দিয়াছে ভালো করিয়া।

কেরাণীবাবুর এস্ত পলায়নের ভঙ্গী দেখিয়া মাধবের হাসিই পাইয়াছিল। বেচারার কতটুকু বুকের জোর। সুন্দর মুখের লোভটুকু আছে, কিন্তু কাহারও চোখের দিকে চোখ তুলিবার সাহস নাই।

মাধব বাড়িতে গিয়া সৌরভীর কাছে কেরাণীবাবুর লাঞ্ছনার গল্পও সেদিন করিয়াছিল:

...বললাম,—'হাওয়া খেতে এ গাঁয়ের ভেতর সেঁধিয়েছ কেন বাপু! অমন ঘাঁড় পড়ে রয়েছ যাও না পেটভরে হাওয়া খাও না।' তারপর আর কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে। আমতা আমতা করে বলে,—'এই একটু দেখছিলুম ঘুরেটুরে।' বললাম—'শহর থেকে এসে এ বনগাঁয়ে কি দেখবে বাবু। এখানকার লোকজন আর বেরুড়া হাওয়া খেতে এসে আর কিছু না খেয়ে যাও।'

সৌরভী অবশ্য ভ্রূকুটি করিয়া বলিয়াছে, —'গাঁ ত তোর কেনা জমিদারী নয়; ঘুরে বেড়ালে তুই করবি কি?'

'কি আর করব! ঠ্যাং দুটো শুদ্ধু দেব ভেঙে।' বলিয়া মাধব হাসিয়াছে এবং সমস্ত ব্যাপারটাও সেই সঙ্গে অনায়াসে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু ঝগড়া বাধিয়াছে তুমুলভাবে বিকালের দিকে। সৌরভী পিতলের কলসীটা ও গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইতেছিল। মাধব হঠাৎ ডাকিয়া বলিল—'ঠাকুর পুকুরে আর যাবিনি।'

সৌরভী হঠাৎ থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল,—'কেন?'

'কেন আবার। ঘরের কাছে চাটুজ্যেদের পুকুর ত রয়েছে।'

'এতদিন কি সেখানে গেছি!'

'এতদিন কি করেছিস না-করেছিস তার খোঁজ ত জানতে চাইনি, ঠাকুরপুকুরে যেতে পাবি না তাই বলে দিলাম। পাঁচজনের পাঁচ কথা আমি শুনতে পারব না।'

'এদিকে ত খুব বারফট্টাই! শুনতে না পারিস তাদের মুখে চাপা দিগে যা আমার ওপর হুকুম করিস কেন?

করবই ত হুকুম! বলিয়া মাধব কি কাজে ঘরে ঢুকিতেছিল হঠাৎ সৌরভীর কাণ্ড দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

সৌরভী হঠাৎ হাতের ঘড়াটা সজোরে মাটির উপর ঠুকিয়া বসাইয়া বলিয়াছে—তবে তুই নিয়ে আয় জল বয়। এইখানেই আমি গা ধোব। ঘরের বার আমি হতে পারব না।'

মাধব তখনও কিন্তু রাগ সামলাইয়া শুধু রাগ করিয়া বলিয়াছিল 'কেন ঠাকুরপুকুর না হলে কি গা ধোয়া হয় না। সেখানে কি মধু আছে?'

তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিয়া সৌরভী বলিয়াছিল,—'কি আছে জানিস না? ধনকলের কেরাণীবাবু যে দাঁড়িয়ে থাকে পথে। তার সঙ্গে দুটো ফষ্টিনষ্টি নইলে তবে কোথায়। সেইজন্যই ত এত ঘন ঘন যেতে চাই!'

বড় বেশী মুখ হয়েছে তোর সৈরী! অনেক দিন ঝাঁটা লাথি খাসনি বুঝি!

না খাইনি! ঝাঁটা লাথি দেয় কে শুনি?—পেট ভরে খেতে দিতে পারে না কোমরে কাপড় দিতে পারে না, তার আবার ঝাঁটা লাথি দেবার শখ কিসের!

দেখ তাহলে কিসের—বলিয়া মাধব এবার দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বেশ কয়েক ঘা সৌরভীর পিঠে বসাইয়া দিয়াছে।

সৌরভীও মাটির উপর এলো চুল ছড়াইয়া লুটাইয়া পড়িয়া—এমন খুনে ভাকতের সঙ্গে বিবাহ দিবার পূর্বে কেন তাহার বাপ মা তাহাকে সোজা যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখাইয়া দেয় নাই—উচ্চৈঃস্বরে সমস্ত পৃথিবীকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া আশু বৈষবের পরম সৌভাগ্যের জন্য কি রকম সে লালায়িত হইয়া আছে, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছে।

এত কাণ্ডের পর আজ বিকালে তার-পাশির ঝুমুর গানের আখড়ায় না গেলেও চলিত। কিন্তু ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া স্ত্রীর অবিরাম কান্নাও মাধবের পক্ষে অসহ্য। সে ঘরে বসিয়া থাকিতে এ কান্না যে থামিবে না, তাহাও সে জানে। আখড়ায় একবার হাজিরা দিয়াই সকাল সকাল বাড়ি ফিরিবে মনে করিয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহা এটা ওটায় বাধা পড়িয়া আর হইয়া উঠে নাই। এখন তাই মনটা তাহার সৌরভীর প্রতি নরম হইয়া আসিয়াছিল অনুশোচনায়। ওই সামান্য ব্যাপার লইয়া মারধর করাটা নিশ্চয়ই তাহার উচিত হয় নাই। আঘাত হয়ত একটু বেশী জোরেই লাগিয়াছে। এতক্ষণ নির্জন একলা ঘরে সে কি করিতেছে কে জানে! ঘর হইতে বাহির হইবার সময় সৌরভী শুনাইয়া শুনাইয়া বলিয়াছিল যে ফিরিয়া আসিয়া মাধব দেখিবে তাহার ঘর-দোর পুড়িয়া ছাই হইয়া আছে। এমন স্বামীর ঘরে শুধু নয় মুখেও আগুন দেওয়াই যে তাহার জীবনের একমাত্র সাধ, তাহাও সে সাগ্রহে চীৎকার করিয়া জানাইয়াছে। কথাগুলো মনে করিয়া মাধবের এখন হাসি পায়। সত্যই সৌরভীর রাগ করা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। অকারণে রোজ রোজ মিথ্যা অপবাদ শুনিয়া আর কয়দিন মেজাজ ভালো থাকে! বিধাতা তাহাকে রূপ দিয়াছেন এই ত তাহার একমাত্র অপরাধ। কে কোথায় তাহাকে দেখিবার লোভে ওত পাতিয়া বসিয়া থাকিবে তাহার জন্য সে ত দায়ী হইতে পারে না?

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.,ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী ৩৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯
আগাম ৮৲ টাকা পাঠাইলে অবশ্যই ঠিকানায় ভি পি

বাঁধের পথ ছাড়িয়া মাধব এবার গাঁয়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। মুখুজ্যেদের চণ্ডী-মণ্ডপ বাঁয়ে রাখিয়া ন্যাড়া শিবের মন্দিরের পাশ দিয়া কয়েক পা গিয়াই তাহার ঘর। এটুকু পথ তাহাকে কিন্তু দৌড়াইয়াই পার হইতে হয়। আকাশ যেন এই মুহূর্তটির জন্য এতক্ষণ ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছিল। সমস্ত দিনের টিপি টিপি বৃষ্টির পর হঠাৎ মুষলধারে জল পড়িতে শুরু হইল। ছুটিয়া গিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়া কিন্তু মাধব আর একটু হইলেই সজোরে হুমড়ি খাইয়া পড়িত। কোন রকমে ধারের একটা কাঠ ধরিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল।

কিন্তু ব্যাপার কি? দরজা যে একেবারে হাঁ হইয়া আছে!

মাধব বিমূঢ়ভাবে ভিতরের উঠানে পা দিল। ভিতরেও আলো কোথাও নাই, অন্য দিন তাহার আসিতে দেরী হইলেও সৌরভী উঠানের দরজায় খিল লাগাইয়া উঁচু দাওয়ার উপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া থাকে। কেরো-সিনের একটা কুলুপি দাওয়ার অপর এক প্রান্তে জ্বলে। আজ তাহার কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না। মাধব শঙ্কিতভাবে এবার দাওয়ার উপর উঠিল!

সৌরভীকে সেখানেও পাওয়া গেল না। তাহাদের ঘরের দরজাও খোলা। না, আর সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। গাঁয়ের লোক সত্য কথাই বলিয়াছিল। তলে তলে সৌরভী ইহারই ষড়যন্ত্র করিয়াছে এতদিন। অকস্মাৎ মাধবের মাথার ভিতরে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চোখের উপর তাহার চারিধারে লেলিহান আগুনের শিখা যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। গাঢ় তমসাচ্ছন্ন রাত্রেও সমস্ত আকাশ পৃথিবী তাহারই আভায় লালে লাল।

কিন্তু তবু বাহিরে এমন শান্ত বুঝি মাধবকে কখনও দেখা যায় নাই। এতটুকু ক্ষিপ্রতা এতটুকু উত্তেজনার পরিচয় তাহার কোন কাজে নাই; অনেক সময় যেন তাহার হাতে! যে আগুন তাহার মধ্যে আজ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহাকে উপযুক্ত আহুতি দিয়া তৃপ্ত করিবার জন্য জীবনের সুদীর্ঘ রাত্রি পড়িয়া আছে।

ঘরের ভিতর কুলপিটা জ্বালিয়া মাধব অনেকক্ষণ নানা জিনিসপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। যেটুকু সংশয় মনের মধ্যে ছিল তাহাও এবার দূর হইয়াছে। সৌরভী শুধু পলায়ন করে নাই। তাহাদের সমস্ত সম্বল নিজের যাহা কিছু গহনাপত্র ছিল সমস্তই সঙ্গে লইয়া গিয়াছে।

এইটুকু জানিবার পর মাধব আর দাঁড়াইল না। বাঁশ-কাটা দাটা ঘরের এক প্রান্তে পড়িয়া ছিল। সেটা তুলিয়া লইয়া কুলপিটা উঠানের মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আকাশ ভাঙ্গিয়া তখন বৃষ্টি নামিয়াছে। কিন্তু তাহার বুঝি কোন সাড়াই নাই। রক্তের মত রাঙ্গা আগুন তাহাকে বেষ্টন করিয়া নাচিতেছে ইহাই শুধু সে জানে।

সৌরভীকে আজ রাত্রেই সে খুঁজিয়া বাহির করিবেই—সৌরভী, আর সকল ব্যাপারের মূল সেই কেশবীবাবুকে। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পলায়ন করিলেও আজ তাহাদের নিস্তার নাই।

আকাশ-ভাঙ্গা বৃষ্টির মধ্যে বাহিরে আচ্ছন্নের মত পথ চলিলেও ভিতরে মন যে সজাগ তাহার প্রমাণ পাইতে দেরী হইল না। গ্রাম হইতে দশ মাইল দূরে রেলের স্টেশন। অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে পথঘাট না মানিয়া অন্য সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অচেতন হইয়া মাধব সেই দিকেই চলিয়াছে দেখা গেল। তাহার মুখে কালি দিয়া সৌরভী যে গ্রামের মধ্যে কোথাও থাকিতে বা দুইটা গ্রাম ছাড়াইয়া তাহার বাপের বাড়িতে উঠিতে সাহস করিবে না, মাধব তাহা ভালো করিয়াই জানে।

গ্রাম ছাড়াইয়া মাধব এবার বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে আসিয়া নামিয়াছিল, কিন্তু সে মাঠ দিয়া বেশী দূর অগ্রসর হইবার আগেই এমন একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল, মাধবের আচ্ছন্নতা ভেদ করিয়াও যাহা দেখা গেল তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।

মাঠের মধ্যে প্রচুর জল আগে হইতেই জমা হইয়াছিল। সামান্য এই খানিকক্ষণের মুষলধারে বৃষ্টিতেও এত জল জমিতে পারে কি না মাধব তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ এতক্ষণ পায় নাই হঠাৎ সেই জলে তীব্র একটা স্রোত অনুভব করিয়া সে অবাক হইয়া গেল। শুধু স্রোত নয়, বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়াও একটা ভয়ঙ্কর গর্জন তাহার কানে আসিয়াছে।

মাধব একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। এত-দূর হইতে নদীর জলোচ্ছ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইবার কথা নয়। শব্দটা সেদিক হইতেও যেন আসিতেছে না!

ব্যাপারটা উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে গিয়াও সে অবাক হইয়া গেল। মাঠের মধ্যে জলের প্রবল স্রোতে পা দুইটাকে যেন সজোরে টানিয়া লইতেছে। চলা দূরের কথা, দাঁড়াইয়া থাকাই কঠিন। বলেও তাহার হাঁটু ছাড়াইয়া ইতিমধ্যেই আরো উর্ধ্বে উঠিয়াছে।

মাঠের মধ্য দিয়া সুবিধা হইবে না মনে করিয়া মাধব আবার সড়কের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেদিকে যাওয়াও কঠিন। জলের টানে ঠিকমত পা ফেলাই যায় না। হঠাৎ ভয়ঙ্কর গর্জনের শব্দও একেবারে যেন কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবল একটা ধাক্কা খাইয়া মাধব জলের উপরই হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

তাহার পর ব্যাপারটা বুঝিতে আর কিছু বাকি রহিল না। প্রবল জলস্রোত তাহার উপর বহিয়া চলিয়াছে। খুব খানিকটা নাকানি-চোবানি খাইয়া সে যখন একটু সামলাইয়া লইল তখন মাটিতে আর পা রাখিবার উপায় নাই। দুরন্ত বন্যার স্রোতের টানে সে ভাসিয়া চলিয়াছে।

নদীর বাঁধ ভাঙিয়া বন্যাই যে আসিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াও মাধব তখনও বুঝি তেমন ভয় পায় নাই। মাঠের মধ্যে বড় বড় অনেক গাছ এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া আছে। তহর একটা যে-কোন রকমে ধরিয়া ফেলিতে পারিবেই। কিন্তু স্রোতের টানে প্রথম একটা গাছে সজোরে ধাক্কা খাইয়া সে ভুল তাহার ভাঙিল। হাতের দা-টাই তহর প্রধান বাধা। সেটা হাতে থাকিতে সাঁতার কাটারও সুবিধা হইতেছে না। কিন্তু তাহা ফেলিয়া দিতেও যে পারা যায় না।

মাধব চারিদিকে ব্যগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আরো খানিক দূরে ভাসিয়া চলিল। আরো কয়েকটা বড় গাছ তীরের মত তাহার পাশ দিয়া সরিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও মাধব তাহাদের ধরিতে পারে নাই।

আর একটা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা খাইয়া এইবার সত্যই মাধব ভীত হইয়া উঠিল। স্রোতের টান যে এত প্রবল হইবে তাহা সে ধারণাই করিতে পারে নাই। সেই স্রোতের বিরুদ্ধে যুঝিতে যুঝিতে কখন তহার শিথিল হাত হইতে দা'টা খসিয়া পড়িয়া গেল সে বোধ হয় জানিতেই পারিল না। শুধু হাতের দা নয়, তহর নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিও যেন কখন মনের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। আত্মরক্ষার চিন্তা ছাড়া আর কিছু সেখানে নাই।

কিন্তু এই দিগন্তব্যাপী জলস্রোতের মধ্যে আশ্রয় কোথায়? আশ্রয় কোথাও থাকিলেও অন্ধকারে তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। শরীরে অসীম শক্তি থাকিলেও মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল খুব বেশীক্ষণ এই স্রোতের মধ্যে ভাসিয়া থাকা তহর পক্ষও অসম্ভব। কয়েকটা গাছে আছড় খাইয়া, দু-এক জায়গায় ঘূর্ণির টানে তলাইয়া গিয়া মাধব ইতিমধ্যেই বেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ভর দিবার মত একটা কিছু না পাইলে তাহার চলিবে না।

বন্যাস্রোত তহকে কোন্ দিকে যে লইয়া চলিয়াছে তহও সে জানে না। উপর হইতে সমানভাবে বৃষ্টি পড়িতেছে। নিচে স্রোতের জল বরফের মত শীতল। শুধু ক্লান্তিতে নয়, সেই ঠাণ্ডাতেও যেন তহর সমস্ত অংগপ্রত্যংগ অসাড় হইয়া আসিতেছে। মনের উপরও কেমন একটা গাঢ় জড়তা নামিয়া আসিয়াছে যবনিকার মত। আর কিছুক্ষণ বাদে বাঁচিয়া থাকিবার ক্ষীণ প্রেরণাটুকুও যেন সে যবনিকায় চাপা পড়িয়া যাইবে।

হঠাৎ তহর ঘাড়ের উপর কি একটা ভারী জিনিস যেন আসিয়া পড়িল। তহর আঘাতে তলাইয়া যইতে যইতেও নিজের অজ্ঞাতে মাধব দুই হাত ধরিয়া তখন সেটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। জিনিসটা প্রকাণ্ড একটা তক্তপোশের ছায়া বলিয়াই তহর মনে হইল।

কিন্তু জড়াইয়া ধরিলেও জলের টানের মধ্যে সেটা আঁকড়াইয়া থাকা অত্যন্ত কঠিন। গুরুত্বের আঘাতে মাথাটা তখন তহর ঝিম ঝিম করিতেছে। ক্লান্ত বাহুতে এতটুকু শক্তি আর নাই। অসাড় হাত শিথিল হইয়া অবশ তলাইয়া যইবার আগেই কিন্তু সে টের পাইল উপর হইতে কে যেন তহর হাত ধরিয়াছে। তহর পর অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি, অনেক পরিশ্রমের পর তাহাকে কোন রকমে যখন উপরে তোলা হইল তখন আর তহর জ্ঞান নেই।

জ্ঞান যখন ফিরিয়া আসিল রাত্রির অন্ধকার মেঘচ্ছন্ন আকাশ তখন পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। মাধব ধীরে ধীরে অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিল। মাথায় ঘা হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়া তহর গালে কাঁধে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে দিকে তহর দৃষ্টি নাই। আবছা আলোয় ব্যগ্র দৃষ্টিতে সে সামনের দিকে চাহিয়া অবস্থাটা বুঝিবার চেষ্টা করিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। স্রোতের টানও তেমন প্রবল নয়। কিন্তু আশা তা বলিয়া কিছু নাই। চারিদিকে শুধু দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশি, দূরে দূরে দু-একটা বড় গাছের মাথা তহরই ভিতর কোন রকম জাগিয়া আছে। কোন্‌খানে সে যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই বিপদ হইতে কেমন করিয়া যে উদ্ধার পাইবে তহরও কোন আভাস দেখা যায় না।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় সে চমকিয়া উঠিল। তাহাকে একজন যথাসময়ে ধরিয়া ফেলিয়া সাহায্য না করিলে এতক্ষণ পর্যন্তও যে তাহাকে বাঁচিতে হইত না, এটুকু অস্পষ্টভাবে তহর মনে আছে। সে লোকটা গেল কোথায়? সন্তর্পণে তক্তাপোশের উপর ঘুরিয়া পিছন ফিরিয়াই কিন্তু সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। পিছনে প্রকাণ্ড তক্তাপোশটার একেবারে শেষ প্রান্তে জড়সড় হইয়া যে দুটি মূর্তি বসিয়া আছে, মুখ দেখা না গেলেও তহদের চিনিতে মাধবের বিলম্ব হইল না।

ভাগ্যই আজ তহর সহায়, নিয়তিই এমন করিয়া তহদের একসঙ্গে মিলাইয়া দিয়াছে।

মাথার ভিতর লুপ্ত অগ্নিশিখা যেন মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মাধব স্থান কাল ভুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল উন্মত্তের মত।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া তহর হইল না। দাঁড়াইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোশটা ভয়ংকরভাবে দুলিয়া ওঠায় সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গেল। চট করিয়া তক্তাপোশের ধারটা ধরিয়া না ফেলিলে বুঝি জলেই ছিটকাইয়া পড়িত। টাল সামলাইয়া ভালো করিয়া বসিতে বেশ খানিকক্ষণ গেল। কিন্তু আর মাধব ওঠে না কেন? না, সমস্তই কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে। তহর মাথায় আগুন যেমন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তেমন মুহূর্তের মধ্যেই আপনা হইতে নিবিয়া। বিমূঢ়ভাবে সে সামনের ভীত আড়ষ্ট দুটি মূর্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তহদের যেন সে চেনে না। মনে করিতে পারে না কি সম্বন্ধের বন্ধনে পরস্পরের সঙ্গে তহরা আবদ্ধ। দিগন্ত-ব্যাপী মৃত্যু যেন জীবনের অন্তহীন সমস্ত সম্পর্কের জটিলতা সমূলে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কিছুতেই যেন আর কিছু আসে যায় না।

কথায় কথায়

ভালো লাগা

কার যে কি ভালো লাগে, কেন ভালো লাগে বোঝা কঠিন। কারোর পেট্রলের গন্ধ ভালো লাগে, কারোর পোড়া ডিজেলের গন্ধ ভালো লাগে। এমন অনেকে আছেন যাঁরা আলকাতরার গন্ধে আত্মহারা হয়ে যান। কেউ আবার শুধুমাত্র ন্যাপথালিনের গন্ধের মোহে ভরগ্রীষ্মে ট্রাঙ্ক খুলে শীতের জামাকাপড় নাড়াচাড়া করেন।

দাঁত মাজার আগে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার ছোট ভাই দৈনিক এক ইঞ্চি পরিমাণ টুথপেস্ট খায়, প্রশ্ন করে জেনেছি এর ফলে নাকি সারাদিন নিঃশ্বাস গন্ধ সতেজ থাকে। এ-কথার মানে কি জানি না একেবারে বিজ্ঞাপনের ভাষা। কিন্তু সে নিশ্চয় ভালো বুঝেই দৈনিক এক ইঞ্চি হিসেবে মাসে আড়াই ফুট টুথপেস্ট ভক্ষণ করে যাচ্ছে।

অনেকদিন আগে আমি একবার এক মেসে ছিলাম। পাশের সিটেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ছিলেন, চমৎকার স্বাস্থ্য, কোনোদিন কোনো অসুখ তাঁর কাছে আসতে পারে না। সেই ভদ্রলোক এক ডিসেম্বর মাসের গোলমেলে বৃষ্টিতে ভিজে সর্দিজ্বরে শয্যাশায়ী হলেন। দু-চারদিন পরে ভালোও হয়ে গেলেন। কিন্তু, কাশি থামলো না। আর সে কি ভয়ংকর, বিপজ্জনক কাশি। অফিস-কাছারি করে সারাদিন মোটামুটি কেটে যায় কিন্তু রাতে শুলেই গমকে গমকে কাশতে থাকেন। তাঁর কণ্ঠনালীতে কোথাও একটা ভাঁজ কম কিংবা বেশি ছিলো বোধহয়, অমন বিদঘুটে কাশির আওয়াজ আমি জন্মে শুনিনি। কাশির জন্যে সারারাত তাঁর ঘুম হতো না। সেই জরাজীর্ণ মেসবাড়ির কড়িকাঠ, জানলা-দরজা সেই কাশির সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতো। কখনো-সখনো পলেস্তারা খসে পড়তো। মেসের অন্যান্যদের, বিশেষ করে কাশিগ্রস্ত ভদ্রলোকের রুমমেট আমার রাতের ঘুম ঐ সময় শিকেয় উঠেছিলো। ভদ্রলোক ভীষণ কৃপণ ছিলেন। কিছুতেই ডাক্তার দেখাবেন না, ওষুধ খাবেন না। অবশেষে নিরুপায় হয়ে ঘুমের দায়ে আমি তাঁকে এক শিশি জনপ্রিয় কফ-মিকশ্চার উপহার দিই।

সেই তাঁর কাল হলো। এক শিশিতেই তাঁর কাশি সেরে গেলো। কিন্তু কি যে ভালো লাগলো তাঁর কাশির সিরাপ, সুস্থ হওয়ার পরেও ঐ কৃপণ নিজের পয়সা দিয়ে কাশির সিরাপ কিনে খেতে লাগলেন। শুধু চামচে দিয়ে খেতেন তা নয়। সকালে চায়ের সঙ্গে মুড়ি দিয়ে মোঘ বাতের বেলা নৈশভোজনের সময় রুটির মধ্যে গুড়ের বদলে কাশির সিরাপ দিয়ে খেতে লাগলেন। আমি এর পরে মাস তিনেক ছিলাম সেই মেসে। তখন তিনি মাসের প্রথমে মাইনে পেয়েই এক ডজন করে সবচেয়ে বড় সাইজের বোতল কাশির সিরাপ কেনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। তাতেও অনেক সময় কুলাতো না। মাসের শেষে আমার কাছে টাকা ধার করতেন সিরাপ ফুরিয়ে গেছে বলে।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন এর মধ্যে তথাকথিত ভালো লাগার ব্যাপার কোথায়? এতো একেবারে খাঁটি নেশা, পাগলামি।

আসলে হয়তো সব ভালো লাগার ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ঐ নেশা বা পাগলামিতেই দাঁড়ায়। আলকাতরার গন্ধ ভালো লাগতে পারে, সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেকেরই ভালো লাগে। কিন্তু যদি এমন হয় কেউ আস্ত আলকাতরার টিন কিনে বাড়িতে এনে সব সময়ে তার সামনে বসে থাকে, তাহলে সেটা নিশ্চয় পাগলামি।

এমনকি কেউ যদি গোলাপ ফুল ভালোবাসে বলে সারাদিন গোলাপবনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, এবং শুধুই গোলাপবনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, সেটাও যথেষ্ট পরিমাণ পাগলামি। সারাদিন, সারারাত্রি কেউ যদি ক্রমাগত কবিতা লেখে, কবিতা আবৃত্তি করে, বাড়িতে কেউ এলেই, রাস্তায় কারোর সঙ্গে দেখা হলেই কবিতা নিয়ে আলোচনা শুরু করে তাহলে সে খুব বড় কবি কিনা এ-কথা হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু সে যে খুব বড় পাগল, এ-বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

এই সব ভালো লাগার পাগলামি তবু যতদিন পর্যন্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে থাকে, ততদিন কারো তাতে কোনো আপত্তির কারণ থাকা উচিত নয়। কিন্তু অনেকের ভালো লাগা বহুবিস্তারী এবং সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়ে। রাত বারোটায় টেলিফোন করতে যদি কারো ভালো লাগে, অন্যের চিঠি খুলে পড়তে যদি ভালো লাগে ভারি গোড়ালিওয়ালা বুটের নিচে লোহার স্পাইক লাগিয়ে ভিড়ের বাসে স্যান্ডেল-আশ্রিত সহযাত্রীর খোলা পা মাড়িয়ে দিতে যদি কারো ভালো লাগে, তাহলে সমূহ বিপদ।

দশদিকে দশ মারণকণ্ঠী চোঙা লাগিয়ে তারস্বরে উচ্চতম গ্রামে মাইক বাজিয়ে, দোলের দিন বিকেল চারটে পর্যন্ত দশ গ্যালন পাকা বাঁদরে রং খরচ করে কিংবা কালীপুজোয় বা যে-কোনো অছিলায় শততম দোদমা বোমাটি ফাটিয়েও ভালো লাগার নিবৃত্তি হয় না অনেকের, এবং সেটাই আসল বিপদ।

বাটা সু কোম্পানী লিমিটেড

আমার সামনে বসে বিজ্ঞাপন জগতের অন্যতম দিকপাল শ্রীঅজিতরঞ্জন গুপ্ত। বয়সে প্রায় ষাট হলেও চেহারায় যথেষ্ট সতেজ দেখায় তাঁকে। খুব ব্যস্তভাবে একটার পর একটা বিলে ভাউচারে সই করে যাচ্ছেন তিনি। হঠাৎ কি প্রয়োজনে নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে গেলেন। সেই সময় লক্ষ্য করলাম ভারতবর্ষের ১৯৭৫-৭৬ সালের 'মার্কেটিং ম্যান অফ দি ইয়ার' তথা বাটা সু কোম্পানীর সেলস ম্যানেজার শ্রীগুপ্ত এখনও যে কোনো তরুণের চেয়ে অনেক স্মার্ট এবং ডাইনামিক মনে এবং চলনে-বলনে। চওড়া লুপ দেওয়া প্যান্ট পরে কটিবন্ধে এখনও চওড়া বেল্ট পরেন, তরুণ কর্মচারীর সঙ্গে সেই বয়সজনোচিত রসিকতা হাসিঠাট্টা করেন।

এসব কথা লেখার অর্থ এই যে বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষে বিজ্ঞাপন এবং প্রচার পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ পাঁচজন অভিজ্ঞ এবং পন্ডিত ব্যক্তির মধ্যে শ্রীঅজিতরঞ্জন গুপ্ত একজন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর সাক্ষাৎকার গ্রহণের আগেই আর এক বিশিষ্ট প্রচার ও বিজ্ঞাপন-বিশেষজ্ঞ আমায় বলেছিলেন—'ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন জগতের ক্রমবিবর্তনের ধারায় এক নতুন গতি এবং আঙ্গিক এনে দিয়েছেন শ্রীগুপ্ত। যাও আলাপ করে এসো। দেখবে তাঁর নিজের জীবনে কথাবার্তায় এবং ব্যবহারেও সেই গতি কত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।' সত্যিই তাই। শ্রীঅজিত গুপ্তের চালচলনে এবং ব্যবহারেও সেই সফিসটিকেটেড গতিময়তা আমি দেখেছি।

মার্কেটিং এবং প্রচার পদ্ধতির বিষয় নিয়ে নানা দেশ বিদেশ ঘুরেছেন তিনি। জলন্ধর পিলানি দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিকস প্রভৃতি এদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে বিদেশের বহু প্রতিষ্ঠানও আমন্ত্রিত হয়ে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁরই চিন্তাধারা ও নেতৃত্বে পরিচালিত বাটা সু কোম্পানীর পাবলিসিটি ইউনিট কর্তৃক নির্মিত বিভিন্ন

মিঃ এ আর গুপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করছেন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের কাছ থেকে

বিজ্ঞাপন পোস্টার এদেশে দু-তিন বছর সর্বশ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করেছে। শুধু তাই নয় বিদেশ থেকেও এনে দিয়েছে কৃতিত্ব।

'এই দেখুন এই বইটা প্রতি বছর প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। সারা পৃথিবীর এক বছরের নানা দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে সেরা বাছাই-করা বিজ্ঞাপনগুলো এই বইতে স্থান পায়। এটা ১৯৭৫ সালের বই। আপনি দেখুন। কথাগুলো বলে আমার দিকে বইটা এগিয়ে দিলেন শ্রীগুপ্ত।

আমি পাতা ওল্টাতে লাগলাম। বইটির নাম—'মডার্ন পাবলিসিটি'। ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ পাঁচটি বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং বিভিন্ন অগ্রণী স্টুডিও প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করেন প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন। দেখলাম পৃথিবীর ৫৫টি দেশের বিজ্ঞাপন স্থান পেয়েছে বইটিতে। ভারতবর্ষ থেকে একমাত্র বিজ্ঞাপন—বাটা সু কোম্পানির।

বই থেকে মুখ তুলে প্রশ্ন রাখলাম। —আচ্ছা বিজ্ঞাপনের পদ্ধতিটাকে আপনি কিভাবে স্থির করেন?

চশমার ফাঁক দিয়ে চকচকে চোখে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বিজ্ঞাপনের গোড়ার কথা 'কোয়ানটেটিভ মডেল'-এর কথা জানেন নিশ্চয়ই? আমি সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিতেই চিন্তা করি। ব্যাপারটাকে সোজা সরল করলে দাঁড়ায় আমি প্রথমেই চিন্তা করি—আমি যে এতগুলো টাকা বিজ্ঞাপন দেবো বা প্রচার চালাবো—তার রিটার্নটা আমার কোম্পানীর পক্ষে কেমন হবে? আমার বিজ্ঞাপন যদি আমার কোম্পানীকে রিটার্ন দেয় তবে তার অনুপাতটা কি হবে? আমার জীবন হাসি পায় যখন দেখি বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী আমার কাছে এসে সাজেশ্চান দেন—আপনি এইভাবে বিজ্ঞাপন করুন আপনি আমাদের শুধু ভাবটা দিন আমি আরো সুন্দরভাবে ডিসপ্লে করে দেবো ইত্যাদি। আমার আরো হাসি পায় যখন কোনো এজেন্সী এসে প্রোপোজাল দেন—আপনি শুধু তিন লাখ টাকা খরচ করুন! দেখুন আমরা কি করি! আমি তখন শুধু গালে হাত দিয়ে কি ভাবি জানেন? এঁরা যে এইসব তিন লাখ টাকা খরচ করার প্রস্তাব দেন, তার আগে এঁরা কি একবারও ভেবেছেন যে ঐ অর্থ খরচের মারফৎ কি এবং কতটুকু লাভ আমার হবে? এঁরা কি আমার বিজনেসের প্রোডাকশনের টোটাল টার্নওভারের ব্যাপারে অন্তত সাত দিনও ভেবে আমাকে ঐ প্রস্তাব দিয়েছেন? তা ওঁরা করে না। আসলে কোনো মানুষ বা এজেন্সী যখন আমার কাছে এসে তাঁদের কি লাভ হবে কি উপকার হবে এসব কথা বলে তখন প্রাকটিক্যালি তাঁদের কথা আমি কিছু শুনি না। আমার চিন্তা ঐ একই। এতে আমার কোম্পানির কতখানি লাভ হবে।'

কথার মাঝখানে বেয়ারা এসে সুদৃশ্য দুই কাপে ধূমায়িত চা রেখে গেছে আমাদের সামনে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ঘরের দুপাশে বোর্ডে আটকানো বাটা কোম্পানীর বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন, পোস্টারের দিকে আঙুল তুলে শ্রীগুপ্ত বললেন 'আর সেইজন্যই কোন এজেন্সী মাধ্যমেই আমরা যাইনি। আমি নিজেই এখানে একটা আলাদা ইউনিট করিয়েছি। এই দেখুন না সব বিজ্ঞাপন। নানা পুরস্কার নিয়ে এসেছে এগুলো। আমি গর্বিত যে আমার কোম্পানীর ছেলেরাই এগুলো করেছে।

চারদিকের চোখধাঁধানো বিজ্ঞাপন গুলোতে চোখ বুলোতে বুলোতে আমার মনে সেই প্রশ্নটা আরো জোরদার হলো যে প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরে মাথায় ঘুরছে। বিজ্ঞাপন থেকে মুখ ঘুরিয়ে সোজা তাকালাম অজিতবাবুর দিকে।

—আপনার অনুমতি নিয়েই একটা অনাধবনের প্রশ্ন রাখতে পারি।

বিজ্ঞাপন ও বিচিত্রা

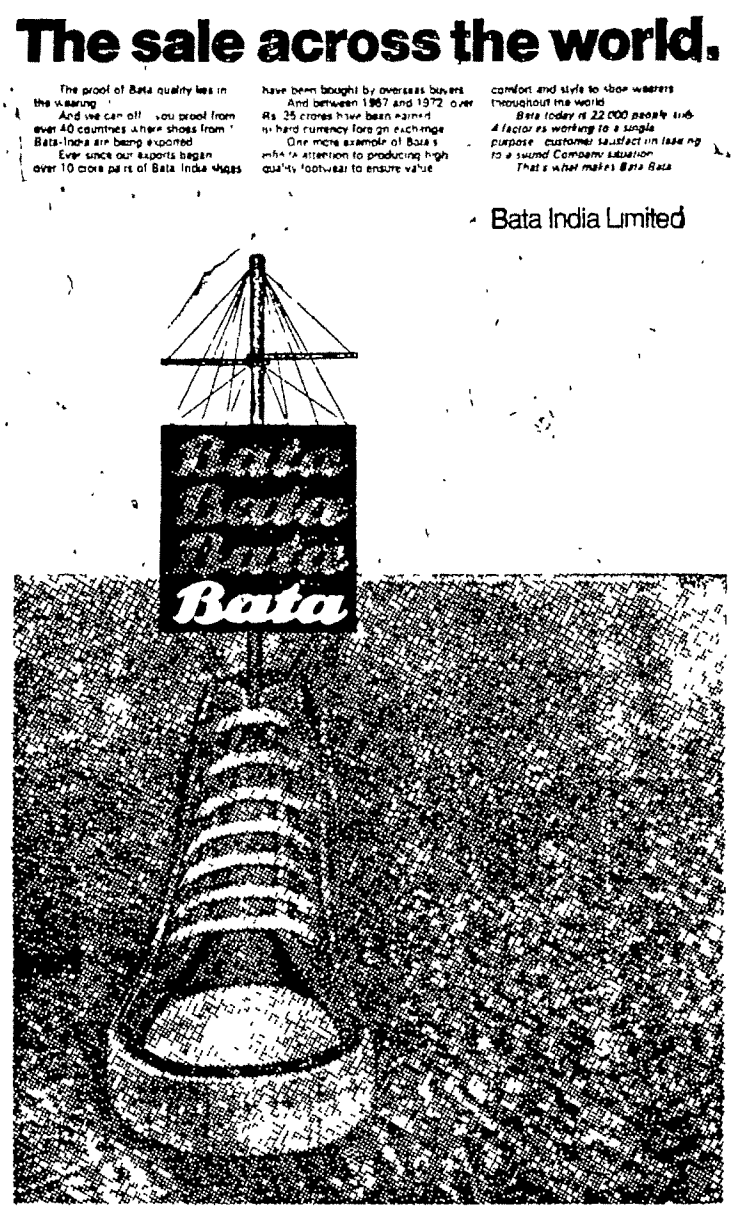

—নিশ্চয়ই।

—ভারতবর্ষের মতো দেশেও আপনাদের ব্যবসা করতে হয়—যেখানে ৭০ ভাগ কিংবা তার বেশিরভাগ লোকই অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মধ্যবিত্ত এবং গরীব শ্রেণীতে পড়ে। এই শ্রেণীর মানুষই কিন্তু আপনার জুতোর অধিকাংশ ক্রেতা।

—নিশ্চয়ই। আরো জোরে উত্তরটা বেরিয়ে আসে।

—তবে কেন আপনার বিজ্ঞাপনে কিংবা পোস্টারে অথবা ডিসপ্লেতে এই সাধারণ মানুষের মুখের ছবি বা প্রতিবিম্ব আসে না? আপনার ঘরের এইসব বিজ্ঞাপনে তো বেশির ভাগ ছেলেমেয়ে বা মানুষের ছবি দেখছি তা দেখে মনে হয় এরা সবাই হাসিখুশি উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। সুতরাং সাধারণ মানুষের ছবিকে যদি বিজ্ঞাপনে.....

আমার মুখের কথা অসমাপ্ত অবস্থাতেই অজিতবাবু বলতে শুরু করলেন—আপনি 'ইমেজ-বিল্ডিং'এর কথা বলছেন? আপনি শুনলে হয়ত অবাক হবেন বাটার জুতো বিটেইলে অর্থাৎ শহরে বা বিক্রি হয় হোলসেলে অর্থাৎ রুরাল মার্কেটে তার চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হয়। গ্রামাঞ্চলের সব জায়গাতেই আমি ঘুরেছি। কোথায় না গিয়েছি? এমনকি আসামের গোপালপাড়া হাতিদা আইজলের গ্রামে গ্রামেও ঘুরেছি। গ্রামের মানুষের পায়ে দেখেছি বাটার জুতো।

—আপনাদের প্রচার-খাতের খরচটা কিভাবে স্থিরীকৃত হয়?

—আমরা আগে থেকেই একটা প্ল্যান ফর অ্যাডভার্টাইজিং অ্যাকশনস স্থির করে নিই। যেমন ধরুন আমরা মরশুম এবং ভারতবর্ষের বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞাপনের স্টেপথ এবং ডাইমেনশনটা স্থির করি। আরো কিছু টাকা বরাদ্দ করে রাখতে হয় নানা খুচরো বিজ্ঞাপনের জন্য। এসবের উপরেই বিজ্ঞাপনের খরচ স্থির করি।

কথাগুলো বলেই আমার সামনে বিজ্ঞাপনের গ্র্যাফিকাল চার্ট তুলে ধরলেন অজিতবাবু।

—বিদেশের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে আমাদের দেশের বিজ্ঞাপন-পদ্ধতি কোন স্তরের?

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীগুপ্ত বললেন মোটামুটি, তবে বিদেশের বিজ্ঞাপন বলতে ইংল্যান্ডেই আজ বিজ্ঞাপন নিয়ে যা কিছু একসপেরিমেন্ট হচ্ছে। আমার মতে, বিজ্ঞাপনের দিক দিয়ে ইংলন্ডই এখন শ্রেষ্ঠ। এমনকি আমেরিকান বিজ্ঞাপন থেকেও ওখানকার বিজ্ঞাপন অনেক গভীর আবেদন-সম্পন্ন এবং রুচিসম্পন্ন। একটা নগ্ন নারীদেহ ছাপিয়ে দিলেই বিজ্ঞাপন হয় না।

—এদেশে বিজ্ঞাপনের সমস্যা কি কি?

—ইয়েস ইট ইজ রিয়েলি এ গুড কোশ্চেন। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম বলব এদেশে বিজ্ঞাপনের ম্যানারস কেউ মানেন না। অন্যান্য লাইনের মতো এ লাইনেও আজ চুরি জোচ্চোরামি ঢুকেছে। দ্বিতীয়ত এ লাইনে যাঁরা আছেন তাঁদের অধিকাংশের ভেতরেই দেশাত্মবোধের অভাব। আরে বাবা দেশের জল মাটি এবং মানুষকেই যদি ভালোবাসতে না পারি, তবে চিন্তা করবো কি নিয়ে? আপনি ভাবতে পারেন মন্ট্রিল অলিম্পিককে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার সরঞ্জাম দিচ্ছি আমরা আমাদের খেলোয়াড়দের অ্যাথলীটদের। স্কাউট মুভমেন্টে আমরা প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছি। বিশ্ব টেবিল টেনিসে আমার দেশের ইমেজ বৃদ্ধির জন্য প্রচুর খরচ করেছি। নিজের দেশের মানুষদের জন্য যদি না ভাববো, তবে এই চেয়ারে বসে থেকে লাভ কি?

—এই সাহায্যের পেছনেও কি আপনার প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক স্বার্থ নেই।

—সেরকম প্রত্যক্ষ কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ইমেজ-বৃদ্ধি হয় এতে। তবে মূলত সব ব্যাপারটাই সেবার দেশের প্রতি ভালবাসার কর্তব্যের টানে। এরকম কর্তব্য পালনে কটা প্রতিষ্ঠানই বা সানন্দে নিজে থেকে এগিয়ে আসে বলতে পারেন?

প্রায় আড়াই ঘন্টার সাক্ষাৎকার আলোচনা শেষ হলো। লক্ষ্য করলাম, এই সময়ের ফাঁকে ফাঁকে কমপক্ষে তিরিশ থেকে চল্লিশজন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে হয়েছে অধীনস্থ কর্মচারীদের অজস্র নির্দেশ দিতে হয়েছে এবং প্রচুর সই করতে হয়েছে। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এই সময়ে তিনি একবারও স্মোক করলেন না।

আনন্দ রায়

মনের অসুখ

মন কথাটি আমরা নানা অর্থে নানাভাবে ব্যবহার করি। 'ভুলো না, মনে রেখো', 'মন দিয়ে পড়লে ঠিক পাশ করবে', মনটা আজ ভাল নেই, যদি কিছু মনে না করেন—'চিতার আগুন নিভবে বটে কিন্তু মনের আগুন নিভবে না',—মনের আলাদা অর্থ, আলাদা তাৎপর্যের নমুনা। কমলাকান্তের মন চুরির কাহিনীতে মন আবার কিছুটা স্বতন্ত্র অর্থবহ। ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পিত ভক্তের মন আর কাঙ্ক্ষিতার করকমলে অর্পিত প্রেমিকার 'মন' কি এক? মন কি? এই প্রশ্নের অন্তত আঠারো রকমের উত্তর পাবেন। মনের অবস্থান কোথায়? যাত্রা থিয়েটারে অভিনেতারা ডান হাতটা বাঁদিকের বুকে ঠেকিয়ে মনের অবস্থান নির্দেশ করেন। তা থেকে অনেকের ধারণা মনের অবস্থান বুকের খাঁচার মধ্যে কোনো এক জায়গায়—হয়ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। মস্তিষ্কে অবস্থিত একটা ছোট গ্রন্থিকে (পিনিয়াল গ্ল্যান্ড) এক সময় মনের আধার ভাবা হত। আজকাল মনস্তাত্ত্বিকদের একদলের মতে মস্তিষ্কই মনের বস্তুগত অধঃস্তর, আবার একদল বলেন—মনের অবস্থাননির্ণয় নিরর্থক, তার প্রকোষ্ঠভিত্তিক সংগঠন জানলেই মানসিকতার ব্যাখ্যা করা যায়। এইসব তত্ত্বগত কচকচির মধ্যে না গিয়ে আমরা মনের কিছু কিছু কর্মকাণ্ডের বিবরণের ভিতর দিয়ে মনের বৈচিত্র্য ও রহস্য বোঝার চেষ্টা করব। বলে রাখা উচিত—বিবরণগুলো কল্পকাহিনী নয়, বাস্তব জীবনের ঘটনা। কোনো ঘটনা নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ, কোনোটা আবার নির্ভরযোগ্য কোনো উৎস থেকে নেওয়া। কোনটাতে মনের স্বাভাবিক দ্বন্দ্বসংঘাত ছাপ ফেলেছে, আবার কোনোটাতে পাবেন অস্বভাবী মনের অভিব্যক্তি।

মননক্রিয়ার একটি বিশেষ অভিব্যক্তিকে বলা হয় প্রক্ষোভ। এই প্রক্ষোভ সম্পর্কে অতিসাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রনেতা, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, শিল্পী-সাহিত্যিক প্রমুখ সকলেরই সমান আগ্রহ। ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, দুঃখ প্রেম ভালবাসার সঠিক সংজ্ঞার্থ বুঝতে না পারলেও এগুলির সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এই সব প্রক্ষোভের প্রভাব সম্পর্কে সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। প্রক্ষোভতাড়িত ব্যক্তি অনেক সময় নিজের বা অপরের পক্ষে ক্ষতিকর হঠকারী কাজ করে বসতে পারে। সব দেশে সব সমাজেই প্রক্ষোভ-সমস্যা দেখা যায়। অনেকে মনে করেন যে যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য হিংসাশ্রয়ী অসামাজিক কার্যকলাপের প্রধান উৎস প্রক্ষোভ। সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, আজকের পৃথিবীতে প্রেম ভালবাসার মত সদর্থক প্রক্ষোভ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। ঘৃণা-বিদ্বেষ হিংসার মত নঞর্থক প্রক্ষোভের প্রসার ও তীব্রতা বাড়ছে। ভূতপ্রেত আর প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়, অনেক কিছু লেখা হয় বটে, কিন্তু খাঁটি প্রেম ভূতের মতই দুর্লভ। কথাগুলো বলেছেন একজন প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক। এঁদের মতে পুরোপুরি সায় না দিয়েও বলা চলে, প্রক্ষোভ-সমস্যা নিশ্চয়ই এক গুরুতর সমস্যা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রক্ষোভ-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যৎসামান্য। সদর্থক নঞর্থক —দুই জাতীয় প্রক্ষোভ সম্পর্কে ঐ একই কথা। প্রেম শ্রেষ্ঠ সদর্থক প্রক্ষোভ। জৈব প্রয়োজন মেটাবার পরই ব্যক্তিমাত্রেই চায় নিরাপত্তা ও ভালবাসা। এই ভালবাসা সম্পর্কে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা খুব কমই হয়েছে। প্রেম-ভালবাসা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? 'প্রতিবেশীকে ভালবাসিবে—' বাইবেলের এই অনুশাসন কিভাবে কার্যকরী করা যায়? তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে, তার সঙ্গে ভাববিনিময় করে? অথবা তার অভাব অসুবিধা দূর করার চেষ্টা করে? অভাব অসুবিধা দূর করার মত সঙ্গতি আমার যদি না থাকে, তবে কিভাবে তাকে বোঝাবো যে আমি তাকে ভালবাসি। অভাব অসুবিধা দূর করতে অযাচিত সাহায্য পাঠালেই সে কি বুঝবে যে আমি তাকে ভালবাসি। উপকৃত হলেই মানুষ কৃতজ্ঞ থাকে না। বরং অনেক সময় সাহায্যকারীকে বিদ্বেষ ও ঘৃণার চোখে দেখে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপরের সাহায্যকে উপকৃত ব্যক্তি তার ন্যায্য পাওনা মনে করে অথবা ভাবে এই সাহায্য-দানের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে। অনেক বাপ-মা ছেলেমেয়েদের জন্যে সাধ্যাতিরিক্ত খরচ করে তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম ব্যবস্থা করেও তাদের বোঝাতে পারেন না যে তাঁরা তাদের ভালবাসেন। তারা ভালবাসার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করে এবং অনেক সময় এর ফলে তাদের বিশ্লিষ্ট মন ক্রমশ খারাপ কাজের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এরকম অনেক ছেলেমেয়ে সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। তাদের দু-একজনের কথা আপনাদের শোনাবো।

গরীবের ঘরের শিশু জামাকাপড়, খাবারদাবার, খেলনা দরকারমত পায় না বলে ভাবতে পারে বাবামা ভালবাসে না। কিন্তু যে শিশু চাওয়ার আগেই সব কিছু হাতের কাছে পায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক কিছু পায়—সে কেন মনে করে বাবামা ভালবাসে না? এই 'কেন'র উত্তরে আপাতত একটা কথা বলে রাখি। ভালবাসা ও আনুষঙ্গিক সবরকমের প্রক্ষোভ সম্পর্কে আমরা জ্ঞানলাভ করতাম, প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসন, গল্প উপন্যাস, লোকগীতি ও রূপকথা থেকে। আজকাল অবশ্য সিনেমা, রেডিও, সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন আমাদের প্রধান শিক্ষক। বলা বাহুল্য, এদের কোনোটিই বিশ্বাসযোগ্য বা নির্ভরযোগ্য শিক্ষার উৎস নয়। প্রক্ষোভ সম্পর্কে মামুলি ধারণা পরিবেশন করে আজকের এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার যুগে, এই দ্রুতপরিবর্তনশীল সমাজে শিশুদের সুস্থ ও শান্ত রাখা যাবে না, প্রক্ষোভ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রেম ভালবাসা সম্পর্কে যা বললাম, অন্যান্য প্রক্ষোভ সম্পর্কেও অনায়াসে তাই বলা চলে।

ভূমিকা এখানেই শেষ। এবার বাস্তব ঘটনার বিবরণ। প্রথমই প্রেম-ভালবাসার কথা।

(১)

অধ্যাপক-দম্পতি তাঁদের দশ বছরের ছেলেটিকে নিয়ে খুবই মুস্কিলে পড়েছেন। ছেলেটিকে দেখতে সুশ্রী, স্বাস্থ্যও ভাল। মুস্কিল দেহ নিয়ে নয়, মন নিয়ে। তিন বছর আগেও এই পুত্রটির জন্যে তাঁরা গর্ব অনুভব করতেন। স্কুলের শিক্ষকরা অধ্যাপক-দম্পতীকে স্পষ্টই বলতেন : বেঁচে থাকলে ছেলেটি আপনাদের মুখ উজ্জ্বল করবে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অলক অষ্টম শ্রেণীর ছেলেদের অঙ্ক অনায়াসে করতে পারে, নির্ভুল ইংরিজী লিখতে পারে। বাড়ীতে বাবা পড়াচ্ছেন অঙ্ক, মা ইংরিজি। স্কুলের পড়া শেষ করে বাবার কাছে সে উঁচু ক্লাসের অঙ্ক শিখত, মায়ের কাছে বড় বড় সাহিত্যিকদের লেখা নামকরা উপন্যাসের কাহিনী শুনত। গোলমাল বেধেছে ঠিক তিন বছর আগে থেকে ছোট বোনটির জন্মের মাস ছয়েক পর থেকে। অলক পড়াশুনায় ক্রমশ অমনো-

যোগী হয়ে উঠতে লাগল, নানা অছিলায় স্কুল কামাই করতে আরম্ভ করল। জোর করে ইস্কুলে দিয়ে এলেন বাবা। কিছুদিন পরে জানলেন ছেলে স্কুল পালিয়ে বাজে ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ খারাপ সিনেমা দেখছে। মায়ের ব্যাগ থেকে পয়সা সরাচ্ছে, এটাও বোঝা গেল। পরীক্ষার ফল হল খুব খারাপ। স্কুল বদলানো হল, কিন্তু ছেলের মন বদলালো না। মা বাবা বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। এর আগে যাকে কোনোদিন একটি কড়া কথা বলার প্রয়োজন হয়নি, তাকে বকলেন, ভয় দেখালেন; চড়চাপড়ও দিতে লাগলেন। এর ফলে তার দস্যিমি-নষ্টামি বেড়েই চলল। স্কুলে যাওয়া একবারেই বন্ধ করে দিল। মাবাবার চোখের সামনেই ছোট বোনটাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে লাগল। ঘুমন্ত শিশুটিকে খোঁচা মেরে, চিমটি কেটে কাঁদাতে পারলে তার চোখেমুখে একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠত অন্য সময় সেই সাত আট বছরের ছেলেটির মুখেচোখে দেখা যেত অপ্রসন্ন বিরক্তির ভাব। পাছে বাচ্চাটির কোনো ক্ষতি করে—এই ভয়ে পালা করে বাবা এবং মা কলেজ কামাই করে শিশুকন্যার পাহারায় থাকতেন। কিন্তু এমন ভাবে তো চিরকাল চলে না। বাড়ীতে বাচ্চাটিকে দেখা-শুনার করার জন্যে মাঝবয়সী যে বিধবাটি ছিলেন, তাঁকে অলক আদৌ সহ্য করত না। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের সময় অলকের মা অলকের তত্ত্বাবধানের জন্য দেশ থেকে স্বামীর এক বৃদ্ধা পিসীকে নিয়ে আসেন। তিনি মাস কয়েক থেকে দেশে ফিরে গেছেন। উপায়ান্তর না দেখে বাবা-মা অলককে একটা ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রেখে, কলেজ যেতে শুরু করলেন। এর পর তাকে কোলকাতার উপকণ্ঠে এক আবাসিক বিদ্যালয়ে রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কড়া তাগিদে ঘরের ছেলেকে আবার তাঁরা ঘরে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হলেন। সমস্যার সমাধান হল না। উপরন্তু দেখা গেল কয়েক মাস বোর্ডিংয়ের বাসিন্দা হয়ে সে ধূমপানে অভ্যস্ত হয়েছে। বাবা-মা প্রমাদ গনলেন। অনেক বন্ধুবান্ধবের পরামর্শ নিলেন, অনেক চিকিৎসকের কাছে দরবার করলেন। এবং দু বছরে এ সম্পর্কিত যাবতীয় লিটারেচার পড়ে শেষ করলেন অধ্যাপক-দম্পতি। সেই সঙ্গে বন্ধুদের পরামর্শে, চিকিৎসকদের সদুপদেশে, ও বিভিন্ন দেশের মনস্তাত্ত্বিকদের নির্দেশানুযায়ী শায়েস্তা-পদ্ধতি প্রয়োগ করতে লাগলেন তাঁরা। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হল না।

কেন ফল হল না? বাবা, মা ও অলকের সঙ্গে কয়েকদিন ধরে কথাবার্তা বলার ফলে খানিকটা তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। বাবা ও মা প্রায় একই ধরনের কথা বললেন। তাঁদের মধ্যে সব বিষয়েই মতৈক্য। তাঁদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই রকম ঃ অলক সবদিক থেকে আদর্শ বালক ছিল। আদর্শ বালক হিসেবেই সে বেড়ে উঠতো যদি না আমরা পিসীকে দেশ থেকে এনে ওর তত্ত্বাবধানে লাগাতাম। পিসীমাই যত নষ্টের মূলে। তিনি নিজে সব কিছু থেকে বঞ্চিত। বাল-বিধবা নিঃসন্তান। অল্পবয়সে আমার (বাবার) মা মারা যাবার পর—আমার লালন-পালনের ভার নিয়েছিলেন। গ্রামের স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা পর্যন্ত পিসীমা আমার অভিভাবকের মত ছিলেন। আমার জন্যে তিনি অনেক কিছু করেছেন। তাঁর প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু আমার ছেলেটির কানে বিষ ঢেলে তিনি আমাদের যে সর্বনাশ করেছেন তার জন্যে আমি তাঁকে আর কোনোদিন ভাল চোখে দেখতে পারব না। তাঁকে মাসে মাসে যে টাকাটা পাঠাই সেটা পাঠাব, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আর কোনোরকম সম্পর্ক রাখব না।

অধ্যাপকমশাই বেশ পড়াশুনো করেছেন। গণিত তাঁর নিজের বিষয়, তার বাইরেও তাঁর গতায়াত আছে। আধুনিক মনস্তত্ত্বের (?) অনেক পরিভাষা তাঁর জানা। মেপে মেপে, ঠিক শব্দ বাছাই করে থেমে থেমে তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত পেশ করলেন। খুব আস্তে কথা বলেন, নিঃশব্দে চলাফেরা করেন, কদাচ মুখে হাসি ফোটে। বললেন ঃ পিসীমা নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য আমার বাবাকে দায়ী করতেন; আমার বাবা নাকি পিসেমশায়ের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করেননি বলে তাঁর অকালমৃত্যু ঘটেছে। এই অভিযোগ শৈশবে তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি। আমাদের বিয়ের পর কয়েকমাস তিনি আমাদের সঙ্গে কোলকাতার বাসায় ছিলেন। আমাদের জীবন সেই কয়মাসেই অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন। জানানো উচিত, আমাদের মনে আমার স্ত্রী ও আমার মধ্যে বিয়ের আগে থেকে পরিচয় ছিল। স্ত্রী আমার থেকে কয়েক বছরের জুনিয়র, ওকে গণিতে 'কোচ' করতে গিয়ে ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। আমাদের বিয়েতে পিসীমার মত ছিল না। নানভাবে আমার স্ত্রীকে তিনি হেয় করবার চেষ্টা করতেন, কাজেই তাঁকে দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হই। পিসীমার মানে ভালবাসা বলে কিছু নেই, তিনি চান আধিপত্য। আমার ওপর আধিপত্য হারিয়ে অলকের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাই তাকে আমাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ করতে শিখিয়েছেন। আমাদের জব্দ করা আর অলকের ওপর আধিপত্য করা— দুই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ওকে বুঝিয়েছেন, সে আমরা ওকে ভালবাসি না। আমাদের ভালবাসা সবটাই নাকি খুকুর জন্যে তোলা ছিল। তাই অলক এক মাস বয়সের সময় তাকে পিসীর হাতে তুলে দিয়ে আমার স্ত্রীকে কলেজ যেতে হত। কারণ চাকরীটা তখন সবে বহাল হয়েছে, ছুটি পাওনা নেই। খুকুর জন্মের পর ও তিনমাস ছুটিতে ছিল। এই ব্যাপারটাকেই ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সাত বছরের ছেলেটার কানে তুলে ওর মনে বিমাতার প্রতি দারুণ ঘৃণার ভাব এনে দিয়েছেন। খুকুর জন্মের পর পিসীর হাতে তুলে না দিয়ে, অলককে তুলে দেওয়াই নাকি আমাদের অলকের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের অকাট্য প্রমাণ।

অধ্যাপক তাঁর স্ত্রীকে সামনে রেখে কথাগুলো বললেন। অধ্যাপিকা মাঝে মাঝে শুধু ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানালেন। একটি কথা নিজের থেকে বললেন না। স্বামীকে সব বিষয়েই ওকালতনামা লিখে দিয়েছেন মনে হল।

অলককে মুখ খোলাতে প্রথমটায় বেশ বেগ পেতে হল। পরে যখন মুখ খুলল— তখন আর থামতে চইল না। অনর্গল কথা বলে গেল।

অলক ঃ থামা (ঠাকুরমা) আমকে বকেছে বলেই কি আমি বদলে গেছি? বাজে কথা। খুকুকে পেয়ে বাবামাই বদলে গেছে, আমকে চায় না। আমাকে কেউ ভালবাসে না, থামও বাসে না। খুকুটা একটু একটু ভালবাসে, আমিও ওকে ভালবাসতে চই। কিন্তু ওরা আমাকে খুকুটার কাছেই ঘেঁষতে দ্যায় না। ওরা পিসীকে বলে ডাইনি। আমকে নাকি তুক করেছে।

বললাম ঃ তুমি তো বাবার কাছ থেকে কত জিনিস পেয়েছ, মামণি-ও তো এই সেদিন— তোমার জন্মদিনে ক্রিকেটের ব্যাট উপহার দিলেন। তোমকে কোলকাতায়

বঙ্গশ্রী হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী • জোড় • সিল্ক • তাঁত • মিল • পোষাক • সার্টিং • সুটিং • ও ছিট কাপড়

সেরা স্কুলে ভর্তি করেছিলেন। অন্য স্কুলের থেকে তিনগুণ খরচা বেশি। তোমার যত বই আছে অত বই তোমার বয়সী কোনো ছেলের নেই। তবে কেন ভাবছ যে বাবা মা তোমাকে ভালবাসেন না? ঐ বয়সের ছেলে হলে কি হবে, জবাবে সে বলল : জিনিস দিলেই ভালবাসা হয় না। আমি তো নোংরা ভিখিরীদের জিনিস, পয়সা দিয়ে থাকি। তা বলে কি আমি তাদের ভালবাসি? দূর থেকে ছুঁড়ে জিনিস পয়সা দিয়েই পালিয়ে যাই। ওদের দেখলে আমার কেমন যেন লাগে। ওদের আমি একটুও ভালবাসি না। ভালবাসলে তো মা বাবা অদব করে গাল টিপে দেয়, কতরকম কথা বলে। খুকুকে ওরা ভালবাসে, আমাকে বাসে না।

—তুমি যখন ছোট ছিলে তোমাকেও আদর করতেন, গাল টিপতেন, ছড়া শোনাতেন।

—না, আমার একটুও মনে পড়ে না। খামা বলেছে, আমাকে ফেলে রেখে সেজেগুজে মামণি পড়াতে চলে যেত। আমি দুষ্টুমি করব, ওদের বিরক্ত করব। বেশ করব, খুব করব। কিন্তু আমি খুকুকে মারব না— সত্যি বলছি খুকুকে মারব না। ওদের বলে দিন না খুকুর সঙ্গে আমাকে খেলতে দিতে। তা হলেই আমি ভাল হয়ে যাব।

অধ্যাপক দম্পতির সঙ্গে পরের দিন কনফারেন্সে বসলাম। খোলাখুলি বললাম যে তাঁরা অলকের ওপর কিছুটা অবিচার করেছেন। শুধু জিনিস দিলে, অভাব মেটালে, ভাল স্কুলে পড়ালেই হবে না। ছোটদের মুখেও ভালবাসা জানতে হবে। 'দে ডু নট্ লভ্ দ্যাট্ ডু নট্ শো দেয়ার লভ্'— শেক্সপীয়রের এই উক্তিটি সবার মনে রাখা দরকার।

অধ্যাপকমশাই মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানালেন। 'শো অফ লভ্' তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। এতে ছেলেদের চরিত্র দুর্বল হয়, তারা স্বাবলম্বী হতে শেখে না। আগের দিনের যৌথ পরিবারে ছেলেদের অভাব মিটিয়েই অভিভাবকরা কর্তব্য পালন করতেন, তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের দেশে দৃঢ়চেতা পুরুষ জন্মেছে। আজকের 'নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে' বাচ্চা নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে, 'শো অফ লভ্'-এর আধিক্য ঘটছে—তাই এই জেনারেশনে মানুষের মত মানুষ দুর্লভ হয়ে উঠছে।

—ভালবাসা জানানোতে বাড়াবাড়ির কথা আমি বলছি না। তবে একেবারে নিস্পৃহ ভাবে ভালবাসা জানাতেও বলছি না। মেয়েটিকে আপনারা যে-ভাবে ভালবাসা জানাচ্ছেন, ছেলেটিকেও ছোটবেলা থেকে সেই ভালবাসা জানালে পিসীমার কথায় ছেলে বিপথে যেত না, বোনকে হিংসে করত না। আপনাদের শীতল ভালবাসা যতই আন্তরিক ও গভীর হোক না কেন, অলকের মনে তার সাড়া জাগছে না।

মেয়ে ও ছেলেকে একইভাবে মানুষ করা ঠিক? মেয়েকে একদিন পরের বাড়ী পাঠাতেই হবে, চিরকাল কাছে রাখা যাবে না।

অধ্যাপক-পত্নী সম্মতিসূচক গ্রীবা-ভঙ্গী করলেন।— তাছাড়া, ছেলেরা বড় হয়ে সমাজ পরিচালনার ভূমিকা নেবে, মেয়েরা তা নেবে না। ছেলেদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনে যে দৃঢ়তা অবলম্বন দরকার, মেয়েদের বেলায় তার প্রয়োজন নেই।

বিরক্তি গোপন করতে পারলাম না।— বলেন কি? মেয়েদের সমাজ পরিচালনায় কোনো ভূমিকা নেই? আপনি কি বলেন মিসেস লাহিড়ী?

স্ত্রী স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। স্বামী বললেন : ভূমিকা নিশ্চয়ই নেবে, কিন্তু সমাজ তাদের ভূমিকা হবে গৌণ, পরিবার পরিচালনায় তাদের ভূমিকা হবে মুখ্য। সেখানে পুরুষালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দরকার হবে না।

—কিন্তু মিঃ লাহিড়ী, আপনিতো নিজস্ব পদ্ধতিতে ছেলেকে মানুষ করেছেন। ফল দেখে কি আপনার মনে হয়নি যে আপনার পদ্ধতি সঠিক নাও হতে পারে।

—কোথায় একটা গলদ আছে নিশ্চয়ই, তাইতো অপনার সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে পিসীমাই যত নষ্টের গোড়া— 'ভিলেইন অফ্ দি পিস্'।

লাহিড়ী-দম্পতি অবশ্য আর আসেন নি। একদিন মিসেস লাহিড়ী ফোনে একটু ত্রস্ত কণ্ঠে বলেছিলেন যে তিনি একবার একা আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর নিজস্ব কিছু বলবার আছে। ঐ পর্যন্ত। তিনি এখনও দেখা করার সময় পাননি।

এইবার অধ্যাপক দম্পতির ভালবাসা সম্পর্কে ধারণা ও শিশুপালন পদ্ধতি সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা চলে।

আমার মনে হয়, অধ্যাপক লাহিড়ী তাঁর পিসীমার মতই (অবশ্য পিসীমা সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি সব তাঁর মুখে) আধিপত্য প্রয়াসী ও কর্তৃত্বাভিলাষী। সামন্ততান্ত্রিক কলের পিতাই তাঁর আদর্শ। পিতার সম্বন্ধে অসীম শ্রদ্ধা পোষণ করেন তিনি, তাঁর মুখেই শুনেছি। ঠিক আত্মকেন্দ্রিক নন, তবে অহম্মন্যতায় ভরপুর। বাইরে খুব মৃদু, ভেতরে খুব কঠিন। নিজের ও পুত্রের 'কেরিয়ার' তৈরীর দিকে তাঁর যত কিছু আগ্রহ। তিনি ভালবাসা চান না, অনুগত্য পেলেই খুশি। স্ত্রীকে তিনি ভালবাসেন কিনা সন্দেহ। তাঁর ছকে বাঁধা পথে চলতে না পারলে, তিনি কাউকেই ক্ষমা করবেন না। স্ত্রীটি সুন্দরী ও ভালমানুষ। শিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রী তাঁর সম্মানবৃদ্ধি করেছে, বিবাহও তিনি ঐ কারণেই করেছেন। স্ত্রী স্বামীকে যতটা ভয়ভক্তি করেন, ততটা ভালবাসেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্যই স্বামীর সামনে আমাকে বলতে সাহস পান নি। বাইরে থেকে মনে হতে পারে এঁরা আদর্শ দম্পতি, কিন্তু আমার বিশ্বাস অধ্যাপিকা লাহিড়ী সুখী নন।

লাহিড়ীর উদ্ভট মতামত ও ছেলে মানুষ করার পদ্ধতিই অলকের এই অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

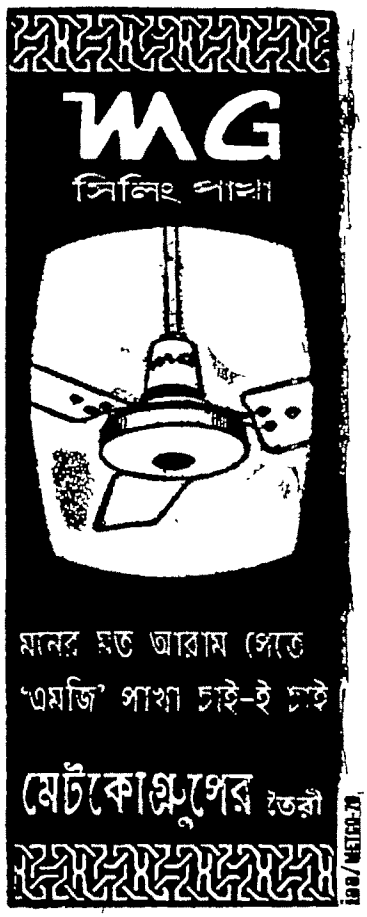

এরিয়া ডিস্ট্রিবিউটর :
টেক্নো (ইণ্ডিয়া)
১, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা-১

কুয়াশার মধ্যে ল্যাণ্ডিং ঃ কানসাস সিটি ॥

জগন্নাথ চক্রবর্তী

আমার মধ্যে একরাশ ক্লান্তি ঘুম এবং কুয়াশা—
এই উড়ন্ত চিলেকোঠায় সীটবেল্টে বন্দী আমি এক বাঙালী কবি
ফেলে-আসা এয়ারপোর্টের টিটলিপগুলি এখনো চোখের কর্ণিয়ায়
দপদপ দপদপ,
নিচে মেঘ এবং উপরে নীল অসীম, এয়ারপকেটের লিফটে
হঠাৎ ঝাঁকুনি
কাপ্তেন, কাপ্তেন, আমার মধ্যে একটা কলরব শুনতে পাচ্ছ?
একটা হিংসুটে ন্যাংটো শিশু যার নাম কবিতা
আমার বুক থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামবে কী সাহস!
আকাশে তো অনেকক্ষণ চক্কর দেওয়া গেল, আর কেন?
কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কি নামবার সংকেত মিলবে না একেবারেই?
এপ্রোনের হাঁসফাঁস-কান্নায় টিটলিপগুলির কি হবে,
কি হবে পাটাঁমাক নদীর ধারের নগ্ন-পলিশ সন্ধ্যার?
কাপ্তেন, কুয়াশায় কি কিছুই দেখতে পাচ্ছ না?
ল্যাণ্ডিং গিয়ার জবুথবু, কিন্তু কোথায়? এই শালাকলো মহ দেশে
নদী এবং জলপ্রপাতের উত্তাল শব্দের মধ্যে আমি এক উড়ন্ত ইগল
আমার মধ্যে একটা কবিতা ছটফট করছে সারাক্ষণ
আমি তাকে নামিয়ে দিতে চাই ঘাসের কার্পেটে অথবা ন্যাটো মাটিতে
মাথায় মধ্যে একরাশ ক্লান্তি, ঘুম এবং কুয়াশা
আমি কি প্লেনে না উড়ন্ত চিলেকোঠায় অথবা উড়ন-চাকতির
চক্রনেমিতে?
কিছু যায় আসে না, আমি উদ্বিগ্ন আমার হিংসুটে
ন্যাংটো শিশুর জন্য
ছকে নামিয়ে দিতে চাই যেখানে তার ল্যাণ্ডিং করবার কথা সেখানেই।

চৈত্র দিনের বৃষ্টি ॥

মনোরমা সিংহ রায়

ডালহৌসীর রাস্তার ধারে
বাসের অপেক্ষায়
দাঁড়িয়ে রয়েছি, এমন সময়
বৃষ্টি পড়লো ঝরে।
টুপটাপ শুধু অঝোরে বৃষ্টি ঝরলো।
অনেকদিনের ভুলে যাওয়া ব্যথা
কেন আজ মনে পড়লো!

বিকেলের শেষ আলো মিলিয়েছে।
সারাটা আকাশ জুড়ে
কালো কালো মেঘ দেখি।
চৈত্রদিনের বৃষ্টি।
হায়রে আজকে টুপটাপ ঝরে
ছড়ালে কী মধু একি!

এখন ভাল আছি ॥

নীরদ রায়

এখন ভালো আছি
এইসব শব্দের আড়ালে
কেননা আমি জেনে নিয়েছি
এক ফালি অন্ধকারকে দুহাতে সরানোর
ক্ষমতা আমার নেই—
এদিক ওদিক আমার সবচেয়ে
কাছের ইচ্ছের গা ঘেঁষে—
যে যেমন ভাবে তাকায়—
নদীতে আচমকা জোয়ার এলে
বিশিষ্ট আলাপ থেমে গেলে
এইসব ঘরভঙ্গ সাহসে অনুভবে
কিছু করার নেই— কিছু ভাবার নেই;
শুধু শ্রদ্ধাহীন ঘরমুখো পিছু টান।
আবার সেইখানে দেখা হবে
আবার কিছু বেহুঁশ সংবাদ
আবার কিছু আগোছালো অন্ধকার

অবিশ্বাস্য

শঙ্করীদাস চট্টোপাধ্যায়

সাদা বাঘ খ্যাত রেওয়া যাবার তখন কোনও রেলপথ ছিল না। এলাহাবাদ থেকে রেওয়া বাসে যেতে হলে সুহাগী পাহাড় পার করতে হয়। সরু রাস্তা ঘুরে ঘুরে পাহাড়ে চড়েছে। একদিকে নির্মম, কঠিন উত্তুঙ্গ পাহাড়, অপরদিকে অতলস্পর্শী গভীর খাদ।

গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে যন্ত্রী বোঝাই সরকারী বাস বুকে হাঁটা অতিকায় গিরগিটির মত পাহাড় চড়ছিল। ওপরে পৌঁছতে পৌঁছতে জলে ভরা মেঘ বাসের জানালা দিয়ে ঢুকে সকলকে যেন কালো চাদরে ঢেকে দিল।

কিন্তু এই পথের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের দিকে আমার মন ছিল না। ভাবছিলাম রেওয়া পৌঁছে বিনয়দাকে কি অবস্থায় দেখব। মানুষের মন প্রথমেই কু ডাকে। জরুরি টেলিগ্রাম এসেছে—বিনয়দা হাসপাতালে শীঘ্র আসুন। বিনয়দা আমার জ্যাঠতুতো দাদা, শুধু দাদা নয় আমার আদর্শ, আমার গাইড।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। দেখলাম বাসটা পাহাড়ের একদম মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে কোনও লোকালয় নেই, বাস স্টপ নেই তবু বাস দাঁড়িয়েছে। দেখলাম ড্রাইভার কন্ডাকটার সশস্ত্র এদেশীয় সব যাত্রী মাথা নীচু করে প্রণাম করছে। বুঝলাম না কি ব্যাপার। পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম। উনি বললেন, আপনি জানেন না! কালভৈরবের মন্দির। মন্দিরের দেওতা খুব জাগ্রত আর ভৈরোজী অর্থাৎ ভৈরব, তিনিও খুব 'পহুঁচে হুয়ে' অর্থাৎ ভৈরব সিদ্ধপুরুষ।

এক সময় বাস আবার চলতে লাগল। রেওয়া পৌঁছতে পৌঁছতে কালভৈরবের মন্দির আর তার ভৈরোজীর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু রেওয়ার হাসপাতালে গিয়ে আবার নতুন করে ভৈরোজীর সম্বন্ধে জানতে হল।

গত তিনদিন যাবৎ বিনয়দা অচৈতন্য হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। অক্লান্ত লোকেরা পালা করে চালিয়ে দিয়েছে যথাসাধ্য ডাক্তারীও আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, কিন্তু কোনই ফল নেই। কখনও

কখনও দিনে এক আধবার বিনয়দা চোখ মেলে চাইছেন তখন তাঁর চোখের দৃষ্টিতে কি এক অদ্ভুত আতঙ্ক, ভয়ে শিউরে উঠে চীৎকার করে উঠেছেন পড়ে গেলুম—পড়ে গেলুম পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়ে পড়ছেন। বুঝলাম না কি ব্যাপার। এমনটা হোল কি করে? আমার এ প্রশ্নের জবাবে কেউ আর কিছু বলেনা। অফিসের লোকেরা এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকে। শেষে বিনয়দার চাকর বল্লুর মুখে যা শুনলাম তাতে হতবাক হয়ে যেতে হোল। ভাবলাম এও কি সম্ভব?

তিনদিন আগে বিনয়দা গিয়েছিলেন সহাগী পাহাড়ে। জুতো খুলে কাল-ভৈরবের মন্দিরে প্রণাম করে ভেরোঁজীর সঙ্গে দেখা করেন। সবিনয়ে নিবেদন করেন সরকারী নির্দেশের কথা। সরু রাস্তা দিয়ে বাস চলাচলের অসুবিধে, তাই রাস্তা চওড়া করতে হবে। একদিকে গভীর খাদ, অতএব কোনও প্রশ্ন ওঠে না। আর অন্য দিকে চওড়া করতে হলে পাহাড় কাটতে হবে।

ভৈরোঁজী আপত্তি জানান না পাহাড় কাটা চলবে না। পাহাড়ের গায়ে গাইতি শাবল চালানো মানে মন্দিরের গায়ে আঘাত করা। উনি তা হতে দিতে পারেন না।

কথায় কথা বাড়ে। শেষে বিনয়দা বলেন, বেশ—আগামী সাতদিনের মধ্যে পাহাড় কাটার কাজ শুরু হবে আপনার সাধ্য থাকে বাধা দেবেন।

ফুটে ফুটে প্রতি ফুটে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর হাল্কা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
সেরা ভাল বিস্কুট—
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট খাওয়ার মানে

ভৈরোঁজী প্রচণ্ড রেগে উঠে দাঁড়ান বলেন—আমার সাধ্যে কি আছে না আছে তারজন্য সাতদিন অপেক্ষা করতে হবে না, এখনই —এই মুহূর্তে তা দেখে নে—বলে হঠাৎ ভৈরোঁজী চোখের কালো চশমাটা একটানে খুলে ফেলে বিনয়দার দিকে এক ভয়ানক কুটিল ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। বিনয়দা ঠিক সেই মুহূর্তে পেছন ফিরে মন্দির চত্বর থেকে নীচ নামবার জন্য পা বাড়িয়েছিলেন, হঠাৎ কি ভাবে যেন পা বেধে পড়ে যান। তারপর অমানুষিক চীৎকার করে ওঠেন। সঙ্গের চাপরাশি-ড্রাইভার এরা সবাই বিনয়দাকে ধরে তুলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিনয়দা তখন অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তার পরেই সঙ্গের লোকেরা হঠাৎ লক্ষ্য করে যে, বিনয়দার মাথার পেছন দিকের কিছু চুল পোড়া। ওরা ভয় পেয়ে বিনয়দাকে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়ে আনে। তারপর বিনয়দার জ্ঞান কিছুতেই ফিরছে না দেখে ওঁকে জীপে তুলে নিয়ে রেওয়াব হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেই থেকে বিনয়দা অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালেই পড়ে রয়েছেন।

কিবে করি কিছুই বুঝতে পারছিলম না। এই বিদেশ বিভুঁই জায়গায় কার কাছে সহায্য পওয়া যায়? কে বলে দেবে বিনয়দাকে বাঁচাবার জন্য কি আমার করা কর্তব্য?

মহাস্থবির জাতকে পড়ে ছিলাম প্লেমাস্কুর আতথী মশায়ের বাল্যবন্ধু তারাচরণ গুঁই মশাই বেওয়ার ইঞ্জিনিয়ার। প্রবাসে বাঙ্গালী মাত্রই স্বজন কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম তিনি সদ্য রিটায়ার হয়ে রেওয়া ছেড়ে চলে গেছেন। শেষে বিনয়দাব অফিসের লোকেরাই আমকে বলল শ্মশানে এক বাঙ্গালী তান্ত্রিক আছেন, আপনি একবার তাঁর কাছে যান, তিনি হয়ত কিছু উপায় বলতে পারেন। ডুবন্ত মানুষে খড়কুটোও চেপে ধরে। তবুও আমার মন এসবে সায় দিচ্ছিল না। ডাক্তারদের জনে জনে জিজ্ঞেস করলাম, কি করা উচিত? কি রকম বুঝছেন আপনারা।

সকলেই গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন। কেউ কিছু বুঝতেই পারেন নি। ডাক্তার সিং তো তাঁর বিশেষ ছত্তিশ গড়ি হিন্দিতে বলেই বসলেন, আমাদের কিছু করবার নেই, যা কিছু করবার সব ভৈরোঁজীর হাতে।

শেষে বাধ্য হয়ে বন্ধুকে সঙ্গে করে শ্মশানের উদ্দেশ্যে চললাম। কিন্তু সব কাজেই বাধা। পুলিশ পথ আটকে রেখেছে রাজার সওয়ারী বেরিয়েছে বলে। কি এক পর্ব উপলক্ষ্যে হাতিতে করে রাজা চলেছেন মহামায়ার মন্দিরে পুজো দিতে। রাজার রাজত্ব চলে গেছে কিন্তু প্রজাদের কাছে এখনও রাজা দেবতার অংশ। রাস্তার দুধারে সারি বেঁধে পাগড়িধারি প্রজারা আভূমি নত হয়ে রাজার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। হঠাৎ বন্ধু পাশ থেকে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলল থালি মাথায় থাকবেন না মাথায় অন্তত রুমালটা দিয়ে নিন। তাই করলাম আমি তাড়াতাড়ি।

রাজার সওয়ারি চলে গেল। অজস্র ভিড় ঠেলে কোনক্রমে রাস্তা করতে করতে শেষে এসে পড়লাম নদীর ধারে। বন্ধু পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল, অনেক উঁচু নীচু বালির ঢিপি পার করে আধপোড়া শবকটি, ভাঙ্গা কলসি, ছাই আর পোড়া কয়লার মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালী তান্ত্রিকের আস্তানায় যখন পৌঁছলাম তখন সূর্য ডুবে গেছে। রাত্রি তার কালো ডানা মেলে পৃথিবীর বুকে দ্রুত নেমে আসছে—আশেপাশে শেয়াল ডাকছে। দূরে শোনা যাচ্ছিল হায়নার হাসি।

সব শুনে বাঙ্গালী তান্ত্রিক মাথা নাড়লেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঙ্গলায় বললেন, না ভাই আমি কিছু করতে পারব না। একটাই উপায় আছে—ওনার পক্ষে তো আর সম্ভব নয়—ওনার কোন নিকট আত্মীয় যদি ভৈরোঁজীর কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন—তাহলেই হয়ত হতে পারে। সুহাগী পাহাড় পর্যন্ত তাকে খালি পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আর হ্যাঁ যে যাবে সে যেন কালভৈরবের পূজোর জন্য একশ আটটা জবা ফুল নিশ্চয়ই করে নিয়ে যায়।

বিনয়দার নিকট আত্মীয় বলতে এখানে আর কে আছে। অতএব আমাকেই যেতে হবে। কিন্তু জবা ফুলের জন্য একদিন দেরী হয়ে গেল। এখানে আবাব সহজে কেউ জবা ফুল বোঝেনা। জবা বললে খব নিয়ে আসে। শেষে অনেক দৌড়ঝাঁপ করবার পব রায় সাহেব পি ডি চ্যাটার্জির ফার্ম থেকে একশ আটটা বড় বড় জবা ফুলেব বন্দোবস্ত হোল। তেবো তারিখে বেওয়া পৌঁছেছিলাম, শনিবার একদিন বাদ দিয়ে পনেরো তারিখের ভোর রাত্তি'র জবা ফুল নিয়ে সুহাগী পাহাড়ের উদ্দেশ্যে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লাম। যাবার আগে বিনয়দার ঘরে উঁকি মেরেছিলাম। দেখি বিনয়দা আগের মতই অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে শুয়ে রয়েছেন।

আজও মনে পড়ে রেওয়া থেকে সুহাগী পাহাড় পর্যন্ত অতখানি পথ কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে ছিলাম। কোনও অনুভূতি ছিল না। মনে শুধু একটাই চিন্তা ছিল, বাস্তব হোক অবাস্তব হোক, অদ্ভুত অসম্ভব অতিপ্রাকৃতিক আধিভৌতিক যাই হোক না কেন যে কোন উপায়ে যেমন করেই হোক বিনয়দাকে বাঁচাতে হবে। এক একবাব ভাবছিলাম এ আমি কোথায় চলেছি? বিশ শতকের সভ্য জগতে এ সবও কি সম্ভব? কিন্তু পরক্ষণেই মনের গভীর অতল তল থেকে যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কার মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছিল—হতে পারে —হয়ত হতে পারে। যে জিনিষ জানি না, কখনও শুনিনি তাই যে মিথ্যে সে কথাই বা জোর গলায় বলি কি করে বুকে হাত দিয়ে কি করে বলি সত্যের আলো সব প্রশ্নের নিরসন করেছে—সব সন্দেহ মিটিয়ে দিয়েছে।

অমাবস্যার সেই গভীর রাতে যখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত পায়ে সুহাগী পাহাড়ের কালভৈরবের মন্দিরের দেবতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন সেখানে কেউ নেই। জনমানবশূন্য কালো পাথরের পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরে কালো পাথরে খোদাই করা কালভৈরবের মূর্তির সামন চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কালো হয়েছিল। জানিনা মানুষের না পশুর রক্ত। প্রকাণ্ড এক প্রদীপের পলতেগুলো পড় পড় করে পুড়ছিল। বুঝলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত মন্দির অন্ধকারে ঢেকে যাবে। কোন রকমে চীৎকার করে উঠলাম ভৈরোঁজী—। কোন সাড়া নেই।

সেই অন্ধকার রাতের চারপাশের কালো নিকষ অন্ধকার যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলবে। আবার ডাকলাম ভৈরোঁজী ভৈরোঁজী—।

অনেকক্ষণ পর কতক্ষণ জানি না, পাঁচ মিনিট হতে পারে—দশ মিনিট হতে পারে, আবার যুগ যুগান্তরও হতে পারে, বহুদূর হতে কার পায়েব আওয়াজ এগিয়ে এল। এসো-এসো তুমি যেই হও এসো। পিশাচ-ভূত-দৈত্য দানা, কাপালিক মানুষ বা দেবতা তুমি যেই হও যাই হও এগিয়ে এসো। তুমি এলে হয়ত এই অন্ধকারের হাত থেকে উদ্ধার পাব।

খড়মের আওয়াজ আমার কাছে এসে থামল। দেখলাম একজন সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী। জিজ্ঞেস করলেন, এতরাতে তুমি কোথা থেকে এলে বেটা? কাকে চাই? উত্তরে যা কিছু জানতাম স্ব গড়গড় করে বলে গেলাম। শেষে বললাম, ভৈরোঁজীকে ডেকে দিন আমি আমাব দাদার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

সাধুজী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শেষে বললেন, বেটা ভৈরোঁজীব কাছে আর ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে না।

আমি ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস করলাম কেন?

: বেটা ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। তোমার দাদা বোধহয় এতক্ষণে ভাল হয়ে গেছেন। প্রকৃত সাধক যে, সে কারোর অমঙ্গল চিন্তা করে না বা নিজের শক্তির খেলাও দেখাতে যায় না। ভৈরোঁ ভুল করেছিল সেই জন্যই বোধহয় এমন হোল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভৈরোঁজীব কি হয়েছে?

: বেটা গুরু মহারাজের নিষেধ ছিল। ভৈরোঁ আজ সকাল পাঁচটায় রামরাব আগে স্নান করতে গিয়ে চশমা খুলে রেখেছিল—পরে ভুল করে আয়না দেখে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

মোহমুক্তি (উপন্যাস ঃ সুহৃদ রুদ্র। বাক্ সাহিত্য প্রাঃ লিঃ ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। পনেরো টাকা

সাহিত্যজগতে সুহৃদ রুদ্র যদিও অপরিচিত নন, মোহমুক্তি তাঁর লেখা প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু সমকালীন সাহিত্যের বিচারে হয়ত আধুনিক নয় কিন্তু সমস্যাজর্জরিত আজকের পাঠকের কাছে বইটি এক নতুন ভাবধারায় এগিয়ে চলবার পথ দেখাতে পারে। এই ভাবধারা হয়ত সত্যই নতুন নয়— সাংসারিক মোহের বন্ধন ছিন্ন করে অমৃতের সন্ধান করাই যে জীবনের চরম আনন্দ এ কথা নতুন করে ভবতরাসীকে অন্ততঃ বলার দরকার করে না।

মোহমুক্তি নাম থেকেই বোঝা যায় লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য কি। কিন্তু উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যে নিয়ে যেতে গিয়ে লেখক কোন জটিলতা বা কঠিন গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করেন নি। বিভিন্ন সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাত ও দৈনন্দিন জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং পওয়া-না-পাওয়ার আনন্দ-বেদনার ছবি এঁকে এঁকে লেখক ধীরে ধীরে অমৃতের আনন্দঘন রূপটি প্রকাশ করেছেন। এই আনন্দের চৈতন্য বা জ্ঞানই মানুষকে আত্ম-কেন্দ্রিকতার ছোট গন্ডী ছাড়িয়ে বহুজন-সুখায়, বহুজনহিতায় নিজেকে উৎসর্গ করার প্রেরণা জোগায়।

কাশীর একটি সাধারণ মেয়ে অলকা আর পাঁচজনের মতো একদিন ভালবেসেছিল সুরেশকে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল দুজনে। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙে গেল। অলকার বিয়ে হ'ল অন্যত্র। সুরেশও। নিয়তির অকরুণ দৃষ্টিপাতে অলকাকে বেরিয়ে আসতে হ'ল ঘর ছেড়ে আর সুরেশ হ'ল সর্বহারা।

কত বছর কেটে গেছে— কত জল বয়ে গেছে কাশীর গঙ্গা দিয়ে। আবার একদিন দেখা হ'ল দুজনের মণিকর্ণিকার ঘাটে। একজন সন্ন্যাসিনী, অপরজন ভবঘুরে।

দার্শনিক বা ভাষ্যকারের মতো কঠিন পথনির্দেশ নেই পাঠকের সমনে, তবে বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে লৌকিক থেকে লোকোত্তরের অভিমুখীন এই যাত্রা।

শ্রীরঘুনাথ মল্লিকের

কালিদাস প্রতিভা

বাহির হইল। এই সুবৃহৎ গ্রন্থে মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইবেন।

মূল্য—১৬-০০

ইউ এন ধর এণ্ড সন্স

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নতুন বই

প্রথম দিকের রচনার মধ্যে মাঝে মাঝে কৃত্রিম আড়ষ্টতা দেখা গেলেও লেখক সেভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন অনায়াসে। শেষের দিকে তাঁর লেখা জীবন্ত স্বতঃস্ফূর্ত, ভাবময়।

ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবুর ডায়েরী— গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। ১১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম চার টাকা।

আট বছরের ছোট্ট ছেলে বাবু ছিল যথার্থ শিল্পী। এই অল্প কয়েকদিনের জীবনে সে যা দেখেছিল দুচোখে, তার অনেক কিছুই সে রেখে গেছে তার ছবি ও ছড়ার জগতে। এই স্মারক গ্রন্থে লিখেছেন কালিদাস রায়, বনফুল প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, জবাসন্ধ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিমল মিত্র শিবরাম চক্রবর্তী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মণীন্দ্র রায় এবং আরো অনেকে। বাবুর আঁকা ছবিগুলি বইটিকে আরো হৃদয়ের কাছাকাছি এনে দিয়েছে।

কল্যাণীয়াসু। খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। মোহন লাইব্রেরী। ৩৫-এ, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৯। আট টাকা।

চিঠির আঙ্গিকে খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'কল্যাণীয়াসু' নামের উপন্যাসোপম রচনাটি পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছেন। লেখক যাকে চিঠি লেখার ভল করে বক্তব্য রাখছেন তার নাম কল্যাণী। অপ্রত্যাশিত-ভাবে ত্রিশ বছর পরে কল্যাণীর স্বামীর একটি চিঠি পাওয়ার পর লেখক যেন তাঁর বর্তমান বক্তব্য রাখছেন। আলোচ্য গ্রন্থ অধ্যাপক ছাত্রীর ইনটেলেকচুয়াল সম্পর্ক সূত্রে বাংলা উপন্যাস, বঙ্কিম-শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ, বিদ্যাসাগরের যুগ বিশেষ করে 'গৃহদাহ' উপন্যাসে বিস্তারিত ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনার অবতারণা করেছেন। এই সব আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কিছু গল্প রচনা করে লেখক পাঠকদের মুখ বদল করার ব্যবস্থা করেছেন।

বন্দনা মালা। শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু। সম্বোধনি সাহিত্য সংসদ, বোধিবিহার, বৌদ্ধ পল্লী শ্যামনগর ২৪ পরগণা। পাঁচটাকা।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন ধর্মের বন্দনা-উপাসনার বই কম। শ্রীমৎ সম্বোধি ভিক্ষু রচিত বৌদ্ধদের জন্য 'বন্দনামালা' গ্রন্থটি সে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

নায়িকা—সুধাংশু দাস। বিশ শতক প্রকাশনী, ১২।৩এ, গ্রোভ লেন, কলকাতা-২৬। দশ টাকা।

প্রচুর কবিতা আছে এই কাব্যগ্রন্থটিতে। কবিতার বিষয়-বৈচিত্র্যও আছে। অতি বিখ্যাত চিত্রতারকাদের নিয়েও কবিতা লিখেছেন। কোন বিষয়, স্থূল অতি বাস্তব আবার কোন বিষয় সূক্ষ্ম অলৌকিক। কিছু কবিতা যথার্থই কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে। অনেক কবিতাতেই অনেক সুন্দর সুন্দর পঙ্‌ক্তি শব্দবন্ধ ও চিত্রকল্প উপহার দিতে পেরেছেন লেখক।

শেষ দৃশ্যে অন্ধকার তবু। বিভুদাস রায়চৌধুরী। বিশশতক প্রকাশনী, ১২।৩এ গ্রোভ লেন, কলকাতা-২৬। চারটাকা।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

শেষ দৃশ্যে অন্ধকার তবু। বিভুদাস রায়চৌধুরীর কবিতায় কোন আধুনিক জীবন জটিলতার ছায়া নেই। কি ছন্দে, কি শব্দে, কি চিত্রবচনায়— কোথাও কোন গভীরভাবে ভাববার অবকাশ রাখেন নি। অতি সহজ সরল ভাষায় ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখেছেন। জীবন, প্রকৃতি, রবীন্দ্র নাথ নিজেকে দেখা— এরকম বিষয়ই তাঁর লক্ষ্য। সাধারণ পাঠকদের ভাল লাগবে।

সঙ্গীত সহায়িকা (প্রথম খণ্ড)। দেবব্রত দত্ত। ব্রতী প্রকাশনী, ৪৯।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বস্তুত সঙ্গীত হল পারফর্মিং আর্ট। কিন্তু এর থিওরীকে নিয়ে একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—যা সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সহজ সুযোগ করে দিয়েছে। দেবব্রত দত্ত সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের জন্য সঙ্গীত সহায়িকা প্রকাশ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যে দেবানন্দপুর। দীনবন্ধু ঘোষ। পপুলার লাইব্রেরী ১৯৫।১বি বিধান সরণি, কলকাতা-৬। এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দীনবন্ধু ঘোষ ভূমিকায় জানিয়েছেন তিনি স্বয়ং 'দেবানন্দপুরের মানুষ।' স্বভাবতই আমরা মনে করি তাঁর আলোচ্য গ্রন্থটি যথাযথ তথ্যসমৃদ্ধ হয়েই দেবানন্দপুরের শরৎচন্দ্রের জীবনচিত্রের উজ্জ্বল প্রতিলিপি। হয়েছেও তাই। দীনবন্ধুবাবু অত্যন্ত নিষ্ঠা শ্রম সততা ও কথাশিল্পীর প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা দিয়ে আলোচ্য গ্রন্থে শরৎচন্দ্রের ঘটনাবহুল জীবন ও তাঁর প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। অনেক তথ্য আমাদের অজানা ছিল। সেগুলি এই গ্রন্থপাঠে জানতে পারি সহজেই। দেবানন্দপুর গ্রামের শরৎ-স্মৃতিধন্য কিছু গৃহের আলোকচিত্র, সংক্ষিপ্ত জীবনী, বিস্তৃত গ্রন্থ তালিকা—এ সবই গ্রন্থটির গবেষণা-মূলক কাজের সমতুল্য। শরৎচন্দ্র গবেষকদের পক্ষে এটি সংগ্রহযোগ্য।

কিশোর কুমার

"আমার মধ্যে আমি দুটি **সত্তাকে অনুভব করি**। একটি বে-পরোয়া, দুর্দম, দুর্বার। অপরটি লাজুক, শান্ত, **গভীরের জন্য তৃষ্ণার্ত**। এই দুটি সত্তাকেই আমি সমান ভালবাসি। তাই জীবনের দুটি দিকই আমার গানে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে।" —কিশোরকুমার

একালের গান

খুব সম্ভব ১৯৬৯ সালের ঘটনা।

রবীন্দ্র স্টেডিয়ামে একটি সংগীত সম্মেলনের আসর। সেদিনের প্রধান আকর্ষণ যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই অনুপস্থিত। ওদিকে সারা অডিটোরিয়ামে হৈ-হৈ হাতাহাতি মানে একরকম দক্ষযজ্ঞ হয়ে উৎসব তছনছ হয়ে যাবার উপক্রম। কর্মকর্তারা বিপন্নভাবে পায়চারী করছেন। একজন যদি বলছেন 'অমুককে বসাও' ত অন্যজন বলছেন 'না না তমুককে' পাগল নাকি? কোনো বড় আর্টিস্ট না হলে এ গোলমাল থামানো কারো বাবার সাধ্যি নেই। কেন আর্টিস্টদের অপমানিত হতে পাঠাচ্ছ?'

ভাগ্যিস সেদিন কিশোরকুমার কোলকাতায় ছিলেন। উদ্যোক্তারা ইউনিভার্সাল ভোলাদার (কিশোরকুমারের সেক্রেটারী) সাহায্যে কিশোরকুমারকে প্যান্ডেলে এনে হাজির করালেন। নেভী-ব্লুর ওপর গাঙ্গাপাখী ফুলের বড় বড় নকসাকাটা চাওয়াইন শার্ট পরা মানুষটি সবাগে এবং হাসির ফুলঝুরি ঝরিয়ে স্টেজে ঢুকতেই সারা অডিটোরিয়ামার প্রতিটি মানুষ যেন আনন্দে নেচে উঠলো।

চলেই আসছিলাম। হঠাৎ মনে এলো একদিন গানবাজনার আলোচনা প্রসঙ্গেই রবিশংকর বলেছিলেন 'কোনো বিষয়কে দূরে ছাই করে উড়িয়ে দেবার মনবারী থেকে মনকে মুক্ত রাখবার চেষ্টা করবে। মনকে প্রশস্ত কর আর সবকিছু থেকে সম্পূচন করবার চেষ্টা কর দেখবে প্রতিটি মুহূর্ত নিজের অজান্তেই আনন্দে ভরে উঠছে।'

সত্যিই ত এ মনবারী কেনই বা? এতগুলো মানুষ যাঁর কাছে এত আনন্দ পাচ্ছে তাঁর কি সবটাই ভেজিক? দেখাই যাক না। বসলাম এককোণে। দেখলাম প্রাণপ্রাচুর্যে কিশোরকুমার যেন টগবগ করে ফুটছেন আর আনন্দের জোয়ারে দর্শকদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন। এ কি নেশা? যদি তাই হয় তবে নেশা কিসের? গানের একটি কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহ যেন খুশীর উচ্ছলতায় নেচে উঠছে। মুখচোখের কৌতুকবিচ্ছুরণে প্রতোকটি দর্শক হেসে কুটোপাটি। এ কি ভাঁড়ামো? হাল্কামো? না স্টান্ট? উঁহু এর কোনোটাই মন মানতে চায় না। নিছক ভাঁড়ামো দিয়েই যদি এতগুলো এবং এতবকমের দর্শককে ভোলানো যেতো—তাহলে যে কোনো সার্কাসের জোকারই তো যথেষ্ট। অতদূর থেকে অত টাকা দক্ষিণা দিয়ে বোম্বাই-এর শিল্পী আনার দরকারটা কি? স্টান্ট যে কিছু নেই তা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র স্টান্ট বা হাল্কা রস সম্বল করে মানুষ কখনও এত জনপ্রিয় (শুধুই কি জনপ্রিয়তা?) আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 'নয়নমণি' হয়ে উঠতে পারতেন না। তবে কি? সকলের মনকে এক মুহূর্তেই নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবার যে রহস্য সেটা হয়ত কিশোরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তথা স্মার্টনেস ও সহজাত প্রতিভার সমন্বয়েই। সবার ওপর অসাধারণ কণ্ঠসম্পদ ত আছেই।

কিশোরকুমারের সুরেলা কণ্ঠ তাঁর নিটোল আওয়াজ (হিন্দুস্থানী পরিভাষায় যাকে বলা জোয়ারী) অজান্তেই মন টানে। সুরের প্রয়োগে প্রতিটি শব্দকে জীবন্ত করে তোলা অলংকারশাস্ত্রে যাকে বলে অনোমেটোপিয়া (সাউন্ড ইকোয়িং দি সেন্স). আর সুরের মধ্যে যডলিং (বিদেশী পদ্ধতিতে হঠাৎ গলা ভাঙ্গার টেকনিক) থেকে শুরু করে মীড় গমক, কি নেই? সবার ওপর এতগুলি বস্তুর যথাযথ প্রয়োগ ও পরিচালনার মেধা। হয়তো এইসব মিলিয়েই কিশোরকুমার কিশোরকুমার হয়েছেন। কিন্তু এতগুলি দুর্লভ সম্পদকে এমন ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলেন কেন? যে ঐশ্বর্য নিয়ে শ্রোতাদের মনে অনায়াসে সীমাহীন গভীরতায় তলিয়ে যাবার পিপাসা জাগাতে পারতেন কেন তাকে এত সামান্য পশারী করে রাখলেন? শুধুমাত্র এই কথাটাকেই জানবার জন্য তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অবতারণা।

'সিনেমা বিশেষ দেখি না, তবে এইটুকু জানি, গায়ক কিশোরকুমার এবং নায়ক কিশোরকুমার উভয়ের সম্মিলনেই জনপ্রিয় তারকা কিশোরকুমার'—বলেই প্রশ্ন করলাম 'এই দুই-এর মধ্যে আপনার মমতা কোন সত্তাটির ওপর?'

অফ কোর্স পপুলারটি। আই কান নট থিংক দ্যি সেপারেট টাইপ অফ মিউজিক।

এই মিউজিকের প্রেরণা?

আমার মামার বাড়ি ভাগলপুরে। ওঁরা বিরাট জমিদার ছিলেন। মামার বাড়িকে সবাই রাজবাড়ি বলত। ওখানে প্রায়ই গানবাজনার জলসা হতো। ভারতবর্ষের নানা দেশ থেকে বড় বড় ওস্তাদরা সেইসব আসরে গাইতেন। এখনও চোখের সামনে ভাসে সেই বিরাট জলসাঘর, ঝাড়লণ্ঠন, কত রং-বেরঙের আলো, আতর-গুলাব পানজর্দার ঘটা। ওস্তাদরা চোখে সুর্মা লগিয়ে, মেহেদী রংয়ে চুল-দাড়ি রাঙিয়ে কত বাহার করে আসরে গাইতে বসতেন, বাঈরা রং-বেরঙের বেনারসী ওড়নায় যেন আরব্য উপন্যাসের স্বপ্নরঙ্গনী রচনা করতেন। গানের শেষে পানজর্দা খেয়ে জিরিয়ে নিয়ে আবার গাইতে বসতেন। এক এক পর্দায় সুর লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই যেন অত বড় অট্টালিকার প্রতিটি রন্ধ্র—সুর-মেলানো তানপুরার প্রতিটি তারের অনুরণনের মতই সাড়া দিয়ে উঠতো।

তখন আমি কত ছোট্টো, কিন্তু মা আমাকে ঘুম পাড়াতে পারতেন না। আসরে প্রথম থেকে শেষ অবধি বসে থেকে হাঁ করে গান শুনতাম। শিল্পীরা এতনা ছোটো লেড়কাকো এতনা প্রেমসে গান শুনতে দেখে অবাক হতেন। আবার খুশীও হতেন। মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমায় কোলে করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হতো। ঘুম থেকে উঠে যখন দেখতাম নিজেদের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছি মনটা খারাপ হয়ে যেতো। কোথায় গেলো সেই সুর-ভরা ময়ূরাঙ্গী রাত? সারাদিন মনমরা হয়ে থাকতাম। কেউ জানতে চাইলে ঠিক বোঝাতে পারতাম না কি হয়েছে। কিন্তু সবসময় মনে হোতো কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। মা বুঝতে পারতেন আমার মনের কথা—আর ভোলাতেন—দুঃখ কিসের? আবার কত গান-বাজনা হবে, আলো জ্বলবে, আতরের গন্ধে বাতাস মাতাল হবে। এই কি শেষ নাকি?

ছোটোবেলা এইরকম পরিবেশের মধ্যে থেকেই সুরের কান এবং গাইবার মন দুই-ই তৈরী হয়ে গিয়েছিলো। অবসর পেলেই গান গাওয়াটা নওয়াশাওয়র মতই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো। তারপর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা সুরে গান গাওয়া এবং সুর-দেওয়াটা যেন নেশার মত হয়ে উঠলো।—

'একটা কথা—ওঁকে বাধা দিয়েই বলি, যে পরিবেশ এবং যে পথে আপনার সংগীতমানস গড়ে উঠেছে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের মেজাজই ত তার স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল পটভূমিকায় মানুষ হয়েও এমন সব গানের দিকেই আপনার প্রবণতা জন্মালো কেন—যার আবেদন অপরিণত মনের তরুণ শ্রোতাদেরই টানে বেশী? আপনি সুকণ্ঠের অধিকারীই শুধু নন এমন অনেক কাজ আপনার গলায় আছে যা কম শিল্পীরই থাকে। সিরিয়াস গান আপনি গাইতে পারেন না এমনও নয়। এই ত সেদিন রবীন্দ্রসদনে একটি অনুষ্ঠানে আপনার গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত ও বাংলা গান উচ্চাসিক শ্রোতারাও মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং কবুল করেছেন—'নাঃ লোকটার গলায় গায়কী আছে। ইচ্ছে করলে ভালো গান এ গাইতে পারে। এই সদিচ্ছাটা হয় না কেন?'

ছেলেমানুষের মতই মাথা চুলকোতে চুলকোতে কিশোর হাসিমুখেই বললেন—'ইচ্ছে না হলে সেদিন গাইলাম কি করে?'

'এই ইচ্ছের স্থায়িত্বটা আর একটু বেশি হলেই বা ক্ষতি কি?'

প্রাণখোলা হাসিতে উচ্ছল হয়ে কিশোর বললেন, 'ছোটোবেলায় ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলাম। কেমন করে এ-নাম কিনেছি সে-ও এক মজার ব্যাপার। জানেন তো আমার জন্ম মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ায়। ১৯৪৮ কিংবা ৪৯ সালে মনে পড়ছে না বোম্বাই এলাম। তার আগে ইন্দোর কলেজে পড়তাম। বোধহয় তখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। আমাদের কলেজের সঙ্গে বাইরের কোন এক কলেজের ফুটবল ম্যাচ ছিলো। সেদিন আমাদের একজন প্লেয়ার কম পড়ে গেলো। আমি একটু-আধটু খেলতাম। কে একজন প্রস্তাব করলেন কিশোরকে নামিয়ে দাও। আমি খেলতে ভালবাসতাম। কিন্তু তাই বলে এত বড় খেলায় নামা? ওরে বাবা, আমি পারব না। ছোটোবেলায় আমি খুব লাজুক ছিলাম। আর ভীতুও। আমি ভয় পেলেও ওঁরা কিন্তু ছাড়লেন না। একেবারে লিকলিকে রোগা ছিলাম। 'এই চেহারা নিয়ে আমি খেলার মাঠে নামতে পারব না।'

'আরে সে ব্যবস্থা হবে'খন।' একটা মস্ত ওভারকোট পরে খেলতে নামলাম। মাঠে গিয়ে কিন্তু নিজেকে একেবারেই ভুলে গেলাম। এমন খেলা খেললাম যে, সেদিন আমাদের কলেজ জিতে গেলো। রাতারাতি কলেজের হিরো হয়ে গেলাম। এই স্পোর্টিং নেচারই আমার লাইট মিউজিকের জন্য অনেকখানি দায়ী।'

'আর একটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলবেন?'

আমার মধ্যেই আমি দুটি সত্তাকে অনুভব করি। একটি বে-পরোয়া, দুর্দম্য দুর্বার। অপরটি লাজুক, শান্ত গম্ভীরের জন্য তৃষ্ণার্ত। এই দুটি সত্তাকেই আমি সমান ভালোবাসি। কারণ, কারও শক্তিই তুচ্ছ করবার মত নয়। যখন খুব হুল্লোড় করে নেচে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখনই দেখি কোথা থেকে স্তব্ধ মৌন সত্তাটি জেগে উঠেছে তার নীরব দাবী নিয়ে। তখনই তলিয়ে যাই রবীন্দ্রসংগীত অথবা ভাবসংগীতের অতলে। কিন্তু তা বলে জীবনের প্রাণচঞ্চল দিকটিও আমার কাছে কিছু কম প্রিয় নয়।'

'গান ত আপনার সহজাত সম্পদ কিন্তু শিক্ষা কার কাছে?'

শিক্ষা?' কৌতুক রঙ্গরাজ কিশোরের চোখ দুটি নেচে উঠলো, 'ভোলাদা। ও ভোলাদা!' একছুটে বেরিয়ে ভোলাবাবুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে একরকম নাচতে নাচতেই হাজির হলেন। শান্তশিষ্ট মানুষটি কিন্তু নির্বিকার। বোঝা গেলো কিশোরের এধরণের আচরণে উনি অভ্যস্ত। বেশ স্বাভাবিকভাবেই নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করে নিয়ে একটা পান মুখে দিয়ে ভোলাদা জিজ্ঞেস করেন—কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?

এই হচ্ছে ভোলাদা! মার এ্যাবসেন্সে আমার গার্জেন। মিউজিশিয়ান ফ্রেন্ড, ফিলসফার, গাইড অ্যান্ড হোয়াট নট? ইনি সঙ্গে না এলে মা আমায় একা কোলকাতায় আসতে দিতেন না। ভোলাদা। ইনি জানতে চাইছেন আমি গান শিখেছি কার কাছে?

কারো কাছে নয়! সম্পূর্ণই নিজের কাছে। ভোলাদা বলেন মৃদুস্বরে, কিন্তু দাপটভরে।

সে কি? অন্ততঃ প্রথমের দিকে নিশ্চয় কেউ একটু ধরিয়ে দিয়েছিলেন? জিজ্ঞেস করলাম।

একেবারেই না। বরং গানকে ধরেই ও এসেছে বলা যায়। ছোটবেলাতেই যে-কোন সুরে, যে-কোনো স্বরও হুবহু নকল করে সবাইকে অবাক করে দিতো।। আপনি শুনলে অবাক হয়ে যাবেন কিশোর যে-কোনো বড় ওস্তাদের যে-কোনো ডিফিকাল্ট তানও এক নিমেষে গলায় তুলে গেয়ে দিতে পারে অথচ ও সরগমও জানে না। কোনটা কোন পর্দা চেনে না।

বিস্ময় প্রায় সীমা ছাড়িয়ে গেলো। সে কি? অমিয় সান্যাল বর্ণিত মিজুদ্দিন শুনেছি এইরকম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন কিন্তু—

কিন্তু দুজনের নাম একনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করতে বাধছে অথচ ঐ নামটা মনে আসছে। এই তো? একটু ঠাট্টা করেই ভোলাবাবু বললেন, কিন্তু মিথ্যে বলে আমার তো কোনো লাভ নেই। কিশোর ত আমার কাছে বাচ্চা, আমি ওর কি তোয়াক্কা করি? ও শুনে শুনে যা শেখবার শিখেছে। সেই হিসেবে ওকে শ্রুতিধর বলতে পারেন।

তাহলে উনি মিউজিক কম্পোজ করেন কি করে?

গলায় গেয়ে দেখিয়ে দেয় আমরা নোটেশন করে নিই। ওর মত অমন মনোযোগী শ্রোতা আপনি পাবেন না। জানেন, ও কার গানের ভক্ত? সায়গল ওর প্রিয় গায়ক।

আর?

বীটোফেনের মিউজিক ওর প্রাণের চেয়েও প্রিয়তর। যখনই সময় পায়, শুনে-

পোকামাকড় যে কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!

ফিনিট

ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা'

ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

উড়ন্ত পোকামাকড়—মাছি, মশা, পতঙ্গ, ডাঁশ আর তীব্রফলের মতো। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১৫ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।

লুকোচুরি পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেঁচো-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর মতো।

যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন। বেসিন মর্দমা থেকে মিয়ে সম্ভব মত সমস্ত লুকোবার জায়গায় স্প্রে করুন। সপ্তাহে একবার কি দুবার স্প্রে করবেন।

মনে রাখবেন, ফিনিট টিনের গায়ে আরও তথ্য দেওয়া আছে। সেগুলি নিশ্চয় করে পড়ে নেবেন।

মনে রাখবেন, পোকামাকড় শুধু বিরক্তিকর নয়, নানান রোগও ছড়ায়। ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।

বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী ফিনিট বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী!

অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক ফিনিট, মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:

ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!

নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

লাইট সোনাটা বেবর্ড চালিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনে। আর একটা কথা; এতবড় শিল্পী, কিন্তু ওর আত্মবিশ্বাস একেবারেই নেই।

আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়।

যদি হয়ে থাকে তারও কারণ ঐ। মানে এই অভাবটাকে ঢাকবার জন্য অবও স্মার্ট আরও দুরন্ত হয়ে ওঠে। তখন মনে হয় ও বুঝি নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই নিঃসংশয়। কিন্তু মূল কারণটা ছোলো ওর লাজুক স্বভাব।

কিশোরকুমার লাজুক? আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না।

এইটেই হোলো ওর বিয়েল ট্র্যাজিডি ম্যাডাম। এত বড় নাম, কিন্তু একেবারে শিশুর মত লাজুক।

কিশোরের দিকে চেয়ে দেখি মৃদু মৃদু হাসছেন।

জনসনের মতে সাইনেস ইজ নাথিং **বাট সেলফ ইমপরটেন্স**। ওঁর লজ্জার কারণটাও কি তাই?

হতাশভাবে হাত উল্টে কিশোরকুমার বলেন, ভোলাদা, ছেড়ে দাও। ভাগ্য নেহাৎই খারাপ। উনি আমায় কমিক ফিগার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে রাজী নন।

মোটেই না। তাহলে এত ঝনঝাট করে ইণ্টারভ্যু নিতে আসতাম না। সে যাক। উপস্থিত আমার প্রশ্ন হোলো এত লাজুক মানুষ এমন নামকরা পপুলার ফিগার হলেন কেমন করে?

একটা কারণ মা, বাবার প্রতি অসাধারণ ভক্তি ভালবাসা। এঁদের

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যাডেনসা
মলম
ব্যবহার করুন!

হয়েছে কিন্তু এখনও মার আদেশ ছাড়া কোনো কাজ করে না। গান বা গল্পে মেতে গেলে নাওয়া-খাওয়ার হুঁশও থাকে না। সেইজন্যই ও যেখানে যায় মা অমায় সঙ্গে দেন। বাবা কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মা গৌরী দেবী ওর কাছে অরাধ্য দেবদেবীর মত। কলেজ ফাংশনে ছোটোবেলায় গান গেয়ে এত নাম করেছি। কিন্তু সব সময় ব্যাকগ্রাউণ্ড থেকে গাইতো। কোনোদিন স্টেজের ওপর আসেনি। ১৯৪৯ সালে ক্ষেমচাঁদ প্রকাশের একটি ছবিতে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট মিউজিক ডিরেকটর ছিলাম। এই সময় আমি একদিন ক্ষেমচাঁদের সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিই। ওর গাওয়া জগমগ কবিতা নিকলা ও রিমঝিম গান দুটি খুব হিট করেছিলো। সেই সময় বোম্বে টকিজ গানের জন্য ওকে অ্যাপয়েন্ট করা হোলো। প্রথমে ছবিতে নামতে ও কিছুতেই রাজী হয়নি। ১৯৬০ সালে মিঃ সন্তোষ জোর করে ওকে ধরে নামালেন হিরোর রোলেই। মাদ্রাজে, (খুব সম্ভব এম বি রামনের) লড়কী ছবিতে ও প্রচুর নাম করেছে। তারপর ১৯৬১ সাল অবধি কিশোর টপ-পেড আর্টিস্ট। ওর নিজের প্রোডাকশন লুকোচুরি তো অসম্ভব রকমের বকস অফিস পেয়েছে। দূর গগন কি ছাঁওমে ওর নিজের প্রোডাকশন। আর একটা ছবি দূর কা রাহি।

তা এমন লাজুক মানুষটি স্টেজে গাইতে সুরু করলেন কবে থেকে এবং কেমন করে?

১৯৬৭ সালে নাটোর একবার এক বিরাট দল গিয়েছিলো। তাঁর মধ্যে ছিলেন ওয়াহিদা, সুনীল দত্ত আরো অনেকে। সবাই খুব আনন্দে, হৈ-চৈ-এ বড় সুন্দর ট্রিপ-টি হয়েছিলো। সেই ট্রুপে গান গেয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের অভিনন্দন, হাসি আমাদের সংস্পর্শে এসে ওর খুব ভালো লেগেছিলো। তারপর বোম্বাইএর একটা শোতে অর্ধগত বছর বালিগঞ্জের একটা ফাংশন গেয়ে ওর এমন নেশা হয়ে গিয়েছে যে এখন ও স্টেজেই নিজেকে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছে। শিল্পী হিসেবে দাদা অশোককুমার এবং অভিনেতা দিলীপকুমারের ওপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। সত্যজিৎ রায় ওর কাছে এক বিস্ময়। রাইচাঁদ বড়ালের সঙ্গেও ওর খুব মধুর সম্পর্ক।

নামযশের আড়ালের কিশোর অত্যন্ত সাধাসিধে সরল মানুষ। বড় বড় হোটেলে ওকে যেমন আনন্দে খেতে দেখেছি তেমনই খুশীতে দেখেছি সাড়ে বাত্রিশ ভাজা অথবা চীনেবাদাম চিবোতে। হৈ-হৈ-এ ওর জুড়ি নেই। কিন্তু ও ভালবাসে সমুদ্রের ধার, নদী বন—এইসব নির্জন জায়গায় আপন মন বসে থাকতে।

ভোলাদার কথা শুনে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সত্যজিৎবাবুর চারুলতা ছবিতে কিশোরকুমারের গাওয়া চিনিগো চিনি তোমারে এক অসামান্য সৌন্দর্যসমৃদ্ধ পরিবেশ রচনা করেছিলো। কিশোরকুমারের কণ্ঠ ও গান সম্বন্ধে সত্যজিৎবাবু খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। আমার সঙ্গে একবার সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সত্যজিৎবাবু বলেছিলেন কণ্ঠ, উচ্চারণ, রেঞ্জ, ভরাট গাম্ভীর্য, মধুরতা সব মিলিয়ে কিশোরের মত এমন গায়ক দুর্লভ। চারুলতা ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও চমৎকার গেয়েছিলো। সবচেয়ে বড় কথা, ওর গলা একেবারেই মাইক্রোফোন-নির্ভর নয়। খোলা-গলা এবং শুধু ভারতীয় নয় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের অনেক টেকনিক ওর গলায় এত সহজে আসে যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। ওর সেন্স অফ রিদমও অসাধারণ। সব মিলিয়ে ভেরী রিচ ভয়েস।

উনি যদি অভিনয়ে অত টাইম এনার্জি খরচ না করে শুধু গানেই আত্মনিয়োগ করতেন গানের জগতে ওঁর জেনুইন কন্ট্রিবিউশন থাকতো বলে আমার বিশ্বাস।

অসম্ভব নয় সত্যজিতবাবু মৃদু হেসে বলেছিলেন, এমনও হতে পারে আস্তে আস্তে ও গানের দিকেই চলে আসবে। ওর মধ্যে এতবড় একটা শক্তির দাবীকে ও অবহেলা করতে পারবে বলে মনে হয় না।

সত্যজিৎবাবুর প্রায় ছ'বছর আগের উক্তি আজ কিশোরের জীবন অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। অভিনয় তিনি আজ করেন না, কিন্তু প্লে-ব্যাকে একমেবাদ্বিতীয়ম এবং হায়েস্টপেড প্লেবাক সিঙ্গার।

হৈ-চৈ-করা ও সমুদ্রের ধারের নির্জনতা-প্রয়াসী দ্বৈত-সত্তা ওঁর গানে শুধু নয়, জীবনেরও সত্য হয়ে উঠেছে।—প্রাণচঞ্চল মন আজ ডানা গুটিয়ে সঙ্গীতলোকেই বিশ্রাম নিতে চায়। কেন একটা ছবিতে গাওয়া ওঁর একটুকু ছোঁওয়া লাগে ভোলা যায় না।

সিনেমা আমি বিশেষ দেখি না। তবু লুকোচুরি দেখা হয়ে গিয়েছিলো। মনে আছে একটা সীন শিং নেই তব নাম তার সিংহ ইত্যাদি গেয়েই আপনি ছুটে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবির নীচে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, তোমার দেশে থেকেও এইসব করতে হচ্ছে ক্ষমা কর, সে কি স্টান্ট না আপনার সত্যিকারের মনের কথাই? এইটিই ছিলো কিশোরকুমারের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন।

কিশোরের চোখদুটিতে যেন খুশীর আলো জ্বলে উঠলো, আপনার মনে আছে? বিশ্বাস করুন সে শুধু আমার নয় আমার বেদনার মধ্যে সকল শিল্পীর অন্তরের বেদনার কথা বলা উঠেছে বলেই আমি মনে করি। আমাদের শিল্পীজীবনের ট্র্যাজেডিই হোলো তাই। যা বলতে চাই, ভাবতে চই, হতে চই, তার সঙ্গে আমরা যা বলি, অথবা যা করি তার কোনো সম্পর্ক নেই। সত্যিকারের আমি, মিথ্যে আমির তলায় কবে চাপা পড়ে যায় জানতেই পারি না। দমকা হওয়ার ধাক্কা আকস্মিকভাবে একদিন হঠাৎ আবরণটা কেন ফাঁকে হয়ত খসে পড়লো তখন নিজেকে নতুন করে দেখি, চিনি আর বিস্মিত হই। ভাবি তামাম দুনিয়া কি ভুল তামাসা? —কিশোর থামলেন।

সমাপ্ত

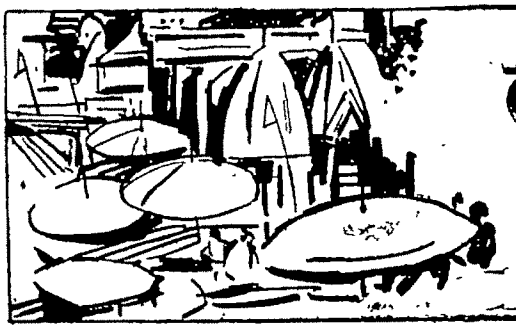

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

॥ ষোল ॥

কদিন ধরে দেবীর সঙ্গে এত কথা বলেছি কিন্তু শেষ মুহূর্তে একটা কথাও বলতে পারলাম না। নিঃশব্দে ওর হাত থেকে খামটা নিয়ে স্থাণুর মত রিকসায় বসে রইলাম।

বিশ্বনাথের গলি, গোধূলিয়ার মোড় বিশ্রান্ত সরবতের দোকান জলযোগ পার হতেই হরসুন্দরী ধর্মশালা। রিকসা খানিকটা এগিয়ে গেলেও থামালাম নামলাম। হরসুন্দরী ধর্মশালার সামনে একটু দাঁড়িয়ে মনে মনে বললাম, যা যাচ্ছি, আবার আসব।

কমিনিটের মধ্যেই বেনিয়াবাগ পৌঁছে মোগলসরাইয়ের বাস উঠে বসলাম। বাস ছাড়ার একটু দেরী আছে। দেবীর দেওয়া খামখানা হাতেই ছিল। একটু নাড়াচাড়া করেই খাকি ফেললাম। ছোট্ট একটা চিঠি—দীপ পিসীর কাছে শুনেছি আগামী ১৫ই চৈত্র তোমার জন্মদিন, সেদিন নিশ্চয়ই তুমি আমাকে কাছে আসতে পারবে না। সবগুলো সামান্য কিছু টাকা দিলাম। এই টাকা দিয়ে ঐদিন নতুন শাড়ি-গয়না কিনে পরলে আমি সত্যি খুশী হবো। —দেবী।

বুঝলাম সবগুলো কাগজের নোটকে টাকা আছে। পড়ে দেখার প্রয়োজন মনে করলাম না। পকেটে রেখে দিয়ে ওর চিঠির উপর দিয়ে বারবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

আশ্চর্য। এই পৃথিবীর জনারণ্যে কে যে কার জন্য সৃষ্টি হয়েছে কেউ তা জানে না। জানতে পারে না। কোথায় ছিলেন পিসী দিদি বা দেবী আর কোথায় ছিলাম আমি। হঠাৎ ধূমকেতুর মত ছিটকে এসে পড়লাম এদের মাঝে। আজ কলকাতায় ফিরে যাবার পথে মনে হচ্ছে শৈশবে মাতৃহারা হয়েও বোধহয় এদের স্নেহ ভালবাসার জন্যই আমি হারিয়ে যাই নি। হারিয়ে যাব না।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মোগলসরাই এলাম হাওড়ার টিকিট কিনলাম ফোর ডাউন বাসে মোলে চাপলাম। উপরের বাঙ্কে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘুমুতে পারলাম না। ঐ তিনটি নারীকে নিয়ে কত কথা মনে পড়ল।

আচ্ছা দিদি, এভাবে দুজনে থাকতে তোমাদের ভাল লাগে?

কি করব বল ভাই? আমার না হয় বয়স হয়েছে কিন্তু এই মেয়েটা ত বুড়ী হয় নি। বুঝি ওর কষ্ট হয় কিন্তু কিছু করার ত উপায় নেই।

আমিও ত একলা মানুষ কিন্তু বাইরের পাঁচটা কাজে দিনগুলো ঠিকই কেটে যায়।

সংসার না করলেও পুরুষদের দিন কেটে যায় কিন্তু সংসার না থাকলে মেয়েদের দিন কাটান সত্যি মুস্কিলের। দিদি একটু থেমে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন যেভাবেই হোক এখন তবু দিন কেটে যাচ্ছে কিন্তু আমি যখন থাকব না তখন যে সমস্যাটার কি হবে তা ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাই।

মনে পড়ল দেবীর কথা। —মনে হলো আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি আর দিদি খুবই চিন্তিত।

সে ত খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু এসব চিন্তা করে কি লাভ?

লাভ-লোকসান ভেবে কি মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে?

তা ঠিক তবুও যে ব্যাপারে চিন্তা করে কারুর কিছু করণীয় নেই সে ব্যাপারে মাথা না ঘামানই ভাল।

তুমি কি রাগ করে একথা বলছ?

রাগ করে বলব কেন? বাস্তব সত্যি কথা বলছি।

আমাদের কারুরই কিছু করণীয় নেই?

দিদির মেয়াদ ত ফুরিয়ে এসেছে। হার্টের রুগী। কখন যে দিদি লুকিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই। আর তুমি? তুমি স্যামীকে নিয়ে হরসুন্দরী ধর্মশালায় গিয়ে চোখের জল ফেলতে পারবে কিন্তু তার বেশী কিছু করার ক্ষমতা কি তোমার আছে?

আমি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারি না। মুখ নীচু করে থাকি।

দেবী একবার প্রাণভরে নিশ্বাস নিয়ে বললো, আমার মত অভাগীকে সমবেদনা জানান সহজ, লুকিয়ে লুকিয়ে ভালবাসাও কঠিন না কিন্তু তার বেশী কিছু করতে গেলেই অধিকাংশ পুরুষ পিছিয়ে আসবে।

ওর কথা শুনে লজ্জায়, দুঃখে অপমানে আমি ইজিচেয়ার থেকে উঠে জানলার সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে দেবী আমার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বললো দীপ তোমাকে অন্য সাধারণ মনে করি না বলেই ত সেবারে তোমার কাছে মাথা নীচু করলাম।

আমি ঘুরে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, সত্যি?

সত্যি।

আরো কত কথা মনে পড়ছিল গাড়ী শুয়ে শুয়ে। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি না নিলেই বুঝতে পারি নি। রসুলগঞ্জের সাঁকামামির শাল ঘুম ভাঙ্গালে দেখি সবাই বাঙ্কের-পোটরা বিছানাপত্র ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। বুঝলাম হাওড়া পৌঁছতে বিশেষ দেরী নেই।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চাদরটা সুটকেশে ভরতে ভরতেই ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকল।

কলকাতা!

কাশী থেকে কলকাতা এলেই চমকে উঠতে হয়। কলকাতা যেন কাশীর উল্টো পুরাণ। কাশীতে মানুষ জয়গান এখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম উন্মাদনা, ওখানে ত্যাগ মানুষকে এখানে সম্পদে সম্ভোগে।

কদিন আগেই কলকাতা থেকে গিয়েছি কিন্তু মাত্র এই কদিনের ব্যবধানেই কেমন যেন পালটে গেছি। এই চিৎকার এই দৌড়াদৌড়ি এই গাড়ীঘোড়ার ভীড় সমস্ত মানুষের মাঝে নিজেকে ছাপ মেরেই মন খারাপ হয়ে গেল। নাকি একটু ভয় পেলাম?

মেসে পৌঁছতেই ভার্তিকবাবু বললেন, তাহলে চিঠি পেয়েছিলে?

পাব না কেন?

কিছু বলা যায় না। আজে এক পয়সার পোস্টকার্ড এখনকার স্টীলগ্রামের বাজারে অনেক জায়গায় বেচতে পারবেন। এই কথা বলতে বলতেই উনি টেবিলের ড্রয়ার থেকে

একটা চিঠি বের করে আমাকে দিয়ে বললেন তোমার কাকাবাবু—মানে মাষ্টার-মশাই এই চিঠিটা দিয়ে বলেছেন আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ওর সঙ্গে দেখা করো।

আমি কোন কথা না বলে ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাকাবাবুর চিঠিটা পড়লাম—স্নেহের প্রদীপ অত্যন্ত দুঃখের কথা তোমার ছাত্রী কল্পনার বাবা শ্রীমান শিবনাথ হঠাৎ মারা গিয়েছেন। ওদের পরিবারের সঙ্গে আমি বিশেষভাবে জড়িত তা তুমি জান। তাই এই বিপর্যয়ের সময় তুমি যদি ওদের পাশে দাঁড়াও তাহলে বিশেষ সুখী হবো। যাইহোক ফিরে এলেই দেখা করো। সাক্ষাতে সব কথা হবে।

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে গেলাম বসলাম। তারপর শুয়ে শুয়ে ভাবলাম আমি সামান্য গৃহশিক্ষক। আমি ওদের কি সাহায্য করতে পারি? ওরা ধনী হয়েও আমার মত সাধারণ ছেলের কি সাহায্য ওদের প্রয়োজন হতে পারে? বরং আমিই ওদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

চা এলো দুটো সিগারেট আনালাম। চা খেয়ে পর পর দুটো সিগারেটও খেলাম কিন্তু মনে মনে অনেক যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ করেও হিসেব মেলাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত স্নান-খাওয়া সেরে কাকাবাবুর কাছেই চলে গেলাম।

কাকাবাবু আর কাকিমা কাশীর কাশীর কথা শোনার পর কাকাবাবুই ও-বাড়ীর কথা শুরু করলেন বড়ই দুঃখের কথা শিবনাথ মারা গেল আর ওর এই হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি জানিস?

কি?

পারিবারিক কগড়া আর মামলা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, বলেন কি?

হ্যাঁ। মরার আগের দিন রাত্রে জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হবার পরই শিবনাথ অসুস্থ হয় আর সকালেই সব শেষ।

কি আশ্চর্য!

দুঃখের কিন্তু আশ্চর্যের নয়। সম্পত্তি থাকলেই এসব নোংরামী আর মামলা মোকদ্দমাও থাকবে।

কথায় কথায় শিবনাথবাবুদের পারিবারিক ইতিহাস জানলাম। আর জানলাম জ্যাঠা মশায়ের পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে না করে পিতৃবন্ধুর কলেজের অধ্যাপকের মেয়েকে শিবনাথবাবু বিয়ে করার জন্যই পারিবারিক গণ্ডগোল আরো গুরুতর হয়। আলাদা বাড়ীতে সংসার শুরু করায় পারিবারিক যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে যায়। শিবনাথবাবু বাবার পুরোনো চেম্বারে বসে ওকালতি করলেও ও বাড়ীর কারুর মুখদর্শনও করতেন না। তবে ব্যাংকশাল বা আলিপুর কোর্টে জ্যাঠতুতো ভাইদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা হতো।

বড়লোকের বাড়ীর পারিবারিক কেচ্ছা শোনার মত মন আমার ছিল না কিন্তু কাকাবাবুকে বাধা দিতে পারছিলাম না বলে বাধ্য হয়েই অনেক কিছু শুনলাম। আর পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কাকাবাবু আমি ওদের কি করতে পারি?

শিবনাথের স্ত্রী শ্যামলী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। ও সব কিছুই সামলে নিতে পারবে কিন্তু বাড়ীতে ত একজন পুরুষ মানুষ চাই। তাই ওর খুব ইচ্ছা তুই ওদের বাড়ীতে থাকিস।

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু আমাকে বলতে না দিয়ে কাকিমা বললেন, শ্যামলীর কোন ভাই নেই। আর ও শ্বশুর-বাড়ীর কারুর সাহায্য নেবে না। ওর পক্ষে ত শুধু দুটো মেয়েকে নিয়ে থাকা সম্ভব নয় তাই.....

কিন্তু কাকিমা চিবটা কালই ত পরের বাড়ীতে কাটালাম। আর পরের বাড়ীতে থাকতে মন চায় না।

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক তবে তুই ত কৃপাপ্রার্থী হয়ে ওদের কাছে থাকবি না। কল্পনাকে যেমন পড়াচ্ছিলি তেমনই পড়াবি। শুধু মেসে না থেকে ওদের বাড়ীতে থাকবি।

কাকিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ও বাড়ীতে থাকলে তোর মেসের খরচা বেঁচে যাবে আর শ্যামলী যখন তোকে এত স্নেহ করে তখন বলা যায় না হয়ত তোকে কিছু করেও দিতে পারে।

ওঁরা দুজনেই আমাকে অনেক বোঝালেন। ওঁরা ভাবতে পারেন নি আমি এ প্রস্তাবে খুব উৎসাহী হবো না। ওঁরা আশা করেছিলেন আমি এক কথায় হাসি মুখে ওদের প্রস্তাব মেনে নেব। আমি কিছুতেই বলতে পারলাম না কাকাবাবু এ সংসারে অন্যের বাড়ীতে অন্ন গ্রহণের কি গ্লানি তা আমি মর্মে মর্মে জানি। যে যত হাসি মুখেই আমাকে আশ্রয় দিতে চান পরে সে হাসি অনুকম্পায় পরিণত হবেই। বলতে পারলাম না বড়লোকের অনুকম্পার চাইতে কার্তিকবাবুর মেসের বোর্ডার হয়ে থাকা অনেক আনন্দের গর্বের ও সম্মানজনক।

কিছু বলতে পারলাম না। নীরব শ্রোতা হয়ে ওঁদের বক্তব্য শুনে গেলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। কারণ জীবনের চরম দুর্দিনেও ওদের স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হই নি। কিন্তু আজ মনে মনে বুঝলাম কাকাবাবুর মত শুভাকাঙ্ক্ষীরও সব কথায় পরামর্শে স্বীকৃতি জানান সহজ ব্যাপার নয়। বোধহয় উচিতও নয়। তবু ওদের কথাই মেনে নিলাম।

আপনারা যখন বলছেন তখন আমি আর কি বলব? থাকব ওদের ওখানে। তবে যদি চাকরি-বাকরি পেয়ে বাইরে কোথাও চলে যেতে হয় তখন যেন ওঁরা আমাকে বাধা না দেন।

কাকাবাবু বললেন না না তা দেবে কেন? তবে এখানে চাকরি পেলে ত ওখানে থাকতে কোন অসুবিধে নেই।

কাকিমা বললেন, দ্যাখ হয়ত তোর অদৃষ্টই পাল্টে যাবে। মানুষের কখন কি হয় তা কি বলা যায়?

নিছক কথার কথা বললেও মনে হলো কাকিমা যেন কিছু একটা বিশেষ কারণেই আমাকে একটু লোভ দেখালেন।

ভেবেছিলাম বিকেলের দিকে একবার কল্পনাদের বাড়ী যাবো কিন্তু কাকাবাবুর ওখান থেকে মেসে ফিরেই শরীরটা বিশেষ সুবিধের লাগল না বলে চুপ করে শুয়ে রইলাম। অনেক রাত্রে যখন নৃপতি খেতে যাবার জন্য ডাকল তখন আর মাথা তুলতে পারছি না। নৃপতি আমার কপালে হাত দিতেই চমকে উঠল এ কী! আপনার ত বেশ জ্বর।

তাই নাকি রে?

হ্যাঁ। কপালে হাত দিতেই ত.....

তুই যা। আমি কিছু খাব না।

একেবারেই কিছু খাবেন না, তাই কি হয়? একটু দুধ খান।

আমার মতামত জানানোর আগেই নৃপতি সামনের বারান্দা থেকে চিৎকার করল, বটুক প্রদীপবাবুর খুব জ্বর, চট করে কুঞ্জর দোকান থেকে এক পো দুধ নিয়ে আয় ত।

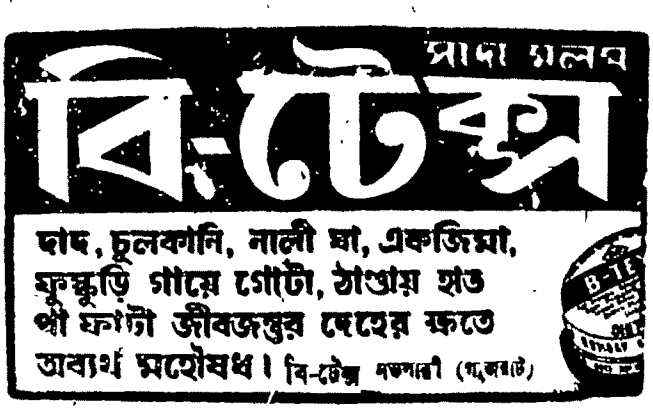

এই মেসে বাক্স-বিছানা নিয়ে প্রথম দিন যখন আসি তখন নৃপতিই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল আপনিই প্রদীপবাবু ত?

হ্যাঁ।

কাঁধের উপর বিছানা আর হাতে সুটকেশ নিয়েই বললো আসুন আমার সঙ্গে।

ঘরে পৌঁছে দিয়েই বললো একটু জিরিয়ে নিন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দু এক মিনিটের মধ্যেই বটুক এক কাপ চা আর দু'খানা থিন এরারুট এনে দিল। বুঝলাম কার্তিকবাবু এ মেসের মালিক হলেও নৃপতিই আসল নৃপতি। আর বুঝলাম কর্তব্যে নৃপতি অদ্বিতীয়।

একটা মানুষ যে কত পরিশ্রম করতে পারে আর কতজনের ফাই-ফরমাস খাটতে পারে তা নৃপতিকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। ভোর পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা—একটা পর্যন্ত নৃপতি উন্মাদের মত ছুটাছুটি করে। এর মাঝে দুপুরের দিকে ঘন্টা খানেক—ঘন্টা দেড়েক বিশ্রাম। তবু ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। কার্তিক-বাবু নিজে রোজ শিয়ালদ থেকে বাজার করে আনেন ঠাকুর রান্না করে কিন্তু বাকি সবকিছু নৃপতি। পঁয়ত্রিশ জন বোর্ডারের পঁয়ত্রিশ রকম রুচি। অফিস থেকে ফিরে এসে কেউ চা-টোস্ট কেউ চিড়ে-দই কেউ ছাতা চপ কলা কেউ তেলে ভাজা আর মুড়ি কেউ বা অন্য কিছু খাবেন, নৃপতির সব মনে থাকে। অফিস থেকে ফিরে এলেই যে যার ঘরে টেবিলের উপর খাবার পাবেন। সব বোর্ডারের ডাইংক্লিনের বিল আর হিসেব নৃপতির মুখস্থ।

আপনার তিন টাকা কুড়ি পয়সা হয়েছিল। এই নিন এক টাকা আশী।

তোর কাছে রেখে দে।

ঘরে বসেই শুনতে পাই কে যেন চিৎকার করলেন নৃপতি।

কে ওকে ডাকলেন তা আমরা কেউ বুঝতে না পারলেও ও ঠিক বুঝতে পারে। নৃপতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, আসছি। এক মিনিটের মধ্যে মদনবাবুর কাছে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করে বলুন কি বলবেন?

হ্যাঁ রে আজ মণি-অর্ডারটা করবি নাকি?

আজ না পারলেও কাল ঠিক করে দেব। কাল করলেও ঠিক সময়ে পৌঁছে যাবে।

তা যাবে।

এই ছুটোছুটির মাঝখানে নৃপতি হঠাৎ আমার ঘরে এসে জানিয়ে যায় আজ ঠাকুর মাছ বড্ড বেশী ঝাল দিয়েছে। আপনি খেতে পারবেন না। আপনার জন্য দই এনে রেখেছি। মনে করে ঠাকুরের কাছ থেকে চেয়ে নেবেন।

আমি অবাক হয়ে শুধু নৃপতির দিকে তাকিয়ে থেকেছি। ভেবেছি এই আন্তরিকতা কর্তব্যবোধ কি সংসারের আর কোথাও পাবো?

একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আচ্ছা নৃপতি তুমি নিজে একটা মেস করছ না কেন?

ক্যাকটাস

নৃপতি মাথা নেড়ে বললো, না না তাহলে কর্তাবাবুর কাছে বেইমানী করা হবে। এগার বছর বয়স থেকে ওর কাছে আছি। এখন কি ওকে ছেড়ে যেতে পারি?

এই হচ্ছে নৃপতি। ওর ঢাল নেই তরোয়াল নেই, পরণে ছেঁড়া গেঞ্জি আর ময়লা ধুতি। তবু এই নৃপতির কাছে হেরে না গিয়ে উপায় নেই।

বটুক দুধ এনে দিতেই নৃপতি আমাকে দুধ খইয়ে দিয়ে বললো এবার ঘুমিয়ে পড়ুন। দরকার হলে কাল সকালে একবার ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনব।

পরের দিন সকালের দিকে জ্বরটা অনেক কম থাকলেও বিকেলের পর থেকেই বেশ বাড়তে শুরু করল। আশেপাশের ঘরের বোর্ডাররা ছাড়াও কার্তিকবাবু মাঝে মাঝেই এসে আমাকে দেখে গেলেন। আমি আচ্ছন্ন হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলেও ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। শুনলাম আগামী কাল সকালে জ্বর না ছাড়লে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে হবে।

সকালে বটুককে ধরে ধরে কোন মতে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে চা-বিস্কুট খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি রায় ফার্মেসীর সতীশ ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করছেন আর কার্তিকবাবু পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কার্তিকবাবুর পিছনে নৃপতি ছাড়াও আরো দু একজন দাঁড়িয়ে।

দুপুরে ক্যাপসুল আর মিকচার খাবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ রে নৃপতি ডাক্তারবাবু কি বললেন রে?

বললেন দিন কতক ওষুধপত্র খেতে হবে।

তবে কি সর্দিগর্মির জ্বর না?

তা ত বলতে পারি না।

কিন্তু মেসে অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকলে ত তোদের সবাইকে.....

নৃপতি আমার মুখের কাছে জলের গেলাস ধরে বললো ওসব আজেবাজে কথা না ভেবে চুপ করে শুয়ে থাকুন।

(ক্রমশঃ)

রামকিঙ্কর বেইজ

কালের হাওয়ায় শান্তিনিকেতনের চেহারা বদলেছে অনেকখানি। কিন্তু রতন পল্লীর সেই প্রাচীনকালের খড়ো চালার মাটির বাড়ী প্রায় একরকমই আছে। মাটির দাওয়া কুয়োতলা, উঠোনে ছোট বগন সবই অবিকৃত। বাড়ির সামনে গেরুয়া মাটির পথ এখনও অম্লান। বাড়িতে ঢোকবার পথের বাঁদিকে লাল কাঁকরের ওপর আগাছার মধ্যে শিল্পীর তৈরী কংক্রীটের কম্পোজিশন সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ধীর পায়ে এগিয়ে যাই। উঠোন অতিক্রম করে দাওয়ার কাছে গিয়ে দেখি—রামকিংকরদা মোড়ায় বসে। অরুণ সূর্যের তরুণ আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর সারা শরীর। আমায় দেখে স্মিত হাসলেন। স্বভাবসুলভ এ হাসি আমার অনেকদিনের চেনা। শিশুসুলভ ইনোসেন্সে ভরা হাসি। মাথাভর্তি অবিন্যস্ত পক্ক কেশ। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। স্নিগ্ধ দৃষ্টি। চোখ দুটো আশ্চর্য রকমের উজ্জ্বল। সে উজ্জ্বলতা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। দৃষ্টিতে স্নিগ্ধ অথচ প্রসন্ন উপেক্ষার ছায়া। মোটা ভারী অঙ্গুলের মাথায় বড় বড় নখ। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। একবার তাঁর এক ছাত্র এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—কিংকরদার হাতের তর্জনী আর নখ— আমরা সবাই ভয় পেতাম। ও দুটো অনেকটা বাজপাখীর মুখের মত দেখতে। আমরা যে ভয় পেতাম, তার কারণ হচ্ছে আমরা হয়ত দিনরাত খেটে কোন কাজ করছি, উনি এসে সেই নখ দিয়ে এক খাবলা মাটি তুলে দিলেন, বললেন—কি করছো এ সব। অথচ সেইটুকু করতে আমরা হয়ত পুরোদিন কিংবা তারও বেশী সময় কাটিয়েছি। অথবা মাথাটা ভালভাবে বসিয়ে রেখে আমরা হয়ত গলা ইত্যাদি ঠিকমত করছি, কিংকরদার পছন্দ না হলেই এক চড়ে মাথাটিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেন। খুব অ্যাগ্রেসিভভাবে কাজ করতেন। এবং অপছন্দ হলে খুব উগ্রভাবেই প্রকাশ করতেন।

একালের চিত্রশিল্পী

রামকিংকর দীর্ঘকাল কলাভবনের শিল্প-শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বছর আগে অবসর নিয়েছেন।

রামকিংকরের শান্তিনিকেতনে আসার ব্যাপারটা বেশ মজার। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। জন্ম বাঁকুড়ার ঘুগীপাড়াতে ১৯০৬ সালের ২৫শে মে। পিতা চন্ডীচরণ বেইজ ছেলেকে শ্লেটে অ আ লিখে দিয়ে বুলোতে বলতেন। ছেলে শ্লেটের উল্টো পিঠে ঘরের দেয়ালে টাংগানো দেবদেবীর মূর্তি নকল করত বারবার চোখ এড়িয়ে। স্কুল পালিয়ে গ্রামের কামারকুমোর কর্মকার বা পটুয়াদের কাজ দেখত তন্ময় হয়ে। এক কুমোরের কাছে মূর্তি গড়াও শিখেছে হাতে-নাতে। মা সম্পূর্ণা অভাবের সংসারে ছেলেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে ত্রুটি করতেন না। বেইজ পদবী সম্পর্কে অনেককেই প্রশ্ন করতে শুনি। রামকিংকরদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন বেজ পদবী এসেছে বৈদ্য থেকে। বৈদ্য থেকে বৈজ। পরে তা বেইজ হয়েছে।

বাঁকুড়ার স্বদেশী মেলায় রামকিংকরের অঙ্কিত ছবি দেখে প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। কয়েকমাস পরে কথাবার্তা পাকা করে রামানন্দ চিঠি লিখলেন রামকিংকরকে। সেটা ১৯২৫ সাল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন্দলালের সঙ্গে পনের ষোল বছরের ছেলের পরিচয়ও করিয়ে দিলেন। ছবি দেখে নন্দলাল বললেন—তোমায় আর কি শিখাব? শিখেই ত এসেছ—এখানে অন্তত দু-তিন বছর থাকো। কাজ কর।

সেই থেকে রামকিংকরদার প্রায় সারাটা জীবন কেটে গেল ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় শান্তিনিকেতনের কোলে। এই সেদিনও কথাপ্রসঙ্গে বললেন চৌষট্টি বছর বয়সে কলাভবন থেকে রিটায়ার করেছি। এখন প্রায় সত্তর একাত্তর বছর বয়স হল। কিন্তু আমার জীবনে সেই পুরনো ঘোর এখনও কাটেনি। চিরকালটা শান্তিনিকেতনেই কাটল। কেবল মাঝে একবার দিল্লীর মডার্ণ হাই স্কুলে গিয়ে-

ছিলাম কাজ শেখাতে। ছ মাসের বেশী টিকতে পারিনি। এখানে পালিয়ে এসে বেঁচেছি

শান্তিনিকেতনে রামকিংকরের প্রায় গোটা জীবনটা কেটেছে অর্থনৈতিক অনটনে। বাঁকুড়া থেকে এসেছিলেন একরকম শূন্যহাতে। তবে নন্দলাল কিছু রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইলাসট্রেশনের কাজ দিয়ে। তাছাড়া সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসের প্রদর্শনীর দৌলতে বিক্রীত ছবির অর্থ দিয়ে অভাব কিছুটা মিটেছিল। এইভাবে বছর দুয়েক কাটাবার পর ডাক এল কবিগুরুর কাছ থেকে। ছবি আঁকা মূর্তি গড়া শেখাতে হবে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। রামকিংকরের দোসর হলেন বিনোদবিহারী মুখার্জি। রামকিংকর ভাস্কর্য ও বিনোদবিহারী চিত্রাঙ্কন শেখাতে শুরু করলেন।

এর আগে ওয়াটার কলারে কাজ করলেও রামকিংকর প্রথম তেলরং-এর কাজ বা মূর্তি গড়েন শান্তিনিকেতনে। রামকিংকরদা বলেন—তেলরঙের কাজ সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে কেউ করতেন না। আমার ইচ্ছে হল অয়েল পেইন্টিং শেখার। রঙের দোকানে গেলাম। জিজ্ঞেস করতেই তাঁরা বললেন এই তুলি, টিউব রঙ আর পাত্রে তেল আছে। ডোবান আর আঁকুন। ব্যাস আমার অয়েল পেইন্টিং শেখা হয়ে গেল। যতদূর মনে পড়ে তেলরঙের প্রথম ছবি, সোমাযোগী। তবে সেই সময়ের ভাল কাজ হচ্ছে—গার্ল অ্যান্ড দি ডগ। অয়েল পেইন্টিং আর অ্যাবসট্রাকট কাজ করার জন্যে প্রথম প্রথম নন্দবাবু খুব একটা সন্তুষ্ট হননি। তবে কখনও বাধা দিতেন না। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুব মডার্ণ ছিলেন। বলতেন, যা ভাল লাগে করে যাও। নতুন নতুন কাজ করে যাও। ওদেশে কত ভাল কাজ হচ্ছে। তোমরাও করে যাও। পারবে। তোমাদের ভেতরও ক্ষমতা আছে।

রামকিংকর কলাভবনে বসে অনেক ভাস্কর্যের কাজ আর মূর্তি গড়েছেন। কিন্তু স্টুডিওর চারদেওয়ালের ভেতরে করা ছোট কাজের মধ্যে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। বেরিয়ে এলেন উন্মুক্ত খোলা প্রকৃতির কোলে। বানালেন কংক্রীটের তৈরী সাঁওতাল মূর্তিটা। লম্বা গাছের মত আকৃতি। মুখটা অ্যাবস্ট্রাকট নয়। জয়া আপাপাবামীক দেখে করা। নন্দবাবু মূর্তি দেখে খুশী হয়ে দোরগোড়ায় লাগিয়ে দিয়েছিলেন ইউক্যালপটাস গাছ। আজ তা শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে সাঁওতালকে যেন নব কলেবর দান করেছে।

সৃষ্টির লীলার মধ্যেই শিল্পের মুক্তি বলেই বোধহয় রামকিংকর একের পর এক মূর্তি বানিয়ে বসিয়েছেন প্রকৃতির কোলে।

কবি : রামকিংকর বেইজ

পুরনো গেস্ট হাউসের সামনে সাঁজানো ব্রোঞ্জ মূর্তিটি রামকিংকরকৃত অ্যাবস্ট্রাকশনের একটি অসাধারণ নমুনা। আপাত দৃষ্টিতে খুব দুর্বোধ্য মনে হয়। কিন্তু একটু ঘুরে ফিরে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওর মধ্যে রয়েছে চুম্বনরতা নারী মূর্তি ও পাখি। উভয়েরই হুবহু আকৃতির অস্তিত্ব নেই। অথচ তাদের উপস্থিতির সংবাদটুকু আছে। কম্পোজিশনের ডাইমেশনাল এপ্রোচ দেখার মত। আর কল্পনা মিশ্রিত এক মিস্টিক ভাবাশ্রয়ে রসাবৃত। তবে সম্প্রতি বোলপুরে গিয়ে দেখলাম কম্পোজিশনের মসৃণ ত্বকের অনেক জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। শান্তিনিকেতনের খোলা আবহাওয়ায় অন্যান্য ভাস্কর্যগুলো মোটামুটি অবিকৃত থাকলেও ওগুলোকে সুন্দর ব্রোঞ্জে রূপান্তরিত করা দরকার। কারণ সিমেন্ট কংক্রীটের আয়ু বোধহয় খুব বেশীদিন নয়।

শান্তিনিকেতনের প্রাঙ্গণে স্থাপিত সাঁওতাল পরিবার ও বাজারের পথে সুবিশাল ভাস্কর্য দুটি প্রাণচঞ্চল গতিময়তায় আকীর্ণ। সাঁওতাল দম্পতি কাজে চলেছে। ভোরবেলায়। ধানকলে, মাথায় রান্না করা খাবার। গায়ে ভিজে কাপড় শুকোতে শুকোতে চলেছে দ্রুতপদে। কাপড়ের বাহুল্য নেই। দ্রুতধাবমান মূর্তির পেছনে অনুসরণকারী শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি অসাধারণ। বাজারের পথে ভাস্কর্যটিতেও সাঁওতাল দম্পতী চলেছে

শীত-গ্রীষ্মে ব্যবহারযোগ্য
রূপসী
বেনারসী ও সিল্ক শাড়ী
৬২, জি. টি. রোড (সাউথ) হাওড়া

হাটে। কোলার একদিকে বিক্রীর জন্যে পসরা অন্যদিকে ক্রেতাদের বাচ্চা। সঙ্গে কুকুর। এটিতেও দ্রুতচারী, ভারক্লান্ত দীর্ঘকায় পুরুষের পদক্ষেপে এক নতুন গতি ও ছন্দ সঞ্চারিত হয়েছে। বোলপুরের রাঙা মাটির পথে, প্রত্যহে এসব দৃশ্য প্রাত্যহিক। এই সামান্য দৃশ্যকে রামকিঙ্কর অসামান্য করেছেন তাঁর কাজের মাধ্যমে। কেন ক্ষণকালকে মহাকালের পাতায় কোদিত করে দিতে চেয়েছেন। সাঁওতাল আদিবাসীদের প্রতি শিল্পীর আত্যন্তিক অন্তরঙ্গতার আঘ্রাণ পাওয়া যায় অন্যান্য অরও অনেক কাজে। এদের সঙ্গে রামকিংকরের মেলামেশা অগাধ ও অবাধ। সাঁওতাল সঙ্গীতের তিনি একজন সমজদার শ্রোতা। গাইতেও পারেন অল্পস্বল্প। একবার সামান্য কিছু শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

যাইহোক এসব মূর্তি অতিমাত্রায় লিরিক্যাল। কোনো জায়গায় অ্যাকাডেমিক বলে মনে হয় না। অথচ একটা বিশেষ স্বতঃস্ফূর্ত ব্যঞ্জনা ও ছন্দোময় কাব্যিক গতিশীলতায় পরিশীলিত। শান্তিনিকেতনের হিজোলিত শাখা-প্রশাখার ছায়ায় এসব মূর্তি আরব্য রজনীর আশ্চর্য গল্পের মত দাঁড়িয়ে থাকে। মনের দ্বারপ্রান্ত করে।

রামকিংকর রবীন্দ্রনাথের দুটি বাস্ট করেছেন। যা পোয়েটস হেড বা কবি নামে খ্যাত। জনপ্রিয়। প্রথমটি কবির শিটিং নিয়ে করা একটু ঝুঁকে বসা চেহারার প্রতিকৃতি। রবীন্দ্রচরিত্রের বৈশিষ্ট্য শতধারায় বিকশিত হয়েছে ভাস্কর্যটিতে। রিয়ালিস্টিক এই প্রতিকৃতিতে এপস্টাইনের কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি আছে বলে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এপস্টাইনও কবির প্রতিকৃতি রচনার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

রামকিংকর কৃত কবির অপর মূর্তিটি ব্রন্জ থেকে গড়া। শিল্পীর চরম অ্যাবস্ট্রাকটসনের নিদর্শনও বটে। এটি বহু আলোচিত। বহু বিতর্কিত। চোখে দুটো বল দেওয়া। দাড়ি সিঁড়ির মত। যেন কয়েকটা এবড়োখেবড়ো ভগ্ন সামগ্রীর সমাহারে ভাস্কর্যটি সম্পূর্ণ।

এ প্রসঙ্গে তাঁর অপর একটি সিমেন্ট কংক্রীটের কাজ 'হাডেস্টিং' স্মরণীয়। কিঞ্চিৎ কিউবিস্টিক রীতিতে রচিত এই ভাস্কর্যটিতে আশ্চর্য বিবর্তনের বিষয়টি দেখার মত। ফর্ম ভেঙেছেন বটে। কিন্তু হুবহু কপি করেননি। স্বীয় মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনের মুক্তাঙ্গনে স্থাপিত ডান্ডি অভিযান ও বুদ্ধ মূর্তি ভারত শিল্প ভাণ্ডারে এক মূল্যবান ঐশ্বর্য হয়ে আছে। রবীন্দ্রভারতী প্রদর্শনশালায় সংগৃহীত অবনঠাকুরের বাস্ট, কিংবা ভিস্তিওয়ালা, পেরেমবুলেটার প্রভৃতিতে রামকিংকরের মূল্যায়নার স্বাক্ষর ষোলআনা। দিল্লীর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনে সাজানো পাথরের যক্ষ-রক্ষিণী শিল্পীর আর একটি মনুমেন্টাল কাজের নিদর্শন।

অর্ধ কৃষি ও শিল্পের প্রতীক হিসেবে মূর্তিদুটো নির্মিত। পাথরের করা এই মূর্তিদুটোতে তৃপ্তি পেলেও শিল্পীর ব্রোঞ্জে কাজ করার ইচ্ছে প্রবল। কথায় কথায় একবার বলেছিলেন—ব্রোঞ্জের বড়সড় কাজ করার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে।

রামকিংকরের ভাস্কর্যের রূপকল্পনায় নানা শৈলীর সংমিশ্রণ ঘটেছে। চল্লিশ দশকের অধিকাংশ কাজ বাস্তবানুগ পদ্ধতি বা রিয়ালিজম আশ্রিত। পরের দিকে তিনি ক্রমশই মূর্ত থেকে বিমূর্তের পথে পদচারণা করেছেন। তাই তাঁর পঞ্চাশ দশকের বেশীরভাগ শিল্পকলা চোখে দেখা বাস্তবতার বাইরে অন্য এক জগতের ইংগিতবাহী। আবার কিউবিস্টিক ফর্মের প্রতি প্রবণতাও ধরা দিয়েছে তাঁর কতিপয় কাজে। এসবের বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়ে আগেই বলেছি। আসলে শিল্পী কোন একটি বিশেষ রূপকল্পে বেশীদিন তৃপ্তি পান না। তাই কেবলই ভাঙেন। তিনি ডিসটরশানে বিশ্বাসী। তবে এই ভাঙাগড়া ইচ্ছাগত নয়। স্রোতের মত আপনিই আসে। ভেতরের তাগিদ থেকে আসে। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে রামকিংকরদা বলেন—একবার দুটি মেয়ের পূর্ণাবয়ব ছবি এঁকেছিলাম। স্প্যাচুলা দিয়ে আঁকা ছবিটাতে একটা অদ্ভুত রঙ ও রেখা এসে গিয়েছিল। মুখের ডিসটরশান এসেছিল। ইচ্ছাকৃত নয়। আপনিই এসেছিল। ডিসটরশান না থাকলে সমস্ত জিনিসটা কি পয়েন্টলেস হয়ে যায় না? প্রকৃতপক্ষে ডিসটরশানই তাঁর শিল্পরসের মূল সুর। কিন্তু ভাঙাগড়ার নিরিখে বহিরঙ্গ আবরণটাই তাঁর ভাস্কর্যে বড় নয়। প্রকৃতির গতি এবং জীবনের ফল্গুধারার বিকাশই মুখ্য। স্বতঃস্ফূর্ত বলিষ্ঠ ও প্রাণচঞ্চল গতিবেগের ঝংকারে তাঁর ভাস্কর্যগুলো স্বতোৎসারিত।

রামকিংকরের বিস্ময়কর প্রতিভার প্রাণচঞ্চল স্ফূর্তিতে স্বপ্নাদৃষ্ট সুরিয়ালিজমের গন্ধও পাওয়া যায়। তাঁর কতিপয় মিত্র ও ভাস্কর্যের অভিব্যক্তিহীন মুখাবয়ব কিংবা চেহারা দেখে এ ধারণা হয়। দেহ থেকে দেহাতীতের মত তিনি যেন রূপ থেকে রূপের বাইরে অভিসারী। অবচেতনের স্বপ্নই স্মৃতি হয়ে বাসা বাঁধে বুকের বারান্দায়। পরে সেই স্বপ্নরূপ রূপায়িত হয় শিল্প সৃষ্টিতে। তাই এসব চিত্রকল্প সজ্ঞান ব্যাপার নয়। বলা যায় ধ্যানলব্ধ। আমি কেন পেইন্টিং করি এক প্রবন্ধে রামকিংকর রেঁদার মত অসাধারণ ভঙ্গীতে লিখেছেন— জীবনের উদ্যানে আমি ঘুরে বেড়াই। যা দেখি হাসি-কান্না, ছোট শিশু, ফুল বা অসুখ, তা আমি ছবিতে আঁকি। আর অন্ধকার রাত্রে আমার ছেলে যখন আমার বুকের ওপর এসে পড়ে তখন তাকে আমি জড়িয়ে ধরি। সেই অভিজ্ঞতা আমি চিত্র কিংবা স্কাল্পচারের মধ্যে রাখি। বাস্তবিক যাঁর এই অসাধারণ একাগ্র অনুভূতি তাঁর পক্ষে এই পৃথিবীতে অসাধ্য আর কি থাকতে পারে!

প্রশান্ত দা

স্বর্গত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের নেপথ্যে

এ মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী

বর্তমান প্রকাশকরা শুধু গল্প উপন্যাস ছাপিয়েই প্রকাশনীর এ অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার জন্যে, সামাজিক গঠনের সহায়ক হবার জন্যে যে দুষ্প্রাপ্য তথ্য-সমৃদ্ধ বইগুলো নিয়মিতভাবে ডাইরেক্ট এনে দিচ্ছে তাঁদের কথা আমরা ভাবি না। এ মুখার্জি এ ভিতেই গড়ে উঠেছে এবং এই বিশ্বাসেই আজো পথ চলেছে।

•

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তখন ভাষণ দান করছেন অবিভক্ত বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। ঘুরতে ঘুরতে একসময়ে পৌঁছুলেন ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রামে। বাঙ্গালী যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করলেন ব্যবসায়ে নামার জন্যে। বিদেশী বণিককুলের ছত্রছায়ায় আছে তখনকার পরাধীন ভারত। বালক অমিয়রঞ্জন সেই ডাকে সাড়া দিলেন। সেই বাল্যকালে সৌভাগ্য হোল আচার্যের কাছাকাছি আসবার। তাকেই পাথেয় করে এ মুখার্জির পথ চলা।

কিন্তু সব ইচ্ছে কি সবসময় পূর্ণ হয়? প্রাচুর্যে ভরা মুখার্জি পরিবার, যার প্রায় সোনার চামচে মুখে নিয়ে আসা, সেই বাড়িতে নেমে এলো প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ঝড় আর বিপর্যয়, অমিয়বাবুর বয়স আর তখন কতো হবে? বড় জোর তেরো কি চোদ্দ। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে, ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে পরিবারটি শেষ পর্যন্ত এমনি ভগ্ন জায়গায় এসে দাঁড়ালো, যখন দু-বেলা দু মুঠো ভাত পর্যন্ত জোটে না, সেই যুগে, যখন এ দেশ সোনার বাংলা। তবু ভাঙ্গলেন না। ভাঙ্গতে তো সবই পারে, গড়ে তোলে কজন? কি করা যায়, কি করা যায় ভেবে, দম্ করে একদিন কাউকে না জানিয়ে ঝড়-জলের রাতে অমিয়বাবু বেরিয়ে পড়লেন। কোথায়? কেউ জানে না। পরে জানা গেল রেঙ্গুন। বাবা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। পড়াশোনার আবার ব্যবস্থা হল ম্যাট্রিকের। নাঃ, আরো জটিল হয়ে উঠলো সংসার। সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ১৯২৮-এ বেরিয়ে পড়লেন কপাল ঠুকে। দেখা যাক। তারপর যা হয় হবে।

বিপুল চট্টোপাধ্যায়

কলকাতায় এসে বাঁণা লাইব্রেরীতে একটা কাজ জুটে গেল। সর্বসাকুল্যে ৩০ টাকা মাইনে। বাঁণা লাইব্রেরীতে তখন প্রায়ই যেতেন অনিলবাবু। মানে ইতিহাসের নামজাদা অধ্যাপক অনিলচন্দ্র ব্যানার্জি। ব্যানার্জিবাবু তখন কয়েকটা বই লিখেছেন বাঁণার। আলাপ হোল অমিয়বাবুর সঙ্গে আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা। তাঁকেই একদিন মনের ইচ্ছেটা বলে ফেললেন অমিয়বাবু—আলাদা একটা ব্যবসা করতে হবে। কারণ সে পোকাটাতো অনেকদিন আগে মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন আচার্যদেব। আর এ পোকা যার মাথায় একবার ঢুকেছে, তা কি অতো সহজে বেরোয়? যাই হোক অনিলবাবু ব্যাপারটা শুনে ভাবলেন মন্দ কি! লেগে পড়ুন। লেগেই পড়লেন অমিয়বাবু। ১৯৪০এ বাঁণা লাইব্রেরী চাকরী ছেড়ে দিয়ে ৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে একতলায় একটা ঘর নিয়ে দোকান খুললেন। ইচ্ছে টেকস্ট বই করার। তখন বাজার জমিয়ে আছে—কমলা বুক ডিপো, সেন ব্রাদার্স, চক্রবর্তী চ্যাটার্জি, এইসব। যুদ্ধের হাওয়া, তখন চাকরীর বাজার একটু একটু করে খুলছে। বি-কম তখন রাত্রিবেলায় পড়া হত বিদ্যাসাগরে। দিনের বেলায় ইউনিভার্সিটিতে। যুদ্ধের পর চাকরী চাহিদাতে রাত্রিতে পড়ার ঝোঁক বাড়লো। সিটি, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষে খোলা হল কমার্স। বি-কমের বইয়ের চাহিদা হবে আঁচ পেয়ে বাজারে ছাড়লেন—এ দাশ

পুনশ্চ

বার্ধক্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আমি এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে জানিতাম যিনি আজীবন তরুণের ন্যায় উৎসাহশীল ছিলেন। আরববাসীগণের সংস্কার এই যে বার্ধক্যের নিঃশ্বাস সেবন করিলে বৃদ্ধের জীর্ণদেহে বলসঞ্চার হয়। এ সংস্কার কতদূর সত্য তাহা জানি না। কিন্তু শিশুর সংসর্গ যে বৃদ্ধের পক্ষে বিশেষ হিতকর সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ...ডাক্তার জনসন এই জন্যই প্রাচীন বয়সে তরুণ বন্ধুর বড় সমাদর করিতেন। তিনি বলিতেন যে তরুণ সহবাসে আমি আপনাকেও তরুণ বোধ করি।... ল্যাপ-ল্যান্ডের ছয়মাস ব্যাপিনী রজনী সূর্য-বিবর্জিতা হইলে কি পরিতাপের বিষয় হইত। নিরানন্দ বার্ধক্য তদধিক ভয়াবহ।

অনেকের ধারণা যে যৌবনকালই সুখ-ভোগের সময়। কিন্তু এ সংস্কার ভ্রমাত্মক। জীবনের অপরাহ্ণই প্রকৃত সুখের সময়। যৌবনের আবেগ ও চাঞ্চল্য সুখভোগের প্রধান অন্তরায়। তখন সুখ বেগবতী-স্রোতস্বতীবক্ষে প্রতিবিম্বিত সুধাংশুর ন্যায় সতত বিভঙ্গ ও বিচলিত হয়। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ডতাপে শান্তির ছায়া কোথায় মিলিবে? যুবা প্রেমের উন্মাদিনী শক্তি মাত্র অনুভব করে। প্রেমের পবিত্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ কেবল জীবনের অপরাহ্ণে দেখা দেয়। যুবার সমক্ষে প্রমদা মোহিনী প্রতিভারূপে প্রতিভাত হয়। নারীর দেবীমূর্তি দর্শন কেবল সংযমী মধ্যবয়স্কের ভাগ্যে ঘটে। ফল কথা এই যে প্রকৃত সুখভোগ করিতে গেলে তরুণকে প্রৌঢ়ের নিকট সংযম শিখিতে হইবে এবং প্রৌঢ়কে তরুণের নিকট জ্বলন্ত উৎসাহ ও অনুরাগ ধার করিতে হইবে।

জীবন-মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের মধ্যে এক-একটি বিশেষ গুণ নিহিত থাকা আবশ্যক—যথা শৈশবে প্রসাদগুণ যৌবনে ওজোগুণ, প্রৌঢ় বয়সে গাম্ভীর্য্য বার্ধক্যে শান্তি। এই সকল গুণের সমাহারে সমগ্র জীবন-কাব্যের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। দ্রাক্ষালতার ফল পাকিলে পাতা শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়ে। যৌবনান্তে যেমন শারীরিক সৌন্দর্য্য ও শক্তির হ্রাস হইতে থাকে সেই সঙ্গে যদি প্রবীণোচিত জ্ঞান ও চরিত্রদৃঢ়তা লাভ করিতে পারি তাহা হইলে যৌবন হারাইয়াছি বলিয়া কেন দুঃখ করিব? বেগবতী নদী যেমন এককূল আঙ্গিয়া ও অপর কূল গড়ে সেই-রূপ কাল-তস্কর এক ইন্দ্রিয় যাহা অপহরণ করে অপর ইন্দ্রিয়ে তাহার ক্ষতিপূরণ করে।

এখন নিজের ওজন বুঝিয়া চলি। যে সকল বিষয়ে ভগ্নমনোরথ হইয়া জীবন নিষ্ফল বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছি জীবনা-চলের শিখরে উঠিয়া তাহাদিগকে কত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখিতেছি কত অভিসম্পাত এখন বর বলিয়া বোধ হইতেছে। যৌবনে যে বস্তুকে কুৎসিত ও অপ্রীতিকর ভাবিতাম এখন তাহার ভিতরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হই। যৌবনের ঔদ্ধত্যে লোকের দোষগুণে প্রশান্তভাবে বিচার করিতে পারিতাম না। লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতাম না।

প্রৌঢ় বয়সে রিপুগণ নিস্তেজ হইয়া আসে। সিসিরো প্রৌঢ় বয়সের গুণ-কীর্ত্তনে বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বয়সে মানুষ দুরন্ত কামরিপুর অত্যাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহা যে কত বড় লাভ তাহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। প্রৌঢ় বয়সে মানুষের ধীশক্তির পূর্ণ বিকাশ হয় ইহা বলা বাহুল্য। একজন সুলেখক বলেন যে কোনও গ্রন্থ-কারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ প্রায় লেখকের জীবনের শেষ সপ্তদশবর্ষের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

শারীরিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পণ্ডিত বলেন যে পঞ্চাশৎবর্ষ অতিক্রম করিবার পর মানুষ যেদিন ভাল-থাকে তাহার সেই দিনই ভাল। আমাদের দেশের লোকে পঞ্চাশ পার হইল বৃদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। নানা কারণে এ-দেশের স্থবিরেরা শীঘ্রই স্বাস্থ্য-সুখে বঞ্চিত হন।

শারদাগমে গগণায় করালমালার ন্যায় বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তদুপযোগী সদগুণসমূহ আপনা হইতেই উদয় হইবে এ বিশ্বাস ভিত্তি-হীন। জ্ঞান ও চরিত্রের উন্নতি পূর্ব্ব বয়সের সাধন-সাপেক্ষ। চুল পাকিলেই বুদ্ধি পাকে না।

বাস্তবিক এক একজন লোক চির-জীবন নাবালগ থাকে। বার্দ্ধক্য তাহাদের মাথার কেবল উপরিভাগে চুনকাম করে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না।... এক একজন লঘুচেতা এত অসার আমোদ-প্রিয় যে বৃদ্ধবয়সেও তরুণোচিত বেশ-ভূষা করিয়া যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়সুখে রত থাকে।.....সংস্কৃত কবি এই শ্রেণীর এক-জনের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে : চুল পাকিয়াছে দাঁত পড়িয়াছে বলিয়া একবারও দুঃখ করি না কিন্তু হরিণ লোচনারা যে আমাকে তাত সম্ভাষণ করে ইহাই আমার পক্ষে কুঠারাঘাত।' একজন সূক্ষ্ম-দর্শী পণ্ডিত বলেন কিরূপে বৃদ্ধ হইতে হয় ইহা যিনি জানেন তিনি জ্ঞানের পরা-কাষ্ঠার পরিচয় দেন। বস্তুতঃ মানুষ সংসারে ডুবিয়া থাকিতে এত ভালবাসে যে চরম দশা উপস্থিত হইয়াছে এখন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইতে হইবে এ জ্ঞান তাহার জন্মিয়াও জন্মায় না। চিরঅভ্যস্ত অভিনয়-মদে মত্ত হইয়া রঙ্গ-মঞ্চ ছাড়িতে চায় না। শেষে দর্শকবৃন্দ বিরক্ত হইয়া বলে : এই বুড়োটা সরিয়া পড়ুক না আর কেন? যখন দেখি মৃত্যু অপরের কপালে থাবা কাটিয়া সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে তখন মনে হয় না যে আমারও ঐ দশা উপস্থিত।

দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সকলেই চায় অথচ বৃদ্ধ হইতে কেহই রাজি নহে কারণ বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা কেবল কবি-কল্পিত ওষধিপ্রস্থেই সম্ভব।.....এই মর-জগতে জরা বার্দ্ধক্যের নিত্যসহচরী। তবে শারীরিক গঠন ও স্বাস্থ্যভেদে জরাজনিত ক্ষয়ের তারতম্য ঘটে মাত্র। এক হিসাবে বৃদ্ধ হওয়া অপেক্ষা মরা সহজ। মৃত্যু-যন্ত্রণা যতই ভয়ঙ্কর হউক না কেন মৃত্যু একবার বই দুইবার হয় না। কিন্তু জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পলে-পলে ও তিলে-তিলে মরণ।.....তাহাকে প্রতিদিন অভিনব ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, প্রতিদিন নিজ শক্তির আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য নূতন করিয়া ঠিক করিতে হইবে। পূর্ব্বে প্রত্যহ এক ক্রোশ বেড়াইতাম, এখন অর্দ্ধক্রোশের অধিক পথ চলিতে শ্রান্তিবোধ করি, কিছুকাল পরে ইহাও সাধ্যাতীত হইবে।

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, বৃদ্ধবয়সে এমন কতকগুলি অভ্যাস ক্রমশঃ সংগঠিত হয় যাহার সাহায্যে মানুষ জরাজনিত দৌর্ব্বল্য সত্ত্বেও কলের পুত্তলির ন্যায় দৈনিক নিত্যকর্ম কথঞ্চিৎ সমাধা করিতে সক্ষম হয় নূতন কিছু করিতে হইলেই বিপদে পড়ে।.....

আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধের পক্ষে এক প্রকার লুপ্ত যৌবনাবশেষ বলিলে বলা যায়। যৌবনে মানুষ সর্ব্বাধিক কষ্টসহিষ্ণু থাকে। যৌবনমদে মত্ত হইয়া মানুষ কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ করে না। কিন্তু নিস্তেজ বৃদ্ধদেহ কোনও প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে একেবারে অসমর্থ। অর্থ-দ্বারা আধিব্যাধি কষ্টের লাঘব হয়। অতএব বৃদ্ধ বয়সে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। সুখপাচ্য অথচ পুষ্টিকর আহার সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা শীত-গ্রীষ্মোপযোগী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ যত্নশীল পরিচারক রোগনাশক ও বলকারক নানাবিধ ঔষধপত্র এবং বিশুদ্ধবায়ু সেবনার্থ যানাদি ভ্রমণসৌকর্য্য বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপায়। সুতরাং আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধের শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও মানসিক দুশ্চিন্তা প্রতি-বিধানের অন্যতম মুখ্য হেতু বা উপায়।

শ্রীঅশোক

হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদের সম্বর্ধনা সভায় গোষ্ঠ পাল

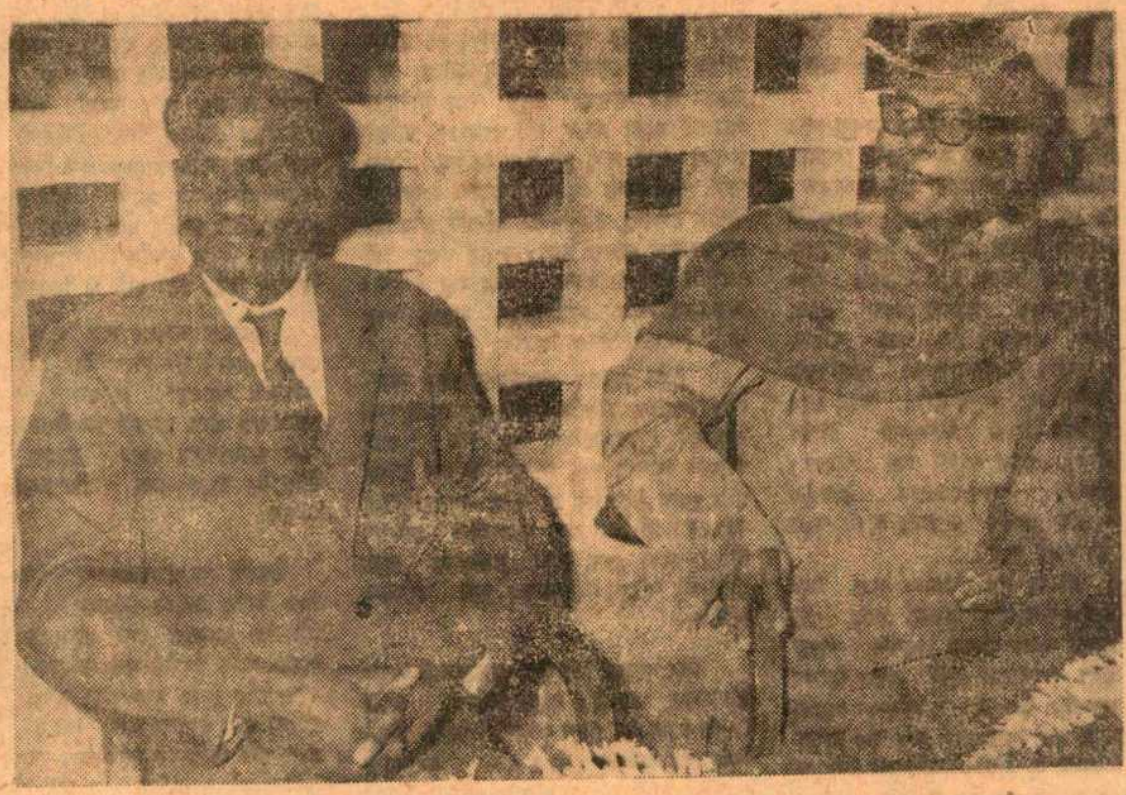

গোষ্ঠ পাল বাঙালীর গর্ব !

(২)

কলকাতার ফুটবল মাঠের বর্ষীয়ান দর্শকদের উপলব্ধি : গোষ্ঠ পালের আসল খেলা ইংরাজ-গোরাদের বিরুদ্ধে, সাহেবদের মোকাবিলায় তিনি যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠতেন। মাঠের মধ্যে চলাফেরা করতেন সিংহবিক্রমে, ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় কেন জানি না তেমন উজ্জীবিত মূর্তি ধরতে পারতেন না।

সাহেব-গোরাদের সঙ্গে খেলার দিনে একরকম। আর ভারতীয়দের বিরুদ্ধে খেলার সময় অন্যরকম, কেন যে এমন রূপান্তর ঘটতো বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করলে কারণটি কিন্তু অজানা থাকার নয়।

গোষ্ঠবাবু ছিলেন নির্ভীক। স্বাধীনচেতা মানুষ। তাঁর যৌবনে দেশজুড়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। মূল জীবনের লড়াই ইংরাজদের সঙ্গে। খেলার মাঠেও তো সেই সংগ্রাম, তাই ইংরাজ-গোরাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাল তিনি নিজেকে আর ধরে রাখতে পারতেন না! যেমন করেই হোক এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবেই এই ছিল তাঁর নিরুচ্চার অঙ্গীকার। আর সেই অঙ্গীকার পালনেই তিনি প্রাণপাত করে যেতেন। ফলে ওইসব দিনেই তাঁর ক্রীড়াদক্ষতা ও শক্তি সামর্থ্য সুসংহত হয়ে উঠতো। ভারতীয়দের বিরুদ্ধাচারণের কাল তাঁর মানসিক প্রস্তুতি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়ে পড়তো বলেই দুদিকের হিসেব খেলোয়াড় গোষ্ঠ পালের আচরণে বৈসাদৃশ্যের লক্ষণ পোতা প্রকাশ।

বিশের দশকে গোষ্ঠ পালের স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন ছিল অনেকের অনুসরণীয়। সাহেবিয়ানার অনুকরণে চলতে ফিরতে সার্ট-প্যান্ট পরা কথায় কথায় ইংরাজী বুকনির খই ফোটানোয় তাঁর ছিল প্রবল অনীহা। উল্টে সভাসমিতিতে অন্যেরা জাত-সাহেব ও দিশী সাহেবরা যখন ইংরাজীতে ভাষণ দিতেন তখন বক্তাকুলের একমাত্র গোষ্ঠ পালই চোস্ত পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেই নিজের বক্তব্য রেখে দিতেন। ইংরাজীয়ানার মোহে ডগমগ শ্রোতৃমণ্ডলী কি ভাবছেন তা জানার কোনো আগ্রহই তাঁর ছিল না। তাঁর মাতৃভাষাই ছল মুখের ও বুকের ভাষা। নিজের ভাষাকে বড় করে দেখায় তিনি চিরদিনই ছিলেন সচেষ্ট।

গোষ্ঠ পালের বাঙালীপনার দৃষ্টান্ত ঘিরে একদিন খেলার মাঠে সাহেবীদল ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের তুমুল ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। ইংরাজ ভারত ছাড়তে বাধ্য না হলে সে ঝগড়া আদৌ মিটতো কিনা সন্দেহ। ইংরাজ যাতাদিন এদেশে রাজপুরুষের সম্মান ভোগ করেছে ততোদিন এ ঝগড়া মিটিয়ে নেয়নি, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সূর্য ডুবতে শুরু করে দিলো তখনই ক্যালকাটা ক্লাবের ইংরাজরা বাঙালীর ক্লাব মোহনবাগানের সঙ্গে তাঁদের পুরানো ঝগড়া মিটিয়ে নেন।

কি নিয়ে যে এই ঝগড়া বেধেছিল তা হয়তো অনেকেই জানেন। তবু ঘটনাটি স্মরণ করছি।

সেদিন ইডেন উদ্যানে খাস বিলিতি সাহেবদের ক্লাব ক্যালকাটার সঙ্গে মোহনবাগানের ক্রিকেট খেলা। ইংরাজ রাজকুমার ডিউক অব কেন্ট কলকাতায় এসে পড়ায় সেদিন চৌরঙ্গী পাড়ায় মহা সোরগোল। ধুমধামের শেষ নেই, পথঘাট একরকম বন্ধ বললেই হয়। ভিড় ঠেলে গোষ্ঠবাবু যখন মাঠে পৌঁছান তখন খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। ক্যালকাটা ব্যাট করছে, মোহনবাগানের ফিল্ডিং।

দেরী হয়ে গেছে, গোষ্ঠবাবু তাড়াতাড়ি মাঠে নেমে পড়লেন। বদলী খেলোয়াড় নিলেন বিশ্রাম। দু দলের অধিনায়কের মধ্যে আগেভাগে এইরকমই কথাবার্তা হয়েছিল।

গোষ্ঠপালের পরণে ছিল ধুতি। মাঝে-কোঁচা কষে ফিল্ডিং করলেন। কারুর ওপর হাতও ঘোরালেন, ক্যালকাটার ব্যাটসম্যানেরা প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে গোষ্ঠ পাল ও তাঁর সতীর্থদের রানের সঙ্গে খাটিয়ে নিলেন। তারপরই ক্যালকাটা ক্লাবের দল জবরদস্ত মাতব্বর গোষ্ঠ পালের ধুতি নিয়ে আপত্তি তুলতে লাগলেন। আপত্তিটা এইরকম যে সাহেবদের খেলায় সাহেবদের সঙ্গে নেটিভ পোষাক পরে খেলা চলে না।

ব্যাপারটা আজকের দিনে জানতে পেলে হয়তো হাসিই পায়। কিন্তু সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্য সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন ধুতি পরে তাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা তাও আবার ক্রিকেট উদ্যান ইডেনে ব্যাপারটা সাহেবদের কাছে ছিল চরম ঔদ্ধত্যের পরিচায়ক। তখনকার দিন ক্যালকাটা ক্লাবের অফিসিয়াল ইডেন উদ্যানে বিনা প্রয়োজনে ভারতীয়েরা যেন, ইংগ-ভারতীয়েরাও ঢুকতে সাহস পেতেন না!

খেলার জগতে মেয়ে

সাইকিলং আসরে দুই কুশলী বাণী, রিক্তা

এ বছর জাতীয় সাইক্লিংয়ে আবার বাংলার মেয়ে বাণী ঘোষ পাতিয়ালার আসরে শ্রেষ্ঠ মহিলা সাইক্লিস্টয়ের সম্মান জয় করেছেন। সাইক্লিংয়ে পশ্চিমবাংলার নাম প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গিয়েছিল। বঙ্গবাসী কলেজের এই ছাত্রীটি স্বকীয় কুশলতায়, আবার পশ্চিমবঙ্গকে সাইক্লিংয়ের ক্ষেত্রে সামনের সারিতে তুলে আনতে পেরেছেন।

গত ৩ ও ৪ মার্চ পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত জাতীয় সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় পশ্চিম-বাংলার দুই মহিলা প্রতিনিধি বাণী ঘোষ ও রিক্তা মণ্ডল নিজেদের কৃতিত্বের আলোয় বাংলার মুখোজ্জ্বল করেছেন।

বাণী দু হাজার মিটার একক পারস্যুটে প্রথম স্থান অধিকার করার সময় এই বিভাগে নতুন জাতীয় রেকর্ডও গড়েছেন। এ ছাড়া দু হাজার মিটার ল্যাপ রেসে শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং হাজার মিটার টাইম ট্রায়ালে অল্পের জন্য দ্বিতীয় হলেও এতেও রেকর্ড করেছেন। হাজার মিটার ম্যাসড রেসেও বাণী দ্বিতীয় হন। কিন্তু মোট ১৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে বাংলার এই মেয়েটি এবারের জাতীয় আসরে বছরের শ্রেষ্ঠ সাইক্লিস্ট-এর সম্মানে ভূষিত হন।

বাণী বলেন, পূর্বসূরীদের সাইক্লিং দেখে আমারও সাইকেল চালাবার ইচ্ছা জাগে। সুযোগও হয়ে যায় প্রখ্যাত সাইক্লিস্ট রাজ মেহেরর সস্নেহ আহ্বানে। শ্রীমিত্রাই বসাকের সযত্ন প্রশিক্ষণের ফলে বাণী ঘোষ ১৯৭৩ সালেই জব্বলপুর জাতীয় আসরে পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করেন। পরের বছর ত্রিবান্দ্রমে আন্তঃ আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ষোল বছরের অনুর্ধ্ব বিভাগে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ান হয়ে

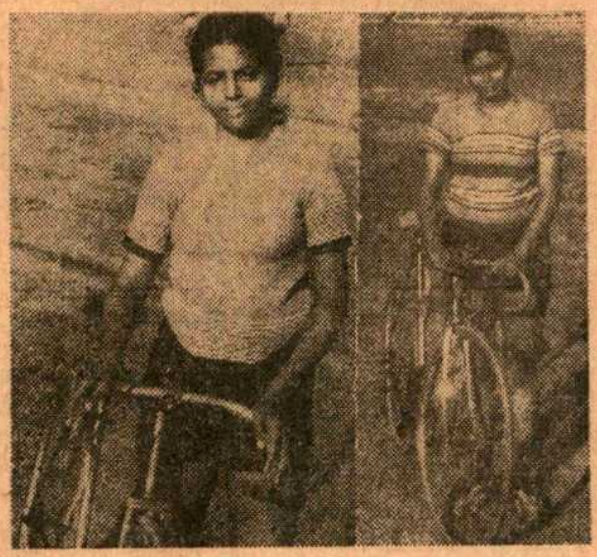

বাণী ঘোষ

রিক্তা মণ্ডল

বাণী তাঁর সাফল্যের প্রথম ধাপে উপস্থিত হন। ঐ বছর হরিয়ানার রাইতে জাতীয় আসরে দু হাজার মিটার ল্যাপ এবং হাজার মিটার টাইম ট্রায়ালে ক্রমপর্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পান। ১৯৭৫-এ বিকানীরে জাতীয় আসরে বাণী আবার বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেন। এবার ম্যাসড স্টার্ট ও দু হাজার মিটার একক পারস্যুটে বাণীই প্রথম হন। ত্রিবান্দ্রমের জাতীয় আসরেও সেবার ১৮ বছরের অনুর্ধ্ব বিভাগে বাণী চ্যাম্পিয়ান আখ্যা অর্জন করেন। ১৯৭৬ সালে হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃ আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার আসরে তিনি পূর্বাঞ্চলের সেরা সাইক্লিস্টরূপে চিহ্নিত হন। বলা প্রয়োজন যে, এবার পাতিয়ালায় দলগতভাবে ২২ পয়েন্ট অর্জনের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্বর্ণ পদক জয়ের পিছনে যে দুজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁদের প্রথমজন বাণী ঘোষ এবং দ্বিতীয়জন হচ্ছেন রিক্তা মণ্ডল।

রিক্তার ভারী দুঃখ যে, জাতীয় আসরে তাঁর সাফল্যের খবর তাঁর বাবা জানতে পারলেন না। রিক্তা পশ্চিমবাংলা দলের হয়ে পাতিয়ালা যাওয়া মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর বাবাকে হারান।

রিক্তা তখন মেট্রোপোলিটান স্কুলের ছাত্রী। সামনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। একদিকে শোক অন্যদিকে পরীক্ষার উদ্বেগে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে রিক্তা পাতিয়ালা রওনা হন। এতরকম বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও রিক্তা হাজার মিটার ম্যাসড রেসে স্টার্টে সতীর্থ বাণীকে পিছনে ফেলে প্রথম স্থান পান। দু হাজার মিটার ল্যাপে কতকটা দুর্ভাগ্য-ক্রমেই তৃতীয় স্থান পান। জাতীয় আসরেও রিক্তা বাধার সম্মুখীন হন হাজার মিটার টাইম ট্রায়ালে। দুর্ঘটনায় সাইকেল থেকে পড়ে চারটি দাঁত না ভাঙ্গলে রিক্তা যে আরও ভাল ফল করতে পারতেন তা বলা বাহুল্য। তবে রিক্তা হটে যায়নি। আগামী আসর আরও ভাল ফললাভের জন্য অক্লান্তভাবে অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

রিক্তা ও বাণী দুজনেই বসাক জিমনা-সিয়ামের সভ্যা। নিতা বসাকের হাতে গড়া দুই কৃতী ছাত্রী।

বাণী ও রিক্তা দুজনেই নিয়মিত অনু-শীলন করেন রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে। তাছাড়া ট্রাকে সাইকেল চালাবার অভাব পূরণ করে ভি আই পি রোডে। কোন কোন দিন ঐ মসৃণ সড়ক পথে সাইকেল চালাতে চালাতে চলে যান দুজনে বারাসাত পর্যন্ত।

বাণী বলেন, আমার অনুশীলনের ঠিক বাঁধাধরা টাইম নেই, রিক্তারও তাই। তবে কোনদিন আমরা তিনঘণ্টার কম অনুশীলন করি না।

শিখা সেনের পর গত ক'বছরই পশ্চিম-বাংলার মহিলা দল জাতীয় আসরে কোন উল্লেখযোগ্য যোগ্যতার নজীর স্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, অনেকেই নিরাশ হয়ে পড়ে-ছিলেন। তাই এবার বাণীর শীর্ষকুশলতা এবং বাণী ও রিক্তার মিলিত প্রয়াসে পশ্চিমবাংলা পাতিয়ালায় মহিলা বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করায় সবাই আবার উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু কেবল মৌখিক উৎসাহে ত কোন বাস্তবিক কাজ হয় না। এ রাজ্যের সাই-ক্লিস্টদের বড় অভিযোগ, এখানে রেসিং সাইকেল বা তার যন্ত্রাংশ অতি দুর্মূল্য হওয়ায় বাণী বা রিক্তাদের মত মধ্যবিত্তরা ভারী অসুবিধায় পড়ে। এদিকে সরকার একটু নজর দিলে উঠতি সাইক্লিস্টদের অনেক সমস্যার সমাধান হবে। বর্তমান সরকার খেলাধূলা প্রসারের প্রতি খুবই সজাগ। তাই মনে হয় সাইক্লিংয়ের দিকেও সরকার নজর দিলে উপকারই হবে।

আলোচনার শেষে বাণী ও রিক্তা দুজনেই একটি দাবী বেশ সজোর রেখেছেন তাহল—কলকাতায় অবিলম্বে একটি আন্ত-র্জাতিক মানের সাইক্লিং ট্র্যাক নির্মিত হওয়া খুবই প্রয়োজন।

অময়

ভোলা ময়রা
লিলি চক্রবর্তী। অমৃত ফটো

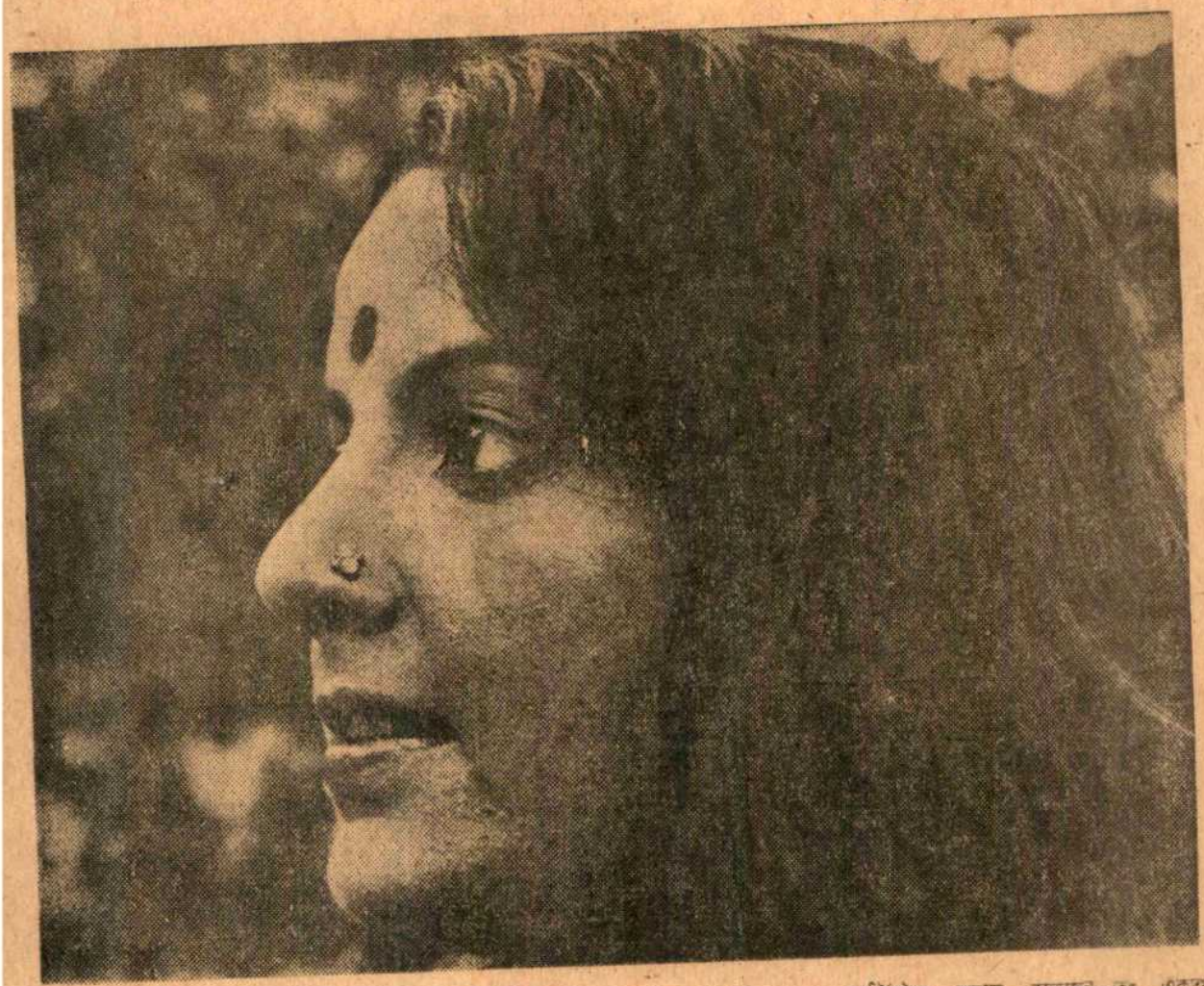

পরের টেকটাও বাতিল করে দিলেন পি সি বি। অর্থাৎ কুমার প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। সবাই সপ্রশ্নে ওঁর দিকে ফিরে তাকালেন।

ওঁর সহকারী কুণ্ঠিতভাবে বললেন—এটাও তাহলে এন জি (নট গুড) বলছেন স্যর?

—হ্যাঁ বলছি—গম্ভীর মুখে পি সি বি বললেন—এমনিতে সবই ঠিক ছিল। কিন্তু উনি যে ভাবে আর্টিষ্টকে বলতে বললেন— আর্টিষ্ট ঠিক রকম বলতে পারল না। আরে হাঁ করে দেখছ কী? আর একটা টেক হবে—

আবার গুছিয়ে নিয়ে শটটা রিটেক করা হল। কিন্তু পি সি বি এবারও বাতিল করে দিলেন—উঁহু এমনিতে সবই ঠিক ছিল—কিন্তু উনি যেভাবে আর্টিষ্টকে বলতে বললেন..নাও রিটেক করো।

আবার ক্ল্যাপস্টিক পড়ল।

পি সি বি অ্যাকশন ঘোষণা করলেন। অমনি ক্যামেরার সামনে সেই অনুগত গোমস্তাটি এসে হাত কচলে সবিনয়ে সংলাপ বলল—আজ্ঞে: রউশনী আপনাকে একবার ভেতরে ডেকেছেন—

জমিদারের অফ সাউন্ড—কেন?

—তা আজ্ঞে বলতে পারব না। খালি বলতে বললেন— বিশেষ দরকার আছে—

ক্যামেরার পেছন থেকে জমিদারের গম্ভীর নেপথ্য কণ্ঠ শোনা গেল— আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি যাও।

পি সি বি একটু সময় দিয়ে এ শটটা কেটে দিলেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন— উহুঁ এমনিতে সবই ঠিক ছিল— কিন্তু উনি যেভাবে আর্টিষ্টকে বলতে বলেছেন—তা একদম পারল না—

ফ্লোরের প্রায় সকলেরই তখন আক্কেল গুড়ুম হবার মত অবস্থা। সামান্য একটা শট—অথচ পি সি বি কিছুতেই ও-কে বলছেন না। টেকের পর টেক শুধু বাতিল করে যাচ্ছেন। আর মন্তব্য করছেন—এমনিতে সবই ঠিক ছিল— কিন্তু উনি যেভাবে আর্টিষ্টকে বলতে বলেছেন একদম পারছে না। আর একটা টেক হোক...

আমি সেদিন বদলা বেলায় নিউ

থিয়েটার্সের গোলঘরে একলা বসে-ছিলাম কোম্পানী উঠে গেছে—স্টুডিওর মালিকানা চলে গেছে অন্যের কাছে—কিন্তু এই স্টুডিওর প্রাচীন যে ঐতিহ্য—সেটা যাবে কোথায়? এই যে আমি বসে গোলঘরে—একদিন বাংলা ফিল্মের তাবড় তাবড় মানুষেরা এসে এখানে নিয়ম করে বসতেন। গল্প-গুজব করতেন। কত নাম জাদা ফিল্মের প্ল্যান প্রোগ্রাম এখানে বসে হয়েছে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর গৌরব সূর্য তখন মধ্য গগনে গনগন করে জ্বলছে। সারা ভারতে হাতিমার্কা নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর তোলা হিন্দী ছবি রবরব করে চলছে। লোকে ছবি দেখতে বসে যেমনই দেখে এ টির ছবি—অমনি উল্লাস ধ্বনি করে সে ছবিকে স্বাগত জানায়—আমি সেই যুগেরই একটা কাহিনী বলছি। মনে বলার চেষ্টা করছি।

প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া তখন টপ ফর্মে বিরাজ করছেন।

শ্রদ্ধেয় বি এন সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন—আসুন আমার ব্যানারে ছবি করবেন।

পি সি বি সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

দম্পতি/মালা সিনহা

সেই যুগে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ব্যানারে ছবি করা একটা খুব বড় মর্যাদার ব্যাপার বলে গণ্য হতো। প্রোডিউসার অনেকে হয়েছেন কিন্তু সারা ভারতে বি-এন সরকারের মত প্রয়োজক কেউ কোনদিন হতে পারবেন না। হওয়া সম্ভবও নয়। এই রকম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক কদাচিৎ মেলে। যাঁর রুচিবোধ শিক্ষা বংশাভিজাত্য, ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়। এখন জেনারেশন গ্যাপ ঘটেছে। আমি বড্ড কৌতূহলী প্রাণী। সাবেক আমলের লোকেদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গল্প শুনি। তাঁরা এখনও সসম্ভ্রমে সরকার সাহেবের নাম করেন। তাঁর অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করেন। আজকের এই আধুনিক ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রী সরকার সাহেবের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে। কারণ ভাল ফিল্ম সেযুগে তিনিই তৈরী করেছেন—আর শিখিয়েছেন ভাল ভাল ফিল্ম কিভাবে তৈরী করতে হয়। তার জন্যে কি ধরণের বুদ্ধিমত্তা, সৃজনশীলতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ফিল্মে টাকার কথা আছেই। তবে আগে নয়। সবার শেষে।

সারা স্টুডিও তখন গমগম করত নানা ধরণের সব কাজের মানুষের আনাগোনায়। বি এন সরকার দেশের প্রায় সব শ্রেষ্ঠ কলাকুশলী ও শিল্পীদের ধরে রেখেছিলেন নিজের ব্যানারে। প্রত্যেকেই মাইনে করা। হাতে কাজ নেই তো কি হয়েছে—প্ল্যান তৈরী করুন—ধীরে ধীরে এগিয়ে যান—তারপর ছবি করতে নেমে পড়ুন। জুনিয়ার টেকনি-সিয়ানরা আশ্বস্ত এই জন্যে যে ভাল কাজ দেখতে পারলে সরকার সাহেব নিশ্চয় তাদের ব্রেক দেবেন। এই নিয়মে এন টি থেকে বহু পরিচালক বহু ক্যামরাম্যান স্বাধীন চিন্তায় কাজ করবার সুযোগ পেয়েছেন। সরকার সাহেব তাঁর স্টাফের ওপর তীক্ষ্ণ সযত্ন দৃষ্টি রাখতেন। আর যখনই তিনি নিজে বুঝতেন যে অমুককে পরিচালক করবার সময় এসেছে—অমনি তার ডাক পড়ত। অতঃপর সে নিজে দায়িত্বেই নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে ছবি পরিচালনা করার সুযোগ পেত।

দত্তা : সুচিত্রা সেন

স্মরণ থাকতে পারে পরিচালক বিমল রায়ের কথা। গোড়ায় উনি ক্যামেরাম্যান ছিলেন। বিমল রায় শুধুমাত্র ক্যামেরাম্যান হিসাবে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি—তাঁর বরাবরের ঝোঁক ছিল চিত্র পরিচালনার দিকে। সরকার সাহেবই সম্ভবত প্রথম মানুষ যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পরিচালক হিসাবে বিমল রায় ভাল ছবি তৈরীর দক্ষতা রাখেন। তাই তিনি ওকে এন টির ব্যানারে ছবি করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। আর বিমল রায় তাঁর প্রথম ছবিতেই (উদয়ের পথে) প্রমাণ করে ছেড়েছিলেন যে তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করার ক্ষমতা ধরেন।

বি এন সরকারের সুযোগ্য পুত্র দিলীপ সরকারও তাঁর বিখ্যাত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছেন। পর পর অনেকগুলি প্রযোজনা করার পর সম্প্রতি বহু কাঠখড় পুড়িয়ে উনি পুনরায় হাতিমার্কা ব্যানারে ছবি করতে চলেছেন। প্রথম ছবিতে যাঁকে উনি পরিচালক হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনি এতদিন বিভিন্ন চিত্রে সহকারীর কাজ করেছেন—এই প্রথম স্বাধীন চিত্র পরিচালনার সুযোগ লাভ করলেন। নাম শংকর ভট্টাচার্য। বয়সে তরুণ এবং দীর্ঘদিন আমাদেরই সহকর্মী হিসাবে ইণ্ডাষ্ট্রীতে কাজ করছেন। ওঁর পক্ষে হাতিমার্কা ব্যানারে রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা গল্পে প্রথম ছবি করা—এটা রীতিমত একটা দুর্লভ সুযোগ ও সম্মান।

সেদিন সন্ধ্যায় স্টুডিওর নির্জন গোলঘরে এন টি স্টুডিওর জনৈক প্রাক্তন বয়সে প্রবীণ কুশলীর মুখে পি সি বির গল্প শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ সেই ভদ্রলোক বললেন—আপনি এখন যেখানে বসে আছেন—একদিন রবীন্দ্রনাথ ওখানে এসে বসতেন—

—এ্যাঁ? আমি লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম—বলেন কী?

উনি মৃদু হেসে জবাব দিলেন—ঠিকই বলছি। ওঁর কাহিনীতে তখন আমাদের এখানে একটি ছবির শুটিং হচ্ছিল। সেই ছবির কাজ দেখাবার জন্য মিঃ সরকারের অনুরোধে উনি আমাদের এই স্টুডিওতে এসেছিলেন...

শুনে আমি শরীরে একটা অদ্ভুত ধরণের শিহরণ বোধ করলাম।

উনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—বাংলাদেশের বহু জ্ঞানীগুণী সম্মানিত মানুষ কখনো কখনো আমাদের এখানে পায়ের ধুলো দিয়ে গেছেন। আমরা ফিল্ম লাইনের মানুষেরা ধন্যবোধ করেছি। এসবই আমার নিজের চোখে দেখা ভাই—

তারপর আবার পি-সি-বি প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। আসলে বড়ুয়া সাহেব সেদিন খুব চটে গিয়েছিলেন। তাই কিছুতেই সেই শট ও-কে বলছিলেন না।

—ঘটনাটা কী ঘটেছিল দাদা?

উনি একটু ভেবে নিয়ে বললেন—এই স্টুডিওরই জনৈক কর্মকর্তার বোকামীর জন্য বড়ুয়া সাহেব রেগে গিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক এর-তার সেটে ঢুকে পরিচালক, কলাকুশলী ময় শিল্পীদেরও নানারকম জ্ঞান-গাম্মি দিতেন। এজন্যে তাঁকে কেউ বড় পছন্দ করত না। কিন্তু যেহেতু তাঁর ক্ষমতা ছিল অনেকটা—তাই প্রকাশ্যে কেউ তাঁকে চটাতে সাহস পেত না।

এই ভদ্রলোক সম্ভবতঃ বড়ুয়া সাহেবকে ভাল চিনতেন না। চেনা বলতে তিনি বড়ুয়া সাহেবের আচরণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, কাজের ধারা ও মেজাজ সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তিনি হঠাৎ সেদিন বড়ুয়া সাহেবের সেটে ঢুকে পড়েছিলেন। দেখেন বড়ুয়া সাহেব একজন অনামা শিল্পীকে দিয়ে গোমস্তার পার্ট করাচ্ছেন। সে বেচারা পারছে না। বড়ুয়া সাহেব তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে যেই ক্যামেরার সামনে হাজির করছেন, অমনি সে সব গুলিয়ে ফেলে উল্টোপাল্টা কথা বলছে।

পর পর দুটি শট এন-জি হয়ে গেল কর্মকর্তার চোখের সামনেই। অমনি ভদ্রলোকের মেজাজ গেল বিগড়ে—এঃ লোকটা একেবারে অপদার্থ। সামান্য এই পার্টটা

দিন আমাদের : রীতা ভাদুড়ি - রঞ্জিত মল্লিক

ফ্লোর থেকে বলছি

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা কাহিনী 'মোম-বাতি' ছবির শুটিং চলছিল ফ্লোরের মধ্যে। যান্ত্রিক গোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন। ফ্লোরের দরজায় প্রযোজক অনাদি ব্যানার্জি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে পরিচয় দিতে তিনি বললেন—ভেতরে যান, শুটিং চলছে।

মার্জিত রুচি সম্পন্ন স্বচ্ছল গৃহস্থের সাজানো-গোছানো ঘরের সেট। দেখি ঘরের মাঝে একটা আরাম কেদারায় উত্তমকুমার সামনের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে আছেন। আর তাঁর চোখের সামনে শ্রীমান অর্ঘ একটা ফুটবল দুম্ দুম্ করে মাটীতে ফেলছে-শূন্যে লাফিয়ে উঠতেই লুফে লুফে নিচ্ছে।

মোমবাতির চিত্রনাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য-র সঙ্গে ফ্লোরেই আলাপ হল। ওঁর মুখে শুনলাম—উত্তমকুমার এ-ছবিতে পাইলটের চরিত্রে অভিনয় করছেন। আর শ্রীমান অর্ঘ সেজেছে পাইলট সন্দীপ্তর দত্তকপুত্র। সন্দীপ্তের স্ত্রী-র ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া দেবী। নিঃসন্তান দম্পতি, তাই অনাথ আশ্রম থেকে এই লালু নামক ছেলেটিকে ওরা নিয়ে এসেছে পোষ্যপুত্র হিসাবে।

ইতিমধ্যে দেখি সুপ্রিয়া দেবী ফ্লোরে এসে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যান অনিল গুপ্ত ওঁকে দেখে যান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রধান দিলীপ মুখার্জিকে বললেন—নাও ভাই, আমরা রেডি—টেক্ করো।

লালু আপন মনে বাবার সামনে ফুটবল ছোঁড়াছুঁড়ি করছিল, সে খেয়ালও করেনি যে অলক্ষ্যে সন্দীপ্তর মুখে বিরক্তির মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। হঠাৎ সন্দীপ্ত পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠল—স্টপ, স্টপ ইট্—

লালু থমকে গেল। অবাক হয়ে তাকাল বাবার দিকে। লালুর সুকুমার মুখে বিস্ময় এবং আতঙ্ক ফুটে উঠল নিমেষে।

উত্তমকুমারের মানসিক প্রতিক্রিয়ার ওপরে

বলতে পারছে না! না পারে তো ভাবার কি আছে? ওকে বাদ দিয়ে দিলেই হয়।

বড়ুয়া সাহেব কথাটা শুনতে পেলেন। তিনি আড়চোখে শান্তভাবে একবার সেই কর্মকর্তার দিকে তাকালেন। ভদ্রলোক এই ফিরে তাকানোর অর্থটা বুঝতে পারলেন না।

আবার একটা টেক হল। এবারও লোকটি সেই একই ভুল করে বসল। তখন কর্মকর্তার মেজাজ যেন চরমে ঠেলে উঠে পড়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে লোকটিকে বললেন—তুমি একটি আস্ত পাঁঠা। সামান্য কটি কথা—তাও গুছিয়ে বলতে পারছ না? স্টুডিওতে এসেছিলে কোন কর্মে?

শুনে বেচারির মুখ চুন।

কর্মকর্তা হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসলেন। নিজেই যেন ছবির পরিচালক—সেই রকম একটা ভঙ্গী করে লোকটিকে বললেন—শোন এইভাবে হাত কচলাতে কচলাতে বলবে—

বলে উনি নিজের হাত কচলে দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন—কচলানো শেষ হলে চোখ নামিয়ে ডায়লাগ বলবে—কী যেন কথাটা—হ্যাঁ ইয়ে-আজ্ঞে বউরাণী আপনাকে একবার ভেতর ডেকেছেন—বুঝলে—ঠিক যেভাবে আমি বললাম সেইভাবে বলবে। ফিল্ম অত সস্তা নয়—

বড়ুয়া সাহেব ভদ্রলোকের কাণ্ড-কারখানা দেখে স্তব্ধ।

স্তব্ধ অন্যান্য শিল্পী এবং কলা-কুশলীরাও। সবাই হতভম্ব।

কিন্তু সে ভদ্রলোকের সেসব দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সমান গজ গজ করেই চলেছেন। বলা-টলা শেষ হবার পর ভদ্রলোক যখন শুটিং জোন ছেড়ে আবার ক্যামেরার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন—তখন বড়ুয়া সাহেব খুব শান্তভাবে জানতে চাইলেন—আপনার হয়েছে?

আঁ...ও হ্যাঁ হ্যাঁ...দেখেছেন মিষ্টার বড়ুয়া কি-সব লোকজন? একটা কথা বুঝতে পারে না—এসেছে কিনা ফিল্মে অ্যাকটিং করতে? রাবিশ—

বড়ুয়া সাহেবের শান্ত মুখে তখন থম থম করছে অনেকগুলো মেজাজী রেখা। গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—টেকিং—

ক্যামেরাম্যান মৃদু কণ্ঠে জানালেন—আমি রেডি—

ক্ল্যাপস্টিক পড়ল। —অ্যাকশান।

শট শেষ হতে বড়ুয়া সাহেব কাট ঘোষণা করেই বললেন—উহুঁ, এমনিতে সবই ঠিক ছিল—কিন্তু উনি যেভাবে আর্টিস্টিক বলতে বললেন—ইনি ঠিক সেভাবে বলতে পারলেন না। ঠিক আছে—আর একটা টেক করা যাক—

কর্মকর্তা ভদ্রলোক ভ্রূ-কুঁচকালেন সামান্য।

আবার টেক। আবার শট বাতিল। আবার রিটেক।

বারকতক এরকম হবার পর কর্মকর্তা ভদ্রলোকের যেন চৈতন্য হল। তিনি বুঝতে পারলেন—বড়ুয়া সাহেব তাঁকে ইচ্ছে করেই হেনস্থা করছেন। ইতিউতি তাকিয়ে গতিক সুবিধের নয় বুঝে তিনি মানে মানে ফ্লোর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

(চলবে) —রঞ্জন মজুমদার

কিছুক্ষণ ক্যামেরা ধরে রেখে দিলীপ মুখার্জি ছুটি কেটে দিলেন।

লালু এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু। জীবন-সমুদ্রে শিশুসদনে সে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে ভালবাসা কাকে বলে এই অনাথ আশ্রমের কোন শিশুই জানে না। অনাদর অবহেলা আর তাচ্ছিল্যের মধ্যেই এই মানবশিশুর দল কোনগতিকে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেই চলেছে। তবে এরই মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে আশ্রমের প্রোঢ়া পরিচারিকা মানদা। এইসব পরিত্যক্ত শিশুদের সে তার হৃদয় দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসার উত্তাপ-ই বা আর কতটুকু। আশ্রমের নবাগত সুপারিনটেনডেন্ট তরুণী অনিতা বিলেত থেকে শিশু মনঃস্তত্ত্বের ওপর বিশেষজ্ঞ হয়ে এসেছে। তার নিয়মকানুন খুবই কঠোর। এখানকার প্রত্যেকটি শিশুকে সে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে চায়। সে চায় বাস্তব অবস্থার মধ্যে দিয়েই এরা জীবনের পথে এগিয়ে যাক। একদিন সে নিজেই নিজের চলার পথ বেছে নিতে পারবে।

আর মানদা ঠিক তার উল্টো ভাবে। কিন্তু অনিতাকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা নেই যে তার।

নিঃসন্তান অধ্যাপক অনাদি সেন এই আশ্রম থেকে লালুকে পছন্দ করে প্রথম দত্তক নিয়ে গিয়েছিল। অনাদি স্ত্রী শেফালী লালুকে তার বুকের মধ্যে পেয়ে অনাস্বাদিত মাতৃত্বের শিহরণ অনুভব করেছিল। তারপর থেকে লালুকে নিয়েই শেফালীর সময় কাটত। লালু এটা চায় লালু ওটা চায় লালুকে আমি এইভাবে মানুষ করে তুলব—লালুকে ঘিরেই শেফালীর সব স্বপ্ন।

অনাদি কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ করেনি। রুচিবান ভদ্রলোক। তাই প্রথম থেকে সে আকারে ইঙ্গিতে স্ত্রীকে যা বলবার বলেছে। কিন্তু শেফালী কিছুই বোঝেনি। লালু ছাড়া তার মুখে অন্য কোন প্রসঙ্গই নেই। আর লালুও তার নবলব্ধ মা ছাড়া বড় কাউকে চায়নি।

অথচ এত ভালবাসার সম্পদ এই লালুরও একদিন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল শেফালীর কাছে। শেফালী শেষপর্যন্ত মা হল। নার্সিং হোম থেকে নবজাত শিশুকে নিয়ে বাড়ী ফিরে অদ্ভি শেফালীর ভিন্ন মেজাজ দেখা গেল। লালু তখন কোথায় একবার মায়ের আদর পাবার জন্যে ঘুর ঘুর করছে—তখন শেফালীকে দেখা গেল নিজের সন্তানের সেবাযত্নে ব্যস্ত। লালুকে কাছে ডেকে এখন আদর করার সময় কোথায় তার?

লালুর প্রথমে রাগ হয়। পরে অভিমান।

এই ছোট্ট শিশুটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এল নাকি?

গিয়েছিল পোগনে গোপনে ভাইকে আদর করতে। দেখতে পেয়ে শেফালীর কি ধমক—খবর্দার তুমি ওকে ছোঁবে না। ওর কাছে যাবে না—

কেন? লালুর বিস্মিত প্রশ্ন।

শেফালীর রূঢ় জবাব—কেন-টেন নেই। যা বলছি তাই শোন। আর আজ থেকে তুমি আমার বিছানায় না—আয়ার কাছে শোবে—এঘরে একদম আসবে না।

শিশু লালু বুঝতে পারে না—হঠাৎ কী এমন অপরাধ সে করল যে মায়ের সঙ্গে রাত্রে শোবার অধিকার থেকে বঞ্চিত? এই প্রশ্নের সদুত্তর কে দেবে লালুকে।

এরপর এক নাটকীয় প্রতিঘাতের মধ্যে লালু যেদিন বুঝল—সে এ-বাড়িতে অবাঞ্ছিত—স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সারাটা দিন। চোখের জল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তারপর রাত্রে অনাদি বাড়ী ফিরে এসে লালুর খোঁজ করতে গিয়ে জানতে পারল—লালু নেই। সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় গুম মেরে বসে থেকে সে এক সময় বাড়ী থেকে চিরদিনের জন্যে চলে গেছে।

লালু আসলে ফিরে গিয়েছিল অনাথ আশ্রমে হাজার তাচ্ছিল্যে এবং অবহেলার মধ্যেও যেখানে তার একটা আশ্রয় বলতে জায়গা ছিল।

মানদা ওকে দেখে ভয়ে আঁতকে উঠল।—তুই ফিরে এলি কেন?

লালু কিছুই বলতে চায়না।

—এখানে যে তোর ঠাঁই নেই। অমন একটা বাড়ীতে তোকে দেয়া হল, তুই না বলে মরতে এখানেই আবার পালিয়ে এলি?

মানদার আতঙ্ক—অনিতার কানে এ-খবর পৌঁছালে মুস্কিল আছে। লালুর ঠাঁই হবে না।

ইতিমধ্যে অনাদি নিজেই অনিতাকে ফোন করে জানাল—লালু কোন অন্যায় করে বাড়ী ছেড়ে যায়নি—ওকে বকবেন না—ওর কোন দোষ নেই। আসলে...আসলে এ-বাড়ীতে ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই ও চলে গেছে। ও অভুক্ত। সারাদিন শুনলাম কিছু খায়ওনি.....

লালু অন্ধকারকে বড় ভয় করে। অন্ধকার থেকেই যে সে এসেছে। সে রাত্রে আলো জ্বালা না থাকলে ঘুমোতে পারে না। অথচ আশ্রমের আধুনিক নিয়ম কোন ঘরেই রাত-ভোর আলো জ্বলবে না। তবে লালু ঘুমোবে কি করে? মানদাকে তাই মোমবাতি জ্বালিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয়। এই সব অসহায় শিশুদের যত আদর আব্দার—সবই তো তারই কাছে। অনিতা এরা যমের মত ভয় করে। এড়িয়ে চলতে চায়।

পাইলট সন্দীপ্তর স্ত্রী জয়িতা মাঝে মাঝে এই আশ্রমে আসা-যাওয়া করত। জয়িতা আসত অবশ্য অনিতার কাছে। ওরা দীর্ঘদিনের বন্ধু।

আশ্রমের শিশুদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা করত তরুণ চিকিৎসক ডাক্তার সঞ্জয় ব্যানার্জি। সঞ্জয়ের সঙ্গে একসময় জয়িতার প্রেম ছিল। ওদের দু'জনের মাঝখানে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সুদর্শন পাইলট সন্দীপ্ত এসে না পড়লে হয়ত জয়িতা শেষ পর্যন্ত এই ডাক্তারেরই ঘরণী হত। কিন্তু ভাগ্যলিপি তাকে টেনে নিয়ে গেল পাইলটের ঘরণী করে।

বিয়ের প্রথম বছরেই ঘটল সেই শোচনীয় বিপর্যয়। তাও আবার বিবাহ বার্ষিকীর রাত্রেই। সন্দীপ ফ্লাইট নিয়ে গিয়েছিল অমৃতসর। কথা ছিল সে সন্ধ্যায় দমদম এয়ারপোর্টে রিটার্ণ ফ্লাট নিয়ে এসে সোজা বাড়ী চলে আসবে। কিন্তু তার আগেই ফোনে দুঃসংবাদ এলো—সন্দীপ্তের প্লেন হঠাৎ ক্র্যাশ করেছে।.....

প্রাণে বাঁচল বটে সন্দীপ্ত,—কিন্তু পা দুটি চলে গেল চিরদিনের জন্য আর ডাক্তার জানিয়ে দিলেন, সন্দীপ্ত কোনদিনই সন্তানের বাবা হতে পারবে না সে ক্ষমতা ও সন্দীপ্ত তার পা দুটির মতই হারিয়েছে। চিরকালের জন্য।

সাবিত্রী সুব্রতা
রাজা বোস

কালীচরণ
রীণা রায়

সন্দীপ্তের চোখে যেন পৃথিবীর সব রূপে—সব রং মলিন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কোথায় গেল সেই প্রাণবন্ত মানুষটি? আকাশে পাখীর মত ডানা মেলে ঘোরার স্বপ্ন। জীবনকে নিত্য নতুন অভিষেকে বরণ করে নেওয়ার আকাঙ্খা!

অনাথ আশ্রমে আসা যাওয়ার ফাঁকে লালুকেই কেমন যেন পছন্দ হয়ে গিয়েছিল জয়িতার। সে চেয়েছিল সন্দীপ্তের ধ্বংসাত্মক নিঃসঙ্গতা ঘোচাতে। তাই লালুকেই সে দত্তক নিয়ে বাড়ী ফিরল একদিন।

লালু আবার নতুন করে ঘর পেল। পেল নতুন মা, নতুন বাবাকে।

লালুকে পুত্রের অভিজ্ঞানে সন্দীপ্ত অন্তর টেনে নেয়—বলে হি-ম্যান।

সন্দীপ্তর মধ্যে নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা জোগায় লালু।

আর জয়িতার কণ্ঠে সুর ছিলই—এবার বাঁচার তাগিদে সেই সুরকে কাজে লাগায় জয়িতা। ফাংশনে ফাংশনে গান গেয়ে অর্থ আর মর্যাদা ঘরে বয়ে নিয়ে আসে জয়িতা। ওদের দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আর একটা অধ্যায় আরম্ভ হয়।

কোথায় ছিল সন্দেহের বিষাক্ত কীট—হঠাৎ তার আক্রমণে সন্দীপ্ত সোজা হয়ে বসে। অনাথ আশ্রমে জয়িতার যাতায়াতের সংবাদ রাখত না সন্দীপ্ত; একদিন কথা প্রসঙ্গে তা লালুর মুখেই জানতে পারে। আশ্রমের বাঁধা চিকিৎসক সঞ্জয় ডাক্তারের কথাও সে জানতে পারে—সঞ্জয়ের সঙ্গেও জয়িতার এককালের সম্পর্কের কথাও।

পংগু সন্দীপ্ত ক্রাচে ভর দিয়ে ঘোরে আর ভাবে—লালু কি তাহলে জয়িতার-ই অবৈধ সন্তান। অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হচ্ছিল? এখন সুযোগ বুঝে কাছে এনে রেখেছে? সন্দেহের গোপন বিষের জ্বালায় অন্তর জর্জরিত হতে থাকে সন্দীপ্ত—হা, কোন খবরই রাখবার সুযোগ পায়নি জয়িতা। সে এখন কেবল গ্রামোফোন রেকর্ডিং, রেডিও সিটিং, সিনেমার প্লে-ব্যাক আর একটার পর একটা ফাংশন নিয়ে ব্যস্ত।

গুম মেরে থাকতে থাকতে একদিন সামান্য অজুহাতে স্ত্রীর ওপর হঠাৎ বোমার মত সশব্দে ফেটে পড়ে। দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে যায় তুমুল ঝগড়া।

লালু ছুটে এসেছিল থামাতে। রাগে মাথায় তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় সন্দীপ্ত স্বয়ং। লালু সেই মুহূর্তেই যেন বুঝতে পারে—আর এখানে তার কোন প্রয়োজন নেই। সেই ঝড়-বৃষ্টির রাতেই লালু ছুটে চলে আশ্রমের পথে। পড়ে পা মচকে যায় তবু সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই তাচ্ছিল্য আর অবহেলার জগতেই ফিরে যেতে চায়। সেটাই যে তার বিধিলিপি—সুখ ঈশ্বর তার কপালে লেখেননি।

কিন্তু কাহিনীর শেষ এখানে নয়। উমানাথবাবু বললেন—শেষের দৃশ্য অবশ্যই রীতিমত উজ্জ্বল-দৃশ্য। তবে সে অনুভবের ব্যাপার। লেখায় সে রেখাচিত্র টানা দুষ্কর.....

'মোমবাতি'তে অভিনয় করেছেন পুরোভাগে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়াদেবী, অনিল চ্যাটার্জি, শ্রীমান অর্ঘ বসু, সুব্রতা চ্যাটার্জি নন্দিতা বসু, ছায়া দেবী, দিলীপ মুখার্জি। নচিকেতা ঘোষের সংগীত পরিচালনা।

মুসাফির

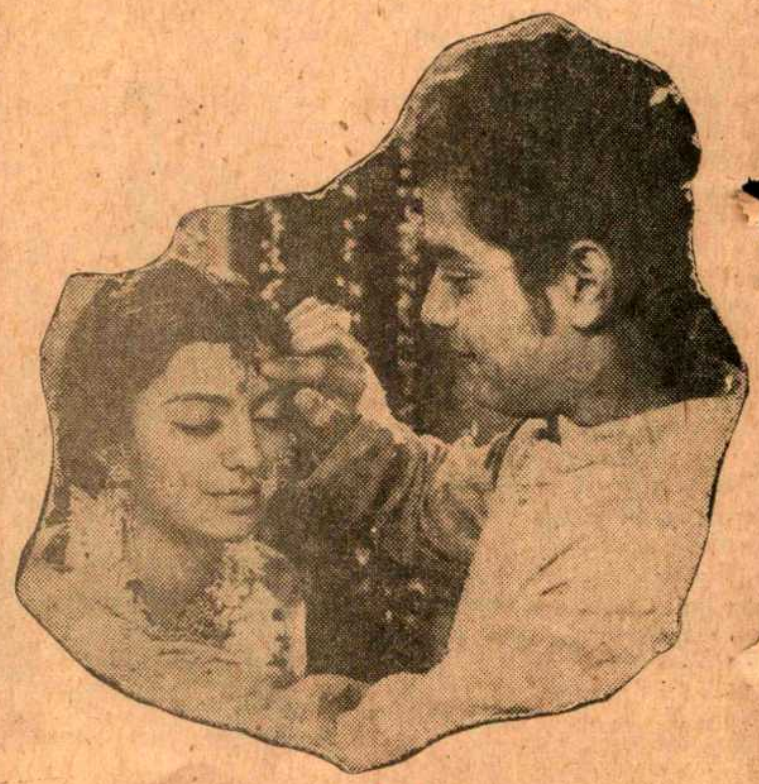

হিন্দী বালিকা বধূ চিত্রের একটি দৃশ্য

কিছুক্ষণ

কল্যাণ চ্যাটার্জি

টালিগঞ্জ ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করা রূপী আছেন দুজন। ভাস্কর চৌধুরী আর ল্যাণ চ্যাটার্জি। দু-বছরের ব্যবধানে দুজনে সম্মানে পুণা থেকে বেরিয়েছেন। প্রথমজন বিনয়ুদ্ধের সামনে প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে জ বম্বে প্রবাসী। বোধহয় ভাগ্যান্বেষণে। দ্বিতীয়জন মানে কল্যাণ চ্যাটার্জি এই হূর্তে আমার ঠিক পাশে সে। স্থান মিসিয়ান স্টুডিওর স্কোরিং থিয়েটার। রা বসে আছি সিঁড়ি গোড়ায়। ভেতরে লাহার নতুন ছবি 'সিন আমাবের' রিং চলছে।

সুতরাং ওখানে কাউকে ডিসটার্ব না রে বেরিয়ে এসে বসলাম আমরা এই ড়িটাতেই বসা যাক, কি বলেন, বলেই টো ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে বসে পড়লেন খানে। অগত্যা আমিও।

সামনের লনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থোকা থোকা আড্ডা বসেছে। রাস্তা দিয়ে পরিচিত লকরা যাচ্ছেন আর একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে উইশ করছেন। চাপ বাঁধা কাঁকড়ানো চুলে হাত বুলিয়ে কল্যাণ বললেন, বলুন তারপর কি ব্যাপার?

কি বলব ভাবছি, জানবারতো তেমন ছু নেই। তাই বললাম—ইনস্টিটিউট কে বেরিয়েছেনতো সেই সাতষট্টি সালে। দীর্ঘ দশ বছরে আপনার তেমন উন্নতি হোল না কেন ভেবেছেন কখনও?

কথাটা শেষ হবার আগেই তিনি বললেন একটা ব্যাপার কি জানেন। নতুন শিল্পীরা প্রথম যে ছবিতে যে ধরনের চরিত্রে সাকসেসফুল হল—দুর্ভাগ্যের কথা বেশীরভাগ সময়ই তিনি টাইপড হয়ে যান। আমার প্রথম ছবি 'আপনজনে' (যদিও আসলে কল্যাণের প্রথম ছবি হোল একটি অসমিয়া ছবি, নাম—সংগ্রাম) যে অ্যাংগ্রিম্যানের চরিত্র করেছিলাম—পরে কোনো ডিরেকটরই ঐ টাইপের চরিত্র ছাড়া ভাবতে পারেননি আমার কথা। এটা করও দোষ নয়, ইটস এ পার্ট অফ দি গেম।

সেজন্যই রিয়েল ব্রেক বলতে বলতে যা বোঝায় তা কল্যাণের আসেনি। সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতে কাজ করার পর অবশ্য আশা করা গিয়েছিল কল্যাণ উইল কাম আপ। কিন্তু না, তা হয়নি। বছর দু-তিনটির বেশী ছবিতে কল্যাণকে পাওয়া যায়নি। তাও আমার তেমন চোখে পড়ার মত চরিত্র নয়।

কল্যাণবাবু ভাল পিরিয়ডকে কিন্তু বেশ স্পোর্টিংলিই নিয়েছিলেন। এই মেজাজটি তাঁর চরিত্রগত। উপরন্তু পুণায় তিন বছরের ট্রেনিং তাঁকে আরও অনেক কিছু শিখিয়েছে। পুণা প্রসঙ্গ আসতেই বললাম—একটা ব্যাপারে আপনার মতামতটা জানতে চাই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা। অনেকেই বলেন—অভিনয় শেখা যায় না। ওটা জন্মগত। ইনস্টিটিউটে গিয়ে তাহলে আপনি কি লাভবান হলেন।

কল্যাণ চ্যাটার্জি

প্রশ্নটা শুনে বোধহয় ইনটারেস্টেড হলেন তিনি। এক নাগাড়ে ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং পদ্ধতি, সিন্ ক্লাস, ইমপ্রোভাইজেশন ক্লাস নিয়ে অনেক গল্প হোল। আর

পাশাপাশি
বীণা ঘোষ ও বিশ্বজিৎ। অমৃত ফটো

বললেন—অভিনেতা হতে গেলে ন্যাক নিশ্চয়ই থাকা দরকার। কিন্তু সায়েন্টিফিক ওয়েতে যদি আপনি আপনার সেই ক্ষমতার নিয়মিত চর্চা করতে পারেন তাহলে কি আপনার উন্নতি হবে না? একজন শিল্পীর পক্ষে তাঁর গুড ও ব্যাড পয়েন্টসগুলো জানা দরকার। তাহলে সেগুলো শুধরে নেওয়া যায় তাড়াতাড়ি। দশ বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একজন আনট্রেইণ্ড শিল্পী যতখানি এগোন, দু-তিন বছরের ট্রেনিংয়ের তার চাইতে কম অভিজ্ঞতা হয় না। যতই ক্ষমতা থাক না কেন নিজেকে কারটিভেট করার প্রয়োজনটা কি অস্বীকার করতে পারেন কেউ?

অনেকেই বলেন অভিনেতা তৈরী করা যায় না। মানছি সেকথা। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার পরিবর্তে খুব কম সময়েই যদি সেই ম্যাচুরিটি আনা যায় সেটা একজন তরুণ শিল্পীর কাছে কম শিক্ষা নয়। নিজেকে ঘষেমেজে তৈরী করাটাই আসলে ইনস্টিটিউটের প্রধান কাজ।

পাল্টা প্রশ্নে যখন জানতে চাইলাম—এই ট্রেনিং নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কতখানি উপকৃত? তিনি বলেন উপকৃততো নিশ্চয়ই। ফিল্ম তৈরীর টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো জেনেছি, ভয়েস মডুলেশন, লেন্সের সঙ্গে অভিনয়ের কি সম্পর্ক এগুলো জানার দরুন অভিনয় করতে সুবিধে হচ্ছে বৈকি!

পাঁচ/ছ বছরের ডাল পিরিয়ড এখন আর নেই। কল্যাণ চ্যাটার্জি এখন প্রতিষ্ঠিত অ্যাণ্টি-হিরো। উনি নিজেই বললেন—চলতি রোমাণ্টিক হিরো সাজবার চেহারা আমার নেই। সেটা আমি জানি। তবে এখনতো নতুন ট্রেণ্ডের ছবি হচ্ছে। হয়তো এবার আমাদের মতো সদমাটা চেহারার শিল্পীরা কাজ পাবে।

কল্যাণের অভিনয় ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। আপনজন—প্রতিদ্বন্দ্বীতে তাঁকে আমরা বলিষ্ঠ চরিত্রে দেখেছি। আবার দেখা যাবে 'এরা এক যুগে' শান্তনুর চেহারায়। কল্যাণ নিজেই বললেন—আমারতো খুব ভালো লেগেছে কাজ করে, এবার আপনার দেখুন।'

শ্যামল রায়চৌধুরী

বললাম—আমরা নয়, সাধারণ দর্শকের মতটাই অসল।

তবে কল্যাণ চ্যাটার্জি আজ নয়তো কাল ক্যারেক্টার করবেই। ইনস্টিটিউটের চৌখশ ছাত্র আর তাঁর আগ্রহী পাঠ বিফলে যাবার নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্যামল রায়চৌধুরী

বাংলা ফিল্মে নতুন আর্টিস্ট একদম আসছে না—এমন একটা অভিযোগ টালিগঞ্জে সবার মুখে ছড়িয়ে আছে। প্রোডিউসার থেকে একজিবিউটার। ডিরেক্টর থেকে টেকনিসয়ান সবাই-ই বলেন—নতুন ছেলে-মেয়ে নেই, এক মুখ দেখতে দেখতে সবাই ক্লান্ত।'

এই অভিযোগের কথাটা তরুণ শিল্পী শ্যামল রায়চৌধুরীর কাছে পাড়তেই তিনি বললেন—এই অভিযোগ আমি মানি না। নতুন ছেলেমেয়ে এখানে নেই? প্রচুর আছে। বরং টালিগঞ্জই তাঁদের ঠিকমত সুযোগ দিচ্ছে না।

বলা বাহুল্য শ্যামলও এই সুযোগ-না-পাওয়া তরুণদের দলে, কোন ক্ষণে যেন তিনি অভিনয়ের প্রেমে পড়েছিলেন, আর ছাড়তে পারেননি। অভিনয়ের সঙ্গে এখন ঘর করা তাঁর জীবনযুদ্ধে বেঁচে থাকার সামিল।

মঞ্চই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র এখন। ক'বছর আগে বয়েজ ওন লাইব্রেরী হলে 'মতিবিবি' নাটকে একটানা প্রায় আড়াইশ নাইট ফকড়ে সেজে অভিনয় করেছেন শ্যামলবাবু। নায়ক সুকুমারের ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে অনেকবার।

এবং সেখান থেকেই এসেছিলেন তিনি ফিল্মে। অজিত ব্যানার্জির 'মেঘের পর মেঘ' ছবিতে তাঁর প্রথম আপিয়ারেন্স। 'দুর্ভাগ্য, ছবিটা রিলিজ হলো না আজও।' ক্ষোভের সুরে বললেন তিনি।

তারপর বাঘবন্দী আনজানে মেহমান (অচেনা অতিথি), রাজা প্রভৃতি ছবিতে খুবই ছোট চরিত্রে কাজ করেছেন। রিয়েল

কালো চোখের তারা
মহুয়া ও তিলক। অমৃত [illegible]

ব্রেক এখনও পাননি শ্যামলবাবু। পরিচা থেকে পরিচালক যাতায়াত চলছে।

আগামী ছবি সম্পর্কে জানতে চাই তিনি বললেন—'জগন্নাথ চ্যাটার্জির সংবাদ'য়ে এক তোতলা আর অমিতাভ গুপ্তের 'আবির্ভাব' ছবিতে ভালো কা পেয়েছি। আশা করছি এই ছবি দুটো মু পেলে আমার লড়াইএর জীবন শেষ হবে

শ্যামলবাবু প্রচণ্ড আশাবাদী। অ তেই তিনি এখনও বুক বেঁধে আছে আর নাটক করে চলেছেন। সম্প্রতি অভিনী সংস্থায় "রামপ্রসাদ' নাটকে হরির চরিত্র করছেন তিনি। সু-অভিনে জন্য প্রশংসাও কম জোটেনি। নাটকে আপাতত ধ্যানজ্ঞান করে নিয়েছেন তিনি

বললাম—'প্রোডিউসার ডিরেকটরের থেকে কেমন ব্যবহার পেয়েছেন?' এ ভেবে বললেন—'ব্যবহার খারাপ ক পাইনি, কিন্তু কাজ পাচ্ছি কই!' সবাই আ দিচ্ছেন, নীট ফলতো তেমন কিছু হচ্ছে এদ্দিন ঘুরে মনে হচ্ছে নতুন শিল্পী সুযোগ দেবার ব্যাপারে ছবির পরিচালক চাইতে প্রযোজকরাই বেশি প্যাওয়ারফু ওঁদের ধরলে তবু কাজ হয়!"

এমনি অনেক কথার মধ্যে শ্যামলবাব যে মন্তব্যটুকু বার করা যায় সেটি হচ্ছে স্টার সিস্টেমের গেরোয় বাঁধা এই ফি লাইনে ভালো পরিচালকের সংখ্যা খু কম। যার জন্য নতুন অভিনেতা আর তৈ হচ্ছে না। ছবির সিকিউরিটির কথা ভে নামী দামী শিল্পীদের নিয়ে কম্প্রোমাই করতে হচ্ছে প্রায় সবাইকে। এ অব বেশীদিন চললে বাংলা ছবির অবস্থা খু বই ভালো হবে না।'

দোহারা চেহারার এই তরুণ ফিল্মে অভিনেতার অভাব কতখানি মেটা পরবে সেটা নিশ্চয় করে বলা যায় না কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা, অভিনয়দক্ষ বিশেষ করে সিরিও কমিক চরিত্রে শ্যাম বাবুর অভিনয় যোগ্য দৃষ্টির দাবী করে।

নির্মৃত

লোকেশন থেকে

তপন সিংহ পরিচালিত **এক যে ছিল দেশ**
প্রেমনারায়ণ ও দীপঙ্কর দে। অমৃত ফটো

নাম রমা, গায়ের রং চাঁপা ফুলের মত। নাম হল তাই রাঙাবৌদি। ছোট ননদ সুলতা শুধু নয়, পাড়ার সবাই-ই তাঁকে ঐ নামে ডাকে। ছোটদের স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে রাঙা-বৌদি আপন করে নিতে পারেন নিমেষে।

একদা রাঙাবৌদিদের যে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল গাঁয়ে আজ সেখানে ভাঁটা পড়েছে। অর্থাভাবে তাঁদের সংসার এখন জীর্ণ, সংসার চলে না প্রায়। বাধ্য হয়েই স্বামী অমলকে শিকার হতে হয়েছে গাঁয়ের দুশ্চরিত্র সুবিনয়ের। চোরাই চালানের কাজে অবৈধ রোজগারে কোনক্রমে সংসার চলে তাদের।

ফুলের মত ছোট্ট বোন লতাও সুবিনয়ের লোলুপ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। একদিন তাকেও এক প্রকান্ড থাবায় গ্রাস করেছে সুবিনয়। পাড়ার সবাই কিন্তু চুপচাপ। সুবিনয়ের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করার সাহস কারও নেই। সব অপমান অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। ভেতরে ভেতরে ফুঁসলেও সবাই চাপা ক্ষোভে নীরব।

একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় বাবলু। বছর বারো বয়সের কিশোর বাবলু। সে জানে তার ফুলের মত দিদির মৃত্যুর কারণ এই পিশাচ সুবিনয়। এরই লোভের খাদ্য হয়ে একদিন বাবলুর দিদিকে চিরদিনের মত চলে যেতে হয়েছে সুবিনয়ের প্রতি তার আক্রোশ বাঁধনহারা। সুযোগ পেলেই চকচকে ছ ইঞ্চি ছুরিখানা তার পিঠে বসিয়ে দেবার জন্য ব্যাবলু রেডি।

ছবির চিত্রনাট্যে সুবিনয়-নিধন পর্ব অবশ্যই আছে। এবং বাবলুই সেই হত্যার নায়ক। সুবিনয়-হত্যায় পাড়ায় শান্তি এলেও আইনের চোখে বাবলু খুনী হয়ে দাঁড়ায়। রাঙাবৌদির ভালবাসা বা অমলের স্নেহ তাকে পুলিশের কালো গাড়ীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

কদিন আগে বজবজের কাছে বাওয়ালী নামে এক গ্রামে সুটিং হচ্ছিল এই ছবির। দুপুর এগারটা নাগাদ স্পটে পৌঁছে দেখি ক্যামেরাম্যান বিজয় দে একটা ভগ্না মন্দিরের মধ্যে বসে রয়েছেন। রিফ্লেকটারগুলো এদিক ওদিক ছড়ান। আর পুকুর পাড়ের বাড়ীখানাকে ঘিরে রয়েছে হাজারখানেক লোকের জনতা।

ভিড় ঠেলে এগোবার মুখে পরিচয় হল বাড়ীর মালিক অরুণ মন্ডলের সঙ্গে। তিনি তখন চলেছেন স্থানীয় থানায়। সুটিংয়ের জন্য পুলিশের কালো গাড়ীটা নাকি আসার কথা ছিল দশটায়। তখনও আসে নি, তাই তিনি চলেছেন খোঁজ নিতে।

প্রকান্ড বাড়ীর চত্বরে ঢুকে সেখানেও কয়েকশ লোক। পরিচালক দীপক গুপ্ত চিন্তান্বিত মুখে বসে। পুলিশের গাড়ীর জন্য সুটিং হেল্ড আপ হয়ে গেল। কি করবেন বোধ হয় ঠিক করতে পারছিলেন না।

দোতলায় উঠে দেখি সাজানো খাটে শুয়ে আছেন দিলীপ রায় ওরফে এই ছবির অমল, সাবিত্রী ওরফে রাঙাবৌদি পান সাজছেন আর তরুণকুমার (ওরফে কি জানি না) হলুদ রংয়ের ফতুয়া আর ধুতিতে বিরাট দেহটা জড়িয়ে মজাসে গল্প করছেন।

কিছুক্ষণ আগে কয়েকটা শট দেওয়ার পর এখন বিরতি। পুলিশের গাড়ীটা এলেই কাজ শুরু হবে। ইন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ওরফে বাবলু ওরফে দীনেন গুপ্তর শ্যালক পরে কস্টিউম পরে রেডি।

বেলা বারোটা নাগাদ পরিশ্রান্ত অরুণবাবু এসে খবর দিলেন দুটো নাগাদ গাড়ী আসছে। সুতরাং লাঞ্চের পর সুটিং। প্রযোজক বাণীকুমার পাত্র নিজেই তদারক করে সকলকে খাওয়ালেন, ওপরের ঘর আড্ডা বসল সবার। দীপক গুপ্ত বিমর্ষ মুখে ঘুরছেন এদিক ওদিক। আমরা সাবিত্রীদির থেকে তাঁর ছোটবেলার গল্প

প্রথম বিদ্যাসাগর পুরস্কার (মরণোত্তর) পেলেন কবি সুনির্মল বসু
তাঁর সমগ্র সাহিত্য কীর্তি— সুনির্মল রচনাসম্ভারের উপর—

সুনির্মল রচনা সম্ভার

তিন খন্ড। মূল্য ঃ ৭০ টাকা।

স্কুল, পাঠাগার এবং নবীনচন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহকগণ ৩১শে মে'র মধ্যে তিন খন্ড সংগ্রহ করলে ৫৬ টাকায় পাবেন।

গ্রাহকগণ যাঁরা এখনও তিন খন্ড সংগ্রহ করেননি তাঁরা ৩১শে মে'র মধ্যে সংগ্রহ না করলে আর পাবেন না।

প্রবীন শিশুসাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস ভোম্বল সর্দার সহ ৫টি উপন্যাস ও ১৪টি বিখ্যাত গল্পের সংকলন। মূল্য—২২-৫০

খগেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

সুমন্ত (২য় সং) ৫-০০ **শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহ** ৫-০০

ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

বাবুমশাই
সৌমিত্র - গায়ত্রী

শুনছি। ঢাকা-কলকাতার গল্প। স্মৃতি-রোমন্থনায় তিনি তখন মশগুল।

কখন যে আমাদের মন এড়িয়ে ঘড়ির কাঁটা তিনটেয় গিয়ে পেঁছেছে খেয়ালই হয় নি। সামনের জানলা দিয়ে দক্ষিণ আকাশে কালো রংয়ের ঘনঘটা দেখেই বুড়োদা (তরুণকুমার) বললেন — সর্বনাশ সুটিং হয়ে গেল! গাড়ী অবশ্য তখনও আসে নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সারা বাওয়ালী গ্রাম ছেয়ে গেল অন্ধকারে। পুলিশের গাড়ী এলো একটু বাদে। সঙ্গে থানার ও-সি আর জন চারেক পুলিশ। তারা তো বাবলুকে পরাবার জন্য হাতকড়া নিয়ে রেডি।

কিন্তু সুটিং হবে কি করে? সূর্যদেব মেঘের আড়ালে ডুবলেন আর মুখ বাড়ালেন না। অগত্যা পরের দিন আবার গাড়ী আসবে এই কথা দিয়ে চলে গেলেন সবাই। শিল্পীরাও।

ঝমঝমে বৃষ্টি থামার পর আমাদের গাড়ীতে তুলে দিতে এসে পরিচালক দীপক গুপ্ত বিমর্ষ মুখে বললেন — দুর্ভাগ্য আমার, সুটিং দেখতে পারলাম না আপনাদের। দীর্ঘশ্বাসও পড়ল একটা। বললাম— একেই বলে ভাগ্য — আপনি আর কি করবেন!

নটমঞ্চ

রঙ্গনার 'নটনটী'

উনিশ শতকের একটা বড় অংশ জুড়ে রঙ্গারঙ্গ মঞ্চের যে সুবর্ণ যুগ গেছে, যে সময়কালের মধ্যে গিরিশ ঘোষ থেকে নটী বিনোদিনী পর্যন্ত বিরাট এক প্রতিভার মিছিল চলে গেছে, সেই সব নটনটীদের একটা বড় অংশের কিছু চরিত্র, তাঁদের ভূমিকা, তাঁদের সম্পর্কে একদিকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অন্যদিকে সেকালের দর্শকের কি ভূমিকা ছিল তাই রঙ্গনার প্রথম প্রযোজিত নাটক নটনটীতে তুলে ধরা হয়েছে।

থিয়েটারকে যে সময়ে একশ্রেণীর মানুষ থ্যাটার বলে ঘৃণা করত, তাঁর নটনটীদের চরিত্র এবং সামাজিক ভূমিকা নিয়ে রঙ্গ-তামাশা করত, সেই নটনটীদেরই ব্যক্তিগত জীবন, সুখদুঃখ, ব্যথা-বেদনা নটনটীর কাহিনী।

আর সেই সবও যে নাটকের বি হতে পারে এবং তা দেখে একালের দ রোমাঞ্চিত হতে পারেন, তার সার্থক দিয়েছেন নটনটীর সার্থক নাট্যক নির্দেশক শ্রীগণেশ মুখোপাধ্যায়। এ তিনি অবশ্যই সাধুবাদ পাবার যো

আর এই ইতিহাসাশ্রয়ী নাটকের স পরমপুরুষ রামকৃষ্ণের ভূমিকা যুক্ত নাটকটি যেন আরও জোরালো, তথ্যসম এবং মানবিক আবেদনে চিহ্নিত উঠছে। নইলে যেন নাটকটি পূর্ণতার র নিত না।

এ-নাটকের মূল চরিত্র বলা গিরিশ ঘোষই। তাঁর নাটকের প্রতি দুর্ আকর্ষণ, মত্ত অবস্থায় থেকেও স প্রতি আনুগত্য ও নিষ্ঠা এবং সংসার বাইরের জীবন থেকে নিজেকে গুটি নিয়ে এসে থিয়েটারের প্রতি তন্ময় হও এবং অন্য দিকে প্রথমে রামকৃষ্ণকে অবজ্ঞা ও পরবর্তীকালে তাঁরই হওয়া, মোটামুটি এই কাঠামোর নটী বিনোদিনী থেকে অর্ধেন্দু মুস্তাফি পর্যন্ত যেসব চরিত্র এসেছে তাঁদের টুকরো টুকরো চরিত্রের আভাস এ-নাটকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আর বড় ভাল লেগেছে তার প্রয়োগ একমাত্র ক্ষেত্রমণির নৌকা বিহারের দৃশ্য (দৃশ্যটি অবশ্য খুবই দর্শনীয় হয়েছে ছাড়া, যেখানে মঞ্চের ওপরেই ঢেউ খেলানো জলের মধ্যে দিয়ে পানসী ভেসে যাওয়ার (গানসহযোগে) আধুনিক কলা কৌশলসমৃদ্ধ দৃশ্যটি ছাড়া, আর কোন দৃশ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে কোনর আধুনিকতা আরোপের চেষ্টা নেই। নাটক দেখতে দেখতে সব সময়ই মনে হয়েছে দর্শকও যেন উনবিংশ শতাব্দীর নির্দিষ্ট সেই সময়-কালে চলে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভাল। অতি দ্রুত দৃশ্য ও পট পরিবর্তন যেমন নাটকটিকে কমপ্যাক্ট করার সহায়ক হয়েছে, তেমনি তার প্রয়োগ ও পরিকল্পনাও বড় ভাল লেগেছে। আর দৃশ্যপট ও আলোর কাজ (আলোক ও শিল্প-নির্দেশনা হীরক মুখোপাধ্যায়) ক্ষেত্রবিশেষে অসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

অনিল বাগচীর সুর রচনা যথেষ্ট সুন্দর তেমনি প্রয়োগও। আর নরেন্দ্রনাথ-রূপী সুধাংশু মাইতি এবং বিনোদিনী-রূপী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দরদ ও আবেগ দিয়ে সতেজ গলায় গেয়ছেনও তেমনি।

অভিনয়ে রামকৃষ্ণদেবের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কিছু

র নেই। তিনি ঐ চরিত্রে অভিনয় করে
র এখন প্রায় সিদ্ধপুরুষ। তারপরই নাম
ছে হয় গিরিশ ঘোষের ভূমিকায় কার্তিক
পাধ্যায়ের। তিনি প্রথম থেকে শেষ
ত দাপটে অভিনয় করে গেছেন। যেমন
ছেন দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্ষেত্রমণি)।
য়েরই কিছু কিছু দৃশ্যের অভিনয়
বার নয়।

অন্যান্য ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যো-
ধ্যায়, অশ্রু ভট্টাচার্য, ধীরাজ বন্দ্যো-
ধ্যায়, গণেশ শর্মা অনিল মুখার্জি,
ংকর মুখার্জি, নিধীর ভট্টাচার্য, সুজিত
ন্থ অসীম বসু, সমীর রায়, মণ্টু
লদার, সুনীল চক্রবর্তী, গৌতম লাহিড়ী,
ামনাথ মজুমদার ইত্যাদির অভিনয়
টকের উপযোগী।

দুটি বিশেষ টাইপ চরিত্রে সন্তোষ
ত ও বিমল দেব দর্শকদের অবাক
রেছে।

মলিনা দেবীর গঙ্গামণি ও মমতা
ন্দ্যোপাধ্যায়ের বিনোদের মা মনে দাগ
াটে। স্বাতী লাহিড়ী ও হিমানী বন্দ্যো-
ধ্যায়কেও দর্শকরা ভুলতে পারবেন না।
রূপসজ্জা যেন সে-কালকেই মঞ্চে উপ-
স্থিত করেছিল।

ক্রিটিকস ক্লাব অফ ইন্ডিয়ার পুরস্কার

ক্রিটিকস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া ১৯৭৫ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরূপে পশ্চিমবাংলার নটসূর্য দিলীপ চট্টোপাধ্যায় ও গুজরাটের দামিনী মেহতাকে মনোনীত

মন্তমুগ্ধ
রঞ্জিত মল্লিক ও সৌমিত্র। অমৃত কর্মী

করেছেন। পুরস্কার দুটি দেওয়া হয় সারা ভারতের ভিত্তিতে। শিল্পী দুজনকে ভবিষ্যতে এক অনুষ্ঠান মারফৎ গন্ধর্ব ও অপ্সরা পদবীতে সম্মানিত করা হবে।

ক্রিটিকস ক্লাবের সৃষ্টি ১৯৭৩ সালে। প্রথম বছর শ্রীমতী জ্যোৎস্না দত্তকে ১৯৭৪ সালের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে অপ্সরা সম্মাননায় ভূষিত করা হয়।

স্বদেশী ছবি

পরীক্ষামূলক অস্ট্রেলিয়ান ছবি

সম্প্রতি ইন্ডিয়ান ফাউন্সিল ফর কাল্চারাল রিলেশনস ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইন্ডিয়া ও বিড়লা আই অ্যান্ড টি মিউজিয়ামের সম্মিলিত উদ্যোগে কলকাতায় এমন কিছু অস্ট্রেলিয়ার পরীক্ষা-মূলক ছবি দেখনো হোলো যা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

যে ছবিগুলি এখানে দেখানো হয়েছে তার সব কটিই অস্ট্রেলিয় সরকারের পৃষ্ঠ-পোষকতায় এবং অস্ট্রেলিয়ান এক্সপেরি-মেন্টাল ফিলম অ্যান্ড টিভি বোর্ডের উদ্যোগে তোলা হয়েছে।

যে অস্ট্রেলিয়া গোটা বছরে মাত্র ষোল থেকে আঠারোটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তৈরী হয় সেখানে এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা মূলক ছবি তৈরী বিস্ময়ের সন্দেহ নেই।

সেদিক থেকে আমাদের দেশ অনেক অগ্রসর অথচ এদেশে এখনও পর্যন্ত তেমন করে পরীক্ষামূলক পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কথা ভাবা দূরে থাক শর্ট ফিলমও তৈরী হয় না।

দুদিনে যে সব ছবি দেখানো হয় তার বিবরণ নিচে দেওয়া হোলো।

অস্ট্রেলিয়ার ছিপ্ট্রী—পরিচালনা ব্রুস পেটি। ছবিটিতে কার্টুনের মাধ্যমে এবং সংক্ষিপ্তাকারে অস্ট্রেলিয়ার কথা বলা হয়েছে। এর প্রকাশভঙ্গীটুকু লক্ষণীয়। একটি যেন ব্যঙ্গের ছোঁয়া মাখা

জিন্দগী অউর তুফান

প্রযোজনা — কীর্তিমান ফিল্মস

টনি পিতৃমাতৃহীন অনাথ, অনাথ শ্রমেই পালিত হয়েছে। জাহাজের বিশিষ্ট কটি পদ থেকে তাকে অপসারিত করা য় পিতৃপরিচয় না থাকার জন্যে। এরপর ওকে দেখা যায় জেলেদের আশ্রয়ে। সেখানে মাছ ধরার কাজে আত্মনিয়োগ করে কায়ক্লেশে দিন কাটাচ্ছিল সে এবং ওখানেই 'তারার' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায় টনি। কিন্তু প্রথম প্রেম মুকুলিত হবার পথেই বাধা এল। তারার হারিয়ে যাওয়া স্বামী গোবিন্দ একদিন আচমকা ফিরে এল। এবার টনী আশ্রয় নিল 'পেরিন' বাইএর কাছে, সে ওর জন্যে সব কিছুই ত্যাগ করতে ত, এমন কী ওর মনের মানুষকে জ দেবার দায়িত্বও নেয় পেরিন, কিন্তু টনির মন পেরিনের কাছ থেকে চলে যায় পূর্বপরিচিত নলিনীর কাছে। নলিনীও টনির দুর্বলতার সুযোগ নেবার চেষ্টা করে। নিরপরাধ নিষ্পাপ পরিচারিকা ভুরীকে টনির দিকে এগিয়ে দিয়ে। একবার নলিনী ওর অফিসের অধিকর্তাকে দিয়ে অসহায়া ভুরীকে এগিয়ে দিয়ে তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ করে দেয়, সে যাত্রায় টনির জন্যে 'ভুরী' রক্ষা পায়। অতপর ওরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

মহাবীর অধিকারীর 'তালাস' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত ছবিতে সমস্যা অনেক, কিন্তু সমাধান করার চেষ্টা লেখক বা চিত্র-নাট্যকার কেউই করেন নি। পরিচালক উমেশ মাথুরেও সেই জট খুলে দিয়ে একটি সুন্দর বাস্তবসম্মত ছবি পরিচালনা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি আঙ্গিক ও অভি-নয়ের দিকে যেমন দৃষ্টি দিয়েছেন অন্যদিকে তেমন নজর দেননি, ফলে সব এলোমেলো। অভিনয়ে—যোগিতা (নলিনী ও ভুরী) সাজ্জিদ (টনি), রেহনা (তারা) রাকেশ (গোবিন্দ), শুভা দেশপাণ্ডে (পেরিন বাই) ও হেলেন (পেরিন) সুন্দর অভিনয় করছেন, আর ডি মাথুরের আলোকচিত্রগ্রহণ এবং লক্ষ্মীকান্ত পেয়ারেলালের সঙ্গীত পরিচালনা এক কথায় চমৎকার।

চিত্রদূত

রক্ষা : জয়শ্রী টি

বিবরণীতে। ছবিটির প্রদর্শন সময় ছিল ১৮ মিনিট (১৯৭১)।

ডার্ক—পরিচালক পল উইংকলার। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের ওপর পরীক্ষামূলক ছবি। সেই কল্পনার যুগ থেকে এর সূত্র নেওয়া। প্রদর্শন সময় ১৯ মিনিট। (১৯৭৩)

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ভির রাজা।
আজই আসুন দর্শন করুন ও
কিনে খুসি হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড ট্রান্সক্রাইবার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

ক্রু-ক্রু-ক্রু—পরিচালক কার্ল জুলিয়াস ম্যাটাস। ভিন্ন স্বাদের এবং মাত্র পাঁচ মিনিটের ছবি। কিন্তু চমকের সৃষ্টি করে। প্রাচীন উপকথা এর উপজীব্য। যার বক্তব্য 'দূরে, বহু দূরে উত্তরপ্রদেশ এমন একটি পাখি আছে যাকে কেউ চোখে দেখেনি, কিন্তু কেউ কেউ তার ডাক শুনেছে।' ছবির মাধ্যম অ্যানিমেশন। তার সঙ্গে ওয়ারেন জোনস ও নেভিল ফগ-এর আশ্চর্য সুর ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। (১৯৭৩)

উই শুড কল ইট এ লিভিং রুম—এ ডাঙ্কো, জে গ্রাউন্ডস, ডি লরী ডি স্টুয়ার্ট পরিচালক। এঁদের দুজন ভাস্কর এবং দুজন চিত্র পরিচালক। এই ছবির বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র তেমনি পরিবেশনের দৃষ্টিভঙ্গী। নৈঃশব্দ্য থেকে কোলাহল পর্যন্ত তার গণ্ডী। মাত্র ন' মিনিটের ছবি। (১৯৭৫)

এক্সপেরিমেন্ট ইন গ্রুপ পেন্টিং—রিচার্ড লীউইলীন। ১৯ মিনিটের ছবি। গ্রুপ পেন্টিংয়ের ওপর সাধারণ পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক ছবি। (১৯৭৫)

ম্যাচলেস—জন পাপাডোপউলস পরিচালিত। দুটি মেয়ে, তার মধ্যে একজন মৃগীরোগী অন্যজন মাঝে মাঝেই মানসিক রোগের শিকার হয়, এরা দুজনে একসঙ্গে বাস করে এক ভাঙ্গা বাড়িতে একজন বয়স্ক মদ্যপের সঙ্গে। তাদেরই বিচিত্র মানসিকতা ও গতিবিধির ওপর তোলা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছবি। প্রদর্শন সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে দীর্ঘ ছবি—৫৫ মিনিট। (১৯৭৪)

মাদার্স লিটল হেলপার—চা তৈরী মেশিন এবং একজন চা-মহিলার গল্প। ৩ মিনিটের ছবি। (১৯৭৩)

দি পয়েন্ট অফ ডিপ্যার্চার—এ ছবি এমন একটি যুবকের, যে অতীতের এক আবেগময় অভিজ্ঞতার স্মৃতির জন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত যদিও তাকে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। এই জটিলতার ওপরই ছবি। ৩০ মিনিটের ছবি। ১৯৭৪ সালে তৈরী।

ছবি সম্পর্কে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কটি ছবিই ভাল লাগবে।

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেলের উৎসব

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কেলের ১০ম বার্ষিক উদযাপন উপলক্ষে গত ১৪ থেকে

বক্তৃতাগুলি কবিগুরুর সমর্থন লাভের জন্য যখন শিশিরকুমার শান্তিনিকেতনে জনৈক প্রতিনিধিকে পাঠান কবিগুরু বলেন, আমাকে কিছুই দেখাতে হবে না। নতুন দৃশ্যও শিশির নিজেই লিখে নিতে পারবে। তাকে বলো।"

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত শিশিরকুমার

স্টার থিয়েটার মঞ্চে নবনাট্যমন্দির নিয়ে নিয়মিত অভিনয় করেন। স্টার কর্তৃপক্ষ শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। ফৌজদারী মামলায় শিশিরকুমার জয়লাভ করলেও উৎখাতের মামলায় তার পরাজয় হয় এবং শেষপর্যন্ত স্টার থিয়েটার থেকে তাকে বিদায় নিতে হয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অকটোবর সুদীর্ঘ ৫ বৎসরাধিক শিশিরকুমারকে স্থায়ী মঞ্চের বাইরে থাকতে হয়। সাম্রাজ্যচ্যুত সম্রাটের মত তিনি ভ্রাম্যমাণ সম্প্রদায় নিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জেলা শহরে কলকাতার আশেপাশে অভিনয় করে বেরিয়েছেন। কলকাতার বিভিন্ন মঞ্চেও মাঝে মাঝে সম্মিলিত অভিনয়ে বা সম্প্রদায়সহ আত্মপ্রকাশ করেছেন। তখন শ্যামবাজারের উপরে একখানি ঘর নিয়ে মহলা দিতেন।

সাম্রাজ্যচ্যুত সম্রাটকে তার হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের সাধনায় ছেড়ে দিয়ে— তারই নিচে এতদিনকার কীর্তিকলাপ নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করা যাক।

নবনাট্যমন্দিরে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয় হচ্ছে— নাটচার্য চাণক্য। দারুণ গ্রীষ্মের সময়। বৈদ্যুতিক সংযোগ গেল বন্ধ হয়ে। 'পাখা চালান — পাখা চলন' চীৎকারে মুহূর্তে নাট্যগৃহ মুখরিত হয়ে ধীরে ধীরে বীভৎসতার রূপ নিল। শেষ পর্যন্ত চাণক্য পণ্ডিত এসে মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনসাধারণকে বল্লেন : 'মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময় বৈদ্যুতিক পাখার প্রচলন ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখতে এসে পাখার অভাবে অস্থির হলে চলবে কেন? তার চেয়ে মোড়ের দোকান থেকে তালপত্রের পাখা নিয়ে এসে ব্যজন করুন। প্রেক্ষাগৃহ সঙ্গে সঙ্গে ভিন্নরূপ নিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য অভিনীত হচ্ছে নব নাট্যমন্দিরে। শিশিরকুমার রডা। রডার সংলাপ মিশ্রিত হিন্দিতে। শিশিরকুমার নূতন করে পড়া শুরু করলেন। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী আরো অন্যত্র ঘুরাঘুরি করে প্রতাপাদিত্য ও নাটকের সামগ্রিক পরিবেশ ও চরিত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেন। সুহৃদ ও প্রধান কর্মী সনৎ মুখোপাধ্যায় একদিন বল্লেন : করবেত রডার পার্ট— তা অত উটছো কেন?

শিশিরকুমার উত্তর দিলেন এখনও তেমরা বালক। অভিনয়ের দিন বুঝতে পারবে।' অভিনয়ের দিন দেখা গেল— রডা বেশী শিশিরকুমার চট্টগ্রামের ভাষায় কথা বলছেন। দর্শক আসন থেকে কয়েকজন মন্তব্য করলেন, রডা আবার চাটগেঁয়ে কবে শিখলো কবে?

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ
অনুপ ও আরতি

অনিল সরকার

শখ ছিল ফটোগ্রাফী শেখার। সেইমত বড়ুয়া সাহেবের স্টুডিওয় বীরেন গুহের কাছে শুরু হয়েছিল শিক্ষা। বেশীদিন নয়, তারপর রাধা ফিল্মের ল্যাবরেটরী-ইন চার্জ ধীরেন দের কাছে এসেছিলেন ল্যাবরেটরীর কাজ শিখতে। এখানেও অল্পদিন হাতে কলমে কাজ শিখে বোধহয় তেমন ভালো লাগল না।

চলে এলেন এডিটিং রুমে। সম্পাদক পান্না বসুর কাছে শুরু হোল আজকের চিত্র-সম্পাদক অনিল সরকারের হাতে খড়ি। আগের কোনো কাজেই তেমন মন বসছিল না। সম্পাদকের টেবিলে বসে ফিল করলেন তিনি। ফিল্ম কাটা আর জোড়া দেওয়ার মধ্যে নাটকীয় উপাদান পেলেন অনিলবাবু। সুতরাং আর ঘর বদল নয়. সম্পাদনার ঘরেই তিনি রয়ে গেলেন, এখনও আছেন। কখনও শুনবে বেঙ্গল কখনওবা ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়—এই দুটো জায়গাতেই তাঁর যাতায়াত এখন বেশী।

রাধা ফিল্মস্ বন্ধ হয়ে যাবার পর রবীন দাসের সহকারী হিসাবে অন্নপূর্ণার মন্দির বৌ ঠাকুরাণীর হাট না আয়পায়ী ঢুলী বলয়গ্রাস ইত্যাদি বহু ছবি করার পর যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে অনিলবাবু কাজ করলেন গরীবের মেয়ে ছবিতে।

কমবেশী কুড়ি-পঁচিশখানি ছবিতে সহকারী সম্পাদকের অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু করলেন স্বাধীনভাবে কাজ জগন্নাথ চ্যাটার্জীর দুরন্ত চড়াইয়ে জগন্নাথ চ্যাটার্জীর পরবর্তী সব ছবিগুলিরই সম্পাদক অনিলবাবু। আগামী ছবি শুভ সংবাদ এরও সম্পাদক তিনি।

ফিল্ম মেকিংয়ে সম্পাদনার গুরুত্ব কতখানি সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করায় অনিল সরকার বললেন—সম্পাদকের কাজ এক কথায় মালাকরের মত, কয়েকশো শট্ এর ফুল নিয়ে মালা গাঁথতে হয় আমাদের, ফুল বাছাইয়ের কাজও আছে।

কেমন সুন্দর তিনি মালা সাজাতে পারেন তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে শৃঙ্খলা ছোট্ট নায়ক দুষ্টু চোখ (বাংলা), মাটির স্বর্গ মরীচিকা ব্যাকমানি (অসমিয়া) সত্যাদি ছবিতে। বন্ধুবৎসল প্রাণখোলা মেজাজের এই মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিটি শুধুমাত্র একজন কুশলী হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও সেই বড়ুয়া সাহেব থেকে শুরু করে টালিগঞ্জের প্রতিটি শিল্পী কলাকুশলীর কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পাবে।

নিরীক্ষিৎ

যবনিকা পড়লে সাদা চাদরে ঢাকা চাদর গায়ে জড়িয়ে হাতে কয়েকখানা বই নিয়ে শিশিরকুমার এসে দাঁড়ালেন মঞ্চে। পেছনে পুরাতন ভৃত্য একখানি মানচিত্র হাতে নিয়ে। মঞ্চকর্মী বা শিল্পীরা তখনও কেউ কিছু বুঝতে পারে নি। পরদা সরে গেল। দর্শকদের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্য করে শিশিরকুমার বল্লেন : জিজ্ঞাসা করলেন : 'আপনাদের মধ্যে কারা যেন জিজ্ঞেস করেছিলেন— রডা চাটগেঁয়ে ভাষা শিখলো কবে?'

যারা মন্তব্য করেছিলেন— তারা আর উঠে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে পারলেন না শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের সামনে। তখন নাট্যাচার্য শুরু করলেন তার বক্তৃতা।

রডা পর্তুগীজ এবং চাটগাঁয়ের থেকে ধরা পড়ে। তার হিন্দিভাষা শেখার অবকাশ ছিল না। পূর্ববঙ্গীয় চাটগাঁয়ের ভাষা শেখাই ছিল স্বাভাবিক। বই থেকে কিছু কিছু অংশ তিনি উদ্ধৃত করে দর্শকদের শোনান এবং ম্যাপ খুলে দেখিয়ে দেন কোন জলপথ দিয়ে রডার আগমণ। ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে নাটকাভিনয়ের সময় কোন দর্শকই মাথা ঘামান না। নিতান্ত বুদ্ধিজীবীও ভিন্ন মন নিয়ে নাটক দেখতে আসেন। যারা এরূপ মন্তব্য করেন তারা ভিন্ন শ্রেণীর। শিশিরকুমারের ব্যক্তিত্বের সামনাসামনি কেউ আর কোন মন্তব্য করলেন না। কিন্তু যেই শিশিরকুমার নিষ্ক্রান্ত হতে যাবেন— অমনি কয়েকজন দর্শক মন্তব্য করলেন —শ্লেষযুক্তভাবে : রিমার্কগুলি ওভারহেড করলেই পারেন। এত আর কলেজের ক্লাস রুম নয়।' শিশিরকুমারের কানে গেল, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন শিক্ষাভিমানী শিশিরকুমার। ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লেন : 'ওভারলুক করতে পারি না আপনাদের সীমাহীন অজ্ঞতা আর মূর্খতা দেখে। আপনারা আসেন নাচ দেখতে, তাই আমাকে রুস করতে হয়— শিক্ষা দিতে হয়।' বলেই বিদায় নিলেন। পরে নিয়মিত অভিনয় শুরু হলো। এমনি তিরস্কার কেবলমাত্র শিশির কুমারের ক্ষেত্রেই নাট্যমোদীরা যেমন সহ্য করতেন— তেমনি আত্মাভিমানীরা মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধ সমালোচনাতেও মুখর হয়ে উঠতেন।

শিশিরকুমারের আত্মাভিমান বা শিক্ষাভিমান সম্পর্কে খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত। তখন নবনাট্যমন্দির নিয়ে শিশিরকুমার স্টার থিয়েটারে, দোতলার খেলা ছাদে আলো-আঁধারে বসে একটু একটু করে মদ্যপান করতেন। সঙ্গে থাকতেন হয়ত বন্ধু সুধাংশু মুখোপাধ্যায় বা আর কেউ। তখন সেখানে যেয়ে বসবার অধিকার থাকতো খুব কমজনেরই। এই কমজনের মধ্যে নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত ছিলেন অন্যতম। পরস্পরের প্রতি যেমন ছিল গভীর শ্রদ্ধা— তেমনি অন্তরে অন্তরে ছিল না তেমন সম্প্রীতি। শচীন সেনগুপ্তও ছিলেন সমান আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। তাই মুখোমুখী দুজনেই দুজনের প্রতি সতর্ক থাকতেন। শচীন সেনগুপ্তের নিজের ভাষাতেই বলি : তিনি আমার প্রতি মোটেই প্রীতি ভাবাপন্ন ছিলেন না কিন্তু একটা বিশ্বস্ততার ভাব ছিল।' একদিন শচীনদা বহুদিনের মত নবনাট্যমন্দিরে গেছেন। দোতলায় উঠবার আগেই খবর পেলেন— ড্রপ অনেকক্ষণ ওঠেনি, দর্শকেরা হৈ-চৈ কচ্ছেন। তখন শিশিরকুমারের থিয়েটারে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। উপরে উঠে গেলেন, শিশিরকুমার তখন উপরের ঘরে সাজতেন। তাঁর ঘরে ঢুকেই দেখেন পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত তিনি পায়চারী কচ্ছেন। আর সুধাংশুবাবু একপাশে টবরাম্ বিভোর হয়ে মুখ টিপে হাসছেন।

কালীশ মুখোপাধ্যায়।

মোহনবাগানের মেয়ে

পরিচালনা— **মানু সেন**

মহাদেববাবু মোহনবাগান দলের গোড়া সমর্থক। পুত্র সুবিনয় কিন্তু ইস্টবেঙ্গল বলতে পাগল। তাই পিতা-পুত্রে প্রায় রোজই দল নিয়ে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। আর রেফারীর মতই তা থামাতে হয় মহাদেববাবুর স্ত্রীকে। সব দেখেশুনে মহাদেববাবু অবাধ্য পুত্রকে সায়েস্তা করবার একটি মোক্ষম উপায় ঠিক করলেন—তা হল পুত্রের সঙ্গে একটি মোহনবাগানের মেয়ের বিয়ে দেওয়া। সেইমত তিনি মেয়ের খোঁজেও বেরোলেন। এদিকে সুবিনয় মিতাকে ভালবাসে সে কিনা ইস্টবেঙ্গল দলের অন্ধ সমর্থক। নাতি বলাই-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী মিতাকে মহাদেববাবুর কাছে মোহনবাগানের মেয়ে সাজতে হল। ব্যাস! মেয়ে পছন্দ এবং বিবাহ! কিন্তু সত্য কি চাপা থাকে? সব জানতে পেরে মহাদেববাবু সুবিনয়কে ত্যাজ্যপুত্র করলেন। সন্তান-সম্ভবা মিতাকে নিয়ে সুবিনয় বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। বাইরে রাগ দেখালেও মহাদেববাবু কিন্তু অন্তরে খুবই আঘাত পেলেন। অবশেষে অনেক নাটকীয় ঘটনার পর মহাদেববাবু পুত্র পুত্রবধূ এবং নাতিকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

হাসির বা মজার ছবি হিসাবে 'মোহনবাগানের মেয়ে'কে বেশ ভাল লাগে। মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের সমর্থকরা ছবি দেখে আনন্দ পাবেন কারণ এর অনেক ঘটনাই আমাদের নিত্যকার ব্যাপার। যদিও ছবিতে বেশ কিছু ত্রুটি আছে, যেমন মোহনবাগান দলের ধারাবাহিকতা, সদ্যজাত শিশুর বড়সড় আকৃতি ইত্যাদি, তবুও ছবি দেখে মজা পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে ফ্ল্যাশব্যাকে মোহনবাগান ক্লাবের অতীত ইতিহাস দেখতে বেশ ভাল লাগে। ছবিকে প্রাণবন্ত করতে প্রধান ভূমিকার শিল্পীদের বিশেষ করে উৎপল দত্তের (মহাদেব) অবদান অনেকখানি। অন্যান্য ভূমিকায় রবি ঘোষ, ধীরাজ দাস তরুণকুমার, চিন্ময় রায় ও শোভা সেন খুবই ভাল অভিনয় করেন। তবে সুনিয় (দীপঙ্কর) ও মিতার (রাজশ্রী) ব্যাপার-স্যাপারগুলি বেশ কিছুটা বাদ দিয়ে এবং মিতার বন্ধুদের না দেখিয়ে ছবি ছোট করলে আরও ভাল হত। দীপঙ্কর দে ও রাজশ্রী বসুর অভিনয় মোটামুটি ভাল। কলাকুশলীদের কাজ মোটামুটি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে অনুপ ঘোষালের কণ্ঠের গানটি শুনতে বিশেষ ভাল লাগে। অন্যান্য গানগুলিও সুগীত।

চিত্রবিদ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১২।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

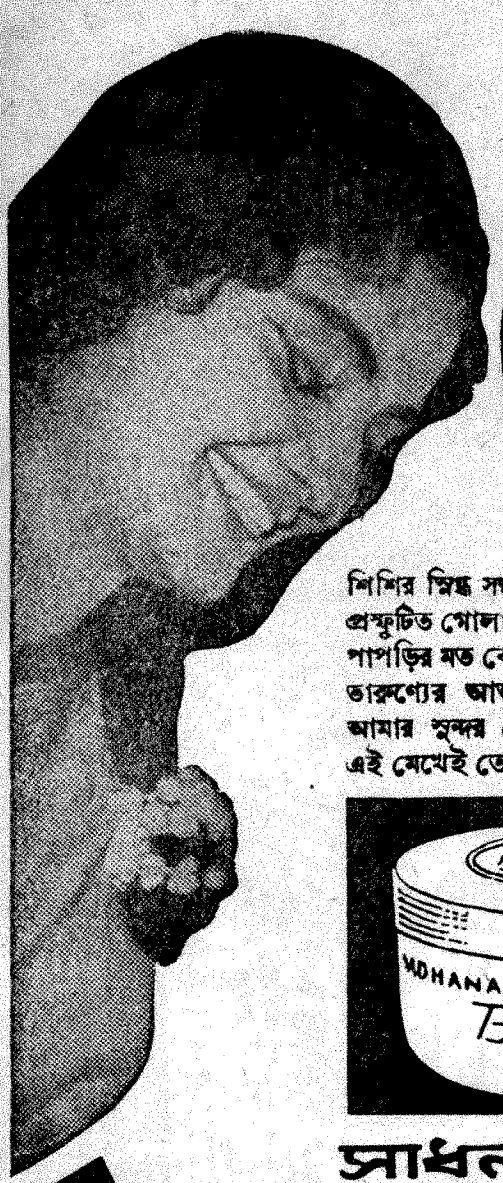

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সদ্য
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো!

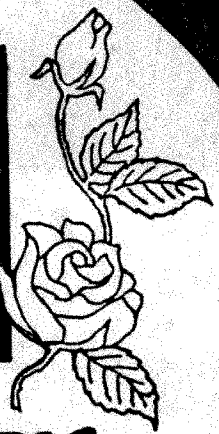

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

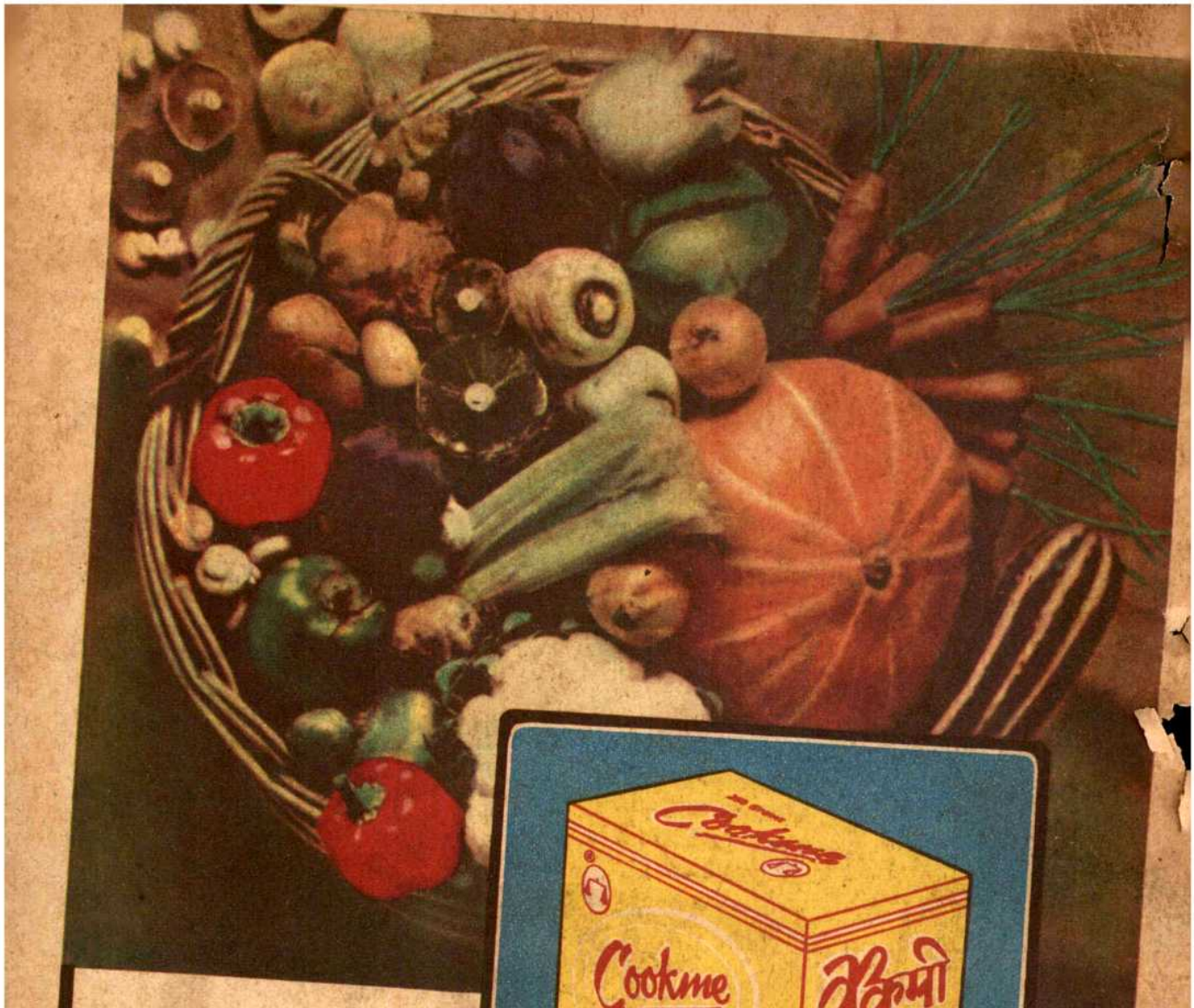

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
এর কোন ব্র্যাণ্ড
ও
শাখা নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫

iaa/KCD-176

11 MAY 1976

মাটো-অফসেট : এন. কে. মোহসেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৮ মে ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

বারোলীন যার সহায়
ক্ষে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই অকৃপণ সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য তাপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ঘুসকুড়ি ও ত্বকের অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতগুলো দূষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বারোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের অন্যান্য কাটা-ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

পোকামাকড় যে কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!

ফিনিট

ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা'

ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

উড়ন্ত পোকামাকড়—মাছি, মশা, পতঙ্গ, ডাঁশ আর ভীমরুলের জন্যে। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১০ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।

বুকেহাঁটা পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেন্নু-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর জন্যে।
যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন। বেসিন নর্দমা থেকে নিয়ে সম্ভব মত সমস্ত লুকোবার জায়গায় স্প্রে করুন। সপ্তাহে একবার কি দুবার স্প্রে করবেন।
মনে রাখবেন, ফিনিট টিনের গায়ে আরও তথ্য দেওয়া আছে। সেগুলি নিশ্চয় করে পড়ে নেবেন।
মনে রাখবেন, পোকামাকড় শুধু বিরক্তিকর নয়, নানান রোগও ছড়ায়।
ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।

বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী **ফিনিট** বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী!
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক **ফিনিট**, মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:

ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!

নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

HP

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

CMHPF-3-244-Ben

এক সেটে অভিনয়যোগ্য কয়েকটি মঞ্চসফল পূর্ণাঙ্গ নাটক

রতনকুমার ঘোষের

সীতা হরণ (২ নারী) ৫-০০
এই দশকের মঞ্চে (২ নারী) ৫-০০
দোহাই ! হাসবেন না (২য় সং ॥ ২ নারী) ৫-০০
ভোরের মিছিল (২য় সং ॥ ১ নারী) ৫-০০
সকালের জন্য (৫ম সং ॥ ১ নারী) ৫-০০
অমৃতস্য পুত্রাঃ (৩য় সং ॥ ৩ নারী) ৫-০০
সিঁড়ি (২য় সং ॥ ১ নারী) ৫, ফেরা (২য় সং ॥ ১ নারী) ৩॥০
ভূমিকম্পের আগে (১ নারী) ৩-০০
ভূমিকম্পের পরে (১ নারী) ৩-০০

মনোজ মিত্রের

শিবের অসাধ্য (২ নারী) ৫-০০
বাবা বদল (৪ নারী) ৩-০০
নেকড়ে (চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে ॥ ২ নারী) ৪-০০

মন্মথ রায়ের

শরৎ-বিপ্লব (৩ নারী) ৫-০০

অগ্নিদূতের

অন্ধকারের নীচে সূর্য (২য় সং ॥ ২ নারী) ৪-০০

রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের

কেষ্টধনের কেরামতি (২ নারী) ৫-০০
আমার জননী (২ নারী) ৫-০০
এই মন সেই মন (২ নারী) ৩-৫০
পাঞ্চজন্য (২ নারী) ৩-০০

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জনপদবধূ (৪ নারী) ৫-০০

রাধারমণ ঘোষের

শতাব্দীর পদাবলী (১ নারী) ৪-০০
রণ-দুন্দুভি (১ নারী) ৫-০০

দিলীপ মজুমদারের

গোলাপ কাঁটার মৃত্যু (১ নারী) ৩-৫০

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর

খাঁচা (২ নারী) ৩-০০
সম্রাট কণিষ্ক (১ নারী) ২-৫০
মলাটের রং মুহূর্ত (২ নারী) ৩,

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর

আমি ক্রীতদাস (৩ নারী) ৪,

জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিহত নিয়তি (২ নারী) ৩-০০
ইস্তাহার (১ নারী) ৪-০০
চিতাভস্ম (৩ নারী) ৩-০০

তমাল দাসের

স্বপ্ন সম্ভবা (২ নারী) ৩-০০

সুশীল সেনের

ভলপোন (২ নারী) ৩-৫০

তপেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের

ক্রৌঞ্চ-নিষাদ কথা (১ নারী) ২-৫০
ব্লেক-জার্নি (২ নারী) ৫-০০

পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আদিম (২ নারী) ৩-০০
এরিণা (৫ নারী) ৩-০০

উমানাথ ভট্টাচার্যের

দাদা জানেন (১ নারী) ৩-০০
অগ্নিকোণ (২ নারী) ৩-০০

কিরণ মৈত্রের

শেষ কোথায় (২ নারী) ৪-০০
রাতের কান্না (২ নারী) ৫-০০

দেবনারায়ণ গুপ্তের

নাট্যকার (২ নারী) ৫-০০

শক্তিপদ রাজগুরুর

কুমারী মন (৩ নারী) ৩-০০

অভিজিৎ সেনগুপ্তের

করুণার ঘর-সংসার (১ নারী) ৩-৫০

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮০৫৬

স্ব-নির্ধারিত কর

পয়লা এপ্রিল ১৯৭৬ থেকে

আয়ের বিবরণ দাখিল করার আগে প্রদেয় করের পরিমাণ যাই হোক না কেন আপনাকে আয়কর জমা দিতে হবে।

কত দিতে হবে : আপনার মোট আয়ের ওপর নির্ধারিত হার অনুযায়ী করের পরিমাণ যা দাঁড়াবে; তার থেকে অগ্রিম কর বাবদ যা দিয়েছেন কিংবা আয়ের সূত্র থেকে যে কর কেটে নেওয়া হয়েছে তা বাদ দিন। তারপর বাকীটা কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে জমা দিন।

কী ভাবে কোথায় জমা দিতে হবে : চালানের ফর্ম (ITNS 166 অথবা 166 এ) ভরে করের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে কোনো দপ্তরে অথবা স্টেট ব্যাঙ্কের যে শাখায় সরকারী ট্রেজারীর কাজকর্ম চলে, সেখানে জমা দিন। উল্লিখিত ফর্ম আয়কর দপ্তর থেকে পাওয়া যায়।

টাকা জমা দেওয়ার প্রমাণ : আয়কর যে দপ্তরে জমা দেওয়া হবে সেই দপ্তরের প্রাপ্তি স্বীকৃতিসহ চালানের তৃতীয় কপি, আয়করের রিটার্নের সঙ্গে দাখিল করা প্রয়োজন।

না হোলে কী হোতে পারে : আপনি যদি স্ব-নিরূপণের ভিত্তিতে যথাযথভাবে টাকা জমা দিতে অপারগ হন তা হলে প্রত্যেক মাসের খেলাপের জন্যে করের টাকার (বা তার অংশ বিশেষ) শতকরা দু ভাগ হারে দণ্ড দিতে হবে।

মনে রাখবেন

আপনাকে আপনার আয়ের রিটার্ন জুন ৩০-এর মধ্যে

কিংবা

আপনার ব্যবসা/বৃত্তিগত কাজের জন্যে আপনার হিসেব বৎসর শেষ হওয়ার চার মাসের মধ্যে (যেটা পরে পড়বে) জমা দিতে হবে। স্বনিরূপিত কর সময়মতো জমা দিন এবং জমা দেওয়ার রসীদটি প্রমাণ হিসেবে, আয়করের রিটার্নের সঙ্গে দাখিল করুন।

ডিরেকটার অফ ইন্‌সপেকশান
(পাবলিকেশান্‌স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশান্‌স)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেণ্ট,
নিউ দিল্লী।

ডিএভিপি ৭৬/৭৩

১৬ বর্ষ

অমৃত

৩ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 28th May, 1976 শুক্রবার ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	প্রেম অপ্রেম	(গল্প)	শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১২	আশাপূর্ণা দেবী	(গল্প)	শ্রীবেথা বড়ুয়া
১২	অভিনেত্রী		শ্রীআশাপূর্ণা দেবী
১৮	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৯	বিজ্ঞাপন-বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২১	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
২৪	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৭	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩০	চার্বাকের পরামর্শ	(কবিতা)	বনফুল
৩১	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৬	সাহিত্য পুরস্কার		চার্বাক
৩৭	নতুন বই		

কয়েকখানি নতুন বই বাহির হইল

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক সমারসেট মম-এর আলোড়ন সৃষ্টিকারী উপন্যাস 'দি ম্যাজিশিয়ান' অবলম্বনে

যাদুকর ১২·০০

অনুবাদ—মনোজিত লাহিড়ী

চিরঞ্জীব সেন-এর নতুন বই। বাহির হইল।

স্মরণীয় বিচার

১৬-০০

এই বই-এ পাবেন ভারতের বিখ্যাত বিখ্যাত বিচার কাহিনী। যেমন নানাবতী বিচার, আই এন এ বিচার, কাকরি ষড়যন্ত্র ও গান্ধী হত্যা মামলা।

সমারসেট মম-এর 'দি পেইন্টেড ভেইল'-এর বাংলা অনুবাদ

রঙিন ওড়না ১৪-০০

অনুবাদ—শ্রীইন্দুভূষণ দাস

মৌলুমী সাহিত্য মন্দির। ১৫বি, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

নারায়ণ সান্যালের

নতুন স্বাদের গ্রন্থ

নক্ষত্রলোকের দেবতা

দাম ১৪৲

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ও space-time continuum যে বিজ্ঞানভিত্তিক কোনও বাঙলা উপন্যাসের উপজীব্য হতে পারে এ গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তা বিশ্বাসই করা যায় নি। সেই অত্যন্ত দুরূহ তাত্ত্বিক আলোচনা উপন্যাসের রসে অভিষিক্ত হয়ে বাঙলা হরফে এই প্রথম সাহিত্যের সৃষ্টি করল।

* * *

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

৩৪-৩৪৯২ ৩৪-৮৭৯১

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীময়ানমাই চরিত

(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)

প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

কালাচাঁদ গীতা

প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

নরোত্তম চরিত

প্রতি কপি—২-০০

LORDGOURANGA

(vol. 2)

Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH

Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :

পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)

১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন কলিকাতা-৩

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড. ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-১৭৪২

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৮	পুনশ্চ		ক্ষপণক
৩৯	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩	সাহিত্যের নেপথ্যে		শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৪৫	ঘুম	(গল্প)	শ্রীনিখিলচন্দ্র সরকার
৫১	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫২	খেলাধুলো		দর্শক
৫৩	রঞ্জিৎসিংজী		
৫৪	খেলার জগতে মেয়ে		অময়
৫৫	সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে পশ্চিমের প্রতিক্রিয়া		শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত
৫৭	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৯	স্টুডিও সংবাদ		মুসাফির
৬০	লোকেশন থেকে		বিশেষ প্রতিনিধি
৬১	বিচ্ছুক্ষণ		শ্রীনির্মল ধর
৬৩	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬৪	বিদেশী ছবি		শা-র-চ

প্রচ্ছদ : শ্রীবিনয় কুমার ব্যানার্জী

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

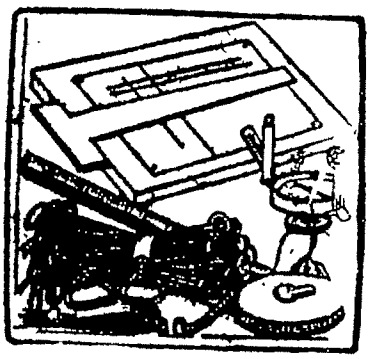

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কাগজ ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ ১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম : সাবরূপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মলিন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

বিখ্যাত ডাটা
গুঁড়ো মশলার
প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত
(কুকমী) প্রাঃ লিঃ
এখন আপনাদের দিচ্ছেন
একটি নতুন অতি
সুদৃশ্য টিনের কৌটায়
সবরকম গুঁড়ো মশলার
অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন
কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম
মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন
প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না।
ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের
মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম সুখাদ্যের
তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না
করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায়
আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
(কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি
পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-৯৭০৮

PAH—KCD-74

কলকাতা নিয়ে

কলকাতা শহর চোখের সামনেই বদলে যাচ্ছে, তবু যেন অনেকের মন উঠছে না। অবশ্য খুঁৎ ধরতে চাইলে প্রায় সকল ব্যাপারেই মস্ত বড় একটা অভিযোগের ফর্দ তৈরি করা কঠিন হয় না। কিন্তু ভালোকে ভালো বলতে না পারাও ঠিক সুবিচার বলা চলে না নিশ্চয়ই।

প্রায় সমস্ত ময়দান জুড়ে চলছে পাতাল রেলের কাজ। পুকুর শুকিয়ে দেয়াল তৈরি ইতস্তত ছড়ানো বিচিত্রদর্শন নানা যন্ত্রপাতির সমাবেশ খুঁড়ে তোলা মাটির পাহাড়—এ সব দেখে কোনো কোনো সৌন্দর্যপিপাসু বিরূপ মন্তব্য করে বলেছেন, এতদিনে বোধকরি ময়দানে এই যে একটু চোখের তৃপ্তির ব্যবস্থা ছিল তাও গেল। উত্তরে যদি কেউ বলে, সৌন্দর্য মাঠে মারা গেল কিনা তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আট দশ বছর পরের সেই সব কলকাতাবাসীর কথা ভাবলেই কি বেশি মানবিকতার পরিচয় দেওয়া হয় না, যাঁরা দুবেলা বাদুড়ঝোলা হয়ে যাতায়াতের অমানুষিকতা থেকে রেহাই পাবেন? তাছাড়া ময়দান যে কুৎসিৎ-দর্শনই হবে, তাই বা কে বলল? ব্যাপারটা তো পাতাল রেল, অনেক কিছুই তো রেল পাতার কাজ শেষ হলে মাটি চাপা পড়বে। আর কে না জানে, পৃথিবীর মতো এমন সর্বংসহা আর কোনো কিছুই নয়, সমস্ত ক্ষত চিহ্নকেই সে ঢেকে দেয় নিপুণ শুশ্রূষার শ্যামল প্রলেপে।

এমন উদাহরণ আরো দেওয়া চলে। যেমন কলকাতায় সবুজ গাছপালার ক্রম-অপসারণ। শুধু পাতাল রেলের জন্যে ময়দানেই নয়, রাস্তা চওড়া করতে গিয়েও ধারাশায়ী হয়েছে বেশ কিছু অশীতিপর বৃক্ষ। নিঃসন্দেহেই দুঃখজনক ঘটনা। যাঁরা কলকাতার বাতাসে শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া-ধুলোর উৎপীড়ন চব্বিশ ঘন্টা ভোগ করেন, এবং যাঁরা জানেন যে হাওয়ার মধ্যে অম্লজানের ভাগ কমে গেলে একমাত্র গাছের সবুজই পারে তার ভারসাম্য ফিরিয়ে দিতে —তাঁরা খুব সঙ্গত কারণেই বিচলিত বোধ করেন বৃক্ষ পতনের দৃশ্যে। কিন্তু এটাও তো সত্যি কথা, হেস্টিংসের আমলে কলকাতায় যতো গাড়িঘোড়া ছিল এখন তার চেয়ে বোধকরি একশগুণ বেড়ে গেছে। এবং উপরোক্ত ঐ গাড়িঘোড়া কথাটির ঘোড়া এখন প্রায় বিরলদৃষ্ট, এবং গাড়ি বলতে এখন বোঝায় মোটরকার, যার সংখ্যা ট্যাকসি - বাস - লরী - টেম্পোর সংমিশ্রণে বল্গাহীন বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। কী করে সেই সতেরো শতকের রাস্তা ধারণ করবে বিশ শতকের শেষ ভাগের এই দুর্দমনীয় ট্র্যাফিকের চাপ? তাই, ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলে বলতেই হয়, রাস্তা বাড়ানো ছাড়া আর অন্য উপায় ছিল না। বিশেষ করে লিংক রোড, অর্থাৎ সংযোগকারী পথগুলিকে।

তবে বৃক্ষ বিরলতার সমস্যা তবু থেকেই যায়। দূষিত বায়ু থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে কী করে এ প্রশ্নেরও কোনো উত্তর মেলে না।

একটা উপায় অবশ্যই পার্কের সংখ্যা বাড়ানো, আর সেই সঙ্গেই যে পার্কগুলি এখন আছে তাতে সুদৃশ্য ছায়াতরুর সংখ্যা বাড়িয়ে যাওয়া। এই প্রচেষ্টায় ময়দানেও নতুন গাছ লাগানো দরকার। আর তা কেবল শিশু তরুই নয়, প্রয়োগ বিদ্যার সাহায্য নিলে এখনকার দিনে রীতিমত কিশোর আকারের গাছও অন্য জায়গা থেকে এনে বসিয়ে দেওয়া যায় পরিকল্পনা মতো। তাতে চোখেরও তৃপ্তি হবে, শরীরও পেতে পারবে তার স্বাস্থ্যের অনুপান।

এরপর থাকে অবশ্য আমাদের পারিবারিক অভ্যাস বদলানোর প্রশ্ন। কলকাতার আকাশ দিয়ে জাম্বো জেট যায়, কলকাতার পাতালে চলছে রেলগাড়ি চালানোর তোড়জোড়, কিন্তু রান্না ঘরে বয়ে গেছে আজো সেই ঘুটে-কয়লার বল্গাহীন বালাই। সত্যি বলতে কি, রোজ দুবেলা কলকাতার বিশ-তিরিশ লক্ষ উনুন থেকে যে পরিমান ধোঁয়া বেরোয়, সমীক্ষা করে দেখলে বোঝা যাবে কলকাতাকে পথে বসবার দায়িত্ব তারও কিছু কম নয়।

বরং এক হিসেবে দেখতে গেলে এই সমস্যাই সব থেকে মারাত্মক। কেননা ঘরোয়া ধোঁয়ার এই ধূম্রলোচন সব চেয়ে সহজে আক্রমণ করে শিশুদের, কেননা তারা অসহায়। অথচ আমরা সকলেই বলে থাকি, শিশুরাই নাকি আমাদের ভবিষ্যৎ।

কলকাতাকে সুন্দর ও বাসযোগ্য করতে হলে কেবল অন্যের খুঁতের দিকে আঙ্গুল দেখালেই হবে না, নিজেরা কী করতে পারি তাও বোধকরি ভুলে যাওয়া ঠিক নয়।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

প্রেম অপ্রেম

আশাপূর্ণা দেবী

কলেজ থেকে বেরিয়ে খানিকটা হেঁটে এসেই, দাঁড়িয়ে পড়লেন সোমনাথ, ঝুঁকে পড়লেন ফুটপাথে ছড়ানো জিনিসগুলোর উপর।...রোজই এমনি দাঁড়িয়ে পড়েন, এমনি ঝুঁকে পড়েন।

যতই সারাদিন সঙ্কল্প করতে থাকুন, আজ আর নয়। আজ কলেজ থেকে বেরিয়েই বাসে উঠে-পড়ে সোজা বাড়ি চলে যাব, ঠিক বেরোনোর মুহূর্তে তাঁর সে সঙ্কল্প বজায় রাখতে পারেন না। গেট ঠেলে রাস্তায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মোড়ের মাথার ওই ফুটপাথের কোণটা যেন একশোখানা হাত বাড়িয়ে ডাকাডাকি করতে থাকে।

ঝুঁকে পড়ে ফুটপাথের এই কোণটে টুকরো টুকুতে ছড়ান ময়লা ময়লা হয়ত বা মলাট ছেঁড়া পুরনো বইগুলোর ওপর একটুখানি ভালবাসার হাত বুলিয়ে নিয়ে বইগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে থাকেন সোমনাথ। রোজই দেখেন, দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গেছে, তবু, হঠাৎ কোনদিন তো নতুন আমদানী কিছু এসেও যায়। মাঝে মাঝে বলেও রাখেন কোন বইয়ের কথা পুরনো বইয়ের এই দোকানদারটিকে।

দোকানদার সুধীরের সঙ্গে সোমনাথের যেন একটা নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক! সোমনাথ জানেন না সুধীরের বাড়ি কোথায়, পরিচয় কি, বিবাহিত না অবিবাহিত, পদবী দাস না ঘোষ রায় কি মল্লিক। সোমনাথ শুধু জানেন কলেজ থেকে বেরিয়েই একটু (যতটা সম্ভব দ্রুত) হেঁটে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেই যোগা কালো দাঁত উঁচু সুধীরকে দেখতে পাবেন।

সোমনাথ বললেন, 'কী সুধীর? নতুন কিছু এল?'

সুধীর উঁচু দাঁত বার করে একটু হেসে বলবে, আসুন বাবু! বিশেষ কিছু না, শুধু এই কটা—

ফুটপাথে বসে পুরনো বই বিক্রী করাটাই সুধীরের একমাত্র পেশা কিনা জানা নেই সোমনাথের, শুধু জানেন- প্রচন্ড বর্ষার দিন ব্যতীত, ঠিক বেলা চারটের সময় সুধীর তার চটে মোড়া পোঁটলাটা নিয়ে এসে এখানে বসবে, ওপরের চটটা ফুটপাথে বিছিয়ে পোঁটলা খুলে বইগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে সাজিয়ে ফেলবে, তারপর একটা বিড়ি ধরাবে।

একটার পর হয়ত আর একটা ক্রমশঃই আস্তে আস্তে, একটি দুটি লোক এসে এসে দাঁড়িয়ে পড়বে, ঝুঁকে পড়বে, বইপত্র ওল্টাবে। বেশীর ভাগই ওই উল্টে-প্যাল্টেই চলে যাবে, কেউ কেউ দর জিজ্ঞাসা করে অতঃপর হাত উল্টে চলে যাবে, কেউ কেউ বা ঝুঁকে পড়ার পর পকেটে হাত দেবে এবং প্যাকেট করবার মত কাগজ কেন রাখে না সুধীর এ নিয়ে গজগজ দিয়ে অনাবৃত

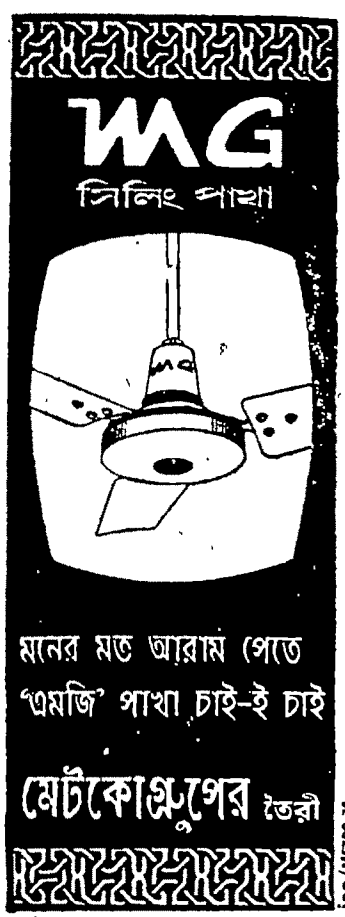

বইগুলোই (বা বইখানা) হাতড়ে করে ফিরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করে দেবে। সোমনাথের মত এমন দীর্ঘক্ষণ ধরে এখানে কালাতিপাত করবে না কেউ। করে না।

সোমনাথ কিনুন না কিনুন, থাকবেন কিছুক্ষণ, দেখবেন কিছুক্ষণ তারপর হয়ত যা যা পারবেন উঠিয়ে নিয়ে দাম চুকিয়ে অস্ফুটে দেব হাসি হেসে সেগুলো বগলদাবা করে ফেলে নিকট বন্ধুত্বে অনাবিল হাসি হেসে বলবেন, 'তাহলে চলি সুধীর?'

'সুধীর ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানাবে. উঁচু দাঁতের বহির্বিকাশ দেখিয়ে একটু হাসবে অথবা বলবে 'আসুন বাবু!'

আসতেও 'আসুন' যেতেও 'আসুন।'

আজও সোমনাথ এসে দাঁড়ান মাত্রই সুধীর বন্ধুর হাসি হেসে বলল, 'আসুন বাবু, আপনার বইটা আজ এসে গেছে— এগিয়ে ধরে একটা বই।

'এসে গেছে!'

সোমনাথের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। টমাসম্যানের 'দি ম্যাজিক মাউন্টেন'।

সোমনাথ উজ্জ্বল হাসিভরা মুখে সেই বিবর্ণ মলিন, প্রায় মলাট-খসা বইখানা হাতে তুলে নেন

কত দিন থেকে খোঁজ করছেন এ বই।

সোমনাথ তারপর প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েই কিছুক্ষণ ধরে তার পাতা উল্টোতে থাকেন, এক একটা পৃষ্ঠায় মার্জিনে ছোট ছোট অক্ষরে কিছু লেখা রয়েছে নিরীক্ষণ করে দেখেন সেগুলো তারপর কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলেন খুব জোগাড়ে ছেলে তুমি। এখন বল।'

কত দাম পড়বে, বা কত নেবে, এরকম কথা কখনো বলেন না সোমনাথ, ওই কুণ্ঠিত হাসিটুকু হেসে বলেন, 'এখন বল।'

কুণ্ঠার কারণ সোমনাথের ধারণা বাজার দরের চাইতে কম নেয় সুধীর সোমনাথের কাছে। যদিও ক্রমশঃ রেট বাড়তে বাড়তে পুরনো বইয়ের দাম আজকাল প্রায় নতুন বইয়ের কাছাকাছি পৌঁছে চলেছে তবু ওই ধারণাটুকু বদ্ধমূলই আছে সোমনাথের মনের মধ্যে। কারণ সুধীর তাকে ভালোবাসে, তবে দামটা দেবার সময় বিগত স্বর্ণ যুগের কথা মনে পড়ে একটু নিঃশ্বাসও পড়ে, যেমন নিঃশ্বাস পড়ে সোমনাথের বড় শালা হিমাংশুর এক পয়সায় দুখানা হিংয়ের কচুরী খাওয়ার দমেরকথা স্মরণ করে।

হিমাংশুর নিঃশ্বাস পড়া দেখে অবাক লাগে সোমনাথের। কী তুচ্ছ জিনিস নিয়ে রোজই একই আক্ষেপ করে এরা। খেয়াল করেন না নিজেরও প্রায় এই কথা ভেবে রোজই নিঃশ্বাস পড়ে, একদা তিনি সাড়ে ন আনা দিয়ে সওদা করে ফেলেছিলেন 'অলিভার টুইস্ট' সাড়ে এগারো আনা দিয়ে 'ডেভিড কপারফিল্ড' আর এক টাকা দু আনা দিয়ে ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট। আর 'ফরসাইট সাগা'? স্কেথা মনে পড়লে শুধু নিঃশ্বাসই পড়ে না, বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। তেরো আনা, মাত্র তেরো আনায় গলসওয়ার্দির ওই দারুণ সৃষ্টিকে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন সোমনাথ। শেষের দিকে তিনখানা পাতা ছিল না, তাতে কিছু দুঃখবোধ করেননি, লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে বসে লিখে নিয়েছিলেন, সেই পাতা কটা।

ছ পয়সা আট পয়সা দশ পয়সাতে ও বই পাওয়া যেত তখন। ফুটপাথের দোকানে ঘোরা তো সেমনাথের আজকের নয়। সেই ছাত্রাবস্থা থেকে। নতুন বই আর কবে কিনলেন?

পৈতের সময় ঝুলিতে পাওয়া ষোলোটা টাকা জড় করে মা সোমনাথকে আংটি গড়িয়ে দেবার উদযোগ করেছিলেন, কিশোর সোমনাথ মার হাতে পায়ে ধরে আংটি গড়ান থেকে নিবৃত্ত করে তার থেকে ছটি টাকা চেয়ে নিয়ে বই কিনেছিল।

তা অনেকগুলো বই-ই হয়েছিল তাতে।

বেশ মনে আছে হয়েছিল বাজ-কাহিনী; নীল পাখি; বত্রিশ সিংহাসন, হিন্দুস্থানী উপকথা আরো যেন কি। এখন কেউ ভাবতেই পারবে না।

সেই যা একসঙ্গে অতগুলো নতুন বইয়ের স্বাদ পাওয়া। পড়ার বইও তো মামা কাকার পুরনো বই দিয়েই চালিয়েছেন। তখন অবিশ্যি সবাই তাই চালাত। ক্লাশে উঠেই নতুন বই কেনা? নেহাৎ বড়লোকের ছেলে ভিন্ন কার আবার হতো?

কিন্তু তাতে দুঃখ ছিল না সোমনাথের। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘোরার নেশা ধরে গিয়েছিল সেই স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। ট্রাম ভাড়ার আর টিফিনের পয়সাই ছিল ভরসা।

আর বথে দোলে কি চড়কে পাওয়া 'পার্বণী'র চকচকে পয়সা কিম্বা নতুন একানি। তাই জমিয়ে জমিয়েই—

পড়ুয়া ছেলের হাতে হাত খরচা দেবার কথা তখন ভাবত না কেউ। দেওয়া গর্হিত মনে করত। পয়সা দিত গুণে গুণে দরকারের মত।

সেই গোনা পয়সা থেকেই জমিয়ে জমিয়ে চার আনা ছ আনা দশ আনার সংস্থান। তা ওর মধ্যেই তো হত! কত ভাল ভাল বইয়ের সংগ্রহ আছে সোমনাথের। আলমারি ছিল না। করাবার অবস্থা কখনই ঘটে নি, আজ পর্যন্তও না। খোলা র‍্যাকেই সব। দেয়াল জোড়া জোড়া কাঠের র‍্যাকই করিয়েছেন গোটা কতক। যার উঁচু তাকগুলোয় হাত পেতে হলে টুলে উঠতে হয়।

বাপ-ঠাকুর্দার আমলের বাড়িখানা ছিল আর সোমনাথই তার একমাত্র উত্তরাধিকার, তাই আস্ত একখানা ঘর সোমনাথের ভগ্যে জুটেছে ওই দেয়ালগুলো ভর্তি করতে। যদিও শেফালী যখন তখন কিম্বা সত্যি বলতে প্রায় প্রতিক্ষণই ওই বরাদ্দটুকু কেটে নিতে চায়।

বলে, আস্ত একখানা ঘর রাখা হয়েছে জঞ্জাল ভর্তি করে। কেউ কখনো শোনে নি এই বাজারে কেউ উঁই ইঁদুর...আর আরশোলা পোষবার জন্যে রাস্তার ধারের একখানা পেল্লায় ঘর ছেড়ে রাখে।... উঠোনের কলতলাটা একটু টিন দিয়ে ঘিরে ওই ঘরখানার সঙ্গে জুড়ে ভাড়া দিলে ফেলে-ছড়ে মাস মাস সত্তর-আশী টাকা ভাড়া পওয়া যেত।...রাজ রাস্তার ওপর অত বড় ঘরখানা।

কিন্তু সোমনাথ তো আর অমন অর্বাচীন কথার কান দিতে যাবেন না। সোমনাথ মাঝে মাঝেই উঁই ইঁদুর এবং আরশোলা নিবারক ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেন যদিও পেরে বড় ওঠেন না। মেজ মেয়েটা মাঝে মাঝে বাপের সাহায্য করে, তার কাছেই সোমনাথ বইয়ের ঘরের চাবিটা রেখে যান।

হ্যাঁ চাবি দেন বৈ কি সোমনাথ তাঁর ঘরে।

কে বলতে পারে বাড়িতে কেউ বেড়াতে এসে সোমনাথের এই অমূল্য সম্পদ ভাণ্ডারে খাবোল বসাতে চইবে কিনা। শেফালী যদিও বলে, 'তোমার ও বই ছমেও ছোঁবে না, কিন্তু শেফালী কি না বলে!

নিজের অর্ডারি বইখানা হাতস্থ করে সোমনাথ একবার সুধীরের আজকের নব-সম্ভারের ওপর চোখ ফেলে কমকে চোখে বলেন, 'আর বাস সুধীর, আজ যে দেখছি অনেক মাল এনে ফেলেছ!'

তারপর বেছে বেছে খানচারেক বই একটু সরিয়ে রেখে তেমনি কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলেন, 'এগুলো দু-একদিন ধরে রাখতে পারবে? মানে পারা সম্ভব হবে? আমি অবশ্য তোমার লোকসান করাতে চাই না, যদি খদ্দের পেয়ে যাও—'

বাকিটা বলতে বোধ হয় বুকটা খচ্ করে উঠল, তাই কথাটা শেষ করলেন না।

সুধীর এতে হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, 'কী যে বলেন বাবু! আপনার বই আমি অন্যকে ছেড়ে দেব?...ন্যান না আজই নিয়ে যান না সবকটা—'

সোমনাথ এ ইঙ্গিতের মানে বুঝতে অক্ষম নয়, কারণ এমন প্রস্তাব সুধীরের নতুনও নয়। প্রায়ই এমন গছিয়ে দেয় সে, 'দামের জন্যে কী হচ্ছে বাবু, আজ পকেটে না থাকে দু-দশদিন পরেই দেবেন।' বলে।

তবে সহজে ধারে বই নিতে চান না সোমনাথ। বেছে রেখে দিয়ে যেতে চান, সুধীরই ছাড়ে না। জোর করে দিয়ে দেয়, দাম পরে দেবেন বাবু, আপনার কাছে তো মরা যাবে না।'

বলে আবার কখনো কখনো হেসে হেসে বলে, 'তবে তেমন লোকও আছে বাবু। একবার এক ভদ্রলোক উনিশ টাকার বই কিনে একশো টাকার নোট দিতে এলেন, ভাগ্যনি ছিল না, দিতে পারলম না, বাবু বললেন, 'আচ্ছা আমি কাপড়ের দোকান থেকে ভাঙিয়ে এনে দিচ্ছি—'

আমি তো আর বলতে পারি না, বাবু বইগুলো রেখেই চলে যান না হালকা হয়ে।'

তা সেই যে গেলেন বাবু, আজও গেলেন কালও গেলেন।...সবাই সমান নয় বাবু।'

বলে আর হাসে।

খদ্দেরের মনোরঞ্জন করতে এমন অনেক গল্প বানায় সুধীর। জানে এরকম গল্পে অনেকেই রস পায়। কিন্তু সোমনাথ পান না, সোমনাথ এরকম গল্পে বিচলিত হয়ে বলেন, 'তুমি ভুল করছ সুধীর, এমনও তো হতে পারে ভদ্রলোকের হয়তো হঠাৎ কোন অ্যাকসিডেন্ট ট্যাকসিডেন্ট—'

সুধীর মৃদু হেসে বলেছে 'আপনার মনের উপযুক্ত কথাই বলেছেন বাবু।'

এখন সুধীর আর এ খদ্দেরের মনোরঞ্জন করতে যায় না। আস্তে আস্তে মানুষটাকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, এবং ভিতরে ভিতরে কেমন একটা হৃদ্যতা জন্মে গেছে দুজনের মধ্যে।

সোমনাথ বললেন, 'এখন বল?'

সুধীরও বলল, 'আপনাকে আবার বলব কী বাবু?'

'যাঃ এতে তো তুমি দামটাম কিছু লিখে রাখনি!'

হ্যাঁ আজকাল পুরনো বইতেও দাম লিখে রাখতে দেখেন সোমনাথ। বোধ করি দামটা এত চড়া হয়ে গিয়েছে বলেই।... কলেজ স্কেয়ারের রেলিং-এর ধারের সেই বুড়ো রসিদ? সে তিন আনায় ছাড়বার বই চোদ্দ আনা থেকে দর করত।

সুধীর বলল, 'এই তো বৌনি। লেখা হয়নি!'

'তবু বলবে তো কিছু।'

'দিয়ে দিন গোটা বারো।'

গোটা বারো।

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিরীটী অমনিবাস

১ম/২য়/৩য়—প্রতিটি ২০৲ ৪র্থ—১৪৲ ৫ম/৬ষ্ঠ/৭ম—প্রতিটি ১৫৲

সুমথনাথ ঘোষের মহাশ্বেতা দেবীর

ওখানে পদ্মা এখানে গঙ্গা ৫৲ অজানা ৪॥

নীহাররঞ্জন গুপ্তর গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

রাত্রি নিশীথে ৭॥ পাও নাই পরিচয় ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর বিমল মিত্রের

ওরা বড় হয়ে গেল ৫৲ বিষয় বিষ নয় ৭৲

জ্যোতিষাচার্য ভৃগুভ্রাতকের

হাত দেখতে শিখুন ৭৲ ভাগ্যলিপি ৯৲

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সোমনাথ মনে মনে প্রমাদ গণেন। যদিও এই অমূল্য গ্রন্থের মূল্যাবদ এ-কিছুই নয়, তবু বারোটা টাকা পকেটে থাকাও তো দরকার।

পকেটে হাতটা ঢুকিয়ে আবার বার করে এনে বুকটা ভরে গেল সোমনাথের, রয়েছে। বারো টাকা বাহাত্তর পয়সা রয়েছে। বইটা নিলেন। আর একটা বইয়ের দিকে দৃষ্টি পড়ল, এ আবার আনকোরা বললেই চলে। আস্তে তুলে নিলেন হাতে রবীন্দ্র-সাহিত্যে উপনিষদের প্রভাব।

ইস এই বই অর্থাভাবে বেচে দিতে হয়েছে কাউকে। অর্থাভাব ছাড়া আর কি। আর কী জন্যে এমন অমূল্য গ্রন্থ বেচে দিতে পারে লোকে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করার সুরে বললেন, 'কতটা অভাবে পড়লে লোকে এমন নতুন বই বেচে দিতে পারে সুধীর!'

সুধীর মনে মনে হাসে।

অভাবেই বটে। বেশীর ভাগ পুরনো বই-ই তো বাড়ির বামুন-চাকরের দ্বারা বাহিত হয়ে আসে। তবু সুধীরবাবুর সুরে মিলিয়ে বিষণ্ণ গলায় বলে, তা যা বলেছেন। তা এ বইটাও আপনি নিয়ে যান বাবু, পরে একসঙ্গে দাম দেবেন।'

সোমনাথের বুকের মধ্যে লোভের স্পন্দন, তবু সামলে নিয়ে বলেন, 'নাঃ থাক। দেখছি তো নতুন দাম বাইশ টাকা। তা এ তো তেমন নতুনই রয়েছে—'

সুধীর বলল, 'কটা খদ্দের এসবের কদর বোঝে বাবু? বেশীর ভাগ লোকে খোঁজ করতে আসে গত পুজোয় পুজো-বার্ষিকীগুলো আছে কিনা। ও আপনি নিয়ে যান, যা মনে করেন পরে দিয়ে দেবেন।'

হুঁহে, কারণ জানে নিজে দর হাঁকার বেশী ন্যায্য পাবে, যদি সোমনাথের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়।

অতঃপর সোমনাথ নিয়েই ফেলেন বইটা।

আরও একখানা বংলা বই 'চর্যাপদের কালে বাঙালীর জীবন চর্চা।' খুব মাল এনে ফেলেছে আজ সুধীর। কই কোনো দিন তো এ বইটার নাম শোনেন নি। মলাট নেই শেষ পৃষ্ঠাটাও নেই।

তা না থাক বুকেট ভরে ওঠে সোমনাথের। এ যাবৎ বিদেশী বইই পড়ে এসেছে, এখন বংলার দিকে বেশী ঝোঁক দিচ্ছেন। এখনেও অনেক পড়বার ছিল, অনেক পড়বার আছে।

তুষ্টিত হাসি হেসে বলেন, 'তুমি তো আমায় ধরে-টারে দিয়ে দও, অসুবিধে হয় তো?'

সুধীর বলে 'অসুবিধে আর কি বাবু? আজকাল তো আমি অড়ংদারের কাছ থেকে এমনিই নিয়ে আসি, বিক্রী-বাটা হলে শেষ দিই।'

'ওঃ তাহলে ভাল।'

বলে সোমনাথ এবার বইগুলি গুছিয়ে নিয়ে বসবার উদ্যোগ করতে লাগল। আর বসে বসে পর আস্তে আস্তে মনের মধ্যে ভয় জমতে থাকে। এতগুলো টাকা বেরিয়ে গেল, বই নিয়ে ঢোকা মাত্রই তো শেফালী মারমূর্তি হয়ে তেড়ে আসবে।

আশ্চর্য। এই এক অদ্ভুত মানুষ। বই ভালবাসে না। বই দেখলে রাগ হয়। অদৃষ্টে সোমনাথের। চট করে দেখতে দেওয়া হবে না, নিয়ে গিয়েই র‍্যাকের পিছন দিকে রেখে দিতে হবে।

শীতকালের একটা বড় সুবিধে আছে হাতের জিনিসটাকে লুকোবার দরকার হলে জিনিস সমেত হাতটাকে চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলা যায়।

বাড়ি ঢোকবার সময় শীতকালকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে হাতের বইয়ের গোছাটাকে বুকের সঙ্গে সেঁটে ধরে গায়ের গরম চাদরটাক ভাল করে টেনে টেনে হাত বুক ঢেকে নিলেন সোমনাথ ভঙ্গীটা চোরের মতো।

কিন্তু উপায় কি? অশান্তি চেঁচামেচি, এগুলো বড় পীড়াদায়ক, এগুলোর হাত এড়াবার জন্যেই এই গোপনীয়তা সোমনাথের। পুরুষ জাতটাই এই এক অসুবিধে, অশান্তির ভয়ে স্ত্রীকে ভয় করতে বাধ্য হয়ে হয়েই ভয় করাটা যেন অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। অন্তত, সোমনাথের মত শান্তিপ্রিয় পুরুষদের।

সোমনাথ ভেবে পান না তাঁর যাতে সব থেকে আতঙ্ক, শেফালীর তাতেই সব থেকে আনন্দ কেন। তা আনন্দই নিশ্চয়। নইলে চেঁচাবার, রাগারাগি করবার সামান্যতম সুযোগটুকুও ছাড়তে চায় না কেন শেফালী।

সব সময়েই রাগারাগি করবার কারণ আবিষ্কার করে ফেলতে পারে সে। বর্ষাকালে বৃষ্টি শীতকালে ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মকালে গরমের বিরুদ্ধেও তার অভিযোগ বাণী অকাশে ওঠে। মশা-মাছি আরশোলা ইঁদুর রেশনের চাল বসনজ্বালা এরকম বহুবিধ ব্যাপারই শেফালীকে উত্তেজনার কারণ জোগায়। এছাড়া আছে মেয়েরা, এবং সর্বোপরি সোমনাথ।

সোমনাথ যে এই অসহনীয় অশান্তি-ময় পৃথিবীখানার মধ্যেও নিজের জন্য একটুকরো নির্জনতা আহরণ করে নিয়ে শামুকের মত নিজেকে একটু শান্তির খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলে দিব্যি দিন কাটিয়ে চলেছেন, এটা শেফালী বরদাস্ত করতে পারে না। শেফালী সোমনাথকে পেড়ে ফেলতে চায়। অথচ পেরে ওঠে না।

কিন্তু শেফালীরই বা দোষ কী?

চিরদিনই যে সোমনাথ তাঁর নিজের সংসারে বহিরাগত অতিথির ভূমিকায় রয়ে গেলেন। সোমনাথ জানেন না। পড়ার মাছতরকারির বাজারটা কোন মুখে, সোমনাথ জানেন না রেশন নামক বস্তুটা কোন রীতি পদ্ধতিতে লোকের ভাঁড়ার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়ে সংসারচক্রকে চালু রাখে। সোমনাথ জানেন না বাজার দর, কাকে বলে কাকে বলে আকাশছোঁয়া। অন্য আর পাঁচজনে যখন ওই প্রসঙ্গটি নিয়েই উতলা হয়ে ওঠে, সোমনাথ তখন অপ্রতিভ অপ্রতিভ মুখে চুপচাপ বসে থাকেন, অথবা একটু অবাক হন নিজের জ্ঞানের পরিধির সংকীর্ণতা দেখে।

অথচ সোমনাথ নিঃসন্তান, অসংসারী মানুষ নন, সংসার আছে স্ত্রীকন্যা আছে, বন্ধু সমাজ না হোক আত্মীয় সমাজ আছে, কন্যা শুধু মাত্র একটা ও নয়, তিন-তিনটে। কিন্তু সোমনাথ তাদের নাম গুলো ছাড়া তাদের সম্পর্কে আর বেশী কি জানেন? পোষাকী আটপৌরে হিসেবে তিন দুগুণে ছটা নমের সবগুলোই কি মনে রাখতে পারেন সব সময়? পোষাকী-গুলো মাঝে মাঝেই স্মরণে আনতে পারেন না।

অথচ তারা ছোট থেকে ক্রমশ বড় হয়েছে, চলতি কথায় মানুষ হয়েছে, বড় মেয়ের তো বিয়েও হয়ে গেছে। কিন্তু এসব ঘটনা সোমনাথের সেই একটুকরো নির্জনতার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করতে পারেনি, চিরদিন দর্শকের ভূমিকাতেই রয়ে গেছেন সোমনাথ।

এতবড় অসহনীয় অবস্থাকে কী করে সহ্য করে চলবে শেফালী মুখ বুজে?

শেফালীর কাছে যে, পৃথিবীটা অসহনীয় সেটা কি সোমনাথেরই অবদান নয়? তবু সোমনাথ সেটা অনুধাবন করতে পারেন না। সোমনাথ শুধু আক্রমণের মুখ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ক্রমশঃই নিজেকে সঙ্কুচিত করতে করতে প্রায় চোরের ভূমিকায় এনে পৌঁছেছেন। শেফালীর সামনে থেকে যতটা পারা যায় নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন সোমনাথ, চেষ্টা করেন নিজের জিনিসগুলিকে সরিয়ে রাখবার। ফুটপাথ থেকে সংগ্রহ করে আনা এই জিনিস-

গুলিই তো সোমনাথের জীবন। কিন্তু সোমনাথের সেই প্রাণতুল্য জিনিসগুলিই শেফালীর ভাষায় রাস্তার জঞ্জাল।

সোমনাথ ঢুকতেই রান্নাঘর থেকে শেফালীর কর্কশ গলা শোনা গেল, 'কে এলরে খুকু?'

ছোটমেয়ে বলল, 'কে আবার। বাবা তো।'

শেফালী নেপথ্য থেকেই বলল, 'তবু ভাল যে বাড়িটা মনে পড়েছে।'

সোমনাথ এসব কথার উত্তর কখনই দেন না, এখনো দিলেন না। ঘরে চলে আসতে আসতে বললেন, 'খুকু তোর মাকে বল চাবিটা আনতে।'

আবার নেপথ্যবাণী উচ্চারিত হল, 'এক্ষুনি আর ওই গোলক বৈকুণ্ঠ পুরীতে ঢুকতে হবে না বলে দে খুকু। হতমুখ পুড়ে চাটুকু খেয়ে আমায় উদ্ধার করে যওয়া হোক।'

'হচ্ছে হচ্ছে। চা কি পালিয়ে যাচ্ছে?'

সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে বলেন, 'কইরে, দীপু? কোথায় গেলি? চাবিটা—

হঠাৎ শেফালীর ঘাষর থেকে বেরিয়ে এল, সন্দেহের গলায় বলে উঠল, 'চাবি চাবি করে এত ব্যস্ত কেন শুনি? আবার গুচ্ছির জঞ্জাল এনে জড়ো করা হচ্ছে বুঝি?'

সোমনাথ তো আর 'না' বলতে পারেন না, তাই ফাঁকা জোরের গলায় বলেন, 'জঞ্জাল মানে?'

জঞ্জাল মানে জঞ্জাল। যা থেকে ইঁদুর-আরশোলা অন্ধ উইপোকায় বাড়ি ভরে গেল। পাঁপর ভাজার মতন ঝুরঝুরে ওই সব বই তোমার একদিন টান মেরে ফেলে দেব।'

'টান মেরে ফেলে দেবে।'

শেফালী জোরালো গলায় বলে, 'দেব না তো কী করব শুনি? ওতো শিশি-বোতলওলাও নেবে না।'

বলেই হঠাৎ এগিয়ে আসে শেফালী ঠাণ্ডা গলায় বলে ওঠে, 'হুঁ ঠিক বুঝেছি। আবার সেই গুচ্ছির বজ্জে পয়সা নষ্ট করে—উঃ কী নির্লজ্জ স্বার্থপর মানুষ তুমি তাই ভাবি।'

সোমনাথ অবাক হয়ে তাকান। শেফালী সবসময় চেঁচায়, কত কিই বলে, কিন্তু এমন ঠাণ্ডা গলায় এরকম অদ্ভুত কথা তো বলেনি কখনো।

সোমনাথের বন্ধ হয়ে আসা গলা থেকে শেফালীর কথাটারই প্রতিধ্বনি ওঠে, 'নির্লজ্জ, স্বার্থপর!'

শেফালীর গলা অবশ্য আর ঠাণ্ডা থাকে না, শেফালী ক্রমশ পর্দায় পর্দায় চড়ে, বলে নয়তো কি! চিরটাদিন দোহাত্তা নিজের শখ মেটাচ্ছ, যা ইচ্ছে বাজে খরচ করছ, সংসারের কী হচ্ছে না হচ্ছে তাকিয়ে দেখেছ কখনো?

সোমনাথ স্তম্ভিত মুখে বলেন 'দোহাত্তা নিজের শখ মেটাচ্ছি। যা ইচ্ছে বাজে খরচ করছি।'

'করছ কিনা নিজেই ভেবে দেখ।' শেফালী নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'কানা কালা ন্যাকা বোকা সেজে চালিয়েও গেলে বেশ। সংসার চলছে কি করে দেখতে হয় না। কিন্তু আর সহ্য করব না আমি। তোমার ওই জঞ্জালের বোঝা সাফ করে ফেলে, ওই ঘর আমি ভাড়া দেব। ওই ভাড়াটা থেকে অন্তত হপ্তার রেশনগুলো তোলা যাবে। ভাড়াটে আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

ভাড়াটে ঠিক করে ফেলেছ! আমি জানলামও না—

সোমনাথ যেন কথাটার মানে বুঝতে পারেন না। কিন্তু শেফালী তো আর অন্ধকারে রেখে দেবে না তার স্বামীকে! আলোয় টেনে বার না করে ছাড়বে না। তাই তিক্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে, ওঃ তোমায় না জানিয়ে! তাইতো ভারী ভুল হয়ে গেছে তো। জ্ঞাননে শুনুনে কর্তা এলেন আমার। তাহলে এটাও জেনে রাখুন কর্তা আজ ঝিয়ের কাছে ধার করে রেশন তুলতে হয়েছে আমার—

ঝিয়ের কাছে ধার করে!

হঠাৎ মেয়েদের মত চোখে একঝলক জল উঠে আসে সোমনাথের।

উঃ পৃথিবীটা কী নিষ্ঠুর! কী নির্লজ্জ।

বুকে সেঁটে ধরে বাধা বইগুলো পাছে কাঁপা কাঁপা হাত থেকে পড়ে যায় তাই সেগুলোকে শক্ত করে ধরে হঠাৎ উল্টো মুখো ঘুরে দালান পার হয়ে রাস্তায় নেমে যান সোমনাথ।

পুঁটলী বাঁধতে বাঁধতে সুধীর চমকে উঠে বলে, কী হল বাবু? ফিরে এলেন আবার?

সোমনাথ কষ্টে হাসির মত করে বলেন। ফিরেই এলাম। বইগুলো তুমি বেঁধেই দাও সুধীর। আর বরং টাকাটা—

সুধীর পুঁটলী বাঁধা স্থগিত রেখে সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে শার্টের ভিতরের পকেট থেকে বারোটা টাকা বার করে সোমনাথের দিকে বাড়িয়ে ধরে স্থির গলায় বলে, বই আর এখন নেওয়া যাবে না বাবু, বস্তা বাঁধা হয়ে গেছে। আবার যেদিন আসবেন দামটা দিয়ে দেবেন, ওর জন্যে কি।

সোমনাথ জোরে মাথা নেড়ে মৃদু গলায় বলেন, নাঃ সুধীর, আর বোধহয় আসা হবে না—

থেমে যান।

সুধীর চোখ তুলে তাকায়, তাকিয়ে থাকে একটু শান্ত গলায় বলে, মেয়েছেলেরা কত সময় কত কথা বলে, সে কথা কি ধোর্তব্য করতে আছে বাবু? আসতে আপনাকে হবেই, না এসে বাঁচবেন কেমন করে? ও আপনি নিয়ে যান। ছাড়া বই ফের বাঁধা বস্তায় তুলতে আমাদের ব্যবসার মানা।

বস্তায় আলগা গিঁটটায় টাইট দেয় গায়ের জোর দিয়ে দিয়ে।

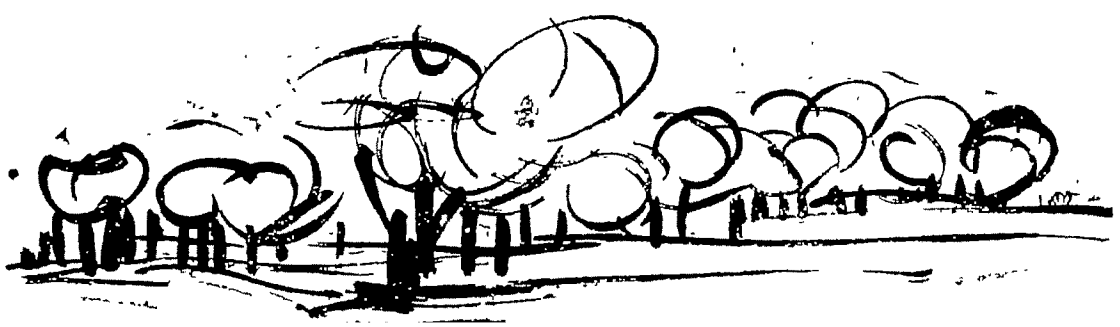

আশাপূর্ণা দেবী

মা বলতেন, সব কথার জবাব দেওয়া যায় না মা বড় হ তারপর নিজেই বুঝবি।

কিন্তু কেন যায় না, কেন যাবে না? নিয়ম? কি অদ্ভুত নিয়ম এ। ছেলেদের বেলায় এক আর মেয়েদের বেলায় অন্য। মা বেশী বই পড়েন, গল্প উপন্যাস। তার জন্য নিন্দের অন্ত নেই, কিন্তু বাবা পড়লে কোন কথাই উঠবে না বাড়ীতে। ছেলেরা যাই করুক কোন দোষ নেই তাতে, কিন্তু মেয়রা?

জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখবে? অত ঢং করো না বাপু। ইসকুলে পড়ে পাশ দেবে? কেন কি হবে শুনি? জজ ম্যাজিস্ট্রেট? গল্প লিখছ? কবিতা? হেসে বাঁচি না শখ দেখে।

এমনি ছিল সে কালটা যখন ইসকুলে যাবার বয়েস মাথায় ঘোমটা টেনে শ্বশুর ঘর করতে এসেছিলেন আশাপূর্ণা নিজেও। মেয়েদের জীবনের মাপা বরাদ্দ ত ওইটুকুই। কিন্তু খেয়ালী বিধাতার কি এক বিচিত্র কৌতুকের বশে দুটো একটা বাড়তি বস্তু দিয়ে ফেলেছিলেন ছোট মেয়েটিকে। জীবনের সুখ-দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করার ক্ষমতা ছিল তার, আর ছিল এক দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। সে আকাঙ্ক্ষা যশ বা অর্থ কোনোটারই নয়। বলতে গেলে ও দুটো শব্দ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিল না তখন বরং নজরটা ছিল অন্য দিকে। যা জেনেছি, যা দেখেছি অনুভব করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করব, লিখে রাখব খাতার পাতায় এমনি একটা ইচ্ছে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল মনের গোপনে।

আরও একটু ছিল। তা হল স্বামীর প্রশ্রয়। সে যুগে সে পরিবেশে যতটুকু সম্ভব ছিল তা তিনি দিয়েছেন। হয়ত মনে একটু প্রচ্ছন্ন গর্বও ছিল বালিকা পত্নীর কৃতিত্বে। বন্ধুমহলে আলোচনা হত, বলত তারা তোর বউত সাংঘাতিক রে কাগজে পদ্য লেখে পুরুষ-মানুষের মত।

কাজটা সত্যিই পুরুষমানুষদের। তারা কত লেখাপড়া জানে, সারা পৃথিবীটা চষে বেড়াচ্ছে দুটি বেলা। চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ ঘরের বউএর জ্ঞান কতটুকু সুযোগ কোথায় অত লেখাটেখার? তাছাড়া ঘরসংসারে কাজের ত অন্ত নেই। সময়ই বা কই তার মধ্যে।

তবু সময় হয়েছিল। সব কর্তব্য, সব দায়দায়িত্বের পালা চুকলে অনেক রাতে ঘরের কোণে ছোট বাতিটা জ্বালিয়ে বসতেন আশাপূর্ণা লিখে চলতেন একমনে। ঘরের মধ্যে বাঁধা জীবন কিন্তু চোখ ত বাঁধা নয়। আত্মীয় বন্ধু দাসদাসী পাড়াপড়শী কত মানুষ চারপাশে অহরহ কি বিচিত্র রঙের খেলা চলছে তাদের মনের জগতে। সারা দিনে কাজের ফাঁকে সহস্র কথা জমত, সহস্র কথা জাগত মনে।

শাশুড়ী বলতেন, বউমা তোমার কেনর জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে গেলাম বাছা। এই-ই নিয়ম এর আর কোন কেন নেই।

কিশোর বয়সের সেই উত্তর না পাওয়া প্রশ্নমালা কোনদিন হারিয়ে যায় নি মন থেকে। লিখতে বসলেই তারা ভিড় করে এসে দাঁড়াত কলমের মুখে। পরিণত মন নিয়ে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে চললেন আশাপূর্ণা, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক অন্যায় অবিচারকে তুলে ধরলেন সবার চোখের সামনে, উদ্ঘাটন করলেন তার নির্মমতা।

সরাজীবন নিজেকে সংসারের পায়ে বিকিয়ে দিয়ে স্বীকৃতিহীন মৃত্যুই হল মেয়েদের নিয়তি। সে শ্রদ্ধার যোগ্য নয়, ভালোবাসার ত নয়ই। খুব বেশী হলে একটুখানি করুণা, তাও নিতান্ত অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যার তাকে। অথচ কি না হতে পারত যদি তাকে দেওয়া হত মানুষের অধিকার বড় হওয়ার অধিকার।

সংকীর্ণ জীবনের বুকভরা গ্লানি আর বঞ্চনার মাঝে বেঁচে থেকে প্রাণের ভেতরের সৌন্দর্যটুকু নিঃশেষ হয়ে যায় ধীরে ধীরে, আর তাই রাজুর মা ছিদ্রান্বেষিণী। পরের যন্ত্রণা পরের লজ্জা তার কাছে পরম উপাদেয়। অন্যের সুখে ভাসা মুখ দেখলে নিজের ওপর জগতের ওপর ঘেন্না ধরে যায় তার। ছিদ্রান্বেষিতার মাঝে নিজের বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন অপমানিতা জয়াবতী একের পর এক মিথ্যার জাল বুনে চলে বিয়ে না হওয়া বয়স্থা মেয়ে বিমলা।

কিন্তু এইত স্বাভাবিক। সুস্থ

অভিনেত্রী

দালানের মাঝখানে গালচের আসন পেতে গোটা আষ্টেক দশ বাটি আর অন্তত রকমের বড় একখানা থালা সাজিয়ে আহারের আয়োজন করা হয়েছে। জামাইয়ের নয়, বেহাইয়ের।

নতুন বৌমার বাপ এসেছেন বিদেশ থেকে।

বাড়ীর গৃহিণী নাকি নিতান্তই লজ্জাশীলা তাই অতিথির অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং বধূমাতারই। তা অযোগ্য অধিকারীর হাতে ভার ন্যস্ত হয়নি। নতুন বৌ ছেলেমানুষ হলে কি হয় তিনজনের আহার্যবস্তু একজনের জঠর-গহ্বরে চালান করিয়ে দেবার চেষ্টার জন্যে যে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সেটা তার আছে।

শ্বশুরবাড়ীতে—বাপ তাই রটন্ত কালেই বাপকে অতিভোজনের জন্যে পীড়াপীড়ি না করবে কেন অনুপমা?

বাপ হেসে বলেন—খুব যে গিন্নী হয়ে উঠেছিস দেখছি! আমার সঙ্গেও কুটুম্বিতা? এত কখনো খাই আমি?

খান না সে কি আর অনুপমাই জানে না? কিন্তু উপরোধটাই রীতি যে! তা ছাড়া—শাশুড়ী সামনাসামনি না এলেও আনাচে-কানাচে আছেন কোথাও, পরে বৌয়ের ত্রুটি ধরবেন। তাই অনুপমা সোৎসাহে বলে—আচ্ছা মাছটাছ না খেতে পারো থাক, পায়েস মিষ্টি এগুলো তো খাবে? এ সন্দেশ এদের দেশ থেকে আনানো—ফেললে চলবে না বাবা!

—না চলে তো তুই খা বসে বসে—বলে বাপ হেসে উঠে পড়েন। অপচয় সম্বন্ধে কোনো বক্তৃতা না দিয়েই ওঠেন।

সাল তারিখের হিসেবে ঘটনাটা দু যুগ আগের। অপচয়ের ভয়ে অপ্রচুর আয়োজনটা ছিল তখনকার দিনে বিশেষ নিন্দনীয়। একজনকে খেতে বসিয়ে কেবল-মাত্র একজনের উপযুক্ত দেওয়া—সে কেমন? ফেলাছড়া না হলে আবার আদর জমে কি? আহার্যবস্তুর ওপর মমত্ববোধটা তো মানসিক দৈন্য।

অতি বড় কল্পনাবিলাসীও তখন রশনের বাজারের দুঃস্বপ্ন দেখে নি। অতএব—কাক বা বেড়াল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন না হয়েই অনুপমাও বারবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায় এবং পাশাপাশি চলতে চলতে প্রায় অস্ফুটস্বরে বলে—আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলবে তো বাবা?

এতক্ষণ বলতে পারে নি, জানতো খাবার সময়টা অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে এদিকে।

বাপও মেয়ের সঙ্গে স্বরের মিল রেখে বলেন—বলবো বলেই তো এসেছি। এবারে একলা ফিরে গেলে তোমাদের মাঠাকরুণটি কি আর অক্ষত রাখবেন আমাকে?..ভাবছি কাল সকালের গাড়ীতেই নিয়ে যাবো।

সুন্দর পূর্ণ মানুষ হয়ে বিকশিত হওয়ার অধিকার তাদের না দিলে কেমন করে তারা শান্ত হবে সুখী হবে, কেমন করে সুখ আর আনন্দের উৎস হবে সারা সংসারের।

তবু এমন মেয়ে আছে যে পারে। অনুপমা পেরেছে। অসীম শক্তিতে নিজেকে সংযত করে সংসারের কল্যাণে নিজেকে ঢেকে রাখে সে। সংসার যদি টিকে থাকে তবেই তার অস্তিত্ব থাকবে একথা জানে অভিনেত্রী অনুপমা আর জানে যে অন্যায়ের প্রতিবিধান করার ক্ষমতা তার নেই বরং হাসি-মুখে সহ্য করায় অপমানের চেহারাটা ঢাকা থাকে। তাই সে বিদ্রোহ করে না প্রতিবাদও করে না। কি হবে অনর্থক অশান্তির আগুন জ্বেলে? শুধু নিজেকে পুড়িয়ে খাক করা আর বিবোধের প্রাচীরে মাথা ঠুকে রক্তাক্ত হওয়া ছাড়া আর কি লাভের আশা করতে পারে একজন অক্ষম মেয়ে? তাই তার একাগ্র সাধনা হল নিজেকে প্রয়োজনীয় করে তোলার। বাপের বাড়ীর দুর্লভ প্রশ্রয় আর আদরটুকুর লোভ দুর্দম হলেও শ্বশুর শাশুড়ীর তুষ্টি সাধনের চেয়ে তা কখনও বড় নয়। সুখের চেয়ে স্বস্তি ঢের দামী। পায়ের তলায় শক্ত মাটির প্রতিশ্রুতি থাকলে তবেই না আকাশে উড়ে সুখ। অনুপমা জানে তা।

কিন্তু বিশ বছর পরেও কি সেই ভয় সেই শঙ্কা থাকা স্বাভাবিক? তখন ত সংসারের চাবিকাঠি গৃহিণী অনুপমারই আঁচলে। তা থাক কিন্তু মনগুলো ত আর তালাচাবির আওতায় পড়ে না। তাছাড়া 'অভ্যাস বলেও ত একটা কথা আছে। বিশ বছরের অনুশীলনে অভিনয় এখন বিনা আয়াসেই আসে আর আসে বলেই আজও এমন সুন্দর হয়ে টিকে আছে অনুপমার সুখের সংসার। ক্ষমতার গর্বে গর্বিত পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলোকে দুটো মিষ্টি আদর ভালোবাসার কথায় নেশা ধরিয়ে যদি বশ করে রাখা যায় সুখে রাখা যায় ওদের তবে কেন তা করবে না অনুপমা। কোন সম্মানের আশায় সে ভেঙ্গে যেতে দেবে সারা জীবনের শ্রম লজ্জা আর দুঃখ দিয়ে গড়া তার সোনার সংসারকে।

লিখব বলে লেখা নয়। দু চোখ ভরে দেখা দৃশ্য তিল তিল করে অনুভব করা সত্য এ প্রকাশ না করতে পারলে ত মুক্তি নেই তাই নিস্তব্ধ রাতে পাতার পর পাতায় উজাড় করে দিয়েছেন নিজের অনুভূতি আর চিন্তাকে। লেখা শেষে ফিরে দেখতে গিয়ে সন্দেহ জেগেছে নিজেরই। মনে হয়েছে হল কি সত্যি গল্পের মত?

তারপর একসময় ধীরে ধীরে এলো আত্মবিশ্বাস জাগল দায়িত্ব বোধ—সবার কথা একমুখে বলার দায় নিজেই তখন কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় অন্তরায় যা তা হল সময়ের। সংসারের শত সহস্র দাবী মিটিয়ে তবেই না লেখাপড়া।

আজ দীর্ঘপথ পেরিয়ে এসে পর সংসারের সেই কাজের ভার থেকে মুক্তি পেয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী এখন দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনায়াসে দেখা যায় পথে চলমান এক জীবনের ছবি দক্ষিণের জানলায় হেলান দিয়ে বর্ষার দুপুরে দুচোখ ভরে দেখা যায় জলে টলোমলো পুকুরটা। কিন্তু তাহলে ত লেখা হয় না। এখনও যে সব বলা হয়নি। যুগ বদলেছে তার সঙ্গে বদলেছে সমস্যাগুলোর চেহারাও নতুন ধরণে ভাবতে হচ্ছে আজ বলতে হচ্ছে নতুন আঙ্গিকে। তাছাড়া জগতের গতি আজ অনেক বড় হয়ে গেছে পরিচয় হয়েছে বহু-জনের সঙ্গে। তারা যখন ভালোবাসার দাবী নিয়ে এসে দাঁড়ায় তখন তাদের ফেরাবেন কেমন করে আরও আছে। এ মেয়েটির সম্মান বোধ বড় তীব্র উপার্জনের পথ তাই তার ওই বউটির স্বামী পরিমিতজ্ঞানহীন খেয়ালী সে আর পারছে না— এর সব কথাই শুনতে হয় কান পেতে মন দিয়েছে।

সারাজীবন ত এদের নিয়েই ছিল কত ভাবনা কত চিন্তা। তাই আজ ব্যস্ততার অজুহাতেও দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না এদের বলা যায় না আমার সময় নেই তোমরা আমায় মুক্তি দাও। কারণ সে মুক্তি কোনদিনই আকাঙ্ক্ষার বস্তু হয়ে ওঠেনি আশাপূর্ণা দেবীর জীবনে।

রেখা বড়ুয়া

আশাপূর্ণা দেবী

আশায় আশঙ্কায় উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় কণ্টকিত কিশোরী হৃদয়, এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে রাজী হয় না। 'কাল-সকাল' —সে যেন সুদূর ভবিষ্যৎ!

কিন্তু 'বৌ' বলে কথা। দুযোগ আগের বৌ। বাপের বড়ী যাবার ইচ্ছা প্রকাশটুও অমার্জনীয় অপরাধ। তাই পাকা গিন্নীর মত ফিসফিস করে বরকে উপদেশ দেয় অনুপমা—বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে বোলো বাবা, জানোই তো আমার শ্বশুর একটু রগী মানুষ?

—একটু? বাবা প্রায় স্পষ্ট হেসে ওঠেন—বলব বিলক্ষণ। চাটং চাটাং কথা শুনলে মেজাজ ঠিক রাখা যায় না। যাক গে—এবার যেমন করে হোক বলে কয়ে—

কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত অনুপমা বাপকে চোখ টিপে ইসারা করে চুপ করতে। কোথায় যেন পায়ের শব্দ হল। বাপের কাছে নিজে যা বলার আবেদন করেছে—এ অপরাধ ধরা পড়লে রক্ষে আছে।

শাশুড়ী লজ্জাশীলা হতে পারেন, তা বলে—এতদূর সহনশীলা তো হতে পারেন না সত্যি।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই দালানেই শতরঞ্জের আসন বিছিয়ে আর—'গাট চার পাঁচ বটী ঘিরে থালা সাজিয়ে অতন্দরে বসেছেন বাড়ির কর্তা। সমানে পাখা হাতে অনুপমা।

ইনি কটুম্বু না হলেও—জামাইয়ের উপরোধের মাত্রাটা ওঠে প্রায় কটুম্বের পর্যায়ে। সেটাও রীতি। ছেলের বৌ যত্ন আত্তি করবে এই তো সাধ মানুষের।...

তা সে সাধ মেটাতে জানে অনুপমা।

কর্তা বেশ খানিকক্ষণ খাওয়ার পর এক সময় মুখ তুলে যেন হঠাৎ মনে পড়ার ভঙ্গিতে বলেন—হ্যাঁ ভালো কথা—তোমার বাবা যে নিয়ে যেতে চাইছেন তোমাকে।

—বাবার কথা বাদ দিন—বলে পাখাটা জোরে জোরে চলতে থাকে অনুপমা, হৃৎস্পন্দনের দ্রুত ছন্দটা পাছে ধরা পড়ে তাই আরো ব্যস্ততা।

—বাদ দিলে কই গো? শ্বশুরঠাকুর শেষের ভঙ্গিতে কথা শেষ করেন—তিনি একেবারে নাছোড়বান্দা মানুষ নিয়ে না গেলে—তোমার মা নাকি তাঁকে বাড়ি ঢুকতে দেবেন না শুনলুম।

—ওই তো হয়েছে জ্বালা—দুটুকরো পান চিবিয়ে দিতে দিতে অনুপমা যেন অগ্রাহ্যভাবে হেসে মরে যায় কী বলতে! মায়ের দেখতে ইচ্ছে হলেই কেন্দে ভাসিয়ে দেবেন। আচ্ছা এ কী? ব্যাপার কি বলা যাবে? সেবারে আমি পূজোর সময় দিদির অসবার কথা ছিল—আসা হল না

বুঝি, বাস মর সাত দিন খওয়া বন্ধ। পুজোর সময়—কোথায় নতুন কপড়চোপড় পরবেন—তা নয়! আচ্ছা সব সময় কি আসা বন্ধলেই অস' হয়? সংসারের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না?

শ্বশুরের মুখের মেঘ কেটে গিয়ে ঈষৎ কৌতুকের বিদ্যুৎছটা দেখা দেয়—আমি তাই তো তোমার বাবাকে কথা দিলাম—বলে পয়সের বাটিটি কছের গেড়য় টেনে নেন।

অনুপকুমার মুখে বিদ্যাৎ বেখা, কিন্তু সুকৌশলে তার ওপর একখানি নকল মেঘ ঢাকা দিয়ে হাতের পাখা নামিয়ে গলে হাত রেখে বলে—সে কি বাবা! কথা দিলেন কি! মার এই শরীর খারাপ, দু দিন বাদে ঠাকুরঝি আসবেন! বামুনঠাকুর দেশে যাবে বলছে—দুশ্চিন্তায় যেন মুসড়ে পড়ে অনুপমা।

—তা বললে কি হবে—কথার পিছনে ড্যাস টেনে—কর্তা জলের গ্লাসে দুখানা পাতিলেবু নিংড়ে অরিয়ে তারিয়ে জলটি খেতে থাকেন।

অনুপমার মা অবুঝ হতে পারেন তাই বলে অনুপমা তো হতে পারে না। সে নুনের পর চিনির কোটা গুছিয়ে তুলতে তুলতে বিচক্ষণভাবে বলে—এ সময় আমি হঠাৎ বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকলে ঠাকুরঝি কি মনে করবেন বাবা? মাকে আপনি ঐ কথাই গিয়ে বলে দিন।

—তা হয় না বোমা—কর্তা মাটিতে দাঁ হাতের ভর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বলেন—মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত! একবার যখন হাঁ বলেছি তখন ত্রিভুবন উল্টে গেলেও তার নড়চড় হবে না।

—তবে আর কি করতে পারে অনুপমা।

মাত্রাতিরিক্ত উজ্জ্বল ভাবটা ম্লান করে আনতে একটু বেশী সময় লাগে বলেই তৎপর হয়ে শ্বশুরের খড়ম খড়কে গামছা ইত্যাদি এগিয়ে দিয়ে তবে বলে—মুশকিল হল! মাঝামাঝি হঠাৎ এখন নিয়ে যাবার জন্যে যে কি দরকার পড়লো বাবা বুঝিও না। মার শরীরটা খারাপ—

এ 'মা' অবশ্য শাশুড়ী।

তাঁর নিটোল দেহখানিতে কোনো রোগ বালাই আছে—এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবে না, কিন্তু অনুপমা দেয়। কর্তা গিন্নী উভয়ের মনোরঞ্জনের এই এক উৎকৃষ্ট দাওয়াই।

পরবর্তী সিন দালান নয়—ঘরে, দিনে নয়—রাত্রে।

তারানাথকে ছেড়ে যেতে যে কি ভয়ঙ্কর মন কেমন করছে সেই কথাই ছলছল চোখে বিশদভাবে বোঝাতে হচ্ছে অনুপমাকে।

দুই কর্তা মিলে কথা পাকাপাকি করে ফেললেন, অনুপমা বেচারী করে কি? ওর তো আর এখন শুধু শুধু যাবার ইচ্ছে ছিল না? হাঁ একটা উপলক্ষ থাকতো—অন্যদা কথা; কিন্তু অবুঝ অনুপমার মা। অথচ বেহায়ার মত বলতে পারে না অনুপমা সে কথা! কাজেই বিরহ-বেদনার যত রকম লক্ষণ আছে সেগুলো সব প্রকাশ করতে হয়—তারানাথের অভিমান ভাঙাতে।

চতুর্থ দৃশ্যও একটা আছে, সে অনুপমার পিতৃগৃহের পটভূমিকায়।...কিন্তু সে কথা থাক। দু যুগ পরের কথাই বলি। দু যুগ কেন—বরং তার বেশীই।

কালের পরিবর্তন হয়েছে বটে—স্থানটা ঠিক আছে। পাত্রটাও বলা চলে। সেই দালানে—ঠিক সেই জায়গাতেই সেই ভঙ্গিতে বসে আছেন গৃহিণী অনুপমা, পাখা একখানা হাতে।...মুখের গড়নটা কিছু বদলেছে, গায়ের বংয়ের জেল্লটা কম গেছে, তবে—চুলে যে পাক ধরেছে সেটা একনজরে চোখে পড়ে না।

সামনে অহার বসেছেন—বর্তমান কর্তা তারানাথ। পঁচিশের পর আর পঁচিশ যোগ করলে—যে পরিবর্তনটুকু অবশ্যম্ভাবী তার বেশী কিছু পরিবর্তন দেখা যচ্ছে না তারানাথের অকৃতিতে। আসনটা আর বসনগুলো বাপের আমলের, তবে অহার আয়োজনটা নয়। তাতে এ যুগের শীর্ণ ছাপ! অনুরোধ উপরোধের কাজটা ফুরিয়েছে গৃহিণীদের।...সচরাচর এ সময় ওই প্রসংগেরই অবতরণা হয়। সে যুগের 'জলের দরের' সংগে এ যুগের 'অগ্নিমূল্যের' তুলনা করে রোজ প্রতিদিনই নতুন করে বিস্ময় প্রকাশ করেন অনুপমা। আবার এ-উৎকণ্ঠা ও প্রকাশ করতে ছাড়েন না—সংসারের এই নবাবী চাল চেলে আর কত দিন চালাতে পারবেন তারানাথ।

ছেলেটি তো একবারে লাটসাহেবের পুষ্যিপুত্তুর। মেয়েটি বদশার বেগম। এতটুকু ত্রুটি হলেই রসাতল। ছেলে-মেয়েদের কন বাচিয়েই অবশ্য বলেন অনুপমা, এখনকার ছেলেমেয়েদের তো বিশ্বাস নেই।

আজ আর বাজার দরের আলোচনা নয়—কর্তা রোগী আছেন। অনুপমা নীরব।

খানিকক্ষণ খওয়ার পর হঠাৎ মুখ তুলে তারানাথ বলেন—কি নিয়ে এতক্ষণ বকর বকর হচ্ছিল বলো?

বলা বাহুল্য উদ্দিষ্ট 'বাবু'-টি তারানাথের বয়স্ক বেকার পুত্র। এহেন অম্লরসাত্মক উষ্ণ ভক্ষ আর কার সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে—উপযুক্ত বয়সের পুত্র ছাড়া?

একটি বিক্ষোভসূচক শব্দের সংগে অনুপমা উত্তর দেন—আর বলো কেন? সেই দিল্লী যাওয়া! বন্ধুরা যাচ্ছে—অতএব ওরও যাওয়াই চাই। দিল্লী দিল্লী করে ক্ষেপে উঠেছে একেবারে।

তারানাথ বিরক্তভাবে বলেন—এখনো সেই 'খোট' ধরে বসে আছে? এক কথায় বলে দিচ্ছি—যাওয়া হবে না, বাস।

—বলে তো আমিও দিয়েছিলাম গো—অনুপমা পাখা নামিয়ে হাত উল্টে বলেন—শুনলে তো! সেই তক্কেই তো হাঙ্গিল 'কেন যাবো না'—'গেলে দোষ কি'—'লাভে কি যায় না—যারা যাবে তারা সব মরে যাবে নাকি—নিষেধের একটা করণ থাকা দরকার...এইসব পাকা পাকা কথা।

নিষেধের করণ থাকা দরকার!

শোন আস্পর্ধার কথা! তারানাথের অনিচ্ছাই তো যথেষ্ট করণ। তাছাড়াও আবার করণ দেখতে হবে ছেলেকে? ভ্রূণ তারানাথ বলেন—আমি ওর তাঁবেদার নই যে কারণ দেখাবো! একদল চ্যাংড়া ছোঁড়ার সংগে হৈ-চৈ করতে যেতে আমি দেব না। টাকা জোগাবার বেলায় তো আমি, ব্যাটা! তবু যদি—এক পয়সা অন্তর মুরোদ থাকতো। চুল-ছাটার পয়সাটি পর্যন্ত তো হাত পেতে নিতে হয়—এই হাতে বুড়োর কাছে তবু কী তেজ! কথাই কওয়া হয় না ভালো করে। আমি যেন একটা কীটস্য কীট।

অনুপমার কণ্ঠেও অনুরূপ সুর—শুধু তুমি কেন, কাকে নয়? জগৎকেই যেন খেড়াই কেয়ার করে ওরা!...দরকারের সময় হাত পাতার কথা বলছো? তা হলেও তো বাঁচতাম, মুখ ফুটে চাইলে—মানের কনা খসে যাবে না?...সেই সেধে সেধে দিতে হবে—নিয়ে যেন মাথা কিনবেন!

—হুঁ। তারানাথ গম্ভীরভাবে বলেন—বললে—তখনি আবার তোমার মানের কনা খসে যাবে, তবে ন্যায্য কথা বলবো—তোমার অঙ্কবাতেই এরকম হয়েছে।

—অস্কারা আবার কি—অনুপমা অসন্তোষ প্রকাশ করেন—মেজাজটি তো জন্মে না ছেলের! একটা ন্যায়-অন্যায় কথা বলবার জো আছে?

—আছে কিনা আমি দেখতাম...তারানাথ হুমকি দিয়ে ওঠেন—বলতে আমি খুবই পারতাম, শুধু পারি না তোমার ভয়ে!

হঠাৎ চল্লিশোত্তীর্ণা অনুপমার মুখে এমন একটা রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে, যেটা চব্বিশ বছরে মানানসই। তবে উত্তরটা বয়সের অনুপাতেই দেন ভদ্রমহিলা—আহা মরি যাই! আমার ভয়ে তো অস্থির হয়ে যচ্ছ তুমি!...ভয় করতে হয়—আজকালকার ছেলেদের। খেকাই তো সেদিন বলছিল—ওর কোন বন্ধুর ভাই নাকি বাপের কাছে বকুনি খেয়ে...কে? কে ওখানে?

তারানাথ অগ্রাহ্যভরে বলেন—কে আবার? মেধো হয় তো!

—কি জানি বাবু—অনুপমা সন্দিগ্ধ ভাবে বলেন—মনে হল যেন খেকা উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে।...

—খোকা আবার কি? এই তো সবের সংগে বেরিয়ে যাওয়া হল বাবুর! পোর্টফোলিও হাতে না ঝুললে বেরোনো হয় না, যেন মস্ত এক অফিসর।

—হ্যাঁ ওই এক ফ্যাশান ছেলের। কিন্তু —ঘুরে আবার আসেনি তো?

—কেন, ঘুরে আসবে কি জন্যে?

—কি জানি, কিছু ভুলে ফেলে গিয়েছে হয়তো। পরশু আমনি—কতদূর গিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো—ঘড়ি ভুলে গেছে বলে।

—তা আসবেন বৈকি। কবজিতে ঘড়ি না বেঁধে বেরোলে যে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কই বলো দিকিন ছুটে গিয়ে সংসারের একটা জিনিস কিনে আনু? মথায় আকাশ ভেঙে পড়বে লাটসাহেবের।

বিরক্তিতিক্ত স্বরে কথাগুলি উচ্চারণ করে ছেট এক টুকরো পতিদেবতা গেলাসের জলে গুলতে থাকেন তারানাথ। তিন অনা জোড়া লেবু বড় বড় দু-খানা খওয়া যায় না।

অনুগামিনী সতী অনুপমা পতিদেবতার এই ধরণের মন্তব্যটির পিঠোপিঠি বেশ ঘোরালো কিছু বলবার আগে একবার উঠে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে নিঃসন্দেহ হয়ে এসে বসেন এবং এখনকার ছেলেরা, লেখাপড়া শিখেও যে কত মুখ্যু আর বাঁদর হয় তারই উদাহরণ দিতে তৎপর হয়ে ওঠেন। ভগ্নে-ভাইপো ভাসুরপো, যেনপো দেখছেন তো সবাইকে। অন্ধ-স্নেহের বশে নিজের ছেলের বিষয়ে ছেড়ে কথা কইবেন এমন মুখ্যু মা অনুপমা নন। তিন তিনটে পাশ করে যে ছেলে নির্বিকার চিত্তে দু-বছর ধরে শুধু আড্ডা দিয়ে আর সিনেমা দেখে বেড়ায়, তার আবার পদার্থ আছে কিছু? কেন, উঠে পড়ে লেগে চেষ্টা করলে কিছু একটা জুটতো না এতদিন? তবু তো বাপের একটু অসান হত।

দুমী দুমী আর ভলো ভালো অরো অনেক কথই বলেন অনুপমা। ছুটির দিন খেয়ে তাড়াতাড়ি ওঠবার তাড়া নেই তরুনথের।

ধীরে-সুস্থে খেয়ে উঠে পানের ডিবে হাতে বাইরের ঘরে চলে যান, ছুটির দুপুরে দরবার আড্ডা বসে পড়ার হিমাংশুবাবুর সঙ্গে। আসর সময় হয়ে এলো তাঁর।

অনুপমা ঠাকুর-চাকর সকলের খাওয়া দেখাশোনা করে সবে খেতে বসেছেন, মেয়ে শীলা নেমে এল বাস্তভাবে বলে —ঠাকুর, উনুনে আগুন আছে তো? থাকে তো একটু চায়ের জল চড়িয়ে দাও চট করে।

চায়ের জল! বেলা দেড়টার সময়।

অনুপমা অবাক হয়ে বলেন—এখন চা খাবি?

শীলা বিরক্তস্বরে বলে—আমি কেন? দাদার ভীষণ মাথা ধরেছে তাই।

নজর করেছেন কি

যে কলকাতার লোকের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে?

কারও মুখ হাঁ, কারও চোখ ট্যারা, আর কারও বা নাক কুঁচকে যাচ্ছে। রাসবিহারী বিধান সরণি আর সেক্রালাস ডায়মণ্ডহারবার রোডে রাত্রে আলোর ছটা, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড, আনওয়ার শা রোড, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, চেতলা আর উল্টোডাঙ্গা ব্রীজ এসব জায়গায় এসে অনেকেই বলে ফেলেছেন "কালী কলকাত্তাওয়ালী, আর কত খেলাই দেখাবি?"

মুখ হাঁ হওয়া মানেই মুখ বন্ধ হয়নি। এখনও শোনা যায় সি. এম. ডি-এর তো পঞ্চাশ মাসে বছর। প্রথম পঞ্চাশ বছর চুপ করে থাকার পর পঁচ বছরে ৫০ বছরের কাজটা হচ্ছে সেটা খেয়াল রাখার দরকারটা কি? জনবহুল এলাকায় একটি পাইপ বসাতে কি হাঙ্গামা, তার হিসাব আছে? প্রথম তো পাশাপাশি দুজনের বেশী মজুরে কাজ করতে পারেন না। তারপর মাটি খুড়লেই ইলেকট্রিক, টেলিফোন, জল আর গ্যাসের লাইন। সেগুলি সাবধান সরিয়ে গর্তের নীচটা এবং ধারটা পাকাপোক্ত করে ঠিক ঢাল অনুযায়ী পাইপ বসিয়ে আবার সেই ইলেকট্রিক টেলিফোন ইত্যাদির লাইন বসিয়ে মাটি চাপা দিতে কত সময় লাগে? শুধু তাই নয় যতদিন না মাটিটা ঠিক আগের মত 'সলিড' হয়ে বসে যাচ্ছে ততদিন পর্যন্ত রাস্তা পাকা করবার উপায় নেই। করলেই বসে যাবে না ধসে যাবে। অবশ্য তখন সি এম. ডি এ-কে গাল দেবার নতুন ছুতো পাওয়া যাবে। যাই হোক অস্থায়ীভাবে চললেও আমরা খোঁড়া রাস্তাগুলির ওপর পাঁচ দিয়ে দেবো যাতে বর্ষার সময় জনসাধারণের অসুবিধা কম হয়। এটা কিন্তু অস্থায়ী ব্যবস্থা, স্থায়ী ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। এই অস্থায়ী ব্যবস্থাও সম্ভবতঃ খুব পাকাপোক্ত হবে না। তবু আপনাদের অসুবিধার কথাই ভাবছি।)

আর কিছুদিন পরেই শুরু বর্ষা নামবে। তখন রাস্তায় জল জমলেই সি. এম ডি এ-কে গাল দেবার আর একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। এত টাকা খরচ করেও জল জমা বন্ধ করতে পারল না—"বা"। সেদিন কালীতলার যে ঝাঁকামাটার ঝাঁকাকে করে ফুলেশ্বরেরা স্কুল থেকে বাড়ী ফিরবেন (কারণ সেখানে একগলা জল) পাইকপাড়ার যে মাছ ধরা হতো আপনা থেকে টাউন যে নৌকা চলতো সেগুলি কি আমাদের মনে আছে? আগেই সি এম ডি এ সাফাই গেয়ে বাখবে বেশী বৃষ্টি হলে জল জমবেই। তবে যতই জল জমুক যেখানে কাজ চলছে সেখানে আগের মত নজরদারী দাঁড়িয়ে না। কথাটা মনে না থাকলে কাগজটা রেখে রাখুন।

কাগজে বের হচ্ছে খবর বিস্তৃতের স্বস্তির নিঃশ্বাস। পাশে-পাশখানা পাকা-রাস্তা চলে আর বিজলী বাতির কল্যাণে রাত্রি আর সে রাত্রি নেই। কিন্তু হবু বাবুদের মন ওঠে না। তাঁদের নাক কুঁচকেই আছে। বড়জোর স্বীকার করবেন যে, এখানে হয়েছে বটে তবে ওখানে হয়নি। সামান্য কিছু হয়েছে বটে কিন্তু সিঙ্গাপুরে বা দেখেছি...।

এই সবজান্তা বাবুদের নিয়েই মুশকিল। বাইরের লোক এসে বলে যাচ্ছেন 'কলকাত্তাকে আর চেনাই যায় না। বেহালা, চেতলা, যাদবপুর, হাওড়া হুগলী বিষ্ণুড়া, বারাসাত, বারুইপুর সর্বত্র খুশীর আমেজ বস্তির লোকেরা বেশী খুশী। কিন্তু কুণ্ঠিতনাসা বাবুরা বলবেন "এ আর এমন কি? আসলে প্রচার বেশী কাজ কম।"

স্বীকার করছি প্রচারটা একটু বেশী। এক তো আমরা চাই বা না চাই লোকের মুখে মুখে সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে। আর প্রচারের প্রয়োজন? নিশ্চয়ই আছে। এখনও অজ্ঞানতার বহর কম নয় জানতেন কি নর্দমা তৈরীর এক হাঙ্গামা? জানতেন কি যে কলকাতা প্রতি বর্ষাতেই ডুববে? আমরাই তো জানিয়ে দিচ্ছি। কারণ আপনার জানা দরকার। দয়া করে জানের খোলাটা ড্রেনের মধ্যে ফেলে "সাহায্য" করবেন না। দয়া করে খোলা ট্যাপে জল যাবেন না। নিজের মাথায় জঞ্জাল ফেলবার জায়গা নেই বলে অন্যের মাথায় ফেলবেন না। আমাদের প্রচারের অপেক্ষা না রেখেই তরুণ সমাজ এবার সাফাই আন্দোলনে নামছেন, ভীড়ের বাসে মায়েদের ও অক্ষমদের 'সীট' ছেড়ে দিচ্ছেন অনেকে। কর্পোরেশনে, সি আই টি রেল বাস, ট্রাম—সকলেই চেষ্টা করছেন কলকাতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

কলকাতার সুনাম যদি সহ্য না করতে পারেন, তাহলে এলোপাথাড়ি ৬ এম ডি এ-কে বা চেয়ারম্যান ভোলানাথ সেনকে গাল দিন বা আরও সহজে একটা নাটক লিখে ফেলুন। বহুতর কলকাতার উন্নতি দেখে বা না দেখে হাঁ-করা মুখ ট্যারা চোখ আর কুঞ্চিত নাসিকা 'ক্যারেকটারের' অভাব হবে না। এটা সি. এম. ডি. এ-র গ্যারান্টি।

কারণ কলকাতার "সবজান্তাদের" অভাব নেই। তাঁরা জল জমলে চেচান আর জল জমা বন্ধ করতে নর্দমা কাটলে চেচান। অবিশ্বাসের বহর এতই বেশী যে বিবাট বিবাট পাইপ বসালেও যে জল সরবে এটা তাঁরা মনে করেন না। 'বাস' নেই, বলেন, আবার পয়সা ভাড়াটা দিতে বা কিউ করতে অনিচ্ছা। তাঁদের মতে রাস্তা চওড়া হচ্ছে গাড়ী-বাবুদের জন্য (বাস, ট্রাম যে রাস্তায় চলে সেটা জলে যায়)। "জলকষ্ট" বলে তাঁরা সমালোচনা করেন তবে রাস্তার আর বাড়ীর কলে যে জল নষ্ট হয়, সেটা তাঁরা দেখতেই পান না। এমন কি বস্তির উন্নয়নেও তাঁদের আপত্তি। একটা গাছ কাটা গেলে এঁরা চোখের জল ফেলেন, কিন্তু যে ৪।৫ হাজার নতুন গাছ লাগানো হয়েছে তাতে এক ফোঁটা জল দেন না।

এদের নিয়েও কলকাতা। কলকাতা বদমায়েস কিন্তু এঁরা?

—দাদা? খোকা বড়ো আছে নাকি? বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে অনুপমার।

—আছেই তো। বেরিয়ে গিয়ে ঘুরে এসে শুয়ে পড়েছে মাথা ধরেছে বলে।..... কই ঠাকুর, দিয়েছো?

শীলার চিত্ত-জগতে একমাত্র সম্মানিত ব্যক্তি দাদা।

গোগ্রাসে ভাত কটা গিলে নিয়ে ছুটে ওপরে গিয়ে ছেলের ঘরে ঢুকে একবার বিছানায় বসে পড়েন অনুপমা। শঙ্কিত স্বরে বলেন—কি হয়েছে রে খোকা? বেরিয়ে আবার ফিরে এসে শুয়েছিস? শরীর খারাপ হয়েছে?

বলা বাহুল্য স্নেহাতুর মাতৃকণ্ঠের এই শঙ্কিত প্রশ্নের কিছু উত্তর তিনি পান না।

অবস্থা নির্ণয়ের প্রথম পর্যায় হিসেবে গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করতে যেতেই—তৎক্ষণাৎ হাতখানা সরিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শোয় খোকা।

অনুপমা এ অপমান গায়ে না মেখে পুনঃ প্রশ্ন করেন—কখন এলি তুই?

খোকা নিরুত্তর।

অতএব নিঃসন্দেহ, তার সম্বন্ধে মা-বাপের মধ্যে যে উচ্চাঙ্গের আলোচনা চলছিল, সে আলোচনা তার কর্ণগোচর হয়েছে। তা হোক, অনুপমা তো হেরে ফিরে যাবেন না, তাই সক্ষোভ বেদনায় বলেন—আজই হঠাৎ শরীর খারাপ করলি? পরশু তোদের রেজাল্ট বার হবার কথা না?

বেরোনো?.....খোকা যেভাবে ভুরু কুঁচকে তাকায়, তাতে আর যাই হোক খোকার প্রকাশ পায় না।—বেরোনো মানে! বেরোচ্ছি কোথায়?

অনুপমা যেন অবোধ, অনুপমা যেন আত্মবিস্মৃত, অনুপমার যেন এখনো শৈশব কাটেনি, তাই প্রায় শিশুসুলভ সরলতাতেই বলে—কেন, তুই যে বলেছিলি মঙ্গলবারই স্টার্ট করবে ওরা?

—ওরা করবে তার আমার কি? ওদের নিজের পয়সা আছে, ওরা যা খুশি করতে পারে।

হঠাৎ আচমকা প্রায় শীলার মতো ভঙ্গীতেই খিল খিল করে হেসে ওঠেন—অনুপমা। বিশ বছর আগে দুধ খেতে নারাজ ছেলেকে যে সুরে কথা বলে করদার আনতেন, প্রায় তেমনি ছেলে-ভোলানো সুরে বলেন,—ওঃ তাই বলো বাবার রাগ হয়েছে। কে বকেছে—কে মেরেছে—কে দিয়েছে গাল? তখন বুঝি ওঁর বাক্যবানগুলি কানে গেছে। (ওঁর কথাই শুধু উল্লেখ করেন অনুপমা, স্বচ্ছন্দেই করেন। নিজের অপরাধবোধের লেশমাত্র ধরা পড়ে না মুখের চেহারায়) তাই ভাবছি—কি হল খোকার! নে নে মন খারাপ করিস নি, টাকা তো আমি দেবো বলেছি।

—তুমি আর কোন আকাশ থেকে টাকা আনবে শুনি? তারানাথ রায়ের টাকাই তো!...সখ করে বেড়াতে যাবার রুচি আমার আর নেই মা একটু ঘুমোতে দাও। বেকারের আবার সখ-সাধ!

অনুপমা যেন তুড়ি দিয়ে ওড়ান ছেলের কথা—ছ্যাঃ বড্ডো তুই বুড়ো হয়েছিস, রেজগারের বয়েস পার হয়ে গেছে একেবারে! তাই বেকার বলে একেবারে দেগে দে নিজেকে। ওঁর কথায় আবার মানুষ রাগ করে! কথার কোন মাথা আছে!...ওঁর কথা ধর্তব্য করতে হলে তো ভাল খেতে নেই, ভাল পরতে নেই, আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ী যেতে নেই, সাধ-আহ্লাদ সব শিকেয় তুলে রেখে খালি টাকা আনা পাইয়ের হিসেব করতে হয়।

—উচিত তাই — খোকা শ্লেষের সুরে বলে—অন্তত যতদিন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি।

—তাই বৈকি—আমি তো আজীবন ওঁর অন্ন ধ্বংসাচ্ছি—করছি যে তাই? ওই সামনা-সামনি দুটো মন রাখা কথা কয়ে যা তা বুঝিয়ে একটু ঠাণ্ডা রাখা—বুঝলি! গোঁয়ার্তুমি করে কাজ পণ্ড করে লাভ? তোর ঠাকুর্দা ছিলেন কী দুর্দান্ত রাগী কিছুতে যদি একবার না বলেছেন তো হ্যাঁ করায় কার সাধ্যি। আমিই শুধু ভুলিয়ে-ভালিয়ে—খোসামোদ করে—

খোকা এইবার উঠে বসে, উষ্মতভাবে বলে—কেন করেছো? অন্যায় করেছো। খোসামোদ করবে কিসের জন্য? বাবাকেও চিরকাল ভয় করে করে আর খোসামোদ করে করে এই অবস্থা! কিন্তু কেন? তোমার নিজের একটা সত্তা নেই? ভালমন্দ বিচার-বিবেচনা নেই? যুক্তিতর্ক নেই?

সূক্ষ্ম একটি একটি হাস্যরেখা ফুটে ওঠে—অনুপমার বাঁকা ঠোঁটের কোণে।

যুক্তিতর্ক? অনুপমার ভিতরে যুক্তি-তর্ক নেই? এত অজস্র আছে যে, তার প্রবল স্রোত সমুদ্রস্রোতের মত ভাসিয়ে দিতে পারে বাপ-ছেলে দুজনকেই। কিন্তু ভাসিয়ে দিলে—চলে কই অনুপমার?... বিচার-বিবেচনা? সেটা যে আছে, তার প্রমাণ দিতে গেলেই তো সংসার করা ঘুচে যেত অনুপমার।

আর সত্তা?

সে বস্তুটাও তো আমসত্ত্বের মত জলে গুলে রোদে শুকিয়ে ভাঁড়ারজাত করা হয়েছে। খোসামোদের বিরুদ্ধে তো এত তড়পানি ছেলের, তাকেই বা এতক্ষণ কি করলেন তিনি মা হয়ে?

কিন্তু এ সবের কিছুটি উচ্চারণ করেন না অনুপমা সূক্ষ্ম হাসির রেখাটা সূক্ষ্মতর হয়ে মিলিয়ে যায়। শুধু ম্লান কণ্ঠে বলেন—কেন নেই, সে আর তুই কি বুঝবি খোকা? লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হলেই কি সব বোঝা যায়? আমার মনে আর দুঃখ দিসনে বাবা, তোর সব বন্ধুরা দিব্যি বেড়াতে যাবে, আর তুই পড়ে থাকবি—এ আমি সইতে পারব না।...উনি না হয় একটু রাগই করবেন।... নিজে কখনো কোথাও যেতে পাইনি, জগতের কিছু কখনো দেখি নি, চিরদিন বন্দী হয়ে থেকেছি তোরা মন খুলে সব করলেও শান্তি আমার।

খোকা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। মনে মনে যেন মায়ের দুই চোখের তারায় পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সেই চির-দিনের ক্ষোভ!...বঞ্চিত জীবনের, বন্দী জীবনের, নিরুপায় জীবনের।

অতঃপর কথার মোড় ঘোরে। চা হাতে করে এসে লীলাও যোগ দেয়। খোকার টাকা হলে মাকে কোন কোন দেশে বেড়াতে নিয়ে যাবে তারই আলোচনা চলে।...খোকার বেটা পছন্দ অনুপমার হয়ত নয়, তাঁর মতে—কত দুঃখে বেরোনো তা মসৌরি কেন? বরং পুরী ভুবনেশ্বর।...শীলার আদর্শ দাদা, অতএব সে মার পছন্দকে উপহাস করে।... খোকা আবার তখুনি মত পাল্টায় — কেন, পুরী ভুবনেশ্বরই কি যা-তা জায়গা? ভারতের স্থাপত্যশিল্পের পৌরাণিক নমুনা। ...মার পছন্দকে বরং তারিফই করতে হয়।

অতএব তাই। তৎক্ষণাৎ শীলার ফটকী শাড়ী কেনা হয়। ক্ষেওরের কাঁসার বাসন। আবার পরবর্তী ট্রিপটা সম্বন্ধে গবেষণা চলে।...

শরৎ অমৃত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সচিত্র অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক সুভাষচন্দ্র—অন্নদাশঙ্কর রায়—১০৲ মহাজীবন—অন্নদাশঙ্কর রায়—২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯
ফোন: ৩৪-৩৬

দেড়টা বেলা গড়িয়ে সাড়ে চারটেয় ঠেকে। হঠাৎ যেন দরজার কাছে বোমা ফাটে।

—বলি, আজ কি আর চা-টা হবে না?

শিহরিত অনুপমা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখেন—চারটে চল্লিশ!...সর্বনাশ। ঠিক চারটে বেলা হচ্ছে—তারানাথের 'টী টাইম'। সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই যে তারানাথের হার্টের ট্রাবল বাড়ে।

আচমকা এই প্রশ্ন—বোমাঘাতে নিজের হার্টের অবস্থা যাই হোক, মুখের চেহারাটা ঠিকই রাখেন অনুপমা। সহজ আফশোসের সুরে বলেন—ওমা এত বেলা হয়ে গেছে। দেখ কাণ্ড! শীলা তুইও তো আচ্ছা মেয়ে?...মেধোরই বা কী আক্কেল! বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে হয়ত।

—সত্যি — স্বরমাধুর্য যতট তিক্ততা ঢালা সম্ভব তা ঢেলে তারানাথ মন্তব্য করেন—মাইনে-করা চাকর-বাকরের আক্কেলটাই বেশী হওয়া উচিত বটে!

স্বামীর কথার উত্তরে—জিভের আগায় কোন কথাটা আসছিল অনুপমার?

বিনি মাইনের চাকরাণীর উচিত বোধের প্রশ্ন?

কি জানি। আসে না তো, কাজেই বোঝা যায় না। শুধু স্বাভাবিক খেদের সুরই ধ্বনিত হয় তাঁর কণ্ঠে—এই দেখ না, ছেলেটা আবার শরীর খারাপ বলে এসে শুয়েছে কে জানে জ্বরজ্বারি হবে কিনা। যে দিনকাল।

পরবর্তী সীন—দিনে নয়, রাত্রে।

এ ঘরে নয়, ও ঘরে।...ঘরের দরজায় খিল লাগানোর পর টাইকো সোডা ট্যাবলেট দুটো আর জলের গ্লাসটা কর্তার হাতে তুলে দিয়ে পানের ডিবেটা নিয়ে বিছানার ওপর গুছিয়ে বসেন অনুপমা।...পান মজুতের বহুবিধ উপকরণপূর্ণ কৌটোটি খুলে একটি মুখে ফেলে বলেন—বুকের কষ্টটা বেশী হচ্ছে না তো? তোমার তো আবার সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলেই—কি? তকাতো নেই কেন? রাগ হয়েছে বুঝি? না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। ছেলেমানুষের মত রাগ অভিমানটা ঠিক আছে এখনো।...ছেলেটাও হয়েছেন তেমনি। বাপের আর কোন গুণ না পান রাগ গুণটি পেয়েছেন ষোল-আনা। তখন তোমায় বললাম—খোকার শরীর খারাপ হয়েছে?... শরীর নয় মোটেই, মেজাজ। ওই যে বন্ধুদের সব গোছগাছ হয়ে যাচ্ছে, তাই মেজাজ খাপপা। রেগেটেগে হুকুম দিয়ে দিয়েছি আমি যেতে।...শেষটায় মন গুজরে থেকে সত্যি যোগ করবে? সুধীর শ্যামল সবাই যাচ্ছে যখন, যাকগে একবার। দিল্লী গিয়ে কী চারখানা হাতে বেরোয় দেখি। হ্যাঁ একটা চাকরী জোগাড় করে আসতে পারে—তবে বলি বুদ্ধি। শ্যামলের মামা না যেন খুব বড় চাকরে ওখানকার? আচ্ছা হ্যাঁগো—তোমাদের সুবোধবাবুও না দিল্লীতে বদলী হয়েছেন আজকাল?

—হয়েছে তার কি—তারানাথ বিদ্রূপ হাস্যে বলেন—তোমার ছেলে গিয়ে দাঁড়ালেই একটা চেয়ার এগিয়ে দেব?

—যাঃও—হেসে ফেলেন অনুপমা। হাসিটা —দশ-বিশ বছর আগের টাইপের। হেসে বালিসের ওপর এলিয়ে পড়ে বলেন—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। সারো দিকিন একটু, শুই ভাল করে।...ওই যাঃ মশারিটা টাঙ্গাবো ভাবলাম যে রেসো টাঙ্গিয়ে দিই।...

—আর থাক—অনুপমার সদ্য বালিসে ফেলা মাথাটার ওপর হাতের একটু চাপ দিয়ে তারানাথ বলে ওঠেন—হয়েছে খুব হয়েছে, উঠতে হবে না। আজ হঠাৎ এত কর্তব্য জ্ঞানের উদয় কেন?

—না না, তোমার শরীরটা আজ ভাল নেই—বলে ব্যস্তভাবে উঠে বসেন অনুপমা। ততক্ষণে অবশ্য তারানাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন। গোঁফের ফাঁকে মুচকে একটু হেসে বলেন—আচ্ছা খুব পতিভক্তি হয়েছে। এই সাতাশ বছরের মধ্যে কদিন মশারি টাঙ্গিয়েছ?

অম্বলের রোগী তারানাথের সহজে ঘুম আসে না, সুদীর্ঘ দিনের কর্মক্লান্ত আর অভিনয়শ্রান্ত অনুপমা ঘুমিয়ে পড়েন মুহূর্তেই ... হয়ত — অভিনয়টা নিখুঁত উৎরেছে বলেই এত স্বস্তি।...

অভিনয়?

তাছাড়া আর কি? সুন্দর নিখুঁত অভিনয়। এত নিখুঁত যে, অভিনয় বলে বোঝা অসম্ভব। বোঝা অসম্ভব কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা কৃত্রিম।

কিন্তু একা অনুপমাই বা কেন? নারী-মাত্রেই কি অভিনেত্রী নয়? অভিনয় ক্ষমতাই তো তার জীবনে মূলধন। জন্মগত সেই মূলধনটুকু সম্বল করেই তো তার যত কিছু কাজ-কারবার।

সে মূলধন যার যত বেশী, তারই তো সংসারে তত বেশী প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি, সুনাম, সুখ্যাতি।

নদীর মতো আপন বেগে প্রবাহিত হতে চাইলে চলবে কেন তার?...একদিক ভরাট করে তুলতে—অপরদিকে ভাঙ্গন ধরবার মতো বোকামি তার নেই। দুই কূল সযত্নে রক্ষা করে চলতে হয় তাকে। রক্ষা করতে হয় সংসার, রক্ষা করতে হয় দাঁড়াবার ঠাঁই।

অনাদরকে তার বড় ভয়, বড় ভয় অবহেলাকে।

না কি এ তথ্যের সবটাই ভুল?

কোনোটাই তার অভিনয় নয়? চিরন্তনী নারীপ্রকৃতির মধ্যে পাশাপাশি বাস করছে সম্পূর্ণ আলাদা দুটি সত্তা, জননী আর প্রিয়া। নিজের ক্ষেত্রে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মমতাময়ী নারী তার এই বিভিন্ন দুটি সত্তার বিপুল পক্ষপুটের আড়ালে সযত্নে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে চিরশিশু অবোধ পুরুষ জাতিকে।

ছলনাটা তার ছলনা নয়, করুণা!

এই করুণার আওতা ছাড়িয়ে ছলনা-লেশহীন উন্মুক্ত পৃথিবীতে বে-পরোয়া শিশু-ভোলানাথের দলকে যদি মুখোমুখি দাঁড়াতে হত — কদিন লাগত পৃথিবীটা ধ্বংস হতে?

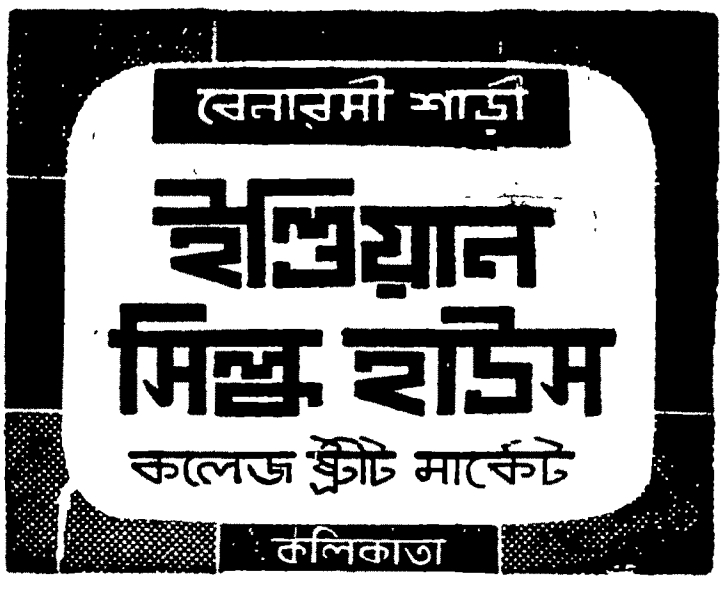

কথায় কথায়

বোকার মা

রেল-ক্রসিংয়ের একটু দূরে রাস্তার মোড়ে দুই বন্ধুর দেখা হয়েছে।

প্রথম বন্ধু—বেলে একটা লোক কাটা পড়েছে দেখেছো?

দ্বিতীয় বন্ধু—না তো, আমি একটু আগে ওদিকের থেকে এলাম, তখন কিছু দেখলাম না। একটা গাড়ি অসাছিলো বটে সেই সময়।

প্রথম বন্ধু—সেই সময়েই কাটা পড়েছে, তাড়াতাড়ি করে আসতে গিয়ে মরা গেল লোকটা।

দ্বিতীয় বন্ধু—আমিও তো তাড়াতাড়ি করেই একেবারে ছুটে এলাম। লোকটা কেমন দেখতে?

প্রথম বন্ধু—তোমার মতই দোহারা চেহারা, লম্বাও তোমার মতই হবে।

দ্বিতীয় বন্ধু—(উত্তেজিত ভাবে) সর্বনাশ গায়ের রং কি রকম?

প্রথম বন্ধু—ভালো করে খেয়াল করিনি, তবে মনে হয় খুব ফর্সা নয়, অনেকটা তোমার মতই হবে।

দ্বিতীয় বন্ধু—(আরো উত্তেজিত) লোকটার পরনে কি দেখলে?

প্রথম বন্ধু—তোমার মতই সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি।

দ্বিতীয় বন্ধু—(গলার স্বর প্রায় জড়িয়ে গেছে) তা হলে?

প্রথম বন্ধু—তা হলে আর কি? লোকটা তুমি নও, তার পায়ে রয়েছে স্যান্ডেল আর তোমার পায়ে দেখছি কাবুলি চপ্পল।

দ্বিতীয় বন্ধু—(পকেটের রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছে) বাঁচালে এই কথাটা আগে বলতে হয়। যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

উপরের এই কাহিনীটি অবশ্যই বাজে এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু আমরা কি প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই রকম অনাবশ্যক উৎকণ্ঠার সম্মুখীন হই না? অনেক দিন আগে কোথায় যেন এক বোকার মায়ের গল্প পড়েছিলাম। বেকার মা সন্তানহীনা। কিন্তু তার স্বসময়েই দুশ্চিন্তা যদি তার ছেলে থাকতো, যদি সেই ছেলে বোকা হতো তা হলে কি সব সাংঘাতিক বিপদ হতে পারতো। চূড়ান্ত বিপর্যয় দেখা দিয়েছিলো এক চাঁদনী সন্ধ্যাবেলায় যখন বোকার মা তার বাড়ির দাওয়ায় পা ছড়িয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছিলো, কাঁদার কারণ ছিলো অনেকটা এই রকম। যদি সত্যি সত্যি বোকা থাকতো যদি বেকা বিকেলে ফুটবল খেলতে যেতো যদি সন্ধ্যাবেলা সেই সময়ে খেলে ফিরতো আর যদি কালবৈশাখীর ঝড় উঠতো, যদি দাওয়ায় একটা বড় আমগাছ থাকতো যদি ঝড়ে সেই আমগাছ উল্টে পড়ে যেতো আর বোকা যদি সেই গাছে চাঁপা পড়তো তাহলে কি সর্বনাশ হতো। কোথায় বা আমগাছ কোথায় বা ঝড়, কোথায় বা বোকা। বেকজননীর করুণ ক্রন্দনে সেই জ্যোৎস্নাময় সন্ধ্যাবেলা শ্লারিত হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিবেশীরা যারা বুদ্ধি করে এই সন্তানহীনাকে বোকার মা নামকরণ করেছিলে তারা সেই সন্ধ্যায় প্রথমে হতভম্ব পরে কৌতূকান্বিত এবং সর্বশেষে অতি বিরক্ত হয়েছিলো।

আমাদের সমস্ত বা অধিকাংশ দুশ্চিন্তাই এত অমূলক এমন কথা বলা চলবে না। কিন্তু যাঁরা রাত দুপুরে সাইকেলের ঘন্টি শুনলেই ভাবেন কোনো অনিবার্য দুঃসংবাদ নিয়ে টেলিগ্রাম এসেছে কিংবা বাড়ির উল্টো দিকের ফুটপাথে কোনো অচেনা লোক দাঁড়িয়ে থাকলেই আশঙ্কিত বোধ করেন যে লোকটা তাঁকে খুন করার জন্যেই অপেক্ষা করছে তাঁদের অবস্থাও আমাদের প্রথম কাহিনীর দ্বিতীয় বন্ধু এবং দ্বিতীয় কাহিনীর বোকার মার চেয়ে কোনো অংশে ভালো নয়।

এমন লোকের সংখ্যা কম নয় যাঁদের দৈনিক সকালে একবার ক্যান্সার হয়, বিকেলে হার্ট অ্যাটাক। বুকে হাত চেপে পা টিপে টিপে বাড়ি ফিরে আসেন, এই যায় কি সেই যায়। পরের দিন সকালেই দুবার কাশবার পর তিনি নিশ্চিত হয়ে যান যে তাঁর টি বি হয়েছে এবং আবার রাত দুপুরে

আলো জ্বালিয়ে বসে কম্পিত বক্ষে নিজের ডানহাত দিয়ে বাঁ হাতের কব্জি ধরে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা গুণে নিজের নাড়ির গতি দেখেন। যে কোনো খাবারেই তাঁর ফুড পয়জন হতে পারে, যে কোনো যানবাহনে দুর্ঘটনা। প্রত্যেকটি লাশের বর্ণনার সঙ্গে তিনি নিজেকে মিলিয়ে দেখবেন সত্যি সত্যি বেঁচে আছেন কি না। কে তাঁকে প্রশ্ন করবে এত উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবনে বেঁচে থাকা আর না থাকার বিশেষ কোনো তফাৎ আছে কি?

সম্ভবত, নেই।

তারাপদ রায়

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

স্নেহাকর ভট্টাচার্য
পাবলিক রিলেশন অফিসার

ব্যাঙ্কিং ব্যবসা আজ থেকে দশ বছর আগেও যে পর্যায়ে ছিল আজ তা আরো সুদূর প্রসারিত। অর্থাৎ, সাম্প্রতিক-কালে ব্যাঙ্কের কার্যধারা আরো ব্যাপক-ভাবে এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও জনজীবনকে স্পর্শ করেছে। বিশেষ করে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ব্যাঙ্কের সুযোগ-সুবিধা এবং সাহায্য পেয়ে আজ ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলের একজন চাষী কিংবা ছোটো ব্যবসায়ীও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। আমাদের জাতীয় অর্থ-নীতিকে আরো সতেজ করে তোলার দায়িত্বে এবং কর্তব্যে যে কটি ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া অন্যতম।

ব্যাঙ্কের কার্যধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটছে তার প্রচারের পদ্ধতিরও। সে প্রসঙ্গেই ইউ বি আইয়ের আকাশ-ছোঁয়া হেড অফিসের ছ তলায় বসে কথা বলছিলাম ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন এবং প্রচার বিভাগের ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীস্নেহাকর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। বয়সে চল্লিশ—ছোঁয়া শ্রীভট্টাচার্য প্রশস্ত টেবিলের উপর চশমাটা রেখে বললেন—দেখুন আজ থেকে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত খবরের কাগজের পাতায় ব্যাঙ্কের প্রফিট অ্যান্ড লস দেখিয়ে দেওয়াটাই ছিল ব্যাঙ্কের পাবলি-সিটি। কিন্তু এখন বিশেষ করে জাতীয়করণের পর প্রচারের ধারাটা ক্রমে ক্রমে পাল্টাচ্ছে। যেমন ধরুন আগে আমাদের গ্রামাঞ্চলের মানুষ সম্বন্ধে যতটা ভাবতে হোতো এখন তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবতে হচ্ছে। গ্রামের দিকে আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা-প্রশাখাও অনেক বেশি হারে খোলা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অল্পশিক্ষিত এবং নিরক্ষর মানুষগুলোকে ব্যাঙ্কের কার্যধারা ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে তোলার জন্য আমাদের প্রচারের ধারা সম্পর্কেও নতুন-ভাবে ভাবতে হচ্ছে।

—সে তো নিশ্চয়ই। কারণ, শহর বা শহরাঞ্চলের লোকদের মধ্যে প্রচারের জন্য আপনার প্রচার পদ্ধতিটা যতখানি ইনটেলেকচুয়াল স্তরের হবে গ্রামের মানুষদের জন্য বিজ্ঞাপনের ভাষা সেরকম না করে সহজ করতে পারলে...।

আমার মুখের কথাটা প্রায় কেড়ে নিয়েই স্নেহাকরবাবু বললেন—খুবই ঠিক কথা। এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ-গুলোর মধ্যে প্রচার চালানো যে কতখানি ডিফিকাল্ট টাস্ক সেটা বাস্তবক্ষেত্রে না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না।

—গ্রামে প্রচার চালানোর জন্য কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করেন?

—যেমন ধরুন—(১) মফস্বলের সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন যেটা সম্প্রতি আমরা ব্যাপকহারে চালু করেছি। (২) হোর্ডিং। এর ভাষাও খুব সহজ করি—যাতে গ্রামের মানুষ আমাদের ব্যাঙ্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়। যথা—টাকা ব্যাঙ্কে রাখুন। টাকা নিরাপদে থাকে, ভালো সুদ আর সুবিধেমতো তোলাও যায়। (৩) সিনেমা—স্লাইড এবং ডকুমেন্টারী ফিল্ম। (৪) রেডিও এবং (৫) ডাইরেক্ট ক্যামপেন। এই জিনিসটা আপনাকে একটু বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার।

তৎক্ষণে চা এসে গেছে। চশমাটা পরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে শ্রীভট্টাচার্য আবার বলতে শুরু করলেন—ডাইরেক্ট ক্যামপেন অর্থাৎ ব্যাপারটাকে সরল করলে দাঁড়ায় সরাসরি মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিজেদের স্থানে গিয়ে গ্রামের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে প্রচার চালাতে হয়। এর জন্য আমরা গ্রুপ ডিসকাশন মিটিং এবং নৃত্যনাট্য, ট্যাবলো, প্রদর্শনী এই সব উপায়ে কাজ করি। এর জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয়। যেমন ধরুন—মেদিনীপুর জেলার চার-পাঁচটা গ্রামকে কেন্দ্র করে আমরা হয়ত কোনো প্রচার চালাবো বলে স্থির করলাম। তার আগে আমরা সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সমীক্ষা চালাই। তাদের ভাষা ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে আমরা প্রচারের পদ্ধতিটা ঠিক করি। খোঁজ নিই স্থানে কোন দিন হাট বসে বা বছরের কোন কোন সময় মেলা বসে বা উৎসব হয়। কারণ এই সব অকেশনগুলোতেই আমরা বেশি লোককে একসঙ্গে পাব। সেই দিনগুলোতে হাটে বা মেলায় আমরা প্রচার চালাই।

—গ্রামাঞ্চলে এই সব প্রচারের ফলা-ফল সম্পর্কে কোনো সমীক্ষা নিয়েছেন কি?

—হ্যাঁ আমরা আমাদের গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শাখার মারফৎ সার্ভে করে-ছিলাম। তাতে দেখেছি আগে যা আমাদের ডিপোজিট ছিল প্রচার অভিযান চালানোর পর ডিপোজিট মবিলাইজেশন অনেক বেড়েছে। এর থেকেই আমরা প্রচারের ফলটা বুঝতে পেরেছি।

—এই ধরণের প্রচার চালাতে গিয়ে অনেক মজার মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে কখনও? আমি প্রশ্ন করি।

বেশ জোরে হেসে উঠলেন স্নেহাকর-বাবু। হাসতে হাসতেই বললেন—নিশ্চয়ই। দারুণ সব মজার অভিজ্ঞতা। যেমন ধরুন—বাঁকুড়ার কথা। বাঁকুড়ায় আমাদের ব্যাঙ্কের শাখার উদ্বোধন হবে। গামছা পরা এক গরীব চাষী এসে বললেন—বাবু ব্যাঙ্ক তো বড় বড় চাষী জোতদার-দের। আমাদের টাকা কি ব্যাঙ্কে রাখা

যাবে? তিনি কিছুতেই টাকা রাখবেন না। তাঁর সঙ্কোচ ঐ একটাই, গামছা পরে বোধহয় ব্যাঙ্কে ঢোকা যাবে না। অবশেষে তাঁকে বোঝানো হলো এবং সর্বপ্রথম তাঁর এ্যাকাউন্ট খুলিয়েই সেই শাখার উদ্বোধন হলো। মেদিনীপুরের একজন চাষী বিশ্বাসই করতে চান না যে ব্যাঙ্ক থেকে সুবিধেমতো টাকা তোলা যায়। নিরক্ষর হলেও বুদ্ধিবাদী মন নিয়ে এই জিনিসটাকে পরীক্ষা করার জন্য তিনি কি করলেন জানেন? সকাল দশটায় ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলে বেলা একটায় সব টাকা তুলে নিলেন।

একটানা কথাগুলো বলে একটু থেমে সিগারেট ধরিয়ে ঠিক সেইভাবেই হাসতে হাসতে শুরু করলেন—আমাদের কিন্তু ঢ্যাড়া পিটিয়ে পিটিয়ে সভার আয়োজনও করতে হয়। যেখানে টুকরো টুকরোভাবে গ্রুপ ডিসকাশন সম্ভব নয় সেখানে এরকম পুস্তিকাও চলে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সংগঠনের মতো আমাদেরও এইসব মিটিংয়ে মঞ্চ থেকে বন্ধুগণ বলে হাঁক ছাড়তে হয়। পুরুলিয়াতেই এ জিনিস আমাদের করতে হয়েছে।

—গ্রামাঞ্চলে আপনাদের বিজ্ঞাপনের মূলে লক্ষ্য কি—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভট্টাচার্য জানালেন—(১) গ্রামে ঋণদান বাড়ানো। (২) গ্রামাঞ্চলের লোককে ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাদান এবং (৩) আমাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভাগ্রহ বাড়ানো।

—প্রতি বছর বিজ্ঞাপন এবং প্রচার খাতে মোটামুটিভাবে আপনাদের কত টাকা বরাদ্দ থাকে?

—সেটা বলায় আমার অসুবিধা আছে, তবে অন্যান্য ব্যাঙ্কের তুলনায় কম এবং বাজেটের বেশিরভাগ গ্রামাঞ্চলেই খরচ হয়।

—প্রচারের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

—আপনাদের শুভেচ্ছায় কোনো বিশেষ সমস্যা এখনও পর্যন্ত আসেনি। সব জায়গা থেকেই সহযোগিতা পেয়েছি। আভ্যন্তরীণ কোনো সমস্যাও নেই।

—অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কিং শিল্পের প্রচার পদ্ধতির তুলনায় আমাদের দেশের মাধ্যম কি অবস্থায় আছে?

—তুলনা কথাটা বোধহয় ঠিক হবে না। আমাদের যেরকম সামাজিক দায়-দায়িত্ব আছে ওদেশে ততটা নয়। আমি এমনও দেখেছি বিদেশে এক ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন পঞ্চাশ বছর ধরে একই রয়েছে। কিন্তু আমাদের? জাতীয় জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে নিত্য নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে।

এবার আমরা শহরের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গ এলাম। সরাসরি প্রশ্ন করলাম স্নেহ করা-বাবুকে—'ক্যালকাটা ইজ ইউ বি আই সিটি।' এই বিজ্ঞাপন আপনারা দিয়েছেন। 'ক্যালকাটা ইজ ফর এভর। কীপ ক্যালকাটা ক্লিন।' এইসব বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কি লাভ? এগুলোর কি অর্থ?

আমার চোখে চোখ রেখে শ্রীভট্টাচার্য বললেন—খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আপনার বোধহয় মনে আছে কয়েক বছর আগে কলকাতার খুব দুঃসময় চলছিল। ভয়ে আতংকে সবাই ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছিলেন কেউ কোনো নতুন ব্যবসা শিল্প খুলতে চাইছিলেন এ শহরে। এমনকি বিদেশের পত্র-পত্রিকাতেও কলকাতাকে নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছিল। সেই সময় কলকাতার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর টানের সম্পর্কের কথা স্মরণ করে ঐ বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। এ শহর আমাদের। এ শহরকে বাঁচানোর জাতীয় দায়িত্ব আমাদের। সেই কথা ভেবেই ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমস্ত রকম ভীতি দূর করার জন্য বিদেশীদের মনে যদি কোনো কলঙ্কের ছাপ লেগে থাকে কলকাতা সম্পর্কে তবে সেই ছাপ মুছে ফেলার জন্য আমরা সেই সময়ে সামাজিক দায়-দায়িত্বের কথা ভেবে তাঁদের কাছে কলকাতার গ্যারান্টার হয়েছিলাম বলতে পারেন। কলকাতাকে আমরা ভালোবাসি। তারই প্রকাশ নানা বিজ্ঞাপনে।

কলকাতার উপর ইউ বি আইয়ের এইসব বিজ্ঞাপন সম্পর্কে দেশে বিদেশের পত্র-পত্রিকার নানা প্রশস্তিমূলক মন্তব্য দেখলাম। সেই সময়ে এই সব বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেই বিদেশীরা কলকাতা সম্পর্কে নতুন করে আশার আলো দেখেছিলেন। সেই পরিচয়ও দেখলাম।

—শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দিক নয় আমাদের জাতীয় জীবনে একটা দায়িত্ব এবং কর্তব্যও আছে। সেই পরিচয়ই আপনি আমাদের বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে খুঁজে পাবেন। শ্রীভট্টাচার্য কথা শেষ করলেন।

আনন্দ রায়

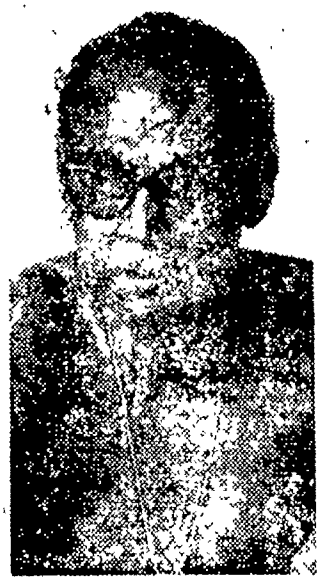

নীরদ মজুমদার

একালের চিত্রশিল্পী

যেন এক চলচ্চিত্র। দেওয়ালে টাঙানো সারে সারে চিত্র-বিচিত্র। অসংখ্য দেবদেবীর চিত্র। শুদ্ধ রং। শুদ্ধ অবয়ব। সেই মুহূর্তে আমি বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম এক পবিত্র ও বিশুদ্ধ আকৃতির মধ্যে। সে সব চিত্রের ফুল পাখি, লতা, পাতা দেব, দেবীর বং ও রেখায় এক নতুন রূপে। এক নতুন আবেশ। যা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলকে উদ্বেলিত করে তোলে এক মহা-জাগতিক আকর্ষণে। মনে পড়ল কবিগুরুর কনসানিং দি ফিগুরেটিভ আর্ট গ্রন্থের কথা। সেখানে তিনি বলেছেন—মহান শিল্পের প্রসঙ্গের কথা এবং কেমন করে সেই এক-আকার রূপ হতে রূপের জন্ম। শিল্পী নীরদ মজুমদারের স্টুডিওতে বসে এমনই অনেক মহাজাগতিক বাণীর প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম যেন বুকের ভেতরে।

একটি প্যানভাস স্ট্যান্ডে আটা। মাঝে তাতে অঙ্কনরত ষোড়শীকন্যা চিত্রমালার একটি। এই চিত্রমালায় তিনি ত্রিনয়নী মায়ের নানান রূপকে নবরসে নতুন সম্ভার দান লাবণ্যময় করে চিত্রিত করছেন একের পর এক।

নীরদদার জগৎ তন্ত্রময়। তিনি বিশ্বাস করেন সমস্ত জাগতিক বিষয়বস্তুতেই নিহিত রয়েছে মহাজাগতিক ক্রিয়াকলাপ। তাই তাঁর চিত্রকর্মে স্থান পেয়েছে কথাসরিৎসাগর, চন্দ্রকলাবিদ্যা, বেহুলা লখীন্দরের উপাখ্যান, তাদের তত্ত্ব, কালী, ত্রিলোক (কসমিক মাদার) ইন্দ্রাণী নিতম্বিনী দেবাদিদেব মহাদেব অলক্ষ্মী প্রভৃতি।

আবার কোন কোনটিকে বিষয়অনুযায়ী সংলাপ বা মন্ত্র শব্দের ভাষায় উৎকীর্ণ করে শিল্পী আত্মোপলব্ধিকে অনেক বেশী জোরালো ও রসাশ্রিত করে মেলে ধরেছেন রসিকের সামনে। একটি দৃষ্টান্তে আরও স্পষ্ট করে বলি। মহাভারতের কাহিনী আশ্রিত পাণ্ডুর মৃত্যু ছবিটিতে শিল্পী চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে লিখে-ছেন—আমি তোমার প্রদত্ত পৃথিবী তোমাকে পুনর্বার পুনরায় ইহা তোমাকে প্রদান করি-তেছি। কিংবা নৃত্যকলা চিত্রমালার একটিতে —হর হর বোম বোম শব্দগুলি গোলাকৃতি মালার মত প্রদক্ষিণ করেছে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত।

শিল্পী মন্ত্র-তন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মন্ত্র-তন্ত্রই সব কিছুর বীজ। তন্ত্রসাধনা ও শক্তিসাধনা করেছেন এক সময়ে। সাধনার নিয়ম-কানুন আচার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ছবি এঁকেছেন কত ভাবে কত রূপে। এক অদৃশ্য মহাশক্তির মহালীলায় এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলমান। তার অস্তিত্ব বিন্দুর মত স্থির গতিহীন, যা নড়ে না। কিন্তু সবকিছুকে গতিশীল করে। এই প্রত্যয়ের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে নীরদদার ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তা, বস্তুত তাঁর চিত্রেও এই উপ-লব্ধির উদ্বোধন ঘটছে। একটি স্থির বিন্দু বা ডট তাঁর চিত্রের প্রধান অঙ্গ। আর এই ডটকে কেন্দ্র করে ক্রিভিয় রেখা জ্যামিতিক গঠনভঙ্গীতে প্রদক্ষিণ করতে করতে আবর্তিত হয়েছে একের পর এক চিত্রকর্মে। যেমন বেহুলা সিরিজের ২৯টি চিত্র মূলতঃ গড়ে উঠেছে একটি স্থিরবিন্দুকে একের পর এক বেষ্টন করে।

নীরদদার ছবিতে এই মেটাফিজিক্যাল ও বিচ্যুয়াল এপ্রোচ আজ নতুন নয়। এই প্রবণতা আকস্মিকভাবেও আসেনি। এর পেছনে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। প্রত্যেক শিল্পীর জীবনেই নানান ঘটনা ঘটে থাকে। এবং পরে সেই অভিজ্ঞতার বা অনুভূতির ছায়াপাত হয় চিত্র-ফলকে। এখন পেছনে ফেলে আসা নীরদদার শিল্পীজীবনের সেই রকম ঘটনাবহুল কতিপয় চিত্র অঙ্কন করার চেষ্টা করছি। যার আলোকে শিল্পী

ও তাঁর শিল্পকলাকে বুঝতে অনেকখানি সহজ হবে।

নীরদদার জন্ম ১৩-র পল্লীর ১৩ নম্বর রমমন্যান স্ট্রীটে, ১১ মে, ১৯১৬ সালে। জন্ম থেকেই রুগ্ন। ছেলেবেলা কেটেছে অসহ্য বিসুখ যন্ত্রণা ও অস্বস্তির মধ্যে। মা রুগ্ন ছেলেকে বুকে নিয়ে প্রায়ই অশ্রু বিসর্জন করতেন। প্রত্যুষে ছেলের কল্যাণ কামনায় তিনি গাইতেন—প্রভুমীশ মনীশ-মহেশ গুণেশ, কিংবা দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে, অথবা দশ অবতার রূপের স্তোত্র। পিতা প্রফুল্ল মজুমদার ছিলেন সামান্য বেতনের পুলিশ অফিসার। প্রফুল্ল-বাবুর বন্ধু ছিলেন ডঃ বিধানচন্দ্র রায়। শেষ পর্যন্ত রুগ্ন ছেলেকে তিনি নিয়ে গেলেন বিধানবাবুর কাছে। পরীক্ষা করে বিধানবাবু বললেন—এ ছেলেকে বাঁচাতে হলে লিচুমারে ঘোরানো ও প্রচুর খাওয়ানো-দাওয়ানো দরকার। আর একটি ইমালশনের নাম লিখে দিয়ে বললেন—যতদিন পারো এটা খাইয়ে যাও। রুগ্ন ছেলে সেই ইমালশন খেয়েছিল একনাগাড়ে ত্রিশ বছর।

ধার্মিক ঠাকুমা যোগমায়া হাড় জির-জিরে ছেলেকে টেনে নিয়ে গিয়ে বাবুঘাটে ডুব দিইয়ে কোমর জলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলতেন—সূর্যের দিকে মুখ করে হাত জোড় করে বল—জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্ ইত্যাদি। মন্ত্রোচ্চারণের শেষে ধূমমান নৌকা, জাহাজ ছাড়ার সংকেত-ধ্বনি, অরুণ সূর্যের স্বর্ণাঞ্জলির স্পর্শ শিশুর মনে শিহরণ সৃষ্টি করত। ফেরার পথে তৃষিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতেন নীরদ চলমান যানবাহন গ্যাসলাইট জান-বাজারের ফিরিওয়ালা মশলা ও পেস্ট্রি রসুনের দোকানের দিকে। এ সব চিত্র যেন রঙীন রাজ্যের টুকরো টুকরো রূপকথার মত ঠেকত তাঁর কাছে।

ছেলেবেলায় প্রথম কালী দর্শনের বিমুগ্ধ স্মৃতি এখনও নীরদদার মনে অমর হয়ে আছে। ভয়, ভাবনা, ভালোবাসায় নয় বিস্ময়ে। এক অবর্ণনীয় হতবাক বিস্ময়ে। প্রথম দর্শনেই কালীমূর্তির রূপ মনের ক্যানভাসে স্থায়ী হয়ে বাসা বেঁধেছিল। সেই আট ন বছর বয়েসেই বাড়ী ফিরে এসে মা কালীর ছবি এঁকেছিলেন। গঙ্গাস্নান সেরে ঠাকুমা সে কালীমূর্তি দেখে স্তম্ভিত। সেই প্রতিকৃতিকে সযত্নে স্থাপন করলেন ঠাকুর ঘরে। রুগ্ন শিশুকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দিলেন পুজোর সব উপাচার। পরে নীরদদা শিশু অবস্থাতেই বাড়ীতে পুরোহিত সেজে পুজো করেছেন অনেকবার।

রানী রাসমণির বাড়ীতে প্রতিমা পুজো, বলিদান, গান-বাজনার আসর, বিসর্জনের দৃশ্য মনের মধ্যে দারুণ রাসায়নিক ক্রিয়া করত। যার রেশ এখনও সজীব হয়ে আছে নীরদদার চেতনায়। ঘোড়ার গাড়ীতে ভাসান যাত্রার স্মৃতি এখনও একটা ফেরার আকুলতায় তাঁর হৃদয়কে চঞ্চল করে তোলে।

জোড়াসাঁকো, ভবানীপুর, বালীগঞ্জের টুকরো টুকরো চিত্র এখনও মনে ছায়া ফেলে। আমতা লাইনে বিষ্টুপুরে খৃস্টান স্কুলে বাইবেল পড়তে হত নিয়মিত। কিন্তু ঐ পরিবেশেও তিনি প্রাত্যহিক ভাগবত পাঠ করতেন। নীরদার বাড়ী দেওঘর থেকে পঁচ মাইল দূরে রিখিয়ায়। সেখানে হলদে গাছ-পাথর, সূর্যাস্তের ঘনঘটা, আকাশে রঙের খেলা, লাল মাটি, পাথরের পাহাড়, বকের সারি, ক্ষেত-খামার দেখে রিখিয়াকে তিনি ভালবেসে ফেলেছিলেন। আজও প্রেয়সীর মতই ভালোবাসেন। বছরে দু-চার বার রিখিয়ায় না গেলে আজও নীরদদার কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

১৯২৯ সালে শিল্পীর জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে যায়। থাকেন ভবানী-পুরে। একদিন দাদা এসে বললেন—একটা খুব ভাল প্রদর্শনী হচ্ছে। তুই গিয়ে দেখে আয়। প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন ইণ্ডি-য়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস, সমবায় ম্যানসনে। পরের দিন দুপুরবেলায় শিল্পী খুঁজে-পেতে গিয়ে হাজির হলেন প্রদর্শনীতে। রাজপুত পেটিং-এর প্রদর্শনী। এর আগে তিনি হেমেন মজুমদার, ভবানী-চরণ লাহা প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীদের কাজ দেখেছেন। বাংলা মেয়েদের নিতম্ব সতন ভিজে কাপড়ের মধ্যে পরিস্ফুট অবস্থায় দেখেছেন তিনি। এবং ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকে ইংরাজ হলমেন হান্ট ইত্যাদিও দেখেছেন। কিন্তু সব দেখাই বানচাল হয়ে গেল যেদিন প্রথম রাজপুত চিত্র দর্শন করলেন। রাজপুত চিত্রে নীল আকাশ বা স্লেট রঙের আকাশে বিদ্যুৎ ঝিলিক বা বলাকার উড়ন্ত সংগঠন নীল রঙের মানুষ যিনি আমাদের কৃষ্ণ গৌর-কান্তি রাধিকা গাছ পাতা প্রভৃতি নিখুঁত স্পষ্ট। সব কিছুই যেন দূরবীন যন্ত্রে দেখা। পাতার শিরা উপশিরা পাখির প্রতিটি রোঁয়া পরিপ্রেক্ষণ গৃহিত দেওয়াল জানালা দরজা পুকুর হাঁস নদী শিল্পীকে বিস্ময়ে অভিভূত করেছিল। কি অপরূপ রং রেখা ও কবিতার সৃষ্টি হয়েছে চিত্র-ফলকে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি ভাবে সম্ভব হয়েছে এই নতুন লোকের সৃষ্টি। তখন তাঁর মনে হয়েছে ভগবান মানুষের মধ্যে কত কত রূপ কত রস দিয়েছেন, আমরা কতই না ঐশ্বর্যবান।

আরও দেখলেন। সোসাইটির অফিসে একদিকে নবুবাবু ও বাদলবাবুর গল্পে মশগুল। আর এক কোণে লম্বাচুল গলায় কণ্ঠী ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছবি আঁকছেন। অন্যত্র কালীপদ ঘোষাল একটি ছাত্রের ছবির ভুলচুক দর্শাচ্ছিলেন। ছবি আঁকা শেখার লোভ হল। কালীবাবুকে বললেন—আমার ছবি আঁকার খুব সখ। এখানে ভর্তি হওয়া যায় না? কালীবাবু উত্তরে বললেন—প্রসপেকটাস নিয়ে যাও। বাবা মার অনু-মতি নিয়ে এস ভর্তি করে নেব।

মার আপত্তি থাকলেও বাবা ওরিয়েন্টাল সোসাইটি অফ আর্টস-এ ছেলেকে ভর্তি করে দিলেন। তখন নীরদদার বয়স মাত্র সতেরো। সেকালে ঐ কম বয়সেই ভর্তি হওয়া যেত। কারণ অবনীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল পাস করে ছবি আঁকা শুরু করলে কেউ চিত্রকর হতে পারে না। কথাটা সত্যি। বাল্যে শুরু না করলে কোনদিন কোন কিছু হবার নয়। যার জন্যেই বোধহয় ফরাসী কবি বলেছিলেন—লার এল এ লা র‍্যাঁ এ কুরু অর্থাৎ শিল্পকলা লম্বা এবং সময় খাটো।

আরও বেশ কয়েক বছর পরের কথা। নীরদদা প্যারিসে যেতেন প্রায়ই। অধিকাংশ দিন যেতেন মিউজেগীমেতে ভারতীয় শিল্পসংগ্রহ দেখতে। সেখানে অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হত। তাঁর মধ্যে ব্রাক এবং রাঁ-কুশীর নাম উল্লেখযোগ্য। সেই সময়ে শিল্পীর হতাশা ও অবসাদ লক্ষ্য করে রাঁকুশী একদিন তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন—ভারতীয় সৃষ্টি অর্থাৎ হিন্দুরূপলোক এক অনতিক্রমনীয় অভিব্যক্তির পরিচায়ক। এসো এ গভীর বননী তোমাকে একাই অতিক্রম করতে হবে। এ কথায় উৎসাহিত হয়ে কিছুটা ভগ্নহৃদয়ে শিল্পী ১৯৪৯ সালে প্যারিসের গ্যালারী বারবিজোঁতে এক একক প্রদর্শনী করেন। এই উপলক্ষে কিছু নামডাক হলেও শিল্প কাজ ও সত্তার মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রইল তাতে অতৃপ্তি আরও অনেকখানি বেড়ে গেল।

এরপর নানান জটিল দুশ্চিন্তায় শিল্পীর মানসিক রোগ হয়। তখন হল্যাণ্ডের এক হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে এচিং সুরু করেন। এই সময়ে বাল্যের রূপলোক এসে ভীড় করত শিল্পীর মনে। সেই সময় মানসিক পরিবর্তনের জন্যে নিয়মিত চণ্ডী ও ভগবৎ গীতা পাঠ করতেন। ছোট আকারের সেই পুরনো গীতা এক সময়ে তাঁর ফরাসী স্ত্রী তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন প্যারিস থেকে। তখনও তাঁদের বিয়ে হয়নি। কিন্তু সেই অসহায় মানসিক অবস্থায় নীরদদা সেই জীর্ণ গীতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এক নতুন ভারতকে। অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন এক নতুন ভারত আত্মাকে। এবং সেই সঙ্গে নানান পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করলেন এক নতুন রূপলোককে। তারপর বিগত সাত বছরের

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য · মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহনলাইব্রেরি
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

সমস্ত কাজ ধ্বংস করে নিজের দৃঢ়তার প্রতিশোধ নিলেন।

লন্ডন থেকে ১৯৫৫ সালে আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। নতুন কল্পনায় নতুন আঙ্গিকে ছবি আঁকা শুরু করলেন। ১৯৫৭ সালে ইমাজ এক্রোজ শিরোনামে এক চিত্রমালার প্রদর্শনী করেন। বিষয়-বস্তু হল বেহুলার জীবনকাহিনী। অনেকটা অরফেউসের রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত। নীরদদার ভাষায়— ভারতীয় অধ্যাত্মিকতা ও দর্শন তত্ত্বানুগ ও সেই সূত্রে প্রতীক-ধর্মী। এই প্রথম আমি অনুভব করলাম— আমার সত্যমার্গ এবং এই প্রথম আমি নিজেকে বলেছি—এই আমি।

এরপর থেকেই শিল্পীর ছবি নতুন ভাষায় নতুন ভাবে কথা বলতে সুরু করল। রচনায় এল সিম্বলিজম বা প্রতীক। এল তান্ত্রিকিজম বা তন্ত্রআর্ট। নতুন কল্পলাবণ্য জোয়ারে শিল্পী একের পর এক আঁকলেন উইং অফ নো এন্ড ভিসুয়াল হিমন নাইন ভেরিয়েয়ান্স অফ সিম্বলিক নাইন দি ডেথ অফ পান্ডু দি কোয়েস্ট কোজাগরী প্রভৃতি। প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করলেন পূজার মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি দেবদেবীর মূর্তি এবং পৌরাণিক কাহিনীআশ্রিত চিত্র। লুনার চিত্রে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করলেন নর-সিংহকে। অর্থাৎ দেখালেন অজ্ঞতার ধ্বংস। আবার বৈতরণী চিত্রমালায় শাপভ্রষ্ট দেবতাদের মর্তে আগমনের কাহিনীটি সুচারুরূপে পরিস্ফুট করেছেন জীবনের আর এক সত্যকে বোঝাবার জন্যে।

এসব চিত্রের রূপকল্প ভারতীয় ঐতি-হ্যভিত্তিক। মানুষের আকৃতি প্রাচীন আই-কনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চিত্রে একটা ধ্রুপদী তত্ত্বময় মেজাজ আছে। জ্যামিতিকে গঠনরীতিতে রচিত প্রত্যেকটি লাইন জোরালো ও গতিময়। অত্যন্ত সহজভাবে একটি স্থিরবিন্দুকে কেন্দ্র করে সাবলীল রেখা ভক্তের মন্দির প্রদক্ষিণ করার মত ঘুরতে থাকে। রং ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নীরদদার সংযমী মনের পরিচয় মেলে। অতিশয়তা নেই। বিষয় অনুযায়ী সবুজ বেগুনী কালো সাদা বাদামী ব্যবহার করেছেন পৌনপুনিক ভাবে। শিল্পীর তুলির প্রতিটি রং অর্থবহ। যেমন কালীর চিত্রে ব্যবহার করেছেন লাল সাদা কালো। এখানে লাল—রজঃ, সাদা—সত্য ও কালো—তমঃ গুণের প্রতীক। আবার মহাদেবের ছবিতে লাল—অতীত, হলুদ—ভবিষ্যৎ ও সাদা—চিরন্তন শান্তির প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্প্রতিক কাজে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল তিনি লাইন কমিয়ে রংয়ের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু গঠনরীতি প্রায় এক রকমই আছে।

সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণায় বিখিয়য় শিল্পী শিবদূতী মন্দির নির্মাণ করেছেন। 'শিবদূতী' অর্থ—সাক্ষাৎ শিবকে দেবী

নীরদ মজুমদারের আঁকা

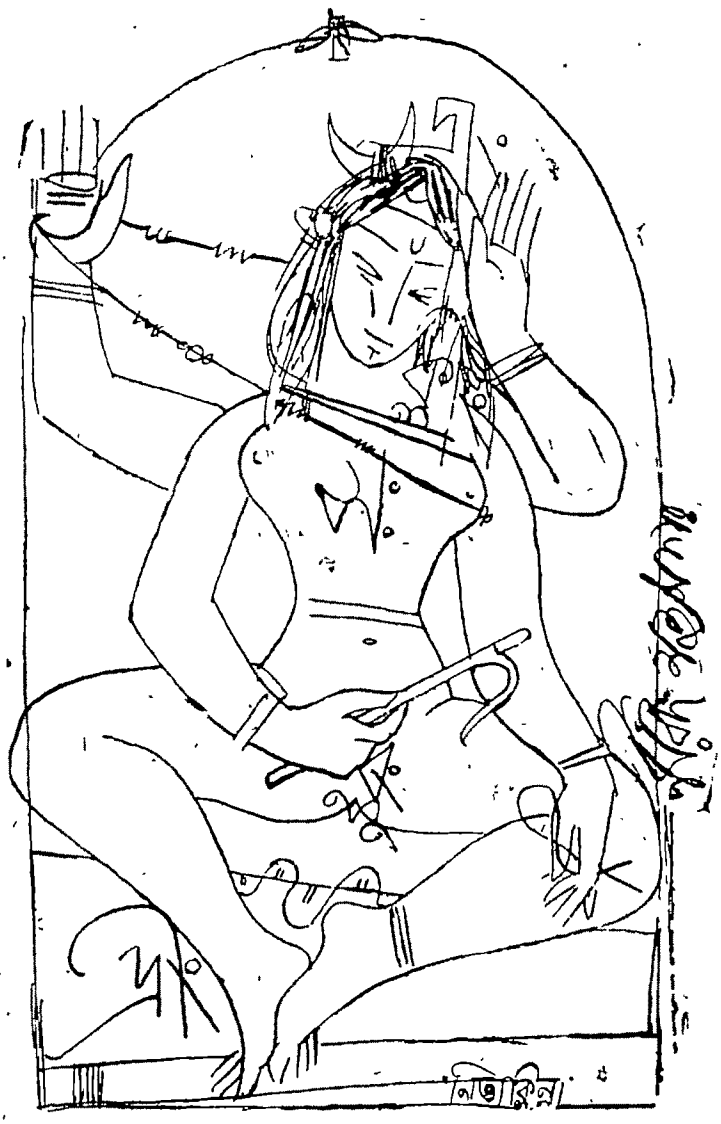

দৌত্যকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন বলে তিনি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধা হইয়াছেন। চতুষ্কোণ বেদীর ওপর কংক্রীটের তৈরী এই মন্দিরটির রচনারীতি তাঁর চিত্রকর্মের মতই জ্যামিতিক। সম্পূর্ণ ভারতীয় কায়দায় কয়েকটি স্তম্ভ বা খিলানের সন্নিবেশে মন্দিরটি গঠিত। খিলানগুলির সংযোগ-স্থলে একটি করে মোট নয়টি নবঘট স্থাপিত হয়েছে। মন্দিরশীর্ষে কেবল একটি ঘট ও ত্রিশূল। স্থাপত্যেও শিল্পীর নিজস্ব মূলসীয়ানার ছাপ রয়েছে সুস্পষ্ট।

একটা বড় বই এগিয়ে দিলেন নীরদদা। খুলে দেখি রামপ্রসাদের গানের ফরাসী অনুবাদ করেছেন শিল্পী স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। আর প্রতিটি গানের চিত্রময় বর্ণনায় শিল্পী গ্রন্থটিকে অমূল্য করেছেন।

বই দেখা শেষ হতে নীরদদা বললেন— আমি কাজের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে থাকতে চাই অজীবন। চাই আরও কোন নতুন লোকের সন্ধান। নকল করে বাঁচতে চাই না। যারা কপি করে বা নকল করে তারা স্মাগলারদের মতন সমান অপরাধী। এদের জেলে পাঠান উচিত।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি। নীরদদা তখনও বলে চলছেন—আজকের দিনে সবকিছু কেমন যেন ক্রমশঃ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না শিল্পীর তুলির রং কেবল রং নয়। তা বিশেষ অর্থবহ। তার একটা মানে আছে। গঙ্গা কি কেবল নদী? না। তার চেয়েও বেশী কিছু। আজ আমরা এটাই ভুলতে বসেছি।

লোড সেডিং। সমস্ত ঘর অকস্মাৎ এক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ব্যস্ত হয়ে নীরদদা বাতি জ্বালালেন। সেই ক্ষীণ আলো-আঁধারে ধীর পায়ে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ কিসের যেন স্পর্শে চমকে উঠলাম। দেখলাম একটা মসৃণ মোটা দড়ি কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্যন্ত ঝুলছে। নীরদদা স্মিত হেসে বললেন—ভয় নেই। ওটা সাপ নয়। ওতে মন্ত্রতন্ত্রও কিছু নেই। আমার ছেলে-মেয়েরা ওটাতে জিমনাস্টিক করে। যে আসে সেই ভাবে আমি তন্ত্র আর্ট করি বলে ওতে কোন মন্ত্রতন্ত্র আছে।

প্রশান্ত দাঁ

মনের অসুখ

কাব্য-নাটক-ইতিহাসে মনের রোগের কাহিনী অনেক পড়েছেন, অনেক শুনেছেন। ঈডিপাস রেক্স ও ইলেকট্রা নাটকে অস্বাভাবিক অজাচার প্রবণতার চিত্র দেখে হয়তো চমকে উঠেছেন। অরেস্টেসে নাটকে পাপবোধ ও অনুতাপের তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে অলীক দর্শন ও অলীক শ্রবণের যে নাটকীয় বর্ণনা আছে তা পড়ে বিস্মিত ও হতবাক হয়েছেন। ঈর্ষাপরায়ণ সন্দিগ্ধচিত্ত ওথেলোর পরিণতি আপনাদের ব্যথিত করেছে, লেডি ম্যাকবেথের স্বপ্নচারিতা ও বাধ্যতামূলক হাত ধোয়ার দৃশ্যে হয়তোবা মহিলাটির জন্যে মনের কোণে অল্পক্ষণের জন্যে হলেও করুণার উদ্রেক হয়েছে। অতিবড় সনাতনপন্থীও শৈবলিনী ও কিরণময়ীর উন্মত্ততা দেখে অন্তত সাময়িকভাবে এই দুই নারীর জন্য সহানুভূতি বোধ করেছেন। এই সব মানসিক অসুস্থতার কাহিনী আপনাদের অভিভূত করলেও আপনারা এগুলোকে নিছক কাল্পনিক কাহিনী হিসেবেই নিয়েছেন। বাস্তব জীবনে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনেকেরই হয়তো মনে হয়নি। পাগলাগারদের অধিবাসীদের জীবনকাহিনী শোনবার প্রয়োজন বা সুযোগ যাঁদের ঘটেছে তাঁরা জানেন জীবনে অনেক সময় নাটকের থেকেও নাটকীয় ঘটনা ঘটে থাকে। তারই একটি আজ আপনাদের শোনাবো।

তার আগে পুরান ইতিহাসের পাতা থেকে দু-চারজন নামকরা কীর্তিমান পুরুষের অসুস্থতার কথা শোনানো, বোধহয় খুব অস্বাভাবিক হবে না। ফ্রীকবীর হারাকিউলেসের মৃগী রোগ ছিল। রোগের আক্রমণের সময় তিনি পূর্বপুরি আত্মবিস্মৃত মারমুখী উন্মাদের মত আচরণ করতেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি নিজের ছেলে, ভাইপো, বন্ধু ও শিক্ষককে নিহত করেন। অ্যাজাকস্ উন্মত্ত অবস্থায় শত্রু মনে করে একপাল ভেড়ার গর্দান নেবার পর আত্মসচেতন হয়ে অনুতাপে আত্মহত্যা করেন। ভারতের পৌরাণিক রাজা কল্মাষপদের মনুষ্যখাবার কাহিনী আর ব্যাবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার-এর নিজেকে নেকড়ে মনে করার কাহিনী নিঃসন্দেহে অসুস্থ মনের কাহিনী। সক্রেটিস, ডেমক্রিটাস, আলেকজান্ডার দি গ্রেট—তিনজনেই মানসিক রোগে ভুগেছেন। তৈমুরলং মড়ার খুলি দিয়ে পিরামিড তৈরী করতে ভালবাসতেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো শেষজীবনে সন্দেহবাতিকে ভুগেছিলেন। তিনি মনে করতেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, প্রাশিয়া তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য শত্রুর ভয়ে একবার লন্ডনের এক হোটেলে নামপত্র রেখে তিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস না হয়, জেমস সি কোলম্যানের লেখা অ্যাবনরম্যাল সাইকলজি অ্যান্ড মডার্ন লাইফ (ভারতীয় সংস্করণ, ১৯৭২)) পড়ে দেখতে পাবেন। বেটোফেন, মোজার্ট, শুমান—কেউই মনের দিক থেকে সুস্থ ছিলেন না। বেটোফেন ও মোজার্ট দুজনেই সন্দেহবাতিকের রোগী ছিলেন। শুমান স্বর্গীয় আত্মার সংগীত শুনতেন। বারবনিতার জন্য নিজের কান কেটে তিনি কার যাত্রা ভঙ্গ করতে চেয়েছিলেন জানা নেই, তবে এটা যে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ সেটা সবাই জানেন। শোপেনহাওয়ার, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, মাঝে মাঝে বিষণ্ণতা (ডিপ্রেসন) রোগে ভুগতেন। বার্ণস ও বায়রন অতিমাত্রায় সুরাসক্ত ছিলেন। কোলরিজ-এর 'কুবলা খাঁ' সৃষ্টির মূলে যে অহিফেন—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই এই সব খ্যাতনামাদের অনেকের ব্যক্তিগত জীবনের এই রহস্যের খবর জানেন। আমি চরিত্র হননের জন্য এঁদের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করছি না। অথবা আমি এই সব উদাহরণ পেশ করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করতে চাই না যে প্রতিভা ও উন্মত্ততা এক। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে বাস্তব জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় হতে পারে। আরো একটি বিষয়ে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। মনের অসুখ সম্পর্কে অনেকেরই ভুল ধারণা আছে। মনের রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সব সময়ই দুর্বল বা হীন নয় অনেক বড় বড় সাধু-সন্তরাও মনের রোগে ভুগেছেন জানলে মনের অসুখকে আর মানুষ বিধাতার অভিশাপ বা শয়তানের অনুগ্রহ বলে মনে করবে না, মনের অসুখ সারাতে ভূতের রোজা ডাকবে না।

আমার কাহিনীর নায়ক তিরিশ বছরের দোহারা চেহারার এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। ১৯৭২ সালের শেষের দিক তিনি আমার এক পরিচিত ডাক্তারের চিঠি নিয়ে আমার কাছে আসেন। মনে করা যাক, তার নাম প্রসূন রায়। প্রসূনবাবু একটা বড় ফার্মে ভাল মাইনের চাকরী করেন। আর্থিক অসচ্ছলতা নেই। থাকেন উত্তর কোলকাতার কোনো এক পল্লীতে। স্ত্রী আর পাঁচ বছরের শিশুসন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। বিয়ে হয়েছে বছর সাতেক আগে। প্রসূনবাবু তখন এম-এস-সি পাশ করে চাকরীতে ঢুকেছেন। বাবা মা আছেন শিলিগুড়িতে। তাঁর বড় দুই ভাই বিদেশে চাকরী করেন। এ-কাহিনীতে তাঁদের ভূমিকা বিশেষ কিছু নেই। প্রসূনবাবুর শারীরিক কোনো রোগ নেই। বছর দুয়েক ধরে তিনি এক অদ্ভুত মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন। ট্রেনে চাপতে তাঁর ভয় হচ্ছে। দূরপাল্লার ট্রেনে করে কোথাও যেতে হবে শুনলে তিনি আতঙ্কে অধীর হয়ে উঠছেন। তাঁর চাকরীতে প্রায়ই দিল্লী বোম্বাই যেতে হয়। সেই সময় ছোট শ্যালককে বাসায় রেখে তিনি বাইরে যান। পাঁচ বছরের মধ্যে অন্তত ২০।২৫ বার তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে। প্রথম ক'বছর কোনো অসুবিধা ছিল না। তিনি বাইরে যেতে বরং আনন্দই পেতেন। টি-এ ইত্যাদি বাবদ এতে আইনসঙ্গত বেশ কিছু টাকা উপরি রোজগারও হত। কিন্তু বছর দুয়েক আগে প্রথমে তিনি রাজধানী একসপ্রেসে উঠে এই আতঙ্কের আভাস পান। গাড়ী হাওড়া স্টেশন ছাড়ার আগেই তাঁর মনে হয় বুকের বাঁ-দিকটায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, চোখে ঝাপসা দেখছেন, গা ঘামছে, বমন উদ্রেক হচ্ছে। তিনি ভয় পেয়ে

গাড়ী থেকে নেমে সোজা বাড়ী চলে আসেন। সেই রাতেই পড়ুর ডাক্তার এবং পরের দিন অফিসের ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করেন। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফ নেওয়া হল, বুকের একসরে ফোটো তোলা হল। কোনো রোগের হদিশ পওয়া গেল না। ডাক্তাররা বললেন, পেটে বায়ু জমার দরুনই বোধহয় এই রকম হয়ে থাকবে। দুদিন বাদে তিনি অফিসে যাতায়াত সুরু করলেন। মাসখানেক বাদে তাঁর অফিস নির্দেশ দিল আবার বাইরে যেতে হবে। এবার বোম্বে। যথারীতি টিকিট কাটা, রিজার্ভেশন পর্ব চুকে গেল। নির্ধারিত তারিখের দিন তিনেক আগে যাবার কথা ভাবতেই তিনি অবার আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে পড়লেন। আবার ডাক্তারী পরীক্ষা। এবারও সেই একই রায় দিলেন চিকিৎসকরা। কোনো রোগ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কুলাইজার খেতে নির্দেশ দিলেন। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে প্রসূনবাবু প্রতিজ্ঞা করলেন. তিনি এই ছেলেমানুষী ভয়কে কিছুতেই আমল দেবেন না। প্রথম শ্রেণীর এক কামরায় উঠে বসার আগেই তিনি স্টেশনের খাবার ঘরে চা খেতে খেতে অসুস্থ বোধ করলেন। সেই বুকে ব্যথা. মাথা ঘোরা, পেট গুলিয়ে উঠলো, যা খেয়েছিলেন সব বমি করে দিলেন। স্ত্রী শ্যালক এবং অফিসের এক বন্ধু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা ভয় পেয়ে গেলেন। বন্ধুটি দেখলেন, নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক দ্রুত। এবারও অফিসের গাড়ী করে বাড়ী ফিরতে হল। এরপর এক নামী নার্সিংহোমে ভরতি হয়ে সাতদিন রইলেন। নানা ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েও কোনো শারীরিক রোগের সন্ধান মিলল না। অফিসের কর্তারা তাঁর কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। অন্য বিভাগে তাঁকে বদলি করা হল, বাইরে যাওয়ার দায় থেকে তিনি অব্যাহতি পেলেন। ট্রেনে ওঠার ভয় কিন্তু তার রয়েই গেছে। তিনি এই ভয় থেকে মুক্ত হতে চান।

—জানেন ডাক্তারবাবু, শুধু লেখাপড়া নয়, খেলাধুলাতেও আমার স্থান বরাবর কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে উঁচু সারিতে ছিল। ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। এই নিউরোটিক দুর্বলতার দরুন আমার প্রতি-পত্তি অনেকটা খর্ব হয়েছে। অফিসে কেউ মুখ টিপে হাসে, কেউবা অযাচিত উপদেশ বর্ষণ করে উত্যক্ত করে তোলে। আর সব থেকে বড় কথা কি জানেন? স্ত্রীর কাছে আমি ছোট হয়ে গেছি, তিনি আমাকে অনুকম্পার চোখে দেখতে সুরু করেছেন। আর ভয় এখন ট্রেনে ওঠাতেই শুধু নয়, বাড়ীর বাইরে যেতেই আমার ভয় হচ্ছে। ভয় ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। অফিস থেকে আগে নিয়মিত খেলার মাঠে যেতাম। এখন সে পাট বন্ধ। লাঞ্চের পর থেকেই আমি ঘড়ি দেখতে আরম্ভ করি। কতক্ষণে পাঁচটা বাজবে, কতক্ষণে গিয়ে গাড়ীতে উঠব—এই চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। বেশিক্ষণ বাড়ীর বাইরে থাকা বন্ধ করেছি। ক্লাব ছেড়েছি, আড্ডা ছেড়েছি। খালি বাড়ী যাবার চিন্তা। দিনের মধ্যে অফিস থেকে অন্তত পাঁচবার নানা অছিলায় বাড়ীতে ফোন করি। বাড়ী ঢোকবার আগেও বুক দুরদুর করে; কিন্তু বাড়ীতে ঢুকে স্ত্রীকে ছেলেকে দেখলেই আমার মন শান্ত হয়। এটা কি রোগ? কি জন্যে এমন হচ্ছে?

দুদিন তিনদিনের মধ্যে আমারই নির্দেশে ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা খুলে বললেন : স্ত্রী আমার আহামরি গোছের না হলও, দেখতে ভালই। বি-এ পাশ করেছেন বিয়ের পর আত্মীয়-স্বজন মহলে খুবই সুনাম। যেমন বুদ্ধিমতী তেমনি কর্মঠ। বিয়ের পর প্রথম বছর তিনেক আমার দুই ভাইই কোলকাতায় ছিলেন। আমরা একসঙ্গে থাকতাম। কোনো গোলমাল হয়নি। আমার স্ত্রীকে বড়রা সমীহ করে, বাচ্চারা ভয় পায়। রাশভারী এক ধরনের মানুষ থাকে জানেনতো, যারা অনায়াসে অপরের ওপর কর্তৃত্ব করে যায়. আমার স্ত্রী সেই জাতের। সব ব্যাপারে তাঁর জেদই বজায় থাকে। তাঁর অনেক অন্যায় সিদ্ধান্তও আমাকে মেনে নিতে হয়। দু'একবার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে হয়েছে। না, আমরা প্রেম করে বিয়ে করিনি। তবে ওদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের জানাশোনা অনেক দিনের। আমি বিদ্রোহ করলে তিনি ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্যে যান না। উঁচুগলায় কথা বলতেও তাঁকে খুব কম শোনা যায়। তবে কি করে বুঝি তিনি রাগ করেছেন? কথা বন্ধ করেন; স্রেফ বোবা হয়ে যান। অবশ্য শুধু আমার সঙ্গে কথা বলেন না। অন্যের সঙ্গে তাঁর আলাপ আচরণে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। আমার সুখসুবিধা খাওয়াদাওয়া, পোষাক-আসকের তদ্বির-তদারক যথারীতি আগের মত করে যান। ঝি চাকররা বুঝতে পারে না যে আমাদের মধ্যে নীরব সংগ্রাম চলেছে। আমি বড় জোর এক সপ্তাহের মত এই ঠাণ্ডা লড়াইএর চাপ সহ্য করতে পারি। সহ্য করতে পারি মানে এই নয় যে, আমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকি। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অস্বস্তি, দিনরাত আমাকে পীড়িত করে। তিনি নিজের বিছানায় শুয়ে নিরুদ্বেগে ঘুমুতো থাকেন আর আমি ঘুমের বড়ি খেয়েও ছটপট করি। তারপর একদিন নতি স্বীকার করি। স্নায়ুর চাপ কমে, অনেকটা শান্তি আসে। কিন্তু নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই, পরাজয়ের গ্লানি কাটতে চায় না। ভেতর থেকে কে যেন আমাকে চাবুক মারতে থাকে। আমার মন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি এবার কোনো সংঘর্ষ ঘটলে আমি নতি স্বীকার করব না। সংঘর্ষ ঘটে, বিদ্রোহ করি, আবার পরাজয় স্বীকার করি আর যন্ত্রণায় ভুগি।

রাজধানী একসপ্রেসে সেদিন প্রথম আতঙ্কের আভাস পেয়েছিলেন সে স্যার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন ছিল মনে আছে কি? যুদ্ধপর্ব না শান্তি পর্ব? কোন পর্ব চলছিল?

—বেশ মনে আছে। একটু বড় দরের অশান্তিই ঘটেছিল। ছেলেকে নিয়ে। উনি ছেলেকে কিছুতেই ইস্কুলে পাঠাতে চান না। আমি একটা বেবি স্কুলে ধরপাকড় করে ওকে ভর্তির ব্যবস্থা করেছিলাম উনি ছেলেকে কিছুতেই ছাড়বেন না। জানেন তো আজকাল কিন্ডারগার্টেন থেকে স্কুলে না ঢুকলে পরে আর জায়গা পাওয়া যায় না। উনি কিছুতেই আমার কথা বুঝতে চাইলেন না। তর্ক করা ওর সঙ্গে বৃথা। কানে উনি সুবিধেমতো তুলো গুঁজে দিতে পারেন। তাই করলেন আর মুখেও ছিপি আঁটলেন। আমিও মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। স্টেশনে যাবার আগে জোর গলায় ঘোষণা করলাম যে দিল্লী থেকে ফিরে এসেই খোকাকে ইস্কুলে পাঠাবো। দেখি কে বাধা দিতে আসে।

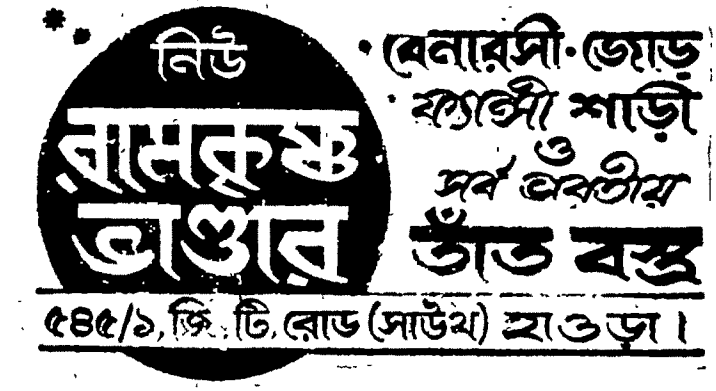

—আপনার মনে গাড়ীতে ওঠার আগে থেকেই তাহলে অশান্তি উদ্বেগ ছিল!

আমার কথার উত্তরে তিনি বললেন—বেশি পরিমাণেই ছিল।

—শুধু দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথাই বললেন; এবার ভাল কথা কিছু শোনান।

—ভালকথা মানে ভালবাসার কথা? স্ত্রীকে ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছেন? মনে হয় অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি সুখী হতে পারতাম। এই আতঙ্ক রোগের জন্য চিকিৎসা করতে হত না। নিউরোসিসের জন্যে লোকের কাছে হেয় হতাম না। কিন্তু আমি অন্য কোনো মেয়েকে ভালবাসার কথা ভাবতে পারি না। আমার বন্ধু-বান্ধবরা স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে বাইরেও প্রেম করে বেড়ায়। আমাকে দু-একবার সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমার রুচিতে বেধেছে। আমি আমন্ত্রণে সাড়া দিইনি। আবার নব-বিবাহিত বন্ধুদের বিবাহিত জীবনের গল্প শুনলে মনে হয় আমি স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই পাইনি; উনি আমাকে সব সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

—আপনি দিনে পাঁচবার করে বাড়ীতে ফোন করেন কেন? বাড়ী থেকে বাইরে থাকতে চান না কেন? আপনি কি স্ত্রীকে সন্দেহ করেন?

প্রসূনবাবু যেন ঈষৎ চমকে উঠলেন। পাশের বইগুলোর দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে চললেন ঃ আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। কূলকিনারা পাচ্ছি না। আমাকে তিনি যত্ন করেন আমার সুখ-সুবিধের দিকে দৃষ্টি আছে। কিন্তু স্ত্রীর সব কর্তব্য তিনি পালন করতে চান না। ভবেশ আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার স্ত্রীর সঙ্গে রোজ কি ঘটে না ঘটে—তার আনুপূর্বিক বিবরণ সে আমাকে দিত। প্রায় এক সময়েই দুজনের বিয়ে হয়েছে। তার কথা শুনে বুঝতাম আমার স্ত্রী অন্যদের স্ত্রীর মত নন। গোড়ার দিকে এ নিয়ে আমি গর্ব অনুভব করতাম। কিন্তু এখন করি না। ভবেশকেও যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলি। তার মিলনের গল্পগুলো শুনে আমার রক্তে আগুন জ্বলে ওঠে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

একটু থেমে এবার একটু উঁচুগলায় বলে উঠলেন ঃ আমার মধ্যে প্যাশান খুব বেশি। আমার স্ত্রী শীতল, তাঁর মধ্যে উত্তাপ কম। বয়ের প্রথম দিকে মনে হত আমি বোধহয় অ্যাবনরম্যাল, তিনিই নরম্যাল। কিন্তু ভবেশ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের দাম্পত্য জীবনের গল্প শুনে আমার ধারণা পালটে গেছে।

—আপনি দাবী করেন না কেন।

—দু'একদিন যে করিনি এমন নয়। বিশেষ করে যে রাত্রে পার্টি বা ক্লাব থেকে কিঞ্চিৎ সুরা পান করে বাড়ী ফিরেছি সেই রাত্রে দাবী করেছি, জবরদস্তিও করেছি মাঝে মাঝে। তখনকার মত তৃপ্তিও হয়তো পেয়েছি। কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়েছে স্ত্রীর ছোট্ট দুটি কথা—ছিঃ! তুমি বড় গ্রোস, বড় ভালগার। লজ্জায় মুখ তুলে সেদিন স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারিনি। আরো লজ্জিত হয়েছি যখন বুঝতে পেরেছি অহল্যা যে পাষাণ সেই পাষাণই রয়ে গেছেন।...

শেষের কথাগুলো বলতে বলতে ভদ্রলোকের গলাটা ধরে এল। তিনি ধীরে ধীরে মুখ নীচু করলেন।

—আমার প্রশ্নের জবাব পেলাম না কিন্তু।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত ভাবে প্রসূনবাবু বললেন ঃ ঐ প্রশ্নের জবাবটা আমি আপনার কাছে পর অশা করছি। আমি আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি কি? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। স্ত্রী আমাকে ভালবাসেন কিনা তাও আমি বুঝতে পারি না। কেননা অন্য কোনো নারীর ভালবাসা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ব্যাপারটা কি আমি হয়তো ঠিক জানি না। তবে তিনি যে আমাকে শ্রদ্ধা করেন না—এ আমি ভালভাবেই বুঝতে পারি। আর ঐ জায়গাতেই আমার দুর্বলতা। মনে হয় ভালবাসা না পেয়েও বাঁচা যায়, দৈহিক মিলনের আনন্দ ও তৃপ্তি ছাড়াই দিন কাটানো যায়। কিন্তু একই ছাদের তলায় আমার দিনরাতের সঙ্গী আমাকে সমীহ করবে না, আমার বিদ্যা-বুদ্ধির তারিফ করবে না—এ আমি কিছুতেই সইতে পারি না। ছোটবেলা থেকে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের কাছে শুধু বাহবা পেয়ে এসেছি। ইউনিভার্সিটির সব পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছি। অফিসে অল্পদিনের মধ্যে জবরদস্ত ডিরেকটররা আমার মূল্য বুঝেছে, সেই অনুযায়ী দক্ষিণা ও মর্যাদা দিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার কদর বুঝলেন না আমার প্রাপ্য আমি পেলাম না। তাই আমার নিরাপত্তাবোধ বিঘ্নিত, আমার অহংবোধ বিপর্যস্ত। আমি অসুখী। আপনি এবার বলুন, আমি ওকে সন্দেহ করি কি করি না। না। ও প্রশ্নের জবাবে আমার দরকার নেই। আপনি আমার 'আতঙ্করোগ' দূর করতে সাহায্য করুন। স্ত্রীকে ছাড়া যাতে আমি চলতে পারি, সেই ব্যবস্থা করে দিন। ওঁর ওপর আমার কেন এই অস্বাভাবিক নির্ভরতা? আমার রোজগারে সংসার চলে ওঁর নিত্যপ্রয়োজনের সব জিনিস আমি জোগাই। উনি আমার ওপর নির্ভর করবেন —এইটেই তো স্বাভাবিক। উল্টোটা কেন হল? আমার ভয় কিসে যাবে বলুন।

—সন্দেহ অবিশ্বাস কাটলেই ভয় চলে যাবে।

—সন্দেহ যে মাঝে মাঝে হয় না, তা নয়। কিন্তু আবার মনে হয়, ঐসব মেয়েরা ভালবাসতে জানে না, ভালবাসা পাবারও ওদের দরকার হয় না। দেহ মন দুদিক থেকেই আমার স্ত্রী শীতল, বরফের মত ঠাণ্ডা। পরপুরুষের প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ওঁর মনে জাগতেই পারে না। আবার এও মনে হয় যে হয়তো এই উষ্ণতার অভাব শুধু আমার ক্ষেত্রেই ঘটছে। আমি আপনাদের কিছু লিটারেচার পড়েছি। ইমপোটেন্স ও ফ্রিজিডিটি দুইই নাকি স্নায়ুকালপাত্র সাপেক্ষ। ঠিক জানি না। আপনি বলছেন সন্দেহের জন্যই আমি বাইরে থাকতে ভয় পাই। ঘন ঘন ফোন করে দেখি স্ত্রী ঘরে আছেন কিনা। তাই যদি সত্যি হয় তবে আমার মত হীনপ্রকৃতির মানুষ খুব কমই আছে বলতে হবে। আমার সন্দেহ দূর হবার কি কোনো উপায় নেই!

—বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন প্রসূনবাবু।

বললাম ঃ অনেক মেয়েই যৌনশীতল। তা বলে তারা স্বামীকে ভালবাসে না—একথা ঠিক নয়। মর্যাদার লড়াই আপনাদের দাম্পত্যজীবনকে অসুখী করেছে। নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে এত বেশি সচেতন নাই বা হলেন প্রসূনবাবু। স্ত্রীকে নিজের সমকক্ষ বলে ভাবতে শিখুন, পুরুষালী দম্ভ ভুলে যান। তা হলেই দেখবেন সন্দেহ দূর হবে, হয়তো আতঙ্কও সেরে যাবে।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

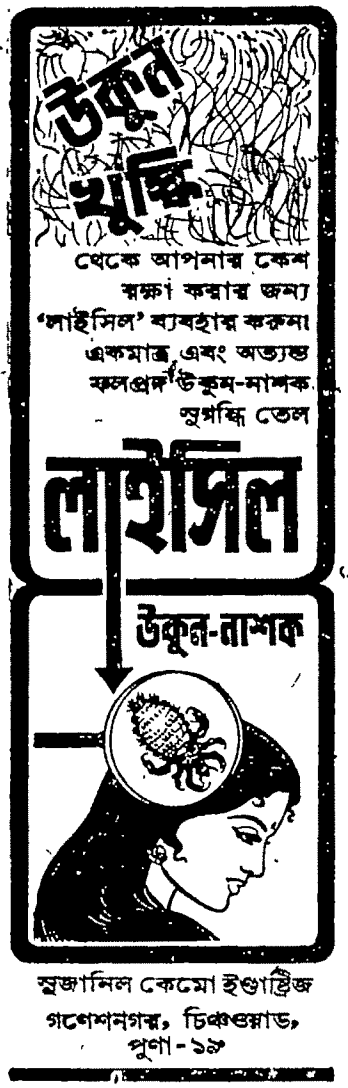

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

—সতের—

পরের দুটো দিন কিভাবে কেটে গেল, বুঝতেও পারলাম না, জানতেও পারলাম না। তার পরের দিন কার্তিকবাবু বললেন, ভয়ের কিছু নেই। প্যারা-টাইফয়েড হয়েছে।

আমি খুব অস্তে অস্তে বললাম, পরশেই ত মেডিকেল কলেজ। আমাকে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।

নৃপতি আমার কথা শুনে একটু হাসল। কার্তিকবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, হাসপাতালে পাঠাবার মত অসুখ তোমার হয়নি। আজকালকার দিনে প্যারা-টাইফয়েড আবার কোন অসুখ নাকি?

যখন জ্বর খুব বাড়তো তখন প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতাম কিন্তু জ্বর কমলে সবকিছু বুঝতাম, দেখতাম। মেসের সবাই মিলে আমাকে এমন দেখশুনা ও সেবাযত্ন করছিলেন যে ঐ অসুস্থ অবস্থাতেও আমি লজ্জায়, কৃতজ্ঞতায় প্রায় মরে যাচ্ছিলাম। কদিন পরে যখন কাকাবাবু আর কাকিমা আমাকে দেখতে এলেন তখন আমি অনেকটা ভাল। ওরা আমাকে ওদের বাসায় নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও কার্তিকবাবু বললেন, না, না, মাস্টার মশাই, এখন আর ওকে নিয়ে টানাটানি করবেন না।

কাকাবাবু বললেন, কিন্তু কার্তিকবাবু, এই অবস্থায় কি ওকে মেসে রাখা ঠিক?

কাকাবাবুর কথায় কার্তিকবাবু হঠাৎ রেগে গেলেন। বললেন, মেস চলাই বলে কি আমরা মানুষ না? আসল বিপদটাই যখন কেটে গেছে তখন আর ভয় নেই। আর কদিনের মধ্যেই ও ভাল হয়ে যাবে।

সেই সেদিন থেকে কাকাবাবু আর কাকিমা রোজ আমাকে দেখতে আসতেন। বেশ কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে গল্প করতেন, আমাকে ওষুধ-পথ্য খাওয়াতেন, বগলে থার্মোমিটার দিয়ে টেম্পারেচার দেখতেন। তারপর ওরা চলে যেতেন।

সেদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেলের মেয়াদ ফুরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এলো কিন্তু কাকাবাবু বা কাকিমা এলেন না। মনে মনে বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম।

নৃপতি এসে ঘরের আলো জ্বালতেই দেখি খুব আস্তে আস্তে কল্পনা আমার ঘরে ঢুকল। আমি অবাক হয়ে ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই দেখি কাকাবাবু কাকিমা কল্পনার মা আর একটি মেয়েও আমার ঘরে এলেন। আমি তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে বললাম, আপনারা?

অন্য কেউ কিছু বলার আগেই সদ্য-বিধবা কল্পনার মা বললেন, কালই ওর কাজকর্ম মিটল। তাই এর আগে আসতে পারিনি।

ওর দিকে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই আমি দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলাম। কোন কথা বলতে পারলাম না। মুখ নীচু করে বসে থাকলেও দেখলাম নৃপতি কয়েকটা চেয়ার দিয়ে গেল। কাকিমা আর কল্পনা আমার বিছানার এক পাশে বসলেন। ওরা তিন-জন সামনেই চেয়ারে বসলেন। কিছুক্ষণ কারুর মুখেই কোন কথা এলো না। তারপর কল্পনার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রদীপ আজ কেমন আছো?

মুখ নীচু করে চাপা গলায় উত্তর দিলাম, অনেকটা ভাল আছি।

কাকিমা আমার মাথায় হাত দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন সেই সেদিনের পর আর ত জ্বর হয় নি?

না।

কল্পনার মা বললেন, এমন সময়ই তোমার শরীর খারাপ হলো যে আমি কিছুই করতে পারলাম না।

আমি বললাম, আপনাদের এই রকম চরম বিপদের দিনে আমিও ত কিছু করতে পারলাম না।

আমাকে ত অনেকজনে সাহায্য করেছেন কিন্তু এমন অসুখের মধ্যেও তোমাকে একলা একলা কাটাতে হলো।

না, না, মেসে আছি বলে আমার কোন কষ্ট হয়নি। এখানকার সবাই আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয় না।

কাকিমা বললেন, তবু বাড়ীর সেবাযত্ন ত অন্য জিনিস।

নৃপতি চা-বিস্কুট আনতেই কল্পনার মা বললেন, এসব আবার আনতে বললে কেন?

আমি ত বলিনি। ও নিজেই নিয়ে এসেছে।

কাকিমা ট্রে থেকে চা-বিস্কুট নিয়ে কল্পনাকে দেবার পরই পিছন ফিরে বললেন, এই যে অলপনা।

কল্পনার মা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সঙ্গে ত অলপনার আলাপ হয়নি, তাই না?

না।

উনি পাশ ফিরে বললেন, অলপনা, এই হচ্ছে প্রদীপ।

হাতে চায়ের কাপ থাকলেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ও আমাকে নমস্কার করার চেষ্টা করল। আমিও হাত জোড় করে নমস্কার করে বললাম, আপনি চা খান।

কাকিমা আর কল্পনার মা প্রায় একসঙ্গে বললেন, ওকে আর আপনি বলতে হবে না।

শারীরিক মানসিক ক্লান্তি সত্ত্বেও একটু হেসে বললাম, যে মেয়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছেন তাকে আপনি বলাই কর্তব্য।

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের আপনি বলাই আজকাল-কার নিয়ম।

আরো দু-পাঁচ মিনিট এই আলোচনা চলার পর কল্পনার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আমার বাড়ীতে কবে আসছ?

ভাবছি কদিন পিসীর কাছ কাটিয়ে আসার পর.....

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বললেন না, না এই শরীর নিয়ে তুমি এখন কাশী যেও না। বরং দুএক মাস পর আমরা সবাই মিলে কাশী ঘুরে আসব।

সঙ্গে সঙ্গে কাকাবাবু বললে, প্রদীপ, সেইত ভাল।

একবার মনে হলো চিৎকার করে বলি, কাকাবাবু, বহুকাল খাঁচার পাখী হয়ে জীবন কাটিয়েছি। ঐ জীবনের যন্ত্রণা আমি জানি। এইত মাত্র কদিন প্রাণভরে আকাশের কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আপনি আর আমাকে ...

হঠাৎ কাকিমা আমার পিঠে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কী ভাবছিস?

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে শুধু বললাম, আমি ত অসুস্থ অবস্থাতেই

পিসীর কাছে চলে যাচ্ছিলাম কিন্তু মেসের সবই মিলে বরণ করায়.....

সস্নেহে আমার মাথায় হাত দিতে দিতে ককিমা বললেন, পিসী যখন তোকে অত ভালবাসেন তখন নিশ্চয়ই যাবি কিন্তু এই শরীর নিয়ে না গিয়ে দু-এক মাস পরই...

বলতে পারলাম না, ককিমা, শুধু পিসী না, অরে একজনের জন্য আমার কাশী যাওয়া দরকার। সে শুধু বাল্যবিধবাই নয়। আমারই মত নিঃসঙ্গ। দিনের আলোয় সে আমার কাছে আসতে না পারলেও রাতের অন্ধকারে সে নীরবে আমার কাছে এসে চোখের জল ফেলে। হরসুন্দরী ধর্মশালায় সে নিজের চোখের জল দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছে। ককিমা আর কিছু নয়, শুধু আমাকে একটু কাছে পেয়ে, আমাকে একটু সেবা-যত্ন ক'রেই সেই সর্বহারা মেয়ে নিজের সব দুঃখ ভুলতে চায়। দোহাই ককিমা, আমাকে তোমরা, কাশী যেতে বারণ করো না।

সম্ভব হলে অরে অনেক কথাই বলতে পারতাম। বলতাম, ককিমা, তোমাদের সবার চাইতে দেবীকেই আমার অনেক আপন মনে হয়। আমি অনেক কিছুই ওকে দিতে পারব না, দিলেও ও নেবে না, নিতে পারবে না কিন্তু নিজেকে ত তার কাছে বিলিয়ে দিতে পারব এবং তাতেই আমার শান্তি, পরম তৃপ্তি। এই শান্তি এই তৃপ্তি পাবার অধিকারটুকু তোমরা কেড়ে নিও না।

এসব কিছুই বলতে পারলাম না। বলব কীভাবে? কেন মানুষ কি তার মনের কথা বলতে পারে? পারে না। মনের কথা মনেই থেকে যায়। আমি শুধু বললাম, পর পর দুদিন পিসীকে স্বপ্ন দেখলাম। তাছাড়া বড্ড বেশী পিসীর কথা মনে হচ্ছে। হাজার হোক বয়স হয়েছে। হঠাৎ যে কোনদিন চলে যেতে পারেন। তাই ভাবছিলাম শরীরটা একটু সুস্থ হলে দিনকতক পিসীর কাছে কাটিয়ে আসি।

কল্পনার মা বললেন, পিসীর কাছে যেতে তোমাকে বারণ করতে পারি না। তবে এই সর্বনাশের পর তুমি আমাদের ওখানে থাকলে অনেকটা ভরসা পেতাম। আমার কোন ভাই নেই, ছেলে নেই; শ্বশুরবাড়ীর সবই ত আমাকে পথে বসতে চান। তাই...

চোখের জল না ফেললেও কথাটা শেষ করতে পারলেন না। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। ককাবাবু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি মন খারাপ করো না। প্রদীপ একটু সুস্থ হলেই তোমরা ওখানে চলে যাবে।

আমি মুখে প্রতিবাদ করলাম না কিন্তু মনে মনে স্বীকৃতি জানাতেও পারলাম না। দুই হাটুর উপর মুখ রেখে চুপ করে বসে রইলাম।

একটু পরেই নৃপতি ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর থেকে শিশি থেকে একটা লাল-কালো রংয়ের ক্যাপসুল বের করে আমার হাতে দিয়েই জলের গেলাসটা আনল। আমি নিঃশব্দে ওষুধটা খেয়ে নিতেই ও বললো, এতক্ষণ বসে বসে কথা বলছেন কেন? শুয়ে শুয়ে কথা বলুন।

নৃপতি দাঁড়াল না। যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু ঘরের সবাইকে বুঝিয়ে দিল যে আমার সঙ্গে এতক্ষণ বকবক করা ঠিক হয়নি।

অন্য কেউ কিছু বলার আগে অলপনা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, মা, চলো। এবার বাড়ী যাই।

অগত্যা অগত্যা সবাই উঠলেন। ককিমা বললেন, কাল সকালে তিন-চার দিনের জন্য আমরা বহরমপুর যাচ্ছি। বড় ভাসুর খুবই অসুস্থ। ফিরে এসেই আবার আসব।

আচ্ছা।

ককাবাবু বললেন, এই কদিন এরা রোজ একবার তোকে দেখে যাবে। কোন কিছুর দরকার হলে ওদের বলতে লজ্জা করিস না।

আমি বললাম, আমি ত এখন বেশ ভালই আছি। ওঁদের রোজ রোজ কষ্ট করে আসতে হবে না।

কল্পনার মা বললেন, এইটুকু পথ আসতে আবার কষ্ট কি? টেবিলের দিকে সেরা করে বললেন, সামান্য একটু ফল রেখে গেলাম। খেও।

ওরা সবাই চলে যাবার একটু পরেই নৃপতি আমার জন্য এক গেলাস দুধ নিয়ে এলো। দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে আমি বললাম, নৃপতি, আমার অসুখের জন্য সব চাইতে তোমাকে বেশী ঝামেলা ভোগ করতে হলো।

নৃপতি সদাসিধে মানুষ। ও বললো, ঝামেলা মনে করলে সব কাজই ঝামেলা।

তা ঠিক কিন্তু তোমাকে ত অনেক কষ্ট করতে হলো।

আপনি দুধ খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

অরে কেন কথা না বলে দুধ খেয়ে খালি গেলাসটা ওর হাতে দিতেই ও জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মেস ছেড়ে দেবেন?

নৃপতির প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ একথা জানতে চাইছ কেন?

মাস্টারমশাই কর্তাবাবুকে বলছিলেন যে.....

ককাবাবু কি বলছিলেন?

বলছিলেন আপনি সুস্থ হলেই ঐ ছাত্রদের বাড়ী চলে যাবেন।

কথাটা শুনেই বিরক্ত লাগল। এ মেসের মালিক কার্তিকবাবু। আমরা পয়সা দিয়ে থাকি, কিন্তু আমাদের সবারই একটা স্বাধীন সত্তা আছে। মর্যাদা আছে। এই কথাটা আমিই সময় মত কার্তিকবাবুকে বলতে পারতাম, ককাবাবুর বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক আমি চুপ করে গম্ভীর হয়ে রইলাম।

আমার মুখের চেহারা দেখে নৃপতি নিশ্চয়ই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারল। বললো, আপনি মন খারাপ করছেন কেন? ইচ্ছা না হলে যাবেন না। হাজার হোক পরের বাড়ীতে থাকার চাইতে মেসে থাকা অনেক আনন্দের।

আমি একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, নৃপতি, এ সংসারে সহজ সরল সাধারণ কথাগুলোই অধিকাংশ মানুষ বুঝতে চায় না বা বোঝে না।

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এসে আমাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে হাসতে হাসতে বললেন, তোমাকে আর ক্যাপসুল খেতে হবে না। ঐ সাদা ট্যাবলেট আরো তিন-দিন খেয়ে বন্ধ করে দিও। তারপর দিনকতক একটা টনিক খেও।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

হাসছি এই জন্য যে তুমি সুস্থ হয়ে গেছ। তোমাকে আর এই বুড়ো ডাক্তারের হাতে অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।

কার্তিকবাবু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। উনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি ও স্বাভাবিক খাওয়া-দাওয়া করতে পারে?

নিশ্চয়ই। এবার ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, আজ থেকে তুমি একটু-আধটু বাইরে বেরুতে শুরু করো।

এক মুহূর্তের জন্য চুপ করে থাকার পর আমি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, ডাক্তারবাবু আপনাকে ত বিশেষ কিছুই দিই নি। এবার অন্তে আস্তে সব শোধ করে দেব।

ডাক্তারবাবু হাসতে হাসতে বললেন,

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক
রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যার সূচীপত্র। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (চিঠিপত্র), **বাণী রায়** (রবীন্দ্রনাথের নারীস্বপ্ন), **হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** (উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ), **ভরত মুনি** (নাট্যশাস্ত্র), **আলপনা রায়চৌধুরী** (মধুসূদনের নাটকে গান), **কল্যাণ সেনগুপ্ত** (রবীন্দ্রনাথের চোখে সুন্দর), **শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়** ও **রমেন্দ্রনাথ মল্লিক** (গ্রন্থের আলোচনা)।
চিত্রসূচী। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**-অঙ্কিত প্রতিকৃতি।
ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র। প্রতি সংখ্যার মূল্য তিন টাকা
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭
পরিবেশক **জিজ্ঞাসা** ১এ কলেজ রো ও ১৩৩এ রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা

আমার কিচ্ছু পাওনা নেই। তুমি বোধহয় জান না, কর্তিকদা ধরে করবার করেন না।

আমি অবাক হয়ে কার্তিকবাবুর দিকে চাইতেই উনি বললেন, এখন তোমাকে টাকা-পয়সার চিন্তা করতে হবে না।

প্রশ্ন সঙ্গে সঙ্গেই ওরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আর আমি স্তব্ধ বিস্ময়ে ওদের চলে যাবার পথের দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

দুপুরে পেট ভরে মাছের ঝোল-ভাত খেয়ে কিমুনি এলেও ঘুমোন বারণ ছিল বলে একটা পুরনো পূজা সংখ্যা পড়ছিলাম। তারাশঙ্কর আর শরদিন্দুর দুটো বড় গল্প শেষ, কবে বনফুলের গল্পটা পড়তে পড়তেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে চোখ বন্ধ করেছিলাম। হঠাৎ নৃপতির ডাকাডাকিতে চোখ মেলে তাকিয়েই দেখি, দরজার কাছে অলপনা আর কল্পনা দাঁড়িয়ে।

একি? ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? ভিতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে কল্পনা আমার হাতে একটা ঠোঙ্গা দিতেই অলপনা বললো, মার ভীষণ মাথা ধরেছে বলে আমাদের পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু আপনারাই বা..

আপনারই না, তোমরা।

আমি একটু হেসে বললাম, বসো।

নৃপতি ঘর থেকে বেরুতেই অলপনা জিজ্ঞাসা করল, আজ কেমন আছেন?

ভাল।

(ক্রমশঃ)

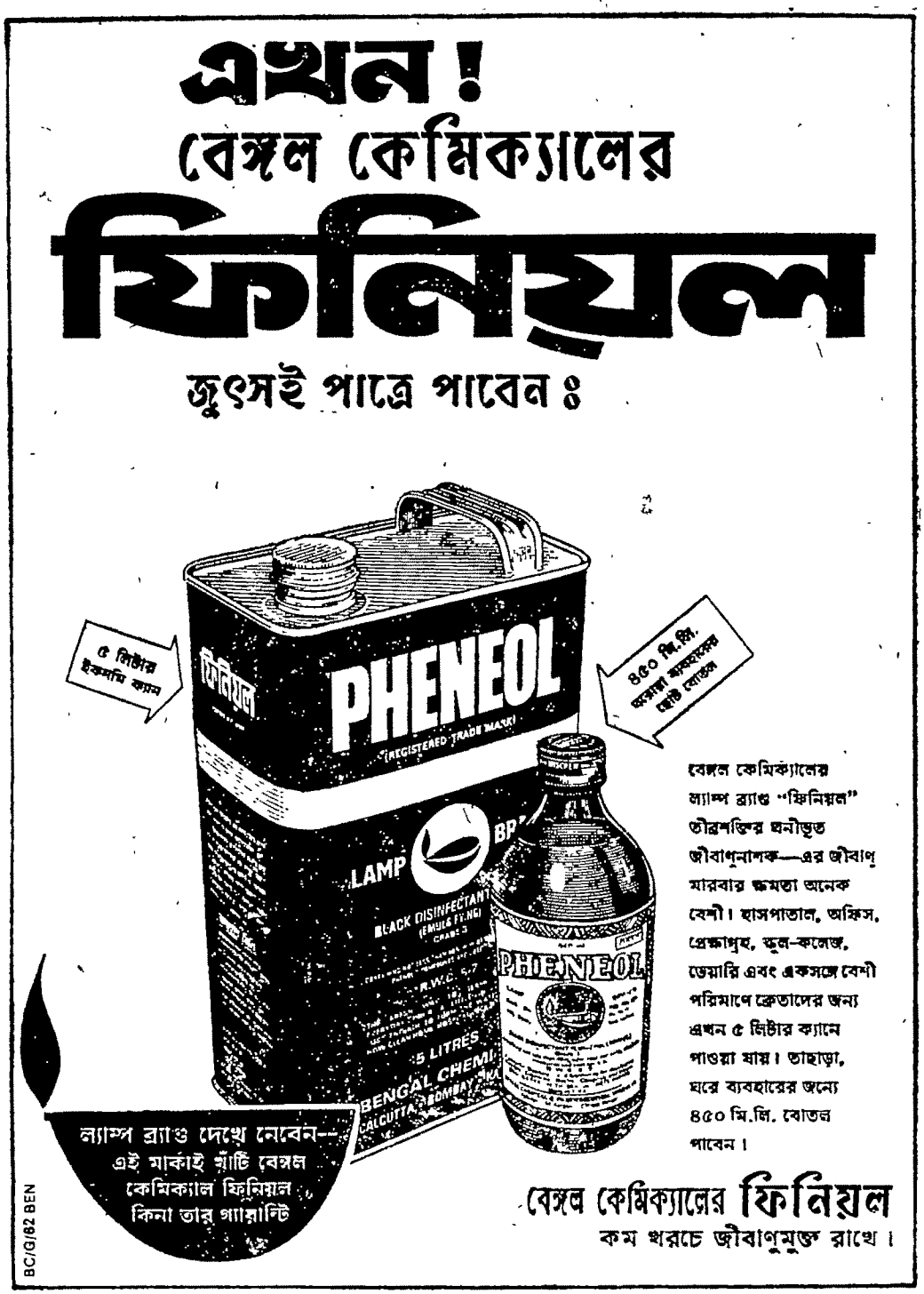

চার্বাকের পরামর্শ ॥

বনফুল

কেন তা জানে না কেউ
চারিদিকে কেন এত সমুদ্র ও ঢেউ
নানা আঁচের নানা ধাঁচের সমুদ্র
ছটফটে, থুতথুতে ক্ষুব্ধ বা রুদ্র।
কি এদের অভিসন্ধি, কিবা মতলব
এ নিয়ে বিস্তর শাস্ত্র বিস্তর বিজ্ঞান
দিবারাত্রি করে আনচান
তবু জানা যায় নাই সব।
পাওয়া গেছে পরস্পর-বিরোধী জবাব
শাস্ত্র-সম্রাট আর বিজ্ঞান-নবাব
যে চিন্তা-কল্প--দ্রুম বানিয়েছেন
তাতে জানিয়েছেন
সবই আজও ধোঁয়া-ধোঁয়া
জ্ঞান-পনসের কোয়া
এখনও অপুষ্ট।
শুনে কৌতূহলীরা হন না সন্তুষ্ট।
তাঁদের কিছুতে মেটে না পিয়াস
জিজ্ঞাসা-সমুদ্রে তাঁরা নন ট্যানটালাস।
চার্বাক বললেন আমি একটা পরামর্শ দি
এত জ্ঞান নিয়ে করবে কি ?
বেগুন পেয়েছ পুড়িয়ে কিম্বা ভেজেটেজে খাও,
বার্তাকু-তত্ত্ব নিয়ে কেন মাথা ঘামাও।
সমুদ্রকে এবং ঢেউকে উপভোগ কর
আর আনন্দ-সাগরে এনতার সাঁতর।

লতা মংগেশকার

বাংলা ও মহারাষ্ট্রের যেটুকু তফাৎ তা শুধুই বাইরের; ধ্যানে, চিন্তায় আবেগে আমরা এক ও অভিন্ন।

একালের গান

আপনিও বেশ কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন। সে গান আশাতীতভাবে রসোত্তীর্ণও হয়েছে। প্রতিভা যা স্পর্শ করে তাই সোনা হয়ে ওঠে। শুধু এ ব্যাখ্যাতেই মনটা খুশী থাকতে চায় না। এ গান আপনার কেন ভাল লাগে সেই কথাটা আপনার মুখ থেকেই শুনে নিতে ইচ্ছে করে।'—এইটেই ছিল লতা মংগেশকারের কাছে আমার প্রশ্ন। মানে, গত বছর যখন তিনি কন্যা মন্দিরের অনুষ্ঠানে কলকাতায় এসেছিলেন তখন।

'আমি সবশুদ্ধ চারটি কি পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি। বাংলা আমার ভাষা নয়, তবু তার গভীরের ছোঁওয়া লাগা অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে একটুও দেরী হয়নি। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে কোনটা জান? এ গানে শাস্ত্রীয় রাগ আছে। আছে কঠিন এবং অপ্রচলিত তাল। কিন্তু এসব ক্লিনিক্স গানের ভাবের সংগে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে যে গানে ঐসব সুর ছাড়া অন্য কোন সুর ভাবা যায় না। গভীর কথা কঠিন তালও এখানে কত সহজ হয়ে উঠেছে। এই সহজ হতে পারাটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য বলে আমার মনে হয়।

তখন অমৃতে সুরের আগুন চলছে। তাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথাটা আলোচনার মধ্যে এসে পড়েছিল। গান এবং সমসাময়িক কালের গানের সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামতের সংগে পরিচয় হয়েছিল তারও অনেক আগে যখন তিনি এসেছিলেন রঞ্জি স্টেডিয়ামের একটি অনুষ্ঠানে। শুধু গান নয় তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি এসেছিলাম তখনই।

আকাশ-ঝলসানো বিদ্যুতের মত ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত তাঁর কণ্ঠদীপ্তিতে চমকিত। হিন্দী ফিল্মের নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী লতা মংগেশকার। তবু তিনি তাঁর জমকালো খ্যাতির মত তাঁর অথবা ঝাঁকালো নন। বরং অফিসের মধ্যমণিরও অন্তরের গভীর এক ধ্যানমগ্না তপস্বিনী আবার প্রদীপের ঊর্ধ্বমুখী শিখার মতই সুন্দরের অভিসারী। এই কথাটিই গানের সুরের মত মনের তারে বাজিয়ে উঠেছিল সেই সময়ই, যখন লতাজী তাঁর অনবকাশের উজান ঠেলে কয়েক দিনের জন্য মাত্র কলকাতায় এসেছিলেন।

সেদিনটা বোধহয় কোনদিন ভুলব না। পার্ক হোটেলের প্রশস্ত ব্যাংকোয়েট হলে লতা মংগেশকারের সংগে সাংবাদিক

সম্মেলন। উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে সাংবাদিক মহলের সঙ্গে লতা মংগেশকারকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। মুশকিলেই পড়তে হত, যদি না অকূলে কান্ডারীর মত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এসে ব্যাংকোয়েট হলের সিংহদ্বার খুলিয়ে সাংবাদিকদের বসাবার ব্যবস্থা না করতেন।

এহেন গ্ল্যামারাস সম্মেলনে নায়িকা দ্বারপ্রান্তে দুটি গাছের হতেই বৃদ্ধ প্রৌঢ় নবীন প্রবীণ সব বয়সী সাংবাদিকেরই একশো নিরানব্বুই মাইল স্পীডে লতা-সান্নিধ্যে দৌড় রীতিমত উপভোগ্য দৃশ্য হয়ে উঠেছিল। ঠেলাঠেলির থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে আমি এ 'দৃশ্য যাকে বলে আস্বাদন করছি,—এমন সময় জনৈক অভিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট জন জ্ঞান দিলেন এসব ক্ষেত্রে নিজেরাই ইনিসিয়েটিভ নিয়ে এগোতে হয়। এত শাই হলে ঠকতে হবে।

আই ডু নট এগ্রি। সাংবাদিক ত বটেই সব দর্শক। সুতরাং দর্শনকরাটাও সাংবাদিকতারই অন্তর্গত।

যাই হোক গ্রামোফোন কোম্পানীর তদানীন্তন অধিকর্তা এ সি সেনই অবশেষে এক ফাঁকে শিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং সেই পরিচয়কে পাক্কা করলেন হেমন্তবাবু, সম্মেলন-শেষে বিস্তারিত বিবরণসহ।

এর পরদিনই পার্ক হোটেলের নিভৃত কক্ষে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ফর্মালিটির ড্রয়িংরুম থেকে লতাজীর অন্তরের অন্দর মহল ক্ষণিক প্রবেশের দুর্লভ লগ্ন এসে ছিল। তখনই জেনেছি নামের অন্তরালের সহজ সুন্দর মানুষটিকে। খুব সম্ভব সে দিনটা ছিল মঙ্গলবার। লতাজীর উপবাসের দিন। শুচিস্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাবের ছোঁওয়া লেগেছিল শিল্পীর প্রতিভা উদ্ভাসিত দুটি চোখে—সরল মুখশ্রীতে ভারী ভাল লাগছিল দেখতে।

আপনি ত বাঙ্গালী নন? তবু বাংলা গান আপনার কণ্ঠে অমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কেমন করে? আপনি নিশ্চয়ই বাংলা গান খুব ভালবাসেন?

জরুর। বাংলা দেশকে ভালবেসেই আমি বাংলা গানকে এমন করে ভালবাসতে শিখেছি। বাংলা ও মহারাষ্ট্রর যেটুকু তফাৎ তা শুধুই বাইরের,—মানে ভৌগোলিক সীমাগত। অন্তরে আমরা এক এবং অভিন্ন। দেখ বাংলাদেশের (তখন বাংলা দেশ বলতে ঢাকাকেই বোঝাত না) কত অভাবনীয় ভাগ্য-বিপর্যয়, ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখ-দারিদ্র্য। কিন্তু এত দুর্ভাগ্য দুর্বিপাকের মধ্যেও বাঙ্গালী বেঁচে আছে তার সংস্কৃতিকে আশ্রয় করেই। শত আঘাত সহ্য করেও ভোলে নি সাহিত্য, সঙ্গীত সুভাষ আর ক্ষুদিরামকে। প্যায়সা ইনকো জ্যাদা নেহি, লেকিন কালচার আউর ইনটেলেকটকো কোই জবাব নেই। আমাদের বাড়ীর সব্বাই শরৎচন্দ্রের খুব ভক্ত। মানুষের হৃদববেদনা, সংঘাত অশ্রুভরা আকুতিকে এমন সংবেদনশীল অন্তর দিয়ে খুব কম লেখকই দেখেছেন। খুব কম মানুষই পেরেছেন মানুষের নির্মম ব্যর্থতাকে এমন সম্ভ্রমভরা সমবেদনার আলোয় মেলে ধরতে। শরৎবাবুর সব বই পড়বার লোভেই আমি বাংলা ভাষা শিখি।

তাই তো বলছিলাম ধ্যানে চিন্তায় আবেগে, আমরা এক। বাঙ্গালী এত মার খেয়েও তার এস্থেটিক সেন্সেকে আঁকড়ে ধরে যেন অমৃতলোকে অবগাহন করতে চায়। তাই শিল্পীর প্রতি তাদের এমন সীমাহীন শ্রদ্ধা। সংস্কৃতির প্রতি এত প্রগাঢ় অনুরাগ। এই শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্যেই আমরা তীব্রভাবে বেঁচে আছি। এখানে বাইরের সকল পার্থক্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

আত্ম-উন্মোচনের চকিত দীপ্তিতে শিল্পীকে নতুন করে দেখে নিলাম। সুন্দরী নন। কিন্তু শ্রীমন্তিনী। গভীর বোধের নিবিড়তাই হয়ত তাঁর ব্যক্তিত্বে এমন একটা গ্যাম-কোমল ভাব এনেছে।

প্রথম বাংলা গান গাইলেন কি উপলক্ষে?

অমর-ভূপালীর বাংলা ভার্সনের সময় ভি শান্তারামের ইচ্ছে হোলো আমার দিয়ে গান গাওয়াবার। তখনই উনি গৌরীপ্রসন্ন বাবুকে বোম্বেতে আমন্ত্রণ করে এনে বাংলা গান লেখান আমি ও মান্না দে গাইলাম বাংলায় একটি ডুয়েট। তবে বাংলা গানের মর্মে প্রবেশ করতে শেখালেন দাদা।

হেমন্তবাবুকে আপনি দাদা বলেন, না?

শুধু বলি না। ওঁকে আমি দাদা বলেই মানি। আর এ মান্য যে কতখানি সেকথা আমাকে যাঁরা জানেন তাঁরাই জানেন। ওঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল গান শুনে 'আচলসে কোঁও বান্ধ লিয়া'—বোধহয় ১৯৪৬ সালে। ওঁর গান আমার খুব ভাল লেগেছিল। লেকিন উনকো সাথ মিলনেসে এ্যাইসা ইম্প্রেশন হুয়া থা যে উনকী দিল বহুত সাফ। এই সাদা মনের জন্যই ওঁর সাথে আমার যে ফ্যামিলী রিলেশন গড়ে উঠেছে তা নিখাদ।

মুহূর্তকাল আকোভর চুপ করে থেকেই আবার যেন চমকে উঠে বলতে শুরু করেন যাক কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, আনন্দ-মঠে আমি ও দাদা বন্দেমাতরম গাইলাম। সেটা ১৯৪৯ কি ৫০ সাল ঠিক মনে করতে পারছি না। তারপর 'তোমার হোল শুরু আমার হোল সারা' রেকর্ড হতে সবাই খুব তারিফ করলেন। মধুগন্ধে ভরা গানটিও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। বৌ-ঠাকুরাণীর হাটে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছি। তারপর সতী-নাথ মুখার্জির সুরে-গাওয়া 'কত নিশি গেছে নিদহারা ওগো' এবং 'আকাশ-প্রদীপ জ্বলে' রেকর্ড সবাই অসম্ভব নিয়েছে। গান দুটিতে সুরের নতুনত্ব আমায় অকুণ্ঠ করে। সতীনাথবাবু আমার গলার উপ-যোগী কাজ দিয়ে গানটি গাওয়া আরও সহজ করে দিয়েছিলেন। মিশর-এর ছবির প্রত্যেকটি গান কল্পনাতীতভাবে হিট করেছিল। তার পর 'বিদায় দে মা'। বাঘিনীর গানের সেন্সও উল্লেখ করবার মতই।

আর 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি?'

'ও গানের কথা ছেড়ে দাও।'

'কেন?'

অন্য সব গান গেয়েছি বাংলা গান গাইবার তাগিদে। ও গান গেয়েছি একটা দুর্বোধ্য প্রেরণাশক্তিতে। শৃঙ্খলমুক্ত উদ্দী-পনার আগুন জ্বলে উঠেছে ঐ গানেই। গাইবার সময় সেই কথাটাই বার বার অনু-ভব করেছি। ও গানকে আমার ইন্সপিরেশন সংও বলতে পার।

'বাংলাদেশের শিল্পীদের মধ্যে কার গান আপনার প্রিয়?'

সারগল। যদিও বাঙ্গালী নন, তবু ওঁর গাওয়া বাংলা গান আমায় বাংলা গান গাইবার প্রেরণা যুগিয়েছে।

কানন দেবীর কণ্ঠও আমার খুব ভাল লাগত (উনকী আওয়াজ মেরা বহুত পসন্দ)। যেমন একসপ্রেশন, তেমনই পার্সোনালিটি। সি ক্যারিজ এ ডিগনিটি উইথ হার।

এখনকার শিল্পীদের মধ্যে দাদা (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়), ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়। বাঙ্গালী শিল্পীমাত্রই সু-কণ্ঠের অধিকারী। কাকে ছেড়ে কার নাম করব?

আমার সব কথার এমন আন্তরিক অকপট জবাব পাচ্ছি যে আমারও একটা কথা মুক্তমনে স্বীকার করা উচিত। মানে স্বীকার না করা অবধি আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।

কি কথা? শিল্পী উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

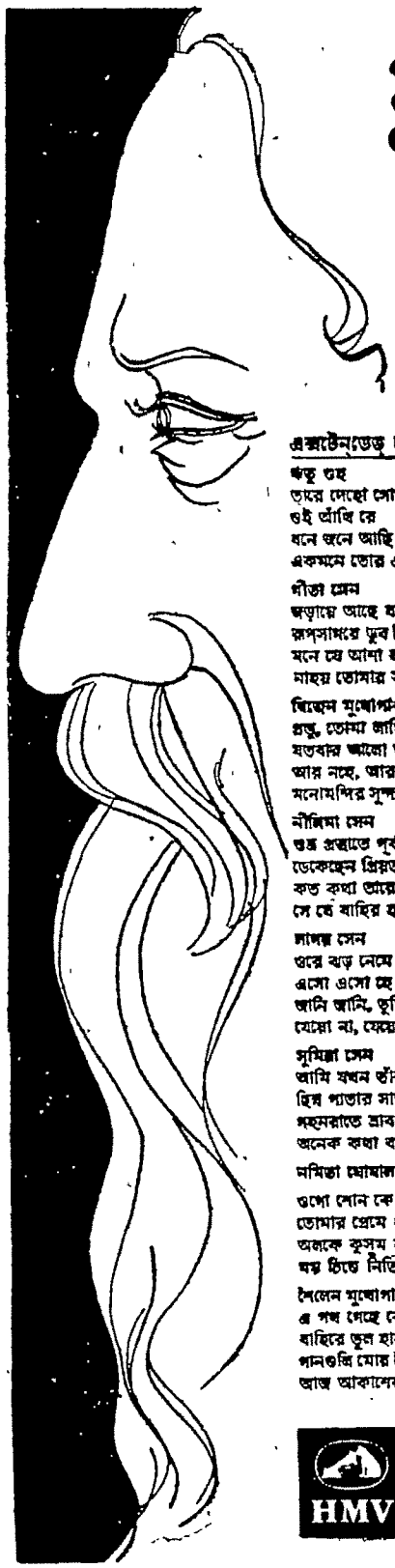

রবীন্দ্র সংগীতের নতুন রেকর্ড

চিরমধুর রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড সংকলন।
নবীন ও প্রবীণ শিল্পীদের কণ্ঠে গাওয়া এইচ-এম-ভির অনবদ্য অবদান।

এক্সটেন্‌ডেড প্লে রেকর্ডে

ঋতু গুহ
তুমর দেহো সো আমি
ওই আঁধি রে
বনে বনে আছি জড়ায়ে হায়
একমনে তোর একতারাতে

গীতা সেন
জড়ায়ে আছে রাধা
রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
মনে যে আশা করে এসেছি
নাহয় তোমার যা হচ্ছে তাই হক

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়
প্রভু, তোমা লাগি আঁখি জাগে
যতবার আলো জ্বালাতে চাই
আর নহে, আর নহে
মনোমন্দির সুন্দরী। মধ্যমঅঞ্চলীয় গুজরি

নীলিমা সেন
শুভ্র প্রভাতে পূর্ব গগনে
ডেকেছেন প্রিয়তম
কত কথা তারে ছিল বলিতে
সে যে বাহির হল আমি জানি।

লাভলু সেন
ওরে ঝড় নেমে আয়
এসো এসো হে তৃষ্ণার জল
আমি জানি, তুমি এসেছ এ পথে
যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে

সুমিত্রা সেন
আমি যখন তাঁর দুয়ারে
ছিল পাতার সাজাই তরণী
গহনরাতে শ্রাবণধারা পড়িছে ঝরে
অনেক কথা বলেছিলেম

নমিতা মোদ্দাল/বীথিন বন্দ্যোপাধ্যায়
ওগো শোন কে বাজায়
তোমার প্রেমে ধন্য করে যারে (বীথিন)
অলকে কুসুম না দিয়ো (বীথিন)
নয় চিতে নিতি নূতো (নমিতা)

শৈলেন মুখোপাধ্যায়/মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
এ পথ গেছে কোনখানে গো (শৈলেন)
বাহিরে ভুল হানবে যখন (মঞ্জু)
পানগুলি মোর শৈবালেরই দল (শৈলেন)
আজ আকাশের মনের কথা (মঞ্জু)

শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়/মঞ্জরী দাস
আমার ব্যথা যখন (শ্রীকুমার)
মধুর রূপে বিরাজো হে (মঞ্জরী)
তোমার শেষের গানের রেশ (শ্রীকুমার)
মধুর মধুর ধ্বনি বাজে (মঞ্জরী)

সুমিত্রা বসু/গীতা ঘটক
দুখের বেশে এসেছ ব'লে (সুমিত্রা)
এই-যে তোমার প্রেম ওগো (সুমিত্রা)
সময় কারো-যে নাই (গীতা)
আমি যে আর সইতে পারিনে (গীতা)

প্রদীপ ঘোষ
দেবতার গ্রাস (আবৃত্তি)

সুপার সেভেন্‌টি স্টিরিও রেকর্ডে

চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে
কাছে যবে ছিল
সে কোন্ বনের হরিণ
প্রথম আলোর চরণধ্বনি
আলোর অমল কমলখানি
একটুকু ছোঁওয়া লাগে

পূর্বা দাম/স্বপন গুপ্ত/শ্রীলা সেন
আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই (পূর্বা)
দুঃখের বরষায় চক্ষের জল (স্বপন)
ওরে কে রে এমন জাদায় তোকে (শ্রীলা)
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে (শ্রীলা)
ছি ছি চোখের জলে (স্বপন)
গান আমার যায় ভেসে যায় (পূর্বা)

পূরবী মুখোপাধ্যায়/রণো গুহঠাকুরতা/
প্রতিমা মুখোপাধ্যায়
দাও হে হৃদয় ভরে দাও (পূরবী)
তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ (রণো)
তুমি যে সুরের আগুন (প্রতিমা)
যে কেবল পাঁজিয়ে বেড়ায় (প্রতিমা)
উন্মাদিনী মাচে রূপরঙ্গে (রণো)
মরি লো কার বাঁশি (পূরবী)

স্বপ্না মোদ্দাল/গৌতম মিত্র/
অদিতি সেনগুপ্ত
শুভ্র নব শঙ্খ তব পদনখরি রাজে (স্বপ্না)
নিশা-অবসানে কে দিল (গৌতম)
যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে (অদিতি)
ধীরে ধীরে প্রাণে আমার (অদিতি)
তোমার লোসন কথাটি, সখী (গৌতম)
বকুলগন্ধে ধন্য এল (স্বপ্না)

স্টিরিও লং প্লে রেকর্ডে

'পথ ও পথিক'

কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়/
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়/সুচিত্রা মিত্র
ওগো পথের সাথী
(কণিকা,সুচিত্রা ও হেমন্ত)
গানের সুরের আসনখানি (সুচিত্রা)
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে (হেমন্ত)
পথ দিয়ে কে যায় গো চলে
(কণিকা ও সুচিত্রা)
পথ চেয়ে যে কেটে গেল (কণিকা)
পথের শেষ কোথায় (হেমন্ত ও কণিকা)
চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে
(কণিকা,সুচিত্রা ও হেমন্ত)
কবে তুমি আসবে ব'লে (কণিকা)
আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি
(কণিকা,সুচিত্রা ও হেমন্ত)
সে কোন্ পাগল যায় পথে তোর (সুচিত্রা)
তোমার বাস কোথা-যে, পথিক ওগো
(কণিকা, সুচিত্রা ও হেমন্ত)
ওরে কি শুনেছিস ঘুমের ঘোরে
(সুচিত্রা ও কণিকা)
ওরে সাবধানী পথিক (হেমন্ত)
কে বলে "যাও যাও"(সুচিত্রা ও হেমন্ত)
'মোর হেমন্ত ফ্রম টেগোর' (২য় খণ্ড)

অর্ঘ্য সেন/মায়া সেন/
কৃষ্ণা গুহঠাকুরতা/বনানী ঘোষ/
বাণী ঠাকুর/শৈলেন দাস/
সুশীল মল্লিক/সুবীর সেন
অন্তজনে দেহো আলো (মায়া)
আজি রাজ-আসনে তোমারে (সুশীল)
সংসারে তুমি রাখিলে মোরে (বনানী)
আমার এ ঘরে আপনার করে (অর্ঘ্য)
দাঁড়াও আমার আঁখির আগে (বাণী)
ঐ শুনি যেন চরণধ্বনি রে (শৈলেন)
কোথায় তুমি, আমি কোথায় (কৃষ্ণা)
কেন তোমরা আমায় ডাক' (সুবীর)
আমি স্বপনে রয়েছি ভোর (কৃষ্ণা)
দিবসরজনী আমি যেন কার (সুবীর)
ফুল তুলিতে ভুল করেছি (বাণী)
আকাশে তোর তেমনি (শৈলেন)
আমি চঞ্চল হে (মায়া)
দ্বারে কেন দিলে নাড়া (অর্ঘ্য)
দেখে যা, দেখে যা, (বনানী)
কে যেতেছিস, আয় রে হেথা (সুশীল)

HMV
হিজ মাস্টার্স ভয়েস
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

GC 8809

আপনি জনপ্রিয় বহু দিনই। কিন্তু আমার প্রিয় শিল্পী হয়ে উঠলেন 'না যেও না' এবং তারও অনেক পরে 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' শোনবার পরে। একথা বলবার কোন প্রয়োজন হত না যদি না তার আগে মনের অতলে একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা থাকত আপনার জনপ্রিয়তার প্রতি।

'কি রকম?' লতাজীর ঠোঁটের কোণে কৌতুকী হাসি ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

ভাবতাম প্লে-ব্যাক সিঙ্গার, অপরিণত তরুণ দলের হিরোইন—লতা মংগেশকার হাল্কা গানের পাল তুলে অসম্ভব রকমের নাম করে ফেলেছেন—নইলে ওঁকে নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করার কি আছে? যে অজ্ঞতাজাত উন্নাসিকতার ফেরে মানুষ অনেক সময় সত্যিকারের গুণীর প্রতিও অবিচার করে ফেলে সেই রকম একটা নেশায় পেয়ে বসেছিল। অজ্ঞাতেই মনে হত ক্ল্যাসিক্যাল শ্রোতাদের আপনার কাছে কিছু পাবার নেই।

'তারপর?' দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে হাসি চেপে প্রশ্ন করেন লতাজী।

'বর্তমান ক্ল্যাসিক্যাল গানের এক উজ্জ্বল তারকা এ ভুল ভাঙালেন।

কে?

সুনন্দা পট্টনায়ক। যিনি একদিন 'না যেও না' গানটি আপনমনে গাইছিলেন। গাইবার পর বললেন 'লতার গলা বলেই গানটা এমন অদ্ভুতভাবে উতরেছে। আমি প্রতিবাদ করে বলেছিলাম 'কখনো নয়। গানের সুরটা খুব ভাল। যে কোন মিডিওকার আর্টিস্টকে দিয়ে গাওয়ালেই ভাল শোনাত।' উনি বললেন, 'কোন আর্টিস্টের ওপর কটাক্ষ না করেই বলছি অমন হাই-পিচ-ড ভয়েস, গাইবার আবেগ আর সিল্কের মত সূক্ষ্ম শ্রুতি না থাকলে ও গানটা এমন এ্যাপিলিং হত না। সিনেমা-টিনেমা আমিও বিশেষ দেখি না। তবে লতা মংগেশকরের হিন্দী ফিল্মের অনেক গান রেডিওতে শুনে মনে হয়েছে ওঁর নিশ্চয়ই ক্ল্যাসিক্যাল বেসিস আছে। নইলে নিছক ভাল গলার জোরেই এমন পার ফেকট সুরে কেউ গাইতে পারে না। আপনার এবং আশা ভোঁসলের অনেক হিন্দী গান উনি হার্দা-প্রয়োগ করে গেয়ে দেখালেন কিভাবে কোথায় কোন রাগের ছোঁয়া শুদ্ধভাবে লেগেছে বলে গানের রূপ পাল্টে গেছে। অশিক্ষিত কণ্ঠ পরিবেশিত হলে ও গান কি চেহারা নিতো তাও দেখালেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীর লেবেলেই আপনার লং-প্লেয়িং হন্টিং মেলডিজ অফ লতা মংগেশকার শুনেও একথার সত্যতা অনুভব করেছি। সব গানই যে জল লেগেছে তা নয়। তবে কিছু গান অসাধারণ মনে হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই একটা প্রশ্ন করছি। বাঙ্গালী সুরকারদের মধ্যে কে আপনার প্রিয়?'

'দাদা ত আছেনই। সলিলদাও বহুত আচ্ছা কম্পোজার। ওঁর সব সময় নতুন কিছু করবার দিকে খুব ঝোঁক গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার পথ বেছে নেবার দুঃসাহস এবং নিজের আইডিয়াকে এস্ট্যাবলিশ করা সোজা নয়। কিন্তু উনি তা পেরেছেন। সলিলদার হিট সং-এর যে লং প্লেয়িং রেকর্ড বেরিয়েছে তার মধ্যে 'না যেও না' যুক্ত হয়েছে দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিলো। আমিই শুধু বাংলাদেশকে তাহলে ভালো বাসিনি, বাঙালীও আমায় আপন ভাবতে পেরেছে।'

সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠিত হবার কাহিনী প্রসঙ্গে লতাজী বললেন 'আমার বাবা দীননাথ মংগেশকর আমার গানের প্রেরণা উৎস সবকিছুই। তাঁর কাছেই আমার সংগীত-শিক্ষা শুরু। বাবা ছিলেন স্টেজ-সিংগার তাঁর নিজস্ব মঞ্চ নাট্য-সম্প্রদায় সবই ছিলো। ছোটবেলা থেকেই দেখতাম বাবা গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজছেন। সেই গানই ফিনিশড্ হয়ে স্টেজে যখন গাওয়া হোতো তার রূপ বদলে যেতো। আর দর্শকদের সে কি উল্লাস।

এইসব দেখেশুনে গান গাওয়াটা আমার কাছে ঠিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই সহজ ও স্বাভাবিক হয়েছিলো। তারপর আস্তে আস্তে ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় ও গান করে করে গান হয়ে উঠলো আমার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।'

'আমার অনুমান যদি ভুল না হয় ক্ল্যাসিক্যাল গানেও আপনার তালিম আছে।'

'ন' বছর বয়স থেকেই বাইরে গাইতে শুরু করেছিলাম স্টেজকে কেন্দ্র করেই। এই সময়ই আমানালি খাঁ নামে এক ওস্তাদের কাছে ক্ল্যাসিক্যাল গানের তালিম নিতাম। ১৯৪৫ সালে সেলাপুর কনফারেন্সে আমার গাওয়া 'খাম্বাবতী' রাগ খুব এ্যাপ্রিশিয়েটেড হয়েছিলো। এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একদিন বাবাকে হারালাম। চোখের সামনে নেমে এলো অন্ধকার। মাথার ওপর পুরো ফ্যামিলীর দায়িত্বের তাড়নাতেই বোধহয় ভেঙ্গে পড়িনি।

বয়স তখন জোর তেরো। কিন্তু মনের বয়স যেন দেহকে ছাপিয়ে উঠলো। বাবা থাকতেই এ লাইনের অনেকের সাথে যোগাযোগ হয়েছিলো, তাঁরাই সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন।

মরাঠী ছবিতে গান ও অভিনয় করে সংসার চালাতাম। ১৯৪২ সালেই বোধহয় প্রথম প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে গেয়েছি। গানটা আজও মনে আছে 'কিতি হসালো'। ১৯৪৭ সালে মস্তবড় মারাঠী অভিনেতা মাঃ বিনায়কের সুপারভিশনে প্রফুল্ল পিকচার্সের একটি ছবির কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। এ ছবির গানটি হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রেকর্ড হয়েছিলো। গানটি হচ্ছে 'তুম স্বপনী পাহিলে', আস্তে আস্তে ব্যাকগ্রাউন্ড সিংগার হিসেবে নাম হতে লাগলো। প্রতিষ্ঠিত হলাম প্লে-ব্যাক সিঙ্গার রূপে।

'আর ভারতজোড়া খ্যাতির অধিকারিণী হলেন কবে থেকে?'

'কোনো বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ব্যাপার এটা নয়' একটু হেসে লতাজী বললেন 'বোম্বের বিভিন্ন ছবিতে প্লে-ব্যাক করার আমন্ত্রণ আসতে লাগলো। তারপর প্রতিভাবান সুরকারের সুর গীতিকারের কথা এবং ডিরেকটারের অ্যাপ্লিকেশনের গুণে এইসব ফিল্মের গান হিট করতে লাগলো।'

'আর শিল্পীর গাইবার কুশলতা বুঝি কিছুই না?'

'আছে হয়তো। তবে অন্যান্য ফ্যাক্টর-গুলোকেও উপেক্ষা করা যায় না। শিল্পী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

'ফার্স্ট সাকসেস আমার হিন্দী ছবির 'মজবুর' গানে। তারপর আন্দাজ, বরসাত (১৯৪৭) বহৎ, মহল এইভাবে চেন্স শুরু হোলো।'

'ফিল্ম আর্টিস্টদের মধ্যে আপনার ফেভারিট?'

'মীনাকুমারী দীলিপকুমার। ক্যামেস্ট্রির অ্যাকটরদের মধ্যে'

'আর বাংলো?'

'বাংলা সিনেমা দেখার সুযোগ খুব কমই হয়। তবু যেটুকু ইম্প্রেশন আছে উত্তমকুমার অবশ্যই বড় আর্টিস্ট। উনকা বাদ সৌমিত্র। পলাতকে রবীন মজুমদারের পার্টও খুব ভালো লেগেছিলো। মাধবীর অভিনয় সুন্দর। বহুদিন আগে কাবেরী বোস বলে একটি মেয়ের দু একটি ছবি খুব ভালো লেগেছে। এছাড়া রবি ঘোষের সিরিও-কমিক অজিত চ্যাটার্জির কমিক পার্ট ভালো না লেগে উপায় নেই।'

'এবারে (১৯৬৮) কোলকাতার শ্রোতাদের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লো?'

'বড় মর্মঘাতী পরিবর্তন। বাংলাদেশকে ভালবাসি বলেই এত লেগেছে। আগে বাঙালী শ্রোতারা সিরিয়াস গান লিরিকাল বিউটি বা গপ্রধান খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন। এখন? টেস্ট বহুৎ চীপ হো গয়া। সারা হিন্দুস্থানে বাংলাদেশের মত গুণের আদর কোথাও নেই, শিল্পীকে এমন রাজসম্মান আর কেউ দিতে জানে না। এত ভক্তি এত প্রেম। তাই ত এদের নিম্নগামী রুচি এত বাধা দেয়। এবার নন্দন বাগের ওপর ছোট একটা গান গাইলাম। কেউ গোলমাল করেনি। কিন্তু বিশেষ খুশী হোলো বলেও মনে হোলো না। তারপর আমি ও কিশোরদা সুলেমান সুলতানার গাইতে না গাইতে বাঁধভাঙা খুশীর স্রোতের সারা স্টেডিয়াম টলমল। ইট ইজ বিয়ন্ড ক্রিটিসিজম। এদেশের শ্রোতারা যদি এই হন বড় কিছুর আশা করা যায় কি?'

'যদি অভয় দেন আর একটা প্রশ্ন করি।'

'ভয়-অভয়ের প্রশ্ন ওঠে তখনই যখন মানুষ থেকে বাইরের মানুষ। কিন্তু ঘনিষ্ঠ হবার পরও এ-প্রশ্ন আসে কি?' বরাভয়ের হাসিতে শিল্পীর মুখ ঝলমলে।

'ধন্যবাদ। কথাটা হচ্ছে এই যে আপনি এমন অসাধারণ কণ্ঠসম্পদের অধিকারিণী। আপনার রাগসংগীতের শিক্ষা আছে। গভীর-বোধের দিব্য আলোয় চিত্ত উদ্ভাসিত। কিন্তু এতগুলো সম্পদ অবহেলা করে জনপ্রিয়তার সস্তাদরে নিজের প্রতিভাকে কেন বিকিয়ে দিচ্ছেন? হোয়াই আর ইউ ওয়েস্টিং ইওর-সেল্ফ ইন দ্যাট ওয়ে?'

লতাজীর দুচোখে নেমে আসে বিষণ্ণ ছায়া' ঐটেই ত শিল্পীজীবনের ট্র্যাজেডী। মন যা চায় তাকে চোখ ঠারিয়ে রাখতে হয় বাস্তব জীবনের চাহিদার তাগিদে। আগেই বলেছি বাবা চলে যাবার পর অল্পবয়সেই সংসারের দায়িত্ব এসে পড়েছিলো তাই কমার্শিয়াল সাকসেসের সহজ পথটাই বেছে নিতে হোলো। এছাড়া এসট্যাবলিশড হওয়ার কোনো উপায় ছিলো না।

'এখন ত আপনি দাবুসভাবে এস-ট্যাবলিশড। নাউ ইউ ক্যান প্রেসিড ইন ইওর ওন ওয়ে। এখন লোকে নেবে আপনার শিল্পীবাক্তিত্বের আকর্ষণে। এমন কিছু দিয়ে যান যা যুগের সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। ভাবীকালের শ্রোতারও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে। আপনার মীরার ভজনের লংপ্লেয়িং রেকর্ড শুনে মনে হয়েছে আপনার কাছে আমাদের আসল পাওনা এখনও বাকী রয়ে গেছে।'

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললেন যাবার খুব তাড়া আছে?'

'এহেন সঙ্গী পেয়েও যাওয়ার জন্য তাড়া করব এত বেরসিক আমি নই।'

'তাহলে আমার সদ্য প্রকাশিত আর একটি লং-প্লেয়িং শোনাই। হয়ত তোমার ভালো লাগবে।'

রেকর্ডটি দেখলাম কভার জুড়ে শ্রীকৃষ্ণের বরাভয় মূর্তি, তারই পদতলে প্রণত পার্থ-সারথী। শ্রীমদ্ভাগবত গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে অর্জুন যখন স্বজনবধের শঙ্কায় যুদ্ধে পরাঙ্মুখ তাঁর সামনে শ্রীকৃষ্ণ মেলে ধরেছেন বিশ্বরূপের বিরাট পটভূমিকা, সত্যের চরম রূপ। অরূপের প্রকাশ অপরূপ কল্পনায়, প্রতিটি শ্লোক শিল্পীর কণ্ঠ-লালিত্যের অনুরণনে উচ্চারণ সৌন্দর্যে ভক্তিভাবের আকুলতায় যেন পূজারতি হয়ে উঠেছে। মনে হোলো আরাধিকার অন্তর-গহনের এক উন্মেল আকৃতি যেন গান হয়ে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করছে পরমাত্মার চরণে, কল্যাণ রাগে শুরু। তারপর জয়-জয়ন্তী দরবারী কানাড়া ভৈরব জৌনপুরী পীলুর এক একটি পর্যায় অতিক্রম করে ভৈরবীর বুকে যেন অস্তঃ পড়লো।

অন্যদিকে ধ্যানদেব-স্তুতি। ধ্যানদেব আমাদের মারাঠী সাধক। বোধহয় ১২৯০ সালে মাত্র আঠারো বছর বয়সে ধ্যানদেব গোদাবরী নদীর তীরে ভগবদ্গীতা শুনিয়ে-ছিলেন। সেই ন হাজারের ওপর শ্লোক ভিত্তি করেই মারাঠী ভাষার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ধ্যানে-শ্বরীর শুরু। ভগবদ্গীতার সঙ্গে এর ভাব একই ছন্দে বাঁধা।

'কেমন লাগলো?'

'এ-কথাও কি মুখে বলবার? আশ্চর্য লাগে ভাবতে এমন গভীর ভাবের ভাবুক হয়েও আপনি অমন নাটুকে হিন্দী গানের কোলাহলে দিনের অধিকাংশ সময় কাটান কেমন করে? আপনার ধৈর্য অসাধারণ।'

'এ ধৈর্যের দীক্ষা কার কাছে জান? তোমাদেরই স্বামীজি, আমার বাবা ওঁর ভক্ত ছিলেন বলেই ওঁর প্রতি আকর্ষণ আমার জন্মগত। দশ বারো বছর বয়সে বাংলা থেকে ওঁর সম্বন্ধে প্রেমানন্দের মারাঠী অনুবাদ পড়ে আমার বিস্ময় যেন আর বাধা মানে না। সেই থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ আমার ধ্যান-জ্ঞান জপ-মন্ত্র। আমার লকেটে ওঁরই মূর্তি। দাদার কাছে একটা গান শুনেছিলাম-শ্যামার ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে জানিনে শুধু তোমারে জানি।' ঐ ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে করে আমিও ঈশ্বরধর্ম বলতে স্বামীজিকেই জানি। ওঁর ছবি দেখলে মনে হয় তরুণ তাপস। বাংলাদেশের শত দুঃখ-মন্থন-করা অমিত শক্তির। বাঙালী হিন্দুর প্রার্থনা যেন সকল দৈন্য জয় জীবনের সকল ক্ষুদ্রতাকে উপেক্ষা করে ঐ সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আগুনের ভাষায় বলেছে 'আমরা মরেছি, আমরা মরেছি কিন্তু আমরা ফুলের মত ফুটে উঠেছি'—ঐ যৌবনদৃপ্ত সাধকের ধ্যানে ভারতের ত্যাগের ধর্ম যেন কথা বলে উঠেছে ঐ হিমালয় ব্যক্তিত্বের কর্মজীবনে। ওঁকেই আমি ভারতের প্রাণপুরুষ বলে জানি। আর এ-হেন ব্যক্তি জন্মেছেন বাংলাদেশে, তাই বাংলাদেশ আমার কাছে তীর্থক্ষেত্র।

গত বছর ১ বৈশাখ (এপ্রিলে) লতা আবার এসেছিলেন। কলামন্দিরের অনুষ্ঠানে কয়েকটি গান গেয়ে উনি বললেন 'এ আসরে আমার পরম শ্রদ্ধেয়া কানন দেবী উপস্থিত আছেন, তিনি আমার কাছে বাংলা গান শুনতে চেয়েছেন। খুব আফশোষ হচ্ছে তাঁর আদেশ মানতে পারলাম না বলে। আমার বাংলা গানের খাতা আনিনি, পরের বার নিশ্চয় শোনাব।'

গানের পর মঞ্চ থেকে নেমে এসে কানন দেবীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। মুগ্ধ হতে হোলো গুণীকে শ্রদ্ধা জানাবার আন্তরিকতা দেখে।

এর পরদিনই আমার সঙ্গে দেখা হোলো গ্রান্ড হোটেলের একটি কক্ষে। উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে চেয়ে বললেন 'এবার আর একটি মীরার ভজনের এল-পি বেরিয়েছে। আমার ভাই সুর দিয়েছে, শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'আমি এখন বেশীরভাগ সিরিয়াস গানেই নিজেকে কনসেনট্রেট করছি।'

'কিকজ ইউ আর সিরিয়াস বাই নেচার।'

'থ্যাংক ইউ।'

'আমিও আপনাকে একটি সুখবর দিচ্ছি। এখন কলকাতায় হৈ-চৈ হল্লার গান প্রায় স্তিমিত (পূজোবাড়ীর মাইক্রোফোন ছাড়া)। সারা কলকাতার অধিকাংশ আসরই রবীন্দ্র-সঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের।'

এইটেই ত একসপেকটেড। কারণ বাঙালী প্রকৃতিতে সৌন্দর্যধ্যানী, এবার আমার কলকাতা আসা সার্থক। কানন দেবীকে দেখলাম। তাঁকে প্রণাম করলাম। তাঁর আদর আশীর্বাদ দুই-ই নিয়ে যেতে পারলাম বলে। এইসব মানুষের আশীর্বাদই জীবনে নতুন প্রাণশক্তির জোয়ার আনে। ওঁর গান কে না ভালবাসে? কিন্তু মাথা নত হয়ে যায় ঐ আশ্চর্য চরিত্রের কাছে। কতবড় শক্তিতে জীবনের সকল বাধা জয় করে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। ওঁর মধ্যে যেন আমি মহাশক্তিময়ী মাকে দেখলাম।

দুজনেই চুপ করে ছিলাম। আসবার সময় একটি লং-প্লেয়িং মীরার ভজন ও একটি মোহর আমার হাতে দিয়ে বলেন 'কানন দেবীর কাছে পৌঁছে দিও প্লিজ। বাংলা লতার নববর্ষের প্রণামী নইলো ঘরোয়াসীর চরণে, গ্রহণ করে যেন তাকে ধন্য করেন।

সন্ধ্যা সেন

রবীন্দ্র পুরস্কার

সাহিত্য পুরস্কার

এ-বছর সাহিত্যরচনার জন্য 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছেন প্রখ্যাত লেখক শ্রীসতীকান্ত গুহ। তাঁর পুরস্কৃত উপন্যাস 'ন্যাটাকর' প্রকাশিত হয়েছিল অমৃতেই। তা ছাড়া তাঁর প্রায় সবগুলি উল্লেখযোগ্য গল্পও বেরিয়েছে এখানেই। অমৃতের পাঠকদের কাছে তিনি সুপরিচিত। স্মরণযোগ্য সাহিত্য রচনার জন্য তিনি পুরস্কৃতও হয়েছেন অনেক আগেই। প্রথমে তিনি শিশু সাহিত্যের জন্য পান 'মৌচাক' পত্রিকার পক্ষ থেকে সুধীরচন্দ্র পুরস্কার। তারপর পান সাহিত্যক্ষেত্রে সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিতে অমৃতবাজার পত্রিকা যুগান্তর ও অমৃতের পক্ষ থেকে 'মতিলাল পুরস্কার'।

রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত শ্রীসতীকান্ত গুহ শিশুসাহিত্য কবিতা নাটক গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর রচনায় শিল্পিক উৎকর্ষের সঙ্গে রয়েছে এমন এক দার্শনিক মনস্বিতা যা আমাদের জীবনের অন্য অর্থের দিকে উদ্বুদ্ধ করে।

সতীকান্ত গুহ

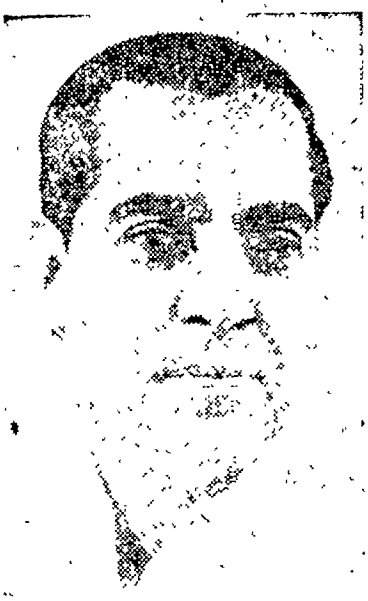

বিজ্ঞান পুরস্কার

বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য দ্বিতীয় রবীন্দ্র-পুরস্কারটি পেয়েছেন অবনীপতন ভট্টাচার্য। 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' গ্রন্থটির জন্য শ্রীভট্টাচার্যকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর পুরস্কার

শিশুসাহিত্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সুনির্মল বসু প্রথম বছরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন। পরলোকগত এই শিশু-সাহিত্যিক যে কজন সাহিত্যিক সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটিকে উর্বরতা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।

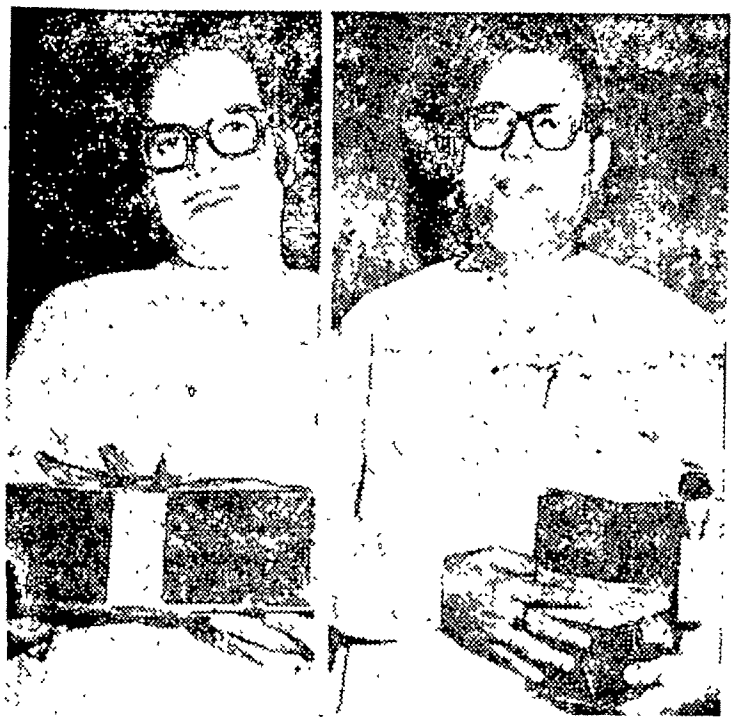

পুরস্কৃত অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

এ বছরের সাহিত্য পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান :

অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, অমৃত এবং মৌচাক পত্রিকার উদ্যোগে এ বছরের সাহিত্যবাসরের অনুষ্ঠান ১২ মে সরলা মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ঔপন্যাসিক এবং প্রাবন্ধিককে সম্মান জানানো হয়। এবছর অমৃতবাজার যুগান্তর ও অমৃত পত্রিকা প্রদত্ত শিশিরকুমার পুরস্কার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেওয়া হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে রচনার জন্যই তাঁর এই পুরস্কার। ঔপন্যাসিক এবং গল্পকার অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য লাভ করেন 'মতিলাল পুরস্কার'।

মৌচাক পত্রিকা প্রদত্ত সুধীরচন্দ্র সরকার পুরস্কার পেলেন ইন্দিরা দেবী। শৈব্যা পুস্তকালয়ের দেওয়া রঞ্জিত স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হলেন শিবশংকর মিত্র। সদ্য পরলোকগত কবি দুর্গাদাস সরকার প্রসাদ পত্রিকার দেওয়া সত্যেন্দ্রনাথ পুরস্কার পেলেন। প্রশান্তোষ ঘটক স্মৃতি দেওয়া হোল সুধা বসুকে। 'প্রসাদ' পত্রিকার দেওয়া নাটকের জন্যে গিরিশ পুরস্কার পেলেন মনোবিজ্ঞানী ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সাহিত্য বাসরের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ শারীরিক অসুস্থতার কারণে উপস্থিত থাকতে না পারায় স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীপ্রতুল গুপ্ত। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজেন মুখোপাধ্যায়।

নিখিল বঙ্গ শিশু সাহিত্য সম্মেলন

সম্প্রতি গোখেল মেমোরিয়াল স্কুলে শিশুসাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ শিশুসাহিত্য সম্মেলনের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেল। সম্মেলনের বিভিন্ন দিনে সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রতুল গুপ্ত। সম্মেলনের পক্ষ থেকে শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। সম্বর্ধিত শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিলেন চারুচন্দ্র চক্র-

ভাষণ দিচ্ছেন
প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

সংগীত পরিবেশন করছেন
দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

বতী পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী মহেন্দ্রনাথ দত্ত সমর দে এবং হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এবং রবিদাস সহায়রায়। আলোচনা সভায় যোগ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, লীলা মজুমদার ধীরেন্দ্রলাল ধর, নলিনী দাস ও অজেয় রায়।

সে ভিয়েত প্রাচ্যবিদের ফিরদৌসি পুরস্কার লাভ

মধ্যযুগীয় প্রাচ্যের মহাকবি 'শাহনামা'র অমর স্রষ্টা ফিরদৌসির নামাঙ্কিত ফিরদৌসি পুরস্কারে এবছর সম্মানিত হয়েছেন সোভিয়েত প্রাচ্যবিদ লেনিনগ্রাদ রাষ্ট্রীয় হারমিটেজ সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ আকাদেমিসিয়ান বি বি পিওতরোভস্কি এবং তাসখন্দ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম এম শহমুখমেদভ। এঁরা যুগ্মভাবে এই পুরস্কার পেয়েছেন।

চার্ব।—

নতুন বই

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাবনা : পুলকেশ দে সরকার। দত্ত চৌধুরী অ্যান্ড সন্স এম টি ৭২এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭। ষোল টাকা।

প্রবীণ সাংবাদিক গবেষণার মাধ্যমে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এ যাবৎ প্রায় অজ্ঞাত রাজনৈতিক ভাবনার একটি রূপরেখা আলোচ্য গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর আগে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' নামে একটি মিতায়তন গ্রন্থে প্রথম অপরাজেয় কথাকারের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কর্মকলেডের কিছুটা পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থ শুধু তার পরিপূরক নয়, শচীনন্দনবাবুর গ্রন্থে আলোচিত বহু প্রসঙ্গও এই পুস্তকে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। এমনকি আপাতবিচারে অপ্রাসঙ্গিক রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ অরবিন্দ ঘোষের রাজনৈতিক ভাবনারও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লেখক তুলে ধরেছেন। এই সমস্ত মনীষীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের চিন্তাধারার কতটুকু মিল অথবা কোথায় মূলগত বিরোধ তার ব্যাখ্যা ঐ অংশে পাওয়া যাবে। শরৎচন্দ্রের 'মহাত্মা'; রবীন্দ্রনাথের 'মহাত্মা' তরুণের বিদ্রোহ, বিপ্লব শরৎচন্দ্র কি সোস্যালিষ্ট ছিলেন ইত্যাদি অধ্যায়গুলি ভাবনা-উদ্দীপক ও নানা অজ্ঞাত-পূর্ব তথ্যে ভরা। লেখক যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন তার পরিচয় এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। তবে সংকলকের 'গৃহিনীপনা'র পরিচয় সর্বত্র তেমন স্পষ্ট নয়। বিষয়-বিন্যাস কিছুটা এলোমেলো। গ্রন্থের শেষে যে 'পরিশিষ্ট' ও নির্দেশিকা সংযোজিত সে দুটি অনেকের কাজে লাগবে। শরৎচন্দ্রের পদত্যাগ প্রসঙ্গে যে দুটি চিঠির ফটো-প্রতিলিপি মুদ্রিত সে দুটিও মূল্যবান দলিল।

সংস্কৃত নাটকের গল্প : অমিতা চক্রবর্তী। সাহিত্য সংসদ। ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। কলকাতা ৭০০০০৯। দাম: আট টাকা।

ভাস; কালিদাস; শূদ্রক; হর্ষ; বিশাখদত্ত; ভবভূতি রচিত নাটকের গল্প অবলম্বনে শ্রীমতী অমিতা চক্রবর্তী সংস্কৃত নাটকের গল্প' বইখানি লিখেছেন। মোট দশখানি নাটকের কাহিনী সমৃদ্ধ এই বইটি থেকে একালের পাঠক প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। লেখিকার ভাষা আরও আধুনিক হলে বইখানির কেবল আকর্ষণই নয় গুরুত্বও অনেক বাড়ত। শেকসপিয়রের নাটকগুলিকে সাধারণের জন্য লিখে আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন চার্লস ল্যাম্ব। এর অন্যতম কারণ ল্যাম্বের রমণীয় ভাষা যা সব বয়সের সব শ্রেণীর পাঠকের কাছে সমান আদরণীয়। লেখিকা ল্যাম্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করেছেন। কিন্তু তিনি যদি ল্যাম্বকে সত্য অর্থে অনুসরণ করতেন তাহলে আমরা আরো উপকৃত হতাম।

স্বয়ং নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী (গল্প সংগ্রহ) প্রভাস ভদ্র। লিপিকা ৩০।১।এ কলেজ রো কলকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

ছটি গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পটি (সূর্যের মুখ চেয়ে) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সুখ সম্পদের নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতি লোভবশত নিজের নোংরা পারিবারিক পরিমন্ডল, যেখানে তার ইচ্ছা-মন-বিবেক দলিত হচ্ছে, সেই পরিমন্ডলকে সেই দলনকে মেনে নিতে বাধ্য হওয়া নায়কের যন্ত্রণাবোধ খুব ভালোভাবেই ফুটে উঠেছে। ঋতুবদলের কাহিনী গতানুগতিক। তরুণ জীবনের বেকারী ও অন্যান্য জ্বালাযন্ত্রণাই গল্পগুলির মূল বিষয়। এবং দু-তিনটি গল্পে তা ভালোভাবেই ফোটাতে পেরেছেন লেখক। লেখারও রীতিমত মুন্সিয়ানা আছে। সেই সঙ্গে আছে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য।

মধ্যদিনের মঞ্জরী (উপন্যাস)—চোমং লামা। কাঞ্চনজঙ্ঘা পাবলিকেশন, মুজাফ্ফর আহম্মদ স্বরণি শিলিগুড়ি। আট টাকা।

গরীব ঘরের একটি সুন্দরী তরুণী দারিদ্র্যের জ্বালাময় ও সাংসারিক প্রতিকূলতায় কিভাবে নিরুপায় হয়ে জীবনের এক অঘন্য পরিণতিতে এসে ঠেকল তারই কাহিনী। মূল কাহিনীতে অনেক উপকাহিনী এলেও উপন্যাসটি মার খায়নি। লেখার হাতে নিপুণতা আছে। প্রচ্ছদটি ভালো নয়।

প্রিয়তমেষু (বিশেষ কবিতা সংকলন)। সম্পাদনায় প্রবাল সান্যাতনি এবং লালু মিত্র। ৪এ রাধাগোবিন্দ সাহা লেন। কলকাতা-১৭। দাম পঞ্চাশ পয়সা।

কিছু তাজা কবিতা নিয়ে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে। লিখেছেন অমিত বসু প্রবাল সান্যাতনি শান্তিকুমার ঘোষ সৌরভ বসু অপূর্ব বসু দেবস্মিতা ঘোষ এবং আরও কয়েকজন। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

মুকুল চক্রবর্তীর একখানি নতুন স্বাদের উপন্যাস
"বিভ্রান্তি"
প্রকাশিত হল
স্কুল, কলেজ ও হোস্টেলের ছাত্রীরা না পড়ে কিছুতেই থাকতে পারবে না।
এই লেখকের—
(১) ঘাটশিলায় বিভূতিভূষণ (দ্বিতীয় সং)
(২) সাহেব বোস্টম
প্রাপ্তিস্থান : নাথ ব্রাদার্স ও মিত্র ও ঘোষ
৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা।

পুনশ্চ

নববর্ষের জ্যৈষ্ঠ মাস যেমন ধর গ্রীষ্মের মাস, তেমনি আম-কাঁঠাল পাকার মাস হিসবেও জ্যৈষ্ঠের খ্যাতি কম নয়। কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠের একটি বেদনার দিকও আছে। বিভিন্ন বর্ষের বিভিন্ন দিনে এই মাসটিতে বাংলার বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষীর তিরোধান ঘটে। ১৯০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ১১ জ্যৈষ্ঠ (১৩৩১) স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ (১৩১২) প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ (১২৯০) অক্ষয়কুমার দত্ত, ২২ জ্যৈষ্ঠ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং ৩০ জ্যৈষ্ঠ বিখ্যাত 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস'-এর লেখক রজনীকান্ত গুপ্ত পরলোকগমন করেন।

বঙ্গের প্রধান কর্মচারী চিত্রগুপ্তের খাতিরে খুললে এমনি কত অসংখ্য বিখ্যাত জনের মৃত্যু-সংবাদ এই জ্যৈষ্ঠ মাসকে ঘিরে পাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। অমরেন্দ্রনাথ রায় বলেন বৎসরের প্রারম্ভিক মাস বৈশাখ থেকে মৃত্যুদিন ধরে চৈত্র পর্যন্ত বৎসরের শেষ মাস স্মৃতি-তর্পণ' নাম দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন 'সচিত্র শিশির' পত্রিকার ১৩৩২ সালের শারদীয় সংখ্যায়।

আমরা বর্তমান সংখ্যার 'পুনশ্চ'র মধ্যে মহামতি স্বজাতিপ্রাণ ও সুপণ্ডিত ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে রচনাটি এখানে পুনরপি মুদ্রিত করলাম।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়
(মৃত্যু ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১)

১৩০১ সালের প্রথম দিনে জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্মবীর ভূদেব বঙ্গমাতার অঙ্কদেশ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। যে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক পঞ্চাশ বৎসরের উপর অন্ধতমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে মনুষ্যত্বের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের এই তারিখে অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পত্রিকার ইহা একটি স্মরণীয় দিন।

স্মরণীয় দিন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ এ দিনে আমরা কিছু করি না। অথচ এই কলিকাতা সহরে সপ্তাহে সপ্তাহে অন্ধ সভা-সমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু ভূদেবের মৃত্যু-দিন ভূদেবের নাম করিয়া কেহ কোথাও কিছু করে না। বৎসরে

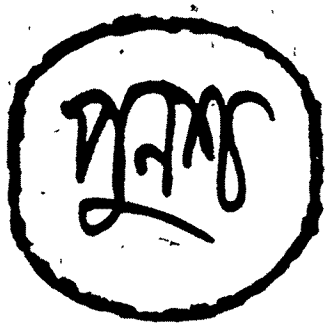

বৎসরে তাঁহার অনন্যসাধারণ জীবন-কথা—তাঁহার অপূর্ব চিন্তারাশি আধুনিক শিক্ষা-বিভ্রান্ত বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিলে লাভ আছে, কিন্তু সে কর্তব্য-জ্ঞান আমাদের নাই।

ভূদেবের জীবন, আদর্শ জীবন। বাক্যে ও কার্যে এমন সামঞ্জস্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি কখনও কোন বিষয় 'অজ্ঞ' বলিয়া কল আবার 'না' বলিতেন না। 'ভবের ঘরে চুরি করিতে' আদৌ তিনি জানিতেন না। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল সেই সহৃদয়তা ও আন্তরিকতারই ফল। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, বঙ্গলার আর কোনও মনীষী এমন সহৃদয়তার সহিত সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেশের ও জাতির কথা কহিতে পারেন নাই।

তিনি বিলাতী শিক্ষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুসরণ করেন নাই। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বিলাতী শিক্ষার নয়ন-নন্দকারী উজ্জ্বল চাকচিক্যে একবার না একবার অল্পবিস্তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিচার-কুশল ভূদেব চিরদিনই স্বদেশের শাস্ত্রে, স্বদেশের ধর্মে স্বদেশের সমাজে ও স্বদেশের সাহিত্যে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিয়া একভাবেই জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীকে আচারে-ব্যবহারে, পোষাকে-পরিচ্ছদে সাহেব সাজিতে দেখিলেই তিনি মর্মাহত হইতেন। তিনি এজন্য স্বজাতিকে নানাভাবে বহুবার সতর্কের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনিই সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন—আমরা যতই কেন সাহেব সাজি না, ইংরাজ কিন্তু নানা ইসারা-ইঙ্গিতে প্রায়ই আমাদের জানাইয়া থাকে, 'তুমি ইংরাজ নও। তুমি আমার ধর্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ; আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।' এই উপদেশই আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। এ উপদেশ অনেকের নিকট আজ পুরাতন ও চর্বিতচর্বণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভূদেব যখন বলিয়াছিলেন, তখন উহার মর্ম বুঝিবার মত সমর্থ ই আমাদের অনেকের ছিল না। আজ যে আমরা নিজেদের চিনিবার চেষ্টা করিতেছি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহার মূলে ভূদেব। ডিওরোজীয়-শিক্ষার প্রতিক্রিয়া তাঁহাতেই প্রথম প্রকট হয়।

ভূদেব স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন বলিয়া গোঁড়ামি যে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এমন কেহ মনে করিবেন না। স্বজাতির দোষ ও গুণ দুই-ই তিনি দেখাইয়া দিয়া পরের গুণটুকু আত্মসাৎ করিতে সদাই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, 'প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্যকুশল অহংকারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরাজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য-কুশলতা শিখিতে হয়। অন্য কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।'—এই প্রকার কত সময়োপযোগী সারপূর্ণ কথা যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। শুধু উপদেশ নহে—নিজের জীবনে তাহা ফুটাইতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিয়াছিলেন, তাহা উন্নতি-পথের পথ-প্রদর্শক। ভক্তিভরে তাহা স্মরণ করিলে জীবন স্বতঃই মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়।

কাজেই বলিতে হয়, ভূদেবকে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। যুগধর্মের যিনি অন্যতম প্রবর্তক, মাতৃপূজার যিনি অন্যতম পুরোহিত, তাঁহার তিরোধানের দিনে তাঁহার স্মৃতিপূজা করা বাঙ্গালীর সর্বতোভাবে কর্তব্য। আজ তাঁহারই ভাষায় এই প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সকলকে আহ্বান করিতেছি 'ভারতবাসীকে সর্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরমধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।'

ক্ষপণক

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(বারো)

সে-রাতে হাউসে গিয়ে রজনীর সঙ্গে অমিয়র দেখা হয়নি। ফেরার জন্যে ট্যাকসি, ট্রাম, বাস কোনোটাই না পেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় চন্ডীদাব ভেঙে দেওয়া একটি টানা রিকসায় চড়ে চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে রাত দুটোয় বাড়ি ফেরে। সামনের ভেজানে দরজা বাতাসে খুলে গিয়ে হা-হা কবছিল। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে। লীলা সোফায় ঘুমিয়ে। সেলাই-কল তোলা হয়নি। অমিয় আলগোছে ঘুমন্ত লীলাকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল। তারপর নিজে পাশে শুয়ে পড়ে। তখন পাশ ফিরে শোয়ার ভঙ্গীতে লীলা অমিয়র গলা জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল। অজান্তেই।

সে-রাতেই অমিয় ঘুমের ভেতবে কিংবা জাগ্রত অবস্থায় ঠিক করেছিল—একটা গাড়ি কিনবো। বোধহয় অত রাতে অত-খানি রিকসায় চড়বার পর এরকম ভাবনা এসেছিল তার মনে।

এখন ডিসেম্বর মাস। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে—শত রজনী অতিক্রান্ত। হাউস-ফুল এখন নিত্য ব্যাপার। একশো আট কি নয় রজনী যাচ্ছে। বাইরে কোলাঘাটের কল শোয়ের পর খয়রাশোল, ক্যানিং চাঁপাডাঙা—সব নাম মনেও নেই—অন্তত বিশ জায়গায় প্লে করে এসেছে 'পঞ্চমুখ'। গ্রিনরুমের দেওয়াল পেছনে প্রায় দশ ফুটের মত সরে যাওয়ায়—ওপরে অ্যাসবেসটসের ছাদ নিয়ে এখন প্রমাণ সাইজের তিনটি বেডরুমের সমান। ক্যানিংয়ের কল-শোয়ের পর ফ্রিজ এসেছে সাজঘরে। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা পাখা। মেকআপের জন্যে আলাদা আয়না। ক্যান্টিনের ফ্রিজে এখন তিন রকমের আইসক্রিম থাকে। দুর্গালালের টাকা শোধ। মোবাইল ব্যাঙ্কের ঋণ শোধ। ড্রেসের জন্যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে কিছু বাকি আছে এখনো। কল শোয়ের দর উঠেছে সাত হাজার। যাতায়াত, খাওয়াদাওয়া আলাদা। একটা ট্রান্সপোর্ট কম্পানী সব সময় অমিয়র ডাকের জন্যে বাস নিয়ে রেডি থাকে।

শনিবার ডবল শোয়ের ঘণ্টা দুয়েক আগে এক অপেরার অধিকারী এসে হাজির। রজনীর শরীরটা খারাপ। ঘুমোচ্ছিল। পাছে কথাবর্তায় ঘুম ভেঙে যায়—তাই অমিয় অধিকারীমশাইকে নিয়ে ফাঁকা স্টেজে উঠে এল। ড্রপ তোলা রয়েছে। সামনে ফাঁকা অডিটোরিয়াম। দুজনে দুখানি চেয়ারে বসল।

—কত সিট?

—পাঁচশোর কাছাকাছি। একস্ট্রা দিয়ে প্রায় ছশো হয়। অমিয় দেখলো অধিকারী মশায়ের পাম্প-সু চিকচিক করছে।

—এত ছোট জায়গায় আপনার মত আর্টিস্টের আটকে থাকার কথা নয়। আপনার দিকে সারা বাংলাদেশ তাকিয়ে আছে।

অমিয় মনে মনে বলল, ওরে বাবাঃ! সে কি কথা? মুখে শুধু হাসি ফুটিয়ে রাখলো।

—আপনি আমাদের অপেরায় আসুন।

—চা খাবেন?

—না। আপনি এসে জয়েন করুন। বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা রয়ালটি। তাছাড়া মাস মাইনে। সে আপনি যা ঠিক করবেন—

অমিয় হেসে ফেলল, আমার মাইনে আমি ঠিক করব!

—হ্যাঁ। আপনিই করুন। চাঁপাডাঙায় আপনার শো আমি ভিড়ের ভেতর বসে দেখেছি।

—অমিয় এবার বলল তবে ঠাণ্ডা কিছু বলি।

—আপনি কথা না দিলে আমি এখন কিছু মুখে দেব না।

—সে কি করে হয়। আপনি এসেছেন নিজে—

—আপনার কথা পেলে তবে বসব।

—ভেবে দেখি। এ-নাটক তো মোটে হাণ্ড্রেড নাইট পাব হল—

নানারকম কথার পর অধিকারীমশায় উঠলেন পৌনে দুটোয়। বেলা একটার ভেতরেই ডবল শো হাউস ফুল হয়ে গেছে। দুটোর সময় রজনী বলল, একবার ডকটর সেনকে ডাকবে। ডকটর সেন আমার হার্ট দেখেছেন আগে।

ফোনে সব শুনে ডকটর সেন সন্ধ্যে-বেলা চেম্বারে আসতে বললেন। এখনকার মত একদম রেস্ট, অন্তত দুদিন।

অমিয়র কাছে রজনী মুখ দেখাতে পারছিল না। একঘণ্টার ভেতর কোথায় 'সজাতা' পাওয়া যাবে? ক্লিনিং থেকে ঘরে এসে অমিয় বলল, লজ্জার কিছু নেই। চল, তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই—

—শোয়ের কি হবে?

—কি আবার হবে। রিফাণ্ড দেওয়া শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে। অনিবার্য কারণে নোটিশ টানিয়ে দিয়ে এলাম। আজ শো বন্ধ।

—দু হাজার টাকা রিফাণ্ড? রজনী বলেই মাথা নিচু করে কাঁদতে লাগল। সাজঘরে বিশ্রাম, বসাবসির জন্যে একখানা খাট এসেছে মাস খানেক। তাতে রজনী অনেক সময় শুয়ে ঘুমিয়ে নেয়। এখন তারই কোণে বসে কুণ্ডলী পাকিয়ে কাঁদছে। অমিয় রজনীকে এই অবস্থায় দেখে হেসে ফেলল, তুমিই না দু মাইল ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে হেঁটে গিয়ে কুলপিতে পনের হাজার লোকের সামনে সজাতা করেছো। এখন তার দাম দিতে হবে না! শরীর তার ওষুধবিষুধ বিশ্রাম কড়ায়-ক্রান্তিতে আদায় করে নেয়।

রজনী চোখ মুছে তাকালো। শেষে বলল আমার জন্যে—

—যারা তিন-চারগুণ বেশি দিয়ে ব্ল্যাকে টিকিট কিনেছে—তাদের কথা ভাবোতো। তারা তো রিফাণ্ড পাবে টিকিটের শুধু আসল দাম—

—খুব রেগে যাবে তাহলে আমাদের ওপর।

—কি করা যাবে। চল বাড়ি দিয়ে আসি তোমাকে। গাড়ি বার করতে বলেছি।

—তুমি চালাবে?

—দ্যাখোই না। চাকরি করার সময় অফিসের গাড়ি চালিয়ে শিখেছিলাম। ভয় নেই।

গাড়ি মাস দুইও হয়নি। সেকেণ্ডহাণ্ড কিনে সারিয়ে নিয়েছে। ভলাকেনসিয়ালের একটা শব্দের ডাক উঠছে। রিপেয়ার করে এখন একদম নতুন গাড়ি। কোন অ্যাওয়াজ নেই। রজনীকে পাশে বসিয়ে কথা বলতে বলতে সিধে গিরীশ পার্ক গাড়ি চালিয়ে চলে এল অমিয়। যেন অনেকদিন চালায়।

—আমি কথা বলতে পারছি না অমিয়। হাঁফ ধরে যাচ্ছে।

—আর কল-শোতে বাইরে যাব না। বিচ্ছিরি খাটুনি।

রজনী এই প্রথম তার ছেলে ছোট দুই মেয়ের সামনে অমিয়র হাত ধরে কথা

বলল, বিকেলে এসো। ডকটর সেনের খানে নিয়ে যেও।

হাউস ফিরে এসে অমিয় দেখল—খনো লোকে লাইন দিয়ে রিফাণ্ড নিচ্ছে কিং থেকে। তাকে না পেয়ে বিকু গ্রিন-ম থেকে বেরিয়ে আসছিল। স্টিয়ারিংয়ে সা অমিয়কে দেখে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলো, ই যে হিরো! কোন বড় অসুখ নয়তো।

—সন্ধ্যেবেলা জানা যাবে।

—আমায় একটু গন্ধর্বে পৌঁছে বে?

—উঠে বোসো।

বসবার পর গাড়ি উল্টোদিকে ঘোরাতে খে বিকু বলল, এ কি হল?

—আজ অনেকদিন পরে স্বাধীনতা পেলাম। শনি-রবিবার বিকেল দেখি না তদিন।

—ওই তো নায়ক হবার প্রাইজ। কিছু নলে কিছু দিতে হয়।

—আজ ছ' হাজার টাকা রিফাণ্ড করে আবার স্বাধীনতা ফিরে পেলাম। চল ভি আই পি রোডে যাই।

—আমি একটা কাজে এসেছিলাম অমিয়।

—আজ কোন কাজের কথা নয়। রোজ শুধু কাজ থাকে। দায়িত্ব থাকে। আজ আমাদের ছুটি। একদিন টিকিট বিক্রির জন্যে বুকিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আজ টিকিটের টাকা রিফাণ্ড করতে পেরে কি আনন্দ পেলাম বিকু তা তোমায় বলতে পারব না।

—আমি গন্ধর্ব অফিস থেকে একটা প্রোপোজাল নিয়ে এসেছিলাম।

—পরে শুনবো। সল্ট লেক দেখেছো?

—না। দেখা হয়নি। কাগজে ছবি দেখেছি।

—চলো ঘুরে আসি। কী সুন্দর জায়গা হয়েছে। চওড়া চওড়া রাস্তা। যে-কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের যে-কোন মেঘ পরিষ্কার দেখা যায়। কলকাতার গায়ে —অথচ কলকাতার মত নয়।

ফাঁকা রাস্তা। ফাইন বাতাস জানলা দিয়ে এসে দু'জনের মাথার চুল সরিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। দু'ধারে নতুন নতুন বাড়ি। স্পিডের কাঁটা আশি ছুঁই-ছুঁই।

—লীলা আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটু বেরোলে পার।

—হয় না বিকু। আরেকখানা গাড়ি কিনছি শীগগিরি। গ্যারেজ থেকে নতুন হয়ে বেরোবে। লীলা আর ছেলেমেয়েদের স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করে হাউসে চলে আসবে গ্রুপের কাজে। ভালো লাগবে?

—তা তো ভাল। কিন্তু লীলা এসব কী ভাবে নিয়েছে?

খচ করে গাড়ি থামালো অমিয়। সেকটর তিনে জলের ট্যাঙ্ক ঢালাই করছে মিস্তিরা। মিকশ্চার মেশিনের ঘড়-ঘড় আওয়াজ সত্ত্বেও অমিয়র মাথার ভেতরে ঢুকে গেল। অমিয় তার পাশে বসা বিকুকে বলল, কী সব?

—এই তোমার থিয়েটার। তার সাকসেস? রজনী?

—ওঃ! শুনেছি ওর স্কুলের দিদিমণিরা নাকি ওর কাছে প্রায়ই খেতে চায়। আর মুখরোচক গল্প শুনতে চায়। লীলার মন আমি সবটা বুঝি না। বোঝাতে চাইলেও লীলা বুঝবে না। লোকে কী জানে—আমি অনেক সময় রজনীর অ্যাডমায়ারার?—ওকে ভক্তি করি? আবার ওর সঙ্গে স্টেজে কম্পিটিশনে অভিনয় করে বুঝতে পারি—আমার অভিনয়ের সবটুকু ও আমার ভেতর থেকে টেনে বের করে আনছে। এ-কাজ ক'জনে পারে! আমি ওর কাছে মাঝে মাঝে শিখি। রজনী আমায় জাগিয়ে তোলে—

বিকুর ভয় করতে লাগল। ঈগল নাশা। দীর্ঘ চোখ। ঈষৎ পুরু দু'খানি ঠোঁটের ওপর জীবন চরিত্রের উপযোগী একটি গোঁফ রেখেছে অমিয় কায়দা। অন্যমনস্ক দৃষ্টি। কোন জুলফি নেই। এখন গাড়ির সাইড উইং দিয়ে বাতাস ঢুকে পড়ে অমিয়র মাথার অবাধ্য দু'-একটি চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। চোখের সামনে নতুন জনপদের গা ধরে হিলহিলে কাশবন সেই বাতাসেই দুলছে। বিকু পরিষ্কার বুঝলো, অমিয়র জন্যে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে। অমিয়র মুখে এখন স্বয়ং নিয়তি বসে আছে। সে সব জানে। পরিণাম সে আগাম জানে।

কথা ঘোরাবার জন্যে বিকু বলল, রজনীর ব্যাপারটা?

—রজনীর কী ব্যাপার?

—এই যে বেলা এগারোটা বাজলেই টিফিন ক্যারিয়ারে তোমার জন্যে রান্না করা খাবার নিয়ে এসে বাড়ির একতলার ফুট-পাথে এসে দাঁড়ায়—তুমি গাড়ি চালিয়ে এসে ওকে তুলে নিয়ে হাউসে চলে আসো। লীলাও দুপুরের খাবার ড্রাইভার লালুর হাত দিয়ে হাউসে পাঠিয়ে দেয়। তোমরা একসঙ্গে খেতে বস। হিসাব দ্যাখো। বিজ্ঞাপন প্ল্যান কর। ঘুমিয়ে থাকো একই খাটে দু'জন।

—বাঃ! ঘুম পেলে মেঝেতে ঘুমোবো নাকি?

—গ্রুপের লোকজন না হয় মানলো। তবু তো ডিসিপ্লিনের প্রবলেম দেখা দিতে পারে। তাছাড়া এসব নিশ্চয় লীলার কানে গেছে—

—যাবেই জানতাম। ও আজকাল রজনীর নাম মুখে আনে না। মিসেস দত্ত কিংবা তোমার হিরোইন—এ সব বলে। কেমন আছে জানতে চায় ক্যাজুয়ালি। আমিও তেমনি জবাব দিই ক্যাজুয়ালি।

—তোমার কোন প্রবলেম নেই?

—কিসের প্রবলেম?

—এই যে তুমি একজন মানুষ। আর দু'জন মানুষকে দুই বেলায় আলাদা করে ভালবাসা দিতে হয়—মনোযোগ দিতে হয় —আলাদা আলাদা প্রেয়জন মনে রেখে মিশতে হয়। কোন গোলমালে পড় না তাতে?

—হাসালে বিকু! ভালবাসা কি বেহালার লোহার ঘর? না তক্তি-কাটা সন্দেশ? আলাদা করা যায়? লীলাকে বলেছিলাম—যার যা ভূমিকা। লীলা মনের কথা আমায় বলেনি। আমি জানি—রজনী আমার ছেলে-মেয়েদের ভালবাসতে পারে। রজনীর বড় মেয়েকে এবার পুজোয় কাপড় পাঠিয়ে-ছিলাম। কী সুন্দর চিঠি লিখেছে আমায়—

—এ সব তো ভেগ উত্তর দিচ্ছো অমিয়।

—এটাই আমার উত্তর। এ রকম উত্তর আগে কোনদিন শোনোনি বলে ও রকম মনে হচ্ছে।

শীতের দুপুরেই বিকেলের গুঁড়ো মেশানো থাকে। তার খানিকটা বাতাসে ভাসছিল। আলো তাই কালো রংয়ের হয়ে আসছিল। তোমার আর রজনীর সম্পর্কটা কী?, রজনীকে ভালোবাসো?'

—এ ভাবে বলা যায়! তবে রজনীর জন্যে ভাবি। রজনীও ভাবে নিশ্চয়। লাভ ইজ টু প্রোটেক্ট হার অলওয়েজ। কোন একটা বিজ্ঞাপনে এ-কথাটা দেখেছিলাম।

—আরেকটু স্পষ্ট করে বলবে?

—বলতে পারো আমরা দু'জনে এক-সঙ্গে আছি। নাটক করি। হিসেব রাখি। কল-শোয়ে যাই। দু' বছর পরে একসঙ্গে নাও থাকতে পারি।

—হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে অমিয়। ভাল-বাসি অথচ বাসি না! এখানে বিকুর মুখে রসিকতার টইটুম্বুর হয়ে গেল। মুখ স্বাভাবিক হয়ে এলে বলল কিংবা বাসি-লেও বাসিতে পারি। সেই গোছের জবাব হয়ে গেল না!

—আর জবাব দিতে পারছিনে বিকু। এই খানিকক্ষণের ফ্রিডম তুমি প্রশ্নোত্তরে মাটি করে দিও না। সন্ধ্যেবেলা রজনীকে নিয়ে ডকটর সেনের ওখানে যাব। তারপর রজনীর ডাবল জোগাড় করতে হবে। আগামী বেস্পতিবারের মধ্যেই তালিম দিয়ে অন্তত চলে যাওয়া গোছের তৈরি করে নিতে হবে। নতুন মেয়ে সন্ধানে আছে?

—আমি কি থিয়েটারের ঘটক! আমি তো ক্রিটিক।

থেমে থাকা গাড়ির স্টিয়ারিং ছেড়ে দু' হাতে বিকুর গলা জড়িয়ে ধরে অমিয় শব্দ করে একটা চুমু খেলো।

—কী হচ্ছে এ সব। ছাড়ো—

—তুমি আমাদের একজন খুব বন্ধু। আমাদের কোন বন্ধু নেই। নাটকটা অশ্লীল বলে হুইসপার ক্যামপেন চালানো হচ্ছে। বড় কাগজ বিজ্ঞাপন নিচ্ছে হাজার হাজার টাকায়। লাখখানেক লোকের এ-নাটক দেখা হয়ে গেছে বিকু। আরও কয়েক লক্ষ লোক দেখবে। কিন্তু বড় কাগজগুলো চোখ বুজে আছে। এক লাইনও রিভিউ করেনি আজও। মজার ব্যাপার চলছে! হয়ত একটা বড় পার্টি দিলে কাজ হত। কিন্তু আমি সে-পথে যাব না বিকু। আমি ওয়েট করব। আমি দেখবো—না রিভিউ করে কোথায় যায়। এ-নাটক হাজার নাইট চলবে দেখে নিও। হাউস ফুল আমাদের এখন শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাইনের লোকজন এখন না দেখে বটিয়ে বেড়াচ্ছে—সুজাতা? ওরে বাবাঃ! অশ্লীল—

—জানুয়ারির ফার্স্ট উইকে গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যা বেরোবে। আমরা সুজাতার রিভিউ করব। তোমার দিক থেকে কিছু

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানোর সুবর্ণ সুযোগ

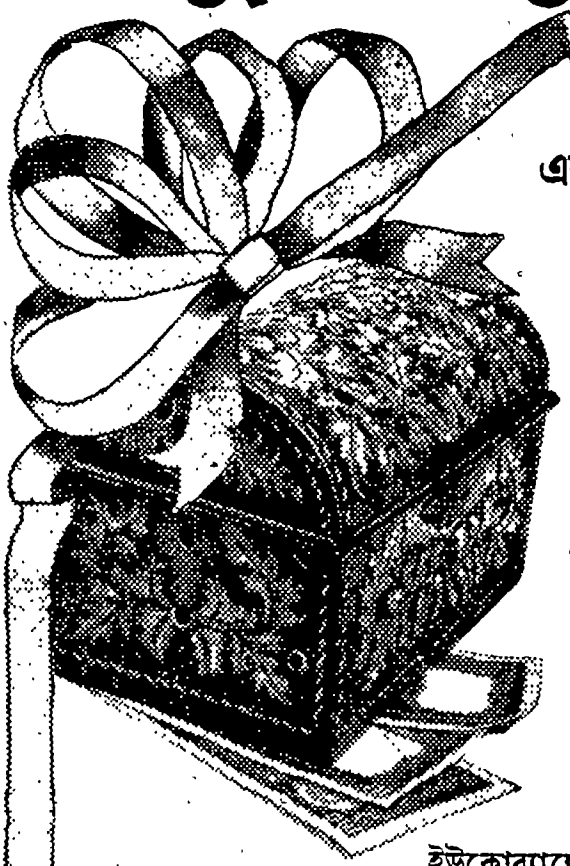

আপনার টাকা একুশ বছরে আটগুণ বাড়িয়ে তুলুন

এখন থেকে ইউকোব্যাঙ্কে ১০০ টাকার, ৫০০ টাকার, ১০০০ টাকার এবং এক হাজারের গুণিতক যে কোন টাকার ২১ বছরের জন্য আমানত নেওয়া হচ্ছে। ২১ বছর ধরে ইউকোব্যাঙ্কে আপনার জমা টাকা বেড়ে চলবে। ২১ বছর পরে, যা জমা রেখেছেন তার আটগুণেরও বেশি আপনার হাতে আসছে।

এখন জমা রাখুন	২১ বছর পরে আপনি পাবেন
১০০ টাকা	৮১২ টাকা
৫০০ টাকা	৪০৬১ টাকা
১০০০ টাকা	৮১২৩ টাকা

ইউকোব্যাঙ্কে ২১ বছর টাকা রাখলে আপনি অনেক বেশি লাভবান হতে পারবেন।

ইউকোব্যাঙ্কে সঞ্চয়ের অন্যান্য পরিকল্পনা:

১ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টস্ প্রকল্প: বছরে ৫ শতাংশ সুদ

২ রিকারিং ডিপজিট প্রকল্প: বছরে ১০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ

৩ স্থায়ী আমানত বা ফিক্সড ডিপজিট প্রকল্প: বছরে ১০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ

৪ রিকারিং ডিপজিট প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ফিক্সড ডিপজিট প্রকল্প: ৭ বছরের আমানতে ১৪.৫০ শতাংশ কার্যকর সুদ

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCOC-65 BEN

বিজ্ঞাপন চাই। বোঝেই তো! কাগজের দাম প্রেস, আর্টিস্ট, ব্লক—হাজারো খরচ।'

—'বেশ তো। বসে কথা বলা যাবে। ভি আই পি রেড দিয়ে একটু জোরে চালিয়ে দেখব।'

—'আমি নেমে যাই।'

—'চল না। দশ মিনিট মোটে। উঃ! কতদিন পরে হাউস থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম আজ। ভয় নেই। খুব জোরে চালাব না। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ি উঠছে। এখানে জমিও হয়ত পাওয়া যায়। কিন্তু নাটক করলে কেউ কি এতদূরে দেখতে আসবে—এখানে হল হলে?'

—'কেন? বেশ তো আছো ভরতে।'

—'না। বেশ নেই। ওরা মামলা ঠুকেছে। উচ্ছেদের মামলা।'

—'তাহলে কি হবে?'

—'হবে আর কি। ওদেরই গণ্ডগোল। চুক্তির মেয়াদ না ফুরোতেই অভাবে পড়ে এক বছরের ভাড়া রসিদ দিয়ে চেকে নিয়েছে। মামলার নিষ্পত্তি হলেও সবার আগে আমারই সঙ্গে লিজে আসতে হবে, আমি তো জানুয়ারিতে মিস্ত্রি লাগাচ্ছি। দোতলায় দুখানা ঘর দরকার। 'পঞ্চমুখের' অফিস, লাইব্রেরি গেস্টরুম হবে দোতলায়—'

স্পিডের কাঁটা আশির ওপর থরথর করে কাঁপছিল। কাজি নজরুল ইসলাম অ্যাভেন্যু। শর্টে ভি আই পি রেড। পশের খালে নৌকো বোঝাই দিয়ে পৌষ ধানের খড় এসেছে গাঁ থেকে। এবার লরিতে উঠবে। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে এয়ারলাইন্সের ঢাউস ঢাউস হোর্ডিং।

—'আমি তোমাদের নাটকের কথা লিখব। এ-নাটকের ইকোনামিকস্ লোকে জানতে চায়। কেন অশ্লীল নয় সে কথাও লেখা দরকার। দরকার তোমাদের কথা লেখা। রজনী, শংকর এমন কি লীলার কথাও। আসলে তোমাদের মানসিক গঠনটা কেমন তাই পব্লিককে জানতে চাই। 'গন্ধর্ব' কাগজ প্রতিটি নাটকের দলের দ্বিতীয় ঠিকানা হয়ে উঠুক।

—'মানে বিজ্ঞাপন চাইতো? দেব। তার চেয়ে বলি কি আমাদের একজন দর্শকের কথা লিখবে?'

—'কেমন?'

—'বুকিংয়ের রবি বলছিল। প্রথম দিন ভদ্রলোক পকেটের মানিব্যাগ বের করে তার ইনসাইড পকেট থেকে একখানা পাকানো টিকিট বের করে হলে ঢুকলেন। চারদিক তাকিয়ে। কেউ দেখে ফেলল কিনা সেই ভয়। পরের দিন সেই দর্শকই এল। সঙ্গে গিন্নি। রীতিমত বুক ফুলিয়ে হলে ঢুকলেন। মুখে পান। আতুলে চুন। এই হল গিয়ে আমাদের নাটকের রিভিউ। এরপরেও কি অশ্লীল বললে লোকে বিশ্বাস করবে?'

এয়ারপোর্টের গায়ে নতুন হোটেল চালু হয়েছে। তার আট-দশ তলায় পটপট করে আলো জ্বলে উঠছে। প্লেন উঠছে। নামছে। ওরা এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে বাঁয়ে ঘুরতে যাওয়ার মোড়ে এসে পড়ল। তখন অন্ধকার। পথের পাশের দোকানে আলো জ্বলতে শুরু করেছে। 'এবার ফিরি বিষ্ণু।'

—'অত জোরে চালিয়ো না এখন। আমি হিরো নই। অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলে আমার বউ ষোল বিঘের ধান একা কেটে তোলার ব্যবস্থা করতে পারবে না।'

—'কী ধান দিয়েছো?'

—'রত্না। কিছু অগে পকে। বেশ সরু ধান।'

অমিয় আর এগোল না। জানে, ধানের কথা বিষ্ণু এখন রাত দশটা অব্দি বলে যেতে পারে। 'আচ্ছা, ধান আর নাটক—কোনটা তোমার নেশা?'

—'দুটোই। ওদের দুজনেরই তোয়াজ চাই। তবে না-মাঠ ভরে ফসল দেবে। তুমি আজ ফসল তুলছো না অমিয়?'

—'কোথায়! দর্শক হলেই যে সেটা একটা আহাম্মরি নটক—তার কোন মানে নেই। আমার এখন এ নটক থেকে বেরিয়ে আসবার পথ নিজেই তৈরি করতে হবে। এত এস্টাব্লিশমেন্ট বেড়ে গেছে। মোট সাতাশি জনের ফ্যামিলি এই নাটকের চলাচলির ওপর নির্ভর করে।'

—'বল কি!'

—'হ্যাঁ। আমি কোন্ দিন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তাম। অবিশ্যি এ নটকে আমাদের এখনো কিছু করার আছে। ফার্স্ট নাইট থেকে এখন অভিনয় কত পাল্টে গেছে। জীবন চরিত্র তো আমার রোজ স্টেজে নেমে নতুন মনে হয়। আমি রোজ স্টেজে জীবনকে আবিষ্কার করি বিষ্ণু। ডায়লগ কত পাল্টে যচ্ছে। ক্যারেকটারের ইন্টার প্রিটেশনও রোজ পাল্টচ্ছে একটু একটু করে। এই তোমার গন্ধর্ব অফিস এসে গেল।'

—'দেরি করলে যে—'

—'কোথায় দেরি। বিষ্ণুকে ছেড়ে এলাম। চেম্বারে ঠিক সময়ই পৌঁছোবো।'

—'বিষ্ণু এসেছিল।' চুপ করে গেল রজনী। তারপর বলল, 'নিশ্চয় আমায় দয়া করল। এতগুলো টাকা বিফান্ড দিতে হোল। আমরা বড়লোক হয়ে গেছি বলে ঠাট্টা করেছে সিওর। ছ' হাজার টাকা। কম না তো—'

—'তোমার এই গিল্ট কমপ্লেক্স, কেন বলতো রজনী? মানুষের শরীর খারাপ হয় না? শরীরের চেয়ে ছহাজার টাকা বেশি?'

রজনী কোন জবাব না দিয়ে অস্তে আস্তে গাইতে লাগলো—

'তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে—
কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে—'

ট্রাফিকের মোড় পেরিয়েই অমিয় বলল, 'এমন বিসর্জনের গান গাইছো কেন? কি হয়েছে—'

রজনী কোন কথা না বলে ওর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে গাইতে থাকল—'তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাক সুখে—কলঙ্ক আমি নেব হাসি মুখে—'

জোছনাতে এসে রজনীর গলা এমন সুন্দর মোড় নেয়। ভারি ভাল লাগে অমিয়র। স্টেজে অভিনয়ের সময় রজনীর গলায় জোছনা কথাটি এলে দু-একদিন এক-হল দর্শকের সামনে খানিকক্ষণের জন্যে অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। নিয়মিত অভ্যেসে বলে ডায়ালগ থেমে থাকে নি তার মুখে।

—'জানো রজনী সুজাতার এই গানের মত তারাশংকরের কবিতেও এমন একটা গান ছিল। ফেইন্টলি মনে পড়ে—'

—'ছিলোই তো।'

—'বিষ্ণু বলছিল—তোমার আমার সম্পর্কটা কি? রাস্তায় চোখ রেখে চলতে হচ্ছিল অমিয়কে। তাই রজনীর মুখে সেই মুহূর্তের খানিক অদৃশ্য ছায়াটি দেখতে পেল না।

—'তুমি কি বললে?'

—'যা সম্পর্ক তাই বললাম।'

—'কি রকম?'

—'তুমি অভিনয়ের সময় আমাকে জাগিয়ে তুলতে পার। তোমার অভিনয় আমাকে জাগিয়ে দেয়।'

—'আর কিছু না?'

—'আরো কত কি। সব কি বলা যায় রজনী?'

ডকটর সেনের কাছে রজনীর ই সি জি করা হল। তারপর গ্রাফ দেখে ডাক্তার বললেন কিছু তো পেলাম না। তবে ওভার এগজারসন। সাবধান থাকতে হবে। পুরোপুরি বিশ্রাম চাই। অন্তত মাস খানেকের—'

ওষুধ সামান্যই। একটার নাম পড়ে অমিয় বুঝলো ঘুমের ওষুধ।

ফেরার পথে অমিয় বলল, 'এখন তোমার কাছে শশাঙ্কর থাকা উচিত।'

—'সে তো আসে মঝে মাঝে।'

—'কী বলে?'

—'আমায় সঙ্গে দেখা হয়নি কোনদিন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলেই চলে যায় বোধ হয়।'

—'ওরা তোমায় কিছু বলে নি?'

—'কোনদিন না। স্টেই আশ্চর্য। আমিও ওদের মা। শুধু অ্যাবসেন্ট থেকে একটা লোক রেজ কী ভাবে যে ওদের চোখে আমায় কাঠগড়ায় তুলছে—কী বলব। আমি যদি একটু অর্ডিনারি হতাম! আমার বিরুদ্ধে ওদের চোখে অনেক অভিযোগ দেখি। অথচ ওরা কিছু বলে না। চুপ করে তাকিয়ে থাকে শুধু। এই লোকটাই তৃপ্তির সঙ্গে ঘোট পাকিয়ে থিয়েটারের সব হুণ্ডি আমায় দিয়ে সই করিয়েছে। সাজঘরে। যখন আমি ব্যস্ত থাকতাম। হয়ত সেকেণ্ড বেল পড়েছে—এমন সময় হুণ্ডির কাগজ ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে। তখন স্টেজে ঢুকবো। ঠিক সেই সময়। তখন কি কেউ মাথা ঠাণ্ডা করে সই করতে পারে অমিয়? আমাকে পথ দেখানের কেউ ছিল না। আমি মেকআপ নিচ্ছি—এমন সময় তৃপ্তি এসে বলেছে—টাকা চাই হাউসের—তিন দিনের ভাড়া বাকি—না হলে শো বন্ধ করে দিতে হবে। সই কর। সই করেছি আমি। জানি না এ সব টাকা শোধ করেছে কিনা। না করে থাকলে কি করে শোধ হবে তাও জানি না। চিন্তায় চিন্তায় আমার ঘুম নেই।'

—'তৃপ্তির আর কোন ফোন পেয়েছো?'

—'না তো।'

(ক্রমশ)

সাহিত্যের নেপথ্যে

অনন্য প্রকাশনী

এ ব্যবসায় সততা পরিশ্রম আর ব্যক্তিগত যোগাযোগ এভাবেই আমার পথ চলা। বর্তমান প্রকাশন জগতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে এটাই এখন একমাত্র আশা। এতে আরো লোকের আসার পথকেও সুগম করবে। প্রকাশকদের দুর্দিন একথা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না।

এর আগে আমি যে কজনকে আপনাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, একটু পেছনের পাতা উল্টে দেখুন, দেখবেন—তাদের মধ্যে নব্বই ভাগ এ লাইনে এসেছেন কখনো পৈত্রিকসূত্রে কিংবা লেখার তাগিদে, বা বন্ধুর সহযোগিতায় কখনো বা কঠিন কঠোর পরিশ্রমের ক্যানভাসিং থেকে প্রকাশনায়। এটাই নিয়ম। অন্তত কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ার ইতিহাস ঘাটলে এই খবর খবরই হাতের সামনে আসে। কিন্তু 'অনন্যার গল্পটা একটু উল্টো। মিলবে না। একদম চেন চৌহদ্দির কারো সংগে মিলবে না। কারণ অনন্যার যা বয়স, বিশেষ করে এর পরিচালক হীরক রায়ের অতীত যাত্রার পথ এত ছোট যে বলা যায় সবেমাত্র ও দৌড়বার হুইসিল পেয়েছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি। কেননা তার দৌড়োবার গতি আর ধরণ দেখে বোঝা যায় এ ঘোড়া ছুটবে অনেক দূর।

কিন্তু কথা ছিল না এ রকম। 'অনন্য' হওয়ারই কোনো কথা ছিল না। এর চেয়ে হীরক বয়ের নামের পাশে অধ্যাপক লটকে থাকলে অনেকেই খুশি হতেন। এ অফার আজো আসছে কিন্তু নট নড়নচড়ন নট কিছু ব'লে হীরক আঁকড়ে আছেন অনন্যাকে। আঁকড়ে থেকে ভালোই করেছেন, কেননা তা না হলে দুটো বইয়ের প্রকাশনীকে আজ এভাবে দেখা যেতো না।

যাক অল্প কথার গল্পটা বলে ফেলি।

কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বজার জানেন তো? যখন যে হাওয়া আসে তখন সব ঘরেই ওই বই। গোয়েন্দায় বজার লাগলো, তো, চলও গোয়েন্দা। ঐতিহাসিক উপন্যাস একটা ধরেছে কি, চালও ঐতিহাসিক উপন্যাস। একটা সুভাসের বই যেই নিয়েছে, তো সুভাষে সুভাষে বজার ছেয়ে গেল! এমনি এক সময় এলো একদিকে চে গুয়েভারা অন্যদিকে কম্বোডিয়া।

হীরক রায়

সমবেশ বসুর ছেলে দেবু মানে দেবকুমার বসু তখন 'মৌসুমী' বেশ জমিয়ে তুলেছেন। হীরক তখন এম-এ পড়ছেন। দেবু কম্বোডিয়ার উপর একটা বই লিখতে বললেন। হীরক বই লিখবে কি এ সম্বন্ধে কোনো কিছু ভাবেই নি। এর চেয়ে ক্রিকেট খেলতে বললে আর একবার প্র্যাকটিস করে নেমে যওয়া যেতো। কারণ হীরক তো এর আগে সেন্ট পলসের ক্রিকেট ক্যাপটেনই ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদার গ্রাজুয়েটের ক্রিকেটের প্রতিনিধিও ছিলেন। সুতরাং চোখ ঠিক রাখবার নেট প্র্যাকটিস করে মঠে হয়তো নামা যায়। কিন্তু গোটা বই লিখে দেওয়া। দোনোমোনো করে হীরক বললো ঠিক আছে, মন্দ কি চেষ্টা করে দেখা যাক। ১০০০ বছরের কম্বোডিয়ার ইতিহাস বিষয়ে বই পত্তর জোগাড় করে কাগজ কলম নিয়ে বসলেন হীরক। বেরুলো কম্বোডিয়া—লেখকের নাম হীরক পাল্টে হলো অমিতাভ রায়। বাবা ভাবলেন ও রোগ দুদিনেই সেরে যাবে। কারণ বাড়িসুদ্ধ যখানে প্রশাসনের সংগে যুক্ত সে বাড়ির ছেলে আর অন্য লাইনে যাবে কি করে! আর বাড়ি মানে বাড়ি? বাবা—WBES; দুই কাকা IRS আর দুজন W.B.E.S. । হীরকের দুভাই-এর একজন দিলীপ রায় শিপিং কর্পোরেশনের ডেপুটি ম্যানেজার, অন্যজন কমল রায় লিপটনের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার। এমন এক বাড়ির ছেলে হীরক এ রকমই কিছু হবেন এটাই ঠিক। তবে এই বয়সে ছেলেদের কবিতা লেখা গল্পো লেখার একটু ঝোঁক থাকে। ও কেটে যাবে, সুতরাং বাবা মাও খুব একটা বেশী অমল দিলেন না।

কিন্তু বিধাতা অন্য কিছু ভাবছিলেন। ছাপাড ফাঁড়ে দিক বা না দিক, একটু দিলো—কম্বোডিয়া বজারে লাগলো। হীরকের বদলে অমিতাভকে তদ্দিনে অনেকে চিনে গেছে।

এই নামটাই হলো কল। তাহলে একটু বজিয়েই দেখা যাক। হীরক ঠিক করলেন প্রকাশনী করবেন। কি নাম হবে? অনন্যাই ঠিক হোলো। হাতে মূলধন কম্বোডিয়ার বিক্রি বাবদ কয়েক হাজার টাকা আর এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করা আর কিছু। মৌখিক আলাপ বিনয়, ভদ্রতা এবং ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে ছেলেটিকে চট করে চোখে লেগে যওয়া ইত্যাদি এমন কিছু গুণ জড়িয়ে আছে যার ফলে কাগজ প্রেস যার পেতে তার খুব একটা অসুবিধে হোলো না। প্রথম বই ছাপা হলো মুস্তাফা সিদ্দিক আর অমিতাভ রায়ের। কিন্তু অফিস বা দোকান কোথায় হবে? হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে তো আর প্রকাশনী চলে না। কি হবে কি হবে ভাবতে ভাবতে এলেন সুজিত চ্যাটার্জী। একসঙ্গে এম-এ পড়তেন ওঁরা। সুজিতের বাবার বিরাট প্রেস, প্রায় প্রথম সারির, অফসেট টপসেট সব আছে। 'চলো কাকাকে বলে তোমার একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। ব্যবস্থা হোলো দীপ্তি প্রিন্টিং-এর অফিস ঘরের পাশে একটা টেবিলে। সালটা বোধ হয় উনিশ শো একাত্তর। দুটো বই-ই ভালো চললো। কলেজ স্ট্রীটের দীপ্তি প্রিন্টিং-এরই দোতলা ঘরের একটা জায়গা খালি হোলো।

এবার অনন্য উঠে এলো সেখানে, সেই নতুন ঘরে। এই ঘর থেকেই দীপ্তির ভাই ব্যবসা শুরু করে শীর্ষে উঠেছে। ব্যাপারটা কিছু-ই নয়, তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখেছি ছেলে-বুড়ো সবাই এই সেন্টিমেন্টটকে মেনে নেন। যেমন নতুন গাড়ি বেরুলেই কালী মন্দির আর জবা ফুলের মালা।

যাই হোক ঘরতো হোলো এবার পর-এর কাছে হাত-পাতা। কে কেমন ভাবে নেবেন। তাবড় তাবড় সাহিত্যিক ইয়া ইয়া প্রকাশনী থাকতে অনন্যকে দেবেন কেন বই? কিন্তু আমি আগেই বলেছি— হীরকের চোখ নাক মুখ এবং সব মিলিয়ে প্লেজিং পার্সোন্যালিটি প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। ফলে ঠিক চট করে ওর মুখের উপর কেউ না বলতে পারলেন না। না নয়, বরঞ্চ সহ-যোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন অনেকে। তার মধ্যে একজন বিমল কর। এমন কি বিমল করের অনুজ বন্ধু অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় গল্পের কাগজ গল্প বিচিত্রা বার হচ্ছিল তারও গুরুভার এসে পড়লে হীরক রায়ের উপর। ঠিকানাটা অনন্য প্রকাশনীরই ছিল। তারপর বিজ্ঞাপন আর ছাপা কাগজের হুড় হুড় করে দাম বাড়া সত্ত্বেও কাগজটিকে ছিল, কিন্তু ভালো লেখা না পাওয়ার ফলে কাগজটা বন্ধ করে দিতে হল। শিশু অবস্থায় কাঁহাতক আর সেই এক নাম ধরে ফিরে চালানো যায়।

অনন্য কিন্তু পায়ে পায়ে তখন এগুচ্ছে। নোবেল প্রাইজ পাবার আগেই হ্যাংহিংরিন বোল-এর একটা বই অনুবাদ হয়ে ছাপা হোলো— যুদ্ধ যখন শুরু হয়। বইটি বেরুবার পর যখন পুরস্কারের ঘোষণা বেরোলো বাজারে তখন অন্য কোনো প্রকাশন লেখকের বই ছাপবার আগেই অনন্যর বই শো-কেস আলো করে আছে। ফলে যা হবার তা হোলো। ঝপাঝপ উঠে গেল প্রথম মুদ্রণ। হ্যাঁ যা বলছিলাম বিমল কর শুধু নয় সমরেশ বসু থেকে কামার দাশিয়ান পর্যন্ত অনন্যর লেখক লিস্টে আছেন, এই কদিনেই প্রায় একাধিক বই বের করেছে অনন্য। চাটিখানি কথা নয়। লিস্টে আছে নানা স্বাদের গল্প আর লেখক যেমন অমিতাভ চৌধুরী সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ নিমাই ভট্টাচার্য শুভঙ্কর ওসমান গণির চক্রবর্তী অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিখিল সরকার। ৭২ সাল থেকেই ঘোড়া ছুটলো ধুলো উড়িয়ে।

একজন প্রকাশকের দায়িত্ব সম্পর্কেও হীরক সচেতন। জীবিকার সন্ধান যে এখন সারা পশ্চিমবাংলার সমস্যা তা মনে রেখে হীরক 'জীবিকার সন্ধান পশ্চিমবঙ্গ' বইটি ছাপলেন। কোন জেলায় কোন ব্যবসা বোধয় মূলধন কাঁচামাল বাজার বোধয় কি সব হদিশ এতে আছে। বাংলাভাষায় এ জাতের বই আর নেই। কৃষির ক্ষেত্রে হীরক গ্রামে গঞ্জেও ঘুরে যে কাজ করেছেন তা ভারতবর্ষে পথিকৃতের কাজ বলা যেতে পারে। ফসলের রোগ পোকার বিবরণ ছবি তার প্রতিকারের উপায় এতদিন চষাদের অজানা ছিল। বিপুল উদ্যমে, প্রচুর ব্যয়ে হীরক যা তৈরী করেছেন সে সম্পর্কে বাংলাভাষায় প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর কাগজে (যুগান্তরেও) প্রচুর আলোচনা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরাও হীরকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এটা একটা জাতীয় কর্তব্য বলা যায়।

—আসলে কি জানেন? হীরক রায় আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে বসেছেন, কারণ বিকেল থেকেই এখানে মোটামুটিভাবে একটা ছোট আড্ডা গড়ে উঠেছে। গল্প গুজব সাহিত্য আলোচনায় প্রায় রাত আটটা হয়ে যায়, এর মধ্যেই কেউ কেউ এসেছেন, কেউ কেউ আসবেন। ফলে এখানে আমাকে বেশীক্ষণ ঠিক ঠিকভাবে বলা হবে না দেখে দীপ্তির ঘরের এক কোণে আমরা মুখোমুখি বসে আছি। —আসলে অনন্যরা যারা নতুন তাদের কাছে সমস্যা একটা থেকে যায়ই। যেমন ধরুন আগে কাগজ ধার পাওয়া যেত, প্রেসও। এখন সে ক্ষেত্রে একটু অসুবিধে হচ্ছে। আস্তে বই বের করে যেতে হবে, নতুন বই অনেক সময় পুরনো লটকে টেনে নিয়ে যায়। তাছাড়া আমি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখছি ইনডিভিজুয়াল বায়ার-এর সংখ্যা বাড়ছে। এই তো পুরুলিয়া ঘুরে এলাম। সেখানেও মার্কেটের সেই একই অবস্থা। এভাবে আসাম থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ডিস্ট্রিবিউশনের মাধ্যম বই দিই। আচ্ছা আসুন এবার ব্যাপারটা নিয়ে একটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক। ধরুন আমি এক একটা জেলায় গেলাম, সেখানকার দোকান বা পরিবেশকের সঙ্গে কথা বলে চুক্তি করে বললাম— পাঁচ কপি করে বই আপনাকে ভি-পিতে পাঠাবো। এভাবে পাঁচ কপি করে আমার প্রথম লটে এখন বেশ কিছু বই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার বাইরে চলে যায়। ফলে ধরুন যেকোনো বই বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একটা এডিশান-এর বেশ কিছুটা বিক্রির যদি গ্যারান্টি পাওয়া যায় তবে প্রকাশনীর বই প্রকাশে কোনো অসুবিধেই থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ বিজ্ঞাপন দিতে হবে, লোককে ব্যাপকভাবে জানতে হবে বইয়ের কথা প্রকাশনীর কথা।

—তা হীরকবাবু, এখন কি ভাবছেন..? এই কাজ না অধ্যাপনা?

: দ্যা, দুবার অফার এসেছে যাই নি।

—প্রকাশনীতেই থাকবেন?

: নিশ্চয়ই, এ ছাড়বো না।

—আর?

: জানেনই তো লেখা এখন আমার অন্যতম নেশা বলতে পারেন। প্রকাশনীর সঙ্গে সঙ্গে তা চালিয়ে যাবো। উপন্যাস গল্প তো বটেই, এবং কবিতা।

—বাবা এখন কি বলছেন।

: বাবা এখন আর খুব কিছু মনে করছেন না, হয়তো বুঝেছেন দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

—দাঁড়িয়ে যাবেনই সে ব্যাপারে একটুও ভুল নেই। আমার ফরকাস্ট হোলো— দু বছর। দু বছরের মধ্যে 'দেজ' বিশ্ববাণীর পাশে অনন্যর নাম থাকবে।

হীরকবাবু হেসে বললেন না না, ওসব কত বড় প্রতিষ্ঠান।

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবছিলাম। একজন তরুণ না জেনে না শুনে এমন এক ব্যবসাতে নেমে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। হীরকের আছে গভীর আত্মপ্রত্যয় যেন ওর চোখের মণিতে ছায়া ফেলে যাচ্ছে অসীম নীলাকাশ।

আজকের এই হতাশার যুগে এ কি একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে না?

শান্ডিল্য চতুর্বেদী

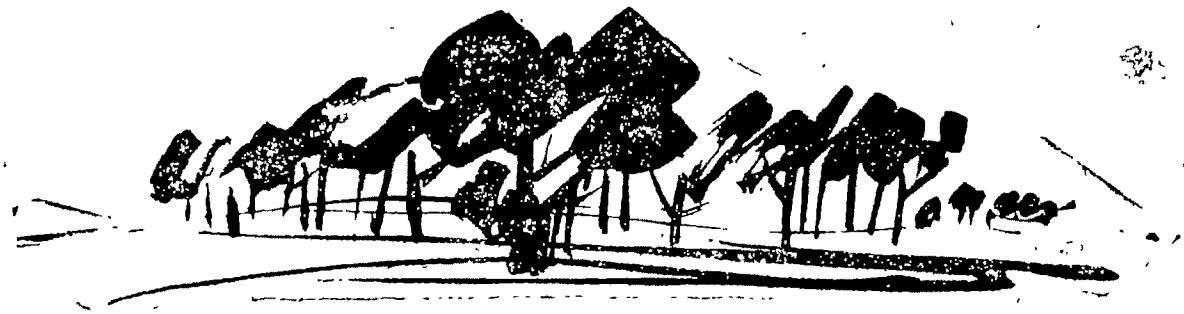

ঘুম

নখিল চন্দ্র সরকার

আজো ঘুম এলো না পলাশের। এই নিয়ে একটানা তিনদিন, চোখে জ্বালা ধরানো ভাব। মাথাটা ভার ভার। মগজের ভেতরটা দপ দপ করে। ঘাড়ের কাছে সর্বাক্ষণ এক যন্ত্রণা। কখনো কমে, কখনো বাড়ে। কিছুতেই পুরোপুরি যাচ্ছে না কপালের দুপাশের শিরা লাফাচ্ছে। মাথাটা ধরে থাকে। কানের লতি দুটো তেতে রয়েছে। শরীরে প্রচণ্ড তাপ। জিভটা বার বার শুকিয়ে উঠছে। আঠা আঠা লাগছে। সারা শরীরে অস্বস্তি। কিছুই যেন আর ভাল লাগে না। খাওয়ার ব্যাপারেই আর তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ নেই। মাঝে মাঝে তার মনের এই অবস্থা কেন যে হয় সেও বুঝতে পারে না। যদি মনে হয়, তার চোখের সামনে বিরাট এক শূন্যতার পর্দা ঝুলে আছে। সেখানে হাজারো উল্কাবৃষ্টি মাতছে। ওরা যেন তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে করে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। ওদের ফিরিয়ে দেওয়ার মতন শক্তি বুঝি তার নেই। ওর মনের চাঙ্গা, টগবগে ভাবটা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে তার নিজেকে অর্থহীন মনে হয়। ফলে এখন আর কারো সঙ্গে কোনরকম কথা-টথা বলতে ইচ্ছে করে না। নেহাত যা না বললে নয় এমন দু-চারটে কথা বলাটাও যেন তার ভীষণ বিরক্তি। কারো কথা শোনার ধৈর্যও যেন তার নেই। সামান্য অসহিষ্ণু, খিটখিটে হয়ে উঠছে। আবার দীর্ঘসময় ধরে চুপচাপ থাকতেও অনেক যন্ত্রণা, ঝামেলা। মনের মধ্যে কখন নানা ধরনের এলোমেলো ভাবনার ঝাঁকুনি চলে মুখের ওপর ছিজিবিজি সব রেখা ফুটে বেরোয়, এ যেন আরো বিরক্তিকর আরো জটিল, অস্থিরতা বেড়েই যায়, ঠিক এ আবার তার কি হলো? নিজেও বুঝতে পারে না। এ কি ভেতর করে প্রবল রে গজরাচ্ছে, আস্ত কোপনে তার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়েছে? এমনি করেই কি কুটুস কুটুস করে অনবরত তাকে খেয়ে যাচ্ছে? কেন, কি ভেতরের উপসর্গ বাইরেও একটু একটু করে ফুটে উঠছে? পলাশ কেন যেন অস্বস্তি বোধ করে। সে তো আজ তিনদিন ধরে এক মুহূর্তও ঘুমোতে পারছে না ভেতরে ভেতরে এক নিদারুণ এক যন্ত্রণা, অস্থিরতা আর উত্তেজনা। কিছুতেই কমছে না। মেজাজটাও তাই কেমন তিরিক্ষে, রুক্ষ হয়ে থাকে, সবাই ঘুমোয়। শুধু ওর চোখেই ঘুম নেই। চোখ বুজে পড়ে থাকে। যন্ত্রণায় ছটফট করে। এপাশ ওপাশ করে তবু তাকে ছিটেফোঁটাও কোন ঘুম-ঘুম নেশা নেই। কখন চোখের পাতা খুলে যায় তার। অন্ধকারের দিকে টানটান করা চোখে চেয়ে থাকে চোখদুটো জ্বলজ্বল। বাইরে যায়। কলতলায় গিয়ে চোখে মুখে ঘাড়ে কানে জল ছিটোয়, ফিরে এসে আবার শোয়। তবু, ঘুম আসে না তার। হঠাৎ তার কেন এমন হলো?

মনের ওপর একটার পর একটা ক্রমাগত চাপ। মাঝে মাঝে তার ছিঁড়ে যায়, সুরে কাটে, সব তখন কেমন এলোমেলো হয়ে যায় সবের অর্থ ফুরিয়ে আসতে পারে তার রাগ হয়। হাত পা ছুঁড়তে ইচ্ছে করে। সে আর পারে না। দিন দিনই সব আরো কেমনা জটিল ঘোলাটে হয়ে উঠছে। এর মধ্যেই পলাশ যেন কেবলই কে যায় তলিয়ে যেতে থাকে। মাথা ঝিমঝিম করে। সে যেন ধীরে ধীরে, ঝিমিয়ে পড়ছে। কিছু মুঠোতে কিছু আর ধরতে পারছে না মুঠোটা কেবলই আলগা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, এই দুর্যোগ ঝড়ো সময়ের হাতে সে নিছক একটা খেলনা মাত্র। তাকে নিয়ে অদৃশ্য কোন এক শক্তি যেন লোফালুফি খেলা দেখাচ্ছে। আলো জ্বালার খেলা। ডুগডুগি বাজছে। সে কি একটা যেন বলতে চাইছে। বলতে পারছে না। তার কথা কেউ শুনতে চায় না। কেমন অসহায়। এই কি বেঁচে থাকা? এরই নাম কি জীবন? এসব আজেবাজে ভাবনা তার মাথার মধ্যে কিলবিল করে।

জীবন যে কি পলাশ এখন ছাড়ে ছুড়ে তা টের পাচ্ছে। এখন সকাল সকাল তাকে ঘুম থেকে উঠতে হয়। আগে অগে বেলা করে উঠেছে, কেউ বলার ছিল না। এখন আর কোন উপায় নেই। হাত মুখ ধুয়ে চা টা কোন রকমে খেয়েই তাকে বাজারে ছুটতে হয়। বাজার যাওয়া মানে একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফেরা। মেজাজ বিগড়ে যায়। কে কি কিনবে বুঝতে পারে না। যেখানেই চলে দেওয়া যায় সেখানেই আগুন। ওরে বাবা, বলে কি। চিংড়ি মাছের কে জি চল্লিশ টাকা। এ হলো কি কথা মাত্র তাও আধা কেজি টাকা, কিছুই পড়ে সস্তা নয়। সবজির লোকের অভাব নেই। খানিকক্ষণের মধ্যেই উধাও, সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, বাজার থেকে প্রায় সবসময়ই খালি হাতে ফিরতে হয়। ঘরে ফিরেও শান্তি নেই। একটু স্বস্তি ফিরে পাবার উপায় নেই। হয়তো সেদিন রবিবার ছুটির দিন। তার মানে আরো একটা বাড়তি ঝামেলা। কোনদিন হয়তো এসে হাজির হবে কেউ, ওরে কমলা ফরিয়াদকে কমলালেবুর রস আন। এবার ভাল দেখে দিতে বলিস কি কমলা দিয়েছে বে একটানেই নিংরে যায় ভাল আঁচ হয় না। কোন কোনদিন আবার ঘরে অভিযোগ পেট ভাঁ করছে ঘরে ওষুধ নেই। কেউ বসিস নেই, একটু উদ্যমের ওপর সান্ত্বনা।

কোনদিন হয়তো নাকেমুখে গুঁজেই তাকে আপিস আপিস বেরোতে হয়। ইলেকট্রিক বিলটা আজ কদিন ধরে পড়ে আছে, জমা দিতে হবে। সেখানেও বিরাট কিউ। সংসারের

আরো শত রকমের ফাইফরমাশ। আরো হরেক ধরনের উটকো ঝামেলা। একটা থেকে আর একটা। কত দিক আর সামলাবে! একটা হয় তো, অন্যটা বাদ পড়ে যায়। সব মনেও থাকে না! দিন দিনই বিরক্তি বাড়ছে। কিছুতেই শরীর থেকে সে তাড়াতে পারছে না এটাকে। এক বাড়তি উপদ্রব। কোন কোনদিন এসব ঝামেলায় তার অফিসের বেলা হয়ে যায়। ভেতরে ভেতরে সে ছটফট করে। এরই মধ্যে পড়িমরি করে অফিসে দৌড়তে হয়। দেরি হলে তো আবার লাল কালির দাগ পড়ে যাবে। বড়বাবুর মুখ ভোঁতা হবে। আরে, সে কি আর ইচ্ছে করে লেট করে? হয়ে যায়। সবটা তার হাতেও থাকে না। সে যেন তখন কিরকম একটা পুতুলের মতন হয়ে যায়। এক মুহূর্তে তার সব উদ্যম ঝাঁপাঝাঁপি কেমন চুপসে যায়। চোখ মুখ উদাসীনতায় ছেয়ে থাকে। একটা নির্লিপ্ত ভাব। সে ইচ্ছে করলে বলতে পারে : দেখুন দোষটা কিন্তু সব আমার নয়। আমি যে ঠিক সময়ই বেরিয়েছিলুম, মাঝপথ থেকে বাসে ট্রামে ওঠা যে কিরকম ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে তো আপনারা জানেনই। কিন্তু আজ যে আমার দেড় ঘন্টা লেট হল বিশ্বাস করুন, বিবেকানন্দ রোডের কাছাকাছি এসে বাসটার কলকব্জা হঠাৎ বিগড়ে গেল! আর যাবে না, ব্রেক ড্রাউন তখন কি বাসে ট্রামে ওঠা সহজ! যাই হোক অনেক কষ্টে একটা ট্রামে উঠলাম। আমার দম আটকে আসার দশা। লোকে ঠাসাঠাসি। ভিড়ে যেন হাত ফসকে পড়ে গেল। গেল গেল চিৎকার! যে গেল, সে তো গেলই, অত ভাববার সময় নেই হাতে। ট্রাম চলল। সোজা এভিনিউ আর বউবাজার ক্রসিং-এ এসে কনডেন্ট হয়ে গেল। কপাল আর কাকে বলে! হেঁটে হেঁটে অফিস এলাম। বিশ্বাস করুন, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না স্যার।

পলাশ জানে, এসব বলে কোন লাভ নেই। তার কথা অনেকেই বিশ্বাস করবে না। ভাববে বানিয়ে বলছে। সে চুপ করে থাকে।

আগে তার এত ঝামেলা বা ভাবনা ছিল না। বছর চার আগেও তার বাবা বেণুবাবু সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। এখন বিছানায় পড়ে আছেন আর যে কোনদিন এ শয্যা ছেড়ে তিনি উঠে হেঁটেচলে বেড়াবেন তার আশা নেই।

বেনারসী • সিল্ক • তাঁত • চিট কাপড় • পোষাক
হাওড়া
মেঘদূত সোপাহাটী
৫৪৫, জি.টি. রোড, হাওড়া • ৬৭-৪৪৪৭

দিন দিনই খাবাপের দিকে যাচ্ছেন। ওষুধপত্রও আর ধরছে না। ক্রমশই বিছানার সঙ্গে লেগে যাচ্ছেন। প্রায় সময়ই ঝিম-ঝিম, আচ্ছন্ন অবস্থায় শুয়ে থাকেন। কারো সঙ্গে বেশী কথা বলেন না। বলতে ইচ্ছে করে না। দিনরাত্রি তাঁর কাছে সমান। কখনো কখনো তিনি তাঁর বড় ছেলে অবনী আর বড় মেয়ে গোপার কথা জিজ্ঞেস করেন। কয়েক বছর আগে একটু চোখে ছানি পড়েছিল। এখন দুটো চোখই গেছে, সময় থাকতে ব্যবস্থা নিলে হয়তো এমনটা হতো না। তখন কেউ গা করেনি। এক সময় ছানি কাটাবার কথাবার্তাও হয়েছিল। কিন্তু প্রেসার বেশী, তাছাড়া শরীরে আরো নানা উপসর্গ। বেণুবাবু রাজী হলেন না। রাজী না হওয়ার অবশ্য অন্য কারণও ছিল। এটা পলাশের অনুমান। মেজদা মানে মোহনও বাবার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আলাদা হয়ে গেছে। বড়দা তো অনেক আগেই তার বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিন্ন সংসার করেছে। পলাশের ওপরই এখন সংসারের বোঝা। ওদের ব্যবহার বাবাকে খুবই আহত করেছে। তার ওপর মার খোঁচামারা কথা। তার নির্মম বিদ্রূপ ঠাট্টা একধরনের অবজ্ঞা, বাবাকে আরো অন্যরকম করেছে। আশ্রয় করার মতন তিনি কাউকেই আর পেলেন না। বাবা বোধ হয় এভাবেই নিজের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন। তা না হলে এমন নির্বিকার উদাসীন হয়ে কেউ কি সংসারে থাকতে পারে? কোন রূঢ় কথা আচরণ বিদ্রূপ তাঁকে আজ স্পর্শ করে না। শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা নিয়েও তার কোনরকম অভিযোগ নেই। এমন নির্লিপ্ত কি করে সম্ভব?

এটা ঠিক তার বাবা বরাবরই খেয়ালী উদাসীনও। মা বলে 'তোর বাপের কথা আর বলিস না। বিষয় বুদ্ধি থাকলে কি আর এই হাল হয়। চিরটা কাল নিজে যা ভাল বুঝেছে, তাই করেছে। কারো বুদ্ধি তো নেয় নি। সময় হারিয়ে এখন তা বুঝতে পারছে।'

একদিন বাজার থেকে ফিরে এসে বেণু বাবু মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। সেই থেকে বিছানায়। আগে মাঝে মধ্যে তবু বাইরে বারান্দায় এসে একটু আধটু বসতেন। এখন আর তাও সম্ভব না। হাঁটু দুটো আর সোজা করতে পারেন না। বাবা এখন পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছেন অথর্ব। এক্ষেত্রে নিয়মিত ওষুধপত্র সেবাশুশ্রূষা খুবই প্রয়োজন। কিন্তু সে কথা একা একা আর কত দিক সামলাবে। পুরো দায় দায়িত্বটা তার একার নয়। তার ওপরে আরো দুই দাদা বউদি। বউদিটাও এখন আর খোঁজ খবর নেয় না। মাঝে মধ্যে ও আসতেও তো পারে! ইচ্ছে করলে কি এ সময়ে কিছু সাহায্য করতে পারে না? সাহায্য তো দূরের কথা চিঠি দেওয়াটাও কমিয়ে দিয়েছে। পাছে কোন কিছুতে জড়িয়ে যায় এই ভয়? আশ্চর্য! তার দাদাবাও সময় বুঝে দিব্যি কেটে পড়েছে। মাসের শেষে কটা টাকা পাঠিয়েই কি সব কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? এ মাসে তো দুজনই আবার কম টাকা পাঠিয়েছে। একেই তো পরিমাণ সামান্য তার ওপর আরো কম। নিছক নিয়মরক্ষা যেন। যুক্তি হলো জিনিসপত্তরের দাম বাড়ছে। ছোট মেয়েটাকে স্কুলে দিয়েছে। এবার অসুখ বিসুখে খুব বেশী ভুগেছে পর পর কটা নেমতন্ন গেছে আরো টুকিটাকি ঝামেলা। সংসারের খরচও বেড়ে গেছে। সুতরাং আর কুলোতে পারছে না। বাঃ চমৎকার অজুহাত। চমৎকার এই সংসার।

চিঠি পড়ে পলাশের মাথার আগুন ধরে যায়, চিঠি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেও তার জ্বালা কমে না। গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করে : বাবা মা কি আমার একলার? এ কটা টাকায় কি হবে শুনি? এরচেয়ে এ ভিক্ষে আর না দিলেই হয়। জিজ্ঞেস করি তোমরাও কি সব অন্ধ হয়ে গেছ? তোমরা কি জান না বাবার ওষুধ দরকার, মারও শরীর ভাল নেই, ভাল থাকে না আজকাল? দু দুটো বোনের এখনও বিয়ে হয়নি? ওদের পেছনেও একটা খরচ আছে? তোমরা তো ভাল করেই জান, আমার মাইনে কত। তবু ধৃতের মতন আমার ওপর সব ফেলে দিয়ে তোমরা সরে পড়েছ। এতে কি ভাবছ তোমাদের ভাল হবে? হবে না হবে না। তোমরা সব শয়তান স্বার্থপর।

আজকাল মা বাবার ওপরও পলাশের ক্রোধ ঘৃণা জমে ওঠে। সেও আর সইতে পারে না। দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। এসব অভাব অভিযোগের কথা সে আর শুনতে চায় না। তবু মা নিরুপায় হয়ে তার কাছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যে করেই হোক, তুই বাবা ছেলেটেলে দেখে একটাকে অন্তত পার কর আমি আর ওদের কথা সইতে পারি না। ওদের জন্যে চিন্তায় চিন্তায় আমার ঘুমটুম আর আসে না।'

পলাশ এসব কথার কোন জবাব দেয় না। সে চুপ করে থাকে, কথা বললেই কথা বাড়ে। তার কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, মার কি চোখ নেই? তারও দুটি কি খোলামকুচি? একপেশে? বুকের ভেতরটা তার টনটন করে। আসলে তাকে কেউ বুঝতে চায় না। চেষ্টাও করে না। মাঝে মাঝে অভিমানে বুক ভারী হয়ে ওঠে, আদৌ তার ক্ষমতা আছে কি না, থাকলেও কতটুকু এসব কথা কেন একবারও কেউ ভাবে না? সে কত আর আয় করে। কিছুই তো সে লুকোয়নি। তবু সন্দেহ! এতগুলো মানুষ বাসা ভাড়া। তার ওপর এই এলেমেলো সময়। তার বাবা বিছানায় পড়ে আছেন অনেকদিন। তার একার রোজগারের ওপর ভরসা। সে আর পেরে উঠছে না, ইদানীং বাড়িওলা আবার তাদের ওঠাবার চেষ্টা করছে। নানান অছিলায় মনোমালিন্য ছোটখাটো কলহ। তার চলে গেলেই বেশী ভাড়া পাবে! কিন্তু কোথায় যাবে তারা? মনটন একেবারে তেতে থাকে। বাইরে ভেতরে শুধু ঝঞ্ঝাট আর ঝঞ্ঝাট। এ অবস্থায় আবার ওদের বিয়ে। বিয়ে কি আর মুখের কথায় হয়! টাকার দরকার।

কোথায় সে এত টাকা পাবে? কার কছে সে হাত পাতবে? আর পাতলেই বা কে তাকে সাহায্য করছে? এমন সহৃদয় মানুষ কি এখনও আছে? সেও জানে ওদের বয়েস হচ্ছে। শরীরের কোমল নরম তেলতেলে ভাবটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। দিনদিনই রুক্ষ শুখনো হয়ে উঠছে চেহারা। চোখের কোলে কালো ছোপ। দিন দিনই স্বভাবে এক ধরনের নির্লজ্জ উদ্ধত, অবাধ্য ভাব। তাহলেও কিছু করার নেই তার।

মা যে কেন তাকে দিনের পর দিন এসব কথা শোনায়। তার শুনতে ইচ্ছে করে না। মনে মনে সে ক্ষুব্ধ হয়। মুখের ওপর খুব কড়া করে অনেক সময় তার বলার ইচ্ছে হয়ঃ এসব প্যানপ্যানানি শুধু আমার কাছে কেন? যাও না, তোমার তো আরো গুণধর সব ছেলে আছে। ওদের কাছে গিয়ে একবার বল তো। তোমাদের জন্যে কি ওদের কোন দায়িত্ব, কর্তব্য নেই? তুমি কি ওদের পেটে ধরনি? আমার ঘাড়েই বা সংসারের এই বোঝা তোমরা চাপিয়ে দিয়েছ কেন? তোমরা আমাকে নিয়ে আর কি করতে চাও?

কিন্তু এসব কথা সে কাউকেই শোনাতে পারেনি। কউকেই সে কিছু বলতে পারে না। তুষের আগুনের মতন সে শুধু পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে। সে অস্থিরতা বোধ করে। ভেতরে ভেতরে তার ছটফটানি বাড়ে ক্রমশই যেন সে কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে। তার কথাটা এখানে একবারও কেউ ভাবছে না। শুধু তাকেই সব কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। মাঝে মাঝে তার মনটন খুব খারাপ হয়ে যায়। মনে হয়, সব ফেলে-ফুলে কোথাও সে চলে যায়। এখানে মমতা, ভালবাসার যেন কোন দাম নেই। তখন কারো কথা সে আর ভাবতে চায় না। ভাবতে ইচ্ছে করে না। সে যেন কেবলই ডুবে যাচ্ছে। তার দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু এর পরও কোথাও সে চলে যেতে পারে না। আবার ফিরে আসে। নিজেকে যেন তখন আরো অসহায় মনে হয়। আরো কষ্ট বাড়ে। দাদারা চতুরের মতন সরে পড়েছে। বাবার মুমূর্ষু দশা। তবু ওরা একবার দেখতে আসে না। বাবার ওপর ওদের অনেক অভিযোগ। ওরা রুষ্ট, অসন্তুষ্ট।

রুষ্ট পলাশও। ঠিকই তো সারা-জীবন রোজগার করে বাবা তাদের জন্যে কিছুই রেখে গেলেন না। পলাশেরও কেন যেন আজকাল বিদ্রূপ করে তার বাবাকে বলতে ইচ্ছে করেঃ হে আমার বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান পিতৃদেব, কি সুন্দর মহান অভিজ্ঞতার মধ্যেই আপনি আমাদের রেখে গেলেন। বলতে পারেন, কি দরকার ছিল এর? এটা কি ঠিক, অধিক সন্তানের জনক হয়েই কারো প্রতি আপনি সুবিচার করতে পারেননি? আমরা কি আপনার সেই ভুলের শিকার? কি করে এমন নির্লিপ্ত উদাসীন থাকতে পারলেন আপনি? মেয়েদের কথাটাও কি একবার আপনার মাথায় এলো না? নিদেনপক্ষে ওদের বিয়ের জন্যেও তো কিছু জমালে-টমালে পারতেন। এ আপনি অজ্ঞ আমাকে কোন নরকে টেনে আনলেন? আপনার আর কি। আপনার তো জীবন কেটে গেল কিন্তু আমার অবস্থাটা কি একবারও ভেবেছেন? আমার অপরাধ? ওদের মতন আমি এখনো সেয়ানা হতে পারিনি তাই? ওহো আপনাকে বলেই বা আর কি হবে। আপনি তো আবার কানে শোনেন না, যাকে বলে কালা, তাই। চোখে দেখেন না, অন্ধ। বুঝবার মতন মনও আপনার নেই।

এসব সে ভেবেই গেছে। বলা আর হলো না। মনে মনে খালি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। জ্বলুনি বেড়েছে। বাবাকে সরা-সরি সে এসব কথা বলতে পারেনি। এই শেষ মুহূর্তে সে আর নতুন করে আঘাত দিতে চায় না। সে শুধু ছটফট করে। অস্থিরতা বাড়ে। এর চেয়ে বোধ করি মুখোমুখি সংঘর্ষ ঢের ঢের ভাল। এতে ভেতরের দূষিত, ঘোলা বাষ্প বেরিয়ে যেত। খানিকটা সে হাল্কা হতে পারত। তার ঘুম আসে না। কিছু যদি একটা সে করে ফেলতে পারত তাহলে এমন করে তাকে তিলে তিলে পুড়তে হতো না কিছু পারে না বলেই যে তার কষ্টটা আরো বেশী। ভেতরে ভেতরে সে যে খুবই আহত, ক্লান্ত, একথাটাও কাউকে বোঝাতে পারছে না। বোঝাতে পারে না। মনের আকাশে শুধু মেঘই জমতে থাকে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায় সেখানে। শুধু কাটাকুটি। অনেক সে ঘোরাঘুরি করেছে, অনেক ভেবেছে। আর সে কিছু পাবে না। ভীষণ ক্লান্তি।

আজ ক'দিন ধরে তার বাবার শরীর আরো খারাপ। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট। একটা ঘোরলাগা, আচ্ছন্ন ভাব। থেকে থেকে হিক্কা উঠছে। অথচ একটা ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না। পলাশ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। নেই। হঠাৎ বাজার থেকে উধাও। এ তো বেশ ভেল্কিবাজির খেলা। বিপদের মুহূর্তেও লোকে ওষুধ পাবে না? আগের ওষুধটায় ভাল কাজ হলো না। ডাক্তারবাবুও অবাক হয়েছেন। কে জানে ওটায় ভেজাল ছিল কিনা? বিবেক মনুষ্যত্ব বলে কি মানুষের সংগ্রহে কোন সম্পদ নেই? সবই কি শেষ হয়ে গিয়েছে। পলাশের কেন যেন ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। দেখতে দেখতে গোটা পরিবেশটাই কেমন নোংরা হয়ে উঠছে। মানুষ কেন এমন হয়? কেন তার এই লাগাম-ছাড়া লোভ? মানুষের বুকের ভেতরে কি এখন কোন মরু-প্রান্তরের শুকনো হাওয়া দাপাদাপি করে? এ নিয়ে পলাশ অনেক ভেবেছে। কোন উত্তর সে পায়নি। বরং এসব ভাবতে গিয়ে মাথাটা তার গরম হয়ে উঠেছে। ঘুমোতে পারছে না। এ কি উদোম নৈত্য শুরু হলো? নিজেকে এর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না সে। বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। সে তো ভাবতে চায় না। কিন্তু চারপাশ থেকে ওরা তাকে ঘিরে ধরে। সে পালিয়ে আসতে চায়। পারে না। বেরোবার কোন পথ তার জানা নেই। এই দুরন্ত ঘুণপোকাটা দিন-রাত তাকে কেটে চলেছে। বিছানায় শুয়েও তার স্বস্তি নেই। খালি এপাশ-ওপাশ, ছটফটানি। রাত ঘন হতে থাকে। তার চোখের পাতা এক হয় না। পাড়ার কুকুর-গুলো অদ্ভুত রকমের চিৎকার শুরু করে। তবু, তবু তার চোখে ঘুম আসে না। বুকের তেষ্টা যেন বেড়েই চলে।

অথচ এসব উপসর্গ তার আগে ছিল না। হালে দেখা দিয়েছে। আগে খুব গাঢ় ঘুম হতো তার। আজ কিছুদিন ধরেই রোগটা তার শরীরে মাঝে মাঝে ভেসে উঠছিল। এক-আধদিন থেকেই আবার মিলিয়ে গেছে। কিন্তু এরকম একটানা তিনদিন ঘুম নেই, এই প্রথম। সে কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? বুকের ভেতরটা তার গ্রীষ্মের দুপুরের মতন খাঁ-খাঁ করে। ফেটে-ফুটে চৌচির। আগুনে ঝলসে-যাওয়া হাওয়া যেন সেখানে এখন ছটফট করে মরছে। ভয়ে সে আঁতকে ওঠে। এ কি আরো মারাত্মক, ভয়ংকর কোন রোগের লক্ষণ? সে বুঝতে পারছে না কিছু। এমনি করেই কি সে পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে?

কিশোর পলাশেরই সহকর্মী বন্ধু। ও-ই তাকে এর থেকে বাঁচবার জন্যে একটা রাস্তা খুঁজে বের করেছিল। ওকে এভাবে মনমরা থাকতে দেখে কিশোর একদিন বলেছিল, এভাবে কি হয়েছে বে?'

পলাশ ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বিষণ্ণ গলায় বলল, ভাল লাগছে না কিছু। ওর মুখের ওপর মলিন ছায়া। সামান্য অস্থিরতা।

টিনোপালের নতুন নাম

রানীপাল+

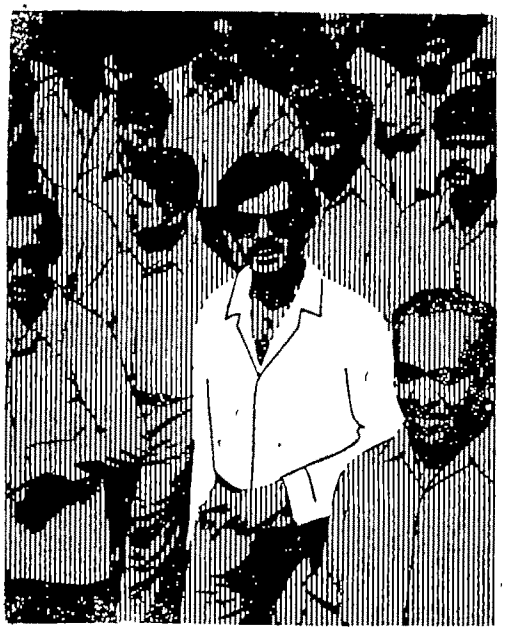

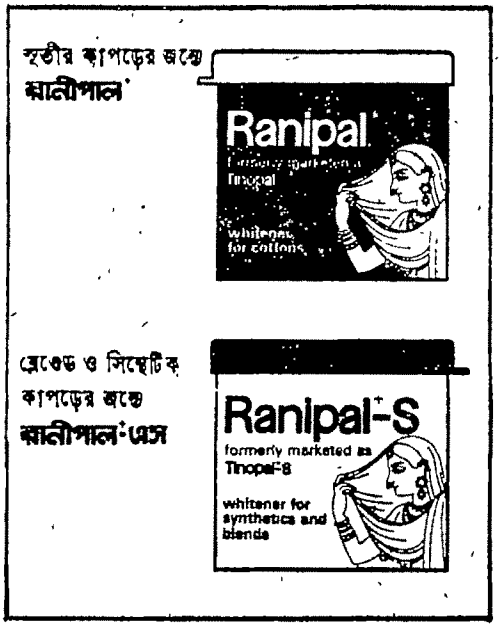

সেই জিনিষ,সেই কাজ,নতুন নামে এল আজ

সবচেয়ে সাদা করার জন্যে রানীপাল+

Suhrid Geigy LIMITED

+ সুহৃদ গায়গি লিমিটেডের ট্রেডমার্ক ● সিবা-গায়গি লিমিটেডের লাইসেন্স'এর অধীনে এতকাল বাজারে বিক্রী হয়েছে।

Shilpi SGT 6A/78 ben

কিশোর মুখ টিপে টিপে হাসল। জবাবে সোৎসাহে বলল, চল আমার সঙ্গে দেখবি শরীর মন সব ঠিক হয়ে গেছে।

কোথায়? পলাশের চোখে ভীরু ছায়া তিরতির করে।

কিশোর ওর হাত ধরে টানল, বলল, চলই না। আরে, অনেকদিন তো ভাল ছেলে থেকে দেখেছিস কি হলো? এবার একটু খারাপ হ দেখি। মাঝে মাঝে খারাপও হতে হয়। তাতে সব কিছু নর্মাল হয়ে যায়। জানিস তো, শরীর মনের যখন যেমনটি দরকার, তখন তাকে তাই দিতে হবে, তা না হলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে। বলতে বলতে ও জোরে জোরে হাসে।

এরকম কথা এর আগেও কিশোর তাকে অনেকবার বলেছে। বহুবার লোভ দেখিয়েছে তাকে। ওর কথার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। ভারী অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে ও।

সেদিন পলাশের যেন কি হলো। ওর কথাটা সে আর উড়িয়ে দিতে পারল না। ফস করে বলে ফেলল, ঠিক আছে চল।

সাবাস! কিশোর বেশ উৎফুল্ল। খুশি খুশি গলায় বলল, বুঝলি পলাশ মানুষের চরিত্র এত ঠুনকো নয়। চরিত্র জিনিসটা অন্যরকম, আরো বড় কিছু। একটু মদ খেলি কি দু চারটে মেয়ে ফেয়ে নিয়ে আমোদ ফুর্তি করলি, তাতে চরিত্র যায় না। কিন্তু আমাদের দেশেই চরিত্রের সংজ্ঞাটা আলাদা। একটুতেই গেল গেল আওয়াজ।

এসব যুক্তিতর্কের কথা পলাশের ভাল লাগে না। ম্লান হেসে বলল, ওসব চরিত্র-ফরিত্র এখন থাক, এখন বল কোথায় যাচ্ছিস।

কিশোর চোখ মটকে হাসি মুখ করে বলে, গেলেই বুঝতে পারবি।

খানিক পরে ওরা একটা 'বার'-এ ঢুকল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। এক কোণায় গিয়ে ওরা বসল। ঝিম ঝিম আলো। পুরু গদি আঁটা সোফা। পলাশের মুখ চোখ শুকিয়ে গেল। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করছিল। কে কোথায় দেখে ফেলবে! একটু আড়ষ্ট। অনেক লোক। গম গম করছে হলঘরটা। অনেক মেয়েরাও এসেছে। কোনরকম সঙ্কোচ বা জড়তা নেই ওদের। হাসছে। কথা বলছে। ওদের পাশের টেবিলেই দুটো অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে একটু একটু করে খাবার খাচ্ছে মদ খাচ্ছে। মাঝে মাঝে হো হো করে হেসে গায়ে ঢলে পড়ছে। মনে মনে পলাশ একটু শক্ত হওয়ার চেষ্টা করছিল। কিশোর সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্যাকেটটা পলাশের দিকে এগিয়ে দিল। একমুখ ধোঁয়া মুখ থেকে বের করে দিতে দিতে কিশোর বেশ সহজ গলায় বলল বেশী কিছু নয়, একটু মদ্যপান। জীবনে তো কিছুই করলি না। মরে গিয়ে যমরাজকে কৈফিয়ৎ দিবি কি? বলে হো হো করে হাসল ও।

পলাশ কিছু বলল না। এই পরিবেশ তার কাছে একেবারেই নতুন। এখনও নিজেকে সে এর সঙ্গে পুরোপুরি মেশাতে পারছে না। সিগারেট ধরাতে গিয়ে হাতটা তার কেঁপে গেল। পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি নষ্ট করে শেষে সিগারেট ধরাল সে। আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ছিল। তার কেন যেন একটু একটু ভয় করছিল। লোকগুলো হঠাৎ যদি মাতাল হয়ে যায়? চেয়ার টেবিল গ্লাস বোতল ভাঙতে শুরু করে দেয়?

কিশোর যা বলার বলে দিয়েছে।

সামান্য পরে বিয়ারের বোতল এল। দুটো গ্লাস। একটা পাত্রে কিছু কাজু বাদাম, চানাচুর। অন্য একটা গ্লাসে বরফের টুকরো। কিশোরই ঢালাঢালি করল। একটা গ্লাস এগিয়ে দিল পলাশের দিকে, নে।

নারে আমার ভয় করছে।

খা তো, কিচ্ছু ভয় নেই, একটুই দিয়েছি।

আমার কিরকম যেন করছে।

কিশোর হাসল, একটু পেটে গেলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে। নিজের গ্লাসে ও চুমুক দিল। সিগারেট টানল। ধোঁয়া ছাড়ল। দুটো কাজু বাদাম খেল। আবার গ্লাসে ও চুমুক দেয়। কি ভেবে আস্তে আস্তে পলাশের মুখের দিকে তাকাল। বলল, আমরা তো একবারই এ জীবনটা পেয়েছি রে! তুই কিন্তু হেলাফেলা করে এই পবিত্র দামী জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছিস। আমার অবশ্য আফশোস নেই। জীবনটাকে আমি চেখে চেখে দেখেছি এখনও দেখছি, কিন্তু তুই?

পলাশের মুখের ওপর বিষণ্ণ এক ছায়া ছড়িয়ে আছে। সে কিছু বলল না। অল্প চানাচুর মুখে ফেলল। পরে কি ভেবে গ্লাসটায় চুমুক দিল। কিরকম যেন বিস্বাদ। বিকৃত মুখ করে বলল, তেতো। গ্লাসটা সরিয়ে রাখল। সিগারেট টানতে টানতে কিশোরের চোখে চোখে সে তাকাল। বলল, তুই তো আমার সবই জানিস। নিজের দিকে তাকাবার মতন কোন ব্যাপার নেই আমার। গলাটা ভাঙা ভাঙা শোনায়।

কিশোরও চোখে চোখে তাকাল, জানি, জানি বলেই তো বলছি। বয়েস তো এদিকে চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে আজো বিয়ে থা করলি না। আমিও করিনি। কিন্তু তুই কি বলতে চাস, আমাদের রক্ত এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? আমাদের কোন কামনা বাসনা নেই? কিশোর চুপ করে থাকল। সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। তার গ্লাস শূন্য। এতে কিছুই হলো না। এবার সে হুইস্কির অর্ডার দিল। এটা তার নিজের জন্যে। একটু পরে হুইস্কি এলো, সোডা এলো।

পলাশ সিগারেট টানতে টানতে বলল, বিশ্বাস কর আমি এখন একটা গাড্ডায় পড়ে গেছি বেরোবার কোন পথ পাচ্ছি না।

কিশোর গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসল কি ভেবে। সিগারেটটা শেষ হয়ে গেছে। অ্যাস-ট্রের গায়ে ঘষে ঘষে টুকরোটা নিবিয়ে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, এরকম নিরামিষ জীবনের কি দাম রে?

সেদিন ফিরতে ফিরতে ওদের বেশ রাত হয়েছিল।

এর পর থেকে কিশোর প্রায়ই তাকে লোভ দেখাত। পলাশ এড়িয়ে গেছে। তার বুকে অত সাহস নেই। সে ভীরু, দুর্বল। অথচ তারও রক্তের মধ্যে ঢেউ ওঠে। কখনো কখনো ঝোড়ো হাওয়া। হুলাৎ হুলাৎ শব্দ হয়। সে তো গলিত নখদন্ত নয়। কামনার বিষে তারও শরীর-মন জরজর। মাঝে মাঝে তারও মনের তলা থেকে একটা প্রশ্ন উঁকি মারে। এ অবস্থায় সে কি কোনদিন বিয়ে করতে পারবে? হয়তো তা সম্ভব নয় তার পক্ষে। এক্ষেত্রে সে কি কোন নারীদেহের উষ্ণ, স্বাদু সান্নিধ্যের সন্ধান অন্ধকারের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে? যদি পারত ক্ষতি ছিল না। মনে মনে সেও তো এক-আধবার কিশোরের মতন হতে চেয়েছে। পেরেছে আর কই। সেও বুঝতে পারে, জীবনকে উপোসী রেখে কোন লাভ নেই। কিন্তু সে খারাপও হতে পারে না। 'সও মাঝে মধ্যে নবকের পথ বরণ' করতে চায়। কিশোরের মতন হতে পারলেও যেন সে বেঁচে যেত। খানিকটা স্বস্তি বোধ করত। মাঝে মাঝে হতাশায় সে ভেঙে পড়তে চায়। নিজেকে তখন বড় একা বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। আশ্চর্য, এই ভোগবিলাসের মধ্যে ডুব দেওয়ার ক্ষমতাও তার নেই। এর জ্বালা যেন আরো বেশী, আরো তীব্র। অক্ষমতার এক নিদারুণ যন্ত্রণা।

আজ সারাদিনটাই তার অস্বস্তি আর যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে কেটেছে। এমনিতেই সাতরকমের ঝামেলা। দুদিন ধরে ঘুম নেই। ওষুধ খেয়েও তার ঘুম হলো না। মাথাটা ছিঁড়ে যাওয়ার দশা। এরই মধ্যে সে বাজারে গেছে। বাজার থেকে উত্তেজিত হয়ে ফিরেছে। রেশনের দোকানে লাইন মেরেছে। আজও অফিসে সে লেট। মেজাজটা এমনিতেই তিরিক্ষে, তেতে ছিল। সে লেট হওয়ার কারণটা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু বড়সাহেব শুনতে চাইলেন না। উল্টে তার ওপর চটে গেলেন। কড়া কড়া কিছু কথা তাকে শুনিয়ে দিলেন।

বেনারসী·সিল্ক
তাঁত ও
ফ্যান্সী শাড়ী
ক্ষপসী
৬২, জি, টি, রোড, হাওড়া।

পলাশ কিছু না বলে নিজের টেবিলে এসে বসে। সে রাগে কাঁপছিল। তার চোখ মুখে উত্তেজনা। বাধ্য হয়ে লেট অ্যাটেন-ডেন্স রেজিস্টারে সই করল। তার শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। লোকটার কাছে গিয়েই সে ভুল করেছে। সে আজ চলে এলেই পারত। মনে মনে তার গালিগালাজ করতে ইচ্ছে হলো : শালা পয়লা নম্বরের চামার, তিলে খচ্চর। ওরে শালা খালি লম্বা চওড়া বাত, তোমাকে তো আর ঝামেলা পোয়াতে হয় না। হলে বুঝতে চাঁদ, আছোলা বাস্তু কাকে বলে!

অথচ এরকমভাবে পলাশ আগে কখনো উত্তেজিত হতো না। এসব শুনলে বরং কুণ্ঠিত, বিনীত মুখে বলত, আর হবে না স্যার, এবার থেকে সময় মতন আসব। কাঁচুমাঁচু গলা। কি যেন সে একটা অপরাধ করে ফেলেছে!

কিন্তু আজকাল সামান্য কারণেই সে চটেমটে ওঠে।

আজ আর তার কিছুই ভাল লাগছে না। অফিস ছুটির পর এলোমেলোভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছে। ওষুধের দোকান থেকে আরো কড়া ধরনের ঘুমের বড়ি কিনেছে। সেও এক ঝামেলা। একটু রাত করেই বাড়ি ফিরেছে সে।

বাড়ি ফিরে হাত মুখ চোখে ঘাড়ে ভাল করে জলের ঝাপটা দিয়েছে। শরীরে তাপ তখনো কমেনি। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে। চোখে ব্যথা। মগজের ভেতরটা দপদপ করছে। খেতে বসে মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। আজ যেন কি হয়েছে তার। শুকনো, শক্ত শক্ত কখানা রুটি, আর জলের মতন একবাটি ডাল, সামান্য আলুর দম।

পলাশ বিকৃত মুখে বলল, রোজ রোজ এ আর কত গেলা যায়? আর কিছু করতে পার না? কয়েক টুকরো মুখে দিয়ে বিরক্তিতে সে উঠে পড়ে।

আমার ওপর চোটপাট করলে কি হবে আমি কি নিজের হাত কেটে খাওয়াব, যা আনবি তাই তো করব। সংসারের অভাব অভিযোগের শতনাম শুনিয়ে চলে মা। ভাঙা রেকর্ডের মতন মার গলায় একই কথা বাজতে থাকে।

পলাশ কিছুই আর ভাবতে চায় না। এসব হিসেব-টিসেবের কোন ধার ধারে না সে। এত চাপ আর সইতে পারছে না। সে এখন ক্লান্ত। তার মাথা ঘুরছে। চোখ টনটন করছে।

রাত ক্রমশ বাড়ছে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার। রাস্তায় থেকে থেকে কুকুরের চিৎকার। দিনের কোলাহল, অস্থিরতা অনেকটা ঝিমিয়ে এসেছে। ঘরের সবাই এর মধ্যেও কত নিশ্চিন্তে, কত আরামে ঘুমোচ্ছে। এরা কি চারপাশের বোন খবরই রাখে না? বাবার অবস্থা আরো খারাপ। ক্রমশই অবসন্ন, নেতিয়ে পড়ছেন। বোধ-শক্তি লোপ পাচ্ছে। হায়রে ওষুধটা আজো পাওয়া গেল না! সে তো এজন্যে অনেক ঘুরেছে!

পলাশ চোখ বুজে অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে আছে। চোখে ঘুম নেই। সংসারের অভাব চিরদিনই বেড়ে চলেছে। কোথায় কিভাবে যে এর শেষ হবে বুঝতে পারছে না। এই সংসার ঘুণপোকার ছদ্মবেশে তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মনে মনে বলল : আমি আর পারছি না, পারছি না। আমার কি মাথাফাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে?

এভাবে আর থাকা যায় না। এবার অন্ধকারের মধ্যেই সে উঠল। পকেট থেকে ওষুধ নিল। আর পারা যাচ্ছে না। টেবিলের ওপর জলের গ্লাস ছিল। দুটো বড়ি সে খেয়ে নিল। আবার এসে শুয়ে পড়ল।

খানিক পরে পলাশ বুঝতে পারল, ওষুধে কাজ হয়েছে। তার চোখ যেন নেশায় ভারী হয়ে উঠছে। জড়িয়ে আসছে চোখের পাতা। কোথায় যেন একটু একটু করে সে ডুবে যাচ্ছে। তার হাত পা সব আলগা হয়ে যাচ্ছে। এতটুকু জোর নেই। তার ভয় হলো। একবার ঘুমিয়ে পড়লে আবার ঘুম ভাঙবে তো! কি একটা কথা বলার ইচ্ছে হলো তার। বলতে পারল না। এ আবার তার কি হলো! কান্না পেল। কাঁদতেও পারছে না। হায় হায়, এ সে কি করেছে! সে ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। চারপাশটা আরো যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না। কাউকেই তো সে চিনতে পারছে না। অনেকের মুখ মনে করার চেষ্টা করল সে। স্পষ্ট হলো না মুখ-গুলো। কি যেন সে বলতে চাইল। কথা ফুটল না গলায়। ঠোঁট কাঁপল। শেষে মনে মনে বলল : ওহে আমার আপনজনেরা, তোমরা শুনে রাখ এরকম করে আমি আর বেশীদিন বাঁচব না। আমার মতন করে বেঁচে কি লাভ। শ্মশান কি আমার এখান থেকে খুব দূরে? আমি তো জানি, এর পর থেকে এরকম ওষুধ না হলে আমার ঘুম হবে না। তখন দুটো তিনটে চারটে বড়িতেও কি আমার কষ্ট, যন্ত্রণা কমবে? আপনারাই বলুন না, এই ভেজাল চোরা-পথে মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে?

পলাশের মাথা ঝিমঝিম করছে। গলাটা আঠা আঠা! খানিকটা টের পাচ্ছে আবার পাচ্ছে না। চেতন অচেতন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। একবার কোথায় তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। আবার ডুবছে আর ভাসছে। এমনি করে করে তার বাকী চেতনাও আবছা, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে আরো, আরো কোন গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে।

ভোজেশ্বর থেকে কলকাতা

(৩)

গোষ্ঠ পালের জন্ম (২৮শে আগষ্ট ১৮৯৬, বাংলা ৫ই ভাদ্র, ১৩০৩) বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার ভোজেশ্বর গ্রামে। কিন্তু তাঁর যৌবনের লীলাভূমি, বার্ধক্যের বারানসী, সবই এই বংলার কলকাতা শহরে। ভোজেশ্বর থেকে কলকাতায় আগমন ও অধিষ্ঠান আসা দেখা ও জয় করা—সে এক বিচিত্র কাহিনী।

তখন বয়স কতেই বা হবে। বড়জোর আট। গোষ্ঠপল প্রথম এলেন কলকাতায়। পড়ার স্কুল এরিয়ান ইনস্টিটিউটে (এখনকার সরদাচরণ ইনস্টিটিউশন) নাম লেখাতে সহপাঠী সরেজ রঞ্জের সংগে বন্ধুত্ব জমে উঠলো। দুজনে ভব হলায় গলায়। সরেজই গোষ্ঠকে নিয়ে যান কুমারটুলী পার্কে। পার্কের পশ্চিম ধারের গোলপোস্টের পেছনে ধর করা একজোড়া ডসনের বাড়ির বুট পরে বল লথালাথি শুরু হয়ে গেল। এমনি করেই হলো তাঁর ফুটবলে হাতেখড়ি।

গোলপোস্টের পেছনের অঞ্চল ছেড়ে ক্যালকটা ইউনিয়ন ক্লাবের রাইট ব্যাক হিসেবে পার্কের মকখনে আসতে গোষ্ঠ পলের তেমন সময় না লগলেও খেলাধূলায় যোগ দেওয়ব বিষয়ে অভিভাবকের সম্মতি পেতে তাঁর অনেক দেবি হয়েছিল। ও'র মুখেই শোনা 'তখন অভিভাবক ছিলেন কাকা। খেলাধূলা একদমই পছন্দ কবতেন না। গরুজনদের লুকিয়ে ওপরতলা থেকে হাফপ্যান্ট রাস্তয় ফেলে দিতাম। তরপর সেটি কুড়িয়ে দৌড়তাম মাঠের দিকে। মঠ থেকে প্যান্ট হাতে ফেরার সময় ভয়ে ভেতরটা দুরদুর করতো। চোরের মতো, কতো কায়দা কবে যে বাড়ীতে ঢুকতে হোত! মোহনবাগানে যোগ দেওয়ব পর অবশ্য গুরুজনেরা প্রসন্ন হন। বিশেষতঃ কাকা। অর তিনি বধা দেন নি। বরং উৎসাহই যুগিয়ে গিয়েছেন।'

মোহনবাগন তখন ডাকসাইটে দল। প্রথম ভরতীয় দল হিসেবে শীল্ড জয় করয ঘরোয়া ফুটবল কুলে তার মর্যাদা বর্ণশ্রেষ্ঠ কুলীনের।' ওই দলে খেলতে পরাটা ভারতীয়দের কছে তখন স্বপ্নের মতো। কিন্তু সে সুযেগ গোষ্ঠ পালের কাছে খুব সহজেই এসে হাজির হয়।

এবিয়ন ইনস্টিটিউটের পড়ুয়া গোষ্ঠ পাল প্রতি ছুটিতেই ভাগ্যকুলে মামারবাড়ি যেতেন। ভাগ্যকুলে তখনকর দিনেও ফুটবলের জমজমট আসর বসতো। এমনি এক অসর ছিল মুকুন্দলাল স্মৃতি শীল্ড প্রতিযোগিতা। ১৯১২ সলে মামারবাড়ি গিয়ে পৌছতেই বি এফ সিব পক্ষ মুকুন্দলাল শীল্ড ফুটবলে খেলতে ডাক পেয়ে গোষ্ঠ পাল মঠে নেমে পড়লেন।

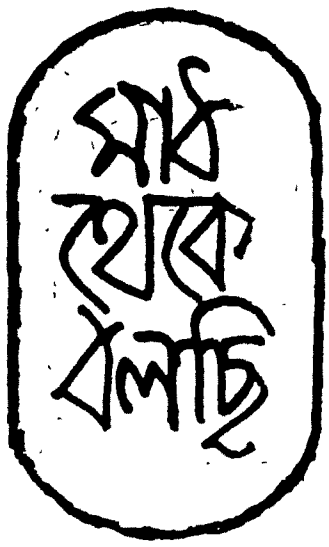

এদিকে কলকাতা থেকে অনেক নামী খেলোয়াড় সেবর ভাগকুলে গেছেন মুকুন্দলাল শীল্ডে খেলতে। ১৯১১ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগানের সেন্টার হাফব্যাক রজেন সেনও হাজির। জহুরীর চোখ ছিল রাজেনবাবুর। ষেল বছরের ফুটবল জোয়ন গোষ্ঠ পালের খেলা আর চেহরা দেখে তখনই রাজেন সেন গোষ্ঠ পলের ভবিষ্যতের ঠিকানা চিনে নিতে পরলেন। সংগে সংগে জানালেন মোহনবাগনে খেলার আমন্ত্রণ।

রাজেনবাবুর কথা শুনে গোষ্ঠ পাল তো ভয়েই সরা।' মোহনবাগানের তখন গগনজোড়া নম। দলে রয়েছেন দিকপাল সব খেলোয়ড়। সেখানে তাঁর ঠাঁই হবে কি করে! গোষ্ঠ পল তো কিছুক্ষণ হ্যাঁ, না, কিছুই বলতে পরলেন না। শেষ পর্যন্ত রাজেন সেন আরও সহস যোগতে গোষ্ঠ পাল বল্লেন, তাঁর ককার সংগে কথা বলতে।

ভাগ্যকুল থেকে কলকতায় ফেরার পথে স্টিমারে মোহনবাগনের তদানীন্তন সম্পাদক শৈলেশ বসুর সংগে আরও কথবর্তা হলো। সেই কথা প্রসংগে গোষ্ঠবাবু জনিয়েছিলেন 'কলকাতায় ফেবার পর সেই বছরেই রাজেনবাবু বড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ায় মোহনবাগানেব হয়ে দু-তিনটি ম্যাচে রাইট হাফে খেলি। পরেব বছর মরশুমের শুরুতে অবার রাজেনবাবুর ডাকেই মাঠে যাই। এবর সুকুলবাবুর জুটি হিসেবে মোহনবাগানের একজন ফুলব্যাক দরকর। সুধীরবাবু (রেভারেন্ড চাটার্জি) অবসর নিয়েছেন। ব্যাক হিসেবে আমায় পরখ করার ব্যবস্থা হলো।

'তখন মোহানবগান লীগে খেলে না। প্রীতি ফুটবলই ছিল বড় খেলা। ব্যাক হিসেবে অমাব প্রথম ট্রায়াল ম্যাচ গেয়ং দল ব্ল্যাকওয়াচের সংগে। খেলাব দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। আমাদেব অবাব খালি পা। ট্রয়ালে ফেল করে গেলম। তবু আব একটি সুযোগ পেলম। দ্বিতীয় ট্রায়ালম্যাচ ড্যালহৌসীর সংগে। আবহওয়া ভাল। শুকনো থটথটে মাঠ। স্ফূর্তিতে খেললাম, প্রণপণ খেটেই। এবার বোধহয় পরীক্ষায় উৎরে গেলাম। কারণ, সেদিন থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত একটানা মোহনবাগানের পক্ষে খেলেছি। বলে যেতে হয়নি কোন দিনই।'

ফুটবল মাঠে গোষ্ঠ পালের মূল শিক্ষা শীল্ড বিজয়ী প্রথম ভারতীয় দল মোহনবাগানের ফুলব্যাক সুকুলের কাছেই। সুকুলের ক্রীড়া নৈপুণ্যের প্রশংসায় গোষ্ঠ পাল চিরদিনই পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। বলতেন যাঁদের সংগী হিসেবে ব্যাকে খেলেছি তাঁদেব মধ্যে সুকুলবাবু ছিলেন অসাধারণ খেলোয়াড়। পরের যুগে ছোনের (এরিয়ন্সের এস মজুমদর) খেলাও আমার খুব ভল লাগতো।'

ক্লাব ম্যাচে বা প্রতিনিধিমূলক খেলায় জুটি হিসেবে যাঁদের পাশে তিনি নিজে খেলেছেন তাঁদের মধ্যে সুকুল ও ছোনে ছড়া গৌর ঘোষ, পান্না প্রমণিক লালবিহারী ঘেষ, কুমর সুরেন্দ্রনরায়ণ (কোচবিহর) আর দাস ডেল: সরকার মণি ঘোষ তুলসী দত্ত, দেবী ঘোষ সুবল ঘেষ বেনেট ও কলভিন সম্পর্কেও গোষ্ঠবাবুর ধারণা ছিল বেশ উঁচু। কলভিনের প্রসংগে গোষ্ঠ পাল বলতেন, ওর জুড়ি নেই। কলভিনের পাশে খেলতে খেলতে কতো কি যে শিখতে পেরেছি, তা তো আমি জানি।

একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখও রাখলেন। সেদিন খেলা সিভিল বনম মিলিটারি দলে। সিভিল দলের ব্যাকে আমি ও কলভিন। ওদিকে মিলিটারি দলের লেফট উইং হলো উস্টারশয়ারের গামারি। গমারি যেমন দৌড়তো, তেমনি বুদ্ধি ধরতো। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ হঠাৎ ফাঁকি দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আমাকে নস্তনবুদ করে তুলছিল। কি যে হয়েছিল আমার কে জানে। গামারিকে ধবে রখয় আমি একেবারে নাকাল বনে গেলাম। ব্যাপারটা কলভিনের নজর এড়য় নি। একটু পবে বল্লে, পল তুমি লেফট ব্যাকে সরে এসো। আমি গমারিকে দেখছি। যেমন কথা তেমনি কজ। কলভিন রাইট ব্যাকে এসে গমারির সব জারিজুরি একেবারে শেষ করে দিলে। দেখে আমিও সেদিন অনেক কিছু শিখতে পারলাম।

সমকালীন এক খেলোয়াড়ের প্রশংসা করতে গিয়ে গোষ্ঠ পাল তাঁর নিজের খেলোয়াড়োচিত চরিত্রের স্বরূপ প্রকশ করেছিলেন। কলভিনকে বড় করে দেখাতে গিয়ে নিজেব ভুলচুকের উল্লেখ রাখতেও ভেলেন নি। তবে কলভিনের খেলা দেখে গোষ্ঠ পল যদি কিছু শিখে থকেন তাহলে তিনি নিজেও প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে অনেককে অনেক কিছু শিখিয়েছেন। কম দিন খেলেন নি। একটনা বছব তেইশ হবে। এই অবকশে যাঁরা তাঁর পাশে দাঁড়াবর সুযোগ পেয়েছেন তাঁরও শিখছেন কতো। তাকে দেখে এবং তাঁব উপদেশ মেনে ওই তেইশ বছরে গোষ্ঠ পাল ছিলেন ফুটবল

মাঠে বনস্পতির মতো। তাঁর ছায়ায় মানুষ হয়েছেন কতেজন যে তার ঠিক-ঠিকানা আছে কি?

তাঁর কলের আরও অনেক খেলোয়াড়ের কথা গোষ্ঠ পালের মনে দীর্ঘ দিন গেঁথে থেকেছিল। অনেককাল পরে স্মৃতিচারণের সূত্রে বলতেন উস্টার্সের সেন্টার ফরোয়ার্ড হোয়াইট মোর, রয়াল গ্যারিসনের গোল-রক্ষক মচ, ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের সেন্টার হাফ চার্চিলের মতো খেলোয়াড় আমার নজরে পড়ে নি। দশম মিডলসেক্সের ফুলব্যাক বার্টরিও ছিলেন এক মস্তো খেলোয়াড়।

সিভিলিয়ান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যালকাটার লেফট উইং পার্সি নইট, ইন-সাইড ফরোয়ার্ড অ্যালেক হোসি, কুমার, শরৎ সিংহ সূর্য চক্রবর্তী মজিদ এবং অবশ্যই সমাদ ছিলেন যাকে বলে জাত খেলোয়াড়। হোসিকে কলকতার মাঠে প্রুশের প্রবর্তক বলা যায়। আর সমাদের তো আর এক নাম জগজার—যাদুকর!'

গোষ্ঠ পাল আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে খেলেছেন মাত্র একবার—১৯২৩ সালে। কিন্তু শীল্ড বিজয়ীর পদক অর্জন করতে পারেন নি। যেহেতু ওই ফাইনালে ভিজে মাঠে খেলে ক্যালকাটা মোহনবাগানকে হারায় ৩—০ গোলে। রোভার্স কাপের ফাই-নালে খেলেন সে বছরেই। কিন্তু সে ফাইনালেও মোহনবাগানকে ডরহাম লাইট ইনফ্যানট্রির কাছে হারতে হয়। রোভার্স ফাইনালে মোহনবাগান বহুক্ষণ এক গোলে এগিয়ে ছিল। কিন্তু শেষ কমিনিটে দুর্ধর্ষ ডরহাম মোহনবাগানের রক্ষণব্যূহ তছনছ করে চার-চারটি গোল দেয়।

তবে রোভার্স ফাইনালে মোহনবাগান হেরে গেলেও মোহনবাগানের শত খুঁটি গোষ্ঠ পাল সম্পর্কে সেবার টাইমস অব ইণ্ডিয়ায় লেখা হয়েছিল, পল দি ফাইনেস্ট ব্যাক এভর প্লেড ইন বম্বে। আর সিমলায় ডুরান্ড কাপে গোষ্ঠ পালের আমলে মোহন-বাগান একবার এগিয়েছিল সেমি ফাইনাল পর্যন্ত। ডুরান্ড কাপের আসর তখন মূলতঃ গোরা দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯২৫ সালে বেসামরিক দল হিসেবে মোহনবাগানই সবপ্রথম ডুরান্ড কাপে খেলার আমন্ত্রণ পেলে প্রথম আবির্ভাবেই মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে উঠে শেরউড ফরেস্টার্সের কাছে এক গোলে হেরে যায়।

গোষ্ঠ পালের মতে, তাঁর আমলে ১৯২০ সালেই মোহনবাগান ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। ওই দলে খেলতেন তিনি ছাড়া পি দাশগুপ্ত পান্না প্রামাণিক পি রায় (জমাই), অভিলাষ ঘোষ, মণি দত্ত হেমাঙ্গ বসু রবি গাঙ্গুলী শরৎ সিংহ কুমার ও পল্টু দাশগুপ্ত। সাধারণের প্রত্যাশা অনু-যায়ী মোহনবাগানের সেবার শীল্ড পাওয়ার কথা। কিন্তু সেমিফাইনলে পথ আগলে দাঁড়িয়ে কুমারটুলী ক্লাব মোহনবাগানকে হারিয়ে শীল্ডে বড় রকমের অঘটন ঘটিয়ে বসে।

সে আমলে স্থানীয় দলগুলির মধ্যে কুমারটুলী নয়, আসলে ক্যালকাটা-ড্যাল-হৌসীই ছিল মোহনবাগানের উপযুক্ত প্রতি-দ্বন্দ্বী। আজ যেমন ইস্টবেঙ্গল-মোহন-বাগানের খেলায় রেষারেষির ভাব দেখা দেয়, সেকালে মোহনবাগান-ক্যালকাটা খেলা ঘিরে অনুরূপ উত্তেজনা, উদ্দীপনা দানা বেঁধে উঠতো। সেই খেলা উপলক্ষে কলকাতার ভারতীয় এবং ইংরাজ-অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান শিবির দু ভাগে ভাগ হয়ে পড়তো। দু পক্ষই খেলার ফলাফলে যথাযথ গুরুত্ব দিতো। মোহনবাগান জিতলে গোটা ভারতীয় সমাজই যেন জাতীয় আনন্দে মেতে উঠতো। আর হারলে ঘটতো ঠিক এর বিপরীত। খেলার দিনে শুধু ভারতীয়দেরই নয়, সাহেব-মেমদেরও জমজমাট জমায়েৎ ঘটতো মাঠের ধারে। বলার কথা এই যে, শুকনো মাঠে ক্যালকাটার বিরুদ্ধে মোহনবাগান কোন দিনই মন্দ খেলে নি। তবে বৃষ্টি নামলেই কপালে দুঃখ জমতো। আর সেইটাই তো ছিল স্বাভাবিক। যেহেতু সেদিনে ভারতীয় ফুটবলাররা বুটবলে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেন নি। (চলবে)

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

বাম্পার প্রসঙ্গ

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ ৪র্থ টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে বাম্পার দেওয়া হয়েছিল নির্বিচারে। এক এক সময় ওভার পিছু তিন-চারটে করে। এধরনের বল করার একটা মাত্রই উদ্দেশ্য থাকে, ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাস সঞ্চার করে তাদের স্বাভাবিক খেলা ভোতা করা। এরকম বেয়াড়া বল আঘাত পেলে ব্যাটস-ম্যানকেই দোষের ভাগী হতে হয়। বলা হয়, ঠিকমত খেলতে পারেনি বলেই আঘাত লেগেছে। বোলাদের সেখানে সাত খুন মাপ। যেমন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ভারতীয় খেলোয়াড়দের ফাস্ট বলে আহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে নিজ দলের ফাস্ট বোলারদের হয়ে খুব জোর ওকালতি করেছেন। তাঁর মতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা ফাস্টবল খেলতে না পারার দরুনই আঘাত পেয়েছেন এবং ভারতীয় খেলোয়াড়রা প্রকৃত ফাস্ট বল খেলতে অভ্যস্ত নন বলেই সব ফাস্ট বলই তাঁদের চোখে বাম্পার মনে হয়। লয়েড আরও বলেছেন, ১৯৭৫-৭৬ সালের টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার জেফ টমসন তাঁদের ওভার পিছু তিন-চারটে করে বাম্পার দিয়েছিলেন। কিন্তু তা নিয়ে তিনি বাদ-প্রতিবাদ করেননি, খোলা মনেই হার মেনে নিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেশ বোলার মাইকেল হোল্ডিংয়ের মাত্রাধিক্য বাম্পার দেওয়ার প্রতিবাদ করে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার পলি উমরীগড় সাংবাদিক বৈঠকে বলেছিলেন, এবিষয়ে ক্রিকেট আইন অনুসারে হোল্ডিংকে আম্পায়ারের সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল।

এই চতুর্থ টেস্ট খেলায় তিনজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের বাম্পারে আঘাত পাওয়ার সংবাদ শুনে ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট সোসাইটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডাক্তার ককশট যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে বাম্পারের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, বাম্পার যদি নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে ক্রিকেট খেলার বদনাম আরও বাড়বে এবং এই অবস্থায় আমাদের করণীয় হবে টেস্ট খেলার দিনে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া। ডাক্তার ককশটের সুপারিশ হল যে-কোন বল একজন দণ্ডায়মান ব্যাটসম্যানের কোমরের ওপর আঘাত করলে তা আম্পায়াররা বাম্পার বলে ঘোষণা করবেন এবং সেই সঙ্গে তার খেসারত হিসাবে স্কোর বোর্ডে ১০ রান যোগ করার নির্দেশ দিবেন। এর ফলে সেকেণ্ডে ১৪০ ফিট বেগে ধাবমান প্রাণঘাতী ফাস্ট বল সম্পর্কে ব্যাটসম্যানদের ত্রাস কেটে যাবে। প্রখ্যাত উইসডেন ক্রিকেট বর্ষপঞ্জীর সম্পাদক নর্ম্যান প্রেস্টন বাম্পার সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, দু'একটা বাম্পার মাঝে মাঝে ছাড়া মেতে পারে। তবে ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে বাম্পার দেওয়ার তিনি ঘোর বিরোধী। তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

বঙ্গশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড় • সিল্ক
• তাঁত • মিল
• পোষাক
• সাটিং • সুটিং
• ছিট কাপড়

রঞ্জিৎ সিংজী

নওনগরের জামসাহেব মহারাজকুমার রঞ্জিৎ সিংজী ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। ভারতীয় হয়েও তিনি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। তাঁর এই টেস্ট খেলা নিয়ে ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল জনসাধারণ কিন্তু কোন রকমের প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। বরং তাঁকে সাদরে আপনজন করে নিয়েছিলেন তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বে এবং তাঁর অসাধারণ চিত্তাকর্ষক ক্রিকেট খেলায় মুগ্ধ হয়ে। ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মহলে অতি আদরের রঞ্জি নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া, দীর্ঘকাল ইংলিস কাউন্টি দলে ক্রিকেট খেলা, ইংল্যাণ্ডের জল-বাতাস এবং সেখানের সমাজে দীর্ঘ দিন বসবাস করা সত্ত্বেও তিনি কখনও ভুলেও ক্রিকেট খেলতে গিয়ে একটাও 'ক্রিশ্চিয়ান স্ট্রোক' মারেন নি অর্থাৎ বিলেতী ভঙ্গিতে ক্রিকেট খেলেন নি। ক্রিকেট খেলায় তাঁর নিজস্ব একটা ভঙ্গি ছিল যেটা সম্পূর্ণ তাঁরই এবং সেই কারণে ভারতীয়। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত 'লেগ গ্লান্স' মারের উদ্ভাবক যার সাবলীল চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীমা দর্শকসাধারণের পরম তৃপ্তির খোরাক ছিল।

রঞ্জিৎ সিংজী জামনগরের নিকটবর্তী সারোদা গ্রামে ১৮৭২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমার কলেজে পড়ার সময় তিনি ক্রিকেট খেলায় হাতেখড়ি নিয়েছিলেন। তিনি ১৮৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডে যান এবং পরের বছর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং সেখান থেকে ১৮৯৩ সালে ক্রিকেটের 'ব্লু' উপাধি লাভ করেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত প্রথম শ্রেণীর কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব সাসেক্স দলে তিনি যোগদান করেন। সাসেক্স ক্লাবের পক্ষে তিনি প্রথম খেলতে নামেন লর্ডস মাঠে, এম সি সির বিপক্ষে ১৮৯৫ সালে। তিনি তাঁর এই প্রথম খেলায় প্রথম ইনিংসে ৭৭ নট আউট এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০ রান করেছিলেন। ১৮৯৫ সালের ইংলিস ক্রিকেট মরশুমে ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় রঞ্জি দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রঞ্জি তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নামেন ১৮৯৬ সালের ১৬ই জুলাই, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে। তিনি এই খেলার প্রথম ইনিংসে ৬২ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫৪ রান করে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থেকে যান। তাঁর এই নট আউট ১৫৪ রানই ছিল উভয় দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান। তিনি টেস্ট ক্রিকেট খেলায় প্রথম খেলতে নেমেই সেঞ্চুরী করার দুর্লভ সম্মান লাভ করেন। তাছাড়া টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে রঞ্জিই লাঞ্চের পূর্বে শতরান করার নজির প্রথম সৃষ্টি করেন। রঞ্জি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে পনেরটি টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন, সবগুলিই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। তাঁর এই পনেরটি টেস্ট খেলার পরিসংখ্যান দাঁড়িয়েছে : ইনিংস ২৬, নট আউট ৪ বার, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ১৭৫ (সিডনি, ১৮৯৭ সাল) মোট রান ৯৮৯, সেঞ্চুরী ২, অর্ধসেঞ্চুরী ৬, এবং গড় ৪৪-৯৫।

রঞ্জির প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনের (১৮৯৩-১৯২০) পরিসংখ্যান এই রকম দাঁড়িয়েছে : ইনিংস ৫০০ নটআউট ৬২ বার, মোট রান ২৪৬৯২, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নট আউট ২৮৫ (বিপক্ষে সমারসেট, ১৯০১ সাল), সেঞ্চুরী ৭২ এবং গড় ৫৬-৩৭।

ইংলিস কাউন্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় একদিনেই উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার নজীর আছে একমাত্র রঞ্জিরই। ১৮৯৬ সালের ২২শে আগস্ট তারিখে শক্তিশালী ইয়র্কসায়ার কাউন্টি দলের বিপক্ষে রঞ্জি সাসেক্স দলের পক্ষে প্রথম ইনিংসে ১০০ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট ১২৫ রান করে যে অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেছিলেন তা আজও অপর কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে স্পর্শ করা সম্ভব হয়নি।

রঞ্জি সময় সময় ঝড়ের গতিতে ব্যাট করতেন। একবার ১৮৯৬ সালে লর্ডস মাঠে জেন্টলমেন বনাম প্লেয়ার্স দলের খেলায় রঞ্জি কাটায় কাটায় ১০ মিনিট সময়ে ৪৭ রান করেছিলেন—বাউণ্ডারী করেছিলেন ১১টা। রঞ্জি তাঁর ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে মোট ৭২টি সেঞ্চুরী করেছিলেন। এর মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরী ছিল ১৪টি। তাঁর প্রথম ডবল সেঞ্চুরী ২৬০ রান (বিপক্ষে এম সি সি, লর্ডস ১৮৯৭ সাল)।

রঞ্জি ইংল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তাঁর প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছিলে—১৫৪ নটআউট (২য় ইনিংস, ম্যাঞ্চেস্টার ১৮৯৬) এবং ১৭৫ নট আউট (১ম ইনিংস সিডনি ১৮৯৭)। রঞ্জির এই নট আউট ১৭৫ রানই তখন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়। রঞ্জির মত কোন একজন খেলোয়াড় নির্দিষ্ট একটি দেশের বিপক্ষে স্বদেশ এবং বিদেশের মাটিতে তাঁর প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে নেমে সেঞ্চুরী করেছেন এমন নজির সারা টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খুবই কম।

রঞ্জি ১৮৯৯ সালের ইনিংস ক্রিকেট মরশুমে মোট ৩২৫৯ রান সংগ্রহ করে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। একটি ইংলিস ক্রিকেট মরশুমে ৩০০০ রান সংগ্রহ করার নজির তিনিই প্রথম গড়েছিলেন। পরের বছরও অর্থাৎ ১৯০০ সালে রঞ্জি ইংলিস ক্রিকেট মরশুমে ৩০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন—তাঁর মোট রান দাঁড়ায় ৩০৬৫। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এক ইনিংসে তাঁর সর্বোচ্চ রান ২৮৫ নট আউট (বিপক্ষে সামারসেট ১৯০১ সাল)। সারা রাত ম্যাচ ধরে পরের দিনই তিনি তাঁর এই নট আউট ২৮৫ রান করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে প্রখ্যাত 'উইসডেন' ক্রিকেট বর্ষপঞ্জিকায় প্রকাশিত 'বছরের সেরা পাঁচজন ক্রিকেট খেলোয়াড়'—এই পর্যায়ে রঞ্জি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল ২ তারিখে রঞ্জি ৬১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯৩৪ সাল থেকে ভারতে জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার সূচনা হয়েছে। এই জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে সুদৃশ্য রঞ্জি ট্রফি দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

ভারতের দুর্ভাগ্য যে, তাঁকে আমরা ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে পাইনি। ভারত সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার ছাড়পত্র প্রথম পায় ১৯৩২ সালে। তার অনেক আগেই রঞ্জি ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

খেলার জগতে মেয়ে

ভলিবল কুশলী মালা-সাধু

বাড়ীর আনুকূল্য আর ক্লাবের সহানুভূতি পেলে একটি মেয়ে যে খেলাধূলায় কতখানি কুশলতা অর্জন করতে সক্ষম, মালা সাধু তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মালা তার বাবা এবং মায়ের উৎসাহে পাড়ার সুভাষ সঙ্ঘে ভলিবল খেলা শিখতে শুরু করে ১৯৬৮ সালে। তখন ওর বয়সই বা কত? কিন্তু বছর তিনের মধ্যেই মালা ক্লাবের দুই প্রশিক্ষক সতোন বসু ও হরেন মণ্ডলের তত্ত্বাবধানে লিফটার হিসাবে এবং রক্ষণভাগে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। রাজ্য লীগও নকআউটে নিয়মিতভাবে নিজ দলের পক্ষে স্থান করে নেয়। শুধু তাই নয়। জালের কাছে বা মাঝ মাঠে ওর কলা-কৌশলের বৈশিষ্ট্য রাজ্যের নির্বাচক-মণ্ডলীরও নজর কাড়ে। তাই ১৯৭১ (গৌহাটি), ১৯৭২ (টাটানগর) ও ১৯৭৩এ (ত্রিবান্দ্রম) মালা জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলা দলেও নিজের জায়গা করে নেয়।

মালা আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় আসরে ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলে নির্বাচিত হয়। কালিকটে আন্তঃ আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় মালা পূর্বাঞ্চল দলের পক্ষে খেলেছে। এছাড়া নিজ ক্লাবের হয়ে দক্ষিণ ভারত সফরে বিভিন্ন জায়গায় নানা টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেয়ে মালা বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

—এখন আর কোন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নামতে ভয় পাই না, আমি। মালা বলে, তাছাড়া আমার শারীরিক সামর্থ্যেও ঘাটতি নেই। দীর্ঘ সময় ধরে খেললেও এতটুকু পরিশ্রান্ত হই না।

—অন্যান্য রাজ্যের খেলোয়াড় বা তাদের খেলার মান কিরকম মনে হল?

—দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ আর কেরলের মেয়েরা বেশ ভাল খেলে। আমরা তাদের কাছে দুটি ট্রফির ফাইনালে যেমন হেরেছি, তেমনি দুটি ট্রফির ফাইনালে তাদেরও হারিয়েছি। তাছাড়া দিল্লীতে হরবন্স কাউর ক্লাব ট্রফিতে সারা ভারতের নামকরা সব দল ছিল। পুরোপুরি রাজ্য দলও খেলেছে। ঐ ট্রফিতে আমাদের ক্লাব ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে বিজয়ী এবং ১৯৭৪ সালে রানার্স আপ হয়। তাছাড়া ডলমিয়া নগরে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে আমরাই বিজয়ী হই। পরে অন্য এ-ট্রফির খেলা হয়নি।

—ঐসব প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষ কিরকম খেলেছিল?

—দিল্লী আর পাঞ্জাবের মেয়েরা বেশ জোর দিয়েই খেলেছিল। ওরা বেশ লম্বা। তবে কলাকৌশলে তারা আমাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি।

—তুমি তো নানা জায়গায় খেলতে গেছ। কোন কোন জায়গা ভাল লাগল?

—জায়গা হিসাবে সিমলাই আ সবচেয়ে ভাল লেগেছে। খেলায় পাঞ্জা দলই সবচেয়ে ব্যালান্সড্।

মালা শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের ছা এবার বি-এ পার্টওয়ান পরীক্ষা দে মালার মতে কম বয়স থেকে খেলা শু করলে আমাদের মেয়েরা সারা ভারতে বটেই আন্তর্জাতিক ভলিবলের আস সুনাম অর্জন করবে। তবে আম বিদেশী দলের সঙ্গে খেলার অভি থাকা দরকার। সেজন্যে বিদেশ সফ এদেশে বিদেশী দল আনা উচিত।

প্রসঙ্গতঃ সুভাষ সঙ্ঘের প্রশি হরেন মণ্ডলকেও ক্লাব সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলাম। উত্তরে জানতে পার যে, এ অঞ্চলে এই ক্লাবটিই সবচেয়ে সংগঠিত। ১৯৬৮ সাল থেকে এদের মেয়ে দলটি পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশ লীগে এবং ১৯৭৩ সাল থেকে নকআ খেলছে। যাদবপুর, নিউ আলিপুর এ অঞ্চল থেকে মেয়েরা আসে এই খেলতে এবং খেলা শিখতে। ভলিব দিকে মেয়েদের আগ্রহ উত্তরোত্তর চলেছে। নানা জায়গায় মেয়েদের ক্লাবও উঠছে। সুভাষ সঙ্ঘ এবার রাজ্য বিজয়ী হয়েছে। মেয়েরা উপর্যুপরি বছর (১৯৬৮-৭০) লীগ বিজয়ী পর ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালে আবার সম্মান ফিরে পায়। আর রানার্স আপ ১৯৭১, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৫ স নকআউটেই আমাদের ভাগ্য সবচেয়ে খা হরেনবাবু বললেন, গত চার বছর আমরা কেবল রানার্স আপই হচ্ছি।

ক্লাবের আর্থিক সঙ্গতি তেমন প্রধানতঃ ক্লাব সচিবের বদান্যতাতেই এ চালন সম্ভব হচ্ছে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদ ছাড়াও অ সংস্থা থেকে ক্রীড়াকুশলী মেয়েরা পায়। ক্লাবে কলেজের মেয়ের সংখ্যাই বেশী।

মালা বলে আমরা এ অঞ্চলের প্র বাসিন্দা তাই এখানে ক্লাব হবার ব্যবা-মা আমার ভলিবল খেলা শি ব্যবস্থা করে দেন। আমরা এক ভাই বোন, ভাইও এখন চাকরী করছে।

কলেজে খেলার ব্যবস্থা নেই?

—নাঃ। তবে এবার আমরা ক ভলিবলের দল তৈরির চেষ্টা ক কলেজে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় আ

—ভবিষ্যতে কি করবে?

—যতদিন পারি এ খেলা চালিয়ে পরে ছোটদের শেখাবার চেষ্টা করবো।

—তোমার সঙ্গে আলাপ করে বেশ লাগল। এই রকম জেরালো মন খেলা ও পড়া দুইই চালিয়ে যাও।

অম

সত্যজিৎ রায়ের ছবি সম্পর্কে

পশ্চিমের প্রতিক্রিয়া

ওয়াশিংটনে সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র উৎসবের সময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটের মাইকেল ওয়েব ও সত্যজিৎ রায়।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে জন এফ কেনেডি টেন্টার ফর পারফরমিং আর্টসে যখন একদিনক্রমে সত্যজিৎ রায়ের সতেরোটি ছবি দেখানো হয়, তখন তিনি বলেছিলেন 'এটি আমার চিত্রগুলির অন্যতম বৃহত্তম প্রদর্শনী।' সত্য সত্যই একদিনক্রমে এতগুলি ছবি দেখানো পৃথিবীর যে কোন পরিচালকের পক্ষেই বৃহৎ প্রদর্শনী।

বহু বছর ধরে সত্যজিৎ রায় পাশ্চাত্য জগতে বহুবিধ সম্মান পেয়ে আসছেন। ভেনিসের সিংহ, বার্লিনের ভল্লুক এবং বহুবার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান, সেলজনিক পুরস্কার, সাদারল্যান্ড পুরস্কার, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি, বৃটিশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিস-এর উপাধি অর্ধ শতাব্দীর সর্বোত্তম খ্যাতিমান চিত্র-পরিচালক, এ ছাড়া আরও অনেক খ্যাতি ও সম্মান সত্যজিৎ অর্জন করেছেন যা বেশির ভাগ ভারতবাসীই শুনে শেষ করতে পারেন না।

সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে পশ্চিমী প্রতিক্রিয়ার এ হেন গভীরতা প্রায়ই ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করে। তিনি বিখ্যাত পরিচালক, কিন্তু তার বিরাটত্বের পরিমাপ কি এতই? এমন কি স্বদেশে তাঁর উৎ অনুরাগীরাও মাঝে মাঝে বিদেশী সমর্থনের উচ্চ কলরোলে বিহ্বল হয়ে পড়েন— বিশেষ করে তাঁর যে ছবিগুলি সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের সমর্থন কিছুটা শীতল।

পাশ্চাত্য জগতে আজকের চেয়ে বেশী সমাদৃত সত্যজিৎ রায় কখনও হন নি। এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত আর কোনও দেশেই তা এত লক্ষণীয় নয়। সত্যজিতের সাম্প্রতিক চিত্র প্রদর্শনী উপলক্ষে মার্কিণ সংবাদিক ওয়ারেন উনা মন্তব্য করেছেন, যেসব মার্কিণী দর্শক এই চিত্র প্রদর্শনী দেখেছেন

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

—তাঁরা গত বিশ বছরে নির্মিত শ্রীরায়ের প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু এবং খুঁটিনাটি অংশ মুখস্ত বলে যেতে পারেন।

ওয়াশিংটনের পর আমেরিকার অপর প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যজিৎ যখন বিশাল উৎসাহী দর্শক সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাঁর চিত্র পরিচালনা করিয়ে দেন তখন গোটা মার্কিণ দেশেই সমাজদার মহলে তাঁর জয়জয়কার। পৃথিবীর বিশালতম উন্নত দেশ, সিনেমার রাজধানী হলিউড যে দেশের সৃষ্টি, সেখানে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষের এক শিল্পীর প্রতি এই অভিনন্দনকে অদ্ভুত বলে মানতে হয়।

শ্রীরায়ের প্রতি পশ্চিমী সম্মানের এই প্রাচুর্যকে অযৌক্তিক, দায়িত্বহীন অথবা প্রতীচীর প্রাচ্য মোহসম্ভূত বলে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী মহলের একটি সুপ্রচারিত মত এই যে ভারতে সত্যজিৎ রায়ের খ্যাতি কেবল বিদেশী প্রশংসারই ফল এবং বিদেশী প্রশংসার কারণ তাঁর ছবিতে ভারতের দারিদ্র্য দেখে বিদেশীদের সুখবোধ। বাস্তবিকই দেশে ও বিদেশে সত্যজিতের মূল্যবিচারের পার্থক্য সহজবোধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে 'অশনি সংকেত'কে উদাহরণস্বরূপ ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক চিন্তাশীল দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয় দর্শকও এই ছবিটি অতি-সুন্দর বলে বাতিল করে দেন। তাঁরা দুর্ভিক্ষের ভয়াল রূপ দেখবেন আশা করেছিলেন। আশানুরূপ কিছু না দেখে অশনিপাত শুধু সংকেত মাত্র দেখে হতাশ হয়েছেন তাঁরা। তাঁরা তাই বোধ করেছেন পশ্চিমী, বিশেষ করে মার্কিণী পত্রপত্রিকা যেন অযৌক্তিক প্রশংসা করেছেন এ ছবির। কার্যতঃ পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়া কিন্তু কোনও

বাংলা চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে পীযূষ বসু, আরতি ভট্টাচার্য, সুপ্রিয়া দেবী, উত্তমকুমার ও সুমিত্রা মুখার্জি। অমৃত ফটো

সিনেমাটিক

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

উনি ফ্লোর ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর যদি ঘটনার পরিসমাপ্তিই ঘটতো, তাহলে ভালো ছিল—কিন্তু বড়ুয়া সাহেব সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি তখনও রিটেকের পর রিটেক চালিয়ে যেতে থাকলেন।

ব্যাপার দেখে কর্মকর্তার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি স্পষ্টই বুঝলেন যে, তাঁকে টাইট দেবার জন্যেই বড়ুয়া সাহেব এটা করছেন। একবার ভাবলেন গিয়ে মিটিয়ে ফেলা যাক—কিন্তু পরক্ষণেই দুশ্চিন্তা হলো তাতে হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। আর ফ্লোরশুদ্ধ লোকের সামনে নিজের ভুল কবুল করাও বড় সহজ কথা নয়।

কর্মকর্তা এরপর নিজের অফিসে গিয়ে বসলেন।

কিছুক্ষণ পর বেয়ারা চা দিতে এল। তিনি বেয়ারাকে বললেন—হ্যাঁরে, বড়ুয়া সাহেব এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন?

বেয়ারা কেন, এই প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মচারীই এই কর্মকর্তাটিকে নাকি ভাল চোখে দেখতো না। তাই সে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল—হ্যাঁ বাবু, ফুল ফর্সে চালিয়ে যাচ্ছেন বড়ুয়া সাহেব।

গোটা স্টুডিওতে তখন ঘটনাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই ভিড় করে এল মজা দেখতে।

একজন বলল—এবার উনি বুঝবেন কত ধানে কত চাল। যেমন বড়ুয়া সাহেবের সঙ্গে চালাকি করতে গিয়েছিল, ফলটাও আজ হাতে হাতে পাবে...

বিকেলের দিকে বড়ুয়া সাহেবের রাগ খানিকটা পড়ে এলো। আর সেই আর্টিস্টের অবস্থাও তখন রীতিমত কাহিল। ক্রমাগত একই ডায়লাগ বলে বলে তার মুখে ফেনা উড়ে গেছে। তার তখন 'ছেড়ে দে মা—কেঁদে বাঁচি' গোছের অবস্থা। জীবনে সে এমন বিপদে কখনো পড়েনি। কিন্তু বড়ুয়া সাহেবকে একথা তখন বোঝায় কে।

এসবই আমার শোনা কথা—প্রতিদিন বিকেলে প্রতিষ্ঠানের মালিক শ্রী বি এন সরকার স্টুডিওয় আসতেন একবার করে। এসে গোলঘরে বসতেন। সেখানে বসেই তিনি সারাদিনের কাজকর্মের রিপোর্ট নিতেন। নিজের অমোঘ সিদ্ধান্তের কথা জানাতেন। অভিযোগ শুনতেন—প্রতিকার করতেন। সকলেই সশ্রদ্ধভাবে তাঁর কথা শুনতেন—নির্দেশ নিয়ে কাজ করতেন। সরকার সাহেব এমনিতেই কম কথার মানুষ। বলতেন যা তাও খুব ধীর-স্থির-শান্ত ভঙ্গীতে।

সেদিন স্টুডিওতে এসেই ওই বিভ্রাটের কথা শুনতে পেলেন।

ফ্লোরের ভেতর তখন সেই একই শটের টেকিং হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে তিনি যেমন এসেছিলেন—তেমন হঠাৎ বাড়ী চলে গেলেন। গম্ভীর মুখে।

শোনা যায়, সেদিন রাতে তিনি স্টুডিওর সেই কর্মকর্তাকে ডেকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। সেই উপদেশ অনুযায়ী সেই রাত্রেই কর্মকর্তা বড়ুয়া সাহেবকে গিয়ে ধরেছিলেন তাঁর বাড়ীতে। নিশ্চয় একটা কম্প্রোমাইজ হয়েছিল। নইলে পরদিন মর্ণিং শিফটের প্রথম শটেই (আগের দিনের সেই মারাত্মক শটটাই অবশ্য) কেন উনি ও-কে ঘোষণা করলেন!

আসলে আগেকার দিনের পরিচালকদের দাপটই ছিল অন্য ধরনের। ফ্লোরে যতক্ষণ ছবির শুটিং চলত—ততক্ষণ পরিচালক 'কিং' হয়ে থাকতেন। তিনি তখন যা বলতেন—নির্বিবাদে সকলকে তা মেনে চলতে হত। ছবির প্রযোজক, শিল্পী এবং কলাকুশলীরা তাঁকে এই বাবদ ন্যায্য মর্যাদা দিয়ে যথেষ্ট বাধা থাকতেন। অবশ্য আমি এক্ষেত্রে শ্রী বি এন সরকারকে টেনে আনছি না। কারণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তিনি একজন বিরলতম মর্যাদাসম্পন্ন প্রযোজক। আমি অন্যান্য প্রযোজকের কথাই বলছি।

আমি নিজের চোখে দেখেছি সুশীল মজুমদারকে—তাঁর ফ্লোরে। ফ্লোরে তিনি পড়লেও যেন সে-আওয়াজ শোনা যেত। আর্টিস্ট-টেকনিশিয়ানরা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। দুর্দান্ত একটা ব্যক্তিত্বর অধিকারী এই মানুষটি কিন্তু ফ্লোরের বাইরে একবারে স্বতন্ত্র মানুষ। কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চলচ্চিত্র শিল্পের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বহুদিন বাদে আবার ওঁকে দেখলাম। উনি সেই একই রকম রয়েছেন দেখলাম। বয়সটাই যা একটু বেড়েছে। তাছাড়া আর কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। কালোর্ড লেন্সের পেছনে সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী সম্মোহনী দৃষ্টি, সেই অভিজাত চলাফেরা, সেই সম্ভ্রান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বেঁটেখাটো দৃঢ় চেহারার সেই অননুকরণীয় মানুষটি। উনি ইতিহাস হয়ে আছেন।

ওঁকে দেখে সেদিন খুউব ভাল লাগল আমাদের।

দেবকী বসুর কথা মনে পড়ছে।

এই গ্ল্যামারের জগতে—এতবড় শিল্প-বিজনেসের মধ্যে থেকেও মানুষটি ছিলেন যেন একজন প্রকৃত সন্ন্যাসী। বলছিলেন আমাদের একজন প্রবীণ চলচ্চিত্র সম্পাদক রবীন দাস। রবীন দাস দেবকী বসুর

সবসে বড়া রুপয়া

বিনোদ মেহরা / মৌসুমী চ্যাটার্জি

কিছুক্ষণ পর আর একজন আর্টিস্ট এল। খানিকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সে বললে—স্যার কী অসুস্থ বোধ করছেন ?

দেবকীবাবুর চোখ কপালে।—কেন? অসুস্থ বোধ করব কেন?

—না মানে আপনার ডান গালটা...মানে লাইট লাল দেখাচ্ছে... বলেই চলে গেল।

এবার দেবকীবাবু বিচলিত হলেন। লাল দেখাচ্ছে মানে? এই যে দেওজীভাই..

—হ্যাঁ স্যার এক্ষুণি হয়ে যাচ্ছে

—আরে দাঁড়ান দাঁড়ান...আচ্ছা দেখুন তো আমার বাঁ গালটা লাল মনে হচ্ছে কিনা?

হেওজীভাই দেখে টেখে বললেন—কই বুঝতে পারছি না তো...

—আচ্ছা ঠিক আছে—

আর একজন আর্টিস্ট এসে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। দেওজীভাই চলে যেতেই সে গম্ভীর মুখে বলল—হ্যাঁ স্যার লালই দেখাচ্ছে। দেওজীভাই লাইট করছে তো চোখ বোধ গেছে। এই তো। স্পষ্ট লাল—

—লাল?

—হ্যাঁ স্যার পিয়োর রেড

—হুম।..আচ্ছা তুমি যেতে পার—

আর্টিস্ট চলে গেল। দেবকীবাবু এবার উসখুস করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ক্যামেরাম্যান অজয় কর এগিয়ে আসছিলেন ঘর্মাক্ত দেহে—এই খবরটা দেবার জন্য যে লাইট রেডি এখন শুটিং করা যেতে পারে। তিনি শুনলেন—দেবকী বসু বলছেন —বুঝলে অজয়—আজ প্যাকআপ করে দিচ্ছি—

অজয় কর যেন আকাশ থেকে পড়লেন—কেন স্যার?

—আমার শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে মানে প্রেশারটা গণ্ডগোল করছে...তারপর প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে দাঁড়াতেই তাঁকে বললেন—আর্টিস্টদের বল আজ প্যাক-আপ—কাল সকাল দশটা থেকে শুটিং—আমার শরীরটা ভীষণ অসুস্থ লাগছে...

প্রোডাকশন ম্যানেজার খবর দিতে গিয়ে দেখেন বহুক্ষণ আগেই নীতিশ ছবির কস্টুম ছেড়ে নিজের পোষাক পরে তৈরী হয়ে বসে আছেন। শুধু জানতে চাইলেন—কাল কটায় প্রোগ্রাম? আর এক্ষুণি একটা ট্যাক্সি ডেকে দাও ভাই...

রঞ্জন মজুমদার

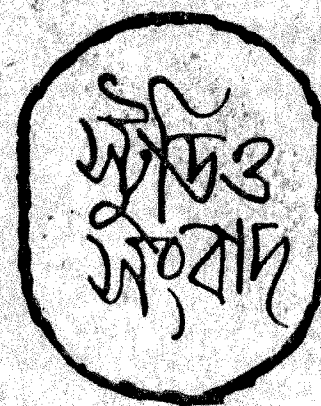

এবার খবরের মত খবর হচ্ছে—আগামী ১৫ জুন থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নিয়মিত চিত্রগৃহে বছরে মোট ছাব্বিশ সপ্তাহ বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক প্রদর্শনী করতে হবে। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারি করছেন। অর্ডিন্যান্সের খসড়া তৈরী হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতির সম্মতি পেলেই এই বিধি কার্যকর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মনে হচ্ছে এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মন্দমূর্খ চলচ্চিত্র শিল্প রক্ষা পাবে। হিন্দী ছবির আক্রমণে বিগত এক দশক ধরে বাংলা ছবি যেভাবে কোণঠাসা হচ্ছিল—তাতে আর বছর দুয়েকের মধ্যেই এই শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা করা হয়ত সত্যিই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। তরুণ উদ্যোগী মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সঙ্কটের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়ানোর ফলেই এই প্রায় অলৌকিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। গত সপ্তাহে চলচ্চিত্রের এক অনুষ্ঠানে সুব্রত মুখার্জি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষে আমরা চেষ্টা করেছিলাম অন্ততঃ কলকাতার প্রেক্ষাগৃহগুলিতে রবীন্দ্রকাহিনীর চলচ্চিত্ররূপ প্রদর্শিত হোক এবং বিনা প্রমোদকরেই। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা তাতে রাজী হলেন না। এটা খুবই বেদনার কথা। যে কবির জন্মতিথি বিশ্বের প্রায় সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে—সেই রবীন্দ্রনাথেরই কলকাতা তাঁকে এই সামান্য সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত হল।

বললেন—বাংলা ছবি বাধ্যতামূলক চালাবার বিধি প্রয়োগ করতেই হচ্ছে। আসলে এছাড়া আর বাঁচবার দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। কিন্তু চিত্রনির্মাতাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে।

সরকার চিত্রমুক্তির ব্যবস্থা অতঃপর নিজের হাতে রাখবেন বলে মনস্থ করেছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেন্সারের তারিখ অনুযায়ী একে একে ছবি রিলিজ করা হবে। সেখানে ছোট বা বড় ছবি বলে কোন তফাৎ হবে না। আর ছবির লাভের অংশের যে সিংহভাগ এতদিন সিনেমা হলের মালিকেরা অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছিলেন—সেই ব্যবস্থার একটা বড় রকম রদ-বদল করা হবে। অর্থাৎ ছবির ব্যবসা সংক্রান্ত ঝুঁকি—এতদিন প্রযোজকরাই যেটা একতরফা টেনে যাচ্ছিলেন—নতুন ব্যবস্থায় তার কিছু অংশ চিত্রগৃহের মালিককেও বহন করতে হবে।

বলা বাহুল্য, এই ঘোষণায় টালীগঞ্জে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। স্টুডিও-ল্যাবরটরী কর্তৃপক্ষ, শিল্পী এবং কলা-কুশলীরা প্রত্যেকেই এতে খুশী হয়েছেন। তবে অনেকে প্রশ্ন করছেন—এই আইন তো অনেক আগেই হবে বলে শোনা গিয়েছিল—কিন্তু হয়নি—এবার সত্যি সত্যিই হচ্ছে তো? আইন বা অর্ডিন্যান্স।

এ মাসের শেষের দিকে শৈল-শহর কলম্পং-এ রঙীন বাংলা ছবি **সিস্টার**-এর এক বিরাট আউটডোর শুটিং হয়ে গেল। এই বহির্দৃশ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন সুপ্রিয়া দেবী, উৎপল দত্ত, অরুণ কুমার, শম্ভু ভট্টাচার্য, বুলবুল চক্রবর্তী, অয়ন বানার্জি এবং একদল কচি কচি ছেলে-মেয়ে। উত্তমকুমার অনিবার্য কারণে যেতে পারেন নি। বর্তমান সপ্তাহে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এই ছবির একটানা চিত্রগ্রহণ

উত্তমকুমার

কথা ছিল বাংলা বছরের প্রথম সকালটা গুরুর সঙ্গে আলোচনায় কাটবে। গুরু মানে উত্তমকুমার আর কি! বাংলা ছবির জগতে একমাত্র সুপার স্টার। জনগণমনপ্রিয় উত্তমকুমার। যাঁর নামে ছেলেদের ছাতি কয়েক ইঞ্চি বাড়ে, আর মেয়েদের মধ্যে শুরু হয় অনুরাগ-কম্পন।

কিন্তু হোল না। স্তাবক আর গুণ-মুগ্ধের ভিড় জমেছিল পয়লা বৈশাখ সকালে। কেউ এসেছিলেন ফুলের তোড়া নিয়ে অভিনন্দন জানাতে, কেউবা সম্মিলিত। সুতরাং উত্তমকুমার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ভিড়ের মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে বললেন—'হোল না নির্মলবাবু আজ।' বসে থাকা লোকগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললাম—'জানতাম—এরকম একটা কিছু হবে।'

হাসতে হাসতে পরবর্তী তিনচার দিনের ব্যস্ত সময়গুলো কয়েক মুহূর্ত হাতড়ে নিয়ে বললেন—'আসুন শনিবার দিন। অসুবিধে হবে না।'

সত্যিই আর অসুবিধে হয়নি। বসার ঘরে মিনিট দশেক অপেক্ষার পর আমায় নিজেই ডেকে নিলেন ভেতরের ঘরে। খুবই ছোট্ট ঘরখানি। সম্ভবতঃ স্ক্রিপ্ট শোনেন উত্তমবাবু এই ঘরে বসে। দু-একটা ঠাকুরও রয়েছে দেখলাম। গণেশ মূর্তিটা বেশ বড়ো।

উত্তমবাবু বসলেন চেয়ারে। বাসি পাজামা পাঞ্জাবীতে বয়সটা পঁচ-সাত বছর কমেছে মনে হোল। চুল অবিন্যস্ত। অবিরত হাত বোলচ্ছেন চুলে। আমি বসলাম সামনের নীচু খাটটিতে। উনি নিজেই বললেন 'রিল্যাক্স করুন।' সুতরাং হাতপা তুলে বাবু হয়ে বসলাম খাটে।

উত্তমকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম প্রশ্ন-টশ্ন করে ওঁর কথার স্রোতকে আটকাব কিনা। প্রশ্ন মানেই তো ধরাবাঁধা উত্তর।

তাই উনি যখন বললেন 'বলুন কি ব্যাপার?' কিছু জিজ্ঞাসা না করে বললাম—

"আপনার কথা নতুন করে প্রশ্ন দিয়ে জানার ইচ্ছে নেই। বলুন যা ভালো লাগে।'

কি নিয়ে শুরু করবেন ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। হদিস না পেয়ে বললেন—'প্রশ্নই বরং করুন। উত্তর দিই।'

অগত্যা প্রশ্নবন তুলে নিতে হোল হতে। জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার এই অসম্ভব জনপ্রিয়তা কেমন লাগে?

—মানে?

: হাউ ডু ইউ এনজয় ইওর পপুলারিটি আর কি!

ভুবন ভোলানো হাসিখানা সারা মুখে ছড়িয়ে বললেন—'খারাপ লাগার কথা তো নয়, আপাততঃ ভালই লাগে বেশ।'

তবে এই জনপ্রিয়তার জন্য তাঁর ভয়ও কম নেই। সব সময় সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। কতদিন এই জনপ্রিয়তা থাকবে বা রাখা যাবে তাই নিয়ে উত্তমকুমার বেশ চিন্তিত।

বললাম—অপস্ অ্যান্ড ডাউনস তো থাকেই, তাতে চিন্তার কি? জবাবে তিনি বললেন—'থাকে ঠিকই কিন্তু দর্শকরা এখন আমাকে এমন এক অবস্থায় এনে ফেলেছেন যেখান থেকে বিন্দুমাত্র স্খলনও বিপজ্জনক।'

সুতরাং প্রতিপদ তাঁকে হিসেব করে চলতে হয়। চরিত্র নির্বাচন থেকে শুরু করে ছবির মুক্তি পাওয়া অব্দি তাঁর প্রতিটি কাজের পেছনে থাকে চিন্তার ফসল।

এত সাবধানতা সত্ত্বেও বিপর্যয় যে ঘটে না এমন নয়। সম্প্রতি তাঁর স্লো ফক্স ক্যাবারে ছবিখানি তেমন জমেনি। কথা প্রসঙ্গে এই ছবির কথা আসতে আমি বললাম—যখন বুঝতেই পেরেছিলেন ছবিখানা চলতে নও পারে তখন কাজ করলেন কেন?

স্বার্থহীন ভাষায় তিনি তখন বললেন—'প্রথমটায় আমি দিলীপকে ছবিটা করতে বারণ করেছিলাম। শুনল না। পরে ভাবলাম নাচিদার গান আছে হয়তে বা লাগতেও পারে।'

এরকম আগেও হয়েছে বহুবার। কখনও তিনি ভেঙ্গে পড়েন নি। দু-তিনটে ছবি মার খেয়েছে, চতুর্থ ছবির সাফল্য আবার তাঁকে স্বস্থানে ফিরিয়ে এনেছে।

তবে এখন চরিত্র নেবার ব্যাপারে খুব বাছবিচার করছেন। তবও ছবি ফেল করছে কেন—জিজ্ঞাসা করলে উত্তমবাবু বললেন 'দর্শকরা চায় নিটোল একটা পরিচ্ছন্ন গল্প। সেই সঙ্গে একটু রস পরিবেশন করা দরকার। সেন্টিমেন্টাল রস। নইলে হবে না। এই যে এ বছর পরপর ছবিগুলো ভেসে যাচ্ছে তার মাত্র একটিই কারণ—নিটোল গল্প কোনো ছবিতেই নেই।'

: এ ব্যাপারে পরিচালকের দায়িত্ব কতখানি।

প্রশ্নটা শুনে মুহূর্তে দেরী না করে বললেন—ছবি তৈরীর কাজে পরিচালকই তো সবেসর্বা। তাঁর হাতেই সমস্ত ক্ষমতা। ছবির গল্প সিলেকশন থেকে শুরু করে ফিল্ম মেকিংএর প্রতিটা স্টেজে তাঁরই পদচারন। পরিচালক ক্ষমতা থাকলে ভালো ছবি তৈরী হতে বাধ্য কই!'

: তাহলে কি বলতে চান ছবির ফ্লপ ফলোর জন্য পরিচালকই দায়ী?

—সর্বাংশে না হলেও মেইনলি তো বটেই।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন—টালিগঞ্জে পরিচালকের বড় অভাব। অনেক সময় মনে হয় অন্য কোনো কাজ না পেয়ে বোধহয় পরিচালক হয়েছেন কিছু লোক। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে ভালো কাজ আশা করাও যায় না।

এমন লোকদের সঙ্গে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না? প্রশ্নের সরাসরি জবাবে তিনি জানালেন—'সেক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার দরকার হয়। চেষ্টা করি নিজের চরিত্রটা বিচারবুদ্ধি দিয়ে তৈরী করে নিতে।'

আসলে ঐ ধরনের পরিচালকরা উত্তমকুমারকে নির্দেশ দেওয়াতো দূরে থাকুক, কিছু বলার সাহস পর্যন্ত পান না। এবং মূলতঃ উত্তমকুমারকে নিলে সবদিক রক্ষা পাবে এই চিন্তা করেই নিয়ে থাকেন। উত্তমবাবুও বেশ ভালো করে বোঝেন ব্যাপারটা। ইণ্ডাস্ট্রিতে তো কম দিন নেই, না বুঝবেনই বা কেন?

প্রায় একাদিক্রমে পঁচিশ বছর যাবৎ অভিনয় করছেন উত্তমকুমার। প্রথম থেকেই নায়ক। বললাম—'এই দীর্ঘ অভিনয় জীবনে পিছন ফিরে তাকিয়েছেন কখনও? পরিবর্তন কিছু নজরে পড়ছে?

—সেটাতো আপনারা বলবেন।

: নিজের পরিবর্তন কতখানি ফিল করছেন আপনি?

অভিনয়ের ব্যাপারে বলতে পারি অনেক চেঞ্জ হয়েছে। অ্যাকটিং-এর ধারাটাই গেছে পাল্টে। অনেক ফাস্ট হয়েছে বাস্তব হয়েছে।

এ কাজে উত্তমবাবুর সবার বড় গুরু হচ্ছেন পরিচালক নির্মল দে। উনিই ওঁকে প্রথম বুঝিয়েছিলেন ক্যারেকটারাই জেশনের মূলমন্ত্র। চরিত্র নিয়ে কিভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে সেই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন নির্মলবাবুর কাছ থেকেই। কোনো চরিত্রের আর্থিক সামাজিক মানসিক বিশ্লেষণ দরকার সবার আগে। চরিত্রটির ব্যাকগ্রাউন্ড জানা না থাকলে অভিনয় হবে কি করে?

একসঙ্গে পাঁচ ছটি চরিত্রে কাজ করার সময় প্রতিটি চরিত্রের প্রতি কি সুবিচার করতে পারেন তিনি? তিনি নিজেই স্বীকার করলেন সমানভাবে সব চরিত্রের প্রতি সুবিচার করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রতিটি চরিত্র নিয়েই তিনি ভাবেন খুব ভাবেন। যত অকিঞ্চিৎকর চরিত্রই হোক না কেন উত্তমকুমার অবহেলা করেন না।

তা নইলে সুপারস্টার তিনি হলেন কি করে? অধ্যবসায় শ্রম ক্ষমতা না থাকলে কেউ কোনদিন বড় হতে পারে কি? জানতে চাইলাম—সুপারস্টার হয়েছেন একটা ভালো ইমেজ হয়েছে আপনার। এই ইমেজটা আপনার ক্ষতি করছে নাকি?

—ক্ষতি মানে কি বলতে চাইছেন?

বললাম ইমেজ পেরিয়ে চরিত্রের কাছাকাছি চলে যাওয়ার কথা বলছি।

উত্তরে বললেন—না সেটা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। ইমেজকে ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসা খুব কম অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব। আর একাজে তাঁর প্রধান সহযোগী হওয়ার দরকার পরিচালককে। পরিচালক যদি তেমন বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন তাহলেই সম্ভব নইলে নয়।

এদেশে তেমন পরিচালক নেই। এটাই উত্তমবাবুর দুঃখের কারণ। তিনিও চন পল মুনির মত গুড আর্থ ওয়ার এজের চরিত্রে অভিনয় করতে। কিন্তু তেমন চরিত্র পাচ্ছেন কই; যেখানে সব চিন্তা-ভাবনা উজার করে দিয়ে উত্তম ইমেজের খেলনা ছেড়ে নতুন রূপে হাজির হবেন তিনি।

হতাশার সঙ্গে তিনি বললেন—আমাদের বেশীর ভাগ পরিচালকই পরিচালক নয় তার হবেটা কি?

মাঝে মাঝে তাই তাঁর খুব ইচ্ছে হয় ছবি পরিচালনা করতে করেওছেন দু তিনটে। এখন করছেন না। অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত বলেই করতে পারছেন না।

ইচ্ছে আছে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পরিচালনায় আসবেন তিনি। তথাকথিত আর্ট ফিল্ম না করেও পরিচ্ছন্ন রুচিশীল ভালো ছবি উত্তমবাবু করবেন করবেনই।

নতুন শিল্পীদের সম্পর্কেও তিনি খুব আশাবাদী নন। শিল্পী তৈরী হচ্ছে না। ভালো ছবি না হলে শিল্পী হবে কোত্থেকে— বললেন তিনি।

সৌমিত্র চ্যাটার্জীর কথা উঠতে তিনি বললেন—পুলু (সৌমিত্রর ডাকনাম) কাজ ভালো করে নিশ্চয়ই তবে সত্যজিৎ রায়ের ছবিতেই তাকে আমরা সম্পূর্ণ করে পাই। অন্য ছবিতে বোধ হয় তেমন মন দিয়ে কাজ করে না ও। কেন বুঝতে পারি না। পারলে পুলুই কিছু করতে পারবে।

নতুনদের মধ্যে রণজিৎ মল্লিক সম্পর্কে তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ রোমান্টিক নায়ক হিসাবে নাকি ও দাঁড়াতে পারবে।

নিজের অভিনয় সম্পর্কে কথা উঠতে বললাম—আপনি নিজেও কিন্তু কতগুলো ম্যানারিজমের শিকার। অস্বীকার করলেন না অভিযোগটা। হেসে বললেন—'কথাটা ঠিক বলেছেন। চেষ্টা করি ওগুলো অ্যাভয়েড করতে কিন্তু অজান্তেই এসে যায়, যেমন বাঁ হাত তুলে কথা বলা বা ঘাড় ঘোরানো।'

এই ম্যানারিজম অ্যাভয়েড করার কাজেও পরিচালকদের দায়িত্ব আছে। আসলে যে চরিত্রের যে ধরনের ব্যবহার চলা বলা হওয়া উচিত সেটাতো প্রথম পরিচালকই ভাবেন। তারপর শিল্পীর ভাবনা।

এতসব অডসের মধ্যেও উত্তমকুমার উত্তমকুমারই। বাংলা ছবির জগতে এক লিজেন্ড, একটা প্রতিষ্ঠান। শুধু অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে নয় ইণ্ডাস্ট্রির নানা সমস্যায় তিনি সবার আগেই হাজির হন।

নির্মল ধর

নাটমঞ্চ

ছোটদের মজার নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'

১৯৭২ সালের ২০ অকটোবর বাগবাজার সার্বজনীন মণ্ডপে যে শিশু নাট্যের যাত্রা শুরু সেই নাটক এই ১৯৭৬ সালেও যে সমান আকর্ষণীয় রয়েছে দর্শকদের কাছে, তার জন্য যেমন নাট্যবস্তুর কৃতিত্ব, তেমনি তার অভিনয় দক্ষতার কথাও স্বীকার করতেই হয়।

এদেশে শিশুদের জন্য যেমন সত্যজিৎ রায়ের ছবি কম তৈরি হয়েছে, তেমনি নাটকও মুষ্টিমেয় দু'-একটি দল ছাড়া নিয়মিত কোন নাট্যদলই ছোটদের জন্য নাটক করেন না।

কোন কোন দল বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য ছোটদের উপযোগী নাটক করলেও, অভিনয়ে প্রায়শই বড়োরাই থাকে। শিশু বা কিশোর অভিনেতার ভূমিকা সেখানে খুবই কম।

দু'-একটি সংস্থা এ-ব্যাপারে ব্যতিক্রম। তাঁরা ছোটদের উপযোগী নাটক করেন যাতে অভিনয়ও করে ছোটরাই।

এবং সেই সব ছোটরাও (এবং তার সঙ্গে কিছু বড়োর সমন্বয়ে) যে কি দারুণ এবং প্রাণবন্ত অভিনয় করতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি প্রত্যয় নাট্য সংস্থা পরিবেশিত সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' দেখে। না দেখলে বুঝিয়ে বলা যাবে না, কি অবাক করা নাটক পরিবেশন করছে প্রত্যয় গোষ্ঠী।

এর জন্য অবশ্যই কৃতিত্ব ঐ নাটকের নির্দেশক, সংগীত ও নৃত্য পরিচালক জয় সেনগুপ্তর প্রাপ্য।

সুকুমার রায়ের সঙ্গে জয় সেনগুপ্তর কল্পনা মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গেছে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটকে। সুকুমার রায়ের রচনার এমন সার্থক রূপায়ণ ইদানীং আর কোন নাটকে দেখা গেছে কিনা জানা নেই।

আর সুখের বিষয় সুকুমার রায়ের লেখার স্বাদ, ব্যাঙ্গের সুর এবং চরিত্র চিত্রণের মূল উদ্দেশ্য, এ-নাটকে সার্থকভাবে উপস্থিত। এসবই সম্ভব হয়েছে সার্থক নির্দেশনা ও প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য। এই মজাদার নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় শিশু ও কিশোর শিল্পীদের অভিনয় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের দর্শককে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

অভিনয়ে দর্শকদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ দিয়েছে তপন সিংহ (হনুমান) ও তাপস মুখার্জি (জাম্বুবান), সেই সঙ্গে বানররূপী দেবব্রত গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন দে শিবু দত্ত ও সামান্য চৌধুরী। শেষোক্ত শিল্পীর অন্যের মাথার উকুন বেছে খাওয়ার বিভিন্ন দৃশ্যের যেন তুলনা হয় না।

পৃথিবেশ রায়ের বানর সুব্রত গাঙ্গুলীর বাবানর-দূত এবং টুটুল মুখার্জির যমরাজও সুন্দর। সেই তুলনায় প্রদীপ দাস ও কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির যমদূতদ্বয় কিঞ্চিৎ ম্লান।

তাপস চৌধুরীকে লক্ষ্মণ মানিয়েছিল সুন্দর, অভিনয়ের মধ্যে একটা সপ্রতিভ ভাবও আগাগোড়াই ছিল। তবে হাবেভাবে যেন কিছুটা ঢিলেঢালা বলে মনে হয়েছে।

তাপস সিংহর বিভীষণ সত্যি সুন্দর হয়েছিল। আর দর্শকদের বাহবা কুড়িয়েছে রাবণরূপী দীপঙ্কর দে। রাবণকে মানিয়েছিলও বেশ।

শৈবাল দাসের রামও সুন্দর। অভিনয় ও মুখের হাসি নাটকের উপযোগী। তবে কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে এর যেমন টিম-ওয়ার্ক, তেমনি তার স্বচ্ছন্দ ও দ্রুতগতি। ফলে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেছে দর্শকরা তা টেরই পায়নি।

নিতাই ঘোষ ও তাপস সিংহর মঞ্চ পরিকল্পনায় কল্পনাশক্তির বিকাশ সুস্পষ্ট। চিন্ময় দাসের আলোর কাজ বেশ ভাল। শৈবাল দাসের রূপসজ্জা এবং শ্রীরূপম ও বিশ্বজিৎ ব্যানার্জির পোষাক দারুণ। অর্থাৎ সবকটি চরিত্রেরই মেক আপ দুর্দান্ত।

গান এ-নাটকের আর এক সম্পদ। যেমন সুন্দর তার সুর তেমনি আকর্ষণীয় তার প্রয়োগ।

এমন নাটক দেখে যে শিশুরা প্রচুর আনন্দ পাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের ছেলেমেয়েদের মনের বিকাশ ঘটাবার জন্য এবং কল্পনাশক্তিকে বাড়াবার চেষ্টা করার জন্য এমন নাটকের আরও অনেক অভিনয় হওয়া দরকার। এমনকি রেডিও এবং টেলিভিশনেও।

সবশেষে প্রত্যয় নাট্য সংস্থা ও তার নির্দেশককে ধন্যবাদ সত্যিকার শিশুদের উপযোগী নাটক উপহার দেবার জন্য।

সি ই এস সি'র 'পথের দাবী'

সেন্ট্রাল ইেটার্স অ্যান্ড ওয়ার্কশপস রিক্রিয়েশন ক্লাব সম্প্রতি শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নাটকটি পরিবেশন করলেন।

পথের দাবী নাটকটি অভিনয় করা যেমন দুরূহ, তেমনি দুঃসাহসেরও বটে। এর চরিত্রগুলিতে যথাযথ রূপদান তো বটেই, তার ওপর অতগুলি চরিত্রকে নিয়ে একটা টোটাল এফেকট গড়ে তোলা রীতিমত কষ্টসাধ্য।

সুখের বিষয়, সেদিক থেকে সি ই এস সি মোটামুটি উৎরে গেছেন। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় অনুরাধা দাশগুপ্তার (সুমিত্রা) ও স্বপন ঘোষের (অপূর্ব)। এছাড়া নিমাই ব্যানার্জি স্বপন রায়চৌধুরী, জয়দেব রায়, নিত্যরঞ্জন রায়, মেনকা ব্যানার্জি ও গীতা ভট্টাচার্য (একটু চড়া ও নাটকীয় গলা সত্ত্বেও) সুন্দর অভিনয় করেছেন।

মূল চরিত্রে সত্যেন কাঞ্জিলাল প্রথম দিকে একটু আড়ষ্ট হলেও, পরে অনেকটা স্বচ্ছন্দ। তবে তিনি অভিনয় করছিলেন এটা মনেই হচ্ছিল।

অন্যান্য ভূমিকায় শচীন চক্রবর্তী বিশ্বনাথ দাস, জয়ন্ত সেন, কানন ঠাকুর, জগবন্ধু ব্যানার্জি, জে রায় অশোক বসু, সুবিমল দাস নাটকের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন।

নাট্যসমালোচক

রঙ্গসভা প্রযোজনা

বোবাকান্না

(কয়লাখনি-জীবনের কাহিনী)

নাটক / উপদেষ্টা

পীযূষ বসু

নির্দেশনা—**তুষার চৌমিক**

মুক্ত অঙ্গন

৩১শে মে

সন্ধ্যা ৭টা

হলে টিকিট

স্বদেশী ছবি

কার্টুন ফিল্ম—এদেশ ওদেশ

শিশুর মনের জগতে সেই আবহমান কাল থেকে সবচেয়ে বেশী যে আধিপত্য বিস্তার করে আসছে সে নিঃসন্দেহে রূপকথা বা ঐ জাতীয় কাহিনী, তারপরই তকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে একালের কার্টুন।

রূপকথার গল্পের সঙ্গে অবশ্য আরো একটি জগত শিশুদের সহজাতভাবেই আকর্ষন করে থাকে সে হোলো জীবজন্তুর জগত।

কার্টুন এই দুটো জগতকে যেন আজ তার মনের কাছকাছি পৌঁছে দিয়েছে কার্টুনের একটা বড় মজা হোলো, সব কিছুকেই সে বিচিত্র এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকে। সেখানে বাঘ কথা বলে, সিংহ ঘুম থেকে উঠে হাই তোলে, হাতী দুষ্টুমী ভরা চোখে পিট পিট করে চেয়ে থাকে ছাগল বাঘ সিংহের পিঠে চড়ে তার সওয়ারী হয়, তেমনি অন্য দিকে কুকুর, বেড়াল থেকে শুরু করে মাছ, ব্যাঙ, হাঁস ইত্যাদি কত মজার মজার ব্যাপার করে।

আর সেই সব দেখে শিশুরা পুলকিত হয়, রোমাঞ্চিত হয়, মজা পায়—সেই সঙ্গে বাড়ে তার কল্পনার জগতের পরিধি।

সেদিক থেকে শিশুর মনের বিকাশের ক্ষেত্রে কার্টুনটা হোলো একটা বড় মধ্যম।

কিন্তু এই কার্টুন আঁকা যে কি দুরূহ এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ ব্যাপার, তা বলে বোঝাবার নয়।

পৃথিবীতে এপর্যন্ত শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য যত কার্টুনিষ্ট তুলি কলম ধরেছেন, তাঁদের মধ্যে ওয়াল্ট ডিজনী যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা অনস্বীকার্য। ডিজনীর রঙীন বা সাদা কালো কার্টুন, মজদার আর দ রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার ছবি দেখে যুগপৎ বিস্মিত, মুগ্ধ ও শিহরিত হয়নি পৃথিবীতে এমন চলচ্চিত্র শিশু দর্শক বিরল। এই কোলকাতা শহরেও যাঁরা আজ বড় কি বুড়ো হয়ে গেছেন তাঁদের থেকে শুরু করে আজকের শিশুরা পর্যন্ত ডিজনীর কার্টুন বা অ্যাডভেঞ্চার ছবির প্রতি সমান আকর্ষণ অনুভব করে। বলতে কি আমাকে তো এখনও সমানভাবেই ডিজনীর সৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

ডিজনীর মিকি মাউস কোনান ডাক ইত্যাদি তো আজও বিশ্বে অদ্বিতীয় সৃষ্টি। রূপকথার গল্পের মতই তারা সব বয়সের দর্শকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

এর পরেই নাম করা যায় চাক জোনসের। যাঁর বাগস বাণী, পর্কি পিক ও এলমার ফাড কার্টুন বই ও কার্টুন ফিল্মে পরিবেশিত হয়ে আমেরিকার বইরেও লক্ষ লক্ষ শিশুকে মন্ত্রমুগ্ধ, শিহরিত করে থাকে। অনেকে ওগুলি এমন কি ডিজনীর সৃষ্টি বলেও ভুল করে থাকে। অনেক সমালোচক আবার তাঁর সৃষ্টিকে অমেরিকান ফিল্মের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।

টইম ম্যাগাজিন তো স্পষ্টতই উল্লেখ করেছেন যে, জোনসের সৃষ্ট চরিত্রগুলি চার্লির মতই মজাদার। অর্থাৎ চার্লির ছবি দেখার পুরো আনন্দ এঁর ছবিতেও বর্তমান।

তিরিশ, চল্লিশ পঞ্চাশের দশকে চাক জোনস ২৫০টির মত এনিমেটেড কার্টুন ফিল্ম পরিচালনা করেন, তার মধ্যে বেশীর ভাগ ছবিই ছ' মিনিটের বেশী দীর্ঘ নয় এবং তারসব কটিই বন্যপ্রাণী, জীবজন্তু এবং জলজ প্রণীদের নিয়ে সৃষ্টি। আর তেমনি মজাদার সেই সব সৃষ্টে চরিত্রগুলি।

গভীরতা এবং মজার দিক থেকেও কার্টুনগুলি অর্থাৎ বাগস বাণী, ড্যাফি ডক অ্যান্ড কোম্পানী ওয়াল্ট ডিজনীর কার্টুনের সার্থক ও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। এনিমেশনের যাদুকর ডিজনীর সঙ্গে পাল্লা দেওয়া কম যোগ্যতা এবং প্রতিভার ব্যাপার নয়। সেই সময় প্রায় সমস্ত বড় বড় ফিল্ম কোম্পানী গুলিই নিয়মিত শর্ট এনিমেটেড ছবি তৈরী করত। তখন চাক ওয়ার্নার ব্রাদার্সের কাছে ছিল সবচেয়ে বেশী মূল্যবান কার্টুন ফিল্ম স্রষ্টা। এমন কি সেই সময় ক্লার্ক গেবল বা গ্রেটা গার্বোর মত নামী দামী বিশ্ববিখ্যাত নায়ক নায়িকার ছবি দেখার আগ দর্শকরা মন ভরিয়ে নিত চাক জোনসের কার্টুন দেখে। নইলে যেন তাদের সেই দেখার আনন্দটাই মাটি হয়ে যেত। বিশেষ করে চাকের কার্টুন দেখা মিস করার তো প্রশ্নই আসতো না। আর ছেলেরা তাঁর ছবি দেখতে দেখতে লেভনীয় খাবার পর্যন্ত হাতে রেখে খেতে ভুলে যেত। তারা তখন খাওয়া ফেল ছুটতো বাগস আর পার্কির পেছন পেছন।

জোনস তাঁর ছবিতে সর্বদা একটা পূর্ণতা এনে দেবার চেষ্টা করেন। ফলে তকে ছ' মিনিটের ছবির প্রতিটি দৃশ্যের জন্য পাঁচ হাজারেরও বেশী আলাদা আলাদা ড্রইং করতে হোতো। বই পরিশ্রই তাঁদের প্রতিটি ছবি তৈরীর প্রচেষ্টাকে সার্থকতায় পৌঁছে দিত।

আমাদের দেশে কার্টুন ছবি তেমন ভাবে তৈরী না হলেও কিছু প্রচেষ্টা যে হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। আর এই প্রচেষ্টায় অনেকখানি সার্থক হন শ্রীমন্দার। সেদিক থেকে তাঁকেই প্রথম সার্থক ব্যক্তি হিসেবে ধরা যায়।

তবে গত মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে অবোরার তত্ত্বাবধানে কিছু কিছু কার্টুন ছবি তৈরীর কথা জানা যায়। পী ব্রদাস বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী কাফী খাঁ বা প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীই সেই কার্টুনগুলি আঁকতেন এবং সেগুলি এক সময় রীতিমত আলোড়নও এনেছিল।

একটা সময় ছিল যখন চলচ্চিত্রে হাসির ছবির টাইটেলে (অবশ্যই বাংলা ছবি) কার্টুন ব্যবহার করা হোতো। এখন তার রূপ বদল হয়েছে।

একালে যতদূর জানা যায় একমাত্র বিখ্যাত ব্যঙ্গ চিত্রী শ্রীচণ্ডী লাহিড়ীই এ্যানিমেশন ফিল্ম বা কার্টুন ছবি করার বিষয় নিয়ে সক্রিয় এবং তিনি নাকি এবিষয়ে অনেকটা এগিয়েছেনও। শোনা যায় তিনি একটি ক্যামেরাও কিনেছেন ইতিমধ্যে।

তবে কার্টুন ছবি ও এ্যানিমেশন ফিল্মে একটা মূলগত পার্থক্য আছে, সেটা শিল্প এবং সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দুটোর মধ্যে দর্শকের বয়স রুচি এবং দর্শকের অনেক তফাৎ।

তবু যে কোন রূপেই হোক, আমাদের চলচ্চিত্রে ও দেশের মত কার্টুন ছবির প্রসার এবং চর্চা বাড়ুক, এটাই আসল কামা।

তাহলেই কালক্রমে এ দেশেও ওয়াল্ট ডিজনী ও চাক জোনসের মত যাদুকরের আবির্ভাব ঘটবে।

শা, র, চ

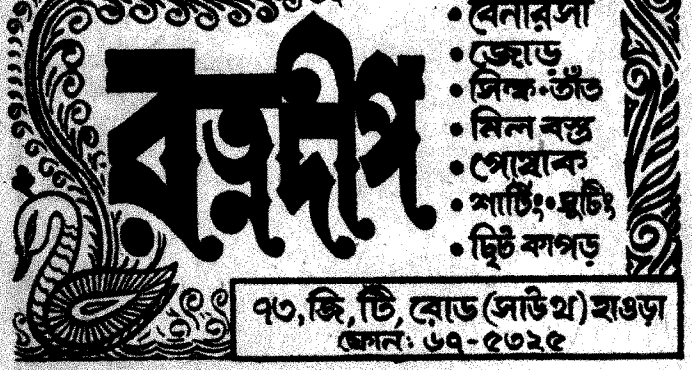

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

07 MAY 1976

লক্ষ লক্ষ লোক আজ ব্যবহার করেন

লক্ষ লক্ষ লোক আজ
সাধনা দশন ব্যবহার করেন
কারণ অতি উৎকৃষ্ট
দাঁতের মাজন ব'লে
এর সুনাম ও জনপ্রিয়তা
উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।
অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
সাধনা দশন বহুদিন ধরে
দেশের সর্বত্র প্রচুর সমাদর
লাভ করে আসছে।
সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-
বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও
উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ
করেন তাঁদের অনুরোধেই
প্রস্তুত করা হয়েছে।

SD.5/70

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেস্ট**

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

Regd. No. WB/NC-13
n : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 28th May, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

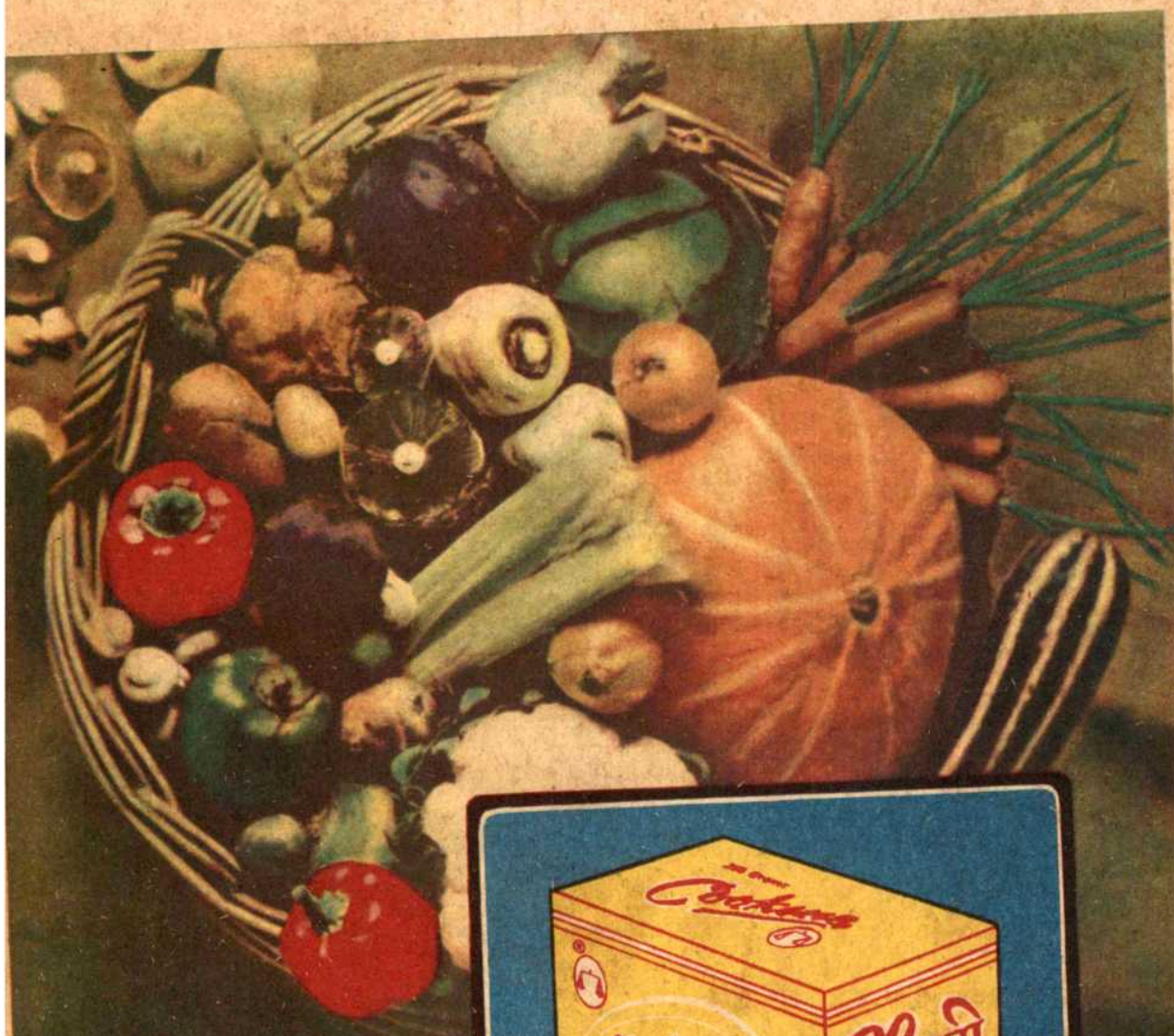

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
(এন) কোন ব্র্যাণ্ড
ও
প্রাথক নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

21 MAY 1976

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫

iaa/KCD-176

ফটো-অফসেট : এন, কে, প্রোসেস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

৪ জুন ১৯৭৮

মূল্য ৭৫ পয়সা

বিশেষ বিমান মাশুল ৭ পয়সা

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

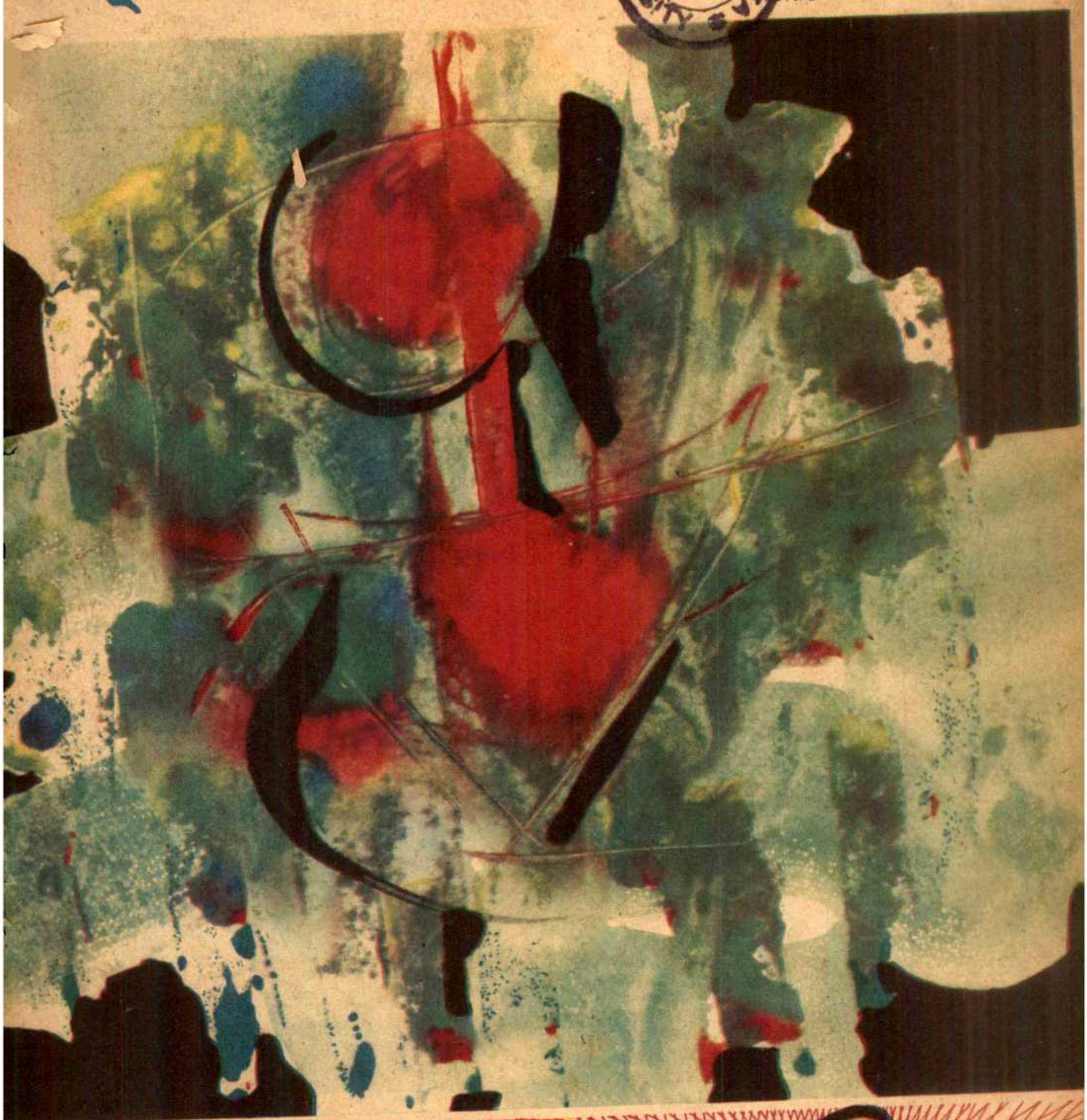

বারোলীন যার সহায়

ম্মে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই প্রকৃপণ সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য তাপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোস্কা, ফুসকুড়ি ও ঘামাচির অকাল অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব জায়গাগুলো ফুলিয়ে হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বারোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের অসাবধানে কাটা-ছেঁড়া-কাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

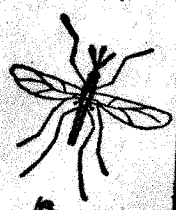

সবচেয়ে বেশী প্রতিরক্ষা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমস

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা অ্যান্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৩৩,নাগীনদাস মাস্টার রোড়,বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHAITRA BLS 45 BEN

॥ নতুন বই ॥

সৈয়দ মুজতবা আলীর

পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয় ৯৲

বাণী রায়ের

জনারণ্যে একমুখ ১২৲

নারায়ণ সান্যালের

নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১৪৲

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের

রঙ্গিন সাঁকো ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর

পলাতকসৈনিক ৭॥

সমরেশ বসুর

সূর্যতৃষ্ণা ৯৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

বন্ধনে ফেরা ৭॥

বিমল মিত্রের

যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

হায়নার দাঁত ৬৲

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

মনে মনে খেলা ৬॥

চারখানি নতুন পকেট বই

সুমথনাথ ঘোষের

মরণের পরে ৩৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

কারণে অকারণে ৩৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের

ছলনার জাল ৩৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাতের গাড়ি ৩৲

কয়েকটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ বেরিয়েছে :

বিভূতি রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড—২৫৲

বর্তমানে মোট নয়টি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ১৮৲

অহল্যাঘুম ৭৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

গঙ্গাবতরণ ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ১০৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

কলকাতার কাছেই

লাইব্রেরী সং—১৮৲ পেপার ব্যাক—৬৲

আশাপূর্ণা দেবীর

বকুলকথা ২৫৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রথম খণ্ড—১৮৲; দ্বিতীয় খণ্ড—যন্ত্রস্থ; তৃতীয় খণ্ড—১২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গন্নাবেগম ১২৲ **কবি** ১২৲

লীলা মজুমদারের

আর কোনোখানে ১০৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

আরণ্যক লাইব্রেরী সং—১৫৲ পেপার ব্যাক— ৭৲

আরণ্যক পেপার ব্যাক সংস্করণে সুদীর্ঘ ভূমিকা ও আলোচনা যুক্ত হ'ল

পথের পাঁচালী (পেপার ব্যাক) ৭৲

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি ১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রো.ড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

চোরা কারবার সামাজিক পাপ

চোরা কারবার
নির্মূল করুন
বিদেশী মাল
বর্জন করুন

স্বদেশী চিনুন স্বদেশী কিনুন

davp 76/82

১৬ বর্ষ

অমৃত

৪ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 4th June, 1976 শুক্রবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	চার আনার গল্প		শ্রীবিমল মিত্র
১২	বিমল মিত্র		শ্রীরেখা রড়য়া
১২	লিলি পালিত	(গল্প)	শ্রীবিমল মিত্র
১৮	কথায় কথায়		শ্রীঅরূপদ রায়
১৯	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২১	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
২৭	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩০	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩৫	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩৮	জাগরণ	(কবিতা)	শ্রীসরোজ আচার্য
৩৮	দিন গুণছি	(কবিতা)	শ্রীঅশেষ চট্টোপাধ্যায়
৩৮	কে আমার প্রতিপক্ষ	(কবিতা)	শ্রীঅমিত চৌধুরী

॥ সদ্য প্রকাশিত হ'ল ॥

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় -এর

মডেল ৭·০০ **ক্ষেত্রজ** ৫·০০

রাজ চক্রবর্তীর আজকের উপন্যাস

মধ্যাহ্ন ডিঙিয়ে রাত্রি ১০·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় -এর

নবীন যৌবন ৬·০০

সামনে আড়ালে ৮·০০

সমুদ্রের সামনে ৬·০০

অনিল রায়-এর

ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ৮·০০

হটলাইন হঠকারী ৮·০০

নগ্ন প্রহর ৮·০০

শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস সম্পাদিত

দেশ বিদেশের ভৌতিক গল্প ২০·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ -এর

নীলশূন্য ১০·০০

জরাসন্ধ -র

নদীর এপার কহে ৮·০০

জ্যোতি প্রকাশন ॥ ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯

সদ্য প্রকাশিত

শঙ্কর সেনগুপ্ত

বাঙালীর খেলা ধূলা ১৮

প্রায় দুশত লৌকিক ও নাগরিক খেলার বিবরণ, চল্লিশের অধিক স্কেচ ও কোর্ট।

"বাঙালীর খেলাধূলো সম্পর্কে এমন তথ্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই মনে হয় এই প্রথম। এই গ্রন্থটি শুধুমাত্র খেলার নয়, এ হল খেলার মাধ্যমে বাঙালীর জাতীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের মনোরম চিত্রণ।" —যুগান্তর।

"নাগরিক খেলার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ও গ্রামীণ খেলাধূলার একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে।" —দেশ

"আলোচ্য লৌকিক খেলাধূলার মধ্যে বহু খেলা এখন বিদ্যালয়ের পাঠ্য। বিদ্যালয়গুলি গ্রন্থটি সংগ্রহ করলে যথেষ্ট উপকৃত হবে।" —বেতার জগৎ

ডঃ প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত

গীতগোবিন্দ ও জয়দেব গোষ্ঠী

রসসিদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা। ১৫·

ভোলানাথ ভট্টাচার্য

শিল্প ভাবনা

একাগ্রচিত্রে গবেষকের আলোচনা ১০·

শঙ্কর সেনগুপ্ত

বাঙালী জীবনে বিবাহ

বিবাহ ও বিবাহ বার্ষিকীর উপহার ৩০

বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি

লৌকিক জীবনের প্রামাণ্য দলিল ২৫·

রণজিৎকুমার সেন

গীতবানী

দেড় শতাধিক সঙ্গীতের সমাহার

ডঃ বীরেন্দ্রনাথ সাহা

ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান

আঞ্চলিক গবেষণার অনবদ্য নিদর্শন ৯·

Sankar Sen Gupta

FOLKLORE OF BENGAL

— a projected study

বাঙলার লোকবৃত্ত বিষয়ক সর্বাধুনিক এবং অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ৫২·

ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা—৬৯

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্যে প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনার খবর ক'মাসের মধ্যে জানানো হয়। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠানো সম্ভব নয় বলে লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মাশু-অর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

১৯৭৫ সালের শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন প্রবীণ শিশু-সাহিত্যিক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর সুমন্ত উপন্যাসের উপর

সুমন্ত ২য় সংস্করণ। মূল্য : ৫-০০

খগেন্দ্র মিত্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড মূল্য : ২২-৫০ দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পথে।

প্রকাশের পথে বিখ্যাত উপন্যাস **ডোম্বল সর্দার** (অখণ্ড)

শিশুসাহিত্যে ১৯৭৫ সালের প্রথম বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেলেন কবি সুনির্মল বসু তাঁর সুনির্মল রচনা সম্ভারের উপর।

সুনির্মল রচনা সম্ভার

তিন খণ্ড। মূল্য : ৭০ টাকা

গ্রাহকগণ যাঁরা এখনও সব খণ্ড সংগ্রহ করেননি তাঁরা ১০ই জুলাই '৭৬ মধ্যে সংগ্রহ না করলে আর বই দেওয়া সম্ভব হবে না।

স্কুল, পাঠাগার এবং আমাদের অন্যান্য রচনাবলী এবং সোনারকাঠি ছোটদের মাসিক পত্রিকার গ্রাহকগণ এই মূল্যবান বইগুলি ১০ই জুলাইর মধ্যে সংগ্রহ করলে শতকরা ২০ টাকা কমে পাবেন।

ফরোয়ার্ড পাবলিশিং কনসার্ন, এম, টি ৭৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

কালকূট রচনা সমগ্র

প্রথম খণ্ড : ভোট দর্পণ, অমৃত-কুম্ভের সন্ধানে, স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে এবং খুঁজে ফিরি সেই মানুষে। দাম : পঁচিশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : নির্জন সৈকতে, বাণী-ধ্বনি বেণুবনে এবং কোথায় পাবো তারে প্রথম অর্ধাংশ। দাম : পঁচিশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : কোথায় পাবো তারে দ্বিতীয় অর্ধাংশ, হারায়ে সেই মানুষে এবং মন মেরামতের আশায়। ছাপা চলছে। আগস্ট মাসের মধ্যেই প্রকাশিত হবে। দাম : পঁচিশ টাকা।

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড প্রকাশিতব্য

প্রকাশিত হল

সমরেশ বসুর

নাচঘর

চলচ্চিত্রায়িত হচ্ছে ॥ ৭-০০

শরৎ জন্মশতবার্ষিকীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

শ কান্তে শরৎচন্দ্র ১৫-০০

দীপক গোস্বামীর

শরৎ রচনাগঞ্জা ৬-০০

পৃথিবীর জন্ম কী করে হল, পৃথিবীর বয়স কত, মহাদেশ ঘুরে বেড়ায় কেন, ভূমিকম্প কেন, প্রবালদ্বীপ কী ইত্যাদি হাজারো প্রশ্নের জবাব পেতে পড়ুন—

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

পৃথিবীর গল্পকথা

ভূবিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। স্কুলের ছেলেমেয়েদের অবশ্য পাঠ্য। ভূমিকা : বিমল কর। দাম ৬-০০।

মৌসুমী প্রকাশনী ১৫।২এ কলেজ রো ॥ কলকাতা-৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৯	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস) শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩	নতুন বই	
৪৪	সাহিত্যের নেপথ্যে	শ্রীশাণ্ডিল্য চতুর্বেদী
৪৭	প্রতিপক্ষ	(গল্প) শ্রীদেবল দেববর্মা
৫৩	পুনশ্চ	ক্ষুপণক
৫৪	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৫	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅভয় বসু
৫৭	খেলাধুলা	দর্শক
৫৮	সিনেমাটিক টক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬০	ফ্লোর থেকে বলছি	মুসাফির
৬১	চিত্র সমালোচনা	চিত্রদূত
৬২	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৪	ঋত্বিক ঘটকের ছবি	

প্রচ্ছদ : শ্রীদীপক দে

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাআত্মা রচিত।

যুগান্তর—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত্র গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

অষ্টম মুদ্রণ চলিতেছে

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত।

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গাআত্মা রচিত।

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮.

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা

শ্রীসন্নিত্যপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনালেখ্য অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা।

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম ঐতিহ্যপূর্ণ পুস্তক বাংলায় আর দেখি নাই।।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬.

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মুইশ্ম প্যাক কিনবার দরকার হবে না। সবজি এমন কি পোলাও, কালিয়া, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে বানাতে দিতে হবে না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক: কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন: ৩৩-৬৩৩৭, ৩৩-৬৭০৮

PAH—KCD-74

সম্পাদকীয়

শিক্ষার হের-ফের

আমাদের শিক্ষানীতির উপর নতুনভাবে আলোকপাত করার চেষ্টা চলছে অনেককাল ধরেই। কিন্তু সমস্যাটির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় তাতে সুস্পষ্ট হয়েছে কিনা বলা সহজ নয়। বরং মনে হচ্ছে, প্রশ্নটি বেশ জটিলই হয়ে উঠছে নানা মুনির নানা মতের ফলে।

এটা অবশ্য ঠিকই যে, এ বিষয়ে সরকারী নীতির মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থকতা নেই। শিক্ষাকে তাঁরা নিছক নামকে ওয়াস্তে একটা ডিগ্রি জুড়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কর্মপ্রসূ করে তুলতে চান। এ যুগের পটভূমিতে, বলতেই হবে, এ সিদ্ধান্ত খুবই সঠিক।

কিন্তু মুশকিল দেখা দিচ্ছে অন্য কারণে।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে আগেই বলে নেওয়া ভালো। আমাদের জাতীয় স্বভাবের মধ্যেই কী করে যেন ঢুকে পড়েছে একটা দুর্বোধ্য ধরনের অনড়তা। এমনিতে দেখতে যে জাতিকে মনে হয় উৎসাহে অধীর—হয়তো বা একটু বেশি পরিমাণেই—কাজের বেলায় তারাই কিন্তু হঠাৎ উলটপুরাণের কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। অন্য কথা বাদ দিয়ে শিক্ষার ব্যাপারটাই ধরা যাক।

ইংরেজরা এ দেশে এসে ভালো করে শিকড় গেড়ে বসার সময় থেকেই শিক্ষানীতিকে ঠিক কোন খাতে বইয়ে দিলে ভালো হয় তা নিয়ে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছে তারা। প্রথমে টোল-মাদ্রাসাকে উৎসাহ দিলেও বণিকের সে মানদণ্ড কিছু-দিনের মধ্যেই হবে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে নি, রাজদণ্ড-বেশে দেখা দিয়ে চালু করতে শুরু করে দেয় ইংরেজি শিক্ষা। এর প্রধান তাগিদটা যে ছিল সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা তা এতদিন পর আশা-করি নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। মেকলে সাহেব তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার মারফৎ তৈরি করতে চেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে ইংরেজিশিক্ষিত কেরানী ও দ্বিতীয়স্তরের কর্মচারী। কেননা সাম্রাজ্যের বেনোজল যতো অপ্রতিরোধ্যগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল সারা ভারতে, ঠিক সেই পরিমাণ দ্রুততায় ততো বেশি সংখ্যার নিচু মাইনের 'রাইটার্স' আমদানি করা অসম্ভব হয়ে উঠছিল। তাছাড়া ব্যাপারটা ক্রমে হয়ে দাঁড়াচ্ছিল টাকা-পয়সার দিক দিয়েও ক্ষতিকর।

কিন্তু ইংরেজরা যে উদ্দেশ্যেই করে থাকুক, আমরা অর্থাৎ বাঙালীরা সে সুযোগ দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিলাম। উনিশ শতকের জনৈক মহৎ ব্যক্তি নিজেই জানিয়ে গেছেন, তখন তাঁরা কেবল ইংরেজিতে লেখাপড়া শেখা আর কথা বলাই নয়, ইংরেজিতে চিন্তা করতে, এমনকি ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখতে পর্যন্ত উৎসাহবোধ করতেন। এর মধ্যে ঈষৎ কৌতুক মেশানো অতিরঞ্জন নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্ন নয়, কিন্তু ব্যাপারটা তবু থেকেই যায়।

এই যে প্রায় এক শতাব্দী ধরে মেকলে ধাঁচের শিক্ষাব্যবস্থা চলছিল বলা ভালো যে, প্রথমদিকে তার সুফলও আমরা কম পাইনি। এখন যাকে 'বাংলার নবজন্ম' বা 'বেঙ্গল রেনেশাঁস' বলি, ইংরেজি শিক্ষা তার প্রধান কারণ। কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকেই এই শিক্ষা-নীতি যে দেউলে হয়ে গেছে তা টের পাওয়া যেতে লাগল। এবং কেবল তাই নয়, সেদিনের সেই পরাধীন জাতির স্বাধীন সত্তা গড়ে তোলার পক্ষে তা হয়ে উঠল একটি প্রতিকূল শক্তি।

সে যুগে জাতীয় শিক্ষার জন্যে নতুন যে একটি আন্দোলন শুরু হয়েছিল, এবং দলে দলে ছাত্ররা "গোলাম তৈরির কারখানা" অর্থাৎ 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' ছেড়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলেন তা এই কারণেই।

কিন্তু পুরনো কথার ফিরিস্তি তৈরি করে লাভ নেই। স্বাধীনতার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, শিক্ষা-নীতিকে নতুন করে ঢেলে সাজানো দরকার। চেষ্টাও যে না হয়েছে তা বলা যাবে না। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার পাশাপাশি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এবং লেদার, সিরামিক, প্রিন্টিং ও ফুড টেকনোলজি এই ধরনের বৃত্তিমূলক শিক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা যথেষ্ট কিনা তা বলা শক্ত।

অসুবিধা হয়েছে প্রধানত এই কারণে যে দেশের বৃহত্তম ছাত্রসংখ্যার সামনে যে শিক্ষার দরজা খোলা ছিল এতদিন, সেটা পুরনো ব্যবস্থারই রকমফের মাত্র। অর্থাৎ এ শিক্ষার ফলে হাতেকলমে কিছুই প্রায় শেখা যেত না, এবং বলতে গেলে আর কোনো উপায়ই থাকত না চাকরি খোঁজা ছাড়া।

সম্প্রতি তাই নতুন ধরনের শিক্ষানীতি প্রয়োগ শুরু হয়েছে, যার আসল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে তার চলতি কালের জীবনযাত্রা এবং জীবনসংগ্রামের উপযুক্ত হতে সাহায্য করা।

কিন্তু নীতি সঠিক হলেই যে সেটা সকলে একবাক্যে মেনে নেবে তা বোধহয় আমাদের দেশে আশা করাই অন্যায়। কেননা দেখা যাচ্ছে, দশ আর এগারো শ্রেণী ছাত্ররা কোথায় পড়বে—ইস্কুলে না কলেজে তাই নিয়ে বিতর্কের মেঘ জমছে। উপরন্তু, কেউ কেউ বলছেন পি ইউ পরীক্ষা যেমন চলছে সেইভাবেই চলতে থাকবে। কাজেই ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় ঠেকবে তা এখন গবেষণার স্তরে চলে যাচ্ছে বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

চার আনার গল্প

বিমল মিত্র

মাত্র চার আনা পয়সা! কিন্তু সেই চার আনা পয়সাই যে এমন করে আমার গল্পের উপকরণ হয়ে উঠবে তা তখন ভাবতে পারিনি।

এখন অবশ্য চার আনা পয়সার কিছু দাম নেই। কিন্তু এককালে ওই চার আনা পয়সা খরচ করলে হোটেলে দু-বেলা ভাত-মাছ-মাংস-ডাল পেট ভরে খেতে পাওয়া যেত। তখন মাংসের সের ছিল আট আনা। এক পয়সায় একসের বেগুন। এক মণ চাল পাওয়া যেত তিন টাকায়। পোনা মাছের সের বারো আনায় উঠলো তো লোকে ত্রাহি-ত্রাহি চিৎকার সুরু করে দিলে।

এই গল্প সেই আমলের।

তা এ-আমলই হোক আর সে-আমলই হোক আনন্দ বেদনা অভাব স্বচ্ছলতা, এ-সব তো চিরকালের সত্য। রাম-রাজত্বেও চোর ছিল, এখনও চোর আছে। আর চিরকালই এ-সব থাকবে। সমস্ত চোররা চুরি-ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে সৎ সাধু হয়ে যাবে, জেলখানা উঠে যাবে, এ-রকম দুর্ঘটনা কোনওদিন ঘটবে না।

সম্পর্কটা অনেক দূরের। আমার ঠাকুমার বোনের স্বামী। আমি তাঁকে দাদু বলে ডাকতাম। বেশ কোঁচানো ধুতি মলমলের পাঞ্জাবী পায়ে পাম্পসু। খুব সৌখীন মানুষ। আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন অল্পক্ষণ ধরে বসে বসে চা খেতেন। চায়ের কাপে মুখ দিয়েই বুঝতে পারতেন সেটা দামী চা না সস্তা চা।

বলতেন—তোমাদের বাড়ি এই চা'টা খেয়ে বড় আরাম পাই হে, বড় ভালো চা তোমাদের—

নিজে যে তিনি একটা বড় কিছু চাকরি করতেন তা নয়। তখন লাইট-হাউস সিনেমা-ঘরটা সবে হয়েছে। সেই টিকিট-ঘরের ক্লার্ক। মাইনে পঞ্চাশ কি ষাট টাকার, বেশি নয়। তত সস্তা-গণ্ডার দিনই হোক পঞ্চাশ-ষাট টাকা মাইনেতে তখনকার দিনেও দামী-জিনিসের সখ মেটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু নজর যাঁর উঁচু তাঁর শখ কে মেটাবে? মাসে হাজার টাকা মাইনে পেলেও তা মেটানো সম্ভব নয় কারো পক্ষে। কারণ শখের জিনিসের তো অভাব নেই বাজারে। না তখন, না এখন।

নিজে তিনি যে বাড়িটায় থাকতেন সেটার তখন ভগ্ন-দশা।

দাদু বলতেন—এ-বাড়িটা এবার বদলাতে হবে হে, এক ফোঁটা হাওয়া ঢোকে না বাড়িতে, এখানে কি বাস করা যায়?

আমাকে জিজ্ঞেস করতেন — তোমার সন্ধানে কোনও ভালো বাড়ি আছে?

আমি বলতাম—হ্যাঁ, খুব ভালো বাড়ি আছে দাদু। কিন্তু ভাড়া একটু বেশি চায়—

—কত?

—তিরিশ টাকা; পাঁচখানা ঘর।

দাদু বলতেন—বাঃ খুব সস্তা তো। তুমি আজই ব্যবস্থা করে ফেল। আমি এ-বাড়িটা এখখুনি ছেড়ে দেব—

আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা-বার্তা বলে সব বন্দোবস্ত পাকা করে ফেললাম। কিন্তু পরে তাকে যখন কথাটা বলতে গেলাম তখন বললেন—ওহে, একটা মুশকিল হয়ে গেছে—

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কী মুশকিল?

দাদু বললেন—আমার বাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। বলছেন—নেত্যবাবু, আপনি আমার বাড়ি ছাড়বেন না, আমি আপনার ভাড়া কমিয়ে দিচ্ছি—

নেত্যবাবু মানে নিত্যানন্দবাবু আমার দাদুর নাম নিত্যানন্দ ঘোষ। নিত্যানন্দটা নেত্যানন্দ হয়ে গিয়েছিল। দাদু দশটাকা বাড়িভাড়া দিতেন। তার থেকে পাঁচটাকা কমে গেল। অত সস্তায় বাড়ি ছেড়ে কে আর তখন তিরিশটাকা ভাড়ার বাড়িতে যাবে?

যে-মানুষ দামী চা খেতে ভালোবাসেন, আলো-হাওয়াওয়ালা ভালো বাড়িতে থাকতে চাইতেন তাঁর সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। এই সাধ্য না থাকার সত্যটা তিনি কিছুতেই মুখে কখনও প্রকাশ করতেন না।

মুখে বলতেন—এ তো বড় মুশকিল করলে হে আমার বাড়িওয়ালা। আমি একটু আরাম করে ভালো বাড়িতে গিয়ে থাকবো তাও আমাকে বাড়িওয়ালা থাকতে দেবে না এ কী রকম অত্যাচার বলো তো?

বাড়িতে গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন—একটু চা খাবে নাকি হে? খুব ভালো চা কিনে এনেছিলাম—

আমার চা খেতে তখন আদৌ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু ঠাকুমা আমার কথা বলবার আগেই বলে উঠতেন—না, ওকে এই দুপুর বারোটার সময় কেন চা খেতে বলছো? তুমি কি ওর শরীরটা খারাপ করে দিতে চাও নাকি? না না, এই অবেলায় আর ওকে চা খেতে হবে না—

দাদু বলতেন—ঠিক আছে, তুমি কাল সকাল আটটার সময় এসো। আমার এখানে এসে চা খাবে। কথা রইল—

তা গেলাম পরের দিন সকাল বেলা। চা খেলাম।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন—চাটা কী রকম খাচ্ছো বলো?

খুব নিকৃষ্ট চা বলে মনে হলো আমার। কিন্তু মুখ ফুটে তা বলতে পারলাম না। শুধু বললাম—ভালোই তো—

দাদু বললেন—হুঁ হুঁ, ভালো তো হবেই এ চায়ের দাম কত জানো?

ঠাকুমা এসে কথাটা চাপা দিলেন। বললেন—থাক আর চায়ের গুণ নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না, তুমি এবার চান করে নাও তো, অফিসে যেতে হবে না বুঝি তোমাকে?

দাদুর অফিস বেলা করে। সিনেমা-হাউসের বুকিং-ক্লার্কের চাকরি। বাড়ি থেকে দুপুরে একটায় বেরোতেন। তারপর বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই যার নাম রাত দশটা কি সাড়ে দশটা। তাই সকাল বেলার দিকে দাদু এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। সংসার দেখাশোনার পুরো ভারটা ছিল ঠাকুমার ওপরে। দাদুর মতন ঠাকুমার অত শখ-সৌখিনতার বালাই ছিল না। সংসারের পেছনে উদয়াস্ত খেটে খেটে দিন দিন তাঁর শরীর কালি হয়ে যাচ্ছিল। শাড়ি সেলাই করে করে চালাতেন অনেকদিন। এক-একদিন দাদুর সঙ্গে ঝগড়াও করতেন খুব। বলতেন—কোথায় কোথায় তুমি অড্ডা দিয়ে বেড়াও বলো তো? আমি তোমাকে বলে দিয়েছিলুম না আসবার সময় বাজার থেকে মাছ নিয়ে আসতে—

—মাছ? এ্যাই যাঃ—

হঠাৎ মাছের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে দাদু জিভ কামড়াতেন। তারপর প্রাথমিক হতাশাটা কাটিয়ে উঠে বলতেন—যাচ্ছি, আমি এখখুনি মাংস কিনে নিয়ে আসছি—

ঠাকুমা বলতেন—না না, তোমাকে এখন আর এই অবেলায় মাংস কিনে আনতে হবে না, একটা দিন নিরিমিষ খেয়েই না-হয় চালাবো—

দাদুও জেদ ধরতেন। বলতেন—না, এখুনি আমি মাংস কিনে নিয়ে আসছি বাজার থেকে—

বলে কারোর কথা না শুনে আবার বড়বে ছুটতেন।

আমি যদি ঠিক সেই সময়ে গিয়ে পড়তুম তো দাদু আমাকে দেখিয়ে বলতেন—ওই দেখ কে এসেছে, ওকেও একটু মাংস-ভাত খাইয়ে দাও—

আমি আপত্তি করতুম। আমি যত আপত্তি করতুম দাদু ততই না-ছোড়বান্দা। তত পীড়াপীড়ি করতেন। দাদু বলতেন—খাও খাও হে, একটু মাংস-ভাত খেয়ে যাও—

আমি বলতাম—না দাদু, আমি এখুনি বাড়িতে গিয়ে খাবো—

দাদু বলতেন—আরে সে তো খাবেই, সে তো পুঁটি মাছ পুঁটি মাছের চচ্চড়ি—

আমি বলতাম—না, পুঁটি মাছের চচ্চড়ি নয় আজকে আমাদের বাড়িতে ইলিশ মাছ এসেছে—

দাদু বলতেন—আরে রেখে দাও তোমার ইলিশ মাছ। সে তো বরফ দেওয়া ফলতার ইলিশ। তোমার সেই ইলিশের সঙ্গে মাংসর তুলনা? এ নিউ-মার্কেটের মাংস, তা জানো? একেবারে গ্রামকেড—

শেষকালে দাদুর বাড়ির সেই মাংস-ভাত খেতেই হতো। দাদু আবার খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করতেন—কেমন লাগলো মাংসটা বলো?

আমাকে বলতে হতো—ভালো—

আর শুধু ভালো বললে দাদু খুশী হতেন না। দাদুর পীড়াপীড়িতে বলতে হতো—খুব ভালো বলতে হতো—এমন মাংস জীবনে কখনও খাইনি—

এত প্রশংসা করার পর তবে তিনি আমাকে রেহাই দিতেন। তার আগে নয়।

এই রকম নবাবী মেজাজ ছিল দাদুর। শুনেছি নিত্যানন্দ দাদুর বাবা ছিলেন সেকালের নামকরা জমিদার। সত্যানন্দ ঘোষের নামে বেড়াপোতার মানুষজন ভয়ে থর-থর করে কাঁপতো। আমার নিজের ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি যখন ঠাকুরমা বোসের বেড়াপোতায় বিয়ে হয়েছিল তখন বিরাট এক হাতীর পিঠে চড়ে দাদু এসেছিলেন বিয়ে করতে। সেই হাতী দেখতেই সেদিন সতখানা গ্রামের লোক এসে ভিড় করেছিল ঠাকুরমাদের বাড়িতে। বরের যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ। গ্রামের লোক বরের স্বাস্থ্য আর রূপ দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিল।

সেসব অনেক কালের কথা। তারপর দিনকাল বদলে গেল পতন-উত্থানের অমোঘ নিয়মে সত্যানন্দ ঘোষের অবস্থাও খারাপ হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ একদিন মারা গেলেন। আর মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল একদিন বইয়ে থেকে যা দেখা যাচ্ছিল সেটা খোলস। খোলসটা খসে যেতেই ভেতরের আসল রূপটা ধরা পড়ে গেল লোকের চোখে।

আর সেই সময়েই দাদু দেশ ছেড়ে এই কলকাতায় পাড়ি দিলেন। এখানে এসে ভাড়া নিলেন এই বাড়িটা আর স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ওখানেই সংসার পাতলেন।

আমি তখন ছোট। দাদুর বাড়িটা ছিল আমাদের কাছেই। মার সঙ্গে প্রায়ই যেতাম সে বাড়িতে।

গেলেই দাদু খাওয়াতেন খুব। কোনও দিন রাবড়ি কোনও দিন পোলাও মাংস আবার কোনও দিন খিচুড়ি ইলিশ মাছ ভাজা।

মা আপত্তি করতো। বলতো—এত কেন খেতে দিচ্ছেন মা এখখুনি তো ও এক পেট খেয়ে এল—

দাদু বলতেন—তুমি থামো তো বউমা আমি আমার নাতিকে খেতে দিচ্ছি তাতে তোমার কী? তাতে তুমি কেন কথা বলতে আসো?

তারপর আমার দিকে চেয়ে বলতেন—খা খা খেয়ে নে পেট ভরে খেয়ে নে। কলকাতায় আর কীই বা পাওয়া যায় যে তোকে খেতে দেব। তুই তো আর সেসব খাওয়া দেখলি নে তখন আমি পুরো একটা কাঁঠাল একাসনে বসে খেয়েছি আর হজম করেছি। আর মাছের কথা যদি শোন বউমা তো অবাক হয়ে যাবে, অন্তত একটা ইলিশ মাছ আমি একলা খেয়েছি এককালে তা জানো? আর তোমাদের এই কলকাতা ঝাটার বাড়ি মারি তোমাদের এই কলকাতার মুখে। এখানে তোমরা কী সুখে যে আছো তাই ভাবি। একটা খাঁটি জিনিস পাইনে খাবার মত। এই ইলিশ মাছ এও বরফ দেওয়া! এ মাছ

খাচ্ছি না মাস খাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারি নে—

কলকাতায় এসে দাদু সঙ্গে করে আনা টাকায় বেশ কিছুদিন কাটালেন। দুহাতে টাকা খরচ করতে লাগলেন আর মুখে রজ্জা উজির মারতে লাগলেন। কথায় কথায় নিজের পূর্ব-গৌরবের কাহিনী রাস্তায়-ঘাটে তারস্বরে সকলকে শোনাতে লাগলেন।

শেষকালে সুরু হলো ঠাকুমার গয়না বিক্রি করা। তাতে ইজ্জৎ বজায় রইল কিন্তু তলে তলে ভাঁড়ার নিঃশেষ হতে লাগলো। তারপর ওই সিনেমা হাউসের চাকরিটা পেয়ে গেলেন? মাইনে অল্প বটে কিন্তু কোনও ক্রমে লজ্জাটি বাঁচলো তখনকার মত।

আমি এসব কাহিনী কিছুই জানতাম না। আমি শুধু জানতাম দাদুর বাড়িতে গেলেই দাদু সবিস্তারে দেশের কথা শোনাবেন আর খাওয়াবেন।

তখন স্কুল ছেড়ে সবে আমি কলেজে ঢুকেছি। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় সিনেমা হাউস হয়েছে। সেসব দেখবার লোভ থাকলেও পকেট তেমন পয়সা নেই যে টিকিট কেটে সেই সব ছবি দেখি। কোথাও হচ্ছে কৃষ্ণকান্তের উইল কোথাও ঋষির প্রেম কোথাও বা আবার রজনটী বসন্তসেনা।

মা এসব দেখতে দেয় না আমাকে। মানা—না ওসব দেখতে নেই ওসব দেখলে ছেলেরা খারাপ হয়ে যায়—

এই সময় একদিন দাদুর বাড়িতে গিয়েছি। দাদু বললেন—এই যে এসে গেছ ভালোই হয়েছে— আমি তো অবাক। আমি হাওয়াতে দাদুর যে কী ভালো হলো বুঝতে পারলাম না।

দাদু বললেন—সিনেমা দেখবে? আমরা সবাই সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। তুমিও চলো—

সিনেমা দেখবার জন্যে তখন ঠিক তৈরি ছিলাম না। একটু দ্বিধা করতে লাগলাম। কিন্তু লোভও হলো খুব। বললাম—সিনেমা—

দাদু বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ সিনেমা। পয়সা লাগবে না হে চারখানা পাশ পেয়েছি—চলো না।

বললাম—কী সিনেমা?

দাদু বললেন—নিমাই সন্ন্যাস। আর তো বেশি সময় নেই। শ্যামবাজারে যেতে ঘন্টাখানেক লাগবে ছটার সময় আরম্ভ বাড়ি থেকে সাড়ে চারটের সময় বেরোলেই চলবে।

তখন ঘড়িতে বিকেল চারটে বেজে গেছে। বাড়িতে গিয়ে জামা-কাপড় বদলে আসবার আর সময় ছিল না।

বললাম—তা চলুন—

নিমাই সন্ন্যাস ছবি দেখার মধ্যে যে কোনও দোষনীয় কিছু নেই তা আমার জানা ছিল। জানা ছিল যে মা তাতে আপত্তি করবে কিছু থাকবে না। তবু তাড়াতাড়ি একবার মাকে গিয়ে শুধু খবরটা দিয়ে এলাম যে দাদুর সঙ্গে আমি নিমাই সন্ন্যাস ছবি দেখতে যাচ্ছি। দাদু ফ্রি পাশ পেয়েছেন।

তারপর দাদুর সঙ্গে আমরা বাস্তায় বেরোলাম। দাদু খুব সেজেছেন। গায়ে একটা খুব দামী শাল পাট করে ফেলে রাখা। গায়ে সার্জের পাঞ্জাবী। পরনে কালোপেড়ে কোঁচানো ধুতি পায়ে বার্নিশ করা শ্লেজ কিড-এর নিউ কাট পামশু। ঠাকুরমাও একটা সিল্কের শাড়ি পরে কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়েছে। ঠাকুমাকে দশ-বারো বছরের মেয়েও সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে বেরিয়েছে। বেড়াপোতার জমিদার বংশের অধস্তন পুরুষ সপরিবারে সিনেমা দেখতে যাচ্ছে এটা সেজা কথা নয়। আমিই শুধু ব্যতিক্রম। আমারই শুধু সাধারণ আটপৌরে সাজ-সজ্জা।

বাস্তায় বেরিয়ে দাদু বললেন—ট্যাকসিই করি, কী বলো তুমি?

আমি ট্যাকসির কথা শুনে বললাম—কেন, ট্যাকসি কেন, বাসেই চলুন না হাতে তো একঘণ্টা সময় রয়েছে—

দাদুর যেন কথাটা শুনে ভালো লাগলো না। বললেন—না না, ট্যাকসির একটা আলাদা ইজ্জৎ, বাসে কি আর সেই ইজ্জৎ আছে? বেড়াপোতার জমিদার-বংশের মানুষ আমরা কেউ যদি দেখে ফেলে, তখন কী ভাববে বলো তো? ভাববে সেই অতবড় জমিদার-বংশের ছেলেরা শেষকালে এই দুর্গতি—সপরিবারে বাসে উঠেছে—

ঠাকুমা বললেন—না না বাসেই চলো—

দাদু অগত্যা রাজি হলেন। বললেন—তাহলে তাই চলো—বাসেই চলো—

তখনকার দিনে ট্রামে-বাসে আজকাল-কার মত এত বাদড়ে-ঝোলা ভিড় থাকতো না। বাসটা সামনে এসে দাঁড়াতেই আমরা সবাই উঠে পড়লাম। তারপর সেটা ছেড়ে দিলে।

দাদু, আর আমি পাশাপাশি একটা সিট বসে আছি। মেয়েরা মেয়েদের বসবার জায়গায়।

দাদু হঠাৎ বললেন—তুমি জানো তো, বেড়াপোতায় আমাদের হাতী ছিল?

বললাম—হ্যাঁ তা তো জানিই—দাদু তো ছোটবেলা থেকে সে-গল্প শুনে আসছি—

দাদু বললেন—তুমি না হয় জানো, কিন্তু আমি যদি এখন কথাটা এই শহরের লোকদের বলি তো তারা কেউ বিশ্বাস করবে? তুমিই বলো কেউ বিশ্বাস করবে?

আমি বললাম—না, কেউ তা বিশ্বাস করবে না—

দাদু বললেন—তুমি ঠিক বলেছ কেউ বিশ্বাস করবে না বুঝলে, কেউই বিশ্বাস করবে না। বরং শুনলে হাসবে কিংবা বেগে গিয়ে আমাকে মারতেই আসবে। বলবে—গুল মারবার আর জায়গা পাননি মশাই?

আমি বললাম—তা তো বলবেই—

দাদু বললেন—ঠিক বলেছ সেইজন্যই তো আমি কাউকে সে-সব কথা বলি না হে। আমি যে বেড়াপোতার অত বড় জমিদার বংশের ছেলে সেকথা আমি ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলি না। বলে তো কোনও লাভ নেই। তুমি কি বলো, লাভ আছে?

আমি বললাম—না দাদু, কোনও লাভ নেই—

দাদু বললেন—তুমি ঠিক বলেছ। আমার অফিসের লোকরা যখন তাদের নিজেদের দেশের কথা বলে, তখন আমি চুপ করে থাকি। বুঝলে আমি একেবারে চেপে যাই—

আমি বললাম—চেপে যান ভালোই করেন—

দাদু বললেন—কিন্তু চেপে যাওয়া কি সোজা হে। মাঝে মাঝে বাগ হয় না? মনে হয় তোদের ডেকে বলি, তোরা শুনে রাখ একটা চুলো পুঁটি সব তোদের আমার কত লবাবী কেন শুনি? আমার কী-কম সব লবাব জানো? অফিসে এসে বড় বড় কথা বলে—

—কী বড় বড় কথা?

—ওই যেমন কেউ বলে তার মামা রায়-বাহাদুর, কেউ বলে তার দাদা বিলেত-

Summer Forecast

The transit of the sun through your solar eigth house strongly indicates physical strain, excessive sweating and bad body odour during the next three months.

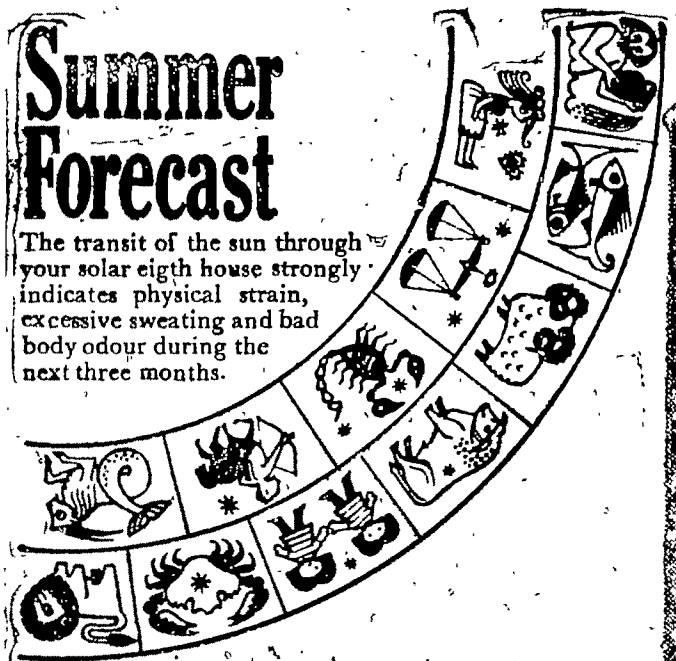

After a refreshing bath with KHUS SOAP, shower yourself with the luxury of AFGHAN Talcum Powder.

your days will be cooler and fresher with...

OTTO KHUS *SOAP*

Luxury
AFGHAN
Talcum Powder

From E. S. Patanwala Makers of Beauty Aids

কেরত, আবার কেউ বলে তার শ্বশুরের ডজারি করে মাসে সাতশো টাকা আয়—। কথাগুলো শুনতে শুনতে এক এক সময় আমার মাথায় খুন চেপে যায়, জানো? এক-একবার ভাবি বলি বাপু এতই যদি তোমের লপ-চপানি তাহলে কেন মরতে এই পাঁচ-সিকে বেতনের চাকরি করতে এসেছিলে শুনি? চাকরি ছেড়ে দিলেই তো পারিস—

আমি বললাম—আপনি ও-সব কথা বলতে যাবেন না দাদু, তাতে উল্টো ফল হবে—

দাদু বললেন—তুমি ক্ষেপেছ? আমি কখনও সেই কথা বলি? ও-সব কথা আমার বাঁ-কান দিয়ে ঢুকে ডান কান দিয়ে বেরিয়ে যায়, বুঝলে?

হঠাৎ কন্ডাকটার এসে টিকিট চাইলে।

দাদু টিকিট কেনবার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালেন। আমিও আমার নিজের টিকিট কেনবার জন্য পকেট থেকে দু'আনা পয়সা বার করে কন্ডাকটারকে দিলাম। তখন জালিয়াট থেকে শ্যামবাজারের বাস-ভাড়া মাত্র দু'আনা।

আমাকে পয়সা বার করে দিতে দেখেই দাদু আমার হাতটা চেপে ধরেছেন।

বললেন—তুমি পয়সা রাখো, রাখো তুমি পয়সা—তুমি পয়সা বার করছো কেন?

আমি বললাম—আমার নিজের টিকিটটা আমাকে কিনতে দিন দাদু, আপনি আমাকে সিনেমা দেখাচ্ছেন তার ওপর আবার আমার বাস-ভাড়াটাও দেবেন?

দাদু বললেন—তুমি বাজে কথা রাখো দিকিনি, তুমি কার সঙ্গে যাচ্ছো সেটা ভুল যাচ্ছো কেন শুনি? জানো না আমি তোমার গুরুজন?

তারপর একটু থেমে বললেন—আর গুরুজন বলো না-ই যদি হতুম, আমি কোন বংশের ছেলে সেটাও তো ভাববে? তুমি যদি ভাড়াটা দিয়ে দাও, তাহলে আমার ইজ্জৎটা কোথায় থাকে বলো তো? তুমি দু'আনা পয়সা ভাড়া দিয়ে কি আমার ইজ্জৎটা খোয়াতে চাও?

বললাম—না, না আপনি ও-কথা ভাবছেন কেন? আমি তো

দাদু বললেন—তা না তো কী? তুমি তো আমার ইজ্জৎটাই খোয়াতে চাইছো।

বলে আমাকে নিরস্ত করে কন্ডাক্টারকে চারখানা টিকিটের পয়সা দিলেন। আমি এর পর আর কোনও উচ্চবাচ্য করলাম না। তারপর যখন বাসটা শ্যামবাজারে পৌঁছোল, তখন আমরা তা থেকে নেমে যথাস্থানে গেলাম। 'নিমাই সন্ন্যাস' ছবি কেমন দেখলাম ভালো না মন্দ সে সব আজ আর এতদিন পরে কিচ্ছুটি মনে নেই। কিন্তু সেই সূত্রে যেটা মনে আছে সেইটের কথা এবার বলি।

সিনেমা শেষ হবার পর আবার আমরা বাসে উঠলাম। আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আমি বাস-ভাড়াটা দিতে গেলাম আর দাদুও দিতে দিলেন না।

আমি বললাম—এবার আমাকে ভাড়াটা দিতে দিন দাদু, বাসভাড়ার পয়সা তো আপনি দিয়েছিলেন। ফেরবার ভাড়াটা অন্ততঃ আমি দি—

দাদু সেবারও আমার হাতটা চেপে ধরলেন। বললেন — খবরদার, বলছি তুমি ভাড়া দিতে পারবে না—

বললাম—বারবার আপনি কেন ভাড়া দেবেন? বারবার আপনি ভাড়া দিলে আমার যে খারাপ লাগে—

দাদু বললেন—লাগুক খারাপ, তবু আমি তোমাকে ভাড়া দিতে দেব না। আমি তোমার গুরুজন না?

এর জবাবে আমি আর কী বলবো চুপ করে রইলাম। শুধু বললাম—এমন জানলে আমি আপনার সঙ্গে আসতুম না—

দাদু ধমক দিয়ে বললেন—তুমি তো খুব লায়েক হয়ে গেছ দেখছি। আগে কলেজ থেকে বেরোও, বেরিয়ে চাকরি-বাকরি করো তখন লবাবী দেখিও—

বললাম—কিন্তু আপনার এই অবস্থায়—

দাদু আমার কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন—কী বলছো? আমার অবস্থা? আমার অবস্থা কী হয়েছে শুনি? তুমি ভাবছো আমি গরীব হয়ে গিয়েছি? জানো এখনও যদি লেডু জানতে পারে আমি বেড়াপোতার জমিদার-বংশের ছেলে তো

লেখকদের আগের গল্পগুলি সংগ্রহ করে রাখলে শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন তৈরি হয়ে যাবে।

তারা এখনই আমাকে একটা পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরি করে দেবে তা জানো? কাউকে বলি না বলে তাই। বললে এখনও তোমাদের এই কলকাতা শহরে ভেলকী খেলা দেখিয়ে দিতে পারি আমি—

এর পর আর কোনও কথা বলতে সাহসে কুলোল না আমার। বাড়ির কাছে এসে বাস থেকে নেমে সে-যার বাড়ির দিকে চলে গেলাম। দাদুর জন্যে বিনা-পয়সায় সিনেমাও দেখা হলো আবার বাস-ভাড়ার চার আনা পয়সাও বেঁচে গেল।

কিন্তু তখনও কি জানি যে আমার জন্যে এক মর্মান্তিক বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে?

পরের দিন সকালবেলা কলেজে যাবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি, দেখি ঠাকুমা হন হন করে আমাদের বাড়ির দিকেই আসছেন। ঠাকুমাকে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখে আমার একটু অবাক লাগলো। কালই দেখা হয়েছে, আর তার পরই এমন কী ঘটলো যে আবার তাঁকে আমাদের বাড়িতে আসতে হলো।

ঠাকুমা একেবারে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

বললেন—তুমি বেরিয়ে যাচ্ছো নাকি? ভাগ্যিস তাড়াতাড়ি এলুম, নইলে তো তোমার সঙ্গে আজকে আমার দেখাই হতো না—

বললাম—কোনও বিপদ-আপদ হয়েছে নাকি? দাদু কেমন আছেন?

ঠাকুমা বললেন—তোমার দাদু তো ভালোই আছেন, সেজন্যে আমি আসিনি। আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম বাবা। কাল তোমার দাদু তোমার বাস-ভাড়াটা দিয়েছিলেন তো? আমি সেই কথাই বলতে এলাম।

আমি বললাম—বাসভাড়া? বাসভাড়ার চার আনা পয়সা তো আমিই দিতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দাদু তো তখন কিছুতেই তা দিতে দিলেন না উল্টে আবার আমার ওপর রাগ করে অনেক কথা শোনালেন—

ঠাকুমা বললেন—দাদুর কথা তুমি ছাড়ো দাও বাবা, উনি ওই রকমই। ওঁর কি আর মাথার ঠিক আছে? করে একদিন সব-পাতাড়ি গুদন জমিদারি ছিল সেকথা উনি এখনও ভুলতে পারেন না। ভেবেছেন এখনও বুঝি সেই সব দিন-কাল আছে। সংসার যে কত কষ্ট করে চালাচ্ছি সে তো আমিই জানি। বাজারে দু'হাতে দেনা করছেন আর সেই আগেকার ঠাট বজায় রাখতে চাইছেন—। এখন চার আনা পয়সাও আমার কাছে চল্লিশ টাকার সমান বাবা। তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই আমার হাতে আমাদের আপনা-আপনির মধ্যে। ওই চার আনা পয়সা পেলে তবু এখন তোমার দাদুকে বাজারে পাঠাতুম। হাতে আমার একটা পয়সা নেই এখন বিশ্বাস করো বাবা, তোমার কাছে বলতে আর লজ্জা কি, একটা পয়সা নেই এখন হাতে যা আজকের বাজার হয়। যে-কটা পয়সা ছিল সব কাল বাস-ভাড়া দিতেই বেরিয়ে গেছে—মাস-পয়লা হতে তো এখনও কতদিন বাকি!

আমি আর কথা বাড়ালাম না, পকেটে একটা দশ টাকার নোট ছিল। কলেজে ফাউন্টেন দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সেটা ঠাকুমার হাতে দিয়ে দিলাম, টাকাটা পেয়ে ঠাকুমা বললেন—কিন্তু আমার কাছে তো এখন ভাঙানি নেই বাবা...

আমি বললাম—সে পরে হবে, আপনি এই নিয়ে এখুনি দাদুকে বাজারে পাঠিয়ে দিন তো—

বলে আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। আমার মনে হলো ঠাকুমার লজ্জা যেন আমারই লজ্জা। আর শুধু ঠাকুমা কিংবা দাদুর লজ্জাই বা বলি কেন, সারা পরিবারের মিথ্যে ইজ্জতের লজ্জা যেন একসঙ্গে আমাকে চারদিক থেকে আক্রমণ করতে এল। আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাসে উঠে পড়ে যেন সেদিন বাঁচলাম। চার আনা পয়সার লজ্জা যেন চার হাজার টাকার লজ্জা হয়ে আমাকে ফেরারী করে ছাড়লে।

এর পরে আর কেশিদিন বাঁচেন নি দাদু। বোধহয় এই ঘটনার তিন-চার মাস পরেই মারা গিয়েছিলেন।

বিমল মিত্র

অভিভাবকরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েছিলেন। পরিবারের আর সবাই প্রতিষ্ঠিত শুধু ছোট ছেলেটির যেন কোন কিছুতেই মন নেই। পৃথিবীতে তার ভালোবাসার বস্তু মাত্র দুটি, সাহিত্য আর গান। কত দুপুর, কত সন্ধ্যে কত রাত কেটে যায় এরই পেছনে। পত্র-পত্রিকায় কবিতা লেখে সে, আর নিয়মিত হাজির হয় গানের আসরে।

অথচ সে যুগটা ছিল অনেকখানি অন্য রকম। শিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত পরিবারের ছেলে কবিতা লিখে সঙ্গীতচর্চা করে জীবন কাটাবে এটা কম বাপ-মাই চাইতেন। তাই বাড়ীতে ধিক্কারের বিরাম ছিল না।

অবশেষে এক সময়ে হতাশ হলেন তাঁরা। বুঝলেন ও শোধরানোর নয় জীবনে কিছু হবে না ওর, ওই সব করেই কাটবে জীবনটা।

সত্যিই শ্রীবিমল মিত্র জীবনটা কাটালেন ওই নিয়েই। এর শুরু কৈশোর থেকেই। যৌবনটাও কেটেছে যেন এক ঘোরের মধ্য দিয়ে। বড়দের দেখিয়ে দেওয়া পথে চলতে কোন আগ্রহই ছিল না তাঁর, বরং সমস্ত মন জুড়ে সর্বক্ষণ বাজত একটি প্রশ্ন—কিছু হওয়া কাকে বলে? সার্থক হওয়া কি? কেমন সেই সার্থক হওয়া? অনেক টাকা মাইনের চাকরী নিয়ে ঝকঝকে কামরায় চকচকে সাজে চারদিক আলো করে বসা, না কি এলোমেলো হয়ে ভাবনার স্রোতে ভেসে তরঙ্গে আছড়ে পড়ে অবশেষে কূলে ওঠা, এক নতুন জগতের? মনে হত সে জগতের আলো-বাতাস সবেরই সৃষ্টিকর্তা হব আমি,—আমারই আদেশে সেখানে ফুল ফুটবে গাছে, সুর উঠবে পাখির গলায়। আমি সেখানে হব ঈশ্বরেরই মত শক্তিমান।

সেই জগৎই হাতছানি দিয়েছে, কিশোর বয়স থেকে। মনের মধ্যে অবিরত চলেছে ভাঙা-গড়ার পালা নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ। কবিতা, উপন্যাস, গল্প একে একে এসেছে কলমের মুখে, মুক্তি দিয়েছে শিল্পীকে সৃষ্টির যন্ত্রণা থেকে।

বাস্তবে দেখা কল্পনায় গড়া ছোট ছোট ছবি রঙীন বুদবুদের মত ভেসে বেড়ত চেতনার মধ্যে। তাদের নিয়ে সৃষ্টি হত এক একটি কাহিনী। মিষ্টিদিদি আশুকাকা, সুজাতা স্বামীনাথন, রারমশাই — বিভিন্ন দিক থেকে আলো ফেলে তাদের উদ্ঘাটন করেছেন বিমল মিত্র। পাঠককে একান্ত কাছে ডেকে তাঁর মুখোমুখি বসেছেন তিনি অন্তরঙ্গতার পরিবেশে একটি একটি করে কত কাহিনী শুনিয়েছেন। একজনের গল্প, একজনের সুখ-দুঃখের কথা বলতে গিয়ে এসেছে আরও বহুজনের কথা ঘরন্তী লাবণ্যর আগে দেখতে হয় মিসেস চৌধুরীকে, হরসুন্দরের কাহিনীতে পৌঁছতে হয় গাঙ্গুলীবাবুকে পেরিয়ে। তবু মূল গল্পের ধারাটিতে ছেদ পড়ে না কখনও।

আবার কখনও বা রচনার গতি একমুখী। সেখানে বক্তব্য বিষয়টি সরল, ভঙ্গিটি তীক্ষ্ণ। এটুকু লেখক যখন যেমনভাবে চেয়েছেন সেইভাবেই প্রকাশ করেছেন।

লিলি পালিতের গল্পটির বক্তব্য সহজ এবং স্পষ্ট। চারপাশে এক অদৃশ্য বর্ম তৈরী করে নিজের বিশ্বাস নিয়ে এক অস্বাভাবিক জীবন যাপন করছিল লিলি পালিত। পবিত্রতা শুচিতা সম্বন্ধে তার এক নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠেছিল। নর-নারীর সহজ সম্পর্কের মধ্যে সে কোন মাধুর্যের সন্ধান পায় নি। বরং পুরুষদের সম্বন্ধে এক অস্বাভাবিক ভয় আর ঘৃণা তার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই তার জীবনের ব্রত ছিল পুরুষকে এড়িয়ে

আগের গল্প

লিলি পালিত

মধুপুরের ঘটনা। নদীর ধার থেকে উনি বেড়িয়ে ফিরছিলেন। মোটাসোটা চেহারা। সঙ্গে প্রায় ছ'সাতটি ছেলেমেয়ে। সবাই দু-এক বছরের পিঠোপিঠি।

বন্ধু দেখতে পেয়েই লাফিয়ে উঠেছে। বললে—ওই যে, ওই উনি আসছেন—

—কে?

—সেই যাকে নিয়ে গল্প লিখেছিলি, সেই..

—লিলি পালিত!

হ্যাঁ আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, দেখবি...

কিন্তু তখন আর এড়াবার উপায় নেই। ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন করবারও সময় নেই।

বন্ধু বললে—লিলি মাসিমা, ভারি ভালো লোক, বাড়ীতে এখন না-খাইয়ে আর ছাড়েন না। ওই অতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে একটু বিরক্ত হওয়া নেই—আলাদা মানুষ একেবারে—

আমি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম! বন্ধুর মুখ থেকেই একদিন লিলি পালিতের গল্প শুনেছিলাম। যে-রকম শুনেছিলাম, সেই-রকমভাবেই লিখেছিলাম গল্পটা। তখন উনি কুমারী। সেই কুমারী লিলি পালিতের গল্পটা যেন ওঁকে সামনে দেখে সমস্ত ওলোট-পালোট হয়ে গেল। কী লিখেছিলাম স্পষ্ট মনে নেই। গল্পটা এই মুহূর্তে ভাবতে গিয়েও কেমন যেন লজ্জায় পড়লাম।

সে কলকাতার রাস্তার একটা ঘটনা।

লিলি পালিতের চোখ থেকে চশমাটা খুলে ঠিকরে পড়লো গিয়ে ফুটপাথের ওপর। একটা অপেক্ষামান রিকসার চাকার সঙ্গে ধাক্কা লাগলো শরীরের। লিলি পালিত উপুড় হয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো।

বাস থেকে নামতে গিয়ে একী দুর্ঘটনা! কে একজন বুঝি সহানুভূতি দেখিয়ে হাত ধরে তুলতে গেল। অনেকগুলো লোকের আর্তচীৎকার কানে এল তার। মুহূর্তে অকর্মণ্য লোকের ভীড় জমে গেছে। সন্ধ্যার অপসরমান ম্লান আলোয় তার চোখে ধাঁধা লেগে গেল।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। একদণ্ডেই নিজেকে সামলে নিয়ে লিলি উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠেই যে-লোকটি হাত ধরে তুলতে যাচ্ছিল তাকে সজোরে ল্যাগাল এক চড়। লোকটার বাঁ-গালের মাংসের ওপর লিলি পালিতের ডান হাতের প্রথম চড়টা সশব্দে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। তারপর ফুটপাথের ওপর থেকে চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার চোখে লাগালো।

এবার স্পষ্ট সব নজরে পড়েছে।

পেছনে একদল দর্শককে বিমূঢ় করে দিয়ে লিলি পালিত সরু গলিটার ভেতর ঢুকল। আপনারা যারা দক্ষিণ কলকাতায় থাকেন তাঁরা লিলি পালিতকে দেখেছেন। রাস্তায় পথ করে যে-সব মেয়েরা বেরোয় লিলি সে দলের নয়। নধর শ্যামশ্রী চোখে মোটা কাচের চশমা কণ্ট্রোলের ফরসা মোটা শাড়ি, হাতে কিছু বই খাতা আর গলার কণ্ঠা ঢাকা ছিটের ব্লাউসের ঠিক কেন্দ্রস্থলে ফাউন্টেনপেনের সোনার ক্লিপটা নজরে পড়ে। শাড়িটা শরীরের আষ্টপৃষ্ঠে পরিপাটী করে জড়ানো। তাতে হাত দুটোর দর্শনীয় অংশটুকুও দ্রষ্টব্যের বাইরে থেকে যায়। অন্য মেয়েরা দেখলে বলে—আদিখ্যেতা। সাধারণত নজরে পড়বার মত মেয়েই নয় সে—না চেহারায় না সাজসজ্জায়। রাস্তার চলমান জনতার মধ্যে তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন মাটীর সঙ্গে মিশির যেতে চাইছে। মিশিয়ে যেতে চাইছে লজ্জার নয় ঘৃণার। লজ্জা করবার কী-ই বা তার আছে। পাঁচ-পাঁচি চেহারাটা একটু ভোল ফেরালেই হয়ত দশজনের দ্রষ্টব্য হতে পারতো। কিন্তু কোনো লোকটা কি ভালো?- অর্থাৎ ঠিক ভাল বলতে যা বোঝায় তা কি কেউ? লোকের চাউনি দেখলেই বোঝা যায়—সহস্র দিক থেকে সবাই তাকে গেলে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ জীবাণু

চলা। সে জানত পুরুষের স্পর্শ মেয়েদের দেহমনকে শুধু অপবিত্রই করে। এর বেশী কিছু দেবার ক্ষমতা ওদের নেই। তাই লিলি পালিত চায় পুরুষ স্পর্শহীন এক শুদ্ধ পবিত্র জীবন।

এই আদর্শকে আঁকড়ে ধরে তার যৌবনের অনেকখানি কেটে গেছে, বাকী দিনগুলোও হয়ত যেত এইভাবে। মানব-ধর্মকে অস্বীকার করে, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করে বেঁচে থাকত সে শুকনো পাতার মত একটি একটি করে বছর নিঃশব্দে খসে পড়ত তার জীবন থেকে। তারপর ভাব-বাহী প্রাণীর নিরুপায়তায় জীবনকে সে বইত আরও কতকাল।

কিন্তু কল্যাণীর মৃত্যু এলো একটা দমকা হাওয়ার মত, ব্রতচারিণীর কাঠিন্যের সযত্ন রক্ষিত বর্মখানা উড়িয়ে নিয়ে গেল একটি ঝাঁকুনি। কত সহজে শেষ হয়ে যায় সব হিসেব-নিকেশ। কত সামান্য উপায়ে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় একটি আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দে ভরা প্রাণকে। একটা মুহূর্ত কেবল লাগে এই দুয়ারটুকু পার হতে। তারপর? তারপর আর জানে না লিলি পালিত। কেউই বোধহয় জানে না।

তবে কেন এই মিথ্যা শুচিতার আদর্শকে বয়ে বেড়াবে লিলি পালিত? রূপ-রসবর্ণে ভরা এই পৃথিবীকে অস্বীকার করবে কিসের জোরে? নারী জীবনের সার্থকতার অধিকার থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করবে কোন অলীক লাভের আকাঙ্ক্ষায়?

মৃত্যুর ভয়ানক রূপ ভীত বিভ্রান্ত করেছে লিলি পালিতকে, আবার জীবনের উষ্ণ স্পর্শ অভয় দিয়ে তাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। বাস্তবের একটি আঘাত সমস্ত ভ্রান্তি সমস্ত অহমিকা দূর করে লিলি পালিতকে প্রতিষ্ঠিত করেছে প্রাণময়ী মানবীমূর্তিতে।

নরনারীর জীবনের এই সব দ্বন্দ্ব, সমস্যা, আদর্শগত বিরোধ নানাভাবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন বিমল মিত্র তাঁর রচনায়। কর্মসূত্রে জীবনে বহু বিচিত্র মানুষ আর বিচিত্রতার ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। সেগুলি অবিরত চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে তাঁকে।

বিগত দুই দশক ধরে দেশে বয়ে চলেছে এক পরিবর্তনের স্রোত। রাজনৈতিক সামাজিক সব ক্ষেত্রেই পুরনো কাঠামো আমূল বদলে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। সেই সঙ্গে তাল রেখে বদলাচ্ছে মানুষের মূল্যবোধ। কাল যা ছিল অন্যায় আজকের সমাজ তাকে ন্যায় বলে মেনে নিচ্ছে। কাল যা ছিল সুন্দর আজ তাকে কুৎসিত আখ্যা দিতে বাধছে না মানুষের।

এই পরিবর্তনশীল সমাজের পটভূমিতে নানা মানুষের চেহারা একটা স্পষ্ট রূপ নিয়েছে বিমল মিত্রের গল্পে। এই সব চরিত্রের কিছু দেখা আবার অনেক কিছু না দেখা। তবু লিখতে গিয়ে বাধা আসে নি। অন্তর্মুখী মনের তীব্র অনুভূতি আর অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে, শক্তি দিয়েছে সাহিত্য সৃষ্টির। শৈশবে যৌবনে পাওয়া অবহেলা, আর নিন্দা পথ করে দিয়েছে জীবনে প্রতিষ্ঠার। বাইরের আঘাতে বার বার ঝঙ্কার উঠছে হৃদয়ের তারে। মন্ত্রের মত মনের মধ্যে অবিরত গুণ গুণ করে ফিরেছে কটি কথা—আমি সফল হব, সার্থক হব। নিজের কর্মই দেবে আমার পরিচয়। আমাকে তোমরা তুচ্ছ করো আঘাত করো, প্রতিবাদ করব না। আমার দিনের সবটুকু সময় হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে আমি সাধনা করব আমার কর্মের, যার মধ্যে আমি আজীবন পেয়েছি দুর্লভ এক মুক্তির স্বাদ।

রেখা বড়ুয়া

বিমল মিত্র

মানুষের প্রাণহরণের জন্যে উদগ্রীব তেমনি ওরা ক্ষুধার্ত লোলুপ বাঘের মত রাস্তায়, পার্কে, ফুটপাথে সিনেমায় সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। ওরা ভয়ঙ্কর ওই পুরুষমাত্রেই ভয়ঙ্কর, চৌদ্দ বছরের কিশোর থেকে শুরু করে সত্তর বছরের বৃদ্ধ—কাউকে বিশ্বাস নেই। লিলি সেই ঘৃণায় ম্রিয়মাণ হয়ে থাকে সারাদিন। সতর্কও কম হয় না। তার তিরিশ বছরের নিষ্কলঙ্ক কুমারীত্বে ওরা দাগ লাগাবে সেই ভয়ে সতর্কতার সীমা থাকে না এক-এক সময়।

গলির ভেতর চলতে চলতে লিলি শ্বাপদ-সতর্ক কান পেতে শুনতে লাগলো। পেছনে পেছনে কেউ তাকে অনুসরণ করছে নাকি।

এমন হওয়া বিচিত্র নয় যে সামনের গলির ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে এসে তাকে অপমান করলো। একটা অবাঞ্ছিত চিঠি দেওয়াও তো অপমানের সামিল। কিম্বা উপযাচক হয়ে অকারণে কথা বলা। কোনও মানে হয় না যে কথার তবুও আগে আগে যেমন হতো; যখন লিলির বয়স ছিল কম—স্কুলের পথে যাতায়াতের সময় রিপোর্ট দিত ছেলেরা। প্রশ্রয় তাদের কোনও দিনই দেওয়া হয়নি। চরিত্রের গার্ডেন ঘিরে তাচ্ছিল্যে ঘৃণায় তাদের সব অপচেষ্টা ব্যর্থ করা হয়েছে। কিন্তু এখন প্রতিবাদ করা বুঝি আরো কঠিন। এখন জীবিকার জোয়ালে বাঁধা জীবন। কারণে, অকারণে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সারাদিন বাহির্জগতে থাকতে হয়। এড়াবার উপায় নেই। ওদের চোখের সামনে থেকেই ওদের অগ্রাহ্য করতে হবে।

সমস্ত শরীর একটা তীব্র যন্ত্রণায় হচ্ছে। কিন্তু হাতের যন্ত্রণাটা যেন তীব্রতর। সেই লোকটা যেখানে ধরে তাকে তুলতে যাচ্ছিল সেখানটায়। স্পর্ধা দেখুন না হয় পড়েই গেছে সে, বাস কন্ডাকটরদের অভদ্রতার দৌরাত্ম্যে কি পা ঠিক রেখে আর বাসে ওঠানামা যায়। কিন্তু তা বলে কোন সাহসে তার গায়ে হাত দিলে সেই লোকটা। তার সমস্ত শরীর যেন অশুচি হয়ে গেছে বলে মনে হলো।

ছত্রিশের একের-এ নম্বরে এসে লিলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়লো। ভেতরে স্টোভের আওয়াজ হচ্ছে। এ রাত্রে কল্যাণী আবার কি রান্না করতে বসল।

ছটফটে মেয়ে এই কল্যাণী। দমদাম করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা তার অভ্যেস। কিন্তু আজ যেন সে ধীর মন্থর পায়ে আসছে। এসে তাতাবিক আওয়াজে খিল খুলে দিলে।

ইলেকট্রিক আলোয় লিলির সর্বাঙ্গ দেখে কল্যাণী বললে—এ কি হয়েছে লিলিদি?

—পড়ে গেছলুম বাস থেকে নামতে গিয়ে।

—ইস—শিউরে উঠলো কল্যাণী—শাড়ি ছিঁড়ে গেছে—হাতের কনুইটা জখম হয়ে গেছে যে—

ওপরে উঠে কল্যাণী টিনচার আইওডিনের শিশি বার করলো। আয়নাতে নিজের চেহারা দেখে লিলি হাসলে। নেহাৎ রাত বলে তাই, নইলে দিনের বেলা হলে হয়ত লোকে পাগল ভাবত।

লিলি জিজ্ঞেস করলে—স্টোভের আওয়াজ শুনছিলাম, স্টোভ জেবলেছিলি কেন রে?

—এমনি জল গরম করতে।

—এত রাত্রে গরম জল কী হবে?

কোনও উত্তর দিলে না কল্যাণী। ছটফটে মেয়ে কল্যাণী—আজ যেন কেমন গম্ভীর গম্ভীর। ভাল করে কল্যাণীর মুখের দিকে চাইলে বটে, লিলিদির প্রখর দৃষ্টির সামনে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে সে। কল্যাণী যেন ভয় পেয়েছে। চোখের কোণে কালি জমেছে কাজলের মত।

ঢং ঢং করে দশটা বাজলো ঘড়িতে। কিন্তু ঘড়িটার গতিও যেন মন্থর হয়ে এসেছে। দম দেওয়া হয়েছে তো। ও কাজটার ভার কল্যাণীর ওপর।—কল্যাণী আজকে দম দিয়েছিলি ঘড়িতে?

পরদা সরিয়ে কল্যাণী এ ঘরে এসে বললো—ঘড়িতে দেবো কি, কী বাড় হয়েছে দেখবে এসো লিলিদি।

সত্যি, লিলি উঠে গিয়ে দেখলে দেওয়ালের ঘড়িটার গায়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড! একঝাঁক বোলতা এসে একটা চাক বেঁধেছে ঘড়ির গায়ে। ইলেকট্রিকের আলোয় দেখা যায় বোলতাগুলো শুঁড় বার করে মানুষ দুটিকে দেখছে তীক্ষ্ণ নজরে। মুহূর্তে হয়তো ছুটে এসে হুল বিঁধিয়ে দেবে। বোলতা, সাপ, মৌমাছি এদের বড় ভয় করে লিলির। প্রতি রোমকূপে এক অস্বস্তিকর শিহরণ অনুভব করলো সে।

কল্যাণী বললে—আজ থাক, কাল চেষ্টা করা যাবেখন—

লিলি পালিত এক কথায় কল্যাণীর গার্জেন।

দুবছর আগের ঘটনা। কল্যাণীর মা এসে নিজে কল্যাণীকে লিলির হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। পাড়াগেঁয়ে মানুষ ছেলে হয়নি, ওই কল্যাণীই চাকরি করে মাকে টাকা পাঠায়, মা দেশে থাকেন তাঁর ছোট আর দুটি মেয়েকে নিয়ে।

লিলি পালিতের হাত দুটি ধরে বলেছিলেন—তুমি ওর বড় বোনের মতো তুমি ওকে দেখো মা।

লিলি পালিতের চালচলন তাঁর ভালই লেগেছিল। লিলির বয়েস যথেষ্ট হয়েছে বটে আর কেমন ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন-যাপন। চুলে তেল না মাখলে নয়, তাই বুঝি একটু মাখা, তাও আবার গন্ধ তেল নয়। শোবার ঘরে খাটের মাথার দিকে শ্রীশ্রীমার ছবি—আর বাঁদিকের দেওয়ালে পরমহংসদেবের। গীতা পড়ে রোজ, ছাদের এক কোণে একটা টবে তুলসী গাছ পুঁতে দিয়েছে তার গোড়ায় নিয়ম করে জল ঢালে। সোমবার মাছ মাংস ছোঁয় না। কল্যাণীর মা এসব দেখে-শুনে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। যা হোক—সাহেবদের অফিসে চাকরি করুক আর যাই করুক, স্বেচ্ছাচার চলবে না এখানে।

তারপর আড়ালে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন—যদি তোমার কথা না শোনে মা, তো আমাকে পত্তর লিখে দিও, আমি পত্তর পেয়েই চলে আসবো—

সেই থেকে কল্যাণীর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবধি নেই লিলি পালিতের। প্রথম প্রথম অনবরত চোখে চোখে রাখতো। বেশী পয়সা দিত না। অফিসের মাইনেটা এনে কল্যাণী সমস্তটা দিতো লিলিদির হাতে। তারপর সেশে পাঠানো, হাতখরচ বাবদ সমস্ত হিসেব রাখতো লিলিদি।

কল্যাণীর বড় সিনেমা দেখবার শখ ছিলো প্রথম প্রথম। সিনেমার ওপর ভারি রাগ লিলি পালিতের। সিনেমা দেখতে শিয়ে একবার তাকে শেষ হবার আগে মাঝখানেই উঠে আসতে হয়েছিলো। কী জঘন্য সব ছবি! মাঝরাত্রে সেসব দৃশ্য মনে পড়লে লিলির গায়ে ঘাম ঝরে। মাঝে মাঝে বহুদিন আগে দেখা ছবির টুকরোগুলো চোখ বুজলেই চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। উঃ কী অশ্লীল সব আজকালকার ছবি। অথচ উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে কত বাপ-মা একসঙ্গে বসে ছবি দেখছে। সব বসাতলে গেলো।

ওইরকম একটা স্বপ্ন দেখে এক-একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায়। তখন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে বিছানা থেকে। উঠে আলো জ্বালে। আলো জেবলে শ্রীশ্রীমার ছবির দিকে মুখ করে হাতজোড় করে অসংখ্য প্রণাম করে। তারপর বাঁদিকের দেওয়ালের সামনে গিয়ে পরমহংসদেবের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আবার অসংখ্য প্রণাম করতে থাকে।

মনে মনে বলে—ঠাকুর আমার কোনও পাপ নেই আমার কোনও অপরাধ নেই—আমার মঙ্গল করো ঠাকুর—আমাকে শক্তি দাও সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করার শক্তি দাও ঠাকুর—সর্বদেবতাকে উদ্দেশ্য করে অসংখ্য প্রণাম সেরে বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে ঘাড়, কপালে ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে দেয়। তারপর ঘরে এসে পর্দা সরিয়ে ঘুমন্ত কল্যাণীর দিকে চেয়ে দেখে। ঘুমে অচৈতন্য কল্যাণী কাপড়টা সরে হাঁটুর ওপর উঠে গেছে। বালিশের তলায় একখানা আধখোলা বই-এর একাংশ দেখা যায়। উপন্যাস নাকি? সর্বনাশ? লুকিয়ে লুকিয়ে উপন্যাস পড়তে শুরু করেছে কল্যাণী! ছি ছি—

আস্তে আস্তে বালিশের তলা থেকে বইখানা টেনে নিলে লিলি পালিত। খোলা পাতাটার ওপর চোখ বুলোলো এক পলক। তারপর লজ্জায় ঘৃণায় বইটা সশব্দে বন্ধ করে ফেললে। যা ভেবেছে তাই। কদিন কল্যাণীর দিকে নজর দেওয়া হয়নি, আর তারই মধ্যে এত বেফাঁড়া হয়ে পড়েছে। ছোট টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে দেখলে। কল্যাণীকে লেখা কোনও অনাত্মীয় পুরুষের চিঠি হয়ত আবিষ্কার হয়ে যেতে পারে। আশ্চর্য কিছু নয়। আজকালকার সিনেমাদেখা নভেল পড়া মেয়ে। তার মা লিলি পালিতের হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। দায়িত্ব তার কি কিছু কম!

অনেক শিখিয়ে পড়িয়েও কল্যাণীকে ঠিক মনের মত করে গড়া গেলো না।

দুর্বলতা কার না থাকে। মানুষ ত প্রবৃত্তির দাস। সেই প্রবৃত্তিকে শাসন করতে হবে। লিলি কল্যাণীকে অনেকবার বলেছে—যখনই নিজেকে দুর্বল মনে হবে তখনই শ্রীশ্রীমার ছবির সামনে চোখ বুজে প্রার্থনা করবে, বলবে—আমাকে শক্তি দাও মা, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করবার শক্তি দাও মা—আর সঙ্গে কোথা থেকে সমস্ত দুর্বলতা চলে গেছে—জড়ত্ব কেটে গেছে—

তারপর নিজের গীতাখানা একদিন পড়তে দিয়েছিলো। যখন হাতে কোন কাজ নেই কোনও কিছু পড়তে ইচ্ছে করছে, তখন নভেল পড়ে সময় নষ্ট না করে গীতাখানা পড়। ইহজন্ম, পরজন্ম—জন্ম-জন্মান্তরের কাজ করা হবে।

সেদিন রাস্তায় কল্যাণীকে নিয়ে বেরোয়, চারিদিকে সতর্ক পাহারা দিতে হয় লিলি পালিতকে।

কল্যাণী ছটফটে মেয়ে। রাস্তায় যখন চলবে, তখন আশেপাশের লোকের দিকে নজর দেবে। অনেক সময় এমন দেখা গেছে কোনও অপরিচিত পুরুষ কল্যাণীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে, কল্যাণীও চেয়ে দেখছে তার দিকে। এ সমস্ত অসহ্য। এক ধমক দিয়েছে লিলি—চোখ নামা কল্যাণী চোখ নামা—স্থিরবুদ্ধি না করে কল্যাণী চোখ নীচু করেছে। আসলে মেয়েটা অবাধ্য নয়—শুধু একটু সংযমের অভাব। তবে আগের চেয়ে এখন অনেকটা শুধরে এসেছে। সিনেমা দেখা বন্ধ করে দিয়েছে—নভেল পড়া বন্ধ। মাঝে মাঝে গীতাখানা নিয়ে বসে। রাস্তায় চলতে চলতে এপাশে ওপাশে চায় না। সাজ-পোশাকেও এখন অনেকখানি শালীনতা এসেছে।

কিন্তু সম্প্রতি যেটা ভাল লাগছে না লিলির, সেটা হচ্ছে কল্যাণীর মন্থরতা। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নামে। আস্তে হাঁটে। কল্যাণী যেন ভয় পেয়েছে। তার চোখের কোণে কালি জমেছে কাজলের মত। লিলিদির প্রখর দৃষ্টির সামনে থেকে কল্যাণী তার মুখ সরিয়ে নেয়। কোথাও কোনও গ্রন্থি বেঁধেছে। তা না হলে কেন এই লজ্জা।

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। রাত দুটো।

যেন মন্থর জরা-স্থবির বার্ধক্যের পদ-ধ্বনি। যৌবনের দিন আর নেই। সেই বোলতার চাকটার কথা মনে পড়লো, কাল যে-কোন রকমে ওটা সরাতেই হবে। নইলে দম না দিলে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবে। কাঁটা ঘুরবে না। সময়ের চাকা অচল হয়ে যাবে যে!

সারা গায়ে টনটনে ব্যথা। লিলি পালিত বিছানা ছেড়ে উঠলো। উঠে আলো জ্বাললে। তারপর শ্রীশ্রীমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চোখ বুজে প্রার্থনা করলে। —আমাকে সমস্ত অকল্যাণ থেকে মুক্ত কর মা, শক্তি দাও ইন্দ্রিয় জয় করবার—

তারপর প্রণাম সেরে বাথরুমে যাবার জন্যে বারান্দার আলো জ্বাললে। বারান্দার শেষ প্রান্তে স্টোভটা রয়েছে। সাধারণত আজকাল তেলের অভাবে স্টোভের ব্যবহার হয় না। স্টোভের ওপর ছোট প্যান-এ কিছু বুঝি গরম করা হয়েছিলো। এখনও খানিকটা গায়ে লেগে রয়েছে। রংগীন কি একটা জলীয় পদার্থ। গন্ধটা মিশ্রী তেজী। কি এটা। কল্যাণী এটা কি করেছে! কিছু রান্না করেছে নাকি! তবে কি ওষুধ! কিসের ওষুধ?

কল্যাণী নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লিলি পালিতের সারা গায়েও আজ বেদনা। চুপচাপ এসে শুয়ে পড়লো সে। কল্যাণীর তরে কি অসুখ হল।

সেদিন সপ্রতিভ শিষ্টাচার সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। সচরাচর এমন হয় না। এত দুপুরে আর অবাধে হোয়াইটওয়ে না করাই ভালো। লিলি পালিত বাসার দিকে পা বাড়ালো।

কিন্তু সে দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সে।

ভেতরে এই অসময়ে আবার স্টোভের শব্দ হচ্ছে কেন?

কল্যাণী আজও অফিসে যায়নি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কল্যাণী এসে দরজার খিল খুলে দিল।

লিলি পালিত কল্যাণীর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিল। কল্যাণী স্টোভ বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে দিতে এসেছে। বোধ হয় রোজ সকাল, অসময়ে কারণে অকারণে তবে গরম জল দরকার হয় কেন?

কোন ভূমিকা না করে লিলি পালিত সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা করল—আজও অফিসে যাওনি?

তীব্র তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি স্থির করে সে কল্যাণীর সকাল ছুটিতে ঘরে ফিরে আসা কল্যাণী কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। লিলিদিদির অনুসন্ধান করতে বলেছে—এক মাসের ছুটি নিয়েছি—

—এক মাস? এক মাস ছুটি নিয়ে কি করবে?—বিছানার ওপর ছড়ানো বইগুলো গোছাতে লিলি পালিত। তাদের ওপর বেশ কিছুক্ষণ দৃষ্টি স্থির করে রাখলো নিজের। শাড়িটা ভাঁজ করে রাখলো। পাশেই ওর ব্যাগটা। ব্যাগের ভেতর একটা ছোট্ট রিভলভার আছে। সেটা বার করে হাতে নিল। ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল। কল্যাণী অফিস যাচ্ছে না আর কোনদিন যাবে না। নিজের কথায় যদি নিজে বিশ্বাস করতে পারে তবে মানুষ সাধারণত মিথ্যে বলে। কিন্তু লিলি পালিত তো কোন সমস্যাই নয়। ইচ্ছামত সাধারণ ভিন্ন কারণ খোঁজা যায়। কল্যাণীকে বলতে হবে কিছু। কিন্তু কল্যাণীকে নিয়ে এ কি ভিন্ন?

কল্যাণী এক পলক সুযোগ বুঝে ঘর থেকে পালিয়ে যাবে।

—এত ধরনে কিছু ছুটি নিয়ে কি করবে?

কল্যাণী আমতা আমতা করে কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না।

লিলি পালিত ঠোঁট কামড়ালো। কল্যাণীর চোখে চোখ রাখলো। তার চোখে একটা দৃষ্টি স্থির করে—একটা আগে স্টোভের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। আবার কোন কারণে কল্যাণী এবার মতো উনুন জ্বেলে চলে যাবে। উত্তর দিল না।

—স্টোভ জ্বেলেছিলে। কেন?—লিলি পালিতের গলার স্বর কঠিন।

কল্যাণী ভেবেছিল সাধারণ ভাবে এড়িয়ে যাবে। লিলি পালিত স্থির হয়ে বসে থাকবে। লিলি পালিত দাঁড়িয়ে রইলো বিমূঢ় হয়ে গেছে সে। মাথার ওপর দেওয়ালের গায়ে ঘড়িটাতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজল। অতি মন্থর হয়ে এসেছে সময়। ঘড়িটার দিকে চোখ রাখলো সে। কালবার চাকরী একদিকে কি সাধারণ বড় হয়েছে। এখনও দম দেওয়া হয়নি। সব শুনলে মনে হয়—অন্য রেকর্ডিং চলবেও না যেন ওটা!

হঠাৎ সেই মুহূর্তে কি হলো কে জানে ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো কল্যাণী।

লিলি পালিত দুই হাতে ধরে মুহূর্তের ধরে সন্তর্পণে কল্যাণীকে নইলে হয়তো পড়েই যেতো।

—কী হয়েছে বল তো। সামান্য কারণে কেন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছিলে—বল তো কী হয়েছে—কথাটা ধরে রইলো লিলি পালিত।

—সব শুনলে বল আমাকে কিছু লজ্জা করিনি—আরও বললো।

কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ছে কল্যাণী। কথা বলবে কেমন করে।

—কথা বল কল্যাণী। না বললে বুঝবো কেমন করে—কল্যাণীর চিবুকটা ধরে মানুষের অন্দরে উঁকি করবার চেষ্টা করলে।

আবার ভেঙে পড়লো কল্যাণী।

—আমাকে বাঁচাও লিলিদি সর্বনাশ হয়েছে বাঁচাও আমাকে লিলিদি—

কিছুটা যেন বুঝতে পারলো লিলি পালিত। কল্যাণীকে নিয়ে বসলো তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘড়িটার দিকে চাইলো। এ কী সর্বনাশ করেছে কল্যাণী। আমি মুহূর্তে ভাবার সময় নেই। আমার সমস্ত পরিকল্পনা কি ধুলোয় লুটোবে। এতদিনের সাধনা কি সব ব্যর্থ হবে না।

হঠাৎ কল্যাণী নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে। মুখ করে সাড়ি নিজের বিশৃঙ্খল বিন্যাস ঠিক করে নিতে লাগলো।

—কী হয়েছে বলবে তো বলো না কল্যাণী—লিলিদির কথায় কান্না ওর আরো বেড়ে গেল।

অনেকক্ষণ কল্যাণীর থামতে ওর সময় লাগল লিলি পালিত। কল্যাণীও শান্ত হয়ে এল একটু।

আর একটু সময় হলে সমস্যা সমাধান করা যাবে। এখন কল্যাণীর সুস্থ হওয়া সময়ের প্রয়োজন।

কল্যাণীকে ওই অবস্থায় রেখে লিলি পালিত উঠলো। তারপর সারা সকাল সকালে সেদ্ধ [illegible] এবং একটা রেকর্ড বাজাতে শুরু করল।

লিলি পালিত উঠলো। [illegible] কাছে, কাছে, নিচে। [illegible] নিচে। তারপর কল্যাণীর [illegible] বিছানার ওপর [illegible] দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে [illegible] সেদ্ধ করে [illegible] কল্যাণীর [illegible] ঘরে [illegible] কল্যাণী [illegible] ঘুমিয়ে [illegible] ঘুমের [illegible] ঘুমিয়ে [illegible] ঘুমের [illegible] ঘুমিয়ে [illegible] ঘুমের

একবার ডাকলে—কল্যাণী। কোথাও বেরুল না তো! সমস্ত অন্ধকার ঘরের আলোটা পর্যন্ত জ্বালেনি। একটা বেড়াল লিলি পালিতের পায়ের কাছ দিয়ে নিঃশব্দে ছুটে বেরিয়ে গেলো। বারান্দার জানলাদুটো খোলা তা দিয়ে অনেক দূরের রাস্তার গ্যাসের আলো দেখা যায়। পাশের বাড়ির উনুনে বুঝি ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। মুখে চোখে নাকে এসে লাগছে ধোঁয়ার গন্ধ। ডান হাত দিয়ে বারান্দার আলোটা জ্বাললে লিলি পালিত। তারপর ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। একটা টিকটিকি একেবারে মেঝের ওপর চরে বেড়াচ্ছিল লোক দেখে দেয়াল বেয়ে একেবারে কড়িকাঠের পাশে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

লিলি পালিত কল্যাণীর ঘরের দরজা ঠেললো ঠেলতেই ভেজানো দরজা খুলে গেছে। একটা কেমন ভিজে গন্ধ এল নাকে। বাঁ হাতে সুইচটা টিপতেই নিবালম্ব নিঃস্পন্দিত নিশ্চল হয়ে এল লিলি পালিত। ঠাণ্ডা অশরীরী দমকা বাতাস খোলা জানালা দিয়ে এসে মুখে চোখে হাত বুলিয়ে দিলে। কঠিন বায়ুভূত মৃত্যু নিরাবয়ব ভয়। স্থির কঠিন দৃষ্টি দিয়ে লিলি পালিত ওকে দেখছে। কল্যাণী যেদিকে শুয়ে আছে সেইদিকে খাটের একটা কোণে একটা দড়ির যোগসূত্র ঝুলছে আর তো কিছু নেই। জিভটা বেরিয়ে গেছে এক হাত। খোঁপাটা খুলে এলোমেলো হয়ে গেছে। পরণের শাড়িটা বিপর্যস্ত। ব্লাউজের বুকের কাছটায় নখগুলো বিঁধে আছে। আর চোখের তারা দুটো ঊর্ধ্বমুখী। লিলি একবার চেষ্টা করলে চোখ ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু চোখ তার আটকে গেছে অনেক চেষ্টা করেও চোখ ফেরানো হয় না।

আবদ্ধ দৃষ্টির সূত্রে লিলি পালিত যেন এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করলে। যেন তাকে টানছে ছটফট মেয়ে কল্যাণী হঠাৎ যেন যাদুমন্ত্রে নিথর হয়ে গেছে। বড় বীভৎস দৃশ্য। সেই অন্ধকার পটভূমিকায় মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে তার পা দুটো থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখের দৃষ্টির সামনে সমস্ত জগৎ অবলুপ্ত হয়ে গেছে—শুধু বাস্তব নিরাবয়ব মৃত্যু যেন আস্তে আস্তে তাকে গ্রাস করতে আসছে।

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি, ডি.জি.ও
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও সচিত্রে
চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মধুমন লাইব্রেরী • ৩৫এ সুরেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা ৭
মূল্য ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

নিদ্রাচ্ছন্নের মতন একবার সে আশে-পাশে চাইবার চেষ্টা করলে। ওপরে দেওয়ালের সামনে শ্রীশ্রীমার ছবির সামনে মাথা ঠেকাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কী হলো—হাত-পা যেন কে বেঁধে ফেলেছে। কল্যাণী যেন হঠাৎ নড়ছে তার মনে হলো। তার দিকে চেয়ে চোখের ইঙ্গিত করছে বলছে—এস এস না—

একবার আর্তনাদ করলে হয়তো নিস্তার হওয়া যেতো। কিন্তু গলা তার শুকিয়ে গেছে।

এবার কল্যাণী যেন দাঁড়িয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে লিলি পালিত এক লাফে ঘরের বাইরে এসেছে। সামনেই দেয়ালের গায়ে ঘড়িটা রয়েছে, সেদিকে চইতে নজর পড়লো তিনটে বেজে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। পেণ্ডুলাম নড়ছে না। সময় বন্ধ হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেছে চাকা। বন্ধ চলবে না।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে কল্যাণীর মুখটা স্মরণ করবার? চেষ্টা করলে। কী বীভৎস। কী ভয়ংকর। কী অবধারিত পরিণতি। এখনও বয়েস আছে—এখনও রক্তের তেজ আছে—

অন্ধকার হয়ে এসেছে গলিটা। ছুটে চললো লিলি পালিত। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না।

রাস্তায় চলতে চলতে বহুদিন আগেকার একটা কথা মনে পড়লো। পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা। সে পাঁচ বছর আগে তাকে একটা চিঠি লিখেছিলো। সে চিঠি সে সেদিন কৃপাভরে প্রত্যাখান করে-ছিলো কিন্তু চিঠিটার প্রত্যেকটি লাইন যেন আজও তার চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে। প্রতিটি লাইন অক্ষরে অক্ষরে তার মনে পড়ছে। ঠিকানাটাও তার মুখস্থ হয়ে গেছে! আজ এই সর্বনাশের শিখরে দাঁড়িয়ে সেই অতল অধঃপতনের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে পড়বে লিলি পালিত।

সময় বন্ধ হয়ে গেছে। অচল হয়ে গেছে চাকা। বন্ধ চলবে না—

কিন্তু এখনও সময় আছে—এখনও বয়েস আছে—এখনও রক্তের তেজ আছে—

তাড়াতাড়ি একটা চলতি বাসে উঠে পড়লো লিলি পালিত। এই বাসে চড়ে শহরের একেবারে উত্তর প্রান্তে যেতে হবে তাকে।

বাসের লেডিস সীটের এক কোণে বসে লিলি পালিতের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে উঠে হয়ে উঠলো। এমন কখনও হয় না। হয়তো না চলা পথ প্রদক্ষিণ করতে হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তবু বেশ লাগছে এই রোমাঞ্চ। সমস্ত শরীরে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে রেখার ঢেউ। বাসের এলোমেলো দোলানিতে লেগে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন নেশার ঝোঁকে খিলখিল করে হাসছে। চলন্ত বাসের মধ্যে বিপরীতমুখী হাওয়া এসে তার মুখে চোখে চুলে এলোপাতাড়ি চুম্বন করতে লাগলো। লিলি পালিতের মনে হল কেউ যেন তাকে আলিঙ্গনের মধ্যে আবদ্ধ করেছে—যত ছাড়াতে চায় সে কিছুতেই ছাড়বে না। অথচ তার ভালো লাগছে। আশ্চর্য! তার বেশ ভালো লাগছে।

শ্যামবাজারের শেষে বাস থেকে নেমে হাটতে হয়। কিন্তু তাতে দেরী হবে। একটা রিকসা করলে। পাঁচ বছর আগেকার চিঠি। তখন কেন গেলো না সে। এতদিন অনেক সময় বয়ে গেছে পায়ের তলায় অনেক তাজা খসে গেছে মাথার ওপর। এখন সে যদি চিনতে না পারে। যদি বাড়ী বদলে থাকে। যদি প্রত্যাখান করে।

নির্ধারিত ঠিকানায় এসে বিকসার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে লিলি পালিত বাড়ির সামনে একবার তাকালো দ্বিধাভরে। চারিদিকে অন্ধকার। জনবিরল শহরতলীর অখ্যাত পাড়া শহর এখন শান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। তারপর আশপাশে তাকিয়ে দেখলে। কেউ কোথাও তাকে লক্ষ্য করছে না। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে দরজার কড়া নাড়তে লাগলো।

ভেতরে যেন কী শব্দ হচ্ছে।

স্টোভ জ্বালাবার শব্দ।

এখানেও স্টোভ। সেই চেনা আওয়াজ। যেন এখানেও মৃত্যুর আয়োজন চলছে। অপমৃত্যুর আয়োজন। এখানে এত দূরে পালিয়ে এসেও যেন অপমৃত্যুকে এড়াতে পারেনি লিলি পালিত।

আর একবার কড়া নড়তেই কে যেন দরজা খুলে দিলে।

একজন চাকর গলা বাড়িয়ে দেখে নিয়েই বললে—মা দাই এসেছে—

—এসে গেছ মা? এসো এসো—একজন মহিলা এগিয়ে এলেন এবার।

আর বললেন—আমার মেয়ের বেলায় সরোজিনী এসেছিল সে তো এপাড়া থেকে এখন উঠে গেছে তা এসো মা দাঁড়িয়ে কেন ভেতরে এসো—

একজন বাধা মহিলা। কথা শুনে যেন এক-পা পেছিয়ে আসতে হলো।

লিলি পালিত কোন রকম বললে—হিরণবাবু আছেন?

হিরণতো ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে গেছে এই এলো বলে তার তোমাকে ডাক্তারবাবুই বুঝি খবর দিয়েছে? তা এসো মা ভেতরে চলে এসো জুতো ঐখানেই থাক ওষুধটা খেয়ে এখন একটু আরাম হয়েছে বোধহয় বোমা এখন একটু শান্ত হয়েছে আমি তো তাই হিরণকে বলছিলাম—আমরাও তিনটে ছেলে মানুষ করেছি মা তবে হিরণ বললে দাই থাকা ভালো তা আমি বললাম—আমাদের সেকেলে নার্সও ছিল না দাইও ছিল না তারপর ভেবে দেখলাম প্রথম পোয়াতি থাকা মা থাকা ওই যে পাশের ঘরে আমি জল গরম করছি তোমার যা চাই বলো।

লিলি পালিত ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল।

এক বেগিণী বিছানায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে। চোখ বন্ধ যন্ত্রণায় একটু

আগেও যেন ছটফট করেছে। মহিলা গলা নীচু করে বললেন—বিয়ের পর তিন বছর তো ছেলেপুলে হলো না আমি ভাবলুম আর বুঝি হবেও না কত পুজো—মানত করে যদিও বা হচ্ছে তো কত কষ্ট দেখ মা—এখন ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলে বাঁচি। কালীতলায় পুজো দেব মনের মত করে—

লিলি পালিত কী যে করবে বুঝতে পারলে না। এখন কি পালিয়ে যাবে সে? মৃত্যু সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তার হয়েছিল কিন্তু এ যে আরও ভয়ংকর। আরো বীভৎস।

লিলি পালিত বললে—একটু জল দেবেন আমাকে?

সেই তখন থেকে সমস্তক্ষণ উত্তেজনার মধ্যে কাটিয়ে যেন কণ্ঠ তার শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে খাঁ খাঁ করছে।

মহিলা বললেন—এই যে সাবান রয়েছে জল রয়েছে হাত ধুয়ে নও মা আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি মা; তোমরা পাশ করা মেয়ে হলে কি হবে আমরা সেকালের লোক ঠাকুমা দিদিমার কাছে সব শিখেছি আমরা সেকেলে..।

—না জল আমি খাবো।

হঠাৎ বাইরে যেন কার গলার আওয়াজ হলো।

মহিলা বললেন—ওই হিরণ এলো বোধহয় ডাক্তারবাবুকে নিয়ে—দেখি—

অনেকদিনের চেনা গলা। চিনতে কষ্ট হবার কথা নয়।

বাইরে হিরণ বলছে—আপনি ভেতরে যান আমি এখনি ওষুধটা আনছি—

বাইরে কোথাকার কে ন ডাক্তারবাবু! এ কোন অজ্ঞাত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে সে এসে পড়লো। দেয়ালের গায়ে একটা ছবি। হিরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে আর পাশে চেয়ারে বসে বধূবেশী হিরণের স্ত্রী। আজ'কর ঐ রোগিণী।

মহিলা বললেন—তোর নার্স এসে গেছে বাবা বোমার কাছে গিয়ে বসে'ছ—বৌমা ভালো আছে এখন—

হিরণের গলা—নার্স! নার্সকে কে আবার খবর দিলে? আমি তো...

—ও বাড়ির পরেশ বলেছিলুম সেই হয়ত তা দেবি করিস নে যেন আবার—

হিরণ বলল—এখন কেমন আছে মা?

—তুই কিছু ভাবিসনে বাবা ডাক্তারবাবু এসে গেছেন দুই এসে গেছ এখন ভগবানকে ডাকছি মা কালীকে মানত করছি—

কথাটা বলে হিরণ চলে গেল।

আর তারপরেই ডাক্তার ঢুকলো ঘরে। একেবারে অচেনা অজানা মুখ।

ঘরে ঢুকেই বললেন—ও আপনি এসে গেছেন ভালোই হয়েছে টেম্পারেচারটা নিয়েছেন?

টেম্পারেচার! ছোট টেবিলের ওপর থার্মোমিটার পড়েছিল একটা। সেটা নিয়ে লিলি পালিত বললে—আমি নিচ্ছি—

—আর—

ডাক্তার বললেন—আর রাত্তিরে বোধহয় আমাকে থাকতে হবে ডেলিভারী না হওয়া পর্যন্ত যদি অপারেশন করতে হয় আপনি খাওয়া-দাওয়া...

হঠাৎ রোগিনী যেন যন্ত্রণায় আবার ছটফট করে উঠলো। যেন বুকের ওপর পাথর চেপে কেউ পিষে ফেলছে তাকে। যেন যন্ত্রণা সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে শরীরের কূলে কূলে। শরীর ভেঙ্গে গুড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য সে দৃশ্য। অদ্ভুত সে অনুভূতি। লিলি পালিত মৃত্যু দেখেছে। এবার দেখছে জন্ম। যেন দুই-ই সমান। মৃত্যু ও জীবন যেন মহা-প্রাণের এপিঠ ওপিঠ। লিলি পালিতের মনে হলো—এ যেন হিরণের স্ত্রী নয় কল্যাণী। যেন কল্যাণীর মৃত্যু-বেদনা সে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছে। যে কল্যাণী নিজের কলঙ্ক মুছে ফেলতে চেয়েছিল সেই কলঙ্কই যেন আজ সগৌরবে ফুল হয়ে ফুটবে। পূর্বজন্মের আগে এ যেন সেই মৃত্যু—বেদনা যাকে মৃত্যু বলে চরম বলে জেনেছিল লিলি পালিত তা যেন একটু একটু করে মরছে। যন্ত্রণা সয়ে সয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এসো মৃত্যু এসো—অমৃতের দূত এসো। লিলি পালিতের জীবনে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।

ডাক্তার বললেন—ধরুন দস্তা একটু... তারপর শুরু হল সেই জীবন-মৃত্যুর শাশ্বত সংগ্রাম। মৃত্যু বড় না জীবন বড়। যেন জীবন-মৃত্যুর মধ্যে মহাদ্বন্দ্বের সমাধান হবে আজ। লিলি পালিত কান পেতে রইলো। অনেক দূর সুদূর থেকে যেন অমৃত-দূত এসেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে তার চেহারা। চির-পাবন মরই-সাধন অমৃত দূতের রূপ। কোনও ভূষণ নেই ভাষণ নেই। অপ্রিয় অকুণ্ঠ অপরূপ অকলঙ্ক। সমস্ত রাত্রি ধরে অমৃত দূতের তপস্যা করছে যেন লিলি পালিত। এক মহা তপস্যার আয়োজন আর আড়ম্বর চলেছে যেন এখানে। সমস্ত রাত ধরে যেন সেই সাধনাই সাধন করতে এসেছে।

শেষরাত্রের দিকে ডাক্তারের কণ্ঠায় আবার জীবন ফিরে এলো তার।

ওপাশে ঘরের বাইরে যেন শাঁখ বাজালেন শাশুড়ি।

ডাক্তারের সঙ্গেই লিলি পালিত সকাল বেলা বেরিয়ে এসেছিল।

হিরণ সামনে এসে বললে—আপনার—

হাতে তার কয়েকটা টাকা।

ডাক্তার টাকা নিলেন। বললেন—বিকেল বেলা একবার খবর দেবেন—

লিলি পালিত চলেই আসছিল নিঃশব্দে। হিরণ তাকেও টাকা দিতে গিয়ে কেমন থমকে দাঁড়ালো—

—তুমি...আপনি...

লিলি পালিত ডাক্তারের পেছনে পেছনে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। বলতে চেয়েছিল—আপনি আমায় বাঁচালেন—কিন্তু বলতে গিয়েও কথাটা তার গলায় আটকে এল। হিরণের মা তখনও শাঁখ বাজিয়ে চলেছেন। লিলি পালিতের মনে হলো—ও যেন শাঁখের শব্দ নয় শুধু ও তারও জীবনের মঙ্গলশঙ্খ।

হঠাৎ কাছে এসে পড়লেন উনি—বন্ধু নমস্কার করে বললে—আমার এই বন্ধুর সঙ্গে তোমায় আলাপ করিয়ে দিই মাসিমা—

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি এ কোন্ লিলি পালিত। কোন্ লিলি পালিতের গল্প লিখেছি আমি তখন! আমি তো সেদিন ঠিক চিনতে পারিনি কিম্বা সেই ঘটনার পর হতে এমনি আলাদা মানুষই হয়ে গেছেন। কে জানে!

হাত তুলে নমস্কার করলাম।

লিলি পালিত বললেন—তোমার এই বন্ধুটি খুব লাজুক বুঝি বাবা, কিন্তু আমার কাছে কোনও লজ্জা করতে পারবে না তোমরা মাসীমার কাছে আবার লজ্জা কিসের বিকেল বেলা যেও চা খেতে হবে ওখানে—কেমন?

বলে চলে গেলেন।

বন্ধু বললে—বিয়ে করার পর থেকেই এইরকম আলাদা মানুষ হয়ে গেছেন, এখন লিলি মাসিমা পুরুষমানুষদের ডেকে ডেকে আলাপ করেন, বাড়িতে নেমতন্ন করেন, গেলে আর ছাড়তে চান না—আশ্চর্য।

—আর এই ছেলেমেয়ে?

—বন্ধু বললে—ওরা বছর বছর হচ্ছে, স্বামীটিতো বুড়ো মানুষ, বুড়ো বয়সে এমন স্ত্রী পেয়ে বেঁচে গেছে মানুষটা।

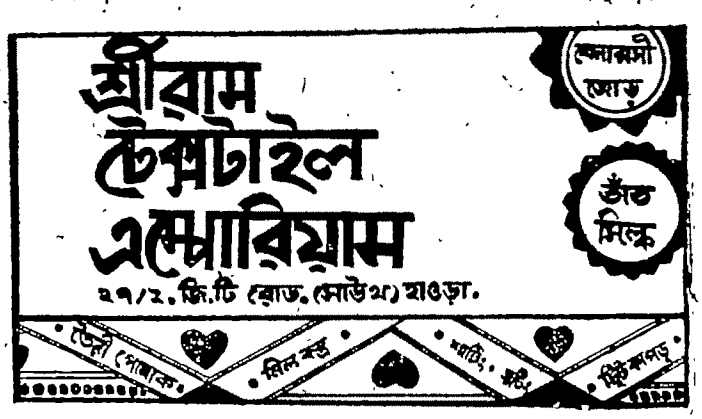

কথায় কথায়

আবহাওয়া

সারা বছর ধরে আবহাওয়া দপ্তর অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন জানিয়ে যায়, রাতের দিকে শীত বাড়বে বিকেলের দিকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অথবা কালবৈশাখী হতে পারে। পুজো-পার্বনের সময়, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলার মাহেন্দ্রক্ষণে কিংবা বাড়িতে বিয়ে-ব্যাপার জাতীয় কিছু থাকলে, নিদেন-পক্ষে দূরে কোথাও যদি যাওয়া থাকে সেই রকম সময়ে আমরা আবহাওয়া নিয়ে মাথা ঘামাই। অবশ্য এ ছাড়া কখনো কখনো খুব পচা গরমে, প্যানপ্যানে বৃষ্টির একঘেয়েমিতে পরিবর্তনের জন্যে আমরা আবহাওয়া বুলেটিনে উৎসাহী হই না তা নয়।

এ বিষয়ে আজ কিছুকাল ধরে আবহাওয়া দপ্তরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে জ্যোতিষীদের। হাওয়া অফিসের লোকেরা অনেক যন্ত্র দেখে, অনেক গোলমেলে অঙ্ক কষে হয়তো বললেন পশ্চিমে বৈশাখী সন্ধ্যাবেলায় কালবৈশাখীর সম্ভাবনা অথবা আগামী নভেম্বরে টেস্টম্যাচের সময় বৃষ্টি-পাত হবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো জ্যোতিষীরা বলছেন প্রথমটি হবে না এবং দ্বিতীয়টি হবে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্পর্কে আমার ধারণা খুব কম। কিন্তু একথাও সত্যি যে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনেক সময় মেলে না এবং এই না মেলার ব্যাপারটা একই স্বাভাবিক এবং নানা কারণে এতই অনিবার্য যে তা নিয়ে হাসাহাসি করার ব্যাপারটা পর্যন্ত বোকার রসিকতার পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

কোথায় কবে হিমালয়ের চূড়ায় কতলক্ষ কুলসী জল জমে বরফ হয়েছিলো তারপর আবার নদীপথে-ঝর্ণায় সেই বরফ জল হয়ে ধোঁয়া হয়ে আকাশে উঠেছে, আকাশের ঘাসুস্তরে, কোথায় কি চাপ এবং শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে, তাপমাত্রা এবং মেঘপুঞ্জের অবস্থান ইত্যাদি-ইত্যাদি চঞ্চল ও অনির্দিষ্ট সতত সঞ্চয়মান তথ্য থেকে পূর্বাভাস দেওয়ার মধ্যে যে জটিলতা ও অনিশ্চয়তা রয়েছে, তা কে অস্বীকার করবে?

কিন্তু জ্যোতিষবিজ্ঞানে এই পূর্বাভাস দেওয়া কি ভাবে সম্ভব? কলকাত্তার আকাশের কি কোনো করলেখা আছে? কিংবা কলকাতার জন্মলগ্নের কোনো ভাগ্যপত্রিকা? থাকলেই বা কি, আমার হাত দেখে কিংবা আমার রাশিনক্ষত্র দেখে আমার জন্ম-মৃত্যু বিদ্যা-বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ হয়তো নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু আমি বৃষ্টির মধ্যে কোনো ব্যস্ত বাস্তবে আটকে পড়বো কিনা অথবা হঠাৎ কালবৈশাখীর মধ্যে পড়ে যাবো কিনা তা কি বলে দেওয়া সম্ভব?

জানি, শাস্ত্রজ্ঞ লোক আমার এই মূর্খতায় মুচকি হাসছেন. কারণ মানুষের ভাগ্যগণনা আর আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী একভাবে হয় না। আমিও শুনেছি, তিথি-নক্ষত্রের যোগাযোগ বিবেচনা করে আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করা হয়। কিন্তু সব ব্যাখ্যার পরেও খটকা থেকে যায় একই তিথি-নক্ষত্রে, একই সময়ে পাশাপাশি দুটি জায়গায় দুই রকম আবহাওয়া হয় কি করে?

জ্ঞানি এরও ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু আমি কোনো ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে এখনে স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে নানা সময়ে জ্যোতিষী মহোদয়দের ভবিষ্যৎবাণীর দৃঢ়তায় এবং সফলতায় অনেকেই যথেষ্ট বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছে।

এ বিষয়ে আমি একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। কয়েক বছর আগে এক বর্ষায় আমি এক মফঃস্বল শহরে কিছুদিন ছিলাম। একটা হোটেলে থাকতাম জরুরি কাজ ছিলো। প্রতিদিন সকালে বেরোতাম। একদিন বেরোতে গিয়ে দেখি আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি আসছে; হোটেলের দরজায় থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। হোটেলের ম্যানেজার ভদ্রলোক দরজায় আমার পাশেই ছিলেন।। তিনি একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে আমাকে বললেন 'বেরিয়ে যান, বৃষ্টি হবে না, আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।' সত্যিই বেরিয়ে পড়লাম, এবং এক-ফোঁটা বৃষ্টি হলো না, আধঘন্টার মধ্যে আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। এর দুদিন পরে সেদিন আকাশে মেঘ-টেঘ নেই সকালে বেরোতে যাচ্ছি, হঠাৎ ম্যানেজার আমাকে ডেকে বললেন, 'সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবেন, ও-বেলায় দারুণ ঝড়-বৃষ্টি হবে।' সত্যিই সেদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড দুর্যোগ ভাগ্যিস আগে ফিরেছিলাম। আমি ম্যানেজার ভদ্রলোকের ওপর খুব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়লাম, কি ভাবে এই পূর্বাভাস সম্ভব? পিঁপড়ের যাতায়াত দেখে, পাখির ওড়া দেখে? নাকি ভদ্রলোকের কোনো অলৌকিক

শক্তি আছে? অথবা কোনো অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়?

বিশেষ কৌতূহল না দেখিয়ে সেদিন চলে আসবো বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নামবার পথে ভদ্রলোককে বললাম, 'যাই, আজ আবহাওয়া ভালোই থাকবে, কি বলেন?' ম্যানেজার বললেন, 'তা ঠিক বলতে পারবো না।' আমি অবাক হওয়ার আগেই তিনি আমাকে আরো অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আজ সকালবেলা রেডিয়োটা শোনা হয় নি।'

তারাপদ রায়

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস

কমলেশ চক্রবর্তী
জনসংযোগ অধিকর্তা

আমাদের প্রতিষ্ঠানের তৈরি অনেক জিনিসই রয়েছে। বোরোলীন, ভেপোলীন ফেমিলা ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ খুব ভালভাবেই আমাদের দ্রব্যকে গ্রহণ করেছে। তবে বোরোলীনকে মানুষ যেভাবে (পশ্চিমবঙ্গের তো বটেই পূর্বাঞ্চলেরও প্রায় প্রতিটি গৃহে) নিজের জীবনের সঙ্গে প্রায় এক করে ফেলেছে, সে নজীর খুব কমই দেখা যায়। শুধুমাত্র শহরের নয়, গ্রাম-গ্রামাঞ্চলেরও প্রায় প্রতিটি মানুষ আজ বোরোলীনের নামের সঙ্গে যুক্ত।'

সত্যি সম্মানের কথা। কথাগুলো শুনে জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালসের মধ্যবয়সী সুদর্শন জনসংযোগ প্রধান শ্রীকমলেশ চক্রবর্তীকে প্রশ্ন করলাম—গ্রামের ব্যাপারটা কি করে বুঝলেন?

চশমটা খুলে কমলেশবাবু বললেন—গ্রামাঞ্চলের এক-একটা এল-কার বিক্রির পরিসংখ্যান থেকেই বুঝেছি। গ্রামের দিকে বোরোলীনের বিক্রি এখনও সর্বাধিক। এ তো গেল এক হিসেব। অন্য হিসেব আমি ভালো বুঝেছি সেইসব জায়গায় ঘুরে ঘুরে। একটু বিস্তৃতিভাবে বলি, তাহলে জিনিসটা পরিষ্কার হবে। কিছু দিন আগে আমি কৃষ্ণনগর শহর থেকে এগিয়ে একটা গ্রামে গেছি। সেই গ্রামে মেলা চলছে তখন। গ্রামের মেলা মানে তো বুঝতেই পারছেন। আশ-পাশের জায়গাগুলো থেকেও বহুলোকের ভীড় হয়েছে। মেলায় নানা ফেস্টুন টাঙানো হয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকের চলাফেরা, গতিবিধি দেখছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, বেশ কিছু লোক দূরের একটা ফেস্টুনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলাবলি করছে—'ঐ দ্যাখো, বেরোলিন।' আশ্চর্য, তারা কিন্তু লেখাপড়াও জানে না, অথচ নানা জায়গায় আমাদের ফেস্টুনের রঙ দেখে দেখে কোনো শিক্ষিত লোকের কাছ থেকে হয়ত তার পরিচিতি জেনে নিয়ে মনের মধ্যে এমন একটা ধারণা করে ফেলেছে যে ঐ ধরণের ফেস্টুনের অর্থই হলো বোরোলীন এবং তা দেখে কি অনন্দ যে তাদের হয়, নিজের চোখে না দেখলে, বলে ঠিক বোঝানো যাবে না।

—প্রচারের ধারা হিসাবে কোন্ কোন্ জিনিস আপনি বেছে নেন?

(১) রেডিও এবং সংবাদপত্র, (২) ফিল্ম, স্কাইড (৩) ব্যানার বা ফেস্টুন ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে আপনাকে বলা দরকার, ইদানীং আমরা ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও আমাদের জিনিসের বিক্রির হারটা আরো বাড়াবার চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদি। আগে অন্যান্য রাজ্যে ভালভাবে সরবরাহ করার মতো উৎপাদন ক্ষমতা আমাদের ফ্যাকটরির ছিল না, এখন সেটা সম্ভব হয়েছে। তাই আমরা এখন ওসব জায়গাতে আরো ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারছি এবং তার বিক্রির জন্য আমরা নতুন-ভাবে প্রচার শুরু করছি।

—কি রকম? প্রশ্ন রাখি।

—ওখানে আমরা কোনো সংবাদপত্রে আমাদের বিজ্ঞাপন দিইনি। প্রচারের মাধ্যম হিসাবে আমরা মূলত বেছে নিয়েছি মহিলা-দের নানা পত্রপত্রিকা এবং ফিল্ম। সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে প্রচার চালাই না তার অন্যতম কারণ হলো, ওসব জায়গায় সংবাদপত্র গ্রামের দিকে তেমনটা যায় না। শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অথচ ঐখানে আমাদের জিনিস শহরগুলি এবং গ্রামের মানুষের কাছেই বেশি বিক্রি হয়।' এই সত্যি কথাটা আমাদের বলার দরকার আছে, পূর্বাঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্যান্য রাজ্যে শহরতলি এবং গ্রামের মানুষের কাছে বোরোলীন যতটা আদরণীয়, শহরের নাগরিকদের কাছে ততটা নয়।

—তা আপনার প্রচারের ফলাফল কিরকম হয়েছে?

শ্রীচক্রবর্তী বললেন—খুবই ভালো। ঐসব জায়গায় আমাদের বিক্রি ভালোই বেড়েছে, বাড়ছে। এদিক থেকে বিচার করতে গিয়ে একটা জিনিস আমি দেখেছি। পশ্চিম-বঙ্গে এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতেও উচ্চ-বিত্ত, মধ্যবিত্ত, গরীব সব শ্রেণীর মানুষই আমাদের ক্রেতা। অন্যান্য জায়গাগুলোতে মধ্যবিত্ত এবং গরীব আমাদের লক্ষ্মী। সাম-গ্রিকভাবে বোরোলীন ৫০ বছর ধরে ভারত-বর্ষে এমন একটা স্থান দখল করে নিয়েছে যে সকলেই আজ বোরোলীনকে ভালবাসেন।

—বিজ্ঞাপন কি আপনারা নিজেরাই করেন? নাকি কোনো এজেন্সীর মারফত?

—হ্যাঁ, পুরো পরিকল্পনা এবং ব্রিফিং আমি নিজেই করি। তবে কাজটা অন্য কোনো স্টুডিও থেকে করিয়ে নিতে হয়। আমাদের নিজস্ব কোনো স্টাফ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার শ্রীকমলেশ চক্রবর্তী ১৯৭২ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। আগে অধ্যাপনা করতেন এক কলেজে।

—জনসংযোগ রক্ষা করতে গিয়ে সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কখনও?

—না অভ্যন্তরীণভাবে তো কোনো সমস্যাই নেই। বাইরের দিক থেকেও কোনো সমস্যা এখনও পর্যন্ত দেখা দেয়নি।

—ভারতবর্ষের মতো দেশে প্রচার পদ্ধতিটা কি খুবই উন্নত ধরনের?

—মোটেই না। প্রচার করতে গিয়ে আমরা এখনও ছেলেমানুষি করি। আপনি শুনলে অবাক হবেন এরকম জিনিসও আমি দেখেছি প্রত্যন্ত গ্রাম বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন কোনো কোম্পানী যার ভাষা পাই না গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জন্য এরকম না—বোঝার তুল্য বিজ্ঞাপন দেওয়ায় কি লাভ? আসলে এতে বেশ হয় বিজ্ঞাপনের বেশি অংশটাই নষ্ট হয়ে যায়। প্রকৃত অর্থে আমি বলতে চাই একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে আমাদের বেশ ভালোভাবে ভাবা দরকার বিজ্ঞাপনটা কেথায় দেওয়া হবে কোন শ্রেণীর লোকদের ইত্যাদি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সেই অঞ্চলের লোকদের শিক্ষা তাদের ভাষা সংস্কৃতি এসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই বিজ্ঞাপন তৈরি করা দরকার।

এদেশে বিজ্ঞাপনের অনগ্রসরতার আর একটা মূল কারণ আমাদের নিরক্ষরতা। যে দেশে শতকরা পঁয়ত্রিশজন লোকই এখনও পর্যন্ত লেখাপড়ার অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠতে পারল না সে দেশে আবার প্রচার পদ্ধতি নিয়ে খুব বেশি কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে বলুন? বিদেশের সঙ্গে পাল্লায় আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে। অন্যান্য দেশে বিজ্ঞাপনের প্রভাব কত গভীর। আমরাও এদেশে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোককে আরো বেশি প্রভাবান্বিত করতে পারবো যখন এদেশের মানুষ আরো শিক্ষিত হবে বিজ্ঞাপনের সংস্পর্শে আসবে।

নমস্কার জানিয়ে আমি উঠে এলাম।

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কল্কে ফুলের মত নরম হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়ল মঞ্চের ওপর। করতালের ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চে এসে ঢুকলেন গুরু মাধবী আম্মা। পা দুটি তাঁর বিচিত্র আলপনা আঁকতে আঁকতে বৃত্তাকারে এগিয়ে চলেছে। গানের একটি পদ বেজে চলেছে গলায়। তালমের বেলে পায়ের ছন্দ কণ্ঠের সুরে নিখুঁত হারমোনি।

মাধবী আম্মার ঠিক পেছনে ছায়ার মত অনুসরণ করে আসছে প্রেমা মেনন। বিকশিত প্রেমা। গুরুর চরণ বিন্যাসের নির্ভুল অনুকরণ করে চলেছে সে। শুধু চরণ নয়, কর-চরণ-বিন্যাস। একটি শ্বেত কুমুদ যেন হওয়ার ছোঁয়ায় হিন্দোলিত হচ্ছে। আজ মঞ্চে প্রেমার প্রথম প্রবেশ রজনী। পদ্মনাভপুরম প্যালেসের দর্শক আসন পূর্ণ হয়ে গেছে বহু আগে। সহস্র চোখ আন্দোলিত ঢেউ-এর দেহে ভেঙ্গে পড়া সূর্যরশ্মির মত প্রেমার ওপর আছড়ে পড়ছে। কেরলার নৃত্যের আকাশে নতুন নক্ষত্র ফুটে উঠল। গুরু মাধবী আম্মা দর্শকদের সমনে আজ দিয়ে যাবেন সেই নবোদিত নক্ষত্রের পরিচয়।

মোহিনী-নর্তকী প্রেমার পিছনে নাচের অভিনয় করে এগিয়ে আসছে যন্ত্রসঙ্গীতের পুরো দলটি। কেউ বাজিয়ে চলেছে তিথি, কারু মুখের ছোঁয়ায় বেজে উঠছে মুখবীণা, কেউ বাজাচ্ছে এডাক্কা, কেউ বা বেল তুলছে টপ্‌পো মাদ্দলমে।

মঞ্চ পরিক্রমা শেষ করে দলটি নেমে এল নীচে। প্রদক্ষিণ করল সারা প্রেক্ষাগৃহ। তারপর এক সময় মঞ্চের ওপর ফিরে এল ওরা। মাধবী অম্মা যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে বসলেন অর্ধবৃত্তকারে। থেমে গেছে গান থেমে গেছে বাদ্য। স্তব্ধ নাটমন্দপম্। প্রেমা এগিয়ে এল ধীর পদক্ষেপে। নমিত দেহে দুই করে করল গুরুর চরণবন্দনা। আবার ফিরে গিয়ে দাঁড়াল মঞ্চের মাঝখানে।

বিপরীত মুখে জানু দুটি ভেঙে অর্ধমণ্ডলম্ মুদ্রায়, অর্ধ উপবেশনের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। বুকের ওপর ঈষৎ ব্যবধানে দুটি বাহু নমিত। মাথায় কেশগুচ্ছ বন্ধে চূড়াবন্ধ। রুপার চন্দ্রকৃতি নেটিচুটি ঘিরে রেখেছে সেই কেশকলাপ। তার নীচে সদ্য মল্লিকা বা মল্লাপুপ্পুর দোসুতি বেষ্টনী। কানে ঝুলছে কমলকের অকার কুড়ো কড়ুকন। মস্টুলের টানে চুলের সঙ্গে বাঁধা। নাকে হীরের মুকুতির ওপর আলো পড়ে ঝলসে উঠছে। নীচে দুলছে মুক্তার বিল্লাক। গলায় সোনার পুতলিমালা। হাতে হস্তকটকম্। মোহিনী আট্টমের মোহিনীমূর্তি।

সাদা পাড়বা পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রেমা। সোনালী জরির পাড় চরণ, কটি আর বক্ষোদেশে বেষ্টন করে হারিয়ে গেছে। মুখে মৃদু হাসির আভা। চোখের তারা স্থির। শুধু কালো ভ্রু দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

শরতের আকাশ হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে একখণ্ড সাদা মেঘ। বিনায় ঘিরে সোনার আলোর রেখা। গুরু মাধবী অম্মার কথা মনে পড়ছে প্রেমার। দেহ আর আত্মাকে যোগে যুক্ত করবে, তবেই তোমার দেহের শখায় শখায় ফুটে উঠবে আনন্দের ফুল।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তাই এতক্ষণ নিজের মধ্যে যোগযুক্ত হচ্ছিল প্রেমা।

এবার চোখের কোণে তাকিয়ে গুরু শিল্পীদের জানিয়ে দিল, সে প্রস্তুত। মুহূর্তে বেজে উঠল চোলকেট্টুর বোল। মাধবী অম্মার কণ্ঠে প্রার্থনার সুর। সঙ্গে সঙ্গে আন্দোলিত হতে লাগল প্রেমার প্রসাধিত দেহ। রুমঝুম্ বেজে উঠল পাদস্বরম্। বোলের বাঁধনে প্রেমা যেঁধে নিচ্ছে দেহখানি। হস্ত, চরণ, নয়ন সব কিছু যেন বোলের তলে তলে ধীর থেকে মধ্যলয়ে, মধ্য থেকে দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। হস্ত চরণ প্রক্ষেপে নয়ন বিভঙ্গে প্রেমা আজ মোহিনী।

দর্শকের আসনে বসে ইন্দ্র দেখছে প্রেমাকে। তার মনে হচ্ছে সমুদ্র মন্থন শুরু হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শৈবাল আর মহেরা সে দোলায় হিল্লোলিত।

এবার শুরু হয়েছে স্ববর্ণতি। সবগম সাধছেন মাধবী আম্মা, নাচছে প্রেমা। নাচতে নাচতে লয় ধরছে অবাধ রফতে। কটির ঊর্ধ্বে বাহু বক্ষ আন্দোলিত হচ্ছে।

ইন্দ্র দেখছে কেরালার জ্যোৎস্না ধোয়া আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে নারিকেল বৃক্ষের সারি, তারা রক্তের হাওয়ায় দুলছে। দীর্ঘ কাণ্ডের ওপর পত্রপুঞ্জ হাওয়ার বেগে ঘুরে ঘুরে দোল খাচ্ছে। প্রেমার দেহ সেই দোলায় দুলছে। তার মেরুদণ্ডটি হয়ে গেছে বৃক্ষের ঋজুকাণ্ড। তার ওপর স্থাপিত বক্ষস্তন যেন সে বৃক্ষের সুপুষ্ট ফল। আর আন্দোলিত বাহুযুগল বৃক্ষের দীর্ঘ পত্রযুক্ত শাখা।

স্বরমতি শেষ হলে শুরু হল বর্ণম্। গান চলেছে। বাসকসজ্জায় সজ্জিত রাধা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে প্রিয়তমের। চোখেমুখে প্রিয় মিলনের উৎকণ্ঠা ফুটিয়ে অভিনয় করে চলেছে প্রেমা। দর্শকের আসনে বসে প্রতিটি দর্শক ভুলে গেছে তাদের বয়স। মহাকালের নিষ্ঠুর ভ্রূভঙ্গকে যেন নিজের যৌবন দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছে প্রেমা। প্রতিটি দর্শককে সে যেন বলছে, মহাকালের বাঁধন মুক্ত হয়ে তুমি এস আমার অনন্ত প্রতীক্ষার পথ বেয়ে এসো। আমার সমস্ত যৌবনের দান আমি তোমার হাতে তুলে দেব বলে অধীর আগ্রহে পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি আমার সেই প্রার্থিত পুরুষ। তোমাকে ভবা স্পর্শ করতে পারবে না। তুমি অনন্ত যৌবনের প্রতিমূর্তি। আমি আমার যৌবন দিয়ে তোমাকে ছুঁয়ে দেব। গানের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বেল-পল্লবী অনুপল্লবী ছুঁয়ে ছুঁয়ে গানে বাজছে শুধু এসো এসো এসো কেন তুমি এখনও উদাসীন।

বর্ণম্-এর পরে স্টেজে নেমে এল ক্ষণিক অন্ধকার। আর্মানি এক ঝাঁক পারাবত যেন চঞ্চল পাখনার শব্দ তুলতে তুলতে উড়ে চলল আকাশে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যামেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

করতালি ধ্বনি যেন থামতেই চায় না।

অবর আলো লটিয়ে পড়ল মঞ্চে। এবার পদম্। সরগম নেই, বোল নেই। শুধু গানে গানে মনের আকুতি জানিয়ে চলা। সমস্ত দেহে ফুটিয়ে তোলা সেই অকুণ্ঠিত আক্ষেপ।

আলেই পায়ুদে কন্না
এন মনম্ আলেই পায়ুদে

উন্ আনন্দ মোহন বেনু গান মদিল...'। তোমার আনন্দ মোহন বেণু গানে আমার মনে ঢেউ উঠেছে কৃষ্ণ। আমি সেই তরঙ্গে ভেসে চলছি।

হে বিনোদ মুরলীধর আমি এত করে ডাকছি, তবু কেন তুমি নিশ্চল শিলার মত দাঁড়িয়ে আছ। সময় পার হয়ে যায় কেন বুঝছ না প্রিয়তম। আমার অসহ্য যন্ত্রণার উপশম, আমার মৃত্যু আজ তোমার সামান্য ইচ্ছার দোলায় দুলছে।

নীলাম্বরীরাগের করুণ মূর্ছনা প্যালেসের মসৃণ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়ছে শ্রোতাদের বুকের ওপর।

আবার অন্ধকার, আবার করতালি আবার আলোর ফুটে ওঠা। এবার প্রেমা যেন পেয়েছে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রেমাস্পদকে। তাই আনন্দকে সে আর ধরে রাখতে পারছে না। তিলানার সপ্ততলে সে নিজের খুশীকে নাচের মুদ্রায় প্রকাশ করে চলেছে। অর্থহীন গানের একটা সুর শুধু ভেসে আসছে। সমস্ত দেহ কি যেন প্রকাশের বেদনায় শিউরে মঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

বেদনা অপরূপভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে আনন্দে। সমস্ত দেহের কম্পনে, মুখ বিভঙ্গে কর-চরণ বিন্যাসে ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছে দেহের শাখা ভরা বসন্তের পর্যাপ্ত পুষ্প।

কখনো উমেশন মুদ্রায়, কখনো বা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে সারা মঞ্চে প্রদক্ষিণ করে চলেছে প্রেমা।

ইন্দ্রর চোখে ফুটে উঠছে একখানা অদ্ভুত ভালম। কেরালার ব্যাকওয়াটার বা কেরালের ঢেউতে ওঠা-নামার খেলা খেলতে খেলতে ভেসে চলেছে সেই সজ্জিত তরণী।

ধীরে ধীরে নেমে আসতে লাগল অন্ধকার আর সেই পাল তোলা তরণী তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের আলোড়িত সমুদ্রে।

আলোড়নে তখন পদ্মনাভপুরম্ প্যালেসও উদ্বেলিত। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে পড়েছেন দর্শক আসন ছেড়ে। তাঁরা চঞ্চল পায়ে চলেছেন গ্রীণ রুমের দিকে। প্রেমাকে অভিনন্দন জানতে হবে। শিল্পীকে নিতে হবে তার সৃষ্টির জন্যে সাধুবাদ। হয়তবা তরুণী প্রেমার জন্যে আরও বেশী কিছু।

ইন্দ্র কিন্তু দাঁড়াল না, কিংবা গ্রীণরুমের দিকে পা বাড়াল না। মঞ্চকে পেছনে রেখে উৎসুক জনতার ভেতর দিয়ে পথ করে বেরিয়ে এল বাইরে।

প্রিমিয়র প্রেসিডেন্টখানায় ঈষৎ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল সে। হাল্কা ধোঁয়া ছড়িয়ে দিতে লাগল বাতাসে। এতক্ষণ প্যালেস হলে যে ঘোরের ভেতর কাটছিল, সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অনেকখানি কেটে গেল।

ক্যালেন্ডারের গণনায় শীতের মাস, কিন্তু নামগন্ধ নেই শীতের। এ প্রদেশের নাকি এই দস্তুর। না শীত না গরম। অর্থাৎ চরম কিছু নেই এর আবহাওয়ায়, শুধু আবহাওয়ায় কেন মানুষের মনেও। ইন্দ্র কেরালায় আসার আগেই শুনেছিল এসব। নীল নীল আকাশ আর সমুদ্রের মত উদার আর উচ্ছল এ দেশের নারী-পুরুষের মন। দিগন্তজোড়া নারকেলের বন যেন চিরসবুজ আর সতেজ করে রেখেছে মলয়ালী এই মানুষগুলিকে। এদের এই অবাক পৃথিবীর ভেতর জেগে উঠেছে লোকসঙ্গীতের আশ্চর্য সব সুর, গড়ে উঠেছে কথাকলি, মোহিনী-আট্টম-ফৈকাট্টিকলি তুল্লাল ইত্যাদি নাচ।

ইন্দ্র প্যালেসের সামনের রাস্তার উল্টোদিকে রেখেছে গাড়ীটা। তাই নৃত্যাগারের বাইরের আলোর চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতা নেই এখানে। কয়েকটা নারকেল গাছের ছায়া পথের ওপর ভেসে আসা আলোটাকে অনেকখানি শুষে নিয়েছে। ছায়ার ধূসর চাদরটায় নিজেকে আড়াল করে রাখতে বেশ ভাল লাগছে ইন্দ্রর। আজ পূর্ণ চাঁদের মায়ায় আকাশটা কেমন যেন বিহ্বল।

দুটো সিগারেট পুড়িয়ে তৃতীয়টির প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে ইন্দ্র দেখল প্রেমা, সরিতা, মাধবী আম্মা নটমণ্ডপের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। সঙ্গে উদ্যোক্তাদের কয়েকজন। দর্শকেরা কিছু আগে উচ্চগ্রামে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গেছে। ইন্দ্র অনুভব করেছে তাদের উত্তাপ। অনুষ্ঠান তাদের নাড়া দিয়েছে, তারই সেচ্ছ্বাস প্রকাশ তাদের উচ্চ আলোচনায়। ছোট্ট দলটি এসে দাঁড়াল ইন্দ্রর সামনে। ইন্দ্র স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রেমই কথা বলল, আপনাকে একটু কষ্ট ফেলব মিঃ রায়। মাধবী আম্মাকে ওঁর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আপনি স্টেট চলে যাবেন হোটেলে। মিঃ পিল্লাই আমাকে লিফ্‌ট দেবেন। গাড়ী আজ আর দরকার নেই, সকালে পেলেই চলবে।

সরিতা প্রেমর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল আমি কিন্তু আমাদের কারেই ফিরছি দিদি। অল দ্য বেস্ট।

মিঃ পিল্লাই হেসে বললেন, ঘণ্টা-খানেকের ভেতর আমার প্রেস-ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাবে। তারপরই তোমার দিদিকে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসব। কাল জন্মভূমির পাতায় রিপোর্টটা বের করতে চাই।

ইন্দ্র শুধু শ্রোতা। সে নির্দেশটুকু জেনে নিয়েই গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে বসল। মাধবী আম্মা আগে ঢুকলেন। সরিতা তাঁর পাশে বসার আগে বলল মিঃ রায় আমি কিন্তু পেছনে বসছি।

ইন্দ্র বলল, ও সিয়োর।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী প্রেমাকে নিয়ে দমকা হাওয়ায় পাতার মত উড়ে চলে যেতেই ইন্দ্র তার গাড়ীতে স্টার্ট দিল। কিছুপথ দুখানা গাড়ী সমনে পেছনে চলল। হেড-লাইটের আলোগুলো হোসপাইপের জলের মত পথটকে যেন ধুয়ে চলেছিল। মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী এখন অন্য রাস্তা ধরেছে, ইন্দ্র যাবে ঠিক তার উল্টো পথে। ইন্দ্রের হেডলাইটের আলো বাঁকের মুখে মুহূর্তে ছুঁয়ে গেল পিল্লাই-এর অ্যামবাসেডারখানা। ফুলের বিনুনী গাঁথা প্রেমার মাথাটা কি মিঃ পিল্লাই-এর টিয়ারিং-এর কাছে অনেকখানি সরে এসেছে।

এক পলকের আলোর ঝলক। কোন একটা সত্যে কি এত তাড়াতাড়ি পৌঁছন যায়। ইন্দ্র ভাবনায় ছেদ ফেলে দিয়ে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য পথ ধরেছে। খানিক দূরে যাবার পরেই পড়ল একটা গ্রাম। চাঁদের আলোয় নারিকেলের দীর্ঘ ছায়া পড়েছে পথের ওপর। গাড়ীর জোরাল আলোয় মুছে মুছে যাচ্ছে। একটা ছোট সাঁকোর ওপর দিয়ে গাড়ীটা পার হয়ে এল। চাঁদনি রাতে একখানা উদাসী নৌকো ভেসে যাচ্ছে। ডানদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাদা বালির প্রান্তর। তার পরেই আলোছায়ার অন্ধকার ঢাকা গ্রাম।

হঠাৎ চোখে পড়ল সমুদ্র। নারিকেল-গাছের ফাঁকে ল্যান্ডস্কেপের মত আঁকা হয়ে আছে। এখন সমুদ্রের অদূরও কাছ দিয়ে যাচ্ছে গাড়ীটা। তিন চারটে জেলে নৌকো বালির ওপর কাৎ হয়ে আছে। এবার মাধবী আম্মার গ্রামে ঢুকল গাড়ী। একটা টালির ছাওয়া বাড়ীর সামনে গাড়ীটাকে এনে দাঁড় করাল ইন্দ্র। এখন থেকেই পদ্মনাভপুরম প্যালেসে যাবার সময় মাধবী আম্মাকে গাড়ীতে তুলে নিয়েছিল প্রেমা। তখন প্রেমাই

চালাচ্ছিল গাড়ী। পাশে বসেছিল সরিতা। পেছনে মাধবী আম্মার সঙ্গে বসেছিল ইন্দ্র।

মাধবী আম্মার মুখে ইন্দ্র এই অর্ধ-ঘণ্টার ভেতর একটিও কথা শোনেনি। নেমে

যাবার সময় মাধবী আম্মা সবিতাকে বললেন প্রেমাকে বোলো সে যেন প্রতিদিন রুটিন মাফিক নাচ অভ্যেস করে যায়। আজ যে সোনার লছমীমালা ও রাজবাহাদুরের হাত থেকে পেল, তার মর্যাদা যেন ও রাখতে পারে। এতদিন ও শুধু ছিল আমারই চোখের সমনে এখন ও সবার চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এবার হবে ওর আসল পরীক্ষা। অনেকের সামনে এসব কথা আমি ওকে বলতে পারিনি, আমার হয়ে তুমি ওকে বোলো।

সরিতা গাড়ী থেকে নেমেই দাঁড়িয়েছিল। সে মাধবী আম্মার হাঁটু ছুঁয়ে প্রণাম করল। মাধবী আম্মা যেন তল্লাদ হয়েই বলে চললেন, ও যে কত বড় গুণী তা ও নিজেই জানে না, শুধু মনের দুরন্ত চপলতাকে যদিও জয় করতে পারে তাহলে সবাইকে ছাড়িয়ে ও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। একটু থেমে আবার বললেন, অনেক দূরের পথ যেতে হবে আর তোমাদের আটকে রাখব না। সময় পেলেই চলে এসো দুবোনে।

মাধবী আম্মার কুতিলের সামনে এখন জ্বলছে একটি ভিলাকু। স্নিগ্ধ হলুদ একটু

খানি আলো প্রবেশ পথের অন্ধকারটুকু মুছে নিয়েছে।

মধবী আম্মা চলে গেলেন। ঘরের ভেতর ঢুকে ওয়াদিল বন্ধ না করা অব্দি তার দিকে চেয়ে রইল সরিতা।

গাড়ী এখন ফিরে চলেছে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ ধরে। সেই যে রাস্তার মোড়ে দুখনা গাড়ী আলাদা হয়ে গিয়েছিল, সেদিকেই চলেছে ইন্দ্রের গাড়ী। ওখানে গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা কোভালমের পথ।

মোড়ে এসে পৌঁছল গাড়ী। ইন্দ্র কোভালমের দিকেই বাঁক নিচ্ছিল, কিন্তু সরিতার কথায় ব্রেক করল।

সরিতা বলে উঠল, অচ্ছা খানিক দূরেই তো জন্মভূমির অফিস, প্রেমা আছে কিনা দেখে গেলে হয় না? থাকলে এই গাড়ীতেই ফিরতে পারত।

ইন্দ্র কথা বলল, যাওয়া যেতে পারে কিন্তু মিস মেনন গাড়ী নিয়ে আপনাকে গাড়ীতে রেখে সোজা হোটেলে চলে যেতে বললেন।

সরিতা বলল, তাহলে থাক, সোজা বাড়ীর দিকেই চলুন।

কোভালমের পথ ধরল গাড়ী। রাত এগারোটা বেজে গেছে। একটু আগে পথের ধারে চার্চের একটা ঘড়ি সময়টা ঘোষণা করেছিল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ চলেছে। গাঁ-এর মানুষ বড় একটা জেগে নেই। রাস্তার মোড়গুলোতে দোকানপাটে দু-একটা আলোর টুকরো বন্ধ কাঁপের ফোকর দিয়ে ঘর পালানো ছেলের মত ছিটকে বেরিয়ে আসছে। এখন পথের ওপর ছুটে চলা গাড়ীর আওয়াজটা কানে এসে বাজছে। গাঁ ছাড়িয়ে ফাঁকা প্রান্তরে এলেও বহুদূর জুড়ে সেই নারকেল গাছের সমারোহ। উঁচু থেকে নীচু হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ঝরছে। চাঁদের পাতলা দুধের মত আলোয় স্নান করছে গাছগুলো। একটা অলৌকিক জগত বলে মনে হয়। গাড়ী চলাতে চালাতে নারিকেলের সবুজ সমুদ্রে আলোর খেলা দেখছিল ইন্দ্র।

হঠাৎ গাড়ীটা একটা আওয়াজ তুলে থেমে গেল।

ইন্দ্র সীটে বসেই পরীক্ষা চালাল। ইঞ্জিন চালু আছে কিন্তু গাড়ী নড়ছে না। ফার্স্ট গীয়ার, সেকেণ্ড গীয়ারে দিয়েও যখন গাড়ীকে নড়ান গেল না তখন ইন্দ্রের মনে হল, ডিফারেন্সিয়াল বক্সের বিয়ার অ্যাকসিল কেটে গেছে। কিছু করার নেই।

এখন উপায়,—হতাশার একটা দীর্ঘশ্বাসের মত কথাটা বেরিয়ে এল ইন্দ্রের মুখ থেকে।

সরিতা বলল, কাছে পিঠে কোন গ্রাম তো চোখে পড়ছে না। তাছাড়া এত রাতে গ্রামের ভেতর মিলবেই বা কি। মানুষজনকে ঘুম থেকে তুলে যে বলব, চল গাড়ীখানাকে ঠেলে নিয়ে, তাও তো সম্ভব নয়।

ইন্দ্র বলল, অতএব।

সরিতা ভাবনার ভেতরও হেসে ফেলে বলল, আসুন, রাতটা গাড়ীর ভেতর বসেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

ইন্দ্র আর সরিতা দুজনে গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে পথের ধারে একটা নিঃসঙ্গ নারকেল গাছের তলায় এল।

সরিতা গাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়ে বলল বড্ড ঘুম পাচ্ছে, আমি কিন্তু ঘুমব।

ইন্দ্র একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঘুম আসবে আপনার?

সরিতা শব্দ করে নড়েচড়ে বসে বলল, কেন আসবে না বলুন?

ইন্দ্র বলল, এ সব তো অঙ্ক কষে বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র।

সরিতা সীটের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আপনার অনুমান ভুলও তো হতে পারে।

ইন্দ্র বলল, তা পারে।

সরিতা জলতরঙ্গের মত হেসে উঠে বলল, আমাকে কি সত্যি কুম্ভকর্ণ ঠাওরালেন নাকি? এ অবস্থায় কেউ ঘুমোতে পারে?

ইন্দ্রও হেসে উঠল। বলল, তাহলে আসুন দুজনেই জাগি।

সরিতা সামনের সীটের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, আপনি নিশ্চয় খুব ভাল গল্প বলতে পারেন।

ইন্দ্র সীটে বসে সিগারেট টানতে টানতে বলল কি করে জানলেন?

সরিতা বলল, বলুন না, আমার অনুমান ঠিক কিনা?

ইন্দ্র বলল, গল্প হয়ত দু-একটা জানি কিন্তু ভাল বলতে পারি কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সরিতাকে ছেলেমানুষীতে পেয়ে বসল বলুন না, বলুন না একটা।

ইন্দ্র বলল, এই পরিবেশে আপনার গল্প শুনতে ভাল লাগবে?

খু—উ—ব, সরিতার স্বরে উৎসাহের জোয়ার।

ইন্দ্র বলল, তাহলে আমার পছন্দ মত গল্প আপনাকে শুনতে হবে।

সরিতার মাথার বিনুনী দুলে উঠল, বাধ্য। যা শোনাবেন তাতেই রাজী।

ইন্দ্র অমনি বলল, ভূতের গল্প।

সরিতা বেশ খানিকটা দমে গেল। নিচু নিচু গলায় বলল ভূতের গল্প।

ইন্দ্র বলল, কেন ভূতটুতে বিশ্বাস নেই নাকি?

সরিতা কাতর গলায় বলল, ভয় দেখাবেন না দোহাই আপনার।

বলতে বলতে দরজা খুলে ঝুপ করে নেমে সামনের দরজাটা খুলে ঢুকে পড়ল। দরজা টেনে ভাল করে লক্ করে ইন্দ্রের কাছে সরে বসল।

ইন্দ্র ওর কাণ্ড দেখে বলল, পেছনের সীটের দুদিক কিন্তু লক্ করা হয়নি, সুযোগ পেলে ঢুকে পড়তে কতক্ষণ।

সরিতা ইন্দ্রের রসিকতাকে তলিয়ে দেখার দরকার মনে করল না। সীটের ওপর দিয়ে শরীরটাকে বেঁকিয়ে পেছনের একটা দরজা লক্ করে গ্লাসটা উঠিয়ে দিলে। পরে ইন্দ্রের কাঁধের পাশ দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ডান দিকের দরজা লক্ করে কাঁচটা তুলতে লাগল।

মেয়েটার যেন কোনদিকে খেয়ালই নেই। একটা চব্বিশ বছরের যুবকের গায়ে আঠারো বছরের মেয়ের ছোঁয়া লাগলে কি হতে পারে সে ব্যাপারে সরিতা মেনন যেন একেবারেই বেহুঁস।

ইন্দ্রের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে সরিতার ফুলে গাঁথা বিনুনী। মুখের বাঁ দিকটা ছুঁয়ে আছে ইন্দ্রের চুলে ভরা মাথা।

একটা উত্তেজক পানীয় এইমাত্র যেন ইন্দ্রের গলায় কেউ ঢেলে দিয়েছে। পানীয়ট ধীরে ধীরে সারা শরীরে অদ্ভুত এক ধরনের জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সরিতা কিন্তু কাজ শেষ করে চুপটি করে বসে পড়ল সীটে। ইন্দ্রকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলল, কি হল, বলুন।

ইন্দ্র নিজেকে সহজ করে নিল। ডানদিক জ্যোৎস্না ঝরা সহস্র সহস্র নারিকেল গাছের সারি। হাওয়ায় মাথাগুলো দুলছে। ঝিকমিক করছে চাঁদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা আলোগুলো। ঠিক যেন মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার কিরণঝরা সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে শত শত স্নানার্থী স্নান লীলায় মেতেছে।

ইন্দ্র বলতে লাগল, অনেক অনেকদিন আগে কেরালা ছিল পালের জাহাজে ভেসে আসা বিদেশীদের ব্যবসার বড় রকমের একটা ঘাঁটি। এখানকার গোলমরিচ, হাতির দাঁত, চন্দন কাঠ আরও বহু রকমের জিনিস বিদেশে বহু দামে বিক্রি হত। এসব কথা ইতিহাস থেকে ভূরি ভূরি মিলবে, কিন্তু একবার একখানা বোম্বেটে জাহাজ কিছু ভিন্ন রকমের জিনিস নিয়ে আরবের দিকে যাচ্ছিল।

সরিতা কৌতূহলী হয়ে উঠল, কি জিনিস?

ইন্দ্র বলল জাহাজের ওপরে ছিল বিদেশী কয়েকজন নাবিক, কিন্তু জাহাজের পাটাতনের তলায় ছিল ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনা কিছু সুন্দরী মেয়ে আর শ্রমিক পুরুষ। তাদের

প্রাণচঞ্চল্যে ভরপুর
নেসকাফে®
স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়
NESCAFE
instant coffee
নেসকাফে®
শতকরা ১০০ ভাগ খাঁটি কফি থেকে তৈরী
একমাত্র ইনস্ট্যান্ট কফি
বিশ্বের সর্বাধিক বিক্রীত কফি

নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আরবদেশে বিক্রির জন্যে। মেয়েগুলি বাদশাহী হারেমের জন্যে পছন্দ করে আনা, আর হতভাগ্য পুরুষগুলো বিক্রি হবে দাস হিসেবে আরবের বাজারে।

সেই মুহূর্তে সরিতা কণ্ঠ পেয়ে বলল, দারুণ দুঃখের ব্যাপার।

ইন্দ্র বলে চলল, আরব সাগরের বুকের ওপর দিয়ে দশ বিশখানা পাল উড়িয়ে জাহাজটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হিসেব মত বাতাস লেগেছিল পালে।

গরম কাল। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী হাওয়া জাহাজটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলছিল ওমান উপসাগরের দিকে। কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখায় ঢুকেই জাহাজটা কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কোনদিকেই আর নড়ে না। হাওয়ার ঠেলায় পাল ফুলে আছে, কিন্তু এক ইঞ্চিও নড়ছে না এত বড় জাহাজটা। দাঁড়িরা দাঁড়ের ঘা মেরে মেরে সমুদ্র ফেনা তুলে ফেলল, তবু নড়ল না জাহাজ।

সরিতার গলায় বিস্ময়, এ কি করে সম্ভব!

ইন্দ্র বলল, এইখানেই ভূতের ওপর বিশ্বাস করতে হয়। পুরোটাই ভৌতিক ব্যাপার।

সরিতা ইন্দ্রের গায়ের আরও কাছে ঘেঁষে এল। ভয়ে ভয়ে বলল, সত্যি বলছেন ভূত?

ইন্দ্র বলল, যদ্দুর শুনেছি, একটা দুষ্টু ইফ্রিদ ভূতের কাণ্ড এটা। সে অক্ষরেখা বরাবর সমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে লুপ্ত কোন একটা নগরীর গুপ্তধনের সন্ধান নিয়ে উঠে আসছিল, হঠাৎ তার মাথায় জাহাজের তলার ঠোকর লাগতেই সে বিগড়ে গেল। আর যায় কোথা, দুহাত দিয়ে জাহাজের দুটো প্রান্ত ধরে স্থির হয়ে রইল। তাকে নড়ায় কার সাধ্যি।

সরিতা বলল, তারপর?

ইন্দ্র বলল, তারপর আর কি, যেখানে মুশকিল সেখানেই আসান। ভূতের ওঝা ছিল ঐ জাহাজে। সে কেরালার কয়েক মন গোলমরিচ তিনদিন ধরে পুড়িয়ে ইফ্রিদটাকে বশ করল। তবু কি ভূতটা ছাড়তে চায় জাহাজ।

সরিতা দারুণ উত্তেজনায় ফেটে পড়ে বলল, তারপর ছাড়ল তো?

ইন্দ্র বলল, ছাড়ল, তবে একটা শর্তে।

সরিতা বলল, কি রকম? ভূত ওঝাকে বলল, তোমরা আমাদের বাদশার কাছে অনেক দামী জিনিস নিয়ে যাচ্ছ, তাই তোমাদের আর আটকে রাখব না। কিন্তু এই জাহাজে দুটো সুখী জীব আছে, তাদের জাহাজ থেকে ফেলে দিলেই আমি জাহাজ ছেড়ে দেব।

ওঝা এবার অনেক গুণেও বের করতে পারল না বন্দী মানুষগুলোর ভেতর সুখী কারা রয়েছে। ওরা সবাই ঘরবাড়ী প্রিয়জন ছেড়ে এসেছে, তাই ওদের কারো তো সুখী থাকার কথা নয়। বরং ওদের বুকের ভেতর সারা আরব সাগরের কান্না উথলে উঠছে।

ইফ্রিদ ভূতটা শেষে বলল, আমি একটা আলো জেবলে দেব, তাতে সবার দেহের ভেতর যে মনটা আছে, তা দেখা যাবে।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদ্র তোলপাড় করে একটা জলস্তম্ভ উঠল। জলস্তম্ভটা রাতের অন্ধকারেও স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে আশ্চর্য এক ধরণের আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল তার দেহ থেকে। সে আলো একসময় অতি তীব্র হয়ে উঠল, কিন্তু উত্তাপ ছিল না সে আলোতে, তাই রক্ষে।

সরিতা যেন কথা বলতে পারছিল না, তবু চাপা গলায় বলল, আশ্চর্য তো!

ইন্দ্র বলল, আশ্চর্য ঐ আলোতে নয়, আলোটা যেখানে জাহাজে গিয়ে পড়েছিল, সেইখানেই ছিল সত্যিকারের আশ্চর্য।

সরিতা বলল কি ছিল ওখানে?

ইন্দ্র বলল জাহাজের খোল থেকে সব মানুষগুলো তখন ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। আর মানুষগুলোর একটিকেও রক্তমাংসের বলে চেনা যাচ্ছিল না। সবাই স্বচ্ছ কাচের মানুষ হয়ে গিয়েছিল।

সরিতা সীমাহীন বিস্ময়ে বলল, কাচের মানুষ!

ইন্দ্র বলল, পুরোপুরি কাচের মানুষ, শুধু হৃৎপিণ্ডের কাছে প্রত্যেকের যেন কালো একটা ছায়া পড়েছিল।

সরিতা বলল, কালো ছায়া কেন?

ইন্দ্র বলল, শোক দুঃখের চিহ্ন ওটা। সকলই ফেলেআসা সংসারের কথা ভেবে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল তাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ভেতর দুটি সুখীকে ধরা গেল।

সরিতা কৌতূহলী হল কি রকম?

ইন্দ্র বলল—ওদের ভেতর দুটি হৃৎপিণ্ড ছিল রক্ত পদ্মের মত লাল। তাই দেখে ওদের চেনা গেল।

সরিতা বলল—ওরা সুখী ছিল কেন?

ইন্দ্র বলল—ওরা ভালবাসার ছোঁয়া পেয়েছিল। বাদশার মুল্লুকে গিয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে জেনেও ওরা দুজনে ভালবেসে ছিল দুজনকে।

তারপর ওদের খুঁজে বের করার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা নিভে গেল। জলস্তম্ভ মিলিয়ে গেল জলে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঢেউ-এর মাথায় ঝিলমিল করতে লাগল। সবাই তখন স্বাভাবিক চেহারা ফিরে পেয়েছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর একটুও দেরী করলে না। ওদের দুজনকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিল। ওরা কিন্তু জাহাজ থেকে পড়ে যাবার সময় কোন রকম আর্তনাদ করল না বরং বিচ্ছেদের হাত এড়াতে পারল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল।

ইন্দ্র হঠাৎ সরিতার দিকে ফিরে বলল—বলুন তো মেয়েটি কে থাকবে?

সরিতা বলল—কি জানি কিন্তু তার জন্যে দুঃখ না হয়ে বরং গর্ব হয়।

ইন্দ্র বলল—মেয়েটি কিন্তু কেরালাবাসী।

অবশ্য প্রশ্ন করল ইন্দ্র এখন বলুন তো দেখি ছেলেটি কে থাকবে?

সরিতা চমকে সচেতন হয়ে উঠেছে। সে মুখে বলল—জানি না। কিন্তু মন যে জানে তার প্রমাণ দিল ইন্দ্রের একখানা হাত ওর দুটো হাতের পাতায় চেপে ধরে।

দুজনে কেউ আর কোন কথা বলতে পারল না। জ্যোৎস্নার আলোকিক মোহ তখন আরও জীব হয়েছে। ওরা দুজন জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে নিক্ষিপ্ত দুটি প্রেমিকের মত ভেসে চলল।

(ক্রমশ

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সুশ্রুত অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৫৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—অবধেশকুমার ঘোষ-১৫৲ মহাজীবন—অবধেশকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী: ৩৫এ সূর্যসেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ ফোন: ৩৫-০৬৩৩

গোপাল ঘোষ

একালের চিত্রশিল্পী

চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে ভারতীয় চিত্রকলা মূলত প্রবাহিত হয়েছে দ্বৈত ধারায়। একদিকে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর গভীর প্রভাব। অন্যদিকে পাশ্চাত্য চিত্ররীতিকে আশ্রয় করে রূপবিন্যাসের প্রচেষ্টা। এই উভয় ধারাই সমান্তরাল সরলরেখার মত পাশাপাশি প্রসারিত ছিল তৎকালীন চিত্রচর্চাতে।

শিল্পী গোপাল ঘোষ এই দশকের এক উল্লেখনীয় নাম। শিল্পী জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে অবনীন্দ্র ভাবধারার কিঞ্চিৎ অনুপ্রাণিত হলেও উত্তরপর্বে তিনি নতুন পথে পদচারণা করেছেন। অবনীন্দ্রনাথ নন্দলাল ও তাঁদের অনুসারীদের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয় ছিল এক কোমল পেলব অথচ কুয়াশার মত আবছা পরিবেশ সৃষ্টি করা। রঙের প্রখর উজ্জ্বলতাকে মলিন ও ধূসর করার জন্যে অনেকে আবার জাপানী প্রথা ছবিকে 'ওয়াশ' করতেন। ফলে চিত্রে বিরাজ করত এক কুহেলীমাখা স্বপ্নময় রূপলোক।

গোপাল ঘোষ এই ধোঁয়াটে ধূসর পরিবেশের গন্ডী অতিক্রম করে তাঁর চিত্রে আনলেন এক রোদ ঝলমলে আলো। উজ্জ্বল রঙের সংস্পর্শে ছবিকে করে তুললেন অধিকতর উজ্জ্বল। গাঢ় হলুদ লাল এবং হালকা সবুজের ছোঁয়ার বচনা করলেন এক অপূর্ব মোহিনী মায়াজাল। উজ্জ্বল গাঢ় রঙের সঙ্গে হালকা শীতল রঙের সমাহারে গোপাল ঘোষের ছবি হয়ে উঠেছিল এক নতুন রঙ ও রূপের আস্বাদবাহী। সত্যি বলতে কি অমদানীকরা সেই ইউরোপীয় আধুনিকতার যুগে, ছন্দোময় রেখাধর্মী ও গতিময় তুলির টানে গোপাল ঘোষ যে শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন তা একান্তই তাঁর নিজস্ব ও নিজস্ব।

কয়েকদিন আগে আবার গিয়েছিলাম গোপালদার বাড়ীতে। ছবি দেখাচ্ছিলেন একের পর এক। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম বিস্তৃত জনপদে উজ্জ্বল এবং বিষণ্ণ প্রকৃতির কোলে, গ্রামের মানুষ আর পশুপাখীর ভিড়ে, সোনালী চিল, শিরীষের ডালপালা অঘ্রানের অস্পষ্ট প্রান্তর বুনো হাঁস শিশিরভেজা ঘাস, জলসিড়ি নদীর ধারে ধানক্ষেত কুয়াশায় ঢেকা পাহাড় নক্ষত্র ভরা আকাশ, সূর্যের আলোয় ঝিলমিল সবুজ বন ইত্যাদি ইত্যাদি, এমনি আরও কত স্নিগ্ধ অলো ছায়া স্বপ্ন দৃশ্য রূপলাভ করেছে রূপকারের ছাবির আয়ায়। এ চিত্র দেখে পৃথিবীকে মায়াবী নদীপারের দেশ বলে মনে হয়। কবি জীবনানন্দের ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যার আমার উপলব্ধিকে আরও কিছুটা সহজ সুন্দর করে বলতে পারি। বলতে পারি—

> ঝাউ হরিতকী শাল, নিস্তব্ধ সূর্যে
> পিয়াশাল পিয়াশাল আমলকী দেবদারু—
> বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ,
> জীবনের ফেনা;
> শাদা শাদা ছিট পায়রার ওড়াওড়ি
> জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়-রাত্রি;
> নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
> অতীত নিস্তব্ধতা।

প্রকৃতি-প্রেমিক কবি জীবনানন্দের আরও অনেক কবিতার লাইনের সঙ্গে গোপালদার চিত্রবর্ণনার অপূর্ব মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিংবা নিসর্গ প্রকৃতির লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কতিপয় ভাবনার সঙ্গে গোপালদার চিত্রময় কল্পনার আশ্চর্য সামঞ্জস্যও লক্ষ্য করা যায়। এঁদের লেখা পড়ে এবং শিল্পীর ছবি নিরীক্ষণ করে মনে হয় কোথায় যেন লেখার ভাষা এবং চিত্রের ভাব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই অর্থে গোপালদাকে প্রকৃতির শিল্পী বলে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। গ্রামে গঞ্জে ভরা ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যপূর্ণ নিসর্গ চিত্র শিল্পীর তুলিতে সজীব হয়ে উঠেছে পরম অন্তরঙ্গতায়। তাঁর ভাবঐশ্বর্যেও আছে এক নতুন আমেজ। নতুন আস্বাদ।

প্রকৃতির প্রতি শিল্পীর অকুণ্ঠ ভালবাসা জন্মলাভ করেছিল শিশুকাল থেকেই। বাবা ক্ষেত্রপাল ঘোষ ছিলেন তদানীন্তন সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে ১৯১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর শিল্পীর জন্ম হলেও ছেলেবেলা কেটেছে পাহাড়ে পাহাড়ে পিতার সঙ্গে কর্মস্থলে।

পাহাড়ের পর পাহাড়, কালিকা, ছোট সিমলা, তাবাদেবী মাবী হিলস ইত্যাদি পাহাড়ের আলো ছায়ায় কেটেছে কৈশোরের আবেগময় দিনগুলো। শীতকালে স্ফটিকের মত সাদা বরফে ঢেকে যেত পাহাড়ের গা। তারওপর সূর্যের আলো পড়ে ঝকমক করত রূপোর মত। গরমকালে বরফ গলে ঝর্ণা নামত। পাহাড়ের চারধারের গা বেয়ে সরু সুতোর মত অসংখ্য ঝর্ণা। সেই ঝর্ণার জলে বন্ধুদের সঙ্গে কতরকমের খেলা করেছেন গোপাল ঘোষ। ঝর্ণার শব্দ শুনতেন কান পেতে। দূরে পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই শব্দ কানে বাজত কোন সিমফনির মত। রাত্রে চাঁদের জ্যোৎস্নায় জানলা ফাঁক করে দেখতেন নির্জন পর্বত পথে জুলজুল নোয়ারের অনাগোনা। পায়ের ছাপ। বেপরোয়া হতে গিয়ে ছোটখাটো জানোয়ারের দু একটা কামড়ও খেয়েছেন।

পড়তেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। ভীষণ ডানপিটে ছিলেন। একদিন এক কান্ড বাঁধিয়ে বসলেন। সেটা ইংরেজ আমল। গান্ধীজী ও জওহরলালের ডাকে স্বদেশী আন্দোলনে সারা দেশ উত্তাল। সেই সময় গোপালদা ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু স্থির করলেন ক্রিশ্চিয়ান কলেজের মাথা থেকে 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে আনবেন। কেননা ইউনিয়ন জ্যাক হল ইংরেজদের দম্ভের প্রতীক। যাই হোক সবাইকার নিষেধ অমান্য করে তিনি ঐ 'ইউনিয়ন জ্যাক' নামিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। পুলিশ এল। গুলি চালাল। গোপালদার ডানহাতে লাগল একটা গুলি। রক্ত ঝরতে লাগল। ঐ অবস্থায় দৌড়ে পালালেন নিরাপদ আশ্রয়ে। সেই ইংরেজ আমলে এই ধরনের ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে যে কতটা সাহসের দরকার হত তা এ যুগে বসে কল্পনা করা যায় না।

বাঁ হাতের দাগ এখনও স্মৃতি হয়ে আছে হাতে।

গোপালদার প্রকৃতি-প্রেম তাঁর চেতনার অন্তঃস্থলে শিকড় গেড়েছিল ছেলেবেলা থেকেই ঐ পাহাড়ী নিসর্গ নির্জন পরিবেশে। প্রকৃতিকে দেখে ছবি আঁকার যে ইচ্ছে দানা বেঁধেছিল বুকে তা উৎসাহ লাভ করেছিল মূলত বাবার প্রেরণায়। তিনি জন রাসকিনের 'এলিমেন্টস অব ড্রইং' বইটি তুলে দিয়েছিলেন ছেলের হাতে।

অনেককাল পরের কথা। থাকেন এলাহাবাদের বাড়ীতে। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ে ১৯৩১ সালে চলে গেছেন জয়পুরে শিল্প শিক্ষার অভিপ্রায়ে। তখন জয়পুর মহারাজা স্কুল অফ আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন শৈলেন দে। পাঁচ বছরের কোর্স শেষ করে প্রথম হলেন চিত্রাঙ্কন বিভাগে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর হাত পেইন্টিং-এ পাকা ছিল। স্কেচও সুনাম হয়েছিল যথেষ্ট। কথা প্রসঙ্গে বলে রাখি—শিল্পীর মাত্র আঠার বছর বয়সের আঁকা ছবি অসামান্য সমাদর লাভ করেছিল বিদেশের মাটিতেও। স্বদেশী উকিলের ভাই বরোদা উকিল শিশুশিল্পীর আঁকা খান বার ছবি নিয়ে গিয়েছিলেন বিলেতে। কোন এক প্রদর্শনীর মাধ্যমে ছবিগুলো উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল এবং উচ্চদরে বিকিয়েওছিল।

১৯৩৫ সালে জয়পুর মহারাজা আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে শিল্পী নুড ও অ্যানাটমি শেখার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তখন মাদ্রাজ ছাড়া সারা ভারতবর্ষে এ শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ ছিল না। যেমন ইচ্ছে তেমন কাজ। মাদ্রাজ আর্ট কলেজে গিয়ে ভর্তি হলেন অ্যাডভান্স কোর্সে থার্ড ইয়ারে। প্রখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। এই সময় কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদারও ছিলেন এই কলেজের ছাত্র। সিনিয়ার হলেও কালীকিঙ্করবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল প্রগাঢ়। বাস্তবাধর্ট সমুদ্রসৈকত ও বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে দুজনে স্কেচ করতেন একসঙ্গে।

মাদ্রাজ চারু ও কারু বিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন গোপাল ঘোষ তাঞ্জোর মদুরা মহাবলীপুরম বিবেকানন্দ রক প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি, প্রতিকৃতি, শহর সমুদ্র ঐতিহাসিক সৌধ ও নানা স্থানের অসংখ্য স্কেচ করেন। কাজগুলি সেই সময়েই শিক্ষক ও ছাত্রসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। আর একটা ঘটনা। গোপাল ঘোষকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ স্নেহ করতেন। শিল্পীর আর্থিক দুরবস্থার কথা স্মরণ করে এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ মাদ্রাজ কলেজের অধ্যক্ষ এবং তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্র দেবীপ্রসাদকে এক চিঠি লেখেন। নীচে অপ্রকাশিত পত্রের অবতারণা করছি।

'চিরুকল শ্রীমান্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ বালাকাল থেকে চিনলেখায় এঁর বেশ হাত দেখে আমি এঁকে ভারতবর্ষের নানা স্থান ঘুরে নানা দৃশ্য ও মন্দিরাদির পেন্সিল ড্রইং করতে উপদেশ দিই।

সেই কথানুসারে ইনি মাদ্রাজ আর্ট স্কুল থেকে দেশ ভ্রমণে বাহির হয়ে অনেকগুলি রেখাচিত্রাদি করেছেন দেখে আনন্দিত হলাম।

এর ড্রইং-এ যেরূপ অসাধারণ হাত তাতে বিলাতে হলে যথেষ্ট আদর পেতেন এবং স্কুল থেকে ইনি ট্রাভেলিং স্কলারশিপ পাবার যোগ্য। কেননা তা ছাড়া স্থানে স্থানে ঘুরে বেড়িয়ে স্কেচ করা এঁর আর্থিক অবস্থার অসম্ভব। আমি সর্বান্তকরণে এর উন্নতি কামনা করি।

জোড়াসাঁকো শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কলিকাতা
২০৯-৩৭

মাদ্রাজ সরকারী আর্ট কলেজ থেকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পী কিছুকাল ছিলেন সেখানে। একদিন তিনি এডেহারের সমুদ্রতীরে বসে তন্ময় হয়ে ছবি আঁকছেন। সমুদ্রের ছবি। আকাশ আর সমুদ্রের ছবি। শিল্পীকে ঘিরে সৈকতের ধীবরেরা ভিড় করে ছবি আঁকা দেখছে নিঃশব্দে। অকস্মাৎ তারা গা ঠেলাঠেলি করে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে শিল্পীর ধ্যান ভঙ্গ হল। ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন তদানীন্তন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী রাজা গোপালাচারী এগিয়ে আসছেন তাঁরই দিকে। কাছে এগিয়ে এসে রাজাজী বললেন, খবর পেয়ে এলুম তোমার ছবি আঁকা দেখতে। ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছিল।

ইচ্ছে থাকলেও মাদ্রাজে বেশী দিন থাকা গেল না। বাবার অসুখের জরুরী তার পেয়ে ফিরে গেলেন এলাহাবাদে। বাবা একটু সামলে উঠতেই চলে এলেন কলকাতায়। অন্যান্য শিল্পীর মত গোপাল ঘোষের ভাগ্যেও নিদারুণ কষ্টের ব্যতিক্রম ঘটেনি। এক বছর স্কটিশ চার্চ কলেজে চিত্রকলা শিখিয়েছেন। শিবপুর বি ই কলেজেও শিক্ষকতা করেছেন এক বছর। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী ছবি বিক্রি ও নানারকম কমার্শিয়াল কাজ করতে হয়েছে অন্নের তাগিদে। অবশ্য পরে ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন হয়। চাকরী পেলেন সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টসে। সেখানে ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৫০ সালে সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত হন।

কলেজে ঢোকার আগে গোপালদার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেন। বিয়ের ব্যাপারটাও মনে রাখার মত। শিল্পী হিসেবে তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্গশ্রী কাগজে তাঁর আঁকা এবং লেখা দুই-ই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কবি বিষ্ণু দের স্নেহভাজন ছিলেন শিল্পী। একদিন কবি স্ত্রী প্রণতি দে কবিকে বললেন—গোপালবাবুর সঙ্গে রেণুর বিয়ে দিলে কেমন হয়! প্রণতি দে এবং রেণু দুজনেই কমলা গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কবির কথায় গোপালদা রাজী হলেন। ভাবী বর-কনে দুজনে দুজনকে দেখলেন। সাত দিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল।

১৯৬৩ সালে শিল্পী এক বিশেষ আমন্ত্রণে ইউরোপ ও আমেরিকা পরিক্রমা করে সেখানকার বহু সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন এবং সেজান ভ্যানগগ পিকাসো মতিস ও রেম ব্রান্টের ছবির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। স্বদেশীয় শিল্পীদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল বসুর চিত্রাবলী তাঁর একান্ত প্রিয়।

একালের অন্যতম শক্তিশালী চিত্রকর শ্রীগোপাল ঘোষ কয়েক বছর আগে কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তারপর থেকেই শিল্পী নিভৃত গুহকোণে শিল্প সাধনায় মগ্ন। গুহাভ্যন্তর থেকেও শিল্পীর মন পূর্বের মত সতত সৃজনশীল। কখনও বা অতীত স্মৃতি-চারণে নিজেকে হারিয়ে ফেলেন অবার কখনও বা বাগ কাশে বেরিয়ে পড়েন অজানার উদ্দেশ্যে। নিঃসঙ্গ প্রকৃতির কোলে বসে স্কেচ করেন একের পর এক কোনো ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত। শিল্পীর প্রকৃতি [illegible] যৌবনের এই

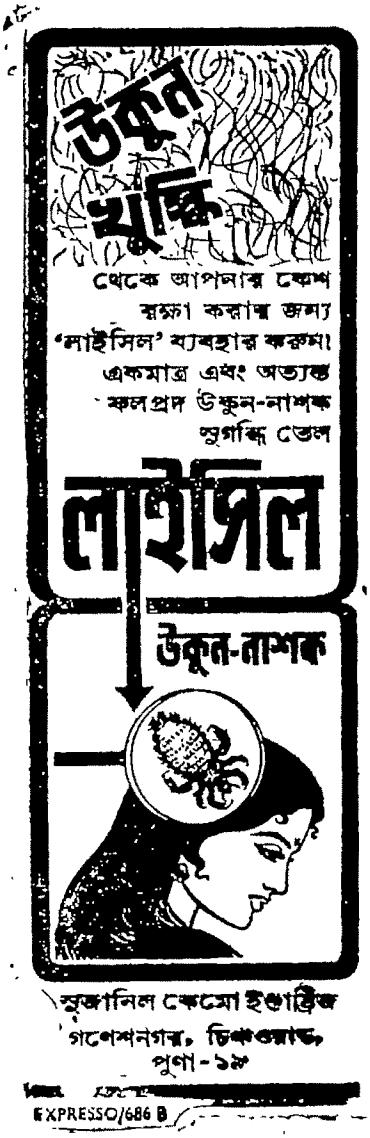

সময়ে দুঃসাহসিক নাবিকের মত সাইকেলে চড়ে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। আর স্কেচ করেছেন। সমগ্র জীবনে স্কেচ এঁকেছেন দশ হাজারেরও বেশী। পরিক্রমার প্রাক্কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পত্রে শিল্পীকে আশীর্বাদ করে লিখেছিলেন—

কল্যাণীয়েষু, শিল্পীর দৃষ্টি নিয়ে তুমি ভারত ভ্রমণে বের হচ্ছ। শিল্পীর চিত্তে তার উদ্দেশ্য সার্থক হোক এই কামনা।

ইতি ২রা ভাদ্র ১৩৪৪
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবিগুরুর আশীর্বাদ ব্যর্থ হয়নি। শিল্পীর চোখ দিয়ে যে সৌন্দর্যকে নিরীক্ষণ করেছেন শিল্পীর মন নিয়ে যে অনুভূতিকে জমা করেছেন অন্তরের অন্তঃস্থলে গোপাল ঘোষ তাকেই রঙে রসে রেখায় চিত্রিত করেছেন অপরিসীম আন্তরিকতায়। কয়েক মাস আগের আঁকা তাঁর চিত্রগুলোতেও একই প্রেরণা কাজ করেছে। আরলি অওয়ার্স সেলজিং সন অফ দি ইস্ট ফার্স্ট সন প্রভৃতি চিত্রে কুয়াশায় ঢাকা প্রভাত সূর্য শিশির সিক্ত গাছপালা ও পাখির ডানার ঘ্রাণ পাওয়া যায়। জীবনানন্দকে বিদগ্ধ সমালোকরা শুধু দৃশ্যকাব্য নয় ঘ্রাণেন্দ্রীয়ের কবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আমার মনে হয় শিল্পী হিসেবে গোপালদাও সমগোত্রীয়, কেননা তাঁর চিত্রকলাতেও ফুলের সৌরভ ও মাটির সোঁদা গন্ধ পাওয়া যায়। শুধু ফুল মাটি কেন প্রাণী ও প্রকৃতির আবরণ ছাড়িয়ে আছে তাঁর প্রায় অধিকাংশ শিল্পের শরীরে। নো হিউম্যান বিইং—একসেপ্ট স্কাই অ্যান্ড কটেজ এক জনবিরল নিঃসঙ্গ নিসর্গ পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঘুরে ফিরে শৈশবের দেখা সিমলার দৃশ্যাবলী শিল্পীর স্মৃতিতে নতুন করে ধরা দিয়েছে। তারাদেবী কালিকা ছেট সিমলা কেলু চিড় প্রভৃতি পাহাড়ী গাছ কিম্বা বেদ ঝলমলে তুষরাবৃত পাহাড় তাঁকে আকর্ষণ করত বলে এতদিন পরেও সেই সব ছবি ফুটিয়ে তুলছেন চিত্রফলকে অনলস নিষ্ঠায়। বর্ষা অ্যান্ড অ্যালফাবেট ব্যালেন্স ত্রিমু চিত্র তিনটি সাংগীতিক সুষমায় মণ্ডিত। এসব চিত্র রচনার প্রেরণা এসেছে বিটোফেনের সংগীত থেকে। ফুল পাখি গাছ সূর্য পাহাড় শিল্পীর প্রিয় ভাবনার অন্যতম। তাঁর বার্ড ও ফ্লাওয়ার সিরিজের কাজ অসাধারণ। বুদ্ধ পূজারিণী মর্তকন্যা চিত্রাবলীর কাজ রসিকের মণিকোঠায় অনেকদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। রঙের ব্যবহারেও গোপাল ঘোষের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। আগেই বলেছি কাজ করার ব্যাপারে অসাধারণ একনিষ্ঠ তিনি আজ চল্লিশোর্ধ্ব জলরঙের যাদুকর বলে। কোন কোন সময় জলরঙের সঙ্গে প্যাস্টেলের ছোঁয়ায় তিনি

স্কেচ : গোপাল ঘোষ

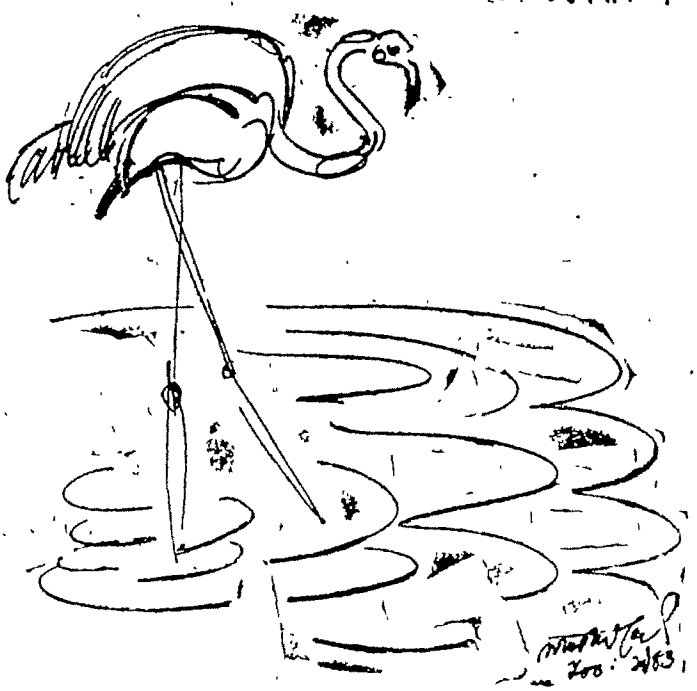

ছবির পরিবেশকে আরও নতুন কাব্য ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করে তোলেন।

শিল্পী এখন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে ভালবাসেন। রাত থাকতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন আকাশের কেচে রঙের খেলা দেখতে। সারাদিন ইচ্ছে অনুযায়ী বই পড়েন লেখেন ছবি আঁকেন। ছোটদের সঙ্গে খেলা করেন। অবাঞ্ছিত মনের মত লোক পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ভেজাল আড্ডা মারেন। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো রং রং খেলা খেলেই কাটিয়ে দিতে চান। তাই কৃত্রিম শহরে সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিল্পী স্বীয় গাহকোণে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন নিভৃত নিঃসঙ্গ জীবন। কারণ তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন—প্লেট এন্ডরি ম্যান বী দি মাস্টার অফ হিস ওন টাইম।

সম্প্রতি শারীরিক অসুস্থতার জন্যে গোপাল ঘোষ কাজ খুব কম করছেন। অধিকাংশ সময়েই প্রকৃতির মত নিস্তব্ধ। নির্বাক। অনেকের ধারণা গোপাল ঘোষ স্তিমিত হয়ে গেছেন কিন্তু আমার মনে হয় তিনি নতুন শৈলী সন্ধানে আত্মস্থ। নতুন রঙের অন্বেষণে আত্মমগ্ন। বং খোজার ব্যাপারে তাঁর অনেক কালের। সরকারী আর্ট কলেজে অধ্যাপনাকালে অভ্যন্তরের কলেজ প্রাঙ্গণে গাছ গাছড়ার মধ্যে গিয়ে কি যেন খুঁজতেন। একদিন ছাত্র-ছাত্রীরা জিজ্ঞেস করতে বললেন—রং খুঁজছি। বং। এ গল্প শোনা তাঁরই এক ছাত্রীর কাছ থেকে।

আজও বোধহয় শিল্পী সেইরকম কিছু নতুন রঙের সন্ধানে সতত চিন্তাশীল। তাই কখনও বা তাকিয়ে থাকেন নীল আকাশের দিকে। আবার কখনও দেখেন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। গোপালদাকে দেখে লিওনার্দো দা ভিনচির সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে হয়—যদি কোথাও যেতেই হয় ত যাও প্রকৃতির কাছে। তিনিই হোন তোমার অধীশ্বরী।

প্রশান্ত দী

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁতে সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

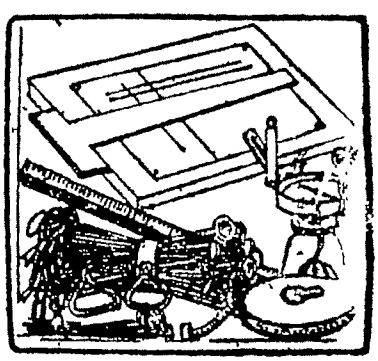

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাগজ
খাতা, লেজার, ক্যাশবই কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম: অরারপিন, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক : কার্মাচন প্রডাক্টস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

তখন স্কুলে পড়ি। হঠাৎই একদিন কানে এলো 'সূর্য ওঠার স্বপন নিয়ে কে জাগে?'

গানটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তেও জেগেছিলো ঐ একটি প্রশ্ন 'কে জাগে?' এমন প্রাণবন্ত গায়কী উচ্ছলতার জোয়ার আর সমৃদ্ধ কণ্ঠ নিয়ে সূর্য-ওঠার স্বপন দেখতে এল কে? শিল্পী নিজেই নন ত?

তখনই 'সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়' নামটির সঙ্গে পরিচয়।

তারপর কতদিন কেটে গেছে। কত শিল্পীর গানের ঢেউ মনের তটে আছড়ে পড়ে অগের স্মৃতিকে মুছিয়ে দিয়েছে। স্মৃতিরেখা যদি বা কিছু থেকেছে সেটা কখনও ক্ষীণ, কখনও বা গভীর। এই বহুর আনাগোনার ভীড়ে 'সূর্য ওঠার স্বপন জাগানোর শিল্পীও একদিন হারিয়ে গেলেন।

কিন্তু আমার মনের সীমিত আকাশ থেকে তিনি হারিয়ে গেলেও খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার সীমাহীন আকাশে অধফোটা তারা থেকে ধীরে ধীরে সূর্যের মতই বিরাট হয়ে আলোক বৃত্তে প্রসারিত হয়েছেন।

এ যুগের প্লে-ব্যাকের নায়িকা সন্ধ্যা মুখার্জির হিট সং-এর তালিকা দিতে গেলে আমার জন্য নির্দিষ্ট সবকটি পাতাই বোধ হয় ফুরিয়ে যাবে। তাই সে চেষ্টা থেকে বিরত হয়ে শিল্পীর মানসলোকের ছবি যথাসম্ভব স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি।

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আসার পরই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে নানা জলসায়, আধুনিক গানের আসরে অথবা উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্মেলনেও। ওঁর আধুনিক গানের মধ্যে যে গানটি আমার মন কেড়ে নিয়েছে সেটি কোনো পরিচিত হিট্ সং-এর পর্যায় পড়ে না। কোনো এক এলোমেলো সন্ধ্যায় আনমনে রেডিওর চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে নবধরা আঙুল যেন থমকে দাঁড়ালো একটি গানের প্রথম কলি কানে যেতেই আমার মনের [illegible]

আজকের যুগের গান সম্বন্ধে এইটুকুই বলতে পারি এ যুগ ধ্রুবতারার তপস্যার যুগ নয়। এ হলো হাউইয়ের যুগ। তবু আমরা চেয়ে থাকব ধ্রুবতারার তপস্যার যুগেরই প্রত্যাশায়। যত রাগ করেই আজ চলে যাক না—সে যুগকে ফিরে আসতেই হবে।

একালের গান

ধ'রে মন ভ গলল না'। গান শেষ হতেই মোহিত হোলো মেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। আর গানটি হোলো 'হেডমাস্টার' ছায়াছবির। রচয়িতা অপরাজেয় কথা-সাহিত্যিক অরদাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরকার সুধীন দাসগুপ্ত।

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের আসরে ওঁর গান শুনেছি ১৯৫৫ সাল থেকে। ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স, তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন আরও কয়েকটি আসরে। বেশীর ভাগ সময়ই মালকোষ অথবা চন্দ্রবোষ। তখন ওঁকে মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছাড়া কিছুই মনে হয়নি। আর খানিকটা পিঠ-চাপড়ানো গোছের তারিফ করেছি এই ভেবে যে, আধুনিক গানের আসরের অন্যতম আকর্ষণ হয়েও ইনি ক্লাসিক্যাল গানের চর্চা রেখেছেন ত! প্রসঙ্গত বলা যায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, মান বন্দ্য মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (এঁদের মধ্যে স্টাইলগত তফাৎ নিশ্চয় আছে) মার্গসঙ্গীতের ভিত্তি থাকলেও সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা এঁদের কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে আধুনিক গানেই। (যে কারণেই হোক না অমন কণ্ঠের অমন ঐশ্বর্যের অপচয় অমার্জনীয় অপরাধ। সেদিন একক আসরে ধনঞ্জয়বাবুর গান শুনতে শুনতে ভেবেছি আহা! ইনি যদি ধ্রুপদ গাইতেন)। কিন্তু আধুনিক গানের আসরের অন্যতমা নায়িকা হয়ে ক্লাসিকাল কনফারেন্সে বসেও পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গাইতে ঐ একটি শিল্পীকেই দেখলাম। সঙ্গীতের প্রতি এই নিষ্ঠাকে সাধুবাদ না জানিয়ে পারা যায়?

সন্ধ্যা মুখার্জি গ্রে-ব্যাকের প্রেমে সন্ত্রাজ্ঞী। আধুনিক গানে অসীম প্রতিভার দাবী এবং ক্লাসিকাল গানেরও চর্চা রাখেন। ওঁর সম্বন্ধে মোটামুটি এই ধারণা নিয়েই খুশী ছিলাম। অতীত সাদাসিদে মিষ্টি স্বভাবের মিশুকে মেয়ে। সবসময়ই হাসিখুশী। দেখলে ভালো লাগে। বস্‌। এই পর্যন্ত।

কিন্তু কয়েক বছর আগে (বোধহয় ১৯৭২) সন্ধ্যা মুখার্জির গান শুনে চমকে উঠতে হোলো। পরিণতির রূপ তা বিস্তার তানে। প্রতিটি সুরেলা শ্রোতার মনোভূমিতে যেন এক নতুন অনুভবের বেলা! মনে হোলো 'না মিউজিয়ার ক্লাসিকাল কনফারেন্সের দাম আর বুঝি এক চিহ্নিত করা যায় না। তেমনই স্বাধীন সন্ধ্যার আসরে ওর কণ্ঠে শুনলাম সেই অনুভূতি ঘনীভূতই। কিন্তু তান নতুন। আলাদা। সাথে তানের সার্থকতা ছিলো। এখন তার সে বিস্তারে ও আগাও ছিলো। এখন তার সে বিস্তারে সুরের স্বাধীনতা আর পরিমিতিবোধের সমন্বয়। বাংলাদেশের ক্লাসিকাল গানের আসরে সন্ধ্যা মুখার্জির সুরে তরুণ শ্রোতাদের শিল্পশিক্ষার্থীদের মনেই পড়ুন। তার গানের বিস্তারের বিকাশ লক্ষ্য করে বিস্ময়ে চোখ ওঁর অভিনব সৃষ্টি গায়কী সুরেলা কণ্ঠের ঝঙ্কারে আপনাকে প্রবল করে।

সেদিন সন্ধ্যা ও শ্যামল গুপ্তের কবিতার মত ছোট সুন্দর বাড়িতে বসে গল্প করতে করতে জানলাম—সন্ধ্যার পরিবারে গান এনেছেন উনিই। মা সু-কণ্ঠী এবং বাবা সংগীতানুরাগী হলেও গাইয়ে বলতে ও বাড়ীতে কেউ-ই ছিলেন না। এ বিষয়ে সন্ধ্যা মুখার্জিই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। সুরেলা কণ্ঠ নিয়েই ওঁর জন্ম।

'আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। বেশভূষা অথবা চালচলনের চটকের দিকে কোনো দিন লক্ষ্যই ছিলো না। ছোটবেলায় খুব রেকর্ড শুনতাম। যার গান ভালো লাগতো চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাইতাম। আমাদের বড়ীর চাবিদিকে গাছপালা খেলা-মেলা। ছোটবেলায় তাদের মধ্যে দাওয়ায় বসে গাইতাম 'ভালোবাসা এলো জীবনে' কিংবা 'যদি আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে'। কানন দেবী শৈল দেবী এঁদের গান কি যে ভালো লাগতো বলে বোঝাতে পারব না।

নিয়মানুযায়িক সংগীতশিক্ষা শুরু সন্তোষ বসুমল্লিকের কাছে। আমাদের পাড়াতেই তিনি থাকতেন। বড়দা (রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) আমায় ওঁর কাছে নিয়ে গেলেন। গানবাজনার ক্ষেত্র বড়দাই আমার কাণ্ডারী।'

'আপনার যে কোনো গান শুনলেই বোঝা যায় এ শুধু সহজাত প্রতিভা ও সংগীতপটুত্বজাত বস্তু নয়। এর মধ্যে সুর-প্রশ্ন সাধনার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। এ-শিক্ষার শুরুও কি সন্তোষবাবুর কাছেই?'

ঠিক ধরছেন। উনি আমায় সরগমের নানাবরম পাঠ্য সাধতে দিতেন। নানা সুর-সমন্বয় পকড়ও ওঁর কাছেই শেখা।'

'রাগসঙ্গীতের শিক্ষা ও-ও কি ওঁরই কাছে?'

'না। উনি কোনো রাগ শেখাননি। তবু জোর ভূপালী'। ওঁর কাছে শেখা কিছুদিন বাদেই যামিনী গাঙ্গুলীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। সত্যিকারের শিক্ষার অধ্যায় তাঁরই কাছে শুরু। স্কুলের পর ঢাকুরিয়া থেকে শ্যাম-বাজার যেতাম। ভেবে দেখুন নেহাতই ছোট্ট বয়সে সেটা কত পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার? কিন্তু গান শেখা হলে কত নতুন রাগ কত-রকমের তানের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে সেই চিন্তাটাই আমার কাছে এত রোমাঞ্চকর ছিল যে কষ্টকে কষ্ট বলে মনেই হোতো না। সারাদিন পড়াশোনা আর অনাসব কাজের মধ্যেও ঐ ২।৩টি ঘণ্টার জন্য সারা চিত্ত কেন উন্মুখ হয়ে থাকতো। তখন গুরুজীর বাড়ি পাঁচুর বাবা তানপুরোর কানগুলো সুচারু কিন্তু দিনে দিনে সুরের আকাশ স্পর্শ করেন সেই চিন্তাই তখন সারা মন অধিকার করে থাকতো। যামিনীবাবু আমাকে ঠিক নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করতেন। তার কত যত্ন করে যে তালিম দিতেন বলা বোঝাতে পারব না। দক্ষিণা-স্বরূপ আমি ওঁকে সংসামনই দিতে পারতুম। কিন্তু ওঁরা হলেন অতি-সাধব। অর্থোপার্জনই ওঁদের জীবনের ধ্রুব নয়। শিক্ষার্থীর কণ্ঠে একটি সরও যদি সুরে বসল—তাতেই মধ্যে ওঁরা জীবনের সার্থকতা খুঁজে পান।

'আমায় প্রথমে দিয়েছিলেন শংকরা। যথার্থ শিক্ষাগুরুর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই তিনি যেন বুঝেছিলেন উচ্চ পর্দার সরসাধনার পথেই আমার কণ্ঠ তার স্বচ্ছন্দ পরিণতিতে পৌঁছবে। একদিন অনেকক্ষণ একটি সাপট তান আমার কণ্ঠে শুনে ওঁর সে কি আনন্দ। ওঁর আনন্দই আমার ভবিষ্যতে শ্রেষ্ঠ প্রেরণার চক্ষু প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিল।'

—বাইরের জগতে আপনার শিল্পী-পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হোলো কেমন করে?

'অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সে কম্পিটিশন একবার ভাল ফল করায়। যামিনীবাবুর শিক্ষার আওতায় ওঠা-পড়া করেছি। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন গিরিজাবাবু (বিচারকমণ্ডলীর অন্যতম) আশীর্বাদ পাবার সৌভাগ্য হয়েছিলো। আমার গান ওঁর খুব ভালো লেগে গেল। তারপর নানা জায়গায় উনি আমার বিশ্বাসের প্রশংসা করে গুণীসমাজে অনেকেরই আমার নামটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন এইরকম কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি-যোগিতায় যে ফার্স্ট হোতো তাঁর বৎসরিক উৎসবে তাকে গাইতে দেওয়া হোতো। এই কনফারেন্স গাইবার সুযোগ নামটা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছিলো। তখন-কার কম্পিটিশনে যাঁরা জয়ী হতেন তাঁরা জানেন? গিরিজাবাবু, গানু ঘটক, শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়, এইরকম সব গুণী, সমিক্ষ ব্যক্তি। ওঁদের গান শোনবার সুযোগ পাওয়াটাও আমার মত সাধারণ শিল্পীর পক্ষে একটা মস্ত পুরস্কারের মতন।

'গীতশ্রী' পরীক্ষায় বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর দবীর খাঁ সাহেব। ঐ পরীক্ষাতেই ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব আমাকে 'মা' বলে ডেকে কত আদর করলেন। সেসব দিনের স্মৃতি মহামূল্য সম্পদের মতই স্মরণলোকে সঞ্চিত থাকবে। সংগীত-চরণের নিবিড় ছায়া নামে ঐ গভীর চোখে।

'গ্রে ব্যাকের জগত এসে পড়লেন কেমন করে?'

বেনারসী·সিল্ক
তাঁত ও
ফ্যান্সী শাড়ী
রূপসী
৬২, জি. টি. রোড, হাওড়া।

'সে এক মজার ব্যাপার। একবার অল ইন্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশনে গাইছি। হল-ভর্তি লোক। একাধারে খেয়াল ঠুংরী ভজন; গজল; প্রাচীন বাংলা গান; রবীন্দ্র-সংগীত এতগুলি বিষয়ের গান গাইতে হয়েছে তাদের সামনে। শুধু রবীন্দ্রসংগীতেই ছাড় হয়েছিলাম। আর সবেতেই ফাস্ট। প্রথম পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছিলাম অনেক স্পেশাল প্রাইজও। ছেলেমেয়ে মিশিয়ে পেলাম বেস্ট পুরস্কার ট্রফি। মনে আছে পুরস্কার বিতরণী সভায় অনুরূপা দেবী প্রাইজ দিচ্ছিলেন। সেই শীল্ড দেখে উনি ত হেসেই অস্থির। ঐটুকু মেয়ে অতবড় শীল্ড ধরবে কি করে? চারজন ভলান্টিয়ার সেই শীল্ড ধরলেন অনুরূপা দেবীর হাতের সঙ্গে। আর আমি সেই শীল্ড একটু ছুঁয়ে ছেড়ে দিলাম। সকলের প্রবল হাসির আওয়াজে যেন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বেজে উঠল আমার পুরস্কার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

তার আগে হরিদাস চট্টোপাধ্যায় যাঁদাকে (যাঁদাচাঁদ বড়াল) আমার কথা বলছিলেন। উনি এই পুরস্কার গ্রহণের গল্প শুনে বললেন 'এই এতগুলো প্রাইজ একটা মেয়ে নিয়ে গেলো? একদিন ওকে আমায় দেখাও।'

ওঁর বাড়ীতে বড়দার সঙ্গে যেতে খুশী হবে বললেন 'দেখা ত হোলো। এবার একদিন গান শোনাও বাবা।'

এরপরই একদিন নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওতে গেলাম। দেখলাম আলি হোসেন খাঁ সাহেব (ছেলো বাজাতেন) কেরামৎ খাঁ সাহেব সুজিতনাথ আরও অনেক গুণীকে। ওঁরা সব স্থায়ীদের স্টাফ আর্টিস্ট। তারপর পঙ্কজবাবুও এলেন দেখলাম। ওঁরা সবাই কাজে ব্যস্ত। আমি বসে বসে অস্থির হয়ে উঠলাম—কখন গান শোনাব?' ছোটবেলা থেকেই আমার ভয়ডর একেবারেই ছিলো না। যতবড় গুণীই হোন তাঁর সামনে গাইতে হলে মনটা যেন আনন্দে নেচে উঠতো। কেন জানি না মনে হোতো এঁদের আমার গান শোনানো দরকার।

কাজ শেষ হতে ওঁরা গান শুনলেন। গাইলাম খেয়াল ঠুংরী ভজন। ওঁদের এত ভালো লাগলো যে সঙ্গে সঙ্গেই 'অঞ্জনগড়' ছবির প্লে-ব্যাক গাইবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ঐ ছবিতেই আমার প্রথম প্লে-ব্যাক গান 'গুণ গুণ গুণ মোর গান'। শৈলেন বাবের সুরে। এরপর থেকে নিউ থিয়েটার্স বন্ধ না হওয়া অবধি আমি কোম্পানীর প্লে-ব্যাক সিংগার ছিলাম।

'রাইবাবুর ট্রেনিং-এর ধারাটা কেমন?'

'উনি প্রত্যেকটি মিউজিশিয়নকে অবাধ স্বাধীনতা দিতেন। নিজে একটি সুর রচনা করে সকলের মতামত নিতেন। আর খুব মেজাজী মানুষ ছিলেন। আজকের সুর কাল পছন্দ না হলে কাল আবার পাল্টে দিতেন। আবার তারপরদিন অন্যরকম। ফাইনাল টেকের আগে অবধি ওঁর সুরবদলের পালা চলতো। কি করে আরো ভালো হবে আরো নিখুঁত হবে এই ভাবনায় অস্থির। সুরে সিচুয়েশনের উপযোগী মুড এনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার দিকেই ওঁর খুব ঝোঁক ছিলো।

'এইরকমভাবে গেয়ে চলেছিলাম। হঠাৎ এম পি প্রোডাকসন্সে 'সুর্য ওঠার স্বপন নিয়ে কে জাগে' দারুণ হিট করলো। সুর শৈলেনবাবুর। কথা রবীন চ্যাটার্জির। অগ্রদূত পরিচালিত 'সমাপিকা' ছিলের গান। মনে আছে প্লে-ব্যাকের আগে নায়িকা সুনন্দাদি (সুনন্দা ব্যানার্জি) আমি তাঁর লিপ মুভমেন্টসের গান গাইছি শুনে হাসতে হাসতে বলেছিলেন 'তোমরা এটা কি করছ? চোদ্দ বছরের একটা ইম্যাচিওর মেয়েকে দিয়ে আমার গান গাওয়াচ্ছ? গলা মিলবে কেন?'

'গান শোনার পর কি বললেন?'

'সেটা আর শোনা হয়নি।' সলজ্জ হেসে শিল্পী বললেন।

'গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কি ফিল্ম সং-এর সূত্রেই যোগাযোগ?'

'ব্যাপকভাবে তাই। তবে বারো বছর বয়সেই আমার প্রথম নন-ফিল্ম গান রেকর্ড হয় গিরিন চক্রবর্তীর সুরে 'তোমার আকাশে ঝিলমিল করে চাঁদের আলো।' রেঙওতে ফার্স্ট অডিশনেই পাশ।"

"একটা কথা, প্লে-ব্যাকের ক্ষেত্রে আপনাকে যে আন্দাজে কাজ করতে হয় তাতে তো মনে হয় দিনের প্রায় সবটাই ওতে চলে যায়, এতটা সময় স্টুডিওতে দিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের চর্চা এবং সে গানেরও একটা স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা সম্ভব হোলো কেমন করে?'

'আপনি একেবারে আমার মনের কথাটিই শুধু বলেন নি আমার সমস্যাটাও সত্যি করে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।" শিল্পী খুশী হয়ে বলে চলেন 'আমার কত আজ্ঞই থাক সকালের বেওয়াজ কখনও বাদ দিই না। অবশ্য কর্তব্যের অঙ্গ হিসেবেই ওটা আমার প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে বাঁধা। যেদিন 'টেক' থাকে বেশীক্ষণ বেওয়াজ করি না, কারণ গলার আওয়াজটা ভারী হয়ে গেলে হাল্কা কাজগুলো আসে না।

গান যত না গেয়েছি তার চেয়ে বেশী শুনেছি জলসায়, কনফারেন্সে, রেকর্ডে, রেডিওতে। কানন দেবী আর শৈলজা দেবীর গানের কথা ত আগেই বলেছি, এছাড়া জ্ঞান গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, আব্দুল করিম খান, ফিরোজ খানের রেকর্ড ও সারাদিন ধরে বাজাতাম আর শুনতাম। আপনি তো জানেনই বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবের রেকর্ড অনেক দেরীতে বার হয়েছিলো? কারণ ওঁর আত্মপ্রকাশই ঘটেছে অনেক বেশী বয়সে। রেকর্ড হয় তারও অনেক পরে।'

"বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব নিশ্চয় আপনার সংগীতচেতনায় একটা বড রকমের ওলট্‌পালট্‌ এনে দিয়েছেন? নৈলে এত গায়কের গান শুনে তাঁকেই বা গুরুপদে বরণ করলেন কেন?"

কয়েকমুহূর্ত চুপ করে থেকে সন্ধ্যা দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বললেন, "আপনি শিল্পীদের কত ভালবাসেন তাই তাদের মনের খবরটা এমন করে আপনার কাছে ধরা পড়ে। সত্যি প্রথম যখন অল্ বেংগল মিউজিক কনফারেন্সে খাঁ সাহেবের 'কেদার' শুনলাম সারা মন যেন কেমন একটা আবিষ্টতায় স্তব্ধ হয়ে গেলো। মনে হোলো আমার এতদিনের সাধনায়, ধ্যানে, অকারণ চঞ্চলতায় যে সুর শুনতে চেয়েছি, যে অনুভবকে খুঁজে বেড়াচ্ছি তারই পূর্ণ রূপ দেখতে পেলাম এই মহাশিল্পীর গানে।"

জানেন বিলায়েৎ খাঁ সাহেব বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেবকে "এ যুগের তানসেন" বলেছেন? —তখনও উনি বেঁচেছিলেন।

বিলায়েৎ খাঁ সাহেব নিজে শিল্পী ত। সেইজন্যই বিরাটকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছেন। সত্যিই উনি এ-যুগের তানসেন।

ওঁর শিক্ষাধীনে এলেন কেমন করে?

উনি তখন জ্ঞানদার বাড়ী উঠতেন। সেইখানেই জ্ঞানদা একদিন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন। শেখবার আগে গান শোনাবার পালা। জীবনে কোথাও কারো সামনে গাইতে কখনও কোনো সংকোচবোধ করিনি, সেকথা ত আগেই বলেছি, কিন্তু খাঁ সাহেবের সামনে গাইতে গিয়ে যেন নিজের যত লজ্জা ভয় আমার মধ্যেই আশ্রয় নিলো। খাঁ সাহেব খুব স্নেহের সুরে বললেন "গাও বেটা। ডরো মত্। কুছ গলতি হোগা ত ম্যয় তো হ্যায়।"

গান শুনে খুব খুশী হলেন, তারপর দেখিয়ে দিলেন কোন্ পর্দায় কিভাবে জোর দিলে রাগের ভাবটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার আগেই মীরাদের গন্ডা বাঁধা হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৪৯ সাল থেকে আমি, মীরা, মুখোবরঞ্জী একসঙ্গে শিখতে সুরু করি, তারপর তাঁর স্নেহ, আদর, যত্ন ও ভালোবাসার যাদুতে গুরু কখন পিতাজী হয়ে উঠলেন জানতেই পারিনি। যেখানেই গেছি সকলের সঙ্গে কত আদর করে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছেন 'মেরা সাকরেদ।' কোথাও গাইলে সবার সামনে বলেছেন আচ্ছা হ্যায় বেটা। পরে আড়ালে ডেকে

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এন্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা, ও টিসট্ ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

ত্রুটি সংশোধন করে দিয়ে বলেছেন "বেটা ইস্‌কা অন্দরমে ই সব নেহি আতা।"

ঠিক হচ্ছে না বলে কখনও যদি বিষণ্ণ হয়ে পড়তাম মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতেন কোই বাত নেহি। তারপর বোঝাতেন "এত ঘাবড়ালে কি চলে?" এ ধরণার ঢেঙে তোমার ঘরে তো কেউ গায়কন, এর পদ্ধতি চলন-বলন সবই আলাদা। নতুন মানুষ কি একদিনেই আপনার হয়? তাকে আস্তে আস্তে চিনতে হয়, বুঝতে হব। অতবড় মানুষটার অন্তর যে কত স্নেহশীল ও কোমল ছিলো, ও'র কাছে না এলে বোঝা যেতো না।

আর কি উদার ও'র শিল্পীমন। ক্লাসিক্যাল গানের শিল্পী হলেও লাইট গানকে কখনও নাক-উঁচু দৃষ্টিতে দেখতেন না। বলতেন লাইট গান বড় 'নাজুক'। ঠিকসে সুর লাগালে এক নিমেষে মন কেড়ে নিতে পারে। কোন তান দ্রুতলয়ে গাইবার জন্য ব্যস্ত হলে বলতেন, ক্রিকেটের ফাস্ট বল কেউ দেখতে পায় না, এমনিই তার গতি। কিন্তু খেলোয়াড়দের প্র্যাকটিশ করতে হয় আস্তে আস্তে। লক্ষ্য রাখতে হয় কোন কবে যথানির্দিষ্ট গতিপথে বলটি চলে। গানের ক্ষেত্রেও ঐ একই লীলা, পরস্তু ঠারোমে কর। স্পীড আপনে আ যায়েগা।

আর কি অপূর্ব ও'র ভাবকে মনের ধ্যানছবি। 'কামাদ' শেখাতে শেখাতে বলেছিলেন, বেটা এ যাগ নয় রাগিণী। নয়, মধুর ভাবের খুরসুরত এক আওরৎ। তার

১টা.৫০প. বাঁচান!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

২টি ৪০০ গ্রা. প্যাক একসঙ্গে কিনে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি। চনমনে তাজাকরা শক্তিদায়ক। কয়েক মিনিটেই আপনার ক্লান্তি দূর করে দেয়। একসঙ্গে ২ টি ৪০০ গ্রা. প্যাক কিনে ১ টা. ৫০ প. বাঁচান, আজই।

তাড়াতাড়ি করুন! এ সুযোগ পাবেন ৩০শে জুন ১৯৭৬ বা স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত! ভেবে স্বাধ্যভামূলক নয়।

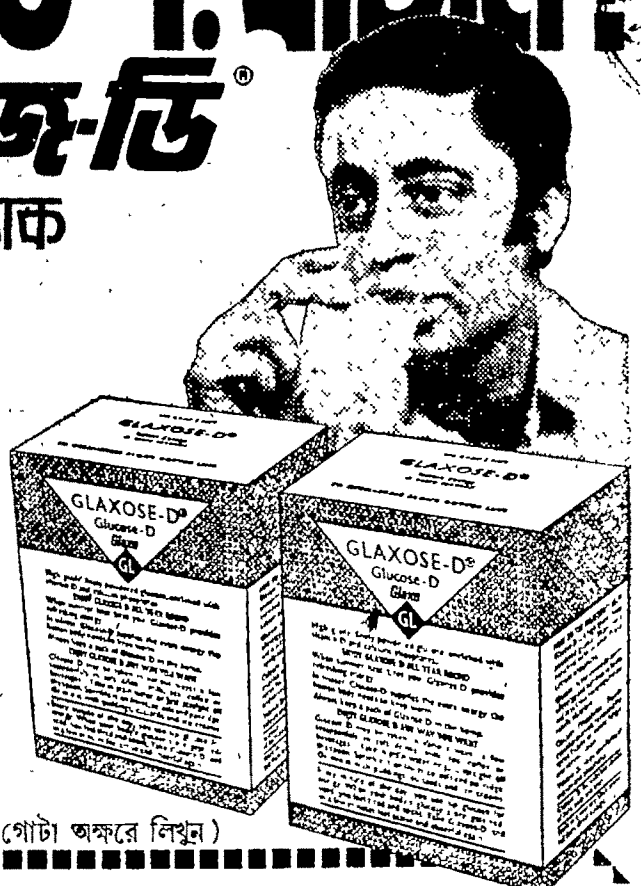

কুপনটি কেটে ভরে নিয়ে, আপনার বিক্রেতার কাছে নিয়ে যান।

(গোটা অক্ষরে লিখুন)

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা .....

.....

বিক্রেতার নাম.....শহর.....

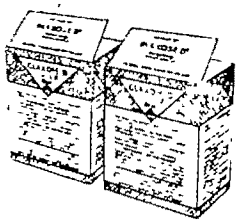

প্রিয় বিক্রেতা মহাশয়,

এই কুপনটি দিলে গ্রাহক ১ টা. ৫০ প. কম দিয়ে ২ টি ৪০০ গ্রা. গ্ল্যাক্সোজ-ডি প্যাক কিনতে পারেন,অবশ্য যদি ওপরে দেওয়া বিস্তারিত বিবরণগুলি সঠিক ও স্পষ্টভাবে ভরে দিয়ে থাকেন।

যে প্যাক দুটি আপনি বিক্রী করবেন তা থেকে ফুটো করা লাইন ধরে গ্ল্যাক্সোজ-ডি নাম লেখা ওপরের ফ্ল্যাপ ছিঁড়ে নিন, এবং কুপনের সঙ্গে জুড়ে তা আমাদের বিক্রয়-প্রতিনিধির কাছে দিয়ে দিন। তার বদলে আমরা আপনাকে একটি ১০০ গ্রা. গ্ল্যাক্সোজ-ডি প্যাক দিয়ে পুষিয়ে দেব।

13

ফ্যামিলী প্রডাক্টস ডিভিশন
গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

daCunha/GL/38a Ben.

চোখে সুর্মা, মাথায় ওড়না, সারা দেহে অনিন্দ্য যৌবনশ্রী, ভাবভংগি খুব রোমান্টিক। তারপরই স্বরটা কোমল পর্দায় নামিয়ে বলতেন, কিন্তু কি নাজুক—

বোধহয় এই নাজুক তার দীক্ষাই আপনাকে দিয়ে গেছেন। তাই আপনার গান দিন দিন এমন নাজুক হয়ে উঠছে। এই প্রথম শিল্পীর উচ্ছ্বাসে বাধা দিলাম।

'জন্মের শেষের দিকে ওঁর মনটা যেন শেখবার জন্যই তৈরী হয়ে আসছিলো হয়তো গাইবার ক্ষমতা কমে আসছিলো বলেই।

খুব স্বাভাবিক। শিল্পীজীবনের প্রথমের দিকে থাকে আত্মপ্রকাশের তাগিদ। শেষের দিকে সৃষ্টির। সংগীতসাধক গান তাঁর সাধনাধ্যান যেন শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে বেঁচে থাকে।

'একেবারে খাঁটি কথা। উনি যাবার তিন মাস আগে যখন শয্যাশায়ী, অমন প্রাণবন্ত মানুষটা কেমন যেন শিশুর মত অসহায় হয়ে পড়লেন। একদিন আমায় দেখে বললেন দ্যাখো অমি এখনও গাইতে পারি বলে 'আ-আ' করে তান করবার সেই করুণ প্রচেষ্টার ছবি আমি আজও ভুলতে পারি না। আর একটা কথা আমার বারবার মনে হোতো ওঁর যেন ভগবানের সংগে যোগাযোগ হয়ে গেছে।'

একটু থেমে বললেন, আমি যদি আপনার মত লিখতে পারতাম খাঁ সাহেবের বিচিত্র জীবনীটাই লিখে রাখতাম কত রসোচ্ছল, প্রেমিক মন ছিল ওঁর।

'অমৃতে' কানন দেবীর স্মৃতিচারণ পড়বার সময় ওঁর বিরাট মানসলোক যেন নতুন করে দেখতে পেতাম। জানেন সারা ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ঐ একটি মহিলাকে আমি আর আমার স্বামী কত শ্রদ্ধা করি! একলা এক নিঃসহায় মেয়ে শুধু নিজের শক্তিতে কত বড় হয়েছেন, উনি যেন মানুষের কল্পনাকেও হার মানান। আমার এ কথাটা নিশ্চয় উল্লেখ করবেন। উনি সকল শিল্পীরই আদর্শ।'

'সংগীত সম্বন্ধে আপনার ধারণার পরিধি এতবড়—আপনি যখন ছবির গান বা আধুনিক গানের ক্ষেত্রে আসেন—গানটা ছোটো খায় না? আধুনিক গান মানেই নীচুমানের তা বলছি না। কিন্তু এমন অনেক গানও ত আছে আপনার টেম্পারামেণ্টের সংগে মেলে না?'

'আপনার ইঙ্গিত আমি বুঝেছি। কিন্তু প্রথমতঃ আমি অন্ততঃ কোনো গানকেই অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না। কারণ জানি সকলেই নিজেদের ধারণা, ক্ষমতা ও সাধনার পরিমাপে সংগীতলক্ষ্মীর সাধনা করে চলেছেন—এবং সেই অনুযায়ীই তাঁদের সাকসেস, সেই কথাটা মনে রাখলে দেখবেন এ-গানের প্রতি উগ্রতা অনেকখানি কমে যাবে। তাছাড়া সংগীত যখন জীবিকার উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয় তখন তার ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকটাও মেনে চলতে হয়, সেখানেই আসে কিছুটা অ্যাডজাস্টমেণ্টের ব্যাপার। আমরা যখন ক্ল্যাসিক্যাল গান গাই, একটি বিশেষ শ্রেণীর সংগীত-অভিজ্ঞ শিক্ষিত শ্রোতাদের জন্য, কিন্তু ফিল্মের গান বা আধুনিক গান মাসের জন্য। এখানে 'এনটারটেনিং' দিকটার কথাও একটু ভাবতে হয়।

আচ্ছা আপনার কথাই ধরুন না? আপনি অমৃতবাজার, যুগান্তর, অমৃতের মত কাগজে লেখেন। আবার সিনেমা পত্রিকাতেও ত লেখেন? কেন? নিজের জনপ্রিয়তার পরিধি বাড়াবার জন্যই নয় কি? কারণ এ-সব কাগজের মাধ্যমে সর্বসাধারণ আপনাকে জানবে।'

আপনার কথা মেনে নিয়েই বলছি সিনেমা পত্রিকাতে লিখলেই যে লেখার বিষয়বস্তুর মান নিম্নগামী করতে হবে এ কথায় আমি একেবারেই বিশ্বাসী নই। কারণ প্রথমতঃ শালীনতা রেখে চলে এমন সিনেমার জগৎ শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষই পড়েন (উদ্দেশ্যমূলক কুরুচিধর্মী পত্রিকাগুলিকে আমি এ পর্যায়ে ফেলছি না) এবং সাধারণ মানুষেরও এইসব গান-বাজনার শিল্পীদের সম্বন্ধে এমন একটা আগ্রহ জন্মেছে, রুচি তৈরী হয়েছে আর তাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছেন। এই ফিচারের জন্য তাঁরা আজ উদ্গ্রীব। শুধু তাই নয়। এখন গানবাজনা নিয়ে যাঁরাই লিখেছেন তাঁরা অজ্ঞাতে এই আঙ্গিককেই অনুসরণ করছেন। এটা আমি সবিনয়েই বলছি কারণ আমার আনন্দ ঐটুকুই।

'মাস-এর রুচির কথা বলছেন? পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মন কানন দেবী, শৈল দেবী সুপ্রভা সরকার—এঁরা এঁদের যুগে জনপ্রিয় ছিলেন না কিম্বা এখনও নন? আমার বক্তব্য শিল্পীরা সাধারণ মানুষের রুচিকে অনেক উন্নত করতে পারেন। ওরা এটা নিতে পারবে না এটা বুঝবে না এই সব ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের দুর্বল করে ফেলেন। সেই সংগে বাংলা গানের ধারাকেও।

'আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা সবারই শ্রদ্ধেয়। কিন্তু এঁদের যুগ, পটভূমিকা, জীবনের কথাও ভেবে দেখুন। এঁরা গান গেয়েছেন গান ভালবেসেছেন বলে। জীবিকার প্রয়োজন তাঁদের গানের উৎস ছিল না। বরং জীবিকা নিজের তাগিদেই এঁদের আহ্বান জানিয়েছে। তখনকার যুগও অনেক শান্ত, আদর্শধর্মী।

এখন? নানান সমস্যা ও সংগ্রামের মধ্যে আমরা সবাই বিপর্যস্ত। স্থিরচিত্তে সুন্দরের আরাধনা করার ধৈর্যই বা কই? সময়ই বা কই?

যুগের ছায়া গানে কিছুটা পড়বে। তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব গড়ে উঠবে। আবার আপন ধর্মেই গতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে সংগীত স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হবে।

'বর্তমান যুগের সংগীতধারা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

'এটা বিশেষ কোন ধারার সংগীত নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি এ যুগ ধ্রুবতারার তপস্যার যুগ নয়। এ হল হাউইয়ের যুগ। দম মেরে বা যে করেই হোক একটা গান জ্বলে উঠে আবার নিভে যায়। সে যতই প্রতিভাসমৃদ্ধ কণ্ঠেই গাওয়া হোক না কেন। পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দেববর্মন, কানন দেবী, সায়গলের গাওয়া গানের মত জাতির ও দেশের কাছে চিরকালের হয়ে থাকবে না।

তবু আমরা চেয়ে থাকব ধ্রুবতারার তপস্যার যুগেরই প্রত্যাশায়। সে যুগকে ফিরে আসতেই হবে, যত রাগ করেই আজ চলে যাক না নইলে আমাদের আশ্রয় কোথায়?'

সন্ধ্যা সেন

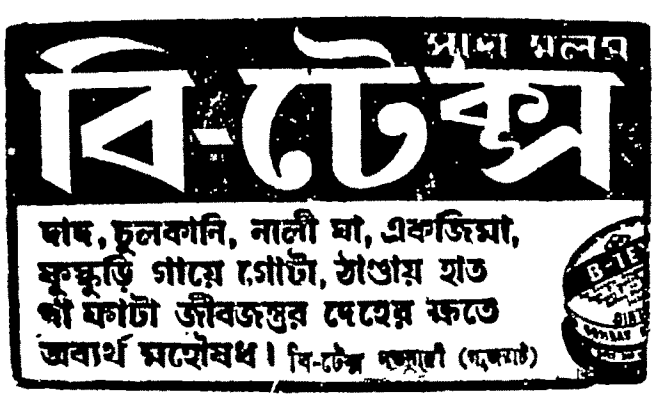

মনের অসুখ

(৩)

"Two people who know
They do not understand each other
Breeding children whom
They do not understand
And who will never
Understand them".
—*T. S. Eliot*

অপূর্ববাবু আর তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলির বিবাহিত জীবনের ইতিহাস শুনতে শুনতে ঐ লাইন কটা মনে পড়ছিল।

প্রায় কুড়ি বছর আগের ঘটনা। মধ্যপ্রদেশের এক মাঝারি গোছের কয়লাখনির ম্যানেজার অপূর্ব সান্যাল তাঁর কোলিয়ারীর ডাক্তারের পরামর্শে স্ত্রীকে কোলকাতায় এনেছেন চিকিৎসার জন্যে। বছর কয়েক ধরেই চিকিৎসা চলছে। প্রথমে মনে হয়েছিল গুরুতর কোনো রোগ। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞরা কিছুদিন চিকিৎসার পর মনের রোগের ডাক্তারদের পরামর্শ নিতে উপদেশ দিয়েছেন। সেই সূত্রে সান্যালের সঙ্গে পরিচয়। পুরনো ব্যবস্থাপত্র ল্যাবরেটরী রিপোর্ট একসরে ফেটো ইত্যাদি দেখানোর পর তিনি এই ভাবে স্ত্রীর অসুখের বিবরণ দিলেন ওকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। ও যদি বুঝতে পারে আপনি পাগলের ডাক্তার তা হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আমাদের ডাক্তারবাবু মৃদু আভাস দিয়েছিলেন যে ওর শরীর খারাপের কারণ হয়তো মনের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে—তাইতেই ও ডাক্তারবাবুর ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। গত কয়েক বছরে বার পাঁচ-ছয় কোলকাতায় এনে নানা ধরনের অনুসন্ধান চালিয়েও শরীরের কোনো বড় রকমের ব্যাধির হদিশ মেলেনি। টনসিল অপারেশন জরায়ু 'কিউরেট' হরমোন চিকিৎসা সব কিছু করেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। কুড়ি বছর বিয়ে হয়েছে ওর বয়স এখন ছত্রিশ আমার বিয়াল্লিশ। এই কুড়ি বছরে পনেরো বছর ধরে ও অসুস্থ। গত তিন-চার বছর ধরে বেশ বাড়াবাড়ি চলেছে। মাঝে মাঝে বেশ ভাল থাকে ওর কাজকর্ম হাসি-ঠাট্টা গল্পগল্প দেখে কার সাধ্য বোঝে যে ওর কোনো অসুখ আছে। ঐ রোগা শরীরে আমাদের অত বড় সংসারের সব ঝক্কি বলতে গেলে একলাই সামলাতে পারে। অথচ যখন মেজাজ বেগড়াতে শুরু করে তখন ধারণাই করা যায় না যে এই মাত্র সপ্তদিন আগেও ও বারো-জনের খাবার টেবিল ম্যানেজ করেছে ছেলেমেয়েদের সাজিয়ে গুজিয়ে ইস্কুলে পাঠিয়েছে সংসারে যার যেটা দরকার সেটা ঠিক সময়মত তার হাতের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমটায় খিটখিটে হয়ে ওঠে। অল্পেতেই রেগে যায় আমার প্রতিটি কাজে খুঁত ধরে ঝি চাকরদের বিনা কারণে গালমন্দ দিতে থাকে। তারপর শয্যা গ্রহণ করে। অনেক সাধ্য সাধনা করলে হয়তো দুদিন অন্তর এক বাটি জলে কোনো রকমে মাথাটা ভিজিয়ে স্নান করে; প্রায় জোর জবরদস্তি করে খাওয়াতে হয় তও দিনান্তে হয়তো দুখানা রুটি কি দুহাতা ভাত ছাড়া আর কিছু গলা দিয়ে নামানো যায় না। আমার মশায় মেজাজ এমনিতেই একটু তিরিক্ষে আর এই স্বল্প দেখলে আরও তেতে উঠি। হ্যাঁ—তা মাঝে মাঝে চড়টা চাপড়টা যে দিই না এমন নয়। সারা দিন কুলি ঠেঙিয়ে বাবুদের খিঁচিয়ে বাড়ীতে এসে যদি অশান্তি পোহাতে হয় তাহলে কার মেজাজ ঠিক থাকে বলুনতো?

অপূর্ববাবুর পালোয়ানী চেহারা আর মিলিটারী মার্কা গোঁফ দেখে মনে হল তাঁর মেজাজ একটু নয় বেশি রকমেরই তিরিক্ষে এবং তিনি বেশ জবরদস্ত ম্যানেজার। ম্যানেজ করার ব্যাপারে তিনি প্রয়োজন হলে চড়চাপড়ের মত মাদু পন্থার পরিবর্তে যে কোনো ধরনের উগ্র পন্থা গ্রহণ করতে ইতস্তত করেন না। পরে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে বুঝেছিলাম আমার অনুমান খুব মিথ্যে খুব মিথ্যে নয়।

স্বামী আরও বললেন—আগে আমাকে বেশ সমীহ করত আমার মতামত অগ্রাহ্য করতে সাহস পেত না। কিন্তু আজকাল ও বদলে গেছে। আমার সব কথাই অগ্রাহ্য করে না তবে এই রোগের ব্যাপারে আমার ও ডাক্তারবাবুর মতামত মানতে চায় না। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে ও 'ডিপ্রেসনে' ভুগছে। 'ডিপ্রেসন' মানে যে এক ধরণের পাগলামি—একথা ও জানে। উল্টে বলে যে আমাদের কোলিয়ারী ডাক্তার ম্যানেজার ওর ভরাশিয়ার সবাই পাগল; তাই ওকে আমরা পাগল মনে করছি।

—আপনাদের মধ্যে কি বিয়ের আগে জানাশোনা আলাপ পরিচয় ছিল?

—একেবারেই না। আমি মধ্যপ্রদেশের ঐ কয়লাখনির শহরে মানুষ আর ওর জন্ম এখানে এই নৈহাটির কাছে এক গ্রামে। আমরা দুজন একেবারে দুই বিপরীত ধরনের বাসিন্দা। ওদের পরিবার ন্যায়রত্ন তর্কচঞ্চুর পরিবার—ওর ঠাকুর-দাদা বিখ্যাত পন্ডিত ছিলেন তাঁর চতুষ্পাঠীতে দেশ-বিদেশের ছাত্র পড়ত। ওর বাবা অল্প বয়সে মারা যান মা সেই থেকে সংসারিক সব ব্যাপারে উদাসীন। পুজোআচ্চা জপতপ নিয়েই ছিলেন। ওর ঠাকুরদাদা ওকে ধন্য কিম্বা গার্গীর মত পন্ডিত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। ও চোদ্দ বছরের পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। কাজেই তাঁর আশা সফল হয়নি তবে ওকে তিনি হিন্দুদের নিত্য-কর্ম পদ্ধতির জীবন্ত নিদর্শন তৈরী

জন্মে গেছেন। বিয়ের আগে ওর সঙ্গে দৈবাৎ আলাপ পরিচয় ঘটলেও প্রেম হবার সম্ভাবনা ছিল না। ও আমাকে নেহাৎ মনে করে আমার গল্পের বাতাস পর্যন্ত এড়িয়ে চলত। আমরা অবশ্য ঠিক ওর উল্টা ধরনের পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছি। বাবাও কলিয়ারীতে কাজ করতেন। ছোঁয়াছুঁয়ি খাওয়া-দাওয়ার বাদবিচার আমরা মানতাম না। যস্মিন দেশে কদাচার—এই নীতি অনুসারে তিনি পানভোজনে খুবই লিবারেল ছিলেন। আমরা যা কাজ করি তাতে একটু আধটু অ্যালকোহল ছাড়া আমাদের সন্ধ্যা কাটানো সম্ভব নয়।

—আপনাদের এই দুই বিপরীত জেরুর বাসিন্দার মিলন ঘটলো কি করে?

যিনি ঘটকালি করেছেন তিনি অঘটন ঘটাতে পারেন মনে হচ্ছে।

—আরে মশাই কোনো ঘটক ঘটকীর সাধ্য ছিল না এ ব্যাপার ঘটাবার। সে এক গল্পের মত ব্যাপার—শুনলে বিশ্বাস হবে না। এইটুকু জেনে রাখুন ভস্মলোচন গৃহের অধিষ্ঠান থেকে মানে ঠিকুজী কোষ্ঠীতে রাজযোটক মিল হওয়াতে বিয়েটা ঘটেছে। মিলটা বোধ হয় অন্য জগতে গিয়ে হবে কিম্বা হয়েছে আমরা বুঝতে পারছি না;—বলে ভদ্রলোক একটু হাসলেন।

এরপর গীতাঞ্জলিকে দেখলাম ও তাঁর মুখে রোগ ইতিহাস শুনলাম সেগুলো পড়লো চেহারা। কখন বিষণ্ণ হাসি প্রায় সব সময়ে মুখে লেগে থাকার দরুণ তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে শুধু হাসলেন কোনো উত্তর দিলেন না। আবার প্রশ্ন করলাম আবার হাসি! শেষ পর্যন্ত মুখ খুললেন টুকরো টুকরো কথাগুলো এক-সঙ্গে জড়ো করে আপনাদের শোনাচ্ছি—কি হয়েছে—সেতো আপনি বলবেন। আপনি ডাক্তার আপনি জানেন কি হয়েছে। আমি মনুষ্যেতর মানুষ আমি কি করে জানব আমার কি হয়েছে? উনি নিশ্চয়ই জানিয়েছেন যে আমি পাগল। ডাক্তার বলার ওঁর বন্ধু তো ডাই বলেন। আপনার কাছে এনেছেন মিথ্যে কথা বলে। আপনি নাকি পেটের ব্যথা সারানোর ডাক্তার। আমি জানি আপনি পাগলের ডাক্তার। ওরা আমাকে পাগল সাজাতে চান। আপনার সার্টিফিকেটে তাই লিখে দিন তা হলেই হবে। মিছিমিছি কতকগুলো বাড়ি গেলবার ব্যবস্থা দেবেন না। আমার ওষুধ দেখলেই বমি আসে। অনেক ওষুধ খেয়েছি। পেটের ব্যথা মধুর ব্যথা যেমন ছিল তেমনিই আছে।... আপনি তবু ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনছেন অন্য কেউ শুনতেই চান না। ডাক্তার বসাকের রিপোর্ট পড়ে দু-চারটে মামুলি কথা জিজ্ঞাসা করে গম্ভীর হয়ে ব্যবস্থাপত্র লিখে উঠে দাঁড়ান।

উনি আপনাকে একতরফা ওঁর কথা শুনিয়েছেন। আমার কথা আপনি শুনতে রাজী আছেন কি? তা হলে শুনুন। তাঁর আগে বলুনতো পাগল কাকে বলে? আমার সঙ্গে কথা বলে কি মনে হচ্ছে? আমি কি পাগল?

—বললাম অন্যের কথা শুনে আমরা কোনো সিদ্ধান্ত নিই না। প্রচলিত রীতি নীতি নিয়মকানুন মেনে না চললে অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যাকে আমরা ঠিক মত বুঝতে পারি না তাকে অনেক সময় পাগল বলি। সাধারণ সংসারী মানুষ আমরা আমাদের চোখ দিয়ে কেউ সংসারটাকে না দেখলেই আমরা তার আচরণ ব্যবহারে পাগলামির গন্ধ পাই। হিমালয়ের দুদিকে শীতে কৌপীন সম্বল যে সাধু ধ্যানে মগ্ন নিজের বিষয় সম্পত্তি সর্বস্ব দান করে যে মানুষ ফকির হয়েছে ভেলায় করে যে সমুদ্র পাড়ি দিতে নোঙর তুলেছে—তারা আমাদের অনেকের কাছে পাগল। আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলুন। একথা আর কেউ জানবে না।

কথাগুলোতে কাজ হল। গীতাঞ্জলি আমাকে বোধ হয় কিছুটা বিশ্বাস করলেন। দু-তিন দিনের মধ্যে আমাকে অনেক কথা জানালেন। ঠাকুরদাদার মৃত্যুর পর মা তাঁকে নিয়ে খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েন। টোল উঠে গেল ছাত্ররা চলে গেল ভাগ-চাষীরা ভাগের ধান দেওয়া বন্ধ করল। ওঁর শ্বশুর আচার ব্যবহারে ম্লেচ্ছ হলে কি হয় ঠিকুজী কোষ্ঠীতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। ওঁদের কয়লাখনির মালিক গীতাঞ্জলির ঠাকুরদাদার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিনিই বিয়েটা ঘটান। নামকরা জ্যোতিষী দিয়ে কোষ্ঠী বিচার করে শ্বশুর ঠাকুর আমাকে দেখলেন। তাঁর পছন্দ হল। মালিকের প্রভাবও নিশ্চয়ই অনেকখানি কাজ করেছিল। মার ঘাড় থেকে বোঝা নামতেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে কাশীবাসী হলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রী আচারনিষ্ঠ গীতাঞ্জলি বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের সব সংস্রব ত্যাগ করে কয়লার ধোঁয়ায় কালো এক শহরের সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে এমন এক পরিবারের গৃহ-লক্ষ্মী হলেন যাদের চালচলন হাবভাব আচার ব্যবহার একেবারে আলাদা। এদের তিনি বোঝেন না এদের তিনি জানেন না। এদের পুরুষদের গলায় যজ্ঞসূত্র নেই, এদের মেয়েরা বাথরুম থেকে এসে কাপড় কাচে না খেয়ে কাগজে মুখ মুছে শুদ্ধ হয় খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে না। পূজা আহ্নিক জপতপের কথা তো ওঠেই না।

গীতাঞ্জলি বললেন—শ্বশুরমশাই রোজ রাতে মদ খেতেন কিন্তু মাতাল হতেন না। তাঁর অচার ব্যবহার যাই হোক না কেন তিনি আমাকে সুনজরে দেখে-ছিলেন। আমার জন্যে সিঁড়ির ঘরটাকে পরিষ্কার করে ঠাকুরঘর করে দিলেন। স্বামীকে কিন্তু বুঝতে পারতাম না। ভক্তি করার জন্যে ভালবাসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। ঠাকুরের কাছে রোজ প্রার্থনা জানাতাম হে ঠাকুর আমাকে বদলে দাও। আমাকে ওঁদের মত কর কিম্বা ওঁকে আমার মত কর। ঠাকুর আমার কথায় কান দিতেন না। স্বামী চাকরী পেলেন। মদ একটু আধটু গোপনে খেতেন এখন আর গোপন রাখার চেষ্টা করলেন না। তাঁর সঙ্গে প্রথম বছর তিনেক আমার শুধু একটা সম্পর্কই ছিল। রাত্রে তাঁর শয্যাসঙ্গিণী হওয়া ছাড়া আমাদের মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি। তা বলে আমাকে তিনি তাচ্ছিল্য করতেন না। ভালবাসতেন কিনা বলতে পারব না তবে যত্ন করতেন। না চাইতেই এটা ওটা কিনে এনে দিতেন। আতর গয়না ব্লাউজ এই সব। সেগুলো আমার কোনো কাজে লাগত না। বিয়ের বছর তিনেক বাদে কয়েক মাসের মধ্যেই শ্বশুর শাশুড়ী দুজনেই স্বর্গে গেলেন। দেওর-ননদ কি-চাকর নিয়ে দশ বারোটি মানুষের সংসারের ভার আমার ওপর পড়ল। আমার সঙ্গে স্বামীর অন্য সম্পর্ক গড়ে উঠতে লাগল। আমি এখন শুধু শয্যাসঙ্গিণী নয় গৃহিণী পরিবারের কর্ত্রী। এই সময় থেকেই দুজনের মধ্যে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে খিটিমিটি আরম্ভ হল। এই সময় থেকেই মাথার যন্ত্রণার সূত্রপাত। কি বলছেন? হ্যাঁ

রাতের দাবী মেটাতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম। না, অনিচ্ছা খুব ছিল না; তবে সামর্থ্য কম ছিল সারা দিন খাটাখাটনির পর দেহটাকে আর টানতে পারতাম না। ও ব্যাপারটা তো স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য, শাস্ত্রে তো তাই বলে, কাজেই আমি ও ব্যাপারে বাধা দেবার চেষ্টা কোন দিনই করিনি।

না, এদিক দিয়ে জোরজবরদস্তি তিনি কোনোদিনই করেন নি, বরং আমার শরীর খারাপ বুঝলে নিজে থেকেই রেহাই দিতেন। আর, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কুলী-কামিন বা অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে তাঁর কোনো অবৈধ সম্পর্ক নেই। ওদিক দিয়ে আমার কোন দুঃখ বা নালিশ নেই। খিটিমিটি তবে কি নিয়ে হত? বলছি। মাঝে মাঝে আমার রান্নাঘরের টোকে পড়া আচারনিষ্ঠ, শুচিশুভ্র সত্তাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। আমি যেন কি রকম হয়ে যেতাম। অন্যদিনের মত তিনি ছরতো বইয়ের কাপড়জামা পরে ঘরে ঢুকে আমার হাত ধরলেন, অমনি আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় কুঁচকে গেল। চোখমুখের চেহারা বদলে যচ্ছে বুঝতে পারতাম, কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারতাম না। আমি হাত ছাড়িয়ে ঘর থেকে বাইরে যাবার চেষ্টা করতাম, উনি বাধা দিতেন আমি সে বাধা না মানলেই তুমুল কাণ্ড ঘটত। আমার স্বামী খুবই বদমেজাজী। এই সময় রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে আমার গায়ে হাত তুলতেন। না ধরে, চড়চাপড় বসা, চুলটুল ধরা বেশ গরুতরই হত; একদিন তো বঁটি দিয়ে পেটে লম্বি মেরেছিলেন, সেই থেকে পেটে যে ব্যথা সে ব্যথা আজও সারল না। পতিনিন্দার পাপে হয়তো আমাকে নরকে যেতে হবে, কিন্তু আজ আমি মনের কথা না বলে পারছি না। আর কারুর কাছে এসব বলতে পারিনি। আপনার মত এই রকম কেউ আমার কথা শোনে নি। পাগলের প্রলাপকে কে কবে গুরুত্ব দিয়েছে? তবে ওর বাবা বড়ের আগুনের মত। দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায়। আমার কাছ থেকে কোন বাধা পেতেন না বলেই বোধ হয় দু-তিন মিনিটের মধ্যেই ওঁর হাত-পা চলানো বন্ধ হয়ে যেত। একদিন লাথি খেয়ে দেওরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে পাখার সঙ্গে কাপড় বুলিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে পড়তে গিছলাম। দরজায় দমদম শব্দ আর ছোট ছেলের কান্না শুনে থেমে যাই। আর একদিন ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ঘরের বাইরে পড়ি। সেদিন রাতে স্বামী ঘুমিয়েছেন মনে করে নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলে আলসের ওপর উঠে ঝাপ দিতে যাব এমনি সময় পেছন থেকে স্বামী কাপড় ধরে নামিয়ে আনেন। প্রতিবারই মারধোরের পর উনি কান্নাকাটি করতেন, হাত জোড় করে মাপ চাইতেন, আর কখনও এরকম করবেন না বলে পিতামাতার নাম নিয়ে শপথ করতেন। তখন আমিও গলে যাই, ওঁর কথা বিশ্বাস করি। মাসখানেক যেতে না যেতেই আবার নিজমূর্তি ধারণ করেন। এখন আমি ওঁর কোনো কথাই বিশ্বাস করি না, উনি আমার কাছে ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছেন।

...আমিও ক্রমশ বদলে যেতে লাগলাম। দু-তিন মাস অন্তর ঠাকুরদের গীতাগুলি আমার মধ্যে জেগে উঠতে লাগল। ছিঃ ছিঃ এ কি জীবন আমি যাপন করছি। এ ঘরবাড়ী নরককুণ্ড, এখানে আমার স্থান হতে পারে না। ছেলেমেয়েকে নিজের মনে হত না। সেই সময় খিদে চলে যায়, ঘুম চলে যায়, কোন কাজ করার ক্ষমতা থাকে না, খালি শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। স্বামীকে আমি এমনিতে বেশ ভয় পাই। কিন্তু সেই সময় ভয়ডর থাকে না, স্বামীর তর্জনগর্জন কানে ঢোকে না শুধু ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। দু-একদিন বেরিয়েও পড়েছি রাস্তা থেকে লোকজন ধরে বেঁধে ফিরিয়ে এনেছে। আচারনিষ্ঠ শুচিশুভ্র চৌদ্দ পড়া মেয়েটাই আমি না এই বড়ীর গৃহিণী, পাঁচটি সন্তানের জননী, ম্যানেজারবাবুর ঘরণী, স্বামীপুত্রের অশুচি অনাচারের অংশীদার মেয়েটি আমি? আমি কিছুই বুঝতে পারি না। আমার যেন সে সময় নবজন্ম হয়। ফিরে যাই সেই অনাচার, আমারই গড়ে ঘেরা ছোটোখাটো অভিমান। এদের আমি তখন চিনতে পারি না, বুঝতে পারি না। এদের সঙ্গে পাঁচিত করে, এদের কথার মূল্য আদরও হতো আমাকে কলুষিত করে। বছরে দু-তিনবার এই রকম হয়। ওদের স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। বিদ্রোহ করার ইচ্ছে হয়, কিন্তু সাহসে কুলোয় না। এই অবস্থাকে ওঁরা বলেন পাগলামি ওদের বন্ধুডাক্তাররা বলেন হিস্টেরিয়া। এর কোন বেড় নয়, কলের আমি বোঝাতে পারি না। ওরা বোঝে না সে ওরই পাগল। ওদের ঐ পাগলামি বন্ধ থেকেও আমি মাঝে মাঝে সুস্থ হবার চেষ্টা করি, উন্মাদাশ্রমের নিয়মকানুন মানতে চাই না—তাই ওরা আমাকে পাগল বলে। আপনিই বলুন কে পাগল? আমি না ওরা?

কথা শেষ করে মেয়েটি একবার হাসবার।

অনেক 'প্যারানয়েড', অনেক ডিলিউশন-গ্রস্ত (ভ্রান্তিবিলাসগ্রস্ত) রোগী ডাক্তারদের কাছে এই ধরনের কথা বলে থাকেন। তবে তাঁদের বলার সঙ্গে মধ্যে ও বক্তব্যের মধ্যে সংহতির অভাব থাকে যায়। খুব জোরগলায় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁরা বলেন যে, আত্মীয়-স্বজন তাঁদের পাগল সাজিয়ে উন্মাদাশ্রমে পাঠাবার ষড়যন্ত্র করেছে। গীতাশ্লোকের কথার ভঙ্গি একই, স্বতন্ত্র। [illegible] আগে আমেরিকা-ইংলণ্ডের [illegible] করেকজন মনোরোগ চিকিৎসক ও [illegible] মিলে এক সেমিনারে এই প্রশ্নটাই [illegible] ছিলেন। এই নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে [illegible] প্রচলিত নীতিবোধ মানবার [illegible] নিতে পারে না, তবুও উন্মাদদের [illegible] কোন মাপে টিপে [illegible] প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োগ করে, [illegible] সঙ্গে মানিয়ে চলা—এরা [illegible] কতটা প্রকৃতির আলোচনা [illegible] থাকুক।

এরপর কয়েক [illegible] আলোচনার ফলে এঁদের [illegible] অরো অনেক কিছু [illegible] সন্ন্যাসরোগের বইয়ে যতই সুদক্ষ [illegible] পরিচালন এবং কুশাসনই [illegible] নিজের পরিবারের বেলায় [illegible] পরিচয় দিতে পারেন নি। [illegible] সব কর্তাই উচ্ছৃঙ্খলতা [illegible] মত তারা নিজেদের সুস্থির [illegible] কিন্তু ইনি মনে করেন [illegible] সমাজে মূল্যবোধ [illegible] সমাজের ছাঁচে [illegible] উদয় হতে পারে না। [illegible] কথা আলোচনা না [illegible] আলোচ্য। [illegible] এতো প্রতিষ্ঠানবাদের [illegible] যান না মনে করেন, তাঁর [illegible] তাঁরই ভালোর জন্যে [illegible]

সান্যাসরোগ [illegible] বিশেষজ্ঞ। আমি তাঁকে [illegible] রোগের ব্যাপার বুঝিয়ে বলেছি। উনি নিজের [illegible] একটু ঘোরা হলেন। কিন্তু [illegible] না হলে [illegible] ব্যাপারে সহানুভূতি [illegible]

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

জাগরণ ॥

সুবো আচার্য

প্রেম ও অপ্রেম থেকে দূরে যাই। কতোদূরে?
বুক থেকে পাতা ঝরে বায়ুস্রোতে অবিরল ওড়াউড়ি করে,
ধূসরিত পৃথিবীতে ছায়া পড়ে বিশাল মেঘের বিদ্যুচ্চমকের
মতো ফণা তোলে একটি শঙ্খচূড়, সমগ্র বিকেল জুড়ে
নিঃশব্দ আকাশ ভরে যায় টুকরো, টুকরো মেঘে,
জন্মান্ধ ভিখারীবালক বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে অদ্ভুত নিস্পৃহতায়
ফিরে যায় আপন গহ্বরে, একটি আহত নারী প্রান্তরের মধ্যে
হেঁটে যায়, একা, যেন অদ্ভুতরহস্যেভরা শরীরও সান্ত্বনা দেয় না তাকে।

এই কি প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির স্পষ্ট অন্তর? এও নয়?
তবে আর কতোদূরে গহন পর্বতে বসে আছো ঈশ্বর আমার?
শরীরের আবরন ভেদ করে দুঃখের পৃথিবীতে জেগে উঠি,
একা, পরাভূত, ক্লান্ত মুখ, জরায় হেরেছি সর্বস্ব, বিশ্রী ঘাম,
পানসে থুথু মাটির ভিতরে, তেতো জিভে বিরক্ত আস্বাদ,
দুচোখ নারীর হিংসার মতো ধারালো, পোষকে অস্বস্তি,
বুকের ভিতরে শ্লেষ্মা জড়ানো অস্পষ্ট ভালোবাসা—
এই কি প্রেম ও অপ্রেম থেকে বহুদূরে!
এবার কি সকল খেলা ভুলে যাবো, সব আবরন
ফেলে দেবো অন্ধকারে—দেখে নেবো অদ্ভুত শরীর!
কঠিন দর্পনে দেখবো কোন্ মুখ? প্রেত, সাপ, কঙ্কালের
স্পষ্ট জটিলতার এক নগরীভরা অন্ধকার—

অন্ধকারে কোন শব্দ নেই, শুধু স্রোতের শব্দ বাতাস,
এলোমেলো জীবনের মধ্যে জমে উঠছে পুঞ্জীভূত রাত্রি—স্তব্ধতা
—জাগরণ বড়ো ক্ষমাহীন;

দিন গুনছি ॥

অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনের অপরাহ্নে—যৌবনের মিছিলে
গা ভাসিয়েছি মনের কাছের
পেতে চেয়েছি কাউকে, খুঁজে বেড়িয়েছি,
অবাধ্য হয়েছি সকলের।
বিদায়ের ঠিক পূর্বে এক সন্ধ্যায়
মান-অভিমান কাটিয়ে
মিলিত হয়েছি আর ঢুকে গেছি সংসারের আবর্তে।
আরূঢ় হয়েছি ঘেউয়ের চূড়ায়।

এখন, মিটে গেছে সখ,
এগিয়ে আসছে দিন, আর আমি শুধু
ঘড়ির স্পন্দন শুনছি বুকে।

কে আমার প্রতিপক্ষ ॥

অমিত চৌধুরী

এত কি গম্ভীরভাবে পড়াশুনো কর?
আমি সারাদিন দেখি তোমার আঁচল
গ্রীষ্মের বিকেল নিয়ে উড়ে যায় মেঘের ওপারে
আর তুমি উজ্জ্বল কৈতকী
টেলিফোন করেছ স্বপনে দীর্ঘরাতে অথবা বিকেলে
ছাদে আসবার আগে স্নানঘরে গেছ শান্ত পায়
এবং সাবান মেখে শরীরের মালিন্য ধুয়েছ
শরীরের ক্লেদ, গ্লানি স্বপন অহংকার
তাই কি তোমার গায়ে এত গন্ধ পারফিউমের,
এমন সাবান তুমি কি আশ্চর্য কোথা থেকে পেলে?
কে দিল তোমাকে বলো
একবার শুধু বলে দাও
কে আমার প্রতিপক্ষ গন্ধ উপহার দিয়ে
তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

—তেরো—

প্রথমেই সব কটা কাগজের বিজ্ঞাপন টেলিফোন করে রজনীর নামটা তুলে দিতে বলা হল। বিজ্ঞাপনের অ্যাড্‌ভান্স কপি থেকে। টেলিফোনগুলো করে শংকর বলল, এখন চারদিনের ভেতর সুজাতা পাবে কোথায়? গলায় গান চাই। হাসলে কাঁদলে ভালো দেখনো চাই। হাউসের লাস্ট রো অবদি গলা পৌঁছনো চাই। তারপর অঙ্কে পার্ট মুখস্ত। মিউজিক হ্যান্ড আর লাইটের সঙ্গে প্র্যাকটিস—

সাজঘরে অমিয় গুম হয়ে বসে ছিল। 'তিনজনকে খবর পাঠিয়েছি। দেখি—'

রবিবারের ডবল শোও গেল।

অমিয় চুপ করেই ছিল। অরগান আর তবলার লোক বসে। তিনজন নায়িকাকে তিন সময়ে আসতে বলা হয়েছে। বেলা দুটো। বিকেল পাঁচটা। আর সন্ধ্যে সাতটায়—

প্রথমজন ঠিক দুটোয় এলেন। দুখনা ছবিতে সুটিং চলছে। অন্য একটি হলে শনি-রবি-বৃহস্পতিবার—হপ্তায় পাঁচটি করে শো করেছেন। মাথায় অনেক চুল। নাক মুখ চোখ সুন্দর। কিছু মোটা এবং বেঁটে।

গলায় ডায়লগ উঠলেও গান হচ্ছে না।

পৌনে পাঁচটা অবদি ধস্তাধস্তি চলল। শেষে তাকে বলা হল, কল বেলা এগারোটায় অবশ্য রিহার্সেলে আসবেন। মেয়েটির নাম রমা। হাত তুলে নমস্কার করে রমা চলে গেল।

বেলা পাঁচটায় এল নন্দনা চক্রবর্তী। গলার গলা আছে। ডায়লগও মন্দ বলে না। কিন্তু মুখের আদলে সে ব্যক্তিত্ব কোথায়? যার ডায়ালগের খোঁতে অমিয় স্টেজে একটু একটু করে ছোট হয়ে নিভে যাবে। উপরন্তু মেয়েটি একটু স্থূল। বলল, তিন মাস ধরে হোমিওপ্যাথির বড়ি খাচ্ছে। ডায়েটিং চালাচ্ছে। ঠিক স্লিম হয়ে যাবে। অমিয় মনে মনে বুঝলো, একে নিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে।

সন্ধ্যা সাতটায় এলেন মালিনী রায়। চমৎকার হাইট। হাসলে বয়স লুকিয়ে পড়ে। ব্যক্তিত্ব আছে। গলাও মন্দ হয় না। কিন্তু ডায়লগ ডেলিভারির সময় কেমন একটা ঘেড়া ঘোড়া ভাব আসে। অমিয় বলল, 'আপনাকে খবর দেব।'

তিন চারদিনের মধ্যে নন্দনা কজচলা-গোছের তৈরি হয়ে গেল। বৃহস্পতিবারের ইভিনিং শো পর হওয়া গেল। কিন্তু কোথায় সেই দাপট? সিন থেকে সিনে নাটকের ক্লাইমাকস্ যত জমে ওঠে রজনী ততই অভিনয়ে তীক্ষ্ণ, ধারালো হয়ে উঠতো। কিন্তু নন্দনা সেখানে পৌঁছতে পারে না। ফলে অমিয়র ভেতরকার অভিনয়ও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি না হওয়ায় বেরিয়ে আসতে পারছিল না।

গোটা কুড়ি নাইটের মাথায় নন্দনা বলল, 'আপনি এবার কলশো নিতে পারেন। আমি রেডি।'

অমিয় মনে মনে বলল, নন্দনা চালিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু মাত্র একদিনই নন্দনাকে নিয়ে একটা মুশকিল দেখা দিচ্ছে। আসবে তার স্বামী পরিমলকে নিয়ে। সময় নেই, অসময় নেই—খালি টকা চঞ্চা। দশো দিন। একপো দিন। তিনশো দিন। পঞ্চাশ দিন। এ একদম লেগেই আছে; ইরিটেটিং।

দেউলটির কলশোর পর বাড়ি ফিরতেই লীলা বলল, 'ইনকম ট্যাক্সের লোক এসে ঘুরে গেছেন। আজ বিকেলে হাউসে যাবেন ওঁরা।'

সেকথায় কান না দিয়ে অমিয় বলল, 'রজনীর কোন ফোন এসেছিল?'

—হ্যাঁ। ওর ছেলে করেছিল। একই রকম আছেন।

একই রকম মানে

—তাতো জানি না।

—ফোন এসেছে বাড়িতে। তুমি নিজে তো একটা ফোন করে খবর নিতে পারতে—

—কেন? উনি কি অসুস্থ? কই? আমি তো জানি না।

কাগজের বিজ্ঞাপন দ্যাখোনি? নন্দনার নাম ছাপা হচ্ছে তিন হপ্তা ধরে—

—বিশ্বাস কর, আমি দেখিনি।

—তোমার স্বামীর থিয়েটার। 'পঞ্চমুখের' নাটক। কাগজটা উল্টে দেখবার ইচ্ছে হয়নি তোমার?

—কেন! তুমিই তো বলে দিয়েছো—যার যা ভূমিকা। অবশ্য কোনদিনই আমার কোন ভূমিকা ছিল না। যেটুকুও ছিল কোনদিন,—সেটুকু আমি ফাঁকি দিইনি কখনো।

—স্বামী হিসাবে আমিও কোন ফাঁকি দিইনি লীলা। এখন নতুন বছর থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো ভালো স্কুলে পড়ছে। তোমাকে বিশ্রাম দিতে লোক রেখেছি। এখন গাড়ি থাকায় তোমাদের আর বাস-ট্রামের ভিড় ভাগতে হয় না—

—স্বামীর এ ছাড়াও কি কোন কাজ নেই? বলতে বলতে গরম জলের গামলা এগিয়ে দিল লীলা। অমিয় কলশো থেকে ফিরেই পা ডুবিয়ে শরীর চাঙ্গা করে। বিশেষত শীতকালে। —তুমি বলবে—আমাদের তুমি সুখে রেখেছো। এর নাম সুখ?

—আর কি করব?

—আর কিছু করার নেই?

—আমার তো থিয়েটারেই সময় চলে যায়।

—সবটাই থিয়েটারে? আর এর নাম কি থিয়েটার?

—কেন?

—নাটক লেগেছে। ভাল হয়েছে। কিন্তু সেখানেই আটকে থাকবে তুমি?

—এখন বেরোবার পথ নেই লীলা। এত বড় এসটাবলিশমেন্ট। নয়ত আমি নতুন নাটকের কথা ভাবছি। কিন্তু ঝুঁকি নিই কি করে? যদি না লাগে; যদি ফেল করে। তাহলে এতগুলো লোক কোথায় যাবে?

—একে আর যাই হোক থিয়েটার বলে না। একে বলে সিকিউরিটি; আরাম। নিশ্চিন্ত টাকা।

—পাবলিক তো নিচ্ছে।

—পাবলিক তো যে কোন জিনিস নেয়। তোমার আর বেরোবার উপায় নেই। দুপুরে দু'খানি ফোন আসবে, চলল অটোমেটিক। দুটি গাড়ি। কলশো ধরলে উইকে সাতটা

শো। তুমি এখন চেক কাটতে ভালবাসো। তুমি এখন টাকা অঙ্কের যন্ত্র মাত্র। নয়ত ফিরে এসেই তোমার যন্ত্রের পার্টস রজনীর খবর নিতে আগে। আমাদের খবর তোমার কাছে খবরই নয় এখন। তুমি নেশায় আছো। ভাবছো আমাদের সুখে রেখেছো। সুখ কাকে বলে?

—ভুল কোরো না। এর নাম শো বিজনেস—

—হ্যাঁ। বিজনেস ভালো করছো।

—আর নিয়ম মেনেই আমাকে এগোতে হয় লীলা। সে জন্যেই রজনীর খবর নিচ্ছিলাম।

—তুমি শেষ কবে এ-বাড়ির জন্যে সকালে থলে হাতে বাজারে গেছ বলতে পার?

—আমি ও সব পারি না।

—তোমার নাটকের নিয়মের মত—শো বিজনেসের নিয়মের মত—সংসারেও এটা একটা নিয়ম। তুমি তোমার ছোট মেয়ের ইংরিজি পরীক্ষার রিপোর্ট জান? জান না। কারণ এ সংসার এখন আর তোমার কাছে কিছু নয়।

অমিয় এখানে এগিয়ে এসে লীলার গালে গাল ঠেকিয়ে তাকে নিরস্ত্র করতে চাইল। লীলা মুখ সরিয়ে নিল; অমিয়র মুখের ভেতরটা ফসকানো আদরটা ফিরে এসে তোলপাড় করে দিল।

খেতে না খেতেই ঘুমিয়ে পড়ল অমিয়। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে দেখল, লীলা স্কুল থেকে ফেরেনি। ছেলেমেয়েরাও ফেরেনি। কাজের নতুন ছেলেটা চা দিল।

হাউসে এসে দেখে ইনকামট্যাক্স-এর লোক বসে আছে। তাদের সঙ্গে বসে 'পঞ্চমুখের' অ্যাকাউন্ট্যান্ট নীতিশ ইনভেনটরি তৈরি করছে। দুটি ফ্রিজ, দুটি গাড়ি, তিন-সেট লাইট একটা পিয়ানো একটা মাইক তিনখানা সাইকেল। সত্তাশিজন কর্মী। এর ভেতর মেকআপম্যান ড্রেস লাইটের লোক মিউজিকহ্যান্ড সবাই আছে।

গন্ধর্ব থেকে ফোন এল বিষ্ণুর। গন্ধর্ব বিনোদন সংস্থার মলটে কার ছবি যাবে? নন্দনা? না, রজনীর?

অমিয় বলল, রজনীর—

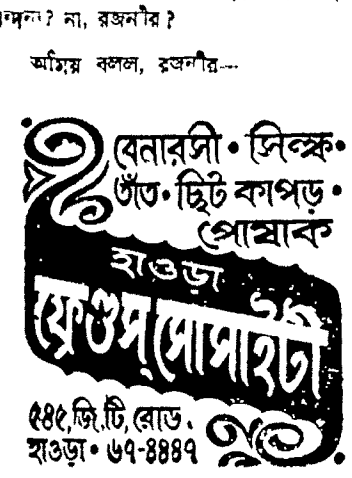

পাশ থেকে বিষ্ণু বলল,—কিন্তু এখন তো নন্দনা অভিনয় করছে। এত টাকার বিজ্ঞাপন। যে অভিনয় করছে না—তার ছবি ছাপা যায় নাকি!

—সেও বটে। মনে মনে হিসেব করে দেখল অমিয়—বিজ্ঞাপন দেখে যারা থিয়েটারে আসবে—তারা তো বিজ্ঞাপনের ছবি মিলিয়ে নেবে মনে মনে। মলাটে রজনীর ছবি দেখে থিয়েটারে যদি নন্দনাকে দেখে—তাহলে এত টাকার বিজ্ঞাপন তো জলে যাবে।

ফোন রেখে দেওয়ার আগে বলল, পরে জানাচ্ছি।

নিজেই গাড়ি চালিয়ে রজনীর ওখানে গেল। ওপরে উঠবার মুখে সিঁড়িতে দুর্গালালকে দেখে অবাক হল অমিয়।—কি ব্যাপার?

—কিছু টাকা পাই অমিয়বাবু—

—কিসের টাকা?

—কবিয়াস থিয়েটারের। রজনী দেবী হুণ্ডিতে সই করেছেন।

—কত টাকা?

—অল্প। সে আপনার কাছে খুব বেশি না।

—কত?

—উনসত্তর হাজার টাকায় দাঁড়িয়েছে সুদ নিয়ে—

অমিয়র মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। দোতলায় উঠবার আগে দুর্গালালকে বলল,—আপনি হাউসে আসুন না। ভেতরে বসে কথা হবে—

—সে তো খুব ভাল কথা।

দোতলায় উঠে রজনীর পকেটের উল্টো দিকের ড্রয়ার সামনে ইজিচেয়ারে পেল। পরনে অমায়িক একটা শাড়ি পরেছে। পাড়ে জায়গায় মৃগ সুতোর কাজ। অমিয়কে দেখেই বলল,—জানো, আমি একটা দামী জিনিস খুঁজে পেয়েছি। আমার মায়ের তিনখানা ডায়েরি।

—তখনকার কথা লিখে গেছেন—

—আশ্চর্য! একদম সে সব কথা লেখেন নি। শুধু টাকার হিসেব। দ্যাখো—

তিনখানা ছোট ছোট ডায়েরি। অমিয় নেড়ে চেড়ে দেখল। বিভিন্ন পাতায় টাকার হিসেব। আজ দুইশত পাইলাম। আজ পাঁচশত পাইলাম। রজনী একশত। আমি চারিশত।

—দ্যাখো। কত কথাই মা লিখতে পারতেন। লিখেছেন কয়েকটা অঙ্ক শুধু।

অমিয়র মাথার ভেতর তখন একটা অঙ্কই লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিল। উনসত্তর হাজার পিছনে তিনটে শূন্য। কী করে এত টাকার দায়ে পড়ল রজনী

—ডেটের সন বলছেন, আমি এখুনি শো করতে পারি—'

—আরও দু'দিন যাক। শশাঙ্ক এসেছিলেন?'

—'একবারও না।' অমিয়র হাতখানা দু'হাতে ধরল রজনী। 'তুমি এখুনি চলে যেও না। জানি তোমার ওপর দিয়ে ধকল যচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ছেলেমেয়েরা কেমন আছে? লীলা?

—'ভাল। আচ্ছা তোমার কোন টেলিফোন পেয়েছে?'

—'নাঃ! তারপর থেকে আর পাইনি।'

—'কাল শো কেমন হল? কত লোক হয়েছিল?'

—'ভাল। হাজার দশেক হবে।'

ঘন্টাখানেক পরে হাউসে ফিরে এসে অমিয়র মনটা আরও খিচড়ে গেল। নন্দনার স্বামী টাকার জন্যে বসে আছে। ভদ্রলোকের সব সময়েই টাকার দরকার। প্রতিবারেই বলবে—এই একটু দরকার। তাছাড়া আরও অনেক রকমের বায়না আছে। যেমন—একটা দামী বুশশার্ট কিনে রাখবেন আমার জন্যে। কিংবা একটা টুকটুকে ডায়েরি। বুঝে ফেলেছে—চালু নাটকের হিরোইন অসুখী। এখন শো বন্ধ রাখা যাবে না। চালু রাখতে হলে নন্দনকে চাই-ই। অতএব আমার বায়না মিটিয়ে আমাকেও চালু রাখো।

সজ্জাঘরের বারান্দায় অন্ধকারে বেঞ্চে নন্দনার স্বামী বসে ছিল। অমিয় সুইচ টিপলো। লোডশেডিং?

চন্ডীদা বলল না। লাইট ফোন—দুইয়েরই লাইন কেটে দিয়ে গেছে।'

—কেন? বিল তো ক্লিয়ার।

—আমরা ছিলাম না। ট্রাস্টের লোকজন এসে কেটে দিয়ে গেছে। আবার লাগিয়ে গেছে—ভরত হল ছাড়া নয়ত গঙ্গাধক্কা দিয়ে বের করে দেব। বাকিয়ের রবিকে বলছে—'

—'বাঃ! ভাড়া ক্লিয়ার। কোর্টে কেস চলছে। নিষ্পত্তি না হওয়া অবধি তো আমরা থাকছিই। অবদান নাকি? বলেও অমিয়র মনে হল এই অন্ধকার সে একা। পাশে কেউ নেই তার লীলা দূরে। রজনী আরও দূরে। দুর্গালালের উনসত্তর হাজার টাকা। উচ্ছেদের মামলা তার শুনানীর দিন উকিলের টাকা বাড়ি বাধা। দোতলায় তিনখানা নতুন ঘর আন্ডারিংয়ের কাজ হচ্ছে। দুটো গাড়ির পেট্রল এত জন লোকের মাস গেলে মাইনে। তারপর তার লাইনের লোকজনের সঙ্গে আজ কাল দেখা হলে তারা যে রকম নির্বাক ভঙ্গীতে তাকায়—তার একটাই অর্থ—তোমার হাউস ফেল নিত্য ব্যাপার হলেও নাটকটি অশ্লীল। অন্ধকারে নিজেকেই মনে মনে বলল, বেশ আছি!

চন্ডীদা বাম জ্বালিয়ে নন্দনার স্বামীকে ভদ্রভাবে সই করিয়ে একশো টাকা দিল—তবে সে উঠলেন। নন্দনা কোনদিন পুরো মাইনে চেয়ে দেখতে পারে না। নন্দনার জন্যে কষ্টও হয়। আবার রাগও হয়। এবার কলশো যাওয়ার পথে পাড়িতে তাকে একটা চিঠি দিয়েছে। খুলে দেখে—তাতে

ইনিয়ে বিনিয়ে একটি কথাই লেখা। দাদা—আপনি পেপার পাবলিসিটির ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। আমি নামভূমিকায় অভিনয় করছি—অথচ আমার নামই যাচ্ছে ছোট টাইপে। তা হবে কেন?

অমিয় চিঠি পড়েই পাশে বসা নন্দনাকে বলেছে এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামিও না। সময় হলে সবই হবে।'

চলন্ত গাড়ির জানলার দু'ধার দিয়ে ঝিলিক ঝিলিক করে শালবন সরে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা মাঠের ভেতরে শো। নন্দনাকে বোঝায় কী করে—আজ যে তুমি মাস গেলে দেড় দু'হাজার টাকা পাচ্ছো—সেতো রজনীর জন্যেই। রজনী এ নাটক দাঁড় করিয়েছে বলেই তো তুমি আজ দর্শক পাচ্ছো। রজনী অসুস্থ বলেই তার নাম মুছে দিতে হবে?

ইলেকট্রিক মিস্ত্রি এসে লাইন ঠিক করার পর অমিয় বলল, 'চন্ডীদা তৃপ্তি কোথায় থাকে বলতো?'

—'কোন্ তৃপ্তি?'

—'তৃপ্তি আবার কটা!'

—'কবিয়ালের তৃপ্তি? সে তো বি কে পাল এভিনিউয়র ওদিকে থাকে।

—'আজ আমি বাড়ি গিয়ে এখন ঘুমোই বুঝলে।

—'কেন? শরীর খারাপ?'

—'নাঃ!! কিচ্ছু ভাল লাগছে না।'

একটু ব্র্যান্ডি খাও। চাঙ্গা লাগবে। খাটুনির তো শেষ নেই।'

—কিছু খাই না—তাতেই রটে গেছে লম্পট। এরপর কিছু খেলে আর রক্ষে থাকবে না চন্ডীদা। এখনই আমি আউটকাস্ট।

—'সে তোমার সাকসেসের জন্যে—'

—তুমি তো বেশ সাইকোলজি বোঝ। সব বুঝে জামাকাপড় ইস্ত্রি করে যাচ্ছ।

—'গ্রুপ রাখতে হবে তো। টিকিয়ে রাখতে না পারলে তো সব ভন্ডুল। নতুন নাটক তাহলে আর কোনদিন করা যাবে না। আবার গোড়া থেকে শুরু করার শক্তি আর নেই অমিয়।'

—'আমরা সুজাতা এখন তুলে দিলে কেমন হয়। অনেকদিন তো হল।'

—'না, এখনো অনেক রাত হওয়া দরকার। দেখাই যাক না—শোক অমদের কতদিন নেয়। সেটাও তো একটা পরীক্ষা।'

—আমরা কি টিকিট সেলের নতুন আরামে ডুবে যাচ্ছি না?'

—'যাচ্ছিলাম। কিন্তু নতুন নাটকও তো তুমি তৈরি করছো।'

—'সম্রাটের কথা বলছো। অনেক ঘষা মাজা বাকি।'

—'সোম মংগল—রিহার্সেল চলুক না।'

—'মন্দ বলনি। চলি চন্ডীদা।'

—বি কে পাল এভিনিউর মোড়ে গাড়ি রেখে অমিয় গলিতে ঢুকলো। কলকাতার আদি পাড়া।

জংগল কেটে বসতি যারা করেছিল—তাদের সব বাড়ি। জানলাগুলো যেন বলে গরাদ। বেঁটে আর চওড়া। বিশ ত্রিশ ইঞ্চি ওয়াল। তৃপ্তির বাড়ি বিশেষ খুঁজতে হল না। একটা ভাঙা দেওয়ালের পাস থেকে শশক বেরিয়ে আসছিল।

দাড়ি রেখেছে। মাথার চুলও ঘড়। ধুতির ওপর খাকির হাফসার্ট। দেখলে কেউ বলবে—পরেনো বাঙালীবাবু। পায়ে লাল কেম্বিশের জুতো। গলির মোড়ের আলো এতদূর আসেনি। দুজন মুখোমুখি দাঁড়ালো।

—'রজনী ঘরে নিয়ে যেতে পাঠায়নি নিশ্চয়।'

—না। আমি নিজে এসেছি। রজনী জানেও না। তার তো অসুখ। জানেন নিশ্চয়—'

—'জানি ডাক্তার দেখছে।'

—একবার গিয়ে দেখা দিলে পারেন।

—'না। তার আর দরকার নেই।'

অমিয় এবার কঠিন হল। অসুস্থ স্ত্রীকে অতগুলো ছেলেমেয়ে সুদ্ধ দেনার পাহাড়ে ডুবিয়ে রেখেছেন। তারপর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন লজ্জা করে না আপনার?'

—'আপনি তো আছেন।'

—'হ্যাঁ। অমি আছি। আমি পালাই না। কিন্তু অতগুলো টাকা কী করলেন আপনারা? কিসে ওড়ালেন? আপনি তো মদভাং খান না। মেয়েমানুষেরও দোষ নেই। তাহলে টাকাগুলো গেল কোথায় শশাঙ্কবন্ধু?'

—'আপনি হিসেব চাওয়ার কে? কৈফিয়ৎ চাওয়ার কে?'

—'কেউ না। কিন্তু আমি আপনার স্ত্রীকে দেখা শুনো করি। ডাক্তার ডাকি।

—'ওঃ! রজনীর বিনে মাইনের কর্মচারী।'

—'না আপনার সংসার খরচ আমিই চালাই। মাস গেলে খোঁজ খবর নিয়ে যা

বাণীশিল্পের আসন্ন প্রকাশ গ্রন্থরাজি

বাংলা সাহিত্যের অনন্য হাস্যরসিক, অমর হর্ষবর্ধন স্রষ্টা, শিল্পশ্রেষ্ঠ
শিবরাম চক্রবর্তীর

০ অকথিত কাহিনী ০ দাম ৬-০০

আত্মস্মৃতির রোমন্থন যা পূর্ব প্রকাশিত "ঈশ্বর-পৃথিবী -ভালবাসায়" নেই।

বর্তমান বিজ্ঞানের আবিষ্কার, যার জন্ম আমাদেরই প্রাচীন ভারতবর্ষে, সেই প্রাচীন ভারতের অমর আবিষ্কারকদের কাহিনী নিয়ে লেখা
সুধাংশু পাল্রের

০ প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ০

দাম ৬-০০

বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন আদর্শ সেবক, সাহিত্যের সর্বপথে যাঁর লেখনী অনন্য, যিনি সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, সেই সব্যসাচী লেখক
বনফুলের ০ নূতন গল্প ০

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর লেখা মানেই এক নতুন জগতের স্বাদ, সন্ধান। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের লেখা বিরল। পাঠক সেই অচেনা অজানা জগতের সন্ধান পাবেন। ০ অচিন পরশ ০ এর পাতায় পাতায়

কয়েক বছর আগে এক শারদীয় সংখ্যায় যে কাহিনী প্রকাশিত হওয়ার পাঠক মহলে আলোড়ন তুলেছিল, সেটি বই হিসেবে এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ০ ছিদ্র ০

এবং এই লেখকের দুই ভিন্ন স্বাদের উপন্যাস একই মলাটে পাবেন।
০ জীবনের স্বাদ ০

বাণীশিল্প : ১১৩ই, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

শোধ করি। আমি হিসাব চইব না তো কে চইবে? রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কথা হয় না। চলুন। তৃপ্তির বাড়ি কোথায় দেখিয়ে দিন আমাকে। সেখানে বসে দু'জনের কাছেই আমি হিসেব চইব। হিসেব আমাকে দিতেই হবে। দুর্গালালের ঘরেই উনসত্তর হাজার টাকা। কম টাকা!'

শশাঙ্ক একটুও মচকালো না। পরিষ্কার বলল রজনীই আপনার 'সুজাতা' হিট করিয়েছে। তার সংসার তো এমনিই চলাবেন দরকার হলে উপহার দেবেন। রজনীকে খুশি রাখবেন।'

—সে আমি বুঝবো। তৃপ্তি কোথায়?

—আমরও তেমনি বুঝবো—হিসেব কাকে দেব, কাকে দেব না। রজনী চাইলে নিশ্চয় দিতাম।'

—'কেন শুধু শুধু মিথ্যে বলছেন? সে বেচারী আর কি চাইবে। তার আর বাকি রেখেছেন কি? বাড়িভাড়া। বাজার খরচ। ওষুধ বিষুধে তো আছেই। তারপর আছে দুর্গালাল। সই করাবার সময় হুণ্ডি কেন ওরই কাছে এগিয়ে দিতেন? আপনারাও তো ছিলেন?

—'দুর্গালাল আমাদের সইতে টাকা দিতে রাজি ছিল না।'

—তার মানে জানতো—আপনারা ফেকলু পার্টি। এই তো। পথে আসুন সেই টাকা দু'জনে মিলে উড়িয়েছেন। কী সে ওড়ালেন এত টাকা? তা ছাড়া টিকিট সেলের টাকা ছিল। সে তো অনেক টাকা। কবিয়াল নাটক অন্তত সাত আট লাখ টাকার বিজনেস করেছে।'

—খরচেও ছিল।

—'ধরলাম ছিল। কিন্তু তারপর?'

—'আপনার এত দরদ কেন? জানি কেন।'

—'হ্যাঁ। রজনীর জন্যে আমি চিন্তা করি। ওর জন্যে আমার কষ্ট হয়। রজনী বাংলা স্টেজের লাস্ট অব দ্যি মোহিকান্স ওই লেভেলের আর্টিস্ট আর কেউ বেঁচে নেই এখন। তিন ডিকেড ধরে দাপটে অভিনয় করে আসছে। সব রকমের রোল। বড়বাবু, অহীনবাবু, ছবি বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র—সবার সঙ্গে অ্যাপিয়ার করেছে স্টেজে। অবার এখনকার নাটকও চুটিয়ে হাউস ফুল করে দিয়েছে রক্তের পর রাত। অথচ বাংলা স্টেজ ওকে কী দিল? কী পেল ও? আপনার মত স্বামী যে কিনা তারই প্রেম-প্রার্থীর সঙ্গে জোট বেঁধে তারই টাকা ওড়ায়—তাকেই দেনার পাহাড়ে তলিয়ে দেয়—তারপর সংসার ফেলে পালিয়ে বেড়ায়—অসুখের সময় ওষুধ এনে দিতে হয় আরেকজনের—'

সমান পর্দা দিয়ে আরো অন্ধকার গলিতে শশাঙ্ক তিনটি ক্ল্যাপ দিল। 'সুন্দর রিহার্সেল দিয়েছেন আপনি। পার্ট টনটনে মুখস্ত। এবার নাটক স্টেজ করুন। আমি টিকিট কেটে দেখব।'

গলির অন্ধকার থেকে একটা হাতে টানা রিকসা ঠুন ঠুন করে বেরিয়ে আসছিল। প্যাসেঞ্জার একটা বস্তা—না, মানুষ বোঝা যাচ্ছিল না। বড় রাস্তায় বেশি রক্তের লম্বি তীক্ষ্ণ হর্ন বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছিল।

অমিয় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। খপ করে কলারটা ধরল শশাঙ্কর।

—চলুন। তৃপ্তির সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। কোনদিকে? চলুন। দেখা করবই আমি।'

—'এখন দেখা করে আর লাভ নেই। ক্ষমা ছাড়ুন।'

অমিয় অবাক হয়ে গেল। কত বড় বাড়ি। ভিত মাটির মধ্যে বসে গিয়ে মেঝে কলকাতার চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি নিচে। উঠোনের জল থলল থলল করে ঘরে ঢুকতে চাইছে। জোরে অনেকক্ষণ বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার—কলকাতার ভেতর এত বড় এত পুরনো একটা বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। ঘরে ঘরে

অনিবার্যকারণে বর্তমান সংখ্যায় শ্রীনিমাই ভট্টাচার্যের 'গোধূলিয়া' প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

হ্যারিকেন। শবিকালি বারন্দার ওপর দিয়ে অনেকটা হাঁটিয়ে নিয়ে শশাঙ্ক যে ঘরটার সামনে এসে দাঁড় করালো—তার দরজা থেকেই হ্যারিকেনের আলোতে প্রথম যা চোখে পড়ল অমিয়র তা হল একটা টুলের ওপর গীতাচন্ডীর মত ভক্তি ভরে থাক থাক সাজানো—বান্ডিল বান্ডিল রেসের বই। তার পাশের টেবিলে হরেক ওষুধের ফাইল লাগোয়া খাটে তৃপ্তির মত একটা লোক শুয়ে।

পায়ের শব্দে মাথা ফিরিয়ে তাকালো তৃপ্তি।

অমিয়র বুকের ভেতরটা ধক করে উঠলো। সামান্য আলোয় তৃপ্তির গলের সরানো মংস দিয়ে মাড়ির দু'পাটি শাদা দাঁত দেখা যাচ্ছে। তৃপ্তির ডান দিকের গালে পুরনো কাঁচা টকর সাইজের একটা বড় গর্ত।

—'কে? অমিয়?'

চোখ নামিয়ে নিল অমিয়। কিন্তু কান বন্ধ করতে পারল না।

—'অমিয় ক্ষমা করে দিও অমিয়। আমি আর নেই—'

শশাঙ্ক অস্তে বলল, 'ক্যানসার।'

অমিয় অনেক কষ্টে চোখ তুলে তাকালো। বউয়ের মত একছন মেয়েলোক সেই অন্ধকার ঘরটায় তৃপ্তির পায়ের কাছে বসে। তৃপ্তির চোখ হ্যারিকেনের ফ্যাকাশে আলোয় আরও সুন্দর। কিন্তু এত অল্প আলোতেও গালের মাংস সরিয়ে দু'পাটি শাদা ঝকঝকে দাঁত যেন হাইজিনের ডাক্তারি চার্ট থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

—ক্ষমা করে দিও অমিয়। রজনী বড় ভালো—'

আর বলতে পারল না তৃপ্তি। খুলে-ফেলা ইঞ্জিনের ছড়নো পার্টস হয়ে খাটে পড়ে আছে।

অমিয় দরজা থেকে সরে এল। বড় রাস্তায় এসে অমিয় বলল,—কোনদিকে যাবেন শশাঙ্কবাবু? চলুন আপনার বাড়িতে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাই। রজনী খুশি হবে দেখলে।

—না। ওদিকে এখন যাব না।

—কোনদিকে যাবেন? নামিয়ে দিয়ে যাই।

—আমি হেঁটে যাব।

—ওঃ! আমার গাড়িতে চড়বেন না!

—না।

অমিয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শশাঙ্কর চলে-যাওয়া দেখলো। অভিনেত্রীর স্বামী। অভিনেত্রীর প্রেমিকের বন্ধু। অভিনেত্রীর বন্ধুর শত্রু অভিনেত্রী বেরিয়ে গেলে বুড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। অভিনেত্রী মদের বিরুদ্ধে তাদের চোখে অভিযোগ সাজিয়ে রেখে আসে। চুল দাড়ি কাটা বন্ধ করে দিয়ে এখন খরচ বাঁচাচ্ছে। ভিড়ে হারিয়ে গেল শশাঙ্ক।

স্টিয়ারিংয়ে বসে প্রথম কথাই মনে হল অমিয়র—আমি এখন কোথায় যাব? চউসে? লীলার কাছে? তৃপ্তির ক্যানসারের কথা বলতে রজনীর বাড়ি?

কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে টিয়ারিংয়ে মাথা রেখেই অমিয়র চোখ বুজে এল। তার এখন তর্কাতেও ইচ্ছে করছে না। কোন কিছুই দেখাব ইচ্ছে নেই তৃপ্তিদা। আমি তোমার অভিনয় দেখেছি কলেজে পড়ার সময়। এইতো কিছুক্ষণ আগে দেখলাম—কবিয়ালে—রাজনের রোলে। তুমি গ্রুপ থিয়েটারের একেবারে গোড়ার দিককার লোক। কী অভিনয়! কোনদিন ও রকম পারব না। কোনদিনও না—

ক্লান্তি কয়েক সেকেণ্ডে তার ঘুম গাঢ় করে দিল। ঘুমের পড়া শেষ হয়ে গিয়ে স্বপ্নের পড়া শুরু। সন্ধ্যে রাতে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুমন্ত অমিয়র চোখের সামনে গরম ইস্ত্রি দাঁড় করিয়ে রেখে চণ্ডীদা বলল, এবার একটা বড়ি কর অমিয়। তোমার ছেলেমেয়ে আছে। ভবিষ্যৎ আছে। থিয়েটারের টকা কিন্তু দাঁড়ায় না—

—তাহলে তো আরাম আমাকে খেয়ে ফেলবে চণ্ডীদা—

ট্রাফিক পুলিশ এসে জাগিয়ে দিল অমিয়কে।

(ক্রমশ)

নতুন বই

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ—সুধা বসু। বাক্ সাহিত্য (প্রাঃ) লিমিটেড। ৩৩ কলেজ রো। কলকাতা—৯। দাম পঁচিশ টাকা।

অবনীন্দ্রনাথ কেবল রং তুলি দিয়ে ছবি আঁকেননি, শব্দের ছবি এঁকে একসময় বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শিল্পকৃতি দেশে-বিদেশে সমাদৃত হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পের নবজাগৃতির পিছনে ছিল অবনীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা। প্রাচ্য পাশ্চত্য শিল্পের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে এক নিজস্ব অঙ্কন-রীতি গড়ে তুলেছিলেন যা পরবর্তী সময়ে অনুসৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। বস্তুনিষ্ঠ শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিমূর্ত শিল্পকর্মেরও বিস্ময়কর নিদর্শন কার্টুন কার্টুন। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে আদর্শ শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্ভার ছিল তাঁর শিল্পেরই সম্পূরক। তাঁর ছবিকে জানতে হলে তাঁর সাহিত্যকেও অধ্যয়ন করতে হয়। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য যেন আর এক সৌন্দর্যের জগত। বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে তুলনা মেলা ভার। তাঁর শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর গুরুত্ব অসীম ও অপরিসীম। অবনীন্দ্রনাথের নালক রাজ কাহিনী ঘরোয়া অংলা ভরত শিল্প বাংলার ব্রত জোড়াসাঁকোর ধারে ঘরোয়া আলোর ফুলকি ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ শিল্পায়ন প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

এই অসামান্য প্রতিভাময় পুরুষের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ করেছেন শ্রীমতী সুধা বসু। শিল্প সম্পর্কে তিনি আগেই কয়েকখানি বই লিখে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থেও তাঁর দক্ষতার স্বাক্ষর স্পষ্ট।

অবনীন্দ্রনাথের শিল্পী হিসাবে আত্ম-বিকাশে সহায়তা করেছিল পরিবেশ। কৈশোরে শিল্প প্রতিভার উন্মেষ যৌবনে চিত্রকল্প শিক্ষা ভারতীয় কলা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ইবি হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষকতা জীবন পদ্ধতি ও মুখোশ রচনা পুঁথি পুস্তক চিত্রায়ণ মুঘল চিত্রকলার প্রভাব নিসর্গ চিত্র রচনা পশু প্রাণী রূপায়ণ কার্টুন কার্টুনের রূপকার এবং অবনীন্দ্রনাথের শিল্পের সুগভীর বিশ্লেষণ করেছেন লেখিকা। প্রতিটি আলোচনাই মৌলিক ও বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত। কোথাও অস্পষ্টতা বা যুক্তি-হীনতা চোখে পড়বে না। অবনীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের অধ্যায়টি অসম্পূর্ণ হলেও মূল্যবান। স্বতন্ত্রভাবে তাঁর শিল্পাদর্শ ও সমালোচন রীতির ওপরও আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আছে আরো বহু প্রসঙ্গে শিল্পীর বিভিন্ন কথা। বইটির পাঠক কেবলমাত্র শিল্পী ও সাহিত্যিক অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পরিচিত হবেন না সমকালীন শিল্প জগতের বহু অজানা ও অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাবে। অবনীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে যত বিতর্কের ঝড়ই উঠুক না কেন শ্রীমতী বসুর গ্রন্থ সেক্ষেত্রে নতুন আলোকপাত করবে।

একটি বিশেষ সংখ্যা

চিত্রবীক্ষণঃ (ঋত্বিক ঘটক সংখ্যা)ঃ সম্পাদক—অনিল সেন ২ জওহরলাল নেহরু রোড। কলকাতা—১৩ দাম ১০ টাকা।

ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে ঋত্বিক ঘটক এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। বিতর্ক তাঁর চলচ্চিত্র ও চলচ্চিত্রের বক্তব্যকে ঘিরে কিন্তু ঋত্বিকের প্রয়োগ নৈপুণ্য ও এই শিল্প মাধ্যমটির প্রকরণে তাঁর ক্ষমতার অধিকার নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। চলচ্চিত্রের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ সহজ গতায়াত চিত্রনাট্য রচনা থেকে শুরু করে চিত্রগ্রহণ সম্পাদনা শব্দসংযোজনা অভিনয় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সমান দক্ষ।

ঋত্বিকের এই ক্ষমতার পরিচয় যেমন ছড়িয়ে আছে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ফিল্ম জীবনের সাতখানি ছবিতে তেমনি ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা বহু প্রবন্ধেও তাঁর চিন্তার ফসলগুলো লিপিবদ্ধ। সিনে সেন্ট্রাল তাদের মাসিক মুখপাত্র চিত্রবীক্ষণের সাম্প্রতিক সংখ্যাটিতে ঋত্বিক ঘটকের সেই প্রায় হারিয়ে যাওয়া রচনাগুলিকে একত্রে সংকলিত করেছেন। যেগুলি থেকে তাঁর ছবি করতে না পারার বেদনা (ছবি করা) তাঁর বীক্ষণে চলচ্চিত্রের স্বরূপ (শিল্প ও সততা আমার ছবি ইত্যাদি) ও ঋত্বিকের ঋজু মানসিকতার (সারি সারি পাঁচিল) পরিচয় মেলে।

সংকলনটির মর্যাদা বাড়িয়েছে ওঁর অসম্পূর্ণ ছবি বগলার বজ্রদর্শন-এর সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য। তাছাড়াও আছে নাগরিক কোমল গান্ধার সুবর্ণরেখা যুক্তি তক্কো গপ্পোর চিত্রনাট্যাংশ এবং সর্বশেষে সেই বিষ্ণুপ্রিয়া নামে যে ছবিখানি তৈরীর জন্য এফ এফ সির কাছে ধার চেয়েছিলেন—তার চিত্রনাট্যের সম্পূর্ণ খসড়াটি। বিখ্যাত চলচ্চিত্রকারদের ছবির মত চিত্রনাট্যগুলিও যে সুখপাঠ্য তা পুনঃপ্রমাণিত হোল এইগুলি পাঠ করে।

ঋত্বিকের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের সঙ্গে বিশেষ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাঁর চিন্তা ও মানসিকতা মূল্যায়নের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং ঋত্বিক সম্পর্কে বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর ছবি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সত্যজিৎ রায় গুরুদাস ভট্টাচার্য দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিমাই ঘোষ বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই প্রসঙ্গে ঋত্বিকের ঘটনাবহুল জীবনের কথা প্রসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সুন্দর রচনাটি (ঋত্বিক ঘটক) লিখেছেন শ্রীমতী সুরমা ঘটক। তাঁর মত ব্যক্তিত্বকে যদিও মাত্র আড়াইশ পৃষ্ঠার কোনো পুস্তকে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব নয় তবে এই ঋত্বিক ঘটকের পরিচয় জানার কাজে এই সংকলনটি অপরিহার্য। শুধুমাত্র ঋত্বিক গুরুমুখাপেক্ষীদের কাছে নয় চলচ্চিত্রের ছাত্রদের কাছেও।

রবীন্দ্র গীতায়ন

পি-২৪৭, সি আই টি রোড, কলি-১০
(বি সরকার মার্কেটের সামনে)

শিক্ষাবর্ষ ঃ জুলাই—জুন

৩০ বছরের অভিজ্ঞ বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সংগীত ও রাগসংগীত বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক হইতে উপাধি পাঠ-ক্রমসহ অভিজাত শিক্ষায়তন। বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

অনুসন্ধান ঃ
সাধী বসু, গীতশ্লোকা
শনিবার বিকাল ৬—৮
রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬

প্রকাশিত হয়েছে

স্যার আর্থার কনান ডয়লের

রহস্যজনক উপন্যাস

ম্যারাকট ডীপ

দাম ঃ ৬-০০

নিউস্ক্রিপট, এ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

শ্রীশ কুণ্ডু

লোডশেডিং ?

কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়ায় এর চেয়ে ভয়ংকর বিভীষিকা বোধ হয় আর কিছুই নেই। অসম্ভব। এক মিনিট এই গুদোমে বসে থাকা অসম্ভব। ঝপাঝপ বেরিয়ে যায় হাতপাখা। জামা থেকে গেঞ্জি বেরিয়ে আসে। উদাম গায়ে থাকতে পারলেই বোধ হয় ভালো হোতো কিন্তু তা তো সম্ভব নয় তুলে মালকোচা উঠিয়ে কাজ করা ছাড়া আর উপায় নেই।

বৃষ্টি হয়ে গেছে খানিক আগে। তবু যেন গরম কমেনি। 'জিজ্ঞাসা'র সেলস কাউন্টারে কারো গায়ে জামা নেই। ঠাসা ভিড়। সিঁড়ির তলাতেই সেলস অফিস। ওখানেই কেনা বেচা, টাকা গোনা। ভিড় কাটিয়ে ওপরে উঠে দেখি মালিকের সেই একই অবস্থা মালকোঁচা আর গেঞ্জি হতে সিগারেট। নম শ্রীশ্রীশ কুণ্ডু যার পেছনে জড়িয়ে আছে দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। মনে রাখার মতো একটা গল্প।

একটু গুছিয়ে বলি :

বাড়ির লোকেরা ভেবেছিলেন ছেলেটা একদিন ভালো উকিল হয়ে বংশের নাম বাড়াবে। উকিলের বাড়ির ছেলে এরচেয়ে আলাদা আর কি হবে ফলে ওকালতি পড়তে হোলো। ইন্টারমিডিয়েট ও পাশও হোলো কিন্তু ফাইনাল দেবার আগে মাথায় গুবরে পোকা এসে ঢুকলো। দেশপ্রেমের পোকা। রাতদিন সে মাথার মধ্যে ভোঁ ভোঁ করেই চলেছে। বাস পরীক্ষা মাথায় উঠলো। ওইবারই কথা—কারণ ঢাকার মানিকগঞ্জের এ বাড়িতে তখন আসেননি এমন কংগ্রেসী নেতা তখন খুব কম ছিলেন। পেল্লাই বাড়ি, থাকা-খাওয়া আলোচনার সুবিধে। বাড়ির কর্তাও তখন এদেরই একজন। ফলে হাওয়া লাগলো সেই সময় যখন ইংরেজের শরীরের বইছে তাদের ভয়ায় সন্ত্রাসবাদীদের আতঙ্ক।

অনুশীলন সমিতি ঢাকাতে হয় ১৯০৫এ। পুলিন দাস, পূর্ণ সেন, কালিচরণ ঘোষ তৈলকা মহারাজ অশ্বিনীকুমার ঘোষ-এর চোখ দিয়ে তখন নব্য যুবসমাজ পরাধীন ভারতকে দেখছে। রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠলো তমলুক বাংলাদেশের। ঠিক এই সময় টেররিস্টদের দু দলে ভাগ হয়ে একটা কৃত্রিম যুদ্ধ হয়ে গেল পুলিন দাস আর রজনীমোহন দ্বেষের দলের সঙ্গে। যেমন আমাদের সেনাবাহিনীদের নকল যুদ্ধের মহড়া। রজনী ঘোষ তখন ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেকটর। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই এই দেশপ্রেমের ভিত্তিতেই তার মিল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত স্বদেশী। স্বদেশী আন্দোলনের খানিকটা কলজের মতো।

এমনিতেই ঘাবড়ে আছে ইংরেজ সরকার।

তার উপর আবার মক ফাইট। কেস ফেল গেল। এই যখন মানিকগঞ্জের অবস্থা তখন ১৯৩৫এ কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে এলো। যুবক দাদা সুধীরকুমার কুণ্ডু ইঞ্জিনীয়র। খরচখরচা হিতেন কাকা দেশ থেকে টাকা পাঠতেন। দু বছর বয়সে বাবা মরে যাওয়ায় এ ছেলেটার ওপর কাকার যেন একটু বেশী টান ছিল। কিন্তু টান থাকলে কি হবে, ভবি তো ভেজার নয়। সেই পেকাটিকে তো আর দেশে রেখে আসা হয়নি। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের সেই কথাটা কানে ঢুকলো। ডিগ্রির প্রয়োজন নাই। ডিগ্রি ইজ নাথিং বাট এ টেল বিহাইন্ড এ ম্যান প্রয়োজন যখন নাই, তখন দরকারো নাই। পড়া শিকেয় উঠলো। পড়তে গেলেন চাষবাস। কলেজ-এর পড়াটা বড় কথা নয় বুঝছো? হেই মানুষ হওয়াটা হইল হগ কতা' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই কথা—মানুষ হতে হবে— শ্রীশ মানুষ হতে হবে। বিনয়েন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে ভর্তি হলেন বি এন পাল এগ্রিকালচারাল স্কুলে। ততদিনে হাতে এসে গেছে—এস সি মৈত্র-র 'এ রিকভারী প্ল্যান ফর বেঙ্গল। বুক

জিজ্ঞাসা

সাহিত্যের নেপথ্যে

কম্পানি থেকে যেদিন বইটা বেরুলো সেদিন প্রথম বইটা কিনলেন শ্রীশবাবু। চাষশেখা স্কুলে ঢুকে দেখলেন—ওমা, এযাব কি শেখায়। কেমন করে লাঙ্গল ধরে, তথ নম কি পেকামকড়ের নাম। কাট-বাঙালের ছেলেদের এসব অবার পড়ে শিখতে হয় নাকি? ডবল প্রমোশন। তবু যেন হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হোলো সেই মানিকগঞ্জে। কাকা বললেন—এভাবে তো সময় নষ্ট করা তো কাজের কজ নয়। কিছু একটা কর। বাংলায় জুট রেভ্লিউশন চলছে। পাট চাষ কমিয়ে দাও। এস অমেদ তখন মানিকগঞ্জের এস ডি ও। তার বাগানে তিনি ফুলের গাছে সার দিচ্ছিলেন। তাকেই জ্ঞান দিয়ে বসলেন শ্রীশবাবু। এভাবে সার দেবেন না অমেদ সাহেব, দিলে গাছ যাবে। গেল ও। তখন শ্রীশবাবুদের বাগানে দারুণ ফুল ফুটছে। আমেদ সাহেব তক্ষুনি ছেলেটিকে জুট বেভ্লিকশন অফিসার' করে দিল মানিকগঞ্জ অর ঢাকা সদর ডিভিশনের কর্তা। আগেই বলেছি—মারে হরি রাখে কে! টাইসন সাহেব তখন ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট। ডেকে পাঠিয়ে বললেন—তুমি টেররিস্ট? তোমার নমে পুলিশ রিপোর্ট আছে। যাক চকরী যখন করছো। কর। কিন্তু তোমাকে সারা জীবনের জন্যে মচলেকা দিতে হবে। শ্রীশবাবু স্বদেশী দাদার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন—ভাইদা এইডা কি কইতাসে করমুডা কি?' —ভাইদা রেগে বললেন—হুলার ব্যাটা জত যদি দিবার চস তো যাবি। দিয়ায়। না করবো ক্যাডা? চকরী করা হোলো না।

পাঠক, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভাবছেন যে একটা প্রকাশনীর কথা লিখতে গিয়ে এসব এগুচ্ছি কেন? কেনর একটা উত্তর—'জিজ্ঞাসা' পশ্চিম বাংলাদেশের এমন একটা প্রকাশন সংস্থা, যাঁরা কখনো গল্প উপন্যাস টেকসট রমারচনা বের করেন নি। জীবনী অর শুধু রিসার্চ পেপরের মতো বইয়ের আদর্শে কপর্দকহীন অবস্থা থেকে আজ প্রায় দেড়শো বই এবং পাঁচ লাখ টকর রানিং ক্যাপিটল করেছেন। যেখানে লিখেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ মানুষেরা একমাত্র জিজ্ঞাসার তালিকা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এঁরা এঁরা এসে জিজ্ঞাসাকে অলঙ্কৃত করেছেন? এই সব বইয়ের লেখক—মানবেন্দ্রনথ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, যোগেশচন্দ্র বাগল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, হবেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী গিরিজাশঙ্কর, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, ভবতোষ দত্ত। পড়তে পড়তে মথা ঘুরে যায়। আর সব প্রবন্ধের বই? কি করে সম্ভব হোলো কি করে তথাকথিত 'বজর'-ছাড়া বিষি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে এত ভারী ভারী' বইগুলো প্রকাশ করে যচ্ছেন যে লোক তার মানসিকতা কি? কোন সে আদর্শ। তাই এই গৌরচন্দ্রিকার একটু প্রয়োজন। কারণ ঝপ করে বাজারে এসে দু পয়সা বামাবর ধন্দা হলে— দু হাতে বের করে যেতে হয় রগরগে মার্ডারি সাইজের উপন্যাস, কেচ্ছা ক্রাইম। তাতে চাঁদা আসে, দুটো পয়সা হয়। পঞ্চাশ ভাগের মানসিকতা এই। সেখানে জিজ্ঞাসা দীর্ঘকাল ধরে শুধু রশভারী বই শিক্ষার প্রসারে সুন্দর করে ছেপে যচ্ছেন এমন যে মনস্থ সে কি ভুঁইফোঁড় মানসিকতা নিয়ে? এন্সি এন্সি এসব হয়? হয় না। আর হয় না বলেই—পঠক, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন— একটু বাজিয়ে নিচ্ছি।

যাক গে, ফিরে যাই সেই কথায়।

আবার বিদ্যাসাগর কলেজ। বয়স তখন কত অর হবে—২১।২২। এবার জলে ছাত্র অন্দোলন। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল স্টুডেন্ট ফেডারেশন প্রথমে শ্রীশবাবু হলেন —উত্তর কলকাতা ইউনিটের কার্যকরী সমিতির সদস্য। তারপর—কেন্দ্রিয় কমিটির সহ-সভাপতি। সিটি কলেজ প্রথম আরম্ভ হয় বি ক্লাসে ভর্তি হলেন। ৪১ সলে পরীক্ষা দেওয়া হোলো, ৪২-এ পাশ করলেন। কলেজ সহপাঠীরা ছিলেন কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশ্বনাথ মুখার্জি আর প্রমোদ সেন, বিমল মজুমদার প্রমুখেরা। পাশ করে এবার পকপাকিভাবে মানিকগঞ্জে গিয়ে ওকালতি করতে হবে। অবর মানিকগঞ্জে চলে যেতে হবে? উকল হয়ে? একটা বইয়ের দোকান করলে হয় না? ইতিমধ্যে মনটন বদলেছে। শ্যামাচরণ স্ট্রীটে একটি প্রকাশনীর দোকানে বসছেন শ্রীশবাবু অল্প মাইনের কর্মচারী।

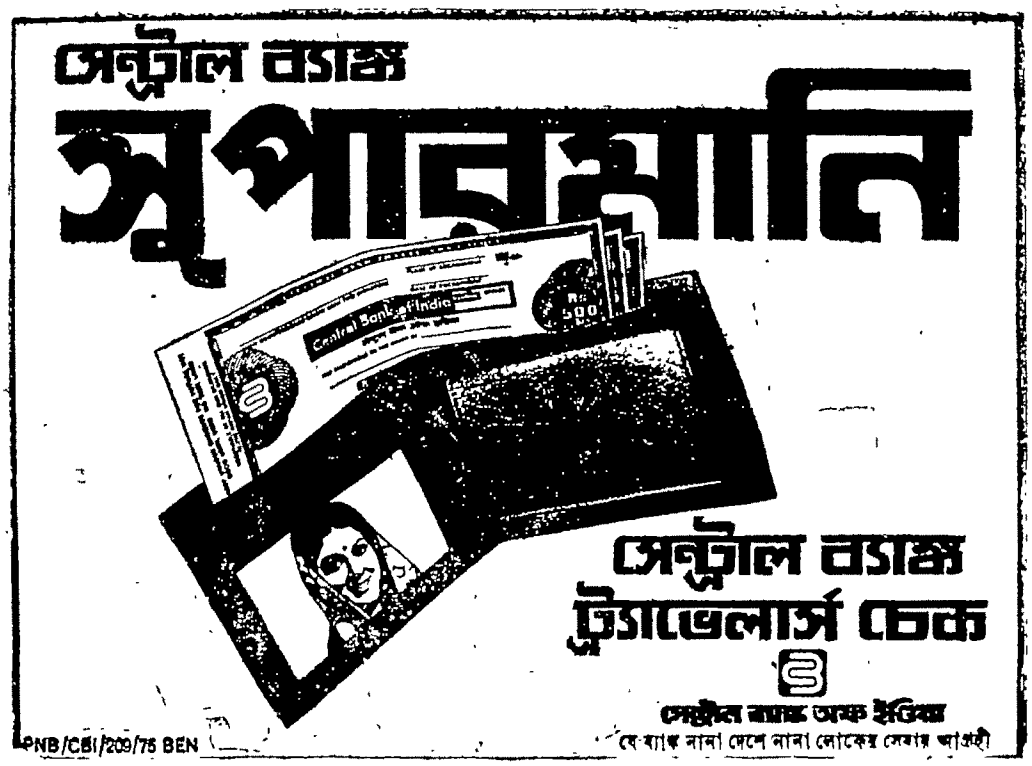

ভারতী ভবনে তখন দেখা হোতো প্রিয়রঞ্জন সেন মশায় আর ত্রিগুণা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ভীম নাগের সন্দেশের মতো গিলছি বাইরের বই আর দেশ-বিদেশে কারা কবে কমনওয়েলথকে গালাগাল দিচ্ছে—বলছে বেঙ্গলিশনের নামে কেমন করে চলছে সিভার অফ পাওয়ার। আর য়ুরোপীয়রা বলছে কিভাবে ইন্ডুলিশনের বিশ্বাসী ওরা বেঙ্গলিশনে বিশ্বাসী অথচ বেঙ্গলিশেন ইজ নথিং বট এ লং জাম্প অফ ইন্ডিউলিয়েশন। ইঞ্জিনীয়ার দাদার বাড়িতে থাকেন ওখানে থেকেই এসব ক্রিয়াকলাপ চলছে। দাদার বাড়িতে আর থাকা হয় কতক্ষণ মেসের প্রায় সব দিন কটান বস্তীতে রাত। পটি পড়শোনা আর বইয়ের দোকানে বসা। দাদা ভাইয়ের এই বয়ে যাওয়া পছন্দ করছেন না। বালীগঞ্জে সেখানে এখন 'জিজ্ঞাসা'। ওখানে রেনেশাঁর কালচারাল সংস্থা ছিল। তার আগে ছিল দাদার অফিস, দাদা তখন আসামে। ঘর দখল করল রেনেশা। কল্যাণীদি মানে কল্যাণী কার্লেকর নলিনী দাশ ঈশান স্কলারশীপের টাকা দিয়ে আলমারী করেছিলেন। যাই হোক প্রিয়-রঞ্জনবাবুকে এটা কি, ওটা কি নানান জিজ্ঞাসায় ব্যতিব্যস্ত করতেন শ্রীশবাবু। নতুন দোকান করার কথা উঠতেই প্রিয়-রঞ্জনবাবু বললেন—রাত-দিন এটা জিজ্ঞাসা ওটা জিজ্ঞাসা কর। তোমার দোকানেরও নাম হোক জিজ্ঞাসা। রেনেশা আলমারী দুটো হল প্রথম বই রাখার জায়গা। প্রিয়-রঞ্জনদা, বিনয়দা এ দোকান ও দোকান থেকে বই সংগ্রহ করে দিলেন। প্রথমেই আমার প্রতিজ্ঞা হল — আমার স্বদেশী দাদারা যেভাবে লাইব্রেরীতে গেলে বই সাজেশন দিতেন ঠিক সেভাবে 'জিজ্ঞাসা'কে গড়ে তুলবো, আর জীবনে টেকসট বইয়ের ব্যবসা করব না তবে অর্ডার সাপ্লাই গেলে কি করা যাবে। জীবনী আর চিরায়ত সাহিত্য। নানা জীবনীর মাধ্যমে মানুষ হোক পরিচিত অনন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। তাঁদের জীবন-ই হোক আমাদের পথ। এই শপথ নিয়ে যে জিজ্ঞাসা শুরু হয়েছিল কপর্দকহীন অবস্থায়। সে ট্রাডিশন আজও চলছে। প্রায় ষাট বছরের শ্রীশবাবু কাঁধে নিয়ে চলেছেন তাঁর সংগ্রামী ইতিহ্য।

—কিন্তু শ্রীশবাবু, ব্যবসা জমে উঠলো কবে?

ঃ চলে যাচ্ছিল, তবে একটা ঘটনাও জিজ্ঞাসাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সেই গল্পটা একটু বলি—

—দেখুন, আমরা, মানে র‍্যাডিক্যালের লোকেরা রবীন্দ্রনাথকে খুব একটা সুবিচারের চোখে দেখি নি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল, বড়লোক জমিদার, উঁচুতলার মানুষ কি বুঝবেন উনি দেশের লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মেহনতি মানুষের কথা। তারপর স্বরাজ দেশ সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথকে পড়তে শুরু করলাম। অবাক হয়ে যত পড়ি তত মুগ্ধ হই—এ মানুষ তো এত বড় সে তো অজানা ছিল। বিশ্বাস করুন সেই প্রথম সহজ পাঠ হাতে নিয়ে দেখলাম—

'বনে থাকে বাঘ
চাকা চাকা দাগ'

ছোটদের বোঝবার জন্যে কি স্পষ্ট ছন্দোময় ব্যঞ্জনা! এ বই সব স্কুলের পাঠ্য হওয়া উচিত। ডি পি আই-এ তখন বিশ্ব-ভারতী বই দিত না। আমি নিজের পয়সায় বই কিনে স্কুলে স্কুলে দিয়েছিলাম। এবং অনুমোদনের জন্যে ডি পি আই-এ এবার ডি পি আই থেকে বিশ্বভারতীতে চিঠি এলো—অনুমোদনের জন্যে আরও কয়েক কপি বই দরকার। চিঠি পড়ে তো গ্রন্থন বিভাগ অবাক। কে দিয়ে এলো বিশ্ব-ভারতীয় হয়ে বই। তখন অধিকর্তা ছিলেন চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। খবর চাপা রইল না। প্রিয়রঞ্জনবাবুও যুক্ত। কথা প্রসঙ্গে আমার কথা উঠলো। চারুবাবু বললেন ছেলেটাকে একবার দেখতে চাই। প্রিয়রঞ্জনবাবুর সঙ্গেই একদিন এলাম। চারুবাবু বললেন জিজ্ঞাসা উঠিয়ে ওখানে আপনি আমাদের বিশ্বভারতীর দোকান করুন আর বিশ্ব-ভারতীর কর্মী হয়ে যোগ দিন। লোভনীয় প্রস্তাব কিন্তু সে প্রস্তাব মেনে নেওয়া হল না। বললাম যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা বিশ্বভারতীর দক্ষিণ কলকাতার এজেন্ট হতে পারি। দু হাজার টাকার মত বই বিক্রী করার অধিকার এলো 'জিজ্ঞাসা'র। ১৯৪৫ সালে বেরুলো জিজ্ঞাসার প্রথম বই কোটনিসের—ফেরে নাই শুধু একজন।

এমন অজস্র গল্প জড়িয়ে আছে 'জিজ্ঞাসার শরীরে। কতটুকু বলা যাবে কতটুকু বলা যায়। ষাট বছরের প্রবীণ শ্রদ্ধেয় শ্রীকুণ্ডু এখনও ঠিক সেইভাবে চলাচুলোহীন সংগ্রামী চেহারার সঙ্গে ইদানীং মিশিয়েছেন ঠাকুরের নাম। ঠাকুর শ্রীশ্রীপরমানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে সময় পেলেই কাটে সৎ চিন্তায় সৎ ভাবনায়। আজ মনে পড়ে সেই সব মনীষী লেখকদের কথা যাঁদের অগ্রহ সহযোগিতা ছাড়া 'জিজ্ঞাসা'কে বাঁচনো যেত না—সেই প্রিয়রঞ্জন সেন, অতুল গুপ্ত সজনী দাশ, পুলিন-বিহারী সেন, বিজন ভট্টাচার্য, গৌরী শাস্ত্রী। এখনও নিয়মিত কলেজ বো-এর দোতলায় আসেন, পুরনো বন্ধুরা সহ-যোগিতার মন নিয়ে বসেন চায়ে পানে সিগারেটে আড্ডায় জমে ওঠে জিজ্ঞাসার দোতলার খুপরী ঘর। আসেন না প্রিন্টিং একসপার্ট রামেশ্বর দে। মারা গেছেন। সঙ্গে থাকেন অরবিন্দ ভট্টাচার্য, গৌরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেন নিয়োগী এবং কাছের শুভানুধ্যায়ীরা কাকে ছেড়ে কার কথা বলবেন কুণ্ডুবাবু। এক ছেলে পার্থ এখন এয়ারফোর্স কমান্ডার।

—তাহলে? তাহলে আপনার এই স্বপ্নের 'জিজ্ঞাসা' দেখবে কে?

ঃ কেন আমার মেয়ে মঞ্জুলিকা। বিয়ের পর ভট্টাচার্য হয়েছে। জামাই দেখছে এখন জিজ্ঞাসা। ও নিজেও একটা পুস্তক প্রকাশনী করেছে যার নাম 'বেস্ট বুকস'।

—জিজ্ঞাসা চলবে। আদর্শটা মূলধন নিয়ে।

শাণ্ডিল্য চতুর্বেদী

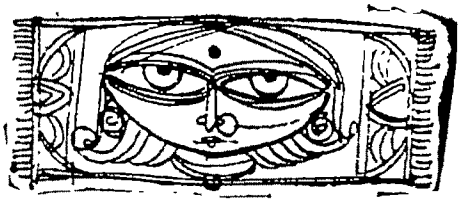

প্রতিপক্ষ

দেবল দেববর্মা

গুলু ওস্তাগর লেনে একটা ফ্ল্যাট বাড়ি খালি আছে। খবরটা পাওয়া গেল নকুড় সহার কাছে। নকুড় সহা বাড়ির দালাল। রোগা চামচিকে চেহারা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরনে ধুতি আর হাফ-শার্ট। অফিস ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে একগাল হেসে বলল—গুলু ওস্তাগর লেনে একটা দু-কামরার ফ্ল্যাট বাড়ি খালি আছে। এই মাত্তর খবর পেয়ে দৌড়ে আসছি। একবার দেখবেন তো চলুন স্যার।

ওর কথা শুনে ভুরু কোঁচকাল সুকান্ত। হাতের ফাইলটা সরিয়ে রাখল। নকুড় সহার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হাসিটা মিষ্টি। মনে হচ্ছে বাড়িটা ভালো। তাছাড়া ফ্ল্যাট বাড়ি যখন। নির্ঝঞ্ঝাট থাকা। কারো সঙ্গে লতায় পাতায় কোনো সম্পর্ক নেই। সুকান্ত তাই চায়। সুমতিও এমনি বাড়ি পছন্দ করে।

কুচবিহার থেকে হঠাৎ বদলি কলকাতায়। অর্থ বদলি মানেই একরাশ চিন্তা। মালপত্র লটবহর বাঁধাছাঁদা। ঠাঁই-নাড়া হয়ে আবার নতুন জায়গায় চলা নতুন করে সংসার পাতা।

মফঃস্বলে বসে সংকটের এই কঠিন রূপটা ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি সুকান্ত। তা হলে কী সাত তাড়াতাড়ি এমনি চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসত? নিশ্চয় বদলি রদ করবার জন্য দরবার করত। অন্তত-পক্ষে দু-চার মাস সময় ভিক্ষা। ইতিমধ্যে খোঁজখবর করে একটা চলনসই অন্তানার জোগাড় না করা পর্যন্ত সে কিছুতেই রওনা হত না। আর সুমতি? তার কথা না বলাই ভালো। কলকাতায় এসে এমন রিফিউজীর হাল হবে জানলে সে কখনও আসতে রাজি হত? চাল নেই চুলো নেই। পরের ঘরে আশ্রয়। ছি ছি। এমন অবস্থায় তাকে পড়তে হবে একথা কী সুমতি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিল?

সত্যি কলকাতায় ঘর পাওয়া সমস্যা। মফঃস্বলে তবু অন্তানা মেলে। পছন্দ মত না হোক মোটামুটি ঘাড়ি-চাঁড়ি পাওয়া যায়। অনেক স্টেশনেই ব্রিটিশ আমলের সাবেকী কেয়ার্টার্স আছে। বড় বড় ঘর। অনেক দরজা-জানালা। লাল রঙের পেল্লাই বাড়ি। সেখানে খেলোমেলা আকাশ বাড়িতে উঠোন সামনে বাগান। দিব্যি ছাদ ইচ্ছে মত হাত-পা ছড়িয়ে থাক। স্থান সংকুলানের কথা কোনোদিন ভাবতে হবে না।

আর কলকাতায় শুধু ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই রব। ছোট ছোট ঘর। উঠতে বসতে প্রায় গায়ে গা ঠেকে। কিন্তু উপায় নেই। এর বেশী পাবে কোথায়? এই ভাগ্যে জুটেছে তাই ঢের।

সুকান্ত এসে উঠেছে পিসিমার বাড়িতে। দূর সম্পর্কের নয়... নিজের পিসিমা। তা পিসিমাও ভাড়া বাড়িতে থাকে। কিন্তু ছ'খানা ঘর দখলে। জর্জ দি ফিফথের আমলের না হলেও অন্তত তিরিশ বছর আগের ভাড়াটে। সেই সব ছয়ছাড়ির মত সস্তা গণ্ডার দিন। টাকায় ছ-সের দুধ। আট-দশ টাকা মণ চাল। আর অমনি একটা

দেড় কেজি ওজনের টাটকা ইলিশ। তেমনি বড়ির ভড়া। সন্ধ্যেবেলায় চায়ের অসরে পিসিমা এখনও সেই পুরনো দিনের গল্প করে।

আদরে অভ্যর্থনায় এক চুল ফাঁক রাখেনি পিসিমা। নজর তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে। একটা ভালো ঘর ভাইপো অরবিন্দকে ছেড়ে দিয়েছে। মুখে সর্বদাই বলে—'যতদিন ভালো বড়ি না পচ্ছ ততদিন বৌমাকে নিয়ে এখানেই থাকবে। আর আমি কী পর বাবা? কথায় বলে বাপের কোন পিসী। দাদা বেঁচে থাকতে কলকাতায় এলে তো এই বাড়িতেই উঠত।'

আপ্যায়নের এই বহর। তবু সুমতি কেমন যেন আড়ষ্ট। সংকোচ আর লজ্জায় কনে-বউয়ের মত জড়সড়। সেই প্রথম দিন থেকে। রাত্তিরবেলায় তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল—'ওগো বড়ি খুঁজে পেতে তোমার কতদিন লাগবে?'

কতদিন? সে কথা সুকান্ত কেন শিবের বাবাও বোধহয় বলতে পারবে না। কলকাতায় খালি বাড়ির খবর পাওয়ার চেয়ে খড়ের গাদায় হারানো ছুঁচ খুঁজে পেতে বের করা অনেক সহজ। তবু স্ত্রীর মন রাখতে সে বলল—'বেশী দিন লাগবে না। এই ধর এক মাস।'

—'এক মাসের বেশী কিন্তু আমি এখানে থাকতে পারব না। তাহলে আমাকে এলাহাবাদে রেখে এস।' সুমতি চপা বিরক্তির সুরে কথা কইল।

এলাহাবাদে অর্থাৎ সুমতির পিত্রালয়ে। বড়লোকের মেয়ে। তাই বাপের বাড়ির খুঁটির জোরটা বেশী। সদম্ভে সে কথা প্রকাশ করে। মাসখানেকের মধ্যে বাড়ি খুঁজে না পাওয়া গেলে কী হল হবে সে কথা চিন্তা করতে পারে না সুকান্ত। শেষ পর্যন্ত হয়তো সুমতিকে এলাহাবাদে রেখে আসতে হবে। তবু সে বলল—'কেন? এখানে কী তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

—'অসুবিধের কথা নয়।' সুমতি বেকাতে চাইল। 'আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে কখনও বেশীদিন থাকতে আছে? কী বিশ্রী লাগে আমার। এক মাস থাকতে বলছ তাই ঢের। বরং তার আগেই চলে যাওয়া উচিত।'

উচিত নিশ্চয়। একশ বার। সুকান্ত তা স্বীকার করে। আর সেজন্যই তো প্রায় আদাজল খেয়ে বাড়ি খুঁজতে লেগেছে। তাছাড়া শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়। তার আসবাবপত্র খাট-আলমারি ড্রেসিং-টেবিল আরো ফার্নিচার। পিসিমার বাড়িতে তার কতটুকু আনতে পেরেছে? সব পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। তিন-চার জায়গায় বন্ধু-বান্ধবদের ঘরে। সিঁড়ির নীচ প্যাকিং-কেস ডাঁই করা। কিন্তু এভাবে কতদিন চলে? পরের বাড়িতে জিনিসপত্র বেশীদিন রাখলে তারা অনাবশ্যক জঞ্জাল বলে মনে করবে।

টেবিলের উপর এখনও অনেক ফাইল জমে। সব শেষ করে উঠতে ঘড়ির কাঁটায় প্রায় চারটে বাজবে কিন্তু নকুড় সাহার নিশ্চয় অত ধৈর্য নেই। বাস্তু দালাল। চরকিবাজির মত এখানে সেখানে দৌড়ে বেড়চ্ছে। তাছাড়া মুখের ওপর একজন লোককে স্রেফ বসিয়ে রেখে কী ফাইলে নোট লেখা যায়? অগত্যা সুকান্ত বেরোবার জন্য তৈরি হল। এখন প্রায় অডাইটে বাজে। নিঃশব্দে কেটে পড়লে কেউ কী টের পাবে?

নকুড় সাহার মুখে জবজবে ঘাম। জমাটা ভিজে গায়ের সঙ্গে প্রায় লেপটে গেছে। বাইরে ধবধবে তুলোযাবার মত শাণিত রোদ্দুর। মার্চের শেষেই এবার বেশ গরম। দুপুরের আকাশ বিবর্ণ পাণ্ডুর। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে কী অবস্থা হবে কে জানে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার আগে সুকান্ত জিজ্ঞাসা করল—'বাড়ির ভড়া কত?' কিছু খবর নিয়েছেন?'

নকুড় সাহা মাথার চুলে হাত বুলিয়ে জবাব দিল—'যারা ছিল তারা আড়াইশ টাকা দিত। আপনার কাছে হয়তো তিনশ চাইবে।'

—'আর কিছু?'

নকুড় সাহা প্রশ্নটা বুঝতে পারল। চশমার ফাঁক দিয়ে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—'অ্যাডভান্স কিম্বা সেলামীর কথা জিজ্ঞাসা করছেন?'

—'হ্যাঁ। সেলামী-টেলামী লাগবে নাকি?'

—'লাগতে পারে।' নকুড় সাহা একটু চিন্তা করে বলল—'বাড়ির পজিশন ভালো। দক্ষিণ খোলা মোজেইক করা মেঝে। সামনে ব্যালকনি আছে। তবে হ্যাঁ সেলামী দিলে ভড়াটা হয়তো একটু কম হতে পারে।'

এই বেওয়াজ। নকুড় সাহা মিথ্যে বলে নি। ভড়া বাড়ির সুলুক-সন্ধান নিতে গিয়ে সুকান্তর অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। যে বাড়ির ভড়া চারশ টাকা পাঁচ হাজার টাকা সেলামী গুনে দিলে তাই নির্ঘাত সড়ে তিনশ কিম্বা তিনশ টাকাতেও নামতে পারে। মোটা অ্যাডভান্স দিলেও বাড়ির ভড়া কমে। গত সপ্তাহে ভবানীপুরে একটা বাড়ির খোঁজ পেয়েছিল সুকান্ত। তিন তলার উপরে দু-কামরার ফ্ল্যাট। চমৎকার বাড়ি। পুব-দক্ষিণ দুই খোলা। সামনে ছ-ফুট চওড়া একটা বারান্দা। ঘরগুলো বেশ বড়। একটা বোধহয় বেডরুমই চেম্বার হবে। ভাড়াও বেশী নয়। মোটে আড়াইশ টাকা। কিন্তু সেলামীর অঙ্ক শুনে ঠিক ফণা তোলা কেউটে সাপ দেখার মত তিন পা পিছিয়ে আসার অবস্থা। বিশ হাজার। তবে সুকান্ত হটে এলেও বাড়ি একদিনও খালি থাকে নি। এক অবাঙালী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পরের দিনই নগদ টাকা গুনে দিয়ে ফ্ল্যাটটা দখল করে নিল।

নকুড় সাহা তাড়া দিল 'চলুন স্যার। শুভস্য শীঘ্রং। দেরি করলে আবার বাড়িটা ফস্কে যেতে পারে।'

—'তা সত্যি। কলকাতা শহরে খালি বাড়ি কী পড়ে থাকার জো আছে? ঠিক রামায়ণের সোনার হরিণের মত। এই আছে এই নেই। মরীচিকার মত মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ?

বড্ড রোদ্দুর। তাই একটা ট্যাক্সি করেই গুলু ওস্তাগর লেনে পৌঁছল সুকান্ত। গাড়ি থেকে নেমেই বাড়িটা দেখাল নকুড় সাহা। তিনতলা বাড়ি। নীচে দোকান ঘর। দোতলায় দুখানা ফ্ল্যাট। ডান দিকের ফ্ল্যাটটা খালি মনে হল। বাড়িওলা তেতলায় থাকে।

নকুড় সাহা চাপা গলায় বলল—'বাড়িটা অবশ্য পুরনো। কিন্তু এমন রং-চং করে রেখেছে যে বাইরে থেকে চট করে বুঝতে পারবেন না। বছর পাঁচ-ছয় আগে ভদ্রলোক এটা কিনেছেন।'

—'তাই নাকি?'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ।' নকুড় সাহা ফের চুলে হাত বুলোল বলল—'কপাল স্যার। নইলে হরিসাধন ঘোষ একটা হোমিওপ্যাথ ডক্তর। বছর দশেক আগে প্রায় কিছুই ছিল না। আর এখন? কী পশার! সন্ধ্যেবেলায় চেম্বারে গেলে দেখবেন অন্তত তিরিশজন রুগী বসে আছে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠল দুজনে। তিনতলার ফ্ল্যাটে ঢুকতে শক্ত কোলাপসিবল গেট। ভিতরে তালা ঝুলছে। বাইরে কলিং বেলের সুইচ। কোনো সাড়শব্দ নেই। মানুষজন আছে বলে মনে হয় না।

দু-তিনটে সিঁড়ির নীচে মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুকান্ত। নকুড় সাহা সামনে। বেল টিপতেই মিনিট খানেক পরে এক ভদ্রমহিলার সাড়া পাওয়া গেল। কোলাপসিবল গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—'আপনারা কাকে চান?'

—'হরিসাধনবাবু বাড়িতে আছেন?'

—'না। উনি একটা কলে বেরিয়েছেন।'

নকুড় সাহা বলল—'দোতলার একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে শুনলাম। এই ভদ্রলোক ভড়া নেবেন। তাই ডক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চান।'

আড় চোখে সে বোধহয় সুকান্তকে নিরীক্ষণ করল। ভ্রূ কুঁচকে কী যেন চিন্তা করে বলল—'তাহলে ভেতরে, এসে বসুন। রুগী দেখে উনি হয়তো আর একটু পরেই ফিরবেন।'

...ছাড়া কিছু করার নেই। বরঞ্চ...
...একটা চাকরী যোগাড় করতে চেষ্টা করুন। ডাক্তার...
...সঙ্গে কথা বলে যাবেন। টেলি...
...করে আমি অফিস থেকে দেখা করব।'

...পেরিয়ে গেল, 'পরিমল সংবাদ...
...ঢুকল। বাঁদিকে দুইং রুম। দিবি...
...গোছানো। দেওয়ালে হালকা...
...রং। সমস্ত। টাঙানো ছবি...
...শক্তি সুরুচির নিদর্শন ছিল। বসবার...
...চকচকে পালিশ করা সেগুন কাঠে...
...সোফা সেট। বাঁদিকে ছোট্ট টেপোয়া টেবিলের...
...টেলিফোন।

...বসতে বসতে মাসীমা ভিতরে চলে...
...সুকন্যার একটু অস্বস্তি লাগছিল। ...
...একলি বসে থাকা। সঙ্গের পুরু...
...কার্পেটে পা ডুবে যাচ্ছে। সমস্ত...
...ঘরময় একটা অস্পষ্ট সুগন্ধ। ...
...একটা ম্যাগাজিন টেনে নিল।

...মিনিট তিনেক পরে সে অবশ্য হাল...
...একটা ঢেকুর তুলে ফোনে পরিমল বাবু...
...সন্দেশের উপর সুজানো সন্দেশ।

...অবাক। কী ব্যাপার? সে...
...ছবার জন্য একেবারে উন্মাদ মনে...
...ছুটে বলে যাচ্ছিল কার বাসিয়ে...
...আপ্যায়ন করবার জন্য বাড়ির মালিক...
...হরিসাধনবাবু স্বয়ং ফিরে এসে...
...ছুটে অবস্থায় দেখলে কী মনে...

...সুকন্যা মরণ-বাঁচন করে একটা কিছু...
...বলল—মাসীমা আমাকে এখন ফিরতে...
...অনেক কাজ। ভদ্রতার খাতিরে...
...একবারটি দেখা হল, তবে...

...সুকন্যার কথা, আর শরীরের ভঙ্গিতে...
...নির্লিপ্ত ভাব সে হেসে বলল...
...সুকন্যার মুখের দিকে একটু তীক্ষ্ণ...
...পারলি না এই না সুকন্যা?'

...সুকন্যার কিছু বলবার প্রবৃত্তি...
...না। মাথা তুলে ভালো করে...
...মুখে একটি চিন্তে পড়ল। ...
...সমস্ত ঘরটি ঝিলিমিলি করছে। ...
...ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র যেন...
...ঘিরে ধরেছে। ...
...সমস্ত ঘরটি ঝিলিমিলি করছে। ...
...ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র যেন...
...ঘিরে ধরেছে। ...
...সমস্ত ঘরটি ঝিলিমিলি করছে। ...
...ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র যেন...
...ঘিরে ধরেছে।

...সুকন্যার কিছু বলবার প্রবৃত্তি...
...না। মাথা তুলে ভালো করে...
...মুখে একটি চিন্তে পড়ল

ভদ্রলোক যদি আবার কাউকে পাকা কথা দিয়ে ফেলেন।'

—উঁহুঁ। সে ভয় নেই।' হৈমবতী মুচকি হাসল। বলল,—'বাড়িটা আমার নামে তো জানেন তো সুকান্তদা? আমাকে জিজ্ঞাসা না করে উনি বোধহয় কাউকে কথা দেবেন না। তাছাড়া ভাড়ার রসিদে তো আমাকেই সই করতে হবে।'

—'তাই নাকি?' সুকান্তকে খুশি মনে হল। সহাস্যে বলল—'তাহলে কথা দাও হৈম। ফ্ল্যাটটা আমাকেই দেবে?'

—'আপনাকে দিতে কোনো আপত্তি নেই। তবে ওর সঙ্গে আগে কথা বলুন না। তারপর আমি তো আছি।' হৈমবতী হেসে তাকে অনেক ভরসা দিল।

—দুই—

হরিসাধন বেশ অল্প কথার মানুষ। তার আগমনের উদ্দেশ্য শুনে পরিষ্কার বলল,—'মাসে তিনশ টাকা ভাড়া আর পাঁচ হাজার টাকা সেলামী। দিতে পারবেন তো?'

—'পাঁচ হাজার!' সুকান্তকে ঠিক চাকুরীপ্রার্থী বেকার যুবকের মত অসহায় দেখল। বলল,—'এর চেয়ে একটু কম হয় না?'

—'না মশায়। সেলামীর টাকা কম করতে পারব না। ওটা লাগবে। দুটো ঘর রং করতে অনেক খরচ। যা দাম রংয়ের। তাছাড়া বাথরুমের ওয়াশ বেসিনটা ভেঙেছে। টুকি-টাকি আরো অনেক কাজ।' ফের বা হোলটা সামান্য ছোট করে বলল—'আপনিই বলুন না, এসব কাজ কেউ ঘর থেকে মাসকাড়ি বের করে? মাছের তেলেই তো মাছ ভাজতে হবে মশায়।'

রাগে সুকান্তর গা জ্বলছিল। কী বিশ্রী কথার ধরণ। মানুষটার চোখের চামড়া নেই। অন্ত চামার। পাঁচ হাজার টাকা সেলামি কেমন অনায়াসে চাইতে পারল। ঘৃণা ছি, ছি! হৈমর মত একটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে এই অর্থপিশাচ অসভ্য লোকটার বিয়ে হবে?

তবু সুকান্তকে হেসে কথা কইতে হল। বলল—'আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন। কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত। টাকাটা অবশ্য জোগাড় করতে হবে বৈকি?'

হরিসাধন ঘোষ বেশ উদার ভঙ্গিতে বলল—'তাতে আপত্তি নেই মশায়। টাকা পয়সা জিনিসটা হাতের ময়লা ছাড়া কিছু নয়। তবে আপনি সরকারী চাকরি করেন। ছোট ফ্যামিলি। রাজি থাকলে ফ্ল্যাটটা আপনাকে ভাড়া দিতে পারি।'

রাস্তায় নেমে সুকান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। পাঁচ হাজার টাকা সেলামি দেবার তার সঙ্গতি নেই। সুতরাং কাল সন্ধ্যেবেলায় আর এখানে আসবার কোনো প্রয়োজন হবে না। মিছিমিছি লোকটার কাছে সে সময় চাইতে গেল। এর চেয়ে দুটো কড়া কথা শুনিয়ে দিতে পারলে তার গায়ের জ্বালা মিটত।

সামনেই একটা চায়ের দোকান। এক কাপ চা নিয়ে চুপ করে বসে রইল সুকান্ত। এখনই পিসিমার বাড়ি ফিরতে তার একটুও ইচ্ছে নেই। রোজই সুমতি তাকে জিজ্ঞাসা করে—'কিগো কোনো খবর-টবর পেলে?'

সুকান্ত যেভাই বলে—'হ্যাঁ এইবার পেয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে।' তারপর একটু হাসে। ধীরে ধীরে সুমতি বোধহয় সে হাসির অর্থ বুঝতে শিখেছে, তাই আর কিছু বলে না।

* * *

হৈমর সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ অতসী করেছিল। ডবলু বি সি এস পরীক্ষায় পাশ করে তখন সদ্য চাকরি পেয়েছে সুকান্ত। পুরুলিয়াতে পোস্টিং। রাঁচি রোডে একটা মেস করে তারা তিনজন অফিসার থাকত। সকলেই প্রবেশনার। নতুন চাকরি। অতসীর স্বামীও তখন ওখানে পোস্টেড। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ার। হপ্তায় দু-তিন দিন অতসীদের বাড়িতে যেত সুকান্ত। তার মায়ের খুড়তুতো বোনের মেয়ে। প্রায় একই বয়সী দুজনে। বিকেলের নরম আলোয় হৈমকে ওর বাড়িতে সে প্রথম দেখেছিল। অতসীদি দিদি বলে ডাকত হৈমকে। উনুনে একটা গোলা আর দুটো কাঁচা নিয়ে তার কাছে সেয়েটারের প্যাটার্ন শিখতে বসত।

সুকান্ত জিজ্ঞাসা করেছিল—'মেয়েটি কে রে?'

—'ওর নাম হৈম। আমাদের পড়ার পঞ্চাননবাবুর মেয়ে।'

—'বেশ সুন্দরী ভাই না? সুকান্ত মুচকি হেসে তাকাল অতসী সুকান্তকে তার মুখের দিকে তাকাল। বলল—'তোর পছন্দ নাকি? তাহলে বল মোসোমশাইকে চিঠি লিখি।'

সত্যি হৈমকে ভালো লেগেছিল সুকান্তর। একটা সলজ্জ সুরভিময়ী ফুলের মত। কিন্তু যাকে প্রেম-ভালবাসা বলে তেমন কিছু তো ঘটে নি। অতসীর বাড়িতে অনেকদিন তার সঙ্গে চোখাচুখি হয়েছে হৈমর। দু-চারটে কথা-টথা বলেছে। যেদিন হৈমকে ডেকে এনে সুকান্তর সামনে বসিয়ে রেখে অতসী মিথ্যে কাজের অছিলায় এদিক-ওদিক সরে পড়ত। তখন হৈমর সঙ্গে গল্প করত সুকান্ত। তার কলেজের গল্প পড়াশুনোর গল্প। বিষয় শহরের নানা বৃত্তান্ত। একদিন সন্ধ্যেবেলায় অকাশে চাঁদ উঠেছে হৈম তাকে গান শুনিয়েছিল। তবু আশ্চর্য! হৈমর কণ্ঠ স্বরে কোনদিন গাঢ় অন্তরঙ্গতার সুর ধরা পড়ে নি।

অবশ্য বিয়ের সম্বন্ধ হবার পরই একটা মিষ্টি ফুলের সুগন্ধের মত খবরটা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা যে অতসীর বাড়ি যাচ্ছে শুনলে বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত—'কোথায় যাচ্ছিস? বউকে দেখতে?

সুকান্ত হেসে জবাব দিত—'পাগল নাকি? শুধু একটা সম্বন্ধ হয়েছে আর তোরা অমনি বউ-টউ ভেবে বসে আছিস?'

কথাটা মিথ্যে নয়। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক আসছিল সুকান্তর। আসে-আসে না হলেও গড়ায় গড়ায় তো বটে। কি যেসেই মেয়ের চিঠিতে তার বিদ্যাবুদ্ধি, খবর পাচ্ছিল সে। পাত্রীর রূপ-গুণে হবু শ্বশুরের কাঞ্চনবৌলিনোর খবর জানিয়ে মা চিঠি লিখতেন। অতসীর পত্র পেয়ে তিনি তাকে পরিষ্কার লিখলেন—'মেয়েটি দেখিতে কেমন? তোমার বউ তাহাকে পছন্দ হয়? তাহা হইলে অমলা পত্নীর বাবার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলিতে পারি।'

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন রামপুরহাট বদলি হয়ে গেল সুকান্ত। খুব জরুরী প্রয়োজন। তাই অর্ডারটা হাতে পাওয়ার পরদিন সকলেই তাকে বিদায় দিতে এল। আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় সে বোনের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিল।

অতসী ঠাট্টা করে বলল—'এ ভালোই হল। শ্বশুরবাড়ির দেশে চাকরি করতে যেতে হবে না। অফিসে গিয়ে লোকে এবার তোকে জামাই বলে ডাকবে।'

সুকান্ত হেসে বলল—'সে না জন্মান্তরেই রামায়ণ। আগে তো বিয়ে হোক তারপর না হয় জামাইবাবু বলবে।'

—'আহা!' অতসী চোখ নাচিয়ে বলল—'তার বেশী দেরি হবে না। পঞ্চানন-বাবু মেজদাদাকে চিঠি লিখেছেন। হয়তো আগামী সপ্তাহেই ওরা মেয়ে দেখতে আসবেন।'

যাবার সময় হৈমর সঙ্গেও তার দেখা হল। অল্প ব্যক্তিত্বও অতসী তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। শুকপক্ষ। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। গন্ধপলাশ মাঠ-ঘাট ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের হলুদ রঙের কোয়ার্টারগুলি চন্দনের দেখা যায়। গোটার বইয়ে এসে সইকলে ওঠার সময় সুকান্ত স্পষ্ট দেখতে পেল হৈমর চোখের তারায় পলাশ একটি জলের অন্তরণ চিকমিক করছে।

* * *

চায়ের দোকানে বসে পুরানো কিসকুলির কথা ভাবছিল সুকান্ত। এতদিন এসব কথা তার একবারও মনে পড়ে নি। মনে পড়ে পরের কথা। রামপুরহাট হঠাৎ একখানা চিঠি এল। অপরিচিত হাতের লেখা ঠিকানা। খাম ছিঁড়ে সুকান্ত অবাক। হৈমর চিঠি!—

সুকান্তদা,

সুদীর্ঘ সাতাশ মাস খোঁয়া শেষ পর্যন্ত আপনাকে লিখলাম। মনের ইচ্ছে কতখানি প্রবল হলে মেয়েরা এমনি চিঠি লিখতে পারে নিশ্চয় বুঝবেন। হয়তো শুনেছেন বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে গেছে। আমার বাবা স্বাভাবিক হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে অক্ষম বলে। কিন্তু আপনার সাধ্য সে সম্মানী পরিচয় ছিল তাই নিয়ে শহরের লোকে অনেক মিথ্যে রূপকথার জন্ম দিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ অসহায় এবং লজ্জায় সেবতে পারি নে। এই অসম্ভায় আপনি বে সহায় একমাত্র সহায়। আর সামান্য পাঁচ হাজার টাকাই কী জীবনে বড় হবে সুকান্তদা? নিজের পছন্দ করা একটি মেয়েকে অসম্মানের লজ্জা এবং মিথ্যে কলঙ্ক হাত থেকে বাঁচিয়ে সুখি করতে পারবেন না?

ইতি
আপনার
হৈমবতী।

চিঠি নয় যেন ঝড়। সেই ঝড়ের ধাক্কায় পরদিন দুপুরে বাড়িওয়ালা এসে নামাল সুকান্ত। হৈমর চিঠিটা তার পকেটে। যাবার সময়ে অবিশ্যি কথা বলা দরকার। বিয়ে সে করবে এবং আর কাউকে নয় হৈমবতীকে। সামান্য পাঁচ হাজার টাকার জন্য নিজের পছন্দ করা একটি মেয়েকে লজ্জা আর কলঙ্কের গ্লানির মধ্যে ঠেলে দিতে পারবে না।

সন্ধেবেলা পর বাবা তাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন—তোর সঙ্গে একটা জরুরী পরামর্শ করবার দরকার ছিল বহুদিন। এসে ভালো করেছিস।'

সুকান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। হৈমকে বিয়ে করবার স্বপক্ষে তার বক্তব্যের যুক্তিগুলির ধার সে তখন নিজের মনে পরীক্ষা করছিল। বাবা বললেন—'এলাহাবাদ থেকে তোমার একটি ভালো সম্বন্ধ এসেছে। মেয়েটি বি এ পাশ। সম্বংশ দেখতে পরমা-সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। মনে হয় সব দিক থেকেই উপযুক্ত। তোমার মত পেলে আগামী ফাল্গুনেই বিয়ের দিন ঠিক করতে পারি।'

সুকান্ত কোনো উত্তর দেবার আগেই মা একগাল হেসে বললেন—'শুধু তাই নয় খোকা। গয়না-পত্তোর দিক থেকেও কিছু ত্রুটি রাখছে না। তোমার বাবা নিজেই লিখে-ছেন—বিবাহ উপলক্ষে সোনা দানা সামগ্রী আসবাবপত্র ঘড়ি-আংটি রেডিওগ্রাম আর্থাৎ যৌতুক দেবেন। তাছাড়া নগদ দশ হাজার টাকা।'

দশ হাজার টাকা! সুকান্ত হেসে একটা ফোঁস ফেলল। এক ভদ্রলোক স্কাউন্ডেল মেয়ে তার ভবিষ্যৎ সুখের গড়া জেরুজালেম ভিজিয়ে দিয়েছে। তার ঠিক আগের মুহূর্তে পর্যন্ত সুকান্ত কী একটা কথা বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু অসম্ভব! তার মুখ দিয়ে একটি শব্দও বেরোল না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাবা বললেন—'মোটামুটি তুমি একবার দেখে আসতে পার। তোমার পছন্দ হলেই বিয়ের কথা পাকা করে ফেলতে দেরি করব না।'

একটা ইতস্তত করে সুকান্ত বলতে গেল—কিন্তু হয়তো—'

মা তাড়াতাড়ি বললেন—'কোনো কিন্তুর কিন্তু নেই খোকা। মেয়েটিকে নিজের চোখে একবার দেখা ভালো। তুই সামনের সপ্তাহেই এলাহাবাদ থেকে ঘুরে আয়।'

সুকান্ত নির্বাক। হৈমর চিঠিখানা তার পকেটে। বোধহয় সে কথাও তার মনে রইল না।

•

তবু সুকান্ত একবার শেষ চেষ্টা করবে ভাবল। হৈমকে সে বুঝিয়ে বলবে। তার নিষ্পলক কথা অসহায় অবস্থার কথা। পিসিমার বাড়িতে দীর্ঘমেয়াদী অতিথির মত সে কতকাল পড়ে থাকবে? আর হৈম নিজে তাকে ফ্ল্যাটটা দিতে চেয়েছে। এখন একটু সহায়তা করতে সে হাত বাড়াবে না? পাঁচ হাজার না হোক এক হাজার টাকা স্কলারশিপ দিতে সে রাজি। আর বাড়িটা তো হৈমর নামে। সে যদি বলে স্বামীকে জেরা করে তাহলে হরিসাধনবাবু কী করে অনিচ্ছায় ফ্ল্যাটটা অন্য কাউকে দিতে পারবেন?

ঠা-ঠা রোদ্দুরেই অফিস থেকে বেরোল সুকান্ত। আগুনের হলকার মত বাতাস। হাত মুখ যেন ঝলসে যায়। আকাশের সর্বত্র পাউডার-টি-সোকা উনুনের মত তপ্ত ভাপ্সা। কিন্তু উপায় নেই। একটু আগেই সে টেলিফোনে খবর নিয়েছে। হরিসাধনবাবু এখন বাড়িতে নেই। সুগী দেখতে চলে গিয়েছেন। ফিরতে বিকেল হবে। ইচ্ছে করেই গলাটা খুব ভারী আর গম্ভীর করেছিল সুকান্ত। যাতে হৈম না তার কণ্ঠস্বর বুঝতে পারে।

সিঁড়িতে উঠবার সময় দোতলার খালি ফ্ল্যাটটার দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে তাকাল সুকান্ত। চমৎকার বাড়ি। হৈমর ভাগ্যের কথা ভাবলে তার নিজেরই এখন ঈর্ষা হয়। আচ্ছা তার সঙ্গে বিয়ে হয় নি বলে হৈমর মনে কী কোনো দুঃখ আছে? দূর! কী লাভ হত হৈমর? স্বামীর অমন পশার। নিজের নামে কলকাতায় তিনতলা বাড়ি। তার তুলনায় সামান্য চাকরি আর প্রায় নিরাশ্রয় অবস্থা। একটা দু-কামরার ছোট ফ্ল্যাট বাড়ির জন্য সর্বস্ব কলকাতা শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কোলাপসিবল গেট খুলে হৈম তাকে আহ্বান করল। 'আসুন সুকান্তদা। উঃ! বন্ধুদের কী ভীষণ ফেলে গিয়েছেন গরমে। পাখার নীচে বসবেন।'

কোনোরকম ভনিতা না করেই সুকান্ত বলল 'তোমার কাছে খুব বিপদে পড়ে এসেছি হৈম। যদি আমার একটা কথা রাখ।'

হৈম খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কী হয়েছে বলুন তো?'

সুকান্ত বলল—'পাঁচ হাজার টাকা স্কলারশিপ দেবার আমার ক্ষমতা নেই। অথচ হরিসাধনবাবু তার কম কিছুতেই রাজি নন। তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বল তাহলে হয়তো একটা উপায় হতে পারে।'

হৈম কেমন বাঁকা চোখে সকৌতুক দৃষ্টি হাজার টাকা নগদ পাওয়া অনেকেই পাকাপাকি হয় সুকান্তদা। কিন্তু যারা নগদ টাকা চায় তারা কী সে কথা রাখে?'

কথা নয় সুতীক্ষ্ণ খোঁচা। তবু সুকান্ত নির্বিরোধ। তবু সুকান্ত সোটি নিঃশব্দে হজম করল।

হঠাৎ হৈম বলল—'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব সুকান্তদা?'

—'হ্যাঁ বল।'

—'এমনি জানতে ইচ্ছে হল। তাই জিজ্ঞাসা করছি।' হৈম ভ্রূ কুঞ্চিত করল। বলল—'রামপুরহাটে থাকতে আমার কোনো চিঠি পান নি?'

—'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।' সুকান্ত যেন দারুণ কোর্টের আসামীর মত সত্যের মিথ্যে কথা বলল,—'তুমি বিশ্বাস কর হৈম। সেদিন বাড়িরের ট্রেনেই আমি কাড়গ্রাম চলে যাই। মা-বাবা দুজনকে অনেক বুঝিয়ে-ছিলাম। কিন্তু তারা কেউ রাজি হলেন।'

হৈম প্রায় ব্যঙ্গ করে বলল—'তাহলে আর জানি সুকান্তদা। বিয়েতে আপনি অনেক যৌতুক পেয়েছেন। তিরিশ ভরি সোনা। অসবাবপত্র, দান সামগ্রী, রেডিওগ্রাম, ঘড়ি আংটি। তাছাড়া নগদ দশ হাজার টাকা। সুতরাং আমার মত গরীবের মেয়েকে আপনি কেন বিয়ে করবেন?'

—'ছি, ছি কী বলছ হৈম!' সুকান্ত একটুও রাগ না করে বলল—'ওসব কথা ভুলে যাও। ভগবান তোমাকে অনেক রূপ দিয়েছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, কলকাতার বাড়ি এখন আর তোমার অভিযোগ করা সাজে না।'

—'হয়তো সাজে না।' হৈম গাঢ়স্বরে বলল 'কিন্তু কখন আমার পরিবর্তন হয়েছে তা আপনার চিঠির জবাব [illegible]

বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। তারপর যেদিন অতসীদির কাছে শুনলাম এলাহাবাদে আপনার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে সেদিন সমস্ত রাত্তির আমি বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছি। কেউ সে কথা জানতে পারেনি।'

অনেকক্ষণ কোনো শব্দ নেই। দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হৈমর চোখ দুটো হঠাৎ যেন জ্বলে উঠল। সুকান্তর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল,—'বেশ ফ্ল্যাট আপনি পাবেন। কোনো চিন্তা করবেন না, আজ রাত্তিরেই আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। পাঁচ হাজার টাকা সেলামীর জন্যে আপনার বাড়ি পাওয়া আটকাবে না।'

সুকান্ত তাড়াতাড়ি বলল —'পাঁচ হাজার টাকা আমার পক্ষে একটু বেশী হবে হৈম। নইলে হয়তো দিতাম। তবে হাজার-খানেক টাকা সেলামী দিতে আমি রাজি। তুমি ডক্তরবাবুকে একটু বুঝিয়ে বললে—

হৈম হাসল 'টাকার জন্যে মিথ্যে ভাবছেন সুকান্তদা। ফ্ল্যাটটা আপনি পাবেন। বাড়ি তো আমার। যাকে খুশি দেব বেশ তো, আপনি এক হাজার টাকা সেলামী দেবেন। আর এক মাসের অ্যাড-ভান্স ভাড়া। আমি তাতেই রাজি।'

তবু সুকান্ত ভয়ে ভয়ে শুধোল—'হরিসাধনবাবু মানে ডাক্তার ঘোষ রাজি হবেন তো?'

—'সে ভার আমার।' হৈম সগর্বে ঘোষণা করল।

কৃতজ্ঞতায় সুকান্তকে প্রায় গদগদ মনে হল। বলল, —বাঁচালে হৈম। বাড়িটা পেলে এত উপকার হয়।' একটু থেমে সে ফের শুধোল, —'তাহলে টাকাটা কখন নিয়ে আসব বল, কাল?'

—'উঁহু, কাল নয়।' হৈম এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল। 'কাল তো শনিবার। আপনি বরং পরশু, —রবিবার সকালে আসুন। বেলা আটটার মধ্যে—উনি তখন বাড়িতেই থাকবেন, কেমন?'

*

সমস্ত রাত্তির ভালো করে ঘুমে হয়নি। আনন্দে অধীর উত্তেজনায়। সুমতির সঙ্গে সে শুধু বাড়ির গল্প করেছে। চমৎকার ফ্ল্যাট। অবশ্য দু-খানা মাত্র ঘর। কিন্তু ছোট নয়। তাছাড়া বাড়ির পজিশন ভালো। সাউথ খোলা মোজেইক করা মেঝে। সামনে ব্যালকনি। বেশ বড় সাইজের বাথ-রুম আর কিচেন। তাছাড়া ডাইনিং স্পেস। সুন্দর হাত-পা ছড়িয়ে থাকা যাবে।

সুমতি জিজ্ঞাসা করল, —'বাড়িটা কার?'

—'ও এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের।' সুকান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল। ফের মন্তব্য করল, —'ব্যাটা হাড়-কঞ্জুষ। প্রথমে বলে কিনা পাঁচ হাজার টাকা সেলামী চাই। ঘরদোর সারিয়ে দেব, আমাকে তো মাছের তেলেই মাছ ভাজতে হবে মশায়। তারপর অবশ্য অনেক বলে হয়ে—' সে হি-হি করে হাসতে লাগল।

সিঁড়িতে উঠবার মুখেই সুকান্তর কেমন যেন খটকা লাগল। দোতলার খালি ফ্ল্যাটটায় কারা যেন কথাবার্তা বলছে। সে ঠোঁট কামড়ে মুহূর্তের জন্য ভাবল। হৈমর জবানী বলছিল বটে, ঘর দুটো ফের সে করিয়ে দেবে। তাহলে হয়তো মিস্ত্রিরাই কাজ করতে লেগেছে।

কোলাপসিবল গেটের সামনে হরিসাধন ঘোষ স্বয়ং দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে হাসি, চোখ দুটি চিকমিক করছে। তাকে অভ্যর্থনা করে বলল, —'আসুন, আসুন, বাড়িতে আমি একা। শুধু আপনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছি।'

—'একা?' সুকান্ত ভ্রূ কোঁচকাল। 'আপনার স্ত্রী কোথায় গেলেন?'

—'বপের বাড়ি। আজ সকালের বাসেই রওনা হলেন।' হরিসাধন ঘোষ মুচকি হেসে যোগ করল, —'বোধহয় লজ্জায় আত্মগোপন করতে গেলেন।'

লজ্জা কিসের? সুকান্ত আর ভনিতা না করে বলল, 'দোতলার ফ্ল্যাটটা উনি আমাকে ভাড়া দিতে রাজি। এক হাজার টাকা সেলামী আর এক মাসের ভাড়া অ্যাড-ভান্স। আপনি নিশ্চয় জানেন?'

—'সব জানি। হরিসাধন ডাক্তার মিটি-মিটি হাসছিল। বলল, —পরশু বাস্তবে তাই কথা হল ওর সঙ্গে। শুনে আমি মশায় খুব আপত্তি করি, অতগুলো টাকা ফালতু লস। কিন্তু কী করব? বউয়ের রেক-মেণ্ডেশন সুতরাং মত দিতেই হল।'

—'তাহলে?'

—'কাল রাত্তির নটা পর্যন্ত তাই ঠিক ছিল, তারপর মশায় আপনার কপাল। বিশ্বাস করবেন না সাড়ে নটায় সমস্ত হৈম নিজে ফ্ল্যাটটা অন্য একজনকে ভাড়া দিল।'

—'কী বলছেন আপনি? তাই কখনও হয়?' সুকান্ত প্রায় আর্তনাদ করল। 'মিসেস ঘোষ আমাকে কথা দিয়েছিলেন।'

ডাক্তার বলল, —'কাল রাত্তির নটার পর অবিনাশ ঘোষাল এসে হাজির, বাড়ির দালাল, —ফুলবাগানে থাকে। সঙ্গে এক পার্টি। সেও যাকে বলে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে।'

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সুকান্ত প্রায় নির্বোধের মত তাকিয়ে রইল।

'আমি অবশ্য বলেছিলাম মশায় যে অন্য একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে। আমার স্ত্রীর বিশেষ পরিচিত ভদ্রলোক। ফ্ল্যাটটা ওকেই দেব।' হরিসাধন ডাক্তার যেন রহস্য করে তাকাল। ফের বলল, —'তা অবিনাশ ঘোষাল ঝানু লোক, কোথায় কলকাঠি নাড়লে কাজ হবে সমস্ত জানে। সে একটা কাণ্ড করল। মক্কেলের হাতের ব্যাগটা টেনে নিয়ে নোটের বাণ্ডিলগুলো হৈমর সামনে ঠিক পুজোর নৈবেদ্যর মত থরে থরে সাজিয়ে দিল। তা অতগুলো টাকা মশায়, শুধু হৈম কেন, আমিও দেখে চমকে উঠেছি।'

বিশ্রী মুখভঙ্গি করে সুকান্ত একটা কুৎসিত গালাগালি দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে হল, সে একজন ভদ্রলোক, ছি, ছি। শেষ পর্যন্ত হৈম একটা কথা রাখতে পারল না। পাঁচ হাজার টাকার লোভে ফ্ল্যাটটা অন্য একজনকে ভাড়া দিল?

তবু ঠোঁট বেঁকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, —'তা অবিনাশ ঘোষাল কত টাকা সেলামী পাইয়ে দিল?

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হরিসাধন ডাক্তার জবাব দিল—'দশ হাজার।'

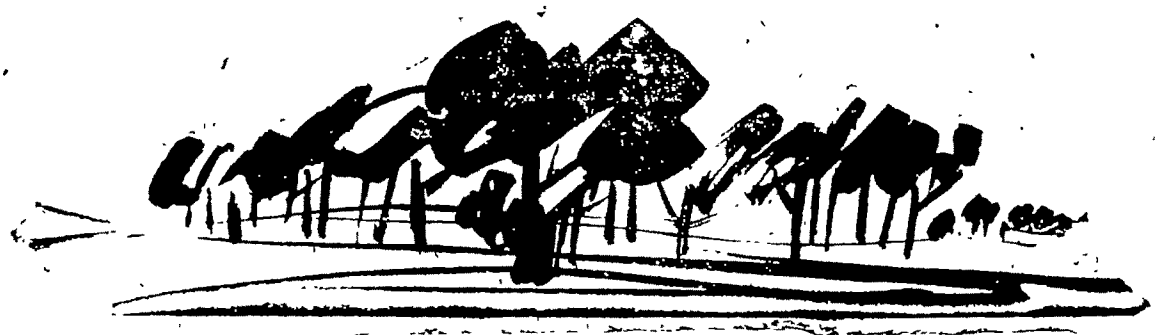

পুনশ্চ

প্রাচীন পত্রিকাগুলিতে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ রচনাদি ও কবিতাদি থাকিলেও সর্বসাধারণের উপভোগ্য বহুবিধ রচনাও মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। অবশ্য এর জন্য বিশেষভাবে কয়েকটি সাপ্তাহিক পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা নির্দিষ্ট ছিল। তৎকালীন বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিকদের অন্যতম দুর্গাদাস লাহিড়ী কর্তৃক প্রকাশিত অনুসন্ধান সাপ্তাহিক পত্র অনুসন্ধান ছিল উক্ত প্রকারের নানাবিধ উপভোগ্য রচনা ও ঘটনা প্রকাশের একতম মাধ্যম।

অনুসন্ধান পাক্ষিক 'জ্ঞানসন্ধান' পত্রিকার (১৫ই বৈশাখ, ১২৯৮) ৪র্থ খণ্ডের ১৮শ সংখ্যা থেকে সখ না সোহাগ নামক একটি রসগর্ভ ও শ্লেষাত্মক রচনা এখানে আমরা উদ্ধৃত করছি। পাঠক ঐ রচনা স্বকপোলকল্পিত রসিক ব্যক্তির নিকট এটি রসায়ন হিসাবে গৃহীত হবে।

।। সখ না সোহাগ ।।

বুঝিতে পারি না। স্বাগর প্রথমবারে শ্রীযুক্ত চন্দ্রাবলির কুলে যাইতেন, শ্রীরাধার সোহাগে কালাচাঁদ বাধ্যকল্প হইয়া বিবাড়িত হইতেন। আবার সোহাগের মহিমা কত দেখ—সোহাগ বাধার মান হইত, মান ভাঙ্গিবার জন্য বংশীধারী রাধার চরণ ধারণ করিতেন। এটা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক সখের ফল।

সোহাগের ভয়ানক ক্ষমতা! সোহাগে না হেন কি সোহাগে না করিতে পারে কি? সীতার সোহাগে রাম সুবর্ণ মৃগ শিকারে প্রবৃত্ত হইলেন; রাবণ এই সুযোগে সীতাকে হরণ করিলেন, ইহা হইতে রাক্ষস বংশ সমূলে ধ্বংস হইল, সোনার লঙ্কা রাবণে পোড়াইয়া ছারখার করিল। রাবণে মানুষে মিতালি হইল। শেষকালে সেই সোহাগের পুতলি সীতা নির্বাসিতা হইলেন। কিন্তু সেই ক্ষেত্রা ও রাবণের সোহাগ এই কবিবাক্য যথার্থতা হইয়া একটা এক রকম ধারণ করিয়াছে। হেড়া কবির বাক্য সোহাগের মর্যাদা দিন দিন বাড়িতেছে আর এই কয়েক ঘণ্টা সোহাগ সমাজকে বসন লইতে যাইতেছে।

ইচ্ছা হয়, মনের কথাটি সব খোলসা করিয়া বলি। কিন্তু সুগধকুণ্ড মানুষের মনে সংকোচ ও কুভাব আসিয়া পড়ে। কাজেই মনের কথা খোলসা করিয়া বলিবার দিন কিন্তু এখন আমাদের সমাজ সখ ও 'সোহাগের' দাবে বড় বাতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল সখ-সোহাগের কথা [illegible] এখন কেহ কেহ মনে করিতে পারেন কথাটি আমাদিগকে বলা হইয়াছে কেন? কিন্তু কাহারও এই আবদার অপূর্ণ হইলে কাহারও প্রাণ বাঁচে না। তাই এই প্রবন্ধের সমস্যাটেই বলিয়া রাখা আমরা ভাল মনে করিতেছি। তাই বেশের কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না।

[illegible] শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে [illegible] শিক্ষিত ভদ্রমহিলাদিগের সোহাগ বড়। শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষিতা হইবে; কিন্তু শিক্ষার সোহাগে শিক্ষিতাদিগের নিকট সৌখিন বাবুরা কিঙ্কর সোহাগের বিষয়। এই সোহাগের পরিবর্তন করিলে ক্ষতিগ্রস্ত ও লিপ্ত। প্রাণ থাকে বা যায় সোহাগের সেবা করা তাঁহাদের প্রধান ব্রত। কবিও একটু খোলসা করিয়া বলি।

অনেকেরা যাহারা হিন্দু-সন্তান অভিমানী, তাহাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শতকরা ১৯ জনই কিন্তু ইহা করিয়া থাকেন, ছাপাই সোয়াপড়া শিখুক, খবরের কাগজ পড়িতে শিখুক, উলের কাজ করিতে শিখুক, আর উনি [illegible] খবরের কাগজের প্রসঙ্গ লইয়া তাঁহাদের সহিত বাদানুবাদ করুক। বাবুদের এই সখ শিক্ষিতাদেরও আসিয়া সোহাগ বাড়ে। শিক্ষিতারা তখন পাশ্চাত্য ভাবে চালে চলিতে চাহেন মন-প্রাণের ভালোবাসা চাই। একদিন স্বামী পাশ্চাত্য শিক্ষিতা সে মনের পরিবর্তন হইত, এখন বিলেত-ফেরতদের সাধারণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সোহাগের স্রোত প্রকৃত পক্ষে ইংরেজ সমাজের অনুকরণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সোহাগ কিন্তু রমণীদিগের সোহাগের সুখ নহে, আমাদের সর্বনাশ।

গৃহে [illegible] বিদেশী [illegible] করিতেছেন। [illegible] ইংরেজ, [illegible]! [illegible] কাঁদ, চক্ষে [illegible] করিয়া কাটাই। [illegible] একখানি বই পাঠাইয়া দিলে [illegible] মহাশয় পাশ কাটাইয়া স্বামীর সখ পূরণ করিবার জন্য বিবরক্ষা বা দেবী চৌধুরাণী একখানি পাঠাইয়া দিয়া [illegible] শিক্ষামধুর শিক্ষা করিতে পথ দেখাই না। এই পথ দেখান অনেক দিন হইতেই চলিতেছে; কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত [illegible] হিন্দু সমাজে একটি প্রফুল্ল [illegible] দেখিতে পাইলাম না, বরং [illegible] দুইতিনটি করিয়া 'সাগর' [illegible] দেখিতে পাই।

সখ-সোহাগের কথা আর কত বলিব, বলিতে গেলে অনেক কথা আসিয়া পড়ে। তবে প্রকৃত প্রস্তাব দেখা যাইতেছে, এই সখ-সোহাগের ঘাত-প্রতিঘাতেই সমাজের অধঃপতন হইতেছে। এই সখ-সোহাগের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলই সমাজের বিকৃত অবস্থা; এই সখ-সোহাগের ফলেই [illegible] আমাদেরও এই শোচনীয় অবস্থা।

ক্ষপণক।

অঙ্গনা

বিউটি শ্লিপ অর্থাৎ মধ্যরাত্রির আগে নিদ্রা —মধুময় নিদ্রা যা মানুষকে এনে দেয় প্রশান্তি উৎসাহ বাড়িয়ে দেয় কর্ম-ক্ষমতা, নিদ্রাহীন মানুষের অবসাদ ও ক্লান্তি সহজে ঘোচে না। তাই ঔষধ খেয়ে নিদ্রাকে আহ্বান করার লোকের অভাব নেই এই দুনিয়ায়। নিদ্রা বা ঘুম যেমন বয়স্ক লোকেদের শ্রান্ত স্নায়ুচক্রে কাজকর্মে শক্তি জোগায় তেমনি শিশুরাও ঘুমের পরে নতুনভাবে কর্ম-চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ শিশুদের ঘুমের জন্য আমাদের ভাবনা অন্যরকম। তাদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জোর করে যখন তখন ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে মায়েরা নিশ্চিন্ত। মায়েদের তখন হাতজোড়া কাজ। অথচ শিশুদের ঘুমের সময় সম্বন্ধে মায়েদের কত সাবধান ও সচেতন থাকা দরকার। যে শিশু অসময়ে কেবল ঘুমুতে ভালবাসে তার পক্ষে দুর্বল হওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। শিশুরা স্বভাবে দামাল—ছোটবেলা থেকে তাদের কতকগুলি অভ্যাস মাকেই করে দিতে হয়। শিশু একবার সুঅভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে তাকে নিয়ে আর বেশি ভাবনার থাকে না। শিশুর মানসিক পরিণতি শৃঙ্খলাবোধের ওপর অনেকখানি গড়ে ওঠে। কোন কোন বিজ্ঞানী আশা করেন শিশুমনের প্রকৃতি ও গতি জানা গেলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়।

পাঁচ থেকে আট বছরের মধ্যে শিশুদের রাতের ঘুমের সময় হওয়া উচিত দশ থেকে বারো ঘন্টা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসময় কমতে থাকে। সূর্যাস্তের ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে শিশুদের বিছানায় পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। দিন কয়েক নির্দিষ্ট সময়ে শিশুদের ঘুমোবার আয়োজন করলে তারা এতে এত অভ্যস্ত হয়ে যাবে যে মায়েদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। কিন্তু অভ্যাসের বদবদলে শিশুকে আবার পুরনো অভ্যাসে ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই নিয়মভঙ্গ বেশী লক্ষ্য করা যায় ছুটির দিনগুলিতে। বোর্ডিং অথবা বাড়ীতে ছুটির দিনগুলিতে শিশুরা প্রায় অধিকাংশ সময়ে বেশী রাত করে ঘুমন্ত যাওয়া এবং বেলায় ঘুম থেকে ওঠার অনুমতি পায়। বিশেষ করে বোর্ডিং থেকে ছেলেমেয়েরা ফিরলে তাদের গল্পের ঝুড়ি উজাড় করে দিলেও কিছুতেই তা শেষ করতে পারে না। তাই তখন সময়ের বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলেও অভিভাবকরা স্নেহের বশে সেটা সহজেই মেনে নেন কিন্তু তখন ভেবে দেখেন না দিনের পর দিন এটা হতে থাকলে তাদের সুঅভ্যাসটা সকলের অলক্ষ্যে পরিবর্তিত হতে থাকে। এরপর যখন তারা বোর্ডিং অথবা নিত্য নৈমিত্তিক মানিয়ে চলতে চেষ্টা করে তখন নানা অসুবিধার সম্মুখীন তাদের হতে হয় এমনকি বন্ধুদের বিরক্তিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দিনের স্কুলে যে শিশুরা পড়ে তাদের অভিভাবকেরা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই ছেলে-মেয়েদের বেশ রাত্রি করে জাগিয়ে রাখেন, খেতে দেন অধিক রাত্রে অথচ একবারও ভেবে দেখেন না এতে শিশুদের স্বাস্থ্যহানি হয় কতখানি। স্বভাবত ভোরবেলা শিশুরা বেশ বেলায় জাগে অথবা তাদের জোর করে জাগাতে হয় তাতে শিশুদের ঘুমের পরে সতেজ ভাবটা আর থাকে না। ঘুম থেকে উঠেও প্রাণখুলে হাসতে পারে না, কেবল ঘুম জড়ানো চোখে হাই তোলে নয়তো আড়মোড়া ভাঙে। সারাদিন কটে, বদমেজাজে সব কাজ তাদের জোর করে করাতে হয়। কোন কাজে উৎসাহ থাকে না। তাদের ঘ্যানঘ্যানানীতে বাড়ীর সকলে অস্থির হয়ে ওঠে।

শিশুদের ঘুমের সময় যে একেবারেই ব্যতিক্রম হবে না তা কখনোই নয় বা সম্ভব নয়। উৎসবাদি সার্কাস প্রভৃতি নানা কারণেই শিশুদের ঘুমের সময়ের বদবদল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিত্য অভ্যাসে দুএকদিনের বদবদলে ভাবনা বা ভয়ের কিছু নেই। সেই বিছানায়- যাওয়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে অথবা আপনমনে খানিকক্ষণ বকবক করে বেড়ানোর উপভোগ করতে করতেই চোখ বুজবে। আবার বেড়ানোটা যদি তার কষ্টকর (যানবাহন ভীড়) মনে হয় তবে ভবিষ্যতে বেড়াতে যাবার কথা উঠলেই সে ভীত হয়ে পড়তে পারে। শিশুর স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে যথেষ্ট মজর [illegible]

যে শিশু ঘুমের সময়ে ঘুমুতে চায় না অথচ তাকে যখন জোর করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা চলে তখন হয়তে সে বন্য স্বভাবের হয়ে ওঠে। শিশুদের জোর করে ঘুম পাড়িয়ে অসুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার চেয়ে শিশু একটু দেরিতে ঘুমুলে কোন ভাবনার নেই। ঘুমের আগে উত্তেজনামূলক কোন কাজই সমীচীন নয়। অনেকসময় টেলিভিশন দেখতে দেখতে শিশুদের ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করা হয়—আর সে ছবিতে যদি ভূত-প্রেত অথবা মারামারি কাটাকাটির দৃশ্য থাকে তবে শিশুর স্বাভাবিক ঘুমে বিঘ্ন ঘটে। অবচেতন মনে ভয়ের যে ছবি একবার তার মনে এঁকে বসলো গভীর রাতেও সেই আতঙ্কে সে চীৎকার করে উঠতে পারে।

শিশুর রাতের খাওয়াটা অত্যন্ত সতর্ক-সহকারে হওয়া দরকার। জোর করে বেশী পরিমাণ খাওয়ালে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। রাতের খাওয়ার পরিমাণ কখনোই বেশী হওয়া উচিত নয়। ঘুমুতে যাওয়ার ঘন্টাখানেক আগে শিশুর রাতের খাওয়া সারতে হবে।

শিশুদের বিছানার চাদর থাকবে পরিষ্কার ও টিপটপ। ছোটবেলা থেকে ছেলে-মেয়েদের ঘুমুবার সময় ঘর অন্ধকার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কোনমতেই যেন আলো এসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত না করে। অন্ধকার ঘরে ছোটবেলা থেকে ঘুমুবার অভ্যাস হলে তাদের আর অন্ধকার সম্বন্ধে কোন ভীতি থাকে না। অযথা জানলা ছাপছোপের পর্দা টাঙিয়ে বাতাস ঢোকার প্রতিবন্ধক করার কোন প্রয়োজন নেই। এমনিও দেখা গেছে পর্দাবিহীন ঘরে বাতাসের মুক্ত চলাচলে শিশু আরামে ঘুমায়। সূর্যোদয়ের প্রথম আলোর ছটা তার চোখে মুখে এসে পড়বে সে আপনা হতেই প্রকৃতির রং-বেরং-এর খেলায় নিজেকে মাতিয়ে তুলবে।

ঘুমোবার সময় শিশু অনেক সময় কুঁকড়ে থাকে দেখে মায়েরা ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। রাতে স্বপ্ন দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যাওয়া শিশুর পক্ষে যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি অনেকে আছে সারারাত গোটা বিছানায় এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে। কুঁকড়ে শোওয়া অনেকের একটা অভ্যাস।

আমাদের দেশে মায়েরা কাজের ভীড়ে এত ব্যস্ত যে ছেলেমেয়েদের বিছানায় পাঠিয়ে ঘরের কাজে মেতে ওঠেন। শিশু কখন ঘুমুলো সেটুকু দেখার পর্যন্ত ফুরসৎ নেই। অতিথি এলে তাদের আপ্যায়ন করতে গিয়েও ছোটদের দিকে ঠিক নজর দেওয়া হয় না। কোনরকমে দুটি খাইয়ে শিশুদের বিছানায় শুইয়ে দিতে পারলেই পরম নিশ্চিন্ত। অথচ সুন্দর ও সুস্থ ঘুমের ওপরে শিশুর মেজাজ শরীর ও উদ্যম সবকিছুই নির্ভর করে।

অঞ্জলী নন্দী

একটি দুর্লভ চিত্র : সাম্যদের সঙ্গে গোষ্ঠ পাল

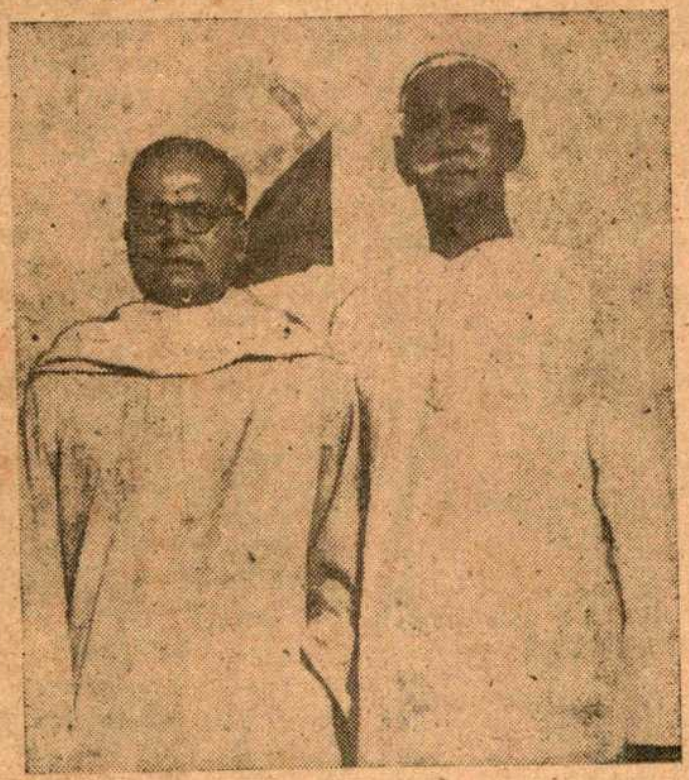

লাগে। সঙ্গে সঙ্গে ফুলেও ওঠে। হাত ফুলে উঠছে দেখে হাড় ভেঙেছে মনে করে গোষ্ঠ পাল সেদিনের মতো বিশ্রাম নেন। মাঠ থেকে পশ্চাদপসরণ সেই বোধহয় প্রথম এবং শেষ। পরে শোনা গিয়েছিল যে গোষ্ঠ পালকে ইচ্ছে করে জখম করায় সানডামোনিয়াম আগেভাগে মতলব এঁটেছিল। তাদের ধারণা ছিল ওপক্ষের রক্ষণভাগের শক্ত খুঁটিটিকে নড়িয়ে দিতে পারলে তাঁদের জেতার পথ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ফুটবল ছাড়া আরও পাঁচ রকম খেলায় গোষ্ঠ পাল হাত পাকিয়েছিলেন। ক্লাব টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন একাধিকবার। সিনিয়ার হকি লীগে খেলেছেন নিয়মিত। আর ক্লাব ক্রিকেট তো বটেই, সেই সঙ্গে প্রতিনিধিমূলক ক্রিকেটে খেলার অধিকার তিনি অর্জন করে নিয়েছিলেন।

পড়গাঁয়ের ছেলে গোষ্ঠ পাল কৈশোরে ক্রিকেটের কও জানতেন না। ১৯১৭ সালে বিদ্যাসাগর কলেজে পড়ার সময় অধ্যক্ষ এস রায় (বাংলার ক্রিকেটের জনক সারদারঞ্জন রায়) তাঁকে জোর করে দলে নেন। তাঁরই উৎসাহে গোষ্ঠ পাল ক্রিকেট শিখতে ও খেলতে শুরু করেন। প্রতিভা ছিল সহজাত। তাই ক্রিকেটেও পাকা হাতের ছাপ রাখতে তাঁর অসুবিধে হয় নি।

সারদারঞ্জনের কথায় গোষ্ঠবাবু নিজেই যেন আবেগে অস্থির হয়ে পড়তেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠতেন 'এমন একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ও গুরুর সংস্পর্শে আসা ভাগ্যেরই কথা। এই ভাগ্যের জোরে নয় পরিবারের অনেক ছেলে যথা—শৈলজা নীরজা এবং আরও কেউ কেউ পরে বড় খেলোয়াড় ও যথার্থ মানুষ হতে পেরেছিল। এক মুখ দাড়ি; লম্বা চওড়া আকৃতি। সারদাবাবুকে দেখতে ছিল রীতিমতো গম্ভীর। কিন্তু ছাত্র-খেলোয়াড়দের জন্যে তাঁর মন ছিল স্নেহসিক্ত। খুবই নরম। ছাত্রদের খেলার জন্যে সারদাবাবু নিজের পকেট থেকে অনেক পয়সা খরচ করতেন। রোজ বিকেলে ছুটির পর কলেজ প্রাঙ্গণে নিজের হাতে তিনি আমাদের খেলা শেখাতেন। তারপর জলখাওয়া বাবদ দশটি করে টাকা বার করে দিতেন। আমাকে তিনি বড্ড ভালবাসতেন। কলেজ ছাড়ার পরও কলেজ দলের সঙ্গে আমায় বাইরে যেতে হয়েছে সারদাবাবুর ডাকে।

'আর শুধু কি সারদাবাবুই। দীর্ঘ খেলোয়াড় জীবনে এবং তারপরে মাঠে-ঘাটে-পথে যারই সান্নিধ্যে এসেছি তারই ভালবাসা পেয়েছি। বাংলাদেশে ক্রীড়ামোদী জনসাধারণের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। খেলা ছেড়েছি কবে। কিন্তু ওঁরা আমায় ছাড়তে চাননি। ভুলতে পারেননি। ওঁদের ভালবাসার দান আমি যে কোথায় তুলে রাখি...' বলতে বলতে গোষ্ঠবাবুর কণ্ঠ যেন আবেগে রুদ্ধ হয়ে পড়তো।

ক্রীড়ামোদী মহলে গোষ্ঠ পাল ছিলেন 'হিরো', চিরায়ত নায়ক। কিন্তু অনামহলে তাঁর ইমেজ কেমন ছিল তা বোঝতে একটি ঘটনার উল্লেখ রেখে আমি এ প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানছি।

সেবার, পঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে কলকাতার ভেটারেন্স ক্লাব দিল্লীতে খেলতে গেছে। দলে আছেন সূর্য চক্রবর্তী দুলাল গুহঠাকুরতা অজিত নন্দী প্রমোদ দাসগুপ্ত ডি সেন মোহিনী ব্যানার্জি সুশীল চ্যাটার্জি, বেবি গুহ এবং নক্ষত্রমর্কা আরও কতো খেলোয়াড়। দলের সঙ্গে রয়েছেন তিন রবীন্দ্রন—গোষ্ঠ পাল এবং ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী দলের দুই সদস্য কানু রায় ও হাবুল সরকার। লেখক নিজে ছিল সেই দলের এক 'ইয়ং ভেটারেন'।'

দিল্লীতে থাকার জায়গা সকলের একসঙ্গে। কিন্তু তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বললেন 'তা কি করে হয়! গোষ্ঠবাবুদের থাকার অন্য ব্যবস্থা হয়েছে।' গোষ্ঠবাবু আপত্তি করলেন, সবাই একসঙ্গে এসেছি, এক জায়গাতেই থাকাই তো ভাল। কবীর সাহেব কোনো ওজর শুনলেন না। একরকম জোর করেই গোষ্ঠ পাল কানু রায় আর হাবুল সরকারকে অন্যত্র নিয়ে গেলেন।

ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন রাষ্ট্রপতি। কবীর সাহেবের মুখে গোষ্ঠ পালের দিল্লী আসার খবর শুনেই তিনি গোষ্ঠবাবুকে রাষ্ট্রপতি ভবনে চায়ে ডাকলেন। সাথসঙ্গী হিসেবে আমরাও আমন্ত্রণ পেলাম। নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে দেখি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি যেন গোষ্ঠপালকে ছাড়তেই চান না। সারাক্ষণই তাঁর যতো কথা তা গোষ্ঠপালের সঙ্গেই হলো। আর কথা বুঝি ফুরুতেই চায় না। কি হৃদ্যতার সঙ্গেই না রাষ্ট্রপতি সেদিন গোষ্ঠ পালের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন। ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতাতেই। প্রেসিডেন্সী কলেজের পড়ুয়া হিসেবে মাঠে গিয়ে কতোদিন তিনি গোষ্ঠ পালের খেলা, কি খেলা দেখেছেন সবিস্তারে তার বর্ণনা দিয়ে চললেন। রাষ্ট্রপতি পুরনো স্মৃতিচারণ করছিলেন। আর আমরা অবাক হয়ে ভাবছিলাম, অন্য জগতের এই মানুষটি, যাঁর মূল জীবন কেটেছে স্বাধীনতার লড়াইয়ে ও রাজনীতিতে তিনি কি করে খেলার এতো সব কথা মনে রেখেছেন!

আসলে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ খেলার কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠপালের স্মৃতি তাঁর মন থেকে মুছে যায়নি। উদ্যত যৌবন, অপরাজেয় মানসিকতার এক ঝলমলে প্রতিচ্ছবি এতোদিন পরও তাঁর মনে জ্বলজ্বল করছে। রাষ্ট্রপতির মতো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিচারে গোষ্ঠপালের প্রকৃত মর্যাদা দেখে সেদিন আমাদের অনেককেই অবাক হতে হয়েছিল।

সত্যিই, গোষ্ঠপাল ছিলেন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। জনঅরণ্যে বনস্পতির মতো। যে মানুষটির প্রাতিস্বিকতার প্রভাব খেলার মাঠ ছাপিয়ে বাঙালীর জীবন খেলার মাঠেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

হায়, এই মানুষটি আজ হারিয়ে গেলেন। দিন শেষে বনস্পতি মূল থেকে উৎপাটিত হয়েছে। নিয়তির বিধান। করার কিছুই নেই। শুধু কপাল চাপড়ে হায় হায় করা জাতিগত শোকপ্রকাশে উদ্বেল হওয়া ছাড়া!

অজয় বসু

ফিরিয়ে নিলেন। মনেই হলো না আমাকে উনি আদৌ চিনতে পেরেছেন।

কথায় বলে মানে ইংরেজী প্রবাদে যে স্ট্রাইক দ্য আয়রণ হোয়াইল ইট হজ হট —আমি সেদিন শুটিং প্যাকআপ হবার পরই ধরলাম ভদ্রলোককে।

আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল জীবন-বাবু—

জীবন গুহ আমার দিকে একটুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বলুন।

ইতস্ততঃ করে বললাম—কোথাও গিয়ে একটু বসলে হতো না!

—আজ বাদ দিন তাহলে। আজ আমি ফ্রিয়ার্ড।

—ঠিক আছে। সেই ভাল। আর একদিন বলা যাবে—

জীবন গুহ আর কিছু বললেন না। নিঃশব্দে চলে গেলেন আজকের অভিনয়ের দরুণ পেমেন্ট নিতে।

এরপর আবার দেখা সাক্ষাৎ হয়। মুখে সেই অমায়িক হাসি, সেই কুশল জিজ্ঞাসা। কোথায় কি ছবির কাজ চলছে আমার—

একদিন টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে আছি, দেখি জীবন গুহ আসছেন। মুখে একগাল হাসি। এসে প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ মশায় আপনি কাগজে লেখেন শুনলাম?

বিব্রত হয়ে বলি—হ্যাঁ...ওই সামান্য এট্-সেট্...

জীবন গুহ সহাস্যে বললেন—সে কথা বলবেন তো মশায়। সেদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গল্প করছি, সেখানেই হঠাৎ আপনার প্রসঙ্গ উঠল। ভাল ভাল খবর ভাল।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলি—এখন কী ছবির কাজ চলছে আপনার?

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে জবাব দিলেন—এই দু-একখানা ছবি। কেউ ভাল চান্সই দিচ্ছে না মশাই।

—হবে হবে। অধৈর্য হবেন না।

ফিক্ করে হাসলেন জীবন গুহ—আমি কক্ষনো অধৈর্য হই না মশাই। ফিল্ম লাইনে আসব আসব করে বড় লেটে এলাম। বছর দশেক আগে এলে হয়ত এতদিনে মোটা-মুটী একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছে যেতে পারতাম।

তাতে কী হয়েছে? কথার মাঝে যোগ লেট দেন নেভার। পৌঁছে তো গেছেন। এখন আর কোন চিন্তা নেই।

হা হা করে একচোট হাসলেন ভদ্রলোক, তারপর হঠাৎ জার্ক দিয়ে থেমে বললেন—এই যাঃ, একজনের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা ছিল, বড় দেরী হয়ে গেল। চলি—

আমাকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই জীবন গুহ হন্ হন্ করে চলে গেলেন।

টেকনিশিয়ান্সের রেকর্ডিং থিয়েটার থেকে তখন মান্না দের গাওয়া গান ভেসে আসছে। ভীষণ দরদ দিয়ে গাইছেন মান্না-বাবু। বড় ভাল লাগল। আমি গেলাম গান শুনতে।

কয়েকদিন পর সন্ধ্যার কিছু পরে, কাজ-কর্ম শেষ করে উঠে আমরা কয়েক বন্ধু স্টুডিওর গোলঘরে বসে গল্প-গুজব করছি, এমন সময় জীবন গুহ সেখানে হাজির হলেন।

জয়ন্ত বসু জীবনবাবুকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল—আসুন আসুন জীবনদা।

অমায়িক হেসে জীবন গুহ আমাদের মধ্যে এসে বসলেন।—গল্প হচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ। বিদেশী ছবির নিয়ে একটু

আতেল আলোচনা হচ্ছে—ইংগমার বার্গম্যানকে দেশ ছাড়তে হয়েছে। ইনকাম ট্যাক্সের লোকেরা ওঁকে নিয়ে এমন সব কেলেঙ্কারি করেছে যে দিশে করতে না পেরে ভদ্রলোক সুইডেন ছেড়ে অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

—তাই বুঝি? তাহলে তো ওদের একটা দারুণ ক্ষতি হ'ল দেশের, অতবড় একজন ডিরেকটর, পৃথিবী জোড়া নাম ভদ্রলোকের...

সিদ্ধার্থ দত্ত আর অবকাশ দিল না। সে সোজা ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বলল —জীবনদা, এটু দেখে দিননা—আমিও তো দেশ ছাড়ব ছাড়ব ভাবছি—দেশের ক্ষতি হবে না তো।

জীবন গুহ প্রথমে অনিচ্ছা, পরে নিমরাজী হয়ে হাতটা টেনে নিয়ে দেখতে লাগলেন। বুঝলাম ভদ্রলোক জ্যোতিষ চর্চা করেন, সিদ্ধার্থ দত্ত মানে বুবু হচ্ছে ইংরিজী বইয়ের পোকা। ওর মাথায় সারাক্ষণ ফিল্মের গল্পের আইডিয়া গিজ্‌ গিজ্‌ করছে। ইংরিজী ছবি 'লভ স্টোরী' ঝেড়ে ও 'সেদিন দুজনায়' গল্পটি দাঁড় করিয়েছিল। সে ছবি বিলকুল ফ্লপ! সো হোয়াট? আবার বানাব, আবার ছবি হবে। এই করতে করতে কোন একটা ছবি একদিন না একদিন হিট্‌ হবেই।

স্টুডিওর গোলঘরের স্বল্প আলোয় জীবন গুহ বুবুর হাত দেখছেন। ওঁর কপালে চিন্তার রেখা পড়ে দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে, মাঝে মাঝে উনি দু-একটি ফোরকাস্ট দিচ্ছেন। আমরা উদগ্রীব হয়ে শুনছি —এমন সময় অনিল চ্যাটার্জি এসে বসলেন।

জীবন গুহ এক সময় সাগ্রহে অনিল চ্যাটার্জির ডান হাতটা টেনে নিলেন।

তারপর নীরবে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে জীবন গুহ কতকগুলি মোক্ষম বাণী দিলেন—দারুণ মিলে গেল। অনিল চ্যাটার্জি মুচকি হেসে চুপ করে শুনতে লাগলেন।

সব কিছুর শেষ আছে। সেই নিরস জ্যোতিষ চর্চাও শেষ হল একসময়। সবাই কথা বলছেন, কথার ক্রশ কাটিং হচ্ছে অনবরত। ফলে কোন কথা কেউ ভালভাবে বুঝতে পারছে না। এই রকম একটা সময় এক্ষেত্রে যা হয় আর কি, মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ, মানুষের বিশ্বাস, অবিশ্বাস, অলৌকিক ঘটনা—এইসব নিয়ে তুমুল গল্প শুরু হয়ে গেল।

জীবন গুহ হঠাৎ বললেন—বুঝিতে অনেক কিছুরই বাধ্যা চলে না ভাই, আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি —বলতে কি—আমার জীবনের সমস্ত গতিই বদলে গেছে তারপর থেকে—

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

সংশোধন

২য় সংখ্যায় ৬১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের ওপর থেকে দ্বিতীয় লাইনে গোপাললাল ঘোষের স্থলে গোলাপলাল ঘোষ পড়তে হবে।

ফ্লোর থেকে বলছি

আমার কাহিনী

আরতি ভট্টাচার্য। অমৃত ফটো

ফ্লোরের মধ্যে শুটিং হচ্ছিল। স্টুডিও ম্যানেজারকে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন—বিমল ভৌমিকের 'আমার পৃথিবী' ছবির কাজ চলছে।

খবর নিয়ে এক সময় ফ্লোরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটা কম্পোজিট শট চলছে তখন। অনিল চ্যাটার্জি, সন্তোষ দত্ত এবং আরতি ভট্টাচার্য—এই তিনজন শিল্পীকে নিয়ে। ক্যামেরার চিত্রগ্রহণ করছেন কৃষ্ণ চক্রবর্তী। অন্ধকারে একটা চেয়ারে বসে চুপচাপ দেখতে লাগলাম শুটিং। কথাবার্তায় বুঝলাম ছবির নায়ক অমিত চ্যাটার্জি হচ্ছেন অনিলবাবু, ইতি ফিল্মের একজন নামজাদা গল্প-লেখক। ছায়াছবির নায়িকা নন্দিতা হচ্ছেন আরতি ভট্টাচার্য। আর সেই ছবির প্রযোজক পুতিতুণ্ডি হচ্ছেন সন্তোষ দত্ত এরা এখন মৃদু তর্কে মেতেছেন।

বিমল ভৌমিকের সহকারীর মুখে গল্পটি শুনলাম।

নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অমিত

চাঁদের কাছাকাছি
উত্তম/সুব্রতা

কালীচরণ

প্রযোজনা—এন এন সিপ্পি

পুলিশের বড়কর্তা অর্থাৎ ইনস্পেকটর জেনারেল খান্না এক ছিচকে চোর দিয়ে মহাচোর গ্রেপ্তারের কথা চিন্তা করছিলেন, দিল্লীর সেন্ট্রাল জেলে যাবজ্জীবন দণ্ড-প্রাপ্ত কয়েদী 'কালীচরণের' সঙ্গে মৃত ডেপুটি ইন্সপেকটার জেনারেল প্রভাকরের চেহারার অদ্ভুত মিল থাকায় এবং প্রতিপক্ষ এই মৃত্যুর খবর না জানায় 'কালীচরণকেই ডেপুটি ইন্সপেকটার জেনারেল পদ বসানো হোল। ইন্সপেকটার প্রভাকর মৃত্যুর পূর্বে যেখানে তদন্ত কার্য শেষ না করে ফেল রেখেছিলেন সেখান থেকেই শুরু করতে গিয়ে কালীচরণ ইন্সপেকটার খান্নার সঙ্গে শেঠ দিন দয়ালের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা জানতে পারলো, অথচ পুলিশের বড়-কর্তা একথা আজগুবী বলে ভাবেন। সুতরাং সব কিছুই প্রমাণ করবার জন্যে কালীচরণ একটা দল গড়লেন আর এক সাহায্য করলো স্বপ্না নাম এক তরুণী। বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে শেঠ দিন দয়ালের মুখোস খুলে দিয়ে সে প্রমাণ করলো প্রভাকরের হত্যাকারী কে এবং নিজের অপরাধের শাস্তির মেয়াদ জমে যাওয়ায় কালীচরণ অনায়াসে তার মানসী স্বপ্নাকে নিয়ে সুখের সংসার তৈরী করার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

সুভাষ ভাই ভট্টের লেখা কাহিনীতে বিশেষ কোন আবর্জনা নেই, কারণ ইতি-পূর্বে এ জাতীয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য ক্রাইম জাতীয় ছবি তৈরী হয়েছে। পরিচালক সুভাষ ঘাই কাহিনীর দুর্বলতাকে তাঁর আকশানের মাধ্যমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, আঙ্গিক এবং অভিনয় এ ছবির অন্যতম সম্পদ। অভিনয়ে—কালীচরণ (শত্রুঘ্ন) খান্না (প্রেমনাথ) দিনদয়াল (অজিত) ও স্বপ্না (রীণা রায়) বেশ সাবলীল ও অন্যান্য ভূমিকায় কৃষ্ণ দেওয়ান ডেভিড অলকা জ্ঞানী মদন পুরী ও শৈলেশ কুমার মন্দ নয়। কে কে মহাজনের আলোক-চিত্র গ্রহণ গুরু দত্ত বামন ভোঁসলের সম্পা-দনা এবং কল্যাণজী আনন্দজীর সঙ্গীত পরিচালনা এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ।

চিত্রদূত

ঢাটার্জি একটা সওদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি করে তার সংসার চালায়। সংসার বলতে এক ভাই আরেক বোন। মোহিত আর সর্বাণী। বাবা-মা নেই। অমিত বিয়ে করেনি। তবে করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। কারণ অফিসের সহকর্মী সীমার সঙ্গে তার আফেয়ার দীর্ঘদিনের। দুজনেরই স্বতন্ত্র সাংসারিক দায়-দায়িত্ব আছে বলেই ওরা হুট করে ম্যারেজ রেজিষ্ট্রী করতে পারছে না।

অমিতের একটা আলাদা পরিচয় আছে। সে মোটামুটি চালু লেখক একজন। তবে অর্থের বিনিময়ে সে নিজের লেখক আদর্শকে বিক্রি করেনি। সে প্রগতিশীল গল্প লেখে এবং প্রগতিশীল দলের সঙ্গেই তার সম্পর্ক। সাধারণ অর্থে যাকে বাম-ঘেঁষা ক্যাম্প বলা হয়।

অমিতের খুবই ইচ্ছে যে সে নিজের ঘনিষ্টভাবে দেখা জীবন ও সমাজের নানা অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে এমন একটা উপন্যাস লিখবে যা প্রকৃতঅর্থে মহাকাব্য (এপিক) হয়ে উঠবে। সে লেখার কাজ তার ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। বইয়ের নামও ঠিক হয়ে গেছে। নাম রেখেছে—আমার পৃথিবী।

ঘরে ভাই বোন নিয়ে হৈ-হল্লোড় করা, অফিসে যাওয়া, সীমার সঙ্গে একটা পরি-চিত রেস্তরার পার্টিশান দেওয়া ঘরে বসে দু দণ্ড প্রেম করা, মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে যোগ দেওয়া লেখক ও সম-মনস্ক বন্ধুদের সঙ্গে বসে সাহিত্য বা রাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনা সেরে বাড়ী ফিরে কিছু লেখা—এই তার প্রাত্যহিক জীবনের মোটামুটি রুটীন। একদিন সকাল বেলায় তাতে হঠাৎ ছন্দ-পতন ঘটল।

অমিত চ্যাটার্জির সরু গলিতে দামী গাড়ী চালিয়ে অবিনাশ দত্ত নামে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন স্বয়ং অমিতেরই কাছে—কী ব্যাপার? না অমিতের লেখা 'মাঝের দেয়াল' নামে একটা গল্প তাঁর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। সেটা তিনি কিনতে চান।

—কিনতে চান মানে?

অবিনাশ দত্ত মসৃণ মোলায়েম হেসে আত্মপরিচয় দিলেন—আমি ছবি প্রোডিউস করি। আপনার গল্প নিয়ে আমি একটা ছবি করতে চাই।

অমিত স্তম্ভিত বিহ্বল। এ যে তার স্বপ্নেরও অগোচর।

বিমূঢ় লেখককে আরও বিস্মিত করে দিয়ে অবিনাশ দত্ত তিন হাজার টাকায় গল্প কিনে নিয়ে চলে গেলেন। অমিতের বিস্ময়ের ঘোর কাটতে বহুক্ষণ সময় লাগল। তারপর ওরা তিনজন উল্লাসে ফেটে পড়ল। এক-সঙ্গে তিন হা-জা-র টাকা।

(চলবে)

মুসাফির

কিছুক্ষণ

লিলি চক্রবর্তী

প্রথম দেখা হয়েছিল 'ভোলা ময়রা' ছবির সেটে। উত্তমকুমারের বৌ সেজে অদূর গায়ে কাপড় জড়িয়ে ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন। পায়ে মল নাকে নাকছবি। একমনে দৃশ্যটির রিহার্সাল দিচ্ছেন।

ক্যামেরা বসেছে লিলি চক্রবর্তী ওরফে এলোকেশীর পিছনে। সুতরাং মুখ ঘুরিয়ে কিরকম রিঅ্যাকশান দিতে হবে সেটা জেনে নিচ্ছিলেন কো-আর্টিস্ট উত্তমকুমারের কাছ থেকে।

শটটা শেষ হবার পর চোখ পড়ল আমার দিকে। দু-চার কথায় কুশল বিনিময়ের পর একদিন বাড়ীতে যাবার কথা বলতে তিনি বললেন—'আসুন খুব ভালো কথা। কিন্তু বসতে দেবো কোথায় তাই ভাবছি। বাড়ীটা রিপেয়ার হচ্ছে। চারদিক বড়ো আগোছাল।'

সুতরাং বাড়ীতে আর বিরক্ত না করে দুদিন বাদে হাজির হয়েছিলাম ইন্দ্রপুরী স্টুডিওয়।

সেদিনও এলোকেশী সেজে বসে আছেন মেক-আপ রুমে। ফ্লোরে ডাক পড়তে তখনও অনেক দেরী। আমাকে দেখে নিজেই বললেন —অসুবিধে না থাকলে এখুনি বসতে পারেন আমার কাছে দেরী আছে এখন।

মেক-আপ রুমে ঢুকে দেখি সাজগোজ প্রায় রেডি। কালো রংয়ের ওপর সাদা ডুরেকাটা শাড়ি পরেছেন। চুলবাঁধা গায়ের বোদের ঢংয়ে। ঘরে আর কেউ নেই। আয়নার সামনের চেয়ারে বসে সামনের আরেকখানা চেয়ারে পা তুলে কি একটা বই পড়ছিলেন বোধহয়।

আমি ঢুকতেই বইটা মুড়ে রেখে পা নামিয়ে বসলেন। ছবির মত সুন্দর মুখ-খানিতে হাসির ঝিলিক তুলে বললেন—'অনেক দিন বাদে দেখা তাই না?'

আয়ত চোখ সুশ্রী গড়ন আর শান্ত মুখশ্রীতে লিলি চক্রবর্তীকে যে কোনো সময়েই আশ্চর্য সুন্দর মনে হয়। সব মিলিয়ে কিন্তু ও'র মধ্যে চটকদারী গ্ল্যামারও নেই। ফিল্মের গ্ল্যামার তো নয়ই। বাড়ীর দিদি-বৌদির মত সরলা ও'র চোখমুখে চেহারায় চলনে বলনে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য করছিলাম গত পাঁচ বছর বম্বে প্রবাসী হলেও এক ছটাক পরিবর্তন আসেনি লিলির মধ্যে।

—বম্বে গেলেন কেন?

এই প্রশ্নের জবাবে ক্ষোভমাখা কোনো উত্তর পাব ভাবিনি। তাই তিনি যখন বললেন —সে অনেক কথা অনেক দুঃখ আছে পিছনে।' তখন অবাক হয়েছি। দুঃখটা কিসের ব্যাথাটা কোথায় বুঝতে পারিনি।

একনাগাড়ে যে শিল্পী হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, প্রভাতের রং, কাঁচ কাটা হীরে সুশান্ত, সা; কেদার রাজা; কষ্টিপাথর; বুলবুলির মত সুপারহিট ছবিগুলো করে ছেন তাঁর অতর্কিতে বিদায় নেবার কারণ মাথায় আসার কথাও নয়।

তবুও সেই শিল্পী বিষণ্ণ মনে একদিন পাড়ি দিলেন বম্বের দিকে। দুঃখে ক্ষোভে যন্ত্রণায়। কারণের গভীরে না গিয়ে তিনি শুধু বললেন—'বাংলা ছবির তখন অবস্থা খারাপ যাচ্ছিল; আমার তো বটেই। কারণ আমি যে ধরনের চরিত্রে সাধারণতঃ কাজ করে থাকি তেমন চরিত্রও তখন পাচ্ছিলাম না।'

অবশ্য বম্বে যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না অভিনয় করা। সুযোগ পেলে করবেন এই ছিল বাসনা। তাছাড়া ফিল্ম লাইনে জনসংযোগ নামক যে বস্তুটি কাজ-কর্ম পাবার ব্যাপারে সবচাইতে কার্যকরী লিলি চক্রবর্তী সেই কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সুতরাং ওখানে প্রথম ছবি 'আচানক'য়ে যোগাযোগের ব্যাপারটাও অদ্ভুত।

পরিচালক গুলজার সাহেব নাকি মনে মনে লিলি চক্রবর্তীর কথাই ভেবেছিলেন চরিত্রটির (পুষ্পা) জন্য। অতর্কিতে এ জনের বাড়ীতে গীতিকার মুকুল দত্তের সঙ্গে লিলির দেখা। লিলিকে দেখেই মুকুলবাবুর মনে পড়ে গুলজারের ছবির কথা। কয়েক বাদে গুলজারের কাছ থেকে গাড়ী এসে হাজির। এবং ও'কে দেখে গুলজারও রাজী। আচানক'য়ে যদিও তিনি অভিনয়ের তেমন সুযোগ পাননি কিন্তু ছবিখানি জনপ্রিয় হওয়ায় লিলির পরিচয় হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে।

লিলি নিজেও চান এমন হোক। মাইনে

করা সেক্রেটারী রেখে কাজ পেতে তিনি ইচ্ছুক নন। উনি বললেন—'সেক্রেটারী রাখাটা ওখানে একটা ফ্যাশনের মতো। আমার ওসব পোষায় না।'

লিলি চক্রবর্তীর মতে—'আমার কাজ ভালো হলে লোকে নিশ্চয়ই ডাকবে আমাকে। সেক্রেটারী রেখে কাজ পেতে যাবো কেন? আমার যোগ্যতাই আমাকে কাজ দেবে।'

ঘটনাও তাই ঘটলো 'আচানক'-এর সাফল্য তাঁকে দিল পরপর কয়েকখানা ছবি। যদিও হিরোইন নয় কিন্তু প্রতিটি ছবিতেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিল তাঁর। চুপকে চুপকে (হৃষিকেশ মুখার্জি); মুঠিভর চাউল (সুরেন্দ্র শৈলজ). উজালা ঔ উজানা (এস এম সাগর) কোনোটাতেই লিলি চক্রবর্তী ফেল করেননি।

ফেল করবেনই বা কেন, অভিনয়ে তো তিনি বিন্দুমাত্র কম ক্ষমতার অধিকারী নন। উপরন্তু স্টারে তিন-তিনটে নাটক করেছেন কয়েকশো রাত। ওখানেই তো বেস্ট বেশ শক্ত হয়েছে।

বললাম—হিন্দী ছবিতে এখনও ক্যান্টার করা ব্রেক কিন্তু পাননি। আদৌ পাবেন কিনা সেবিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ।'

উনিও আমার সঙ্গে একমত হলেন। সংকোচহীনভাবে বললেন—'ব্রেক বলতে হিরোইন হবার কথা যদি বলেন, তাহলে বলি চলতি সব হিন্দী ছবির হিরোইন আমি সাজতেও চাই না, —চাই ভালো চরিত্র তাহলেই চলবে।'

হৃষিকেশ মুখার্জির 'আলাপ' আর অনিল গাঙ্গুলীর 'সমর্পণ' ছবি দুটিতে নাকি দারুণ চরিত্র পেয়েছেন। দুটিই বৌদির চরিত্র। উনি আশা করেছেন তাঁর অভিনয়ের ব্রেক ঘটবে হয়তো এই ছবি দুটিতেই।

বৌদি চরিত্র প্রসঙ্গ থেকে ঋতিত আলোচনা চলে এলো সত্যজিৎ রায়ের সাম্প্রতিক ছবি 'জনঅরণ্যে'র বৌদির চরিত্র। এই ছবিতে একমাত্র তাঁর চরিত্রটিই নিরুচ্ছার অভিব্যক্তিতে নায়ক সোমনাথের প্রতি সহানুভূতিশীল। লিলি চক্রবর্তী তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয়ে চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য এবং সুন্দর করে তুলেছিলেন।

কিছুদিন আগে সত্যজিৎ বাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন লিলি। ওঁকে দেখেই নাকি তিনি বলেছিলেন—'তোমার তো খুব নামডাক হয়েছে এ ছবিতে। শুনেছো নাকি।' বিনয় হাসিতে লিলি উত্তর দিয়েছিলেন—'সবই আপনার কৃতিত্ব।'

—তা ক করে হয়। তোমার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই আছে।

সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে যোগাযোগের পশ্চাদপট জানতে চাইলে লিলি চক্রবর্তী সহাস্যে বললেন—'যোগাযোগ বলতে যা বোঝায় সেরকম কিছুই নাকি হয়নি। হঠাৎ এক বৃহস্পতিবার অলস দুপুরে পিওন একটি অচেনা হস্তাক্ষরের চিঠি দিয়ে যায় বম্বের বাড়ীতে। চিঠিখানা খুলে নীচের নামটাই আগে পড়েছিলেন।

সত্যজিৎ রায় তাঁকে চিঠি লিখেছেন! কেন, কি ব্যাপার তা আর ভাববার সময় ছিল না। এক নিশ্বাসে চিঠিখানা শেষ করেছিলেন একবার নয় তিন-তিনবার। 'জন অরণ্যে' কাজের অফার ছিল সে চিঠিতে। স্বয়ং সত্যজিৎ রায় নিজে ডেকেছেন, সুতরাং কিন্তু কেন কবে কোথায় ইত্যাদি প্রশ্নই আসে না। মুহূর্তের মধ্যে মনস্থির করে সেই রাত্রিতেই উত্তর দিয়েছিলেন—'হ্যাঁ, কাজ করব।'

তারপর সত্যজিৎ বাবুর মাধ্যমেই প্রোডিউসারের সঙ্গে যোগাযোগ কন্ট্রাক্ট সই আর দু-তিন মাসের মধ্যে কলকাতায় এসে শুটিং শুরু। তারপর ফিরে গিয়েছিলেন বম্বেতে। ওখানে তখন কাজ চলছিল। আবার প্রোডিউসার সুনন্দা ওরফে সুনীল রায়চৌধুরী ভোলা ময়রা'র জন; যোগাযোগ করতে কলকাতায় এসেছেন। ছবির কাজ শেষ হলেও থাকবেন কিছুদিন।

ইতিমধ্যে 'না' নাটকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। মাধবীকে কয়েক মাসের জন্য রিপ্লেস করছেন লিলি। জ্ঞানেশ মুখার্জিকে ওঁকে নাটকের কথা পাড়তেই তিনি রাজী হয়েছেন। প্রথমতঃ নাটকের প্রতি তাঁর ভালবাসা, দ্বিতীয়তঃ উনি যোগ না দিলে হয়তো নাটকটাই বন্ধ হয়ে যেত। কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চের কর্মীরা বেকার হয়ে পড়তেন। এই দুটো দিক চিন্তা করেই লিলি রাজী হয়েছেন।

—তাহলে তো আপনি এখন কলকাতাবাসী হচ্ছেন।

বৌদির মত সরল হাসিতে বললেন—কলকাতা তে আমারই শহর, এটাই আমার প্রিয় জায়গা, এখনে তো থাকবই। মাঝখানে কিছুদিন বম্বে প্রবাসী হয়েছিলুম বলতে পারেন।'

সত্যিই তাই! বম্বেতে থাকলেও মনে প্রাণে তিনি সবসময় কলকাতার দিকেই চেয়ে থাকতেন। তাই না বাংলা ছবির অফার পেয়েই ছুটে এসেছেন! তাঁর হিন্দী ছবি করার কারণ তো এখানে নিশ্চুপ বসে থাকাটাই!

কিন্তু টালিগঞ্জ যদি আজ লিলি চক্রবর্তীর ক্ষমতাকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারে কাজের সুযোগ তিনি যথাযথ পান তাহলে তিনি আর বম্বেতে ফিরে যাবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

এখানে কাজ না পেয়ে বম্বে চলে যাবেন, এটা নিশ্চয়ই টালিগঞ্জ চাইবে না।

লিলি চক্রবর্তী যোগ্য মর্যাদা নিয়ে এখানে ছিলেন আছেন এবং থাকা উচিত।

নির্মল ধর

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি. ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ট্রানজিস্টার ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

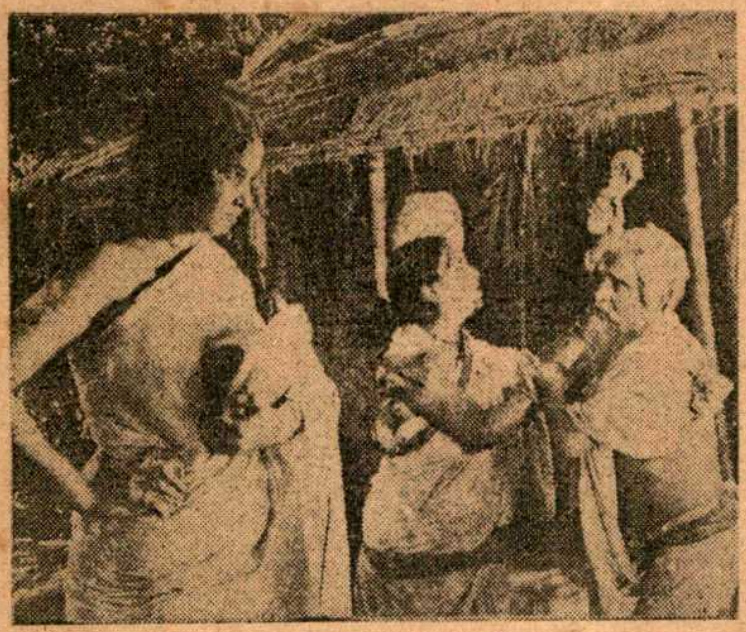

ঋত্বিক ঘটকের ছবি

সম্প্রতি ফেডারেশন অফ ফিল্ম সোসাইটিজ অফ ইণ্ডিয়া ঋত্বিক ঘটককৃত ছবিগুলির যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তার প্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীঘটকের শেষ দুখানি ছবি। এক—বাংলাদেশে তৈরী তিতাস একটি নদীর নাম, দুই—এদেশে তৈরী যুক্তি তক্কো গপ্পো। অন্যান্য ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক কম হয় নি সুতরাং সে প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবী রেখে সাম্প্রতিক ছবি দুখানির প্রতিই আলোচনা নিবন্ধ রাখা যাক।

দুকূল প্লাবী তিতাসকে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক নতুন সম্প্রদায়। নাম তাদের মালো। মাছ ধরাই তাদের জীবন এবং জীবিকা। মালোদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ভেদ নেই। যেমন নেই তিতাসকে ঘিরে তাঁদের আশা-স্বপ্নের কল্পনা। ছবির শুরুতে নীল জলে থৈ থৈ তিতাস, ছবির শেষে রুক্ষ বালিয়াড়ির রূপ নিয়েছে। শুধু তিতাস শুকোয় নি শুকিয়েছে মালো জাতটাও। ছিন্নমূল মেয়েগুলো শেষ পর্যন্ত তাই বলে ত্রিপুরার চা-বাগানে কাজ করতে যাবার কথা। আরও বলে—বাধা পামু ক্যান, পিছলাইয়া যামু, যৈবন তো যায় নাই।

এই ক্ষয়ের কথা সারা ছবি জুড়ে। শুধুমাত্র নাগরিক সমাজেই নয়, পল্লী-বাংলার সুদূর গ্রামেও যে নৈতিক অধঃপতন শুরু হয়েছে তারই এক ধারাবিবরণী রয়েছে ছবিটিতে। এই সামাজিক সংকটের চেহারাটা ধরবার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কয়কটি ঘটনাবহুল জীবনকে। কখনও কখনও ঘটনার ঘনঘটায় এবং সংলাপের বাহুল্যে তিতাস থেকে চোখ সরে যায় বটে, কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুতে পরিচালক স্থির। আপাতত অসংলগ্ন বহু দৃশ্যকল্পর মধ্যেও ঋত্বিক স্বমূর্তিতে বিরাজমান। যেমন — পত্রস্নেহকাতর বাসন্তী অনন্তর কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে আহত। হঠাৎ একদিন তিতাসের পাড়ে দেখা হওয়ায় কাছে টেনে নিয়েছিল তাকে। কিন্তু অনন্ত তাকে প্রত্যাখ্যান করে সরে যায়। বাসন্তী তখন রাগে দুঃখে বেদনায় চড় মারে তাকে। প্রচণ্ড অভিমানে সে ফেটে পড়ে। বাসন্তীর সেই ইনার ভায়োলেন্সের প্রকাশ যেভাবে পর্দায় পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছেন তা তুলনারহিত অনন্তকে চড় মারার সঙ্গে সঙ্গে কেটে দৃশ্যটিকে নিয়ে আসা হয়েছে প্রচণ্ড শব্দে বাইচ খেলার মাঠে। কয়েক মিনিট পর ঐ সিংহ গর্জনের বাইচ খেলা থামতে আবার দৃশ্যটিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে বাসন্তীর আলুথালু ক্লোজ-আপে। পেছনে ভয়ার্ত অনন্ত। সাউণ্ড ট্রাকে তখন আর কোন শব্দ নেই। একবারে নিশ্চুপ। হৃদয় নিংড়ে ব্যথা বের করতে চায় যেন।

কিংবা সেই দৃশ্যটি যেখানে তিতাসের পাড়ে হেলান একটি তালগাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে চক্কী মোল্লা সাহেব ভবিষ্যতে ভাল হবার কথা বলে। এবং ক্যামেরা টিল্ট আপ করে উঠে যায় তালগাছের মাথায়, পরবর্তী শটেই খবর দেওয়া হল সেই মোল্লা সাহেব তালগাছ থেকে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। ক্যামেরা তখন মিড লংয়ে চলচ্চিত্রের ভাষায় ঘটনার প্রিলাড হিসাবে এই যে চিত্রকল্পনা তা পরিচালকের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেয়।

যুক্তি তক্কো গপ্পোয় তিনি সম্পূর্ণ অন্য-রূপে হাজির। এখানে অবক্ষয় শুধু চরিত্র বা বিশেষ কোন ঘটনাকে ঘিরে নয় অবক্ষয় আর সংকটের ছায়া এ ছবিতে দেখান হয়েছে সারা সমাজ জুড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষণে এটি প্রচণ্ড রাজনৈতিক ছবি বটে। সমাজের সকল বিষ পান করে নায়ক নীলকণ্ঠ বাগচী। সীতাই আজ নীলকণ্ঠ। মাতাল, অকেজো সে। যুক্তি আর তক্কোর গোলকধাঁধায় নিজেই বিভ্রান্ত।

আজকের সমাজের চেহারাটা তাঁর দৃষ্টিতে তাই শুধু পড়ছে—ব্রহ্মাণ্ড পড়ছে—চারিদিক পড়ছে, এমন কি সে নিজেও পড়ছে। কিছু করতে না পারার জ্বালায় সে জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড যেন। কিন্তু সে বেপথু নয়। নিজের মতের প্রতি আদর্শের প্রতি স্থিতবান।

ছবির শেষ দৃশ্যে নীলকণ্ঠ তাই বলে—অচ্ছা মানিকবাবুর (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) সেই মদন তাঁতীর কথা মনে আছে তোমার? সেই যে বলেছিল, ভুবন মহাজনের টাকায় সুতো কিন তাঁত চালাবো? তোদের সঙ্গে বেইমানি করবো? তাঁত না চালিয়ে পায়ের গাঁট বা ধরে গেছে তাই খালি তাঁত চালালুম একটু। একটা কিছু করতে হবে তো?...

এই কটি কথার মধ্যেই নীলকণ্ঠর সারাটা জীবনব্যাপী অসহায়তার কথা স্বর্থহীন ভাষায় সোচ্চার। সারা ছবি জুড়ে যে কথা বলার তোড়জোড় শেষ কটি কথায় ত অ্যাটম বোমার মত বিস্ফারিত। কলা-কৌশলগত কাজকর্মে প্রচুর ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও এই ছবি এক কথায় ঋত্বিকের আত্ম-জীবনী। ঋত্বিকের চেহারায় যদি আশ-পাশের কারও ছাপ পড়ে থাকে সেটা দর্শকের অনুভূতিতে হারান নিজেকে ফিরে পাওয়ার আকুতির জন্যই হয়তো।

মজার ব্যাপার বাংলা ছবির দর্শকরা কিন্তু সুবিচার করে নি ঋত্বিক ঘটকের প্রতি। তাঁর কোন ছবিই দর্শকানুকূল্য পায় নি। সম্প্রতি এই উৎসবে তাঁর ছবি দেখা নিয়ে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে তা যদি তিনি বেঁচে থাকতে ঘটতো তাহলে ঋত্বিকের পরিণতি ভিন্নতর হতে পারতো।

নিরীক্ষিৎ

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৯, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা ৩ হইতে প্রকাশিত।

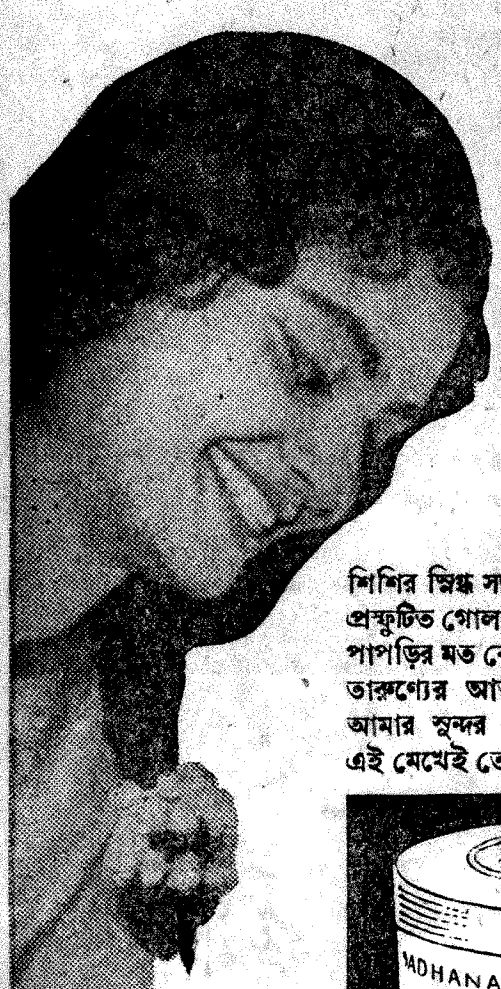

এর কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য
বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সন্ত
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেখেই তো!

সাধনা
বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক
অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 4th June, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

1 JUN 1976

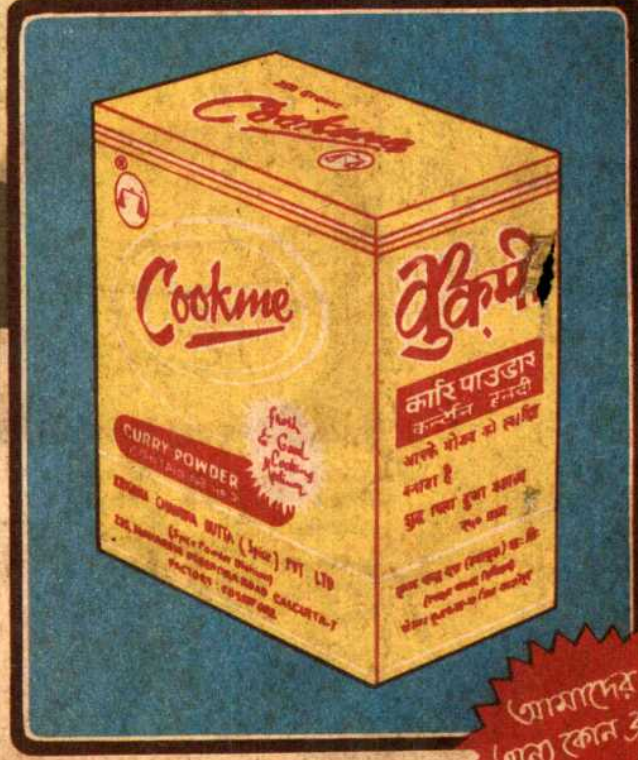

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে

আমাদের (এন) কোন ব্র্যাণ্ড ও আশ্চ নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫

iaa/KCD-176

অর্ডার-অফিসেই : এন, কে, প্রোডাক্টস এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১১ জুন ১৯৭৬

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত কিমান মাশুল ৭ পয়সা

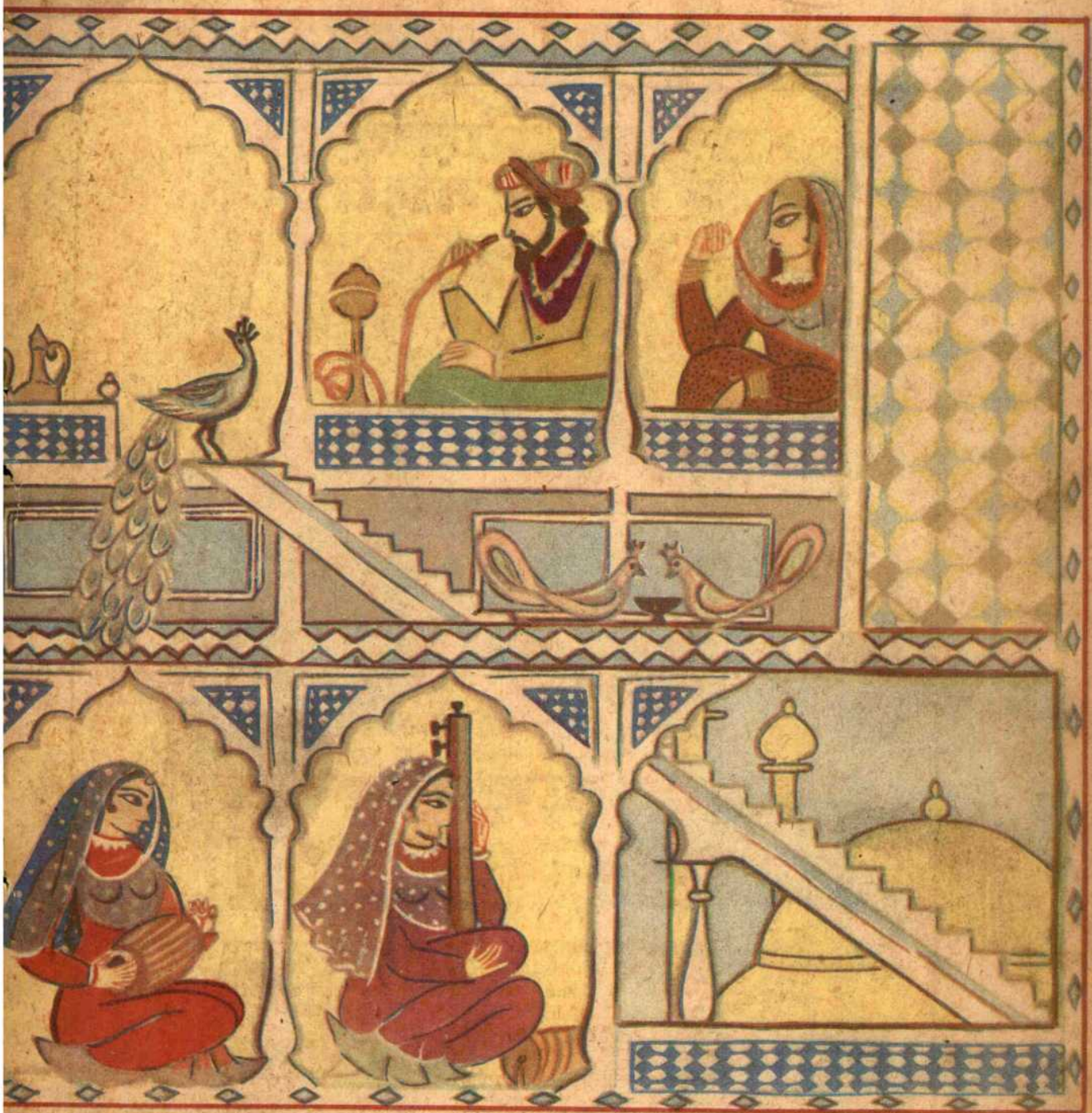

বারোলীন যার সহায়
ম্লে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই প্রকৃতি সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো গরম আপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোস্কা, মুখকুঁড়ি ও অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা হয়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

সবচেয়ে বেশী কার্যকরী মশা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন ওডোমস

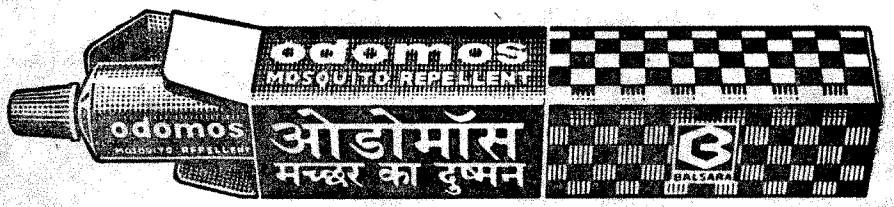

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক

BALSARA বালসারা আণ্ড কোম্পানী (প্রা.) লি.
৬৩,নাগীনদাস মাস্টার রোড়,বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHAITRA BLS 45 BEN

ভ্রমণ-সাহিত্যে অনন্য শঙ্কু মহারাজের সার্থকতম রচনা

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

আলোক-চিত্র শোভিত, মধুময় বৃন্দাবনের পথপঞ্জীসহ উপন্যাস-রসসিক্ত অপূর্ব গ্রন্থ।

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবন পর্ব ১২৲

অগ্নিঝরা রক্তাক্ত বিপ্লব-দিনের পটভূমিকায় বহুজন-সংবর্ধিত
শৈলেশ দে'র

আমি সুভাষ বলছি

তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ ॥ মূল্য ঃ প্রতি খণ্ড কুড়ি টাকা

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫৲

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় থানা ও পুলিশের পটভূমিকায়
সুসাহিত্যিক নট রাজনের অনন্য গ্রন্থ

থানার মাটি নোনা ১৬৲

১৯৭৫ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত
সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের উপন্যাস

প্রেম ঘৃণা দাহ ৮৲

কল্‌হনের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০৲

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০৲

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫৲

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

অন্যদিন ৪৲

নিখিলচন্দ্র সরকারের উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২৲

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১৫৲

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪৲

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

সুবর্নশিরি ২০৲

নিগূঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি
৭৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতী ও দীপু ১০৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈথৈহাহাকার ১৮৲

আবদুল জববারের

পল্লীর পদাবলী
১৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

শ্রীহংস-এর উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২ ॥ ফোন ঃ ৩৪-৮৩৫৬

আপনার স্বপ্ন সত্যি হবে...

মাল্টি-বেনিফিট অ্যাণ্ড ওল্ড এজ ডিপোজিট স্কীম

আমরা আপনার কথা---পাঁচ, দশ এমন কি কুড়ি বছর পরের কথা ভেবেছি। আপনার স্বপ্ন সত্যি করতে আমরা আপনাকে সাহায্য করব।

আমাদের মাল্টি-বেনিফিট অ্যাণ্ড ওল্ড এজ ডিপোজিট স্কীমের অধীনে 5,000টাকা জমা রাখলে ছেলেমেয়েদের উচ্চতর শিক্ষা বা কারিগরি শিক্ষা কিংবা তাদের ভালো চাকরীর জন্যে একটা ব্যবস্থা করা যায়। আর তা না হলে অন্ততঃ বার্ধক্যের অর্থচিন্তা তো দূর করা যায়।

কুড়ি বছরের একটা প্রকল্পে আপনার টাকা বছরে 31.6% হারে বাড়তে থাকবে। আজ হাজার টাকা জমা রাখলে তা 7,328 টাকায় আর পাঁচ হাজার টাকা জমা রাখলে 36,640 টাকায় দাঁড়াবে। একশ' বা তার বেশি পরিমাণ টাকা 13 মাস থেকে 241 মাসের জন্যে জমা দেওয়া যায়।

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের নিকটতম শাখায় যোগাযোগ করুন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

devp-78/697

১৬ বর্ষ

অমৃত

৫ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 11th June, 1976 শুক্রবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	রিপু	(গল্প)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১২	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়		শ্রীরেখা বড়ুয়া
১২	দ্বীপ	(গল্প)	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
২০	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২৩	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৫	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২৮	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৩১	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৬	মোড়ের ঘর পাক	(কবিতা)	শ্রীঅরুণ মিত্র
৩৬	কবিতা হারিয়ে যায়	(কবিতা)	শ্রীঅমিয়কুমার হাটি
৩৬	বর্ষা সন্ধ্যা	(কবিতা)	শ্রীঅজিত বাইরী

আশাপূর্ণা দেবীর

নবতম ও বৃহত্তম উপন্যাস

কখনো দিন কখনো রাত ৩০,

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের

তিনে একে চার ২০,

বিমল মিত্রের

বিষয় বিষ নয় ৭,

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রাত্রি নিশীথে ৭॥

প্রবোধকুমার সান্যালের

অগ্নিকন্যা ৪,

মহাশ্বেতা দেবীর

অজানা ৪॥

ফণীভূষণের

ভাগ্যলিপি ৯,

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কুয়ারী গিরিপথে

নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। দশ টাকা।

অমর সাহিত্য প্রকাশন, ৭, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

সদ্য প্রকাশিত

বাজ বর্মণের

দোভাষী ৫·০০

হ্যাঁ! চট্টগ্রামের সেই বিখ্যাত আব্দুল-হক দোভাষী। পৃথিবীতে যে চরিত্র আর দ্বিতীয় নেই। অশিক্ষিত হয়েও শিক্ষিত-দের কেন পূজ্য, কেন মরেও অমর—তারই কিছু দৃষ্টান্ত.....

সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিক্ষা সঙ্কট প্রসঙ্গে ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সত্যপ্রিয় রায়, অম্লান দত্ত, সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতি ভট্টাচার্য ও ভবেশ মৈত্র প্রমুখ ১৮ জন শিক্ষাবিদের বক্তব্য :

* ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট
* সোভিয়েট ইউনিয়ন, ভিয়েতনাম ও চীনের শিক্ষা কাঠামোর বিস্তারিত বিশ্লেষণ.....

নিশান প্রকাশনী

৩০।১বি, কলেজ রো, কলি-৯

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর

লিখনসরঞ্জাম

এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

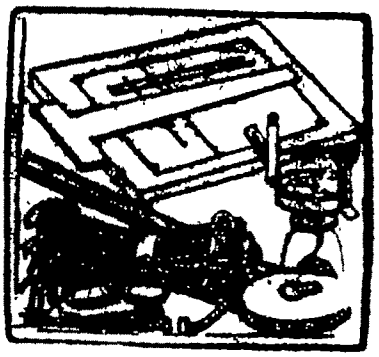

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজ, খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য

অন্যতম প্রতিষ্ঠান

কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স

৬৩ই, রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১।

ফোন : ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪

গ্রাম : অবারণীয়, পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া

পরিবেশক : ক্যামলিন প্রডাক্টস (ষ্টেশনারী বিভাগ)

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রেখে পাঠাবেন। অমনোনীত রচনার খরচ সংশ্লিষ্ট লেখকের দেয় হবে। অমনোনীত রচনা কোনক্রমেই ফেরৎ পাঠান সম্ভব নয়। লেখার সঙ্গে কোন ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। প্রেরিত রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্যে গৃহীত হয় না।

৩। রচনার সঙ্গে লেখকের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কে অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্যে অন্তত ১৫ দিন আগে 'অমৃত' কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে ধ্রুব অগ্রিমযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,

কলিকাতা—৮

ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডাঃ জিতেন ঘোষের

গ্রীক ট্র্যাজেডির তিন কবি

এসকিলাস, সোফোক্লিস য়ুরিপিদিস জীবনী ও নাট্যালোচনা। ৫-

গ্রীক ও রোমক কমেডির চার রূপকার

আরিসতোফেনিস, মিনান্দার প্লুতাস তেরেনস : জীবনী ও নাট্যালোচনা। ৫্

ডঃ জিতেন ঘোষ ও ডঃ অরুণ সান্যাল : সাহিত্য কোষ ১২্

প্রাপ্তিস্থান : দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, জিজ্ঞাসা দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, সিদ্ধেশ্বরী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৪ শৈব্যা পুস্তকালয়, কলিকাতা-১২।

সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত নৃত্যকলা প্রতিভা অনুসন্ধানে ব্রতী

প্রতিশ্রুতি পরিষদ

অন্যান্য বছরের মত এবারও বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করছেন ২৪শে জুন (জহর শিশু ভবন) ও ২৫শে জুলাই (কলামন্দির—মিনি হল)

এবার সাহিত্য পুরস্কার ছাড়া সঙ্গীত ও নৃত্যকলাতেও পুরস্কার দেওয়া হবে।

গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গরচনা ৪টি (বয়ঃসীমা ৩৫)—মোট ৫০০্।
ঐ ঐ বিষয়ে কেবলমাত্র 'প্রতিশ্রুতি' পত্রিকার লেখকদের জন্য ৪টি (বয়ঃসীমা ৩৫)—মোট ৫০০্।

সঙ্গীত—'ক' বিভাগ (বয়ঃসীমা ১১—১৬) স্বর্ণখচিত ও রৌপ্য পদক।
'খ' বিভাগ (বয়ঃসীমা ৬—১০)—স্বর্ণখচিত ও রৌপ্য পদক।

নৃত্যকলা—(বয়ঃসীমা ৬—১০)— স্বর্ণখচিত পদক ও রৌপ্য পদক।

১৫ই জুনের মধ্যে ঠিকানা লেখা খামসহ আবেদনপত্রের জন্য যোগাযোগ করতে হবে। কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

সঙ্গীতানুষ্ঠানে প্রখ্যাত ও তরুণ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করবেন।

[কেবলমাত্র পরিষদ সদস্য ও আমন্ত্রিতদের জন্য]

পরিষদের বার্ষিক দেয় ২৫্ (+১৫্ অন্তর্ভুক্তির জন্য। আজীবন সদস্যদের দেয় ২৫০্ (+১৫্) পরিষদ সদস্যদের 'প্রতিশ্রুতি' পত্রিকার জন্য পৃথক চাঁদা দিতে হয় না।

'প্রতিশ্রুতি পরিষদে'র সহযোগিতায়

প্রতিশ্রুতি

'প্রতিশ্রুতি'র এখন থেকে উন্নতমানের মাসিকরূপে বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম সংখ্যা থেকেই শুরু হচ্ছে একটি আলোড়ন জাগানো বিশেষ প্রবন্ধ।

ভারতীয় প্রজ্ঞার আলোকে সৃষ্টিরহস্য, বিজ্ঞান ও দর্শন

প্রতি সংখ্যা এক টাকা। বার্ষিক চাঁদা ১৬্ টাকা বিশেষ সংখ্যাসহ। বৈশাখ সংখ্যা থেকেই পাওয়া যাবে। নতুনদের লেখাই অগ্রাধিকার পাবে। এজেন্সি কমিশন ১৫%—২৫%

সাধারণ সম্পাদক—প্রতিশ্রুতি পরিষদ ও কর্মাধ্যক্ষ, প্রতিশ্রুতি।
২০-সি ফার্ণ রোড, কলিকাতা-১৯। ফোন : ৪৬-২১১৯

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৭	নতুন বই	
৩৮	একালের গান	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪২	সাহিত্যের নেপথ্যে	শাশ্বতী চতুর্বেদী
৪৫	প্রদীপের আলো কালো (গল্প)	শ্রীধীবেন হোম
৫১	পুনশ্চ	ক্ষণপনক
৫২	অঙ্গনা	শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫৩	অদ্য শেষ রজনী (উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৫৫	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৫৭	খেলাধুলা	দর্শক
৫৮	সিনেমাটিকটক	শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৬১	কিছুক্ষণ	শ্রীনির্মল ধর
৬৩	জলসা	চিত্রাঙ্গদা

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রানন্দ চৌধুরী

সুলেখা
লেখার সাথী
আনবে কলমে গতি
বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় :
রয়াল ব্লু • ব্লু-ব্ল্যাক • নেভি ব্লু
ব্ল্যাক • রেড • গ্রীণ
ব্রাউন • ভায়োলেট

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে যোগাড় করে রাখতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ মাংস, ডিম ও সবরকম সুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৪৩৭, ৩৪-৯৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

গ্রামের কথা

এবারের গ্রীষ্মে তাপমাত্রা কম যাচ্ছে এটা অস্বীকার করা যায় না, যদিও গুমোট এবং গরমের ভাব খুব একটা কম নয়। তবু স্বীকার করতেই হবে, যে রুদ্র বৈশাখের কথা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পড়া যায় এবং যার অস্তিত্ব কবিকল্পনার চৌহদ্দি পেরিয়ে আমাদের গাত্রচর্ম পর্যন্ত এসে পৌঁছতো সে অন্য বস্তু। এবারের গোটা বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠের প্রায় শেষ সপ্তাহ অবধি শুধু কালবৈশাখী নয়, বৃষ্টিও পড়েছে যথেষ্ট। তাপমাত্রা কম থাকার কারণ হয়তো সেটাই।

কারণ যাইহোক, কেননা রোদ্দের তাপ কতটা উঠল বা নামল সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল বৃষ্টি। খবরে দেখা গেছে, কলকাতাতেই নয় শুধু, গোটা পশ্চিমবঙ্গেই ঝরে পড়েছে আকাশের এই অকৃপণ আশীর্বাদ। আশা করা যাচ্ছে, চাষবাসের দিক দিয়ে ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে এ বৃষ্টি যথেষ্ট পরিমাণেই।

আমাদেরও আসল প্রসঙ্গ সেটাই—গ্রামের মানুষদের কথা, সারা পশ্চিমবঙ্গের কথা। কৃষি যেহেতু পল্লীজীবনের প্রধান উপজীব্য সেজন্যে সুস্থ জীবন-পরিবেশের মূল চাবিটি কৃষির হাতেই। এ সত্য প্রথম ধরা দিয়েছিল বোধকরি রামায়ণের যুগেই, কেননা সেখানে রাজর্ষি জনককে দেখা যায় স্বহস্তে হলচালনা করতে। তারপর থেকে অবশ্য ইতিহাসের নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল, কিন্তু কৃষি যে এদেশের বৃহত্তম জনসংখ্যার—যাঁরা বাস করেন গ্রামে, তাঁদের জীবনের মূলকেন্দ্রে রয়ে গেছে এনিয়ে আর অতিবিস্তার বাহুল্য।

স্বাধীনতার পরও আমাদের এই রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এব্যাপারে ছিল পিছনের সারিতে। তার একটা কারণ দেশভাগ, যার ফলে অবিভক্ত বাংলার যে অংশে হত ধান ও পাটের চাষ তার সিংহভাগ চলে যায় সীমান্তের অন্য পারে। পশ্চিমবঙ্গ সেজন্যে রাতারাতি হয়ে দাঁড়াল খাদ্যের দিক দিয়ে ঘাটতি অঞ্চল।

এ সমস্যা দূর করার চেষ্টা শুরু হয়েছে অবশ্য প্রথম থেকেই। সেচের জন্যে তৈরি হয়েছে দামোদরের ওপর বেশ কয়েকটি বাঁধ, তাছাড়া অন্যান্য নদীতেও বাঁধ তৈরি হয়েছে পরে। কিন্তু সঙ্কট থেকে তাতে ত্রাণ পাওয়া গেছে একথা বলা শক্ত।

ভারতের বৃহত্তম নগর কলকাতা ও তার অতি ব্যাপক শহরতলির শিল্পাঞ্চল—যেখানে শস্য ফলে না, কিন্তু সেখানকার সমস্ত মানুষকে খাওয়ানোর দায়িত্ব এই রাজ্যেরই। সেজন্যে চালু করতে হয়েছে খাদ্য-র‍্যাশান ব্যবস্থা এবং আমদানী করতে হয়েছে চাল ও গম প্রচুর পরিমাণে।

কিন্তু ইদানীং কয়েক বছরের চেষ্টায় চাকা যেন উল্টো পাকে ঘুরতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের জমিতে শুরু হয়েছে এখন অজস্র ধরনের ফলন। তার জন্যে প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই কৃষিজীবী মানুষের এবং সেই সঙ্গে সরকারেরও। একই জমিতে বছরে একাধিক জাতের ধানের চাষ, গম চাষের প্রচলন, উন্নত ধরনের বীজ ও সারের জোগান, সারা বছর সেচের জন্যে কেবল বাঁধের উপর ভরসা না করে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপের ব্যবস্থা, কীটনাশকের সরঞ্জাম দিয়ে তার ব্যবহার-পদ্ধতিতে চাষীকে অভ্যস্ত করা—এগুলি সম্ভব হয়েছে সরকারী প্রচেষ্টাতেই। এবং কেবল তাই নয়, কৃষি-গবেষণার কাজেও সরকারই অগ্রণী। বিশ্ব ব্যাঙ্ককে তাঁদের পরিকল্পনাতে রাজি করিয়ে এর আগেই তাঁরা ৪ কোটি টাকা আদায় করেছেন। আর বিশ্ব ব্যাঙ্কও রীতিমতো তারিফ করেছে পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্বে। এত অল্প সময়ে এ রাজ্যে যে ধরনের উন্নত চাষ চালু হয়েছে তা দেখে বিশ্ব ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই আবার ঋণ মঞ্জুর করবে মনে হচ্ছে, এবং তার অঙ্ক সরকারী আবেদন অনুযায়ী ১৬ কোটি না হলেও ১০ কোটি টাকার কম হবে না হয়তো।

পশ্চিমবঙ্গের চাষী এখন সারা বছর চাষ করে, ধানের সঙ্গে সঙ্গে গম চাষেও সে তার দক্ষতা প্রমাণ করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা অর্জন করেছে। শ্রীজগজীবন রাম বলেছেন গম বিপ্লব যদি সত্যিই কোথাও হয়ে থাকে তো সেটা ঘটেছে পশ্চিমবঙ্গেই—কেননা অন্য প্রদেশের চাষী চিরকালই করত গমের চাষ, বাংলার চাষী গমের চাষ শুরু করেছে নিতান্তই কয়েক বছর আগে।

সর্বদিকের চিত্র যদি এক নজরে দেখে যাওয়া যায় তাহলে স্বীকার করতেই হবে, শুধু গম চাষেই নয় আজকের গ্রামজীবনেও ঘটে যাচ্ছে এক নিঃশব্দ রূপান্তর—যা অতি দ্রুত আমাদের সমাজকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে আধুনিক যুগে।

লেখাটা শুরু হয়েছিল বৃষ্টি দিয়ে। রুদ্র বৈশাখের দিনে এ বৃষ্টি কেবল মাটিকেই করবে না চাষের উপযোগী, এ বৃষ্টি আমাদের মনের জীবনকেও যেন ভরে দিতে যাচ্ছে সোনার ফসলে।

একই লেখক

দুই গল্প ঃ দুই সময়।

রিপু

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মিষ্টি হর্নের আওয়াজ কানে আসতে অঞ্জলির ঘড়ির দিকে চোখ গেল। রাত এগারোটা বেজে সতের। না তাকে জানান দেবার উদ্দেশ্যে হর্ন বাজানো হয় নি। শব্দটা কানে যাওয়ামাত্র আধ-বয়সি রঘু পড়িমরি করে ছুটে যাবে গেট খুলতে। এক বারের বেশি দুবার হর্ন বাজাতে হলে প্রভুর ভ্রূকুটির ভয় আছে।

অঞ্জলি সরকার নিজের ঘর অন্ধকার করে বসেছিল। চুপচাপ খাট থেকে নেমে বাইরের অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চেপে শীত নেমেছে কটা দিন। অঞ্জলির গায়ে গরম কিছু নেই। শাড়ির আঁচলটা শুধু আঁট করে জড়ানো। শীত করছে হয়তো। কিন্তু টের পাচ্ছে না। আবার দেড়টা মাস হয়ে গেল হাড়-পাঁজর সব এমনিতেই ঠাণ্ডা অঞ্জলি সরকারের। সমস্ত অস্তিত্ব একটা হিমেল গহ্বরে সেঁধিয়েছে।

...রঘু গেট খুলে দিয়েছে। জোরালো হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানোর আগেই রঘু ছুটে এসে পিছনের দরজা খুলে দিল। গাড়ির মালিক নামল।

অঞ্জলি সরকার তেমনি নিঃশব্দে ঘরে চলে এলো আবার। কি ভেবে সুইচটা টিপে দিল। টিউব লাইটের আলোয় অন্ধকার ঘর সাদা হয়ে গেল। এ-ঘরে নিশ্চিন্ত আরামের শয্যায় শুয়ে আছে কেউ ভাবার দরকার নেই। সামনের দিকের দরজার এক পাট খোলা। চুপচাপ সেখানে এসে দাঁড়াল অঞ্জলি।

সিঁড়িতে চাপা শব্দ। সন্তর্পণে উঠে আসার চেষ্টা। গাড়িতে বসে সমস্ত বাড়ি অন্ধকার দেখেছিল নিখিলেশ সরকার। কিন্তু সিঁড়ির বাঁক ঘোরার আগেই সামনের ঘরের আলো চোখে ধাক্কা দিল। এক পাট খোলা দরজার ওধারে অঞ্জলিকেও দেখল।

চোখে মুখে পলকের বিরক্তি। বাকি কটা সিঁড়ি ভেঙে স্বাভাবিকভাবেই ওপরে উঠে এলো। পাশের ঘরের দিকে পা-বাড়ানোর আগে থমকে দাঁড়ালো একটু। সাদাসিধে ভাবেই বলতে চেষ্টা করল, ফোনে তো জানিয়েই দিয়েছিলাম ফিরতে দেরি হবে, এখনো জেগে বসে আছ কেন?

কথা ফুরোবার আগেই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে। অঞ্জলি সেখানেই দাঁড়িয়ে। তেমনি নির্বাক দাঁড়িয়ে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে শীত করে উঠল হঠাৎ। সেটা শীত কি আর কিছু অঞ্জলি জানে না। ভিতরটা হঠাৎ ভয়ানক রকম শূন্য হয়ে গেলেও তো হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। আগেও অনেক অনেক দিন লেগেছে। এখন আবার লাগছে।

দেড় মাস আগের মাঝের কটা দিনই শুধু স্বপ্নের মতো।

অঞ্জলি ফিরল। কিন্তু শয্যার দিকে এগোতে পারল না। পায়ে পায়ে ড্রেসিং টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়াল। সমনে সবুজ খামটা পড়ে আছে। ওপরে সুন্দর হরপে লেখা 'মা'। তার নিচে বাড়ির ঠিকানা। অতি যত্নে খামটা খোলা হয়েছিল। ছেলের চিঠি পড়তে পড়তে চোখে ঝাপসা দেখছিল অঞ্জলি। কি এক অজানা আবেগে গা শিরশির করছিল। মাত্র তের বছরের ছেলে এরই মধ্যে গুছিয়ে লিখতে শিখেছে বেশ। লিখেছে, 'মা-গো, আর তিনটে দিনের মধ্যে তোমার আর বাবার চিঠি না পেলে এবারে ঠিক-ঠিক আড়ি করে দেব। মনের আনন্দে তোমরা দুটিতে খুব জপ-তপ করে বেড়াচ্ছ তা বলে ছেলের কথাও মনে থাকে না? বাবার শরীর এখন আরো ভালো হয়েছে নিশ্চয়? মাসি সেদিন আমাকে দেখতে এসেছিল। আর কত রকমের খাবার এনেছিল সঙ্গে। আমি মজা করে খেলাম, অন্য ছেলেরাও খেল। আর মাসি কি বলল জানো? বলল, তোর মায়ের মতো অত পুণ্যির জোর আর কার। মাসি বলবে কেন আমিও জানি যমকে তুমি আচ্ছা করে কলা দেখিয়ে ছেড়েছ। তবু সত্যি বলছি মা বাবাকে আসনে বসে ধ্যান করতে দেখলে আমার বড্ড হাসি পেয়ে যায়। বাবাকে কিন্তু এ-কথা বোলো না। আর তুমিও রাগ কোরো না। তুমি খুব ভালো মা আর খুব লক্ষ্মী মা। তুমি আর বাবা আমার অনেক আদর নিও। চিঠি পেয়েই চিঠি দিও। বাবার চিঠিও চাই। দেরি করলে সাংঘাতিক রেগে যাব কিন্তু।

...ছেলের বাবা বলে গেল ফোনে জানানো হয়েছিল ফিরতে দেরি হবে। আর ফোনে এও বলেছিল বটে বাইরে থেকে খেয়ে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই। বাইরে খেয়ে আসার অজুহাত হাতের মুঠোয়। ব্যবসায় খাতির পেতে হলে খাতির করতে হয়। চৌরঙ্গীর পাড়ায় জমজমাট ফোটোগ্রাফির স্টুডিও নিখিলেশ সরকারের। হাল ফ্যাশানের সেই বিশাল স্টুডিওতে পা ফেললে সত্যি চোখ জুড়োয়। পয়সাওলা মেয়ে পুরুষের ভিড় লেগেই আছে। কিন্তু শুধু সখের ছবি তুলে খদ্দেরের আশ মিটিয়ে কত আর বড় হওয়া চলে? থোকে থোকে কাঁচা টাকা আসে সরকারী বে-সরকারী বহু সংস্থার রকমারি বিজ্ঞাপনের মুভি ফিল্ম থেকে। বড় বড় অনেক কোম্পানী মুভির সচল বিজ্ঞাপনের খাতে অজস্র টাকা খরচ করে থাকে। আর স্টুডিওর মালিক নিখিলেশ সরকার মাথা খাটিয়ে যা করে দেয় তাকে শুধু চটকদার বিজ্ঞাপন না বলে বিজ্ঞাপন কাব্যও বলা চলে। এ ছাড়া অনেক ফার্মের স্টিল পাবলিসিটি শৌখিন ক্যালেন্ডার ইত্যাদির কাজ আছে। এ-সব কাজের জন্য মোটা মাস-মাইনের দুজন সুশ্রী মেয়ে মডেল আছে স্টুডিওতে। এর ওপর রূপসী গোছের ছুট মডেলের আনা-গোনা তো আছেই। খদ্দেরের রকমারি পছন্দ। তাদের চোখ মজলে তবে টাকা।

তবু কমপিটিশনের বাজারে কাজের চটকটা আসল হলেও সেটুকুই সব নয়। শাঁসালো মক্কেল বুঝে হামেশাই টোপ ফেলার দরকার হয়। বাড়তি খাতির কদর না পেলে তাদের নেকনজর বাড়বে কেন? অতএব টোপ ফেলার ব্যাপারেও নিখিলেশ সরকার সিদ্ধহস্ত। বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁয় তার লাঞ্চ পার্টি ডিনার পার্টি লেগেই আছে। সেখানে তার দরাজ হস্ত দরাজ মন। টাকা তুলতে চাও তো চোখ-কান খোলা রেখে টাকা কিছু ছড়াও। দরকার পড়লে বাছাই করা কোন-কোন মডেলেরও আমন্ত্রণ জোটে। যে ব্যবসার যেমন চটক।

নিজের ঘরে অঞ্জলি তেমনি দাঁড়িয়ে চুপচাপ। বিকেলে দরকারী কিছু কেনা-কাটার জন্য বাইরে গেছল। সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছেলের চিঠি পেয়েছে। চিঠিটা পড়ার পর যেন কূটো ধরে ডুবন্ত জল থেকে ডাঙায় ওঠার তাড়না তার। ফোন নিখিলেশ করে নি অঞ্জলি করেছে। রিসেপশনিস্ট মিসেস খান গলা চেনে, মনিবকে তক্ষুনি ডেকে দিয়েছে।...মনিব ব্যস্ত ছিল নিশ্চয়, ব্যস্তই থাকে।

—হ্যাঁ বলো।

—নানুর চিঠি এসেছে। আমাদের চিঠি না পেয়ে দুজনের ওপরেই খুব রেগে গেছে।...শুনবে?

—এখন না বাড়ি গিয়ে দেখবখন।... শোনো আজও ফিরতে দেরি হবে তুমি অপেক্ষা কোরো না, আমি বাইরে থেকে খেয়ে আসব। ছাড়ি এখন—

ছেলের চিঠি পড়ে ভিতরটা ভরাট হচ্ছিল বলে গা শিরশির করছিল অঞ্জলির। ফোন ছাড়ার পর গা শিরশির করছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল বলে।

সামনের বারান্দার দেয়াল ঘড়িতে টং করে শব্দ হল একটু। রাত সাড়ে এগারোটা। ড্রেসিং টেবিল ছেড়ে অঞ্জলি পায়ে পায়ে ভিতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল আবার।.. ও-ঘর সবুজ আলো জ্বলছে। সবুজ আলো জ্বেলেই ঘুমোনো অভ্যেস করেছে মাস-কতক ধরে। লোকটা অন্ধকার বরদাস্ত করতে পারে না এখনো। সেই এক কালো ত্রাস এখনো মনের তলায় সেঁধিয়ে আছে কিনা কে জানে।

চোখ ফেরালো। বারান্দার এ-মাথায় অর্থাৎ বাঁয়ের দিকে আর একটা ঘর। দরজা বন্ধ। শেকল তোলা। আজ অনেক দিন হয়ে গেল প্রায় দেড় মাস হয়ে গেল ওই ঘরের শেকল খোলে নি অঞ্জলি। ঠাকুর-ঘর। গোপালের ঘর। গোপালের দু পাশে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর শ্রীমা। দেয়ালে বাবার মস্ত অয়েল পেন্টিং ছবি। দরজা খুলে যে-কেউ সামনে দাঁড়ালেই হল। বড় জাগ্রত প্রসন্ন দৃষ্টি ওঁদের।

...কিন্তু সেদিন ওই দেব-দৃষ্টির এক তীব্র কশাঘাতে অন্তরাত্মাসুদ্ধ যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছল তার। নিঃশব্দ আর্ত-নাদের বোঝা বুকে করে ছুটে পালিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। তারপর থেকে এত দিনের মধ্যে আর ও-ঘর মাড়াতে পারে নি।

হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিল অঞ্জলি। বারান্দা অন্ধকার। ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজা দুটো ঠেলে একটা ভর্ৎসনা যেন এখনও ঠিকরে আসতে চাইছে তার দিকে।

এই করে নিষ্কৃতি নেই জানে। ওই দরজার সামনেই আবার গিয়ে দাঁড়াতে হবে। দরজা খুলতে হবে। বুকের কান্না উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে। মাথা খুঁড়তে হবে।

কিন্তু আজ পারছে না। এখনও পারছে না।

মোটামুটি সচ্ছল ঘরের মেয়ে অঞ্জলি আরও সচ্ছল ঘরে এসেছে। বাবা ছিলেন নিষ্ঠাবান ভক্ত মানুষ। ভালো চাকরিই করতেন। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন। কিন্তু ভক্তিনিষ্ঠাশূন্য আধুনিকতার স্রোতে গা ভাসাতে দেন নি। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অঞ্জলিকেই বোধকরি সব থেকে বেশি ভালবাসতেন ভদ্রলোক। তার দুটো কারণ। এক, হুবহু বাপের আদলের ছোট মেয়ে বাপের মতোই কালো গায়ের রঙ। মেয়ের গায়ের রঙের জন্য তিনি স্ত্রী দুশ্চিন্তা কানে তুলতেন না। মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বেশ আত্মতৃপ্তি অনুভব করতেন। বলতেন, তোমাদের চোখ থাকলে রং-রং করতে না। আমার চোখে অঞ্জু দস্তুরমত সুন্দরী—অমন মুখশ্রী ক'জনার আর অমন স্বাস্থ্যই বা ক'জনার! দ্বিতীয় কারণ এই মেয়ে ঘরে আসার পর থেকেই সংসারের আয়পয় বেড়েছে। তাঁর বিশ্বাস, মেয়ে যে-ঘরে যায় সেই ঘরেরও শ্রী ফিরবে।

তাঁর এই বিশ্বাস আর এক ভদ্রলোকের মনেও বদ্ধমূল ছিল। তিনি নিখিলেশের বাবা। অঞ্জলির বাবার ছোটবেলার বন্ধু। পড়াশুনায় কোনদিন অঞ্জলির বাবার নাগাল পান নি বলে ক্ষোভ ছিল। কিন্তু ব্যবসায় নেমে কমলার প্রসাদ তিনি ঢের বেশি পেয়েছেন। টাকা হয়েছে। বাড়ি গাড়ি হয়েছে। ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে দুই ছেলের জন্য দু ফ্ল্যাটের বাড়ি করেছিলেন পড়াশুনোর পাট শেষ হতে বড় ছেলেকে নিজের ব্যবসায় টেনে নিতে পেরেছিলেন। ছোট ছেলে নিখিলেশের বেলাতেও একই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার ভিন্ন ধাত। সে ফোটোগ্রাফিতে হাত পাকিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক জায়গা থেকে ট্রেনিং নিয়েছে অনেক রকমের গবেষণা করেছে। ব্যবসায়ী বাপ ছেলের স্বাধীন ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া দূরে থাক, বহু টাকা খরচ করে এই স্টুডিওর গোড়া-পত্তন করে দিয়েছিলেন। বাবার ব্যবসার মালিকানার প্রতি নিখিলেশের কণামাত্র লোভ ছিল না। বাবা হঠাৎ চোখ বোজার পর ওই ব্যবসার সবটাই দাদার হাতে

গেছে। নিখিলেশ তখনও তাকে বলেছে তোমারটা তোমার, আমারটা আমার।

মৃত্যুর আগে ছোট ছেলের কাছে মনের বাসনা ব্যক্ত করে গেছলেন ভদ্রলোক। বলে-ছিলেন ওমুকের মেয়েটিকে ঘরে আনিস। তার বাবাকে আমি বলে রেখেছি তোর আপত্তি না হলে আমি নেব। মেয়ের গায়ের রং দেখে অমত করিস না রংটাই সব নয়—তোর ভালো হবে।

বাবার এ-কথা নিখিলেশই অঞ্জলিকে বলেছিল। অসলে ছোট ছেলের মতি-গতির ওপর ভদ্রলোকের তেমন আস্থা ছিল না। রক্ষণশীল পরিবারের ওই শিক্ষিতা মেয়েটি এলে শক্ত হাতে হাল ধরতে পারবে এই আশাই করেছিলেন।

অঞ্জলির সেবারে এম এ পরীক্ষা বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মৃত্যুতে মন খারাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু এ-সব কথা কিছুই জানত না। আধ্যাত্ম আলোচনার ফাঁকে দুই বন্ধুতে ঝগড়াই লেগে যেত এক-একদিন। অঞ্জলির মজা লাগত। বাবা তাঁকে মুখের ওপর বলে বসতেন, তুমি কেবল টাকা জানো টাকা বোঝো—আর কি জানো বোঝো। এ-রকম শুনলে অঞ্জলি তক্ষুনি কাকাবাবুর পক্ষ নিত। বলত, এটা যুক্তি তর্কো হল না বাবা। একদিন বলে বসেছিল, শুধু টাকা জানলে আর টাকা বুঝলে উনি তোমার কাছে আসবেন কেন?

কিন্তু কাকাবাবুর মনের কথা অঞ্জলি কোনদিন আঁচ করতে পারে নি। বাবাও কিছু বলেননি। হয়তো ভেবেছেন শেষ পর্যন্ত ও পক্ষের ছেলে অমত করলে মেয়ে দুঃখ পাবে। কাকাবাবুর ছোট ছেলে অর্থাৎ নিখিলেশ কলেজে ঢোকার আগে মাঝে-সাজে এ-বাড়ি আসত। কিন্তু তারপর থেকে আর তার দেখা মেলে নি। তাই তাকে নিয়ে অঞ্জলির মাথা ঘামানোর অবকাশও হয় নি।

বাবার শ্রাদ্ধর নেমন্তন্ন করতে এসে নিখিলেশ অনেককাল বাদে আবার অঞ্জলিকে দেখল। বাবার অনুরোধ মনে ছিল কিন্তু সেটা খুব কানে তোলার মতো ভাবেনি। নিজের ইচ্ছের ওপর আর কারো ইচ্ছেটা বোঝার মতো চাপাতে রাজি নয় কোনদিন। তবে বাবার কথা শোনার পর মেয়েটাকে একবার দেখার ইচ্ছে মনে মনে ছিল।

দেখামাত্র শরাহত। এই বোধহয় ওপর-ওয়ালার ষড়যন্ত্র। নইলে এক কালো মেয়েকে দেখে এররম হবার কথা নয়। বিশেষ করে এই সময়ে। যত আধুনিক ছেলেই হোক বাপকে ভালবাসত না এমন নয়। পরনে তখনো অশৌচ বস্ত্র, হাতে কম্বলের আসন। এই অবস্থাতেও অঞ্জলিকে দেখে একটা অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করেছিল। তার অনেক-দেখা আধুনিক মেয়ের মধ্যে এই কালো মেয়ে যেন বিশেষ ব্যতিক্রম। বাবা মিথ্যে বলেননি, যেমন মুখশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্য। এক পিঠ খোলা চুল।

শোকের সময় ছেলের হাব-ভাব আর চাউনি দেখে অঞ্জলি মনে মনে বিরক্ত হয়েছিল। সখেদে বন্ধুর কথা বলতে বলতে বাবা তাকে নিচে-পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। ওই ছেলের কথা শুনে অঞ্জলির দু'কান কড়কড় করে উঠল। সে বাবাকে বলল, আপনাকে আর আসতে হবে না, অঞ্জলির সঙ্গে দুই একটা কথা আছে, বলে যাই। তাকে ডাকল, এসো—

অগত্যা অঞ্জলি পিছনে পিছনে নিচে নেমে এলো। আর তার পরেই ওই দুটো চোখের ধাক্কায় অঞ্জলি থতমত খেয়ে গেল। পুরুষের দৃষ্টি এক দফা বিচরণ করে নিয়ে ওই মুখের ওপরেই থামল আবার।

কোনরকম ভনিতা না করে নিখিলেশ জানালো, মৃত্যুর দিন-কতক আগে বাবা এই-এই বলে গেছলেন। আমার আপত্তি নেই। তোমার কি মত?

এই সময় এ-রকম প্রস্তাব কেউ করতে পারে ভাবা যায় না। কালো মেয়ের মুখের তখন আর এক শ্রী। দিশেহারা হতকচিত অবস্থা। তাছাড়া দশটা বছরের মধ্যে যার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত নেই।

কোনরকমে জবাব দিল, এ-সব কথা পরে ভাবা যাবে, আগে কাজকর্ম সারা হোক। বলেই হনহন করে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল। রাগে জ্বলতে জ্বলতে উঠতে চাইল। কিন্তু দোতলায় পা দেবার আগেই যেন উল্টো প্রলেপে ভিতর ঠান্ডা। বাবার চোখ আড়াল করে নিজের ঘরে ঢুকে হেসে সারা সে। এমন নির্লজ্জ বেহায়া মানুষ আর কি দেখেছে? বাবার সুপুরুষের কতো ওই চাউনি দেখেই বোঝা গেছে। হ্যাঁ, এ-রকম একটা কান্ড ঘটে গেল বলেই বোধহয় অঞ্জলিও মাত্র কটা মুহূর্তের মধ্যে অনুরাগের অনেকগুলো সিঁড়ি-টপকে এক অনাস্বাদিত রোমাঞ্চের সন্ধান পেল।

এর পরের ব্যাপার কিছুটা গতানুগতিক। কিন্তু নবরাগের পাঠ যারা নিতে বসেছে তাদের কাছে এই পুরনো অধ্যায় বিচিত্র রকমের নতুন। বাবার কাজ মিটে যাবার পর নিখিলেশ নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল। অঞ্জলির এম-এ পরীক্ষার পড়া ভন্ডুল হতে থাকল। নিখিলেশ গরুদশার বছর-টছর মানে না। বিয়েটা চটপট সেরে ফেলার ইচ্ছে। সম্ভব হলে অঞ্জলিরও আপত্তি ছিল না খুব। কিন্তু তার বাবা এ-সব ব্যাপারে কড়া রকমের গোঁড়া। তাঁর সাদাসাপটা ফতোয়া, এক বছরের কলাশৌচ যাক, আর এর মধ্যে মেয়েটাও পরীক্ষার ব্যাপার শেষ করে ফেলুক। এত দিনই গেছে, আর কটা দিন সবুর করো বাপু।

অঞ্জলিরই বিড়ম্বনার একশেষ। রাগ দেখাতে চেষ্টা করেছে। —দু'মাস হয়নি কাকাবাবু গেছেন, এই অবস্থায় বাবাকে তুমি বিয়ের তাগিদ দিতে গেলে।

নিখিলেশের অসহিষ্ণু জবাব, দুরবস্থা বলেই দিতে গেলাম। তিনি সেটা বুঝলেন না—

বেশিক্ষণ চোখে চোখ রেখে হাসতে ভয় করে অঞ্জলির। মানুষটার কামনার আঁচ বড় বেশি স্পষ্ট। সেই আঁচে নিজের ভিতরের এক সুপ্ত বাসনা নাড়াচাড়া খেয়ে সজাগ হতে চায়। এই একটা বছরের মধ্যে যে-কোনো দিন নীতির বাঁধ-ভাঙা বড়সড় বিপর্যয় কিছু ঘটে যেতে পারত। ঘটেনি রক্ষা।

বছরান্তের প্রথম লগ্নে বিয়েটা হয়ে গেল। তার পরের ব্যাপারের জন্য সবটাই প্রস্তুত ছিল অঞ্জলি। তবু প্রথম কিছু দিন অন্তত নাজেহাল দশা তার। একটা বাঘ যেন তার দীর্ঘ উপবাসের শোধ তুলছে। তবু অঞ্জলির ভালো লাগত। আর, ভালো লাগার অধীর প্রতীক্ষায় এক একটা দিনের অবসান হত। রাত আসত।

তবু এক একসময় এক ধরনের বেদনা-মেশানো বিস্ময় উঁকিঝুঁকি দিত অঞ্জলির মনের তলায়। একটা বিদেশী গল্প মনে পড়ত। ভিন্ন জাতীয় এক কালো মেয়ের প্রণয়াসক্ত একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। বর্ণশীর জাত-বর্ণ ভিন্ন বলেই যেন পুরুষের অকরুণ গোছের গ্রামের উল্লাস। এই বিভেদ-টুকুই তার প্রবল আকর্ষণ। নিখিলেশ সুপুরুষ ধপধপে ফর্সা। কালো মেয়ে অঞ্জলিও যেন তাকে বিভেদের ওই মাদকতার ইন্ধন জুগিয়ে আসছে। রাতের শয্যায় এই পুরুষেরও ভোগের সঙ্গে দরদের বুননির যোগ কম।

...দুটো বছর না যেতে নানুর আসার সম্ভাবনা দেখা গেছে। সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষটা যেন আড়মোড়া ভেঙে একটা ঘোর কাটিয়ে উঠেছে। তার আচরণে ছলনা কম বলেই আঘাতটা সবার বুকে এসে লাগত। আর অঞ্জলির শরীরটাও বিচ্ছিরি রকমের খারাপ হয়ে গেছল তখন। এমন যে, আয়নায় নিজের নিজের দিকে তাকাতে বিতৃষ্ণা। ভিতরের কেউ যেন তার সমস্ত শক্তি সমস্ত রস শুষে নিংড়ে নিচ্ছে।

ছেলে আসার ছমাসের মধ্যে আবার আগের স্বাস্থ্য আগের শ্রী। কালো রূপের জলুস বরং আগের থেকেও বেড়েছে। অঞ্জলি আবার সন্তান না চাইলেও মনে মনে আশা করেছে লোকটা আবার ফিরল বলে তার দিকে। কিন্তু তার ব্যাপারে ওই পুরুষ যেন মোহমুক্ত মানুষ একেবারে। ব্যবসায় আগেও হেলাফেলা করেনি। কিন্তু এখন সমস্ত মনোযোগ আর উৎসাহ আর উদ্দীপনা সেই দিকে নিবদ্ধ। স্টুডিও বড় হচ্ছে যোগাযোগ বাড়ছে টাকা আসছে। নিজের পৈতৃক ফ্ল্যাট বেচে দিয়ে অভিজাত এলাকায় শৌখিন বাড়ি কিনেছে। তার পরের কয়েকটা বছরে অঞ্জলির বাবা মেয়ের এই ভাগ্যের দিকটাই দেখে গেছেন। ভিতরে যেখানে টান ধরেছে সেদিকটা টের পাননি। বাবার মৃত্যু অঞ্জলির মস্ত শোকের কারণ তো বটেই আবার সূক্ষ্ম একটু স্বস্তিরও কারণ। আদরের মেয়ের এতটুকু বিষাদের আঁচ পেলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন।

নিঃশব্দে এক দুঃসহ জীবনযাপন শুরু হয়েছে অঞ্জলির। সে মুখে কিছু বলে না কিছু জিজ্ঞেস করে না। কিন্তু দু'চোখ তুলে এই লোকের দিকে তাকালেই অনেক কিছু বুঝতে পারে। সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠা দেখে আঁচ করতে পারে কতটা

মদ জঠবে গেল সেই রাতে। এ যুগের হাওয়ায় নিয়মিত ড্রিংক করে আসাটা বড় ব্যাপার নয় কারো চোখে। মদে মত্ত হওয়াটাই দোষের শুধু। নিখিলেশ সরকারকে সে রকম অপবাদ কেউ দেবে না। কিন্তু এই লোকের আর এক ক্ষুধার স্বরূপ জানে অঞ্জলি সরকার। প্রবৃত্তির প্রতি পদক্ষেপ জানে। গল্পে পড়া সেই শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মতোই কালো রূপের মোহ গেছে তার। এখন চাই চেনা রূপের নতুন চটক নতুন বংশলতা। তেমন মেয়ে হাতের নাগালের মধ্যেই থাকে সর্বদা। বাঙ্গালী আংলো পার্শী...কাউকে মনে ধরলে এই বিত্তোজ্জ্বল সুপুরুষের তাকে কাছে পেতে কতক্ষণ। সে রকম কাছে যে তারা হামেশাই আসে অঞ্জলি স্বকার তাও নির্ভুল আঁচ করতে পারে।

ঘৃণায় বিদ্বেষে নিজেকে সে অনেকখানি গুটিয়ে নিয়েছে। নিজের শোবার ঘর পৃথক করে নিয়েছে। ফলে ওই মানুষ ভিতরে ভিতরে আগে স্বস্তিবোধ করেছে। মনে মনে স্ত্রীর সংযত বুদ্ধিরও তারিফ করেছে হয়তো। রাতের ওইটুকু নিভৃত অবকাশে নিঃসঙ্গতাই কাম্য।

কিন্তু অঞ্জলি কি করবে এর পর? ঠাকুর ঘরে সমর্পণ করবে নিজেকে? ওই ঠাকুর ঘরটা করা হয়েছিল বাবার তাগিদে। বাবা বলে ছিলেন পুজো আর্চা করিস না করিস ঠাকুর ঘর একটা থাক সময়ে অসময়ে দেখবি দুদণ্ড গিয়ে বসতে ভালো লাগবে। বেশ ছিমছাম ঠাকুর ঘরই করা হয়েছিল। সিংহাসনে গোপালের ছবি। দুদিকে ঠাকুর আর শ্রীমার বড় ফটো। দেয়ালে বাবার একখানা মস্ত অয়েলপেন্টিং। অনেক টাকা খরচ করে অঞ্জলি এটা করিয়েছিল। বাবার হাসি ছোঁয়া দুচোখ জীবন্ত মনে হয়।

গোড়ায় গোড়ায় অঞ্জলিই ওঘরে ধূপ-ধুনো দিত প্রত্যেক ফোটোতে মালা পরাতো। সময় পেলে দু-পাঁচ মিনিট বসতও। ধূপ-ধুনো এখন পরিচারিকা দেয়। মালা পরানো হয় কিনা জানে না। মনের এই অবস্থায় ওখানে গিয়ে মন সঁপে দেওয়া দূরে থাক—চাপা আক্রোশের ফলে সিদিকে তাকাতেও ইচ্ছে করত না।

হঠাৎই অপ্রত্যাশিত ওলট-পালট ব্যাপার ঘটে গেল একটা। পর পর কটা রাত দুঃস্বপ্নের বোঝা যেন। অঞ্জলির বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে। কোন রাত কাটবে আর কোন রাতে সব শেষ হবে সেই নিদারুণ সংকট।

সন্ধ্যার পরেই সেদিন বাড়ি ফিরেছে নিখিলেশ। ড্রাইভার আর স্টুডিওর দুজন কর্মচারী ধরে ধরে দোতলায় তুলেছে তাকে বুকের ওপর দুহাত চাপা। যন্ত্রণায় বিবর্ণ সমস্ত মুখ। ঘামছে দরদর করে।

অঞ্জলি আঁতকেই উঠেছিল। কোনরকমে দোতলায় পা দিয়ে নিখিলেশ বিড়বিড় করে বলল—বুকে ভয়ানক যন্ত্রণা শিগগীর ডাক্তারকে খবর দাও।

বলতে বলতে ঢলে পড়ল। লোক কটা তাকে প্রায় আলতো করে তুলে এনে শয্যায় শুইয়ে দিল। অঞ্জলি ছুটল চেনা ডাক্তারকে ফোন করতে। ফোন সেরে এসে দেখে যন্ত্রণায় মানুষটা কুঁকড়ে যাচ্ছে বার বার। বাঁচার এক মর্মান্তিক আকুতি নিয়ে তার দিকে তাকালো একবার। তারপর অজ্ঞান।

অঞ্জলির হাত-পা ঠাণ্ডা। বিমূঢ় স্টুডিওর কর্মচারী তাকে বলছে শরীর হঠাৎ খারাপ বোধ করতে সাহেব বাড়ি যেতে চাইলেন। কিন্তু গাড়িতে এই তিন মাইল পথ আসতেই কি-রকম যেন করতে লাগলেন তিনি, বুকের যন্ত্রণা ভয়ানক বেড়ে গেল। এরকম হবে বুঝলে তারা সোজা হাসপাতালেই নিয়ে যেত।

বিশ মিনিটের মধ্যে বাড়ির চেনা ডাক্তার এলো। তক্ষুনি ইনজেকশন দিল গোটা কয়েক। তারপর টেলিফোনে তাগিদ দিয়ে আধঘন্টার মধ্যে আরো দুজন বড় ডাক্তার নিয়ে এলো। অঞ্জলি তাদের কথাবার্তা আলোচনা শুনছে। সংকটজনক হার্ট স্ট্রোক। প্রথমেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারলে ভালো হত। কিন্তু এ অবস্থায় আর নাড়াচাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না। তাতে সদ্যই বিপদের সম্ভাবনা। অতএব হাসপাতালের যাবতীয় ব্যবস্থা বাড়িতেই করতে হবে।

টাকার জোর আছে। সেটা সহজেই করা গেল। ডাক্তার নার্স স্টুডিওর মানুষ আর এলাহি চিকিৎসার সরঞ্জামে বাড়ির বাতাস ভারি। অজ্ঞান অবস্থাতেই চিকিৎসা চলছে। পরদিন বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরল বটে কিন্তু রোগের উপশমের কোনো লক্ষণ নেই। তবে যন্ত্রণাকাতর দু চোখ অঞ্জলিকে খুঁজেছে। অঞ্জলি সামনে ঝুঁকেছে। ওই দুটো চোখে বাঁচার কি অসীম আকুতি। কথা বলতে পারেনি। চোখ জল গড়িয়েছে। তাই দেখে অঞ্জলির ভিতরটা ডুকরে কেঁদে উঠতে চেয়েছে। মানুষটাকে যে কত ভালবাসে এ সে নিজেও জানত না এতদিন। একটুও জানত না।

ইনজেকশন দিয়ে ডাক্তার আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে।

ভয় আতংকের মধ্য দিয়ে একে একে চারটে দিন চারটে রাত কেটে গেল। কিন্তু ডাক্তারদের মুখের দিকে চেয়ে এতটুকু ভরসা পাচ্ছে না অঞ্জলি। রোগীর জ্ঞান ফিরলেও বেশিক্ষণ তাকে জেগে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। ওষুধে আর ইনজেকশনে আবার ঘুমিয়ে পড়ছে। কিন্তু এটা কোন রকমের ঘুম? একটাও ভরসার কথা বলছে না কেন ডাক্তাররা? কেন বলছে না অঞ্জলি অনায়াস করতে পারে। ঘন-ঘন শার্ডিওগ্রাফ বিপদ কাটিয়ে ওঠার হদিস দিচ্ছে না। কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশান! আবার সামান্য স্টোকেও শেষ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

...যতক্ষণ জ্ঞান থাকে মানুষটার দু চোখে সে কি পরিতাপ আর বাঁচার সে কি অপরিসীম ইচ্ছে। সে চাউনি দেখে অঞ্জলির বুকের ভিতরটা দুমড়ে মুচড়ে যেতে থাকে।

কদিনের মধ্যে ঠাকুরঘরে যাবার ফুরসৎ মেলেনি। কিন্তু মনে মনে অবিরাম ঠাকুরকেই ডেকে চলেছে।...রাত তখন দেড়টা। রোগীর ঘরে নীল আলো জ্বলছে। শয্যার গা ঘেঁসা চেয়ারে নার্স বসে। গজখানেক দূরের চেয়ারে একজন ডাক্তার মোতায়েন। রোগীর নাকে আজ আবার অকসিজেনের নল গোঁজা। কেউ না বলে দিলেও অঞ্জলি জানে আবার একটা সংকটের রাত কাটছে।...কাটবে কি কাটবে না?

হঠাৎ বাবাকে মনে পড়ল। মনে হল বাবা যেন খুব স্পষ্টভাবে তাকে ঠাকুর ঘরে চলে যেতে বলছেন।

অঞ্জলি দিশেহারার মতো ছুটল।

শব্দ না করে কাঁপা হাতে দরজার শেকল নামালো। আলো জ্বালল। সেই বরাভয় প্রসন্ন দৃষ্টি স্কলের।

আকুল কান্নায় মেঝেতে আছড়ে পড়ল অঞ্জলি। ঠাকুর ও আমার নয়—ও তোমার— তোমার— তোমার তোমার—তোমাকে দিলাম—ওকে তুমি রাখো ঠাকুর—যেতে দিও না—রাখো—রাখো—রাখো—

কতক্ষণ পড়েছিল ওইভাবে জানে না। মনে হল ভিতরে যেন ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়েছে। উঠে বসল। চারদিকে তাকালো। সকলের মুখ যেন আরো সুন্দর আরো প্রসন্ন।

তেরটি রাত কাটার পর রোগীকে শয্যায় উঠে বসার অনুমতি দিয়েছে ডাক্তাররা। এ যাত্রা সংকট কেটেছে। এরপর সংযমে বাঁধা দিন যাপনের নির্দেশ।

হ্যাঁ, একটা আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে নিখিলেশেরও ভিতরে ভিতরে। রোগশয্যা ছেড়ে ধীরে ধীরে বাইরে পা দিয়েছে। কিন্তু মনের তলায় মৃত্যুর থাবার স্পর্শটা থেকেই গেছে। মৃত্যুর একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। মৃত্যু ভাবনা তাকে আসক্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে নিষ্কৃতি দিয়েছে। অঞ্জলিকে চুপিচুপি বলেছে আমি কোথা থেকে কত দূর থেকে যে ঘুরে এলাম তুমিও ভাবতে পারো না। আর আসক্তি নয় আর বিষয়চিন্তা নয়। সব যাক। যেটুকু না করলে নয় শুধু সেটুকুই..

অঞ্জলির মুখে হাসি চোখে জল আর বুকের তলায় এক অদ্ভুত আনন্দ।

সে নিয়মিত এখন ঠাকুরঘরে আসন নিয়ে বসে। নিখিলেশও আসে। বসে। জপ করে। একমনে ঠাকুরকে ডাকে। অঞ্জলি হাসে। গোপালকে দেখিয়ে বলে তুমি এখন ওঁর, তোমার আর কোনো ভয় নেই।

পরম আশ্বাস পাওয়ার মতো করে

নিখিলেশ জিজ্ঞেস করে, ফের আবার অ্যাটাক হবে না?

—কক্ষনো হবে না। হতেই পারে না।

মানুষটার এতখানি পরিবর্তন অঞ্জলি চোখে দেখেও যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। দু মাস না যেতে শরীর স্বাস্থ্য ফিরেছে। কাজেও মন দিয়েছে। কিন্তু ঠাকুরঘরে যাওয়ার কামাই নেই জপতপও চলছে। শুধু তাই নয় ছেলেকে মিশনারি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে নবেন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়ে সেখানকার আবাসিক স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে এসেছে। অঞ্জলিকে বলেছে, আসলে কোন শিক্ষা দরকার ছেলের সেটা বেশ বুঝে নিয়েছি।

অঞ্জলির বুকের তলায় খুশির ঢেউ।

আরো তিনটে মাস কাটল। আগের মতোই সুস্থ তরতাজা চেহারা নিখিলেশ সরকারের। অঞ্জলির মনে হয় আগের থেকেও ভালো। সম্প্রতি কয়েকটা বড় অর্ডার পাওয়ার ফলে কাজের চাপ বেড়েছে। জপতপের এখন আর অত সময় হয় না। ফিরতে রাত হলে অঞ্জলি বকাবকি করে। নিখিলেশ হাসে। এই হাসিতে খাদ নেই। মুখ হাত ধুয়ে একবার ঠাকুর ঘরে এসে দাঁড়ায় সে। নিজের শোবার ঘর এখানা আলাদা তার। মৃত্যু ভাবনা যে আসক্তির অবসান ঘটিয়েছিল সেটা কোনো ফাঁক দিয়ে আবার না এসে চড়াও হয়। নিঃসঙ্গ শয্যায় আত্মমগ্ন হবার স্বাদ জেনেছে তখন। কিন্তু সম্প্রতি সে অবকাশ আর মেলে না। সমস্ত দিনের খাটা-খাটুনির পর বিছানায় গা দিতে না দিতে গাঢ় ঘুম।

কি ষড়যন্ত্র ছিল সেই দিনটাতে অঞ্জলি জানে না।

সমস্ত দিনটাই আনন্দের মধ্যে কেটেছে। খেয়েদেয়ে নিখিলেশ সকাল দশটায় স্টুডিও চলে গেছে। অঞ্জলির নির্দেশ মতো দুপুরে গাড়ি ফিরে এসেছে। সদ্য বিলেত ফেরত এক বান্ধবী ফোন করেছিল। তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। সেখান থেকে নবেন্দ্রপুর চলে যাবে ছেলেকে দেখতে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে আবার স্টুডিওতে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

তাই করেছে।

বান্ধবী দুটো ছেলেমেয়ের মা। আবার সন্তানসম্ভাবনা স্পষ্ট। অঞ্জলি ঠাট্টা করতে সুন্দর মুখ কুঁচকে বান্ধবী বলেছিল আর পারি না বাপু রাত হলেই পুরুষগুলোকে যেন লুটের নেশায় পেয়ে যায়।

ছেলে তাকে একলা দেখে রাগ করেছে। বলেছে, তোমার সঙ্গে বাবাকে না দেখলে ভালো লাগে না।

আসার সময় এক জায়গায় গাড়ি থামতে একটা শীর্ণ ছেলে তাজা বেল-ফুলের মালা হাতে এগিয়ে এসেছিল। অঞ্জলি পরিপুষ্ট একখানা মালা কিনে গলায় পরেছিল। সমস্ত পথ বেলফুলের গন্ধ ভারী মিষ্টি লাগছিল তার। একই সঙ্গে ছেলের অভিমানের কথাগুলো মনে পড়তে আরো ভালো লাগছিল।

সন্ধ্যায় স্টুডিওতে গাড়ি পাঠানোর আধঘন্টার মধ্যে নিখিলেশের ফোন। একটা বড় পার্টিকে এনটারটেন করতে হবে ফিরতে রাত হবে একটু।

শাসনের সুরে অঞ্জলি বলেছে খবরদার বেশি রাত করবে না।

নিখিলেশ জানিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরতে চেষ্টা করবে। বলেছে তুমি অপেক্ষা কোরো না, খেয়ে নিও।

রাত সাড়ে দশটার সময় অঞ্জলি ভ্রু কুঁচকে ভাবল টেলিফোনে ফেরার তাগিদ দেবে। কিন্তু কোন হোটেলে পার্টি জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ঘরে আর বাইরের দিকের বারান্দায় পায়চারি করল খানিক। আকাশটা খুব মেঘলা বোধহয়। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়া বাতাস শুমোটের মতো লাগছে। একটা ছোট হাই তুলে ঘরে এলো। বেলফুলের মালার মিষ্টি গন্ধ নাকে এলো। ঘরের চড়া আলো নিভিয়ে সবুজ আলো জেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। গায়ের জামা-টামাগুলো খুলে ফেলে শাড়ির আঁচলটা সরে ভালো করে জড়িয়ে নিতে যচ্ছে বাইরে হর্ন-এর মিষ্টি আওয়াজ।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আয়নায় নিজের দিকে চোখ গেল অঞ্জলির। থমকালো একটু। ভ্রু কুঁচকে কেন যেন নিজেকে একটু পলকা শাসন করতে চাইল।

সিঁড়িতে চেনা পায়ের শব্দ। শাড়ির আঁচলটা আলতো করে গায়ে জড়িয়ে অঞ্জলি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। হৃদ্য শাসনের মুখ।

হালকা খুশি মুখে দোতলায় উঠে কি বলতে গিয়েও বলা হল না নিখিলেশের। অনেক দিনের বিস্মৃতির পর বড় চেনা লোভনীয় কিছু দেখে যেন হোঁচট খেল দুটো চোখ। দৃষ্টিটা মুখ থেকে বুকে নেমে থামল।

অঞ্জলি বলল—তোমার সঙ্গে কথা নেই রাত পৌনে এগারোটা এখন—আমি শুতে যাচ্ছি।

ভ্রূকুটি করে দরজা ছেড়ে ভিতরে সরে এলো। লোকটা তার আগেই দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে।

ঘরে ঢুকে কাছে এসে দাঁড়াল। বেশ কাছে। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা। দেখছে। এই হাসি আর এই দেখার পাঁচ রকম অর্থ হয় না।

তবু পলকা ঝাঁকেই অঞ্জলি বলল—কি?

নিখিলেশ আরো কাছে। একেবারে আধ হাতের মধ্যে। মুখোমুখি। দেখার ফাঁকে কিছু একটা বলার জন্যেই বলল—ছেলের খবর কি?

—ভালো। রাগ করে বলেছে তোমার সঙ্গে বাবাকে না দেখলে ভালো লাগে না।

অল্প অল্প হাসছে নিখিলেশ। আরো একটু ঝুঁকে দু চোখ ভরে দেখছে।

—যাও! তাকে ঠেলে দেবার জন্য হাত বাড়িয়েও বিপরীত কান্ড করে বসল অঞ্জলি। দু হাতে মাথাটা নিজের মুখের ওপর টেনে নামালো।

...সে রাতে নিখিলেশ সরকার নিজের ঘর মাড়ায়নি। আর বিস্মৃতির এমন তৃষ্ণা অঞ্জলির নিজেরও জানা ছিল না বুঝি।

তারপরের আট-দশটা রাতও একই-ভাবে কেটেছে। আগল ভাঙা পুরুষের সেই দুরন্ত অধিকার বিস্তার। বিস্মৃতির অতলে নিঃশেষে হারিয়ে যাওয়া ছাড়া যেন উপায় নেই অঞ্জলির। একটু-আধটু বাধাও দিতে চেষ্টা করেছে এই। এত বাড়াবাড়ি ভালো না।

কিন্তু বাধা টিকবে সেটা অঞ্জলিও আশা করেনি।

এই উদ্দাম ভাব কেটেছে একদিন। আর তারপর থেকেই ভিতরে ভিতরে কি একটা আশংকা অঞ্জলির। নিখিলেশ কাজে মন দিয়েছে। কাজের চাপ বাড়ছে। ফিরতে রাত হলে অঞ্জলি অনুযোগ করে। নিখিলেশ কানে তোলে না। ভিতরের আশংকাটা বাড়ছেই বাড়ছেই। নিখিলেশের ফিরতে দেরি হলে অঞ্জলি তীক্ষ্ণ চোখে দেখে তাকে। সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় পায়ের দিকে তাকায়।

তারপর সেই রাত। সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। নিখিলেশ সিঁড়ি ধরে ধরে, দোতলায় উঠে আসছে। অঞ্জলি বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নিস্পন্দ কাঠ যেন। কোনরকমে রেলিং ধরে উঠে আসছে মানুষটা। অঞ্জলিকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অঞ্জলি দেখছে। আবার সুনো এসেছে। পা চলছে না। আবার নারী এসেছে। ঠোঁট লাল দাগ কুঁচকে যাওয়া জামার কাঁধেরও।

বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল নিখিলেশ এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে থাকার কি আছে।

পাশ কাটিয়ে ভারী পায়ে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

নিঃশব্দ একটা আর্ত হাহাকার বুকে চেপে অঞ্জলি ঠাকুর ঘরে ছুটল।

আলো জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাবুকের ঘায়ে যেন ভেতর বার পঙ্গু হয়ে গেল তার।

এখানে কারো মুখ প্রসন্ন নয়। সকলের চোখে ভর্ৎসনা। গোপালের চোখে। ঠাকুর আর শ্রীমার চোখে।

তার বাবার চোখেও।

ভর্ৎসনা শুধু তারই ওপর। তারই দিকে।

সেই নিঃশব্দ আর্তনাদের বোঝা বুকে নিয়েই আবার পালিয়ে এলো অঞ্জলি সরকার।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রাতের বেলায় আসত তারা। জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলো এসে পড়ত সাদা মশারিটার গায়ে, সেই আলোয় দেখা যেত ছায়া ছায়া শরীর।

লক্ষ্মী আড্ডির বাগানটা ছিল আসলে কবরখানার ওপর। শ' দুয়েক বছর আগে চুঁচুড়া চন্দননগরের কত উঁচু খানদানী মানুষ হয়ত মাটি নিয়েছেন এখানে। ফল-পাকুড়ের গাছের মাঝে তাই এখানে ওখানে রয়ে গেছে উঁচু উঁচু ঢিপির মতন। জানা ছিল ওটি গোরস্থান। তবু ডাঁসা পেয়ারা জামরুল আর কাঁচা কামের লোভ ত কম নয়। তাই অনেক কোলাহলে দুপুর এবং বৃষ্টি-ভেজা দিন কেটে যেত ওই কবরগুলোর আশেপাশে।

কিন্তু রাতে যখন ঘুম আসত না তখন মনে পড়ত ওদের কথা, যারা দীর্ঘকাল শুয়ে রয়েছে মাটির নীচে অন্ধকারে। তারা যেন প্রাণ ফিরে পেত তখন, ছায়া ছায়া শরীর নিয়ে এসে দাঁড়াত সাদা মশারিটার চারপাশে। কারুর সাদা দাড়িতে মেহেদীর রং পায়ে জরিদার নাগরা আবার কারুর বা আপাদমস্তক ঢাকা কালো রেশমের বোরখায়। কেমন ইচ্ছে তাদের সাজানো শ্বেত কল্পনা দিয়ে।

আর আসত বাস্তব জীবনের জীবন্ত মানুষরা। সেও কল্পনার। ক্লাসের সেই ভালো ছেলেটি অরক্ষণীয়া জ্ঞানদার মত নতমুখী সেই কালো মেয়েটি—

আটটির মধ্যে তৃতীয় ছেলে আশুতোষ। তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না বাড়ীতে। বাবা ভাবতেন, কি হবে ও ছেলের?

মা ভাবতেন, ও কেন সবার থেকে আলাদা? এত কিসের ভাবনা ওর, ওর কি কোন দুঃখ আছে? কোন কষ্ট? ছেলে ভাবত আমার কিছু হবে না। কোন কিছুই যে ভালো লাগে না আমার।

ভালো লাগত না সব কিছু বিস্বাদ মনে হত। রাতে ঘুম আসতে চাইত না, প্রাণমন অস্থির হয়ে উঠত। সেই বিরাগ সেই বিতৃষ্ণা স্থির হতে দিল না কোথাও। পড়াশোনা চলছিল এলোমেলোভাবে। কখনো পাঠ্যবিষয় বদল, কলেজ বদলের পর অধ্যয়নে ছেদ পড়ল অসুস্থতার জন্য।

সুস্থ হওয়ার পর চাকরী। সেখানেও ওই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। বাবা জীবনে প্রতিষ্ঠিত সম্মানিত ব্যক্তি। দাদারাও তাই। ছোটরা নিজেদের ভবিষ্যত নিশ্চিন্তভাবে গড়ে নিচ্ছে। সবার মধ্যে—শুধু একটি ভাই কেন নিজের প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পাচ্ছে না! এটা সারা পরিবারের উৎকণ্ঠার কারণ। চাকরী আসছে, নিচ্ছেও কিন্তু সেখানে লেগে থাকার কোন স্পৃহা নেই। একটি ছেড়ে আর একটি, এমনিভাবে চলছে।

চিন্তার সঙ্গে কর্মের সঙ্গতি না থাকলে বোধহয় এমনই হয়। যা পাই তা চাই না, অথচ কি চাই তাও স্পষ্ট অনুভবে ধরা পড়ছে না। এতে মনের শান্তি থাকবে কেমন করে? অবশেষে একদিন মোড় ঘুরল জীবনের। নিজেকে চিনে নেওয়ার দিনটি এলো অনেক যন্ত্রণার পর।

লেখা—লেখার কি আনন্দ! ছোট প্যাডখানা আর কলমটা হাতে তুলে নিলেই মুছে যায় বিশ্বসংসার। খুলে যায় আর এক জগতের দরজা। মাথার ওপর মনিব নেই, ঘড়ির চোখরাঙানী নেই। এর চেয়ে সুখ আর কিসে? মনটা খাঁচায় পোরা পাখির মত ডানা ঝাপটে মরছিল এতকাল। এবার সে মুক্তি পেলো। পাথুরে মাটির তলার প্রবাহিত জলস্রোতের মত মুক্তির পথ পেয়ে উচ্ছলিত হয়ে উঠল শতধারায়। কবিতা গল্প, উপন্যাস বিভিন্ন রসের বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এবার নতুন জীবন নতুন পরিচয় লাভ করলেন সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

কিছু ভালো না লাগার কাল তখন অতীত। নতুন করে পৃথিবীকে দেখতে, মানুষকে জানতে আগ্রহ জাগছে মনে। কত বৈচিত্র্য চারপাশে। দেখার মন নিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে তা। সেই দেখা সাধারণ মানুষ সামান্য ঘটনা এক সময়ে কেমন আসাধারণ হয়ে ওঠে কল্পনার অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে।

আগের গল্প ॥ রচনা ১৯৫৮

দ্বীপ

'তোমাকে খবরটা কেমন করে জানাব ভাবছি। তুমি বার বার বলে দিয়েছিলে ভালো হোক মন্দ হোক; যেমন খবরই হোক জানাতে। বলেছিলে তুমি সহ্য করতে পারবে। খবরটা যে শুভ নয় সে তো তুমি নিজেই মন দিয়ে বুঝেছিলে। তুমি যা অনুমান করেছিলে তাই-ই সত্যি। বড়সাহেব বেঁচে নেই। যুদ্ধে গিয়েছিলেন আর ফেরেন নি। তুমি শক্তিমতী। তোমার সন্তান বাঁচার সন্তান। তোমার ছেলে বড় হোক অন্য কারণ হোক—এই প্রার্থনা।'

চিঠিটা শেষ করে খাম বন্ধ করার পরেও অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। হাত থেকে ছেড়ে দিলেই এটা একদিন গিয়ে পৌঁছবে সাগর-বসতির দেশে। কালাপানির এক দ্বীপের মেয়ের কাছে। সে এই চিঠিখানাই আশা করছে। আমি কথা দিয়ে এসেছিলাম দেশে ফিরে এসে লিখব। লিখেছি।

চিঠিতে যার কথা লিখেছি তাকে অর্থাৎ দত্ত সাহেবকে আমি চিনি না। কোনোদিন দেখিও নি। সে বেঁচে আছে কি মারা গেছে জানি না। কোনোদিন সে যুদ্ধে গিয়েছিল কিনা তাও জানি না।

সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের দায় আমার নয়। আমি প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। করি নি এখনো করতে যাচ্ছি।

চিঠিখানা যথাস্থানে পৌঁছলে পরে কি হবে অনুমান করা শক্ত নয়। চিঠি হাতে মেয়েটি ঠান্ডা মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে খানিক। এরই আশায় ছিল বটে তবু চট করে বিশ্বাস হবে না যেন। কারণ মেন-ল্যান্ডের লোকের প্রতিশ্রুতির পরে তার আস্থা গেছে। উল্টেপাল্টে দেখবে চিঠিখানা। কালো দু' চোখ চকচকিয়ে উঠবে খুশীতে। পড়তে পারবে না। পড়তে জানে না। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। ভাঙা হিন্দী বলতে পারে। ভাঙা ইংরেজী আর একটু বেশী বলতে পারে।

ছেলে কোলে তুলে নিয়ে কারো কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে বলবে ইংরেজী, চিঠিটা পড়ে দিতে হবে। মুখে আশার আলো জেবলে বলবে। তারপর যে পড়বে তার মুখের দিক চেয়ে ওর মুখ শুকোবে একটু একটু করে। আর চিঠির বাবতা বোঝার পর ছেলেসুদ্ধু কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়বে হয়ত। তারপর কাঁদবে হাপুস নয়নে। দেখতে দেখতে খবরটা ছড়িয়ে যাবে। বয়স্ক বা আধবয়সী মাতব্বরেরা এগিয়ে আসবে তাদের প্রাক্তন সর্দারের এই অদ্ভুত স্বভাবের মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে। মেয়েরা সম্ভ্রমভরা চোখে দূর থেকে দেখবে চেয়ে চেয়ে। ছেলে-ছোকরারা বোবা চোখে।

সকলে ভাববে আধাপাগলা মেয়েটা এবারে গোটাগুটি না পাগল হয়। যাও আশা নিয়ে ছিল তাও গেল।

মেয়েটা উঠবে এক সময়। লোকজনেরা তাকে ডেরায় পৌঁছে দিয়ে যাবে। সকলে চলে গেলে ছেলেটাকে কিছু খেতে দিয়ে ঠান্ডা করবে। তারপর চুবড়িতে যত্ন করে তুলে রাখবে চিঠিখানা। তারপর মুখ-হাত ধুয়ে নিজে ঠান্ডা হয়ে ছেলের পাশে বসবে। তারপর আমাকে ধন্যবাদ দেবে। ভাঙা ইংরেজীতে বলবে মে গড ব্লেস ইউ স্যার—

জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত গাইড চাচা বকস; তাপসী সুমিত্রা; মাধব চতুর্বেদীর রহস্যময়ী স্ত্রী, ভাগ্যকে ফাঁকি দেওয়া বামকিঙ্করবাবু—সবাই জীবন্ত হয়ে এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। ছোটবেলার কাল্পনিক সংলাপ রচনার অভ্যাস ছিল, বিলাস ছিল ওইটাই সেই অভ্যাস ফিরে আসে কলমের মুখে। তাছাড়া দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ হয়েছে তখন, আগে যা চোখে পড়ত না আজ তা পড়ে। মানুষের মনস্তত্ত্ব সমাজের উত্থান-পতনের ইতিহাস, সবই আজ বিশ্লেষণ করে দেখার প্রবণতা জন্মেছে, জীবনের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা খোরাক জুগিয়েছে নতুন ভাবনার, নতুন সৃষ্টির।

উত্তাল সাগরের মাঝখানে ছোট্ট দ্বীপ নিকোবর। সেখানে একদিন পদার্পণ করেছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দ্বীপের মানুষগুলির গ্লানিময় অতীত ইতিহাস, তাদের বর্তমান সমাজব্যবস্থা আর স্বভাবগত সারল্য তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল নতুন এক কাহিনী রচনার। এই লুণ্ঠিত বঞ্চিত মানুষগুলি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক নতুন জীবনের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু অতীতের অত্যাচার অনাচারের ক্ষতচিহ্ন তাদের জীবন থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। নিকোবরীদের দেহে মনে তার ছাপ স্পষ্ট।

শিক্ষাদীক্ষাটা অনেক মানুষের ক্ষেত্রে বাইরের খোলস হয়েই থেকে যায়। চাতুর্যের আবরণে আসল লোভী মূর্তিটি ঢাকা থাকে শুধু। সেই ছদ্মবেশ দেখে বিভ্রান্ত হয়েছে এই সরল আদিম মানুষগুলি। ওরা বিশ্বাস করে জড়িয়ে পড়েছে হৃদয়হীনতার আর ছলনার জালে।

দ্বীপবাসিনী ববিও এমনি বিশ্বাস করেছিল। এবং করে মরেছিল। বিশ্বাসঘাতক দত্তসাহেব ওকে দেহেমনে নিঃশেষ করে দিয়ে পালিয়ে গেছে কাপুরুষের মত। নিকোবরের সমাজে এ কিছু নতুন নয়। এখানে দেহের বেচাকেনায় তখন এরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে কেউ কেউ, অভ্যস্ত হয়েছে কেউ কেউ তখন বহিরাগত মানুষের ভোগলালসার শিকার হতে। সভ্য মানুষের ভোগের কলুষিত বাসনা ক্রমে যেন সংক্রমিত হয়েছে এদেরও কারো কারো মনে, বিবেক বিচারহীন উদ্দাম লালসার সঙ্গী হতে এদের কারো কারো তাই আর দ্বিধা জাগে না।

ববির মত অবস্থায় অন্য কোনো কোনো নিকোবরী রমণী দুদিন মন গুমরে থাকে তারপর তৃতীয় দিনে ধরা দেয় অন্য পুরুষের বাহুবন্ধনে। কিন্তু ববি সাধারণ মেয়ে নয়। নিকোবরের সর্দার-কন্যা সে। জন্মসূত্রে দ্বীপের মানুষের কল্যাণের নৈতিক দায়িত্ব তার। আজ নিজের বঞ্চনা দিয়ে সে দ্বীপবাসিনী মেয়েদের অপমানের তীব্রতা অনুভব করেছে আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তারই নিরসনের দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। জীবনের অর্থই উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, দেহ মানেই শুধু ভোগ নয়। সংযম মানুষকে পরিণত করে ভালোবাসা তাকে মহান করে। সেই ভালোবাসার শিক্ষাই ববির সবচেয়ে বড় উপহার হবে দ্বীপের মেয়েদের জন্য। যে কোন মূল্য দিয়েই সে তা আহরণ করতে প্রস্তুত।

নারীর দুর্জয় শক্তিতে লেখকের অজস্র বিশ্বাস। নারীকে তিনি দেখেছেন শক্তির আধাররূপে। শত দুঃখে শত বিপর্যয়েও সে অপরাজিতা। পুরুষের কাছে তার আত্মসমর্পণ নিরুপায়ের নতিস্বীকার নয়। মমতায় করুণায় বিগলিত নারী মদমত্ত পুরুষকে রক্ষা করে তাকে আশ্রয় দিয়ে। লোভলালসার উদ্দাম তরঙ্গের মাঝে সে সৃষ্টি করতে পারে স্নিগ্ধ, শান্ত ছায়াঘেরা এক দ্বীপ, মূঢ় অচেতন মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পারে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার দুর্বার টান থেকে। দুই নয়নে প্রশ্রয় আর ললাটনেত্রে শাসনের অগ্নিকণা এই হল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কল্পনায় নারীর ভাবমূর্তি। শতাব্দীর গোড়ায় শরৎসাহিত্যে যে মূর্তির আবরণ উন্মোচিত হয়েছিল, শতকের শেষভাগে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় তা মধ্যাহ্নের দীপ্তকিরণে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

শৈশবে কিছুই ভালো লাগত না ভালো লাগত শুধু কল্পনার জাল বুনতে। কিন্তু আজ আর সে বিবাগ নেই। এখন ভালো লাগে সব কিছুই। সংসারের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ আনন্দবেদনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে কলম তুলে নিয়ে বসলে মনটা ভরে যায়। সেটা শুধু সুখে নয়। একটা দায়িত্ব বোধও রয়েছে সঙ্গে। মানুষের সমাজের যেটুকু পাপ যেটুকু কলঙ্ক তাকে শুভ্রতার আলোয় ধুইয়ে দেওয়া, সেও ত লেখকের জীবনের এক মহান কর্তব্য।

রেখা বড়ুয়া

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মেয়েটির গল্প প্রথম শুনি জাহাজের ডেকে বসে রমেশচন্দ্রের মুখে। রমেশচন্দ্র বাঙালী নয় ইউ-পির লোক। গত বার-তের বছর ধরে পোর্টব্লেয়ারে আছে। ম্যাচ-ফ্যাকটরীর পদস্থ কর্মচারী। বছরান্তে একবার কলকাতা ঘুরে দেশে যায়। তখন দেখা হয়। ছেলেবেলা থেকে কলেজ পর্যন্ত একসঙ্গে পড়েছি। তখনো ভালো লাগত এখনো লাগে। হাসিখুশী মানুষ গল্প করতে পেলে আর কথা নেই।

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চলেছি কর-নিকোবর দ্বীপে। সেখানে কি একটা উৎসব উপলক্ষে চীফ কমিশনার যাচ্ছেন। আমার উদ্দেশ্য বেড়ান। সঙ্গী রমেশচন্দ্র। মাদ্রাজের পথে জাহাজ এখানে একবেলা থামে। উৎসবান্তে চীফ কমিশনার রমেশচন্দ্র মাদ্রাজে চলে যাবেন। রমেশচন্দ্র মাদ্রাজ থেকে কলকাতা হয়ে দেশে যাবে। আমি দিন তিনেক নিকোবরে থেকে এক মস্ত ব্যবসায়ীর মোটর লঞ্চে পোর্টব্লেয়ারে ফিরে আসব। রমেশচন্দ্রের পাকা ব্যবস্থা।

প্রবাল দ্বীপ কথাটা কবে প্রথম মনে গেঁথেছিল জানি না। কিন্তু তখনো পর্যন্ত প্রবাল দ্বীপ স্বপ্নের দ্বীপ। অনেকদিন-পর্যন্ত ওটা কল্পনাগম্য দ্বীপ বলেই জানতাম। সত্যি সত্যি সেই দ্বীপে চলেছি ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন একটু উত্তেজনা ছিল রোমাঞ্চ ছিল। রমেশচন্দ্রকে সেই উত্তেজনা বা রোমাঞ্চের সঙ্গী করে নিতে পারি নি। কারণ এ পর্যন্ত অনেকবার সে নিকোবরে এসেছে। এই দ্বীপ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা আর কৌতূহল অনেক সময় তার হাসির খোরাক হয়েছে।

সমুদ্র পথে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর-নিকোবর একশ তেতাল্লিশ মাইল। বেলা তিনটে নাগাদ জাহাজ ছেড়েছে পরদিন সকালে পৌঁছে দেবে। রাত্রিতে ডেকে বসে রাতের সমুদ্র দেখছি আর রমেশচন্দ্রের সঙ্গে এটা-সেটা গল্প করছি।

হঠাৎ মনে পড়ল, নিকোবরে আসার ব্যাপারটা বরাতজোরে ঘটতে চলেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে আসার পারমিট সংগ্রহ করা শক্ত হয়েছিল। রমেশচন্দ্রের তদবির-তদারকে ছাড়পত্র মিলেছে। একই সরকারের তত্ত্বাবধানে দুই দ্বীপে—যাতায়াতে পারমিট লাগবে কেন, ভেবে পাই নি। তারপর পারমিট সই করে নিতে এসে দেখি দশ ঝামেলা। কাগজে-কলমে নাম-ধাম বংশপঞ্জী কবুল করতে হল, বিশদভাবে স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করা হল। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ গায়ের রঙ চুলের রঙ—এমন কি সনাক্ত করা যেতে পারে অবয়বে তেমন কোথায় কি চিহ্ন বা ক্ষতচিহ্ন আছে তাও লেখা হল। তারপর, কেন যাচ্ছি কদিন থাকব ইত্যাদি!

যেদিন পারমিট মিলেছে সেইদিনই যাত্রা। কাজেই তাড়াহুড়োয় এইসব আনুষঙ্গিক সতর্কতা পালনের কারণ জিজ্ঞাসা করার কথা মনে ছিল না। এখন মনে পড়ল।

জিজ্ঞাসা করলাম, নিকোবরে আসতে হলে এত সব আইন-কানুনের ফাঁকড়া কেন হে, কি ব্যাপার?

রমেশচন্দ্র মুচকি হেসে জবাব দিল, তুমি যে সেখানে গিয়ে প্রেমের জাল বিছিয়ে বসবে না, তার বিশ্বাস কি?

—বসলে কি হবে?

—কি আর হবে, ফলাফল যদি ধরে কিছু তার স্ব দায়-দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে পালিয়ে রেহাই পাবে না।

আমি অবাক—এ-রকমও হয় নাকি?

—এখন বিশেষ হয় না; আগে হত। আগে তো শুধু ফুর্তি করার জন্যই নিকোবরে যেত লোকে—একটা জাতকে জাত বিগিয়ে গেছে ওই করে শতকরা সত্তরটা ছেলেমেয়ের খারাপ রোগ।

বিশদ বিবরণ শোনার পর আমি চুপ একেবারে। সভ্য মানুষের এই লোভের ইতিবৃত্ত নতুন কিছু নয়। সেদিকে তাকালে এই সভ্যতার মশালে অনেক আহুতির নজির মিলবে অনেক ক্ষুধার বিভীষিকা দগদগিয়ে উঠবে।.. সমুদ্র-বুকের ওই আদি-মানুষেরা সমুদ্রের মতই উন্মুক্ত উচ্ছল উদ্দাম। আনন্দের সঙ্গে ওদের সত্তার যোগ; প্রথম চেতনার আলো দেখিয়েছিল তাদের ক্রিশ্চিয়ান মিশনারীরা। তারা হৃদয়ের বৈসাতির উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল। তারা সফল হয়েছে। আজও এদের সঙ্গে ওই আদিবাসীদের হৃদয়ের সম্পর্ক। এখনো সেখানে মিশনারীদের রীতি-নীতির প্রাধান্য বেশী।

কিন্তু এর পর সেই ইংরেজ শাসনের যুগেই যারা এসেছে তারা বৈসাতির উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে শুধু। আদিবাসী পুরুষের তাদের গতর দিয়ে সোনা ফলিয়েছে আর রমণীরা যৌবন দিয়ে দেউলে হয়েছে। তারা 'না' বলতে জানত না এখনো জানে না ভালো করে। জীবন আনন্দের বস্তু ভোগের বস্তু—দেবতাসদৃশ এই বিদেশী সভ্য অতিথিদের আনন্দের আমন্ত্রণে আর ভোগের আয়োজনে তারা মুখ ফিরিয়ে থাকতে শেখে নি। তারা বিমুখ করতে জানে না কাউকে।

ব্যভিচার?

ব্যভিচার কাকে বলে সেটাই তারা ভালো করে জানে না। তাদের নিজেদের রীতিনীতি সামাজিক বিধিব্যবস্থা আছে। কিন্তু পরদেশী অতিথিদের সম্ভ্রমের চোখে দেখত আলোর মানুষ বলে ভাবত। এখনো দেখে এখনো অনেকটা সেই রকমই ভাবে। তাদের আনন্দের জন্যে খুশীর জন্যে নিজেদের রীতিনীতি শিকেয় তুলে রাখতে আপত্তি কি?

তাছাড়া যারা আসত তারা খালি হাতে আসত না সভ্য জগতের লোভের সামগ্রী নিয়েই আসত। তুচ্ছ জিনিসকে এদের তুচ্ছ বলে জানতে অনেক সময় লেগেছে। আজও ভালো করে জানে না কোনটা তুচ্ছ আর কোনটা নয়। আলো দেখলে পতঙ্গ ধেয়ে আসবে না?

এর পর যারা এসেছে আদিবাসীরা তাদের শুধু সম্ভ্রমের চোখে দেখত না শুধু অতিথি বলেই ভাবত না। বিদেশী শাসনের শেষের যুগে রাজকর্মচারী আর ব্যবসায়ীদের বেশ সমীহ করত, ভয়ও করত। এদের নগ্ন চাহিদার রূপটা ওরা খানিকটা চিনেছিল কিছুটা হয়ত বুঝেছিল। কিন্তু অন্ন যাদের হাতে ইচ্ছেয় না দিলে তারা যে আদায় করে নেবে—সেই সঙ্গে এটাও জেনেছিল।

ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। একটা জাতির মেরুদণ্ডে রোগের ঘুণ ধরেছে। বংশ বংশ সেই রোগ টানছে তারা। সমুদ্রের বুকের এই মানুষেরা আজও যৌনব্যাধিতেই চোখ বোজে সব থেকে বেশী। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার ওই রোগের নিরসন সমস্যাটাই সব থেকে বড়। সেই জন্যেই ওখানে পদার্পণের এত বিধিনিষেধ এত কড়াকড়ি।

কথায় কথায় এরপর দত্ত সাহেব আর ববির গল্প করেছে রমেশচন্দ্র। আজও ওরা কত সহজ কত সরল কত বিশ্বাসপ্রবণ সেই গল্প বলেছে গেলেই মেয়েটাকে দেখতে পাবে—ভারি সুন্দর দেখতে—একটা ছেলে আছে বছর তিনেকের। আজও দত্ত সাহেবের আশায় বসে আছে তপস্বিনীর মত দিন কাটাচ্ছে। ওর বিশ্বাস দত্ত সাহেব ঘুরে গেছে একদিন না একদিন ওর কাছে ফিরে আসবেই।

গল্পটা শুনেছি। এ-রকম বিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতার গল্প কোনো একটা বিশেষ দেশের বিশেষ গল্প কিছু নয়। ববির নিকোবরিদের এক সর্দারের মেয়ে। আসল নামটা কি রমেশচন্দ্র জানে না। মিশনারীদের দেওয়া ওই নামটাই চালু। ববির বাবা বিদেশীদের সুনজরে দেখত না খুব তার কারণ সম্ভবত ববির মায়ের অকালমৃত্যু। তার মাও সেরা সুন্দরী ছিল দ্বীপের। যৌবন-দাক্ষিণ্যে ভরপুর ছিল। ববির বাবার মুখ থেকেই রমেশচন্দ্র শুনেছে সে কথা। মেয়েটার সাত-আট বছর বয়সে ওর মায়ের সেই সুন্দর দেহ রোগে খেয়েছে। পরদেশী বাবুদের সঙ্গে মাত্র দু-তিন বছর মেলামেশার পরেই তাকে হারাতে হয়েছে।

ববির বাবাও বেঁচে নেই আর। যখন ছিল দত্ত সাহেবের সঙ্গে মেয়ের মেলামেশা বরদাস্ত করে নি। এমন কি মেয়ে সহায় না থাকলে লোকটার প্রাণ-সংশয় হত। ববি বুক দিয়ে আগলেছে তাকে। শুধু বাবার হাত থেকে নয়, যে দু-চারজন মরদ ওকে পাবার আশায় দিন গুনছিল তাদের কোপ থেকেও। ববির মন পাওয়ার আশায় ওদের মধ্যে অনেকেই জোনাক চেপে চৌডা দ্বীপে পাড়ি দিয়েছে অনেকবার। নিকোবরী রমণীরা ববিভোগ্যা বীরত্বের অনুরাগিণী। চৌডা দ্বীপে পাড়ি দিল না যে সে কবুলার পাত্র। ববির বাবা সানন্দে যখন জামাই ছাঁটাই বাছাই করছে মনে মনে সেই সময়ে দত্ত সাহেবের আবির্ভাব।

পোর্টব্লেয়ারের এক নামজাদা ব্যবসায়ীর অধীনে মোটামুটি ভালো চাকরি করত দত্ত সাহেব। রমেশচন্দ্রের সঙ্গেও বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল তার। লোকটার সততাও আছে বলিও আছে। তার ওপর ঘরকুনো নয় চলমান স্রোতে জীবন ভাসাতে একপায়ে রাজী। পোর্টব্লেয়ারের বাঙালী অবাঙালী সকলেই জানে তাকে। মালিকও সুনজরে দেখত। ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানে প্রায়ই নিকোবরে পাঠাত তাকে। ববির কথা আর তাদের প্রণয়ের কথা প্রথমে তার মুখ থেকেই শুনেছিল রমেশচন্দ্র। হা-হা করে হাসত দত্ত সাহেব আর নিজের কেরামতির কথা বলত। বলত কবে শুনবে ওখানকার ওই লোকগুলোর হাতেই প্রাণটা গেছে আমার ব্যর্থ-প্রেমিকরা সব ছুরি শানাচ্ছে বাপটাও সদয় নয়।

ওই বাপকে আর ব্যর্থ-প্রেমিকদের ভোলাবার জন্যে রমেশচন্দ্র পোর্টব্লেয়ার থেকে অনেকবার অনেক কিছু কিনে নিয়ে যেতে দেখেছে তাকে। এরপর শুনেছে মালিকের ব্যবসা তত্ত্বাবধানের জন্যে পাকা-পাকিভাবে একজনের থাকা দরকার সেখানে। অতএব দত্ত সাহেব চলেছে থাকতে।

যাবার আগে উদ্দেশ্যটা খোলাখুলি ব্যক্ত করেছে রমেশচন্দ্রের কাছে। ওই মেয়েই প্রথম মেয়ে নয় তার জীবনে। কিন্তু ও-রকম মেয়ে আর দেখে নি। সমুদ্র অনেক দেখেছে কিন্তু কোনো মেয়ের বুকে যৌবন-সমুদ্র তুফান আর দেখে নি। মেয়েটা মাতাল করেছে, তাকে পিপে পিপে মদ গিলেও ও-রকম মাতাল হওয়া যায় না। মেয়েটার বাপ বেঁচে নেই তখন মাতব্বর দলের সঙ্গে দত্ত সাহেবের একটা বফা হয়ে গেছে। অবশ্য ওই মেয়ের চেষ্টাতেই হয়েছে সেটা। তারা বলেছে বিয়ে করতে হবে।..দত্ত সাহেব বলেছে রাজী।..কি সব অনুষ্ঠানের পর তারা বলেছে বিয়ে হয়ে গেল তোমাদের। দত্ত সাহেব বলেছে বেশ কথা।

—এখন বউ ছেড়ে আমি এখানে পড়ে থাকি কি করে?...দত্ত সাহেব মুচকি হেসেছিল।

বয়সে ছোট কিন্তু রমেশচন্দ্র সতর্ক করেছে তাকে কাজটা ভালো করছ না কিন্তু—

দত্ত সাহেবের রক্তে নেশা তখন ভালো-মন্দ বিচারের বাইরে। উল্টে ঠাট্টা করেছে খোলা আকাশের নীচে আর খোলা সমুদ্রের চড়ায় কোনো সমুদ্রকন্যার সঙ্গে রাত কাটিয়েছ কোনোদিন না দ্বীপের নির্জন বনে ছোটাছুটির পালায় হারিয়ে কোনো বন্য মেয়েকে দস্যুর মত শেষ পর্যন্ত দু-হাতের বোড়তে আটকাতে পেরেছ কখনো। তোমরা ভালোমন্দ খতিয়ে দেখ আমি চলতি।

তার সে কামনা-গলানো উদ্দীপনা দেখে রমেশচন্দ্রের মনে হয়েছিল জাহাজে পৌঁছানোর একটা দিনও নষ্ট না করে এই মুহূর্তে সমুদ্রটা সাঁতরে পাড়ি দিতে পারলে দিত।

এর পরের সমাচার সংক্ষিপ্ত। এক বছরের মধ্যে দত্ত সাহেব একবারও পোর্ট-ব্লেয়ারে আসে নি। রমেশচন্দ্র ছুটিতে দেশে এসেছিল। ফিরে গিয়ে শুনেছে বিশেষ জরুরী কাজে ছুটি নিয়ে দত্ত সাহেব নিকোবর থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা গেছে। তার মালিকের মুখেই খবরটা শুনেছিল রমেশচন্দ্র। মালিক চিন্তিত দত্ত সাহেবের ছুটির মিয়াদের দ্বিগুণ কাবার অথচ একেবারে নিপাত্তা সে। তার কল-কাতার ঠিকানায় চিঠি লিখেও কোনো খবর মেলে নি। মালিক খোঁজ করতে

এসেছিল রমেশচন্দ্র তার কোনো চিঠি পেয়েছে কি না বা তার কোনো খবর রাখে কি না।

কিন্তু এই তিন বছরের মধ্যেও কোনো খবর মেলে নি। আর মিলবেও না জানা কথা। ইতিমধ্যে বার কয়েক নিকোবরে গেছে রমেশচন্দ্র। সেখানকার খবরটাই খবর। নিকোবরিরা সকলেই জানে সরকারী পরোয়ানা পেয়ে দত্ত সাহেবকে যুদ্ধে যেতে হয়েছে। কোথায় যুদ্ধ কার সঙ্গে যুদ্ধ তারা জানে না। তবে যুদ্ধ বোঝে যুদ্ধের বিভীষিকা জানে। স্বাগত যুদ্ধের ধকল তাদের ওপর দিয়েও গেছে কিছুটা। জাপানীরা ওই দ্বীপ দখল করেছিল।

তিন বছরের মধ্যেও লোকটার কোনো খবর না পেয়ে তারা ম্রিয়মাণ। এখন স্পষ্টই মনে তাদের অশুভ ছায়া পড়ছে। দেশের ডাকে বীরের মতই হাসি মুখে গিয়েছিল মানুষটা বীরের মতই তাদের মধ্যে ফিরবে আবার—সেই আশা করেছিল। কি যে হল তারা ভেবে আকুল।

আরো আকুল রবির অবস্থা দেখে। অমন মেয়েটা আস্তে আস্তে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল। তিন বছরের ছেলে নিয়ে আজও প্রতীক্ষায় আছে। তার প্রেম তার ভালোবাসা আজ একটা আদর্শের মত হয়ে উঠেছে ওই দ্বীপে। সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে তাকে। ওখানকার মেয়েদের জীবন থেকে একজন পুরুষ সরে গেলে আর একজন পুরুষের আবির্ভাব হতে সময় লাগে না। কিন্তু রবির আগের প্রণয়ীরাও এখন আর বাসনার আওতায় পেতে চায় না ওকে। বরং মনে মনে আশা করে লোকটা ফিরে আসুক। কোথাও কোনোরকম ব্যভিচারের ছায়া পড়লে রবির নজির দেখায় বৃদ্ধ মেয়ে-পুরুষেরা। ওকে দেখলে এক ধরনের সংযম-চেতনা উঁকিঝুঁকি দেয় কেমন। ওদের বেপরোয়া খুশীর জীবন আর ফুর্তির জীবনটা অমনি সাদা হওয়া দরকার সেই উপলব্ধিও জাগে বোধহয়।

রবির ঘরে একটা ফটো আছে দত্ত সাহেবের। সেই ফোটোটাই এখন প্রাণ তার। জাতীয় উৎসবে পার্বণে সেই ফোটো সঙ্গে নিয়ে যায়। ফোটোতে শুকর-বরের ফোঁটা পরায় তখন। বোজ মালা পরায় ফুল দেয়!

অন্য পরিবেশে বসে শুনলে এই গল্প কেমন লাগত, বলতে পারি না। কিন্তু অফুরন্ত আকাশের নিচে অফুরন্ত সমুদ্রের বুকে বসে অদেখা এক আদিবাসী রমণীর অদৃষ্ট-বঞ্চনা আমাকে স্পর্শ করেছিল। রাতের আবছা আলোয় ঢেউগুলো জ্বলছিল। আর ভিতরে ভিতরে আমিও এক ধরনের জ্বালা অনুভব করছিলাম।

পরদিন সাতটা নাগাদ জাহাজ থামল। কিন্তু থামল তীর থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে। এত দূর থেকে নিকোবর দ্বীপ বড়সড় একচাপ ঝোপের মত দেখায়। শুনলাম, এখানকার সমুদ্রের গভীরতা সুনির্বিঘ্ন নয় বলে বড় জাহাজ পাড়ের দিকে ঘেঁষে না। এখান থেকে ডিঙির মত ছোট ছোট মোটর বোটে পাড়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা।

ধুতি-পাঞ্জাবি সামলে কোনোরকমে মোটর বোটে উঠে বসলাম। কিন্তু তার পরেই লন্ডভন্ড কান্ড। আমরা যেন খেলনার নৌকোয় চেয়ে বসেছি একটা। প্রকান্ড প্রকান্ড ঢেউয়ের ঝাপটায় একবার করে মহাশূন্যে উঠছি আর একবার করে অতলে নামছি। যে-কোন রকমে একবার ছিটকে পড়লেই অতলসমাধি। অথচ এটাই নাকি সমুদ্রের শান্তরূপ। ভয়ে কাঠ আমি কোনোরকমে নৌকো আঁকড়ে বসে আছি। রমেশচন্দ্র বার দুই আশ্বাস দিল, কিচ্ছু ভয় নেই, চুপচাপ বসে থাক।

যাই হোক তীরের কাছাকাছি এসে মোটর বোটও থেমে গেল। আশ্চর্য এখানকার জল পুকুরের মত নিস্তরঙ্গ, ঠান্ডা! ঢেউ তো নেই-ই, স্রোতও নেই যেন। নিকোবরেরই আদিবাসীরা এক একটা ক্ষুদ্রাকৃতি কেনো নিয়ে মোটর বোটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। লম্বা সরু ভেলার মত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তলা দিয়ে দুটো বড় বাঁশ আড়াআড়ি বাঁধা। ওই ভেলায় চেপে আমরা তীরে উঠব।

পাড়ে নিকোবরি পুরুষ-রমণীর ভিড়। পুরুষদের পরণে পাতলা রঙিন হাফপ্যান্ট গায়ে রং-বেরংয়ের হাফ-হাতা জামা বা গেঞ্জি। মাথায় অনেকেরই কাঁটার মুকুট জড়ান। এক-একজনের এক-এক রকম। যার যেমন পছন্দ। মেয়েদের পরণে রঙিন সায়া, গায়ে রঙিন ব্লাউজ। লক্ষ্য করলে অন্তর্বাসও চোখে পড়ে। মেয়ে-পুরুষ সকলেরই গায়ের রঙ লালচে তামাটে।

প্রথম দর্শনে প্রবাল দ্বীপ দেখে নিরাশ হয়েছি সত্যি কথা। এই প্রবাল দ্বীপে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার প্রবাল দ্বীপের অস্তিত্ব লুপ্ত। একটুও মেলে না। গাছ-গাছরা ঝোপঝাড় ভরা পুব বাংলার গাঁয়ের মত। প্রস্তরীভূত প্রবাল-কীটের অস্তিত্ব দেখব, এ আশা যদিও হাস্যকর তবু এমন গদ্যাকারের প্রবাল দ্বীপ দেখব ভাবি নি।

আদরযত্ন করে আমাদের আধ মাইল দূরের একটা প্যান্ডেলের নিচে নিয়ে যাওয়া হল। একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। মেয়ে-পুরুষ সকলেই আমাকে যেন একটু বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। চীফ কমিশনার এবং অন্যান্য গণ্যমান্যজনের সমাবেশেও আমি লক্ষণীয় কেন সেটা বুঝতে অবশ্য বেগ পেতে হল না। একমাত্র আমারই পরণে ধুতি-পাঞ্জাবি। এটাই ওদের চোখে বিশেষ বৈচিত্র্যের মনে হল।

নিকোবরি মেয়েরা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে জন গণ মন জাতীয় সঙ্গীত শোনাল প্রথম। আমি অভিভূত। পুষ্ট গলা, স্পষ্ট উচ্চারণ, সেই অবিকৃত সুর যে সবের সঙ্গে নর্তকীর যোগ। অনেক অভিজাত সমাবেশে নিজের দেশের মেয়েদের গলায়ও এই জন গণ মন অনেক সময় মেকী মনে হয়েছে।

গানের শেষে চীফ কমিশনার ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন একটা। তারপর ভোজনপর্ব। মাংস-ভাত আর চাটনি। সঙ্গে যে যত খেতে পারে টাটকা ভাঙা ডাবের জল। যার আতিথ্যে তিনটে রাত আমি কাটাব এখানে, রমেশচন্দ্র তাঁর সঙ্গে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ভদ্রলোক কেরালার অধিবাসী।

কিন্তু সব ছেড়ে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ আর একদিকে। অদূরের একটা নারকেল গাছের পাশে দাঁড়ান একটি মেয়ের দিকে। সুশ্রী গম্ভীর, বছর তিনেকের একটি ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা মায়ের হাত ছাড়িয়ে এদিকে চলে আসতে চাইছে, কিন্তু শক্ত হাতে ধরা বলে পারছে না।

মেয়েটি সেই থেকে নিষ্পলক চেয়ে আছে আমার দিকে।

কেউ না বলে দিলেও আমি যেন চিনেছি মেয়েটিকে। তবু ইশারায় রমেশচন্দ্রকে দেখালাম। রমেশচন্দ্র মাথা নাড়লে, সে-ই বটে। রবি।

—কিন্তু সেই থেকে দেখছে কি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে?

রমেশচন্দ্রও ঠিক ঠাওর করতে না পেরে মৃদু ঠাট্টা করল, ভাবনায় ফেলছ, তোমাকে পছন্দ হয়ে গেল না তো?

যতবার চোখ গেছে, চোখাচোখি হয়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে, একভাবেই চেয়ে আছে। আমার কি রকম অস্বস্তি একটা। কেমন মনে হল, চাউনিটা সদয় নয়।

চীফ কমিশনার এবং জাহাজ থেকে আর যাঁরা এসেছেন সকলেরই এবারে জাহাজে ফেরার তাড়া। পায়ে পায়ে আবার সমুদ্র-পাড়ের দিকে এগোলেন সকলে। স্থানীয় ভদ্রলোক আর নিকোবরি মেয়ে-পুরুষেরা সঙ্গ নিয়েছে। আমি আর রমেশচন্দ্র পাশাপাশি আসছি। তাকে ছেড়ে এই দ্বীপে তিনটে রাত কাটাব ভাবতে কেমন যেন লাগছে।

হাতে চাপ দিয়ে রমেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমাদের দশ-পনের হাতের মধ্যে সেই মেয়েটি—রবি। ছেলের হাত ধরে নিজের অগোচরে আসছে যেন। স্থির কঠিন দুই চোখের আওতায় আমায় আটকে নিয়ে পথ ভাঙছে যেন।

রমেশচন্দ্রও এবারে অবাক একটু। বলল, ওদের দু-চারজন লোক আমাকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল, কোন দেশের লোক তুমি, কোথায় থাক...। কলকাতায় শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছিল...। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো—

হঠাৎ কিছু মনে হল তার। দাঁড়িয়ে পড়ে দেখল আমাকে তারপর হেসে বলল, বুঝেছি... এগোতে এগোতে বলল, দত্ত সাহেবও প্রায়ই ধুতি পরত। এখানে ধুতি পর আর যাই পর, বাইরে থেকে এলে সাহেব। শুধু ধুতি পরার জন্যই নয়, সেও তোমার মত অমনি করেই ধুতির কোঁচা পাঞ্জাবির বাঁ-পকেটে গুঁজত। এই থেকেই মেয়েটা কিছু একটা ভেবেছে হয়ত।

—কি সর্বনাশ! আমি তাহলে এই জাহাজেই পালাই।

রমেশচন্দ্র হাসতে লাগল। বললাম বলেই যাওয়া সম্ভব নয়। জাহাজ যাচ্ছে মাদ্রাজে; আমাকে ফিরতে হবে পোর্টব্লেয়ার

রমেশচন্দ্র আশ্বাস দিল, না হে না, খুব অতিথি-বৎসল ওরা, দেখখন।

অতিথিরা কেনোয় উঠলেন, কেনো থেকে মোটর বোটে। মোটর বোট। আবার তাঁদের জাহাজে পৌঁছে দেবে। সকলেই দাঁড়িয়ে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। রুমাল নাড়ার ধুম পড়ে গেল দুদিক থেকে।

ধুতি পরা লোকটা আমি থেকে গেলাম, সেটা এবারে নিকোবরি মেয়ে-পুরুষদের চোখে পড়ল বিশেষ করে। ঈষৎ বিস্ময়ে স্থানীয় কর্মচারীদের তারা এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, নিজেদের মধ্যেও কি বলাবলি করতে লাগল।

একদিকে ঘাড় ফেরাতেই আবারও রীতিমত ধাক্কা খেলাম একটা।

মেয়েটি চেয়েই আছে। স্তব্ধ কঠিন মূর্তি। নিষ্পলক। দুই চোখে সাদা আগুন। আদিবাসী মেয়ে-পুরুষরা অনেকে তাকেও দেখছে চেয়ে চেয়ে। কেউ কেউ তাকে বলছে কিছু। আমি অবাক, ধুতিপরা এই বাঙালী মূর্তি দেখে মেয়েটার স্মৃতির বেদনা উপছে ওঠেও যদি, তার হাবভাব এমন কঠিন হবে কেন, চাউনিটা এমন অকরুণ হবে কেন। বরং আমাকে তো প্রীতির চোখে দেখার কথা তার।

কেরালাবাসী ভদ্রলোকটির সঙ্গে পায়ে পায়ে ফিরে চলেছি। সকলেই ফিরছে। কিন্তু আর একবারও না তাকিয়েও সারাক্ষণই মনে হচ্ছিল, ওদের মধ্যে ছেলের হাত ধরা কোনো বিশেষ এক মেয়ের দুই চোখ ছুরির ফলার মত আমার গায়ে বিঁধে আছে।...অস্বস্তি।

আরও আধ মাইলটাক দূরে এসে থামলাম। গলা উঁচু বাঁশের মাচার ওপর মোচাকের আকারে খড়ের চাল দেওয়া কাঠের ঘর একটা। সেই ঘরেই আমি থাকব এই তিন রাত। তিরিশ চল্লিশ গজ দূরে ওই রকমই আর একটা ঘরে, সঙ্গী ভদ্রলোকটি থাকবেন। দুপুরের খাওয়ার ঝামেলা নেই। ছোট দ্বীপে আমাকে যথেচ্ছ বেড়াতে বলে ভদ্রলোক নিজের কাজে চলে গেলেন।

নিকোবরি মেয়েরা চলে গেছে, পুরুষরা অনেকেই এগিয়ে এলো। 'সাব সাব' বলে আদর-অভ্যর্থনা করল। ভাঙা ইংরেজী বললেও ইংরেজী বেশ বোঝে। হিন্দীও বোঝে। কোথায় থাকি, পোর্টব্লেয়ারে কেন এসেছি, এখানে কতদিন থাকব, ইত্যাদি। নিবাস কলকাতায় শুনে আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা, কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করল না।

আমাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে তারা চলে গেল। বিকেলে আবার আসবে বলে গেল। তিনদিন এখানে থাকব শুনে সকলেই খুশী।

ঘড়ি দেখলাম, বেলা এগারোটা মোটে। জাহাজের ধকলে শরীর দুলছিল কেমন, ঘড়ির ঘাটিয়ার ঘন্টা দুই গড়াগড়ি করে উঠলাম আবার।

পথ চিনি না। চেনার দরকারও নেই। যে পথেই যাই একসময় দেখব সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। পায়ে পায়ে অনির্দিষ্টভাবে হেঁটে চলেছি। কোথাও জঙ্গল কোথাও ফাঁকা। ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখছি। নারকেলের জঙ্গলই বেশি। বেশ একটা রোমাঞ্চকর নির্জনতা. এই দ্বীপে আমিই একমাত্র মানুষ, ভাবতেও কষ্ট হয় না। ভাবলে কেমন গা ছমছম করে, অথচ ভালোও লাগে। আমি কোন একটা পরিত্যক্ত ধার দিয়েই চলেছি বোধ হয়, নইলে নিকোবরে শুনেছি জায়গার আয়তনে লোক-বসতির চাপ বেশী।

হঠাৎ পা দুটো থেমে গেল আমার। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

অদূরে দুটো ছোট গাছের ফাঁকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে সেই মেয়ে—ববি। কোনো মেয়ের মুখে এত ঘৃণা, এত বিদ্বেষ আর দেখিনি। হকচকিয়ে গিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক নেই। দিশা ফিরে পেয়ে দু-পা এগোতেই মেয়েটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটা অজানা শঙ্কার মত বোধ করতে লাগলাম। মেয়েটা কি ভেবেছে? মেয়েটা এমন করছে কেন?

বিকেলটা সেই ভদ্রলোক আর অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে-মিশে কাটল। পরদিন সকলটাও। তবু আমার কেমন মনে হত, কোন অলক্ষ্য থেকে কেউ যেন লক্ষ্য করছে আমাকে।

দুপুরে আবার সেই ব্যাপার। গতকাল যে দিকে এসেছিলাম আজ তার উল্টো দিকে এসেছি। জায়গাটাও একেবারে নির্জন নয়। গাছগাছড়ার ফাঁকে ফাঁকে আদিবাসীদের কুটির দেখা যাচ্ছে। সরু একটা পায়ে-চলা পথে পা বাড়াতে গিয়ে দেখি অদূরে পথ আগলে ববি দাঁড়িয়ে। দু-হাত কোমরে দৃপ্ত ভঙ্গি। লালচে মুখে নির্বাক রোষ। শুকনো মুখে কিছু একটা অটুট সঙ্কল্প।

দেখামাত্র মনে হল, এগিয়ে গেলেও আজ আর সরে যাবে না। গেলও না। কাছে এসে দু হাত জুড়ে কপালে ঠেকালাম, নমস্তে—

ওই নমস্কারটা ওরা বোঝে দেখেছি। আদিবাসীদের অনেকেই আমাকে এভাবে অভিবাদন জ্ঞাপন করেছে।

জবাবে ববি মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল খানিক। মুখের কঠিন রেখা একটুও নরম হল বলে মনে হল না। কোমর থেকেও হাত সরাল না। ছুরির ফলার মত দুটো চোখ যেন, আমার সমস্ত মুখটা ফালা ফালা করে ভিতরটা দেখে নিচ্ছে।

ভাঙা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করল, হোয়াই আর ইউ হিয়ার?...এখানে কি মতলবে এসেছ?

সব বিস্ময় শিকেয় তুলে অতিথিসুলভ জবাব দিলাম, তোমাদের দেশ দেখতে এসেছি।

এই জবাবই দেব, জানত যেন। তেমনি অস্ফুট ঠাণ্ডা গলায় আবার প্রশ্ন হল এখানে দেখার কি আছে?

জবাব কি দেব? বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে বললাম দেশ বেড়াতে আমার ভাল লাগে। তোমরা কি চাও না, বাইরের লোক এখানে আসে?

—আমি চাই না।...আই ডু নট ওয়ান্ট। অই হেট!

আমি নির্বাক।

—তোমার নাম কি?

আমি স্বেন বিচারের অসামী। নাম বললাম। মনে হল আমার এই নামটা বিশ্বাস করল না।

—ইউ নো দত্তো সাব?...দত্ত সাহেবকে চেন?

মাথা নাড়লাম, চিনি না।

অবিশ্বাসে এবার হিসহিসিয়ে উঠল মেয়েটা। তুমি ক্যালকাটায় থাক না?

মাথা নাড়লাম, আই থাকি। এটাই যেন চরম মিথ্যা উক্তি আমার। নির্বাক রোষে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার সমস্ত মুখ। আবারও আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল এক দফা। বিশেষ করে আমার পাঞ্জাবির বাঁ পকেটে কোঁচা গোঁজাটা। এবারে আমার বলা উচিত ছিল, ওকে বোঝান উচিত ছিল কলকাতায় কত লোক থাকে, কত লোক এমনি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, কত লোক জামার পকেটে কোঁচা গোঁজে। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। আমি নির্বাক, নিস্পন্দ।

তেমনি ধীর অথচ অসহিষ্ণু কণ্ঠে হিন্দীতে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, কতদিন থাকার মতলব তোমার এখানে?

বললাম, পরশু চলে যাব

আবারও খানিক চেয়ে থেকে ববি অস্ফুট রায় দিল, যদি না যাও, তোমার বিপদ হবে।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। একটা বস্তু ঝোপের ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে ঠিক নেই। পায়ে পায়ে ডেরায় ফিরেছি এক সময়। বিকেলেও কারও সঙ্গে গল্প-গুজব করতে পারি নি ভাল করে। কেরালাবাসী ভদ্রলোকটিকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে উঠতে পারি নি। রাতে ভাল ঘুম হয় নি। কি ভেবেছে মেয়েটা একটুও ঠাওর করে উঠতে পারি নি। অথচ ভীষণ কিছু যে ভেবে বসে আছে সন্দেহ নেই। দত্তসাহেবের দেশের মানুষ বলে যেখানে ওর কাছ আরও বেশী খাতির পাবার কথা, সেখানে উল্টে এই ব্যবহার কেন!

পরদিন।

কিছুতেই জট ছাড়িয়ে ওঠা গেল না। যত ভেবেছি তত দিশেহারা হয়েছি। অথচ অন্যান্য আদিবাসীরা ভারি সদয় আমার ওপর। দত্ত সাহেবের দেশের লোক বলেই যেন, ক্যালকাটার লোক বলেই যেন। ওদের অনেকেই সেদিন সাগ্রহে দত্ত সাহেবের কথা জিজ্ঞাসা করেছে আমাকে। সকলেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে সে আবার ববির কাছে ফিরে আসুক ওদের মধ্যে ফিরে আসুক। আগামীকাল আমার পোর্ট-ব্লেয়ারে ফেরার কথা। ওই মেয়েটার ভয়ে নয়, তবু স্টীম লঞ্চ পেলে আজই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে আপত্তি ছিল না আমার।

সকাল, দুপুর বা বিকেলের মধ্যে মেয়েটাকে আর দেখি নি। অথচ মনে মনে দেখার আশা। সন্ধ্যার পর ডেরায় বসে ছিলাম। খানিক আগে কেরালাবাসী ভদ্র-

লোকটি রাতের খাবার আয়োজনের ব্যবস্থায় উঠে গেছেন। হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখি দরজার কাছে বছর পনের ষোলর একটা আদিবাসী ছেলে দাঁড়িয়ে।

—সাব—

উঠে এলাম।

সে চেষ্টা-চরিত্র করে যা বোঝাল, তার সারমর্ম, বাবি একবার আমাকে তার ঘরে নিয়ে যেতে বলেছে জরুরী কথা আছে তার, এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

আমি হতভম্ব। রাজ্যের অস্বস্তিও। কি করব, যাব? ছেলেটার দিকে চেয়ে মনে হল, সে যেন বুঝেছে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ত বা ভয়ই পেয়েছি ভাবছে।

বেশী পথ ভাঙতে হল না। এই রকমই আর একটা ডেরার দরজার কাছে বাবি দাঁড়িয়ে। ছেলেটকে ইশারায় চলে যেতে বলল। আমাকে ডাকল, কাম ইন সাব—

সিঁড়ি দিয়ে মাচার ঘরে এসে দাঁড়ালাম। আমার বাহ্য চেতনা সক্রিয় নয় খুব। তকতকে পরিচ্ছন্ন ঘর। মেঝেতে তিন বছরের ছেলেটা বসে খেলা করছে। আমাকে দেখে সবিস্ময়ে চেয়ে রইল খানিক, তারপর আমার দিকে ছোট একটা বেতের ঢালা এগিয়ে দিয়ে ভাব করতে চেষ্টা করল। ছেলের মায়ের দিকে চেয়ে ছেলেটার দিকে এগোতে ভরসা হল না। সেই মুখ আগের দিনের মত না হলেও থমথমে গম্ভীর।

ঘরের কোণে একটা তাকের দিকে চোখ গেল। তাকের ওপর ধুতি-পাঞ্জাবিপরা

খাঁটি গ্ল্যাক্সোজ-ডি®
শুধু একটিই আছে—
যা গ্ল্যাক্সোর তৈরী!

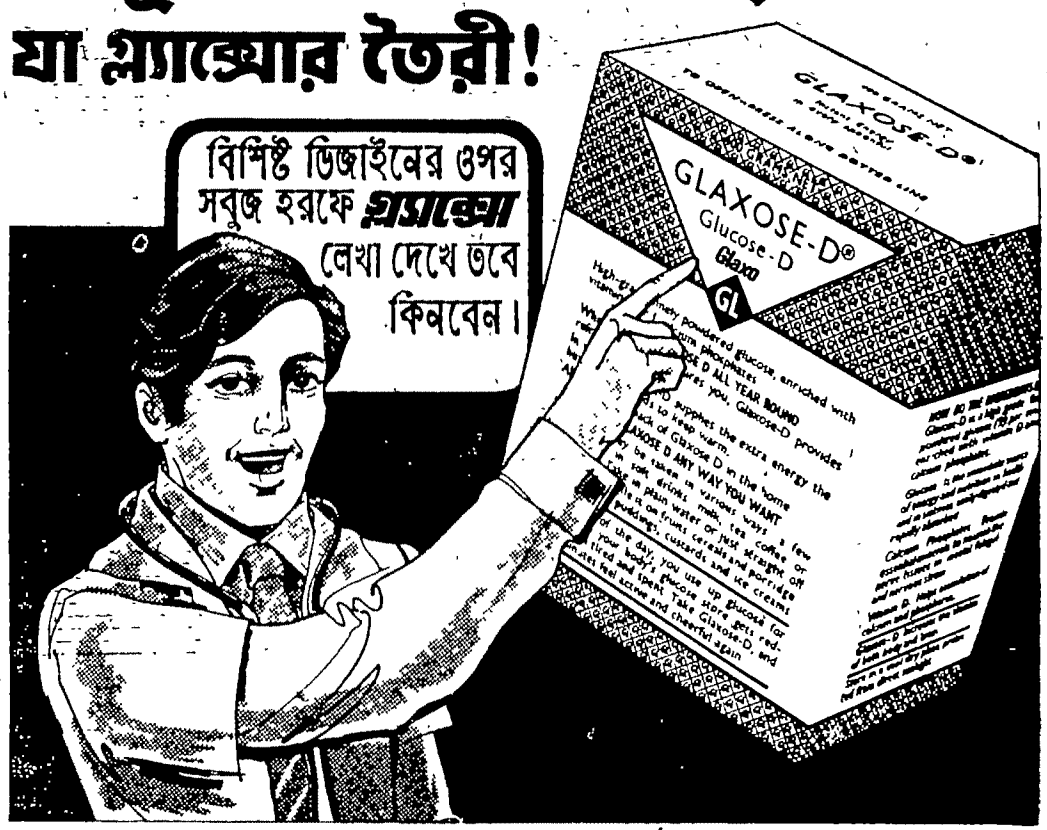

Ⓡ ব্যবহারকারীদের রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক

গ্লুকোজ আর ভিটামিন ডি, ফস্‌ফরাস ও ক্যালসিয়াম মিশিয়ে তৈরী গ্ল্যাক্সোজ-ডি—আজ সবচেয়ে বেশী আস্থা অর্জন করেছে! লক্ষ লক্ষ লোক গ্ল্যাক্সোজ-ডি খান নিমেষে শক্তি পাবার জন্যে! গ্ল্যাক্সোজ-ডি'র নির্মাতা গ্ল্যাক্সো—বকমারি আহার্য্য উৎপাদন ও জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্রের জন্যে বিখ্যাত।

নিকৃষ্ট ধরনের নকল থেকে সাবধান—এ থেকে আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

গ্ল্যাক্সোজ-ডি'র প্যাকেট কেনবার সময় নিশ্চয়ই দেখে নেবেন জিনিষটি খাঁটি কিনা!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি® গ্ল্যাক্সোর তৈরী

বাঙালী তরুণের ফোটো একটা। বেশ সশ্রী চেহারা। ফোটোতে মালা জড়ান, সামনেও ফুল কতকগুলো। এই তাহলে দত্ত সাহেব।

ববি জিজ্ঞাসা করল, গোইং টু-মরো? ...কাল যাচ্ছ?

মাথা নাড়লাম হ্যাঁ, যাচ্ছি।

সেটা শুনে নিয়ে আতিথ্যের কথা মনে হল বোধহয়। ঠাণ্ডা আপ্যায়ন জানাল, সিট ডউন সাব—

মেঝেতে নারকেল পাতার চাটাইয়ের মত পাতা। বসলাম।

ছেলেকে সামনে টেনে নিয়ে অদূরে মেঝেতেই বসল ববি। আমকে ভরাতার সম্বন্ধে সচেতন রাখার জন্যেই ছেলেটাকে কাছে টেনে বসিয়েছি মনে হল। তারপর মুখের ওপর দু-চোখ আটকে নিয়ে দেখল খানিক।

ভাষা বুঝুক না বুঝুক, লক্ষ্য করলে আমার অসহায় বিস্ময়টুকু উপলব্ধি না করার কথা নয়। আর করলও বোধহয়। ইংরেজী আর হিন্দীতে মিশিয়ে বলল কল তোমার সঙ্গে আমি খুব খারাপ ব্যবহার করেছি সাহেব, তুমি কিছু মনে কর না।

মাথা নেড়েছি, কিছু মনে করি নি। তারপর চুপচাপ অপেক্ষা করছি।

হঠাৎই সে আবার জিজ্ঞাসা করল দত্ত-সাহেবকে চেন তুমি?

কাল চিনি না বলাতে বিশ্বাস করে নি। হোক মিথ্যে, তবু মেয়েটার ক্ষত যদি একটু ঠাণ্ডা হয়, সত্যি বলে কাজ নেই। ঘুরিয়ে জবাব দিলাম আমি চিনি নে ঠিক, কলকাতা মস্ত জায়গা, অনেক লোক — তবে তাঁর নাম শুনেছি তিনি নামকরা লোক, দেশের জন্যে যুদ্ধে গেছেন—

কিন্তু আর বলা হল না। মেয়েটা যেন দপ করে জ্বলে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তপ্ত যাতনায় অস্ফুট গলায় কথাগুলো যেন দাঁতের চাপে ভাঙতে ভাঙতে বলে উঠল—ইউ লাইং তুমি মিথ্যে কথা বলছ। সে কোনদিন যুদ্ধে যায় নি। এখানকার লোকেদের কাছে আমি বানিয়ে বলেছি সে যুদ্ধে গেছে। সে আমার সব কিছু লুঠ করে নিয়ে চোরের মত সরে গেছে এখান থেকে বেইমানি করে পালিয়ে গেছে, আই হেট হিম, আই হেট হিম!

জীবনে এমন পরিস্থিতিতে আর কখনও পড়েছি কিনা এত বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছি কিনা জানা নেই। বোবার মত খানিক বসে থেকে সহজ স্বীকৃতির রাস্তাটাই বেছে নিলাম আমি। ওকে বুঝিয়ে বললাম, দত্ত সাহেবকে আমি কোনদিন দেখি নি নামও শুনি নি কখনো, পোর্টব্লেয়ারে এসে তার কথা শুনেছি, ববির কথা শুনেছি—ববিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই ওটুকু মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলাম আর কোন কারণে নয়—শুধু এই জন্যেই।

ববি খুঁটিয়ে দেখছে আমাকে, বিশ্বাস করবে কি করবে না, সেই সংশয়। আমাদের কথা তুমি কার কাছে শুনেছ?

রমেশচন্দ্রের নাম করলাম।

খানিক থেমে আবারও জিজ্ঞাসা করল, তোমার দেশের লোকের বেইমানির কথা শুনে তোমার কি মনে হয়েছে?

বললাম, আমি লজ্জা পেয়েছি, দুঃখ পেয়েছি—কিন্তু আমার দেশের সব লোকই যে এরকম নয় তোমাকে বোঝাব কেমন করে?

ববি চুপ করে ভাবল একটু, তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

বললাম, তুমি বিশ্বাস করতে চাইলেও পারবে কি?

এই জবাবটা পছন্দ হয়েছে মনে হল। আমার আন্তরিকতার সম্বন্ধে তত আর সংশয়াপন্ন নয় যেন। শান্ত মুখে বলল ভাল-মন্দ সব দেশেই আছে, তোমার দেশের একজন লোক খারাপ কাজ করেছে, তুমি ইচ্ছে করলে একটা ভাল কাজ করতে পার করবে?

আমি নীরব, জিজ্ঞাসু।

—তুমি ক্যালকাটার লোক, তোমার কথা এখন সকলে বিশ্বাস করবে। ক্যালকাটা থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখে জানাবে দত্ত সাহেব যুদ্ধে মারা গেছে। লিখবে?

বিস্ময়ের ধাক্কায় আমি বোবা খানিকক্ষণ। নিজের অগোচরেই দত্ত সাহেবের ফোটোটার দিকে চোখ গেল আবার। ফুল আর মালা এখনও শুকোয় নি, আজই দিয়েছে বোঝা যায়।

আমার নীরব বিস্ময়টুকু উপলব্ধি করল ববি। চোখাচোখি হতে বলল, আই হেট হিম!

তবু জিজ্ঞাসা করলাম তাহলে ফুল দাও কেন, মালা পরাও কেন?

ববি জবাব দিল, এই দ্বীপে ভালবাসার একটা নজির রাখবার জন্য। সাদা নজির—এ হোয়াইট লেসন।

সহজ কথাকটার এক বর্ণও বোধগম্য হল না। স্থান কাল ভুলে ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

কিন্তু মেয়েটা যেন হঠাৎ নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছে। লালচে তামাটে মুখখানা সত্যিই তপস্বিনীর মত লাগছে এখন। ছেলেটাকে নিজের আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে একটা গাল তার ঝাঁকড়া-চুল মাথার ওপর ঘষল একটু। তারপর আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল আমার বাবা এই দ্বীপের সর্দারদের একজন ছিল, তার বাবাও তাই ছিল। তারা দ্বীপের ভাল-মন্দ বুঝত, ভাল-মন্দ ভাবতে পারত। আমার বাবা আমাকে নিষেধ করেছিল আমি শুনি নি। বাবা বলত, ওরা শুধু ফুর্তি করতে আসে, রোগ ছড়াতে আসে—সেই ফুর্তিতে আর সেই রোগে আমার মা মরেছে। আমি তবু শুনি নি।

ববি সোজা হয়ে বসল। মুখের দিকে চেয়ে কার সঙ্গে কথা কইছে সেটাই যেন ভালো করে দেখে নিল আর একবার। তারপর ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আবারও বলে গেল আমার মত এই দ্বীপের অনেক মেয়ে শোনেনি অনেক মেয়ে শোনে না। তারা ফুর্তি করে ফুর্তির লোক চলে গেলে আবার নতুন ফুর্তির আশায় বসে থাকে — নয়ত দ্বীপের ছেলেছোকরাদের নিয়েই ফুর্তির নেশা করে। তারপর রোগে পড়ে আর রোগ ছড়ায়। গোটা দ্বীপে এই রোগের ধা। আমি এই ঘা সারার ফুর্তির নেশা ছাড়াব। আমি আমার জীবন দিয়ে এই দ্বীপে ভালোবাসার নজির রাখব এদের ভালোবাসা শেখাব। আমাকে দেখলে ওদের মন জাগবে ফুর্তির নেশা ছুটে যাবে লোভ কুকড়ে যাবে। আমি শেখাব ওদের আমার ছেলে শেখাবে—এই করে রোগ ছেড়ে যাবে—যাবে না সাহেব?

আশায় উদ্দীপনায় সমস্ত মুখ জ্বলজ্বল। আমার গলার কাছে কিছু একটা আটকেছে যেন। চোখের কোণ দুটো শিরশির করছে। লবণাক্ত সমুদ্র-ঘেরা এই দ্বীপের বাসিন্দে মাচার ঘরে বসে এক নিরক্ষরা আদিবাসী রমণীর মুখে আমি যা শুনেছি তা কোনোদিন ভোলবার না। আমার সাগরপারের শিক্ষিত মন আর শিক্ষিত বুদ্ধির নিক্তি দিয়ে একবারও তা বিশ্লেষণ করা বা সম্ভব-অসম্ভব ওজন করার কথা মনে হয়নি আমার। আমি মাথা নেড়েছি বার বার বলতে চেয়েছি—যাবে নিশ্চয় যাবে।

ববির মুখে আর রাগ-দ্বেষের চিহ্ন মাত্র নেই ক্ষোভের এতটুকু ছায়া নেই। রমণী-মুখে যেন গোটা দ্বীপের আঁধার-ঘোচানো শিখা জ্বলছে। বলল দত্ত সাহেব আমার ক্ষতি করলেও দ্বীপের উপকার করেছে আমার রাগ করা ভুল আর রাগ করব না। কিন্তু এই দ্বীপের জন্যে যে আরো অনেক বড় নজির দরকার অনেক বেশী সাদা নজির—তুমি ক্যালকাটা থেকে ওই চিঠিখানা লিখবে সাহেব? লিখবে?

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি লিখব।

পরদিন যথাসময়ে স্টীম লঞ্চ এসেছে। স্থানীয় কর্মচারীটির সঙ্গে অনেক আদিবাসীও সমুদ্রতীরে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এসেছে আমাকে। ছেলের হাত ধরে ববিও এসেছে। তার চোখে সেই নীরব আকুতি.. সাহেব লিখবে তো? ভুলবে না তো?

বিদায় নিয়ে কেনোতে উঠেছি কেনো থেকে ছোট মোটর বোটে। মোটর বোট থেকে স্টীম লঞ্চে। ওরা দাঁড়িয়ে আছে তখনো। হাত নাড়ছে রুমাল নাড়ছে আর ওই এক পাশে ববি দাঁড়িয়ে আছে ছেলের হাত ধরে।

সেদিকে চেয়ে এই প্রথম মনে হল প্রবাল দ্বীপে এসেছিলাম। ..প্রবাল দ্বীপ ছেড়ে চলে যাচ্ছি!

কথায় কথায়

নিজের পিঠ নিজে চুলকোন

কুকুরেরা কি চমৎকার পা উলটিয়ে পিঠ চুলকোতে পারে, বিড়ালেরাও খুব ভালো পারে। কিন্তু গরুরা পারে না। তাদের যখন পিঠ চুলকোয় তখন গরুরা দু-চারবার লেজের ঝাপট মেরে চুলকানি কমাবার চেষ্টা করে। অথবা করুণভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে যদি কোনো মহাপ্রাণ কাক এসে পিঠটা একটু ঠুকরিয়ে দেয়।

মানুষ কিন্তু পিঠ চুলকানোর ব্যাপারে সকলের পিছনে। অবশ্য মাছ কিংবা সাপেদের এই প্রতিযোগিতার অন্তর্গত করা হচ্ছে না। মাছেদের আঁশবহুল পিঠ কখনো চুলকোয় কিনা, পিঠ চুলকানির বোধ তাদের আছে কিনা, সাপেদের পিঠ কুটকুট করে কিনা কখনো, এসব বলা খুবই কঠিন।

মানুষের যখন পিঠ চুলকোয়, তখন সে প্রথম এক হাত দিয়ে, তারপর দু হাত দিয়ে, পিঠের সেই অকুস্থলটি আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারে না, হাতের নাগালে পায় না। বাড়িতে হলে, ছেলে, বৌ কিংবা বিশ্বাসী গৃহ-ভৃত্যকে ডেকে বলে পিঠটা চুলকিয়ে দিতে। কিন্তু অফিসে বা রাস্তাঘাটে হলে কিছুই করার উপায় থাকে না। কে আর সহকর্মী বা সহযাত্রীকে বলতে ভরসা করবে যে, 'ভাই আমার পিঠটা একটু চুলকিকে দিন না।'

এই সব সমস্যা বিবেচনা করে পুরীর ব্যবসায়ীরা বহুকাল ধরে এক ধরণের পিঠ-চুলকানির লাঠি, যার লম্বা মাথায় অল্প বাঁকানো নকল নখ, তীর্থযাত্রীদের কাছে বিক্রি করে আসছেন। কিন্তু কয়জনেই বা পুরী থেকে মনে করে সেই লাঠি কিনে আনেন? আর সব সময়েই তো সেই লাঠি হাতে করে অফিস-কাছারি, ট্রামে-বাসে যাতায়াত করা যায় না।

মানবজাতির বহু ধরণের দুঃখ-কষ্ট, অসুবিধা-সমস্যার সমাধানের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য লোক কতরকম চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মারা কোনোদিনও এ-অভাবের জন্যে ভেবে দেখেন নি পিঠ চুলকানির মত কষ্টসহ এবং জটিল সমস্যাটির প্রতিকার কি? তাঁদের যখন নিজেদের পিঠ চুলবুল করে উঠতো, কি করতেন তাঁরা? বোধহয়, মুখ বিকৃত করে যথাসম্ভব দূরের কোনো অনির্দিষ্ট বস্তুর দিকে চোখ কটমট করে তাকাতেন।

আমার বন্ধু বিদ্যানাথ পালের বয়েস এখন উনচল্লিশ। পঁচিশ বছর আগে স্কুলের উঁচু ক্লাসে এক সহপাঠী বৃদ্ধুকে দিয়ে পিঠ চুলকিয়ে নেওয়ার সময় শিক্ষকের হাতে নিগৃহীত হন। তখন থেকে গত আড়াই দশক কাল তাঁর জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত ব্যয়িত হয়েছে পিঠ চুলকানির উপর গবেষণা করে।

প্রথমে কুকুর বিড়াল গরু ইত্যাদি জীব-জন্তুর পিঠ চুলকানোর পদ্ধতি নিয়ে সময় অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন জাতের কুকুরের পিঠ চুলকানোর কায়দার উপরে তিনি প্রায় সাড়ে চার হাজার আলেখ্যচিত্র তুলেছিলেন—উনিশশো পঞ্চাশ থেকে ষাট সাল এই পাঁচ বছরের মধ্যে। এই সব ফটো থেকে বাছাই করে একশো ছবি নিয়ে কলকাতা, লন্ডন এবং নিউইয়র্কে বিদ্যানাথ গত দশকের গোড়ার দিকে একাধিক প্রদর্শনী করেন। প্রদর্শনীগুলির নামকরণ করা হয়েছিল, 'কুকুরেরা পারে মানুষেরা পারে না।' প্রদর্শনীগুলি খুব সার্থক হয়েছিল, কিন্তু লন্ডনে এক কুকুর-বৎসলা পাগলিনী মেমসাহেব এই ফটোগুলি কুকুর নির্যাতনের দৃশ্য ভেবে সহসা অতর্কিতে বিদ্যানাথকে ছাতা পেটা করেন। দুটি শক্ত আঘাত লেগেছিলো বিদ্যানাথের কাঁধের হাড়ের ওপরে। বিলেতের বিখ্যাত পুলিশেরা ছুটে এসে বিদ্যানাথকে রক্ষা করে।

এই ঘটনার পরে প্রায় দুই সপ্তাহ বিদ্যানাথ কাঁধের ব্যথায় খুব কষ্ট পান। বিলিতি ডাক্তারেরা (সকলেই বাঙ্গালী) এক বাক্যে বললেন, কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে, জোড়া লাগাতে তিনমাস লাগবে। কিন্তু বিদ্যানাথের নানা কারণে অতদিন লন্ডনে থাকার উপায় ছিলো না। ফলে দিন কুড়ির মধ্যে কাঁধের হাড় জোড়া না লাগিয়েই তিনি দেশে রওনা হন।

পথে বিমানের ভিতরে তাঁর পিঠ চুলকে ওঠে, বিদ্যানাথ একবার ভাবে আকাশ-সেবিকাকে ডাকবেন তাঁকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু কি ভেবে একটু অস্বস্তি-বোধ করে নিজেই কাঁধের পিছনে হাত ঘুরিয়ে পিঠটা চুলকিয়ে ফেলেন। এবং সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করেন কাঁধের হাড়ের জোড় খুলে যাওয়ার ফলে যদিও সামান্য কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এখন তিনি তাঁর পৃষ্ঠ-দেশের যত্রতত্র দুটি হাতই ঘুরিয়ে নিতে পারছেন এবং চমৎকার চুলকোতে পারছেন।

এইভাবে এরকম কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় বিদ্যানাথ চমৎকৃত হয়ে পড়েন। এবং এখন পর্যন্ত চমৎকার-ভাবে নিজের পিঠ নিজেই চুলকিয়ে যাচ্ছেন।

উপরি গত পনেরো বছরে নানাভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা করে এত অভিজ্ঞতা হয়েছে যে তিনি যেকোনো ব্যক্তির কাঁধের হাড় এখন নিমেষে কক্ষচ্যুত করতে পারেন।

ফলে সেই ব্যক্তি অতি অনায়াসে তাঁর পিঠের যেকোনো জায়গা নিজেই চুলকিয়ে নিতে পারেন। এর জন্যে বিদ্যানাথবাবু ব্যবহার করেন একটি বিলিতি লেডিস ছাতা। প্রতি ব্যক্তির জন্যে একটি করে ছাতা দরকার। কারণ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ছাতা ভেঙে যায়। ছাতার দাম পড়ে দেড়শো টাকা, বিদ্যানাথের ভিজিট আড়াইশো, মোট চারশো টাকা খরচা।

সহজে পিঠ চুলকানোর এরচেয়ে সুলভ উপায় আর কি হতে পারে।

তারাপদ রায়

মনের অসুখ

—নিজেকে ভাল না বেসে কি অন্যকে ভালবসা যায়? নিজেকে ভালবাসা কি স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা? কোন, ভালবাসা স্বার্থপরতা নয়? সদাশয়তা পরার্থিতা, নিঃস্বার্থপরতা—এইসব গালভরা নাম শুনতে বেশ, বলতেও বেশ। কিন্তু আসলে এ সব কথার জাদু শুধু নিজেকে আর অন্যকে মোহিত করার মন্ত্র। আমরা যা কিছু করি সবই আত্মতৃপ্তির তাগিদে। বিপন্ন বন্ধুকে সাহায্য করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি, নিজেকে ঐ বন্ধুর চেয়ে অন্যের চেয়ে উঁচু দরের জীব মনে করি। এর মধ্যে আত্মপ্রেম, স্বার্থপরতা ছাড়া আর কি আছে বলতে পারেন?, কোনো মিশনের মহারাজকে আপনি যখন মোটা অঙ্কের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, আপনি তখনই অনেকখানি সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হলেন। পরার্থিতা ইংরিজিতে যাকে অলট্রুইজম বলা হয়, আসলে অহম্মন্যতার ছদ্মবেশ নয় কি? মা সন্তানকে ভালবাসে নিজের তাগিদে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আপনি সামাজিক হিতের জন্য টাকা খরচ করেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেন কেন? পরিবর্তে নিরাপত্তা চান, নাম চান, যশ চান—তাই নয় কি? শিবপতি মন্দির, ধর্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আত্মবিস্তৃপ্তির জন্যে। বিজ্ঞাপনে লক্ষ টাকা খরচ করে কোটি টাকা রোজগার করার জন্যে। আবার দুর্বল মানুষ অন্যকে ভালবাসে বা ভালবাসার ভান করে তার কাছ থেকে ভালবাসা বা বিপদে আপদে সাহায্য পাবার আশায়। তাই নয় কি?.....

এইভাবে একটানা খানিকক্ষণ বকে যাবার পর চন্দ্রকান্তবাবু চুপ করলেন। সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন এবার চোখ নীচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনের গেলাস থেকে এক ঢোক জল পান করলেন। কিছুদিন আগে চন্দ্রকান্তবাবুর এক বন্ধু ওঁকে নিয়ে আমার কাছে আসেন এক বিশেষ সমস্যা সমাধানে আমার সাহায্যের জন্য। সমস্যাটা প্রথমত চাকরী নিয়ে, দ্বিতীয়ত স্ত্রীকে নিয়ে। বছর পাঁচেক আগে নমিতার সঙ্গে আলাপ হয় দারজিলিং এ বেড়াতে গিয়ে। চন্দ্রকান্ত একটা নামকরা কলেজের লেকচারার ডকটরেট-এর জন্য গবেষণা করছেন। আর নমিতা পড়া শেষ করে মফঃস্বলের একটা প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারী নিয়েছে। চন্দ্রকান্তের মাসীর সঙ্গে নমিতার মায়ের অনেক কালের বন্ধুত্ব। সেই সূত্রে প্রথম পরিচয় হয়। মাসীর নিমন্ত্রণেই চন্দ্রকান্ত দারজিলিং এসেছিলেন, আর নমিতা এসেছিল স্কুলের কিছু ছাত্রীকে নিয়ে। দুই দলই একই হোটেলে বাসা নিয়েছিলেন। নমিতা মেয়েটিকে মাসীর খুবই পছন্দ। আজকালকার মেয়েদের মত পুরুষালী হাবভাব নেই। আবার আগের দিনের মত লজ্জাবতী লতাও নয়। ছোটখাট্টো সপ্রতিভ সুশ্রী মেয়েটিকে দেখলে সবারই ভাল লাগবে। বিধবা মা ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই। মা দেশের বাড়ি আগলে পড়ে আছেন! বোনপোটিকে মাসী মানুষ করেছেন ছোটবেলা থেকে। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলার দাঙ্গায় চন্দ্রকান্তের বাড়ীর সবাই নিহত হন। গ্রামের অন্যান্য শরণার্থীদের হাত ধরে সাত বছরের ছেলে এপার বাংলায় এসে মাসীর সংসারে আশ্রয় পায়। মাসীর ছেলেমেয়েরা এখন বিয়ে-থা করে নানা জায়গায় ঘর বেঁধেছে, চন্দ্রকান্তকে সংসারী করতে পারলেই মাসী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। দারজিলিংয়ে আসার উদ্দেশ্য নমিতার সঙ্গে চন্দ্রকান্তের মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা করা। চন্দ্রকান্তের লম্বাচওড়া চেহারা দেখলে বোঝা যাবে না যে তিনি লাজুক আর ঘরকুনো। পোস্টগ্রাজুয়েট ক্লাসেও কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন নি। ছেলেবন্ধুও তাঁর খুবই কম। সমবয়সী ছেলেমেয়ের চেয়ে প্রৌঢ় শিক্ষক ও শিক্ষকস্থানীয়দের সঙ্গে তাঁর বেশি পরিচয়, তাঁদের সাহচর্য ও তাঁদের সঙ্গে গুরুগম্ভীর আলোচনাতে বেশি আনন্দ পান। ছাত্র হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম থাকলেও তাঁর সাহচর্য কেউ কামনা করত না। ভাঁর দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে অপ্যায়নের হাসি কদাচ ফুটে উঠতো বলে সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলত। আর সেইটেই বোধ হয় চাইতেন চন্দ্রকান্ত। দারজিলিং-এর আবহাওয়া, অথবা নমিতার ব্যবহার যে কোনো কারণেই হোক চন্দ্রকান্তের মুখে ঘন ঘন হাসি ফুটতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় ফিরে এসে মাসীমা দুই হাত এক করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। মফঃস্বলের স্কুলের চাকরী ছেড়ে নমিতা, শহরতলীর একটা নতুন স্কুলে চাকরী নিয়ে সেখানেই একটা ছোট ফ্ল্যাটে বিবাহিত জীবনযাত্রা শুরু করল। কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্যা দেখা দিল।

সেদিন শনিবার। নমিতা স্কুল থেকে এসে গা ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। দরোজা খুলতেই দেখে যে, চন্দ্রকান্ত দুজন ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। জামা ছেঁড়া, চোখে আঘাতের চিহ্ন, চুল উড়ছে। ভয়ে ওর বুক কাঁপতে লাগল। ছেলেরা 'স্যারকে' বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে নমিতাকে যে বিবরণ দিল তা শুনে হতবাক হয়ে গেল নমিতা। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। বিতর্ক সভায় চন্দ্রকান্তের উন্মাদের মত আচরণ শিক্ষক, ছাত্র সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। একজন সতীর্থ তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ করায় চন্দ্রকান্ত নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে তাঁকে এলোপাথাড়ি ঘুসি মারতে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি। তখন কিছু ছাত্র তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে বেদম প্রহার করেছে। ছাত্রদের ধারণা 'স্যার' এ, জি, অর্থাৎ সতীর্থ অমল ঘোষের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়ে এই অদ্ভুত আচরণ করেছেন। একথাও তারা জানাতে ভোলেনি যে, চন্দ্রকান্তবাবু বোধহয় নেশা করেছিলেন কেননা সে সময় তাঁর পা টলছিল, কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে গাঁজলা বেরুচ্ছিল।

ছাত্ররা চলে যাবার পর যখন ডাক্তার এলেন, তখন চন্দ্রকান্ত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ডাক্তার চন্দ্রকান্তের বন্ধুস্থানীয়। তিনি নমিতাকে জানালেন যে, আগের দিন সন্ধ্যায় চন্দ্রকান্ত রাত জেগে পড়াশুনো করার জন্য তাঁর কাছে কিছু ওষুধ চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ওষুধ খেয়ে রাত জাগার পক্ষপাতী নন, তাই কোনো ওষুধ দিতে রাজী হননি। ঘটনাটা তিনি আগেই শুনেছেন, এবং তাঁরও ধারণা হয়েছে কোনো 'ড্রাগ' বেশি পরিমাণে খাবার ফলেই তিনি এই উন্মাদের মত আচরণ করেছেন। ভদ্র নম্র লাজুক স্বভাবের চন্দ্রকান্তের পক্ষে এই আচরণ অন্য কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

চব্বিশ ঘণ্টার মত বিশ্রামের পর চন্দ্রকান্ত সুস্থ হয়ে উঠলেন। লজ্জার ভাব

কেটে যাবার পর তিনি স্বীকার করলেন যে তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছিলেন না তাই স্নায়ুউত্তেজক একটা ওষুধের বেশ কয়েকটা বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নিয়েছেন। এতদিন তিনি সভাসমিতি এড়িয়ে এসেছেন বিশেষ করে বিতর্ক সভা সম্বন্ধে তাঁর মনে চিরকাল দারুণ ভয়। নমিতার সঙ্গে বিয়ে না হলে তিনি বিতর্ক সভায় যোগ দেবার কথা চিন্তাই করতেন না। নমিতাকে তিনি দুএকটা সভায় 'ডিবেট' করতে দেখেছেন আর তাঁর মনে হয়েছে তিনি যদি ওর মত সহজ অথচ দৃঢ়ভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে না পারেন, তা হলে নমিতার চোখে তিনি ছোট হয়ে যাবেন। নমিতা এই ছেলেমানুষী কথা শুনে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল, তাঁর চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে আদর করতে করতে জানাল যে তর্কাতর্কি করতে পারাটা খুব একটা বাহাদুরীর ব্যাপার নয়। ও-সব না করতে পারলেও চন্দ্রকান্ত তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন না। চন্দ্রকান্ত প্রতিজ্ঞা করল যে আর এ দুষ্কর্ম তিনি করবেন না। কিন্তু তিনি কথা রাখতে পারেননি। ঐ ঘটনার পর থেকে তিনি 'রিটালিন' জাতীয় উত্তেজক ওষুধ খেয়েই চলেছেন, প্রথমে দিনে দুএকটা বড়ি তারপর ডোজ বেড়ে বেড়ে এই চার বছরে প্রায় এক ডজনে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে খুবই সংগোপনে, স্ত্রীকে না জানিয়ে খেতেন এখন আর লুকোচুরির বালাই নেই। বিতর্ক সভায় যোগ দেবার প্রয়োজনে নয়। সেদিনকার ঐ লজ্জাকর আচরণের পর কলেজে ছাত্র ও শিক্ষকদের কাছে মুখ দেখানোর প্রয়োজনে তাঁকে ওষুধের সাহায্য নিতে হয়েছে পরে লেকচার দেবার প্রয়োজনে ওষুধের দরকার হয়েছে। এখন ওষুধ ছাড়া একদিনও চলে না, আবার ওষুধ খেয়েও তিনি নিজেকে চালু রাখতে পারেন না। সব সময়েই পা টলে, হাত কাঁপে, জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন। কলেজের ও পাড়ার সকলেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। বিভাগীয় বড়কর্তা ও অধ্যক্ষ তাঁকে স্নেহ করেন, তাঁরা ছ মাসের ছুটির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এই শর্তে যে এর মধ্যে তিনি চিকিৎসা করে এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হবেন; অন্যথায় চাকরী থাকবে না। নমিতাও জানিয়েছে যে ছ মাসের মধ্যে নেশা না ছাড়লে ও স্বামীকে পরিত্যাগ করবে।

এই ইতিহাস আমি চন্দ্রকান্তবাবুর বন্ধু ও নমিতার কাছ থেকে সংগ্রহ করি। নমিতা মেয়েটি বেশ দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতী। প্রথম দিনই ও আমাকে খুব অল্প কথায় জানালো যে, সব রকম চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। তিন বছরের বাচ্চা মেয়ে ঝুমুরের মাথা ছুঁয়ে প্রতিদিন শপথ করেন চন্দ্রকান্তবাবু আর পিল খাবো না, আর পিল খাবো না, আর পিল খাবো না। দুটো দিন বড় জোর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন, তারপর যা ছিলেন তাই। ডাক্তাররা আবার আস্কারা দিয়ে ওঁর অভ্যাসটা কায়েমী করে দিচ্ছেন। তাঁরা বলেন—হঠাৎ একসঙ্গে ছেড়ে দিলে 'উইথড্রয়াল সিম্পটম' দেখা দিতে পারে, একটু একটু করে মাত্রা কমিয়ে ছাড়তে হবে। একবার নার্সিং হোমে তিন মাস আটকে রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে; বেরিয়ে এসে দু একদিন বাদেই আবার যথারীতি নেশায় মেতেছেন। এত ওষুধ পান কোথা থেকে? ঐ ওষুধগুলো তো বিনা ব্যবস্থাপত্রে দেবার কথা নয়। নমিতা হেসে বলল, টাকা দিলে এই শহরে সবই পাওয়া যায়। এই তার শেষ চেষ্টা। এর পর আর কান্নাকাটিতে ভুলবে না। ঝুমুরকে নিয়ে ও দেশে মার কাছে চলে যাবে। ঐ স্বার্থপর অমানুষের মুখ দেখতেও তার ঘৃণা হয়।

চন্দ্রকান্তবাবুর সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম চাকরী হারানোর ভয়ের থেকে স্ত্রী-কন্যাকে হারানোর ভয়টাই তাঁকে বেশি করে পেয়ে বসেছে। আমাকে তিনি নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে তিনি নিজেকে ভালবাসেন বটে, কিন্তু স্ত্রীকন্যাকেও ভালবাসেন। মাসীমাকেও ভালবাসতেন। তাঁর অভিযোগ নমিতাই তাঁকে ভালবাসে না, সে সব বিষয়ে নিজেকে তাঁর থেকে বড় মনে করে।

আমি তা আগে এমন ছিলাম না। লজ্জা ভয় আমার ছিল বটে। কিন্তু ক্লাসে লেকচার দিতে ভয় হত না, তার জন্যে পিল খেতে হত না। নমিতা চলে গেলে আমি কার কাছে থাকব? মাসীমা বেঁচে থাকলে আমি এত ভাবতাম না, আমি নিশ্চিন্ত মনে তাঁর কাছে থাকতে পারতাম। ও বলে, আমি নাকি পশুর মত শুধু নিজেকেই ভালবাসি, ওকে ভালবাসি না। ঝুমুরকে ভালবাসি না। নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে পিল খাই। ওদের ভালবাসি। অবিশ্যি তা ওরা বুঝতে পারে না। বলে ওদের নিয়ে বেড়াতে যাই না সিনেমায় যাই না জিনিস কিনে দিই না।

—মাঝে মাঝে আপনি ওদের মারধোর করে থাকেন শুনলাম।

একদিন, কি বড়জোর দুদিন। ডাক্তার আমাকে তিন বড়ি করে খেতে বলেছিল। ও আমার বরাদ্দ ডোজ দেয়নি, তাই একটা পেপারওয়েট তুলে—এই বলে মুঠো থেকে গোটা কতক বড়ি মুখে পুরে, আর এক ঢোক জল খেলেন ভদ্রলোক। আমি ইচ্ছে করেই বাধা দিলাম না। ওকে প্রাণখুলে কথা বলতে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

—ছোট মেয়েটার হাত মচকে দিয়েছিলেন একদিন।

—সেতো 'একসপেরিমেন্ট'। আমি দেখতে চেয়েছিলাম ঝুমুর নিজেকে ভালবাসে কিনা। হাত মুচড়ে ধরলাম, ও চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, বুঝলাম ও নিজেকে ভালবাসে আমি নিজেকে ভালবাসি, ঝুমুরকেও ভালবাসি, নমিতাকেও ভালবাসি।

এতক্ষণে 'ড্রাগের' ক্রিয়া শুরু হল। জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে টেনে চন্দ্রকান্ত বলতে লাগলেন : যাদের ব্যক্তিত্ব অসম্পূর্ণ, যারা নিজেকে ভালবাসে না, তারা অন্যকেও ভালবাসতে পারে না। বৃষ্টির জলের মত ভালবাসা ঈশ্বরের করুণা। নদীনালা ছাপিয়ে যাবার পরই জলধারা উপচে উঠে পড়ের সব কিছুর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করে। ভালবাসাও তেমনি নিজেকে ছাপিয়ে অন্যকে

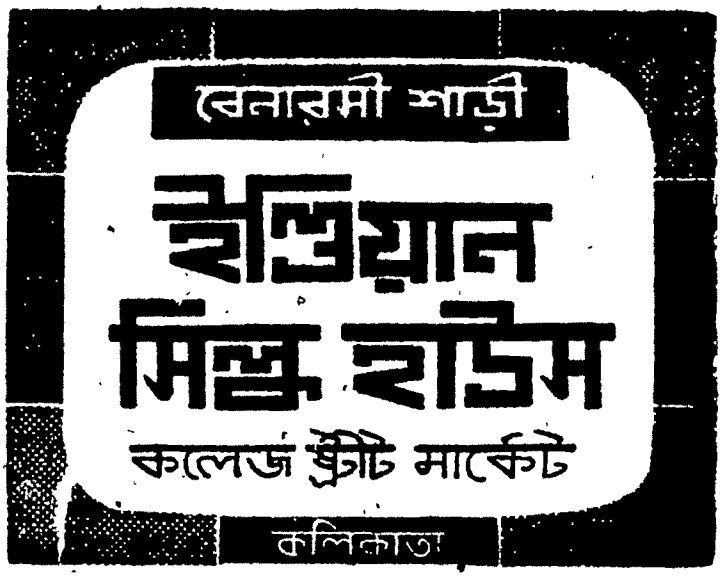

সঞ্জীবিত করে। নিজেকে ভালবাসা স্বার্থপরতা কেন হবে? নিজেকে ভাল না বাসলে অন্যকে ভালবাসব কি করে? আমি নিজের মধ্যে প্রেমের দেবতাকে অনুভব করি। আমার মন ভালবাসায় ভরা। দেহ-মন উপচে সেই ভালবাসার ধারা নমিতাকে ঝুমুরকে স্নান করিয়ে দেবে—কিন্তু নমিতা আমাকে সুযোগ দিচ্ছে না।

একটা হতাশার ভঙ্গি করে চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়লেন। নেশা ওঁর ভালমতই হয়েছে।

—আপনি কি সত্যিসত্যি ভালবাসতে পারেন? যে ভালবাসে সেতো অন্যের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারে। আপনি যাদের ভালবাসেন, তাদের অনুরোধে তুচ্ছ নেশাই ছাড়তে পারছেন না! এ কি রকমের ভালবাসা!

—আমি নেশা কেন, সব ছাড়তে পারি, কিন্তু একটি শর্তে।

কি সেই শর্ত?

চোখের পাতা জুড়ে আসছে, অতি কষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : এই সভ্য

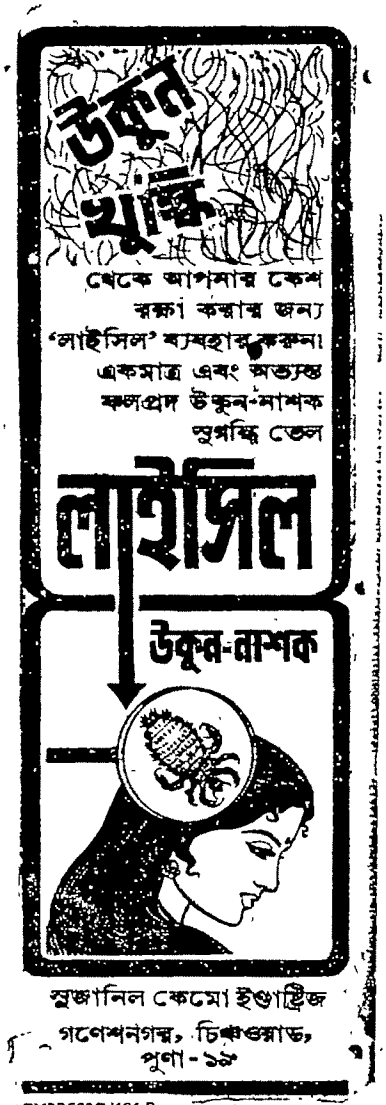

মানুষের সমাজ থেকে আমাকে বাইরে কোথাও যদি নিয়ে যায়, আমি নেশা ছাড়তে পারি। আমি এইসব মানুষের মধ্যে থাকতে চাই না। কোনো পাহাড়ের গুহার মধ্যে, কিম্বা কোন জনহীন দ্বীপের মধ্যে গিয়ে থাকলে আমি নেশা ছাড়াই বাঁচতে পারি। আমি এই বেশাবেশি, এই প্রতিযোগিতার সমাজে থাকলে বাঁচবো না।

—সমাজের বাইরে কি কেউ থাকতে পারে?

—সমাজ ছাড়াই মানুষ বাঁচতে পারে, নিজেকে জানতে পারে, চিনতে পারে।

—ঈশ্বর ছাড়া কেউ তা পারে না।

—তা হলে আমি ঈশ্বর। ...চন্দ্রকান্ত চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে উঠলেন। স্থির দৃষ্টিতে সামনের ছবিটার দিকে তাকিয়ে বলে চললেন : তা হলে আমি ঈশ্বর, আমি এ যুগের ঈশ্বর। সমাজের বাইরে আমি বেঁচে থাকব। বিশ্বসৃষ্টির অনেক আগে আমি আমাকে, আমার ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছি। আমি আমার সেই অজাতশত্রু মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমি, আকাশ আর সমুদ্র। আমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে, আমার ব্যক্তিত্বকে খর্ব করতে, আমার আত্মজনকে হত্যা করতে—অন্য কোনো প্রাণী তখনও সৃষ্টি হয় নি। মাঝে মাঝে পিল খেয়ে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। বিশাল এক রণক্ষেত্র, হতাহতের চিৎকার ছাপিয়ে মুহুর্মুহু কামান গর্জে উঠছে। বিরাট এক ট্যাঙ্কের কামানের ওপর দাঁড়িয়ে খোলা ডালোয়ার হাতে আমি চলেছি। এক-চক্ষু দৈত্যের মত সামনের সার্চলাইট থেকে আলো ফেলে গর্জন করে ছুটে চলেছে ট্যাংক। সারিবাঁধা ক্ষুদে মানুষের দল মাটিতে শুয়ে পড়ে আমার কাছে, তাদের ঈশ্বরের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইছে। ট্যাঙ্কের ঘর্ঘর শব্দ ছাপিয়ে তাদের কাতর আর্তনাদ আমার কানে পৌঁছচ্ছে না। আমি ওদের জীবনবিধাতা, ওরা আমাকে হিংসে করে ভয় করে। কিন্তু আমি ওদের জীবন ভিক্ষা দিতে পারি না, তাহলে আমি বাঁচব না। আমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে আমাকে ওরা—আমাকে ওরা—

কথা একেবারে জড়িয়ে গেল। টলতে টলতে পাশের সোফায় গিয়ে দেহটা এলিয়ে দিলেন চন্দ্রকান্তবাবু। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের কোণে জল। সোফায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাঁপাতে লাগলেন।

*

পরের দিন অনেকটা শান্ত দেখলাম চন্দ্রকান্তকে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাবার হত্যাকান্ড বালক চন্দ্রকান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন। টুকরো টুকরো করে তাঁকে কেটে ফেলতে দেখেছেন। তখন তিনি উঠোনের একপাশে খড়ের গাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন। দেখতে দেখতে বোধহয় চেতনা হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে মনে পড়ে পাড়ার এক প্রৌঢ়ার কোলে নৌকোর মধ্যে বসে। তিনি আরও বললেন, তাঁরা গ্রামের জমিদার ছিলেন, তাঁর ঠাকুরদার আমলে নাকি গরীব প্রজাদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

—এক প্রজন্মের ঋণ অন্য প্রজন্মে শোধ করেছে প্রজারা—এই সব ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারি?

অনেকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। মনে হল বোধ হয় সেদিন পিল খেতে ভুলে গেছেন।

—সকলকে আমি হিংসে করি, ভয় করি। নমিতাকেও হিংসে করি বোধহয়। নিজেকে হীন মনে হয়, অভিশপ্ত মনে হয়। বিয়ে না করাই বোধহয় ভাল ছিল। কিছুতেই আমি নিজেকে নমিতার সমকক্ষ ভাবতে পারি না। এই পিল খাওয়া ছাড়া অন্য কোনো অসামাজিক কাজ সজ্ঞানে করেছি বলে মনে পড়ে না। তবু কেন মনে হয় আমি কলঙ্কিত। আমাকে হারিয়ে দেবার জন্য, হীন প্রতিপন্ন করার জন্য সকলেই ষড়যন্ত্র করছে? মনে হয়, প্রথম দিন থেকেই অমল ঘোষ আমাকে কুপ্পার চোখে দেখছে। তাই তো সেদিন পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম ওকে শাস্তি দিতে। বিয়ের পর নমিতা অতিমাত্রায় সহানুভূতি দেখাত, বড্ড বেশি ভালবাসার কথা বলত। আমি সহ্য করতে পারতাম না। মনে হত সব বানানো, সব সাজানো। নমিতাকে আমি মিথ্যে বলেছি, বিতর্ক-সভার অনেক আগে থেকে, বিয়ের পরদিন থেকেই আমি পিল খেতে শুরু করি। এম-এ পরীক্ষার সময় এক বন্ধুর পরামর্শে কিছু-দিন রাত জাগবার জন্য ঐ পিল খেয়ে-ছিলাম। বিয়ের পর মনে হল, পিল না খেয়ে আমি নমিতার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে পারব না, ওর গায়ে হাত দিতে পারব না, ওকে চুমু খেতে পারব না। তখন শুধু সন্ধ্যার সময় এক আধটা খেতাম। সেদিন বিতর্ক সভার আগে গোটা চারেক একসঙ্গে খাই। তারপর যখন অমল ঘোষ আমার থিসিসের বিষয় নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দিতে শুরু করল, আমি আধ ঘন্টার মধ্যে অন্যের অলক্ষ্যে আরো গোটা চার পাঁচ পিল খাই। 'আত্ম-প্রেমও করুণা' —এই নিয়ে আমার গবে-ষণা। ডাক্তারবাবু, আমি কি সুস্থ হতে পারব, পিল ছাড়তে পারব?। নমিতা আমাকে হয়তো অনুকম্পার চোখে দেখে, হয়তো ভালবাসে না।। কিন্তু আমি ওদের ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারব না। আমাকে এই মারাত্মক আসক্তির হাত থেকে কি বাঁচাতে পারবেন?

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

(আঠারো)

দু-এক মিনিট চুপ করে থাকার পর মনে হলো হাজার হোক ওরা আমাকে দেখতে এসেছে। আমার এভাবে চুপ করে থাকা ঠিক নয়। কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করলাম কি খেতে ইচ্ছে করছে?

ও জবাব দেবার আগেই বললো—না না ও কিছু খাবে না। একটু আগেই ও খেয়েছে।

আমি একটু হেসে বললাম—আমি জানি আপনি ওর দিদি। ওকে শাসন করার অধিকার আপনার আছে কিন্তু এখানে সামান্য কিছু খেলে, বোধহয় খুব অন্যায় হবে না।

আশা করছিলাম কোন গুরু-গম্ভীর জবাব শুনব কিন্তু তা শুনতে পেলাম না। আলপনা হাসতে হাসতে বললো—এই সামান্য কটা মাস দু-চারটে ছাত্র-ছাত্রী পড়াতে না পড়াতেই বেশ ত মাষ্টারমশাইদের মত কথা বলতে শিখেছেন।

ভেবেছিলাম গম্ভীর হয়ে থাকব কিন্তু সম্ভব হলো না। চাপা হাসি হাসতে হাসতে বললাম— কুলীন না হলে কি বামুন হওয়া যায় না?

আলপনা এবার আর হাসি চাপতে পারল না। একটু জোরে হাসতে হাসতে বললো—আপনি যে টোলবাড়ীর পন্ডিতদের মত কথা বলছেন!

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল এই দিদি টোলবাড়ী কাকে বলে রে?

আলপনা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিডিমিডি পন্ডিতদের স্কুল।

আমি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করলাম এখুনি নৃপতি এসে জিজ্ঞাসা করলে কি আনতে বলব?

ও আনতে চাইলেই আনতে দিতে হবে?

আমি কিছু না বললেও নৃপতি কিছু না এনে পারবে না।

তাহলে চা আনতে বলবেন।

শুধু চা?

তা হয় না। আপনি মিষ্টি না নোনতা ভালবাসেন?

আমার কথা শুনেও বুঝতে পারছেন না?

একটু লজ্জিত হয়ে বললাম—মেয়েরা সাধারণত নোনতাই ভালবাসে।

একটু সহজ হয়ে আলপনা বললো সামান্য কিছু নোনতা আনতে দিন।

আমি উঠে গিয়ে নৃপতিকে দুটো চিকেন কাটলেট আর কটা সন্দেশ আনতে বলে এলাম।

আমি ফিরে আসতেই আলপনা বললো, আপনার মেসটা বেশ ভাল।

ভাল মানে?

সাধারণ মেসবাড়ীর মত জোর হৈ-হুল্লোড় নেই।

একদম না।

আপনি কি এখানে অনেক কাল আছেন?

না না, এইত মাত্র কয়েক মাস।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কিন্তু মেসের সবার কথাবার্তা ব্যবহার দেখে মনে হয় আপনি এখানকার পুরোনো বাসিন্দা।

আমি একটু হেসে বললাম—হ্যাঁ মেসের সবাই আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এই অসুখের সময় তা আরো ভাল করে বুঝতে পেরেছি।

কল্পনা জিজ্ঞাসা করল, আপনার মেসে থাকতে ভাল লাগে?

খুব ভাল লাগে।

আলপনা জিজ্ঞাসা করল—বাড়ীর চাইতে মেসে থাকতে বেশী ভাল লাগে?

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বললাম—নিজের বাড়ীতে ত কোনদিন থাকিনি; তবে পরের বাড়ীতে থাকার চাইতে মেসে থাকা নিশ্চয়ই ভাল।

আমি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আলপনার মুখের চেহারা বদলে গেল। বুঝলাম, কথাটা বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু যে কথা বলে ফেলেছি তা ত ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। চুপ করে রইলাম।

অস্বস্তি থেকে বাঁচালো কল্পনা। জিজ্ঞাসা করল—প্রদীপদা, আপনি সারাদিন এই ঘরের মধ্যে থাকেন?

বললাম—এতদিন অসুস্থ ছিলাম বলে ঘরের মধ্যেই কাটিয়েছি। তবে আজই ডাক্তারবাবু বাইরে বেরুবার অনুমতি দিয়েছেন।

কল্পনা আবার জিজ্ঞাসা করল—আজ বেরিয়েছিলেন?

না। ভেবেছি কাল থেকে একটু একটু বেরুব।

আলপনা জিজ্ঞাসা করল আমরা না এলে আজই বোধহয় বেরুতেন?

না। এখন ঘরেই থাকতাম।

তাই কি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা আসব তা ত জানতেন না।

জানতাম না ঠিকই কিন্তু মনে মনে আশা করছিলাম কেউ না কেউ আসবেনই।

কথাবার্তা বলতে বলতেই নৃপতি ওদের জন্য চিকেন কাটলেট আর সন্দেশ এনে দিয়ে বললো একটু পরে চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

নৃপতি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলপনা বললো—এত খাবার কে খাবে?

ওয়ান কাটলেট প্লাস টু ছোট ছোট সন্দেশ—এত খাবার হয় না। চটপট খেয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমি একটা কাটলেটের প্লেট তুলে কল্পনাকে দিয়ে বললাম—তুমি শুরু কর। এবার দ্বিতীয় প্লেটা আলপনার সামনে ধরে বললাম—প্লীজ শুরু করুন।

একবার আমার দিকে তাকিয়ে আলপনা প্লেটটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল আপনি কি শুধু দর্শক হয়ে বসে থাকবেন?

আপনারা আসার একটু আগেই আমি দুধ আর বিস্কুট খেয়েছি। তাছাড়া এখন এসব খাবার খাওয়া ঠিক উচিত হবে না।

চা খাবেন ত?

নৃপতি দিলে নিশ্চয়ই খাব।

নৃপতিকে বলে দেব?

বলতে হবে না। মনে হয় এক কাপ চা পাবো।

তাহলে শুরু করব?

নিশ্চয়ই।

ওদের খাওয়া শেষ হতে না হতেই নৃপতির এক চেলা এসে তিন কাপ চা দিয়ে গেল।

কল্পনা বললো, আমি চা খাব না।

সঙ্গে সঙ্গে আলপনা বললো—ঠিক আছে আমি খেয়ে নেবো।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বুঝি চা খেতে খুব ভালবাসেন?

দাদু-দিদার আদরে মানুষ হয়ে আমি একেবারে গোল্লায় গেছি।

না, না, আমি তা বলি নি।

আপনি না বললেও আমি জানি আমি একটা রাস্কার বাঁদর তৈরী হয়েছি।

ওর কথা শুনে আমি না হেসে পারি না।

আলপনাও হাসে। বলে—হাসছেন কেন? এতক্ষণ আমার বাচালতা দেখেও বুঝতে পারেননি দাদু-দিদা আদর দিয়ে আমার বারোটা বাজিয়েছেন।

আমি হাসতে হাসতে বলি—যে বলে আমি পাগল, সে কখনই পাগল নয়।

দাদু-দিদা আমাকে পুরো পাগল বানাতে পারেন নি, তবে হাফ পাগল যে হয়েছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আপনি রিয়েলি ভেরী ইন্টারেস্টিং মেয়ে।

ইন্টারেস্টিং কিনা জানি না তবে হেসে খেলে জীবন কাটাতে আমার ভাল লাগে।

সেই ত ভাল।

কিন্তু হেসে-খেলে জীবন কাটানরও সমস্যা আছে।

কেন?

আলপনা একটু থেমে বললো—শুনতে চান?

আপত্তি না থাকলে শুনতে পারি।

কোন কিছু বলতেই আমার আপত্তি নেই।

তাহলে বলুন।

একটু মুচকি হেসে ও বললো—তেমন কিছু নয়; তবে এই হেসে-খেলে কথা বলার জন্য অনেক ছেলেই ভাবে আমি তাদের প্রেমে পড়েছি।...

ভয় নেই, আমি সে ভুল করব না।

এসব কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না।

অন্য কেউ না পারলেও আমি পারি।

আলপনা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—যাক তাহলে আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলে মেশা যাবে।

কথায় কথায় আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। কল্পনা বললো—দিদি বাড়ী যাবি না?

আলপনা জবাব দেবার আগেই আমি বললাম—সত্যি কথায় কথায় আপনাদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। আপনাদের মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছেন।

আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো—পাঁচ মিনিটের ত রাস্তা। দরকার হলে মা ডেকে পাঠাতেন। যাই হোক আজ চলি।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—সময় পেলে আবার আসবেন।

আলপনা ওর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললো—আমার আবার সময়ের অভাব কোথায়? লেখাপড়ার ঝামেলা চুকে গেছে। এখন শ্বশুরবাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত আমার অফুরন্ত সময়।

ওর প্রত্যেকটা কথা শুনেই হাসি পায়। বলি আপনার কথা শুনতে বেশ লাগে।

বেশী উৎসাহ দেবেন না। তাহলে আমি মাথায় চড়ে বসব।

ওদের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসার পথে কার্তিকবাবু ডাকলেন প্রদীপ শুনে যাও।

ওর সামনে হাজির হতেই উনি বললেন—এই সন্ধ্যেবেলায় ঘরে বসে না থেকে একটু বাইরে ঘুরে এলে ত শরীরটা ভাল লাগত।

কাল থেকে বেরুব।

তবে কাল থেকেই আবার টিউশানি শুরু করো না।

আমি হেসে বললাম—না না সপ্তাহখানেকের আগে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে যাচ্ছি না।

আচ্ছা যাও।

উনি চলে যেতে বললেও আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম ভূতের মত চেহারার এই লোকটা আমাদের মেসের মালিক। সারাদিন চাল-ডাল তেল-নুন সব্জী আর মাছের হিসেব করেন। একটি পয়সার গরমিল হলে উনি বোধহয় তিন দিন দাড়ি কামান না। দেখে মনে হয় না, মানুষটার দেহের মধ্যে হৃৎপিণ্ড বলে কোন পদার্থ আছে। অথচ কি আশ্চর্য দরদী মন।

দাঁড়িয়ে আছো কেন? কিছু বলবে?

না কিছু বলব না।

তাহলে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম কর।

ঘরে ফিরে এসেও কার্তিকবাবুর চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। একটু পরে নতুন ছোকরা চাকরটা কাপ-প্লেট-গেলাস নিতে এলে হঠাৎ টেবিলের উপর দৃষ্টি পড়তেই দেখি একটা ছোট্ট লেডিজ পার্স। বুঝলাম ওরা ফেলে গেছে। একবার মনে হলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি। আবার মনে হল বস্ত কি? কাল ওরা কেউ না এলে ফিরিয়ে দিয়ে আসব। এসব ভাবতে ভাবতেই পার্সটা খুলে দেখি একটা একশ টাকার নোট আর একটা প্রেসক্রিপসন। বুঝতে পারলাম ওর মা ওষুধ কিনতে দিয়েছিলেন কিন্তু আলপনা ভুলে গেছে। একবার মনে হল ওষুধটা হয়ত আজই দরকার। পার্সটা এখুনি দিয়ে আসাই উচিত হবে কিন্তু এখন বেরুতে গেলেই কার্তিকবাবু চেপে ধরবেন। হয়ত বলবেন—যদি অত জরুরী হয় তাহলে ওরাই এসে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত পার্সটা নিজের কাছেই রেখে দিলাম।

আটটা বাজতে না বাজতেই ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল। নটার মধ্যেই শুয়ে পড়লাম কিন্তু এত সকাল সকাল কি ঘুম আসে? হঠাৎ মনে হল আলপনা মেয়েটা বেশ প্রাণখোলা হাসি-খুশী। শরতের মেঘের মত নির্মল ও স্বচ্ছন্দ। যতক্ষণ কাছে থাকে কথা বলে মনটা খুশীতে ভরে যায়। ওর কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম তা নিজেও জানতে পারলাম না।

(ক্রমশ)

বরং অন্যান্য বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ প্রশ্ন অর্থ-
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০
মহানায়ক মুজিবুর-অপ্রকাশিত অংশ-১৫ মহাজীবন-অপ্রকাশিত অংশ-২০
মোহন লাইব্রেরী : ১৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯

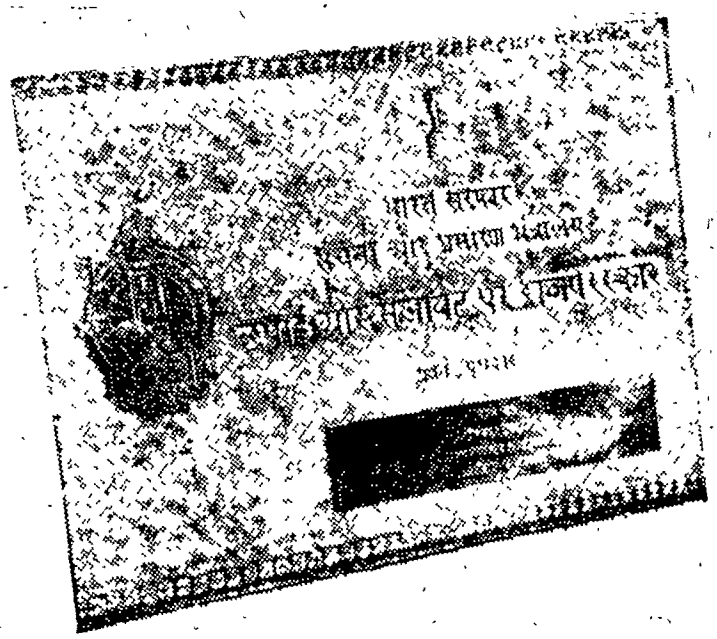

বছরের সেরা বিজ্ঞাপন কাজের (১৯৭৪-৭৫) জন্য ভারত সরকারের প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন ক্যারিয়ন ম্যাককানের বোম্বাই অফিস

*

প্রশান্ত সান্যাল

ক্যারিয়ন ম্যাক্‌কান অ্যাডভার্টাইজিং সার্ভিসেস লিমিটেড

'একজন মানুষ হিসেবে এ-দেশের আপামর জনতার স্বপক্ষে শ্রদ্ধা আছে কি নেই, এটাই আজকের দিনে জনসংযোগের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। জনসংযোগের প্রধান সমস্যাও বলতে পারেন। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, তাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের কাজকর্মের প্রতি আমাদের আস্থা, শ্রদ্ধা আছে কি নেই, এটাই বিচার্য বিষয়। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের মতো দেশে, এই আমরা অর্থাৎ তথাকথিত মুষ্টিমেয় মানুষ এখনও পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের সম্পর্কে একটা উন্নাসিকতা পোষণ করি, অন্য চোখে দেখি।

দ্বিতীয় বাধা, গত ২০।২৫ বছরের মধ্যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যে পরিবর্তন আনা উচিত ছিল, সেই পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এদেশের নেতা শ্রেণীর মানুষ এবং 'ম্যানেজেরিয়াল' শ্রেণীর লোকদের বিষয়ে যদি আপনি সমীক্ষা নেন, তাহলে দেখবেন, এঁদের মানসিকতা, চাল-চলন, মনোবৃত্তি প্রভৃতি সব ঠিক প্রায় আগের মতোই রয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ের সঙ্গে এখনকার মানসিকতার তফাৎ অত্যন্ত সামান্য।

—কি রকম? প্রশ্ন করার দরকার হল।

'আপনি লক্ষ্য করে দেখুন, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে অর্থাৎ ব্রিটিশ যুগে সেই ঔপনিবেশিকতার সময়ে একজন ম্যানেজারের বা এই শ্রেণীর মানুষের যোগ্যতার প্রধানতম মাপকাঠি ছিল—সেই লোকটির ভিতর কতখানি ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি আছে তা বিচার করা, এবং সাধারণ মানুষের জন্য নয় ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখার ক্ষমতা যার ভিতর যত বেশি ছিল তাকেই তত বেশী দক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা হোতো। আমাদের দেশে এখনও উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিদের বা ম্যানেজমেন্টের দিকের লোকদের মধ্যে ঐ প্রকার মানসিকতা, মনোবৃত্তি এবং ব্যবহার রয়ে গেছে। এগুলো দূর না হলে জনসংযোগের পথও প্রশস্ততর হতে পারে না।'

কথাগুলো বললেন এদেশের সম্ভবত বৃহত্তম বিজ্ঞাপন এবং জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীপ্রশান্ত সান্যাল। ভারতবর্ষে ইদানীং যারা প্রচারপদ্ধতি এবং জনসংযোগের মাধ্যম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, পরীক্ষানিরীক্ষা করছেন, তাঁদের অন্যতম প্রধান-পুরুষ শ্রীসান্যাল।

জনসংযোগ এবং প্রচারের বিষয় নিয়ে নানা দেশ-বিদেশ ঘুরতে হয়েছে তাঁকে।

নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতাও করেছেন। এখনও সর্বদা ব্যস্ত। এমনই তিনি ব্যস্ত যে এই নিবন্ধ-লেখক সাংবাদিককেও নানা স্থানে তাঁর খোঁজে বহুবার টেলিফোন মারফত যোগা-যোগ করে তবে মুখোমুখি বসবার সুযোগ করতে হয়েছে। জনসংযোগ এবং প্রচারের ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এঁদের মতো ব্যক্তিদের জীবনে, সেটাও উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ক্ল্যারিয়ন ম্যাকক্যান অ্যাডভার্টাইজিং অফিসের বাতানুকুল সুরুচিসম্পন্ন ম্যানেজিং ডিরেকটরের ঘরে বসে কথা বলছিলাম শ্রীপ্রশান্ত সান্যালের সঙ্গে। বেশ ছিমছাম ব্যক্তিত্বপূর্ণ গলায় কথা বলছিলেন। জানতে চাইলাম এই প্রতিষ্ঠানের কিছু গোড়ার কথা।

মুখে পাইপ টানতে টানতে বেশ কিছু-ক্ষণ আনমনে উপরের দিকে তাকিয়ে রইলেন শ্রীসান্যাল। তাঁর আয়ত সুন্দর গভীর চোখের সামনে তখন হয়তো ভাসছে অতীতের সেই দিনগুলোর কথা, সহকর্মীদের সেই নিষ্ঠা, সংগ্রামের কথা।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম আজ থেকে ২০ বছর আগে। কিভাবে তার জন্ম সেটাই আপনাকে বলা দরকার। এর আগে ডি জে কিমার অ্যান্ড কোম্পানি নামে এক ব্রিটিশ অফিস ছিল। ১৯৫৬ সালে হঠাৎ করে সেই কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। এইভাবে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কোম্পানি বন্ধ করে দেওয়ায় ১২০ জন কর্মচারী সম্পূর্ণ-ভাবে বেকার হয়ে পড়লেন। যখন এই ঘটনা ঘটল, তার কিছুদিনের মধ্যেই কর্ম-চারীরা নিজেদের সমবেত চেষ্টায় আর একটা এই ধরনের অফিস খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ যে চার পাঁচজন উদ্যোগী হয়ে এই কোম্পানি খুলেছিলেন, তাঁরা হলেন—স্যার ধীরেন মিত্র, স্বর্গত সুভাষ সেন, শ্রীশিবচন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুব্রত সেনগুপ্ত প্রভৃতি। প্রসঙ্গত বলা দর-কার, এঁরা এঁদের পূর্বতন অফিসের মাইনা, গ্র্যাচুইটি প্রভৃতি হিসেবে যা পেয়েছিলেন সর্বসমেত ৪৯ হাজার টাকাকে মূলধন করেই এই নতুন কোম্পানির সূত্রপাত করেন। এইভাবেই ক্ল্যারিয়ন ম্যাকক্যানের জন্ম। তারপর ধীরে ধীরে সকলের প্রচেষ্টায়, আমাদের নিষ্ঠা এবং কর্মদক্ষতার গুণে এই প্রতিষ্ঠান আজ সম্ভবত ভারতবর্ষের বৃহত্তম বিজ্ঞাপন সংস্থায় পরিণত হয়েছে। আজ এর কর্মচারী সংখ্যা চারশো। কলকাতা বোম্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ এবং ব্যাঙ্গালোরে পাঁচটি প্রধান অফিস। এছাড়া হায়দ্রাবাদ এবং গৌহাটিতেও আমাদের অফিস আছে।

কোনো প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে চাই না। তবুও একটা বাঙ্গালী সংস্থা যে আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বড় হতে পেরেছে, সেজন্য নিশ্চয়ই আমরা গর্ব করতে পারি।'

—এখন এই কোম্পানির মালিকানা কি সম্পূর্ণভাবে আপনাদের?

—হ্যাঁ, শুধু আমাদের বলে নয়, আপনি শুনলে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন, যাঁরা এখানে কাজ করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই এই কোম্পানির মালিক। আপনি কথাটাকে এইভাবে বুঝতে পারেন যে এখানে কোন ডমিনান্ট শেয়ার হোল্ডার নেই। সমবায় পদ্ধতির এরকম একটা প্রচেষ্টাকে সাফল্যে পরিণত করা, কম কৃতিত্বের নয়।

একটু আনত ভঙ্গিতে মুখ রেখে কথা বলছিলেন শ্রীসান্যাল। আমি প্রশ্ন করায় মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। —আপনাদের—প্রতিষ্ঠানের মূল কাজটা কি?

কথাটাকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে বেশ খুশির হাসি হাসতে হাসতে আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রশান্তবাবু—অর্থাৎ আমাদের প্রাণবস্তুটা কি? তাই না? ভাল প্রসঙ্গ। আমাদের প্রধান কাজ হল—ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটা সেতুবন্ধ তৈরি করা। আসলে 'বিজ্ঞাপন'—এই বস্তুটাকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। কেউ বলেন—'বিজ্ঞাপন হলো মিথ্যার বেসাতি।' কেউ কেউ বলেন—'বিজ্ঞাপন মানুষের অবচেতন মনের বাসনাকে জাগিয়ে তোলে।' এই ধরনের নানাপ্রকার উক্তির মধ্যে সত্যতা কিছু থাকলেও একথা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে সমগ্র দেশের, যে কোনো দেশেরই হোক না কেন, অর্থনীতিতে বিজ্ঞাপনের গুরুত্ব কম নয়। অর্থনীতিতে যখন প্রতিযোগিতা ক্রমেই বাড়ছে, তখন বিজ্ঞাপনের গুরুত্বও দিন দিন বাড়ছে বাড়বে। এমনকি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-গুলোতেও যেমন—সোভিয়েত রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশ-গুলোতেও আজ বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছে। ঐসব 'ওয়েলফেয়ার ইকনমি'তেও আজ বিজ্ঞা-পনের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে যেহেতু ঐ দেশগুলোর মানুষের মধ্যেও, কনজিউমারদের মধ্যেও, পণ্যের বাছাইয়ের এবং ভাল মন্দের বিচারের চেতনা বাড়ছে।

কথায় কথায় আমরা ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে এলাম।

—আচ্ছা মিস্টার সান্যাল, আমাদের মতো দেশে যেখানে শতকরা ৭০ জন লোকের অ আ ক খ কিংবা এ বি সি বর্ণের সঙ্গে

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী • ৩৫ এ, কলেজ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯
আগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠালে ভি পি অর্ডারে পাঠানো হয়।

অদ্বিতীয় ফরমুলা...অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে

প্রেপারেশন এইচ*
আমেরিকান ডাক্তারদের পরীক্ষা করে দেখা
• কয়েক মিনিটেই চুলকানি বন্ধ করে
• সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণার উপশম হয়
• খুব বাড়াবাড়ি না হলে, অপারেশন ছাড়াই অর্শের সঙ্কোচন করে
• পিচ্ছিল ক'রে মলত্যাগের কষ্ট কমিয়ে দেয়

বিনামূল্যে! অর্শ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ পুস্তিকার জন্যে আজই এই ঠিকানায় লিখুন (সঙ্গে ২৫ পয়সার ডাকটিকিট পাঠাবেন): ডিপার্টমেন্ট PH-88 পোঃ অঃ বক্স ১০১৩৩, বম্বে ৪০০০০১

*Regd. User of TM: Geoffrey Manners & Co. Ltd.
743-PH-92 BEN

পরিচয় ঘটেছে, সেখানে বিজ্ঞাপনের কার্যকারিতা বা ব্যাপকতা কতখানি?

আমার এই প্রশ্নে শ্রীসান্যাল কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। তারপর মুখ খুললেন।

খুবই ন্যায্য প্রশ্ন করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে, আমাদের দেশে এরকম নিরক্ষরতা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের দেশের বিশেষত গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর মানুষেরও যথেষ্ট বিচারবুদ্ধি রয়েছে এবং সেগুলো তাঁরা প্রয়োগও করেন। এর প্রমাণ আমরা দেখেছি। সুতরাং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও তাঁরা এই বুদ্ধি, চোখ, কান প্রয়োগ করতে পারেন। আমরা হিসাব করে দেখেছি, ভারতবর্ষের মতো দেশে ২০০ থেকে ২৫০ এমন কতগুলো গ্রাম, গঞ্জ বা শহরআছে অর্থাৎ কেন্দ্র আছে, যেখানে ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক লোক সপ্তাহে অন্তত একদিন যাতায়াত করে। এই জায়গাগুলোকে যদি যথাযথভাবে বিজ্ঞাপনের কেন্দ্র করা যায়, তবে সেগুলো প্রচারের খুব ভাল মাধ্যম হবে। ফলে ব্যাপকতাও বাড়বে।

—অশিক্ষিত মানুষদের জন্য প্রচারের ভাল মাধ্যম—অডিও-ভিসুয়াল পদ্ধতি। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি কি বেশ শক্তিশালী বলে আপনি মনে করেন?

—না। আপনি ঠিকই বলেছেন। শক্তিশালী করার জন্য সরকারী তরফ থেকে আরো সিনেমাহল, যাত্রা থিয়েটার মুক্ত খোলা উচিত যাতে গ্রামের মানুষ তার সুযোগ-সুবিধা নিতে পারে।

আবার অন্য প্রসঙ্গে এলাম। আলোচ্য সংস্থার কার্যপদ্ধতিতে।

বিজ্ঞাপন প্রচার ছাড়াও আপনারা আর কি কি করেন?

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে ডানলপের অভিনন্দন

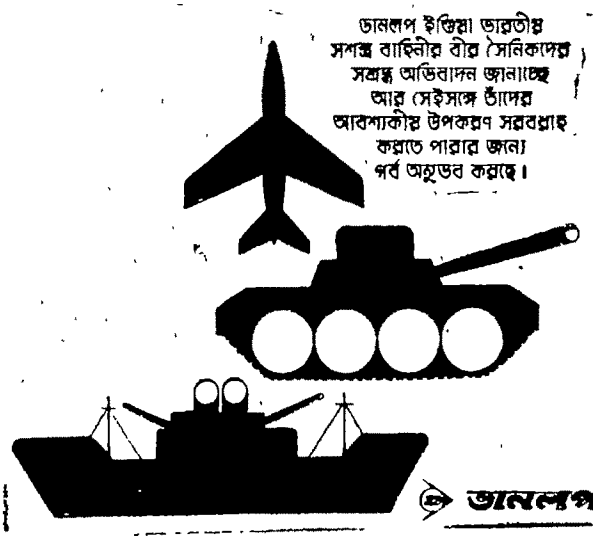

প্রশান্তবাবু বললেন—আমরা বিজ্ঞাপনের উপর নানা সমীক্ষা করি। তাছাড়াও রয়েছে 'বিহেভিয়ারাল রিসার্চ', মার্কেটিং রিসার্চ' প্রভৃতি। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কল্যাণের জন্য আমরা সর্বপ্রথম জনশিক্ষার উপর জোর দিই। সম্প্রতি আমরা সরকারকে পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে সবচেয়ে কম খরচে অথচ ব্যাপকভাবে প্রচারের পদ্ধতি সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা দিয়েছি। আমরা সব সময় মূলত দুটি জিনিসের উপর গুরুত্ব দিই। (১) সবথেকে কম খরচায় অথচ সর্বাপেক্ষা ব্যাপকভাবে জনগণকে এমন একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই, যা জনগণ চাইছে। (২) বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কি বললে এবং কিভাবে বললে জনগণকে শুধু আকৃষ্ট করাই নয়, কিভাবে তাদের অ্যাকশনে মুভ করানো যায়, সেটাই আমাদের মূল চিন্তা।

কথা প্রসঙ্গে প্রশান্তবাবু বললেন—দেখুন, মাঝে মাঝে শুনি, আমাদের দেশে বিজ্ঞাপনটা বাকি অপচয়। বিজ্ঞাপন কিছু নষ্ট হয় সত্যি কথা, তবে এটাও সত্যি যে ভারতবর্ষের মতো দেশে বছরে যে ৮০ থেকে ৯০ কোটি টাকা বিজ্ঞাপন এবং প্রচারে খরচ হয়—এই টাকাটাই কিন্তু বছরে ১০।১২ হাজার কোটি টাকার লেনদেনকে সম্ভব করেছে।

নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ। সাক্ষাৎকার শেষ। নমস্কার জানিয়ে উঠে এলাম।

আনন্দ রায়

রথীন মৈত্র

একালের চিত্রশিল্পী

চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পীর উপকরণ ও ধরন এক না হলেও দুয়েরই রসসৃষ্টিতে প্রধান বিষয়ে মিল রয়েছে। কেননা দুজনকেই মাথা ঘামাতে হয় প্রসঙ্গ ও আঙ্গিক নিয়ে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আঙ্গিককে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; তাই শিল্পের আদি থেকে আঙ্গিক নিয়ে এত ভাঙ্গাগড়া, এত পরীক্ষা নিরীক্ষা।

চল্লিশ দশকের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা গ্রুপ কিন্তু এ সম্পর্কে কোন বিতর্কে না গিয়ে পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় তাঁদের ইস্তাহারে বলেছিল—চিত্রকলার ক্ষেত্রে ভাতীয় ভাষা বলে কিছু থাকতে পারে না। কেবল জাতীয় সংস্কারকে রক্ষা কবচ করে ছবি আঁকা সমীচীন নয়। রং এবং রেখার যে মৌল ভাষায় ছবি কথা বলে থাকে এবং যে ছবির ভাষা পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল লোকে অনুভব করতে পারে, সেই ভাষাকেই ছবিতে মুখর করে তোলা প্রত্যেক সৎ শিল্পীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

বলাই বাহুল্য, সেই সময়ের শিল্পী-সমাজে এই ক্যালকাটা গ্রুপ তাদের সুচিন্তিত নয়া কর্মপদ্ধতি ও দুঃসাহসিক মনোভাবের জন্যে এবং নতুন ধরনের ছবি এঁকে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। যে কয়েকজন শিল্পী এই শিল্প আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে রথীন মৈত্রের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রথীন মৈত্রের শিল্প ভাবনার উন্মেষ ঘটেছিল জীবনের উষালগ্নেই। জন্মেছিলেন ১৯১৩ সালের ১০ই জুলাই পাবনা জেলার শীতলাইয়ের অভিজাত বংশে। পাবনা বেড়া ও রাজসাহীতে ছড়ানো ছিল শীতলাইয়ের ভূসম্পত্তি। পিতৃদেব যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন মনে-প্রাণে সাহিত্য, শিল্প ও স্বদেশী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ।

পাবনার দক্ষিণপ্রান্তে বিস্তীর্ণ পদ্মা। আর এক দিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। পিতৃদেব রথীনকে হাতধরে পদ্মার চরে নিয়ে যেতেন বেড়াতে। শিশু রথীন নদীর ধারের বিশালতার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। বোটে করে বেড়াতে যেতেন চর থেকে চরে। এ কূল থেকে আর এক কূলে। পদ্মার তীরে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত এতবার এত রকমভাবে দেখেছেন যে কোনদিন ভোলবার নয়।

জমিদার বাড়ীর গ্রন্থাগার ছিল একটা দেখার জিনিস। বাড়ীর সামনে সুন্দর বাগান। নানা ধরনের দেশী এবং সৌখীন গাছ সাজানো ছিল সযত্নে। দূর দূর থেকে মানুষ বাগান দেখতে আসত। এইভাবে অফুরন্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও অপর্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে রথীনের ছেলেবেলা।

বাড়ীর সামনে পদ্মা। পরপারে শিলাইদহ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে অপর পারের শিলাইদহের কাছাড়ীবাড়ী দেখা যেত কুয়াশার মত অস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথ অনেকবার শীতলাইয়ের জমিদার বাড়ীর বোট চেয়ে পরে বেরিয়েছেন পদ্মার বুকে। ছিন্নপত্রে এই বোটের উল্লেখ আছে। যাইহোক শিশু রথীন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন সৌম্যকান্তি, সুপুরুষ কবি রবীন্দ্রনাথের দিকে। পরে তিনি যতবারই শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন কবিগুরু ততবারই জিজ্ঞেস করতেন সেই সাজানো-গোছানো প্রকাণ্ড বোটের কথা।

সন্ধ্যেবেলায় বাড়ীতে বসত হর গানের আসর নয়তো সাহিত্যের আড্ডা। পাঁচ-ছয় বছরের রথীন তখন প্রকাণ্ড হলঘরের এক কোণে বসে জমায় হয়ে শুনতেন সবকিছু। অনেক রসিক ব্যক্তির পায়ের ধুলো পড়ত এই হলঘরে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে রাখালদাস, অক্ষয় মৈত্র, মানিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ আরও অনেকেই আসতেন। গল্প চলতেন ঘন্টার পর ঘন্টা। বালক স্তব্ধ হয়ে শুনতেন। মনে দীর্ঘ ছায়া পড়ত। তবে রবীন্দ্রনাথের কথাই বেশী করে মনে দাগ টানত। প্রবাসী বা মডার্ন রিভ্যুইতে ছাপা অবনীন্দ্রনাথ বা নন্দলালের ছবিতেও তিনি পেয়েছিলেন এক নতুন রূপের আস্বাদ। শেলটে হিজি-বিজি কেটে সেই প্রত্যক্ষ রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন প্রাণপনে। বাবার উৎসাহ পেতেন পুরোদমে। কারণ তিনি নিজেও ছবি ভালবাসতেন; ছবি আঁকতেনও। তিনি প্রতিকৃতি অঙ্কন শিখেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে।

শৈশবের এইসব অসংখ্য স্মৃতি, সান্নিধ্য, অজস্র প্রাকৃতিক ছবি ও তার রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ মনের মণিকোঠায় সযত্নে বয়ে নিয়ে রথীন মৈত্র এলেন কোলকাতায়।

ভর্তি হলেন কলকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশানে। অঙ্কের মাস্টার মশাই ছিলেন কেশব নাগ। অঙ্কের ক্লাসে পেছনের বেঞ্চে বসে ছবি এঁকে, ধরা পড়ে রথীন মৈত্র কানমলা খেয়েছেন অনেকবার। ওনার প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন কেশব নাগ।

সেই সময়ে মিত্র স্কুলের শিল্পশিক্ষক ছিলেন একালের প্রখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রকর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। স্কুলে প্রবেশের আগেই রথীন মৈত্র প্রবাসীর দৌলতে দেবীপ্রসাদের বেশ কিছু ছবির প্রিন্ট দেখে শিল্পী সম্পর্কে একটা ছবি কল্পনায় এঁকে নিয়েছিলেন। কিন্তু সশরীরে শিল্পীকে দেখে ভয় হল। মাথায় বাবরী চুল। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবী। পায়ে নাগরা। স্কুলে আসতেন সাইকেল করে। সেই সাইকেল তুলতেন তিন তলার ড্রইংক্লাশে একহাতে। পালোয়ানের মত পেশীবহুল চেহারা দেখে রথীন মৈত্র ভাবতেন—এই ব্যক্তি ছবি আঁকেন কি করে? রীতিমত ভয় হত তাঁর সামনে যেতে। একদিন অতি কষ্টে ভয় গোপন করে গেলেন দেবীপ্রসাদের সামনে ড্রইংক্লাশে।

ঢোকা মাত্রই দেবীপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন—আঁকতে টাকতে পার? ভয়ে ভয়ে রথীন মৈত্র জবাব দিলেন—একটু আধটু স্যার। দেবীপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বললেন—আচ্ছা একটা বাঁদর আঁক ত, দেখি কেমন পার!

রথীন মৈত্র ঘাবড়ে গেলেন। এত বিষয় থাকতে বাঁদর কেন? যাইহোক তাই আঁকবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই হয় না। দেবীপ্রসাদ হাবভাব দেখে বললেন—বাঁদর দেখেছ ত? মনে মনে বাঁদরের চেহারা চিন্তা কর এবং আঁক। আরও বললেন—আর্টিস্ট-এর 'অবসারভেসন'ই হচ্ছে সম্পদ। একটা জিনিসকে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে শিল্পী সেভাবে দেখে না। তাঁর দর্শনে থাকে পার্থক্য। তাই দেখার চোখ তৈরী করতে হবে আগে। গান শিখতে হলে কান তৈরী করতে হয়। গান শুনতে হয়। গানের আসরে যেতে হয়। সেরকম পাঁচটা ছবি দেখতে হবে। যেটা ভাল লাগবে সেটা গ্রুমকে গিয়ে দেখবে। প্রাণভরে দেখবে। এই-ভাবে দেবীপ্রসাদ রথীন মৈত্রের ছবি দেখার চোখ তৈরী করে দিয়েছিলেন। আর সেই প্রথম গুরুর উপদেশ পরবর্তীকালে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে আজও স্মরণে রেখে-ছেন জপমন্ত্রের মত।

বাল্যের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রথীন মৈত্র বললেন—তখন শিল্পী হিসেবে দেবী-প্রসাদের বেশ নাম-ডাক। তিনি ক্লাশে বসেই ছবি আঁকতেন। কয়েকটা দিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তিনি ক্লাশে সময় হলে শেষের কবিতার ইলাস্ট্রেশন করতেন। অমিত রে, সিসি, লিসি প্রভৃতি চরিত্র কয়েকটি রেখার বিন্যাসে কি অসাধারণ ভাবেই না ফুটিয়ে তুলতেন তা আজ আরও ভাল করে উপলব্ধি করতে পারি। সেসব ছবি অবশ্য সেই সময়ে নিয়মিত প্রবাসীতেও ছাপা হয়েছে। তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

স্কুলের চৌকাট পেরিয়ে রথীন মৈত্র গিয়ে ভর্তি হলেন আর্ট কলেজে। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন মুকুল দে। আর্ট কলেজে ভর্তির কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ রসিকতা করে রথীন মৈত্রকে বলেছিলেন—তুমি মুকুলের কাছে মুকুলিত হতে যাচ্ছ?

আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে শিল্পী মহা সমস্যায় পড়লেন। কোন পথে যাবেন ঠিক করতে পারছেন না। কেবলই পথ হাতড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস-এ যেতেন। শিল্পীদের কাজ দেখতেন। তখন অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্য-বঙ্গীয় চিত্রশৈলীর দারুণ রমরমা। বিশেষত তখন তাঁর ওয়াশ টেকনিক খুবই জনপ্রিয়। আর এক দিকে পাশ্চাত্য প্রথার অপরিসীম প্রভাব।

শিল্পী শিল্পের গোলক ধাঁধার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন। আকস্মিকভাবে, যামিনী রায়ের চিত্রকলা দেখে। তাঁর অঙ্কিত মিউরাল ধর্মী এক চিত্র দেখে শিল্পী বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। মনে মনে স্থির করলেন ভেঙেচুরে নতুন কিছু করতে হবে। নতুনের নেশায় মেতে উঠলেন। কিন্তু চিরাচরিত পথ থেকে বেরোবেন কি করে? ছুটে গেলেন যামিনী রায়ের কাছে। তিনি বললেন—জোর করে কিছু করো না। নতুন কিছু আসার হলে সে আপনিই বেরিয়ে আসবে।

আকাশের কোলে কোলে মেঘের মত অসন্তোষে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল শিল্পীর সমস্ত মন। একদিন তিনি হঠাৎ প্রকৃতির মধ্যে আবিষ্কার করলেন অজস্র রং ও ফর্মকে। পর পর বেশ কয়েকটি ছবি আঁকলেন। যামিনীদা একদিন বাড়ীতে এসে দেখে বললেন—বাঃ, বেশ এঁকেছো হে। শিল্পী উৎসাহিত হলেন। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, সিকিম ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে আঁকলেন একের পর এক ল্যান্ড-স্কেপ, মানুষ ও প্রকৃতিকে আশ্রয় করে।

কয়েক বছর পরের কথা। এর আগে আর্ট কলেজ থেকে সাফল্যের সঙ্গে পাশ করে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেছেন। তখন চারদিকে যুদ্ধের ডামাডোল। বছর দুয়েক আগে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ হয়েছে। চার-দিকে মনুষ্যের তৈরী কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে মরক লেগেছে। ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে ক্ষুধার্ত মানুষের দল পথে পথে ভিক্ষে করে ফিরছে। সেই অস্থির পরিবেশে শিল্পীর সংবেদনশীল মানসিকতার পরি-বর্তন হলো। তিনি ক্ষুধার্ত, নির্যাতিত মানুষের সকরুণ আর্তি ও নিপীড়িত অসহায় মানুষের অন্তর্বেদনাকে তুলির আঁচড়ে বাঙ্ময় করে তুললেন বেশ কয়েকটি চিত্রকর্মে।

ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। দেখতে দেখতে কলকাতা শহর মিলিটারী লোকজনে ভর্তি হয়ে গেলো। যে কোন মুহূর্তে বোমা বিস্ফোরণে কলকাতা লোপাট হয়ে যেতে পারে। এমনই এক আশঙ্কার বাতাস বইতে সুরু করল। জীবনের মূল্য-বোধগুলো অতি সত্বর বদলে যেতে লাগল। পরিবেশের প্রতিক্রিয়া সুরু হল মনে। ভাব-লেন দল গড়ে ছবি আঁকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে কাজ করতে হবে।

বেশ কয়েকজন শিল্পী একত্র হলেন। তার মধ্যে ছিলেন নীরদ মজুমদার, গোপাল ঘোষ, সুভো ঠাকুর, প্রদোষ দাশগুপ্ত, প্রাণতোষ পাল, পরিতোষ সেন। তৈরী হল ক্যালকাটা গ্রুপ। ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরেসে ১৯৪১-৪২ সালে ক্যালকাটা গ্রুপের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হল। সব শিল্পীর কাজেই ফুটে উঠল নিজস্ব ধারা। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, হতাশা, বঞ্চনা ও নিরন্ন মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কথা রূপ নিল এই গ্রুপের শিল্পী-দের চিত্রকর্মে। কলকাতার সে সময়কার নামকরা সব কাগজেই প্রশংসার সঙ্গে এই প্রদর্শনীর বড় আকারের সমালোচনা বের হয়েছিল।

চার-পাঁচ বছর তোড়ে চলার পর ক্যাল-কাটা গ্রুপ ঝিমিয়ে পড়ল। পরিতোষ সেন গেলেন ইন্দোরে। নীরদ মজুমদার পাড়ি দিলেন প্যারিসে। দলের আরও অনেকে সরে গেলেন। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে ক্যালকাটা গ্রুপ প্রায় উঠে যাবার সামিল হল।

কবি লিখেছেন যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে। দল ভেঙে যাওয়ায় রথীন মৈত্র একলাই ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। বোম্বেতে এক একক প্রদর্শনী করলেন। সেই সময়ে বোম্বাইতে শিল্পী হিসেবে জর্জ কীট্-এর খুব নাম-ডাক। তবুও বোম্বের রসিকরা মুগ্ধ হয়েছিলেন রথীন মৈত্রের প্রদর্শনী দেখে। বেশ কয়েকটি ছবিও বিক্রী হয়েছিল। বিখ্যাত আর্ট ম্যাগাজীন মার্গ-এ শিল্পীর সুদীর্ঘ জীবনীও প্রকাশিত হয়েছিল এই উপলক্ষে।

১৯৪৮-৪৯ সালে শিল্পীর জীবনে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটলো। সরকারী আর্ট কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ রমেন চক্রবর্তীর অনুরোধে ঐ কলেজে শিল্পী শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। পরে ১৯৫১ সালে কলকাতার অ্যাকাদমী অব ফাইন আর্টসের সেক্রেটারীর পদে নির্বাচিত হন। তারপর ১৯৫৩ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে এক সর্ব ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে রথীন

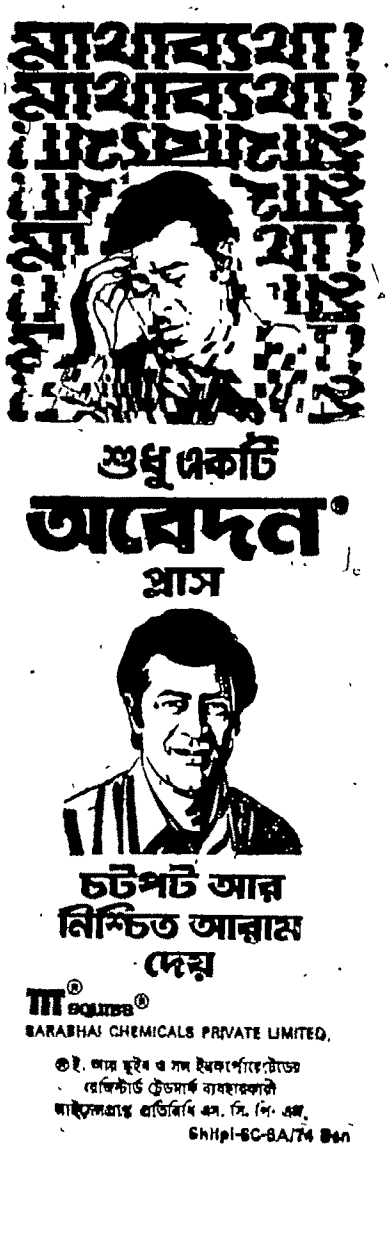

সেনক চারমার : রথীন মৈত্র অঙ্কিত

মৈত্র যান আমেরিকায়। সেখানকার বিভিন্ন শহরে প্রদর্শনীর সুবাদে শিল্পী গুণীজ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। ফেরার পথে ইউরোপের প্রায় সমস্ত আর্ট গ্যালারী পরিদর্শন করেন। এই সময়ে শিল্পীর অঙ্কিত ৩০ ফিট দীর্ঘ এক মুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়ে সেখানকার মানুষ এটিকে ক্রয় করেন। এটি আছে নিউ ইণ্ডিয়া হাউসে।

বিদেশী শিল্পকলার সংস্পর্শে এসে শিল্পীর ধ্যান-ধারণার এক নতুন ভাবের জোয়ার আসে। দেখলেন ওদের সমকালীন চিত্রকর্ম বড় বেশী টেকনিক ওরিয়েন্টেড পাশ্চাত্য শিল্প - নিদর্শনের সঙ্গে নিজের কাজের তুলনামূলক বিচার করে শিল্পীর অতৃপ্তি বেড়ে গেল। বুঝলেন হৃদয়ের সঙ্গে মনের যোগ নেই। টেকনিক, টেকসচার ও মিডিয়ামের খিচুড়ি বানিয়ে ধোঁকা দিচ্ছেন রসিককে।

অচিরেই অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটল। আমাদের পারিপার্শ্বিক আকাশ বাতাস ও ঐতিহ্যের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেলেন শিল্পের নব দিগন্ত। আঁকলেন যীশু, নৃত্যরত বাউল। দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তুদের অসহায় অবস্থার কথা বললেন 'ডেসটিটিউটে'। 'আই উইল নট ডাই'তে বাঁচার আকুতি। 'দুষেট' চিত্রে কোন এক ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীর মত স্তূপের মধ্যে দুটি প্রাণীর অস্তিত্বে যেন শিল্পী ক্ষয়হীন জীবনের অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন। হোয়াট নেকসট, অন দি রুস রোড। স্ট্রাগল ফর একসিসটেন্স প্রভৃতি চিত্রগুলো সবই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, হতাশা ও ক্লান্তিকর জীবনের পটভূমিতে রচিত। নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতার জীবন্ত ছায়াপাত ঘটেছে এই সব তেলরং ছবিতে।

'দি গোল্ডেন ডিয়ার' এক সাংগীতিক মায়াজালে মহিমান্বিত। 'অ্যাট রেস্ট'-এর 'সলিডিটি' লক্ষ্য করার মত কাজ। সেনক চারমার' রং-এর খেলায় অপরূপ। 'রেসারেকশান' প্রতীকের আশ্রয়ে রচিত। ভাবসম্পদে ঐশ্বর্যবান। বাংলাদেশে মুজিব পরিবারের মর্মান্তিক হত্যালীলার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রটি রচিত। 'বিদম অফ লাইফ' ছন্দময়। 'টারগেট'-এ শুরিয়েলিজমের ছোঁয়া আছে। 'মাদারস ড্রীম'-এর প্রকাশ প্রণালী অভিনব। 'দি অ্যাটাক' চিত্রটি মনে গভীর রেখাপাত করে। নীল আকাশের নীচে এক চিল উড়ন্ত এক পায়রাকে আঘাত হানছে। চিলের ধারালো নখের আঁচড়ে পায়রার পালক খসে খসে পড়ছে বাতাসে।

রথীন মৈত্রের চিত্রকলায় আঙ্গিকে ও রূপকল্পের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বেগুনী হলুদ রং বেশী ব্যবহার করেন। 'সলিডিটি' তাঁর চিত্রকর্মকে কিছুটা ভাস্কর্যমণ্ডিত করে তোলে। একসময় শিল্পী কিছু ভাস্কর্যের কাজও করেছেন। যখন কলকাতায় বোমা পড়ছে, তখন বাবার নির্দেশে পাবনার বাড়ীতে ফিরে গিয়ে কিছুকাল ভাস্কর্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'রিদম' রথীন মৈত্রের চিত্রের আর এক উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য।

প্রভাবের কথা উঠলে শিল্পী বলেন—আমার চিত্রে কতটা প্রভাব পড়েছে জানি না। তবে এল গ্রেকো, বত্তিচেলী, এবং পিকাসোর সুপিরিয়রডের কাজ দেখে অনুপ্রেরণা পেয়েছি অনেকখানি। যামিনীদার ছবি আমাকে এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। নটরাজের মূর্তি, ক্যাণ্ডাপেইন্টিং, বাসুলী পেইন্টিং-এর কাজ আমাকে কম উৎসাহিত করেনি। বাগ গুহার ফ্রেসকো চিত্রাবলী আমার কাছে এখনও অবিস্মরণীয় মনে হয়।

শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কে রথীন মৈত্র বলেন, ফরমায়েসী কাজে শিল্পীর স্বাধীনতা খুবই সীমিত। নির্দেশিত পথে আর যাই হোক না কেন ছবি আঁকা হয় না। কারণ শিল্পী আঁকেন ভেতরের তাগিদ থেকে। অন্তরের আকুতি থেকে। ডিকটেশনে শিল্পসৃষ্টি হয় না। পোস্টার হয়। পোস্টার এবং শিল্পে অনেক পার্থক্য। উদাহরণ দিয়ে বলি। পদ্মের মূল পঙ্কে থাকে। সেখান থেকে সে রস সংগ্রহ করে। তারপর জলের বিভিন্ন স্তর ভেদ করে সে প্রস্ফুটিত হয় উদার মুক্ত আকাশের নিচে। শিল্পীও তেমনি এই নিত্যনৈমিত্তিক ভাল-মন্দের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তারপর পরিবেশ থেকে একটু ওপরে উঠে নিজের মনের কল্পনা-ভাবনা মিশিয়ে সৃষ্টি করেন আর এক জগতের।

আজকের চিত্রকলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে রথীন মৈত্র অভ্যস্ত খেদ ও দুঃখের সঙ্গে জানান—শিল্পের বড় বিষয় ফর্ম। কারণ শৈলীই শিল্পীর মনের উচ্ছ্বাসকে বয়ে নিয়ে যায় রসিকের কাছে। তাই দুর্বোধ্য ফর্ম 'কমিউনিকেট' করতে পারে না। আর হিজিবিজি 'অ্যাবসট্রাকশান করে নিজেও শিল্পী কতটা তৃপ্তি পান এটাও আমার এক ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা। নভুনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ভাল। কিন্তু ঐতিহ্য ও প্রকরণাকে বাদ দিয়ে নয়। অনেক শিল্পীকে দেখি যে তাঁরা প্রকরণের ধার ধারেন না। কিন্তু সেভ কেবল শেক্সপীয়ারই বলতে পারেন—'আই উইল নট ফলো গ্রামার। গ্রামার উইল ফলো মী।' আজকে অধিকাংশ শিল্পী দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। 'এসথেটিকস' ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। যার যা খুশী করছেন। কোন মাথামুণ্ডু নেই। শিল্পে উদ্ভট জিনিসের আমদানী করে বাহবা নেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরের এসব ধুয়ে মুছে যাবে। বর্তমান কাল একটা ভয়ানক হতাশা ও অতৃপ্তির পথ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চলেছে। কবিতা ও সঙ্গীতেরও একই অবস্থা। পপ আর্ট, পপ মিউজিক নিয়ে হৈ চৈ চারিদিকে। চিন্তায় কোন 'স্টেবিলিটি' নেই।

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন রথীন মৈত্র। মেঘলা দিনের এক ঝলক ঝড়ো বাতাসে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল স্নিগ্ধ প্রশান্তি। রথীন মৈত্র থামলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বললেন—শিল্পের জগতেও ফিরে আসুক এমনই এক প্রশান্তি। বিরাজ করুক এক সৃষ্টিশীল পরিবেশ।

প্রশান্ত দা

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

শান্ত নিস্তব্ধ রাতটা কিসের শব্দে যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। একটা গাড়ী আসছে দূরে থেকে। পেছনে দিক থেকেই আসছিল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল আলোটা।

সরিতা হঠাৎ ইন্দ্রের বুকের ওপর থেকে মাথাটা সরিয়ে নিল। কোন কথা না বলে গড়ীর দরজাটা খুলে বেরিয়ে দাঁড়াল পথের ওপর। চূর্ণ চুল আর মথিত ফুল-গুলোকে যতদূর সম্ভব ঠিক করে নিল। তারপর পেছনের দরজা খুলে সীটের ওপর বসে গাড়ীর গ্লাসগুলো নামিয়ে দিল।

ততক্ষণ ইন্দ্র গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েছে।

পেছনের গাড়ীটা তীব্র স্পীডে হঠাৎ দারুণ একটা ব্রেক কষে দাঁড়াল। ভেতর থেকে মেয়েলি গলার একটা, ভয়ার্ত আওয়াজ উঠেই থেমে গেল।

গাড়ী থেকে মিঃ পিল্লাই নেমে এসেছেন।

কী ব্যাপার?

ইন্দ্র বলল, বিচ্ছিরি ব্যাপার ডিফা-রেন্সিয়াল বক্সের রিয়ার অ্যাকসিল কেটে গেছে।

ততক্ষণে সামনের সীট থেকে নেমে এসেছে প্রেমা।

গাড়ী থেকে সরিতাও নেমে দাঁড়াল।

মিঃ পিল্লাই দু বোনের মাঝে এসে পড়লেন. ভাগ্যিস মিস মেননকে কিছু বেশী সময় আটকে রাখতে পেরেছিলাম, নইলে সারা রাত আপনাদের এই পথের ওপরেই কাটাতে হত।

ইন্দ্র মনে মনে বলল, উদ্ধার করেছ। তুমি না এলে সারা কেরালা দেশটাই সমুদ্রের তলায় চলে যেত।

মুখে বলল, মিস মেনন মনে হয় বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন. ভাগ্যিস আপনি এসে পড়লেন।

সরিতা বলল, মোটেও না ভয় পেতে যাব কেন দারুণ ঘুম পাচ্ছিল।

প্রেমা বলল, পথে দাঁড়িয়ে বাত কাবাব করে লাভ নেই, এখন সবাই মিলে ঘরে পৌঁছানর ব্যবস্থা করা যাক।

মিঃ পিল্লাই বললেন সবাই আমার গাড়ীতে চলে আসতে পারেন, কিন্তু আপনার গাড়ীর কি হবে?

তখন একটা চেন অথবা মোটা দড়ি-জাতীয় কিছু খোঁজ চলল দু গাড়িতে। অ্যামবাসেডার প্রেসিডেন্টকে টেনে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তাও মিলল না।

ইন্দ্র বলল, ভাবনা নেই আমি গাড়ীতে আছি. দিব্যি রাতটা কেটে যাবে। ভোরের বাসে একজন মেকানিককে পাঠিয়ে দিলেই চলবে।

মিঃ পিল্লাই প্রেমার দিকে চেয়ে বললেন. মিস মেনন আমি না হয় আজ রাতে আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ফিরেই যাই। তা হলে মিঃ রায় উদ্ধার পাবেন। কোভালম বাজারের মোড় থেকে একজন মেকানিক নিয়ে চলে আসব।

প্রেমা বলল তা হয় না, আপনার বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

অগত্যা ইন্দ্রের পরিকল্পনাই বহাল রইল। মিঃ পিল্লাই তাঁর প্রায় অক্ষত সিগারেটের দামী প্যাকেটটাই ইন্দ্রকে প্রেজেন্ট করে বসলেন। রাত জাগতে ইন্দ্রের সঙ্গী রইলো সিগারেট।

ওরা মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ীতে উঠে বসল।

ইন্দ্র দাঁড়িয়ে রইল প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টে হেলান দিয়ে।

মিঃ পিল্লাই-এর গাড়ী স্টার্ট নিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

সরিতা ইন্দ্রের গাড়ীতে ব্যাগ ফেলে গেছে। তাই সে আবার ছুটতে ছুটতে এল প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে।

ইন্দ্র সিগারেট টানতে টানতে বলল, কি হল, ফিরে এলেন যে?

সরিতা বলল আপনাকে না বলে গিয়েছিলাম, তাই একটু দুষ্টুমি করতে হল। ব্যাগটা ফেলেই গিয়েছিলাম। সত্যি, ভীষণ খারাপ লাগছে আমার। একটুও ঘুমুতে পারব না রাত।

ইন্দ্র বলল আমার কিন্তু কোন অসুবিধেই হবে না। একটা ফুলে ভরা মাথার গন্ধে বুক ভরে আছে। রাতভোর

সারা সাগরের হাওয়াতেও সে গন্ধটুকু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

সরিতা জ্যোৎস্নার আলোয় চোখে ধরুণ মিনতি ফুটিয়ে দ্রুত পায়ে মিঃ পিল্লাই এর গাড়ীর দিকে চলে গেল।

ইন্দ্র কাঁচ তুলে গাড়ী লক করে বসেছিল। বাঁ দিকের গ্লাসটা সামান্য খোলা ছিল। সে স্বপ্ন দেখছিল, একটি মেয়ের। এক একবার কেমন যেন মনে হচ্ছিল, সবটাই স্বপ্ন। কে জানত বাংলাদেশ থেকে একেবারে আরব সাগরের তীরে তাকে একটা হোটেল চালাবার দায়িত্ব নিয়ে চলে আসতে হবে।

ইউনিভার্সিটির পড়া শেষ করে তার আর বেকারের দলে ভীড় বাড়াবার ইচ্ছে ছিল না। তাই সে সোজা চলে গিয়েছিল হোটেল ম্যানেজমেণ্ট আর ক্যাটারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে।

বছর তিনেক পরে কানপুর থেকে দিল্লী হয়ে ফেরার পথে নিউজ পেপারে চোখে পড়েছিল। বিজ্ঞাপনটা। সমুদ্রের ধারে আধুনিক হোটেল। অভিজ্ঞ ম্যানেজার দরকার। পোষ্ট বকস না দিয়ে সরাসরি একটা ঠিকানা দেওয়া ছিল। তাই রেজেষ্ট্রী ডাকে দরখাস্ত পাঠিয়ে কালক্ষয় না করে সে সোজা চলে এসেছিল কেরালায়।

কোভালম বীচের পাশেই কোভালম গ্রাম। ঐ গ্রামেই নাম্বুদ্রী করুণাকরের আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্মত কেটেজম্। সেখানেই সে প্রথম দেখল প্রেমা মেননকে। বয়েসে তার চেয়ে কিছু ছোটই হবে, কিন্তু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। প্রেমা মেননই তাকে জব অফার দিতে বলল। তাদের পরিবারের ছোট একটু ইতিহাসও কদিন পরে প্রেমার মুখ থেকেই সে শুনেছিল। এতটুকু সংকোচ কিংবা গোপন করার কোন চেষ্টা ই ছিল না তার কথায়।

নাম্বুদ্রী করুণাকর যৌবনে নৃত্যশিল্পী মেনন পরিবারের একটি মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন। ফলে সমাজ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। নিজের চেষ্টায় বুদ্ধিমান আর পরিশ্রমী করুণাকর অনেক কিছুই করেছিলেন। ফিসারিজ কয়ার ইণ্ডাস্ট্রি, কাজু এক্সপোর্ট। শেষে কভালম বীচ থেকে কিছুদূরে একটা হোটেল তৈরী করেন। কোভালম গ্রামে নারকেল-কুঞ্জে ঘেরা 'রিট্রিট' নামে বাড়ীতে তিনি থাকতেন, আর গাড়ী করে হোটেলে যেতেন। হোটেলটাকে বাড়ীর কাছেই করতে পারতেন কিন্তু তা তিনি করেন নি। কর্ম আর বিশ্রামের দুটি জায়গাকে তিনি একটু তফাতেই রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বাড়ীর নাম 'রিট্রিট' রাখলেও শান্তিতে বিশ্রাম করার ভাগ্য ছিল না তাঁর। নৃত্যপটয়সী স্ত্রী তাঁকে দুটি কন্যা সন্তান উপহার দিয়েই মারা গিয়েছিলেন। সেই সন্তানই প্রেমা আর সরিতা। প্রেমা মায়ের কাছে নাচ শিখত, আর সবিতা তখন সবে পাঁচ। মা মারা গেলে বাবা করুণাকর স্ত্রীর বান্ধবী মাধবী আম্মার তত্ত্বাবধানে প্রেমাকে রেখে দেন। মাধবী আম্মা কলা কেন্দ্রমের নৃত্যগুরু ছিলেন। মোহিনী আট্টমের পুরানো রীতি তিনি যদ্দুর সম্ভব নির্ভেজাল শেখানোর চেষ্টা করতেন।

তাঁর কঠোর তদারকী আর শিক্ষায় প্রেমা এখন নিপুণ নর্তকী। প্রেমা নাচের সঙ্গে সঙ্গে কনভেণ্টে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু ছোট বোন সরিতা একটু ভিন্ন চরিত্রের। নাচ ভালবাসলেও তার ভেতর সে নিজেকে জড়াতে চায়নি। পড়ে ত্রিবান্দ্রম কলেজে। ঘুরে বেড়ায় বান্ধবীদের নিয়ে। আজ পিকনিক, কাল সিনেমা, পরশু ব্যাকওয়াটারে ভ্রমণ। এই নিয়ে তার জগৎ। তবে প্রেমার উক্তি অনুসারে সরিতা তার চেয়েও হিসেবী। এই বয়সেই সে নাকি ব্যবসা বোঝে অনেক বেশী।

করুণাকর সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে গিয়েছিলেন ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দিয়ে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ফেলতে পারলেন না। তার আগেই স্টেশনের ভেতরে হৃদরোগের শিকার হলেন।

বাবা চলে যাবার পর প্রেমাকে সাহায্য করার জন্য পিতৃকুলের অনেক আত্মীয় এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু প্রেমা তাদের বিদায় দিয়েছিল বিনীত নমস্কারে। বাবার জীবদ্দশায় যারা আসেনি, বাবার অবর্তমানে তাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিল প্রেমা।

একটি একটি করে সব কটা ব্যবসাকেই সে উপযুক্ত দামে বিক্রি করে ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স বাড়িয়েছিল। কিন্তু পারেনি হোটেলটাকে হাতছাড়া করতে। করুণাকর এক সময় মেয়েদের নাকি বলেছিলেন, ব্যবসায়ের খাতিরে ঘন ঘন বিদেশ যাওয়া তাঁর পোষাচ্ছে না। তিনি হঠাৎ একদিন সব ছেড়েছুড়ে ঘরে এসে বসবেন, আর শুধু থাকবে তাঁর নিজের পছন্দমত গড়ে তোলা সান অ্যাণ্ড সী হোটেলটা।

বাবার শেষ ইচ্ছাকে প্রেমা সবতো রক্ষা করতে চায়। তাই উপযুক্ত ম্যানেজার চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল সে।

ইন্দ্র বসে বসে ভাবছিল কথাগুলো। একটি বছরও পূর্ণ হয়নি তার চাকুরীর কিন্তু ইতিমধ্যেই সে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। আর এজন্য সপ্রশংস অভিনন্দন পেয়েছে প্রেমার কাছ থেকে। তার হোটেল সাজানোর পরিকল্পনা কিম্বা ফরেন ট্যুরিষ্ট আকর্ষণের জন্য পাবলিসিটির ধরণ নাকি অভিনব। প্রেমার অ্যাপ্রিসিয়েশান তাকে হোটেলটাকে নিয়ে নানাভাবে ভাবতে উৎসাহিত করেছে।

তার কাজ প্রোপ্রাইটারদের পছন্দ হলেও ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ বা মেলামেশার কোন সুযোগ ছিল না তার। কিম্বা সে রকম কোন সুযোগ তৈরীও করে নেয় নি সে। তাই অ্যাপ্রিসিয়েশান যতখানি হয়েছিল অ্যাকোয়েণ্টেন্স ততখানি হয়নি। কিন্তু আজকের ঘটনার কথা ভেবে সে নিজের মনেই অবাক হয়ে যাচ্ছে। কি করে এটা সম্ভব হলো। সরিতা যতখানি এগিয়ে এসেছে তার কোন আভাসই তো সে পায়নি আগে। সরিতা তার কলেজ বন্ধুদের নিয়ে হয়ত এক ঝাঁক চড়ুই পাখির মত কখনো চড়াও হয়েছে হোটেলে। সমুদ্রে স্নান সেরে বালিতে হুটোপুটি করে, নারকেল বাগানের ছায়ায় বসে গান গেয়ে, ব্যাকওয়াটারে চিরুনাল ভাড়ায় বা হোটেলের সাজানো নৌকোটা হৈ হৈ করে ভাসিয়ে আবার ফিরে গেছে রিজার্ভ করা গাড়ীতে। বাবার সময় শান্ত হয়ে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে নিজের ব্যাগ খুলে টাকা গুনে দিয়েছে। একটু দূরে তার ডেস্কে বসে ইন্দ্র সবিতার এই আচরণটুকু উপভোগ করেছে।

যখনই কোন কারণে সে সরিতার মুখোমুখি হয়েছে তখনই দেখেছে অশান্ত চঞ্চল মেয়েটি কত শান্ত আর শোভন হয়ে গেছে।

কদিন আগে প্রিমিয়ার প্রেসিডেন্টখানা চালিয়ে হোটেলে এসেছিল সরিতা। প্রেমা পদ্মনাভম্ প্যালেসে নাচবে তার জন্য একটা ইনভিটেশান কার্ড তৈরী করে দিতে হবে। একদিকে থাকবে আমন্ত্রণ, অন্যদিকে থাকবে গুরু মাধবী আম্মা আর শিষ্যা প্রেমা মেননের পরিচিতি।

অনেক দৌড়ঝাঁপ করে প্রেমা মেননের মোহিনী আট্টমের একখানা ফটোর রেখাচিত্র এঁকে ব্লক করিয়ে গোল্ড কালারে ছেপে দিয়েছে ইন্দ্র। ব্লু কালারে ছাপিয়েছে নিমন্ত্রণ চিঠিখানা। একেবারে আরব সাগরের নীলের ওপর কেরালার সোনালী সূর্য নৃত্যের লীলায় মেতেছে।

কার্ড তৈরী করে প্রেমার কাছে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল সে। প্রেমা শুধু একটা শব্দই উচ্চারণ করেছিল, দারুণ। আর তাতেই ইন্দ্রের কদিনের সব পরিশ্রম পুরস্কৃত হয়েছিল। চলে আসার সময় ইন্দ্রকে কিন্তু নাচ দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি প্রেমা। ইন্দ্র পথে আসতে আসতে ভেবেছিল, প্রেমার আরও একটু সৌজন্য দেখান উচিত ছিল। স্বাভাবিক ভদ্রতায় নাচ দেখতে যাওয়ার মৌখিক একটা আমন্ত্রণ মাত্র। হোটেলে পৌঁছে তার মনে হয়েছিল, এই তার যথার্থ জায়গা, এর বাইরে পা বাড়াতে গেলেই অকারণে আহত হতে হবে।

সে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই বসেছিল, কিন্তু গতকাল একটি জার্মান কাপ্‌লকে ব্যাকওয়াটারে নৌকো বিহার করিয়ে শেষ বেলায় হোটেলে ফিরে এসে দেখল, তার ডেস্কে একখানা কার্ড পড়ে আছে। সঙ্গে একটুকরো চিঠি ক্লেমস্‌ ক্লীপ দিয়ে সাঁটা।

নাচ দেখার জন্যে প্রেমার প্রতিনিধি হয়ে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলাম। কার্ড রেখে গেলাম। আপনার পরিকল্পিত কার্ডের মর্যাদা প্রেমা কতখানি রাখতে পেরেছে তা স্বচক্ষে দেখলে আমরা সকলেই খুশী হব।

আসা চাই কিন্তু—সরিতা।

কার্ড পেয়ে ওদের ওপর মনটা অনেক বেশী প্রসন্ন হয়ে উঠল ইন্দ্রের। ওরা তাহলে ইন্দ্রের কথা ভোলে নি। সেদিন প্রেমার মুখোমুখি নিমন্ত্রণ না করার কারণ এখন তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, এ ব্যাপারটা অনেক বেশী শোভন আর সুন্দর হয়েছে।

কিন্তু সরিতা! কি করে কয়েক মুহূর্তের ভেতর সে এত কাছে সরে এল। বেশী কোন কথাই সে বলে নি, শুধু ফুলের কারুকাজ করা মাথাটাকে তার বুকের মাঝখানে সমর্পণ করে দিয়ে বসেছিল।

ইন্দ্রের মনে হতে লাগল, নির্জন জ্যোৎস্না ঝরা রাতগুলো শুধু মাত্র দুজন প্রেমিকের। তারা যেন প্রকৃতির এই বিহ্বল করা সুধাপানের জন্য বিশেষ নিমন্ত্রিত অতিথি। এই রাতে হৃদয়ের গভীর কোন কথা গোপন করে রাখা যায় না, সব কথা রুপালী আবরণ ভেদ করে প্রজাপতির মত বাইরে বেরিয়ে এসে এলোমেলো অথচ আশ্চর্য ছন্দময় নাচের খেলা দেখিয়ে উড়ে বেড়ায়।

পর পর এগিয়ে আসা হালকা ঢেউগুলো যেমন করে বেলাভূমির সোনালী বালিকে ভিজিয়ে দিয়ে যায় ঠিক তেমনি একটা সুখকর তন্দ্রাচ্ছন্নতার প্রবাহে ভিজে যাচ্ছিল ইন্দ্রের সোনালী স্বপ্নগুলো।

কে যেন ডাকছে। অনেক দূর থেকে একটা শব্দ অ্যাকিউরিয়মে রাখা চিকন দেহ ছোট ছোট কিসিং গোরামী মাছের মত জল কেটে কেটে তিরতির করে এগিয়ে আসছে।

শব্দটা এখন অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র সজাগ হয়ে বাইরে তাকাল।

কাচের ওপর হাত রেখে কেউ তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে।

ইন্দ্র চোখ রগড়ে নিল দু-হাতের আঙুল দিয়ে। এখন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে চাঁদের আলোয় সরিতা নয়, প্রেমা দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য, তার সামনে আর একখানা গাড়ী!

খুট্‌ করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল ইন্দ্র। গলায় বিস্ময়, আপনি?

প্রেমা বলল, চেন একটা নিয়ে এলাম বাঁধুন গাড়ী।

ইন্দ্রের মুখে একরাশ প্রশ্ন, এত রাতে একা এলেন! কি ব্যাপার বলুন তো? মিঃ পিল্লাই কিংবা আর কাউকে তো সঙ্গে আনতে পারতেন।

প্রেমা মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে বলল, দোষটা করলাম আমি আর শাস্তি পাবে অন্যে।

ইন্দ্র বলল, দিব্যি গাড়ীর ভেতর বসে বসে কেটে যেত রাতটা। আপনি এলেন, আমার ভীষণ খারাপ লাগছে।

প্রেমা মিষ্টি আওয়াজ তুলে হেসে উঠল। বলল, দেখুন তো এত কষ্ট করে এলাম আর আপনি বলছেন আমি আসতেই আপনার খারাপ লাগছে।

ইন্দ্র চেন দিয়ে দুটো গাড়ী বাঁধতে বাঁধতে করুণ গলায় বলল, আমাকে এমন করে ভুল বুঝবেন না। আমি শুধু আপনার কষ্টের কথাই ভাবছি। সারা সন্ধ্যে নাচের অনুষ্ঠান হল তারপর রাত জেগে গাড়ী চালিয়ে এলেন। কি করে আপনার পক্ষে সম্ভব হল এতগুলো কাজ তা ভেবে উঠতে পারছি না।

প্রেমা হঠাৎ বলল, কেমন লাগল আমার নাচ, বলেন নি তো।

আবার কথাটা চাপা দিয়ে বলল, আচ্ছা গাড়ীতে বসে শুনব। আপনি ড্রাইভ করুন।

ইন্দ্র তার বাঁ দিকের লক খুলে দিল। প্রেমা ভেতরে ঢুকে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ইন্দ্র ভাবল, প্রেমার ভেতরে সংস্কারের লেশ মাত্র নেই, যা আছে তা সহজ স্বচ্ছন্দতা। লজ্জা কিংবা সংকোচের আবরণে অনেক সময় মেয়েদের সুন্দর দেখায় ঠিক, কিন্তু সহজ আচরণের ভেতর স্বাভাবিক একটা শ্রী আছে। অবশ্য পুরুষালির উৎকট অনুকরণটাই চোখে লাগে বেশী।

কি ভাবছেন? প্রেমার গলা বেজে উঠল।

না কিছু না—বলেই ইন্দ্র গাড়ীতে স্টার্ট দিল। প্রেমা বলল, নাচ কেমন লাগল কই বললেন না তো?

ইন্দ্র বলল, আমার বলার কিছু অপেক্ষা আছে কি? সারা ত্রিবান্দ্রমের এলিট সম্মেলন হয়েছিল আপনার নাচের আসরে। আর তাদের মতবাও আপনার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

প্রেমা বলল, নিজেকে আর ফাঁকে রাখবেন না মিঃ রায়। ইনভিটেশান কার্ডের নমুনা দেখেই বুঝেছিলাম, আপনি কি ধরণের সমঝদার।

ইন্দ্র বলল ওটা অশিক্ষিত পটুত্ব। কস্মিনকালেও ছবি আঁকতে পারি না, কিন্তু ছবি দেখতে ভালবাসি।

প্রেমা বলল, প্রকৃতির কবিতা ডজন ডজন মুখস্থ করলেই কি আর প্রকৃতিকে

মনোরম প্রকৃতি

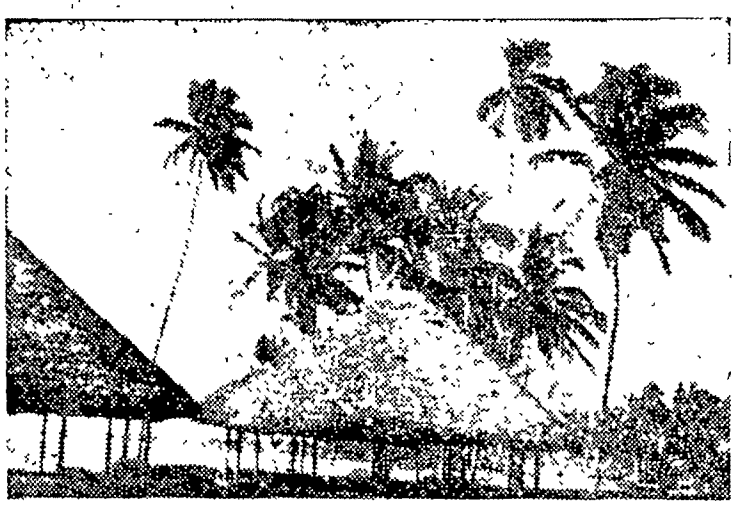

চেনা যায় না বস্তু তুলোর শ্রাদ্ধ করলেই শিল্পী হওয়া যায়।

ইন্দ্র একটা বাঁক ঘুরে আবার সোজা পথ ধরল।

দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি আপনার নাচের টেকনিক্যাল দিকটা আমি তেমন বুঝি না কিন্তু সামগ্রিক আবেদন যে কোন হৃদয়কে নাড়া দেবেই।

প্রেমা হেসে বলল, অন্ততঃ একজন সমঝদার পাওয়া গেল, আমার নাচ সোজা-সুজি যাঁর হৃদয়ে ঘা দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল, কথাটা নির্ভেজাল সত্যি।

কিছুক্ষণের ভেতরই গাড়ী এসে পৌঁছল কোভালমে। মেন রাস্তা থেকে একটা লাল সুরকী বিছান পথ কয়েক একর নারকেল বাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রেমাদের বাড়ীর দোরে এসে শেষ হয়েছে।

প্রেমা বলল, অচল গাড়ীটা এখানেই থাক। আপনি আর একটু কষ্ট করে সবিতার ঐ গাড়ীটা নিয়ে হোটেলে চলে যান, কাল দুপুরে যে কেউ গিয়ে নিয়ে আসবে। আমিও যেতে পারি। ভোর হতেও আর বড় একটা বাকী নেই। সারা রাত আপনারই হল হয়রানি।

ইন্দ্র হেসে বলল, হয়রানি নয় বলুন উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

হোটেলে ফিরে ইন্দ্র দেখল, সুগদন বসে আছে। সামনের সমুদ্রের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে। সামান্য হলেও গাড়ীর শব্দ হয়েছে, তবু নির্বিকার সুগদন। হোটেলের মালি কাম দারোয়ানের কাজ করে এই লোকটি। ব্যাকওয়াটার অব্দি বিস্তৃত পেছনের বিরাট নারকেল বাগানটির মালিক মেনন বোনেরা। সুগদন বৌ কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সংসার পেতেছে ঐ তেঙ্গা তপপ্পমের ভেতর। নারকেল বাগানের সে-ই রক্ষক সে-ই পরিচালক সেই দড়ি উৎপাদক ব্যবসার কর্ম পরিদর্শক।

সারাদিন হোটেলের ফাইফরমাস খাটে রাত হোটেলের বারান্দায় শুয়ে থাকে। দারুণ নাক ডাকে। ঘুমন্ত পাহারাদার।

ইন্দ্র একটু অবাক হল বৈকি, সুগদন শেষ রাতে জেগে বসে সমুদ্রের দিকে এক-দৃষ্টে তাকিয়ে। প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য। চাঁদ আকাশে এখনও জেগে। সমুদ্র বালির স্তূপ নারকেল কুঞ্জ মায়াময়। এই পরিবেশে সুগদনের কবিত্ব লাভ হল নাকি। অথবা লোকটাকে নিশিতে পেয়েছে।

ইন্দ্র কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সুগদনের ধ্যান ভাঙ্গল। ইন্দ্রকে দেখে সে যেন ভূত কিংবা পুলিশ দেখছে বলে মনে হল।

ইন্দ্র একটু গলা চড়িয়ে বলল, কি হল, জেগে বসে আছ যে?

সুগদন এতক্ষণ কোনরকমে নিজেকে সামলে রেখেছিল ইন্দ্রর কথার ছোঁয়ায় একে-বারে ভেঙে পড়ল।

সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল সারারাত ওদের পাহারা দিয়ে বসে আছি সাহেব।

ইন্দ্র এতক্ষণ ভাল করে ওদিকে চেয়েই দেখেন নি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে সমুদ্রের তীরে নারকেল পাতার ছাউনি দেওয়া গোল ছাতার তলায় নগ্নপ্রায় দুটি মূর্তি। একজন দাঁড়িয়ে অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত পা ছুড়ে চলেছে, আর অন্যজন বালির ওপর শুয়ে কখনো বা বসে সেই অভিনয় দেখছে।

প্রথম ঘোরটা কেটে যেতেই ইন্দ্র ওদের চিনতে পারল। তিন-চারদিন হল হোটেলে এসেছে এই দুটি টুরিস্ট। দুজনেই পঁচিশের নীচে, দুজনেই ফটোগ্রাফার। মেয়েটি আমেরিকান আর ছেলেটি জার্মান। একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে, সে বিধাতা-পুরুষ আর ওরা দুজনেই জানে। বিবাহিত দম্পতি নয়, বন্ধু। সারা দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দুজনে। ফটো তুলে যাচ্ছে একনাগাড়। একটা দেশ বা অঞ্চল থেকে ফটো নেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে। সেখানে অনেক দামে বিক্রি করে আসছে ছবির সিরিজ।

আবার ঢুকে পড়ছে নতুন মুল্লুকে নতুন উদ্যমে। বথ দেখা, কলা বেচা দুটোই চলছে। চোখভরে দেশ দেখছে পাথেয় আর রসদ-টাও জোগাড় করে নিচ্ছে।

ইন্দ্রর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা মিষ্টি হেসে ওদের পরিচয় দিয়েছিল। সস্তায় একখানা সিঙ্গল বেডেড রুম চেয়েছিল। বেশী খরচের সংগতি যে নেই তা স্পষ্ট করে না বললেও আকারে ইংগিতে বুঝিয়ে দিয়েছিল।

ইন্দ্রের ব্যাপারটা বেশ ভালই লেগেছিল। পথে পরিচয় জীবনের কতকগুলো দিন একসঙ্গে কাটান, তারপর একদিন যে যার ঘরে ফিরে যাওয়া। কোন দায় নেই, কোন দায়িত্ব বহনের ঝঞ্ঝাটও নেই। হয়ত ওরা সংসারী হবে। যে যার দেশের ছেলে মেয়েদের বিয়ে করে ঘর বাঁধবে, তারপর কোন বিষণ্ণ দিনে মনে পড়বে দুজনের কথা। সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়ান ছিটানো আকুল করা স্মৃতি। ঐ স্মৃতিগুলোই হবে তখন তাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

মোটামুটি সস্তায় একখানা ভাল ঘরই ওদের দিয়েছিল ইন্দ্র। ঘরে বসে সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিক থেকে একটা ছোট্ট পাহাড় যেন সপরিবারে নেমেছে সমুদ্রে স্নান করতে। উঁচু নীচু কতকগুলো শিলাখণ্ড আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। শিলাগুলো ঢেউ-এর তলায় একবার ডুবছে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে। সূর্যের সোনালী রোদ গায়ে মেখে তেরামালা পাখিরা ওদের স্নানলীলা দেখছে। নুলিয়াদের বড় আকারের কটা ডাগলম ডোর থেকে সমুদ্র চষে বেড়ায় তার-পর শ্রান্ত হয়ে দুপুরে তীরে উঠেই সেই যে বালুর বিছানায় এলিয়ে পড়ে, দিনে রাতে আর নড়নচড়ন নেই। নুলিয়ারা ঐ নৌকার ছায়ায় ফেঁসে যাওয়া জাল সারাতে বসে।

ঘর পেয়ে ওরা বলছিল, রেস্ত থাকলে এখানেই মাসখানেক দিব্যি কাটিয়ে দেওয়া যায়।

হঠাৎ আজ রাতে ওদের এমন অভিনয়ের ইচ্ছেটা চাড়া দিয়ে উঠল কেন, তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে ইন্দ্র যা জানল তার মর্মার্থ এই :

সুগদনের সঙ্গে ঐ দুটি ফটোগ্রাফারের কি করে যেন ভাব জমে যায়। ওরা নারকেল বাগানে ওদের কুড়িল আব্দি ধাওয়া করে। ওখানে সুগদনের সুন্দরী বউ আর ছেলে মেয়েদের ফটো তোলে। ম্যানেজার সাহেব নেই, তাই সুগদন খুশী হয়ে ওদের সান্ধ্য-ভোজে আপ্যায়ন করে। ভোজ শেষে কিছু

পানীয় ব্যবস্থাও ছিল। নারকেল গাছের রস পচিয়ে তৈরী দিশি কোলম অতিথিদের সেবার জন্য পরিবেশন করেছে সুগদন। ভিনদেশী সুরা একটু মাত্রাতিরিক্ত পেটে পড়তেই ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। হোটেল থেকে রাত দশটায় ওরা স্নানের পোষাক পরে বেরিয়েছে সমুদ্রে। ভাগ্যিস সুগদন সঙ্গে ছিল তাই রক্ষে। ছেলেটি নাকি সমুদ্রে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল, আর মেয়েটি সুগদনের সাহায্যে কাতর অনুনয়ে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল বার বার। এই ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্কল্প আর তা থেকে প্রত্যাবর্তনের পালা প্রায় তিন চার ঘন্টা ধরে অভিনীত হয়। সেই দীর্ঘ তিন চার ঘন্টা বেচারা সুগদনকে ওখানে দাঁড়িয়ে অতিথি সেবার মাশুল জোগাতে হচ্ছিল।

এখন নাকি ছেলেটির ইচ্ছার কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সে আর আপাততঃ যাচ্ছে না জলের দিকে। মাঝে মাঝে চাঁদ আর নারকেল গাছের দিকে চেয়ে চেয়ে হাত পা নেড়ে বক্তৃতা শুরু করেছে। মেয়েটি কিছুটা নিশ্চিন্ত আর ক্লান্তও বটে, এখন শুয়ে বসে ওর বক্তৃতাব তাবিফ করছে।

ইন্দ্র জানতে চাইল, মেয়েটি কি সুস্থ আছে?

সুগদন বলল, না সাহেব, ও আর বেশী বেহুঁস হয়েছে।

কি করে বুঝলে?

সুগদন মাথা চুলকে বলল, বলতে পারব না সাহেব।

ইন্দ্র কষে ধমক লাগাতেই সুগদন বলল শেষবার ছেলেটা যখন জলে ঝাঁপ দিতে যায় তখন মেয়েটা চেঁচিয়ে বলল, এবার যদি জলে নাব তাহলে আমি সুগদনকে সঙ্গে নিয়ে কলম্বো চলে যাব।

সাহেব ঐ কথাই শুনেই আমি পালিয়ে এসেছি। ছেলে বউ ফেলে আমি কি করে ওর সঙ্গে যাই সাহেব। বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল সুগদন। কাতর গলায় বলল আমাকে বাঁচান সাহেব, আমি ঐ মেয়েটার সঙ্গে গেলে আর বেঁচে ফিরতে পারব না।

ইন্দ্র দেখল, কেবালাব কোলম আজ কাউকেই ছাড়েনি, তিনটি প্রাণীকেই ঘায়েল করেছে।

সুগদনকে ধমক দিয়ে এক সময় ঘরে পাঠাল ইন্দ্র। তারপর তিনতলায় নিজের ছোট ঘরটিতে উঠে গেল।

এখন আর শোবার কোন মানেই হয় না। চারটে বেজে গেছে। জানালা দিয়ে ইন্দ্র চেয়ে রইল বাইরের দিকে। তার মনে হল নীল আকাশটা যেন চন্দ্রাতপ। ঝুলে থাকা চাঁদটা তার গায়ে সংলগ্ন একটা আলো। তার থেকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে রঙ্গমঞ্চের ওপর। পশ্চাদপটে দিগন্তজোড়া সমুদ্র। সাদা বালির গালিচার ওপর শুরু হয়েছে অভিনয়। একটি যুবক আর যুবতী খণ্ডকালের মঞ্চে অনাদি অনন্তকালের অভিনয় করে চলেছে।

দুপুরে ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো।

ওপার থেকে কথা ভেসে এল, কে বলছেন?

ইন্দ্র বলল, আমি স্যার অ্যাসিস্ট্যান্ট সীব ম্যানেজার বলছি।

গলাটা ইন্দ্রর কাছে একেবারে অচেনা মনে হল।

ওপার থেকে অপরিচিতার গলা বাজল, মিঃ রায় বলছেন?

হাঁ আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি?

ওপার থেকে ঈষৎ আনুনাসিক গলায় এবার কথা ভেসে এল, আমি ভূত। আরব সাগরের জল ফেলে দেবার পর আমি উঠে এসেছি।

ইন্দ্র খুব একচোট হেসে নিয়ে বলল কাছেপিঠে বুঝি দিদি নেই?

সরিতা ওপ্রান্ত থেকে বলল, কয়েক মাইলের ভেতর নেই। প্রেমাকে খুব ভয়, তাই না?

ইন্দ্র বলল, গরীব মানুষ, এসেছি অভাবে পড়ে চাকরী করতে, মালিকের ভয় তো একটু থাকবেই। কিন্তু আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?

সরিতা বলল কলেজের কাছে বন্ধুর বাড়ী থেকে।

ইন্দ্র বলল, বান্ধবী কাছে নেই?

ওপ্রান্তে সরিতাকে চাপা গলায় বলতে শোনা গেল, তুই আমার পাশে আছিস কি না জিজ্ঞেস করছে।

তারপর ইন্দ্রের কথার জবাবে বলল, মেয়েরা কখনও কোন পুরুষবন্ধুর সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের বান্ধবীদের খোঁজ খবর দিয়ে কথা বলতে ভালবাসে না।

ইন্দ্র বলল, এটা উদারতার অভাব।

সরিতা বলল, আজ্ঞে না মশায়, পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতার ফলে মেয়েদের সাবধানতা।

ওপ্রান্তে সরিতার বান্ধবীর হাসি শোনা যাচ্ছে।

ইন্দ্র বলল, অনেকদিনের বান্ধবী মনে হচ্ছে?

সরিতা বলল, কি করে বুঝলেন?

ইন্দ্র বলল, আপনার অনুদার উক্তিকেও হাসি দিয়ে অভিনন্দিত করছে।

হঠাৎ ছন্দপতন হল। ওপারে কিছু একটা অঘটন ঘটেছে।

সরিতার গলার সুর পালটে গেছে। সংকোচ আর বিনয় মিশিয়ে সরিতা বলল হ্যাঁ স্যার আপনার নোটগুলো মীণাক্ষী আর আমি কপি করছি। কদিন পরেই আপনাকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু স্যার বোমিও জুলিয়েটের কি হবে? ও ব্যাপারে একটু সাহায্য না করলে একেবারে যে ডুবে যাব।

দারুণ হাসি পেল ইন্দ্রর। চাপা গলায় বলল, গুরুজনজাতীয় কেউ ঘরে ঢুকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, হ্যাঁ স্যার। কবে আপনার কাছে যাব বলুন।

একটু থেমে যেন এপারের কথা শুনে নিয়ে বলল, শনিবার? মা আমার কোন অসুবিধে নেই। দুপুরে আমি কলেজ থেকে আপনার ওখানে সোজা চলে যাব। আপনারও তো ওদিন কলেজ নেই।

একটু পরেই আবার বলল আচ্ছা রাখছি স্যার।

ফোনটা রেখে দিল সরিতা।

ইন্দ্র আপন মনে খুব একচোট হাসল। বুদ্ধিতে ঝকঝক করছে মেয়েটা। পরিস্থিতিকে কেমন ম্যানেজ করে নিল।

ইন্দ্রর কানে কেবল বাজতে লাগল দুষ্টু মেয়েটার মিষ্টি গলা, বোমিও জুলিয়েটের কি হবে স্যার। (ক্রমশঃ)

মোড়ের ঘুরপাক ॥ অরুণ মিত্র

মোড়ের ঘুরপাক আমি পা ফেলে দেখেছি
আকণ্ঠ লাফিয়ে ওঠে,
মালার পরাগ পাগড়ি টুকরো কথা
মুখমণ্ডলের আলো থেকে খ'সে
দেকলো হারিয়ে ঘোরে,
পুরোনো রাস্তার কাদা ভেঙে
কিছুদূর যাই আমি ফের হ'টে আসি।
এদিকে সমস্ত ক্ষণ অন্য গ্রহ
চক্রবৎ মাথার উপরে অবিরত,
আমি দেখতে পাই জলের ওপারে
ঘাসফুল স্বচ্ছ পাখনা রঞ্জন আকাশ স্ফটিকের কোণ.
সবুজ বন্দরে করেক শো মাইল শূন্য
অনুরাগে ভ'রে আছে।
আমি ঘরবার করি,
রাস্তায় উঠোনে বারান্দায়
শরীরের ভার রাখি টেনে তুলি
আর ওই গ্রহ মাথার উপরে ফিরে ফিরে আসে।

বর্ষা সন্ধ্যা ॥ অজিত বাইরী

নদীর ওপর দিয়ে নদীর ঢালের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে
গম্ভীর কালো মেঘ; স্লেট-রং ভিজে ভারি আকাশ,
আরও ঘন হয়ে ঘিরে আছে নমিতা-দিদের বাড়ির চারিপাশ।

জানলায় ঝড়ো-হাওয়ায় পিঠের ওপর ভাঙা খোঁপা
খোলা চুল
অলগা হাওয়ায় উড়ছে; শাসনের ভঙ্গিতে হাতের মুদ্রা।

অধীর প্রতীক্ষায়, কার প্রতীক্ষায়? দেবদূতের বন্দনায়
তোমারও অঙ্গে কি আজ আকাশের বহ্নি, উত্তাপ?
প্রেমিক আসবে না; ঘোর বর্ষা। বর্ষাতি মাথায়
আজ কেউ বাইরে আসেনি।

নীলাঞ্জন...প্রিয় নীলাঞ্জন...
স্মৃতিকাতর বুক খালি করে উড়ে যায় অশ্রুর শব্দমালা।

ঘোরলাগা এই মন-খারাপ-সন্ধ্যায়
নমিতা-দি স্মৃতির বাকস থেকে জেমার তুলে আনো হারমোনিয়াম;
কিংবা এসো, পরেনো শীতলপাটি বিছিয়ে
আজ দুজনে ছেলেবেলার লুডো-খেলা খোলি।

কবিতা হারিয়ে যায় ॥

অমিয়কুমার হাটি

বেদনা কেন যে এত সুগভীর? অসুস্থ শরীর
একা কি এজন্য দায়ী? কী কেন বা গিয়েছে হারিয়ে!
সেটাই সর্বদা খুঁজি। মৃত্যু সেতো ভৃত্য ছাড়া নয়,
তার ও ভ্রূকুটি তুচ্ছ। তুচ্ছ নয় হারালাম যেটা।

বুদ্ধির ব্যাখ্যাকে মানি। অন্তরের ঘনঘটা মেটা
যদিও সম্ভব নয়, মুছে যায় মনের সঞ্চয়
তবুও পারিনা কেন বেদনাকে নিঃশেষে তাড়িয়ে
স্বস্তির ওষুধ খেতে? স্নায়ুশিরা আবেগে অধীর!

কবিতা হারিয়ে যায়। পাবো তাকে কোথায় ভরসা?
সমস্ত রাত্রির কোলে নিদ্রাহীন একা জেগে বসা!

নতুন বই

পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা। আশুতোষ ভট্টাচার্য। বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ৫।১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশের লোক সাহিত্য, সংস্কৃতি, লোকজীবনের সমাজভাবনা, ঐতিহাসিক সূত্র পরম্পরা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেছেন। পরিণত জীবনপর্বেও তাঁর এই ব্যাপারে নিরলস ও ঐকান্তিক প্রয়াস যে এতটুকুও স্তিমিত হয়নি, সম্প্রতি প্রকাশিত 'পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা' বইটি পড়ে কৃতজ্ঞার সঙ্গেই স্বীকার করতে হয়। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সুচিন্তিত লেখক।

এই মানস বৈশিষ্ট্যের ফলেই পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা বইটি সূক্ষ্ম, সুকুমার বৈশিষ্ট্য সমন্বিত হয়ে আলাদা মর্যাদা পাবার যোগ্য হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলার ছৌ মুখোস নৃত্যের দল নিয়ে তিনি কিছুকাল আগে ইউরোপের যে চারটি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি আমেরিকাতে কয়েকটি শহরেও গিয়েছিলেন। এই সমস্ত শহরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমন্ত্রণে যেসব অনুষ্ঠান করেন, তার মধ্য দিয়ে পশ্চিম বাংলার এই নূতন আবিষ্কৃত শিল্পরূপটির একটি শিক্ষাগত মূল্য ও মর্যাদাকেও সূক্ষ্ম করার সুযোগ পান। তিনি বুঝিয়ে বলেন যে, ছৌ-নৃত্যের মধ্যে আছে নাটক ও নতুন এক নৃত্যশৈলী।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য নিউইয়র্ক, কানাডা, বোস্টন, নিউ হ্যাম্পসায়ার, মিশিগান, ইলিনয়, সান ফ্রানসিসকো ইত্যাদির অন্তর্গত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদর আমন্ত্রণে ভারতীয় এই লোকশিল্পের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান করেন। এই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলির কৃতিত্ব হল, বিদেশে, বিশেষত আমেরিকার বিদগ্ধ মানুষ ভারতের মাটির সম্পদ যে লোকজাত শিল্প-সংস্কৃতি—তার প্রতি সশ্রদ্ধ হন। ডঃ ভট্টাচার্য বিস্তৃতভাবে তাঁর যাত্রা সুরু থেকে পুণ্যদেশে প্রত্যাবর্তন—এর মধ্যবর্তী উজ্জ্বল ঘটনাগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

'পুরুলিয়া থেকে আমেরিকা' বইটি আসলে আধা-ডায়েরী, আধা-ভ্রমণ কাহিনীর ঢঙে লেখা। ডায়েরীর অন্তরঙ্গতা, ভ্রমণ কাহিনীর নিরাশক্তি ও বিবৃতি—সমস্তই মেলে এ বইখানিতে। লেখক বর্ণনা করেছেন রম্য ভঙ্গিতে। বিশেষ ধরনের রম্য রচনা বললে এর আরও এক বৈশিষ্ট্য সম্ভবত পাঠকরা অস্বীকার করতে পারবেন না। ডঃ ভট্টাচার্যের লেখার সবচেয়ে বড় গুণ দুরূহ, জটিল বিষয়কে সহজ, সরল ভাষায় বর্ণনা করার ক্ষমতা। তাঁর রচনায় কোন দুর্বোধ্যতা নেই।

বিশাল গ্রন্থের শেষদিকে লেখক হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ রক্ষা প্রসঙ্গে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস ও তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্য সমৃদ্ধভাবে উপস্থিত করেছেন। এই প্রয়াস প্রশংসনীয় কারণ আমেরিকার প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিচয় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে থাকলেও মূল আমেরিকার থেকে যে তা স্বতন্ত্র এবং সেই কারণে উল্লেখ্য—তা লেখক বুঝেছেন। তাই এই অধ্যায়ের সংযোজন অভিনন্দনযোগ্য। পরিশিষ্টে মার্কিন দেশীয় পত্র-পত্রিকার পক্ষে ছৌ-সম্পর্কিত মতামতগুলির উল্লেখ থাকায় গ্রন্থটির গৌরব বেড়েছে। গ্রন্থে সংযোজিত আলোকচিত্র গ্রন্থের অলঙ্কার বিশেষ।

জ্ঞান মহারাজের সান্নিধ্যে। সম্পাদক—তারকনাথ আঢ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, ১৩।২, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির পথ, উত্তর ব্যাটরা, হাওড়া। চার টাকা।

জ্ঞান মহারাজ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ, ধর্মচেতনা, দর্শন ও আধ্যাত্মিক সাধনাতে জ্ঞান মহারাজ ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। বর্তমান বইটি তাঁর জীবন ও বাণীর একটি সঙ্কলন। জ্ঞান মহারাজের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্যে, তাঁদের কথোপকথন, মূল্যবান উপদেশ, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপ—এসব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। যাঁরা তাঁর ভক্ত শিষ্য, অনুরাগী, সর্বোপরি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারাকে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে মন ও মননে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা আলোচ্য গ্রন্থে এই ধারার আর একদিকের পরিচয় পাবেন।

গুহাচিত্র (কাব্য সংকলন): মৃণাল বসু চৌধুরী। গঙ্গোত্রী প্রকাশনী; ৪।১, আফতাব মসজিদ লেন, কলকাতা-২৭। চার টাকা।

মৃণাল বসু চৌধুরী একজন নিষ্ঠাবান আধুনিক কবি। কবিতার তারুণ্য এবং সেই সঙ্গে গভীর অভিজ্ঞতা কবিকে উল্লেখযোগ্য ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'গুহাচিত্র' কাব্য সংকলনে তার স্বাক্ষর পাওয়া গেল। চরণকে ভেঙে, কখনো বা স্তবকবন্ধে, অন্তর্মিলে, কখনো আবার বড় বড় চরণের ধ্বনিতরঙ্গে অদ্ভুত সাম্য ও অর্থ সম্পদ রেখে কাব্য রচনায় প্রয়াস তাঁকে পাঠকদের বিরক্তির সামনে হাজির করে না, বরং পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি অভিনন্দিত হন আধুনিক তরুণ কবি হিসেবে। প্রকৃতি, প্রেম, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি নিয়ে নিজের অনুভূতির দর্পণে মুখ রেখে 'গুহাচিত্রের ছোট-বড় মাপের কবিতাগুলিকে কবি ক্ষমতাব স্বাতন্ত্র্যে দীপ্ত করেছেন। 'গুহাচিত্র' নিঃসন্দেহে কবির আধুনিক কাব্য ভাবনার এক উজ্জ্বল নিদর্শন।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

বররুচি। সম্পাদনা মদনমোহন বৈতালিক এবং শ্যামলকান্তি দাশ। আবাসবাড়ি। তমলুক। মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর জেলার লিটল ম্যাগাজিনের তালিকায় বররুচি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। শীর্ণকায় হলেও এই কবিতা পত্রিকাটি সম্পাদনার কৃতিত্বে সাহিত্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সংখ্যায় লিখেছেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, সামসুল হক, শ্যামলকান্তি দাস, মদনমোহন বৈতালিক, বীতশোক ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে। কবিতা সম্পর্কিত নিবন্ধ লিখেছেন শান্তিকুমার ঘোষ।

॥নাট্যপিপাসুদের জন্য মফঃস্বল রঙ্গমঞ্চে অভিনয়োপযোগী দুটি মঞ্চ সফল নাটক॥

শ্রীকুণাল মুখোপাধ্যায়ের

পরিচয় ৪

(স্টারে অভিনীত)

অনন্যা ৪

(রঙমহলে অভিনীত)

প্রাপ্তিস্থান : বিহার সাহিত্য ভবন
৩৭এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

আগ্রহশীল পাঠক ও গবেষকবৃন্দের সাগ্রহ অনুরোধে প্রকাশিত হ'ল

কিরণশশী দে'র

॥ রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রামাণ্য সুর প্রসঙ্গ ॥

রবীন্দ্রনাথের সুর রচনা ও সুর প্রচার সম্পর্কীয় বহু অজানা তথ্য সম্বলিত গ্রন্থ। অবতরণিকা লিখেছেন—সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য : ছয় টাকা

গান্ধর্বী প্রকাশনী ঃ ১২ লেক এভিনু, কলিকাতা-২৬

আরতি মুখোপাধ্যায়

সত্যিকারের ভালো গান গাইতে হলে শিল্পীর পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন চিত্তশুদ্ধির। নির্মল চিত্তেই যথার্থ গানের ধ্বনি বেজে উঠতে পারে। এখন আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে বোঝার চেষ্টা করলে, অন্ততঃ তাঁর গানগুলি মনে মনে আবৃত্তি করলেও চিত্তশুদ্ধির কাজটা খুব সহজেই হয়ে যায়।

'বোম্বেতে আপনার লেটেস্ট ছবির গান কি কি?'

শ্যাম তেরে বংশী' ও 'কব গয়া কানহা' রবীন্দ্র জৈনের সংগীত পরিচালনায় গেয়েছি 'গীত গাথা চলে' ও 'তপস্বিনী' ছবিতে।

'গানগুলো আপনার মনের মতন হয়েছিলো?'

'একুকেবারে। কেন জানেন? রবীনবাবু দুটি গানের সুর দিয়েছেন রাগসংগীতের বেসিসে। প্রথমটি চারুকেশী। দ্বিতীয়টি বৈরাগী ভৈরো। কিন্তু শুধু রাগের জন্যই যে গানগুলি আমার মনের মত হয়েছে তা নয়। রাগঘেঁষা হলেই গান ভালো হবে না হলে খারাপ হবে এরকম কোনো গোঁড়ামো আমার নেই। ভালো গান হলেই আমার মনকে স্পর্শ করে।'

'এ গান দুটি মনকে স্পর্শ করেছে কি কারণে?'

'গায়কীর প্যাটার্ন, সুরের সৌন্দর্য এবং সুরপ্রয়োগের শিল্পকৌশল এইসব মিলিয়ে গান দুটির একটি বৈচিত্র্য এবং উন্নত মান আমায় মুগ্ধ করেছে।

চারুকেশী, কিরবাণী এই সব দাক্ষিণাত্যের রাগকে উত্তর ভারতে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন পন্ডিত রবিশংকর জ? কিন্তু কিরবাণীর সংগে সবাই যতখানি পরিচিত চারুকেশীর সংগে ঠিক ততখানি নয়—অথচ রাগটা খুবই মিষ্টি। 'শ্যাম তেরে বংশী' গানটিতে ঐ চারুদেশীর পর্দাই এত সুন্দর করে রবিজ্জী লাগিয়েছেন কি বলব। রাগের স্টিফ্‌নেস্‌ নেই কিন্তু মধুরতা আছে। ঘন পাতার আড়ালে লুকনো হাস্নাহেনার গন্ধের মতই যেন রাগের সৌরভে গানটি সুরভিত।

দ্বিতীয়টিতে ('কব গয়া কানহা') বৈরাগী ভিঁবোর কোমল করুণ নির্যাসটুকু দিয়েই যেন গানটির সৃষ্টি। সুরটি হঠাৎ শুনলে মনে হবে খুবই হাল্কা। তবু কিন্তু খুবই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে ঐ বৈরাগীর ছোঁয়াটুকু আছে বলে। রাগের ছোঁয়া কিভাবে, কোথায় কতটুকু লাগালে গানের মধ্যে প্রাণসঞ্চার হয় সেই বোধ যাঁর যত বেশী আছে তিনি ততখানি সার্থক সুরকার।

আবার রাগ ছাড়াই একটি গান গেয়েছি আমি ও কিশোরকুমার। কিশোরদার গলা হাল্কার ওপর ভারী মেলোডিয়াস। আর ছবির গানে উপযোগী ড্রামাটিক এফেক্ট সৃষ্টি করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ও'র আছে। ও'র সংগীত ব্যক্তিত্বের অনেকখানি জুড়ে আছে এই নাটকীয় বৈচিত্র্য। গত সপ্তাহে কয়েকদিনের জন্য যখন কোলকাতা এসেছিলেন—ও'র সাম্প্রতিক প্লে-ব্যাক গানের আলোচনা প্রসংগে বললেন আরতি মুখোপাধ্যায়।

'আমার গানের প্রেরণা ছিলেন প্রধানতঃ আমার মা (প্রভাবতী মুখোপাধ্যায়)। বাড়ীতে গানের আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন মা, বাবা ভাইবোন সবাই। জয়েন্ট ফ্যামিলীতে আমরা মানুষ। একে অপরের সহায়তা করে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নিজের কর্মক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে দিতেন। আমার দাদু ব্রিটিশ আমলের পি এম জি ছিলেন।

একালের গান

শিক্ষাদীক্ষা গান বাজনা সবেতেই ছিলো তাঁর প্রচন্ড অনুরাগ।

এই পশ্চাৎপট ত ছিলই। কিন্তু এসবেরও ওপরে ছিলো আমার মায়ের প্রভাব। মা যেন আমায় হাত ধরে গানের জগতে নিয়ে এলেন। তাঁরই ইচ্ছেয় বাসন্তী বিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম এবং সেইখানেই আমার সংগীত শিক্ষা সুরু। অনেক পরে ব্যাপকভাবে ক্ল্যাসিক্যাল ও অন্যান্য গানের শিক্ষা পেয়েছিলাম চিন্ময় লাহিড়ী, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সগীরুদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে। সগীরজীর কাছে আমি এখনও শিখি।

লাইট সং গাইবার প্রেরণা পেয়েছিলাম লতা মংগেশকার, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এঁদের গান শুনে। তাছাড়া আমাদের বাড়ীতে ওয়েস্টার্ন মিউজিশিয়ানদের অনেক রেকর্ড ছিলো। সেইসব শুনতে শুনতে অনুভব করতাম সুরের ধারা মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়।

আরও অনেক পরে। বড় হয়ে বুঝলাম ওটা শেখবার জিনিষ।

রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলাম দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে। রেকর্ডে কটা রবীন্দ্রসংগীত যতদূর মনে পড়ছে সাতখানা গান গান—'কর ঝর মুখর', 'কুসুমে কুসুমে চরণ চিহ্ন' 'কার চোখের চাওয়া' 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে', 'পূর্ণ চাঁদের মায়া' 'সহেনা যাতনা', 'মম চিত্তে'। রবীন্দ্রসংগীতের প্রিয় শিল্পী? অফ কোর্স জর্জদা। উনি রবীন্দ্রসংগীতকে সেই পর্যায়ে পৌঁছে দেন যাকে আপনারা বলেন, গানের সোল (আত্মা)। আর্টকে হয়ত কিছুটা ধরে রাখা যায়। কিন্তু ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টের দুর্বার উর্ধমুখীন প্রেরণা? এগিয়ে চলার উদ্দাম গতি? তাকে বাঁধবে কোন শক্তি? নির্ভয়ে, নিঃসংকোচে তাঁরা ছোটেন সকল বাধাকে ধূলিসাৎ করে দিতে দিতে। এই প্রেরণা ত আছেই। তার ওপর আছে বিধিদত্ত পুরুষালী কণ্ঠ। সব মিলিয়ে জর্জদা আমার কাছে একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

মায়ের মুখে কাদের গান শুনতাম? সুধীরলাল উৎপলা সেন যূথিকা রায়ের। রেকর্ডে 'মধুর আমার মায়ের হাসি' (সুধীরলাল), আনার কলির গান (লতা) 'সুর্য ওঠার স্বপ্ন নিয়ে', 'ওগো মোর গীতিময়' (সন্ধ্যা) শুনে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। বার বার ঐ সব রেকর্ড বাজাতাম আর অনুভব করতাম 'আই উইল হ্যাভ টু সিং লাইক দ্যাট'।

এটা কিন্তু অল্প বয়সের অপরিণত মনের ভাবনা। ইচ্ছে করলেই যে এটা হয় না, 'পারে যে সে আপনি পারে'—একথা বুঝছি এখন, মানে এত দিনে। আমার প্রথম আধুনিক গানের রেকর্ড 'বাঁশুরিয়ারে'।

এরই মধ্যে মুরারী স্মৃতিবার্ষিকী, সুবল স্মৃতিবার্ষিকী এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে এবং মুরারী স্মৃতিবার্ষিকীর প্রতিযোগিতায় পর পর তিন বছর ট্রফি পেয়ে বাইরে একটু একটু নামটা ছড়িয়ে পড়ছিলো। কারণ এই সব প্রতিষ্ঠানের পুরস্কারকে তখন সংগীতমহল খুবই সম্মানের চোখে দেখতেন। জাজদের মধ্যে ছিলেন শ্রদ্ধেয় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। ওরকম গুণী শিল্পী বিরল। উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন 'তুমি ফিল্মে গাইবে?' আমি ত অবাক। এত পরম সৌভাগ্যের কথা। উনি আবার আমায় জিজ্ঞেস করছেন? তখন ক্লাশ এইটে পড়ি। উনিই আমায় সংগে করে রবীন চ্যাটার্জির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। 'মামলার ফল' ছবিতে গেয়েছিলাম একটি বাউল ধরণের গান 'উমা কাঁদে'।

১৯৫৭ সালে প্রথম বোম্বের সংগে সোগাযোগ হোলো। মারফি রেডিও কম্পিটিশনে মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছিলাম আমি, ছেলেদের মধ্যে মহেন্দ্র কাপুর। বোম্বেতে সেই প্রথম যাওয়া। এই প্রতিযোগিতার বিচারকমন্ডলীতে ছিলেন নৌসাদ, শ্রীরামচন্দ্র রোসন অনিল বিশ্বাস ও মদনমোহন।

গানের পর এঁরা ছবিতে গাইবার অফার দিলেন। সেইটেই ছিলো এই কম্পিটিশনের পুরস্কার। 'অংগুলিমালা' ছবিতে প্রথম গাইলাম। নায়ক-নায়িকা ভারতভূষণ ও নিমি। সংগীত পরিচালক অনিল বিশ্বাস।

এরপর বসন্ত দেশাই-এর সংগীত পরিচালনায় 'দো ফুল' ছবিতে গেয়েছিলাম 'নটক নাচুরে'।

শংকর জয়কিষণের সুরে 'বয় ফ্রেন্ড' ছবিতে গেয়েছি পপসং-এর ধাঁচে 'আয়েগা এ কেয়া হো গয়া' এই সব গানের পথ বেয়েই বোম্বেতে আমার প্রথম পরিচিতি এবং স্বীকৃতিও।

তারপর এখানে চলে এলাম। শ্যামলবাবুর 'দেওয়া-নেওয়া' ছবিতে গাইলাম ওঁরই সুরে 'মাধবীর মধুতে'। ও ছবির সব গান খুব হিট করেছিলো জানেনই ত? সেই তালিকায় আমার গানটিও স্থান পেয়েছিলো।

সংগীতজীবনের অভিজ্ঞতায় প্রথম উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তন ঘটলো সুবর্ণরেখা ছবিতে। এ ছবিতে অনেকগুলি গান গেয়েছিলাম আর প্রাণভরে পেয়েছি যা চেয়েছিলাম গানের কাছে। ধ্রুপদ ধামার খেয়াল টপ্পা ঠুংরী এমন কি রবীন্দ্রসংগীত পর্যন্ত।

বাহাদুর খাঁ সাহেব (সংগীত পরিচালক) যেন আমার জন্যই গানগুলির সুর দিয়েছিলেন। গানগুলি গুণীসমাজে সমাদৃত হয়েছিলো। এটা ভাগ্যের কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু তার চেয়েও বড় সৌভাগ্য হোলো এইটি যে এসব গান গেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি এমন আত্মহারা মুহূর্ত জীবনে অল্পই এসেছে। অন্ততঃ 'সুবর্ণরেখা'র যুগের আগে ত আসেইনি।

এরপর এর মধ্যে তপন সিংহর 'গল্প হোলো সত্যি' ছবিতেও গান গেয়েছি। পর পর দু-বছর বি এফ জে এ পুরস্কার পেয়েছি।

তারপরই ছবিতে গাওয়ার যেন ঢল নামলো। একে একে গাইলাম 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার' 'কাম্যা' 'নিশীথে শংখবেলা'। প্রথমটি কালিপদ সেনের সংগীত পরিচালনায়। বাকীগুলি সুধীন দাশগুপ্তের সুরে। 'জোড়াদিঘীর চৌধুরী পরিবারে' গেয়েছিলাম 'পলাশের প্রান্তর'। বাকী তিনটিতে রবীন্দ্রসংগীত।

তারপরই স্মরণযোগ্য গানের অধ্যায় 'বিলম্বিত লয়' ছবিতে।

সুবর্ণরেখার পর এই ছবিটিই জীবনে যেন আবার নিয়ে এল গানের উল্লাস। এ ছবির সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ। এসব গানে নচিদা ক্ল্যাসিক্যাল পপ রোমান্টিক সব রকম সুর, ভাব ও ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং প্রত্যেকটিই রসোত্তীর্ণ। 'এক বৈশাখে' আঁকাবাঁকা পথে' এবং আরও দুটি গান ছাড়াও মান্নাবাবুর সংগে একটি ডুয়েট 'বেঁধোনা ফুলমালা ডোরে'—এসব গানের প্রত্যেকটিই এত জনপ্রিয় হয়েছিলো যে, আসরে গাইতে গেলেই ওসব গান গাইবার জোর তাগিদ আসত এবং এখনও আসে। এরপর 'ধন্যি মেয়ে' এবং আরও অন্যান্য ছবিতে গান গাওয়া চলছে। কিন্তু পরিতৃপ্তির প্রসাদে হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠার ঘটনা ঘটেছে ঐ দুটি ছবিতেই। আমার সংবাদ হোলো এই। ক্ষুদ্র মানুষ। তার চেয়েও ক্ষুদ্র জ্ঞানবুদ্ধির পরিধি'।

বিনম্র হাসিতে শিল্পী থামলেন।

'নিজেকে ক্ষুদ্র বলে বুঝতে পারার অবস্থা তো বিরাটের পদপ্রান্তে। পৌঁছবারই অধ্যায়। এ অধ্যায়ের অভিজ্ঞতা হয়ত 'সুবর্ণরেখা', 'বিলম্বিত লয়ে'র চেয়েও চমকপ্রদ হতে পারে'।

'আপনার কথাই যেন সত্যি হয়। কিন্তু এতক্ষণ ত আমিই একটানা বলে গেলাম। আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন না?'

'আপনি প্রথম যখন বোম্বেতে গিয়েছিলেন তখন ত নবাগতা কিশোরী, এখন সু-পরিচিতা এবং সু-প্রতিষ্ঠিতাও। বোম্বে, কোলকাতা দু'জায়গাতেই। প্রথমে বোম্বের প্রসংগেই আসি। পিপলস 'সং' বলতে যা বোঝায় সেটা ত সিনেমাই রেখেছে? অন্ততঃ এদেশে। সেই নিরিখেই প্রশ্ন করছি বোম্বেতে আপনি যখন প্রথমে গিয়েছিলেন তখনকার সংগে এখনকার যুগের গানের মেজাজ গতি প্রকৃতির কোনো তফাৎ আছে কী? যদি থাকে সেটা কী?

প্রথম যুগে ওখানের গান যেন মেলডির হাত ধরেই চলতো। সাদামাটা সুর, কখনও

রাগের কাছ-ঘেঁষা, কখনও তাও নয়। কিন্তু সুরের গতি ছিলো অব্যাহত এবং সেইজন্যই মনকে ছুঁতো।

তারপর এলো কেমন যেন একটা এলো-মেলো, অশান্ত যুগ। এটা হোলো গত চার-পাঁচ বছর আগের কথা। তখন গানের মধ্যে সংগীত মূল্যের চেয়ে ছবির প্রয়োজনে ড্রামাটিক এ্যাকশনই প্রধান হয়ে উঠলো। গানে সুরের চেয়ে চমকটাই বড় হয়ে ওঠার ফলে এমন একটা চটকদারী আকর্ষণের সৃষ্টি হোলো যেটা অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের খুব আমোদ যোগাতো। কিন্তু গানের মধ্যে যাঁরা সংগীতকে খোঁজেন এ যুগটা ছিলো যেন তাঁদের উপবাসের যুগ। এটা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলব এ যুগের গানেও বাণিজ্যিক সাফল্য নিশ্চয়ই ছিলো। নইলে যতটুকু স্থায়িত্ব পেয়েছে সেটা পেতো না যে কোনো সাফল্যের জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়। এই মূল্যটা হোলো ওদের মিউজিশিয়ানদের ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের যথার্থ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকেও ওরা দক্ষ। হারমণি সৃষ্টি করতে হলে কোন স্বরের সংগে তার বিপরীত স্বরকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয় কোন যন্ত্রের শব্দের সংগে অন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা যায় এসব বোধ ওদের পাকা। তাই ওদের রচিত দাপাদাপির গানের মধ্যেও কান পাতলে একটা সুসম ছন্দের ওঠাপড়া লক্ষ্য করা যায়। এইটিই হোলো শিক্ষিত সংগীত পরিচালকের সৃষ্টি।

তবে শুধুমাত্র ছবির প্রয়োজন অথবা মাস মেজরিটির মনোরঞ্জনের জন্য যার জন্ম উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়ার জন্যই তার আবেদন মনের গভীরে পৌঁছয় না। লঘু-ধর্মী গানের মধ্যে এমন কোনো সৌন্দর্য থাকতে পারে না যা মনের মধ্যে একটা মধুর ধ্বনি বাজতে পারে। এই চিরায়ত সৌন্দর্য-তৃষ্ণার তাগিদে রুচির গতির মোড় ফেরে কবির ভাষায় 'ভিতর পানে'।

গত এক বছর ধরে দেখছি বোম্বের ছবির সুরস্রষ্টারা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছেন। ওখানের উদ্যমতা এখন স্থির হয়ে আসছে। সুর বা মেলডির সংগে বুদ্ধি ও মনন-শীলতার ছোঁওয়ায় বোম্বে ছবির মিউজিক গভীরতার ছায়াই এখন প্রতিবিম্বিত।

মিউজিক সম্বন্ধে আপনার মনের ছবিটি?"

'আমার সংগীতচেতনা জাগিয়েছে কে এল সায়গলের গান। সায়গল ইজ দি সিংগার অফ সিংগারস। কণ্ঠ একসপ্রেসিভ বিউটি, ভাবগভীরতা সব মিলিয়ে সায়গল ইজ সায়গল। সায়গলের গানই আমার কাছে সম্পূর্ণ মিউজিকের প্রথম ধারণা।

অথচ 'এ'র যখন বাংলা গানের ক্ষেত্রে এলেন তখন সবে খেয়াল ঠুংরী ভেংগে বাংলা গান বা আধুনিক গান হচ্ছে। এ গান তখনও এত ডেভলপড হয়নি—কি হোলো? আপনি একটু উশখুশ করছেন মনে হচ্ছে। কিছু ভুল বললাম?'

'না। আপনার কথা আগে শেষ হোক। তারপর বলছি। মাঝখানে বলতে গেলে আপনার ভাবনার খেই হারিয়ে যাবে।'

'থ্যাংকু। সায়গলের পরই গান বলতে আমি বুঝি লতা মংগেশকারের গান। উনি যেন চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ফিল্মের গান কেমন করে গাইতে হয়। বুদ্ধি, স্বরক্ষেপণ থ্রো অফ ওয়ার্ড টু ক্রিয়েট ইমোশন এ্যান্ড ড্রামা, মেলডি এবং এই সবের ওপর সুরের শুদ্ধতা সব মিলিয়ে লতা একটা জাইগান্টিক ফিগার। কাব্য করে বলতে ইচ্ছে করে 'ও রূপের নাই তুলনা'।

'আপনি লতার খুব ভক্ত আপনার গান শুনলেই সেটা বোঝা যায়?'

আরতিকে খুব খুশী খুশী দেখায়। কিন্তু আপনি তখন কি যেন একটা বলব বলেছিলেন?'

'ধন্যবাদ। আপনি একটু আগেই সায়গলের কথা আলোচনা করতে করতে বললেন 'বাংলা গান এত 'ডেভলপড' ছিল না। এই 'এত ডেভলপড' কথাটির সংগে আমি একমত হতে পারছি না। গানের ক্ষেত্রে আমি একটু সেকাল-ঘেঁষা বলেই কিনা জানি না। জ্ঞান পরার পরই আপনি মায়ের মুখে কার কার গান শুনেছেন? অধিকাংশই সুরসাগর, সুধীরলাল, অজয় ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টা-চার্য, নজরুল—এ'দেরই ত? কিন্তু এসব গানের কথা ও সুরের ঐশ্বর্যর কাছে এখন-কার গান দাঁড়াতে পারে? এখনকার গানকে 'এত ডেভলপড' আপনি ঠিক কি অর্থে বলছেন?'

'মেলডির বিচারে তখনকার গানের আবেদনের ইউনিভার্সালিটি অনস্বীকার্য। কিন্তু সুর নিয়ে একসপেরিমেন্ট, ইমপ্রো-ভাইজেশন এসবেরও ত প্রয়োজন। আছে? সে দিক দিয়ে এখনকার সুরকাররা কিছু কাজ করেছেন বই কি? যেমন ধরুন সুধীন দাসগুপ্ত ওয়েস্টার্ণ ইস্টার্ণ দু ধরনের সুর নিয়েই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জন করেছেন।

নচিদা 'রিদম' ড্রামা দুয়ের সামঞ্জস্যে গানের মধ্যে এমন একটা ন্যাচারালিটি সৃষ্টি করতে পারেন—যেটা ভালো না লেগে উপায় নেই। যেমন 'জলে নেমোনা অধর ধৈ পাবে না' কিম্বা 'সেদিনের ভজহরি'।

সতীনাথবাবু গানের মধ্যে সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে যেন মনের সূক্ষ্ম ভাবগুলি মূর্ত করে তোলেন।

শ্যামল মিত্র সুরে ভারী সুন্দর একটা সুরের আবেশ সৃষ্টি করেন।

আর সলিলদা? ও'র গানে কি নেই? মেলডি, স্টোকাটো ফর্মের এ্যাপ্লিকেশন, এ্যাকশন, চমক, মাধুর্য সব মিলিয়ে সলিল চৌধুরী ইজ সলিল চৌধুরী। সুনীল গাংগুলির 'একটি স্বপ্নের কাছে রয়ে যাব ঋণী'র সংগে সলিলদার সুরের মিলন, কি দারুণ সুন্দর?

কিংবা ধরুন না 'না যেও না' কথাগুলি হয়ত রাবীন্দ্রিক। কিন্তু সুরের মধ্যে সলিলদার শীলমোহর কি ভুল হবার?

আর 'বাঁশী কে বাজায় 'যারে উড়ে যারে পাখী' এসব গানের মধ্যে সুরের একটা আলাদা মজা নেই?'

'অবশ্যই আছে। কিন্তু যতই মজা থাক আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা যতই চলুক।—ইমপ্রোভাইজড ক্যাটেগরীর একসপেরিমেন্ট কতগুলি বিশেষ মুহূর্তেই ভাল লাগে। কিন্তু গানের সমে ফেরার মতই শান্তি আর আনন্দ জাগে যখন শুনি সুধীনবাবুর 'সোনার হাতে সোনার কাঁকন' (সতীনাথ মুখার্জির রেকর্ড) নচিকেতা ঘোষের 'মেঘ কালো আঁধার কালো' (হেমন্ত মুখার্জি) আর সলিলদার 'না যেওনা' ধরনের গান গুলি। ছন্দ ড্রামা নিয়ে এ'রা যতই একস-পেরিমেন্ট করুন না, এসব একসপেরিমেন্টে মেলডির ক্যারেকটার পাল্টানোর রূপটা দেখার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ নিশ্চয়ই আছে। তবু মনটা খুশী হয়ে উঠেছিলো এইবারই বিশেষ একটি সিরিয়াস পংকজবাবুর মেঘ-নিবিড় কণ্ঠে শুনলাম 'ও-কেন গেল চলে-?' —মনে হল এই ধরনের গানের জন্যই মনটা বুঝি তৃষিত চাতকের মতই প্রতীক্ষা করছিল।'

এ বস্তু এখনকার গানে কই?

আপনার সংগে আমিও এ বিষয়ে এক-মত। কিন্তু আপনি যে গানটির কথা বললেন ভাবগভীরতায় সুরের মাধুর্যে কিংবদন্তীর সংগীতনায়ক পংকজ মল্লিকের সে গান চিরকালের সম্পদ।'

'এবং সেই জন্যই এ গানের মধ্যে একটা ক্ল্যাসিক বিউটি আছে?'

'নিশ্চয়ই।'

'এটা এখনকার গানে নেই কেন?'

'দেখুন এ প্রশ্ন যে আমারও মনে জাগে নি তা নয়। যখন দেখেছিলাম আমার রাগ-প্রধান (সরস্বতী) ও তারাণার রেকর্ডও শ্রোতারা খুবই পছন্দ করেছেন। কিংবা লোকসংগীতে এল পি ডিস্কে 'হরি দিন ত গেল' অথবা লালন ফকীরের গানও সবাই নিয়েছে। এখন আমার নিজেকে জানবার সময়। নিজেকে সংশোধন করে নেবার সময়। আপনার মত আমিও যে একথা ভাবি না তা নয়?'

'ভেবে কি পেলেন?'

ছুটিতে 'আমার হাত ধরে তুমি' গানটি শুধু আমার নয় সবারই মনে একটা নাড়া দিয়েছিলো। কেন? গানটির কথা ও সুর সাদাসিধে। কিন্তু এ্যাপ্লিকেশন অথবা গাইবার তন্ময়তা যে কোন কারণেই হোক গানটিকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে যে একে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও বলা যায় আবার হিউম্যান ইমোশনের টাচও অনুভব করা যায়। কেন? কি আছে এ গানে? এ গান শান্তি রসাশ্রিত। এর মধ্যে আছে শান্তি। আছে মাধুর্য। তা বলে যে গাইবে সেই কি এ গানের মর্মের এই শান্তির ভাবটা অন্যের হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারবে?

পারবে না। কারণ নিজের মধ্যে শান্তির অনুভূতি না এলে গানে শান্তির ভাব আনা যায় না। আর এ শান্তি আনতে না পারলে অপরকে শান্তি দেওয়াও যায় না। বোধহয় এই শান্তি এখনকার গীতিকার, সুরকার এবং আমাদেরও মানে শিল্পীদের মনে নেই। তাই আমাদের গান শ্রোতাদের মনকে শান্ত করতে পারে না। কিছু শ্রোতাকে সুরের চটকে কিছুক্ষণ মাতিয়ে রাখে। যেসব গানে চিত্তের স্থিরতা আছে, সেইসব গানই সকল শ্রেণীর শ্রোতার ভালো লাগে।'

'আর একটি কথা। এখন তুলনামূলক বিচারে আধুনিক গানের চেয়ে রবীন্দ্রসংগীতের আসরের সংখ্যাই বেশী। আধুনিক গানের আসরের শ্রোতাদের স্টার আর্টিস্টদের কাছে সিনেমার গান শোনার আগ্রহ যতখানি —সত্যিকারের গানের আগ্রহ ততখানি নয়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সতীনাথ মুখার্জি, শ্যামল মিত্র, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়—এ'দের আসরে ভীড়ের অভাব হয় না। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের এক আসরেও দেখেছি রুচিশীল শ্রোতৃসমাগম। জুনিয়র আর্টিস্টদের শোনার জন্য এ'রা তেমন আগ্রহ নন। কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতে তরুণেতর শিল্পীগোষ্ঠির চাহিদাও যথেষ্ট। এর কারণ?'

'নিশ্চয়ই কথা ও সুর মিলিয়ে উচ্চাঙ্গের লিরিক্যাল ভ্যালুর জন্য। শিল্পীর চেয়ে এখানে গানটাই বড়। রবীন্দ্রসংগীতের আসরে চোখ বুজে শুধু কথাগুলো শুনলেও অনেক কাজ হয়।

তারওপর অনবদ্য সুরের অবদান ত আছেই।'

'সেই কথা ত আমিও বলছি সুর যদি বা এক-আধটা গানের উতরে যায় কথার বিস্তৃতায় বাংলা গান যেন আজ ধু-ধু সাহারা। এর কারণ কি? এ ক্ষেত্রে প্রতিভার অভাব? এটাই বা কি করে হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই এক একটা যুগ আসে যখন প্রতিভার প্রাচুর্য যে কোন ক্ষেত্রেই স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করে। কিন্তু একেবারে প্রতিভাহীন যুগ কি হয়?'

'না হয় না। আমাদের যুগেও ট্যালেন্ট নিশ্চয় আছে। তবে নানান সংঘাতে সাপ্রেশড্। স্বতঃস্ফূর্ত গতিকে ব্যাহত করে শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাড়নায় প্রতিভাকে কাজে লাগালে তার সে ধার বা দীপ্তি থাকা কি সম্ভব?

আজ আমরা যে স্বপ্ন দেখতে ভুলে যাচ্ছি। শিল্পীই বলুন গীতিকারই বলুন, কি সুরকারই বলুন যদি স্বপ্ন দেখতে না পারে গানে সেই রং ফুটবে কেমন করে? আমাদের চিন্তা সাধনা ধ্যান সব কিছু যদি একটা মহৎ ভাবের পর্যায়ে না পৌঁছয় তাহলে কোনো শক্তিশালী সংগীতব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে না। আর এই শিল্পী যদি এই ভাবের ভাবুক না হন শ্রোতাদের মনকেও সেখানে পৌঁছে দিতে পারেন না। হয়ত সেই জন্যই সবাই এখন রবীন্দ্রসংগীত অথবা লোকসংগীতের দিকে ঝুঁকেছেন।

খুব সুন্দর বলেছেন। সন্ধানী মন না হলে এমন করে বিশ্লেষণ করা যায় না।

আমি সবসময় নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করি। যখন সময় পাই তখনই। সেইজন্যই চট করে অন্যকে সমালোচনা করাটা আসে না। মনে হয় হু অ্যাম আই টু क्रিটিসাইজ আদারস?'

আর অন্যের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল হওয়া দরকার। মানুষকে বোঝবার চেষ্টা বা অনুভূতি যার যত প্রবল তিনি ততবড় শিল্পী। বড় বড় শিল্পীদের দেখে এই কথাটিই মনে হয়েছে। আর এ বোধ সবচেয়ে বেশী জাগিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এখন আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার চেষ্টা করলে তাঁর গানগুলি মনে মনে আবৃত্তি করলেও চিত্তশুদ্ধির কাজটা খুব সহজেই হয়ে যায়।

হেমন্তদা আসরে আজকাল বেশীর ভাগই রবীন্দ্রসংগীত গান। ওঁর আধুনিক গানের আসরের গানেও অন্তত ফিফটি পারসেন্ট রবীন্দ্রসংগীত থাকেই। আমার মনে হয় এইজন্যই আজও উনি ফুরিয়ে যাননি। রবীন্দ্রসংগীত গাইতে গাইতেই ওঁর মধ্যে এমন একটা সৌন্দর্যবোধ এসেছে যে উনি কখনও সস্তা দরের আধুনিক গান গাইতেই পারেন না। হেমন্তদার মতন এমন লিরিক কনশাস আর্টিস্ট সারা ভারতবর্ষে নেই। আর কণ্ঠের যাদু ত আছেই।

আমি এ বিষয়ে আপনার সংগে একমত। আপনি বাইরে কোথায় কোথায় গেছেন?

মান্নাদা আর আমি একসংগে আফ্রিকা মরিশাস এবং ঐসব দেশে গেয়ে এসেছি। ওখানে বেশীর ভাগ শ্রোতাই অবাঙালী ভারতীয়। এবং ছবির গানই ভালবাসেন। হিন্দী গানের রেকর্ড এদেশের মার্কেটে আসার আগেই ওদেশে যেন ঝড়ের বেগে উড়ে চলে যায়।

বোম্বেতে সম্প্রতি কোন কোন পরিচালকের সংগে কাজ করেছেন এবং করছেন।

লক্ষ্মীকান্ত পিয়ারীলাল কল্যাণজী আনন্দজী বাপি লাহিড়ী রবীন্দ্র জৈন জয়দেব শংকর জয়কিষণ স্বপন জগমোহন সারদা চাঁদ পরদেশী।

এ বছর এবার ওখানে সুরশৃংগার থেকে মিঞা তানসেন পুরস্কার পেয়েছি।

এ বছরটা তাহলে আপনার বেডলেটার ইয়ার বলা যায়? এখানেও ত অনেক প্রাইজ পেয়েছেন শুনেছি।

এবার ছুটির ফাঁদের গানের জন্য বি এফ জে এ প্রাইজ পেয়েছি প্রসাদ পুরস্কার চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির পুরস্কার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরস্কার পেয়েছি।

আপনি নিজে কোনো গানে সুর দেননি?

হাসিমুখের হাসি এবার হোলো উজ্জ্বলতর আমি নিজেকে এখনও সুরকার বলে মনেই করি না। এখনও মাথার ওপর কত গুরুতুল্য সুরকার রয়েছেন? বড়দের স্নেহছায়ায় যদি আরামে কাটানো যায় দরকার কি ওসব ঝুঁকি নেবার?

আমি শুধু এইটুকুই বুঝি রুচির ভোজে সুন্দর কিছু নিতে হলে নিজেকে আরো তৈরী করতে হবে। এই মানসিক প্রস্তুতির জন্যই আরো অনেক অনেক শিখতে চাই। যখন যার কাছেই কাজ করি চেষ্টা করি তাঁর কাছে থেকে কিছু শিখতে আহরণ করতে। শিক্ষা না থাকলে শিল্পী ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ ঘটতে পারে না। সে ব্যক্তিত্বের পরিধি এতটুকুই হোক আর এতবড়ই হোক। মনটা যদি গ্রোয়িং না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমি ফুরিয়ে গেছি। টু বি ফ্রেশ ইউ উইল হ্যাভ টু লার্ন সামথিং।

আর একটা কথা। নিজের প্রকাশভংগি শিল্পধর্ম এবং সার্থকতা প্রতিটি শিল্পীকে নিজেই খুঁজে নিতে হবে। ঈশ্বর প্রতিভা দিয়েছেন। কিন্তু সে প্রতিভাকে যথাযথ পথ পরিচালিত করে নিজেদের গড়ে তোলবার দায়িত্ব আমাদেরই। এ দায়িত্ব পালন না করা মানে তাঁর দানের অমর্যাদা করা।

সন্ধ্যা সেন

রবীন বল

শৈব্যা পুস্তকালয়

শিশু সাহিত্যকে বাঁচাতে পারেন একমাত্র সরকার। শিশু-সাহিত্যের জন্যে গ্রামগঞ্জে জেলায় নানা লাইব্রেরীতে একটা শিশু-দের র‍্যাক থাকা উচিত। সারা বছরে সরকার যে লক্ষ লক্ষ টাকা সমস্ত লাইব্রেরীদের বই কেনার জন্যে দেন তার মধ্যে শিশু-সাহি-ত্যের জন্যে কিছুটা অংশ থাকলে তবেই শিশু-সাহিত্যের আরো প্রসার ঘটবে।

বেশ কিছুদিন আগে।

তা ধরুন প্রায় বছরখানেক আগের কথা হবে। পরিচিত একটি পত্রিকার কার্যকরী সম্পাদকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় নামতে উনি বললেন—চলুন আমিও দক্ষিণে যাবো, একসঙ্গে যাওয়া যাক। গাড়িতে আমার একপাশে বসেছিলেন দে'জের সুধাংশু, আর ডানপাশে যিনি বসেছিলেন তাঁকে আমি এর আগে কখনো দেখিনি, সুধাংশুরই বয়সী হবেন। পরিচয় হোলো রবীনবাবুর সঙ্গে। শৈব্যার রবীন বল। শৈব্যার প্রকাশনীর দিকটা দেখছেন। বিনয়ী যুবকটিকে চোখ দিয়ে এবার জরিপ করে নিয়ে দেখলুম—উজ্জ্বল, উচ্ছ্বল, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, অনেক কিছু করার আকাঙ্ক্ষা। একথা সেকথার পর আমরা যে যার পথে নেমে পড়লুম। কিন্তু মুখটিকে আমার খুব ভালো লেগে গেল।

তারপর আমার যা হয়। ভুলেই মেরে দিয়েছি। ব্যস্ত কলকাতায় প্রতিদিন এত লোকের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হয়, যে আড়ালের মুখগুলো ছবি থেকে প্রতিচ্ছবি হতে হতে একসময় কখন যেন ফিকে হয়ে আসে।

নিতাইবাবু অর্থাৎ নিতাইচন্দ্র বলের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিন আগের থেকে। আলাপ ছিল নানা সূত্রে। সেলস কাউন্টারে ওপথে যেতে গিয়ে প্রায়ই দেখা হয়। বইয়ের বাজার নিয়ে আলোচনা করেছি অনেকবার। বলেছিলুম—একদিন আসছি এবার কাজ নিয়ে। এবার সত্যি সত্যিই শৈব্যায় যেতে নিতাইবাবু বললেন আমাদের পাবলিশিং-এর দিকটা দেখছে আমার ভাই রবীন, ওই সব বলতে পারবে।

সে কি! আর আপনি?

—আমি সেলস, এই যে দেখছেন। দেখলুম—ছোট্ট দোকানটায় ভিড় উপচে পড়ছে এ তাক সে তাক থেকে লাইব্রেরী দোকানের খদ্দেরের জন্যে হাজার নামের বই বের করে দিচ্ছেন কর্মচারীরা। 'শৈব্যা' বই পাড়ার বেশ নামকরা হোল সেলার। 'দেজ'-এর মতো অতো বিরাট না হলেও বেশ উল্লেখ করার মতো।

দোকানে একটুও বসার জায়গা নেই। দাদা একজন কর্মচারীকে দিয়ে ওঁদের অফিসে পাঠালেন। এদিক ওদিক ঘুরে এঁকে বেঁকে একসময় সুইংডোর খুলে ভেতরে বসতে বলে কর্মচারীটি চলে যেতে আরে আসুন আসুন শান্ডিল্য দা' চেয়ার থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে যে যুবকটি আমায় অভ্যর্থনা করলেন, বিশ্বাস করুন তাকে আমি সে মুহূর্তে চিনতে পারলুম না। মনে পড়ছে?'

—মনে নেই সেইবার সেই গাড়ি করে আমরা একসঙ্গে কবি দিনেশ দাসের বাড়িতে গেলুম।

—ইস্ কি লজ্জার ব্যাপার, স্যরি, ভেরী স্যরি। রবীনবাবু এত পাল্টেছেন এই কটা মাসে?

রবীনবাবু শুধু নিজের চেহারাটাই পাল্টাননি। শৈব্যা'র পুরো চেহারাটা আস্তে আস্তে পাল্টে দিচ্ছেন। একটু অবাক করে দেওয়ার মতো এই পাল্টানো। তা না হলে শৈব্যা'র বয়স আর কতো এর মধ্যে সে শুধু প্রকাশনী বা হোলসেলিং হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেনি। বছরের সাহিত্য পুর-স্কারে নিজেরা পুরস্কার দিচ্ছেন। কিন্তু শৈব্যা যখন হয়েছিল, তখন ছিলেন একা সেজদা রণজিৎকুমার বল। খুব ছোট করে শুরু করেছিলেন, গোড়ার দিকে যা হয়। ঢাকার সুত্রাপুর থেকে কলকাতায় এসে নিজের পায়ে দাঁড়ানো, চাট্টিখানি কথা নয়। ফলে যা হবার তাই হোলো লড়াই। অস্তিত্বকে জিইয়ে রাখার লড়াই। গোড়ার দিকে যা হয়। সেই স্কুল বই বিক্রির কমিশন আর সিজনের জন্যে বসে থাকা। এভাবে একটু একটু করে বাড়তে বাড়তে ৬১ সাল এলো এবার সেজদা রণজিৎকুমার বল স্কুল-বই প্রকাশ করতে শুরু করলেন—শৈব্যা একধাপ এগুলো। শৈব্যা যখন এগিয়ে যাচ্ছে তখন আসানসোলে স্ট্রোকে হঠাৎ রণজিৎবাবু মারা গেলেন। অকাল তো বটেই, তার উপর পরিবারে যেন আচমকা একটা বাজ ভেঙে পড়লো। শৈব্যাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বুকে শোক চেপেই বড়দা গোপালচন্দ্র বল ও সেজদা নিতাইচন্দ্র বল এসে দোকানের হাল ধরলেন। ইতিমধ্যে সেজদাই ছোটদের বই প্রকাশ শুরু করে দিয়েছিলেন। রবীনবাবু সরকারী চাকরী-বাকরী ছেড়ে দিয়ে, এবার প্রকাশনী নিয়েই

সাহিত্যের নেপথ্যে

ভাবতে শুরু করলেন। ভাবা সুরু শিশু-সাহিত্য থেকেই।

আজব এই দেশ। এখানে অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেছি। প্রথমত যারা শিশুসাহিত্য, একমাত্র শিশু সাহিত্যই করেন তাদের এক-কথায় আগেই অচ্ছুৎ করে রেখে দিই। কোন আধুনিক সাহিত্যিক বেশ কিছুদিন ধরেই যদি দেখি তিনি বাচ্চাদের নিয়ে ভাবছেন। ব্যাস তাহলে আর দেখতে হবে না, তাঁর হয়ে গেল। বেশ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত দেব-সাহিত্য কুটির-এর সেই আজব কভারে মোড়া অনুবাদ এবং কিছু মৌলিক লেখা ছাড়া কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা 'ঠাকুমার ঝুলি' উপেন্দ্রকিশোর থেকে 'আবোল তাবোলে' অব্দি এসে থমকে ছিলাম। বাঁধ ভেঙ্গে দিলেন বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, যোগেন্দ্র গুপ্ত এবং পরে লীলা মজুমদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় প্রমুখেরা। শিশু সাহিত্য শুধু অনুবাদ থেকে এবার স্বতন্ত্র আসন নিল। তা নিলে কি হবে। আজো পর্যন্ত শতকরা আশী ভাগ প্রকাশকেরা বাচ্চাদের রিসক্ নিতে কক্ষনো রাজী হবে না।

অথচ আশ্চর্যভাবে এদ্দিনে 'শৈব্যা' প্রায় অবাক করে দিয়েছে ২৫।২৬টা বই বের করে। কে নেই। আছেন উপেন্দ্রকিশোর, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, স্বপনবুড়ো, দক্ষিণারঞ্জন বসু, মনি বাগচী। আছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মুস্তাফা সিরাজ থেকে শুরু করে বন্দনা গুপ্ত অব্দি।

—আচ্ছা রবীনবাবু, এই যে ছোটদের বই বের করছেন, এর বাজার এখন কি রকম? অন্যান্য প্রকাশকেরা ঠিক তেমনিভাবে এগিয়ে আসছেন না কেন বলুন তো?

একটা ব্যাপার কি জানেন? এটা সত্যিই একটা রিসক্। যেমন ধরুন যেহেতু ছোটদের বই সুতরাং একটু আপনাকে কালারফুল করতেই হবে। আর কালারফুল করার মানে জানেন তো? ব্লক : ব্লকের দাম বেড়েছে। রং : ইমপ্রেশনের দাম বেড়েছে। কাগজ : ভালো কাগজের দাম মানে, ভাবা যায় না। ছোটদের বইতো অ্যান্টিক-ট্যাস্টিকে করা যায় না। আবার দাম বেশী বাড়ানোরও একটা অসুবিধে আছে তাহলে আবার বিক্রি করা যায় না, অত দাম দিয়ে কিনবে কে? ফলে ধরি মাছ না ছুঁই পানি করে না এগুলে উপায় নেই।

—তাহলে কি করে বের করছেন?

: হাজার কপি আস্তে আস্তে করে চলে যায়। কিন্তু টাকাটা অনেক দিন ধের আটকে থাকে। প্রকাশকদের টাকা আটকে থাকাটাই অসুবিধে। টাকাটাকে রোল করতে দিতে হয়। এই রোল করতে করতেই টাকা থেকে টাকা বেরিয়ে আসে।

—আচ্ছা, একটা ব্যাপার বলুন তো.—এতো একটা স্থায়ী সমস্যা, এ থেকে তো আমাদের বেরুবার উপায় নেই। কিভাবে আপনারা এর সমাধানের কথা ভাবছেন বলুন তো?

: সমাধান বা সহযোগিতা অবশ্য একপক্ষই করতে পারেন। তা হল সরকার। না, আমি নতুন কোনো সরকারী অর্থ বিনিয়োগের কথা বলছি না। ধরুন, ৮০০০ স্কুল। এখানে সরকার ইচ্ছে করলে শিশু-সাহিত্য সংযোজন করতে পারেন। প্রতি বছর সরকার কয়েক লক্ষ টাকা দেন ডিস্ট্রিক্ট্ সোস্যাল এডুকেশন অফিসে থেকে বড়দের লাইব্রেরীতে বই কেনার জন্যে। বেশ, ভালো কথা, কিন্তু ধরুন, সব লাইব্রেরীতেই কি একটা শিশুদের র‍্যাক করা যায় না? নানারকমের বই। ছবি ছড়া থেকে শুরু করে জ্ঞান বিজ্ঞান ভ্রমণ অব্দি। রাখা যায় না? বলুন, তাহলে শহর ছাড়িয়ে গ্রাম-গঞ্জেও তো শিশু সাহিত্যের আরো প্রসার ঘটে। এখন অবশ্য আরেকটা নতুন স্কীম-এ বই কেনা হয়—রাজা রামমোহন রায় ফাউ: ন্ডেশন তহবিল। এভাবে সব দিক দিয়ে সহযোগিতা পেলে বাজারে আরো বেশী বই যাবে। এবং বেশী মুদ্রণ হলে অবশ্য প্রকাশন সংস্থা শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে মনোযোগী হবেন। শিশু সাহিত্য আরো বেশী প্রসার ঘটবে। তাছাড়া দিল্লীতে যেমন চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট আছে, সেরকম যদি এখানে আঞ্চলিক ভাষায় করা যায়।

—কিন্তু ধরুন, এ-সবের কিছুই হোলো না, তাহলে? তাহলে আপনারা কিভাবে এগুবেন?

: এগুবো মানে, এভাবেই এগুতে হবে, তাছাড়া এখন অবশ্য শিশুসাহিত্য একটু বেশী যাচ্ছে। অনেক নামী দামী প্রকাশক সংস্থাও এগিয়ে আসছেন। তাছাড়া আমরা আশায় আছি। আসছে ৭৭ সালে সম্ভবত বিশ্ব শিশু দিবস উদযাপিত হবে। সরকার পক্ষ থেকে আশা করি প্রকাশক লেখকু সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ব্যাপকভাবে কিছু ভাববেন। তবে একটা কথা কি জানেন, দে' ডি-এম বা নাথ ব্রাদার্সের মতো আমরাও হোলসেলার। অতবড় না হলেও যেহেতু আমরা হোল-সেলার, প্রকাশক হিসেবে একটা সুবিধে আছে।

—কি রকম?

: ধরুন আমাদের তো নানা লেখকের নানা রকমের বই বিক্রী করতে হয় ফলে নিজস্ব প্রকাশনীর বই পুশ করতে কষ্ট হয় না, তাছাড়া অন্য প্রকাশকেরা বিক্রী করলে যেমন আমাদের সঙ্গে বই বিক্রির চুক্তি হয় কমিশন ভিত্তিক, এক্ষেত্রে তাও আমাদের দিতে হচ্ছে না। ফলে একটা মেক-আপ্ হয়ে যায়।

তাহলে বড়দের বইয়ের কথা ভাবছেন না।

: ভাবছি না মানে। এখন আমরা বড়দের কথাই পাশাপাশি ভাবছি। ইতি-মধ্যেই আমরা অনেকটা এগিয়েছি। এই কিছুদিন আগে বেরিয়েছে—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'কোন মনে বনে' প্রফুল্ল রায়ের 'মানুষের জন্য' সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোপনে নির্জনে'। আমাদের ইচ্ছে আছে একসঙ্গে গল্প উপন্যাস সমালোচনার গ্রন্থ সমানভাবে প্রকাশ করে যাবো। ইতিমধ্যেই অমিতাভ চৌধুরীর সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। দিলীপ মালাকারের 'শিল্পী রবীন্দ্রনাথ' ও আমরা ছাপছি।

চুক্তিবদ্ধ হয়েছি আরও অনেক প্রবীন ও নবীন সাহিত্যিকদের সঙ্গে।

—কবিতা গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু ভাবছেন?

: নিশ্চয়ই। আজকাল গল্প উপন্যাস প্রবন্ধের মতো কবিতার বই বিক্রি হচ্ছে। এ ব্যাপারটা ৫।৬ বছর আগে এত ছিল না। আপনাকে আগেই বলেছি যে আমরা যেহেতু হোল সেলার যেহেতু আমরা বুঝতে পারি বাজারে নিয়মিত-ভাবে কোন লেখকের কি কি বিষয়ের বই জনপ্রিয় হচ্ছে। ফলে আমাদের বুঝতে একটু সুবিধে হয়। —ঠিক কিভাবে ভাবছেন?

আমরা ঠিক খুচরো একটা বই ছাপার চেয়ে কবিতায় এক একজন কবিকে লিস্টে এনে তার বিভিন্ন দশক বা সমগ্রের সমস্ত কবিতা থেকে বাছাই করা কবিতা নিয়ে তার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতার বই বের করা যাতে করে কবিকে একটু বেশী করে জানবার কিংবা তার বিবর্তন কিংবা তাকে আরো বেশী আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যায়। এটা ঠিক শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজ নয় ধরা যাক অমুকের নির্বাচিত কবিতা বা

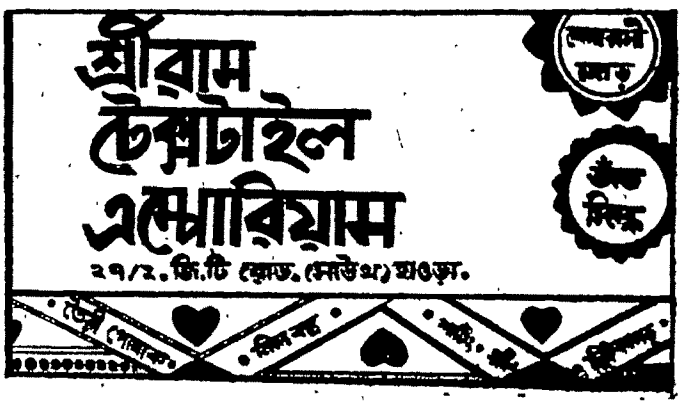

সময়ের কবিতা। ঠিক এক্ষুনি খুব একটা বেশী কবির কথা ভাবিনি। তবে যাদের কথা প্রথম পর্যায়ে ভেবেছি তাঁরা হলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, প্রমুখের কথা। ইতিমধ্যেই শক্তিবাবু একটা বই দিয়ে গেছেন।

শৈব্যাতে গেলেই দেখতে পাবেন—বই বই আর বইয়ের পাহাড়ের ওপরে দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবি। ছবিটাতে বোধহয় চন্দনের ফোঁটা দেওয়া হয় দাগ কখনো মিলোতে দেখিনি। ছবিটা সেজদা রণজিৎ বলের যার স্মৃতির উদ্দেশে শৈব্যা প্রতি বছর সাহিত্যিকদের দিচ্ছেন রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার পাঁচ ভাই-এর। তাঁরজন। এখনো একসঙ্গে শোক পরিবারে মিলে-মিশে বাস। আমি একটু অবাক হয়ে লক্ষ করছিলুম দেজের সঙ্গে শৈব্যার কি অদ্ভুত মিল। ববীন যেন সুধাংশু। প্রকাশনী দেখছেন। বড়ভাই ও মেজভাই, দেখছেন সেলস আর দেজের মতো ছোট ভাই

আজকের চিত্রশিল্পী

২১শে মে '৭৬ সংখ্যা অমৃতে 'আজকের চিত্রশিল্পী' পর্যায়ে শ্রীপ্রশান্ত দাঁ মহাশয়ের লেখা শিল্পী রামকিঙ্কর বেজ-এর উপরে নিবন্ধটি পড়লাম।

প্রসঙ্গত ১৯৭৫-এর শীতে আমরা শান্তিনিকেতনে গিয়ে শিল্পীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমাদের মধ্যে প্রায় তিনঘণ্টা কথোপকথন হয়। সে সময়ে তিনি নিজ বিষয়ে কিছু কথা আমাদের বলেন। নিবন্ধ লেখকের বিবৃতির সঙ্গে শিল্পীর সেই আত্মকথনের কিছু অমিল লক্ষ্য করলাম।

নিবন্ধকার জানিয়েছেন, 'বাঁকুড়ার বাগীপাড়ায় তাঁর জন্ম' এবং 'বেজ পদবী এসেছে বৈদ্য থেকে।' রামকিঙ্করবাবু আমাদের বলেছিলেন, তিনি জন্মসূত্রে সাঁওতাল। সোজাসুজি না বললেও প্রশান্তবাবু সম্ভবত এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে শিল্পী বাঙ্গালী। কারণ 'বাঁকুড়া' বঙ্গদেশে অবস্থিত এবং 'বৈদ্য' প্রধানত বাঙালী পদবী। অবশ্য শিল্পীর জন্মস্থানটুকুই কেবল উনি জানিয়েছেন। তাঁদের আদিপুরুষের জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয়ত বাঁকুড়ার স্বদেশী মেলায় তাঁকে আবিষ্কার করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নন্দলাল বসুর হাতে তুলে দেন—প্রশান্তবাবু এ-রকম বলেছেন। কিন্তু শিল্পী নিজে এ-প্রসঙ্গে বলার সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কোন উল্লেখ করেননি। নন্দলাল বসু বাঁকুড়ায় গিয়ে তাঁর কাজ দেখে খুশী হয়ে তাঁকে সঙ্গে করে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন—এ-রকম বলেছেন।

আমরা এ-বিষয়ে শ্রীপ্রশান্ত দাঁ-এর কাছে এবং সম্ভব হলে শ্রদ্ধেয় শিল্পীর কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।

আশা করি এ-অনুরোধ সভার স্বার্থেই রাখা হবে।

মিহিরকুমার মরোরি
রবীন্দ্র মল্লিক
বাদরা, কলকাতা-৫১
২৪শে মে, ১৯৭৬

একালের গান

১৬শ বর্ষের ২য় সংখ্যা 'অমৃত' দেখে সুখী হলাম। পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধতর ও উন্নততর করার জন্য আমাদের অভিনন্দন জানবেন। ইতিপূর্বে শ্রীযুক্তা সন্ধ্যা সেনের 'সুরের আগুন' আমাদের চিত্তজয় করেছিল এবার 'একালের গান'-এর আসর বসল। এসম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

আমাদের মতে 'সুরের আগুন'-এর প্রথম রচনা যাঁর সম্মানে রচিত হওয়া উচিত ছিল, তিনি শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক অথবা শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ। তা করা হয়নি। 'একালের গান'-এর সূত্রপাত এমন একজনকে দিয়ে করা হল যাঁর নতুন কালের বাংলা গানে প্রায় কোন অবদানই নেই। তিনি কোনভাবেই বাংলা গান, বাংলা সুর, বাংলা ভাষা, বাংলা নাটক বা চলচ্চিত্র, বাংলা সাহিত্য—বলা চলে বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত নন। একটি বাংলা ছবি প্রযোজনা করে এবং বৎসরে (কিছুদিন থেকে) পূজার সময় বাংলা গান রেকর্ড করে এই সম্মানের অধিকারী কিভাবে বিবেচিত হলেন? আর এই একাল কবে থেকে ধরা হল এবং এই গানের কি বৈশিষ্ট্য কিছুই জানান হয়নি। তবে আমাদের মতে কিশোরকুমার কখনোই তার প্রতিভূ হইতে পারেন না। উদাহরণস্বরূপ লেখিকা তাঁর একটি গানেরও উল্লেখ করেননি।

অন্যান্য আর পাঁচটি পত্র-পত্রিকার মত শুধু একজনের সাক্ষাৎকার এবং শিল্পী পরিচিতি 'একালের গান'-এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। বরং 'একালের গান'-এর স্বরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশিষ্ট শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া দরকার। এই সাক্ষাৎকার কবেকার? নিশ্চয়ই কয়েক বৎসর পূর্বের। কারণ সেক্রেটারী মিউজিশিয়ান ফ্রেন্ড, ফিলসফার গাইড ইত্যাদি বিভূষণে ভূষিত ভোলাদা আজ কয়েক বৎসর হল পরলোকগমন করেছেন। তাঁর অল্পবয়স্ক কন্যা মায়ের সাহায্যে এককভাবে মনোপলি পরিবেষ্টিত চিত্রজগতে গায়িকা হিসাবে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাচ্ছেন।

ইতিপূর্বে কিশোরকুমারের কোন কোন ইংরাজী পত্রিকায় (নাম ঠিক স্মরণ করতে পারছি না) সাক্ষাৎকার পড়েছিলাম। সেখানে ভোলা শ্রেষ্ঠা অনুপস্থিত এবং কিশোরকুমার স্বয়ং তাঁর বক্তব্য বলেছিলেন। তিনি বোম্বায়ের অভিনেতা হবার মানসেই এসেছিলেন দাদামণি রাজী ছিলেন না। তিনি স্বয়ং (ভোলাদা নয়) স্বর্গীয় খেমচাঁদ প্রকাশের সহকারী হিসাবে কাজ করেন (সংগীতের শিক্ষা ও চর্চা তাঁরই কাছে বলা চলে)। তিনিই তাঁকে প্রথম গান গাইতে দেন। অবশ্য একথা এই রচনাতেও বলা হয়েছে। তবে তা ভোলাদার সাহায্যে। প্রথমে বম্বে টকীজের সম্ভবত 'মুকন্দর' ছবিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ। তবে শ্রীযুক্ত ফণী মজুমদারই তাঁর 'আন্দোলন' ছবিতে কিশোরকুমারকে নায়করূপে উপস্থিত করেন। পরে তাঁরই ধোবী ডাক্তারেও কিশোরকুমার নায়ক। অমৃতে প্রকাশিত রচনায় তথ্যের অমিল রয়েছে। তিনি নাকি অভিনেতা হতে চান নি, সংগীতই প্রথম প্রেম। অথচ উক্ত সাক্ষাৎকারে অন্য কথা বলা হয়েছিল।

যা হোক তার জন্য আমাদের বিশেষ চিন্তা নেই। আমরা শুধু জানাতে চাই, বাংলা একালের গানের চর্চা আরম্ভ করার ভার যাকে দেওয়া হয়েছে তিনি, তাঁর চিন্তাভাবনা বা আলোচনা দ্বারা সামান্য আলোকপাত করতেও পারেননি। আমরা অন্ধকারেই রয়ে গেলাম। ভবিষ্যতে যোগ্য শিল্পীরা তা দূর করবেন এই আশায় রইলাম। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, এই বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অগাধ এবং যাঁরা সত্যকারের স্রষ্টা ও পথিকৃৎ তাঁদের কাকেও কেন এ-সম্মান দেওয়া হল না? বক্তব্য পরিষ্কার করতে পত্র দীর্ঘ হল সেজন্য দুঃখিত।

সুধীর দাস,
আন্ধেরী, বোম্বে।

শান্ডিল্য চতুর্বেদী

।। ১ ।।

নিকট অতীতের এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যা। বোম্বের চার্চগেট রেক্লেমেশনে এক ছ-তলা বিল্ডিং-এ ব্যবসায়ী বিক্রম কাপুরের ফ্লোর জোড়া ফ্ল্যাটে ঝলমলে বিনোদন-রজনী। অতিথিরা প্রায় সকলেই সস্ত্রীক অথবা স-বান্ধবী। হাতে মদের গেলাস আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট মুখে বসালুতে হাসি কিম্বা কথা। বিশাল হলঘরের এখানে ওখানে সেখানে ছোট বড় গুচ্ছে তারা দণ্ডাকারে বসা অথবা দাঁড়ানো। মিসেস মঞ্জু ভাবে। বয়েস নিশ্চয় চল্লিশের ওপর। চলে পাক ধরা। কিন্তু রূপে এবং জীবন-প্রাচুর্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী। এঁরও হাতে মদের গেলাস, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট, মুখে কোন সময় হাসি কোন সময় উপলক্ষ-শোভন বাক-ফোয়ারা। মহিলা স্থায়ী ছিলেন না কোথাও। এদলে ওদলে তাঁর উপস্থিতি-প্রসাদ বিতরণ করে বেড়াচ্ছিলেন।

চোখে পড়া অতিথি সেখানে আরো একজন ছিলেন। ভাস্কর বসু। কিন্তু উপলক্ষশোভন ব্যক্তিত্ব-ছটায় নয় তার অভাবে। বয়েস পঞ্চাশের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও এঁরও চেহারা সুন্দর, আঁটোসাটো। কিন্তু মদ ইনি ছোঁন না, কথা বলেন কম শোনেন বেশী, এবং যদিও ইংরেজী-শিক্ষিত, পাইপ-বিলাসী এবং প্যান্ট-বুশ-সার্ট পরা, সার্বিক ব্যক্তিত্বপ্রভায় একটা গেঁয়ো স্বচ্ছতা।

ভদ্রলোক ওখানে উপস্থিত ঘটনাচক্রে। বিক্রম কাপুর এঁর আবাল্য বন্ধু। ছাত্র-জীবনে ছিলেন এঁরা সহপাঠী, কিছুকাল সহ-বিপ্লবীও। এখন বিক্রম বোম্বেতে মস্ত বড় ব্যবসায়ী; ভাস্কর চিরকুমার, উত্তর-বঙ্গের এক অজ্ঞাত গ্রামাঞ্চলে স্বনামধন্য পল্লী-সেবক। বহু বছর পর দুজনের মধ্যে আবার এই প্রথম দেখা। গ্রামীণ সমস্যা সম্পর্কে একটা আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় ভারতের মুখ্য প্রতিনিধিত্ব করে ইউরোপ থেকে দেশে ফেরার পথে ভাস্কর বিক্রমের অতিথি।

আসর জমজমাট। মদের ঝাঁঝে, সিগারেটের ধোঁয়ায়, ঘর্ম-গন্ধ-দুষ্ট প্রসাধন-সৌরভে বাঁধ ভাঙা আনন্দের জোয়ার। শুরু থেকেই ভাস্কর বসুকে ঘিরে একটা উপেক্ষা-প্রাচীর গড়ে উঠছিল। এখন সেটা অভেদ্য-প্রায়। শুধু বিক্রম এবং তাঁর স্ত্রী বিমলা ফাঁকে ফাঁকে এসে তাঁর তত্ত্বাবধান করে যাচ্ছিলেন।

একবার ভাস্কর বসুর পাশে এসে বসে যান আসর-তারকা মঞ্জু ভাবে। আচমকা জিজ্ঞাসা করেন কি ভাস্কর, আমাকে পাশ কেটে থাকছ নাকি?

ভাস্কর বসুর মুখের ওপর বিরক্তি-তেতো বিস্ময়-ছায়া। আপনি কি বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পাচ্ছ না! এতো বছর পর আজ এখানে আমাদের দেখা, আর তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন আমাকে তুমি চেনই না।

আপনি নিশ্চয় ভুল করছেন। এর আগে আমাদের কখনো দেখা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না।

কি বলছ তুমি! তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে থাকতে পার? বহু বছর ধরে আমাদের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকায়?

যাকে আমি চিনতে পারছি না কি করে বলব আমি তাকে চিনি? আচ্ছা নমস্কার। ভাস্কর অন্য একটা নিরালা-আশ্রিত আসনের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাস্কর বসুর পাশে এসে মঞ্জু ভাবকে চুপি চুপি কথা বলতে দেখে দু-একজন আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। অভেদ্য উপেক্ষা-প্রাচীরটা যথাসাধ্য ডিঙিয়ে এসে। এঁরা ব্যাপারটাকে একটা রসাল আলোচনা সামগ্রী করে তোলেন এবং কানাঘুষা করতে করতে সেটা মঞ্জু ভাবের স্বামী সুভাষ ভাবের কানেও পৌঁছিয়ে দেয়। ইনি ভাস্কর বসুকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলেন আমি শুনলাম আপনি আমার স্ত্রীকে চিনতে পারেন নি। কেন? আপনি ওকে চেনেন না?

ব্যাপারটা এমন হতে পারে ভাস্কর বসু কল্পনা করতে পারেন নি। কিন্তু নিজের অপ্রস্তুতি ভাবটা চট করে সামলে নেন। আর বলবেন না। গ্রোস্ট অ্যাম্নেরাসিং সিচুয়েশান। উনি দেখছি আমাকে খুব ভাল করে চেনেন, অথচ আমি ওঁকে কবে কোথায় দেখেছি তা-ই মনে করতে পারছি না।

তাই নাকি? আমি কিন্তু আমার স্ত্রীর অ্যালবামে ওঁকে আর আপনাকে নিয়ে একত্রে তোলা অনেক ফটো দেখেছি।

অপ্রত্যাশিত নতুন আক্রমণ। ভাস্কর আরো অপ্রস্তুত। বলুন তো কি আশ্চর্য পরিস্থিতি! যাঁর সঙ্গে একত্র [illegible]

উঠেছি তাকে কোথায় এর আগে দেখেছি তা-ই মনে করতে পারছি না।

সুভাষ ভাবের মুখ ক্রোধ-বিকৃত হয়ে ওঠে। আলবৎ চিনতে পেরেছেন। কেন আপনি ওঁকে চিনেও না চেনার ভান করছেন? আমি তার ঠিক ঠিক জবাব চাই। জানেন না, চেনা মানুষকে না চেনার ভান করা অপমান—দাবুণ? তিনি ভাস্কর বসুর কাঁধটা খাবলে ধরেন।

ডোন্ট গো টু ফার। এক টানে নিজের কাঁধ থেকে সুভাষ ভাবের হাতটা সরিয়ে দিয়ে ধমকে ওঠেন ভাস্কর বসু।

ইতিমধ্যে বিক্রম কাপুরও সেখানে এসে গিয়েছিলেন। তিনি মারমুখো হয়ে উঠে সুভাষ ভাবের একটা হাত ধরে ফেলেন।

পরিস্থিতি তেতে ওঠে, কিন্তু আর এগুতে পারে না। ভাস্কর বসুই মাঝে এসে গিনয় দুজনকে দুদিকে ঠেলে ধরেন। মঞ্জু ভাবে, বিক্রমের পত্নী, বিমলা কাপুর এবং অভ্যাগত-অভ্যাগতাদের অধিকাংশও ছুটে এসে পড়েছিলেন। ব্যাপারটা যে পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে দেওয়া হয়েছিল সে পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে দেওয়ায় সকলেই একবাক্যে সুভাষকে নিন্দা করেন। কোণঠাসা হয়ে গিয়ে সুভাষ ভাবে সস্ত্রীক আসর ত্যাগ করেন।

। ২ ।

মঞ্জু ভাবেকে কিন্তু ভাস্কর বসু দেখেই চিনে ফেলেছিলেন। কেন ও রকম অমার্জিত ধরণে ওঁকে না চেনার ভান করেছিলেন সে প্রশ্নটা তাঁকে এখন আত্ম-ধিক্কৃত করে, ভাবিবে ভোলে বিক্রম কাপুরের ফ্ল্যাটটা ছিল সর্বোচ্চ তলায়। একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজে নিয়ে ভাস্কর বসুও আসর ছেড়ে চলে যান ছাদে।

মঞ্জু ভাবেকে কিন্তু ভাস্কর বসু প্রথম দেখেছিলেন পূর্বোক্ত ঘটনার পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে বোম্বেতেই। কি একটা বিশেষ কারণে ডাকা এক ছাত্র সম্মেলন উপলক্ষে শহরের এক বিখ্যাত নাগরিক সভা মণ্ডপে উপচে-পড়া ভিড়। কিন্তু উদ্যোক্তারা উৎসাহ-উন্মত্ত নয়, দুর্ভাবনা - নিষ্পীড়িত। হেতু মঞ্জু। সে তখন কুমারী নাম মঞ্জু—মঞ্জুলা আপ্তে, ছাত্র জগতে কল্পনার তুলিতে আঁকা কলঙ্ক উজ্জ্বল কলেজ-তারকা। সকলেরই বিশ্বাস ভাগ্যবানদের বেলায় তার বন্ধুত্ব যেমন সহজলভ্য তেমনি সম্ভোগ-সম্ভারের অফুরন্ত উৎস। আর ভাল গাইতে পারত বলে তাকেই আনা স্থির হয়েছিল বন্দেমাতরম গেয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে।

অনুষ্ঠান সূচীর শুরুতেই স্তোত্রটি। কিন্তু মঞ্জুর ঢোকা মাত্রই হলে উৎকট উচ্ছৃঙ্খলা চেঁচামেচি শিস দেওয়া, বক্র-কুৎসিত মন্তব্য প্রভৃতির কিছুই বন্ধ যায় না। অনেকে আবার মঞ্জুর দিকে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে পয়সা চকোলেট, ছড়ায় লেখা প্রেমপত্র আরে কত কি? উদ্যোক্তারাও ছাত্র। তাদেরও মেজাজ চড়ে যায়। দেখা দেয় সঙ্ঘর্ষ-সম্ভাবনা। দু-এক প্রস্ত ধাক্কা-ধাক্কি এবং ঘুষাঘুষির মহড়া হয়েও যায়। তুমুল লড়াই বাধে বাধে অবস্থা।

এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মোড় ঘোরানোর চেষ্টায় মঞ্জু দেখায় স্বপ্নাতীত স্বদেশ-বাৎসল্য। এক ঝটকা মেরে ডান তর্জনীর ডগাটা থেঁতো করে, সেই রক্তে একটা বড় সাইজের কাগজে 'বন্দে মাতরম' শব্দটি লিখে সেটা মাথার ওপর তুলে ধরে সে মাইকে বলে—সুন্দর ইংরেজীতে —পড়তে পার এতে কি লেখা আছে? বন্দে-মাতরম। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদি মন্ত্র। এর প্রেরণায় হাজার হাজার দেশবাসী লাঠি গুলি খেয়েছে, জেল-দ্বীপান্তর ভুগেছে, বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচিয়ে ফাঁসিকাঠে চড়েছে। ঋষি বঙ্কিমের দেওয়া জাতির এই মন্ত্রশক্তির অবমাননা হতে আমি দেব না। প্রাণ গেলেও না।

হঠাৎ কে একজন লাফিয়ে উঠে এক হাত মাথার ওপর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠে ভারত মাতা কি?

সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে প্রতি-ধ্বনিত হয়, জয়।

প্রেক্ষা-গহ্বর এখন জাগ্রত স্বাদেশিকতার যজ্ঞকুণ্ড। মঞ্জু কেঁদে ফেলে। ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে নিজেকে বশেও নিয়ে আসে সে মুহূর্তেই। ভারতীয় ছাত্র সম্প্রদায়ের এক-জন হওয়ার জন্যে আজ আমি গর্বিত। কান্না-স্নিগ্ধ সুরে এই মন্তব্যটি করে মঞ্জু গায় বন্দেমাতরম।

ঐ অনুষ্ঠানে বাইশ-তেইশ বছর বয়স্ক ভাস্কর ছিল বোম্বের এক ডাকসাইটে ইংরেজী দৈনিকের প্রতিনিধি। বন্দে-মাতরমের মর্যাদা রক্ষার্থে ঈশানী হয়ে ওঠা সতেব-আঠের বছর বয়স্কা মঞ্জুর সঙ্গে সে পড়ে যায় প্রেমে। দর্শনদগ্ধ হয়ে অপরিচিত পাথারের দুর্লঙ্ঘ্যতার কথাটা ভুলে গিয়ে। কিন্তু পরদিন কাগজে তার লেখা প্রতিবেদন পড়ে ঐ ছাত্র কনফারেন্সের কর্মকর্তারা উৎসাহিক্ষপ্ত। তারাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করে, অনুষ্ঠান-সমাপ্তি চিহ্নিত করতে ডাকা তাদের ঘরোয়া চা-সন্ধ্যায় তাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বয়েস-গন্ধি এক হওয়ায় দু পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যার ফলে মঞ্জুর সঙ্গেও ভাস্করের আলাপ-পরিচয় হয়। অচিরেই।

তাতে কিন্তু ভাস্করের কপাল ফেরে না। ঐ ছাত্রগোষ্ঠীর একজন মুখ্য সদস্য ছিল মোহন ঘোষে নামক এক যুবক। কিছু দিনের মধ্যেই তার আর মঞ্জুর হয়ে যায় বিয়ে ভালবেসে। তবে বিয়ে হবার আগে মঞ্জু এবং মোহন দুজনেই হয়ে যায় ভাস্করের বিশিষ্ট বন্ধু।

তারপর ঘটে এক নিদারুণ দুর্ঘটনা। বিয়ের মাত্র এক দেড় মাসের মধ্যেই আরম্ভ হয় কুইট ইন্ডিয়া বিদ্রোহ। বুকে গুলীবিদ্ধ হয়ে মোহন শহীদ হয়।

সদ্য বিবাহিতা মঞ্জু সদ্য বিধবা হয়ে ভাস্করকে আরো কাছে টেনে ধরে। শোকাচ্ছন্ন হয়ে। ভাস্কর বিয়ের প্রস্তাব করে। মঞ্জু রাজি হয় না, বলে—সে তার বৈধব্যে মোহনকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। ভাস্কর সাংবাদিকতা ছেড়ে পঞ্চাসেবক হয়।

। ৩ ।

ভাস্কর বসু ছাতে আসার অল্পক্ষণের মধ্যেই সেখানে আসেন বিক্রম কাপুর। ভাবেদের সঙ্গে তার 'লাফড়াটা'—মানে গোলমেলে ব্যাপারটা যে কি হতে পারে আমি ভেবে পাচ্ছি না ভাস্কর।

ভাস্কর বসু চমকে ওঠেন। তুই এখানে যে? পার্টি ভেঙে গেল এর-ই মধ্যে?

না, আর এখনো দেরী আছে। কিন্তু ঐ ব্যাপারটা কি, তুই আমাকে বলবি না?

তোকে কি বলব, আমি নিজেই নিজের ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি না। ভাস্কর প্রশ্নোত্তরে সময় নষ্ট না হতে দিয়ে তাঁর হতাশ প্রেমের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। বিক্রম নীরবে একটা সিগারেট ধরিয়ে এবং সেটা দু-এক টান খেয়ে বলেন তোর আইবুড়ো থাকার পেছনে একটা আঁচলের ছায়া আমি বরাবর অনুমান করে এসেছি। বারবার। তোর সেটা অস্বীকার করা সত্ত্বেও। আঁচলটা মঞ্জুর জেনে আমি আশ্চর্য। জানিস সুভাষ ভাবে ওর তৃতীয় স্বামী?

ও! কিন্তু পরক্ষণেই ভাস্কর হেসে ফেলেন। ওর স্বামী-সংখ্যায় আমাকে সান্ত্বনা খুঁজতে বলছিস নাকি?

সান্ত্বনা খুঁজতে নয় ভুল দেখতে। হতাশ প্রেমে দেবদাস হবার যুগ এটা না। দৈবাৎ মঞ্জু যদি পারু হতো তবু না হয় বুঝতাম।

ভাস্কর তাঁর পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলেন মঞ্জুর বৈধব্য-ভাঙানো বিয়েটা কার সঙ্গে হয়েছিল জানিস?

নামধাম ভাল করে জানি না। তবে ছেলেটি আর্ট-পাগলা ছিল।

আর মঞ্জু ওর আর্ট-পাগলামি দেখে আত্মহারা হয়ে গিয়ে ওকে বিয়ে করে ফেলেছিল?

তা নয়। মঞ্জুকে রাজি করাতে অনেকদিন ধরে প্রেম নিবেদন করতে হয়েছিল। চার-পাঁচ বছর। আর্টিস্ট-টি নাকি অশেষ ধৈর্যও দেখিয়েছিল। অসাধারণ ধৈর্য।

ওদের দুজনের দেখা হয়েছিল কি করে।

ওদের মধ্যে আগে থেকেই জানা পরিচয় ছিল। আর্টিস্টটির বাবাও প্রাচুর্য-প্রসাদিত সমাজভুক্ত ছিলেন। মঞ্জুর বাবার সঙ্গে ওঠা-বসা করতেন। সেই সূত্রেই তাঁর দুজনের মধ্যেও জানাশোনা ছিল।

আর প্রেম? সেটা কখন ঘটালো?

তা জানি না। মানুতে বলে কলা-প্রীতি থেকেই নাকি কন্দর্প-কামনা জেগেছিল।

মঞ্জু আবার আর্টিস্ট হয়েছিল কবে?

আরেঃ! তুই এ খবর রাখিস না? ও ছেলেবেলা থেকেই ছবি-টবি আঁকতো। অবশ্য গানের দিকেই ঝোঁকটা ছিল ওর বেশী। যাক মঞ্জু যুগ-কন্যা। ও বিধবাই হয়েছিল, নিপীড়িতা। গৃহবন্দিনী তো নয়। সার্থক কোন একটা কিছু করে বেঁচে থাকার অভিপ্রায়ে ও এক উদ্যোগে—ঝঞ্ঝা হয়ে উঠেছিল। প্রথমত পেশাদার গায়িকা হতে যায়। সে প্রয়াস খুব একটা সফল হয় না। ও তাই আরো কি একটা লাইনে হাত পুড়িয়ে-টুড়িয়ে হয় ইন্টেরিয়র ডেকরেটর।

ঐ আর্টিস্টের পরামর্শে এবং সহায়তা নির্ভরে আসে সাফল্য। তুষার-গলা সম্প্রপাতের মতো। আজ ও বোম্বের সেরা ইন্টেরিয়র ডেকরেটরের একজন।

ঐ দ্বিতীয় বিয়ে সমাপ্তি ঘটেছিল কি করে? ঐ আর্টিস্টও শহীদ-টহীদ হয়েছিল নাকি?

না না তা নয়। ঐ বিয়েটা ভাঙ্গানো হয়েছিল। সুভাষ ওটা ভাঙ্গায়। তবে শুনেছি ঐ দ্বিতীয় বিয়েটা সুখের ছিল না। দুজনের একজনের জন্যেও না।

ভাস্কর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। নিজের অজান্তেই। বিক্রম সহানুভূতি কাতর হয়ে ওঠে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বলেন—তোর আত্ম-অনুকম্পা হচ্ছে, না-রে? ওতে লাভ নেই। আমার কথা রাখ, একটা বিয়ে করে ফ্যাল। এখনো সময় আছে।

ভাস্কর সে কথায় কান না দিয়ে বলল—তুই তোর পার্টির কথা ভুলে গেলি যেন?

না ভুলিনি। বিমলাকে বলে এসেছি। কোন প্রয়োজন হলে ডেকে পাঠাবে। তবু আমি এখন পালাব। এক ঘর ভর্তি সুরা-বিসিকদের ওপর নজর রাখা মেয়ে মানুষের কাজ নয়। কিন্তু যাবার আগে আমি আবার তোকে বলছি বিয়ে কর। নইলে তোকে আরো অনেক পস্তাতে হবে। শেষ জীবনে নিঃসঙ্গতা একটা ভয়ঙ্কর অভিশাপ।

বিল্ডিংটার ছাতে সুন্দর বাগান। বসার জন্যে চেয়ার-টেবিলও ছিল। ওসবেরই একটাতে বসে ছিলেন ভাস্কর। বিক্রম চলে গেলে উনি ওটাতে আরো গা এলিয়ে বসেন—চোখ বুজে ভুরু কুঁচকিয়ে। কিন্তু ভাবছিলেন তিনি বিক্রম যা বলে গিয়েছিলেন তা নিয়ে নয় অন্য কথা।

মঞ্জুর প্রথম স্বামী মোহন ছিল অদম্য স্বাধীনতা-সংগ্রামী। সেজন্যে সে দু-তিনবার জেলও খেটেছিল। কিন্তু মঞ্জুর বাবা দর্দান্ত ব্যবহারজীবী জগন্নাথরাও আদৌ ছিলেন সাহেব ঘেঁষা এবং খয়ের খাঁ। ভাবতে ইংরেজ শাসনকে তিনি দৈব বিধান মনে করতেন আর স্বাধীনতা সংগ্রামকে অ্যান্যার্কিজম। মঞ্জু মোহনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে শুনে জগন্নাথরাও মেয়েকে ডেকে সাফ সাফ বলে দেন আমি আমার কোন সন্তানেরই ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করিনি। খর্ব হতে দিইনি। কিন্তু আমার নিজস্ব বিচার-বিবেচনাও আমি হারিয়ে যেতে দিই না। মোহন শুধু একজন অ্যান্যার্কিস্টই নয়, অ্যানার্কিস্টদের পালের গোদা। ওকেই বিয়ে করতে চাও কর কিন্তু আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে। তবে উত্তরাধিকার সূত্রে তোমার যা প্রাপ্য তা থেকে তুমি বঞ্চিত হবে না। মঞ্জু পিতৃগৃহে তার ঠাঁইটুকু সহ উত্তরাধিকার সূত্রে তার যা প্রাপ্য ছিল তাও ছেড়ে দিয়ে মোহনকে বিয়ে করে। তবে তার আগে পিতার আশীর্বাদটুকু আদায় না করে ছাড়ে না।

বিয়ের মাত্র মাস দুই-এক মধ্যে মোহন শহীদ হয়ে সওয়ায় জগন্নাথরাওয়ের কিন্তু মন গলে যায়। তিনি মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেন। মঞ্জু যায় না বলে—মোহনের স্ত্রী সধবা থাকতে যা পাষাণ বিধবা হয়ে তা নেবে না।

বিয়ে হওয়ার সময় থেকেই মঞ্জুর জীবন এক সংগ্রাম বহুল হয়ে গিয়েছিল। জীবিকার জন্যে। মোহনের বাবাও সম-সম্বন্ধে ছিলেন। মঞ্জু তাকেও পিতৃ-ঐশ্বর্যের এক কপর্দকও নিতে দেয় না। ধনাঢ্য পিতার ত্যাজ্য-পুত্রী থেকে ধনাঢ্য-শ্বশুরের পুত্রবধূ হতে অস্বীকার করে সে। মোহন স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছাত্রও। রোজগার করার তার সময় বা সুযোগ কোনটাই নেই। সংসার চলে কি করে? সমস্যার সমাধান ঘটায় মঞ্জু। সে পড়াশুনা ছেড়ে গান গেয়ে রোজগার করতে নামে। মঞ্চ রেডিও গ্রামোফোন, রৌপ্য-পরদা হয় তার সংগ্রামক্ষেত্র।

মঞ্জু নাম করেছিল সৌখীন গায়িকা হিসেবে। গান গেয়ে রোজগার করতে নেমে সে দেখে খদ্দেররা বড্ড খুঁতখুঁতে। সে দমে না সংগ্রাম চালিয়ে যায় বিধবা হয়ে যাবার পরও।

কিন্তু লড়ে যায় একা নয়। পাশে টেনে ধরে সে ভাস্করকে।

বিয়ের পর মঞ্জু এবং মোহন সুন্দর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল। খুব বড় নয় কিন্তু এক অভিজাত পাড়ায়। বিধবা হয়ে মঞ্জু অভিভাবক-সমস্যায় পড়ে গিয়ে ভাস্করকে ডাকে ঐ ফ্ল্যাটে সহ-অধিবাসী হতে।

ভাস্কর পড়ে বিচার-বিপাকে। মঞ্জুর সমস্যাটা সে দেখতে পাচ্ছিল। তার বয়েস তখন উনিশের মতো। অত্যন্ত রূপসী প্রাণ-চঞ্চল এবং চটপটে। কলেজ জীবনের বদনামটাও পৃষ্ঠপটে একটা রহস্য-ছায়ার হাতছানি।

অনেক ভেবে ভাস্কর মঞ্জুকে অবশেষে বলে তোমার এভাবে একা থাকা সত্যিই অনুচিত। কিন্তু কোন আত্মীয়াকে সঙ্গে রাখলে ভাল হয় না?

যাদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আসতে হয়েছিল তাদেরই কারো না কারুর শরণাপন্ন হতে বলছ?

হ্যাঁ সে-ও ভাববার কথা। আচ্ছা তোমার এমন কোন বান্ধবী নাই যাকে সঙ্গে রাখতে পার?

আছে কিন্তু যাকেই আনব সেও হবে আর একজন বিবাহযোগ্যা কুমারী। বিবাহিতা কাউকে আনার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমার সমস্যা তাতে বাড়বে বই কমবে না। পূজারীদের উৎপীড়ন দ্বিগুণ হবে। গৃহ-সুখ বলতেও আমার আর কিছু থাকবে না। কিন্তু আমার বাড়িতে এসে থাকতে তোমার এতো কি আপত্তি?

স্টো কি তুমি আন্দাজ করতে পার না?

পারি, পারি বলেই তো তোমার ওপর আমার এতো ভরসা। আমার ব্যক্তিজীবনের তোমার ভালবাসা ছাড়া নির্ভরযোগ্য আর কি আছে এখন?

কিন্তু একত্রবাসের ঝুঁকিটা বোঝ?

বদনামের?

শুধু বদনাম নয় অন্য কথাও তো আছে?

বললাম তো তোমার ভালবাসাই আমার আজ রক্ষা-কবচ।

ভাস্কর হতবাক। তার মনে পড়ে যায় সেই ছাত্র কনফারেন্সের পর অন্য এক উপলক্ষে মঞ্জুর ঈশাণী মূর্তি ধারণের কথা। বুকে গুলি খেয়ে মোহন মরে যাবার পর তার শবদেহ সরকার কবলিত করে নেন। ঐ নিয়ে কোন মিটিং-মিছিল করাও মানা হয়ে যায়। মঞ্জু চোখের জল মোছে দাঁতে দাঁত চেপে রাস্তায় নামে। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মোহনের শবদেহ ছাড়িয়ে আনতে। তার এই নির্ভীক পদক্ষেপে পাড়ায় জাগে স্বদেশ-বাৎসল্যের ঝড়। দলে দলে মানুষ তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। কুইট ইন্ডিয়া বিদ্রোহের চরম পর্যায়। স্বদেশ-বাৎসল্যের বিস্ফোরণে সারা দেশ মুক্তি পাগল। দেখতে দেখতে শোক মিছিল এক উদ্দাম গণস্রোতে পরিণত হয়। এমন সময় পথ আগলে ধরে একদল গোরা সৈন্য। মঞ্জু থমকে দাঁড়ায় না এগিয়ে যায়—

যেমনভাবে এগিয়ে আসছিল। জনতাও স্তব্ধ নীরবে এবং নির্ভয়ে। মহল্লায় সজীব স্তব্ধতা। কি যে হতে যাচ্ছে তার ভীতি-কল্পনা এক স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তবতা।

জয় হয় মঞ্জুর। শেষ মুহূর্তে মোহনের শবদেহ সরকার মঞ্জুর হাতে সঁপে দেন। বিনা শর্তে।

মঞ্জুর দু-দু'বার দেখা সেই ঈশাণী মূর্তির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ভাস্করের মনেও হয় আত্মবিশ্বাসের বিস্ফোরণ। সে মঞ্জুর ফ্ল্যাটে থাকতে রাজি হয়ে যায়।

কিন্তু দুঃসাহস বলেও যে একটা জিনিস আছে তাও প্রমাণিত হতে সময় যায় না। সান্নিধ্য-বন্দি ভালবাসা হয়ে ওঠে এক অগ্নি-পরীক্ষা। শুধু ভাস্করই নয় মঞ্জুও এক অসহনীয় দহন-সুখে আপন-ভোলা হতে থাকে। যে আত্ম-বিশ্বাসের ওপর দুজনেই এতো নির্ভর করেছিল প্রয়োজনের সময় তা আত্মগোপন করে বৈধব্য-বাধার সীমানা হ্রাস পেতে অন্তিম রেখায় সংকুচিত হয়। এক রাতে সেটাও বিলুপ্তি-সম্ভাবনার কবলে পড়ে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বৈধব্য-বাধা আপন জোরেই টিকে থাকে। হঠাৎ মঞ্জু লাফিয়ে ওঠে ভাস্করের ঘর থেকে ছুটে পালায় নিজের ঘরে। ভাস্কর তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে। জ্বলে ওঠা প্রণয়-পিপাসায় সমাপ্তি-পাগল হয়ে। কিন্তু সে মঞ্জুর বিছানার ধার পর্যন্ত যেয়েই দাঁড়িয়ে যায়। থমকে। তীর-বিদ্ধ শিকারের মতো মঞ্জু বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ছটফট করছিল আর থেকে থেকে বলে যাচ্ছিল—ভুলি নাই ভুলি নাই। মোহন আমি তোমায় ভুলি নাই—তার গলায় কান্না আটকানো স্বর-ক্লিষ্টতা।

ভাস্করের সমাপ্তি-উন্মত্ততা বিলীন হয়ে যায়। ফ্যাকাসে। সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ায়। কিন্তু কি ভেবে বেরিয়ে না গিয়ে সে বসে যায় মঞ্জুর বিছানায়। সংগে সংগে থেমে যায় মঞ্জুর ছটফট করতে থাকা। কান্নাও। সেই মৌনতায় সোচ্চার হয়ে ওঠে তিরস্কার-তাড়না নয় মিনতি-ভরা জিজ্ঞাসা-চাপ। যেন সে জানতে চাচ্ছে কি তাদের কর্তব্য এখন। ভাস্কর না বোঝে না, বুঝবার মতো মনের অবস্থা তার তখন না। সে বলে এর চেয়ে সংগত উপায় একসঙ্গে থাকাটা কি শ্রেয় হতো না?

মঞ্জু জবাব দেয় না, হাত বাড়িয়ে ভাস্করের একটা হাত তুলে নেয় নিজের কাঠোয়। সেই স্পর্শের অগ্নি-উষ্ণ কোমলতা ভাস্করের শিরায় শিরায় তারার ছড়ায় বিদ্যুৎবার্তা। কিন্তু সে এবার নিজের ওপর জোর চালিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে। বলে আমি জানি তোমার বুক জুড়ে আছে মোহনের স্মৃতি। তাদের মাঝে স্থান আপনার নেই। মোহন শহীদ। সে আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। তাকে আমিই কি ভুলতে পারি?

মঞ্জু আবার কেঁদে ওঠে। না না, আমাকে অসহায় করে তোল না। আমি মোহনের বিধবা থেকে মরতে চাই। আমাকে মুক্ত দাও, পথ দেখাও।

ভাস্করের শহরবাস ছেড়ে গ্রামে পল্লী-সেবক হতে যাওয়ার এটাই গোপন ইতিহাস।

।।৪।।

সারা জীবন ধরে অতিশয় সন্তর্পণে গোপন রাখা এই প্রেম-যাতনার ইতিহাস তন্নতন্ন করে খুঁজে ভাস্কর বসু এক কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হন: আইবুড়ো থেকে গিয়ে তিনি আত্ম-প্রতারিত না প্রেম-সিদ্ধ? প্রশ্নটা যেন তাকে পেয়ে বসে হঠাৎ। তাঁর মনে হতে থাকে এ প্রশ্নের জবাব তাঁকে পেতেই হবে। তক্ষুনি। কিন্তু যতই তিনি জবাব খুঁজেন প্রশ্নটাও ততই জটিল দেখায়। অস্থির হয়ে তিনি চলে যান বিক্রমের তল্লাসে—তাঁর সাহায্য চাইতে।

পার্টির তখন ভেঙ্গেও না ভাঙ্গার অবস্থা। অতিথিদের অধিকাংশই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকজন ঘাগী পার্টি-বাজ জুয়া খেলায় মত্ত। বিক্রমও। কিন্তু ভাস্করের ইংগিতে তিনি হাতের খেলাটা শেষ করে উঠে আসেন। দুজনে চলে যান ভাস্করের শোবার ঘরে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই প্রেম কাহিনীর অন্তরংগতা-বহুল অংশটা ভাস্কর প্রকাশ করতে পারেন না। বাধা হয়ে দাঁড়ায় এক ব্যথা-মধুর অনিচ্ছা। তিনি বলেন বিক্রম তোকে জুয়া খেলা থেকে হিড়হিড়ে নিয়ে এসেছি বলে কিছু মনে করিস নে। দু-একটা অদ্ভুত ঘটনা-কণার ব্যাখ্যা খোঁজায় তোর ব্যবসায়ী শ্যেন-দৃষ্টির সাহায্য নিতে হচ্ছে। মঞ্জুকে আমার চিনেও না চেনাটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে। সে কথা আদৌ আর অস্বীকার করি না। কিন্তু মঞ্জুর নিজের ব্যবহারটাও কি আশ্চর্যজনক হয় নি?

কি করে?

বা-রে! এই তোর শ্যেন-দৃষ্টি! মঞ্জু আমাকে চিনেও কেন ফাঁক খোঁজে আমার সংগে চুপিচুপি আলাপ জমাতে এসেছিল? কেন আমাকে দেখেই ও বলে ওঠে নি—আরে ভাস্কর যে? কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন? বা এই ধরনের কোন কথা?

বিক্রম চট করে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। শুধু বলেন, হুঁ, ভাববার কথা।

আরো একটা কথা। যে সব ফটোতে সুভাষ আমাকে দেখেছে সেগুলোর প্রত্যেকটাতেই মোহনও আছে। সবগুলোতেই মঞ্জু দুজনের মাঝখানে—বসা কিম্বা দাঁড়ান। এখন তুই-ই বল তিন তিন বার বিয়ে করা কোন মেয়ে অতীত স্বামীদের সংগে তোলা ফটো তার বর্তমান স্বামীকে কেন অন্য কাউকেও দেখিয়ে বেড়াতে পারে? আমাদের দেশে?

পারুক আর না পারুক তাতে তোর কি? তুই কেন তা নিয়ে রাত জেগে ভেবে মরছিস?

যার প্রেমে হতাশ হয়ে সারা জীবন বিয়ে না করে থেকেছি তার সম্পর্কে এটা ওটা নিয়ে ভাবা কি অস্বাভাবিক?

কিন্তু ভেবে লাভটা কি?

তা তুই বুঝবি না। তুই তো কারো প্রেমে হতাশ হওয়া আইবুড়ো নয়। আচ্ছা, এখন শোন আমার কথা। তোর কি মনে হয় না ঐ ফটোগুলো সুভাষ লুকিয়ে দেখেছে?

যদি দেখেই থাকে তো দোষটা কি হয়েছে? তিন তিনবার বিয়ে-করা মেয়েমানুষ যার স্ত্রী, তার চোখকান খোলা না রাখার বিপদ আছে না?

ভাস্কর হেসে ফেলল। একশোবার আছে। কিন্তু সে কথা থাক। তুই-ই আমাকে দেবদাস আর পারুর উদাহরণ দেখিয়েছিলি। সেই নজিরেই আমি তোকে প্রশ্ন করছি: দেবদাসের জন্যে বুক-ভরা ভালবাসা নিয়ে পারু কেন অন্য একজনকে বিয়ে করেছিল? মঞ্জুর মতো স্বাধীন জীবন যাপন করার যদি সুযোগ থাকতো তবুও কি সে ওভাবে অন্য কাউকে বিয়ে করতো? কিম্বা স্বাধীন অস্তিত্বের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য বিয়ে করার ফলে সে দেবদাসকে ভুলে যেতো? মনের গভীরতম তলাতেও?

সহজ কথায় তুই বলতে চাস মঞ্জু দু-দুটো বিয়ে করেও মোহনকে ভুলে যায়নি—এই তো? তাই যদি হয়, তবে তোর তাতে কি যায় আসে? মঞ্জু তোকে তো ভালবাসে না? তবে কেন তুই চিরকুমার হতে গেলি?

দ্যাখ, কারণ একটা আছে। তবে সেটা আমি কাউকে বলা সমীচীন মনে করি না। এমন কি তোকেও না। কিন্তু আজ আমি এক কঠিন প্রশ্নের জবাব খুঁজে অস্থির হচ্ছি। তাই তোকে কারণটা বলা। মঞ্জুর সংগে একত্র থাকার সময় একবারে যা ঘটেছিল সেটা ভাস্কর এখন বিক্রমকে বলেন। আদ্যোপান্ত, সবিস্তার।

বিক্রম হেসে ওঠেন। প্রায় হো হো করে, রাত কতখানি হয়েছে ভুলে গিয়ে। এই জন্যে তুই আইবুড়ো থেকে গেছিস! এতোবড় একটা ত্যাগ তুই এমন একটা মামুলী কারণে করেছিস? জানিস কোথায় তোর ভুল হয়েছে? যেখানে তোর আদিম পুরুষের মতো ব্যবহার করা উচিত ছিল সেখানে তুই হতে গেছিস মহাপুরুষ। মঞ্জু নির্ঘাত তোর হতো সে রাতে ঐ ভুলটা না করলে! আর না, আমি এখন পালাব। জুয়া খেলা খুব জমে উঠছে।

দাঁড়া, আরো একটা কথার জবাব দিয়ে যা। ওভাবে মঞ্জুকে পেয়ে গেলে কি আমি সুখী হতাম?

প্রশ্নটা সুখ-দুঃখের নয়, জীবনের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতার। আমার একটা কথার জবাব দিতে পারিস? মোহন যদি শহীদ না হয়ে যেতো তবে কি সে-ই সারা জীবনই মঞ্জুর একনিষ্ঠ ভালবাসা পেয়ে যেতে থাকতো?

মায়েরা !
এক বেবীফুডে ডাক্তাররা যা যা চান তাঁরা সে-সবই পান আমূলস্প্রেতে

আমূলস্প্রেতে ভিটামিন, খনিজ-পদার্থ আর প্রোটিন রয়েছে যা আপনার শিশুকে সুস্থ আর সবল ক'রে গ'ড়ে তোলার পক্ষে দরকার।

ভিটামিন সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আর খিদে বাড়াবার জন্য, সুস্থ স্নায়ু, মাড়ি, চোখ আর দাঁতের জন্য। নিয়াসিন হজম শক্তি আর পরিপাক ক্রিয়া সবল ক'রে তোলার জন্য, সুস্থ ত্বকের জন্য, ক্যালসিয়াম ও ফসফোরাসের মত খনিজ পদার্থ হাড়ের গঠন স্বাভাবিক ক'রে তোলার জন্য। আয়রণ সাহায্য করে রক্ত গঠনে।

প্রোটিন কোষ গ'ড়ে তোলা আর পুষ্টিতে সাহায্য করার মূল উপাদান। আর আমূলস্প্রেতে আছে উঁচুমানের পর্য্যাপ্ত প্রোটিন।

আমূলস্প্রে কয়েক দিনের শিশুও হজম করতে পারে

প্রতি বিন্দু দুধ শুখিয়ে চমৎকার মিহি পাউডারে পরিণত করা হয়। ফ্যাটটাও সেভাবেই ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং এটি হজম হয় সহজে।

আমূলস্প্রে চটপট এবং সহজেই তৈরী ক'রে নেওয়া যায়

আমূলস্প্রে স্প্রে-ড্রাইং পদ্ধতিতে অত্যন্ত মিহি পাউডারে পরিণত করা হয় বলে এটি গলেও খুব তাড়াতাড়ি আর সহজে। এর ফলে, বোতলের নিপলে জমাট বেঁধে যায় না, আর শিশুকেও অনেকটা বাতাস গিলে ফেলতে হয় না।

বালআমূল এবং বাড়ন্ত শিশুরা

৩ মাস বয়স থেকে শিশুকে আমূলস্প্রে ছাড়াও শক্ত আহার বালআমূল খাওয়াতে শুরু করুন।

আরও নানান তথ্য জানবার জন্যে বিনামূল্যে আমূল পুস্তক—মাতৃত্ব ও শিশু পালন

বিনামূল্যে আমূল পুস্তক মাতৃত্ব ও শিশুপালন পেতে হ'লে এই ঠিকানায় চিঠি দিন—পোঃ বঃ নং ১০১২৪, বোম্বাই ৪০০ ০০১। সঙ্গে ৫০ পঃ ডাক টিকিট এবং আপনার পুরো ঠিকানা লেখেন।

আমূলস্প্রে

মায়ের দুধের আদর্শ বিকল্প

Indian Standards Institution

ASP-AS-83

বাজারে ছেড়েছে :
গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন লিঃ, আনন্দ।

ভাস্কর চমকে ওঠেন, কিছুই বলেন না।

বিক্রম বলেন, দেখলি? এ প্রশ্নের জবাব নেই। আচ্ছা চল্লাম। বিক্রম দরজা পর্যন্ত চলেও যান। একটু যেন টলতে টলতে। কিন্তু হঠাৎ আবার ফিরে এসে বলেন—খানিকটা নেশা-বিজড়িত ঢঙে : শোন জীবনের, সম্পূর্ণতা মানে সব পাওয়া কিম্বা হারানো নয়, পাওয়া-হারানোর যোগফল। সারা জীবন তুই খুইয়ে এসেছিস! এবার পাওয়ার পালা আরম্ভ কর। একটা মেয়ে-মানুষ পছন্দ করে নে। তোর পছন্দ হতে পারে মেয়ে অনেক আছে। শুধু বেছে নেবার অপেক্ষা। তোর ব্যক্তি-জীবনই মরু-ধূসর। সমাজ জীবন সার্থক। যখন আমরা বিপ্লব করতে নেমেছিলাম তখন তুই-ই ছিলি আমাদের মধ্যে সেরা কর্মী। পাঠ্যজীবন তো আগাগোড়াই ছিল কৃতিত্ব - উজ্জ্বল। সাংবাদিক জীবনে কি করেছিলি আমি জানি না। আমি তখন বাবার টাকায় ইউরোপ - আমেরিকার ব্যবসাবুদ্ধি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম। কিন্তু তোর লিপিশক্তি আজ সুধী সমাজে সুবিদিত। সারা বিশ্বেই। পল্লী-জীবনের ভবিষ্যৎ গুরুত্ব সম্পর্কে লেখা তোর প্রবন্ধ এবং উপন্যাস ভারতের অনেক ভাষাতে অনুবাদিত হয়েছে, হচ্ছে। চেহারটা আজও কন্দর্পতুল্য রেখেছিস। বাড়িতে গাওয়া দুধ দৈ ঘি মাখন খেয়ে খেয়ে। তোকে লুফে নেবার মতো মেয়ে-মানুষ কতো পাবি তার হিসেব নেই। আচ্ছা, আমি এবার কিন্তু সত্যিই পালাচ্ছি। তুইও একটু ঘুমিয়ে নে। মঞ্জু তোকে নিশ্চিমিছি আইবুড়ো রেখেছে। ওপর থেকে ও যদি তোর অনিদ্রা-রোগেরও কারণ হয়ে ওঠে, তবে সেটা হবে মহা-ট্রাজেডী।

বিক্রম চলে যান কিন্তু ভাস্কর ঘুমুতে ছুটেন না। ভাবতে থাকেন। বিক্রম বাস্তব-জ্ঞানী। কিন্তু তাই কি সব? ত্যাগ আদর্শ ধর্মবোধ ভালবাসা বিজ্ঞান-প্রেরণা শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য প্রভৃতি কি বাস্তববুদ্ধির অবদান? ব্যক্তিস্তরে? মহাপুরুষ হবার চেষ্টা ভণ্ডামি কিম্বা বাচলতা। কিন্তু আদিমপুরুষ না হয়ে থাকার বাসনা এবং প্রয়াসই কি সভ্যতার জন্মদাতা নয়? জৈবিক তাগিদসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রেরণা এবং ক্ষমতা অর্জন করেই কি মানুষ মনুষ্যত্বের সীমানায় এসে পৌঁছয়নি। প্রজনন-তাগিদ জাগামাত্রই জন্তু-জানোয়ার বিহার-ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষ? কেন সে বিয়ে শয়নঘর লজ্জা-নিবারণী বস্ত্র-শিল্প সৃষ্টি করেছে? ভাবতে ভাবতে ভাস্কর একটু ছিটগ্রস্তের মতো হয়ে ওঠেন এবং বিড়বিড় করে নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দেন : আত্ম-বিকশনের তাগিদে : এই তাগিদের জন্ম ঘটিয়েই মানুষ মনুষ্যত্বের সীমানায় এসে পৌঁছেছিল। এই আত্ম-বিকশনেই তার বেঁচে থাকার সার্থকতা এবং সম্পূর্ণতা। তাই সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার ওপরে নাই।

তাঁর বিড়বিড় করে বকে যাওয়াটা ভাস্কর নিজেই লক্ষ্য করে একটু লজ্জা-কাতর হয়ে যান। ঘরে তিনি একা আছেন জেনেও এক-বার এদিকে ওদিকে চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে অনেকক্ষণ ভুলে থাকা পাইপটা সাজিয়ে নেন ধরান এবং ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে জানালার বসে ভাবতে থাকেন। বসবার জন্য একটা আরামকেদারা টেনে নিয়েই

এবার তাঁর ভাবনাবস্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পূর্বেকার সেই এক এক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী রাতের ঘটনাবলী। সে রাত্রে মঞ্জুর 'না' হয়তো মূলতঃ 'হ্যাঁ'-ই ছিল। সেই উহ্য 'হ্যাঁ'-র অমান্য করাতেই হয়তো তিনি পঞ্চাশ-প্রায় বয়েসের আইবুড়ো। কিন্তু এই আইবুড়ত্ব তাঁর জীবনকে মরু-ধূসর সার্থতায় পরিণত করেছে? কক্ষনো না। মঞ্জুকে পুনর্বিবাহিতা দেখার প্রচন্ড ধাক্কাটা না লাগা পর্যন্ত তাঁর চিরকৌমার্য এক প্রশান্ত সন্তোষ এবং সার্থকতা-বোধের উৎস ছিল। আর মঞ্জু? তার মনের খবর কি তার তিন তিনটে বিয়েতে?

যে কথাটা বলতে হতে পারার ভয়ে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত এই প্রেম-কাহিনীর অন্তরঙ্গভাবহুল অংশটা তাঁর সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বন্ধু বিক্রমের কাছে গোপন রাখার ইচ্ছা-তাড়না জেগেছিল, ভাস্কর এখন সেটাই মনে মনে ভাবতে থাকেন। মঞ্জু হয়তো তাঁকে কোনদিন ভালবাসে নি। কিন্তু সে কি বরা-বরই তার ভাল চেয়ে আসেনি? ইচ্ছা করলেই সে তাঁকেই কিংবা তাঁকেও বিয়ে করতে পারতো না? তবু কেন সে তা করে নি? তাঁকে কোনপ্রকার ফাঁকিতে না ফেলার বাসনা থেকে নয় কি? এমন ভাবা কি অসঙ্গত, যে নিজেকে একজনের ত্যাগের বেদীতে অধিষ্ঠিতা দেখে সে তার জ্ঞান-বুদ্ধি অনু-সারে এই অধিষ্ঠিতির মর্যাদা রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে? আর সে যদি তেমন কিছু না-ও করে থাকে তাতেই বা কি? আত্ম-বিকশন কি তাতে খর্বিত বা মহিমান্বিত?

যে কথাটা গোপন রাখতে তাঁর এত ব্যাকুলতা ছিল এবং যা তিনি শেষপর্যন্ত গোপনই রেখে দিয়েছেন সেটা ছিল এই :

পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগে চাকরী-টাকরী ছেড়ে বোম্বে থেকে চলে যাবার দিন ভিকটোরিয়া ষ্টেশনে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে এসেছিল মঞ্জু একা। যাতে সেখানে অন্য কেউ না এসে যায় সেজন্যে তাঁর চলে যাবার খবরটা চেপে রাখা হয়েছিল। দুজনের মধ্যে কাঁদাকাটি এবং কথার যা ছিল তা আগেই শেষ করা হয়ে গিয়েছিল। তাই ঠিক ছিল ষ্টেশনে হবে শুধু সুখ-সংলাপ। সেজন্য হাতে যথেষ্ট সময় রাখার অভিপ্রায়ে দুপুরে খাওয়াটাও সারা হয়েছিল ষ্টেশনেই। সে যুগের এক বিখ্যাত রেস্তরাঁতে। সুখসংলাপ হয়ও প্রচুর। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার কিছুক্ষণ আগে হঠাৎ ভাস্কর তাঁর নোটবুক থেকে এক টুকরো কাগজ ছিঁড়ে তাঁর কাশীর ঠিকানাটা তাতে লিখে সেটা তিনি মঞ্জুর হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন জান? জগতে আশার মতো এমন বেহায়া আর নাই। যা আমি চাই তা তোমার কাছে কোনদিনই পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সেকথা জানা সত্ত্বেও আশা আবার আমার মনটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিষ্ঠ করে তুলছে! একটা কোন উপায়ে ঐ পাবার সম্ভাবনটা চিরতরে সমাধিস্থ হতে না দিতে। যদিই কোনদিন তোমার মন পরিবর্তিত হয়, আমাকে এই ঠিকানায় লিখো—আমি যেখানেই থাকি, পাব। মনে রেখো তুমি সংসারে মোহনের স্মৃতি-শিখা আর আমার ত্যাগের বেদীতে আশার প্রদীপ।

মঞ্জু হেসে ফেলেছিল। বিষাদ-ম্লান মৃদু হাসি। বলেছিল তুমি একটা সাধারণ কথা বুঝতে পারছ না। তোমাকে ভুলতে পারব শুধু সেদিন যেদিন মোহনের স্মৃতি আমার মন থেকে মুছে যাবে। তখন আমাকে পাওয়া না পাওয়া সমান হবে নাকি?

নতুন প্রকাশনের প্রথম প্রকাশনা প্রকাশিত হ'ল

"সাহিত্যিক বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ স্বর্গত রমেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কবরেজ খানায়। তারাশঙ্কর, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখ প্রায় সব লেখকই যেতেন তাঁর আড্ডায়.....।"

শিবরাম চক্রবর্তীর শিল্পী জীবনের এক বিচিত্র বিস্ময়কর দলিল

অকথিত কাহিনী

দাম ৭·০০

ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট, চরক, সুশ্রুত, জীবক, ধন্বন্তরি, চক্রপানিদত্ত, শ্রীধরাচার্য ও নাগার্জুন প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকদের জীবন কাহিনী বর্ণনা করেছেন **সুধাংশু পাত্র** তাঁর

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

গ্রন্থে-দাম ৬-০০

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক ষ্টোর, ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর

বাণীশিল্প, ১১৩।ই, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯

পুনশ্চ

প্রাচীন কলিকাতার ইতিহাস সত্যই গবেষণার বিষয়। কলিকাতার কাহিনী যেমন বোমাঞ্চকর, তেমনি কিংবদন্তীভূয়িষ্ঠ। বহু গবেষক বহুভাবে এই বৈচিত্র্যময় ঐতিহাসিক নগরের বিষয় তাঁদের গ্রন্থাদির মধ্যে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন এবং এখনও বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী প্রকাশিত হয়ে চলেছে পুস্তকের মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকায়।

অতীতের কলিকাতা সম্বন্ধে প্রাচীন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসাবে ইংরেজীতে বাঙালী রচিত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের 'আর্লি হিস্ট্রি এন্ড গ্রোথ অফ ক্যালকাটা' যেমন একখানি তথ্যবহুল ঐতিহাসিক গ্রন্থ তেমনি ইদানীন্তনকালে নব যুবক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত কমল চৌধুরী সম্পাদিত ইতিহাসের কলকাতাও একখানি বহু চিত্রশোভিত ও বহুবিধ বিষয়সমৃদ্ধ মূল্যবান গ্রন্থ।

প্রাচীনকালের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রাসঙ্গিকভাবে কলিকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল নিবন্ধ - প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, ইতিপূর্বে 'পুনশ্চর' মধ্যে তার কিয়দংশ আমরা প্রকাশ করেছি। বর্তমান সংখ্যায় 'প্রাচীন কলকাতা' সম্বন্ধে প্রবন্ধটি 'যমুনা' পত্রিকার ১৩১৭ সালের ভাদ্র সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত হল। এই প্রবন্ধের লেখক শ্রীশিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবন্ধটি কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রাচীন কলিকাতা
(ঐতিহাসিক বিবরণ)

আধুনিক কলিকাতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ যে স্থানে উপস্থিত কলিকাতা নগরী বিরাজমান সেই স্থান এবং তন্নিকটবর্ত্তী অপরাপর স্থান-সমূহ (নিম্নবঙ্গ) কতদিন হইল সৃজিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় আবশ্যক। 'সৃজিত' শব্দ ব্যবহার করার তাৎপর্য এই যে অনেকের মতে পূর্বকালে বর্ত্তমান রাজ-মহল পর্যন্ত সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। এই উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমরা সচরাচর নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি প্রাপ্ত হই—যেখানে আসিয়া গঙ্গা সাগরে মিলিত হন তাহারই নাম গঙ্গাসাগর সঙ্গম। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই সঙ্গম হিন্দুজাতির অতি পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। (ভাগবত ৩৮৫ অঃ, হরিবংশ ১৬৮) কিন্তু পূর্বকালে এই সাগরসঙ্গম কোথায় ছিল, তাহা লইয়াই গোল। ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এক সময়ে সাগরের স্রোত রাজমহল অবধি প্রবাহিত হইত। এরূপস্থলে স্বীকার করিতে হয়, এখনকার প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তরে সাগর-সঙ্গম ছিল। ২৪ পরগণা নদীয়া, যশোর, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলা তখন নদীগর্ভে অবস্থিত। মহাভারতে তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে—কৌশিকী তীর্থে (অর্থাৎ গঙ্গা ও কৌশিকীর সঙ্গমে) রাজা যুধিষ্ঠির উপস্থিত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহারই পর পঞ্চশত নদীযুক্ত গঙ্গাসাগরসঙ্গম। সাগরের তীরে কলিঙ্গ দেশ (বনপর্ব্ব ১১৩ অঃ)।

সপ্তম শতাব্দী হিউয়েতেনিসয়াং কামরূপের প্রায় একশত ক্রোশ দক্ষিণে সমতট নামক স্থানে আগমন করেন। তাঁহার বর্ণনানুসারে এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকা জেলার উত্তরাংশ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার বর্ণনায় এই সমতট সাগরের তীরে অবস্থিত।

কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে জানা যায় যে, ললিতাদিত্য যখন গৌড়ে আগমন করেন, তখন গৌড়ের পরই সমুদ্র প্রবাহিত ছিল। (রাজতরঙ্গিণী ৫ম তরঙ্গ)

উপরোক্ত প্রমাণ ও অনুমান দ্বারা বোধহয় সহস্র বৎসর পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ সমুদ্রশায়ী ছিল, সাগরসঙ্গমও অনেকটা উত্তরে ছিল। রামায়ণের সময় যে গঙ্গা সাগরসঙ্গম আধুনিক মুর্শিদাবাদ বা নবদ্বীপের নিকটে ছিল, তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। যখন যে স্থানে ভাগীরথী সাগরের সহিত মিলিতা হইতেন সেই স্থানই সেই সময় গঙ্গাসাগর তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, যখন মুর্শিদাবাদের নিকটে সাগরসঙ্গম ছিল, তখন তথায় কপিলাশ্রম ছিল। তৎপরে ত্রিবেণীতে কপিলাশ্রম থাকার কথাও শ্রুত হইয়া থাকে। এ সকল কথা পরিত্যাগ করিলেও সমুদ্র যে দিন দিন দক্ষিণাভিমুখে সরিয়া যাইতেছে কয়েকটি স্থানের নামের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা আমাদের বোধগম্য হইবে। যথা, অগ্রদ্বীপ। বিশ্বকোষে লিখিত আছে যে, চড়া পড়িয়া প্রথমে যে স্থান উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাই অগ্রদ্বীপ নামে পরিচিত। ইহার প্রায় তিন ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে যে আর একটি চড়া পড়ে, তাহাই আধুনিক নবদ্বীপ। এইরূপ এমন অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল স্থান এককালে জলমগ্ন ছিল, পরে নগর বা গ্রামে পরিণত হইয়াছে। যথা—শুকেসাগর (শুষ্ক সাগর) চাকদহ (চক্র দ্বীপ) ডুমুরদহ (ডুমুর দ্বীপ) খড়দহ (খড়্গ দ্বীপ) শিয়ালদহ (শৃগাল দ্বীপ) ইত্যাদি।

এই সকল প্রমাণ হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, এককালে গঙ্গা রাজমহলের নিকট সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছিলেন। পরে সমুদ্র প্রবাহ যতই দক্ষিণ দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল, ভাগীরথীর প্রবাহ দৈর্ঘ্যে ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং নূতন স্থলখণ্ড সকলও উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু সে কতকাল পূর্বে? মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হই যে, 'যুধিষ্ঠির তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া নন্দা (রামায়ণের 'হ্যাদিনী' ও বর্ত্তমান 'মহানন্দা') কৌশিকী তীর্থে স্নান করিয়া গঙ্গাসাগর সঙ্গমে উপস্থিত হন ও তথায় পঞ্চশত নদী মধ্যে অবগাহন করিয়া সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করেন।' উল্লিখিত উদ্ধৃত বিবরণ পাঠে বুঝা গেল যে, যে সময় যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর সঙ্গমে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন তখন উক্ত স্থান কলিঙ্গদেশের নিকটবর্ত্তী ছিল, যেহেতু তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গদেশ গমন করেন। সুতরাং সে সময় গঙ্গার 'ব' দ্বীপ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং নিম্নবঙ্গও জাগিয়া উঠিয়াছে। অতএব এই সময় হইতেই, বা ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই নিম্নবঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ আধুনিক কলিকাতা কত কালবধি এই নামে পরিচিত তাহা আমাদের অবগত হওয়া আবশ্যক। তাহা জ্ঞাত হইলে, ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে আমাদের একরূপ স্থূল অভিজ্ঞতা জন্মিবে। ইহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে, আমাদের পুরাণের কথা স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয়। কোন পুরাণ বা অন্য কোনও হিন্দু-শাস্ত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে কিনা তাহা জানিবার অভিলাষ জন্মে। আমরা শাস্ত্রগ্রন্থ ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ইহার প্রাচীনত্ব প্রদর্শন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

বর্ত্তমান কলিকাতার প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে কালীঘাট। এই স্থান সম্বন্ধে যে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কথিত আছে, তাহা হিন্দুমাত্রেই অবগত আছেন। কথিত আছে, পুরাকালে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞে সমস্ত দেবতা নিমন্ত্রিত হইলেন, কেবল জামাতা মহাদেব নিমন্ত্রিত হইলেন না। সতীর পিত্রালয়ে গমনের নির্ব্বারিতাতিশয্যে মহাদেব তাঁহাকে বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষালয়ে গমনের আদেশ দান করিতে বাধ্য হইলেন—সতী অনুচর সঙ্গে পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, স্বীয় পিতা দক্ষের নিকট মহাদেব নিন্দা শ্রবণ করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। এই নিন্দাবরণ সংবাদ পাইয়া মহাদেব স্বয়ং দক্ষ ভবনে উপস্থিত হইলেন; এবং মৃত-সতীদেহ আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড উন্মাদের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালীন রুদ্র-মূর্ত্তির ভীষণ পদভরে পৃথিবী ধ্বংসোন্মুখ হইল। অবশেষে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা সেই মৃত সতীদেহ কর্ত্তন করিয়া ভারতের ৫২ বিভিন্ন প্রদেশে নিক্ষেপ করিলেন। যে স্থানে সতী অঙ্গ পতিত হইল সেই স্থানে এক দেবী এবং তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত এক ভৈরব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

(ক্রমশঃ)

ক্ষণিক

অঙ্গনা

আমেরিকার মেয়েদের জীবনেও ছিল কঠোরতা

আমেরিকা আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে। সেখানকার মহিলারা এখন প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন। 'উইমেনস লিব' আন্দোলনের সর্বাগ্রে তাদের নাম। পুরুষের সঙ্গে তাদের গতিবিধির ফারাক নেই বললেই চলে—কি শিক্ষায়, কি দেশগঠনে।

প্রায় একশো বছর আগের কথাই ধরা যাক এখানে স্ত্রী-পুরুষের বিভিন্ন কাজের পার্থক্যটা মানা হত অত্যন্ত কঠিনভাবে। গোটা জীবনটাই কাটাতে হত পুরুষদের ওপর নির্ভর করে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মেয়ে বলতে মনে হতো নরম, কোমল, পেলব, শিশুর মতো শ্বাসনে ভীত। ঘরের কাজ আর সন্তান পালনই ছিল তাদের প্রধান কাজ। সে সঙ্গে জুড়ে দিত দাসদাসীদের তদারকির দায়িত্ব। জীবন এত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে চালাতে হতো যে মেয়েদের নিজেদের স্বাধীনতার কথা ভাবারও ফুরসৎ হত না। ১৮৬৫ সালে গৃহযুদ্ধের আগুন যখন জ্বলে উঠলো দাবানলের মতো—পুরুষেরা দলে দলে চলে গেল লড়াই করতে—মেয়েরা রইল সংসারটি পরিপাটী করে আগলে রাখতে। মেয়েরা নিখুঁতভাবে সংসার চালিয়ে দিন কাটাতে লাগলো ঘরের পুরুষদের ফেরার অপেক্ষায়। যুদ্ধশেষে ঘরের ছেলেরা ফিরলো ঘরে। মেয়েরা ততদিনে হয়ে উঠেছে অনেক স্বাবলম্বী, ঘরের বাইরের জগতটাকে দেখারও অনেক সুযোগ হয়েছে তাদের। পুরুষেরা চাইলো পুরনো দিনের কঠোর জীবনে বেড়ি দিয়ে আবার মেয়েদের ঘিরে রাখতে। সে চেষ্টা আর সফল হল না। মজুর খাটিয়ে চাষ-বাসের দিনও গেল পালটে। ছোট শহর-গুলিতেও কলকারখানা গড়ে উঠলো। বৈষয়িকতার ভিত্তি হল মজবুত।

দেশের পশ্চিমাঞ্চলের মেয়েরাও ছিল সেই একই দশায়। নানারকম শিষ্টাচার মেনে তবে তাদের ভদ্র নামটা আদায় করতে হত। বাবা এবং স্বামীর হয়ে অতিথি আপ্যায়ন করার অনুমতি পেলেই তবে তারা উত্তরে যেত। স্বাধীন ভাবনা চিন্তা স্বাধীনতা তখন তাদের কল্পনারও অতীত ছিল।

অথচ এই মহিলাদের অনেকেই দেশের পশ্চিমাঞ্চলের শতাব্দীর ঘুমে আচ্ছন্ন বন কেটে বসতি গড়তে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়েই ঘর বাঁধার কাঠ কেটেছে, গম বেড়েছে, বন্দুক রেখেছে ঘাড়ে করে।

দেশের পূর্বপ্রান্তের মেয়েদের অবস্থা তখন অবশ্য অন্যরকম। কোমল শহুরে জীবনে পুরুষদের চেয়ে তাদের জীবন বইতো ভিন্ন খাতে।

আজকে নারী স্বাধীনতার দিনে তদানীন্তন কালের মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসনের কথা ভাবলে অবাক লাগে। উকিলের মেয়ে এমিলি ডিকিনসন দিন কাটিয়েছিলেন এইরকম কঠোর পরিবেশে। আমেরিকার সাহিত্যের সুবর্ণ যুগে জন্মেও এমার্সন আর থোরোর মতো সাহিত্যসেবীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ তাঁর হয়নি। কেবল-মাত্র 'অ্যাটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকার লেখক টি ডবলিউ হিগিনসনের সঙ্গে তাঁর ছিল পরিচয়। তাঁকেই এমিলি কিছু লেখা পাঠিয়ে দিয়ে জানতে চেয়েছিলেন লেখাগুলি ছাপানো যায় কিনা।

টি ডবলিউ হিগিনসন আন্তরিকভাবে এমিলির লেখার ভাল-মন্দ সমালোচনা করে-ছিলেন কিন্তু সেগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়নি। এমিলি আর লেখা-গুলিকে ছেপে বার করার জন্য তেমন আগ্রহ দেখান নি।

এমিলি তাঁর আইপো-ভাইঝিদের মজার মজার চিঠি লিখে পাঠাতেন কবিতায়। এমিলি থাকতেন একা। ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ জীবনে তাঁর অতিন্দ্রিয় চেতনা হয়ে উঠলো তীক্ষ্ণ, শ্লেষ আর ব্যঙ্গে ভরা রইলো কবিতা।

১৮৮৬ খৃঃ মৃত্যুর পরে একটা পাটিরার মধ্যে পাওয়া গেল তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি সযত্নে কালো ফিতে দিয়ে বাঁধা। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন :—

'ডেভিডের মতোই তাক করে পাথর ছুঁড়েছি,
কিন্তু পতন হয়েছে নিজেরই।'

সে যুগের কঠিন পরিবেশ ও সংস্কারের বেড়া ডিঙিয়ে এমিলি ডিকিনসন নামের খ্যাতিতে হতে পারেন নি প্রতিষ্ঠিতা। অথচ তাঁর মৃত্যুর পর দু-তিন পুরুষ পার না হতেই 'উনিশ / শতকের শ্রেষ্ঠতম কবি' সম্মানে এমিলি ডিকিনসন হলেন ভূষিতা। বিদগ্ধ সমালোচকের ভাষায়, 'আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা, তাঁর প্রভাব অপরিমেয়।'

প্রগতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য চাই নিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম। আমেরিকার মত সুসভ্য দেশের মেয়েদেরও স্বাধীনতা ও ক্ষমতা আদায়ের জন্য করতে হয়েছে কঠিন সংগ্রাম। তারই ফলশ্রুতি হিসেবে আজ তারা সমাজ, শিল্প, সাহিত্য ও জীবনের বিভিন্ন দিকে হয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিতা।

রেসের মাঠেও .....

শ্রীমতী ভ্যালেরি গ্রিভস হারিয়ে দিলেন সেদিন যাঁরা তাঁর পাশাপাশি ঘোড়ার বাঁশ টেনে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। খবরটি [illegible] থেকে। একত্রিশ বছর বয়স্কা শ্রীমতী ভ্যালেরি দুটি সন্তানের জননী। এর আগে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এ জাতীয় রেকর্ড কেউ স্থাপন করতে পারেন নি। রেসের মাঠে অনেক মহিলাই ঘোড়ায় চেপে প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তা নিছকই সখ করে। কিছু কিছু মহিলা অনেক ত্যামেচার ছেলে প্রতি-যোগীদেরও কৃতিত্বের সঙ্গে হারিয়েছে কিন্তু তাঁরা পেশাদারী ঘোড়সওয়ারদের হারাতে পারেন নি। ভ্যালেরি এই প্রথম তাঁর পেশাদারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে দিয়ে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেছেন।

প্রাক্তন ব্রিটিশ জকি চ্যাম্পিয়ন বেরি মন্তব্য করেছেন যে ভ্যালেরি খুব দক্ষতার সঙ্গে দৌড়টি পরিচালনা করেছিলেন। ভ্যালেরির মতে তাঁর ঘোড়াটি প্রথম থেকে নিপুণভাবে দৌড়তে সুরু করেছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁর সন্দেহ হয়েছিল জয়ের খুঁটিতে বুঝি আর পৌঁছতে পারা গেল না। শেষ পর্যন্ত তিনিই প্রথম ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুঁটিটি পার হয়ে গিয়েছিলেন।

অনেকে হয়তো ভাবছেন এতে আর ভ্যালেরির কৃতিত্ব কি—ঘোড়াই তো দুরন্ত-বেগে ছুটে গিয়ে তাঁকে জয়ের খুঁটির কাছে সগর্বে হাজির করেছিল। ঘোড়ার কৃতিত্বকে অবশ্য অস্বীকার করা যায় না কিন্তু পরি-চালিকার কৌশল ও দূরদর্শিতাকেই বা আমরা কেমন করে উড়িয়ে দি। ঘোড়া এবং তার পরিচালক তো আরও অনেকেই ছিলেন কিন্তু সবাই তো আর বিজয়ী হতে পারেন নি। বুদ্ধি বিকাশে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে নানা ব্যাপারে এখনও পিছিয়ে আছেন তার কারণ অনুশীলনের অভাব। সুযোগ পেলেই তাঁরা এই দুর্বলতা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

খেলাধুলো ও শরীরচর্চার ক্ষেত্রে কিছু-দিন আগেও মহিলারা অনেক ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু আজকের দিনে তাঁরা মোটর চালানো, পাইলটিং, মহাকাশে বিচরণ, পর্বতারোহণ রাইফেল শুটিং, তীর নিক্ষেপ, বর্শা নিক্ষেপ সব ব্যাপারেই বিশেষ কৃতিত্বের অধি-কারিণী। ফুটবল ও ক্রিকেট খেলায় মেয়েরা শুধু অংশ গ্রহণই নয়, অনুশীলনের ফলে তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে চলেছেন। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন দেশে মেয়েদের ক্রিকেট টেস্ট টিম ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফুটবল টিম গড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

মহিলাদের ঘোড়ায় চড়া দেশ-বিদেশে এমন কিছু নতুন কথা নয়। হেলেনও ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁর প্রেমাস্পদের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ঝাঁসীর রানী, রানী দুর্গাবতী ও অন্যান্য অনেক বীরাঙ্গনা রীতিমত ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করেছেন। তখন কিন্তু দেশবাসীর কাছে সেটা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হতো কারণ রাজা বা রানীকে নিজে-দের তাগিদে অশ্ব চালনায় দক্ষ হতে হত। কিন্তু তাঁদের পুরুষদের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ার প্রতিযোগিতায় এভাবে অবতীর্ণ হতে হবনি। সেই হিসেবে ভ্যালেরির কৃতিত্ব যথেষ্ট বিস্ময়কর।

অঞ্জলি চৌধুরী

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

।। চোদ্দ ।।

এক উচ্চ পর্বতশ্রেণীর নেতা 'পঞ্চমুখে'র প্যাডের কাগজে লিখে দিলেন, আই এনজয়েড দ্য শো ভেরি মাচ। তিনশো রজনীর অভিনয় এইমাত্র শেষ হয়েছে। প্রধান অতিথি সেই নেতা। তাঁর দান ভাণ্ডারে এই শোয়ের টিকিট বিক্রির পুরো টাকা রজনী তাঁর হাতে তুলে দিল। ফটোগ্রাফাররা ক্লিক-ক্লিক ছবি তুললেন। বহুর ঘুরে গিয়ে শীত ফুটে গরম আসছিল।

সেই দেশনেতা দোতলার নতুন ঘরে নাটকের লাইব্রেরি দেখলেন 'পঞ্চমুখে'র। তারপর এক সময় চলে গেলেন। আজ সুজাতা হয়েছিল রজনী। অনেক দিন পরে। আডা হয়েছে নন্দনা।

—অমিষ শঙ্করকে বলল, 'মালপত্র বাসে তুলতে বল। কম রাস্তা নয় পুরুলিয়া।'

—'এখুনি রওনা দেবে?'

—'রাতে রাতে চলে গেলে কাল বারোটার ভেতর পৌঁছবো। পুরুলিয়া ছাড়িয়ে তো রঘুনাথপুর। দুপুরটা ঘুমিয়ে সন্ধেবেলায় শো। আবার রাতের বাস। কলকাতায় ফিরে পরশু ডবল শো আছে।'

শঙ্কর তাকে থামিয়ে বলল, 'এত টাকা আয় করে লাভ হচ্ছে কি শুনি। অসুখে পড়বে ঠিক তুমি। দিদি মাত্র মাস দুই সেরে উঠেছে—'

রজনী বলল, 'আমি ঠিক আছি। তারপর অমিষর দিকে তাকিয়ে বলল, না গেলে নয়? তোমার শরীর কী হয়েছে দেখেছো একবার আয়নায়—'

—'বাঃ! পুরো টাকা অ্যাডভান্স নেওয়া সবার। সেখানে পোস্টার দিয়েছে। দশ হাজার লোক ফিরে যাবে?'

শঙ্কর লাইটের সেট তুলছিল—ড্রাইভারের সিটের পাশে। গ্রুপের সবাই হৈ-হৈ করে বাসে উঠছিল। অমিয় আস্তে বলল, দুর্গালাল ফিরে যাবে? তার কিস্তির টাকা তো পরশু দিতেই হবে।'

রজনী আস্তে ওঃ! বলে থেমে গেল। এই দীর্ঘ দেনাটি শশাঙ্ক আর তৃপ্তি তাকে উপহার দিয়েছে। কথাবার্তা বলে মোট টাকার একটা কাটছাঁট করিয়েছে অমিয়। দুর্গালালও রাজি হয়েছে। শশাঙ্ক সেই যে ফেরার—তারপর আর রজনীর চোখের সামনে আসে না। রজনীর বলার ইচ্ছে ছিল—আমার খরচ থেকে না হয় আস্তে আস্তে দুর্গালালকে দিতে। কিন্তু তা হয় না। তার সংসারে তাহলে খরচ কমানো দরকার। আর সুদও বেড়ে যাবে অনেক।

বাসে সাতটা টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার উঠলো। নন্দনার স্বামীও উঠেছে। ভদ্রলোক এখন কল-শোয়ে 'পঞ্চমুখে'র সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরেন। শঙ্কর একবার হেসে বলেছিল 'পাহারা!'

নন্দনা হাতের চিরুনী ছুঁড়ে মেরেছিল, 'সবটাতে তোর ইয়ারকি। বিয়ে তো করোনি। জানবে কি করে! শুধু হাঁটা হচ্ছে ফিলম হবার জন্যে।'

নন্দনা এখন ওদের একজনের মতই। সেদিন নিজের একটা ইনসিওর করালো। প্রথম প্রিমিয়ামটা অমিয় পঞ্চমুখ থেকে দিয়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাট বদলাবে। অ্যাডভান্সের চার হাজার টাকা ধার দিয়েছে 'পঞ্চমুখ'। তাছাড়া শোয়ের দিন গাড়ি যায়। নিয়ে আসে। বাড়ি পৌঁছে দেয়। অমিয়কে একখানা বই দিয়েছে নন্দনা। হেমিংওয়ের 'ব্যাড ওম্যান অব স্প্যেনিয়ান'। তার ফ্লাই লিফে লিখেছে—দাদার জন্মদিনে। নন্দনা।

রজনীর অসুখ থেকে ওঠার পর আজ ছিল বড় শো। গেস্টদের দিয়েও অনেক মালা বেশি হয়েছে। রজনী মালার গোছা হাতে নিয়ে গ্রুপের সবার গলায় পরিয়ে দিচ্ছিল একটা করে। মেক আপ তোলা হয়নি। পরণে লাস্ট সিনে সুজাতার বিদায় নেওয়ার সেই শাড়ি।

অমিয় মুখ তুলে বলল 'মেক-আপ তুলবে না? এখুনি বেরোতে হবে। কি ব্যাপার? আজ তোমার বিষে মনে হচ্ছে!'

—'এখুনি তুলছি। নাও।'

গলায় মালা পরিয়ে দিতে অমিয় হেসে ফেলল, 'অমিষবাও তোমার গেস্ট নাকি?'

সেকথায় কান না দিয়ে রজনী নন্দনাকে ডাকলো, 'এসো এদিকে ভাই।' মালাটা পরিয়ে দিয়ে রজনী বলল 'তোমার জন্যে একটা নাকছবি এনেছি। পরে নাও তো।'

—'এখন ইচ্ছে করছে না দিদি।'

—'পরো না দেখি। এই তো। কী সুন্দর দেখাচ্ছে দ্যাখো। গলার মালা নাকে নাকছবি। আজ খুব মানিয়েছিল তোমায় আডার রোলে।'

বাস ছাড়বার মুখে গন্ধর্ব অফিস থেকে পিওন এসে দশ কপি বিনোদন সংখ্যা দিয়ে গেল। দুখানা রেখে আটখানা বাসে পাঠিয়ে দিল অমিয়।

—'বিষ্ণুবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। একটা সই করে দিন।'

সই দিয়ে অমিয় জানতে চাইল কবে বেরিয়েছে?

—'এই তো বেরোলো। ঘন্টাখানেক আগে।'

বাস চলে গেল আগে। অমিয়র গাড়ি ছাড়লো প্রায় সাড়ে দশটায়। ড্রাইভার ছাড়া ওরা তিনজন। সামনের সিটে অমিয়। পেছনে রজনী আর নন্দনা।

কলকাতা পেরিয়ে রাতের অন্ধকার রাস্তায় পড়তেই পেছনের সিটের দুজন দুখানা গন্ধর্ব হাতে নিল। নন্দনা ভেতরের আলোটা জ্বালিয়ে দিল। তারপর একই সঙ্গে দুজন দুজনের মুখের দিকে তাকালো। রজনী নন্দনার। নন্দনা রজনীর। আবার যে যার বইতে চোখ। গাড়ির অরেঞ্জ ইন্ডিকেটরটা থিরথির করে কাঁপছিল। রজনীর হাতে গন্ধর্বের মলাট বাতাস পেয়ে কাঁপছিল।

মলাটে সুজাতার পোশাকে নন্দনা শুয়ে আছে। তার সঙ্গে মস্তাজ করে আরও তিনটি ছবি মেশানো। অমিয় নন্দনাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়ানো।

রজনী আর দেখতে পারল না। পেছনের তাকে কাগজখানা রেখে দিল। চোখ সরু হয়ে তখন তার সামনের সিটে বসা অমিয়র মাথা, দীর্ঘ গ্রীবা কাপুসা হয়ে আসতে লাগল।

নন্দনা বিষ্ণু দত্তর লেখা প্রবন্ধ পড়ছিল। 'সুজাতা নাটক এবং হুইসপার ক্যামপেন'—বিষ্ণু দত্ত।

রজনী বলল 'ঘুম পাচ্ছে আলো নিভিয়ে দিই।'

—'আরেকটু দিদি আরেকটু।'

—'এই আলোতে পড়ে চোখ খারাপ করিসনে'—বলেই হাত এগিয়ে সুইচ অফ করে দিল রজনী।

পার্টি বলেছিল বাস থেকে নেমে সামান্য পথ। দেখা গেল সেই সামান্য মানে দু' মাইল। তাও আবার পুরুলিয়া জেলার দুপুরে। রোদের ভেতর।

গাছপালার ছায়াঘেরা একটা বাড়িতে এসে যখন ওরা পৌঁছলো, তখন বেলা একটা। সারাটা পথ রজনী শুধু অমিয়র একথা সেকথার দায়সারা গোছের হুঁ হাঁ দিয়ে এসেছে।

—'কি হয়েছে তোমার বলতো। মেজাজ খারাপ?'

—'কোথায়!'

এর বেশি আর কথা এগোয়নি।

বাসে এগিয়ে এসে অ্যাডভান্স পার্টি শোবার গড়াবার জায়গাটুকু দখল করে এসে আছে। সন্ধেবেলা শো। হাত-পা ছড়িয়ে সবার আগে বিশ্রাম করা দরকার রজনীর আর অমিয়র। তাবাই শোবার জায়গা পেল না।

অমিয় মনে মনে বলল, এদের কি একটু আক্কেল নেই?

বেলা চারটে নাগাদ সবাই গ্রাম দেখতে বেরোলো। অল্পক্ষণের জন্যে। রজনী তখনো বারান্দার একটা বেতের চেয়ারে কুকুরকুন্ডলী হয়ে বসে আছে। দুপুরে খায়নি। রাগের চোটে অমিয়ও খায়নি। কেউ সাধলোও না তাদের।

'রজনী' বলে দরোর ডাকলো অমিয়। 'এবার একটু শুয়ে নাও না। তাহলে এতটা জার্নির গায়ের ব্যথা কিছু মরবে।'

রজনী কোন জবাব দিল না। খাওয়া হয়নি। স্নান হয়নি। তারপর গ্রুপের সবার এমন বেআক্কেলে কান্ড। আগিয়ে উঠে গিয়ে রজনীর সামনে দাঁড়ালো। রজনী তখন শীতকালের কুকুরের মত নিজেকে বেতের বড় চেয়ারটায় কোনরকমে ভরে নিয়ে বসেছিল।

ধাই, কার এক চড় কষালো অমিয়। রজনী চমকে মুখ তুলে তাকালো। 'তুমি আমায় মারলে?'

অমিয় সেখানে দাঁড়ালো না। হনহন করে হেঁটে গিয়ে কর্মকর্তাদের ভেতরে বসে পড়ল। মেকআপ নেওয়ার সময়ও দুজনে কোন কথা হল না। স্টেজে কিন্তু ওরা রোজকার মতই অভিনয় করে গেল। পাবলিকের একটুও বোঝার উপায় ছিল না—কয়েক ঘন্টা আগে থেকেই একটি চড়ের জন্যে ওদের দুজনের ভেতরে সবরকম কথা থেমে আছে।

সেই রাতেই ওরা রওনা দিল। এবার ফেরার পালা। আজ সকাল থেকেই নন্দনা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিষ্ণু দত্তর লেখাটা পড়ে চলেছে। ওদের দিকে মন দেবার মত সময় তার ছিল না। নন্দনার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় রিভিউ।

ফেরার পথেও রজনী বা অমিয়—কেউ কিছু খেল না।

পরদিন দুপুরে ভরত হলের সাজঘরে রজনীর বাড়ি থেকে খাবার এল। রজনী এল না। শো শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা আগে অমিয় ফোন করে জানালো রজনী তো যথারীতি বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। বজনীর ছেলেই জানালো, মা তো হাউসে গেছে।

তাহলে কোথায় যেতে পারে। নন্দনাকে সুজাতার মেকআপ নিতে বলে অমিয় কল্যাণীকে আড্ডা হতে বলল। স্টেজে ঢোকার আগে লালুকে বাবাসাত পাঠালো। সেখানে রজনীর একজন পাতানো মা থাকেন। হয়ত তাঁর কাছে গেছে।

ভরত শোয়ের মাঝখানে খবর এল রজনী সেখানে যায়নি। কোথায় যেতে পারে? ইভনিং শোয়ের শেষে বেরিয়ে তিনটি থানায় ডায়রি করল অমিয়। তখন মনে হল আজ যদি শশাঙ্ক থাকতো। অনেক রাতে বাড়ি ফিরলে লীলা বলল 'বিষ্ণুবাবুর লেখাটা পড়েছো?" দারুণ লিখেছেন কিন্তু।'

—'পড়ার সময় পেলাম কোথায়? রজনী বেপাত্তা—'

—'কী ব্যাপার?'

—'আজ দুপুর থেকে। কেউ বলতে পারছে না কোথায় গেছে—'

অন্যমনস্ক অমিয় কিছুই খেল না। ভাত নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করল শুধু। ফলে লীলারও বিশেষ খাওয়া হল না। লীলা জানে—শশাঙ্ক কমাস হল—হাওয়া। ড্রাইভার লালুই বলেছে তাকে। রজনী আর লীলার মধ্যে অমিয় ছাড়াও আরেকটি যোগসূত্র—লালু ড্রাইভার। তারও কষ্ট হচ্ছিল রজনীর জন্যে। কোথায় যেতে পারে? খানিক পরে বাগুও হল। এমন করে লোক হারিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়।

—'কিছু বলেছিলে ওকে?'

—'একটা চড় মেরেছিলাম।'

—'এ্যাঁ! সেকি?'

লীলা পরিষ্কার বুঝলো, চড়টা সোজা তার গালেই এসে লাগল। সম্পর্কটা এতদূর যে অবলীলায় চড়ও মারা যায়। কিন্তু কিছু বলল না। দুজন মানুষ সেদিন একই বিছানায় দুদিক ফিরে শুয়ে থাকলো। কারও ঘুম হওয়ার কথা নয়। তবে শেষ রাতের দিকে ক্লান্তিতে অমিয়র চোখ বুজে এল। বেলায় বিছানা থেকে উঠে সোজা ভরতে চলে এল। বিশ্বনাথকে পাঠালো পুরী। মাঝে মাঝে যেন রজনী পুরী হোটেলের কথা বলত।

চন্ডীদার ডবল—বিমলকে পাঠালো ওয়ালটেয়ার। আর লাইটের তারকাকে দীঘায়। বলে দিল খবর পাওয়া মাত্র ভরতে ফোন করবে।

সেদিন সারাদিন কোন খবর নেই। পরদিন শোয়ের আগে শংকর খাবার আনালো। 'দুটি খেয়ে নাও। নয়ত শরীরের গোলমাল হবে। এই মন নিয়ে শো করা যায়?' অমিয় কাঁটা চামচ নেড়েচেড়েও খেতে পারল না।

শোয়ের ঠিক আগে পুরীর খবর এল। বিশ্বনাথের গলা। 'দিদি এখানে। কথা বলবে?'

অমিয় বলল, 'না।'

বিশ্বনাথ বলল, 'আমরা কোনারক বেড়াতে যাচ্ছি।'

অমিয় ফোন নামিয়ে রাখলো। শো সেদিন পাঁচ মিনিট দেরিতে শুরু হল। কারণ ফোন নামিয়ে অমিয় নির্জন সাজঘরে সেই ফেলে রাখা খাবার প্রোগ্রামে খেল। জল খেল দু গ্লাস। পর পর। তার শরীর তখন কাঁপছে। স্টেজে নন্দনা খুব আস্তে বলল পড়ে যাবেন দাদা! আপনার হাত কাঁপছে।

আরও তিনদিন বে রজনী ফিরে এল। হাউস এসে অমিয়র দিকে তাকাতে পারছিল না। 'এ কি করেছো শরীরের অবস্থা। সব শুনলাম লালুর কাছে। এই নাও পুরীর প্রসাদ।'

অমিয় অবাক হয়ে তাকালো। দেবেরা যে কী বস্তু। কী দিয়ে তৈরি হয়। রজনীর হাতে কোনারকের পোড়ামাটির পুতুল। হাতে শুকনো মালা। কোন মন্দিরের হবে। প্রসাদ দিল যেন—কালীঘাট গিয়েছিল ট্রামে করে—ফেরার পথে এনেছে।

খানিকক্ষণ কোন কথা হল না। তারপর অমিয় বলল 'চড় মেরেছি বলে চলে গেলে?'

—'না।'

—'তবে?'

—'নাটকের শুরু থেকে আমি। গন্ধর্বের মলাটে গেল নন্দনা'?

—'এই কথা! তা বলবে তো আমাকে। স্ল্যানিংয়ের সময় তুমি অসুস্থ। বিজ্ঞাপন তো রানিং শো নিয়েই হয়। এত ছেলেমানুষ!'

(ক্রমশঃ)

বাম্পার ও আম্পায়ার

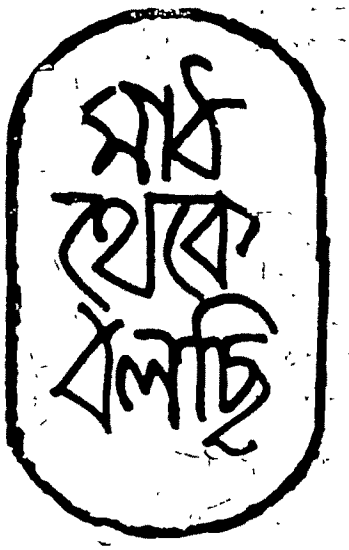

প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার আসরে আম্পায়ার বা রেফারীর ওপর মস্তো দায়িত্ব চাপানো থাকে। যে কোনো খেলা যাতে নিয়মের আওতায় থেকে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তারই জন্যে ক্রীড়া পরিচালনার ভার দিয়ে আম্পায়ার বা রেফারী নিয়োগ করা হয়। খেলার গতি যেন অকারণ ব্যাহত না হয়, কোনো খেলোয়াড় যেন অন্যায়ভাবে সুবিধে নিতে না পারে তা দেখার ভার রেফারী বা আম্পায়ারের। খেলার মাঠে তারাই হলেন বিচারক। মতান্তর দেখা দিলে নিয়মঘটিত বিতর্কের সৃষ্টি হলে বিষয়টির মীমাংসায় পৌঁছতে তাঁরাই রায় দেন। এবং সেই রায় অলঙ্ঘনীয়।

ক্রীড়ানুষ্ঠানের সুষ্ঠুপরিচালনার কাজ যাতে সহজ হয় তারই জন্যে রেফারী বা আম্পায়ারের হাতে আইন মোতাবেক বিশেষ বিশেষ ক্ষমতাও তুলে দেওয়া হয়েছে। বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণে তাঁরা তাই নিজের ইচ্ছা খাটাতে পারেন। এক কথায় তাঁদের ক্ষমতার সীমা পরিসীমা নেই। সেই ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁরা এক একটি অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে পারেন। আবার সেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগে তাঁরাই কিন্তু খেলা ভণ্ডুলও করে দিতে পারেন।

এতো সব কাজের দায়িত্ব যাঁদের ওপর থাকে তাঁরা বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং পরিস্থিতির মূল্যায়নে স্থির বুদ্ধির পরিচয় রাখবেন, এইটিই সাধারণের প্রত্যাশা। কিন্তু সে প্রত্যাশা যদি পূরণ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে পরিণামে যে কি সংকট ঘনিয়ে আসতে পারে তারই অভ্রান্ত প্রমাণ থেকে গেছে সাবিনা পার্কে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের বিবরণে।

কিংসটনের সাবিনা পার্কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চারজন পেস বোলার—হোল্ডিং ড্যানিয়েল জুলিয়েন ও হোল্ডার। তাঁরা প্রথমে সহজভাবে বোলিং করছিলেন। কিন্তু প্রথম ইনিংস মাত্র এক উইকেট হারিয়ে ভারতের রান দুশর ঘরে পৌঁছে যাবার মুখে তাঁদের ভাবান্তর ঘটে। ম্যাচ হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে তখন তাঁরা দ্বিতীয় নতুন বলটিকে খাটো লেংথে ঠুকতে বাম্পার ছাড়েন সবিক্রমে এবং যথেচ্ছভাবে। উদ্দেশ্য ছিল বাম্পার ঠুকে ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ধরানো। তাঁদের আঘাত হানা। সে উদ্দেশ্য তাঁদের সফল হয়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন বাম্পারের ছোবলে অনূন চারজন ব্যাটসম্যান (বিশ্বনাথ ব্রিজেশ প্যাটেল, অংশুমান গায়কোয়াড় দলিপ ভেঙ্গসরকার) বড় রকমের চোট পেলেন। কারুর আঙ্গুলের হাড় সরে গেল। কারুর বা সারা অঙ্গে কলুশরের ছোপ আঁকা হলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমনই হয়ে দাঁড়ালো যে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট বাগিয়ে ধরে মাঠে নামার জন্যে অনেককেই খুঁজে পাওয়া গেল না। অনোন্যপায়ে ভারতীয় দলপতি বিষেণ সিং বেদী দলের পাঁচজন আউট হতেই দ্বিতীয় ইনিংসের দান ছেড়ে ম্যাচও ছেড়ে দিলেন। বাইশ বছরের তাজা তরুণ মাইক হোল্ডিং অধিনায়কের পরামর্শে মারধোর করে বিপক্ষ দলকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ায় ওই পর্যায়ে লয়েড পরিচালিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২—১ ম্যাচে জিতে গেল বটে। কিন্তু এই মারকুটে মেজাজের পটভূমিকায় 'মজার খেলা' ক্রিকেটের সুমহান ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রইলো কিনা, তা ক্লাইভ লয়েড একবারও ভেবে দেখলেন না।

প্রশ্ন এই যে লয়েডের মন্ত্রণায় মাইক হোল্ডিং ও তাঁর সতীর্থরা যখন ব্যাটসম্যানদের শরীর তাগ করে একটানা বাম্পার ছাড়ছিলেন তখন আম্পায়াররা হাত গুটিয়ে বসেছিলেন কেন? তাঁরা বোলারদের সতর্ক করেন নি, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে একটি আঙ্গুলও তোলেন নি কেন?

এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আম্পায়ারের কি করণীয় তার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়ে গেছে ক্রিকেটের নিয়মাবলীতে। ৪৬নং নিয়মের বিভিন্ন ধারায় বলা হয়েছে ঃ

(ক) পেস বোলাররা যদি ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে অনবরত খাটো লেংথে বল দেন তাহলে কাজটি হবে অন্যায়। এই জাতীয় বোলিংকে ব্যাটসম্যানদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এক চক্রান্ত বলে মনে করা হবে। তবে ব্যাপারটা যে ওইরকম ঘটছে সে বিষয়ে বোলার প্রান্তের আম্পায়ারকে নিঃসন্দেহ হতে হবে। অর্থাৎ তিনি যদি মনে করেন যে বোলারের লক্ষ্য ভয় দেখানো তাহলে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ঃ

(ক) আম্পায়ারের মতে ব্যাপারটি নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটতে থাকলে তিনি বোলারকে সতর্ক করে দেবেন।

(খ) সতর্কীকরণে কাজ না হলে আম্পায়ার বিষয়টির প্রতি যে দল ফিল্ডিং করছে তার অধিনায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং যা ঘটছে সে সম্পর্কে সহযোগী আম্পায়ারকে অবহিত রাখবেন।

(গ) এতেও যদি বাঞ্ছিত ফললাভ না ঘটে তাহলে বোলার প্রান্তের আম্পায়ারকে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে,

(১) আবার সর্ট পিচ দেওয়া মাত্রই তিনি বলটিকে 'ডেড বল' বলে ঘোষণা করবেন এবং ওই অবস্থাতেই ওভার শেষ হলো বলে ধরে নিতে হবে।

(২) যে দল ফিল্ডিং করছে সেই দলের অধিনায়ককে অভিযুক্ত বোলারকে আর বল করতে না দেওয়ার জন্যে নির্দেশ দেবেন এবং অধিনায়ককে সে নির্দেশ মানতেই হবে।

(৩) বিরতির কালে আম্পায়ার ঘটনার আনুষ্ঠানিক বিবরণ পেশ করবেন যে দল ব্যাট করছে তার অধিনায়ককে।

আম্পায়ারের নির্দেশে যে বোলারকে এইভাবে সরে দাঁড়াতে হয় তিনি ওই ইনিংসে আর বল করতে পারবেন না।

সংশ্লিষ্ট নিয়মের নির্দেশ সবল ও পরিষ্কার। তবে বোলার প্রান্তের আম্পায়ার যদি বোলারের বদ মতলব সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেন তাহলে অন্য কথা। এক্ষেত্রে সাবিনা পার্কের আম্পায়ার গোসেন মনে করেন নি যে মাইক হোল্ডিং বা অন্য কেউ ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ধরাতে সর্ট পিচ বল করেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে।

মনে করেন নি, না মনে করতে চান নি। এক ওভারের ছটি বলের মধ্যে গুণে গুণে তিন চারটি বাম্পার ছাড়া যদি

বসুশ্রী
হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী
• জোড়·সিল্ক
• তাঁত·মিল
• পোষাক
• সাটিং·সুটিং
ও ছিট কাপড়

নিরবচ্ছিন্ন সর্ট পিচ বল করা না হয় তাহলে একটানা বাম্পার ছাড়া আর কাকে বলে জানি না! বলের লক্ষ্য ব্যাটসম্যান শরীর কিনা না দেখে দূরে থেকে তা বলা কঠিন। তবে হোল্ডিং ও হোল্ডারের সময় সময় উইকেট ঘুরে (রাউন্ড দি উইকেট) বল করার কায়দা থেকে তাঁদের মতলবের কিছুটা আঁচ পাওয়া যেতে পারে বৈকি।

ব্যাপারটা ঠিক কি ঘটেছিল, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তার সন্ধান পেতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফররত ভারতীয় সাংবাদিকদের লিখিত ভাষ্য হাতড়াবার দরকার নেই। বরং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ভাষ্যকার-সমালোচক টনি কোজিয়ার এবং জ্যামাইকার ডেইলি গ্লিনার পত্রিকার ক্রিকেট সমীক্ষকের মন্তব্যগুলি ধরা যাক: ও'রা ওদেশীয় ক্রীড়া সমালোচক। ভারতের কোলে ঝোল টেনে কথা কইবার পাত্র নন। তাঁরা দুজনেই বলেছেন যে সময় সময় ওভার পিছু চারটি করে বাম্পার ছেড়েছেন মাইক হোল্ডিং। সত্যিই বাম্পার প্রয়োগে তিনি বড্ড বাড়াবাড়ি করেছেন। আম্পায়ার গোসেনের উচিত ছিল হোল্ডিংয়ের আস্ফালন বন্ধ করায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

গোসেনের এই নিষ্ক্রিয় ও মৌন মূর্তি দেখে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে আম্পায়ার হিসেবে তিনি কি সত্যিই নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন? টেস্ট ক্রিকেটের আসরে তাঁর দেশের বোলাররা যখন অন্যায় সুবিধা ভোগের সঙ্কল্পে নিয়মের নির্দেশ পদে পদে উপেক্ষা করলেন তখনও তিনি অপরাধজনক ক্রিয়াকলাপ নজরে আনলেন না। আম্পায়াররা যদি তাঁদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন না করেন, দু-পক্ষের বিশ্বাসভাজন না হতে পারেন, যদি তাঁদের ব্যক্তিত্ব সমীহ জাগানো না হয় তাহলে ক্রিকেট মাঠে আম্পায়ার থাকা না থাকা, দুই-ই সমান হয়ে দাঁড়ায় না কি?

আম্পায়ারদের এই নিষ্ক্রিয়তার ফাঁকে একদলের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পেস-বোলাররা অন্যায়ভাবে সুবিধা আদায় করে নিচ্ছেন। তাঁদের বাম্পার-বিমারের আস্ফালনে অসতর্ক ব্যাটসম্যানের জীবননাশের আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে। ক্রিকেট মূলতঃ একটি খেলাই। ক্রিকেট মানে যুদ্ধ নয়। আম্পায়ারদের নিষ্ক্রিয়তায় খেলার মাঠ সত্যিই যদি যুদ্ধভূমিতে পরিণত হয়ে পড়ে তাহলে তার চেয়ে দুঃখ, ক্ষোভের আর কিই বা থাকতে পারে!

পেস বোলাররা যে কালে বাম্পার যুদ্ধ গড়ে তোলায় রণং দেহী মূর্তি ধরছেন সেই-কালে আম্পায়াররা তাঁদের নিজেদের জাতীয় দলের অধিনায়ক বা জাতীয় দলের বোলার-দের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে বা কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সঙ্কোচ বোধ করছেন বলে অভিযোগ উঠছে। এই অভিযোগ, অনেকের মতে, নিতান্ত অযৌক্তিকও নয়। তাঁদেরই সুপারিশ, ভবিষ্যতে টেস্ট ম্যাচ পরিচালনার ভার নিরপেক্ষ দেশের আম্পায়ারদের ওপর অর্পণ করা হোক্। এই অভিমত ক্রিকেটের আদর্শের সঙ্গে খাপ খায় না। যেহেতু ক্রিকেট হলো শোভনরীতি, সদাচরণের প্রতীক। "প্লে ক্রিকেট" বলে এখনও ন্যায় পথে চলার আহ্বান জানানো হয়। ক্রিকেট যারা খেলে, তা সে যে পর্যায়ের অনুষ্ঠান হোক্ না কেন, তারা শোভন রীতি ও সদা-চরণে সুসমঞ্জস হয়ে থাকবে বলেই আশা করা যায়। দুটি দলের খেলা পরিচালনার অনেক দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী দু দলের অধিনায়কের হাতে তুলে রাখা হয়েছে। সে সব ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, অধিনায়কদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলে তবেই সে মামলা আম্পায়ারের আদালতে নিয়ে যেতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে নিজেরা পারলে মিলে-মিশে খেলা চালিয়ে যাও। অনুষ্ঠানের মূলে উদ্দেশ্য তাইই। পারস্পরিক মিলন ও মৈত্রী। মিলনের সূত্র যদি ছিঁড়ে যায় তবেই আম্পা-য়ারকে হস্তক্ষেপে ডাকা হয়। কিন্তু একালে কথায় কথায় খেলায় আম্পায়ারের হস্তক্ষেপ ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বুঝি কল্পনায় আনা যায় না। যেহেতু টেস্ট ক্রিকেট এখন পেশাদার খেলোয়াড়দের কাছে মুনাফা সংগ্রহে বড় ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে। ক্রিকেট মাঠে এই বেনিয়া বুদ্ধি যতো মাথা চাড়া দেবে ততোই নিরপেক্ষ আম্পায়ার নিয়োগের দাবী হবে জোরদার। এবং তারই পরিণামে একদিন হয়তো একদেশে আয়োজিত টেস্ট ম্যাচ পরিচালনার জন্যে অন্যদেশ থেকে আম্পায়ার আমদানী করতে হবে। সেদিন বিশ্বাসের মূল ধ্বসে গিয়ে ক্রিকেটকে এক অতি সাধারণ স্তরের খেলায় পর্যবসিত করে দেবে এবং সদাচরণ, ন্যায়নীতির প্রতীক রূপে যে খেলাটি এতোদিন পরিচিত হয়েছিল, আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য হারাবার ফলে সেই খেলাটিকে তখন চিনতেই অসুবিধে হবে। সেদিনেই ক্রিকেটের আসল সঙ্কট ঘনিয়ে আসবে। সেই লগ্ন সকলেরই অনভিপ্রেত। কিন্তু দিনটি কি সত্যিই সুদূরপরাহত?

ক্রিকেটের সেই দুর্দিনকে ঠেকিয়ে রাখা যায় যদি ৪৬ নং নিয়মের বর্ষানটি কিঞ্চিৎ পাল্টে সেই নিয়ম প্রয়োগে সব আম্পায়ারকে বাধ্য করা যায়। ওভার পিছু কটি বাম্পার ছাড়লে তা নিরবচ্ছিন্ন সর্ট পিচ বোলিংয়ের পর্যায়ে পড়ে বর্তমান নিয়মে তা খোলসা করে বলা হয়নি। তাই এক ওভারে তিন-চারটি বাম্পার দেওয়ার ঘটনা দেখেও আম্পায়াররা চোখ বুজে থাকার ভান করছেন। এই নিয়ম সংশোধন করে যদি বলা হয় ওভার পিছু দুটির বেশি বাম্পার দেওয়া অপরাধমূলক কাজ বলে গণ্য হবে তাহলে হয়তো আম্পায়াররা এড়িয়ে যাওয়ার অজুহাত খুঁজে পাবেন না। অতএব প্রস্তাব নিয়ম সংশোধন করে পরিষ্কার বলে দেওয়া হোক যে কোনো ক্ষেত্রেই পেস বোলাররা ওভার পিছু দুটির বেশি বল সর্ট পিচে ঠুকতে পারবেন না। বেয়াড়া পেস-বোলারদের এবং তাঁদের মুরুব্বি দলপতিদের এইভাবে বেঁধে দিতে পারলে হয়তো বাম্পার বিমারের আস্ফালন কিছুটা কমবে। নইলে ভয় হয় যে একদিন ক্রিকেট খেলতে এসে কোনো উৎসাহী তরুণ বাম্পার-বিমারের কোপে পড়ে নিজের অমূল্য জীবন বলি দিয়ে শহীদ বনে যেতে পারেন! সেদিনকে ঠেকিয়ে রাখার আজই কিছু করার দরকার। এই প্রয়োজন ঐতিহাসিকও বটে।

অজয় বসু

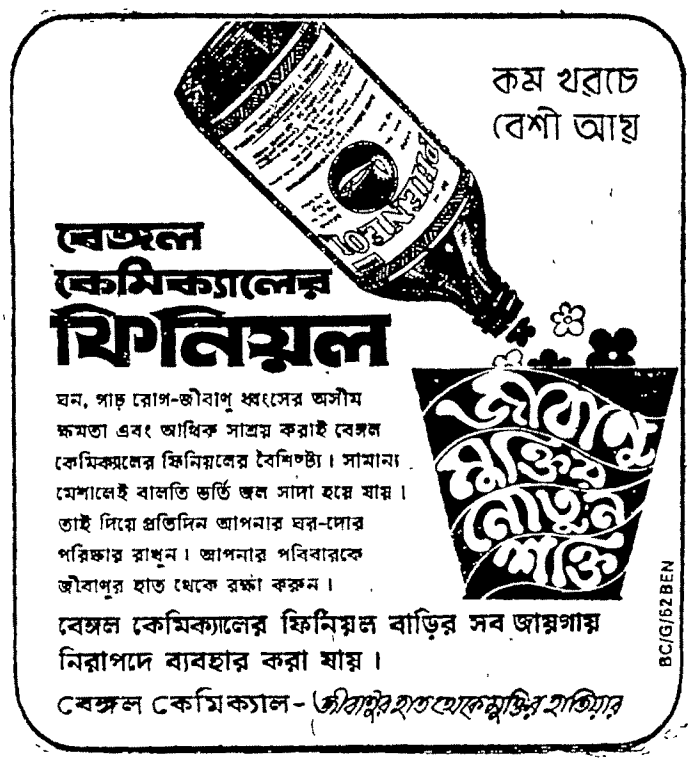

খেলাধুলা

দর্শক

কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের আশ-পাশের ময়দানে আই এফ এ-র বিভিন্ন বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার আসর জাঁকিয়ে বসে গেছে। এইসব ফুটবল লীগ খেলার মধ্যে প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার আকর্ষণই প্রধান। সেই কারণে ফুটবল খেলার আসরে তার স্থান রাজ-সিংহাসনে। এক কথায় সে কুলীন শ্রেষ্ঠ। ১৯৭৬ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার উদ্বোধন হয়েছে গত ২৪শে মে। এবছরের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় প্রতিযোগী দলের সংখ্যা ২৩। গত বছর ছিল ২২। গত বছর যে বাইশটি দল খেলেছিল তাদের মধ্যে লীগের চূড়ান্ত তালিকায় সর্বনিম্ন স্থান পেয়েছিল বালী প্রতিভা। ফলে বালী প্রতিভাকে এবছর প্রথম বিভাগ ছেড়ে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে আসতে হয়েছে। আর তার সেই শূন্যস্থানে খেলছে গত বছরের দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান সালকিয়া ফ্রেন্ডস। এবছরের প্রথম বিভাগের লীগের খেলায় সালকিয়া ফ্রেন্ডস ছাড়া আর একটি নতুন দলকে দেখতে পাচ্ছি, নাম রেজিমেন্ট অব আর্টিলারি। অনেকদিন পর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় আবার সামরিক দলের দর্শন পাওয়া গেল। তবে খেলার দিক থেকে এই দলটি খুব দুর্ধর্ষ নয়। তবে সামরিক দলের যে-সব গুণ বেশী থাকে, যেমন খেলোয়াড়দের দৈহিক সক্ষমতা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া ইত্যাদি এই দলটির যথেষ্ট আছে। প্রথম বিভাগের বাইশটি দলের বিপক্ষে প্রথম বছর খেলতে নেমেই তারা বিরাট সাফল্যের নজির সৃষ্টি করবে এমন আশা করা খুবই ভুল হবে।

খেলোয়াড়দের দল বদলের ফলে এবছর কাগজে-কলমে বেশী লাভবান হয়েছে মোহনবাগান। তবে তার চূড়ান্ত বিচার হবে বাস্তব ক্ষেত্রে অর্থাৎ খেলার মাঠে। গত কয়েক বছরই মোহনবাগান লীগ ও আই এফ এ শীল্ডের খেলায় বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেনি। মোহনবাগান শেষ প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী হয়েছে ১৯৬৯ সালে। মোহনবাগান সেখানে থেমে গেল তারপর থেকে তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব চুটিয়ে লীগ-শীল্ড খেতাব পেয়ে চলেছে। ১৯৭০ সাল থেকে ইস্টবেঙ্গল প্রথম বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে উপর্যুপরি ৬বার এবং আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে ৫বার—এর মধ্যে উপর্যুপরি ৪বার। প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের এই বিরাট সাফল্যে স্বভাবতই মোহনবাগানের খেলোয়াড় সদস্য এবং সমর্থকদের মনোবল দারুন ভেঙ্গে গেছে। তাই এবছর মোহনবাগান ক্লাবের কর্মকর্তারা কোমর বেঁধে সাধ্যমত শক্তিশালী দল তৈরী করেছেন দলের হৃত-গৌরব পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে। ইস্টবেঙ্গলের খ্যাতনামা কোচ প্রদীপ ব্যানার্জি এবং কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় মোহনবাগানে যোগদান করেছেন। এদিকে ইস্টবেঙ্গল চুপ করে বসে নেই। তাদের কোচ অমল দত্ত বলেছেন কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় দলত্যাগ করলেও নতুন খেলোয়াড়দের গড়ে-পিটে নিতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। তাদের প্রধান মূলধন মনোবল। ১৯৭৫ সালে প্রথম বিভাগের লীগ এবং আই এফ এ শীল্ড পাওয়ার সূত্রে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্যুপরি সর্বাধিক বার লীগ এবং শীল্ড জয়ের যে রেকর্ড করেছে তা দীর্ঘকাল তাদের খেলোয়াড়দের মনোবল অটুট রাখবে। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এরিয়ান্স গত বছর লীগ তালিকায় পেয়েছিল চতুর্থ স্থান। খেলায় অঘটন ঘটাতে এরিয়ান্সের জুড়ি নেই। তাদের এই খ্যাতি দীর্ঘদিনের। অনেকবার অনেক দলের মুখের গ্রাস পড়ে গেছে। সুতরাং এবছরও লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল, মোহন-বাগান এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিপক্ষে খেলতে নেমে এরিয়ান্স তাদের খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

অন্যদিকে ফুটবল দল পরিচালনা ব্যাপারেও নানা সমস্যা ও অভাব অভিযোগ দেখা দিয়েছে। ছোট ক্লাবগুলির অভিযোগ, তারা অনেক চেষ্টায় গড়েপিটে খেলোয়াড় তৈরী করে আর বড় ক্লাবগুলি সেই তৈরী খেলোয়াড়দের ভাগিয়ে নিয়ে যায়। খেলোয়াড়রা যে এইভাবে দলত্যাগ করে তা শুধু বড় ক্লাবে খেলার জন্যেই নয়। শুধু ছোট ক্লাব থেকেই খেলোয়াড়রা দলত্যাগ করে না বড় ক্লাব থেকেও করে থাকে। এর সঙ্গে টাকার একটা নিকট সম্পর্ক আছে কিন্তু তা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ফুটবল খেলা নিয়ে এই আধা-পেশাদারী অনেক দিন ধরেই কলকাতার ফুটবল মহলে চালু আছে। নতুন কিছু নয়। তবে একটা সুলক্ষণ এই যে, আগের তুলনায় কলকাতার মাঠে বাংলার বাইরে থেকে ফুটবল খেলোয়াড় আমদানী অনেক কমে গেছে। বর্তমানে কলকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই খেলোয়াড়দের এই দল বদল একরকম সীমাবদ্ধ।

কলকাতার ময়দান অঞ্চলে আই এফ এ পরিচালিত প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হয় ১৮৯৮ সালে। এই প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ৭৮ বছরের ইতিহাসে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা জমা হয়ে আছে। ১৮৯৮ সালে প্রথম বছরের এই লীগ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল আটটি দল— পাঁচটি বে-সামরিক দল এবং তিনটি সামরিক দল। পাঁচটি বে-সামরিক দলের নাম ক্যালকাটা এফ সি, ক্যালকাটা বেঞ্চার্স, ডালহৌসী, হাওড়া ইউনাইটেড এবং ওয়াই এম সি এ। অপর-দিকে তিনটি সামরিক দল—ক্লস্টার্স রেজিমেন্ট, রয়েল ওয়েস্ট কেন্ট এবং ৪৮ এফ বি আর এ। প্রথম বছরের প্রতি-যোগিতায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ক্লস্টার্স রেজিমেন্ট। বে-সামরিক দলের মধ্যে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব ১৮৯৯ সালে।

কলকাতার ময়দানে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার সূচনা যথাক্রমে ১৮৯৮ ও ১৯০৪ সালে। এই দুই ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা দীর্ঘ-দিন কেবলমাত্র ইউরোপীয় এবং মিলিটারী ফুটবল দলের জন্যে সংরক্ষিত ছিল। সে সময় শ্বেতাঙ্গ ফুটবল ক্লাব নিয়ন্ত্রিত এই দুই বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ভারতীয়দের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করা হত না। রাজনৈতিক দিক থেকে আমরা তখন ইংরেজদের চোখে অধস্তন প্রজা। ফুটবল আবার ইংরেজদের জাতীয় খেলা। ফলে শ্বেতাঙ্গদের দিক থেকে অনেক রকমের ওজর-আপত্তি ছিল। দীর্ঘদিন কেটে যাওয়ার পর ১৯১৪ সালে দুই ভারতীয় ফুটবল দল—মোহনবাগান এবং এরিয়ান্স শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় যোগদানের অনুমতি লাভ করে। এরপর প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলায় ভারতীয় দলের অনুমতি পেতে দেরী হয় নি। ১৯১৫ সালে প্রথম ভারতীয় ফুটবল দল হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগে খেলতে পায় মোহনবাগান এবং দ্বিতীয় ভারতীয় দল হিসাবে প্রথম বিভাগের লীগ খেলায় যোগদান করে এরিয়ান্স ১৯১৬ সালে।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের খেলায় ভারতীয় দলের মধ্যে সর্বপ্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করে মহ-মেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ১৯৩৪ সালে। তাছাড়া প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলার ইতিহাসে সর্বপ্রথম উপর্যুপরি পাঁচ বছর লীগ খেতাব জয়ের রেকর্ড করে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৯৩৪—৩৮)। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব উপর্যুপরি ৬বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়ে (১৯৭০—৭৫) মহমেডান স্পোর্টিংয়ের পূর্ব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে : মোহনবাগান ১৪ বার এবং ইস্টবেঙ্গল ১৪ বার। এই প্রসঙ্গে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ১০বার এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের ৮বার লীগ খেতাব জয়ও উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগের সমস্ত খেলায় জয়লাভের রেকর্ড আছে এই চারটি দলের : ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস, ১৯০৮ সালে গর্ডনস এল আই, ১৯১২ সালে ব্ল্যাকওয়াচ এবং ১৯৭৫ সালে ইস্টবেঙ্গল। একটা গোলও না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মাত্র এই দুটি দল : ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস এবং ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল। একটা গোলও না খেয়ে সমস্ত খেলায় জিতে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে একমাত্র রয়েল আইরিশ রাইফেলস ১৯০১ সালে (১৪টা খেলায় ২৮ পয়েন্ট। গোল স্বপক্ষে ৩৫ এবং বিপক্ষে ০)। ফুটবল খেলা নিয়ে লোকের এত যে মাতামাতি ও রেষারেষি, তা কি শুধু খেলার মাঠে খেলা দেখেই ? না তা নয়। খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও রেকর্ডগুলি নিঃসন্দেহে তাদের তর্ক-বিতর্ক এবং আত্মপ্রসাদের প্রধান উপকরণ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

সবাই অমনি সোৎসাহে বলে উঠল—বলুন বলুন জীবনদা।

জীবন গুহ মৃদু হেসে আরম্ভ করলেন বলতে।

উনসাট সালের কথা।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে জীবন গুহ তখন আণ্ডার ট্রায়ালে প্রিজনার। ওঁর বিরুদ্ধে প্রায় দু-ডজন মারাত্মক মারাত্মক কেস ঝুলছে। পলিটিক্যাল, অ্যান্টি সোশ্যাল হরেক রকমের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। প্রিভেনটিভ ডিটেনশন অ্যাক্ট তখন সবে মাত্র আসব আসব করছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ধরা হয়েছে অনেককেই। জীবন গুহ তাদেরই একজন।

জীবন গুহ খুব মিশুকে মানুষ।

জেলের রক্ষী-বন্দী সকলের সঙ্গে ওঁর ভাব—ভালবাসা।

মাঝে মাঝে কোর্টের ডেট পড়ে, প্রিজনর ভ্যানে চেপে কোর্টে যান, আবার ফিরে আসেন। এই করতে করতে একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

বিকেলে কোর্ট ফেরৎ পুলিশের গাড়ী করে সেদিন যারা জেলে এল, তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেন জীবন গুহ। আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনার।

হঠাৎ জীবন গুহ আলাপ করলেন—কী ব্যাপার, আপনি সন্ন্যাসী মানুষ, এখানে হঠাৎ কী মনে করে?

সন্ন্যাসীর নাম অভিমন্যু দাস।

উত্তরে নিঃশব্দে হাসল সন্ন্যাসী। মুক্তোর মত একসারি দাঁত শুধু ঝিলিক দিল। তারপর কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যাবার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্ন্যাসী বলল—কপালের লেখা খণ্ডাবে কার সাধ্যি...

পুলিশ তাকে ধরেছে ডাকাতী মার্ডার চার্জে।

জীবন গুহ ভাবলেন, ব্যাটা ভেক ধরেছে। নিজের দর বাড়াবার জন্যে বলছে এসব কথা।

জেলে কয়েদীদের মধ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠার একটা প্রশ্ন আছে। আসলে কে কত গুরুতর অপরাধ করে জেল খাটতে এসেছে—তার ওপর নির্ভর করে এই প্রতিষ্ঠা। ছিঁচকে চোর আর খুনীর পদমর্যাদা এক হতে পারে না। আইনের চোখে অবশ্য দুজনই অপরাধী। কিন্তু অপরাধীদের জগতে খুনী যদি হয় জমিদার, ছিঁচকে চোর হবে জমাদার।

রাজবোদি। সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

এখানে এই মধ্যবয়স্ক সন্ন্যাসীর বিরুদ্ধে পুলিশের চার্জশিট হচ্ছে আই-পি-সি থ্রী নাটনটি সিকস। অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান পেনাল কোর্ডের তিনশো ছিয়ানব্বুই ধারা। সাংঘাতিক ধারা। একবার এর পাল্লায় পড়লে এর থেকে রেহাই পাওয়া খুব কঠিন।

জীবন গুহ ভাবলেন লোকটা নির্জলা গুল ঝাড়ছে।

—কী ব্যাপার ঠাকুর, কোর্টে জামীন পেলেন না।

—নাঃ।

—জামিন নেবার কেউ নেই বুঝি আপনার?

—হ্যাঁ আছে।

—তাহলে জামিন নিলেন না কেন?

অভিমন্যু দাস কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল—জামিন হতো না।

—অবশ্য না হবারই কথা। আপনার বিরুদ্ধে যদি থ্রী নাইনটি সিকস চার্জ থাকে—এখন থেকে তিনমাস চুপচাপ থাকতে

দস্যু রত্নাকর/রেহনা সুলতান

হবে জেলে। চেষ্টা করেও লাভ হত না, হবেও না।

অভিমন্যু দাস ফ্যালফ্যাল করে জীবন গুহর দিকে তাকাল।

—হ্যাঁ ঠাকুর, যা বলছি শুধু শুনে রাখুন। আইন আমার ভাল করে জানা হয়ে গেছে। তা মার্ডার যে করেছেন—কাকে? মেল না ফিমেল?

অভিমন্যু দাস তখনও অবাক চোখে তাকিয়ে, যেন তখনও কথাটা তার মাথায় ঢোকেনি।

জীবন গুহ তাই আবার বললেন—খুন যে করলেন—তা কোনও ব্যাটাছেলে না মেয়েছেলেকে?

হঠাৎ যেন সম্বিত ফিরে এল সন্ন্যাসীর। স্ত্রীকে বললে—না না আমি খুন-টুন করিনি। ওসব বাজে কথা। পুলিশ আমায় ভুল করে ধরে এনেছে।

—যাঃ, কেন মিথ্যে কথা বলছ ঠাকুর। আমায় বললে তোমার ক্ষতি হবে না। বল না। বল না—

সন্ন্যাসী এবার হেসে বলল—আমি মিথ্যে কথা বলি না। আর ওই যে বললে না যে আমার জামিন হতই না, কথাটা ঠিক। তবে আমি এখানে তে-রাত্তিরের বেশী থাকছি না—

জীবন গুহ অবাক। জেল ভেঙ্গে পালাবে নাকি?

—না না জেল ভাঙ্গতে যাব কেন! ছি ছি। আমি এমনই থাকব না। তে-রাত্তিরের বেশী আমার এখানে থাকার কথাও নয়। কপাল, বুঝলে এটা কপাল ছাড়া আর কিছু নয়।

পাগল যেন প্রলাপ বকছে। আই-পি-সি থ্রী নাইনটি সিকস-এর নাম! এতো সিনেমার জেল নয় যে চিত্রনাট্যকার জেলে ঢুকিয়ে দিয়েই ক্যারেকটারকে সটান বের করে আনবে। এটা প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার। পুলিশ একবার যখন ওই ধারায় পাকড়াও করেছে—তখন আর চট করে রেহাই নেই অভিমন্যু দাস। এখন বেশ কয়েকটা বছর নিশ্চিন্তে এই জেলেই পচতে হবে তোমাকে।

অভিমন্যু দাস হাসল। —ওরে পাগল আমি মায়ের সাধক। দিনরাত তাঁর সেবা চলাফেরা করি। পুলিশ আমাকে আটকাবে কি করে!

—নেশাভাঙ্গ কর নাকি ঠাকুর?

—নারে, আমার ওসব বালাই নেই।

জীবন গুহ খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন—মা যদি বাঁচাবেন তো জেলে এলে কেন? কোর্ট থেকে জামিন হয়ে যেতে পারতো—

—না পারতাম না। তে-রাত্তির জেল বাস আমার অদৃষ্টের লিখন। আজ হোক কাল হোক, এখানে আসতে আমায় হতই। আমাকে জামিন দেবার জন্যে কোর্টে লোক এসেছিল। আমিই তাদের নিষেধ করলাম।

—তাই নাকি! তুমি বলছ যে তে-রাত্তিরের বেশী তুমি এখানে থাকবে না! আচ্ছা দেখা যাবে।

আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদের নির্ধারিত সেলে সন্ধ্যের মধ্যেই সবাইকে গনতি করে ঢুকিয়ে জেল প্রহরীরা তালা বন্ধ করে দিল।

তারপর সবাই সন্ন্যাসীকে নিয়ে পড়ল। চলল কিছুক্ষণ টিটকারি ঠাট্টা আর তামাশা! সন্ন্যাসী নির্বিকার। কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে ওকে মার্ডার চার্জে ধরে এনেছে। সবাই খোঁচাতে লাগল—বল না ঠাকুর কী করেছিল! চুরি-চামারি না দাঙ্গা-হ্যাঙ্গামা?

অভিমন্যু দাস শুধু হাসে। শেষে জীবন গুহ সবাইকে ধমক দিলেন—যাও নিজের নিজের চরকায় তেল দাওগে সব। সন্ন্যাসী কী করে এসেছে জেনে তোমাদের কী লাভ!

ত্রিশোর্ধ্ব বয়স অভিমন্যু দাসের। শক্ত-সমর্থ বেঁটে খাটো চেহারার মানুষ। সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে, সন্ন্যাসীর চোখ দুটি,—উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। সারা মুখে একটা অদ্ভুত প্রসন্নতার ভাব ছড়িয়ে রয়েছে। গলায় রুদ্রাক্ষের দু-ফের্তা মালা। পরনে পীতবস্ত্র। সঙ্গে একটা থলে ছিল—পুলিশ তা জেল গেটে জমা নিয়ে রেখেছে।

সময়টা শীতকাল। সন্ধ্যের মধ্যে রাত্রের খাওয়ার পাট সাঙ্গ হয়ে গেল। তারপরই শুয়ে পড়বার কথা। জীবন গুহ বললেন—কোথায় শোবে ঠাকুর? কম্বল এনেছো তো গেট থেকে? রাতে কিন্তু ভীষণ শীত করবে।

সন্ন্যাসী হেসে বলল—তোমার পাশেই শোব ভাবছি।

—তাহলে আর দেরী না করে শুয়ে পড়।

বলে জীবন গুহ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল জীবন গুহর। সমস্ত জেলখানা তখন নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে পাহারা-দারেরা ভারী বুট পরে চলা-ফেরার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না।

পাশ ফিরতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলেন জীবন গুহ।

অভিমন্যু দাস বিছনায় নেই।

জ্বল আলো-অন্ধকারের মধ্যে নজর ঠাহর করে জীবন গুহ দেখলেন, অদূরে ঘরের মেঝেতে অভিমন্যু দাস ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে। ও দেহে প্রাণের স্পন্দন নেই যেন। মশারা চারিদিক থেকে ওকে ছেঁকে ধরেছে। অথচ কোন সাড় নেই।

আর একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার দেখলেন জীবন গুহ। চোখের বিভ্রম নয় তো? মনে হল সন্ন্যাসীর সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা জ্যোতির মত আলো ফুটে বেরোচ্ছে।

সাড়া নিতে গিয়েও নিলেন না জীবন গুহ। একদৃষ্টে অভিমন্যুর দিকে কতক্ষণ যে তাকিয়ে রইলেন তা খেয়াল নেই। তারপর একসময় চোখে রাজ্যের ঘুমে নেমে এল। জীবন গুহ তলিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে জীবন গুহ সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করলেন—কী ঠাকুর রাত্রে জপ-তপ করো নাকি?

অভিমন্যু মৃদু হেসে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

জেলের মধ্যে সময় যেন আর কাটতেই চায় না। আণ্ডার ট্রায়াল প্রিজনারদের তো কিছু করারই নেই। সারাদিন নিজের নিজের কেসের কথা ভেবে উদ্বেগে আতঙ্কে প্রহর কাটে। জীবন গুহ কিন্তু এসব দিক দিয়ে নির্বিকার। যা হবার হবেই, অত ভেবে লাভ কী।

জীবন গুহ অনেক মানুষ দেখেছেন। মানুষের নিদারুণ নিদারুণ সব লোভ লালসারও প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। সামান্য। কটি টাকার জন্যে মানুষের জীবন গেছে দেখেছেন। আবার সেই খুনী মানুষকে ফুলের মালা গলায় নিয়ে সামাজিক জীবনে উচ্চ প্রতিষ্ঠা পেতেও দেখেছেন। দেখেছেন রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার লড়াই, দ্বন্দ্ব, প্রতিহিংসাপরায়ণতা। আবার নির্লোভ সাধুসন্তের চাইতেও উঁচুদরের মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন। দেখেছেন কাকে বলে দারিদ্র আর কাকে বলে প্রাচুর্য। দেখেছেন মানুষ আর জানোয়ার—সেও মানুষ।

আর একটা রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল অভিমন্যু দাসের। সেই হাসি হাসি মুখ। এক সময় জীবন গুহকে ডেকে বললেন—আমি একটা রুদ্রাক্ষ দিয়ে যাব তোমাকে। নেবে তো?

—নিয়ে কী হবে?

—নিয়েই দেখ না। তুমি তো অনেক কাণ্ড করেছ, ঈশ্বর মেনেছ কখনও?

—না।

—কেন?

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—এবার বিশ্বাস হবে। যেটা দেব যত্ন করে রেখে দিও, তোমার সব বিপদ কেটে যাবে।

তখন জীবন গুহ বললেন—শোন ঠাকুর, তে রাত্তিরের পরও যদি তোমাকে এই জেলখানায় থাকতে হয় তাহলে আমি কিন্তু তোমায় ছাড়ব না। তোমার বুজরুকি আমি জন্মের মত বের করে দেব। তোমার মত সাধু-সন্ন্যাসীরাই মানুষের শত্রু, দেশের শত্রু।

হা হা করে হাসল অভিমন্যু। —মারবি নাকি? তাতে তোর লাভ? ভেতরের মানুষটাকে জিগ্যেস কর—কত মানুষের তো ক্ষয়-ক্ষতি করেছিস—কী হয়েছে আখেরে? তোর কত বড় প্রাণশক্তি, নিজেকে এভাবে নষ্ট করছিস কেন? ঠাকুরের শরণ নে, তোর মঙ্গল হবে।

—ধুত্তোর নিকুচি করেছে তোমার ঠাকুরের—জীবন গুহ'র কথা— যে ক'দিন বাঁচব মৌজ করে বাঁচব। আমায় জ্ঞান দেবার চেষ্টা করো না ঠাকুর। দেখব তোমার ঠাকুর তোমায় বাঁচায় কী ভাবে!

—আমার মা। ঠিক বাঁচাবে।...রুদ্রাক্ষটা চেয়ে নিস। তাড়াহুড়োয় আমার হয়ত খেয়াল থাকবে না.....

—আচ্ছা দেখা যাবে—জীবন গুহ কঠিন মুখে উঠে গেলেন। ধর্মের ভড়ং আর ভূজং দিয়ে ভারতের লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী এইভাবে জীবন কাটাচ্ছে। এর একটা প্রতিকার হওয়া দরকার।

দ্বিতীয় রাত্রি কেটে গেল।

তৃতীয় রাত এল।

—কী ঠাকুর? কী রকম বুঝছো?

ফিক করে হেসে অভিমন্যু বলল—জানিস, আজ রাতে আমার মা আসবেন। আমার সব দায়-দায়িত্ব ওঁরই ওপর। আমি ভেবে আর কী করব বল?...হ্যাঁ, সকালে মনে করে রুদ্রাক্ষটা চেয়ে নিস বাবা। তাড়াহুড়োয় হয়ত.....

সে রাতে জীবন গুহ স্থির করেছিলেন ঘুমোবেন না। দেখবেন সন্ন্যাসীর ব্যাপারটা রাত জেগে লোকটা কী করে। কিন্তু কম্বল মুড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দারুণ ঘুম পেয়ে গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাকে ঠেকানো গেল না।

জীবন গুহ দারুণ উত্তেজিত। এ যেন একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। দিন গড়িয়ে বিকেল হল। কোর্ট থেকে গাড়ী ফিরে এল। জীবন গুহ দেখলেন কম্বল আর থালা গেলাস জড় করে এক পাশে রেখে দিয়েছে সন্ন্যাসী। এখান থেকে বেরোবার সময় প্রত্যেক প্রিজনারকে ওগুলো আবার জেল গেটে জমা দিয়ে যেতে হয়। সন্ন্যাসীর ভাব ভঙ্গীতে মনে হল—ও ওর বিশ্বাসে অটল, আজ ওর মুক্তি হবেই। চতুর্থ রাত্রি তাকে আর জেলে থাকতে হবে না। কিছুতেই না।

জীবন গুহ অভিমন্যু দাসের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন সারাদিন। হঠাৎ ও ছুটে এসে একটা রুদ্রাক্ষ জীবন গুহর হাতে দিয়ে বলল —ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল। এটা যত্ন করে রেখে দে। আর...বলেই হঠাৎ জীবন গুহর কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে ফিস ফিস করে কি যেন বার বার তিনবার উচ্চারণ করল।

—আরে কী হচ্ছে কী হচ্ছে...

জীবন গুহ তাড়াতাড়ি ওকে সরাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু অভিমন্যু দাস হেসে বলল—রাগ করছিস কেন? বীজমন্ত্র দিচ্ছি—পাবি না পাবি না—কেউ দেবে না—নিয়ে রাখ—তিন সন্ধ্যে জপ করবি এই রুদ্রাক্ষ হাতে—তোর সব বিপদ কেটে যাবে...এখানে তোকে আটকে রাখতে পারবে না.....

জীবন গুহ তখনও কঠিন এবং অবিচল। বেশ, বেশ, সবই করব। তার আগে তুমি রিলিজ হও তো।

(চলবে)

রঞ্জন মজুমদার

অপরাজিতা

একদিকে মামা সমস্ত সম্পত্তি ঠকিয়ে নিয়ে সুপ্রিয়াকে নিঃস্ব করে—অপরদিকে বাবার বন্ধুপুত্র অজিত কোনো এক রাতে তার চরম সর্বনাশ করে। এদিকে সুপ্রিয়া আবার অরুণের বাগদত্তা। এই অবস্থায় আত্মহত্যা মানেইত পরাজয়। তাই জনৈক বেঞ্জামিনের সাহায্যে কিভাবে সে এ সবের প্রতিশোধ নেয় এবং বেশ কিছুকাল কারাবরণ করবার পর অরুণকে ফিরে পায় ছবিতে তাই বর্ণিত।

পরিচালক এই গতানুগতিক কাহিনীটিকে মোটামুটি জমাতে পেরেছেন এবং এ ব্যাপারে চিত্রনাট্য ও সম্পাদনা তাঁকে বেশ সাহায্য করে। প্রথমার্ধের বেশ কিছু অপ্রাসঙ্গিক ঘটনা বাদ দিলে (বোম্বাই-পর্ব) ছবির গতি আরও বাড়ত। ছবি দ্বিতীয়ার্ধেই জমে ওঠে। তবে চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটু নজর দেবার প্রয়োজন ছিল।

সুপ্রিয়ার মামা যেন একটু বেশী নিষ্ঠুর এবং তার কীর্তিকলাপও কেমন যেন অস্বাভাবিক। চরিত্রটিতে মন্মথ মুখার্জির অভিনয়ও কেমন যেন কমিক্যাল। অজিত যে এমন ভদ্রবেশী শয়তান আগে কোথাও তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। এই চরিত্রে বিজু ফুকন একরকম ভালই করেন। আর বেঞ্জামিন—নিজের মেয়ের হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার ব্যাপারে এত নিস্পৃহ কেন? এ ক্ষেত্রে সুপ্রিয়ার সাহায্য ছাড়া সে নিজেও ত কিছু করতে পারত, চরিত্রটিতে অবশ্য তরুণকুমার ভালই অভিনয় করেন। সুপ্রিয়ার চরিত্রে রাজশ্রী বসুর অভিনয় ভাল। তবে তাঁর ভয়েস-মডুলেশনের দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। যাই হোক চরিত্রটিকে তিনি বেশ প্রাণবন্ত করে তুলতে পেরেছেন। রঞ্জিৎ মল্লিকের অরুণ সু-অভিনীত। এ ছাড়া শিপ্রা মিত্র শৈলেন মুখার্জি এবং উৎপল দত্তর অভিনয় বেশ ভাল।

ছবিতে বিশেষ অ্যাকশন নেই, তবে ক্যাবারে নৃত্য আছে। আর সুধীন দাশগুপ্তর সুরে একটি ভাল গানও আছে। ডিটেলের কাজে কিছু ত্রুটি পাওয়া গেলেও ছবি দেখতে ভালই লাগে। শব্দগ্রহণ উচ্চগ্রামের অনাথায় কলাকুশলীদের কাজ মোটামুটি ভাল।

চিত্রবিদ

কিছুক্ষণ

সুপ্রিয়া দেবী

সিনেমায় অভিনয়ের সিলভার জুবিলী হতে চললো, প্রায় পঞ্চাশখানি ছবিতে অভিনয় করে এখন সুপ্রিয়া দেবী প্রবীণ শিল্পীর দলে (অবশ্যই বয়সে নয়, অভিজ্ঞতায়), তবুও তিনি বলছেন—'সেরকম রোল পেলাম আর কই? বোধ হয় আর পাবোও না।' গলায় আক্ষেপের সুর।

বললাম—'কেন, সেকি বলছেন, ভালো রোল পান নি? 'মেঘে ঢাকা তারা'র নীতা আপনার ভালো লাগে নি?'

উড়ে আসা ঘাড়ের চুলগুলোকে বাঁ হাতে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন—'মেঘে ঢাকা তারা' করার সময় শিল্পী হিসাবে আমার ম্যাচিওরিটিই আসেনি। ঋত্বিকদা যেভাবে বলতেন, খুব নর্মাল সেগুলো করেছি। কি করেছি নিজেই জানি না। সবাই অবশ্য বলেছিল—আমার কাজ নাকি দারুন হয়েছে! আমি কিছু বুঝতে পারিনি।'

তাঁর এই আক্ষেপ সত্যিকার শিল্পীর আক্ষেপ। যখন অভিনয় সম্পর্কে সচেতন হলেন, বুঝতে পারলেন চরিত্রায়নের মজাগুলো, তখন আর মনের মত চরিত্র পেলেন না। এমন ঘটনা শুধু সুপ্রিয়া দেবীর ক্ষেত্রে নয়, আরও বহু শিল্পীর ক্ষেত্রে ঘটেছে।

সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সেদিন কথা হচ্ছিল ময়রা স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে। মাসখানেক আগে যে ঘরে যে সোফায় বসে উত্তমকুমারের ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম, আজও সেই ঘরে সেই সোফায় বসে। সুপ্রিয়া দেবী সামনের চেয়ারে টু-পিস গাউন পরে একবারে ঘরোয়া চেহারায়। নো মেক-আপ, নট কিসসু। এলো চুল হাওয়ায় বারবার অবিন্যস্ত হচ্ছে। ডান হাত দিয়ে সামলে নিচ্ছেন।

—সেই ১৯৫২ সালে বসু পরিবার করেছিলেন, এত ছবির পরও আশা না মেটার কথা শুনে বললাম—'থিয়েটার করছেন না কেন? ভালো লাগবে থিয়েটার করুন।'

হাতে একখানা কাগজ ছিল। সেটি কথার ফাঁকে ফাঁকে কখন যে পাকিয়ে ফেলেছেন দেখিনি। সেই পাকানো কাগজটিকে নাকের কাছে ধরে হাসতে হাসতে বললেন—'বেস্পতিবার-বেস্পতিবার থিয়েটার করতে পারি, শনি-রোববার পারব না। স্বামী সংসার ফেলে ঐ দুটো দিন থাকা অসম্ভব।' গ্রীবা বেঁকিয়ে সুরেলা কণ্ঠে জানালেন দাদাকে (উত্তমকুমার) ছেড়ে থাকা তাঁর সম্ভব নয়। 'আমাকে বাড়ীতে না দেখলেই তো এসে গজগজ করবে। বলবে, যাও তুমি তাহলে থিয়েটার করোগে।

স্বামীর এই অভিমান ঝরা কথা শুনতে সুপ্রিয়া দেবী প্রস্তুত নন। উপরন্তু সপ্তাহান্তে দুটো দিন তাঁকে সঙ্গ দেওয়াতো দরকার। সুতরাং আপাততঃ প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকলেও থিয়েটার করতে পারছেন না সুপ্রিয়া দেবী।

বার্মায় থাকাকালীন শাহজাহান আর নয়নারায়ণ নাটকে অভিনয়ের স্মৃতিই হাতড়ে চলেছেন। স্মৃতির ঝুলিতে তাঁর আরও অনেক সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কাহিনী আছে, কিন্তু তিনি এখন শুধু চান সুখ আর আশার স্বপ্নে মশগুল থাকতে।

কে আর অতীত খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে।

সাক্ষাৎকারের সময়টুকুতেও তাই আমি আর স্মৃতির পাতা ওল্টানোর চেষ্টা করিনি। অভিনয় আর অভিনয় জীবন নিয়ে এক নাগাড়ে প্রশ্ন শুনে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিয়া দেবী নিজেই বললেন 'অভিনয় নিয়েই শুধু প্রশ্ন করলেন, আর কিছু জানার নেই?'

—আমার কাছে নয়।

উত্তরটা শুনে জানি না তিনি অবাক হয়েছিলেন কিনা, তবে উনি আর কোন কথা বলেন নি।

স্টুডিও এবং স্টুডিওর বাইরে দেখা সুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে সেদিন অনেক অমিল লক্ষ্য করেছি। গাম্ভীর্যের কোনো আবরণ ছিল না আচরণে, ছিল না কোন স্টারসুলভ সমঝদারি। সাদামাটা ঘরোয়া আবহাওয়ায় যেন কসেছিলেন তিনি। কখনও হাল্কা হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠছিলেন, কখনও একান্ত কাছের মানুষটির মত প্রশ্ন করে আমাকেই ধাঁধিয়ে দিচ্ছিলেন।

মনোমত চরিত্র না পাওয়ার কথা প্রসঙ্গেই বললেন 'একবার রাজেনদা দারুন একটা স্ক্রীপ্ট শুনিয়েছিলেন আমাকে। খনি এলাকায় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শ্রমিক, তাঁদের আশা স্বপ্ন—স্বপ্নভঙ্গ নিয়েই

গল্প। জানি না শেষ অব্দি কেন হোল না ছবিটা। দারুন রোল ছিল।'

ঐ রকম একটি চরিত্র ফস্কে যাবার জন্য তিনি মনে মনে খুব বিচলিত। কথা শেষ করে আবার বললেন—আপনার সঙ্গে রাজেনদার দেখা হবে?

বললাম—হবে না কেন, নিশ্চয়ই হবে।

আকুল স্বরে একটা ভালো চরিত্র করবার আকুতি নিয়ে তিনি বলে উঠলেন—'দেখা হলে রাজেন দাকে বোলো তো ঐ ছবিটা করবেন কিনা, আমি কাজ করতে রাজী।'

এই নিষ্ঠা, এই আকুতি খুব কম দেখেছি আমি। অভিনয় এখন সুপ্রিয়া দেবীর প্রেম-পাত্র। অভিনয়ের জন্য কম খাটেন নাকি!

স্টুডিওর একটা ঘটনা মনে পড়ছে। টেকনিসিয়ান স্টুডিওয় সম্ভবতঃ যাত্রিকের কোন একটা ছবির কাজ হচ্ছে। প্রচণ্ড ইমোশনাল সিনে অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া দেবী আর উত্তমকুমার। দু-দুবার মনিটরের পর টেকিং-এর আগে লাইট ফাইন্যালি দেখে নিচ্ছেন ক্যামেরাম্যান। সেই ফাঁকে কে একজন যেন এসে সুপ্রিয়া দেবীকে কিছু বলতে এগিয়েছিলেন। কথা শেষ করতে পারেন নি, অমনি সুপ্রিয়া দেবী একটু রাগতঃভাবেই বলে উঠেছিলেন—'কাইণ্ডলি এখন ডিস্টার্ব করবেন না।'

একটু বাদে সিনটা টেক হবার আগেই হয়ে গেল লোড শেডিং। বিরক্ত সুপ্রিয়া দেবী বিড়বিড় করতে ফ্লোরেই বাইরে আসার সময় বলেছিলেন—'নাঃ এখানে আর কাজ করা যাবে না!'

অভিনয়ের সময় প্রচণ্ড সিরিয়স। চরিত্রের সঙ্গে একবারে একাত্ম হয়ে যান। উনি নিজেই বললেন—'আধুনিক থিয়োরী-টিয়োরী আমি জানি না। চরিত্রের সঙ্গে যদি আইডেন্টিফাইড না হতে পারি, তাহলে চরিত্রটা ফোটাব কি করে? আমি অন্ততঃ পারি না। এই যে ধরুন আপনার চরিত্রে যদি অভিনয় করি, আপনার মত আমায় হয়ে যেতে হবে তো! নইলে এক আমি সুপ্রিয়া আর এক আমি নির্মল হবো কি করে?'

এই অনুভূতির সঙ্গে শিল্পীকে জীবন-বোধ সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হয়। আর দরকার প্রখর অবজারভেশন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি। যার যত অবজারভেশন ভালো তিনি তত দক্ষ নিপুণ শিল্পী হতে পারেন। চল-মান জীবনের আশপাশে চোখ মেলে চললেই জীবনকে দেখা যায়। চেনা যায়।

সুপ্রিয়া দেবীর এই দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। সেই বর্মা মুলুক থেকে শুরু করে বিহার বা বিয়ের পর বাঁদাবাটির আধো গাঁ, কলকাতার হাজরা রোডের বাড়ীর আশপাশে জীবনকে তিনি তারিয়ে তারিয়ে দেখেছেন। এখনও বাঁদাবাটির কোনো এক ছুঁচিবাই বৃদ্ধা 'বিমানের মা'র কথা ভুলতে পারেননি। তার চলন বলন স্মৃতির পাতায় আঁকা রয়েছে।

ইমোশনের ফোঁকে একবার বলেই ফেললেন—'ঐ রকম ছুঁচিবাই বিমলের মা-র মত কোনো চরিত্র পেলে করতাম!'

—বললাম সে ছবি কি চলবে?

হা-হা করে বলে উঠলেন—'কেন চলবে না? বুড়ির অল্প বয়সের ঘটনা দেখিয়ে নানাভাবে গল্প তৈরী করা যায়! স্ক্রিপ্ট রাইটার পারলে অনেক কিছুই করতে পারেন।'

তাঁর প্রতিটি কথায় উপছে পড়ছে ভালো চরিত্র না পাবার বেদনা আর আকুতি। তবুও এরই মধ্যে 'জীবন জিজ্ঞাসা' ছবির 'রাধা' তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা বটে!

ভেতরের এই ঘরে ঢোকার সময়ই দেখে-ছিলাম বিরাট বসার ঘরখানার রিনোভেশন হচ্ছে। বাঁ দিকের বিশাল দেয়াল জুড়ে তৈরী হচ্ছে সুদৃশ্য র‍্যাক। আমাদের কথার ফাঁকে সুপ্রিয়া দেবীর হেয়ার ড্রেসার এসে কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে নির্দেশ নিয়ে চলে গেল।

ঠাণ্ডা কোকাকোলা যে কখন আবার গরম হয়ে উঠেছে লক্ষ্য করিনি। সুপ্রিয়া দেবীই বললেন—'খেয়ে নিন, গরম হয়ে যাচ্ছে।'

বসার জায়গাটার অবিন্যস্ত অবস্থার দিকে শুরুতেই বলেছিলেন ঘরের বর্ণনা-টর্ণনা কিছু দেবেন না কাইণ্ডলি। একে তো আধভাঙ্গা বাড়ীতে আছি, এখনো সাজানো-গোছানো হয়নি, লোকে ভাববেটা কি!'

ইতিমধ্যে আরও একবার হেয়ার ড্রেসার এসে মিষ্টি সুরে তাগাদা দিয়ে গেছেন সুপ্রিয়াকে। ভেতরে কি কাজ যেন আটকে আছে!

এদিকে জানালার ফাঁক দিয়ে বুঝতে পারছি বিকালের আলো ঘনিয়ে আসছে। সুপ্রিয়া দেবী আমার সামনের চেয়ারে বসে সুখদুঃখ হাসি কান্নার হাজারো কথা বলে চলেছেন। ফর্মালিটির কোনো বেড়া না রেখে জলপ্রপাতের ধারায় কথা বলছেন।

বার্মার কথা, বাঁদাবাটির বাড়ীর গল্প, স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্সের সময়, ফিল্মের ব্যাড টাইমের কথা, উত্তমকুমারের প্রতি তাঁর ডিপেণ্ডেন্সের ঘটনা, ফিল্ম লাইনে উত্তম-কুমারের দান, বাংলায় পরিচালকের অভাব, আরও আরও আরও অনেক কিছু।

হয়তো আরও বলতেন যদিনা আবার এসে হেয়ার ড্রেসার ভেতরে যাবার তাগাদা না দিতেন। ডায়েরীর পাতায় আমার দ্রুত হাত চলনা দেখে বললেন—'অনেক কিছু লিখে ফেললেন দেখছি।'

হেসে বললাম—'কাগজেই দেখবেন কি লিখলাম।' হাতের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে আগোছাল চুল দু-হাত দিয়ে গোছাতে গোছাতে বললেন—'যদিও এখনও দেরী আছে, তবুও আগাম বলে রাখছি, 'ও'র (উত্তমকুমার) জন্মদিনে এবার আসবেন অবশ্যই। পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে এবার?'

নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললাম—'তার আগে আপনার জন্মদিনে আসার ইচ্ছে আছে।'

—তা আর হোলনা। আমার জন্ম তো জানুয়ারীতে। আমি জন্মদিন পালন-টালন করি না। ও'র জন্মদিনে আগে আসুন তো! হাসতে হাসতে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বললেন 'ভালো ছবি দেবেন লেখার সঙ্গে।'

বলেছিলাম—'নিশ্চয়ই!'

কথা বোধ হয় রাখতে পেরেছি সুপ্রিয়া দেবী।

নির্মল ধর

এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে 'কিছুক্ষণ' বিভাগের সমাপ্তি ঘটল। নতুন লেখা দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই শুরু হবে।

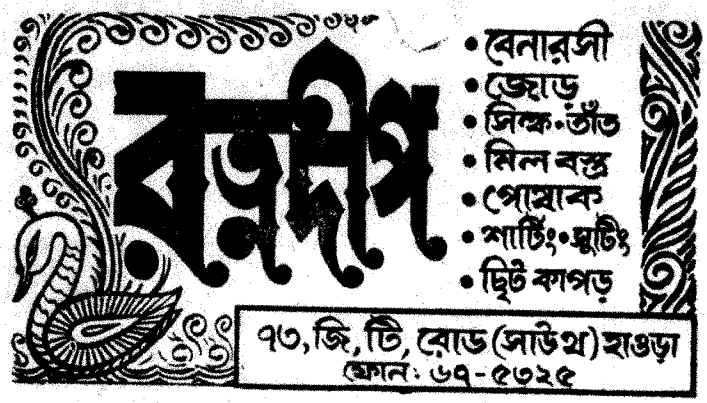

দুটি সাংবাদিক সম্মেলন

'বাংলা ছবিকে বাঁচাবার জন্য অর্ডিন্যান্স আসছে ভালো কথা। সুখবর নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরও ভালো ছবি তৈরী করতে হবে।' কথাগুলো বলেছেন পরিচালক তপন সিনহা। গত ১৯ মে এক সংবাদিক সম্মেলনে আলোচনা হচ্ছিল সম্প্রতিক বংলা ছবির সম্পর্কে। আগামী অর্ডিন্যান্স কিভাবে বাংলা চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসিনহা অরও বললেন—'এখান থেকে রঙীন ছবি করার কথা ভাবা দরকার সবার আগে। কারণ সাদা-কালো ছবির চাহিদা দিনকে দিন কমে যাচ্ছে। দর্শকের চোখও আজকাল রং পছন্দ করছেই এমতাবস্থায় বাংলা ছবিকেও রঙীন না করে উপায় নেই!'

কিন্তু বিদেশী কোডাক - ইস্টম্যানকলার 'ফিল্ম আমদানীতে বৈদেশিক মুদ্রার যে কড়া বিধি-নিষেধ আছে বাংলা ছবির পক্ষে চার গুণ বৈদেশিক মুদ্রার গ্যারান্টি দেওয়া সম্ভব কিনা প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—'ক'দিন আগে পরিচালক অজয় করের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই ব্যাপার নিয়ে। আমরা আলোচনা করে দেখেছি ষোল মিঃ মিঃয়ে ছবি তুলে পঁয়ত্রিশ মিঃ মিঃ-য়ে যদি রো অপ করে প্রিন্ট করা যায় তাহলে সাদা-কালোয় ছবির সমান খরচই প্রায় পড়ে।'

এই পদ্ধতিতে বিদেশে নাকি নিয়মিত কাজ হয়ে থাকে। সুতরাং এখানেও না হবার কোনো কারণ নেই। শ্রীসিনহা এই ব্যাপারে সরকার ও চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চান। রঙীন ল্যাবরেটরীর কথা উঠতে তিনি বললেন—'এই পদ্ধতিতে নিয়মিত ছবি তৈরী শুরু হলে ল্যাবরেটরী নিশ্চয়ই তৈরী হবে।' সরকারী সহায্যও পাওয়া যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

সংবাদিক সম্মেলনটি ডাকা হয়েছিল অবশ্য অন্য কারণে। তপন সিনহার মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি 'হারমোনিয়ম'-এর প্রযোজক মিঃ আগরওয়াল এবং মিঃ জালান চিত্র সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিচয় করালেন। এটাই ওঁদের প্রথম ছবি।

জানা গেল যে তপন সিনহার পরবর্তী ছবি 'পুরস্কার'ও প্রযোজনা করছেন এঁরা। হিন্দী ভাষায় তোলা এই শিশু চিত্রটি রঙীন ফিল্মে তোলা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ছবির জন্য রপ্তানীর ব্যাপারে বিদেশী কিছু সহায্য করছেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিচ্ছিলেন অরুন্ধতী দেবী। তিনি বলেন আঞ্চলিক ছবির ক্ষেত্রে রঙীন ফিল্ম রপ্তানীর ব্যাপারে সরকারী নীতির কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার।

ঐদিন সন্ধ্যায় আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন ভানু ব্যানার্জী অনিল চ্যাটার্জী কালী ব্যানার্জী স্বরূপ দত্ত সমিত ভঞ্জ কাজল গুপ্ত সেনালী গুপ্ত বিমল মুখার্জী ভীষ্ম গুহঠাকুরতা প্রমুখ।

দ্বিতীয় সাংবাদিক সম্মেলনটি হয়েছিল অরও ক'দিন আগে। ফর্মাল কোনো আলোচনা নয় পার্ক হোটেলে এক ঘরোয়া পরিবেশে বম্বের খ্যাতনামা প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্তের সঙ্গে বি এফ জে-এ'র সদস্যরা এক চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন।

'আমানুষ'র আশাতীত সাফল্যের পর শক্তিবাবু আবার বংলায় ছবি করতে আসছেন। এবার হবে 'ডাক্তার'এর রি-মেক। হিন্দী বাংলা দু' ভাষাতেই তুলবেন। তিনি বললেন 'শুধু বাংলায় করলে খরচ অনেক বেশী পড়ে।'

বম্বে চিত্রজগতের এখন শক্তি সামন্ত একটি স্তম্ভ বিশেষ। এ পর্যন্ত প্রায় পঁচিশখানি ছবি পরিচালনা করেছেন তার মধ্যে পনেরখানাই বোধহয় নিজের প্রোডাক-সনের ছবি। ফিল্মের ব্যবসার দিকটা খুব বোঝেন দর্শকের চাহিদা মাফিক ছবি করাই তাঁর উদ্দেশ্যে। তাই বলে কুরুচিপূর্ণ উপায়ে কখনই নয়।

সম্প্রতি টি ভি'র জন্য আলাদা ফিল্ম তৈরীর কথা শোনা যাচ্ছে। ঐ প্রসঙ্গে কথা উঠতে তিনি বললেন—'আপাততঃ টি-ভি'র জন্য ছবি তৈরীর কথা ভাবছি না। ভবিষ্যতে হয়তো ভাববো। অবশ্য বিদেশের মত টি-ভি ফিল্ম তৈরী করে বিক্রীর ব্যবস্থা এখনে নেই। বিদেশে অনেক প্রাইভেট টি-ভি কোম্পনী আছে যারা প্রযোজকদের ফিল্ম তৈরীর কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দেন। শুনেছি ওখনে নাকি বেশ ভালো পয়সাও তাঁরা দেন। এখনে এসব ব্যবস্থা কোথায়? একটা ছবিকে একবার স্ক্রিনিং করলে দেয় মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।'

কথা প্রসঙ্গে অর্ডিন্যান্সের কথাও এলো। শক্তিবাবু বললেন—'এতে কোনো লাভ হবে না। কারণ বংলা ছবির নির্দিষ্ট কতগুলি চেন্ আছে তার বাইরে গেলে ছবি মার খাবে।' কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহের নাম করে তিনি আরও বললেন 'ঐ সব হাউসে বাংলা ছবি কখনই চলবে না। আসলে এখন দরকার ভালো ছবি এবং বেশী ছবি। ভালো ছবি হলে দর্শকরা নিশ্চয়ই ছবি দেখবে।'

পরীক্ষামূলক ছবি করছেন না কেন?—একজন সংবাদিক প্রশ্নটা রাখতে তিনি নির্দ্বিধায় বললেন—'আপনাদের এক্স-পেরিমেন্টাল ছবিটাবি আমি বুঝি না ছবির ব্যবসায়িক সাফল্যটাই আমার কাছে বড়ো। তাছাড়া দর্শকদের মর্জি বোঝাটাও এক ধরনের পরীক্ষা সেদিক থেকে সব ছবিকেই একসপেরিমেন্টাল বলা যায়।'

জলসা

'জীবনে যত পূজা হোলো না সারা'

অশ্রুভরা বেদনায় গাইছিলেন রবীন্দ্র-সংগীতের অন্যতম গুরু শৈলজানন্দ মজুমদার, পল-ম্যানসনে দত্ত পরিবারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পী রাজে-শ্বরী দত্তর স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠানে। শৈলজা-বাবু বললেন 'রাজেশ (প্রিয় শিষ্যাকে তিনি ঐ নামেই ডাকতেন) সারা জীবন ধরে নীরব সাধনাই করে গেলো। কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলো না। অসময়ে চলে গেলো।'

অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেদগান দিয়ে আসর সুরু হয়েছিল এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত-শিল্পীরা গান গেয়ে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন।

গীতবিতানের পক্ষ থেকে ঐ সংগীত শিক্ষায়তনে একটি স্মৃতিতর্পণ সভা আয়োজিত হয়। শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগ-ভরা ভাষণে শিল্পীর অসামান্য প্রতিভা, শিশুসুলভ স্বভাব ও আচরণের অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা যেন বেদনাভরা মুহূর্তের মধ্যে থমকে দাঁড়ালো। প্রধান বক্তা শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ বলেন 'রাজেশ্বরী নিজের ভাষা, গান, দেশ সবকিছু ছেড়ে বাংলার বধূ হয়ে বাংলা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবু তাঁকে কাজের জন্য যেতে হল প্রবাসে। এতে আমাদেরই লজ্জা বোধ করা উচিত।'

তৃতীয় সভা কমলা গার্লস স্কুলে। আহ্বায়ক বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয় এবার রাজেশ্বরী দত্ত দেশে আসার পর কলকাতায় তাঁর প্রথম আসর এবং দুটি সংবর্ধনা উৎসবের আয়োজন করেন ইনিই। কলকাতাবাসী তাঁর শেষ গান শুনেছে বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই।

এ আসরের বক্তা ছিলেন নীহারবিন্দু সেন ও সন্ধ্যা সেন। দেবব্রত বিশ্বাস 'চোখের আলোয় দেখেছিলেন' বাংলার পর ফরাসী ভাষায় গেছে শোনালেন। গাইবার আগে শিল্পী বললেন 'রাজেশ্বরী অনর্গল ফরাসী ভাষায় কথা বলতেন। তাই জামসেদপুরে তাঁর সংবর্ধনা সভায় বিশেষ করে তাঁরই জন্য ফরাসী ভাষায় রবীন্দ্রসংগীত গেয়েছিলাম। আজও গাইছি।'

তিনি ছাড়া আর যেসব শিল্পী গান গেয়ে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন তাঁরা হলেন কুমকুম চট্টোপাধ্যায়, গীতা ঘটক ও সাগর সেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন পার্থ ঘোষ ও গৌরী ঘোষ। সভায় উপস্থিত ছিলেন কনক দাস, নীহারবিন্দু সেন, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপ্নী

ঠাকুর, বনানী ঘোষ, অজিত সেনগুপ্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর মিত্র ও বিমান ঘোষ।

অনুষ্ঠানের সুরুতে বেদগান শুনিয়েছিলেন সুরতীর্থের ছাত্রছাত্রীরা।

তিনটি সভাতেই সর্বশেষ অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্তা রাজেশ্বরী দত্তর টেপরেকর্ডে ধৃত গান বাজিয়ে শোনানো হয়েছিল।

রাগচক্র প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী

উত্তর কলকাতায় রাগচক্র প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে শিক্ষায়তন সংশ্লিষ্ট শান্তিভিলায় পর পর দুদিন গানের আসরের আয়োজন করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনটি ছিল সারারাত্রিব্যাপী।

প্রথম দিনের প্রধান শিল্পী ওস্তাদ মুনাব্বর খাঁ রাগেশ্রী রাগে খেয়াল ও তারানায় পাতিয়ালা ঘরাণার এক উপভোগ্য রূপ মেলে ধরেছিলেন। শান্তি মুখার্জি পরিবেশিত 'মারু বেহাগ' রাগের খেয়ালে এই তরুণ শিল্পীর অগ্রগতির বলিষ্ঠ স্বাক্ষর পাওয়া গেল।

রাগচক্রের শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমকুম মজুমদার (ইমন), লছমন সিং (শিবরঞ্জানী)। মিয়া মুসারত আলি খাঁন তাঁর পিতা সওকৎ আলি খাঁর তবলা সহযোগিতায় সরোদ বাজিয়ে শোনান কিরবাণী রাগে। ইনি উক্ত সংগতিয়া ছাড়াও তবলা ও সারেঙ্গীতে অন্যান্য শিল্পীদের সহযোগিতা করেছেন মহঃ আসলাম খাঁ, দীনেশ চক্রবর্তী, অপু দত্ত এবং মেহমুদ খাঁ।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানের সুরু অরুণ ভট্টাচার্য রচিত এবং ছায়া চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত গুরুবন্দনা দিয়ে। এদিন উদ্বোধক, সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কালিদাস সান্যাল, জয়কৃষ্ণ সান্যাল এবং জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। সকলেই তাদের ভাষণে বারাকপুর মহকুমা অঞ্চলে শাস্ত্রীয় সংগীত প্রচারে শ্রীচাকলাদারের বিশেষ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সুখরঞ্জন চাকলাদার ও কানাইলাল মুন্সি।

যন্ত্রসংগীতের আসরে সেতারে নলিনী-জীবন সোমের মারুবেহাগ রাগবিশ্লেষণ যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন ধারার এক প্রামাণ্য রূপ মেলে ধরেন।

বসন্তমুখারী রাগে রবীন ঘোষের বেহালা এ আসরের এক আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। সুভাষ চাকলাদার মালকোষ রাগে খেয়াল গেয়ে শোনান। রাগবিস্তার, তান-শৈলী, বিলম্বিত ও দ্রুত উভয় অংগেই তাঁর দক্ষতা লক্ষ্য করবার মত। শিক্ষা এবং অনুশীলনী দুই-এর সমান অংশ ছিলো তাঁর সার্থক অনুষ্ঠানে।

সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান শ্যামল চট্টোপাধ্যায়ের সেতার। রাগ বিলাসখানি টোড়ি, সকলের প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে। তবলাসংগতে ছিলেন তাঁরই পুত্র সুদীপ চট্টোপাধ্যায়।

এরাতে রাগচক্রের শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায় (খেয়াল-জয়জয়ন্তী) এবং তন্দ্রা দাস (ঝোঁশিক কানাড়া)। সহযোগিতায় সুনীল দত্ত, অরূপ দে, মাধবচন্দ্র মাদুলী, মিঃ রাউত (বেনারস), পণ্ডিত কানাই মিত্র এবং রত্না সেনগুপ্ত।

একটি মহৎ অনুষ্ঠান

সম্প্রতি রবীন্দ্রসদনে পাতিপুকুর শিক্ষা সংসদের সভ্যবৃন্দ একটি রবীন্দ্রসংগীতের আসরের আয়োজন করেছিলেন—যা একটি স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। ১৯৬৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছিলো দরিদ্র পল্লীতে বিদ্যালয় হস্তশিল্প-শিক্ষণ কেন্দ্র এবং কিশোর গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কণ্ঠে দেশ রাগাশ্রিত 'রাখ নিত্যপ্রভু' এবং জগতে 'আনন্দ যজ্ঞে' রাগাশ্রিত গানে শিল্পীর অধিকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

মায়া সেনের নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও গভীরবোধ সব মিলিয়ে শ্রোতাদের মনকে ধরে রেখেছিলো তাঁর 'অন্ধজনে দেহ আলো' 'বাসন্তী হে' 'সন্ধ্যা হোলোগো,' 'দাঁড়াও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে'।

সুমিত্রা সেনের আড়ম্বরহীন মুখ ভঙ্গিতেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে গাওয়া 'আসা যাওয়ার মাঝখানে'। 'তু একলা ঘরে' 'সখি ভাবনা কাহারে বলে' 'সুখে আমায় রাখলে'।

সাগর সেন তাঁর শোভন পরিবেশনে মুগ্ধ করেছেন যে কটি গানে, সেগুলি হোলো 'প্রখর তপন তাপে' জেনেশুনে বি করেছি পান'।

ঋতু গুহ যেন সারা প্রেক্ষাগৃহকে স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন যখন সালংকার কণ্ঠে গাইলেন 'নিভৃত প্রাণের দেবতা' 'আমায় ভোলাও গো দিতে।'

হীরক চৌধুরীর নির্বাচন, পরিবেশন দুই-ই সুন্দর। তিনি গেয়েছিলেন 'মরি হায় 'এবার নীরব করে' 'আমারে যে বাঁধবে 'ক্ষমিতে পারিলাম না'।

শিল্পীদের সংগে তবলা ও তারসানায় সংগতে ছিলেন বিপ্লব মণ্ডল ও সোমে বসু।

উদ্বোধন সংগীতে শোনা গিয়েছিলো সংসদের শিশু-শিল্পীদের কণ্ঠে। প্রদীপ ঘোষের কণ্ঠে 'পৃথিবী', 'দুঃসময়' অ কয়েকটি কবিতা শ্রোতাদের অনেক আনন্দ দিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা

বিদেশীছবি

এই কাব্য মণ্ডিত ছবিটির পরিচালক পল মাজারিসকী। এ ছবির বড় সম্পদ এর আবহসংগীত ও গান।

গোর্কি সদনে চলচ্চিত্র উৎসব

সম্প্রতি গোর্কি সদনে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশের যে মিলিত চলচ্চিত্র উৎসব হয়ে গেল তা নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য।

এই উৎসবে দেখানো হোলো জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার ছবি। ছবিগুলির বেশীর ভাগই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তোলা। দেশ গঠন দেশ ও ব্যক্তিগত শ্রমিক জীবন, তাঁদের দৃঢ়তা ও দুঃসহ স্বার্থের জন্য শ্রমিকদের সংগ্রামের ভূমিকা এই সব ছবিতে প্রাধান্য পেয়েছে।

উদ্যোক্তাদের মতে এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য হোলো আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ও মৈত্রীর প্রসারকে দৃঢ় করা।

এই চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন রাজ্য বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার শ্রীহরিদাস মিত্র।

চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয় ৩ মে থেকে।

শা, র, চ

হ্যারি এ্যান্ড টন্টো' শ্লোবে

কলকাতায় মাঝে মধ্যে এমন এক একটা ছবি আসে, যা বিদগ্ধ দর্শকদের মন ভরায়; এমনি একটি আকর্ষণীয় ছবি বর্তমানে শ্লোবের আকর্ষণ। ছবির নাম 'হ্যারি এ্যান্ড টন্টো'।

এ ছবির নায়ক এমন একজন বৃদ্ধ, যাঁর একমাত্র সংগী একটি বেড়াল। সতেজ, প্রাণবন্ত এবং সংস্কার মুক্ত এই মানুষটিকে কোন পরিবেশই যেন বাঁধ রাখতে পারে না।

যেমন তিনি একা একটা বড় অ্যাপার্টমেণ্টে থাকতেন, অবসর সময়ে পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সংগ বসে সময় কাটাতেন কিন্তু তাদের সংগে একাত্ম হতে পারতেন না, তেমনি তাঁর ছেলে এসে যখন জোর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যায় তখনও তিনি তাদের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারেননি।

শেষ পযন্ত তিনি সিকাগোর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। প্লেনে তাঁর বেড়ালের ঠাঁই হোলো না বলে তিনি অভিমান করে এক সময় পথে নেমে পড়লেন। পথের সেই রমণীয় এবং রোমাঞ্চকর যাত্রা নিয়েই ছবির পরবর্তি অংশ। যা দেখতে দেখতে দর্শকও এক সময় তাঁর সংগে একাত্ম হয়ে যাবেন।

বৃদ্ধ হ্যারির ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছেন আর্ট কারনি। এই ছবিতে অভিনয় করেই তিনি শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা হিসেবে 'অস্কার' পুরস্কারে ভূষিত হন।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

7 JUN 1976

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ । দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ : ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 11th June, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

১৮ জুন ১৯৭৩

মূল্য ৭৫ পয়
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়

বোরোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?

যদিও বাসা ক্যাজ আপনাকে সারাদিন এই প্রকৃপ মূর্তিই নিয়েই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উত্তাপ অসহ্যরূপ গরম তাপে গলেসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, কুসকুড়ি ও সর্বদাই অসহ্য অস্বাচ্ছন্দ্য। আসল সময় এই সব ক্ষত জ্বালা করে হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের সকল

পোকামাকড় যে কি তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে...ভাবতে পারবেন না!

ফিনিট

ছড়ান বাড়ীতে নিয়মিতভাবে, বাড়ী পোকামাকড় মুক্ত করুন, নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

বিজ্ঞানসম্মত ফরমুলায় তৈরী **ফিনিট** বহু উদ্দেশ্যসাধক কীটনাশক—মাছি, মশা, আরশোলা, ছারপোকার মত সব পোকামাকড় মারবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী!
অতএব, নাশ করুন সারা বাড়ীর কীট, ছড়িয়ে দিয়ে ঘাতক **ফিনিট**, মশা, মাছি, আরশোলা, ছারপোকা:

ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন!

নিরাপদ অথচ নিশ্চিতভাবে!

HP

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড

ফিনিট 'পোকামাকড়-নিয়ন্ত্রণ' পরিকল্পনা

ফিনিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

উড়ন্ত পোকামাকড়—মাছি, মশা, পতঙ্গ, ডাঁশ আর ভীমরুলের জন্যে। বন্ধ ঘরে ফিনিট স্প্রে করুন যতক্ষণ না ঘর কুয়াশাচ্ছন্ন দেখায়। ১৫ মিনিট পরে ঘর খুলে দিন।

লুকেছাঁটা পোকামাকড়—আরশোলা, পিঁপড়ে, মাকড়সা, ডানাহীন মাছি, কেন্নু-বিছে, এঁটুলি, "সিলভার ফিশ"-এর জন্যে।
যেখানে সম্ভব সোজাসুজি স্প্রে করুন। বেসিন, নর্দমা থেকে নিয়ে সম্ভব মত সমস্ত লুকোবার জায়গায় স্প্রে করুন। সপ্তাহে একবার কি দুবার স্প্রে করবেন।
মনে রাখবেন, ফিনিট টিনের গায়ে আরও তথ্য দেওয়া আছে। সেগুলি নিশ্চয় করে পড়ে নেবেন।
মনে রাখবেন, পোকামাকড় শুধু বিরক্তিকর নয়, নানান রোগও ছড়ায়।
ফিনিট ছড়ান, ওদের খতম করুন।

CMHPF-3-244-Ben

ভিটামিনের অভাবের ফলে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার জন্য

ডাক্তাররা খেতে বলেন সেই সমস্ত ভিটামিন আর খনিজ পদার্থ যা আপনি পাবেন রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে-তে

আজকাল আমাদের জীবন আগের মত নয়, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে। যা পাওয়া যায় তাও তেমন পুষ্টিকর আর তাজা নয়। সকালের জলখাবার আর দুপুরের আহার তাড়াতাড়ি সারতে হয়। পুষ্টির দিক থেকে সেসবও যথেষ্ট নয়। পুষ্টির এই অভাব আর তার ওপর অফিসে ঘরে আর কারখানায় কাজের চাপ—আপনি সহজেই ক্লান্তি আর অবসাদ বোধ করেন।

ভিটামিনের এই অভাব পূরণের জন্য সবচেয়ে ভাল উপায় হল রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে যাতে রয়েছে সুষম আহারের জন্য আবশ্যক ১১টি ভিটামিন আর ৫টি খনিজ পদার্থ।

মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে প্রত্যহ সকালে খান। ক্লান্তি দূর করার এই হল সেরা উপায়।

রোশ

ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে

'বড়ির আকারে টনিক'

প্রত্যেক দিন সকালে মাত্র একটি রোশ ভিটামিনেট্‌স ফোর্টে দিনে ২০ পয়সারও* কম খরচে।

*স্থানীয় কর আলাদা

RP-8571

আজীবনের জন্যে নিশ্চিত মাসিক আয়...

হোল লাইফ মান্থলী ইনকাম স্কীম

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে আজ থেকে সাত বছরের জন্যে, প্রতি মাসে যে কোনও পরিমাণ টাকা জমা দিন আর সারা জীবন ধরে মাসে মাসে সেই পরিমাণ টাকা ফেরৎ নিন। তা সত্ত্বেও আপনার পুঁজি পুরোপুরি থাকবে।

কী করবেন ? প্রতি মাসে, ধরুন দশ টাকা বা তার বেশি আমাদের কাছে জমা রাখুন। চুরাশী মাস কিস্তি জমা দিয়ে, টাকা দেওয়া বন্ধ করুন।

কী করব ? সাত বছর পর থেকে, আপনি যে পরিমাণ জমা দিচ্ছিলেন ঠিক সেই পরিমাণ টাকা, আমরা, আপনাকে মাসে মাসে দিয়ে যাব আপনার সারা জীবনের জন্যে, কিংবা তারও পরে, আপনার উত্তরাধিকারীদের হাতে।

আপনার 'ভবিষ্য নিধি' সাত বছর পরে আপনার মাসিক কিস্তির একশ কুড়ি গুণ যে আমাদের কাছে জমা থাকবে···সেটাই হবে আপনার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড···এই টাকা পুরোই থাকবে।

কে যোগ দিতে পারে যে কেউ, এমন কি নাবালক ছেলেমেয়েরাও। তাছাড়া দুজনের নামে যৌথ খাতাও খোলা যেতে পারে।

বিশদ বিবরণের জন্যে আমাদের নিকটতম শাখায় চোলে আসুন :

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

davp 76/27

বাংলা সাহিত্যে এমন কয়েকটি বই আছে ভাষার মাধুর্যে, চরিত্র চিত্রণে তথা গুণাগুন বিচারে যা অনেক পুরস্কৃত বইয়ের শিরোনামার উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী রাখে। বাংলা সাহিত্যে এমন একটি বলিষ্ঠ রচনা যার নাম আজ সর্বত্র সবার মুখে মুখে।

প্রবোধকুমার সান্যালের

বনস্পতির বৈঠক ৩৮৲

দুটি খণ্ডে সমাপ্ত।

বিমল মিত্রের		গজেন্দ্রকুমার মিত্রের		নীহাররঞ্জন গুপ্তের	
আসামী হাজির	৪৫৲	বহ্নিবন্যা	১৩৲	সেই মরুপ্রান্তে	১৩৲
একক দশক শতক	২০৲	একদা কী করিয়া	১১	তালপাতার পুঁথি	২৫৲
সুমরেশ বসুর		আশাপূর্ণা দেবীর		তরুণকুমার ভাদুড়ীর	
অবরোধ	১০৲	প্রথম প্রতিশ্রুতি	২৫৲	কাগজের নৌকো	১০৲
সূর্যতৃষ্ণা	৯৲	যে যার দর্পণে	৮৲	সন্ধ্যাদীপের শিখা	৫৲
নিমাই ভট্টাচার্যের		সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের		নারায়ণ সান্যালের	
নাচনী	৭৲	মনে মনে খেলা	৬॥	নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা	১৪৲
জরাসন্ধের		আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের		সুমথনাথ ঘোষের	
নিঃসঙ্গ পথিক	৩৬৲	নগরপারে রূপনগর	২৫৲	নীলাঞ্জনা	৯৲
নিশানা	৮৲	পায়ে পায়ে প্রতিধ্বনি	৯৲	পরপূর্বা	৪॥০
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের		শুভেন্দ্রকুমার মিত্র সম্পাদিত		বাণী রায়ের	
রঙিন সাঁকো	১০৲	বৈজ্ঞানিক অভিধান	২৫৲	জনারণ্যে একমুখ	১২৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ

১ম—১৮৲ ২য়—যন্ত্রস্থ ৩য়—১২৲

ভক্ত বিবেকানন্দ ৭॥ কবি শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৲

সাহিত্যসম্রাট দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
রূপকথা-কাহিনীর আর একটি সুমধুর বই

দাদামশায়ের থলে

নতুন মুদ্রণ প্রকাশিত হ'ল। দাম নয় টাকা।

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অমনোনীত রচনা ফেরত পাবার জন্য উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন না।

২। কোনো রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

৩। অমনোনীত রচনা ফেরতের নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকদের চাঁদা নিম্নলিখিত হারে মণি অর্ডারযোগে অমৃত কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়

১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৯
ফোন ঃ ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক ঃ ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত । সম্পাদক ঃ শ্রীঅঞ্জলি বসু
ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারি ৭৬ পর্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতি জগতের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য দান আছে এমন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর জীবনচরিত যৌথ গবেষণা ও প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে, জন্মসূত্রে বাঙালী নন, তাঁদেরও জীবনী সন্নিবিষ্ট। ৬৪৮ পৃষ্ঠা, লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। [মূল্য ঃ টাঃ ৪০-০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। [টাঃ ২০-০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত। [টাঃ ২৫-০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক ঃ অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। [প্রতি খণ্ড টাঃ ৪০-০০, একত্রে অগ্রিম মূল্য টাঃ ৮০-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা (৩৫-৭৬৬৯)

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
নিলয় না জানি

এ উপন্যাসের একটি চরিত্র স্বয়ং লেখক। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী নয়। যথার্থ উপন্যাসই। আউল-বাউল ফকির আর তান্ত্রিকদের রহস্যময় জগত এর পট-ভূমি। আরব্য উপাখ্যানের সেই মরজিনা-আবদুল্লারই আরেক জন্মের কাহিনী।
দাম ঃ ১০-০০ টাকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের
কোণে মনে বনে ৬-০০

অরণ্যের পটভূমিতে অসাধারণ এক রোমান্টিক কাহিনী

প্রফুল্ল রায়ের
মানুষের জন্য ৭-০০

কি ভাবে মানবতাবোধ অসঙ্কে স্বর্গবাবে নিয়ে যায়, তারই উপাখ্যান।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
গোপনে নির্জনে ৮-০০

"কূপকুহেলিঘেরা জগতের ভয়-জাগানো রহস্যময় স্তব্ধতার বুকে গড়ে ওঠা" উপন্যাস।

শৈব্যার পরবর্তী প্রকাশ যাঁদের নিয়ে ঃ রমাপদ চৌধুরী, বিমল কর, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ চৌধুরী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়।

শৈব্যা পুস্তকালয়, ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-১২

১৬ বর্ষ

অমৃত

৬ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 18th June, 1976 শুক্রবার, ৪ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৮	সম্পাদকীয়		
৯	সোনালী দিন	(গল্প)	শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
১২	পলাতক ও অনুসরণকারী	(গল্প)	"
১৬	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
১৭	শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফর		শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত
১৯	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২১	মোহিনী আট্টম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
২৫	একালের চিত্রকলা		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
২৮	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৩১	আরব জগতের গৃহযুদ্ধ		শ্রীদিলীপ মালাকার
৩২	নতুন বই		
৩৪	নিঃশব্দ ঘড়ির	(কবিতা)	কবিরুল ইসলাম

বাণীশিল্পের নতুন বই প্রকাশিত হ'ল

'.... শিবরামের রচনার স্বাদ আলাদা—যাকে বলে অনির্বচনীয় .....'
—ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

শিবরাম চক্রবর্তীর **অকথিত কাহিনী** দাম ৭.০০

অতীতের ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অত্যাশ্চর্য কাহিনী
সুধাংশু পাত্রের
প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী দাম ৬.০০

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর ● **অচিন পরশ** দাম ৮.০০

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ● **ছিদ্র** দাম ঃ ৬.০০

প্রকাশের অপেক্ষায়

বনফুলের ● **নূতন গল্প**

বিক্রমাদিত্যের ● **ভালন**

প্রাপ্তিস্থান— দে বুক স্টোর, ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটারস

বাণীশিল্প ১১৩ই কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিঃ- ৯।

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীশ্রীআমিয়নিমাই চরিত
(১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪.০০

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১.৫০

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২.০০

LORD GOURANGA
(vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান ঃ
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

অফিস এবং ইনজিনীয়ারিং-এর
নিখুঁত সরঞ্জাম
এখানে এসে কিনে নিয়ে যান

সার্ভে, ড্রইং, নানা রকম কাজের
খাতা, লেজার, ক্যাশবই, কালি ও
উৎকৃষ্ট ছাপার জন্য
অন্যতম প্রতিষ্ঠান
কুইক ষ্টেশনারী ষ্টোর্স
৬৩ই রাধাবাজার ষ্ট্রীট কলিঃ-১
ফোন ঃ ২২-৮৫৮৮, ৬৭-৪৬৬৪
গ্রাম ঃ স্বাধীনতা পোষ্ট বক্স—৩৮ হাওড়া
পরিবেশক ঃ কার্মাইন প্রভাইস
(ষ্টেশনারী বিভাগ)

সুস্বাদু, পুষ্টিকর
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট
BRITANNIA
Glaxo
BISCUITS
BRITANNIA
Glaxo
BISCUITS
বাড়ন্ত বাচ্চার
সুস্বাদু সাথী
ব্রিটানিয়া
বিস্কুট সবচেয়ে সেরা
ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট এত ভাল লাগে কেন ? কারণ, এর বিশেষ পুষ্টিকর গুণ। বাচ্চারা ভালবাসে খুব আর পুষ্টির গুণে বেড়েও ওঠে। ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট সত্যিই বাড়ন্ত বাচ্চাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী।
লিনটাস-88C.GLX.6-140 BG

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৪	বিদ্যুতের ছুরি	(কবিতা)	শ্রীপরেশ মণ্ডল
৩৪	ঘুমের মধ্যে	(কবিতা)	শ্রীশৈলেন শেঠ
৩৫	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
৩৮	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৪১	বিজ্ঞানের কথা		অয়স্কান্ত
৪৩	অদ্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৭	পুনশ্চ		ক্ষপণক
৪৮	অপর্ণা		শ্রীঅঞ্জলি চৌধুরী
৫০	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫১	খেলাধূলা		দর্শক
৫৩	মাঠের নায়ক		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৫	সিনেমাটিক টক্		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৭	ক্লোর থেকে বলছি		শ্রীমুসাফির
৫৯	শতবর্ষের স্মরণীয়		শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
৬০	স্টুডিও সংবাদ		মুসাফির
৬০	নাটমঞ্চ		নাট্যসমালোচক
৬৩	বিবিধ সংবাদ		

প্রচ্ছদ : অজিতকুমার কর্মকার

শ্রীশচীন্দ্রলাল ঘরের
গল্প সংগ্রহ

আনন্দ ওমনিবাস

১ম খণ্ড : প্রাচীন সাহিত্য
২য় খণ্ড : ঐতিহাসিক গল্প
৩য় খণ্ড : সরস গল্প
৪র্থ খণ্ড : সরস গল্প
প্রতি খণ্ড : ৫ টাকা

ভ্রমণ কথা

নালন্দা থেকে লুম্বিনী

২য় সংস্করণ : ৭ টাকা

নীলাচলের পথে ২-০০

আমার দেশ

আমার গর্ব : ২-৫০

বিদেশী রূপকথা

(এণ্ডারসেনের গল্প)
রাজ সংস্করণ : ১-০০

ভিনদেশী রূপকথা

(গ্রিমের গল্প)
রাজ সংস্করণ : ১-০০

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিঃ-৯

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আগনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটো ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে রান্নায় দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম সুখাদ্যের তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAH—KCD-74

সম্পাদকীয়

টেলিফোন

কথায় বলে, বিষে বিষক্ষয়—কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এদিনে সকলেই অল্পবিস্তর স্নায়ুপীড়নে অতিষ্ঠ। জীবন চলে ঘড়ির কাঁটায়, কিন্তু সমস্তরকম কাজকর্মের পথেও কাঁটা কিছু কম নয়। খোঁচাটা অবশ্যই শরীরে নয়, আমূলে বিদ্ধ হয় মনের মধ্যে। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠতে হয় সেজন্যে অতি সহজেই। আর ক্রমে ক্রমে অনেককেই হতে হয় উচ্চ রক্তচাপ এবং আরো নানারকম ব্যাধির শিকার।

এ সব খুবই জানা কথা, আরেকবার বলে নেওয়া হল নেহাতই ঝালিয়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু এমন যদি কোনো ব্যবস্থা থাকে যাতে সকাল থেকেই গোটা দিনটির জীবন-যুদ্ধের জন্যে বেশ একটু তৈরি হয়ে নেওয়া যায়, অথবা এমন কোনো বৃহত্তর স্নায়ুপীড়া যা সারা দিনের সবকিছু বিরক্তিকে করে দেয় ছেলেখেলার মতো—তাহলে?

তাহলে আর কি, সুকুমার রায় বর্ণিত ষষ্ঠিচরণের মতো সমস্ত দিনের রাশিকৃত চাপগুলিও 'হাতি লোফার মতো সহজ হয়ে যাবে কলকাতাবাসীদের কাছে।

সেই সদুদ্দেশ্যেই বছরের পর বছর ধরে চলছে টেলিফোনের এই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা।

এ ছাড়া, সত্যি বলতে কি, আর কোনোই ব্যাখ্যা সাধারণ বুদ্ধিতে পাওয়া দুঃসাধ্য। প্রতিদিন সকাল বেলাতেই টেলিফোন করতে যে ধরনের জটিল এবং বৈচিত্র্যময় স্নায়ু-পীড়নের পদ্ধতির ভেতর দিয়ে পার হতে হয়, সেটা যে রীতিমত একটা ব্যায়ামের কাজ করে, তা কোনোমতেই অস্বীকার করা যাবে না। অসুবিধাগুলির ফর্দ তৈরি করা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। কোনো কোনো সুরসিক এ থেকে হাসির গল্পের মালমশলা জোগাড় করেছেন, ব্যঙ্গকৌতুকের কার্টুনও আঁকা হয়েছে কম নয়। উৎসাহী ব্যক্তিরা ইচ্ছে করলে এ থেকে এমনকি নতুন ধরনের একটা সিনারি তৈরি করেও বাজার মাৎ করতে পারেন। কিন্তু স্থিতধী টেলিফোন-কর্তারা তাতে খুব বিচলিত হবেন এমন মনে করার কারণ নেই। সোরগোল বেশি হলে, নিয়ম-মাফিক একটি বিবৃতি দেবেন, তার বেশি নয়। কলকাতার টেলিফোন ব্যবস্থা যে তিমিরে সেই তিমিরেই নিমজ্জিত থাকবে।

একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, টেলিফোনের চাহিদা যেমন চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না নতুন নতুন লাইন বার করার সুযোগ। বাধ্য হয়ে নতুন এক্সচেঞ্জও যে না খোলা হচ্ছে তা নয়। তাছাড়া শুধু টেলিফোনকে দায়ী করলে হবে না, কলকাতার জলের পাইপ এবং ইলেকট্রিক কিম্বা গ্যাসের লাইন নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁদেরও গাফিলতি কিছু কম নয়।

সব থেকে বেশি যা বিপদ ঘটায় তা হল কো-অর্ডিনেশান, অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে কাজ করতে হয় এমন প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ ও পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব। একই রাস্তায় জলের পাইপ বসিয়ে মাস কয়েক পর যদি বা তার মেরামতির কাজ শেষ হয়ে পড়ল পিচের প্রলেপ, ঠিক তার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই হৈ হৈ করে মাটি খুঁড়ে শুরু হল ইলেকট্রিকের কেবল পাতার কাজ। এতে রাস্তা-গুলিই শুধু জখম হয় না, জখম হয় যানবাহন আর পথচারীও।

এবং টেলিফোন ব্যবস্থাও। অথচ বছরের পর বছর একই ধরনের অসুবিধায় ভুগেও তৈরি করা যায়নি একটা কো-অর্ডিনেশান কমিটি।

কিন্তু গোড়ায় যা বলেছি, সব গোলযোগই কিন্তু রাস্তায় নয়, টেলিফোন কেন্দ্রগুলিতেও দেখা দিচ্ছে এক ধরনের ঔদাসীন্য এবং অনড়তা। লাইন না পেয়ে সাহায্যের জন্যে ১৯৯ নম্বর থেকে অনেক সময়েই মিনিটের পর মিনিট রিং হয়ে গেলে সাড়া পাওয়া যায় না, গেলেও সঙ্গিনীদের পারস্পরিক আলাপের মধ্যে নম্বর চাইলে বারবার রিপিট করতে হয় নম্বর, কিম্বা প্রায়শই শোনা যায়, আপনার প্রার্থিত লাইনটি আউট অব অর্ডার—যদিচ ১৯৯ ছেড়ে পরের মুহূর্তেই নিজে চেষ্টা করলে সেই মৃত লাইনটিই জ্যান্ত হয়ে ওঠে ল্যাজারাসের মতো।

না, কাউকে দায়ী করার জন্যে এই লেখা নয়। এই রচনাটির একটিমাত্র উদ্দেশ্য — মানবিক আবেদন; এবং তা সকলের কাছেই। টেলিফোনের কর্মকর্তা ও কর্মীদের কাছে যেমন, তেমনি কলকাতার নাগরিকদের কাছেও। টেলিফোনকে জরুরী কাজেই শুধু ব্যবহার করুন তাঁরা, ঘন্টার পর ঘন্টা খোশগল্পের জন্যে নয়।

কোথাও হয়তো কেউ দমকলকে খবর দেবার চেষ্টা করছে, কোথাও হয়তো কোনো মুমূর্ষু রোগীর জন্যে দরকার এক্ষুনি ডাক্তার-বাবুকে।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

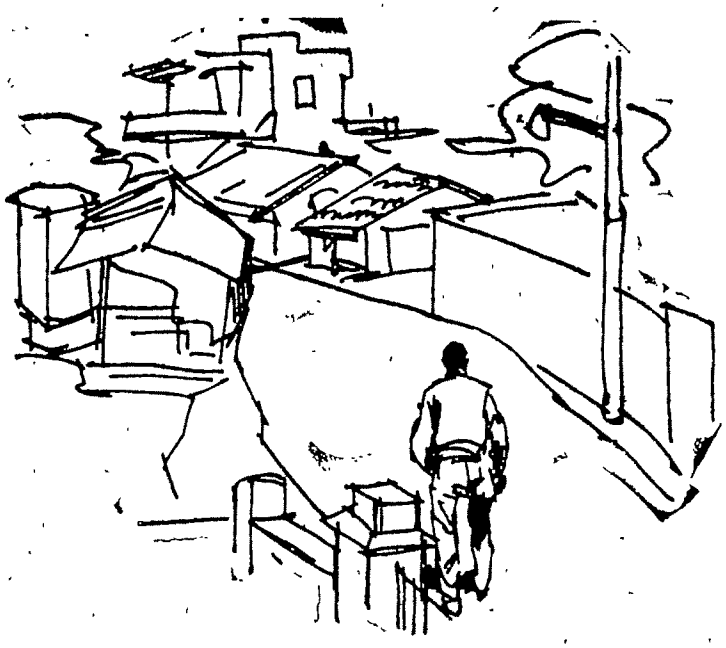

সোনালী দিন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ও মশাই, উঠুন, উঠুন!

পিনাকী চোখ মেলে প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলো না। সে কোথায়? কে তাকে ডাকছে? এত নীচু মত একটা লম্বা ঘর। খাকি পোষাকপরা লোকটি আবার বললো কী মশাই, বাড়ি যাবেন না?

তখন পিনাকী ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। সে বাসের দোতলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন পিনাকী বাসে উঠেছিল তখন ভিড়ে গিসগিস করছিল। দোতলাতেও দাঁড়িয়েছিল অনেকে; প্রায় অর্ধেকের বেশী রাস্তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসে হঠাৎ সে একটা সীট পেয়েছিল। এখন বাসটা একদম ফাঁকা, গ্যারাজের মধ্যে ঢুকে আছে।

লজ্জিত মুখ করে, কন্ডাকটরকে কিছুই না বলে সে অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে নেমে গেল। পাদানির ঠিক নীচেই ছিল খানিকটা মাটী খোঁড়া। সেখানে জল জমা, পিনাকী না দেখে সেখানে ডান পা ফেলতেই তার প্যান্টে অনেকখানি জল কাদা লেগে গেল। যাক এমন কিছু ক্ষতি হয়নি।

বেশী রাত হয়নি, মাত্র পৌনে এগারোটা। এর মধ্যেই বাস গ্যারাজে ঢুকে যায়? জেগে থাকলে পিনাকীর সাড়ে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত ছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে তো! জায়গাটা কোথায়? বেলঘোরিয়া নাকি?

বাইরে এসে পিনাকী দেখল, না পাইকপাড়া। তা হলে বেশী দূর নয়। এখন কি আর উল্টোদিকের বাস পাওয়া যাবে? এটুকু রাস্তা হেঁটেই যেতে হবে মনে হচ্ছে।

সিগারেট খোঁজার জন্য পিনাকী পকেটে হাত দিল। তার পকেটে সিগারেট দেশলাই, খুচরো পয়সা, একটা দু'টাকার নোট, কয়েকটা ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজপত্র—কিচ্ছু নেই। প্যান্ট ও হাওয়াই শার্ট মিলিয়ে মোট তিনটি পকেট একেবারে শূন্য। এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছিল বাসের মধ্যে, কেউ না কেউ তুলে নিয়ে গেছে। চোর কি সিগারেট দেশলাইও নেয়? কিংবা পকেট থেকে পড়ে গেছে? থাক, আবার ফিরে গিয়ে খুঁজে দেখার কোন মানে হয় না।

পিনাকী আপন মনে একটু হাসলো। সে যে বাসের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে? তার তো এখন খুবই চিন্তা-ভাবনায় দুঃখিত মুখ করে থাকার কথা।

ফুটপাত ধরে কয়েক পা এগিয়েই পিনাকী দেখলো সামনে একটা কলম পড়ে আছে। কলম নয়, ডট পেন। কোনরকম দ্বিধা না করে সে সেটা তুলে নিল। তার নিজের জিনিস হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়েছে সুতরাং রাস্তায় অন্যের হারানো জিনিস সে নেবে না কেন? পিনাকীর চোখ খুব তীক্ষ্ণ। সে পৌনে এগারোটার অন্ধকার রাস্তাতেও একটা ডট পেন দেখতে পায়।

শীষটা ঠিক আছে কিনা দেখবার জন্যে এক টুকরো কাগজ পেলে ভালো হতো। তার পকেটে তো কিচ্ছু নেই! একটা কাগজের খোঁজে এদিক-ওদিক তাকালো। কিছুই চোখে পড়লো না। তখন সে শীষটা নিজের বাঁ হাতের তালুতে ঘষলো। কয়েকবার, বেশ জোরে। তবু কোনো দাগ পড়ে না। শুধু তাই নয়, ডট পেনটার একটা পাশ ফাটা। এটা হারায়নি, কেউ ইচ্ছে করে ফেলে দিয়ে গেছে। ঠিক এইখানেই কেন? পিনাকীকে ঠকাবার জন্য। তাছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? সেই জন্যই অন্য কেউও এটা আগে তোলে নি। সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে পিনাকীকে ঠকাবার জন্য। কিন্তু পিনাকীকে ঠকিয়ে অন্যদের কি লাভ?

আর যাতে কেউ না ঠকে, সেইজন্য পিনাকী রাস্তার পাশের একটা ড্রেন খুঁজে তার মধ্যে খুব যত্ন করে ফেলে দিল জিনিসটা। পিনাকী কারুকে ঠকাতে চায় না।

তখন তার মনে পড়ে গেল একটা জ্যামিতির বাকসর কথা। তার ছোটভাই পল্টু ক্লাস সেভেনে পড়ে, তার জ্যামিতির ইন্সট্রুমেন্ট বকস নেই বলে ক্লাশে বকুনি খায়। তাকে সেটা কিনে দেওয়া হয়নি। পল্টুর পড়ার বইগুলো কেনা হয়েছে কলেজ স্ট্রীটের পুরোনো বইয়ে দোকান থেকে। জ্যামিতির বাকসের দাম বারো টাকা। কে যেন বলেছিল জ্যামিতির বাকসও কোথায় যেন পুরোনো কিনতে পাওয়া যায়। সেই আশাতেই নতুন কেনা হয়নি। পুরোনোও পাওয়া যায়নি।

অন্ধকার রাস্তায় থমকে দাঁড়িয়ে পিনাকী একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। সে অনুচ্চ স্বরে বললো, পল্টু তোকে আমি সামনের মাসেই ঠিক জ্যামিতির বাক্স কিনে দেবো, দেবোই দেবো। নতুন হলদে রংয়ের সুন্দর বাক্স, ভেতরের জিনিসগুলো ঝকঝকে।

প্রতিজ্ঞাটা করার পরেই সে মনশ্চক্ষে দেখতে পেল পল্টুর বইপত্তরের ওপরে শোভা পাচ্ছে সেই বাক্সটা। পল্টু পড়াশোনায় ভালো, সে খুশী হবে। পিনাকীও আগে থেকে খুশী হয়ে গেল এবং জোরে পা চালালো।

পিনাকীকে যেতে হবে দত্তবাগানের দিকে। তখন শ্যামবাজার পর্যন্ত হেঁটে গেলে ওদিকের বাস পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পিনাকীর পকেটে তো একটাও পয়সা নেই। সুতরাং পাইকপাড়ার ভেতর দিয়ে কোণাকুনি পায়ে হেঁটে যাওয়াই সহজ উপায়।

কিন্তু পিনাকী ঠিক সহজ পথটাতে গেল না। বাণী হর্ষমুখী বোড থেকে সে একবার বাঁয়ে বেঁকলো। এদিকের গলিঘুঁজি ধরে ঘুরে ঘুরে আবার বড় রাস্তায় পড়া যায়। এপাড়ার কুকুরগুলো বড্ড বেশী চ্যাঁচায়। গলির মোড়ে পানের দোকানটা এখনও খোলা আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে গুলতানি করছে চার-পাঁচটি ছেলে। প্রত্যেকের হাতে সিগারেট। সেটা দেখেই সিগারেটের জন্য মনটা আবার আনচান করে উঠলো পিনাকীর। কিন্তু কোন উপায় তো নেই। ওদের কাছে একটা সিগারেট ধার চাইবে? অচেনা লোকের কাছেও নস্যি চাওয়া যায়, কিন্তু সিগারেট চাওয়া যায় না। পকেটে একটাও পয়সা নেই বলে কিন্তু পিনাকীর তেমন বেশী দুঃখ হচ্ছে না। মোটে তো দুটো টাকা আর কিছু খুচরো! যদি থাকতো দু হাজার টাকা অবশ্য অত টাকা থাকলে পিনাকী বাসে না চেপে ট্যাকসিতেই আসতো। বছর দু-একের মধ্যে পিনাকী ট্যাকসিতে চাপেনি। প্রথম গলির পর আবার ডানদিকে বেঁকলে সাতখানা বাড়ির পর রত্নাদের বাড়ি। গলিটা ফাঁকা একদম। রত্নাদের বাড়ির সবগুলো ঘরই অন্ধকার। এতো বাড়ি নয়, পাখীর বাসা। ঐটুকু একটা তিনতলা বাড়িতে সাতটি পরিবার থাকে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এতক্ষণ জেগে থেকে কি-ইবা করবে? পাখীদের মতই সাধারণ মানুষও বেশীক্ষণ জেগে থাকে না। যদি না তাদের বাড়ির কোনো ছেলে পিনাকীর মতন এখনো বাড়ি না ফিরে থাকে।

রত্না তো ঘুমোবেই, কারণ তাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। সে একটা সকালের ইস্কুলে পড়ায়, তাও যেতে হয় বৌবাজারে। প্রথম প্রথম পিনাকী রত্নাকে পৌঁছে দেবার জন্য শ্যামবাজার বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকতো খুব সকালে এসে। আজকাল আর হয়ে ওঠে না। তাছাড়া রোজ এক জায়গায় একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দাঁড়ালে কাছাকাছি লোকজনেরা চিনে যায়, তাতে বড় অস্বস্তি লাগে।

রত্না তিনতলার বোন ঘরটাতে থাকে তা পিনাকী জানে। যদিও সে কোনোদিন রত্নাদের বাড়ির তিনতলায় ওঠেনি। রত্নাদের মাত্র দুটো ঘরের ফ্ল্যাট দুজন লোক।

একদিন ভোরবেলায়ে পিনাকী দেখেছিল রত্না বৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিজে গিয়ে বাসস্টপের দিকে হেঁটে আসছে। পিনাকী তখন পাশের দোকানের ছাউনির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

রত্না সেই বৃষ্টির মধ্যে বাস-স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাসের দেখা নেই। পিনাকী ছাউনি ছেড়ে ছুটে এলো রত্নার কাছে। একটু বকুনি দিয়ে বললো শুধু শুধু ভিজছো কেন? রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াও।

রত্না বললো আর কি হবে? একদম ভিজেই তো গেছি।

—কেন ভিজলে? একটু অপেক্ষা করতে পারলে না?

—এ বৃষ্টি কি থামবে? কাল রাত থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

—একটা ছাতা নাও নি কেন?

—থাকলে তো নেবো।

—নেই?

—ছিল একটা বাবার...গোল বাঁকানো হাতল। ঐ রকম ছাতা নিয়ে মেয়েরা বেরোয় না।

—এসব তোমাদের বাড়াবাড়ি। কাজ চললেই হলো। শুধু শুধু ফ্যাশন করতে গিয়ে বৃষ্টি ভেজার কোনো মানে হয়?

রত্না তার ভেজা মুখ তুলে সম্পূর্ণভাবে তাকিয়েছিল পিনাকীর দিকে। পিনাকীর গলার বকুনির সুর শুনেও সে হেসেছিল। রত্না সহজে রাগে না। বরং পিনাকীকেই সে রাগাতে ভালোবাসে।

সে বলছিল সেই ছাতার কাপড়ে আবার অনেকগুলো তাপ্পিমারা। সেই রকম ছাতা নিয়ে যদি আমি বেরোতুম তুমি খুশী হতে?

পিনাকী তবু জেদ ধরে বললো হ্যাঁ। বৃষ্টি ভিজে অসুখ বাঁধানোর চেয়ে সেরকম ছাতা নিয়ে বেরুনোও ভালো। লোকে যা বলে বলুক।

রত্না বললো—সেটা নিয়েই বেরুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু খুলতে যেতেই শিক-টিকগুলো সব ছটকে গেল। আর একটু হলে আমার চোখে লাগছিল আর কি! ওটা আর সারানোও যাবে না। বাবা বললেন ছাতাটা ছাব্বিশ বছরের পুরনো। তার মধ্যে গত তিন বছর সেলাই হয়নি।

পিনাকী তবু হার মানলো না। বললো একদিন স্কুলে না গেলে কি হতো? বৃষ্টি ভিজেও যেতে হবে?

—কদিন ধরে প্রায়ই তো ভোরের দিকে বৃষ্টি হচ্ছে। কদিন আর স্কুল কামাই করবো?

কেন ঠিক ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়? পিনাকী রুদ্ধভাবে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল। সকাল ছটার সময় বিশ্রি নামতে পারে না? রত্নার স্কুলে যাবার সময়টা বাদ দিয়ে? রত্নার একবার প্লুরিসি হয়েছিল। বৃষ্টিভেজা তার পক্ষে খুব খারাপ।

রত্না বললো—তা ছাড়া একটু থেমে গেল। আঙুল দিয়ে ভুরুর ওপরের জল মুছলো। তারপর আবার বললো—তাছাড়া তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে জানতাম তবু আমার বাড়িতে বসে থাকতে ভালো লাগবে?

আজ আর স্কুলে যেও না!

—কিন্তু বাড়িতেও ফিরবো না।

—কেন?

—বাবা খিটখিট করবে! বাবার ধারণা একদিন স্কুলে না গেলেই চাকরি চলে যায়।

—ঠিক আছে আমাদের বাড়িতে চলো।

—যাচ্ছি কিন্তু আমার চাকরি গেলে তুমি দায়ী থাকবে কিন্তু..

এটা দেড়মাস আগেকার কথা। পিনাকী আকাশের দিকে তাকালো। মেঘের গায়ে লাল লাল আভা। সাবাষাত গুমোট গরমে সবাইকে ভুগিয়ে ঠিক ভোরের দিকে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে।

রত্না এখনো ছাতা কেনেনি। বেসরকারী ছোট স্কুলটাতে রত্না মাইনে পায় একশো পনেরো টাকা। এর মধ্যে বাসভাড়া আছে টিফিনেও কিছু খেতে হয়। রত্নার বাবার এখন এক পয়সা রোজগার নেই। রত্না একটু ভালো মাইনে এই সাড়ে তিনশোর কাছাকাছি একটা মাস্টারির কাজ পেয়েছিল আশুনসোলে। পিনাকী সেখানে রত্নাকে যেতে দেয়নি। রত্না অতদূরে চলে গেলে সে কি নিয়ে থাকবে? তাছাড়া সেখানও রত্নার বাবা ছোট ভাই-বোনদের নিয়ে যেতে হবে—মাত্র সাড়ে তিনশো টাকায় তার চেয়ে কলকাতায় টিউশনি আছে আরও যদি কিছু পাওয়া যায়...

রত্নাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পিনাকীর ডান পায়ের জুতো ও প্যান্ট কাদায় মাখামাখি পকেটে একটাও পয়সা নেই। তবু সে আর একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। সে খুব আস্তে আস্তে বললো—রত্না খুব শিগগিরই তোমাকে একটা ছাতা কিনে দেবো। রঙীন ফুলকাটা ছাতা সেই যেগুলো বোতাম টিপলেই খোলে আর গুটিয়ে ছোট্ট করে ফেলা যায় হাত ব্যাগের মধ্যে ঢোকানো যায়—ঠিক সেইরকম রত্না খুব শিগগিরই তোমার জন্য..

রত্নাকে যেদিন ছাতাটা উপহার দেবে সেদিন নিশ্চয়ই রত্না একটু বকবে তাকে বাজে খরচ করার জন্য। পিনাকী উত্তর হেসে বলবে এ আর এমন কি: এই তো তোমাকে রাজছত্র দিলাম। এর পর তোমাকে রাজপ্রসাদ উপহার দেবো..। মহারাণী হর্ষ-কুমারীর বদলে এই রাস্তার নাম হবে মহারাণী রত্নাকুমারীর নামে—কারুর বাপের সাধ্য নেই যে আটকায়।

পিনাকী এরপর পা চালালো বেশ জোরে। রাত অনেক হয়ে যাচ্ছে। তাদের পাড়ার কাছাকাছি পানের দোকানটা তখন ঝাঁপ ফেলতে শুরু করেছে। পিনাকী এই

দৌড় লাগালো কোনোক্রমে শেষ মুহূর্তে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই।

দীনুদা নিজের জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে একবারটি আড়চোখে দেখলো পিনাকীকে। সিগারেটের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালে না।

—দীনুদা এক প্যাকেট সিগারেট আর একটা দেশলাই।

—কই পয়সা দিন°

—হ্যাঁ দেবো আজ নয়...মানে আমার কত যেন হয়েছে।

—পনেরো টাকা! আপনি নিজেই তো কাল বলে গেলেন যে ওটা শোধ দেবার আগে আর ধারে নেবে নেবেন না! এখন থেকে নগদা পয়সায়।

—দিতাম আজই দিতাম! কুড়ি টাকা পকেট মার হয়ে গেল কিনা। বৌবাজারে বাসে এত ভিড়...লোকটাকে আগেই সন্দেহ করেছিলাম।

এ গল্প শোনার ব্যাপারে দীনুদার কোনো উৎসাহ নেই। এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই ছুঁড়ে দিয়ে বললো—পনেরো টাকা তিরাশি পয়সা হল! সরুন দোকান বন্ধ করব।

পিনাকী বললো—দিয়ে দেবো তোমাকে সব শোধ করে দেবো দীনুদা! আর কোনো চিন্তা নেই!

পিনাকী এমন সুরে বলল—কথাটা যেন সে নতুন চাকরি কিংবা লটারির পুরস্কার পেয়েছে। দীনুদা একবার মুখ ঘুরিয়ে পিনাকীকে না দেখে পাবলো না। পিনাকী আর দাঁড়ালো না সেখানে।

এ পাড়ার কুকুরবা পিনাকীকে চেনে। পাশের বড় ফ্ল্যাট বাড়িগুলোর দু-একটা ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। পিনাকী গলির মধ্যে ঢুকলো।

তাদের বাড়ির দরজাটা বন্ধ। সন্ধ্যে থেকেই বন্ধ থাকে, না হলে ছিঁচকে চোর ঢুকে পড়ে। দরজার গায়ে স্ক্রু দিয়ে লাগান পিনাকীর বাবার আমলের লেটার বকস্। রং আর লেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ভেতরে উঁকি মেরে দেখলো, কোনো চিঠি আছে কিনা। নেই।

পিনাকী মনে মনে ঠিক করলো, লেটার বকস্টার বং করাতে হবে। সুন্দর ঝকঝকে লেটার বকস্ না হলে কী আর ভালো ভালো চিঠি আসে? বাবা বেঁচে থাকতে তাঁর নামে কত চিঠি আসতো, পিনাকীর নামে কোনো চিঠি আসে না। একদিন আসবে ঠিকই।

দরজার কড়া নাড়লে একতলার ভাড়াটেরা বিরক্ত হয়, তাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়। দরজায় একটা কলিং বেল লাগালে এ সমস্যা মিটে যায়। সাউথ ক্যালকাটার সব বাড়িতেই কলিং বেল থাকে সেখানে কেউ কড়া নেড়ে ডাকে না পিনাকী দেখেছে। এবার তাদের বাড়ীতেও একটা কলিংবেল লাগাতে হবে। নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি।

কড়া নাড়তে হলো না। তার আগেই দরজা খুলে গেল। মা।

আপনারা কি বলেন ?

কলকাতার লোক এবার সি, এম, ডি, এ-র ওপর আরও চটে যাবেন। কথাতেই তো বলে 'পেটে ভাত নেই, বাজকন্যেকে বিয়ে করার শখ,'— কলকাতার যা অবস্থা তাতে আবার 'কালচার', তার আবার 'বিউটি' তার আবার সাজানো কিন্তু না সাজালেও তো চলছে না। কারণ এখানে এত শিল্পী আছেন, এত স্থপতি আছেন, ভাস্কর আছেন, আর শিল্প রসিকের সংখ্যাও তো কম নয়। বরং বেশী। তবু, শহরটার একটা বদনাম আছে। এখানে লোক নাকি সৌন্দর্য ভালবাসে। খালি পেটে কবিতা লেখে, ডাস্টবিনে ফুলের গন্ধ পায় আর শিল্পীর হাত নিশপিস করে শহীদ মিনারকে রাঙিয়ে দিতে, হাওড়া ব্রীজের ওপর দৈত্য দাঁড় করাতে। কলকাতাকে সুন্দর করতে হলে এঁদের দরকার।

আসল কথায় আসি। আমরা ঠিক করেছি যে ডিসেম্বর মাস নাগাদ একটা ভাস্কর্য প্রদর্শনী করব। ভাস্করবা সেখানে নিজেদের সৃষ্টির নমুনা রাখবেন, শিল্প-রসিকরা কয়েক দন্ড তাকাবেন, আর সম্ভব হলে, সি, এম, ডি, এ, বা অন্যরা পরে কিছু ভাস্কর্যের নমুনা সংগ্রহও করতে পারেন। নবীন, প্রবীণ সব শিল্পীকেই আহ্বান জানানো হচ্ছে. সি, এম, ডি, এ-র জনসংযোগ (পাবলিক রিলেশন) দপ্তর থেকে নিয়মাবলী সংগ্রহ করুন।

একটা প্রশ্ন করবো? এ ব্যাপারে আর কোনও সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা আর কারও কি কোনও দায়িত্ব নেই? তাঁরা একটু শহরটার সৌন্দর্য্যের দিকে নজর দিতে পারেন না?

● ● ●

আর একটা কাজ সি, এম, ডি, এ করতে যাচ্ছে— সেটা শহরের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি নয়, শহরটার বাঁচাবার তাগিদে। সেই বহু বিতর্কিত "হকার" যাঁরা রাস্তা অবরোধ করে আছেন তাঁদের সমস্যা। থানা থেকে ফর্ম বিলি করার কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে, অন্ততঃ দশটি জায়গায় বাজার তৈরীর কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যাঁরা "সত্যিকারের" হকার তাঁদের আস্তে আস্তে সেই সব বাজারে সরে যেতে হবে। অনেক দিক ভেবে, অনেক চিন্তা করে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে।

এটা ঠিক যে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজার না বাড়ার জন্য যত্র-তত্র সর্বত্র বেচাকেনা চলছে। কিন্তু এভাবে ক'দিন চলবে? অনেক জায়গায় রাস্তা দিয়ে হাঁটা যায় না, গাড়ী পাওয়া তো দূরের কথা। অস্বাস্থ্যকর, বিশ্রী পরিবেশ, দুর্ঘটনা লেগেই আছে। কতদিন থেকেই তো শোনা যাচ্ছে, একটা কিছু করা দরকার। সেই "একটা" কিছু এবার হচ্ছে রাজ্য সরকার, সি, এম, ডি, এ কলকাতা কর্পোরেশন আর পুলিশের যৌথ চেষ্টায়।

একটা জিনিষ বুঝে দেখুন— এত বড় শহরে, যেখানে লোক এত বেশী, গাড়ী এত বেশী, রাস্তা এত কম, সেখানে অরাজক কেনা-বেচা আর কতদিন চলবে? আজ হোক, কাল হোক এটা বন্ধ করতেই হবে। আর যদি সত্যিকারের হকার আর জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যায়, তাহলে, গড়ে উঠবে নিয়মিত বাজার। প্রথম অবস্থায় কয়েকটি, পরে আরও বেশী। প্রথম অবস্থায় কাঁচা অস্থায়ী ব্যবস্থা, পরে পাকাপাকি সুন্দর ব্যবস্থা। কাজ আরম্ভ হয়েছে, থেমে থাকবে না।

জানি বেশীর ভাগ লোকই খুশী হবেন, কেউ কেউ আবার খুশী হবেন না। তবে বৃহত্তর কলকাতার স্বার্থে, পরিবহণ ব্যবস্থা অটুট রাখতে হলে, দুর্ঘটনা বন্ধ করতে, আর সর্বোপরি পরিবেশটা একটু স্বাস্থ্যকর ক'রে তুলতে, এছাড়া আর কি পথ আছে? প্রশ্নটা আপনাকে। যাঁরা 'হকার' তাঁদের যাঁরা ফুটপাত দিয়ে হাঁটেন, রাস্তা দিয়ে চলেন, যাঁরা কেনেন, যাঁরা বেচেন— সবাইকে প্রশ্ন করছি। কলকাতার রাস্তা ফুটপাথ বাধামুক্ত হোক, এটা চান কি না? নিয়মিত বাজারে হকাররা কেনা-বেচা করুন, এটা চান কি না?

তাহলে নিজেরাই এগিয়ে আসুন নিয়মিত বাজারে জিনিষ কেনা-বেচার ব্যবস্থা আর অভ্যাস করুন।

সি, এম, ডি, এ-র সবচেয়ে বড় দোষ শুধু চ্যাটাং চ্যাটাং কথাই বলে না, যা সবাই জানে, সেই কথাই বলে।

আপনারা তো সবাই জানেন যে রাস্তায় ফুটপাথে বাজার ব'সে কি অবস্থা হয়েছে শহরটার। তাহলে নতুন কথা আর কি বলবো?

নতুন কথা হ'ল,— বেলেঘাটা মেন রোড, হেম নস্কর রোড, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, সর্বমঙ্গলা লেন, হুমায়ুন এ্যাভিনিউ আর দমদমে নর্দান অ্যাভিনিউতে অস্থায়ী বাজার বানানো হচ্ছে। আরও হবে।

আর একটা কথা বিশ্বাস করুন। কলকাতার রাস্তা-ফুটপাথ বাধামুক্ত হ'লে কলকাতার ছাইচাপা সৌন্দর্য্য কিছুটা প্রকাশ পাবে। লোকের চলাফেরার সুবিধা হবে, দুর্ঘটনা কমবে, জঞ্জাল কম জমবে। এই একটা পরিকল্পনায় কলকাতার চেহারা পাল্টে যাবে। সেটাকে বাধা দেবেন কি?

তাদের বাড়ীতে বারান্দা নেই। পিনাকী তো দোতলার জানলাতেও কারুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেনি। তবু মা কি করে টের পেলো!

—কী রে, এত দেরী করলি?

পিনাকী অস্পষ্টভাবে বললো, এই একটু হয়ে গেল দেরি ....। দোতলায় এসে পিনাকী আগে পায়ের কাদা ধুলো। তারপর জুতো জামা খুলতে লাগলো একটা একটা করে। মা সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছেন পিনাকীর দিকে, চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

—দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—তারপর কী হলো? কিছু বলছিস না কেন?

—দাঁড়াও বলছি বলছি প্যান্টটা ছেড়ে আসি।

নিজের ঘরে গিয়ে পিনাকী আলো জ্বাললো না। তার ছোট ভাইটা ঘুমিয়ে আছে যদি জেগে যায়। অন্ধকারে নগ্ন হয়ে সে পোষাক বদলালো। বেরিয়ে এসে বললো মা খাবার দাও!

মেঝের ওপর আসন পাতা, তার সামনে খাবার ঢাকাই রয়েছে। বুটি ডাল আর চাড়শের তরকারি। ক্ষিদেয় পেট চড়চড় করছিল, এতক্ষণ পিনাকী টের পায়নি সে বেশ উপভোগ করে খেতে লাগলো।

—উনি তোকে চিনতে পেরেছিলেন?

—হ্যাঁ। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করলেন মিঃ ব্যানার্জি।

—আসল কথাটা কী হল তাই বল না!

পিনাকী হাসিমুখে মায়ের দিকে তাকালো। তারপর খুব সহজভাবে বলল চাকরিটা হয়নি মা!

মা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। রক্তশূন্য মুখ। তারপর তিনি ফ্যাকাশেভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললেন তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছিস। তোর তো সবতাতেই ইয়ার্কি করা স্বভাব।

পিনাকী মায়ের সঙ্গে একটু ইয়ার্কি করবেই ঠিক করেছিল। যদি চাকরিটা হয়ে যেত তাহলে মায়ের কাছে সহজে সে কথাটা ভাঙতো না। শেষমুহূর্তে মা কান্নাকাটি শুরু করলে খবরটা দিয়ে মাকে চমকে দিত। কিন্তু যে চাকরি হয়নি তা নিয়ে আবার ইয়ার্কি কি? এ ইয়ার্কির শেষে তো কোনো চমক নেই।

সে বললে, মিঃ ব্যানার্জি খুব দুঃখ করলেন। ওঁর কোনো হাত নেই এখন। ওঁর সাধ্য থাকলে উনি নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করতেন আমার জন্য। ঐ পোস্টে আগেই লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

মা শুধু বললেন, যাঃ!

—ভালোই হয়েছে চাকরিটা পেলে দুর্গাপুরে চলে যেতে হতো।

—কিন্তু মাইনে তো ছিল সাতশো টাকা।

—তা ছিল।

—ওটা পেলে আমরাও দুর্গাপুরে গিয়ে থাকতাম—পিনাকী দেখলো, মা ছেঁড়া শাড়ী পরে আছেন। বিধবার থানের কতই বা দাম, তাও ছেঁড়া? বাবা মারা গেছেন দুবছর আগে। অবস্থা এতটা খারাপ হতো না, যদি না বৌদির সঙ্গে মায়ের দারুণ ঝগড়া হওয়ার ফলে দাদা আট মাস আগে আলদা হয়ে না যেত! দাদা ভালোই চাকরি করে মাসে দেড়শো টাকা করে এখনো এ বাড়িতে দেয়। দাদার পাঠানো টাকা মা ছোঁন না। পিনাকী অবশ্য টাকাটা ফেরৎ দিতে পারে নি, নিজে চাকরি পেলে দাদাকে সব টাকা শোধ করে দেবে ঠিক করেছে। দাদার টাকায় মা কাপড় কিনবেন না।

পিনাকীই মায়ের জন্য একজোড়া ভালো শাড়ী কিনে দেবে। তার কোনো বন্ধুবান্ধবের মা ছেঁড়া শাড়ী পরেন না। শুধু তার মা একা কেন ছেঁড়া শাড়ী পরবেন? ঢালাকি নাকি? পিনাকী এটা কিছুতেই সহ্য করবে না!

সে বললো মা চিন্তা করো না সব ঠিক হয়ে যাবে!

মা নিঃশব্দে কাঁদছেন। মায়ের কান্নাটা যে এখন ঠিক কি কারণে, তা পিনাকী বুঝতে পারলো না। মা কী প্রফুল্ল ব্যানার্জির কথা ভাবছেন?

মা-ই পিনাকীকে পাঠিয়েছিলেন প্রফুল্ল ব্যানার্জির কাছ। পিনাকী নিজের চেষ্টায় এতদিন চাকরি জোগাড় করতে পারে নি।

আগের গল্প ॥ ১৯৭১

পলাতক ও অনুসরণকারী

—তুমি?

রবি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল চুপ। চকিতে একবার পেছন দিকে তাকালো। এক পা এগিয়ে এসে বলল, পিসেমশাই বাড়িতে আছেন? অশোকদা আছেন?

জয়ন্তী দুদিকে মাথা নেড়ে জানালো, ওঁরা নেই।

—পিসিমা আছেন তো?

—হ্যাঁ।

জয়ন্তী রবির সর্বাঙ্গে চোখ বোলালো। তারপর বলল, তোমার পায়ে এত কাদা। উঠোনের ঐ কলে পা ধুয়ে নাও ভাল করে।

জয়ন্তী নিজেই কলটা খুলে দিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল এত দিন কোথায় ছিলে?

—বৌদি, আমার খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খাবার আছে? মুড়িটুড়ি হলেই চলবে।

—ওপরে এসো।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায়। সিঁড়ির মুখেই পিসিমা। চোখে ভাল দেখতে পান না।—কে এসেছে বৌমা?

—আমাদের রবি।

আবছা দৃষ্টিময় দুটি চোখ রবির দিকে। একটি শিশু এখন যৌবন পেরেছে, তবু শিশুটিকেই দেখে ঐ চোখ।

—আয়, দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন?

—সেজো পিসী, আমার খুব খিদে পেয়েছে।

প্রৌঢ়ার পা দুখানি প্রণাম নেবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ক্ষুধার্তের কি ওসব মনে থাকে? সে জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, একটু তাড়াতাড়ি—

পিসী জিজ্ঞেস করলেন, এক্ষুনি চলে যাবি নাকি? আজ থাকবি না?

—অশোকদা আসুক। অশোকদার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

—বড়দা কেমন আছে এখন?

—একই রকম।

—আর তোর মা? অনেকদিন চিঠি পাইনি।

—রবি রেগে গিয়ে কড়া গলায় বলল, বলছি না, আমার খিদে পেয়েছে? খাবার-টাবার কিছু দেবে কিনা বলো, নাকি শুধু জেরাই করবে?

—ছেলের মেজাজ কি! কদিন ধরে খাসনি?

এক বাটি মুড়ির সঙ্গে পেঁয়াজ, লঙ্কা, চানাচুর মিশিয়ে মোটামুটি সুখাদ্যে পরিণত করে নিয়ে এল জয়ন্তী। রবির হাতে তুলে দিয়ে বলল, এখন এটা খাও। লুচি ভাজছি এক্ষুনি—

—এতেই হবে। লুচি-টুচি ভাজতে হবে না।

চায়ের জল বসাই?

—বসাও।

—এই এক মাসেই তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছ। নিজের ওপরেও কি একটু মায়াদয়া নেই?

—অশোকদা দিন দিন মোটা হচ্ছে। তুমি তোমার শরীরের কত্ব নিতে পারো না?

—চোখ দুটো তো একেবারে বসে গেছে। কারাত্তির ঘুমোওনি?

—যাও, তাড়াতাড়ি চায়ের জল বসাও।

রবি মুড়ি চিবোতে চিবোতে এল জানলার কাছে। বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। চোখ সরু করে চেয়ে রইল বাইরে। একটু ক্ষণের মধ্যেই দেখতে পেল তিনজন লোক পাশাপাশি [illegible] আসছে, নিজেদের

কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে মা পিনাকীকে বলেছিলেন তুই সঙ্গে গিয়ে সব্বাসরি দেখা কর, আমার নাম বলবি, বলবি বেহালার চৌধুরীদের বাড়ির মেয়ে উনি ঠিক চিনবেন ঠিক ব্যবস্থা করে দেবেন।

পিনাকী পরে জেনেছিল ঐ প্রফুল্ল ব্যানার্জির সঙ্গে আটত্রিশ বছর আগে তার মায়ের বিয়ে হবার কথা ছিল। তখন মায়ের বয়স একুশ। বেনী ঝুলিয়ে দুপুরে সিনেমা দেখতে যেতেন। প্রফুল্ল ব্যানার্জি মাকে বিয়ে করার জন্য পাগল খুব পাগল হয়েছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত দুবাড়ির ঘোর আপত্তিতে হয়নি।

প্রফুল্ল ব্যানার্জির বাড়িতে গিয়ে পিনাকীর বেশ মজা লেগেছিল। এই লোকটি তার বাবা হলেও হতে পারতো। তা হলে সে এই কেয়াতলা রোডের বাড়িতে থাকতো, কুকুরের গলায় চেন বেঁধে বেড়াতে যেত বিকেলে।

আটত্রিশ বছর আগেকার দুর্বলতার কথা মিঃ ব্যানার্জি বিশেষ মনে রাখেন নি। তিনি মায়ের এই নাম শুনে চিনতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর এই হলেও হতে পারতো ছেলেটির প্রতি আলাদা কোনো আগ্রহ দেখান নি। শুকনো ভদ্রতার সঙ্গে আপনি আপনি সম্বোধনে কথা বলেছেন পিনাকীর সঙ্গে। চাকরিটা পেয়েছে তাঁরই বর্তমান শালা।

তিনতলা-চারতলায় অত ভাড়াটে আছে কিন্তু ছাদের দরজাটা খোলাই থাকে। খেয়ে উঠে পিনাকী সিগারেট-দেশলাই নিয়ে ছাদে উঠে গেল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসে এই সময় গোটা দুই সিগারেট টানতে চমৎকার আরাম।

তিনতলার ভাড়াটেদের রেডিওর এরিয়ালের তারটা বেশ উঁচু। আগে পিনাকী লাফিয়ে সেটা ছুঁতে পারতো। এখন কি পারে? তিনবার লাফিয়ে সেটা ছুঁয়ে দিল। এখনো পারে। তার গায়ে জোর আছে শরীরে কোনো অসুখ নেই, একটা কমার্স ডিগ্রি আছে, সে কেন হেরে যাবে?

ইদানীং পিনাকী বড্ড বেশী হেরে যাচ্ছিল। সব সময় তার মুখে একটা তেতো স্বাদ। সতেরো জায়গায় চাকরির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হবার পর, সে ভেবেছিল আর কিছুই হবে না তার দ্বারা। ছোট ভাইটা পড়াশুনোর ব্যাপার নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে এলে, দুদিন আগে পিনাকী তাকে ধমক দিয়েছে কুৎসিৎ ভাষায়। পরপর কয়েকদিন রত্নাকেও সে এড়িয়ে গেছে। দূর থেকে রত্নাকে দেখেও কাছে যায় নি। সিগারেট কেনেনি পাড়ার দোকান থেকে। মায়ের মুখের দিকে তাকায় নি। সে হেরে গিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। দারিদ্র্য শুধু তাকে বিপদে ফেলে নি, তার মনটাকেও ছোট করে দিচ্ছিল। সে ছোট ভাইয়ের জ্যামিতির বাকসও পুরোনো কেনার কথা ভাবে।

সিগারেটের শেষ টুকরোটা মাটিতে জোরে ছুঁড়ে ফেলে সে দাঁত দাঁত চেপে বললো, আমি পিনাকী সরকার, আমাকে আটকাবে কোন শালা!

এবার নীচে ফিরে যেতে হবে। সে না গেলে মা ঘুমোবে না। মা কি এখনো কাঁদছে?

পিনাকী ফিসফিস করে বললো, মা, চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমি তোমার জন্য দুটো নতুন শাড়ী...আমি পল্টুর জন্যে নতুন চকচকে জ্যামিতির বাকস...আমাদের দরজায় কলিং বেল..... রত্নার জন্যে ফুলকাটা ছাতা...রত্না তার সবচেয়ে প্রিয় শাড়ীটা পরে আসবে সেদিন, ঝকঝকে রোদের মধ্যে ওর মাথায় রঙিন ছাতা—ওর মুখে একটা অন্যরকম আলো পড়বে—রত্না আসবে এ বাড়িতে..পল্টু ছুটে যাবে মোড়ের দোকান থেকে সন্দেশ কিনে আনতে, মা, তুমি হাসবে, কতদিন পরে তোমার মুখে এরকম হাসি মা, আমি দিতে পারি এইসব। বিশ্বাস করো, আর সব কিছু কি পারে, আর আমি এই সামান্য কটা জিনিস কেন পারবো না নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই...মা আমি তোমাদের জন্য সবকিছু... আমি পারি, আমি পারি, আমি কেন পারবো না? আমি অন্যদের থেকে কম কিসে

কিন্তু সবচেয়ে আগে চিঠির বাকসটা রং করা দরকার। কাল কি নিজের হাতে ওটা রং করবে। রঙীন ঝলমলে ডাক বাকসটাতে একদিন একটা সুন্দর চিঠি আসবে। সে চিঠিটা তাকে বলবে, পিনাকী, তুমি পারো, তুমি পারো, তুমি সব পারো!

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

মধ্যে গল্পে মত্ত। এ-বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা একসঙ্গে মুখ তুলে তাকালো। নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। তারপর যেন একটা সমবেত দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারা এগিয়ে আসতে লাগল এই বাড়ির দিকে।

রবি হাতের অর্ধসমাপ্ত মুড়ির বাটিটা ঠক করে নামিয়ে রাখল নিচে। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাড়ির কারুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে নেমে এল নিচে, বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। বেরিয়েই সে দৌড়তে লাগল।

সেই তিনজন লোক এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এক পলক দেখতে পেল অপসিয়মান রবির চেহারা। তারা ব্যস্ত হল না, কোনো রকম চাঞ্চল্যও প্রকাশ পেল না।

এক নং অনুসরণকারী বলল, এবারেও চলে গেল। দু নং অনুসরণকারী বলল ঠিক আছে। তিন নং অনুসরণকারী পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে চোখের সামনে রেখে বলল এবার কোথায় দমদম না শ্রীরামপুর?

১নং বলল দমদম।

২ নং বলল তাহলে এখানকার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলা যাক।

৩ নং কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, শীতটা বেশ জমিয়ে পড়েছে আজ। মোড়ের দোকানে দেখে এলাম গরম গরম চপ ভাজছে।

১ নং তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা বোমা বার করে ছুঁড়ে মারল বাড়িটার দরজার ওপরে।

২ নং বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, বাঃ আওয়াজটা বেশ।

৩ নং বলল তাড়াহুড়ো তো কিছু নেই, চলো, কয়েকটা চপ খাওয়া যাক।

রবি একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনুচ্চ গলায় ডাকল, চন্দন, চন্দন।

কেউ সাড়া দিল না। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। মফস্বল পাড়া নিঝুম। মাঝে মাঝে শোনা যায়, সাইকেল রিকশার শব্দ। অনাবশ্যক কুকুরের ডাক।

রবি এবার জোরে ডাকল, চন্দন—

দোতলার বারান্দা থেকে একটি অল্পবয়সী মেয়ে শরীর কুঁকিয়ে বলল কে?

—চন্দন আছে?

—দাদার জ্বর।

—বিছানা থেকে উঠতে পারবে না?

—ঘুমোচ্ছে।

—একবার দরজাটা খুলে দাও।

—আপনার নাম কি?

—দরজাটা আগে খুলে দাও।

—রবি ঝট করে পেছনে ঘুরে দাঁড়ালো। দুটো সাইকেল রিকসা তখন বড় রাস্তাটায় সদ্য থেমেছে। দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করতে পারল না রবি, দৌড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেই তিনজন এসে দাঁড়ালো বাড়িটার সামনে। ১ নং বলল, ভেতরে ঢোকেনি, আমি দেখেছি।

১ নং কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল দরজার সামনে। সে ধাক্কা মারবার আগেই দরজা খুলে গেল। একটি চোদ্দ-পনরো বছরের মেয়ে সদ্য শাড়ি পরা ধরেছে এখনো ভালো করে শেখেনি। ২ নং শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, চন্দনের সত্যিই জ্বর হয়েছে?

মেয়েটি বলল, আজ একশো চার উঠেছিল। আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

রবিবাবুর কাছ থেকে। তোমার দাদাকে একটু ডেকে আনবো?

—এখন তো ঘুমোচ্ছে।

—আচ্ছা থাক।

—কিছু বলতে হবে?

—বলে দিও, রবিবাবুর খোঁজ করতে তিনজন লোক এসেছিল। তাহলেই বুঝতে পারবে।

২ নং দরজার কাছ থেকে সরে আসার পর ৩ নং জিজ্ঞেস করল এখনে কি আর ওটার দরকার আছে?

১ নং বলল, আমার তো মনে হয়—

৩ নং বলল, আমারও ছোট ভাইটার জ্বর। আমিও মনে হচ্ছে জ্বরে পড়বো এবার।

২ নং তার কপালে হাত দিয়ে বলল, কই টেম্পারেচার নেই তো!

—ভেতরে ভেতরে টের পাচ্ছি। আঃ যদি এখন একটু লেপের তলায় শোওয়া যেত!

১ নং বলল এখানকার কাজটা সেরে ফেলা যাক। দেরি করে লাভ নেই।

৩ নং বলল, ক'দিন ধরে এক ফোঁটা ঘুম নেই। আর শীতও পড়েছে তেমনি। ভগবানের একটু মায়াদয়াও নেই।

২ নং বলল, হারামীর বাচ্চাটা বড় জ্বালাচ্ছে।

১ নং থলে থেকে বার করে একটা বোমা ছুঁড়ল বাড়ির দরজায়। নিস্তব্ধ নিশীথ কেঁপে উঠল সেই শব্দে। কুকুরগুলো তারস্বরে ডেকে উঠল।

রবি সারারাত্রি গঙ্গার ঘাটে শ্মশানে গিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝে ঘুমের ঢুলুনি

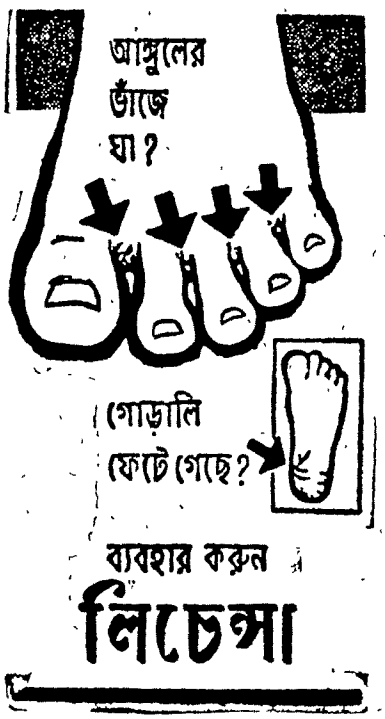

আসতেই সে উঠে একটু পায়চারি করে নিচ্ছিল, কখনো দাঁড়াচ্ছিল চিতার ধারে। সারারাত ধরেই চারটে চিতা জ্বলছে। লোকজনের আনাগোনার বিরাম নেই। চিতার ধোঁয়ায় সর্বক্ষণ তার চোখ ছলছলে অন্যায়েই তাকে শ্মশানযাত্রীদের অন্যতম মনে করা যায়। বহুদিন কারুর মৃত্যুতে তার চোখ দিয়ে জল পড়েনি। বিশেষত শ্মশানে এলে মনে হয়, মৃত্যু নিছক একটা নির্লিপ্ততার ব্যাপার—এর কোনো ভালো বা মন্দ দিক নেই। বীবি তার গেঞ্জীহীন বুকে হাত রাখে। হঠাৎ তার নিজেকে আদর করতে ইচ্ছে হয়। নিজের বুকটা অন্যার বুক মনে করে সে হাত বুলোয়।

ভোর হবার পর স্নানের পুণ্য অর্জনকারীদের ভিড়ে মিশে গিয়ে সে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে হাওড়া স্টেশনে। শ্রীরামপুরের ট্রেন ধরে।

সুশান্ত তখন বাজারের থলে হাতে বেরুচ্ছিল, রবি তাকে বলল, আমি আজ এখানে থাকবো।

সুশান্ত ইতস্তত করে বলল দিল্লী থেকে আমার বাবা আসছেন এখানে।

রবি বলল, আজকের দিনটা অন্তত থাকতেই হবে আমাকে।

—খোকন আছে গোঁসাই পাড়ায়। ওদের কাছে খবর পাঠাবো?

—না, কোনো দরকার নেই।

সারাদিনটা রবি পড়ে পড়ে ঘুমোলো। অনেক দিনের ঘুম পাওনা ছিল তার। মাঝখানে উঠে একবার শুধু স্নান করে নিল। স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে, খেতে বেশি সময় লাগল না।

তার শার্ট ও প্যান্ট এতদূর অপরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে স্নান করে উঠে ঐ পোষাক আর পরা যায় না। সুতরাং তাকে পরে নিতে হল সুশান্তর ধুতি ও পাঞ্জাবি। এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাকে। সে বলল, অন্যরকম পোষাক পরার মতন আমি যদি অন্য একটা মানুষ হয়ে যেতে পারতাম! এই বলেই সে ঘুমিয়ে পড়ল আবার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে একটা জাহাজের স্বপ্ন দেখল।

ঘুম ভেঙে উঠে রবি দেখল বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যে বখন গাঢ়। সে আশ্রয় পেয়েছে ছাদের একটি ছোট্ট ঘরে, চটপট উঠে ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে দেখে নিল চতুর্দিক। কেউ নেই।

তখন সুশান্তর স্ত্রী রুপা তার জন্য চা নিয়ে এসেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে বধি জিজ্ঞেস করল আপনার কাছে অ্যাসপিরিন বা ঐ জাতীয় কিছু আছে?

—না তো। আনিয়ে দেবো?

—থাক। সন্ধ্যের পর রোজই এক ধরনের মাথার যন্ত্রণা আবার কমেও যায় আপনি আপনি। সুশান্ত ফেরেনি অফিস থেকে?

—আর একটু বাদেই ফিরবে।

—আপনি এখন নিচে যান। সুশান্ত এলে পাঠিয়ে দেবেন।

—আপনি এখন কিছু খাবেন?

—আমাকে সাধাসাধি করে কেউ কখনো খাওয়ায় না। খিদে পেলে আমি চাইবো। বাড়িতে মুগের ডাল আছে? এ-বেলা রাঁধতে পারবেন? বহুদিন খাইনি।

—আপনার বাড়িতে—

—আপনি নিচে যান। আমি একটু একা থাকতে চাই। ঘরের আলো না জ্বালিবে। রবি গম হয়ে বসে রইল দেয়ালের দিকে। একবারও দৃষ্টি ফেরালো না। বেশ কিছুক্ষণ পরে সে একটু নড়ে উঠে দু হাতে চেপে ধরল কপালের দু পাশের রগ।

সুশান্ত এসে বলল, কি রে আলো জ্বালিসনি যে?

রবি বলল অনেকক্ষণ ধরে একটা কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

ছেলেবেলায় আমি একটা কুকুর পুষেছিলাম—তার ডাক ছিল ঠিক এই রকম। অবিকল এই রকম।

—সে কুকুরটা এখন কোথায়?

—তখন আমরা শিবসাগরে থাকতাম। কুকুরটা ছিল আমার সবসময়ের সঙ্গী, খুব বাধ্য ছিল আমার। হঠাৎ কি হল সেটা খুব অবাধ্য আর রাগী হয়ে গেল। সবাইকে ভয় দেখায়। মা-বাবা বললেন, কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে। আমি কিছুতেই মানতে চাইনি—কিন্তু ওঁরা কুকুরটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস করলেন না। একদিন ওকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নৌকায় চাপিয়ে নদীর একটা চরায় রেখে আসা হল। সে চরটা মাঝে মাঝে জলে ডুবে যায়। সেই থেকে কোনো নির্জন জায়গায় কোনো কুকুরের ডাক শুনলেই—

—তুই এখান থেকে কোথায় যাবি?

—জানি না।

—এখানে থাকতে পারিস দু একদিন। এই ঘরটা তো কাজেই লাগে না।

রবি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুশান্তর দিকে। হঠাৎ সদর্পে বলল, মাথার ওপর ছাদ না থাকলেও আমার কিছু আসে যায় না। ঘরের কথা চিন্তা করে আমি রাস্তায় বেরোইনি—

সুশান্তও কড়া গলায় বলল, এবার আমাদের রাস্তা বদলাতে হবে। তুই যে পথে যাচ্ছিস, সেটাকে রাস্তা বলে না এঁদো গলি।

—তোর বাড়িতে গ্রামোফোন আছে নিশ্চয়ই?

—হঠাৎ?

সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন—এ না হলে মানায় না।

—এর নাম বোকা অহংকার।

রূপা এসে সুশান্তকে বলল, তোমাকে তিনজন লোক ডাকতে এসেছেন।

রবি তড়াক করে চলে গেল ছাদের পাঁচিলের কাছে। সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে শান্তভাবে বলল তোদের বাড়ির পেছন দিক থেকে বেরুবার কোনো রাস্তা আছে?

সুশান্ত রবির হাত চেপে ধরে বলল, তুই চলে যাবি?

——একদম সময় নেই।

—তোকে যেতে হবে না। আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছি। অত ভয়ের কি আছে?

—ভয় না, ঘৃণা। একদম সময় নেই।

রূপা বলল, আপনি এরকম করছেন কেন? পাশের বাড়িতে টেলিফোন আছে আমি থানায় খবর দিচ্ছি।

রবি রূপার দিকে একবারও তাকালো না পর্যন্ত। সে ছাদের উল্টোদিকের পাঁচিল টপকে পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল। একটু দূরে প্রবল ট্রেনের শব্দ। ১ নং অনুসরণকারী বলল এদিকে রাস্তার বাড়ির নম্বরগুলো একেবারে উল্টোপাল্টা। সাইত্রিশের পর বাহান্ন—বিচ্ছিরি ব্যাপার।

২ নং অনুসরণকারী বলল, কোনো কোনো বাড়িতে নম্বর প্লেটই নেই।

৩ নং বলল হেঁটে হেঁটে পা ধরে গেল মাইরি!

১নং বলল গত বছর এই সময় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। তাতে থ্রিল বেশি।

২নং বলল, বর্ধন যেদিন মারা যায়—

৩ নং বলল, আমার মামাবাড়িতে একটা পেয়ারাগাছ আছে—ভেতরটা লাল রঙের। ছেলেবেলায় সেই পেয়ারাগাছ থেকে একবার পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকে আমার এয়টা পা কমজোরী হয়ে আছে।

২নং বলল, পেয়ারার ভেতরটা লাল?

১ নং বলল, দেওঘরেও ওরকম পেয়ারা পাওয়া যায়। আমি অনেকদিন আগে গিয়েছিলাম দাদা-বৌদির সঙ্গে।

২ নং বলল এখনকার ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

৩ নং বলল, তারপর বাড়ি গিয়ে ভালো করে ঘুমোবো। বাড়ির রান্না গরম গরম ভাত, মুসুরির ডাল আর আলুসেদ্ধ—

১ নং এগিয়ে গেল দরজার কাছে সুশান্তর সঙ্গে কথা বলতে। অন্য দুজন ছড়িয়ে গেল বাড়ির দু'পাশে।

রবি ছুটতে ছুটতে একজন অচেনা লোককে সামনে দেখে জিজ্ঞেস করল, স্টেশনটা কোনদিকে?

লোকটি বলল, এই অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কেন? ঐ তো, ঐদিকে রাস্তা।

—মাঠের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাবে না?

—যাওয়া যেতে পারে—আপনি রাস্তা চিনতে পারবেন না।

রবি এক ধমক দিয়ে বলল, ঠিক চিনতে পারবো। কোনদিকটা আপনি দেখিয়ে দিন না।

ধমক খেয়ে দমে না গিয়ে লোকটি বলল, আপনি যখন অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়েই যেতে চান—তখন নিজেই রাস্তা খুঁজে নিন।

রবি লোকটির দিকে রুক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আর কথা না বলে দৌড়াতে লাগল। সে মেপে মেপে নিশ্বাস নিচ্ছে, তাকে সহজে ক্লান্ত হলে চলবে না। সে এখন একা—কিন্তু পৃথিবীর হাওয়ায় বহু মানুষের নিশ্বাস মিশে থাকে। এমন কি যারা বেঁচে নেই—তাদেরও নিশ্বাস বাতাস থেকে হারিয়ে যায় না।

পেছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে রবি। শীতের বাতাসেও তার শরীরে ঘাম। হঠাৎ সে সামনের একটা দেয়ালে ধাক্কা খেল।

দেয়াল নয়, তিনজন মানুষ। নিপুণ হাতে তারা রবিকে আঁকড়ে ধরে নিশ্চল করে দিল। রবিও ছটফট করল না, দু'হাতে মুখ চাপা দিল শুধু।

১নং রবির মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করে বলল, কি রে রবি চিনতে পারিস?

২নং বলল, বর্ধনকে ডোবা তিনজন—

৩নং বলল, শালা অনেক ভুগিয়েছিস—

রবি কোনো কথা বলল না। আকস্মিক ভাবে তার মনে পড়ল তার ছোট বনকে ছবি আঁকার এক বাকস রং পেন্সিল পাঠাবার কথা ছিল—দু'তিনবার চিঠি লিখেছে—

ছুরি চালাবার কাজটা সমাধা হল নিঃশব্দে। মাটিতে পেড়ে ফেলে রবির বুক পেট ফালা ফালা করে দিয়েও ওরা তিনজন রবির শেষ নিশ্বাস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইল। পৃথিবীর বাতাস ব্যবহার রবির ততক্ষণে শেষ হয়ে গেছে।

এই সময়ে দূরে একটা কলরব শোনা গেল। আট দশজন লোক এই দিকেই ছুটে আসছে।

এই তিনজন সেই দিকে একটু বিমূঢ় ভাবে তাকালো। ওরা কি তাদের অভিনন্দন জানাতে আসছে। না ধরতে? উভয় ক্ষেত্রেই চিৎকারটা প্রায় একই রকম হয়। এই তিনজন কোনো ঝুঁকি নিল না। তৎক্ষণাৎ এরা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল, পালাবার সুবিধের জন্য তিনজন তিন দিকে।

অবিলম্বে সেই দলটি এখানে এসে পৌঁছলো। ভূতপূর্ব রবির দিকে এক পলক তাকালো শুধু, তারপর শোনা গেল একটা প্রতিজ্ঞার উচ্চারণ।

এই দলে ছিল ন'জন ব্যক্তি। এরা তিনজন করে তিনটে দলে ভাগ হয়ে ছুটতে শুরু করল তিন দিকে।

একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক—তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার কর। দেখে নে।

কথায় কথায়

প্রেসকৃপশন

আগে গল্পটা বলে নিই। যাঁরা গল্পটা আগে শুনেছেন দয়া করে পরের দুই প্যারা বাদ দিয়ে পড়বেন।

সেই এক বিখ্যাত ডাক্তার, জমজমাট পশার তাঁর, কোনোদিকে নজর দেবার সময় নেই। কিন্তু তিনি তো অসামাজিক লোক নন, কত বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন। যেমন হয় এক বন্ধু এসে ধরেছেন, তাঁর মেয়ের এক সম্বন্ধের জন্যে ডাক্তারবাবুর একটি সুপারিশ হলে ভালো হয়। কারণ পাত্রপক্ষ ডাক্তার-বাবুর বাঁধা রোগী। ডাক্তারবাবু একটি চিঠি লিখে দিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবুদের হাতের লেখা যেমন হয়, সে চিঠি পড়তে পারে কার সাধ্য। যিনি চিঠি নিয়ে গেলেন তাঁর দায়িত্ব শেষ হলো চিঠিটা পৌঁছে দিয়েই, কিন্তু পাত্রপক্ষ হিমসিম খেতে লাগলেন সেই চিঠি পড়তে গিয়ে। এক অক্ষর মাথামুন্ডু কিছু বোঝা যায় না।

অবশেষে একজন বুদ্ধি দিলেন, যে ওষুধের দোকান ডাক্তারবাবুর প্রেসকৃপশন দেখে ওষুধ দিতে পারে তারাই পারবে এই পত্রের মর্মোদ্ধার করতে। যথাসময়ে ওষুধের দোকানটিতে চিঠিটি নিয়ে যাওয়া হলো। চিঠিটি কাউন্টার থেকে সেলসম্যান মালিকের কাছে পৌঁছে দিলো। মালিক চিঠি পড়ে কি বুঝলেন কে জানে, পনেরো মিনিট বাদে সেলস্ম্যান ভদ্রলোক এক শিশি লাল রং-এর মিকশ্চার এনে ধরিয়ে দিলেন পত্রবাহকের হাতে। পত্রবাহক হতম্ভব। ততক্ষণ সাংঘাতিক চিঠিটির উপরে ওষুধের দোকানের বরাত স্ট্যাম্প এবং তারিখের ছাপ লাগানো হয়ে গেছে।

এই গল্পটির মানে এই নয় যে সব ডাক্তারবাবুর হাতের লেখাই মারাত্মক কিংবা ডাক্তারবাবুরা যাই লিখুন তাই প্রেসকৃপশন। আসলে প্রেসকৃপশন জিনিষটি আরো গোলমেলে।

ওষুধ ব্যবসায়ীদের জন্য ডাক্তারবাবুরা প্রেসকৃপশনে সাংকেতিক ভাষায় যা লেখেন তা লিখুন কিন্তু ঐ প্রেসকৃপশনে রোগীর জন্যে বহুবিধ নির্দেশ থাকে। তার মানে ভুলে গেলে কারোর পক্ষেই স্মরণ করা সম্ভব নয়, সকালে চা খাওয়ার আগে না দুপুরে ভাত খাওয়ার পরে ট্যাবলেটটি গলাধঃকরণ করতে হবে, একবার যদি ঘুলিয়ে যায় তা হলে প্রেসকৃপশন পড়ে বোঝা যাবে না। বুঝবার চেষ্টা যদি কেউ করতে চায় এবং সেই বোঝা অনুযায়ী যদি ওষুধ খায় তবে রোগী গোলমালে পড়তেও পারে।

আজকাল সাধারণত যে কোনো অসুখের প্রেসকৃপশনে, সেই অসুখ যত নগণ্য, যত সামান্যই হোক না কেন, অন্তত চার রকমের ওষুধ থাকে। দু রকম ট্যাবলেট দু রকম মিকশ্চার। তার কোনটা কার আগে, কার পরে, কতক্ষণ পরে, কিভাবে, কি অবস্থায় খেতে হবে সে এক জটিল হাসান ফিজিক্সের ফর্মুলা। মুখস্ত থাকা অসম্ভব, আবার ভুলে গেলে ডাক্তারবাবুর হাতের লেখা পড়ে পাঠোদ্ধার করা যাবে তাও অসম্ভব। সুতরাং রোগী ওষুধ ঘুলিয়ে ফেলবেই, রোগ কমবে কিনা বলা শক্ত। মিথ্যে মিথ্যে ওষুধ ও ডাক্তারবাবুর নিন্দে হবে।

তাছাড়া, একটি প্রেসকৃপশনে যদি চারটি ওষুধের উল্লেখ থাকে, সেই চারটি ওষুধ যতই বিখ্যাত কোম্পানির হোক, এবং ওষুধ গুলি যতই নামকরা হোক, কোনোদিন একটিমাত্র ওষুধের দোকানেই সব কটি ওষুধ পাওয়া যাবে এটা ভাগ্যের ব্যাপার। প্রথমটি হয়তো আছে, দ্বিতীয়টি সকালে ফুরিয়ে গেছে। তৃতীয়টি দু মাস বাজারে নেই এবং চতুর্থটি কাল বিকেলে আসবে, এই অবস্থায় ক্রেতামহোদয়কে একটি গুরুতর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চারটির বদলে একটি ওষুধ খেয়েই রোগ সারানো চেষ্টা করবেন নাকি অন্য দোকান দেখবেন?

অবশ্য বুদ্ধিমান রোগী জানেন, অন্য দোকানে যাওয়া বৃথা। যে ওষুধ এক দোকানে নেই তা অন্য দোকানেও নেই। তবে এ দোকান যদি বলে দু মাস নেই ঐ দোকান বলবে তিনমাস নেই। কারোর যদি এই সময়ের ব্যবধান নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে থাকে তিনি দোকানে-দোকানে খোঁজ করতে পারেন। তবে কেউ সাধারণত তা করে না।

তা না করুক, ওষুধ খেয়ে কিংবা না খেয়ে ডাক্তার দেখিয়ে কিংবা না দেখিয়ে, কিছু লোক অসুখ থেকে যেমন সুস্থ হবে, তেমনি অনেকে মারাও যাবে। তবে আমাদের পরিচিত এক ভদ্রলোক ওষুধ খুঁজে না পেয়ে প্রেসকৃপশন পালটিয়ে নিয়েছিলেন চিকিৎসক মহোদয়কে দিয়ে। হাতীবাগান থেকে বাস বিহারী অবধি সাড়ে সাতশো দোকানে ঘুরেছিলেন তিনি। অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়ে ফুটপাথের কর্পোরেশনের কলের জল এক আঁজলা নিয়ে প্রেসকৃপশনের কাগজটি দিয়ে বল বানিয়ে ট্যাবলেটের মত গিলে খেয়ে নিয়েছিলেন। সুখের বিষয় সেই দিনই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যান।

এরপর থেকে সেই ভদ্রলোক অসুখ হলেই এক টুকরো কাগজ বল বানিয়ে জল দিয়ে খেয়ে নেন। আমাদেরও শরীর খারাপ হলে তিনি তাই পরামর্শ দেন। কিন্তু আমরা সাহস পাই না।

তারাপদ রায়

শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফর

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাঁচ বছর বাদে আবার সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করতে গেলেন। দুই দেশের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের নেতারা এই উপলক্ষে আর একবার পারস্পরিক বন্ধুত্বের সূত্রগুলি দৃঢ়তর করার ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করার সুযোগ পেলেন।

শ্রীমতী গান্ধী এর আগে আরও অন্তত চারবার রাশিয়ায় গেছেন। পাঁচ বছর আগে শেষবার যখন শ্রীমতী গান্ধী সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করতে গিয়েছিলেন তখন দুই দেশের সম্পর্ক একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছিল। এই সফরের ঠিক আগেই ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে, স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারত-সোভিয়েট শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তি। ১৯৭১ সালের সেই চুক্তি বিশ্ব রাজনীতিতে একটা প্রকাণ্ড দিকচিহ্ন হয়ে আছে। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু দুই দেশের মধ্যে যে সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সূত্রপাত করেছিলেন তারই পরিণত রূপ ছিল ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসের এই চুক্তি। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাথী হিসাবে ভারতবর্ষ যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন তখন সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার এই চুক্তি প্রচণ্ড মনোবল জুগিয়েছে।

এই পাঁচ বছরের মধ্যে ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে, সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারত সফর করে গেছেন। ঐ সফরকালে ব্রেজনেভ বলেছিলেন সোভিয়েট-ভারত সম্পর্ক এখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বহু অনাগত বছরের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য ভবিষ্যতের একটা পরিকল্পনা মোটামুটি তৈরি করতে পারি।

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উপর সোভিয়েট রাশিয়া যে গুরুত্ব দেয় তার আর একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এবারকার সোভিয়েট দেশ সফরের মাত্র মাস তিনেক আগে অনুষ্ঠিত সোভিয়েট ইউনিয়ন কম্যুনিস্ট পার্টির ২৫তম কংগ্রেসে। ঐ কংগ্রেসে লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেছিলেন, 'সেই মহান দেশের বন্ধুত্বের উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতিতে আমরা অবিচল থাকব।'

মস্কোতে নবনিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ইন্দ্রকুমার গুজরাল শ্রীমতী গান্ধীর এই সফরের প্রাক্কালে এক বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেছেন যে, দুই দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার ফলে শুধু যে উভয় দেশের সম্পর্ক দৃঢ়তর হবে তা নয় তাদের মধ্যে সহযোগিতার নতুন নতুন দিকও খুলে যাবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই যাত্রায় গেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াই বি চ্যবন যোজনামন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ এবং বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ অফিসারদের এক প্রতিনিধি দল। দুই দেশের মধ্যে এমন কোন বড় রকমের বকেয়া সমস্যা নেই যার নিষ্পত্তির প্রয়োজন রয়েছে। স্বভাবতই অনুমান যে, এই ধরনের উচ্চপর্যায়ের একদল প্রতিনিধি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সোভিয়েট রাশিয়ায় সফর করতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে দুই দেশের বর্তমান সম্পর্কের ক্ষেত্রগুলির পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা করা ও এই ক্ষেত্রগুলিকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করা।

ভারত-সোভিয়েট সম্পর্কের বর্তমান ক্ষেত্রগুলিকে মোটামুটিভাবে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এগুলি হচ্ছে—(১) রাজনৈতিক (২) অর্থনৈতিক এবং (৩) বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক।

ভারত-সোভিয়েট রাজনৈতিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল, ভিন্ন ভিন্ন সমাজব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পরস্পরের সার্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতি এবং পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি। বিশ্ব শান্তি সুনিশ্চিত করার ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের যেমন গভীর আস্থা রয়েছে তেমনি সোভিয়েট রাশিয়াও আজ এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, ভারতের প্রবর্তিত জোট-নিরপেক্ষতার নীতি বিশ্বশান্তির একটি বড় সহায়ক শক্তি। উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধেও দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য রয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ও বর্ণাভিমানী সংখ্যালঘু শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকার জনগণের সংগ্রামে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়া একই দিকে রয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায়ও সোভিয়েট রাশিয়ার মতো ভারতের সহানুভূতি আরবদের দিকে।

ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য ভারত যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি যে উপমহাদেশে শান্তি ও স্বাভাবিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করবে, ভারতবর্ষের এই অভিমতে সোভিয়েট রাশিয়াও সায় দিয়েছে। ভারত তার নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্য সম্প্রতি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সেটাও, অনুমান করা

যায়, শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের এবারকার বৈঠকের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। পাকিস্তানের সঙ্গে দূত বিনিময় করে ভারত-পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত এর আগেই রাশিয়ার অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এই চেষ্টার উপর চীনের যে ছায়া পড়েছে সেটা এখন নিশ্চয়ই ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার নেতাদের নিজেদের মধ্যে সলাপরামর্শের অন্যতম বিষয়বস্তু। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি চীনে গিয়ে আবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছেন এবং এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। চীনও ভুট্টোর এই বক্তব্য সমর্থন করেছে। নিজেদের বকেয়া বিরোধগুলি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মধ্য দিয়ে মিটিয়ে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সিমলা চুক্তি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। অথচ সে আবার রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কাশ্মীরে ডেকে আনতে চাইছে। এ ব্যাপারে ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন আর একবার চেয়েছে, এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।'

দ্বিতীয় যে দেশটির সঙ্গে ভারত সম্প্রতি স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে সেটি হচ্ছে চীন। চীনের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক এখনও তিক্ত। কিন্তু তাতে ভারত ও চীনের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধনের চেষ্টায় কোন বাধা হবে না এই আশ্বাস নয়াদিল্লি ও মস্কো থেকে পাওয়া গেছে। ভারতের নেতারা বলেছেন, ভারত-সোভিয়েট সম্পর্ক তৃতীয় কোন দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের পরিপন্থী নয়। শ্রীমতী গান্ধীর এবারকার রাশিয়া সফরের মধ্য দিয়ে এব্যাপারে রাশিয়ার মনোভাব স্পষ্টতরভাবে প্রকাশ পাবে বলে অনুমান করা যায়।

হেলসিঙ্কি ঘোষণার আদেশে এশিয়ায়ও একটা যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অবশ্য কিছুটা মতভেদ আছে। এবিষয়ে সোভিয়েট রাশিয়া যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ভারতবর্ষ তাতে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে সাড়া দেয় নি। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যে, শ্রীমতী গান্ধীর রাশিয়া সফরের প্রাক্কালে সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা এ পি এন-র রাজনৈতিক ভাষ্যকার স্পার্তাক বেগলভের যে প্রবন্ধ প্রচার করা হয়েছে তার এক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'সোভিয়েট জনগণ সঙ্গত কারণেই আশা করে যে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের এবং সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের নীতির ভিত্তিতে এশিয়ার শান্তিপূর্ণ আলোচনা আরও ব্যাপক করে তোলার জন্য মস্কো থেকে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ভারত তার প্রতি উদাসীন থাকবে না। এইভাবে সে চেষ্টাই করতে হবে যাতে এই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবর্তিত গোষ্ঠীনীতির বিকল্প নীতিকে মিলিত আলাপ-আলোচনার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আরও শক্তিশালী করে তোলা যায়।'

১৯৫৫ সালে রাশিয়ার সহযোগিতায় ভিলাইয়ে ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত থেকে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার যে অধ্যায় শুরু হয়েছে তাতে ভারত একটা আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। রাশিয়ার সহযোগিতা ভারতকে ইস্পাত, খনিজ তেল কয়লা ভারি যন্ত্রপাতি ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ঔষধ প্রভৃতি শিল্পে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন-ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। এই সব শিল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলি ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে রাজি হয় নি বা হত না। অন্ততপক্ষে এসব শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা স্থাপনে যে পাশ্চাত্য দেশগুলি থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যেত না, একথা ধ্রুব সত্য।

ভারতে আজ প্রায় এমন ৮০টি কারখানা রয়েছে যেগুলি ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সহযোগিতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এদেশের মোট ইস্পাত উৎপাদনের ৩০ শতাংশ, তেল উৎপাদনের ৫০ শতাংশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের ২০ শতাংশ এবং ইস্পাত কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদনের ৮০ শতাংশ এইসব কারখানা থেকে আসে।

বিকাশমান ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সম্পর্কের আর একটি দিক হল, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার। গত দশ বছরে সোভিয়েট রাশিয়ায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানির পরিমাণ তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে ভারত যেখানে সোভিয়েট ইউনিয়নে ৫২ কোটি রুবল মূল্যের পণ্য রপ্তানি করেছিল। ১৯৬৬-৭০ সালে সেই রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯৪ কোটি ১০ লক্ষ রুবল। এর পরবর্তী পাঁচ বছরের বাণিজ্যের যে প্রাথমিক হিসাব পাওয়া গেছে তাতে প্রকাশ যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় ১৭০ কোটি রুবল মূল্যের ভারতীয় পণ্য রপ্তানি করা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শুধু যে টাকা বা রুবলের অঙ্কেই সোভিয়েট-ভারত বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়েছে তা নয়, সোভিয়েট রাশিয়ার পাঠান ভারতীয় পণ্যের তালিকাও অনেক দীর্ঘতর হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য চলত চিরাচরিত ধারায়। অর্থাৎ চা, কফি অভ্র মশলাপাতি পাটজাত দ্রব্য প্রভৃতি কাঁচামাল অথবা কৃষিপণ্যই ভারত থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নে চালান যেত। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া ভারত থেকে মাত্র ১২ রকমের পণ্য আমদানি করত। ১৯৭৫ সালে সেই সংখ্যা ৭০ দাঁড়িয়ে গেছে। ভারতীয় সুতি কাপড়, গেঞ্জি মোজা সোয়েটার দামী ফ্লাস্ক সিগারেট তৈরি পোশাক, জুতো লাক্ষা রং সাবান প্রসাধন দ্রব্য হস্তশিল্প প্রভৃতি তো সোভিয়েট রাশিয়ায় যাচ্ছেই, স্টোবেজ ও ট্র্যাকশন ব্যাটারি ট্রাক কেবল চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, গ্যারাজের যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও ভারত থেকে রাশিয়ায় যাচ্ছে।

ভারতের মোট জুতা রপ্তানির ২০ শতাংশ, গেঞ্জি মোজা সোয়েটার প্রভৃতির রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশ এবং তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রায় ৬৫ শতাংশ যায় সোভিয়েট রাশিয়ায়।

ভারতের পক্ষে একটি বিশেষ সুবিধা-জনক ব্যবস্থা হল এই যে, এই বাণিজ্য হয় টাকায়। অর্থাৎ ভারত সোভিয়েট রাশিয়া থেকে যে পণ্য আমদানি করে তার জন্য তাকে স্টার্লিং বা ডলারের মতো অবাধে বিনিময়যোগ্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয় না। যদিও টাকার সঙ্গে রুবলের বিনিময়হার নিয়ে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মতভেদ দুই দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণের অন্তরায় হয় নি এবং ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় ২৩ বছরের পুরান ভারত-সোভিয়েট বাণিজ্য এখন এক লাফে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে।'

ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহ-যোগিতার বিকাশের প্রশ্নটির দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য দুই দেশের সরকারি প্রতিনিধি-দের একটি স্থায়ী কমিশন রয়েছে। সম্প্রতি মস্কোতে এই কমিশনের তৃতীয় অধিবেশনে যেসব সিদ্ধান্ত হয়েছে তাতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতাকে নতুন ও উন্নততর আকার দেওয়া হয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রশ্নটিকে ঐ সিদ্ধান্তের দ্বারা আরও উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উৎপাদনে সহযোগিতা বলতে এত-দিন বোঝাত যেমন ভারত সোভিয়েট রাশিয়া থেকে তুলো আমদানি করবে আর সেই তুলো থেকে তৈরি সুতি কাপড় রপ্তানি করে তার মূল্য শোধ করবে। কিন্তু এখন স্থির হয়েছে, ভারতীয় সুতি কাপড় রপ্তানির বিনিময়ে সোভিয়েট রাশিয়া রাষ্ট্রা-য়ত্ত কাপড়ের কলগুলিকে আধুনিক যন্ত্র-পাতিও যোগাবে। এই ধরণের দ্বিতীয় আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে, ওড়িশা ও অন্ধ্র-প্রদেশের উপকূল অঞ্চলে যে বকসাইটের সন্ধান পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে পাঁচ লক্ষ টন অ্যালুমিনা উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা তৈরি করতে সোভিয়েট রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করবে। এজন্য যে যন্ত্রপাতি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আসবে তার মূল্য শোধ করা হবে উৎপন্ন অ্যালুমিনা সোভিয়েট ইউনিয়নে রপ্তানি করে।

শ্রীমতী গান্ধী এমন এক সময়ে সোভি-য়েট রাশিয়ায় গেছেন যখন নতুন একটি বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রশ্নটি জরুরি হয়ে উঠেছে। আমেরিকার নেতৃত্বে পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির ন্যায়বিচার লাভের চেষ্টায় ক্রমাগত বাধা দিয়ে যাচ্ছে। শ্রীমতী গান্ধীর সোভিয়েট সফর এই সময়ে ভারত-সোভিয়েট অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে তৃতীয় বিশ্বের সামনে একটি আন্তর্জাতিক নববিধানের মডেল হিসাবে উপস্থিত করতে পারে।

"Each one of us in our place should determine to do more for our fellow citizens, not only for ourselves"

Prime Minister Shrimati Indira Gandhi

UCOBANK joins the countrymen in celebrating the 59th birthday of Shrimati Indira Gandhi.

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল
ব্যাঙ্ক

United Commercial Bank
Helping people to help themselves - profitably

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

কাঁচে ঘেরা ঘরে বসে কি যেন ভাবছিলেন শ্রীসান্যাল। প্রচারপদ্ধতির নানা দেশ-বিদেশের কলাকৌশল, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়—করা মাথায় নতুন কোনো বিজ্ঞাপনের কথা ভাবছিলেন হয়ত। দরজা ঠেলে বললাম—আসতে পারি?

হেসে ভিতরে গিয়ে বসতে বললেন।

শ্রীসান্যাল—অর্থাৎ ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের জনসংযোগ এবং প্রচারের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীনৃপেন্দ্র সান্যালের কথা বলছি আমি। বিজ্ঞাপন জগতে বিশেষভাবে পরিচিত তিনি। বিজ্ঞাপনের কাজে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। বিদেশেও গেছেন। সব অভিজ্ঞতা নিয়ে এখন যুক্ত আছেন, ইউকো ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন আরো কত উন্নত এবং সুন্দরতর পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রচেষ্টায়।

'ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর আমাদের প্রচারের মূল্য লক্ষ্য হলো, জাতীয়করণের নীতিগুলোকে কিভাবে কার্যকর করা যায়। এবং কি করে আমরা আরো ভালোভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোতে পারি সেই চেষ্টা চালানো। সাধারণভাবে আমরা আমাদের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমকে দু'ভাগে ভাগ করেছি। (১) শহর এবং শহরতলির লোকদের জন্য বিজ্ঞাপনকে করেছি পত্র-পত্রিকা-কেন্দ্রিক। (২) গ্রামের বেশির ভাগ মানুষই নিরক্ষর। তাদের জন্য তাই 'অডিও-ভিসুয়াল' পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছি।

—জাতীয়করণের পর গ্রামাঞ্চলে আপনাদের ব্যাঙ্কের কাজ আরো বেড়েছে। নানা শাখাও খোলা হয়েছে। গ্রামীণ জীবনের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থাকে নতুন করে গড়ে তোলার ব্যাপারেও আপনাদের দায়িত্ব বেড়েছে। সেই দিক থেকে ঐ অঞ্চলে প্রচারের ধারা কি পরিবর্তিত হয়েছে?

—হ্যাঁ, আমি সেই প্রসঙ্গেই আসছিলাম। এ বিষয়ে আপনাকে প্রথমেই বলা দরকার

ইদানীং কয়েক বছর ধরে গ্রামাঞ্চলের বিজ্ঞাপন আমরা দারুণ 'ইনটেনসিভ' করেছি। এর পেছনে যত টাকা আমরা খরচ করি, সম্প্রতি শহরাঞ্চলের বিজ্ঞাপনের জন্যে তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, গ্রামাঞ্চলের প্রচারের ধারা আমাদের কাছে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। ১৯৭৩ সালে এবং তার আগে আমাদের ব্যাঙ্কের নামে নানাদিক থেকে এই বলে সমালোচনা হলো যে, আমরা নাকি 'প্রায়োরিটি সেকটর'এ কিছুই করছি না। এই ধরনের ভুল ধারণার মোকাবিলা করার জন্য আমরা আমাদের সত্যিকারের বাস্তব তথ্য তুলে ধরে প্রচারের ধারাটা আরো জোরদার করলাম। গ্রামাঞ্চলে ফিল্মের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলাম। সঙ্গে ছিল মূক অভিনয়ের ব্যবস্থা। গ্রামের মানুষের বুঝবার মতো ভাষায় হোর্ডিং দিলাম, কয়েকটা গ্রাম জুড়ে জুড়ে 'গ্রুপ ডিসকাশন'এর ব্যবস্থা করলাম। গ্রামাঞ্চলের বিজ্ঞাপনের আর একটা মজা আছে। সব অঞ্চলের সব এলাকার সমস্যা তো একই নয়। তাই আমরা প্রথমে এলাকা ভাগ ভাগ করে নিই। তারপর আলাদা আলাদাভাবে এক একটা এলাকার চাহিদা চাষীদের সমস্যা প্রয়োজন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করি এবং তার উপর ভিত্তি করেই সেই এলাকার জন্য বিজ্ঞাপন তৈরি করি।

আলোচনার মাঝে ছেদ পড়ল কিছু সময়ের জন্য। চায়ের বিরতি। তারপর নৃপেনবাবু বললেন—এবার শহরের বিজ্ঞাপন প্রসঙ্গে আসা যাক।

বললাম—বলুন।

—শহরের বিজ্ঞাপনের উপর সমীক্ষা নিয়ে আমরা দেখেছি, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান-গুলোর বিজ্ঞাপনের মধ্যে আমাদের বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞাপনের প্রতি পাঠকের একটা আলাদা নজর আছে। এর অনেক কারণের মধ্যে দুটির কথা বলছি। এক বিজ্ঞাপনের ভাষা এবং দুই, বিজ্ঞাপনে কার্টুনের ব্যবহার। আমাদের বেশির ভাগ বিজ্ঞাপনেই আমরা কার্টুন ব্যবহার করি।

—এর কারণ? প্রশ্ন রাখি।

—এর কারণ এই যে, আমরা খবরের কাগজে সাধারণত একই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখি। এর ফলে আমাদের এক ধরনের 'ব্লাইন্ড স্পট' তৈরি হয়। এর থেকে 'রিলিফ' দেওয়ার জন্যই আমরা কার্টুন ব্যবহার করেছি। কার্টুনের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা একটি সমীক্ষাও করেছি। দেখা গেছে এটা খুব প্রফেকটিভ।

—বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা, বয়ান সবই কি আপনারা করেন?

—আমাদের কাজ হয় এজেন্সীর মারফত তবে বিজ্ঞাপনের প্রাথমিক কাজগুলো আমরাই তৈরি করে দিই। তারপর তাকে সম্পূর্ণ করা হয় যৌথ প্রচেষ্টায়।

—অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কিং প্রচার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় এদেশের প্রচার পদ্ধতি কোন মানের?

—আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং পাবলিসিটিকে অ্যাডভান্স ধরনের বলা যায় না। তবে এটাকে আমি 'ইউনিক' বলবো। বিদেশে একটা বিজ্ঞাপন যেরকম 'সফিসটিকেটেড' পর্যায়ে দেওয়া সম্ভব, এদেশের সেটা সম্ভব নয়। তার মূল কারণ অবশ্য আমাদের শিক্ষার অনগ্রসরতা।

—এখনকার প্রচার মাধ্যমের সমস্যা কি কি?

সোজা হয়ে বসলেন শ্রীসান্যাল। বললেন—আমাদের বিজ্ঞাপনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো, আমাদের এর মূলে লক্ষ্যটা কখনও পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয় না। অথচ পরিষ্কার এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য জানা না থাকলে বলে না দেওয়া হলে যে কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। একটা বিজ্ঞাপনের উপযোগিতা এবং উদ্দেশ্য অজস্র রকমের হতে পারে। সুতরাং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না হলে বিজ্ঞাপন তৈরির পথে বিভ্রম ঘটে যায়।

—প্রতি বছর প্রচারখাতে আপনাদের খরচ কত?

প্রশ্নের উত্তরে নৃপেনবাবু বললেন—আমাদের প্রয়োজন-ভিত্তিক বাজেট তৈরি হয়। যতটুকু আমাদের প্রয়োজন, ততটুকুই খরচ করি। সেই হিসাবে ১৯৭৫ সালে খরচ হয়েছিল ১৮-৭১ লক্ষ টাকা। এ বছরে আছে ২৫ লক্ষ। এর হেরফেরও হতে পারে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীসান্যাল বললেন—আমাদের মূল লক্ষ্য এখন গ্রামের চাষী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর কাজে লাগা। তাঁদের যাতে উন্নতি হয় সেইদিকেই আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবরকম পদ্ধতিতে এমনকি নৃত্যনাট্য নাটক মূকাভিনয়ের মাধ্যমেও তাদের জানাতে চেষ্টা করছি—আমাদের ব্যাঙ্ক কতোভাবে তাঁদের সাহায্যে আসতে পারে। দেখি কতদূর কি হয়।

আনন্দ রায়

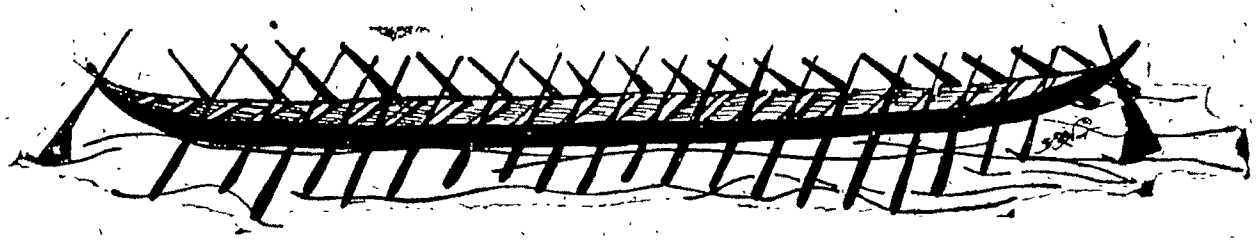

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

সূর্য তখন আরব সাগরের জল ছুঁয়ে মস্ত বড় একটা সিঁদুরের টিপের মত স্থির হয়েছিল। ইন্দ্র ওদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে তাই দেখছিল। পেছন থেকে, হঠাৎ প্রেমার গলা বেজে উঠল, এই যে মিঃ রায় এখানে আমি আপনাকে হোটেল আর ব্যাকওয়াটারের দিকে খুঁজে ফিরছিলাম।

ইন্দ্র প্রেমার মুখোমুখি হল। বলল, সাধারণতঃ আমি ব্যাকওয়াটারের দিকেই বেড়াতে যাই, কিন্তু আজ হোটেলের কাউকে না জানিয়ে এদিকে চলে এসেছি।

প্রেমা বলল, গাড়ীটা নিয়ে যেতে হবে। কাল একখানা যা কান্ড হল, সত্যি!

ইন্দ্র হেসে বলল, বেশ মজা হল, বলুন।

প্রেমা বলল, মজাই বটে। আমার একটা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আপনার রাতের ঘুমটাই মাটি হল।

ইন্দ্র বলল, অনেক বেলা অব্দি ঘুমিয়েছি।

প্রেমা বলল, চলুন একটু হাঁটা যাক। সকাল থেকে ফোনের জ্বালায় কান ঝালাপালা। একটুও ঘুমুতে পারি নি। সন্ধ্যাটা সমুদ্রের ধারে বেড়ালে মাথাটা হালকা হতে পারে।

ইন্দ্র আর প্রেমা বালির ওপর দিয়ে পায়ের পাতা ডুবিয়ে হাঁটতে লাগল।

ইন্দ্র প্রেমার কথার খেই ধরে বলল ছোট থাকলে দুঃখ বড় হলে বিপদ কোন কিছুতেই শান্তি নেই। আপনি এখন নাচের জগতের লাইম লাইটে এসে গেছেন, ঝক্কি বাড়বে বৈ কমবে না।

প্রেমা বলল, দর্শকদের অতি উৎসাহ যেমন একটা ঝামেলা আছে তেমনি উত্তেজনা নেই বললে মিথ্যে বলা হবে।

সূর্য ডুবে গেছে অথৈ সমুদ্রের বুকের ঠিক মধ্যিখানে। আরব সাগরের জল এখন সন্ধ্যার নেমে আসা ছায়ার ছোঁয়ায় ঘন আর উত্তাল।

ইন্দ্র বলল, এখানে আসা অব্দি বেশ কটি নাচের আসরে যাবার সুযোগ হয়েছে আমার। অধিকাংশ শিল্পীর মুদ্রায় নাচের নিভুর্ল ব্যাকরণই শুধু দেখেছি, মন ছুঁতে পারে নি। আপনি কাল কিন্তু প্রতিটি দর্শকের মনের সীমানায় আপনার নাচকে পৌঁছে দিয়েছেন। আপনার 'বাসকসজ্জার' ভাবটি আশ্চর্য মধুর হয়ে ফুটে উঠেছিল।

প্রেমা নিজের ভেতর থেকে কথা বলে উঠল, জানেন দেবন বলত তুমি ভুলে যাও তুমি প্রেমা শুধু ভাব তুমি সেই চিরদিনের প্রেমিকা যার হৃদয় প্রেমিকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। সমস্ত তরুণী হৃদয়ের কামনায় তোমার বুক ভরে উঠুক, তবেই তো তোমার সারা দেহে প্রিয়তমের জন্য প্রতীক্ষার আকুল ছবিটি ফুটে উঠবে।

ইন্দ্র বলল, ভারী সুন্দর কথা তো। কাতরতার ভাবটি কোন ব্যক্তির যেন না হয়, সমস্ত নারীর ভাবনাকে বুকে নিয়ে পথ চাওয়ার ভাবটি ফোটাতে হবে। দেবন কে, মিস মেনন?

প্রেমা বলল, তাঁকে বড় একটা কেউ চেনে না কিন্তু আমাদের কলাকেন্দ্রমে এতবড় শিল্পী আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। ও শিখত কথাকলি আর আমি ছিলাম মোহিনী আট্টমের ছাত্রী।

জানেন, সুযোগ পেলেই আমি ওর ক্লাশে গিয়ে বসতাম। শুধু ওর দিকে চেয়ে দেখতাম। গুরু পিল্লাই বলতেন, দেবনের মত শিল্পী কালেভদ্রে জন্ম নেয়। ও জন্মেছে নাচের বিদ্যা আয়ত্ত করে।

ইন্দ্র বলল, আমি ওঁর নাচ দেখি নি। আপনার মুখে ওঁর কথা শুনে দেখতে ইচ্ছে করছে।

প্রেমা ম্লান হেসে বলল, ওকে পাবেন কোথা, ও ঐ এক ধরনের মানুষ। রাজ্জান মন্ডপে সমঝদারের সামনে ও বড় একটা নাচতে চায় না। ও বলে, কথাকলি আমার কেরালার নাচ। যাদের নাচ তাদের ঘরে ঘরে একে পৌঁছে দেব আগে তারপর এ জীবনে সময় যদি পাই বিশ্বজয়ে বেরোব।

ইন্দ্র বলল, আমি নাচের বিশেষ ভক্ত জানবেন তাই দেবনের মত শিল্পীর নাচ দেখতে পেলাম না বলে বড় আফশোষ থেকে গেল।

প্রেমা বলল, ও এখন ঘুরছে গাঁয়ে গাঁয়ে পথে প্রান্তরে। সাধারণ মানুষকে ও ওর নাচের সমঝদার করে তুলতে চায়।

ইন্দ্র বলল, আপনারা একই সঙ্গে কলাকেন্দ্রমের শিক্ষার্থী ছিলেন তাহলে?

প্রেমা বলল, একই সঙ্গে না বলে একই সময়ে ছিলাম বলতে পারেন। কথাকলিটা ঠিক মেয়েদের নাচ নয়, যদিও ওতে মেয়েদের ভূমিকা আছে। ওখানে পুরুষেরাই মেয়েদের ভূমিকায় অংশ নেয়। আর মোহিনী আট্টম পুরোপুরি মেয়েদের নাচ।

ইন্দ্র বলল, কথাকলির নাচে মেয়েদের ভূমিকাটা তো মেয়েরাই নিতে পারেন।

প্রেমা বলল, আমারও সেই মত। আমি একদিন কলাকেন্দ্রমে দেবনকে এই কথা বলেছিলাম। শুনে ও তো ক্ষেপে উঠল। বলল, নাচের বিশুদ্ধতাকে সব সময়ই তোমরা নষ্ট করতে চাও। তোমাদের মোহিনী আট্টমে ভারত নাট্টম আর কথাকলির মিশ্রণ ঘটেছে ঘটুক, কিন্তু দয়া করে আর কথাকলিকে নতুন পোষাকে সাজিও না।

ইন্দ্র বলল, একটু উদারতা থাকলে ক্ষতি কি?

প্রেমা বলল, শিল্পের ক্ষেত্রে দেবন উদারতায় আগ্রহী নয় বিশুদ্ধতায় বিশ্বাসী।

হোটেলের বয়টি ছুটতে ছুটতে এল। ইন্দ্রের পাশে এসে বলল, ছোট মেমসাহেবের ফোন এসেছে।

কথাটা শুনেই ইন্দ্রের মনে হল, সে যেন চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এর থেকে উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই। সন্ধ্যার আবছায়াতেও সে বুঝতে পারল প্রেমা তার দিকে চেয়ে আছে চোখে বিস্ময় নিয়ে।

কে যেন কথা জুগিয়ে দিল ইন্দ্রের মুখে। প্রেমার দিকে চেয়ে সে বলল, আপনার খোঁজেই বাড়ী থেকে ফোন এসেছে নিশ্চয়। আপনি কি এখানে আসার কথা বলে আসেন নি?

প্রেমার চোখের দৃষ্টি সহজ হল। সে বলল, হয়ত তাই। কোন দরকারে আমার খোঁজ করছে সরিতা।

দুজনেই হোটেলের দিকে পা বাড়াল।

হোটেলে পৌঁছে ফোনটা তুলে নিল ইন্দ্র।

হ্যালো।

ও প্রান্ত থেকে সরিতা বলল, ম্যানেজার সাহেব হোটেলে নেই, এ তো বড় অন্যায়। আমি প্রেমা মেননের কাছে প্রতিবাদ জানাব।

ইন্দ্র অপরাধীর গলায় বলল, আমি এই একটুখানি বাইরে বেরিয়েছিলাম। হাঁ, আপনার দিদি এখানেই এসেছেন, কথা বলুন।

প্রেমা ফোন ধরল। ইন্দ্রের তখন কিছুটা ঘাম দিয়ে জ্বর নেমেছে। প্রথম ধাক্কাটা সামলানো গেছে।

প্রেমা বলল, গাড়ীটা নিতে এসেছি।

ওপাশের প্রশ্নের জবাবে আবার বলল, চাঁ সাইকেলে করেই এলাম। তুই অপেক্ষা কর, সাতটার ভেতর আমি এসে পৌঁছব।

প্রেমা ফোন ছেড়ে দিয়ে ইন্দ্রের দিকে এক মুখ হাসি ছড়িয়ে বলল, একেবারে পাগল। একটুখানি চোখের আড়াল হলেই খুঁজে খুঁজে সারা দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলবে। জানেন মিঃ রায়, উঠতে বসতে ওর গার্জেনীর ঠেলায় গেলাম। ওর রকম-সকম দেখে সবাই ভাবে ও-ই আমার দিদি।

ইন্দ্র এখন প্রাণ খুলে প্রেমার হাসিতে যোগ দিল।

প্রেমা বলল চলুন, আপনার রুমে বসে একটু কফি খাওয়া যাক।

একটু থেমে আবার বলল, আপনি তো নিজের থেকে বললেন না, তাই চেয়ে নিতে হল।

ইন্দ্র বলল, এ যে আপনি নিজের ঘরে পরবাসী হয়ে থাকার কথা বলছেন। আমি আপনাকে আতিথ্য দেবার কে! আপনার হোটেলে কাজ করছি বই তো নয়।

ওপরে উঠতে উঠতে প্রেমা বলল, আমি হোটেলের প্রোপ্রাইট্রেস ঠিক, কিন্তু আপনি এ হোটেলের কর্মপরিচালক। সুতরাং হোটেলের ভেতর আপনার কর্তৃত্ব আমার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

ওরা এসে ঢুকল ইন্দ্রর ঘরে।

সুন্দর সাজানো ঘর। ব্যাচিলারের ডেরা বলে মনেই হয় না। প্রায় মাস দশেক ইন্দ্র চাকরীতে বহাল হয়েছে, কিন্তু প্রেমা ইন্দ্রের রুমে ঢোকে নি কোনদিন। হোটেলে এসে চলে গেছে কাজ সেরে। অফিস রুমে বসেছে, দরকারী কথা বলেছে; ওপরে ওঠার কথাই ওঠে নি।

প্রেমাকে একখানা চেয়ারে বসতে বলে নীচে নেমে গেল ইন্দ্র। কফি আর কিছু জলখাবারের অর্ডার দিতে গেল সে। হোটেলের একটা বয়কে ওপরে ডেকে অর্ডার দিতে পারত; কিন্তু তাতে দুটো অসুবিধে দেখা দিত। প্রেমা যেহেতু মালিক, তার সামনে অর্ডার চালানো শোভন নয়।

আর কিছু স্ন্যাকস ইত্যাদির অর্ডার দিতে গেলে প্রেমা হয়ত বারণ করেই বসবে। তাই ইন্দ্র নিজেই অর্ডার দিতে গেল। আজ প্রেমা তার রুমে এসেছে সান্ধ্য কফির আসরে। ধরা যেতে পারে তার আতিথ্য নিয়েছে।

প্রেমা নিঃসঙ্গ ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দেখছে। লম্বা সাদা একখানা বুক শেলফ ইংরাজী, বাংলা বইতে ঠাসা। বইগুলো সাজানোর ভঙ্গীটা অদ্ভুত। মনে হবে কোন বিশিষ্ট বুক শপের শো-কেসে বই সাজানো রয়েছে। শেলফ-এর ওপরে মার্বেল পাথরের একসার হাতি চলেছে। পর পর বড় থেকে ছোট, অনেক ছোট হয়ে গেছে হাতিগুলো। এগুলো যে কেবলার জিনিস নয় তা ভাল করেই জানে প্রেমা। ঘরের কোণে পেতলের একটা ঝকঝকে মাজা টব সাদা লম্বা গ্রীলের কাজ করা কাঁচের টবের ওপর বসানো। তার পাশে একটা লম্বা সাদা রড সিলিং ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টবের থেকে মানি-প্ল্যান্টের একটা লতা প্রায় আদ্দেক উঠে গেছে ঐ রডখানাকে পাক দিতে দিতে। পাতাগুলো সবুজ হলদে মেশা। বিছানার ওপর যে বেড কভার পাতা তার রঙও সবুজে হলদে। দুই পাশের সমর্থনে রুমটা আর সবুজ সুতো দিয়ে ডিজাইন তোলা। সব জায়গাতেই ছিমছাম একটা রুচির পরিচয়।

ইন্দ্র ঘরে ঢুকে বলল, আপনাকে একা বসিয়ে রেখে গেলাম, অপরাধ নেবেন না।

প্রেমা বলল, আপনার ঘরে বসে থাকলে কারো একা বলে মনে হয় না। একটা কিউরিউ শপে বসে আছি বলে মনে হবে।

ইন্দ্র বলল, সব কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখতে জানলে হোটেল সাজাব কি করে। এটা তো আমাদের কাজেরই অঙ্গ।

খাটের পাশে টিপয়ের ওপর রাখা ফ্লাওয়ার ভাসে ফুল সাজানো। সাজাবার ভঙ্গীটা মুহূর্তে চোখ টেনে নেয়।

প্রেমা বলল, আপনার ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর।

ইন্দ্র বলল, ও কথা বলবেন না। দক্ষিণীদের কাছে ভারতের আর সবাইকে ফুলের ব্যবহার শিখতে হবে। আপনাদের সারা দেহ ভরে ফুলেরই উৎসব।

প্রেমা বলল, আপনি কবি তাই বলছেন অমন করে। তবে ফুল আমরা ভালবাসি। আমাদের সব উৎসবেই ফুলের ঘটা। কিন্তু আপনার ফুলদানি সাজানোর কায়দাটাই আলাদা।

ইন্দ্র বলল, ও বিদ্যেটা বিদেশ থেকে আমদানি করা মিস মেনন। ওটা ইকাবানা। জাপানী ফ্লাওয়ার এ্যারেঞ্জমেন্টের কায়দাতেই সাজানো।

প্রেমা মুগ্ধ গলায় বলল, আমার খুব ভাল লেগেছে।

ইন্দ্র হেসে বলল, সমঝদার তো পাই না ভাগ্যিস আপনি দয়া করে আজ এলেন।

প্রেমা বলল, সত্যি আমি আপনার রুমে কখনো আসি নি। বাবা বেঁচে থাকতে সবই দেখতেন তিনি, আমি আমার পড়া আর নাচ নিয়েই থাকতাম। ওঁর অবর্তমানে একজন এ দেশীয় ম্যানেজারের ওপর ভার দিয়েছিলাম। তিনি কিছুকাল পরে অলেপ্পিতে নিজের হোটেল করে চলে গেলেন তারপর এলেন আপনি।

ইন্দ্র হেসে বলল, কথা দিচ্ছি আমি অন্ততঃ হোটেল করে কোথাও উঠে যাব না।

প্রেমাও ইন্দ্রের হাসিতে যোগ দিল।

কিছুক্ষণের ভেতরই আবার নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল প্রেমা। বলল, কাউকে কি চিরদিনের তরে ধরে রাখা যায় মিঃ রায়।

কথাটা শুনে চমকে উঠল ইন্দ্র। একটি পূর্ণবিকশিত তরুণী বসে আছে তার সামনে। কৃতি নর্তকী প্রেমা, মেননের কথায় কি অন্য কোন সুর বাজছে।

ইন্দ্র বলল, আমার দিক থেকে অন্ততঃ চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আপনাদের যদি কোনদিন প্রয়োজন ফুরোয়, তাহলে সে আলাদা কথা।

প্রেমা বলল, আপনি অন্যভাবে নেবেন না মিঃ রায়, আজ ঘরে ফিরে কেবল আমার

দেবনের কথাই মনে পড়ছে। ওকে একদিন মনের ভেতর ধরে রাখার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ওকে চিরদিনের করে তো ধরে রাখা গেল না। তাই বলছিলাম আমাদের ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়ে ওঠে না।

ইন্দ্র বুঝতে পারল, আজ সে প্রেমার উপলক্ষ্য হলেও আসল লক্ষ্য দেবন। প্রেমার জীবনে দেবন হয়ত কোনদিন এসে দাঁড়িয়েছিল, তার প্রতিভাব পরিচয়লিপি উৎকীর্ণ করে গিয়েছিল প্রেমাব হৃদয়ে কিন্তু আজ আর সে নেই। তাই প্রেমা মাঝে মাঝে অতীত স্মৃতির দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

কফি আর কিছু খাবার নিয়ে বয় ঢুকল ঘবেব ভেতর। খাবার সাজিয়ে রেখে চলে গেল। প্রেমা অন্যমনস্কভাবে কাপে কফি ঢালতে লাগল। ইন্দ্র প্রেমাকে লক্ষ্য করল। কেরালার অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে চুলের রাশ পিঠের ওপর ফেলে শুধু প্রান্তে একটুখানি বেঁধে রাখে প্রেমা তেমনি করেই চুল বেঁধেছে। ঘাড় কাৎ করে কফি ঢালাব সময় সে এমন দর্শনীয় ভঙ্গীতে মুখখানাকে ফুটিয়ে তুলছে যেখান থেকে সহজে চোখ সবিয়ে নেওয়া যায় না।

প্রথম কফির কাপ প্রেমা তুলে দিল ইন্দ্রর হাতে। বলল, কফিতে দু' চামচ চিনি দিলাম আপনাকে না জিজ্ঞেস করেই।

ইন্দ্র বলল, আপনার আন্দাজ বোঝা গেল অব্যর্থ। আমি দু' চামচ চিনিই নিয়ে থাকি।

নিজেব কাপ ঠোঁটে ঠেকিয়ে কি যেন শোনাব চেষ্টা কবল প্রেমা। এক সময় বলল, আচ্ছা ঘন্টার টুং টাং একটা আওয়াজ কোত্থেকে আসছে বলুন তো? খুব মৃদু অথচ ভারী মিষ্টি একটা আওয়াজ? শুনতে পাচ্ছেন না?

ইন্দ্র মুখে হাসির রেখা টেনে ঘবের সিলিং-এব দিকে তাকাল। প্রেমার চোখ পড়েছে এবার। সে গলায় বিস্ময়েব সুর তুলে বলল, আমি এতক্ষণ মাথা ঘামিয়ে মরছি শব্দটার উৎস নিয়ে, কিন্তু এখন দেখছি আওযাজ আপনার ঘব থেকেই উঠছে।

একটা পেতলেব চেন সিলিং থেকে ঝোলান। তার থেকে ঝুলছে ছোট বড় মাঝারি প্রায় ডজনখানেক ঘন্টা। সামান্য হাওয়ায় দুলে দুলে মৃদু মিষ্টি একটা আওযাজ ছড়াচ্ছে।

প্রেমা চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, আপনি একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদাব মিঃ রায়, কিন্তু শিল্পী নন।

ইন্দ্র কথাটা এভাবে শুনবে আশা করে নি, তাই চমকে উঠল। উত্তবে শুধু বলল আপনাব অনুমান নির্ভুল। নিজে শিল্পী না হলেও শিল্পবস্তুর ওপব আমাব একটা মোহ আছে। কিন্তু আপনার এই নির্ভুল অনুমানেব কারণটা জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

প্রেমা বলল, কাবণ খুব সোজা। আমি নাচ কম্পোজ করি, সারাদিন ওরই ভাবনায় আমার কেটে যায় কিন্তু নাচেব অলংকার পোষাক পরিচ্ছদ ফুল পাতার খবরই আমি রাখি না। আমাব সব কিছুই এলোমেলো হয়ে থাকে। সরিতা না থাকলে আমি অন্ধ। ও-ই আমাকে সাজিয়ে স্টেজে পাঠায়। আমার যদি সামান্য কিছু কৃতিত্ব থাকে তাহলে তার আন্দেকের বেশী ওরই প্রাপ্য।

ইন্দ্র মনে মনে খুশী হয়ে বলল সেদিন স্টেজে কিন্তু আপনাকে অসামান্যা মনে হয়েছিল। আপনাব সাজে আড়ম্বর ছিল না কিন্তু বেশ-বাস অলংকরণে এমন নিখুঁত একটা হাবমনি ছিল যা চোখকে সারাক্ষণ টেনে বেখেছিল।

প্রেমা তপ্তগত হয়েছে মনে হল! সে বলল, মোহিনী আট্টমের পোষাকে ফুলের কাজে শুধু সাদারই মেলা। আমার মনে হয় যিনি প্রথম এই নাচের পোষাক পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি ছিলেন যথার্থ একজন ভাবুক। পোষাকে চমকে শিল্পী দর্শকদের ভোলাবে এটা তিনি চান নি। সাদা পোষাকে শিল্পীর সাবা দেহেব প্রতিটি বেখা শ্বেত পাথরে তৈরী মূর্তির মত ফুটে উঠবে, সেখানেই তো সবকিছু চার্ম। তার ওপব যখন সেই শ্বেত ভাস্কর্য নাচের লীলায় মেতে ওঠে তখনই সে হয় মোহিনী।

ইন্দ্র বলল, আপনার ব্যাখ্যার তারিফ না করে পারছি না। অ্যাপোলো অথবা ডেভিডেব মূর্তি কিম্বা ভেনাসের ছবি হঠাৎ যদি প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে তাহলে সে বিস্ময়, সে রোমাঞ্চ ধবে রাখা যায় না। তাদের নগ্নতা তখন চোখেব পীড়া না হয়ে প্রাণেব উৎসব হয়ে ওঠে।

প্রেমা হঠাৎ অন্যমনস্ক হল। আশ্চর্য সুন্দব মৃদাষ গালে আঙুল ঠেকিয়ে অন্য মনে চেয়ে রইল।

এক সময় বলল, কথাকলি কিন্তু তুলনাহীন। যদিও শিল্পী সারা পোষাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, তবু তার অভিব্যক্তি অসাধাবণ। দেবন বলে, দেহ দেখিয়ে তোমরা আন্দেক জয় কর, বাকীটুকু মুদ্রায়। কিন্তু আমরা আড়ালে থেকে আমাদের সম্পদকে বিলিয়ে দিই।

ইন্দ্র বলল, কথাটাব আংশিক সত্যতা হয়ত আছে, কিন্তু দেবনের উক্তিটা শোনাচ্ছে অহংকারেব মত।

প্রেমাব গলার স্ববে উত্তেজনা আপনি ঠিকই বলেছেন দেবন অহংকাবী কিন্তু অহংকার দেবনেরই শোভা পায়। সে যাদুকর তার প্রত্যেকটা মুদ্রায় চুম্বকের আকর্ষণ।

ইন্দ্র এসে বলল, কিছু মনে করবেন না মিস মেনন আপনি মনে হয় দেবনের সবচেয়ে বড় গুণগ্রাহী।

প্রেমা কোন কথা বলল না। সে ইন্দ্রেব মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। ইন্দ্র বুঝল প্রেমাব চোখ রয়েছে তাব দিকে কিন্তু আসল দৃষ্টিটা হারিয়ে গেছে নিজের মধ্যে।

এক সময় প্রেমা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ব্যস্ত হয়ে বলল, মিঃ রায় আপনার সান্ধ্য কফিব জন্য ধন্যবাদ। সরিতা আমার জন্য অপেক্ষা কবে বসে আছে।

দবজা পেরিয়ে কবিডোর দিয়ে প্রেমা দ্রুত সিঁড়ির দিকে চলল। এক সময় পেছন ফিরে ইন্দ্রকে বলল, আপনার শিল্প রুচি আর আলোচনার জন্য আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিঁড়ি বেয়ে ক্ষিপ্র পায়ে নেমে গেল প্রেমা। ইন্দ্র তার পেছন পেছন নীচে নামল। প্রেমা কিন্তু আর কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ীব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে বলল, এই আপনার চাবি।

প্রেমা মিষ্টি একটা হাসি হেসে চাবিটা ইন্দ্রেব হাত থেকে নিয়ে গাড়ী খুলে ঢুকে বসল।

ভোরেব রোদের মত লাবণ্যে মাখা হাতখানা গাড়ীব বাইবে বের কবে নাড়ল তারপর গাড়ী চালিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোটেলে উঠে এসেই ইন্দ্র ফোনেব লাইনটা নিজের রুমে নিয়ে নিল। তারপব তিনতলায় উঠে বিছানার ওপর বসে ডায়েল করল।

ও প্রান্তে ফোন ধবল সরিতা হ্যালো।

ইন্দ্র বলল, কে বলছেন?

ওপার থেকে উত্তর এল কাকে চাই আপনার?

ইন্দ্র বলল, সরিতাকে।

আপনি কে বলছেন?

ইন্দ্র সরিতার গলা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল আমি ছাড়া আপনাব আর কটি পুরুষ বন্ধু আছে মিস মেনন?

অমনি সবিতা ফোঁস করে উঠল আপনার মত আমার বন্ধুর সংখ্যা অত বেশী নয় মানি তা বলে একটিমাত্র মানুষেব কথাব জন্যে ফোন পেতে আছি ভাবলেন কি করে?

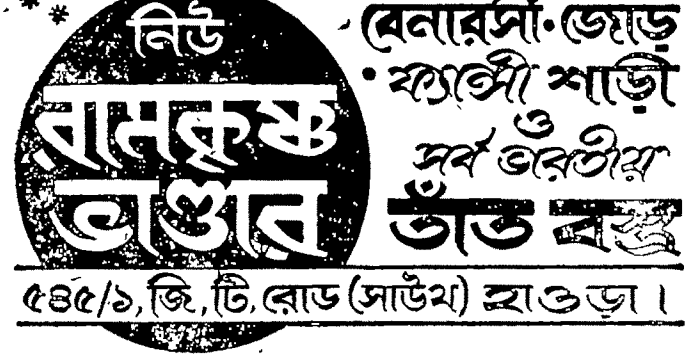

ইন্দ্র বলল তর্ক থাক কি বিপদেই না ফেলেছিলেন আজ। দিদির সঙ্গে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে আছি হোটেলের বেয়ারা গিয়ে বলল ছোট মেমসাব আপনাকে ফোনে ডাকছেন।

ওপার থেকে সরিতা বলল তাই বুঝি?

ইন্দ্র বলল এমন বিপদে কস্মিনকালেও পড়িনি। প্রেমার মুখ তো বিস্ময় চিহ্ন এঁকে আমার দিকে চেয়ে আছে। যা হোক অদৃশ্য দেবতাই শেষটায় হাল ধরে রক্ষা করলেন।

সরিতা বলল প্রেমা এখন কোথায়?

ইন্দ্র দুষ্টুমি করে বলল, আমার ঘরে বসে আছেন।

সরিতার গলায় বিস্ময় সে কি কি করছে?

ইন্দ্র বলল তাঁর বোনের জন্য ঘটকালী করছেন।

সরিতা বলে উঠল নিজের জন্যে নয় তো?

ইন্দ্র বলল মেয়েরা দারুণ অবিশ্বাসী। পুরুষদের চেয়েও মেয়েরা মেয়েদের সন্দেহ করে বেশী।

সরিতা বলল আর সেই সুযোগে ভালমানুষ ছেলেগুলো মেয়েদের ঠকিয়ে আনন্দ পায়।

ইন্দ্র বলল, আপনার এ অপবাদ থেকে একজন পুরুষ এখনও নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে।

সরিতা অমনি বলল, তাহলে জিতেন্দ্রিয় পুরুষটির মুখখানা তো আর একবার ভাল করে দেখতে হয়।

ইন্দ্র বলল, বন্ধুর বাড়ী থেকে সে ফোনে বললেন শনিবার পড়তে আসছেন প্রফেসারের বাড়ী তাহলে আসছেন তো?

আপনি কি আমার প্রফেসার? তিনি আমার অনেক শ্রদ্ধেয়।

ইন্দ্র বলল, আশা করি আমি এখনও কারো চোখে দারুণ রকম একটা অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠিনি।

সরিতা বলল, শনিবার তৈরী থাকবেন।

ইন্দ্র বলল, আদেশ মানাই আমার কাজ।

সরিতা ফোন রেখে দেবার আগে বলল মনে থাকে যেন।

ইন্দ্র ফোনটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

শনিবার ভোর হল। প্রথম হেমন্তের হাওয়ার মত শিরশিরে একটা অনুভূতি ছুঁয়ে গেল ইন্দ্রের সারা দেহমন। সে বিছানায় শুয়ে জানালার ফাঁকে তাকিয়ে দেখল কাটুমারমে চেপে হোটেলের সেই ভুবন ভ্রাম্যমান ফটোগ্রাফার বগল সমুদ্র চষতে বেরিয়েছে। নুলিয়া পাল সামলাচ্ছে আর ওরা দুটিতে বৈঠা পিটছে জলে।

ইন্দ্রের মনে হল, কত সুখী ওরা। হাওয়ার সমুদ্রে ডানা ভাসিয়ে পাখির মত ওরা সারা দুনিয়ায় উড়ে চলেছে।

ইন্দ্র বিছানার ওপর উঠে বসতেই পেছনের জানালায় চোখ পড়ল। নারকেল গাছের মাথা ছুঁয়ে সকালের একফালি সোনালী আলো লম্বা উত্তরীয়ের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সুগন্ধনের বছর ষোল বয়েসের মেয়ে কেনাগাম্মা সেই উত্তরীয়ের খানিকটা বুকে জড়িয়ে নিজের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। কি যেন একটা পাখি শিস্ দিয়ে ওর চোখের তন্ময় চাউনিটা কেড়ে নিল।

আজ এই মুহূর্তে দারুণ একরকমের ভাল লাগায় পেয়ে বসল। তার নিজেকে মনে হল। কবি হাফিজ—যিনি বোখারা সমরখন্দের মত দুটি নগরীকেও একটি তুর্কী মেয়ের কালো তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে রাজী ছিলেন।

বেলটা অনেকক্ষণ ধরে বাজাল ইন্দ্র। হোটেলের বেয়ারাটির পড়ি কি মরি করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে আসার শব্দ শুনতে পেল সে। ঘরে এলে তাকে অর্ডার দিল কফির।

নীচ থেকে কানেকশান নিয়ে ইন্দ্র ফোন তুলল। প্রেমার বাড়ীতে ডায়েল করতে গিয়ে তার মনে হল, যদি সরিতা না ধরে প্রেমা ফোন ধরে, তাহলে কি কথা বানিয়ে বলবে সে। আবার ফোনটাকে যথাস্থানে রেখে দিয়ে সে ভাবতে বসল।

সেকেন্ড খুটে তার মনে হল, সে ফোন করবে না। প্রতীক্ষা করবে প্রতিটি মুহূর্ত সরিতার জন্যে। এক সময় রাগ হল সরিতার ওপর। তিন তিনটে দিন পার করে শনিবার এল, সরিতার কি এর ভেতর তাকে একবারও ফোন করার সুযোগ পেল না। ইন্দ্র ভাবল, এত উতলা হবার কি আছে। সরিতা তার খবর না নিয়ে যদি তিন দিন কাটিয়ে দিতে পারে তবে সে-ই বা পারবে না কেন।

আশ্চর্য ইন্দ্রের এলোমেলো ভাবনার ভেতরেই ফোন বেজে উঠল। সরিতার ফোন।

হ্যালো, বলতেই ওপ্রান্ত থেকে সরিতা বলল মশায়ের আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে?

ইন্দ্র বলল মালিক নিশ্চিন্তে নিদ্রা গেলে তবেই কর্মচারীদের সুনিদ্রা হয়।

সরিতা বলল আপনি দেখছি কর্মচারী হিসেবে একদম কাঁচা। মালিক পক্ষ যখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোয় তখনই তো কর্মচারীদের জেগে থাকার পালা। ঐ সুযোগে কিছু হাতিয়ে নেওয়া যায়।

ইন্দ্র বলল কাঁচা থেকেই যদি এমন পাওনা জোটে তাহলে পাকা হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার।

সরিতা বলল জানি না আপনি কি পেয়েছেন তবে আমি একজন বন্ধু পেয়েছি।

ইন্দ্র বলল, মালিক বোধহয় কাছে-পিঠে নেই?

সরিতা বলল মালিক এখন নতুন উত্তেজনায় মেতেছে। সরকার থেকে এসেছে আমন্ত্রণ। বিদেশ থেকে আসছেন কোন এক বিশিষ্ট সরকারী অতিথি, তাকে নাচ দেখাতে হবে। তার প্রস্তুত চলছে পুরোদমে।

ইন্দ্র বলল, ঘরেই তাহলে অনুশীলন চলছে বলুন।

সরিতা বলল আজই সরকারী গাড়ীতে রওনা হয়ে গেছে। কদিন থাকবে সরকারী অতিথিশালায়। ওখানে কথাকলি মোহিনী আট্টম, আরও অনেক লোকনৃত্যের দলও জমায়েৎ হবে। রিহার্সেল চলবে পুরোদমে। এ দুতিনটে দিন আমারও হিপ হিপ হুররে।

ইন্দ্র বলল আহা দিদির ওপর কি ভক্তি কি টান।

সরিতা বলল আমার টান না থাক কিন্তু আর কারো টান থাকলেই মুশকিল।

ইন্দ্র কথা পাল্টাল, আসছেন কখন?

সরিতা ওপার থেকে বলল, যাব কিনা ভেবে দেখছি।

ইন্দ্র বলল, তিন দিন ধরে ভেবে ভেবেও স্থির করতে পারলেন না?

সরিতা বলল, কলেজে গানের কম্পিটিশান আছে, তাই এ কদিন গলা নিয়ে পড়েছি।

ইন্দ্র বলল, আপনি যে গান জানেন তা তো জানতাম না।

সরিতা বলল, জানবার মত গান নয় তাই জানতে পারেননি। নইলে রেডিও খুললে অথবা রেকর্ড চালালে জানতে পারতেন।

একটু থেমে আবার বলল, তিনটের তৈরী থাকবেন। তিন দিনের মত হোটেল থেকে ছুটি করে নিতে হবে।

ইন্দ্র বলল, তিন দিন!

সরিতা বলল, থাক তাহলে আপনি আপনার হোটেল নিয়েই থাকুন।

ইন্দ্র বলল, রাগ করছেন কেন হোটেলটা তো আপনাদেরই। ভালভাবে তার দেখাশোনা করলে লাভ হবে মালিকের।

সরিতা বলল, এতদিন আপনি কোথায় ছিলেন মশাই! আহা দুনিয়ার সব কটা হোটেল যদি আপনার মত একজন করে ম্যানেজার পেত তাহলে তাদের পয়সা রাখার জায়গা থাকত না।

ইন্দ্র বলল, কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম। আমি এখন থেকেই তৈরী।

সরিতা বলল, কাজের মানুষেরা কাজের ভেতর থেকেই ছুটি বের করে নিতে জানে, যারা কাজ করতে জানে না তারা ছুটি ম্যানেজ করতেও জানে না।

ইন্দ্র বলল, জন্মে জন্মে যেন মেনন বোনদের মত মালিক পাই।

সরিতা বলল, তা বলে ভাববেন না আপনার মত কাজ পাগল ম্যানেজার আমি জন্মে জন্মে চাইব।

ইন্দ্র বলল, আমি ঠিক তিনটেতে তৈরী থাকব।

সরিতা বলল, আমি কিন্তু একটি মিনিটও দাঁড়াব না।

ইন্দ্র হেসে বলল, দাঁড়াবেন কেন হোটেলে বসার ভাল ব্যবস্থা আছে।

সরিতা বলল, ফোন রাখছি কথাটা মনে থাকে যেন। বস্যটসার ভেতর আমি নেই।

ইন্দ্র বলল তথাস্তু।

ফোন ছেড়ে দিল সরিতা।

(ক্রমশঃ)

পরিতোষ সেন

একালের চিত্রশিল্পী

সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে সত্তর দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা, তাদের সামাজিক দায়দায়িত্ব নিয়ে। এই বিতর্কিত প্রশ্নের জবাবে স্বপক্ষে বিপক্ষে নানা মুনির নানা মত। অনেকে আবার বক্তব্যের মারপ্যাচে বিষয়টিকে জটিল করে আসল প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গেছেন খোশের আঁড়ালে মুখ ঢেকে।

এ সম্পর্কে শিল্পী পরিতোষ সেনের উত্তর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। শিল্পী গজদন্ত-মিনারবাসী নয়। সমাজেই তিনি বসবাস করেন। সমাজজীবন থেকেই তিনি সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করেন। এমনকি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের হাসি কান্নাও অনেকটা নির্ভর করে সমাজের ভালোমন্দের ওপর। সুতরাং শিল্পীর অবশ্যই কতকগুলো সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে। তাকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ সমাজকে অস্বীকার করা।

এই উত্তর থেকে শিল্পী পরিতোষ সেনের শিল্পভাবনার মূল সুরটিকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। বোঝা যায় তাঁর চিত্রকল্প দাঁড়িয়ে আছে এক বলিষ্ঠ বিশ্বাসের ওপর, যা অত্যন্ত 'পজিটিভ'। সাধারণ মানুষের অন্তর ও বহির্জগতের বাস্তবিক জীবনচিত্রকে মানবদরদী শিল্পী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নিরীক্ষণ করেছেন এবং তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে চিত্রিত করেছেন অবক্ষয় ও হতাশার সকরুণ বেদনাশিক্ত ছবি।

এ প্রসঙ্গে তাঁর কয়েকটি ছবি নিয়ে আলোচনা করা যায়। এ্যাকসিডেন্ট পর্যায়ের চিত্রাবলীর মধ্যে মানুষের হিংসা, দ্বেষ, লোভ, কাম, ঈর্ষা প্রভৃতি আদিম প্রবৃত্তির প্রকাশ ও পরিণতির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। পোস্টেট অফ অ্যান অ্যানিম্যাল চিত্রে মানুষের জীবনের চরম দানবিক দিকটি দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'রোর অফ ওয়ার'-এ যুদ্ধের ভয়ংকরতা এবং তার দুঃখজনক ফলশ্রুতির নিষ্ঠুর মর্মান্তিক কাহিনী আত্মপ্রকাশ করেছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের পটভূমিতে রচিত অন্য একটি চিত্রে হিংস্র নৃশংসতার বিরুদ্ধে শিল্পীর তুলি তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে। 'আনডেড ম্যান'-এ যুদ্ধে নিহত রক্তাক্ত সৈনিকের আর্তনাদ শোনা যায়। এছাড়া আরও অনেক চিত্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পী অপরিসীম নিষ্ঠার মানুষের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, কালোবাজার এবং সংকটাপন্ন জনজীবনের কথা।

কলকাতা ফুটপাথের কিংবা বস্তী এলাকার অনেক অপাংক্তেয় অবহেলিত

চরিত্রের অন্তর্বেদনাও মুক্তিলাভ করেছে শিল্পীর তুলির আঁচড়ে। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের চারপাশের নিপীড়িত নির্জীতিত মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে হাতিয়ার করে পরিতোষ সেন শিল্পকলার রণাঙ্গনে লড়াই চালিয়েছেন সেই গ্রীক নাটকের দুঃসাহসী নিঃসঙ্গ নায়কের মত।

চল্লিশ দশকের গোড়ায় রচিত পরিতোষ সেনের চিত্রভাবনার সংবেদন ঐ একই সুরে বাঁধা। সেই সময়ে মানুষের তৈরী কৃত্রিম দুর্ভিক্ষে পশ্চিমবঙ্গে হতাশা ও হাহাকারের কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪২ সালে ককেজন শিল্পী তখন একই বেদনায় বিদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে তৈরী করলেন ক্যালকাটা গ্রুপ। বলাই বাহুল্য ভারতবর্ষে এই ধরনের শিল্পগোষ্ঠীর পত্তন এই প্রথম। কয়েক মাস পরে অনুষ্ঠিত এই গ্রুপের প্রথম চিত্র প্রদর্শনীতে অধিকাংশ শিল্পীর তুলিতে বাময় হয়ে উঠল যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, নির্যাতন ও ক্লেদবিদ্ধ যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের কথা।

পরিতোষ সেনের জন্ম ১৯১৮ সালের ১৮ই অক্টোবর ঢাকা শহরে। পিতা প্রসন্নকুমার সেন ছিলেন কবিরাজ। বাড়ীতে গানবাজনা বা পড়াশুনার প্রতিকূল পরিবেশ থেকে পরিতোষ পালিয়ে বাঁচতেন চার দেয়ালের বাইরে। তৎকালীন ঢাকায় মধ্যবিত্ত সমাজে শিল্প সংস্কৃতির পরিবেশ ছিল। যাত্রাগান, কথকতা, পাঁচালী, কবির লড়াই ও লোকশিল্পের সমাবেশ হত বারো মাসে তেরো পার্বন উপলক্ষে। ছাত্রাবস্থায় পরিতোষ সেন এই শিল্প সঙ্গীতের রস আহরন করতেন তন্ময় হয়ে তৃষিত চাতকের মত। স্কুলে সবচেয়ে প্রিয় ছিল ড্রইং ক্লাশ। আঁকতেও পারতেন খুব ভাল। ক্লাশে ছবি আঁকাতে তিনি বরাবরই প্রথম হতেন। বাড়ীতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন ড্রইং করে। তাঁর পেন্সিল স্কেচ তখনই তাঁর বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে মেট্রিক পাশ করে তিনি শিল্পী হবার সিদ্ধান্ত নেন। ইতিমধ্যে বাবার মৃত্যু হয়েছে। একান্নবর্তী সেন পরিবারের সবাই বাধ সাধলেন পরিতোষের কথা শুনে।

বিনা অস্ত্রোপচারে
অর্শের
জ্বালা-যন্ত্রনা
থেকে
দ্রুত আরাম
পেতে হলে
হ্যামেসা
মলম
ব্যবহার করুন!

ত্রিশ দশকের বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে ওরিজিন্যাল শিল্পকলা নিরীক্ষণের কোন উপায় ছিল না। কারণ আজকালকার মত এমন ব্যাপক হারে তখন চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হত না। ছবি দেখার স্বল্প সুযোগ ঘটত প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত রঙ্গীন আর্ট প্লেটের দৌলতে।

পরিতোষদার সঙ্গেও দেবীপ্রসাদ অঙ্কিত চিত্রাবলীর পরিচয় ঘটে এই প্রবাসীর পাতাতেই। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কি অদ্ভুত কাজ। প্রতিকৃতির প্রতিটি শিরা উপশিরা পর্যন্ত যেন জীবন্ত হয়ে ফুটেছে বলিষ্ঠ রেখার বিন্যাসে। শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে তখন অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের যুগ। এবং এঁদের অপরিসীম প্রভাব পড়েছিল উত্তরসূরীদের কাজে। তা সত্ত্বেও দেবীপ্রসাদ এই জোরালো প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন শৈলী ও চিত্রকল্পে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এই বিষয়টিই পরিতোষদাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। এবং তিনি দেবীপ্রসাদের কাছে শিল্পশিক্ষা নেবার জন্যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজ যাত্রা করেন। দেবীপ্রসাদ তখন মাদ্রাজের সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ।

সেই সময় থেকেই শিল্প ছাড়াও সৃষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা ও আকর্ষণীয় মাধুর্যের জোরে দেবীপ্রসাদ 'লিজেন্ডারী' ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি পরিতোষদা শিল্পীজীবনে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এই অমর শিল্পীর শিল্পকলায়।

মাদ্রাজ কলেজে ভর্তি হয়ে পরিতোষদা পেলেন, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাসগুপ্ত, সুনীল মুখার্জী, কালীকিঙ্কর ঘোষদস্তিদার প্রমুখ কলকাতার বহু কৃতী ছাত্রকে। এঁদের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। কারণ আজকে এঁরা সবাই যশস্বী এবং সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পী। যাই হোক এঁদের অনেকের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল পরিতোষদার। কলেজে মডেল স্টাডি এবং যন্ত্র-তন্ত্র ঘুরে স্কেচ করা ছিল প্রাত্যহিক কাজের প্রধান অঙ্গ। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন চরিত্রকে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখা এবং রূঢ় বাস্তবকে আন্তরিকভাবে অনুভব করার ক্ষমতাও জন্মেছিল এই সুবাদে।

পরিতোষ সেন অঙ্কিত একটি চিত্র প্রবাসীর পাতায় এই সময়ে মুদ্রিত হয়। এবং রসিকজনের কাছে তা খুবই সমাদর পায়।

পরবর্তীকালে তিনি যামিনী রায়ের চিত্ররূপে আকৃষ্ট হন। তাঁর চিত্রে রং ও রেখা এবং চিত্র বর্ণন পদ্ধতি শিল্পীর সামনে এক নতুন রূপকথার দরজা খুলে দেয়। চিত্রের চরিত্রগুলো ঠিক বাস্তবানুগ রীতিতে রচিত নয়। অথচ সেই চরিত্রগুলোর অস্তিত্বের স্পষ্ট সংবাদ রয়েছে চিত্রফলকে। এই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হওয়ার ফলে ১৯৪০ সালে পরিতোষ সেনের অঙ্কন বিন্যাসে বিবর্তন আসে।

১৯৪০ সালে ডালী কলেজে শিল্প শিক্ষকের চাকরী নিয়ে শিল্পী চলে যান ইন্দোরে। কলেজের ইংরেজ প্রিন্সিপ্যাল-এর একটি ছোট সংগ্রহশালায় ভ্যানগগ, গঁগা, সেজান প্রভৃতি পৃথিবী বিখ্যাত চিত্রকরদের চিত্রের প্রতিলিপি সংরক্ষিত ছিল। এইসব চিত্রদর্শনে পরিতোষ সেন মডার্ন আর্টের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হন।

চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের চেহারা বিদ্যুৎ চমকের মত আকস্মিক ভাবে বদলে যায় ম্যানমেড ফেমিন, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের ফলে। ভারতবর্ষ ভরে যায় বিদেশী সৈনিক ও সামরিক কর্মচারীতে। শিল্পরসিক সামরিক লোকেদের অনেকের সঙ্গেই শিল্পীর বন্ধুত্ব হয়। তাদের মুখে শোনেন তামাম ইউরোপের শিল্প সংবাদ। বিউটিসম, ইমপ্রেসেনিজম, ফিউচার মুভমেণ্ট প্রভৃতি শিল্প আন্দোলনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন। যেসব প্রশ্ন প্রস্তরে খোদিত কঠিন অক্ষরের মত বুকে বাসা বেঁধেছিল তা স্বচ্ছ জলের মত সহজ হয়ে গেল বিদেশীদের সঙ্গে সেখানকার শিল্প বিপ্লব সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে।

সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিল্পে যে অনেক কিছুর অভাব ছিল তার জন্যে অতৃপ্তি বেড়ে গেল। ভারতীয় শিল্পঐতিহ্যে যেসব চিরন্তন গুণাবলী ছিল সে বিষয়েও সচেতনতা বৃদ্ধি পেল। আর্টের সঙ্গে আবেষ্টনীর যোগাযোগ কম মনে হল।

চিত্রকল্পনায় বাস্তব জীবনের সঙ্গে যোগ প্রায় ছিল না বললেই চলে। কারণ তখন

রামায়ণ, মহাভারত, বেদ পুরাণকে অবলম্বন করেই চিত্রভাবনা মুক্তি পেত। অন্য আস্বাদের ছবির মধ্যে ওম্যান ইন টয়লেট, সিল্কবসনা নারী, নারীর নগ্নরূপ, ফুল বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী কিংবা রাজা মহারাজাদের প্রতিকৃতিই ছিল ছবির মূল বিষয়বস্তু। অর্থাৎ বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্গে চিত্রভাবনার যোগ অতি সামান্য থাকায় শিল্পীর মনে এমনিতেই একটা জিজ্ঞাসা কাঁটার মত মনের অবচেতনে বিঁধে ছিল। তার ওপর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ কালোবাজারী ইত্যাদি ঘটনা সে সময়কার বুদ্ধিজীবী সমাজে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল। পরিতোষ সেনের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল সোসাইটিতে আর্টিস্ট এ রোল সম্পর্কে। এই প্রশ্ন ও বেদনাবোধ থেকেই মূলত জন্মলাভ করেছিল ক্যালকাটা গ্রুপ। শিল্পী তার কাজের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ সাধন করলেন।

কোন বক্তব্য জোরালো ভাবে বলতে গেলে তার আগে হাতিয়ারগুলো শানিয়ে নিতে হয়। তাই শিল্পী সারা পৃথিবীর শিল্পকলা দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। ভাবলেন বিদেশে যাবেন। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ করার উপায় ছিল না। কারণ তাঁর আয় ছিল অতি সামান্য।

তবুও সাহস করে জাহাজের টিকিট কিনে পাড়ি দিলেন প্যারিসে। সেখানে নানা বাধা-বিপত্তির কাঁটাতার পার হয়ে শিল্পশিক্ষা শেষ করে পাঁচ বছর পর ফিরে এলেন স্বদেশে।

প্যারিসের পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা শিল্পীর জীবনে এক নতুন পথের সন্ধান এনে দেয়। শিল্পশিক্ষা ও শিল্প দর্শন ছাড়াও তিনি পৃথিবীবিখ্যাত কয়েকজন মনীষীর সংস্পর্শে আসেন। তার মধ্যে ব্রাক প্রাকুশী পিকাসো—প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ব্রাকুশীর জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে। অত বড় শিল্পী অথচ কি সাদাসিধে ব্যবহার। শিশুর মত সরল কথাবার্তা। আমাদের দেশে কেউ একটু বড় হলেই সাধারণত মেজাজ, ব্যবহার এমন বদলে যায় যে বলবার নয়। পিকাসোরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা করে পরিতোষ সেন এক অজ্ঞাত শিল্পলোকের সন্ধান পেয়েছিলেন। নিজের কাজও দেখিয়েছিলেন। পিকাসো উৎসাহবাণী তাঁকে চলার পথে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল অনেকখানি।

কিন্তু শেষ বেশ পরিতোষদা বুঝলেন কিছু করতে গেলে দেশের বাইরে থেকে করা সম্ভব নয়। শিল্পী হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে দেশের আলো মাটি আকাশ বাতাসের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ দরকার। ফিরে এলেন দেশে।

দেশকে নতুন চোখে দেখার ফলে কাজে নয়া দৃষ্টিভঙ্গি দেখা দিল। নিত্যনতুন ফুটপাতের নাগরিক বিকাশ এইসব নীচুতলার থেকে থাওয়া মানুষের অপরংক্তের

ড্রইং : পরিতোষ সেন

চরিত্র এল ছবিতে। মোটামুটি ছবির বক্তব্য হয়ে গেল শহরকেন্দ্রিক ও জীবনমুখী।

১৯৫৭ সালে পরিতোষ সেন দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ করেন। ১৯৬২ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত শিল্পীর চিফ প্রদর্শনী খুবই সমাদর লাভ করে। ভারতীয় রাগ রাগিনীর ওপর অঙ্কিত এই চিত্রমালার প্রতিটি কাজ সাংগীতিক ছন্দময়তায় রসাসৃত। এই সময়ে শিল্পী বিমূর্ত চিত্রকলা, হিন্দু দর্শন সেতারের সুর ঝঙ্কার এবং সত্যজিৎ রায়ের লিরিক ধর্মী চলচ্চিত্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। ১৯৬৪ সালে দেশে ফিরে এসে শিল্পী শিল্প সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। এবং ১৯৬৮ সালের চিত্র প্রদর্শনীতে মানুষের দুঃখ ক্ষোভ হতাশা অবক্ষয়ের আধাদীর্ণ দিকটি প্রস্ফুটিত করেছেন অপরিসীম আন্তরিকতায়। দি হিউম্যান কন্ডিশান দি ফল ম্যান ডিসেন্ডিং এই সব ছবিতে শিল্পীর অসাধারণতা সুস্পষ্ট। দি সরোদ প্লেয়ার ও গুলাম আলী খান চিত্র দুটিতে যেন সুরের বিস্তারে শিল্পী এক স্বর্গীতের মোহিনী মায়াজাল রচনা করেছেন।

১৯৭৩ সালের শিল্পীর আর একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে। শিল্পীর সাম্প্রতিক চিত্রভাবনায় ফুটে উঠেছে চারপাশের শোকাতুর রক্তশ্বেদকাতর মুখের প্রতিচ্ছবি। শ্রবণ তিনি বিশ্বাস করেন চারপাশের দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। তাঁর বলার নিজস্ব ভাষা আছে। বক্তব্যকে জোরালো করতে গিয়ে কোথাও ছবির ভাবকে তিনি হারিয়ে ফেলেননি।

আগামী দিনের শিল্পকলা সম্পর্কে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করলে পরিতোষ সেন কপাল কুঁচকে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলেন—ছবি আঁকতে উৎসাহ মোটেই পাই না। কারণ যে সমাজে ছবি আঁকি সেখানে ছবির কোন স্থান নেই। এটা ফাঁকির যুগ। তবে ফাঁকি দিয়ে মহাকালের পাতায় টিঁকে থাকা যায় না। ছবি আঁকার জন্যে এখনও যেটুকু অনুপ্রেরণা পাই তার উৎস জীবন। নিজের এবং সমাজের। আমার কাছে সমাজ মানে গোটা পৃথিবীটা। প্রাত্যহিক জীবনের ক্লান্তিকর কেদাক্ত অভিজ্ঞতা আমার যন্ত্রণা দেয় দিনরাত। তাকে চিত্ররূপ দেওয়ার কথা ভাবছি। ফাঁকিবাজি করে নয়। তার জন্যে সাধনাও করছি প্রাণপণ। সাধনা না থাকলে যে সরস্বতীর বর পাওয়া যায় না।

একটু থেমে শিল্পী আবার বলেন—প্রত্যেক মানুষের কতকগুলো ভ্যালুজ থাকে। যেসব ভ্যালুজ তার অন্তর্জগতে অতি প্রিয়। এবং তার কাজের মাধ্যমে সেই মূল্যবোধগুলোর রূপায়ণ ঘটে। আজকের দিনে আর্টিস্ট-এর পক্ষে শুধু রং তুলি ঘাঁটাই যথেষ্ট নয়। তার নিজের মন এবং বুদ্ধিকে সমৃদ্ধ করার দরকার। সেটা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রচুর পড়াশুনা করা এবং চোখ কান সচেতনভাবে খুলে রাখা। তাছাড়া অন্যান্য জিনিষ, যেমন—নাটক চলচ্চিত্র সঙ্গীত সাহিত্য বিজ্ঞান এসবের প্রতিও সচেতন দৃষ্টি থাকা চাই। আমার নিজের ধারণা আমার উৎকৃষ্ট কাজ এখনও হয়নি। এবার হবে এবং সেই আশায় আমি দিন গুনছি।

প্রশান্ত দাঁ

মুকেশ

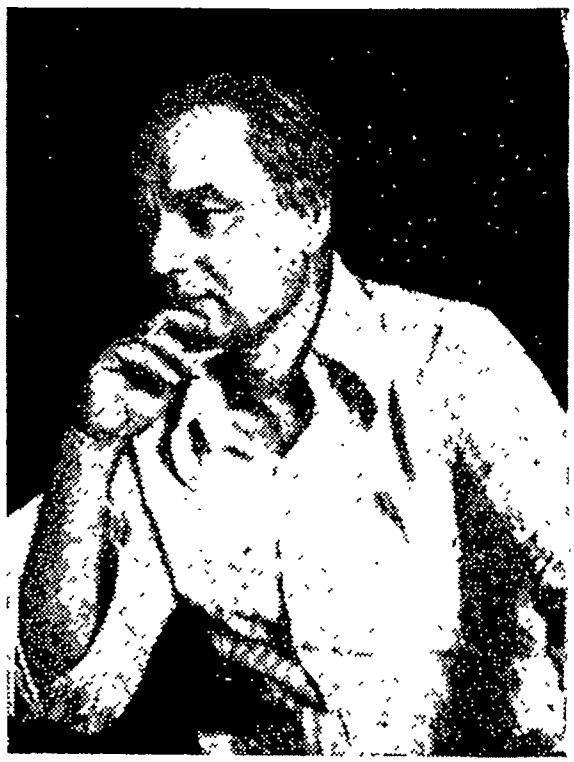

পংকজ মল্লিকের কণ্ঠের পৌরুষ, ওজস্, মিষ্টিক চার্ম সঙ্গীতের গভীরে প্রবেশ করার অসামান্য শক্তি সব মিলিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সঙ্গীতচেতনা—এ বস্তুর কাছে মাথা নত না করে আমার উপায় ছিল না...পংকজ মল্লিক ইজ এ ফ্যানটাস্টিক পার্সোনালিটি টু মি।

টকটকে রং। চোখ দুটি বিশাল নয়। ভাসাও নয়। ঈষৎ অনুপ্রবিষ্ট কিন্তু স্বপ্নময় কথা বলার সময় মৃদু হাসি—সব মিলিয়ে সৌম্য শান্ত ভাবুক মানুষটি গ্রীক সৌন্দর্যকে মনে করিয়ে দেয়। আলাপ হতে না হতেই মনে হোলো যেন কত আপনার জন। সারা ভারতের চিত্রজগতের এক অনন্য সংগীত-ব্যক্তিত্ব মুকেশ তাঁর গানের মতই মধুর এবং হৃদয় ছোঁওয়া। আর এ সবের চেয়েও অনেক বেশি আকর্ষণীয় হোলো ওঁর অন্তর্মুখী শিল্পী চিত্ত। মুকেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হচ্ছিলো যেন বোদেপোড়া সিমেন্টের পথ অসংখ্য আকাশ ছোঁয়া ঘরবাড়ী থেকে অনেক অনেক দূরে বটের শীতল ছায়ার নিচে আসনে, আকাশ ঘন সবুজের প্রতিবিম্বিত বিরাট হ্রদের ধারে বসে আছি। ওঁর চিন্তাশীল দার্শনিক মনটির তুলনা একমাত্র শান্ত নিস্তরঙ্গ হ্রদ।

এখানকার হাজারো কর্কশ কোলাহলের মধ্যেও মুকেশ যেন এক শান্ত সমাহিত প্রশান্তি নিয়ে বসে আছেন। দেখছেন সব। বুঝছেনও। এখনকার স্বার্থান্ধ নির্মম বৃত্তিতা সীমাহীন ক্ষুদ্রতায় সংগীত জগৎ বিক্ষত। স্বপ্নময়তা সেইজন্যই অন্তর্হিত। চিত্তে তাই জাগে না কোনো মহৎ ধ্যানের অনুভব। কিন্তু তার জন্য তাঁর আক্ষেপ নেই। কারো প্রতি অভিযোগও নেই। নেই কোনো উন্মাসিক অবজ্ঞা। সকলের প্রতি সংবেদশীল মন নিয়ে আপন ধ্যানের অতলে যেন মগ্ন আছেন আত্মভোলা মানুষটি। নিজেকে গদ্যময় পরিবেশ ও পটভূমিকার বিপরীত প্রমাণ করার দুর্জয় প্রতিজ্ঞা নিয়েই যেন মুকেশের জন্ম। শৈশব কেটেছে দিল্লীতে। বাড়ীর সবাই বড় সরকারী চাকুরে। গান কেউই গাইতেন না। অথচ মুকেশের মনে বড় চাকুরে হবার উচ্চাকাঙ্খা এতটুকুও জায়গা পায়নি। হৃদয়ভরা গানের ধ্যান এবং সুরভরা কণ্ঠ নিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়েই কেটেছে মুকেশের শৈশব ও কৈশোর।

তারপর এলাম বোম্বে। তখনও প্লে-ব্যাক সিস্টেম চালু হয়নি। আমি প্রথমে সিনেমার নায়ক হিসেবেই ছবিতে যোগ দিয়েছিলাম। নলিনী জয়ন্তের বিপরীতে 'নির্দোষ' ছবিতে। খুব সম্ভব ১৯৩৯ সাল সেটা। রূপোলী পর্দার নায়ক থেকে অন্তরালের গায়ক হয়েছিলাম অনেক পরে।

কিন্তু অন্তরালের গায়ক হবার আগেও ত একটা প্রস্তুতিপর্ব ছিলো শিক্ষা ও রেওয়াজের

শিক্ষা ও রেওয়াজের পালা সুরু হয়েছিল প্লে-ব্যাক সিংগার হিসেবে ছবিতে যোগ দেবার পরে। তার আগে নয়।

একালের গান

বাড়ীতে অথবা পরিবারে যদি গানের চল না থেকে থাকে কোনো একজনের গান শুনেই ত আপনার অন্তরও গান গেয়ে উঠেছিল সে গান কার?

আমার কল্পনাকেও হার মানিয়ে নিয়ে জবাব এলো পংকজ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র দে কে এল সায়গল—মেগাদেব মধ্যে কানন দেবী।

সে কী? সীমাহীন বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি এঁরা সবাই-ই ত কোলকাতার মানে তদানীন্তন বাংলাদেশের শিল্পী। আর কোনো মনের মত গাইয়ে বোম্বে ফিল্ম ইনডাস্ট্রিতে বা তার বাইরে ছিলেন না?

নিউ থিয়েটার্সের চেয়ে বড় চিত্র প্রতিষ্ঠান তখন সারা ভারতবর্ষের কোথাও ছিলো না এ্যান্ড নিউ থিয়েটার্স ওয়াজ দি মাইন অফ আর্ট মিউজিক। আর্টিস্টস ক্যামেরাম্যান ডিরেকটর এমন্ড হোয়াট নট? নিউ থিয়েটার্সের নীতিন বসুই প্রথম প্লে-ব্যাক প্রথা ইনট্রোডিউস করেছিলেন। এবং এই প্রথা একবার চালু হবার সংগে সংগে চিত্রজগৎ যেন লুফে নিলো। কারণ প্লে-ব্যাক সিস্টেম আসার ফলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে গেলো এবং চিত্রনির্মাতারা ছবির আকর্ষণ বাড়াবারও একটা রাস্তা পেলেন।

আমি পংকজবাবুর কাছে শুনেছি এ কাহিনী। পংকজবাবুই আপনার ফার্স্ট হিরো বলছেন?

অফ কোর্স। হি ওয়াজ ফ্যানটাসটিক মাই হার্ট পিয়ার্সিং টু মি সব মোর দ্যান ওয়ান রিজন। ফার্স্টলি আই হ্যাড

নেভার হার্ড সাচ এ ভয়েস অফ ম্যাসকুলাইন ভিগার।

সেকেন্ডলি এ মিসটিক চার্ম ইন হিজ থ্রবিং ভয়েস। অ্যান্ড অ্যাবাভ অল ইজ হিজ অ্যাচটাউনডিং পাওয়ার অফ ড্রাইভিং ডিপ ইন টু দি সাটেলনেস অফ মিউজিক। মানে পঙ্কজ মল্লিকের কণ্ঠের পৌরুষ ওজস মিষ্টিক চার্ম সংগীতের গভীরে প্রবেশ করার অসামান্য শক্তি সব মিলিয়ে তাঁর পরিপূর্ণ সংগীত চেতনা এ বস্তুর কাছে মাথা নত না করে আমার উপায় ছিলো না।

যথার্থ শিল্পীমনের বিশ্লেষণ। ভারী সুন্দর বলেছেন! বলুন না অন্য তিনজন শিল্পীর সম্বন্ধেও। কেন তাঁদের গান ভাল লেগেছিলো?

চিন্তা গভীর মুখে এসে পড়ে মৃদু হাসির ছোঁয়া।

কৃষ্ণচন্দ্র দের কীর্তনাংগের এবং আধ্যাত্মিক ভাবাশ্রিত গানের তুলনা নেই। বিশেষ করে কীর্তনের মধ্যে যে ড্রামা আছে তার সবস ও সূক্ষ্ম ভাবের মর্মদ্রাবী প্রকাশ ঘটেছে কৃষ্ণচন্দ্র দের গানেই। কীর্তন শুনেছি অনেক নামকরা কীর্তনীয়াদের কাছে। কিন্তু যতই সুকণ্ঠের অধিকারী হোন না কেন কীর্তন কিছুক্ষণ শোনবার পর একটু মনোটনি লাগেই।

আমি এ বিষয়ে আপনার সংগে একমত।

থ্যাঙ্কু। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র দের পালাকীর্তনে কখনও এটা হোতো না। তার কারণ ওঁর গানের বিরাট ক্লাসিক্যাল পটভূমিকা। নানা-রকম রাগ ধ্রুপদ ধামারের ছন্দ ভাব মিলিয়ে উনি কীর্তন ঘেঁষা গানে এমন রস সঞ্চার করেছেন যাকে ওঁরই সৃষ্টি বলা যায়।

সায়গল? লিরিক্যাল বিউটি আবেগ সজল করুণ মাধুর্য—এই ত্রিধারার মিলনে সায়গলের গান যেন বুকের তলার গান হয়ে উঠতো। এ গানে সাড়া না দিয়ে উপায় কি?

কানন দেবীর গলা? ঠোঁটের কোণে আবার মৃদু হাসির আভাস।

চট করে বিশ্লেষণ করা মুস্কিল। ভৈরবী গর্জিয়াস ভয়েস। সুর ভলুম ভাব ভয়েস থ্রো সবই আছে। যখন ওপরের পর্দায় উঠতেন ওর কণ্ঠে কেমন একটা সিম্ফনী অর্কেস্টার মত বেজে উঠতো। তার আলাদা একটা মাদকতা ছিলো। এ জিনিস আর কোথাও পাইনি।

এই সব শিল্পীদের ভাবভাষায় গড়ে উঠেছে মুকেশের সুকুমার পেলব আর স্পর্শকাতর সংগীতমানস। এই ত গত মঙ্গলবারেই কলামন্দিরে মুকেশের কণ্ঠে শুনলাম সিস সেশনের গংগা সতীর হাত সংসারে কলি কলি এবং দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর প্রথমের সুরের ছবির গান। এ গানে নেই ক্ষিপ্রগতির চমক উত্তেজনা কোলাহল। বিলম্বিত লয়ের পরিবর্তে অনাড়ম্বর সহজের ধারে ধীরে এগোন। প্রতিটি কথার উচ্চারণ ধ্বনির তারতম্যই সুর দোলা দেয় মর্মে। এমন স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন এ গানকে এমন স্নিগ্ধ ছোঁওয়া করে তুলেছিলো। এ গান আত্মগত নিজেরই সংগে যেন কথা বলা কি আরও বেশী। গানের আলোয় হৃদয়কে দেখার আকুলতা। এ ব্যাকুলতা যেন প্রার্থনার মত ভগবানকে ছুঁয়ে আসে, এই চুপি চুপি কথা বলার ঢংই মুকেশের নিজস্ব ঢং। প্রকাশভংগির এই অন্তরমুখীন রূপই মুকেশকে চিনিয়ে দেয়।

ওঁর প্রথম প্লে-ব্যাক করা গান মতিলালের পহেলী নজর ছবির চারখানি গান। প্রতেকটি গানই জনপ্রিয় হলেও বেশী হিট করেছিলো দিল জ্বলতা হ্যায় অনিল বিশ্বাসের সুর ও সংগীত পরিচালনা।

তারপর অল ইন্ডিয়া ফেম অর্জন করেছে আওয়ারা বরসাত শ্রীফোর টোয়েন্টি সংগম ইত্যাদি আর কে ফিল্মের ছবিতে।

আওয়ারা ছবি আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তার স্তরে পৌঁছেছিলো। চৌ এন লাই ভারতবর্ষে এসে দিল্লীতে মুকেশজীকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মাত্র আওয়ারা হুঁ তাঁর স্বকণ্ঠে শোনবার জন্য। ফিল্মের গানে প্রথম যুগের বনকী চিড়িয়া অংগান আওর জবরমিয়া, পিয়া মিলনকো যানা-র মতই প্রোডাকটিভিটি পপুলারিটি ছিল আওয়ারার গানের। বাশিয়াতে আওয়ারা হুঁ গানটির সোভিয়েট ভার্সন বার করেছিলো।

রাজকাপুরের সংস্পর্শে এসেছিলাম রঞ্জিৎ ফিল্মসে কাজ করবার সময় থেকে। আমরা ওখানে ছিলাম সতীর্থ। পরিচালক কেদার শর্মার অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলো রাজ-কাপুর আমি প্লে-ব্যাক সিংগার। ও বরা-বরই খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর মৌলিকতা ভালবাসতেন। ওর চিরকালের ঝোঁক ছিলো নিজে প্রোডাকসন করবে আর সেখানে থাকবে। সব এক নম্বরের শিল্পীরা। গানে অভিনয়ে প্রেজেনটেশনে ওর ছবি সেনসে-শন জাগাবে সারা পৃথিবী তোলপাড় করবে। এইটেই ছিলো ওর শ্রৌবনের স্বপ্ন। এ-স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটবার সুযোগ যখন এলো ও এতটুকুও অপচয় ঘটায়নি। দুর্দমনীয় শক্তিতে এগিয়ে চলে-ছিলো। শিল্পী প্রোডিউসার ডিরেকটর সবদিক দিয়ে এমন অল-রাউন্ড ট্যালেন্ট খুব কম দেখা যায়। ওর কণ্ঠে আমার গান খুব মিলেছিলো। সকলে নিয়েছিলো আর আমার জনপ্রিয়তা চরমে পৌঁছেছিলো এইসব গানেই।

'মধুমতী' ছবিতে সলিল চৌধুরীর সুরের গানগুলিও অসম্ভব পপুলার হয়েছিলো।

'শাওন কি নিজানে' গোলাম হায়দর ছিলেন সংগীতস্রষ্টা। বালসারা ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট। এ-ছবির গানও ভারতজোড়া জনপ্রিয়তার লেভেলেই ছিলো। শিল্পীকে একটু অনামনস্ক। তারপর সেই স্নিগ্ধ হাসির মৃদু লয়ে বললেন যে কোনো শিল্পীর ভাগ্যেই এটা ঘটে। এক-একটা সময় আসে যে তার প্রতিটি শিল্পকৃতিতেই থাকে যেন বিধাতার আদরের ছোঁওয়া।

আপনার গান শুনলেই বোঝা যায় ক্লাসিক্যাল বেসিস খুব সাউন্ড। অথচ আপনি বলছেন ছবিতে গাইবার পর গাইতে শিখেছেন। যাঁর কোনোই শিক্ষা নেই তাঁকে দিয়ে ছবির কর্তাব্যক্তিরা এমন স্ব ইম্পর-টেন্ট ছবির গান গাওয়াবার সাহসই বা করতেন কেমন করে?

আত্মভোলা দার্শনিক. দার্শনিক মুখে আবার সেই মৃদু হাসির নীলাভ আলো।

সন্ধ্যা, যাঁদের নাম বললাম—তাঁদের গান সম্বন্ধে ত তোমার আইডিয়া আছে?

আছে?

আচ্ছা, ঐসব গান থেকে যদি কোনো অল্পবয়সী ছেলের সংগীতচেতনা জাগে এবং সে অল্প বয়সেই ঐসব গান গাইবার চেষ্টা করে তবে সেই চেষ্টা থেকেই তার গলা খানিকটা তৈরি হয়ে যায় না কি?

যায়।

আর কোনো গুরুই যখন সামনে থাকেন না অথচ মনে জাগে গান গাইবার দুর্বার আবেগ তখন সেই আবেগই তাকে গুরুর মত পথ দেখায়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন, তোমার অনুমান ভুল নয়। নিয়মিতভাবে ক্লাসিক্যাল যে শিখিনি তা নয়।

ক্ষেমচাঁদ প্রকাশজীর ছোটো ভাই জগন্নাথ প্রসাদজীর কাছে বেশ কয়েক বছর আমি রাগসংগীত শিখেছিলাম। আর রেওয়াজে একদিনের জন্যও ফাঁকি দিইনি কারণ ঐটেই ছিলো আমার জীবনের সত্যি-কারের আনন্দ, নিজেকে খুঁজে নেবার দুর্লভ অবকাশ।

আপনার প্রিয় রাগ?

সবই। বিশেষ করে কেদার ও ভৈরবী। একটা হচ্ছে আনন্দের উচ্ছ্বাস অপরটি যেন সকল অনুভূতির মিলনসংগম। ভক্তি প্রেম রোমান্স বিষণ্ণতা উল্লাস আত্মনিবেদন—কি নেই এতে? ভৈরবীর মত কালোবাফুলে রাগ বুঝি আর নেই।

আর একলা বসে আপনমনে গাইবার রাগ হোলো দরবারী কানাড়া। এ-রাগ অপরকে শোনাবার নয়। নিজের বাথার জায়গাটায় নিজে হাত ছোঁয়ানোয় যে তৃপ্তি,

রবীন্দ্র গীতায়ন

পি-২৪৭, সি আই টি রোড, কলি-১০
(বি সরকার মার্কেটের সামনে)

শিক্ষাবর্ষ : জুলাই-জুন

৩০ বছরের অভিজ্ঞ বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সংগীত ও রাগসংগীত বিশেষজ্ঞ স্বারা পরিচালিত প্রাথমিক হইতে উপাধি পাঠক্রমসহ অভিজাত শিক্ষায়তন। বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

অনুসন্ধান :
সাথী বসু, গীতশ্লোকা
শনিবার বিকাল ৬—৮
রবিবার সকাল ৮—১২ ও বিকাল ৪—৬

সেই তৃপ্তিই মেলে দরবারী কানাড়ার কাছে।

আপনি ত গজল মাস্টারও?

গজল আমার খুব প্রিয় কাব্যসৌন্দর্য এবং সুরের নিবিড় আত্মহারা ভাবের জন্য।

আপনি ১৯৪১ সাল থেকে শুরু করে আজ অবধি একটানা ৩৫ বছর ধরে শীর্ষস্থানীয় প্লে-ব্যাক গায়ক। এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গানের গতি-প্রকৃতির বারবার পরিবর্তন ঘটেছে নিশ্চয়?

ও সিওর। প্রতি পাঁচ-ছ' বছর অন্তর সিনেমার সঙ্গে সঙ্গে গানেরও মেজাজ পাল্টায়। ইউ আর এ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। প্রথমের দিকে মেলডিই ছিলো গানের প্রাণ। কিসমৎ বন্ধন আওয়ারা—সুরের মধুরতায় এ-যুগের গান শ্রোতাদের মন টানতো। আর একটা আকর্ষণ লিরিকধর্মিতা। এ-যুগের যাঁরা সুরকার—ক্ষেমচাঁদ, অনিল বিশ্বাস তাঁদের সুরের নকশা ছিলো ক্ল্যাসিক্যাল-ঘেঁষা।

তারপর গানের চরিত্র বদলালো। শ্রীরামচন্দ্র, নৌসাদ, শংকর জয়কিষণ এঁদের সুর অত বেশী ক্ল্যাসিক্যাল নয়। লিরিক্যাল আসপেকটও অত জোরালো নয়। কিন্তু ভারী মেলডিয়াস। সুরের আবেদন হৃদয়ে পৌঁছাতো আপন ধর্মেই। কারণ এঁরা সবাই সত্যিকারের গুণী। সংগীতচেতনা এঁদের হৃদয় জুড়ে। তবু বলব আত্মমগন সুরকারের অন্তর থেকে উৎসারিত সুরের নিবিষ্টতা এখানে অনেকটাই অন্তর্হিত। এ-যুগের সংগীত-রচয়িতা যেন জনসাধারণের মেজাজমাফিক করে সংগীতের ছাঁদ গড়তে চান। সুরের গতিটা বহির্মুখী হলেও, সংগীতবোধসম্পন্ন সুরকারের কল্পনার রং ছিলো বলেই এ-গান জাতচ্যুত নয়।

তারপর ছবিতে একটা মস্তবড় জায়গা জুড়ে রইলো ভায়োলেন্স, সেকস হুড়োহুড়ি মাতামাতি। ভারসাম্যহীন অস্থির যুগ। অগত্যা সেইসব ছবির মেজাজের সঙ্গে তাল ঠুকে সংগীতও পৌঁছালো সেই পর্যায়ে যাকে সংগীত না বলে 'কোলাহল' বলাই সঙ্গত।

মেলডি একেবারেই ছিলো না?

কেমন করে থাকবে? হাউ ক্যান ইউ কম্পোজ মেলডি ফর পিক্চারস অফ সেকস এ্যান্ড ভায়োলেন্স? দেয়ার মেন কনসার্ন ওয়াজ টু স্টিমুলেট এ্যান্ড গিভিং সাম ডাইনামিজম টু ইট।

এসব একসপেরিমেন্টাল ছবির এ্যাকশন মিউজিক কিছুক্ষণের জন্য ভালো লাগতে পারে বাট দে ক্যান নেভার বিকাম এভারলাস্টিং। পাঁচ বছর বাদেই লোকে এসব গান ভুলে যায়। কিন্তু পঙ্কজ মল্লিক কৃষ্ণচন্দ্র দে সায়গল, কানন? আহা। এঁদের গানের আকর্ষণ চিরকালের। কারণ এসব গানের সৌন্দর্য অফুরান।

কীর্তনের ধুয়োর মত ঘুরেফিরে বারবার ঐ চারটি নামে এসে শিল্পী দাঁড়াচ্ছেন বিশেষ করে পঙ্কজ মল্লিকের ওপর জোর দিলে।

ওঁদের আপনি ভুলতে পারছেন না। না?

কি করে ভুলি? কোনো সিরিয়াস-মাইন্ডেড শিল্পীই ওঁদের ভুলতে পারবেন না। দিনে দিনে গান যত হাল্কা হয়ে উঠতে লাগলো মনটা তত বেশী করে স্রেন ওঁদের গানের মধ্যে আশ্রয় পেতে চাইলো। যত দেরীতেই বাড়ী ফিরি, যত ক্লান্তই থাকি, একবার করে ওঁদের রেকর্ড আমার শোনা চাই। ক্রমে জপমালার মত মনের কোণে ঘুরত একটিই মন্ত্র যা ধ্রুব, যা শাশ্বত, তাঁকে একদিন না একদিন ফিরে আসতেই হবে।

আপনি নিজে কোনো ছবির প্রযোজনা করেননি?

করেছিলাম সাত বছর আগে। 'অনুরাগ'। ঊষাকিরণ ছিলেন হিরোইন। সংগীত পরিচালনা করেছিলাম আমিই আমার গাওয়া একটি গান 'ইয়াদ রাখো'। ফিমেল ভয়েসের গানগুলি লতার।

ছবিটি তখন কতকগুলো কারণের জন্য রিলিজ হয়নি। এখন ত আর হবার কোনো চান্সই নেই।

কারণ ওটা কালার পিকচার নয়। ব্ল্যাক এ্যান্ড হোয়াইট।

অত পরিশ্রম, অর্থব্যয় সবই বৃথা গেলো?

স—ব বৃথা গেলো।

ওঁর বলার ধরণ দেখে মনে হোলো ব্যর্থতা সার্থকতা দুই-ই ওঁর কাছে সমান। মুকেশের এই ফিলজফিক টেম্পারামেন্টটি আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। এই দার্শনিক মনের ছোঁওয়াই বুঝি ওঁর গানকে এমন গভীর ও অন্তর্মুখী করেছে।

সিনেমায় লোক কেবলই পরিবর্তন চায়। নতুন থেকে আরও নতুন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখলে নৌসাদ, শংকর জয়কিষণ, আর ডি সুপার একস কম্পোজার অফ দি সেঞ্চুরী।

ফিল্ম মিউজিক অথবা তার বাইরে আধুনিক গানে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ব্লেন্ডিং সম্বন্ধে আপনার কি মত?

ব্লেন্ডিং না স্টিলিং?

এবার আর মৃদু হাসি নয়, একেবারে দুষ্টু হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে। কৌতুক-ঝিলিকে চিন্তাশীল চোখ দুটি আলোকিত হয়ে উঠে কি সুন্দর যে দেখায়। যেন সমুদ্রের বুকে বিদায়ী বিকেলের গৈরিক আলোর ছটা। মেশানো কি যায়? দুটো যে দু' জাতের জিনিস। তবে হ্যাঁ, কোনো গান বা সুরের কার্বন কপি করে বিশেষ সিচুয়েশনে প্রয়োগ করলে মাঝে মাঝে উৎরে হয়তো যায়? কিন্তু তার স্থায়িত্ব কতটুকু? ছায়া ছায়াই। সে কখনও কায়ার মর্যাদা পেতে পারে না। ক্ল্যাসিক সুরের ব্যাপ্তির সঙ্গে এর তুলনা হয়? ধর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র। এঁদের নভেল নিয়ে যদি ছবি হয় তবে গানের সুরে অথবা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের সুর কি খাপ খাবে? কিন্তু ওঁদের দেশের এই রকম রবণীয় কবি বা সাহিত্যিকদের ওয়ার্কস যদি ছবি হয় তাহলে ভৈরবী, বাহার কাফী কানাড়া যে-কোনো রাগ অনায়াসে বক্তব্যের সঙ্গে খাপ খেয়ে যাবে।

সেইজন্যেই ত বলছিলাম ইণ্ডিয়ানস সুড বি মোর ইণ্ডিয়ান। সংগীতের ক্ষেত্রে তাঁদের ওয়েস্টার্ন হবার দরকার নেই। অন্ততঃ ভারতীয় সংগীতের মত এত ঐশ্বর্য আর কোনো দেশের সংগীতে নেই।

রবীন্দ্রসংগীতের কথাই ধর না? অসাধারণ লিরিক। থট-কন্টেন্ট, তার পোয়েটিক একসপ্রেশন এবং এ-সবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সুর—এর তুলনা আমি কোথাও খুঁজে পাই না। বাংলাভাষা যারা বোঝে না তাদের হৃদয়েও এ-গান নাড়া দেয়।

অবশ্যই এ-চেতনার মূলে পঙ্কজ মল্লিকের অবদান একটা বড় স্থান অধিকার করে আছে। আমি নিজে অবাঙ্গালী থাকি বাংলাদেশের বাইরে। নিজের অভিজ্ঞতার এজাহারেই একথা বলছি।

পঙ্কজ মল্লিক ইজ এ ফ্যানটাস্টিক পারসোনালিটি টু মি। জ্ঞান ১৯৪৩ সালে প্রথম যখন কোলকাতায় এলাম আমার খুব থ্রিলিং লেগেছিলো শুধু একটি কথা ভেবে। এখানে এলে পঙ্কজ মল্লিককে দেখতে পাব—এই একটি চিন্তাই আমার সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করেছিলো। সেই আনন্দর কাছে অন্য সকল প্রয়োজন ম্লান হয়ে গেলো।

তারপর একদিন এলো সেই প্রতিক্ষিত মুহূর্ত। ওঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম। দেখলাম আমার হিরোকে। বহুদিনের গড়া কল্পনাকে ছাপিয়ে উঠলো তাঁর অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। সংগীতশাস্ত্রে যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই অসাধারণ রসবোধ। চিন্তার গভীরতা যতখানি, ততখানিই প্রকাশভঙ্গির ক্ষমতা। দর্শন, নন্দনতত্ত্ব, শিল্পচেতনা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যেন পঙ্কজ মল্লিক নামক বিস্ময়কর সংগীত-ব্যক্তিত্বটি গড়ে তুলেছে।

যন্ত্রীদের মধ্যে আলি আকবর রবিশংকর, বিলায়েৎ সবাই আমার শ্রদ্ধেয়। তবু মন টানেন বেশী আলি আকবর। কারণ আগেই বলেছি আমি খুব সিরিয়াস মাইন্ডেড। সেইজন্যই সরোদের সুগম্ভীর আওয়াজ। আলি আকবর খাঁ সাহেবের ধ্যানস্তব্ধ প্রকৃতি ও প্রকাশভঙ্গি আমাকে যেন গ্রাস করে।

বোম্বেতে ইয়ং জেনারেশনের মধ্যে সত্যিকারের ট্যালেন্টেড কেউ আছেন?

নিশ্চয়ই! আরতি মুখোপাধ্যায় হেমলতা সুলক্ষণা পণ্ডিত আমার ছেলে নীতিন, কিশোরের ছেলে অমিত এদের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

ভবিষ্যৎ সংগীত সম্বন্ধে আপনার চিন্তা?'

আমি আশাবাদী। বড় কিছুই আশা রাখি। নদী এঁকে বেঁকে যে পথ দিয়েই যাক না লক্ষ্য তার মহাসমুদ্র। এখন গানের গতি যেদিকেই যাক—ভারতীয় আদর্শের শক্তি তাকে আপন ধর্মে টেনে আনবেই। আমাদের জীবনে এটা দেখতে পাব কিনা জানি না। তবে এ হবেই হবে।'

সন্ধ্যা সেন

আরব জগতে গৃহযুদ্ধ

দিলীপ মালাকার

আজকের লেবাননে যা ঘটছে তা বুঝতে হলে গত কয়েক বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। গত এক বছর ধরে লেবাননে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলছে ঠিক তেমনি সংঘর্ষ চলে সাইপ্রাসে বছর কয়েক আগে।

১৯৭৪ সালের ১৫ জুলাই, ছোট্ট দ্বীপ সাইপ্রাসের দুই সীমান্তে নেমে পড়ে একদিকে তুর্কি সেনা বাহিনী আরেক দিকে গ্রীক। তুরস্ক আর গ্রীস দু দেশই উত্তর অতলান্তিক চুক্তি গোষ্ঠীর সদস্য। দু দেশই মার্কিন ঘেঁষা। তখন এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় দুই দেশের মধ্যে লড়াই বাধে আর কি। দুই রাষ্ট্রই অভিযোগ করে তাদের সম্প্রদায়ের ওপর অত্যাচার চলছে। সাইপ্রাস ভূমধ্য সাগরের বুকে ছোট্ট স্বাধীন দ্বীপ। জনসংখ্যার সত্তর ভাগ গ্রীক। তারা গোঁড়া খৃষ্টান। আর বাকি ত্রিশ ভাগ তুর্কি মুসলমান। তুর্কিরা ধর্মে মুসলমান হলেও ওদের সঙ্গে আরবদের বনিবনা নেই; এককালে ইউরোপের বহু দেশ তুর্কিদের শাসনে ছিল। ছিল গ্রীস এবং সাইপ্রাস। সাইপ্রাসে বৃটিশ আমলে গ্রীক ও তুর্কিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ তেমন মাথা চাড়া দিতে পারে নি। ষাট দশকে সাইপ্রাস স্বাধীন হবার পর থেকে সেখানকার গ্রীক ও তুর্কিদের মধ্যে বিরোধের ফাটল বাড়তে থাকে। রাষ্ট্রপতি আর্চবিশপ ম্যাকারিওস পররাষ্ট্র নীতিতে নিরপেক্ষ। কিছুটা বা সমাজতান্ত্রিক ঘেঁষা। তাই তুরস্ক ও গ্রীস ওঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখত। বছর পাঁচেক আগে সাইপ্রাসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ হত প্রায়ই। তারই পরিণতি হিসেবে ১৯৭৪ সালে দুই রাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী সাইপ্রাসে গিয়ে উপস্থিত হয়। সাইপ্রাসের স্বাধীনতা তখন যায়-যায় অবস্থা। যাই হোক সে বিরোধ এখন কোনো রকমে ধামা চাপা আছে। সাইপ্রাস এখন বে-সরকারীভাবে বিভক্ত। উত্তর পশ্চিমে তুর্কিরা আছে নিজেদের মধ্যে। গ্রীকদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি নেই। গ্রীকরাও তুর্কি এলাকায় যায় না। এই অবস্থায় সাইপ্রাসের অর্থনীতি চরম সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে।

ঠিক এমনি অবস্থা ঘটছে লেবাননে। লেবাননের অবস্থা আরও জটিল। সাইপ্রাসে তুর্কি ও গ্রীকরা ভাষা, সংস্কৃতি ও সম্প্রদায়ভাবে পৃথক। দুই মহাদেশের দুই রাষ্ট্রের অধিবাসী একটি দ্বীপে বন্দী।

লেবাননে সংঘর্ষ চলছে প্রাচীন পন্থী খৃষ্টান আর সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে। মারোনাইট খৃষ্টান আর মুসলমান দুয়ের ভাষা আরবী। ওরা নিজেদের আরবী বলেই পরিচয় দেয়। সংস্কৃতিতে একই। বহুকাল লেবানন ছিল তুর্কিদের শাসনে। তাই তুর্কি সংস্কৃতি সেখানে এখনও চলতি। তুর্কি সংস্কৃতির প্রাধান্য আছে বলেই মধ্যপ্রাচ্যের অন্য আরবদের সঙ্গে লেবাননের তেমন মাখামাখি নেই। লেবানন বরাবরই নিরপেক্ষ। আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধে দুই সম্প্রদায় বরাবরই আরবদের পক্ষ নিয়েছে।

লেবাননের আয়তন সাড়ে ন' হাজার বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা মাত্র বিশ লাখ। অর্থাৎ খাস কলকাতার চেয়ে অনেক কম। ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে আট শতকে। তার আগে দেশটি পরিচিত ছিল ফিনিশিয়া নামে। বহুকাল খৃষ্টানদের দখলে ছিল। তারপর ষোড়শ শতকে তুর্কিদের শাসন কায়েম হয়। ১৮৬১ সালে ইউরোপের বড় শক্তিগুলো লেবাননকে আলাদা করে ফেলে। আর ১৯১৮ সালে লেবাননকে ডেট দেওয়া হয় ফ্রান্সকে। ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ফরাসী পক্ষপুটে পরিচালিত হয় স্বায়ত্তশাসন। ১৯৪৩ সালে লেবানন সত্যিকারের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মধ্যপ্রাচ্যে ও আরব জগতে বহু উত্থান-পতন ঘটেছে। রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয়ে প্রজাতন্ত্র কায়েম হয়েছে বহু আরব দেশে। প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ হল। ইজরায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হল। পঁচিশ-ত্রিশ লাখ আরব উদ্বাস্তু হল। তারপর ১৯৬৭ সালের এবং ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে জর্ডন ও ইজিপ্তের কিছু অংশও চলে গেল। এত সবের মধ্যেও কিন্তু লেবানন তার নিরপেক্ষ নীতি বজায় রেখে চলছিল। ওদের শাসনতন্ত্রের নিয়মানুসারে রাষ্ট্রপতি যদি মুসলমান সম্প্রদায়ের হন তাহলে প্রধানমন্ত্রী হবেন মারোনাইট খৃষ্টান। এইভাবে পাল্টাপাল্টিভাবে চলে আসছে ওদের মন্ত্রিসভা ও শাসন ব্যবস্থা। সংখ্যায় মারোনাইট খৃষ্টানরা শতকরা পঁয়ত্রিশ। খৃষ্টানরা সংখ্যালঘু হলে হবে কি ওরা বিত্তবান। লেবাননকে বলা হয় মধ্যপ্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। ইউরোপ সুইজারল্যান্ডের যে ভূমিকা ঠিক তেমনি ভূমিকা পালন করে আসছিল লেবানন। ইউরোপের ব্যাঙ্ক হল সুইজারল্যান্ড। চিরকাল নিরপেক্ষ বলে শত্রু-মিত্র সব রাষ্ট্রের ধনবানরা তাদের টাকা রাখে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে। সেখানে টাকা মারা যাবার সম্ভাবনা নেই। মধ্যপ্রাচ্যের সব রাষ্ট্র ও ধনবানেরাও তাই তাদের টাকা রাখে লেবাননের ব্যাঙ্কে। কিন্তু লেবাননের ব্যাঙ্ক পরিচালনা করে মারোনাইট খৃষ্টানরা। লেবাননের মুসলমানরা নন। লেবাননের মারোনাইট খৃষ্টানদের সঙ্গে যোগ দেয় আর্মেনিয়ার ও তরস্কের কিছু খৃষ্টান ব্যবসায়ী। এরা ব্যবসা বাণিজ্য ভাল বোঝে। ব্যবসা ও অর্থই এদের ধর্ম-কর্ম-মোক্ষ। মধ্যপ্রাচ্যের গচ্ছিত অর্থে ফুলে-ফেঁপে ওঠা লেবাননের ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিম ইউরোপের বহু রাজধানী ও শহরে বহু অট্টালিকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিনতে শুরু করে ষাট দশকে। ফ্রান্স, ইতালি জার্মানী ও স্পেনের বহু হোটেল-রেস্তোরাঁ, এমনকি বহু বড় বড় কারখানা এখন লেবাননের ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কের মালিকানায় চলছে।

লেবাননের ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের দেশে ব্যবসা করতে গিয়ে হাত মেলাতে হয় মার্কিন ধনপতিদের সঙ্গে। ঠিক যে যে কারণে লেবাননের ব্যবসায়ীরা ইউরোপের বাজার দখল করতে গিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় ঠিক সেই কারণে মার্কিন ব্যবসায়ীরাও। এই এক কারণে লেবাননের ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমঝোতা গড়ে ওঠে। মার্কিন ধনপতিদের অর্ধেকই হল ইহুদী। এই মার্কিন ইহুদী ধনপতিদের সঙ্গে লেবাননের ব্যবসায়ীদের মাখামাখি পছন্দ করেনি কোনোকালে সমাজতন্ত্রবাদপন্থী লেবাননের মুসলমান প্যালেস্টাইন সম্প্রদায়। ব্যাপারটা বড়ই গোলমেলে।

পি এল, ও অর্থাৎ প্যালেস্টানান লিবারেশান অর্গানাইজেশান হল সমাজতন্ত্রবাদপন্থী। পি, এল, ওরা প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে আজ দুই দশক ধরে। ওদের লড়াই ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। পি এল, ওর রসদ জোগায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো। আর ইজরায়েলের রসদ জোগায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইজরায়েল পরোপুরি মার্কিনপন্থী। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে ইজরায়েল বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে যেত।

লেবাননের কিছু অধিবাসী প্যালেস্টাইনের উদ্বাস্তু। তারা পি এল ওর সমর্থক। বিরোধ দেখা দেয় লেবাননের পি এল ওর সমর্থক ও মার্কিনপন্থী মারোনাইট খৃষ্টান ব্যবসায়ীদের মধ্যে বছর কয়েক আগে। তারই জের হিসেবে সংঘর্ষ শুরু হয় গত বছরে। প্রথমে মতবিরোধ, ঝগড়া ও পরে সংঘর্ষ। বিশ্বের অনাসব রাষ্ট্রে যা হয় এখানেও তাই হল। পি এল ও পন্থীদের সমর্থন জানান রাশিয়া আর মারোনাইট খৃষ্টানদের সমর্থন জানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মারোনাইট খৃষ্টানরা সংখ্যালঘু হতে পারে কিন্তু ওদের অর্থবল অনেক বেশী। ওরা খরিদ করেছে মার্কিন ও পশ্চিম ইউরোপীয় সমরাস্ত্র। দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গাহাঙ্গামা এখন গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোকজন এখন বেরুট ও লেবাননের উত্তরে জড় হয়েছে। খৃষ্টানদের তাতিয়ে তুলেছে দক্ষিণপন্থী দল। তারা বলছে যে, খৃষ্টানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র হোক। আর অন্যদিকে

পি এল ও দল বলছে যে, ওরা দক্ষিণপন্থী ওদের হাতে সরকারী ক্ষমতা ছেড়ে নেওয়া হোক। দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের সুযোগ নিয়ে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র এখন লেবাননকে গ্রাস করতে চাইছে। বেশ কিছু পি এল ও সেনা এখন সিরিয়াতে রয়েছে। সিরিয়া বলছে পি এল ওকে সাহায্য করতে তারা সব সময়ে প্রস্তুত। এই অজুহাতে সিরিয়া খৃষ্টানদের গ্রাম-শহর দখল করতে চাইছে।

লেবাননে দুই সম্প্রদায়ের বিরোধ এখন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেচে যে লেবাননের সামরিক বাহিনীতে খৃষ্টান সেনাপতির আদেশ মুসলমান সেনারা মানছে না। আবার তেমনি মুসলমান সেনাপতির আদেশ খৃষ্টান অফিসাররা মানছে না। এমন কি খৃষ্টান রাষ্ট্রপতি মিঃ ফ্রানজিয়ের আদেশ অমান্য করেছে লেবাননের মুসলমান সেনারা। তারাই আবার একদিন রাষ্ট্রপতির আবাস ঘিরে রাখে এবং গোলাগুলি চালায়। দিন কয়েক হল রাষ্ট্রপতি লেবাননের শাসনতন্ত্র বদলাবার নির্দেশ দিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এখন দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ বন্ধ আছে। শাসনতন্ত্র বদলালে যাইহোক ভবিষ্যতে লেবানন দুই ভাগে বিভক্ত হবেই।

সবচেয়ে আশ্চর্য করেছে উত্তর আফ্রিকার দুই আরব রাষ্ট্র মরক্কো ও আলজেরিয়া। এরা বহুকাল ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। স্বাধীন হয়েছে দুই দশকের মধ্যে। দুই দেশের ভাগ্যাহারবী, জাতে মুসলমান ধর্মেও। সংস্কৃতিতে ও কোনো ফারাক নেই। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্মুখ সমর হয়ে গেল এবছরের গোড়ায় সাহারা মরুভূমির এক খণ্ড জমির জন্যে।

সাহারা মরুভূমির পশ্চিমাংশ বহুকাল ছিল স্পেনের উপনিবেশে। স্পেন তার উপনিবেশ ছাড়তেই ওই অংশগুলোর দাবী জানায় মরক্কো ও আলজেরিয়া। বলা নেই কওয়া নেই মরক্কো কয়েকটি অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। সেই সঙ্গে আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী। তারপর যা হয় তাই হল। কামান বন্দুক এমন কি ট্যাঙ্কে লড়াই হল সাহারার বুকে। লড়াইয়ে জিত হল মরক্কোর। আলজেরিয়া নিরপেক্ষ কিন্তু সমাজতন্ত্রী ঘেঁষা। মরক্কো রাজতন্ত্রী কিন্তু মার্কিন ঘেঁষা। এখানেও মার্কিন ও রাশিয়ার প্রভাব পরোক্ষভাবে খেলা করেছে।

সাহারার বুকে দুই আরব রাষ্ট্রের লড়াই এখন থেমেছে বটে। কিন্তু শান্তি সেখানে ফিরে আসেনি। দুই রাষ্ট্রই আবার যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আরব রাষ্ট্রগুলো দুই দেশকে সমর্থন জানিয়েছে। সাহারা মরুভূমি হলে হবে কি সেখানে পেট্রল ও প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্য পাওয়া গেছে। তারই লোভে লড়াই বেধেছে মরক্কো ও আলজেরিয়ার মধ্যে। সাহারার পেট্রল কে ভোগ করবে এটাই এখন দুই রাষ্ট্রের চিন্তা।

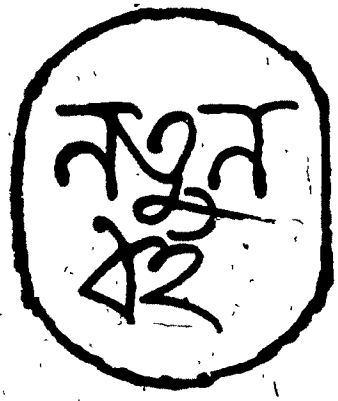

বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ। অখিলচন্দ্র নন্দী।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭। আট টাকা।

লেখক অখিলচন্দ্র নন্দী স্বয়ং এক বিপ্লবী। বাংলাদেশের গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন—যা ইংরেজ রাজত্বে অসহনীয় পীড়নের বিরোধী প্রয়াস হিসেবে সুরু হয়েছিল তার একটা অজ্ঞাত অধ্যায়কে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে প্রকল্প করেছেন 'বিপ্লবীর স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে অখিল নন্দী। কোন স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে কয়েকটি ত্রুটি স্বাভাবিভাবেই দেখা দিতে পারে। তথ্যগত বিভ্রান্তি, কোন ঘটনার প্রতি মমতা বা বিতৃষ্ণায় অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ, সত্যকে ব্যক্তিগত মত ও পথের বিশ্বাস ও গোঁড়ামির কারণে সরিয়ে রাখার প্রয়াস বা বেশী বলার চেষ্টা, ইতিহাসকে বিস্মরণের মধ্যে ধরার চেষ্টায় 'এ্যানাক্রনিসম' জাতীয় স্খলন—এসব নানান দিক দেখা দেয়। লেখক অখিলচন্দ্র নন্দী আলোচ্য গ্রন্থে সে সমস্তই কাটিয়ে উঠেছেন। বহু বিপ্লবীর কথা নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তথ্যের প্রতি নিষ্ঠা, প্রাচীন বিপ্লবের আবেগধর্ম—সবই আলোচ্য গ্রন্থটিকে উন্নত মানের করেছে, লেখক সাহিত্যিক নন, কিন্তু সাহিত্যের রস-সরসতা গ্রন্থটিকে সর্বস্তরের পাঠকদের কাছে সহজেই আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানেই গ্রন্থটির সর্বাঙ্গীণ মূল্য স্বীকৃত।

ধর্মদর্শন। প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ৫।১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯। বাইশ টাকা।

'ধর্মদর্শন' গ্রন্থটি বস্তুত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচিত হলেও সাধারণ উৎসুক পাঠক ও গবেষকরা। এ গ্রন্থ থেকে যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানস্পৃহা মেটাতে পারবেন সে বিষয়ে আমরা স্থির-নিশ্চিত। সেদিক থেকে এই গ্রন্থটি সংগ্রহযোগ্য।

দি পারসিস্টিং হিউম্যানিটি। কালিদাস কাঞ্জিলাল। সাহিত্যলোক, ৩২।৭, বিডন স্ট্রীট, কলকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

বাংলা ইংরাজী মিলিয়ে বেশ কিছু ছোট-বড় প্রবন্ধের সংকলন হল কালিদাস কাঞ্জিলাল রচিত 'দি পারসিস্টিং হিউম্যানিটি' নামের গ্রন্থটি। মানবতার প্রসঙ্গে লেখক বিভিন্ন দিক হাতড়েছেন এবং প্রসঙ্গকে অনেক বিস্তারিত করেছেন। উদ্বাস্তু সমস্যা, মাদার টেরেসা প্রসঙ্গ, জগজীবন রাম সম্পর্কিত ভাবনা, বাংলাদেশের চিন্তা, লেটার্স টু ইনটেলেকচুয়ালস—এরকম নানান বিষয় লেখকের মাথায় ঘুরেছে। কিন্তু এমন ছোট একটি গ্রন্থে পরিসর কম হওয়ায় প্রত্যেকটি বিষয় তেমন গভীরভাবে দানা বাঁধতে পারে নি। তবু লেখক আধুনিক অস্থির 'সমাজ-ভাবনার মধ্যে মানবিকতা নিয়ে যে কিছু চিন্তা করতে সচেষ্ট হয়েছেন—তা নিশ্চিত-ভাবে প্রশংসা করতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা, বিষয়গুলিকে আধুনিককালের সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন—তাই রচনাগুলি ভাবায়।

দেবদারু বনে আগুন (কাব্য সংকলন)। ধনঞ্জয় রায়। রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২। চার টাকা।

কিছু কাব্যিক উপমা, শব্দ, চিত্রকল্প এবং অনুভবের প্রকাশ কোন কোন কবিতায় থাকলেও কবির হাত এখনো কাঁচা বোঝা যায়। অনেক কবিতার ছন্দনির্মাণ নিখুঁত হয়নি।

এই দশকের ছোট গল্প। পরিবেশক : দে বুক ষ্টোর। সম্পাদনা : ভাস্কর বসু। দাম বার টাকা।

বই-এর প্রথমেই লেখক পরিচিত ও সন্তোষকুমার ঘোষের ভূমিকাটি এক কথায় অনবদ্য সংযোজন।

এই বইতে অসীম রায়, সুব্রত নিয়োগী, অনির্বাণ রায়চৌধুরী, তিমির পাল, সমর-কুমার বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত, রাণা চট্টোপাধ্যায়, ঋডেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ বসু, কল্লোল ব্রহ্মচারী, মনোজিৎ মিত্র প্রভৃতি নবীন ও তরুণ সাহিত্যিকের লেখা স্থান পেয়েছে।

সুব্রত নিয়োগীর 'দুঃসময়' গল্পটিতে খরা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের কথা স্থান পেয়েছে। লেখাটি সুন্দর। অনির্বাণ রায়-চৌধুরীর 'নোনাজল মিঠে মাটি' গল্পটি বলিষ্ঠ হাতের রচনা। ঋডেশ্বর চট্টো-পাধ্যায়ের 'হাড়' গল্পটি নতুনত্বের দাবী রাখে। বিকাশবাবুর 'হিরণ্যর কাজ নেই'

গল্পটি আজকের সাধারণ মানুষের জীবনের কাহিনী। তরুণ সাহিত্যিক সমরকুমার বসুর 'প্রজাপতি ধরা যায় না' গল্পটি খুবই সুন্দর।

সংকলন ও পত্রপত্রিকা

ক্যালকাটা ফিল্ম সার্কল। দশম বর্ষ পূর্তি স্মারক গ্রন্থ। সম্পাদনা সন্দীপ রায়।

ঋত্বিকের মত ব্যক্তিত্বের জন্ম মৃত্যুর সাল তামামি অবান্তর। তবু তথ্যের খাতিরেই চলতে হয় 'ঋত্বিক জন্মেছেন ১৯২৬ সালের ৪ নভেম্বর ঢাকায় মৃত্যু ঘটেছে ৬ ফেব্রুয়ারী কলকাতায়। আকাশকে ছুঁয়ে দেখার স্পর্ধায় যে দুরন্ত দুর্ধর্ষ ঋত্বিক ফুরিয়ে গেলেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই স্মারক গ্রন্থটিতে গুটি দুয়েক লেখা আছে। প্রবীর সেনের 'ঋত্বিক ঘটকের গোত্র' নামের লেখাটি ভালো'। এই বিতর্কিত এবং স্মরণীয় ব্যক্তিত্বটিকে নিয়ে আরও কিছু মননশীল রচনা থাকলে ভালো হত। চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অন্যান্য গল্পগুলির কয়েকটি বেশ মর্যাদাসম্পন্ন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন তরফদার, শঙ্খ ঘোষ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। পরিচ্ছন্ন ছাপা, সুন্দর অলংকরণ স্মারক গ্রন্থটিতে আকর্ষণীয় করেছে। চলচ্চিত্র বিষয়ে যাঁরা ভাবনা-চিন্তা করেন তাঁরা এটি সংগ্রহ করতে পারেন।

রা। সম্পাদনা ঋতীশ চক্রবর্তী। ১৬৬, বিধান পার্ক। কোলকাতা-৫০।

এই বিশেষ স্মরণ সংখ্যায় শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে কালিদাস রায়, সতীন সেনবর্মন, আগাথা ক্রিস্টি, আহমদজান থিরাকুয়া, পল রোবসন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, ঋত্বিক ঘটক, তারাপদ চক্রবর্তী, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অনাথ বসু এবং অমর কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে। লেখাগুলি ভাল। সংখ্যাটি সংগ্রহযোগ্য।

সন্দীপন। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দিরের বার্ষিক পত্রিকা। সম্পাদনা নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণদাস সেন। রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষা মন্দির। বেলুড় মঠ।

'ধর্ম ও শিক্ষা' মুক্তিমন্ত্রের পূজারী শরৎচন্দ্র শরৎচন্দ্রের 'সমাজচেতনা ও গীতি-ভাবনা' মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ শীর্ষক নিবন্ধগুলি সংখ্যাটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। পরিচ্ছন্ন ছাপা। প্রচ্ছদও ভালো।

বোম্বাই বিথি। সম্পাদনা রেখা দত্ত। মঞ্জুলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সবর্ণটি ঘোষ। ওবলি হিলস। বোম্বাই-৪০০০১৮। দাম চার টাকা।

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত এই বাঙলা পত্রিকাটি ইতিমধ্যেই পাঠক সমাজে পরিচিতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক সংখ্যাটিতে গোটা কয়েক ভালো লেখা দেখা গেল। 'শরৎস্মৃতি বিজড়িত ভাগলপুর' প্রসঙ্গ, দোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও শরৎচন্দ্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। পত্রিকাটিতে কিছু গল্প ও কবিতাও আছে। কিন্তু এর মধ্যে 'বোম্বাইয়ের লেখক-লেখিকা ক'জন?

লোকান্তরে কবি ও শিল্পী

বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হবে ৩০ মে'র অপরাহ্ণ বেলায় মৈনাক সৈনিক হত'-এর কবি নির্বাক হয়ে গেলেন। শিশু সাহিত্যেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ছেলেদের কাগজ রংমশালের সম্পাদকও ছিলেন এক সময়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতক হয়ে বঙ্কিম পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

বাংলা দেশের প্রখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন পরলোকগমন করেছেন। একদা যার দুর্ভিক্ষের ছবি রং তুলিতে কথা বলত সেই বলিষ্ঠ হাতে জয়নুল আর কোন দিন তুলি ধরবেন না। তবু দুঃখ নেই তাতে শিল্পরসিকের চোখে অনিবার্যভাবেই জ্যান্তো হয়ে রইবে তাঁর সেই শিল্প ফসল-গুলি। কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুল থেকে স্নাতক হয়েছিলেন ১৯৩৩-এ। ১৯৪৪-এ বাংলার দুর্ভিক্ষকে চোখের সামনে জ্যান্তো করে তুলে খ্যাতনামা হয়ে-ছিলেন। ১৯৪৭ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন শিল্প ও কারু কলেজ। কুড়ি বছর তার অধ্যক্ষ ছিলেন। '৬৬ সালে চারুকলা বিভাগের ডীন পদ পান ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের। জয়নুল আবেদিনের মৃত্যু শিল্প জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি।

অন্যান্য খবর

এ বছর শিশু সাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন ভাষার এগারোটি বই নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত বইগুলির মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা খগেন্দ্রনাথ মিত্রের 'সুমন্ত' বইখানি রয়েছে। নির্বাচিত অন্যান্য বইগুলি হোল মোহন চৌধুরীর 'চিরিজন বিখ্যাতি' (অসমীয়া) দীপক মানকড়ের আই সি আই থ্রিংক আই সিং' (ইংরাজী) শ্রীপ্রসাদের মেরা ষষ্ঠী ঘোড়া (হিন্দী) বালস্বরূপ রাহীর 'দাদশ আত্মা মুঝে বাতাও'। এ ছাড়াও কানাড়া, মালয়ালম মারাঠী তেলেগু উর্দু ভাষার বইও নির্বাচন লাভ করেছে।

শিশু সাহিত্য পরিষদ শিশু সাহিত্য ও শিল্পকর্মের জন্য দুটি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ১৩৮৪ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কার দুটির সম্মান মূল্য হবে এক হাজার টাকা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের হাবড়া শাখার কবি প্রণাম অনুষ্ঠান গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হোল। সভার সভাপতিত্ব করেন কবি হরপ্রসাদ মিত্র এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল ঘোষ। অনুষ্ঠানে কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ এবং সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল।

চার্বাক

প্রাপ্তি স্বীকার

শঙ্খচূড় (কাব্য সংকলন)। অঞ্জন ঘোষ। কবিমহল, আমতা, হাওড়া। দু'টাকা।

সমকাল সচেতনায় নিবিষ্ট করে কবি আলোচ্য সংকলনের কবিতাগুলি প্রকাশ করেছেন। কবির আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, শ্রম ও সারল্য পাঠকহৃদয় টানবে।

আকাঙ্ক্ষার নিরন্ন কাকেরা (কাব্য সংকলন)। প্রকাশ চক্রবর্তী। কবিমহল, আমতা, হাওড়া। দু'টাকা।

মিল অমিল দুই রীতির ছন্দে লেখা কবিতাগুলিতে কবির অন্তরঙ্গ হৃদয়ছবি পাঠকদের বিস্মিত করবে।

রুখে দাঁড়াও। দেবব্রত ঘোষ। লিপিকা, ৩০।১, কলেজ রো, কলকাতা-৯। তিন টাকা।

কবি হৃদয়ের রাগরঞ্জিত বিদ্রোহভাবনা কবিতাগুলিকে ভিন্নস্বাদী করেছে।

প্রকাশিত হল : তিনটি বৃহৎ উপন্যাস

নির্মল আচার্যের

গাড়োয়ান পাড়া রোড মূল্য : ১৬-০০

বাণীপ্রসাদ মিশ্রের

চলার পথে মূল্য : ১২-০০

নির্মল আচার্যের

সছিদ্র জল মূল্য : ১৪-০০

'রক্ত স্বাক্ষর পাবলিকেশন্স' ৭৷১ ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-৭০০০১২

প্রাপ্তিস্থান—দে বুক স্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী

নিঃ শব্দ ঘুঙুর ॥

কবিরুল ইসলাম

তোমার দুঃখের দিন তোমার সুখের রাতগুলি
তোমার সুখের দিন তোমার দুঃখের রাতগুলি
ফলে-পড়া ইঁদুরের মতো মুখে-রক্ত
থেঁতলে দুমড়ে পড়ে আছে।

মা, আমি শহরে আর
খালি পায়ে যেরকম মহিলারা এখনও কেউ-কেউ
শান্তিনিকেতনে
না, আমি শহরে আর কখনও যাবো না।

আমার একহারা জুতো তোমার সন্ধানে ঘুরে-ঘুরে
চিরকালের চাকুরী প্রার্থীর মতো
ছিন্নভিন্ন কাঁটা বিঁধে আছে—
যেন বা অলীক কাঁটা
আলজিবে, শল্য চিকিৎসকের টেবিলে
আবেদন শুয়ে চিৎপাত।
শেকসপীয়রের
সেই সুরসিক অদ্বিতীয় নাগরিক যেন!

তোমার সুখের দিন তোমার দুঃখের রাতগুলি...
আমাদের ব্যক্তিগত অফসেটে রোটারি মেশিনে
ঠান্ডা স্থির জ্বলে আছে
নক্ষত্রের মতো ধ্রুব।
শুধু লাইনো টাইপে নয়, সংসক্ত নিবিড়
ধুয়ে আছে স্নিগ্ধ শিশিরে।
বেজে যাচ্ছে অহরহ
প্রেমিকার নিঃশব্দ ঘুঙুর যেন সবুজ সহজ
ঐ শোনো যত তার শব্দ বাজে ধ্বনিহীন
আমার চারদিকে, ঐ শোনো, তোমারও চারদিকে

অর্থের অথস্তে তত বেজে ওঠে ভূত ভবিষ্যৎ।।

বিদ্যুতের ছুরি ॥

পরেশ মণ্ডল

কেন এই চঞ্চলতা মধ্যরাতে
এ কিসের জাগরণ সমর্পণে
জানলার ওপারে বৃষ্টি
অন্ধ আকাশ চিরে বিদ্যুতের ছুরি দিগন্তে হারিয়ে যায়
মনে মন হৃদয়ে শূন্যতা
সব কথা থেমে গেলে ক্লান্ত নীরবতা
বধির সময় মেপে আকাঙ্ক্ষার জাল
বুনট নির্মম
জানিনা সকাল
কীভাবে আসবে ফিরে
জানিনা কখন
ত্বরিতে বা ধীরে
বিদ্যুতের ছুরি এখনো আকাশ চিরে
বাড়ায় মমতা
মনে মন হৃদয়ে শূন্যতা

ঘুমের মধ্যে ॥

শৈলেন শেঠ

ঘুমের মধ্যে সহসা রৌদ্র ফেলেছিলে তুমি মুখে
সেই থেকে আলো ভয়ের বাজনা বাজায়,
ভালোবাসার অনুচ্চ দান অভিমানের সুখে
অহংকারের স্ফটিক আমার অন্ধকারে সাজায়

ঘুমের মধ্যে সহসা আগুন—আগুন দিয়েছ ঘরে
নিজেই নিজের ঝলসানো রূপ চিনতে পারিনি পরে
জান— এমন ভয় দেখালে বুকের পাল্লা নড়ে
বৃক্ষমূলে অনন্য ফুল বেদনার মত ঝরে

ঘুমের মধ্যে সহসা রৌদ্র—ঘুমের মধ্যে আগুন
তৃষ্ণা মেঘে জেগে দেখি কোথায় রাখলে ফাগুন
ঘুমের মধ্যে জলজ স্নেহে পিপাসু হয়ে ছিলাম
জাগরণে জলের দামে সপ্তসিন্ধু নীলাম

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

।।উনিশ।।

ভোরবেলার দিকে ঘুম ভাঙ্গলেও আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙ্গল নৃপতির ডাকাডাকিতে। উঠে দেখি আটটা বেজে গেছে। চা খেয়ে বাথরুম থেকে ঘুরে আসতেই ন'টা হয়ে গেল। তারপর ডাক্তার-বাবুর নির্দেশ মত দুধ টোষ্ট আর ডিম খেয়ে খবরের কাগজখানা নিয়ে বসতে না বসতেই দেখি আলপনা হাসতে হাসতে আমার ঘরে ঢুকল। অভ্যর্থনা না করে অপরাধীর মত আগেই বললাম খুব উচিত ছিল পার্সটা পৌঁছে দিয়ে আসা কিন্তু...

তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় নি বা মা আমাকে ফাঁসীও দেন নি।

তবু আমার কর্তব্য.....

ছোট লেডিজ রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে ও বললো, আগে একটু জিরিয়ে নিই। তারপর আপনার কর্তব্যের কথা শুনব, কি বলেন?

লজ্জিত হয়ে বললাম সরি! বসুন বসুন।

আলপনা চেয়ারে বসতেই বললাম, শুধু পার্সটা নেবার জন্যই এই সাত সকালে আপনাকে এত কষ্ট করতে হলো।

কে বললো শুধু পার্স নেবার জন্য বেরিয়েছি?

আমার অনুমান।

আপনার অনুমান ঠিক নয়। এখান থেকে ব্যাঙ্কে যাব ব্যাঙ্ক থেকে বোনের স্কুলে, যাব তারপর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরব।

খাবেন ত?

তা খেতে পারি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দু' কাপ চায়ের কথা বলে ঘরে আসতেই ও জিজ্ঞাসা করল, আজ বিকেলে কখন বেড়াতে বেরুবেন?

বেড়াতে বেরুব মানে একটু ঘুরে আসব।

কখন?

সন্ধ্যের আগে না।

তাহলে বিকেলের দিকে মেসেই থাকবেন?

আর কোথায় যাব?

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সিনেমা-থিয়েটার যেখানে মন চাইবে সেখানেই যেতে পারেন।

আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই? আর সিনেমা-থিয়েটার বিশেষ দেখি না।

আলপনা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব নেই, তাই কখনো হতে পারে?

বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। তবে আমি সত্যি কথাই বলছি।

আমি অবিশ্বাস করছি না কিন্তু.....

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ঐ কিন্তুটাই আমার জীবনের ট্রাজেডি।

আমার কথা শুনে আলপনা হঠাৎ কোন কথা বলতে পারল না।

দু' কাপ চা এলো। দু'জনে চা খেতে শুরু করলাম কিন্তু তখনও কারুর মুখে কোন কথা নেই। একটু পরে আলপনা জিজ্ঞাসা করল, আপনি দিনগুলো কাটান কিভাবে?

একটু ম্লান হাসি হেসে বললাম, দিন কাটাই না; কোন মতে দিনগুলো পার হয়ে যাচ্ছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়ে এসে এই মেসেই থাকেন?

হ্যাঁ।

ভাল লাগে?

মেসে ভাল লাগার মত কি আছে? শুয়ে-বসে সময়টা কাটিয়ে দিই, এই মাত্র।

আবার কয়েক মিনিট দু'জনেই চুপচাপ রইলাম। তারপর আলপনা জিজ্ঞাসা করল, শুনছিলাম আপনি মাঝে মাঝেই বেনারস যান?

মাঝে মাঝে মানে ইদানীংকালে বার দুয়েক গিয়েছি।

ওখানে কি আপনার কেউ আছেন?

আত্মীয় বলতে আমরা যা বুঝি সে রকম কেউ নেই। তবে দু' এক বৃদ্ধা আর বিধবা আছেন যারা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন।

বেনারস জায়গাটা বেশ ভাল, তাই না?

আমি টুরিষ্টদের মত খুব বেশী ঘুরে-ফিরে দেখি নি। যাদের জন্য যাই তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করেই ক'টা দিন কাটিয়ে দিই।

আচ্ছা, ওখানকার [illegible] কুলজার ভেটিড?

সাধারণ লোকজন বোধহয় কনজার-ভেটিভ। তবে ওখানকার বিধবারা বড় দুঃখী।

কেন?

প্রায় প্রত্যেক বিধবাকেই বহু দুঃখ বহু অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে ও হচ্ছে।

আজকালকার দিনেও বিধবাদের উপর অত্যাচার হয়?

কাশীর গলিতে এখনও আজকালকার হাওয়া ঢোকে নি। ওখানকার বিধবাদের আজও পঞ্জিকার প্রতিটি অনুশাসন মেনে চলতে হয়।

বলেন কি?

আমি একটু শুকনো হাসি হেসে বললাম, স্বাধীন ভারতবর্ষ শুধু চাষী-মজুরের দুঃখের কথাই ভাবল। বিধবাদের দুঃখের কথা ভাবার সময় কারুর হলো না।

কি আশ্চর্য!

কিছু আশ্চর্য নয়। এ দেশে ধর্মের নামে কিভাবে যে মানুষের উপর অত্যাচার করা হয় তা কাশীতে না গেলে জানা যায় না।

আলপনা চট করে কোন কথা বলতে পারল না। মুখ নীচু করে আপন মনে বসে রইল। কিছুক্ষণ পরে ও হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতেই আমার খেয়াল হলো ওর অনেক কাজ আছে। ওকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি। বললাম আপনাকে অনেক দেরী করিয়ে দিলাম।

বেনারসী·সিল্ক
তাঁত ও
ফ্যান্সী শাড়ী
রূপশী
৬২, জি, টি, রোড, হাওড়া।

আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, দেরী হয় নি। ব্যাঙ্ক ত দশটায় খোলে। এখন ত মোটে সওয়া দশটা বাজে।।

আমি টেবিলের দিকে হাত দেখিয়ে বললাম, আগে পার্সটা হাতে নিন। তা নয়ত আবার এই রোদ্দুরে ফিরে আসতে হবে।

টেবিল থেকে পার্সটা তুলতে তুলতে আলপনা বললো, পার্স নিয়ে গেলেও আপনার কাছে আবার আসতে হবে।

কেন?

সত্যি কথা বলব?

সত্যি কথাই ত বলা উচিত।

প্রথম দিন আপনাকে আমার বিশেষ ভাল লাগে নি। কেন জানেন?

না।

মনে হয়েছিল আপনার নিজস্ব কোন চিন্তাধারা নেই। বড়দের বড্ড বেশী অনুগত কিন্তু আজ ইঙ্গিত পেলাম আপনি ঠিক তা নন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আলপনা দরজার দিকে এক পা বাড়িয়েই বললো, চলি। বোধহয় বিকেলের দিকে মার সঙ্গে আসব।

আজকে আপনার মা কেমন আছেন?

ভালই আছেন; তবে সদ্য সদ্য বাবা মারা গিয়েছেন বলে কিছু না হলেও মা অসুস্থ বোধ করেন।

খুবই স্বাভাবিক।

তবে এতবড় একটা আঘাত মাকে একলা একলা সহ্য করতে হচ্ছে বলে ওর এত কষ্ট হচ্ছে।

একলা একলা কেন?

সে অনেক কথা। পরে বলব। এখন চলি।

আচ্ছা।

আলপনা আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আমি আপন মনে একটু হাসলাম। মনে মনে বললাম, আলপনা প্রথম দিন তোমাকে দেখে আমার মোটেও ভাল লাগে নি। কেন জান? মনে হয়েছিল অত্যন্ত অহঙ্কারী। নিজের রূপ যৌবন পারিবারিক অর্থ-প্রতিপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম আর কিছু মনে হয় নি? মনে হয়েছিল বড়লোক দাদুর আদুরে ন্যাকা বোকা নাতনী।

সেদিন ওকে দেখে আমি ভাবতেও পারি নি ও কোনদিন আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলবে। আজ মনে হচ্ছে আমি ভুল বুঝেছিলাম। এখন বুঝতে পারছি আলপনা শুধু বুদ্ধিমতী নয়, একটু স্বতন্ত্র।

কয়েক দিন পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হলাম। ছাত্রছাত্রী পড়ান শুরু করলাম। এতদিন টাকাকড়ির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় নি। কার্তিকবাবু সবকিছু খরচ করেছেন। এখন হিসেব করে দেখলাম শ' চারেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। আমি সবা মাসেও চারশ' টাকা রোজগার করি না। প্রয়োজনে দু একটি ছাত্রছাত্রীর বাবা-মার কাছ থেকে দশ-পনের দিন আগেই মাইনে নিয়েছি কিন্তু চারশ' টাকা ত সেভাবে জোগাড়-করা যাবে না। কার্তিকবাবু মেসের মালিক হলেও ধনী নন। বোধহয় মাসের শেষে চার-পাঁচশর বেশী উনিও হাতে পান না। এই আয় দিয়ে দেশের বাড়ীতে ওর বিরাট সংসার চালাতে হয়। সুতরাং উনি কিছু না বললেও আমি জানি টাকাটা ওর জরুরী প্রয়োজন।

দু তিনদিন ভেবে দেখলাম কাকাবাবু বা কোন ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে এত টাকা চাওয়া ঠিক হবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম দেবীকেই লিখব। বাড়ি ফিরে এসেই দেবীকে দীর্ঘ চিঠি লিখলাম। সব কিছু জানালাম। তারপর সব শেষে লিখলাম, কার্তিকবাবুকে টাকাটা দিয়ে দেওয়া দরকার। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাশ হলেও এত টাকার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা আমার নেই। এ দৈন্যের কথা শুধু তোমাকেই জানালাম।

সপ্তাহখানেক পরে দুটি ছাত্র পড়িয়ে কলেজ স্ট্রীটের বইয়ের দোকান থেকে দুটি বই কিনে মেসে ফেরার পথে আমার এক সহপাঠীর সঙ্গে দেখা। সে জোর করে বেন্টু বলে নিয়ে গেল। মেসে ফিরতে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল।

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্য সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ গ্রন্থ-
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর-অরবিন্দকুমার ঘোষ-১০৲ মহাজীবন-অরবিন্দকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা-৯ ফোন : ৩৫-০৬৩৩

বারান্দায় পা দিতে না দিতেই কার্তিক-বাবু বললেন, তোমার একটা অর্ডার এসেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তোমার ঘরে দিদি বসে আছে। তার কাছে ফর্মটা আছে। সই করে আমাকে দিয়ে যেও। পিওন একটু পরে আসবে।

আচ্ছা।

তাড়াতাড়ি উপরে উঠলাম। দেখি আলপনা বসে আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতক্ষণ?

মিনিট পনের।

কি ব্যাপার? এই রকম অসময়?

আলপনা একটু হেসে বললো, জানতাম মোটা টাকার মণি-অর্ডার আসবে। তাই এসে বসে আছি।

আমি তক্তাপোষের উপর বসতে বসতে বললাম, এটা আমার রোজগারের টাকা নয়। সুতরাং এ টাকা না পেলেও আমার দুঃখ করার অধিকার নেই।

ও আমার দিকে মনি-অর্ডার ফর্মটা এগিয়ে দিয়ে বললো, নিজের রোজগারের টাকাই হোক বা বাপ-ঠাকুর্দার সম্পত্তির টাকাই হোক, টাকাটা ত আপনার।

আমি ফর্মটা হাতে নিয়ে বললাম, বাবা শুধু আমাকেই রেখে গেছেন সম্পত্তি রেখে যান নি।

নিজের রোজগারের টাকা না পৈতৃক সম্পত্তির টাকাও না তবু এত টাকার মনি-অর্ডার। আপনি ত সত্যি ভাগ্যবান।

মনি অর্ডার ফর্মে দেখলাম পাঁচশ' টাকা এসেছে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললাম, সত্যি আমি ভাগ্যবান। যিনি এই পাঠিয়েছেন তাকে আমার কিছুই দেবার নেই, অথচ তার কাছে ছাড়া আর কারুর কাছেই আমি কিছু চাইতে পারি না।

উনি নিশ্চয়ই আপনাকে খুব স্নেহ করেন?

আমাকে স্নেহ করার বয়স ওর নয়। উনি আমার চাইতে বছর দুয়েকের ছোট।

তাহলে উনি আপনাকে ভক্তি করেন, শ্রদ্ধা করেন।

ঠিক ভক্তি-শ্রদ্ধাও করেন না।

তাহলে বোধহয় আপনাকে ভালবাসেন।

কথাটা শুনেই চমকে উঠলাম। বললাম, উনি বিধবা।

আমার জবাব শুনে আলপনাও চমকে উঠল। বললো হঠাৎ বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না।

কিছু মনে করি নি।

আমি মনি অর্ডার দুটো সই করে কুপনটা ছিঁড়ে নিলাম। বললাম, একটু বসুন। ফর্মটা নীচে দিয়ে আসি।

ও কিছু বললো না। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পা দিতেই কুপনটা পড়লাম। দেবী লিখেছে এই রকম একটা শুভ সংবাদ পাব বলেই প্রত্যাশা করছিলাম। মেয়েদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারার জন্যই কি ভগবান পুরুষ মানুষ সৃষ্টি করেছেন? কার্তিকবাবুর ৪০০ টাকা নৃপতির ধুতির টাকা তোমার আসার ভাড়া পাঠালাম। খুব তাড়াতাড়ি চলে এসো।

মনি অর্ডার ফর্মটা কার্তিকবাবুকে দিয়ে আবার নিজের ঘরে এসেই কুপনটা আলপনার সামনে ধরে বললাম পড়ুন।

ও কুপনটা পড়েই আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ইনি খুব বলিষ্ঠ চরিত্রের মেয়ে তাই না?

কেন বলুন ত?

এই দু' লাইন লেখা পড়েই বোঝা যায় মনের মধ্যে কোন দ্বিধা বা জড়তা নেই।

আমি কিছু বললাম না। শুধু একটু হাসলাম।

হাসছেন কেন?

আপনার কথা শুনে।

কেন? ঠিক বলি নি?

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ দু' লাইন পড়ে আর কিছু মনে হল?

আপনাকে উনি খুব আপনজন মনে করেন।

আর কিছু?

এবার আলপনা হেসে বললো, আর মনে হল আপনার নিশ্চয়ই বেনারস যাওয়া উচিত।

কিন্তু তা ত সম্ভব না।

অসম্ভব হলেও আপনি যাবেন।

আমি এখন আবার কাশী গেলে কাকাবাবু কাকিমা আপনার মা—সবাই আমার উপর রাগ করবেন।

ওরা রাগ করলে আপনার কিছু যায় আসে না কিন্তু এমন শুভাকাঙ্ক্ষিনীকে দুঃখ দিলে.....

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, আপনি ভাবাবেগের কথা বলছেন, যুক্তির কথা বলছেন না।

জীবনটা ত কোর্ট রুম নয় যে শুধু যুক্তি-তর্ক করেই.....

জীবনটা শুধু ভাবাবেগের জন্যও নয়।

মাথা দুলিয়ে আলপনা বললো, তর্ক করবেন না। মোট কথা আপনি যাবেন, যেতেই হবে।

আচ্ছা সে দেখা যাবে। আপনি কেন এসেছেন, তা ত বললেন না।

মা বলেছেন আজ রাত্রে আপনি আমাদের বাড়ীতে খাবেন।

কেন?

কোন কারণ নেই; মার ইচ্ছা।

হঠাৎ?

আপনি এত প্রশ্ন করবেন জানলে মার কাছ থেকে উত্তরগুলো জেনে আসতাম।

ওর কথা শুনে আমি একটু হাসি।

আসবেন ত?

আসব; তবে ন'টা বেজে যাবে।

তা বাজুক। আলপনা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলি।

এতক্ষণে আমার খেয়াল হলো ওকে এক কাপ চা পর্যন্ত দিলাম না। বললাম, আপনাকে ত এক কাপ চাও খাওয়ালাম না।

এখন আর সে কথা বলে লাভ নেই। চলি।

আলপনা চলে গেল।

(ক্রমশঃ)

ঘড়ি
ও
গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত
রায় কাজিন এণ্ড কোং
জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স
৪, বি, বি, ডি বাগ, কলি-১
ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির
অফিসিয়াল এজেন্টস্

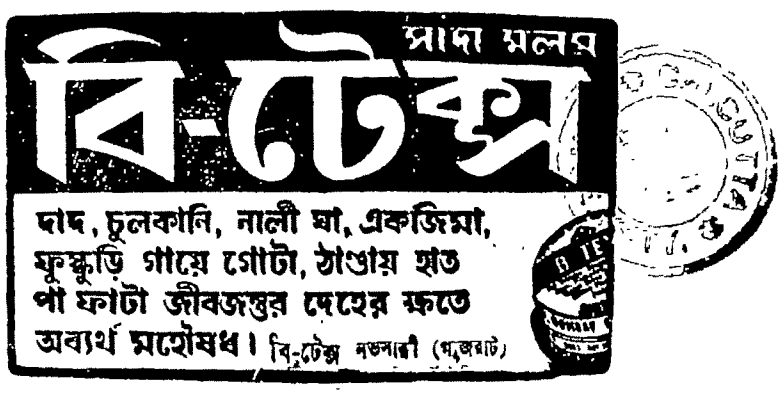

মনের অসুখ

প্রসূনবাবুর মুখে স্ত্রী লতিকার সঙ্গে তাঁর মনান্তরের বিবরণ শুনলাম।

প্রায় দশ বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে তখন ওর বয়স ছিল ষোলো, আমার বত্রিশ। প্রথম বছর পাঁচেক বেশ শান্তিতেই ছিলাম, কিন্তু গত পাঁচ বছরে ওর অত্যাচারে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি। বছরে তিন-চার বার ও একেবারে ক্ষেপে যায়। সামান্য কথাকাটাকাটি থেকে একেবারে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। ছেলেদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে, বাধা দিতে গেলে আমার গায়েও দু-চার ঘা দিতে কসুর করে না। চ্যাঁচামেচির ফলে বাড়ী শুদ্ধ লোক জড় হয়, মাঝে মাঝে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে পড়ে, আশে-পাশের বাড়ীর বৌ-ঝিরা জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। আমি রেগে কোন কথা বললে : হুন-হুন করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। সোজা ট্যাকসি করে যায় ভবানীপুর থেকে দমদমে দিদির বাড়ী। ছেলেটার বয়স আট, মেয়েটার পাঁচ। এখন ওরা মায়ের জন্য কান্নাকাটি করে না। কিন্তু প্রথম-প্রথম ছেলেটা তখন চার, মেয়েটার এক বছর ও পেরোয় নি ওদের কান্নাকাটিতে বিব্রত হয়ে আমি ফোন করে, ওর দিদির বাড়ী গিয়ে মান ভাঙিয়ে ওকে নিয়ে আসতাম। অনেক বার আমাকে সম্মান খুইয়ে দমদম ছুটতে হয়েছে বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। বাড়ীতে এর জন্যে আমার পজিশন একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা দুই ভাই। আমিই বড়। ছোট ভাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে, বাবা-মাও আমাকে ভালবাসেন—তাঁদের কথা বলছি না। আমার পজিশন নষ্ট হয়েছে বৌমার কাছে। বৌমা লেখাপড়া জানা বড় ঘরের মেয়ে। ওর বাবার বিরাট কারবার, খানকতক বাড়ী আছে এই শহরে। লতুর পাগলামিটা ছোট ভাইয়ের বিয়ের পরই শুরু হয়েছে। তাতেই লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। বৌমাকে ও হিংসে করে আর স্টো বাড়ি শুদ্ধ সবাই বুঝতে পেরেছে।

—কি নিয়ে হিংসে করে? একটু বুঝিয়ে বলুন।

—তা হলে আর একটু গোড়া থেকেই শুরু করতে হয়। আমাদের সোনা-রূপোর কারবার। তিন পুরুষ ধরে আমরা ব্যবসাই করে আসছি। গুরুর আশীর্বাদে এই কলকাতা শহরে আমাদের খানচারেক দোকান কারখানায় পঁচিশ-তিরিশজন লোক কাজ করে। এ ছাড়া আমরা আজকাল বস্তানীর কারবারেও নেমে পড়েছি। দোকানগুলো সব বাবা দেখাশুনো করেন। আর নতুন ব্যবসাটা পুরোপুরি ছোট ভাই-এর হাতে। আমি ভাল্লাববাবু একটু শান্তিপ্রিয় মানুষ, ঐসব কারবারের ঝুটকামেলা আমার সহ্য হয় না। ছোটবেলা থেকে ধর্মকর্মের দিকেই আমার ঝোঁক।

আর এই নিয়ে ওর যত আক্রোশ। আমি কেন পুজুরী বামুনের মত থাকব? আমি কেন অফিসে যাব না? দোকানে বসব না? কেন কান্তির মানে আমার ছোট ভাইএর মত আমি একখানা আলাদা গাড়ী পাব না? কেন বড় ভাই হয়েও বাড়ীতে আমার প্রেস্টিজ নেই?...দিনরাত্র এই সব নালিশ শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা।

—আপনি কি ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে একেবারেই থাকেন না? বাড়ীর কোন কাজ আপনি দেখাশোনা করেন?

—ব্যবসা ছাড়া কি বাড়ীর আর কোন কাজ নেই? অনেকটা জায়গা নিয়ে আমাদের বাড়ী। ভাড়া দেবার জন্যও বাবা খানকতক বাড়ী করিয়েছেন। এ-সবের মেরামতি তদারকি আমাকেই করতে হয়। তাছাড়া গৃহদেবতা আছেন তাঁর নিত্যকর্মের সব ব্যবস্থাই তো আমাকে দেখতে হয়। এ-সব লতুর কাছে কাজই নয়। রেগে গেলে বলে এ সব নাকি দারোয়ান গোমস্তর কাজ। গড়িয়াতে আমাদের একটা বাগান আছে, ফুল ফল, তরিতরকারীর তত্ত্বতল্লাশ করতে সপ্তাহে দু-তিন দিন সেখানে যেতে হয়। সেটা নাকি মালির কাজ। আসলে বৌমাকে ও দেখতে পারে না। বৌমা কেন রোজ গাড়ী করে ঘুরবে, বৌমা কেন এত বড় ঘরের বউ হয়ে মাষ্টারনীর মত ছেলে পড়াতে যাবে

—আপনার ছোট ভাই-এর বউ কি কাজ করেন?

—বয়স্কদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে গাড়ী করে দুপুরবেলা এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে। গাড়ীখানা ওর বাবা দিয়েছেন। আমার স্ত্রী খুব দরিদ্র পরিবারের মেয়ে, বৌমাকে তাই ও একেবারে দেখতে পারে না। এখন ভাবি—কেন যে মায়ের কান্নাকাটিতে বিয়ে করতে রাজি হলাম। বাড়ী শুদ্ধ সবার নার্ভের ওপর দারুণ চাপ পড়ছে, লতুর এই পাগলামি আমরা সহ্য করতে পারছি না। ডাঃ সাহা বলেছেন ওকে মনের রোগের হাসপাতালে পাঠাতে, কিন্তু আমরা রাজী হতে পারছি না। মা-বাবা তো ভাবতেই পারেন না যে তাঁদের বাড়ীর বউ পাগলা গারদে থাকবে। চারদিকে একেবারে টি টি পড়ে যাবে, আত্মীয়স্বজনের কাছে মুখ দেখানো যাবে না। আমরা ডাক্তার সাহাকে বলে দিয়েছি—না। এমনি বাড়ীতে রেখে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না কি?

—রোগীকে আমি দেখি নি, জানি না। আমি কি করে বলব? তিনি যে পাগল—এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত হলেন কি করে?

এইবার একটু হাসলেন ভদ্রলোক। পাঞ্জাবীর হাতা তুলে দেখালেন তাঁর বাঁ হাতের অনেকটা জায়গা ব্যাণ্ডেজ করা রয়েছে। লতুর কীর্তি। ছেলেটাকে কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছিল, হাত দিয়ে আটকে দিতে ক্ষেপে গিয়ে পেন্সিল কাটা ছুরি দিয়ে ওঁর হাতে কয়েকবার আঘাত করেছে। ছেলেটাকে তিন মাস চার মাস অন্তর দু-একটা স্টিচ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়। এ যাবৎ বরাবর দু-একদিনের মধ্যেই দম-দম থেকে ফিরে এসেছে। যখন ফিরে আসে তখন ওকে দেখলে মনেই হবে না যে দু দিন আগে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধরে তাণ্ডব নৃত্য করে গেছে। পাগলামীর ঝোঁকে যেমন হুট করে আসে, তেমনি ঝট করে চলে যায়। এবার স্পেলটা কাটছে না। আজই ওর দিদি ফোন করেছিলেন—এবার অন্য রকম হয়ে গেছে, কিছুতেই ভবানীপুর ফিরবে না ভিক্ষে করে খাবে তবু শ্বশুর বাড়ীর অন্ন মুখে তুলবে না।

—চিকিৎসাতে তিনি রাজী হবেন কি?

—ওর দিদি বলেছেন রাজী করাতে পারবেন। আমার ওখানে ফেরার জন্যে নয়, রাগ কমানোর জন্যে ও-চিকিৎসা করতে রাজী আছে। রাগ পড়ে গেলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে আদর করতে করতে বলে—আমি কি করব? আমি যে সামলাতে পারি না। রোজ সকালে উঠে ঠাকুরের কাছে ও নাকি প্রার্থনা করে, রাগ কমানোর জন্যে ঠাকুরকে ডাকে, কিন্তু রাগ কমে না। ওষুধপত্রও অনেক খেয়েছে, শুধু ঘুম বেড়েছে—আর কোন ফল হয় নি। ওষুধের ঘোরের মধ্যে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ মারধোর চেঁচামেচি করে না—এই পর্যন্ত।

লতিকা যা বলল তার সারমর্ম এই : আমার ছেলে-মেয়েদের হেনস্থা করা হয়

ও বাড়ীতে। কারণ কি জানেন? আমরা গরীব। ছেলে বাড়ী ভুলে হয়ে ঘুরে বেড়াত, কিছুতেই সংসার করবে না, পড়াশুনো কাজকর্মে কোন দিন মন ছিল না। শ্বশুর ভাবলেন যেমন করে হোক ছেলের বিয়ে দিতে পারলে বুঝি তাকে ঘরমুখো করতে পারবেন। এক বিয়ে বাড়ীতে আমাকে দেখে আর গান শুনে শাশুড়ীর খুব পছন্দ হল। তখন সত্যিই দেখতে ভাল ছিলাম গানের গলাটাও ভগবান ভালই দিয়েছিলেন। ভজন গাইতে গেলে এখনও চোখের জল আটকাতে পারি না। স্বামীকে অনেক কসরৎ করে ওঁরা আমার গরীব দিদির বাড়ীতে এনে আমার গান শোনালেন। স্বামী ঠাকুরদেবতার গান শুনতে খুব ভাল বাসতেন। চেহারা দেখে নয়, উনি বলেছেন গান শুনে ওঁর মন টলালো, বয়সের ফারাকটা তখন আর ওঁর কাছে তেমন কিছু একটা বেশি মনে হল না। উনি রাজী হলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বংশের বড় ছেলেকে ঘরমুখো করতে পেরে ওঁরা সত্যিই খুশী হলেন। বিয়ের পর পাঁচ বছর স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কেটে গেল। রূপকথার সেই ঘুঁটেকুড়ুনীর মেয়ে যেন রাজরাণী হল। আমাকে ঘিরে রোজ সন্ধ্যায় আসর বসত। আমি ভজন গাইতাম, পদাবলী শোনাতাম, বাড়ীর ঝি চাকর দারোয়ান ড্রাইভার সব উঠোনে জড় হয়ে আমার গান শুনত। শাশুড়ী আর স্বামী নিয়মিত হাজির হতেন গানের আসরে। স্বামীর উড়োনচণ্ডীপানা অনেকটা কমল, তীর্থভ্রমণের নেশাটা কাটল। আমাকে নিয়ে কি বছর গরমে পাহাড়ে, শীতে অন্য কোন জায়গায় বেড়াতে যেতেন। চার বছরে আমি দুটো বাচ্চার মা হলাম। এই সময় নানা বিদ্যাবিশারদ হয়ে কান্তি বিদেশ থেকে ফিরল তাকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। নতুন ব্যবসা শুরু করল সে। সেই ব্যবসা সূত্রে আলাপ হল গীতার বাবার সঙ্গে। কিছু দিনের মধ্যেই গীতার সঙ্গে ঠাকুরপোর বিয়ে হল। গীতা বি-এ পাশ; গীতা গাড়ী চালায়, গীতা পিয়ানো বাজায়; বাড়ীর সবাই রাতারাতি গীতার ভক্ত হয়ে উঠল। আমার ছেলেটাকে তো গীতা একেবারে বশ করে ফেলল। কাকীর কাছে নাওয়া-খাওয়া কাকীর সঙ্গে গাড়ী করে বেড়ানো কাকীর কাছে ঘুমুনো—আমার সঙ্গে সম্পর্কটা প্রায় চুকেই গেল। শ্বশুর শাশুড়ী স্বামী সকলকেই যেন তুক করল গীতা। জানেন বোধহয় ওদের গয়নার দোকান আছে। নতুন ডিজাইন তৈরী করে গীতা। ঠাকুরপোর বাইরে গয়না, খেলনা পাঠাবার ব্যবসার ব্যাপারেও গীতার পরামর্শ নিতে হয়। এতসব করেও গীতা দুপুরে গাড়ী করে অনাবাড়ীর কাজের লোকেদের লেখাপড়া শেখাবার স্কুলে যায়, নিজে মাষ্টারী করে। আমার স্বামী—শুধু স্বামী কেন বাড়ীর সবাইয়ের মুখে শুধু গীতার প্রশংসা। আমার গানের আসরের শ্রোতা কমতে লাগল, বছর খানেকের মধ্যে আসর উঠেই গেল। বিলিতি বাজনার টিউনিং শোনবার জন্যে ভিড় জমতে লাগল গীতার ঘরের আশেপাশে। এক সন্ধ্যায় পিয়ানোর বাজনা শুনতে শুনতে আমার মাথার মধ্যে কেমন করে উঠল। হারমনিয়ামটা টেনে নিয়ে একটা কিছু বাজাতে গেলাম, ভাল লাগল না, সব যেন কেমন বেসুরো বেয়াড়া হয়ে গেল। এই সময় স্বামী কি একটা কাজে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম বোধহয় পিয়ানোর আসর থেকে আমার ভজন শুনতে এসেছেন। আমি ওঁর ফেভারিট গানটা—যেটা শুনে উনি বিয়েতে মত দিয়েছিলেন, সবে ধরেছি এমনি সময় উনি বললেন, লতু তোমার কাছে মাথা ধরার কোনো ট্যাবলেট আছে? আমার ড্রয়ারে দুটো ট্যাবলেট ছিল খুঁজে পাচ্ছি না। গীতার পিয়ানো শুনতে আজ একসপোর্ট কন্ট্রোলের বড় কর্তারা এসেছেন কিন্তু ও মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছে।

আমার গান বন্ধ হয়ে গেল, মনে হল আমার গলাটা যেন উনি দুহাত দিয়ে চেপে ধরেছেন। মাথার ভেতরে আগুন জ্বলে উঠল, হারমোনিয়ামের ডালাটা দিয়ে টেবল ল্যাম্পের ওপর আঘাত করলাম বাল্বটা ভেঙ্গে গেল ঘর অন্ধকার কিন্তু আমার চোখের সামনে আলোর ঝিলিমিলি...

প্রথম দিনের ইতিবৃত্ত বলতে বলতে মেয়েটির চোখেমুখে অস্বাভাবিক ভাব ফুটে উঠল। মুখে কে যেন সিঁদুর লেপে দিয়েছে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল : আবার ভর হচ্ছিল, অতি কষ্টে সামলে নিয়েছি। এইরকম হয়, বুঝলেন। তখন আমি আর নিজেকে সামলাতে পারি না। সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে ফেলতে ইচ্ছে করে। তখন বোধহয় আমি মানুষ খুন করতেও পারি। আমি পাগল নই ডাক্তারবাবু আমার মধ্যে কে যেন ভর করে তখন কার মত জ্ঞানগম্যি লোপ পায়। মাথা ঠাণ্ডা রাখার অনেক ওষুধ খেয়েছি। অনেক তেল মেখেছি কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আমি চাই না আমি আমার খোকনকে মারি, আমি চাইনা আমি চ্যাঁচামেচি করে বাড়ির লোকের হাসির খোরাক জোগাই, কিন্তু আমি কিছুতেই রাগ সামলাতে পারি না! এর জন্যে দায়ী কে জানেন? ঐ উনি —এই বলে স্বামীর দিকে আঙুল তুলল।

—উনি কি আপনাকে অযত্ন করেন?

ওঁর যত্ন অযত্নের কি দাম আছে? বাড়ীর দারোয়ানের যেটুকু ক্ষমতা আছে ওঁর সেটুকুও নেই। বাড়ীর বড় ছেলে হয়েও ওঁর কোনো ক্ষমতা নেই। মার্কেটে যেতে গেলে একটা গাড়ী পাব না, সিনেমায় যেতে হলে ট্যাকসী ডাকতে হবে অথচ বাড়ীতে তিন তিনখনা গাড়ী। আমার দরকার—

এইখানে স্বামী বাধা দিলেন। তিনখানা নয় দুখানা; একটাতো গীতার নিজস্ব। আমার ছেলেমেয়েকে গীতা নিজে গাড়ী করে স্কুলে

সমবায় প্রকাশনীর বই

কিশোর জ্ঞানকোষ

[দুই খণ্ডে] পঞ্চাশ টাকা

কিছু কিছু বিষয়সূচী : পৃথিবী প্রাণ মানুষ পরিবার ও সমাজ ভাষা ভূগোল ইতিহাস মহাদেশ মহাকাশ বিজ্ঞান চিকিৎসাবিজ্ঞান অর্থনীতি শিল্প সমবায় সাহিত্য সংগীত ও নৃত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য ও স্থাপত্য যাত্রা-থিয়েটার চলচ্চিত্র - টেলিভিশান ভারতবর্ষ কলকাতা। [প্রয়োজনীয় চিত্রসহ]

এ ছাড়াও থাকছে কিশোর-কিশোরীদের ক্যারিয়ার নির্বাচনের সূত্র এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে অংশ গ্রহণের হাতে খড়ি।

উপরন্তু থাকছে নানা মৌলিক মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী অপরিহার্য সাহায্য ও তথ্য। যেমন—যারা কবি সাহিত্যিক শিল্পী খেলোয়াড় বিজ্ঞানী অভিনেতা ও যন্ত্রবিদ হতে চায় এই জ্ঞানকোষ তাদের কার্যকর সাহায্য যোগাবে। এই প্রচেষ্টা একেবারে অভিনব।

সম্পাদনা করছেন : বিভিন্ন বিভাগে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞগণ এবং কলকাতা যাদবপুর কল্যাণী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ।

গ্রাহকমূল্য ৩৮ টাকা। মাত্র আট টাকা দিলেই গ্রাহক হওয়া যাবে। মনি-অর্ডারেও টাকা গৃহীত হবে। গ্রাহক সংখ্যা সীমিত। অবিলম্বে যোগাযোগ করুন।

মডেল পাবলিশিং হাউস : ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট / কলকাতা-১২

দিয়ে আসে নিয়ে আসে; অন্য দুখানা আপিস দোকানের কাজে রাত আটটা পর্যন্ত আটকে থাকে।

—ওঁকে ওঁর কথা বলতে দিন প্রসূন-বাবু বাধা দেবেন না। আচ্ছা আপনি শ্বশুর-বাড়ী ফিরতে চাইছেন না কেন? রাগ কমানোর চিকিৎসা তো বাড়ী থেকেই হতে পারে।

ওখানে আমাকে কেউ চায় না। ছেলে-মেয়েদেরও ওঁরা বুঝিয়েছেন—আমি পাগল, আমার কাছে আসতে নেই। তাছাড়া ওখানে আমার অবস্থা দাসীবাঁদীরও অধম। একটা শাড়ী কিনতে হলেও আমাকে দরবার করতে হয় স্বামীর কাছে, স্বামীকে দরবার করতে হয় তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে—

আবার বাধা দিলেন প্রসূনবাবু : মিথ্যে কথা বলো না, কোন জিনিসের জন্য তোমাকে দরকার করতে হয় নি কোনদিন। আমাদের ডাক্তারবাবু, সেই সেকেলে যৌথ পরিবার। কাপড়জামা কেনাকাটার ব্যাপার বছরে দুবার। পুজোতে আর নববর্ষে। মাঝে কারুর কোন শখ হলে, বাবাকে জানাতে হয়। এর মধ্যে অন্যায় কি আছে—বলুন তো?

—গীতা তোমার বাবার কাছে হাত পাততে যায়? সেদিন ওর ছোট বোনকে দেড় হাজার টাকার রেকর্ড প্লেয়ার দিল, তোমার বাবার কাছে দরবার করেছিল সে জন্যে? ঠাকুরপোর অ্যাকাউন্টে টাকাটা খরচা লেখা হল? আর আমার বেলায় পঞ্চাশ টাকার একটা শাড়ীর জন্যে তিন দরবারে ধর্ণা দিতে হয়—উত্তেজিত হয়ে উঠল মেয়েটি।

—আমি সেকেলে মানুষ, আজে-বাজে জিনিষ কিনে টাকা নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে করে না। আমার নিজের বছরে দখানা ধুতি আর তিনটে হাফসার্টের বেশি কিছু দরকার হয় না। রেকর্ড প্লেয়ার টেপ রেকর্ডার, হাজারো রকমের গ্যাজেট নিয়ে মেতে থাকা এ যুগে একটা ব্যাধি। মানুষের প্রয়োজন ইচ্ছেমত বাড়ানো যায়। আমার তাতে সায় নেই —স্বামী গম্ভীরভাবে মত প্রকাশ করলেন।

—নিজের বেলায় আর নিজের বৌ-এর বেলায় যত ধর্মজ্ঞান আর বক্তৃতা। ঠাকুরপোর বেলায়, গীতার বেলায় কই—এসব বক্তৃতা কোথায় তোলা থাকে? ভণ্ড তপস্বীর মুখোশ খুলে দিতে আমার এতটুকুও আটকাবে না বলে দিচ্ছি। ক্ষমতা নেই তাই বল! তা না যত সব বড় বড় কথা!—হাঁপাতে লাগল মেয়েটি।

স্বামীর কোন উত্তেজনা নেই। আমি ইঙ্গিতে তাঁকে বাইরে যেতে বললাম।

স্বামী বাইরে যেতেই লতিকা টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কয়েক মিনিট ধরে কাঁদল, তারপর চোখ মুছে, চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে ভাঙা গলায় বলতে লাগল : আসলে গরীবের মেয়ে বলে স্বামী আমাকে নিজের লোক ভাবতে পারেন না, মনে মনে আমাদের বাড়ীর সবাইকে ওঁদের থেকে ছোট মনে করেন। শ্বশুর-শাশুড়ী অন্য রকম, তাঁরা সত্যিই ভাল মানুষ আমাকে গরীব বলে কোনদিন অবহেলা করেছেন বলে মনে হয় না।

—তবে আপনি ও বাড়ীতে ফিরে যেতে চান না কেন?

আবার ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—কি করে যাই বলুন। এবার রাগের মাথায় শ্বশুরমশাইকে যা তা বলে গাল দিয়েছি। একটা গেলাশ ছুড়ে মেরেছিলাম, ভাগ্যি ভাল, তাঁর গায়ে লাগে নি। আমি যেতে চাইলেও স্বামী আমাকে নেবেন না।

—কি হয়েছিল সেদিন? কেন অত রেগে গিয়েছিলেন?

অশ্রুসজল চোখে মেয়েটি ঘটনার বিবরণ দিল : ছেলে-মেয়েকে ওদের কাকী আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, আমার চেয়ে ওরা কাকীকে বেশি ভালবাসে। আমারই দোষ। অত মারধোর করলে ভালবাসবে কি করে? তাছাড়া, বাড়ীর কাজের লোকেরা পর্যন্ত যাকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাকে ওরা শ্রদ্ধা করতেও পারে না। সেদিন গীতাদের বাড়ীতে ও বাড়ীর সবার নেমতন্ন, আমারও। গীতার দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন হচ্ছে খুব ঘটা করে। রাত পর্যন্ত আমি ভালই ছিলাম গীতার বাড়ী যাব বলে ভুল্ট থেকে গয়নাগুলো আনিয়ে রেখেছি, শাড়ী ব্লাউজ গুছিয়েছি, সকাল সকাল তিনটে গাড়ী করে আমরা বেরিয়ে পড়ব ব্যবস্থা হয়েছে। হঠাৎ সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে রেডিওতে সেই গানটা শুনলাম। বেটার কথা একটু আগে আপনাকে বলেছি। স্বামীর খাটের কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে তার গায়ে হাত ছোঁয়ালাম। আমার সারা গায়ে কি রকম একটা শিহরণ..., মনে হল যেন দশ বছর আগের সেই দিনটাতে ফিরে গেছি। ভোরের নরম আলো, মৃদু বাতাস আমাকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল। ওঁর ঘুম ভাঙছে না দেখে রাগ হল। একটু জোরে ধাক্কা দিতে উনি ধড়মড় করে উঠে বললেন—কী, ব্যাপার কী? আমি বললাম রেডিওতে সেই গানটা হচ্ছে। হাঁই তুলে বললেন, রেডিওটা বন্ধ করে দাও মিছিমিছি ঘুম ভাঙিয়ে দিলে বলে আবার শুয়ে পড়লেন। আমার মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল। রেডিওটাকে তুলে নিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিলাম। বেশ জোরে শব্দ হল। স্বামীর ঘুম ভাঙ্গল না, ভাঙ্গলেও উনি সাড়া দিলেন না। আমার রাগ অভিমান জানাবার জায়গা নেই ভেবে বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল। তখুনি দুমদাম করে ভেতলায় উঠে গীতার দরজায় ঘা দিলাম। চোখ মুছতে মুছতে গীতা বেরিয়ে আসতেই বললাম—খোকনকে তুলে দাও এখুনি। ওর চোখে মুখে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠল কিনা দেখবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি ঘরে ঢুকে ছেলেটাকে টেনে তুলে টানতে টানতে নিজের ঘরে এনে ওকে কাপড় জামা পরে রেডি হতে বললাম ততক্ষণে স্বামী জেগে উঠেছেন, গীতা নেমে এসেছে, খোকন কান্না জুড়ে দিয়েছে, মেয়েটাও ওর সঙ্গে গলা মিলিয়েছে। নিশ্চয়ই সে এক বিচ্ছিরি কাণ্ড, কিন্তু সে সব বোঝার মত মনের অবস্থা ছিল না। কোথায় যাবে এত সাত সকালে? একটু বাদেই তো গীতাদের বাড়ী যেতে হবে। স্বামী বার বার এই সব কথা বলছিলেন সবটা আমার কানে যাচ্ছিল না। সুটকেস গোছাতে গোছাতে বললাম, স্বপ্ন দেখেছি দিদির খুব অসুখ, আমাকে এখুনি যেতে হবে। গীতা বলল, লোক পাঠিয়ে খবর নিতে, স্বামী বললেন, তিনি পাশের বাড়ীতে ফোন করে খবর নিচ্ছেন, স্বপ্ন দেখেই ছুটতে হবে কেন? আমি কোন উত্তর না দিয়ে নিজের কাজ করে যেতে লাগলাম। ওরা আমায় চেনে কাজেই বাধা না দিয়ে বলল,—তুমি যাবে যাও, কিন্তু ছেলেমেয়েকে নিতে পারবে না, ওরা যেতেও চায় না। আমি তখন ছেলেটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাচ্ছি আর বোধ হয় বলছি—যেতে হবে, যেতে হবে। আমার ছেলে আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাব, কেউ বাধা দিতে পারবে না। কখন শ্বশুরমশায় এসে ঘরে দাঁড়িয়েছেন টের পাই নি। তিনি বোধ হয় একটু রুক্ষভাবে বলেছিলেন—এ সব পাগলামি ছেড়ে দাও বউমা, আমি এখুনি দারোয়ান পাঠিয়ে দমদম থেকে খবর আনছি। গাড়ী করে যাবে গাড়ী করে আসবে, এক ঘন্টার মধ্যে তুমি দিদির খবর পেয়ে যাবে। আমার মনে আছে, বেশ মনে আছে, আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম আর বলেছিলাম : বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান আমার ঘর থেকে, অসভ্য ইতর সব। ভোর বেলায় হল্লা করতে এসেছেন আমার ঘরে। তার পর টিপয় থেকে জলভরা গেলাশটা তুলে ছুঁড়ে মেরে নিজের সুটকেশটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

লতিকা আবার আস্তে আস্তে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ছোট মেয়ের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.ডি.জি.ও.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌন বিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী • ৩৫এ, স্যাডন ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

বিজ্ঞানের কথা

বৈজ্ঞানিক বিচারে যোগক্রিয়া

হঠযোগীদের কাণ্ডকারখানা অনেকেই দেখেছেন। তাঁরা পেরেকের বিছানার ওপরে বসে বা শুয়ে থাকেন, জলের ওপর দিয়ে হাঁটেন, মাটির নিচের গর্তে মাটিচাপা অবস্থায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্প্রতিকালে যোগব্যায়াম সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী হয়েছেন। দাবি করা হচ্ছে, যোগব্যায়ামে বহু ব্যাধি সারে। আর যোগীদের সম্পর্কে আশ্চর্য অলৌকিক সব কাহিনী তো অনেক কাল থেকেই প্রচারিত। আমাদের আলোচনার বিষয়, 'যোগ' ব্যাপারটা কী? যোগ-কে বিজ্ঞানীরা কী চোখে দেখেন? নয়াদিল্লীর সরকারী ভারত চিকিৎসবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের দুজন গবেষক বিজ্ঞানী (ডঃ জি এস ছিনা ও ডঃ বলদেব সিং) এ-বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। এই প্রবন্ধের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের কিছু বক্তব্য আমরা উপস্থিত করছি।

যোগ কথাটার মানে কী? বলা হয়ে থাকে, প্রাণ ও মহাশক্তির মিলনই হচ্ছে যোগ। ব্যাখ্যা করতে হলে বলা হয়, যোগ হচ্ছে চেতনার অচঞ্চলতা ও আভ্যন্তরিক সমতা অর্জন। এমন এক অবস্থা যে বাইরে থেকে উত্তেজনার যতোই কারণ ঘটুক চেতনার সংযম তবুও অবিচলিত।

যোগাভ্যাস নানা রকমের হয়ে থাকে। যথা—আসন, প্রাণায়াম, বন্ধ। যোগাভ্যাসের ফলে অবশ্যই পেশীচলনা ঘটে ও সন্নিস্থলনাভাবে সচল হয়। যোগাভ্যাস শুরু করার আগে আরো কিছু অভ্যাস করার প্রয়োজন ঘটতে পারে। যথা—যম, নিয়ম, প্রত্যাহার ও ষট্‌কর্ম। যম হচ্ছে নিবারণ, নিয়ম হচ্ছে পালন, প্রত্যাহার হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ, ষট্‌কর্ম হচ্ছে শুদ্ধির জন্য ছয়প্রকারের বিধি।

আসন করার সবিশেষ ফল পেশীর সক্রিয়তা, যেমন স্থিরতার দিক থেকে তেমনি সচলতার দিক থেকে। আসন এমনভাবে করা হয় যেন একটিতে যে-পেশীর সক্রিয়তা, অপরটিতে তার বিরুদ্ধ পেশীর। কোনো কোনো আসন খুবই সহজ, কোনো কোনো আসন এতই দুরূহ যে শরীর পুরোপুরি সমর্থ অবস্থায় না থাকলে চেষ্টা করাও অসম্ভব।

আসনের বিভিন্ন ভঙ্গী শরীরকে কখনো সম্পূর্ণ শিথিল করে তোলে, কখনো কঠোরতম ব্যায়ামের অবস্থায় নিয়ে যায়। কতকগুলো ভঙ্গী আছে যা ধ্যান ধারণা সমাধি প্রণায়াম ও কুণ্ডলিনী-শক্তি অভ্যাস করার জন্য প্রযুক্ত।

স্বেচ্ছাঘটিত ও স্বতঃঘটিত ক্রিয়াকাণ্ড এবং মানসিক তৎপরতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পেশীর এই প্রণালীবিদ্ধ ব্যবহারের ফল লভ্য চালনগত ব্যাপারে, তা থেকে পেশীগত ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এক বিশেষীকৃত ব্যবহারে। এই সমস্ত কিছুর পরিণামসিদ্ধ ও সুবিন্যস্ত অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিবিশেষ হয়ে ওঠেন যোগী। তার নানা ধরন, কিন্তু এমনও হতে পারে যে শারীরিক তৎপরতা সম্পূর্ণ বর্জিত। তখন শুধুই সমাধি, যার উদ্দেশ্য মানসিক ও আত্মিক উৎকর্ষ অর্জন। যোগের প্রকরণে এই বিপুল অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে কখনো কখনো বুঝতে ভুল হয়ে যায় যে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলিত যোগাভ্যাস ও সমগ্রভাবে আচরিত যোগব্যবস্থা এক জিনিস নয়।

গবেষক বিজ্ঞানীর কাছে তাই সমস্যাটা হচ্ছে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুসন্ধানের—শুধু শারীরিক সাধনের নয়, স্বয়ং যোগীর বিষয়গত অভিজ্ঞতারও। যোগী যে অভিজ্ঞতা বিবৃত করেন তার বিষয়গত যাচাই কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমনকি যোগী যে-সমস্ত ক্ষমতার নিদর্শন রাখেন—যেমন অপরের চিন্তা পাঠ করা, ভবিষ্যদ্বাণী করা, ইত্যাদি ইত্যাদি—তাও গ্রাহ্য হতে পারে পরিসংখ্যানগত বিচারে সিদ্ধ হলে পরে।

বিষয়ীর বিবরণে যে পরীক্ষাগত ও শারীরগত পরিক্রমার পথ পাওয়া যায় তা যদিও অভিন্ন কিন্তু পরিণামের বিচারে অতিশয় বিভিন্ন। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিক আয়োজনের অগ্রগতি সত্ত্বেও বিজ্ঞানী এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে শরীরের সাড়া লিপিবদ্ধ করতে অপারগ। সেখানে বিষয়ীর সঙ্গে ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়ার একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

তাহলেও গবেষণা কিছু হয়েছে এবং তার পরিমাণও নিতান্ত কম নয়।

আসন করার একটা ফল এই যে শরীরের সন্ধিগুলোর সচলতা অনেকখানি ব্যাপক হয়ে ওঠে। আসনের ভঙ্গিটি যদি অনায়াস-আয়ত্ত করতে হয় তাহলে সেই বিশেষ পেশীগুলিকেই শিথিল করা দরকার যা অভীষ্ট সচলতার জন্য ব্যবহৃত হয় না। বিষয়টি সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানা গেলে আসন করার মধ্যে দিয়ে সচলতা-সাধনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে আরো উন্নত করে তোলা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে লক্ষ্য করা গিয়েছে, হৃৎপিণ্ড রক্ত-ধমনী, শ্বাসপ্রশ্বাস ও বিপাকের ওপরে আসনের কিছু ক্রিয়া থাকে। এই ক্রিয়ার চেহারা নির্ধারণ করার জন্য গবেষকরা সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের গবেষণার ফল হিসেবে একটি আসন ইতিমধ্যেই শারীরিক ও মানসিক সতেজতা সম্পাদনের সহায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তা হচ্ছে শবাসন। এই আসনে অনুকৃত ভঙ্গিটি মৃতের। লক্ষ্য করা গিয়েছে এই আসন করার সময়ে রক্তের চাপ ও বিপাকক্রিয়ার হার কমে যায়, শ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের হার ধীর হয়, চামড়ার উত্তাপ বাড়ে।

অপর একটি আসন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা চলছে। শীর্ষাসন বা মাটিতে মাথা রেখে ও পা ওপরে তুলে দাঁড়ানো। জানা গিয়েছে অনভ্যস্ত কোনো ব্যক্তি যদি শীর্ষাসন করেন তাহলে তার শরীর স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থার চেয়ে ৪৮ শতাংশ অধিক অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে, আর শায়িত অবস্থার চেয়ে ৬০ শতাংশ অধিক। এই ভঙ্গিতে থাকার সময় মস্তিষ্কে রক্ত-চলাচল বেড়ে যায়, পায়ের রক্তচাপ কমে, হাতের রক্তচাপ বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের হার কমে। শীর্ষাসনে দীর্ঘস্থায়ী কোনো সুফল আছে

কিনা তা এখনো গবেষণার বিষয়। আশু সুফল অবশ্যই কিছু আছে।

অধিকাংশ আসন অভ্যাস করা হয় কোনো না কোনো প্রাণায়াম সহযোগে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গিয়েছে প্রাণায়াম-কারী ব্যক্তির বিপাকক্রিয়া, হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার হ্রাস পায়, চামড়ায় রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, রক্তের চাপ সামান্য কমে এবং স্নায়ুর তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষণ-সূচক আরো কিছু ব্যাপার ঘটে।

যোগীরা প্রাণায়ামের ওপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। কেননা কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতা প্রাণায়ামকারীর আয়ত্তে এসে যায়—যেমন, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা, সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু স্বতঃঘটিত ক্রিয়াকান্ড নিয়ন্ত্রণ করাও। ইচ্ছামতো শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করা গেলে প্রয়োজন অনুযায়ী অবস্থাতেও শরীরকে আনা সম্ভব। এ এক মস্ত ক্ষমতা। এমনিতে স্বতঃঘটিত ক্রিয়াকান্ডের অবস্থায় শরীরের ওপরে স্বেচ্ছাঘটিত নিয়ন্ত্রণের একটা সীমানা থাকে কিন্তু প্রাণায়ামকারী যেহেতু শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অধিকারী অতএব এই সীমানা লঙ্ঘনে সমর্থ। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাণায়ামের ক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন ফুসফুসের গ্যাস বিনিময়ের নিরীখে এবং রক্ত ও গ্যাসের (কার্বন ডাই-অকসাইড ও অকসিজেন) গড়নের নিরীখে। সরাসরি সাক্ষ্য অবশ্য দুর্লঙ্ঘ, কিন্তু এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো গিয়েছে যে প্রাণা-য়ামের ফলে শরীরে ভিতরে নানা পরিবর্তন ঘটে। স্নায়ুতন্ত্র তাতে উজ্জীবিত হয় এবং বিশেষ গ্ল্যান্ড থেকে নিঃসরণ ঘটে। সব মিলিয়ে ফললাভ এই যে শরীরের স্বতঃঘটিত সাড়াগুলোকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। স্বতঃঘটিত ক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হতে পারে হৃৎপিন্ডের নাদ বন্ধ হয়ে যাওয়া, খাদ্যনালীতে বা মূত্রাশয়ে চলাচল ও চাপ নিয়ন্ত্রিত হওয়া ঘাম নিবারিত হওয়া, ইত্যাদি। হৃৎপিন্ডের শব্দ ও নাড়ী বন্ধ হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত কোনো কোনো বিজ্ঞানী খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের ধারণা, এ-ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডের ওপরে স্বেচ্ছা-ঘটিত নিয়ন্ত্রণের ফলে।

যোগীরা কি তাঁদের হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ করতে পারেন? নানা বিজ্ঞানী নানা সময়ে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন, যোগীদের পক্ষে তাও সম্ভব। তা করার জন্য যোগীরা প্রথমে বুকের ভেতরকার চাপ বাড়াতে থাকেন। বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যান যখন শিরার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে রক্তে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। তখন হৃৎপিন্ডের রক্তের অভাব ঘটে এবং হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু একস-রে ও ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে দেখা গিয়েছে, তখনো কিন্তু হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয় না। এব্যাপারটি চলতে পারে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। কোনো কোনো যোগী হৃৎপিন্ডকে মিনিটে ৩০ থেকে ৩৫ স্পন্দনের মাত্রায় নামিয়ে আনতে পারেন (স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে মিনিটে ৭২)। এই অবস্থায় আরো বেশিক্ষণ থাকা সম্ভব।

এমন ঘটনা দেখা গিয়েছে যে বাতাস ঢুকতে পারে না এমন গর্তের মধ্যে মাটি-চাপা অবস্থায় যোগীরা দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। এই হচ্ছে ভূ-সমাধি। আসলে কী ঘটে? এটিকে বলা যেতে পারে প্রাণায়াম ও ধ্যানের যুক্ত ফল। ভূ-সমাধির ব্যাপারটি নিয়ে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্য হয়ে গিয়েছে। সাধারণত দেখা গিয়েছে, ভূ-সমাধি চলার সময়েও ভিতরকার গ্যাসের চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় একজন মানুষের যতোখানি অকসিজেনের প্রয়োজন হয়, ভূ-সমাধিস্থ যোগীর প্রয়োজন হয় তার চেয়েও ৫০ শতাংশ কম। তাঁর মস্তিষ্কের অবস্থা হয়ে থাকে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ শিথিল একজন মানুষের মতো। গর্তের ভিতরের বাতাসে অকসিজেনের পরিমাণ যদি হয় ১৪ শতাংশ আর কার্বন ডাই-অকসাইডের ৫ শতাংশ—তখনো যোগী কোনো অসুবিধা বোধ করেন না। অর্থাৎ, সিদ্ধান্ত করতে হয়, স্বেচ্ছাঘটিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে যোগী এমন এক অবস্থায় নিজেকে নিয়ে আসতে পারেন যার ফলে এই অত্যন্ত প্রতি-কূলতার মধ্যেও তাঁর পক্ষে উপযুক্ততা লাভ সম্ভব।

এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক স্বতঃঘটিত স্নায়ুতন্ত্রের ওপরে স্বেচ্ছাবর্তিত নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা মাত্র কয়েক বছর হল শুরু হয়েছে। এবং বিজ্ঞানীদের ধারণা, বিষয়টির বৈজ্ঞানিক বিচার সম্পূর্ণ হলে এই পৃথিবীর ক্রমঘটমান, প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষকে আরো উপযোগী করে তুলতে বড়ো রকমের সহায়তা হবে।

যোগব্যায়ামে ব্যাধি সারে—এই বিচারও এখনো তাই বৈজ্ঞানিক বিচার-সাপেক্ষ। অনেক কিছুই হয়তো বাতিল হতে পারে, কিন্তু তবুও একথা ঠিক যে যোগক্রিয়ার অজানা জগৎ থেকে বিরাট এক সম্ভাবনা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাকে সার্থক করতে হলে মনোভাব থাকা চাই যেমন সবিনয় গ্রহণের, তেমনি নির্মম বর্জনের।

কৃত্রিম হৃৎপিন্ড

সোভিয়েত ও আমেরিকান বিজ্ঞানীরা একযোগে জীবের শরীরে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড সংযোজন করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে মস্কোতে, অঙ্গ ও টিসু পুনঃসংযোজন ইনস্টিটিউটে। প্রথম দিন একটি বাছুরের শরীরের সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা সংযোজন করেন সোভিয়েতে তৈরী হৃৎপিন্ড। দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় আরেকটি বাছুরের শরীরে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা সংযোজন করেন তাঁদের তৈরী হৃৎপিন্ড।

প্রথম কৃত্রিম হৃৎপিন্ড তৈরি করেছিলেন একজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী—সার্গেই ব্রুখোনেনভো—আজ থেকে ৫২ বছর আগে, ১৯২৪ সালে। তাঁর তৈরী কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের সাহায্যে একটি কুকুরের মস্তিষ্ক দু-ঘন্টা সজীব রাখা গিয়েছিল। এই ছিল ভিত্তি যা থেকে বর্তমানের হৃৎপিন্ড-ফুসফুস সচল রাখার যন্ত্র উদ্ভাবিত। শেষোক্ত যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের সঞ্চালন কয়েকঘন্টা যাবৎ বজায় রাখা চলে।

এখনকার কৃত্রিম হৃৎপিন্ড আর স্বাভাবিক হৃৎপিন্ড বিস্ময়কর রকমের সদৃশ। এবং কৃত্রিম হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হওয়ার দরুন তার ভেতরের সবটাই দৃষ্টি-গোচর। ফলে, কৃত্রিম হৃৎপিন্ড কিভাবে কাজ করছে তা দেখা যেতে পারে।

কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের এখন একটিই কাজ—রক্ত পাম্প করা। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা তাদের পাম্পটিকে ছোট আর হাল্কা করতে চেষ্টা করেছেন (স্বাভাবিক হৃৎপিন্ডের ওজন ৩০০ গ্রামের মতো)। এক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় এই যে কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের সাহায্যে রক্তের প্রবাহ এমনভাবে বজায় থাকা উচিত যেন তা যতোটা সম্ভব স্বাভাবিক অঙ্গের মতো হয়, যেন তাতে এমন কোনো আলোড়ন না থাকে যাতে রক্ত জমাট বাঁধে। যাতে সকল অবস্থায় রক্তের প্রবাহ স্বাভাবিক থাকে।

হৃৎপিন্ডকে বিপুল কাজ করতে হয়—এই কারণে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড তৈরী করার উপযোগী যথেষ্ট শক্তপোক্ত উপকরণ খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। হৃৎপিন্ড সঙ্কুচিত হয় মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার। রক্ত পাম্প করে মিনিটে পাঁচ লিটার যখন হৃৎপিন্ডের মালিক বিশ্রামরত, মিনিটে ৩০ থেকে ৩৫ লিটার যখন হৃৎপিন্ডের মালিক সচল। সারা বছরে হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচন চার কোটি বার হওয়াও অসম্ভব নয়।

কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের উপকরণটি হওয়া চাই মজবুত ও টেকসই, তাছাড়া হওয়া চাই জৈবগতভাবে নিষ্ক্রিয়। শেষোক্ত শর্তটি পূরণ না হলে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছেন। স্বাভাবিক হৃৎপিন্ডে ও রক্তবাহী নালীতে লাইনিং থাকে আর এই লাইনিং থাকার জন্য রক্ত জমাট বাঁধতে পারে না। অতএব কৃত্রিম হৃৎপিন্ডের ডিজাইনাররা কৃত্রিম লাইনিং উদ্ভাবন করেছেন।

এই উদ্দেশ্যে বহু উপকরণ পরখ করে দেখা হয়েছে, তার মধ্যে জৈব সিলিকন রবারকে মনে হয়েছে সবচেয়ে উপযোগী।

হৃৎপিন্ডকে চালু রাখার জন্য শক্তির ব্যবস্থা করা অপর এক সমস্যা। কয়েটি উৎসের নাম করা হয়েছে, তার মধ্যে বিজ্ঞানীরা এখন মনোযোগ নিবন্ধ করেছেন প্লুটোনিয়াম-২৩৮ আইসোটোপের ওপরে। তাঁরা আরো পর্যালোচনা করে দেখছেন শরীরের বিপাকগত শক্তিকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় কিনা। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে কৃত্রিম হৃৎপিন্ড চালু রাখার পক্ষে এটি হয়ে উঠতে পারে, শক্তির অফুরন্ত উৎস। তবে যতোই আকর্ষণীয় মনে হোক, এই সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠতে এখনো অনেক বাকি। অয়স্কান্ত

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—'তারপর দেখলাম ওরা রঘুনাথপুরে শো করতে গেছে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছে। ধকলটা সবচেয়ে বেশি আমার। অথচ আমার জন্যে বসবার কোন জায়গা রাখেনি। নন্দনা শুয়ে শুয়ে বিজয়ের লেখাটা পড়ছে। মলাট জুড়ে নন্দনার স্প্রেড আউট। তুমি মাঝখানে চড়। ঠিক করলাম—এ জীবন রাখবো না।'

এখানে পৌঁছে রজনী কাঁদতে লাগল। শব্দহীন। হাতের পোড়ামাটির পুতুলজোড়া পড়ে গেল পাপোষে। অমিয় নিচু হয়ে কুড়িয়ে রাখলো।

—'ঠিক করলাম—পুরী যাব। মায়ের সঙ্গে খুব ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। তখন-কার সমুদ্র মনে ছিল। এবার গিয়ে সমুদ্রের কাছে দাঁড়ালাম। ঠিক ছিল ডুবে মরব—কিংবা দূরে ভেসে যাব। কিন্তু হল না।'

—'কেন?'

—'আমি গেলে আমার ছেলের কি হবে? ছোট মেয়ে দুটোকে কে দেখবে? ওদের তো আমি ছাড়া কেউ নেই।'

—'বেশি দুধ দিয়ে কফি খাবে?' রজনীর সায়ের জন্যে অপেক্ষা না করে অমিয় হিটারে দুধটা গরম করতে দিল। ফিরে আসার একটা লজ্জা ছিল। মরতে না পারার একটা দুঃখ ছিল। রজনী কোন কথাই জোর দিয়ে বলতে পারছিল না। এখন মনে হচ্ছে ভবত হলে সে আগন্তুক। সদ্য সদ্য ফেল আসা মন্দির সমুদ্রের স্মৃতি—সেখানকার সূর্যালোক তখনো তার গায়ের ওপর লেগে-ছিল।

কফি খাওয়ার পর অমিয় তাকে এক সপ্তাহের কাটা টিকিটের কাউন্টার বইগুলো আর খাতা ধরিয়ে দিল। 'এগুলো সব মিলিয়ে দিয়ে তবে উঠবে।'

রজনী একটা কাজ পেয়ে গিয়ে লজ্জার হাত থেকে বেঁচে গেল। বছরখানেক হয়ে গেছে—এই কাজটা সে করে আসছে। খানিক-পর দেখলো. অমিয় একখানা নতুন খাতা খুলে তার ভেতর ঝুঁকে বসেছে।

রজনী উঠে এসে পেছন থেকে উঁকি দিল 'নতুন নাটক?'

—'হ্যাঁ। স্মার্ট।'

—'সুজাতা আর করবে না?'

—'কেন করব না। তবে অনেকদিন তো হল। আমাদের আরও নাটক রিহার্সেল দিয়ে তৈরি রাখা দরকার। ধর বৃহস্পতিবার নতুন নাটক করা যায়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করলে একটা মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায়। নয়তো রোজ এক কথা। একই জায়গায় ক্ল্যাপ—একই জায়গায় মিউজিক ফোকাস—কেমন বন্দী বন্দী লাগে রজনী।'

—'আমি তোমায় বন্দী করেছি। না?'

—'একথা আসছে কোত্থেকে?'

—'যে কদিন ছিলাম না—বোকা চন্ডীদাকে পাঠিয়েছো। নিজে গিয়েছো। খবর নিয়েছো। এটা একটা বন্দীদশা নয়?'

—'এসব আমার ভাল লাগে। বিশেষ করে—ওরা তো ছেলেমানুষ। আমি এখন চল্লিশ পেরিয়ে গেছি। স্নেহটাই সবচেয়ে আগে কাজ করে। রাগ আসে অনেক পরে। আর শশাঙ্ক থাকলে তো আমার যাওয়ার কথাই থাকতো না।'

—'সে একদিনও যায়নি এর ভেতর?'

—'না। হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত আছে। তুমি কিন্তু ভুল বুঝে রাগ করেছো। পঞ্চমুখের কোন নাটক চন্ডীদার স্টিল কোন কাগজের কভারে যেতে পারে। অবস্থা বুঝে। নাটক বুঝে।'

—'হয়তো তাই।' তারপর একদম অন্য কথায় চলে এল রজনী। 'তোমার বড়-ছেলেকেও আমার খুব ভাল লাগে। লালুর, পাশে বসে স্কুলে যেতে দেখেছি। আমাদের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল—ভেতরে ডাকি।'

—'ডাকলে না কেন?'

—'যদি না আসে। যদি লীলা রাগ করে।'

—'করলোই বা। স্নেহ ভালবাসা কি কোথাও আটকে থাকবার জিনিস!'

—'তোমার নতুন নাটকে আমার কোন রোল নেই?'

—'আছে। দু চারদিন রিহার্সেল দিলে বুঝতে পারবে। ইতিহাস ভিত্তিক নাটক। অথচ সবই এখনকার কথা।'

—'কখন লেখো তুমি?'

—'সময় নিয়ে বাধাধরা কিছু নেই। গত আঠেরো বছরে একুশখানা নাটক নেমেছে পঞ্চমুখের। যখন লিখি তখন ঘোরে থাকি। কিছু জানি না।'

—'এর সঙ্গে তো চালু নাটকের শো থাকে। তার নানান ঝক্কিও থাকে।'

—'আমার যখন চারদিক থেকে দম আটকে আসার অবস্থা হয়—তখনই নতুন নাটক আসে আমার ভেতর থেকে। আজকের ইভনিং শোটা করবে? করো না। লোকে তোমার অভিনয় দেখতে আসে।'

—'তা কেন? নন্দনা তো ভালোই করছে। আমার চেয়ে স্পিডেও করে। অ্যাকচুয়াল টাইম বারো মিনিট কমিয়ে এনেছে।'

—'ওর সঙ্গে স্টেজে ঢুকলে আমার ভেতর থেকে কোন কম্পিটিশন আসে না। মন হয়—করবার তাই করে যাচ্ছি। তোমার সে দাপট ওর ভেতরে নেই। তুমি স্টেজে ঢুকেই সবার চোখ তোমার দিকে টেনে নিতে বাধ্য কর।'

—'সবার অভিনয় তো এক রকম নয়। কেউ অভিনয়ের চরিত্রে ঢুকে পড়ে—সেই চরিত্র হয়ে যায়। আবার কেউ অভিনয়ের চরিত্রে ঢুকেও নিজের আলাদা একটা বিশিষ্টতা বজায় রাখে। সেই স্বাতন্ত্র্য অভিনয়ের চরিত্রে নতুন মানে যোগ করে। তখন তা আরও উজ্জ্বল হয়।'

—'তুমি তো বেশ ও দিয়ে সুন্দর করে বলতে পার।'

—'এই নতুন মানে দিতে গেলে জীবনের অভিজ্ঞতা চাই। দুঃখের, সুখের গানের বিপদের। আমি তো এগারোর নামতায় পড়ে আর এগোই নি। তাই চোখে যা দেখি—কানে যা শুনি—একটু একটু করে সঞ্চয় করি—তুলে রাখি—তা থেকেই নাটকে নিজেকে ঢালি। ভালো কথা। এখনো দুর্গালাল আর কত পাবে?'

—'আট ন' হাজার।'

—'অত টাকা শোধ করে ফেলেছো। তুমি মানুষ না।'

—'কেন?'

—'আমি তোমার কেউ নই। তার জন্যে তুমি আট হাজার টাকার দেনা ক্লিয়ার করে দিলে?'

—'কে বললে কেউ নও? আমাকে যে রোজ জাগিয়ে তোল স্টেজে। সে-রকম তো কেউ জাগাতে পারে না। খুব সেন্টিমেন্টাল শোনাবে রজনী। সেদিন স্বামী, বন্ধু সবার কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়া একজন অভিনেত্রী ট্যাকসির জানলায় বসে বিনা রসিদে তিন দিনের হল ভাড়া না দিলে 'ফেরিওলার মৃত্যু'র লাস্ট নাইটও স্টেজ পাওয়া যেত না।'

—'ওঃ! সেই সামান্য কথা মনে করে রেখেছো।'

—'আরও মনে করার জিনিস অনেক আছে রজনী। ফার্স্ট নাইটের আগে তুমি বেবি মিররের ফোকাস জোগাড় করে না দিলে 'পঞ্চমুখ' ও সিন স্টেজ করতে পারত না।'

—'কিচ্ছু না।'

—'অনেক। অনেক রজনী। লীলা আমাকে সংসার দিয়েছে পি এল ভেকে টাকা জুগিয়েছে। চাকরি করে অন্নজল বজায় রেখেছে। সবই আমার জন্যে। তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে তো আমার ভেতরকার অভিনয়কে জাগিয়ে তুলতে পারে নি। নাটকের জন্যে তুমি অনেক দিয়েছো আমাকে।'

—'তাহলে ইভিনিং শোটা করতে বোলছো।'

—'কর, না। আমি এ ক'দিন একদম ঘুমিয়ে আছি।'

—'নন্দনা কি করবে?'

—'নন্দনা আভা করুক। কল্যাণী বেস্ট নিক।'

অনেক দিন পরে ভরতের স্টেজে অমিয়র মনে হচ্ছিল নিজের বারান্দায় বসে আছে। এ কোন অভিনয় নয়। এরই নাম পৃথিবী। রজনীর গলায়—তুমি চাঁদের জোছনা হয়ে থাকো—একদম স্টেজে চলে যাওয়ার—সরে যাওয়ার ভাব এনে দিল। অমিয় প্রায় ছুটে ছুটে রজনীকে ধরবার চেষ্টা করছিল। ধরা কি যায়! একদম অন্য জাতের অভিনয়।

শোয়ের শেষে অনেকেই দেখা করতে এলেন গ্রিনরুমে। এই তাড়াহুড়োর ভেতর নন্দনা কখন মেক-আপ তুলে চলে গেছে কারও তা খেয়ালই নেই। খেয়াল হল—যখন অনেক দিন পরে আবার সবাই খেতে বসল এক সঙ্গে। আজ রজনী সবাইকে খাওয়াবে বলে রেখেছিল। নন্দনা অ্যাবসেন্ট।

নতুন নাটক পাবলিসিটি বৃহস্পতিবার একটা করে শো অন্য নাটকের ট্রায়াল—এসব নিয়ে কথা হতে হতে দেখা গেল—সাজ ঘরে শুধু অমিয় আর রজনী আছে। চন্দ্রদা ক্যান্টিনে খেতে গেছে।

এমন সময় অমিয় বলল 'তোমার একটা কথা বলা হয় নি রজনী।'

কি?'

—'দিন দশেক হল শুনেছি। কিন্তু বলার সময় পাই নি। শশাঙ্কবাবুর সঙ্গেও দেখা হয় না।'

—'তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাকি মাঝে মাঝে।'

—'একবার হয়েছিল। তোমার তখন অসুখ।'

—'বল নি তো।'

—'বলার মত কিছু নয়। রাস্তায় দেখা—'

—'তাই বুঝি। আমাদের কথা—আমার কথা—কিছু বলেছিল?'

—'না। আমি অন্য একটা কথা বলছি। তুমি কীভাবে নেবে জানি না। তোমার অনেক দিনের বন্ধু।'

—'বন্ধু?'

—'হ্যাঁ। তৃপ্তির কথা বলছি।'

—'হাঃ! কি বলছো তুমি। অত ভনিতা কিসের,'

—'তৃপ্তি নেই।'

—'মানে?'

—'ক্যানসার হয়েছিল।'

—'ও।' রজনী বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

—'ভালোই হয়েছে মরে গিয়ে। নয়ত ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের অল্প বয়সে ওঁর অভিনয়ে আমরা ইন্সপায়ার্ড হতাম।'

—'এই সেদিনও রাজন করেছে। কী সুন্দর করতেন। যদি ঠিক ঠিক পথে থাকতেন। বেস মদ—ওঁকে শেষ করে দিল।'

রজনী তার চোখের জল আটকাতে পারল না। 'যখন আমাদের অল্প বয়স ছিল—ওঁকে পাবলিক বোর্ডে বড়দের সঙ্গে ঠেক্কা দিয়ে অভিনয় করতে দেখেছি।'

—'তোমায় খুব ভালবাসতেন।'

—'তা বাসতেন। তবে ভুল ভাবে। আমি ওঁকে কখনো সে-চোখে দেখতে

আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষে মুসলিম মেয়েদের মুক্তির বাণী এনেছে
বিমল দাসের বিদ্রোহিনী
মূল্য : ৮-০০
প্রাপ্তিস্থান
পাথেয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৫এ, বৃন্দাবন বোস লেন, কলি-৬

প্রকাশিত হলো অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলীন-এর
পাপেট অন্ এ চেন্ ১৪·০০
(Puppet on a Chain) ছায়াচিত্রে রূপায়িত
ভাষান্তর : মনোজিৎ লাহিড়ী
ওয়ার্ল্ড ক্লাসিকস : প্রাপ্তিস্থান—পূর্বাচল, ৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

পারি নি। আমার সব সময় মনে পড়ত আগেকার ও'র সেই রূপ। 'বিসর্জনে' তৃপ্তিকে দেখলে তুমি ভুলতে পারবে না কোনদিন। 'চিরকুমার সভায়' অক্ষয়। তুলনা-হীন। পরে অবশ্য দেবকীবাবুর বইতে নীতিশ মুখোপাধ্যায়ও অক্ষয় করেছেন। তারও তুলনা নেই। আচ্ছা অমিয়—আমরাও একদিন কারো স্মৃতিতে এমনি হয়ত জায়গা পাবো। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। স্মৃতিও একদিন পুরনো কাগজের মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়—'

—'তৃপ্তির শ্রাদ্ধে কাল তিনশো টাকা পাঠিয়ে দেব ভেবেছি।'

—'ক'টি ছেলেমেয়ে?'

—'তাতো জানি না। বউ মত একজনকে দেখলাম—'

—'তৃপ্তির বাল্যবিবাহ ছিল।'

রজনী তখনো চোখ মুছছিল। অনেক-কালের অনেক ছবি সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। সবগুলো দৃশ্যই উজ্জ্বল।

।। পনর ।।

গাড়ি গিয়ে ফিরে এল নন্দনা আসেনি। চিঠি পাঠিয়েছে। শরীর খারাপ। ডাক্তারের পরামর্শে রেস্ট নিচ্ছে। আমার মুখটা সকালের বিছানায় বসেই গম্ভীর হয়ে গেল। সামনেই আজকের কাগজ। তাতে যাত্রার পাতায় নন্দনার ছবি। রয়েল অপেরায় যোগ দিয়েছে। খবরটা ছবির নিচে লেখা। ছবি-খানা কিন্তু সুজাতা নাটকের সুজাতার পোশাকে তোলা। তাড়াতাড়ি অ্যালবাম ঘেঁটে দেখল— ছবির নেগেটিভ তার কাছে আছে। তাহলে ছবিখানা নিয়ে গেছে শুধু।

লীলাও কাগজ পড়েছে। অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

বুঝছি না। লালুর হাত দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে— রেস্ট চাই। অথচ কাগজ বলছে, দু'একদিনের মধ্যে রয়েল অপেরার রিহার্সেল শুরু করবে।

তা কি করে হবে! পাওনার চেয়ে বেশি দেওয়া রয়েছে।

সেই যে পাবলিসিটিটা নিয়ে ওর মনে খিচ্ ছিল—

সেও তো মিটে যাওয়ার কথা। গন্ধর্বের বিনোদন সংখ্যার মলাট জুড়েই তো নন্দনা।

কাগজ বিক্রি হয়ে ফুরিয়ে গেছে। এর চেয়ে বেশি তো আমরা কেউ কোনদিন পাইনি।

তাহলে বেশি টাকায় গিয়েছে।

তা গিয়েছে। কিন্তু তেমনি মাসের ভেতর ত্রিশদিন বনবাদাড়ে ঘুরতে হবে। পঞ্চমুখ তো বাড়িয়ে দিতেও তৈরী ছিল। রজনীর শরীর ভাল নয়। হয়ত পাকাপাকি হলেই কোনদিন সুজাতা রোলের ভার নিতে হত। বোকামি করল।

রজনী ওকে বিষিয়ে দেয়নি তো। হয়তো অতিষ্ঠ করে তাড়িয়েছে—

কী বাজে বকছো। বিষোবার সময় কোথায় পেল। আসলে না চাইতে কাউকে যদি বেশি দাও—সে তার দাম বোঝে না। কিন্তু একটা কথা— পঞ্চমুখ নাটকের স্টিল দিয়ে তো রয়েল অপেরার নিউজ করা যায় না। এটা হল কী করে?

মনে মনে ভেবেই পেল না অমিয়— কেন নন্দনা চলে গেল। ওর কোনকিছুতে তো না বলা হয়নি। ভেবেই রেখেছিল, হাজার নাইট থেকে নন্দনার পাওনা বাড়িয়ে দেবে। নিয়মিত পাবলিসিটিকেও বড় টাইপে আলাদা করে নাম দেবে।

স্কালটা ঠিক করেছিল— সম্রাট নাটকের স্ক্রিপট নিয়ে বসবে। একা একাই ডায়ালগ বলে বলে দেখবে। আর দরকার মত শব্দে গাঁথুনি পালটে পালটে আসল ধার নিয়ে আসবে।

তা আর করা হল না। উকিলের টেলিফোন। উচ্ছেদের মামলার কাগজপত্র চাই। ভাড়ার রসিদ। চুক্তিপত্র। চেক নম্বর। নতুন ইলেকট্রিক লাইন কার নামে সব কাগজ চাই।

বিষয় সম্পত্তিওয়ালা একজন লোকের মত ফাইলপত্র বগলে নিয়ে— শাল গায় দিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসল। যাবে উকিলবাড়ি। এর নাম নাটক করা। এন্ট্রান্স একজিট, মিউজিক ফোকাস গানের পরেও আছে মামলা— পাবলিসিটি, হোর্ডিং এগ-জস্ট পাখা রিভিউ দর্শকদের জন্যে জোড়া বাথরুম, ক্যান্টিনে চায়ের কোয়ালিটি উপরন্তু দোতলায় নাটকের লাইব্রেরি।

বাহারে গ্রুপ থিয়েটার। বাহারে শো বিজনেস!! বাহারে সাকসেস!!! ইংরাজিতে একটা কথা আছে। এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইন্ড। কিন্তু পাপটা কোথায় করল।

নন্দনার চলে যাওয়া পঞ্চমুখের কেউই ভাল চোখে নিতে পারল না। সো. মঙ্গল বুধের ভেতর ড্রেববায় কল শোয়ের ডেট দিতে হল। সেখানে টাকা নেওয়া ছিল পুরো। বৃষ্টির জন্যে শো হয়নি। তারা পাবলিসিটি করে বসে আছে। নয়ত ফিরিয়ে দিত অমিয়। রজনীরও ইচ্ছে ছিল না— অতখানি গিয়ে সুজাতার রোল করে।

দিনে দিনে যাওয়া। অ্যাডভান্স পার্টি বাসে আগে চলে গেছে।

ঘন্টা তিনেক পরে পেছনের গাড়িতে গাড়িতে কল্যাণী আর রজনীকে নিয়ে অমিয়

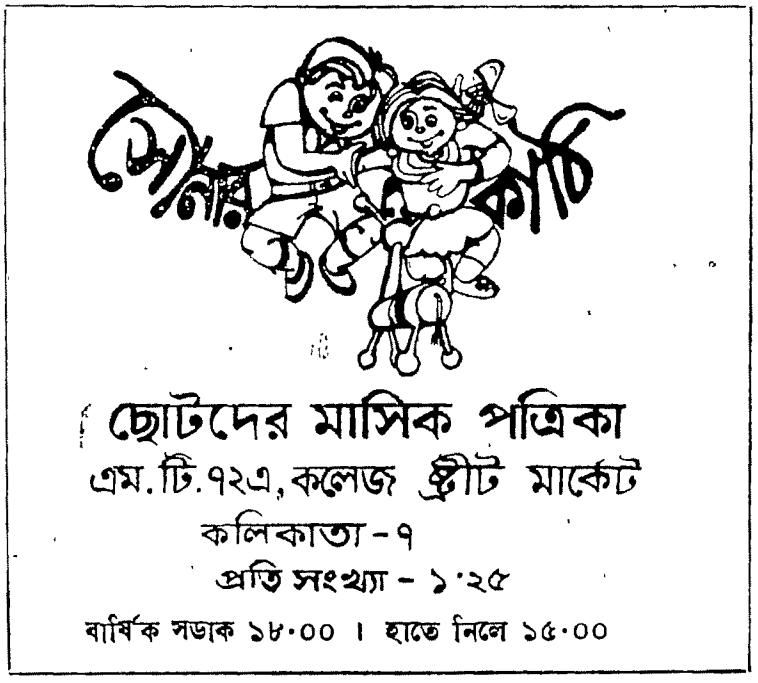

রওনা দিল। অর্ধেক পথ গিয়ে অমিয় ছাসপাস করতে লাগল। লালু মেইন রোডে এক বিরাট নির্জন গাছতলায় গাড়ি থামিয়ে দিয়ে অমিয়কে ঘাসের ওপর শুইয়ে ছিল।

রজনী বলল, চল ফিরে যাই।

না। বাস পৌঁছে গেছে। ওদের তাহলে পিটিয়ে ছাতু করে দেবে।

এই শরীরে যাওয়া যায়।

লালু আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলল। মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছিল। কল্যাণী পেছনের সিট থেকে অমিয়র বুকে হাত বুলিয়ে দিল। কোথায় কষ্ট দাদা। আরেকটু পথ। ওখানে নিশ্চয় ডাক্তার পাবই

রজনীর কিছুই করা হচ্ছিল না। পেছনের সিটে বসে এক কাধে মাথা রেখে কাঁদছিল শুধু। বেলা দুটোয় একটা অসময়ের বৃষ্টি পেল ওরা পথে। গুঁড়ি গুঁড়ি। তাতে পিচ রাস্তা ধুয়ে গিয়ে কালো হয়ে যাচ্ছিল। সামনের কাচে জলের দাগ দেখ দিল।

ডেবরায় পৌঁছে ডাক্তার পাওয়া গেল। তিনি ওষুধ দিয়ে বললেন, শুয়ে থাকুন ঘন্টা দুই। তারপর চাঙ্গা হয়ে শো করবেন।

রজনী এখন আর অভিনেত্রী নয়। সে বারবার নিজের মনকে বলল, তোমার ছেলে মেয়ে বউয়ের কাছে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে আমার কাজ শেষ হবে।

অসুখটা যে কি— ডাক্তারবাবু তার কিছুই বিশেষ বললেন না। শুধু বললেন, ওভার এগজারশন। ক্লান্তি।

অমিয় স্টেজে উঠে দেখল— হ্যাজাকের আলোয় ধানকাটা ক্ষেতের ওপর যতদূর দেখা যায়— শুধু কালো-কালো মাথা।। সেই দৃশ্যটি তাকে সাহস দিল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল. তার জন্যে বিরাট একটা ধূমের সাগর পড়ে রয়েছে। যতদূর দেখা যায়। এ সে কি করে পার হবে তা ভেবে পাচ্ছিল না।

প্রথম ভার সিন কোথাও একটু আট-কালো না। দশ মিনিট বিরতিব পর পঞ্চম দৃশ্য শুরু থেকেই যেন আর এগোতে চায় না। শেষে এক জায়গায় এসে অমিয় স্টেজের পাশের আড়বাঁশের খুটি ধরে খুব আস্তে নিরুপায় গলায় বলল, আর পারছি না রজনী। আমি আর পারছি না। কত বাকি?'

অভিনয়ের ভঙ্গীতে রজনী তার পিঠে হাত রেখে বলল, পারতেই হবে অমিয়। পারতেই হবে। এত লোক বসে আছে আমাদের জন্যে।

রজনী কাঁদছিল আর ডায়ালগ বলছিল। কোনরকমে কথার ভেতর দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে গান গেয়ে যেতেই রজনীর চোখের জল আর বাধা মানল না। কাঁদছিল আর গাইছিল। হাজার পনের লোক নিশ্চুপ। অমিয় সেই খুটি ছেড়ে একটু একটু করে এগিয়ে এল। তারপর খাটে গিয়ে বসল। তাকে খানিকটা বিশ্রাম দিতে রজনী পুরো গানটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে দু'বার গাইল।

শংকর টেম্পোবারি সাজঘরের সামনে বেঞ্চে বসে একদৃষ্টে স্টেজের অমিয়র দিকে তাকিয়ে ছিল। ছুটে গিয়ে ধরা দরকার কি না— তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না।

বেশী রাতে অমিয়কে গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে রজনী বসল ড্রাইভারের পাশে।

অন্ধকারে হেডলাইটের আলোয় শালবন। একবার মোড় ঘোরার সময় আলোর ভেতরে বিরাট একটা পোড়ো বাড়ি পড়ল। এসব বাড়ি নাকি কোম্পানি আমলের সাহেব জমিদারদের। মাঠের ভেতর এমন পেল্লায় পেল্লায় বাড়ি পড়ে আছে তাও প্রায় একশো বছর।

লালু আস্তে চালাচ্ছিল। পাছে ঝাকুনিতে অমিয়র কষ্ট হয়। কলকাতা এগিয়ে আসছিল। ভোররাতে লীলা দোর খুলে দেখে তার দুয়ারে আর কেউ নয় — রজনী দাঁড়িয়ে।

বড় কেউ আছে?

কী ব্যাপার? এত রাতে—

তোমার অমিয় অসুস্থ। তুমি আর আমি মিলে তো তুলতে পারব না। দাশদা এলেন। লালু ধরল। দোতলার ঘরে খাটে শুইয়ে দেওয়া মাত্র রজনী নেমে গেল। ডাক্তার নিয়ে ফিরে যখন এল— তখন রোদ উঠে গেছে।

ওষুধ বিষুধ শুনে ডাক্তার বলল, ঠিক ঠিক ওষুধই দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত এগজারসন। বিশ্রাম দরকার।

লীলা এবার লজ্জা পেল। এতক্ষণ অমিয়র জন্য যে ছোটাছুটি— সারারাত গাড়িতে করে বয়ে আনা—সবই করেছে রজনী। সে প্রায় দর্শক মাত্র। ডাক্তার চলে যেতে জোর করে রজনীকে চেয়ারে বসিয়ে— লীলা বলল, একটু ফল কেটে দি—

না। একটু চা খেলে হত।

দিচ্ছি। আপনি বসুন।

ও ঘরে যেন কোন গোলমাল না হয় দেখো।

ভেবেছিল ভালভাবেই কথাবার্তা বলবে লীলা। কিন্তু রজনীর এ-কথায় তার ভেতরটা বেঁকে দাঁড়াল। আপনার মত কি দেখতে পাব।

রজনী কিছু বলল না। রাত জাগার একটা ক্লান্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। চা টুকু নিমপাতার রসের মতই প্রায় এক ঢোকে খেয়ে নিয়ে উঠে গেল রজনী।

ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠে ঘুমন্ত বাবাকে বিছানায় দেখে খুব খুশি। ওরা কোনদিন অমিয়কে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেনি। এ-বাড়িতে ঘুম থেকে সবচেয়ে আগে ওঠে অমিয়। বড় মেয়ে আজ আর সাঁতারে গেল না। ওরা কলকল করে বাবার কাছে যাচ্ছিল। লীলা যেতে দিল না। কোন গোলমাল নয়। শরীর খারাপ হয়ে ঘুমোচ্ছে—

ওরা তখন দর্শকের মত দরজায় দাঁড়িয়ে বাবাকে দেখতে লাগল।

অনেকদিন অমিয়র জন্যে বিশেষ করে কিছু করার অভ্যাস নেই বলে— লীলা ঠিকই করতে পারল না— খারাপ শরীরের মানুষ-টার জন্যে কী করবে। চোখ ফেটে জল আসছিল। আমি ভুলে গেছি— এখন কী করতে হয়।

সন্ধ্যেবেলা একবার জেগেছিল অমিয়।

(ক্রমশ)

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পীঠমালা তন্ত্রের মতে এই কালীঘাটে সতীর বামহস্তের অঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল। বৃহন্নীল তন্ত্র ও শিবনির্ব্বাচন তন্ত্রে এই স্থান কালীঘাট নামে উক্ত হইয়াছে। ভবিষ্য পুরাণেও কালীঘাটের তৎকালীন সীমা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ আছে। যথা, দক্ষিণেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া বহুলা (আধুনিক বেহালা) পর্য্যন্ত দুই যোজন পরিমিত ধনুকের ন্যায় আকার বিশিষ্ট স্থানই কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট। তন্মধ্যে এক ক্রোশ পরিমিত ত্রিকোণাকার স্থান তাহার তিন কোণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব বিরাজ করিতেছেন, এবং তাহার মধ্যে মহাকালী নামে প্রসিদ্ধ কালীকাদেবীর স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে।

কোনও আধুনিক লেখক তাঁহার 'কলিকাতার প্রাচীন ইতিহাসে' কালীঘাটের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া বর্ত্তমান কলিকাতার কোন কোন স্থানের সহিত তাহার মিল আছে তাহা সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।...

কিন্তু তাহাতে একটি বিশেষ কথা আছে, ইহাও আমাদের অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। সেইটি ভূকম্পনে প্রাচীন কালে এইরূপ ভূকম্পন অথবা এমন কিছু একটা ঘটনা—সুন্দরবন হইতে বর্ত্তমান কলিকাতা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে ঘটিত। এতৎ সম্বন্ধে অনেক যুক্তিতর্ক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনুমান ব্যতীত প্রকৃত তথ্য লাভে কেহই এ পর্য্যন্ত সমর্থ হন নাই।..

সুতরাং পাশ্চাত্য এবং এদেশীয় ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যাহা একপ্রকার স্থির করিয়াছেন, তাহারই পুনরুল্লেখ এবং সাধারণের সমক্ষে তাহারই প্রকাশ করা ভিন্ন আমাদের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার এক স্থানের মৃত্তিকার নিম্নে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দণ্ডায়মান অবস্থায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে ভূ-তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই স্থলে এককালে বন ছিল পরে সেই বন ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায় এবং তদুপরি পুনরায় 'পলি' পড়িয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা ভূমিকম্পনের ফলে সংঘটিত হইয়াছিল, অথবা এই সকল স্থানের উপরিভাগের নিম্নে তরল মৃত্তিকা থাকায়, ঐ তরল মৃত্তিকা উপরিভাগের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া বসিয়া যাইত।

এইরূপ প্রথিত হইয়া যাওয়ার বিবরণ আমরা কেবল নিম্নবঙ্গের বিশেষতঃ সমুদ্রের নিকটস্থ স্থান সকলেরই প্রাপ্ত হই। যে প্রদেশ মধ্যে মধ্যে ভূগর্ভে প্রবেশ করিত তাহার এইরূপ চতুঃসীমা দেওয়া চলিতে পারে। উত্তরে গোবিন্দপুর, কালীঘাট, দক্ষিণ সুন্দরবন এবং পূর্ব্বে খুলনা, যশোর প্রভৃতি। এই যে উত্তর সীমায় কালীঘাট এবং গোবিন্দপুর প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা হইল ইহার অব্যবহিত পশ্চিমেই ভাগীরথী। ভাগীরথীর পূর্ব্ব তট মধ্যে মধ্যে বসিয়া যাইত বটে, কিন্তু পশ্চিম তট এইরূপে প্রোথিত হইয়া যাওয়ার কোনও তত্ত্বই আমরা অবগত নহি।

সুতরাং পূর্ব্ব বিবরণ হইতে স্থির করা যায় যে, যৎকালের কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি, তৎকালে ঐ সকল স্থানে লোকের বসবাস একেবারেই ছিল না বলিলেই চলে। আমাদের এই অনুমান যে সত্য, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রাচীন দুর্গ 'ফোর্ট উইলিয়ম' ও শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থানে যে সকল ভূমি পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যাদির মধ্যে মনুষ্যবাসের কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ নাই। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ এই যে, যদি কোন সময়ে কলিকাতায় লোকের বাস থাকিত তবে উল্লিখিত পরীক্ষার সময় কলিকাতার মৃত্তিকার নিম্নে কোনও না কোনও স্থানে নর-কঙ্কাল, মনুষ্য-ব্যবহার্য অস্ত্র বা অন্যান্য দ্রব্যাদি অথবা মনুষ্য বাসের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত সন্দেহ নাই।

এ সম্বন্ধে আরও অবগত হইয়া যায় যে, 'পূর্ব্বে কালীঘাটের চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল ছিল, লোকের বসতি ছিল না। এই বনমধ্যে কালীকাদেবী সামান্য পর্ণকুটীরে অবস্থান করিতেন, কাপালিক ও সন্ন্যাসীরা তাঁহাকে পূজা করিতেন। প্রথমে এই কালীদেবী গুপ্তভাবে ছিলেন বলিয়া বৃহন্নলী তন্ত্রে গুহ্যকালী নামে উক্ত হইয়াছিল। অতএব আমরা বিশ্বাস করিতে পারি যে, সে সময়ে ঐ স্থানে কোন মনুষ্যের বসতি ছিল না।

তন্ত্র, পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে আমরা কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাই এবং তাহা যে এই স্থান সে কথা আমরা নিসন্দেহে বলিতে পারি কিন্তু ইতিহাসে ইহার সম্বন্ধে কোনও কথা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাজা টোড়রমল্লের প্রদত্ত করের বিবরণে আইন-ই-আকবরী নামক পুস্তকের একস্থানে কলিকাতার নামোল্লেখ ও রাজকরের পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বে আর কোথাও কলিকাতার নাম বড় পাওয়া যায় না। ১৫শ শতাব্দীতে বিপ্রদাস পিপলাইর লিখিত মনসা কাব্য এবং ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর লিখিত চণ্ডীকাব্যে যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহার ঐতিহাসিকত্ব যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ সময়ে আমরা কলিকাতা বিশেষতঃ কালীঘাট ও বেতড় প্রভৃতি স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাই, এবং তৎকালে গঙ্গা কলিকাতার কোন স্থান দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন, তাহারও একরূপ আভাস পাই। কিন্তু তৎকালিক ভাগীরথী প্রবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন কলিকাতা বা কালীঘাটের সম্বন্ধে অন্য কোন জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারি কিনা একবার দেখা উচিত।

হিন্দু প্রবাদ অনুসারে প্রচলিত আছে যে বল্লাল সেনের সময় জনৈক ব্রাহ্মণ-পরিবার বে এই স্থান রাজপ্রসাদ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আদিসুরের রাজত্বকালে আমরা কালীক্ষেত্রের কোন উল্লেখ পাই নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কালীক্ষেত্র বা কালীঘাট খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী হইতে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছে।

চণ্ডীকাব্যের উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীমন্ত কলিকাতা হইতে বালীঘাটা (বর্ত্তমান বেলেঘাটা) হইয়া নৌকাযোগে কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে বেলেঘাটা ভাগীরথী হইতে প্রায় ২ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত, এখন শ্রীমন্তের নৌকা যাত্রার সহিত তৎসাময়িক স্থান সকলের ভৌগোলিক সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, আমাদিগকে বড়ই গোলে পতিত হইতে হয়। কিন্তু তাঁহার যাত্রার আরম্ভ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থানই যথাযথ বর্ণিত আছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি সুতরাং এস্থলেও সেই মত বলবৎ রাখিতে হইলে আমাদিগকে একটি নূতন স্রোত কল্পনা করিয়া লইতে হয়। মেজর রেনেল আভ্যন্তরিক জলপথের গতি দেখাইবার জন্য তাঁহার হিন্দুস্থানের মানচিত্র নামক গ্রন্থে যে একখানি নদী-প্রবাহ প্রদর্শক মানচিত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্ব্ব বেলেঘাটার নিম্নে একটি নদী-ধারা ছিল, কবিকঙ্কণের বালীঘাটা যদি এই বেলেঘাটা হয়, তাহা হইলে ঐ নদী-ধারাই যে ভাগীরথীর আদি স্রোত, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না কারণ এই নদী-ধারার উপরেই শ্রীমন্ত কালীঘাট পাইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

অঙ্গনা

বিবাহ বিচ্ছেদ \ নতুন আইন

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্ত্রী-স্বাধীনতা সমাজে আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাধীনতার আগে মেয়ে জন্মালেই তার অভিভাবকরা একটা বিরাট ঋণের বোঝা বলে মনে করতেন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এই বোঝা থেকে মুক্ত হতে পারলে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতেন। উনিশ শতকে বহু নামী ঘরের অভিভাবকরা বালিকাদের পাঁচ-ছ বছর বয়স হলেই স্বামীর ঘরে পাঠাবার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে, এক শহর থেকে আর এক শহরে চলতো পাত্র খোঁজার হিড়িক। যে অভিভাবকেরা মেয়ের ন' দশ বছর বয়স হলে বাড়ী থেকে পার করতে না পারতেন তাদের ওপর সমাজ ও প্রতিবেশীদের চলতো অকথ্য অত্যাচার। সমাজেও কখনো কখনো একঘরে হয়ে থাকতে হতো। বেণ্টিঙ্ক-এর সময় আমরা দেখতে পাই ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক নবজাত শিশুকন্যাদের পৃথিবীর আলো-বাতাস আর ভোগ করা হতো না—অসময়েই ছিঁড়ে ফেলা হতো সে ফুলের মত শিশুদেহ। বেণ্টিঙ্কের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই কুপ্রথা দূর হল। কন্যা হত্যা নিবারিত হল বটে, কিন্তু অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা দূর হল না। অভিভাবকেরা এবার কন্যা পার করার এক উপায় বের করলেন। রাতারাতি কৌলীন্য প্রথা দেশের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এর ফলে কৌলীন্য প্রথার নামে একই ব্যক্তির বহু বিবাহে কোন আপত্তি রইল না সে সঙ্গে বয়সের বাছবিচারও কেটে গেল। সত্তর বছরের বৃদ্ধও অক্লেশে দশ বছরের কন্যার পাণিগ্রহণ করলেন।

সমাজের সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিরা কোন মতেই এই কুপ্রথাগুলিকে বাধা দিতে পারলেন না। গন্ডালিকাপ্রবাহে দেখা গেল সবাইকে গা ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু অন্যায় ও অবিচার শুধু শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে দীর্ঘ দিন টিকিয়ে রাখা গেল না। ইংরেজ শাসনের শেষ দিক দিয়ে 'সর্দা আইন' চালু হল। বিয়ের বয়স মেয়েদের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে বারো বছরে টেনে আনা হল। বহুবিবাহ প্রথাও অনেকটা কমে গেল।

স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা-দীক্ষায় মেয়েরা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেলেন। তৈরি হল ভারতের সংবিধান। এই সংবিধানে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হল। বিবাহ আইন সংশোধিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৫৪ সালে বিশেষ বিবাহ আইন ও ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইনের বলে বহু বিবাহ আইনতঃ দন্ডনীয় বলে ঘোষিত হল। বিয়ের বয়স ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়ানো হল। মেয়েদের বিয়ের বয়স হল কমপক্ষে পনেরো অর্থাৎ পনেরো থেকে আঠারো বছর বয়স্কা মেয়েদের বিয়ে হল অভিভাবকদের অনুমতিসাপেক্ষ। আঠারো বছর বয়স্কা মেয়েরা অবশ্য অভিভাবক ব্যতিরেকে বিয়ের অধিকার অর্জন করলো। সম্প্রতি লোকসভায় মেয়েদের বিয়ের বয়সের যে বিল আনা হয়েছে তাতে এ বয়সসীমা কমপক্ষে আঠারো করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের আইনত কোন দায়িত্ব নেই।

মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল তাদের বিবাহিত জীবনের নিরাপত্তা। ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন বলে মেয়েরা অর্জন করে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার। এই অধিকার কতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আদালতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ে প্রার্থী হতে পারেন। ছেলেরা বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করলে স্ত্রীর ভরনপোষণের সারা জীবনের দায়িত্ব বইতে হবে ফলে যদৃচ্ছভাবে ছেলেদের তরফ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের আগ্রহ অনেক কমে যেতে লাগলো। স্ত্রীর ভরনপোষণের অর্থ আদালতের নির্দেশে কমবেশী হতে লাগলো। এই ব্যবস্থা মোটামুটি মেয়েদের অধিকার আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলো। কিন্তু গত বিশ বছর যাবত আইনের গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে এই বিবাহ বিচ্ছেদ সময়সাপেক্ষ—প্রায় তিন বছরের আগে কোন বিচ্ছেদই সম্ভব হচ্ছে না। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের সূক্ষ্ম মার-প্যাচে বিচ্ছেদের পথে বাধা পড়তে লাগলো। অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুনর্মিলনও সম্ভব হল না। বিবাহবিচ্ছেদে দেরি হওয়ার ফলে অনেক সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে সন্তান সন্ততি থাকলে। এইসব দিকে দৃষ্টি রেখে এই আইন সংশোধনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল। তাই রাজ্যসভায় ও লোকসভায় সম্প্রতি আর একটি বিল আনা হল যার ফলে খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন-বোধে বিবাহবিচ্ছেদ সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। এই বিবাহবিচ্ছেদ ও বিয়ের বয়স সম্পর্কিত আইন সংশোধনের পক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে।

এই সংশোধনটি কার্যকরী হলে সমাজের পক্ষে শুভ হবে কিনা জানতে চাইলাম শ্রীমতী নীলিমা ধরের কাছে। তিনি দুটি সন্তানের জননী ও সুগৃহিণী। গৃহের কাজের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের জগত সম্পর্কেও যথেষ্ট সচেতন। স্বামী, পুত্র কন্যা নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। আমি জিজ্ঞেস করলাম—বিবাহবিচ্ছেদ আপনি সমর্থন করেন কি?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আমার মতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। এই সম্পর্ক সহজে খন্ডন করা যায় না, উচিতও নয়। এই সম্পর্ক সেদিনই শেষ হবে যেদিন পৃথিবীতে আর আমাদের জন্ম নিতে হবে না। বিয়ের পাট ঘুচিয়ে দিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেলে ছেলে-পুলেদেরই বা হবে কি!

তাই বলে পারিবারিক কলহ ও মনো-মালিন্যে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে হবে?

বিজেরা বুঝেশুনে চলতে চাইলে, একে অপরের সুখ-দুঃখে পুরোপুরি অংশীদার হতে পারলে পারিবারিক কলহ আর কতক্ষণ টিকে থাকে? মেয়েদের পতিভক্তিই অলংকার। স্বামীর সেবাই তাঁদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। কখনোই নিজেকে স্বামীর সমকক্ষ কিংবা তাঁর চেয়ে বড় বলে মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। এই ধারণা পোষণ করলে নিজেদের মধ্যে বোঝা-পড়ার অভাব হয় না, এবং সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন সহজেই গড়ে ওঠে।

তবে কেন অনেকে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা সত্ত্বেও ডিভোর্সের পথে পা বাড়াচ্ছেন?

এটা তাঁরা করছেন একটা উত্তেজনাবশে। তাঁদের অনেকেই পরে নিজেদের সাময়িক ভুল বুঝতে পেরে বিবেকের দংশন ও তীব্র অনুশোচনায় চোখের জল ফেলতে বাধ্য হয়েছেন—কারণ তখন ছেলেমেয়েরা পড়েছে অকূল পাথারে।

আপনার মতে সব স্বামী-স্ত্রীই কি সুবিবেচক? নিজেদের ভুল কি সবাই বুঝতে পারেন?

স্বামী বিবেচক না হলে স্ত্রীকে সহ্য করে তাঁর স্বভাবকে মানিয়ে চলতে হবে। চিরকাল আমাদের সমাজে এ রীতি চলে আসছে। তাতে আমাদের ঠাকুরমা-দিদিমা এবং মাসেরা সুখীই হয়েছেন। অবশ্য স্রেফ দুশ্চরিত্র, উন্মাদ স্বামীর ক্ষেত্রে স্ত্রীরা কোর্টে গেলে আমার বিশেষ আপত্তি নেই।

যদি বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তাঁরা আদালতের শরণাপন্ন হন তবে শীঘ্রগিরই যে আইন পাশ হতে চলেছে সে সম্পর্কে আপনি কি ভাবছেন?

আমার মতে ১৯৫৫ সালের বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনই ভাল ছিল। তিন বছরের ব্যবধানে স্বামীর চরিত্র সংশোধনের একটা সুযোগ থাকতো। কিন্তু এক বছর নিতান্ত অল্প সময়।

এরপর আমি একজন সমাজসেবীর সামনে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে ধরলাম।

বিবাহ বিচ্ছেদের নতুন আইন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

আমি নতুন আইনকে স্বাগত জানাচ্ছি। বাক বাঁচা গেল। এতদিন পরে নারীমর্যাদার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হল।

শুধুমাত্র বিচ্ছেদ কার্যকরী করাকেই আপনি নারীমর্যাদার সার্থক রূপায়ণ কি করে ভাবলেন? মানুষের পারিবারিক জীবন কি উপেক্ষা করা যায়? ছেলেমেয়ে, স্বামী, সংসার নিয়ে যিনি সুখে না থাকতে পারবেন তাঁর সুখ অন্য কোথায় আছে?

স্বামী, পুত্র-কন্যা নিয়ে সবাই সুখে থাকতে চায়। সহজে কোন মহিলা এ গণ্ডী থেকে বেরুতে চান না। কিন্তু একান্ত নিরুপায় হলে পরে তাদেরও তো একটা আশ্রয় চাই। সে আশ্রয় অথবা নিজের পছন্দ-মতো শান্তিময় জীবন কাটানোর অভিলাষ পূর্ণ হতে পারে বিচ্ছেদের পরে।

এবারে দেখা হল এক অশীতিপর বৃদ্ধার সঙ্গে। জিজ্ঞেস করলাম—হিন্দু বিবাহের নতুন আইন প্রণয়নে আপনার কি মত?

তিনি পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জানতে চাইলেন। সবকিছু জেনেশুনে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সারা জীবন অনেক দুঃখ সয়েছি। সব দুঃখের মূলকেন্দ্র স্বামী শ্বশুরবাড়ীর অত্যাচার। পরে পরে মার খাওয়া ছাড়া আমাদের মত অসহায় নারীদের আর কি করার ছিল?

আপনি কতকাল এই অত্যাচার সহ্য করেছেন? এখনও কি করছেন?

বৃদ্ধা বললেন—যতদিন পর্যন্ত জামাই ও ছেলের বৌ না এসেছে এই অত্যাচার আমাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। এখনকার সমাজব্যবস্থা ও বিচ্ছেদের সুবিধা তখন থাকলে মুক্তি পেতাম। অন্ততঃ স্বাধীনভাবে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতাম।

মধ্যবয়সী এক মহিলার সঙ্গে পরিচয় হল। স্বামীর সঙ্গে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করলাম—কি কারণে আপনি বিবাহ বিচ্ছেদ করলেন?

ভদ্রমহিলা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে উত্তর দিলেন বনিবনা হয়নি। স্বামীর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে মানিয়ে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি বারতিনেক আমার প্রাণহানির চেষ্টা করছিলেন। আমি ডিভোর্স করে নিজে বেঁচেছি।

এতেও আমার কৌতূহলের নিবৃত্তি হল না। আমি জানতাম ভদ্রমহিলা এরও আগে দুবার বিবাহ বিচ্ছেদ করেছেন তাই অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী ঘটনাগুলি জানতে চাইলাম।

আমার কৌতূহলে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। অনায়াসে তিনি বললেন—আমি খুব আনফরচুনেট। আমার প্রথম স্বামী ছিলেন উন্মাদ। বিয়ের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তার স্বরূপ দেখে আঁতকে উঠলাম। তখন বয়স আমার অল্প। সারা জীবনের সুখভোগের চিন্তায় আচ্ছন্ন তাই স্বামীকে ছেড়ে দেওয়াই উচিত মনে হয়েছিল। অবশ্য অল্প বয়সে বিবাহ বিচ্ছেদ করবার প্রস্তুতিতে অনেক ইতস্ততঃ ও মনের বোঝা-পড়ার সম্মুখীন হয়েছিলাম। দ্বিতীয় স্বামী সংক্রামক যৌনব্যাধিতে ভুগছিলেন সে খবর বিয়ের আগে জানতাম না। এখানেও আমার ঘর করা হল না। বাধ্য হয়ে ঐ একই অবস্থা অবলম্বন করতে হল। এবারে অবশ্য বিবাহ বিচ্ছেদে যাবার আগে কোন রকম আর অনুভূতি বা ইতস্ততঃ ছিল না। অযথা দেরিও করিনি।

আপনি কি আবার নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছেন?

স্বপ্ন নয়—বাস্তবেই আমি আবার বিয়ে করবো সেদিকে আমার মানসিক প্রস্তুতি পুরোদমে রয়েছে। জানি না আবার কোন দুর্ভাগ্যের কবলে পড়বো কিনা।

নতুন আইনে এক বছরের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ কি আপনি সমর্থন করেন?

আমার প্রশ্ন শুনে তিনি যে কেন হাসলেন বুঝলাম না। হাসিমুখেই জবাব দিলেন— দারুণ আইন হয়েছে। আমার যা দুর্ভাগ্য এই সুযোগটা আগে মিললে আমাকে বোধহয় তিনটের জায়গায় ছটা বিয়ে করতে হত। কারণ বিবাহ-বিচ্ছেদের নিষ্পত্তি খুব অল্প সময়ের জন্য হয়ে যেতে পারতো।

এতক্ষণ যাঁদের সঙ্গে আমি কথা বললাম তাঁরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী কিন্তু একজন-ই মাত্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এই ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ আইনজীবীর ব্যবস্থা হলাম। আইনজীবী সাদরে নতুন আইনকে গ্রহণ করবেন তাই জানালেন।

আপনি কি মনে করেন নতুন আইন চালু হলে এক বৎসরের মধ্যেই বিচ্ছেদ সংক্রান্ত কেসের নিষ্পত্তি হবে?

এ ব্যাপারে আগেই মতামত দেওয়া কঠিন কারণ আদালতে প্রচুর দেওয়ানী মামলা বহু বছর ধরে জমে আছে। এগুলি নিষ্পত্তি কবে হবে কেউ বলতে পারে না। তার ওপর বিচার বিভাগের কাজ এই গতিতে চললে আইনে এক বছরের বিধান থাকলেও ঠিক কতদিনে সেই বিধান অনুযায়ী কেসের নিষ্পত্তি হবে বলা শক্ত। আমার মনে হয় এই বিষয় সংক্রান্ত কেসগুলিকে আদালতে প্রাধান্য দেওয়া দরকার।

এক বছরের সুবিধায় ডিভোর্সের সংখ্যা বেড়ে যাবে এ সম্বন্ধে আপনি কি ভাবছেন?

এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমিও একমত—তবে অবশ্য এত অল্প সময়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিচ্ছেদের কারণ খতিয়ে দেখার ততটা সুযোগ পাবেন না। আবার একথাও ঠিক, শুধুমাত্র আদালতের আশ্রয় নিলেই যে বিচারে বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষেই রায় হবে তাও ভাবা যায় না। তবুও উন্মাদ, চরিত্রহীন স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের কেসগুলিতে অযথা কালক্ষেপ করার যুক্তি নেই।।

বিবাহ বিচ্ছেদের নতুন আইন সম্বন্ধে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা-কল্পনা। ভবিষ্যৎ সামাজিক জীবনে এই আইনের প্রতিফলন থেকে আমরা এর যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবো।

অঞ্জলি চৌধুরী

বাম্পার বিতর্কের এক অধ্যায়

বাম্পার বিতর্ক ঘিরে ক্রিকেট মহলে নানা জনে যা বলছেন, আজ তাই শোনার চেষ্টা করছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের চতুর্থ টেস্ট উপলক্ষে বাম্পার বর্ষণের হিড়িক লক্ষ্য করে ইংলণ্ডের প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছেন :

নিরবচ্ছিন্ন বাম্পার ঠুকে ব্যাটসম্যানকে ভয় দেখানোর এই যে ঝোঁক তা প্রতিহত করায় আম্পায়ারদের এখন এগিয়ে আসতে হবে। আমার প্রস্তাব, যে সব ব্যাটসম্যান বাম্পারের মোকাবিলায় অক্ষম, তাঁদের বিরুদ্ধে বাম্পার দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হোক।

ক্রিকেট খেলার একটা আদর্শগত দিক আছে। সাবিনা পার্কে সেই আদর্শকে উপেক্ষা করা হয়েছে। এইভাবে জিতে ক্লাইভ লয়েড সন্তুষ্ট বোধ করতে পেরেছেন কিনা জানতে আমার নিজেরই সন্দেহ রয়েছে।

আমরা সেকালে খেলতাম সেইকালেও সর্ট পিচে বল ঠুকে বাম্পার দেওয়া হোত। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে বোলারদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যাটসম্যানদের আউট করা। নিশ্চয়ই তাঁদের আহত করা নয়। রে লিণ্ডওয়াল, কিথ মিলার, ফ্র্যাঙ্ক টাইসন, ফ্রেডি ট্রুম্যান বোলাররা পিটার হেন, নিল এড্‌কক্কের মতো পেস বাম্পার ব্যবহার করতেন ঘটনার আকস্মিকতায় ব্যাটসম্যানদের চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তাঁদের মারধোর করার জন্যে নয়। তাছাড়া একেবারে শেষ পর্বের ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো বাম্পার প্রয়োগ করেন নি। শেষদিকে ব্যাটসম্যানেরা বাম্পারের মোকাবিলায় অশক্ত জেনেই তাঁরা এক অলিখিত অনুশাসন মান্য করে চলতেন।

ইংলণ্ডের আর এক প্রাক্তন খেলোয়াড় টেস্ট ক্রিকেটে বোলিংয়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী জিম লেকার বলেছেন যে দেওয়ালের লিখন ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখনই কিছু করা দরকার। নইলে অদূর ভবিষ্যতে ক্রিকেট মাঠে কাউকে খুন হয়ে যেতে হবে। লেকার বলেছেন যে নিয়ম সংশোধন করে ওভার পিছু একটির বেশি বাম্পার দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষিত হোক না?

লেকারের মতে, ব্যাটসম্যানদের আঘাত এড়াবার উদ্দেশ্যে অধুনা বিশেষ ধরনের পোষাক ও শিরস্ত্রান ব্যবহারের প্রস্তাব উঠেছে। এসব অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাব। আসলে তাঁদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে নিয়মের মাধ্যমে। যে নিয়ম প্রয়োগে আম্পায়ারকে তৎপর ও ক্ষমাহীন হয়ে

উঠতে হবে। পেস্ বোলারদের হাত থেকে বাম্পার নামক অস্ত্রটি লেকার কেড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী নন। কিন্তু তাই বলে ক্রিকেট খেলার মাঠ যুদ্ধভূমিতে পরিণত হোক তা তিনি চান না। তাই লেকারের সুপারিশ অবিলম্বে প্রয়োজনীয়, কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

বৃটিশ ক্রিকেট সমীক্ষক জন উইকনেসও লেকারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি তুলে লিখেছেন যে আম্পায়ারদের কাজই হলো, ব্যাটসম্যানদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া এবং সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবায়িত করায় কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া। নইলে সত্যিই একদিন-কাউকে ক্রিকেট মাঠে প্রাণ হারাতে হবে!

আম্পায়ারদের যে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে সেকথা বলেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ম্যানেজার ক্লাইভ ওয়ালকটও। ওয়াল-কটের ভাষ্যে 'বাম্পার নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে কিনা তা দেখবেন আম্পায়ার। ব্যাটস-ম্যানকে ভয় দেখাতে ইচ্ছে করে বাম্পার ঠোকা হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন তিনিই।' তবে সাবিনা পার্কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেস্ বোলাররা বাম্পার দেওয়ার ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছেন বলে ওয়ালকট মনে করেন না। তাই কতকটা কৈফিয়তের সুরেই শুনিয়েছেন যে আজকাল টেস্ট ক্রিকেটে জিততে হলে কিঞ্চিৎ চড়া ধাতের পরিচয় রাখতে হয়।

চড়াধাতের পরিচয় রাখায় সাবিনা পার্কে যে দুজন সবচেয়ে ওস্তাদী দেখিয়েছেন সেই মাইক হোল্ডিং ও তাঁর পরামর্শদাতা ক্লাইভ লয়েডের অভিমতটি এবার শোনা যাক।

হোল্ডিং বলেছেন যে পেস বোলারদের কাজই হলো ব্যাটসম্যানদের ভয় দেখানো। পেস্ বোলার যদি ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ধরাতে না পারে তাহলে তাঁর ভূমিকা ভোঁতা হয়ে পড়ে না কি?

তবু ভাল যে অপরিণত তরুণ বাইশ বছরের মাইক হোল্ডিং বলে ফেলেছেন যে তিনি ব্যাটসম্যানদের মনে ভয় ধরাতেই চান। তার জন্যে যা করণীয় তাই হয়তো তিনি সাবিনা পার্কে করে ফেলেছেন। কিন্তু লয়েড তেমন অপরিণত নন এবং অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান। তাই বাম্পার প্রয়োগে বাড়াবাড়ি করার অভিযোগ অস্বীকার করে লয়েড যা বলেছেন তা শোনবারই মতো!

লয়েড যেন বলতে চেয়েছেন যে একটানা বাম্পার দেওয়ার অভিযোগ তাহা মিথ্যে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা জোর বলে খেলতে অনভ্যস্ত বলেই বাম্পার জুজু তাঁদের ভূতের মতো তাড়িয়ে বেড়ায়। তাঁরা কি আশা করেন, টেস্ট ক্রিকেটে তাঁদের উদ্দেশ্যে লোপ্পা বল ছাড়া হবে? ঠিকমতো খেলতে না পারার দোষেই তাঁদের চোট লেগেছে। তাছাড়া সাবিনা পার্কের পিচের একটি জায়গার মাটি অসমান ছিল। অঞ্চলটি যেন শিরের মতো ফুলে উঠেছিল। বল ওখানে পড়ে লাফিয়েছে। বোলাররা ইচ্ছে করে বাম্পার ঠোকেনি।

শিরের মতো ফুলে ওঠা জায়গাটি পরি-ভাষায় যা 'রিজ', তার অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি? লয়েডের কৈফিয়ৎ শুনে ভারতীয় দলের ম্যানেজার পলি উমরিগড় প্রতিবাদে বলেছেন যে রিজ-ফিজ বাজে অজুহাত। ও বস্তুটি মাঠে আদৌ ছিল না। কল্পনার চোখে ওটিকে আবিষ্কার করে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে পরে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হচ্ছে। 'রিজ' থাকলে তো প্রথম দিনেই বল লাফাতো। কিন্তু তা তো হয়নি। ভারতীয় ব্যাটসম্যানেরা যখন তাঁদের ইনিংসটি ভালভাবে গুছিয়ে নিয়েছে ঠিক তখনই বল ঠোকা শুরু হলো এবং বল লাফাতেও আরম্ভ করে দিল। সবই পূর্ব পরিকল্পনার কারসাজি। এখন ব্যাপারটা ঢাকা দেবার জন্যে 'রিজ'এর অজুহাত তোলা হচ্ছে।

উমরিগড় বলেছেন যে পেস বোলাররা বাম্পার ছাড়া বিমারও ছেড়েছেন। বিমার নিশ্চয়ই বোলারদের হাত ফসকে বেরিয়ে পড়েনি। তাঁর স্বার্থহীন উপলব্ধি ক্রিকেটের ৪৬নং আইনের যথাযথ প্রয়োগে আম্পা-য়াররা ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে বোলাররা তাঁদের অনুসৃত নীতিতে ব্যাটসম্যানদের ইচ্ছে করে ভয় দেখাচ্ছিলেন আম্পায়াররা তাঁদের সতর্কিত করেন নি। তবু আমরা মুখ ফুটে প্রতিবাদ জানাই নি। আমরা শুধু সাংবাদিকদের কাছে বলেছিলাম এর নাম আর যাই হোক, ক্রিকেট নয়!

ক্লাইভ লয়েড ও পলি উমরিগড়কে এ ব্যাপারে একেবারে নিরপেক্ষ বলে মনে করা যায় না। কারণ তাঁরা হলেন এই বিতর্কের সঙ্গে জড়িত। দুই শিবিরের দুই প্রধান কর্মকর্তা। একজন দলপতি। অন্যজন দলের ম্যানেজার। তাই ওঁদের বাদ রেখে নিরপেক্ষ দর্শক-সমালোচক হিসেবে যদি আমরা ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট সমীক্ষক

ভাষ্যকার টনি কোজিয়ারের মন্তব্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে ক্লাইভ লয়েড সদা সত্য কথা বলেন নি। কোজিয়ার বলেছেন যে হোল্ডিং বাম্পার নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। ওভার পিছু চারটি করে বাম্পার ঠুকতেও তাঁর আটকায় নি। কোজিয়ার বলেন যে সফরকারী ভারতীয় দলের মোট সতেরোজন খেলোয়াড়কেই কোনো কোনো সময়ে চতুর্থ টেস্ট উপলক্ষে মাঠে নামতে হয়েছে। এক সময়ে তো পাঁচ-পাঁচজন বদলী খেলোয়াড় মাঠে ছিলেন। যেহেতু আসল খেলোয়াড়েরা তখন আঘাতের শুশ্রূষায় হয় হাসপাতালে আর না হয় প্যাভেলিয়নের অভ্যন্তরে নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত! একটি খেলায় পাঁচজন বদলী! এমন ঘটনা আগে ঘটেছে কিনা কে জানে!

কোজিয়ার বলেছেন আম্পায়ার গসেনের উচিত ছিল হোল্ডিংকে সতর্কিত করা। জামাইকার ডেইলি গ্লিনার পত্রিকার ক্রিকেট সমালোচকও টনি কোজিয়ারের সঙ্গে একমত হয়ে বাম্পার ব্যবহারে বাড়াবাড়ির অভিযোগ এনেছেন প্রত্যক্ষে! অতএব লয়েডের কৈফিয়ৎটি মাঠেই মারা গেছে! সাবিনা পার্কে ভারত-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্টে বাম্পার বর্ষনের আধিক্য ঘিরে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন। অনেকক্ষেত্রে এই সব মন্তব্য পরস্পরবিরোধী। তবুও দু-একজনের অভিমতের উল্লেখ রাখা হলো ঃ

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক নরি কন্ট্রাকটর বলেছেন ঃ অবস্থা যখন প্রতিকূল তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পরিত্রাণের পথ হিসেবে বাম্পারকে বেছে নেবে, সেইটিই তো স্বাভাবিক। আর হোল্ডিং কি সত্যিই নিরবচ্ছিন্ন বাম্পার বর্ষণ করেছেন? বেতার ভাষ্যে শুনেছি যে পিচের এক জায়গায় মাটি শিরের মতো ফুলে উঠেছিল। বল সেখানে পড়ে অতর্কিতে লাফিয়ে উঠেছে। হোল্ডিং টিপ করে ওই জায়গাতেই বল ফেলেছেন। তাহলে হোল্ডিংয়ের অপরাধ কোথায়? অতো তাড়াতাড়ি ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করায় আমি দুঃখিত। সাতটি উইকেট পড়ার পর বেদী ইনিংস ডিক্লেয়ার করলেই ভাল করতেন।

আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক মনসুর পাতৌদির মত ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে চারজন পেস বোলার ছিলেন। প্রথম দিনে ভারতের রান এক উইকেটে ১৭৮-এ পৌঁছোতেই পেস বোলারদের হাত নিসপিস করতে থাকে। আর সেইটিই তো স্বাভাবিক। তাঁরা তখন সর্ট পিচ বল দিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের সামর্থ্য পরখ করে দেখতে থাকেন। বাম্পার ছাড়ায় হোল্ডিংয়ের বাড়াবাড়ি রুখতে যে আম্পায়ার কিছুই করেননি, অপরাধ তো তাঁরই। দ্বিতীয় ইনিংস তাড়াতাড়ি ডিক্লেয়ার করে বেদী ঠিক না ভুল করেছেন, এ প্রশ্ন ওঠেই না। যেহেতু তাঁর অন্য কিছু করার ছিল না। হোল্ডিংয়ের বাউন্সিং পদ্ধতির প্রতিবাদে বেদী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বলে আমি মনে করি।

প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় দিলীপ সরদেশাইয়ের অভিমতও মনসুরের অনুরূপ। তিনি বলেছেন, লয়েড জিততে চেয়েছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর দলের পেস বোলাররা আলতো বল দেবেন নাকি? তবে হোল্ডিংকে সংযত রাখায় আম্পায়ারের ওপর যে দায়িত্ব ছিল সে দায়িত্ব পালিত হয়নি। বেদী সম্পর্কে সরদেশাই বলেন, দান ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কি করণীয় ছিল? দান ছেড়ে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তা আমি মনে করি না।

রুসি মোদিও আম্পায়ারকে দুষেছেন। তাঁর মতে, বাম্পার নিয়ে বাড়াবাড়ি করার দরুণ আম্পায়ারের উচিত ছিল হোল্ডিংকে ক্রিকেটের ৪৬নং নিয়মের আওতায় আনা।

কিঞ্চিৎ ভিন্নসুরে কথা বলেছেন ভারতের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক অজিত ওয়াদেকার ও বিনু মানকাদ। ওয়াদেকার বলেন যে, যে পিচে পড়ে বল দ্রুতগতিতে ছোটে সেই পিচে খেলতে হলে প্রকরণগত যে সঙ্গতির দরকার, ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের যে তা নেই সেই সত্যই সাবিনা পার্কে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবক্ষেত্রে আমরা আমাদের মনোমতো উইকেট পাবো, এই আশাই তো অযৌক্তিক। ওয়াদেকার যেন লয়েডের বক্তব্যটির ওপর বেশি আস্থা রেখেছেন। ঊমরিগড়ের অভিযোগের ওপর তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁর ধারণা, দান ছেড়ে দিয়ে বেদী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল অনুসৃত রীতির পরোক্ষে প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিলেন।

মানকাদের অভিমত অভিন্নপ্রায়। তিনি বলেছেন, পেস বোলারদের ব্যবহার করতে চেয়ে লয়েড যথার্থ পথই অনুসরণ করেছেন। তাছাড়া ভারতীয়েরা যে বাম্পারে চোট পেয়েছেন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ নই। দান ছেড়ে দিয়ে বেদী সুরুচির পরিচয় দেননি।

দাত্তু ফাদকার বলেন যে সাবিনা পার্কে আম্পায়ার যে ভুল করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মাইক হোল্ডিং উইকেট ঘুরে বল করার সময় বাম্পার ছেড়েছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ব্যাটসম্যানদের শরীর তাগ করা। ওভার পিছু তিন-চারটি বাম্পার দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? ব্যাটসম্যানদের ভয় দেখানো নয়?

সুটে ব্যানার্জির মত ঃ বাম্পার পেস বোলারদের হাতে এক আইনসিদ্ধ অস্ত্র। এই অস্ত্র কেড়ে নেওয়া উচিত নয়। তবে বাম্পার নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও সমর্থনীয় নয়। বাড়াবাড়ি করলে ক্রিকেটের আদর্শের প্রতি সনিষ্ঠ থাকা যায় না। ব্যাটসম্যানদের তাগ করে অনবরত বাম্পার ঠোকা ক্রিকেটের রীতি-নীতি অনুযায়ী অভব্য কাজ।

রামচাঁদ বলেছেন যে মনে হচ্ছে যে হোল্ডিং বাম্পার দেওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করেছেন। দান ছেড়ে দেওয়া ছাড়া বেদীর উপায়ই বা কি ছিল! যদিও আমি হলে একহাতে প্ল্যাস্টার জড়িয়েই ব্যাট নিয়ে মাঠে নামতাম। তবুও বলি, বেদী প্রতিবাদ জানাতে কিছু করেছেন বলে আমি মনে করি না।

অজয় বসু

খেলাধুলা

দর্শক

আগামী জুলাই মাসে কানাডার মন্ট্রিল শহরে ২১তম অলিম্পিক গেমসের আসর বসছে। এই মন্ট্রিল অলিম্পিকে যোগদানকারী ভারতীয় দলে আছেন মোট ৩৮ জন সদস্য—খেলোয়াড় ২৭ জন এবং কর্মকর্তা ১১ জন। ভারতবর্ষ মাত্র এই পাঁচ রকমের খেলায় অংশ গ্রহণ করবে—অ্যাথলেটিকস, হকি, সুটিং, ভারোত্তোলন এবং মুষ্টিযুদ্ধ। ভারতীয় অলিম্পিক দলে এইভাবে ২৭ জন খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন—হকিতে ১৬ জন, অ্যাথলেটিকসে ৪ জন, সুটিংয়ে ৩ জন, বকসিংয়ে ২ জন এবং ভারোত্তোলনে ১ জন। দলের ১১ জন কর্মকর্তা হলেন হকির ২ জন, অ্যাথলেটিকসের ২ জন, সুটিংয়ের ২ জন এবং মুষ্টিযুদ্ধের ১ জন। তাছাড়া একজন করে চিকিৎসক এবং অধ্যাসংবাহক। এয়ার চীফ মার্শাল ও পি মেহেরা দলের শোফ দ্য মিশন এবং এয়ার ভাইস মার্শাল চমনলাল মেহতা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় অলিম্পিক দলটি একসঙ্গে মন্ট্রিল যাবে না। বিভিন্ন সময়ে ভাগ করে পাঠানো হবে। কেননা হকি দলটি ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। তারা ফ্রান্স হয়ে মন্ট্রিল যাবে। অ্যাথলেট দলটি যাবে তেহরান হয়ে। বাকি দলগুলি সোজা মন্ট্রিল অভিমুখে রওনা হবে ৮ই জুলাই।

অলিম্পিক গেমসের প্রধান আকর্ষণ হল অ্যাথলেটিকস। এবারের অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস আসরে ভারতের পক্ষে মাত্র এই চারজন অ্যাথলীট অংশ গ্রহণ করবেন ঃ ৮০০ মিটার দৌড়ে শ্রীরাম সিং (সার্ভিসেস), ১০,০০০ মিটার দৌড়ে হরি চাঁদ (পুলিশ), ম্যারাথনে শিবনাথ সিং (সার্ভিসেস) এবং লং জাম্পে টি সি জোহানন (হেভী ইঞ্জিনিয়ারিং স্পোর্টস ক্লাব)। দেখা যাচ্ছে, এই ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস দলে একজনও স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী নেই। রাশিয়া অথবা আমেরিকার অলিম্পিক অ্যাথলেটিকস দলে এ রকম হয় না। এই দুই দেশের স্কুল-কলেজ এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বেশী সংখ্যায় স্বদেশের অলিম্পিক দলে স্থান পেয়ে পদক জয়ী হন। তাছাড়া বিশাল ভারতের পক্ষে মাত্র চারজন পুরুষ অ্যাথলীট অলিম্পিক ক্রীড়ামান অনুসারে নির্বাচিত হয়েছেন এটাও খুব লজ্জার ব্যাপার নয় কি?

এবারের অলিম্পিকের আসরে ভারতের পদক জয়ের একমাত্র ভরসা হকি। বিগত ১০টি অলিম্পিক গেমসের আসরে (১৯২৮-৭২) ভারত হকিতে এইভাবে পদক জয়ী হয়েছে স্বর্ণ ৭, রৌপ্য ১ এবং ব্রোঞ্জ ২। অর্থাৎ প্রতিবারই কোন না কোন একটা পদক পেয়েছে।

ভারত অলিম্পিক হকিতে উপর্যুপরি ৬টি স্বর্ণ পদক জয়ের পর ১৯৬০ সালের অলিম্পিক হকির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ০-১ গোলে হেরে রৌপ্য পদক পায়। এরপর ১৯৬৪ সালে ভারত পুনরায় হকিতে স্বর্ণপদক জয়ী হয়। কিন্তু পরবর্তী ১৯৬৮ ও ১৯৭২ সালের অলিম্পিক হকিতে ভারতের ভাগ্যে ব্রোঞ্জ পদক জুটেছিল। উপর্যুপরি দুটি অলিম্পিক হকির আসরে ব্রোঞ্জ পদক লাভের ফলে ভারতের মান-সম্ভ্রম যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছিল। যাইহোক ১৯৭৫ সালে কুয়ালালামপুরে আয়োজিত তৃতীয় বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতায় ভারত স্বর্ণ পদক জয়ের সূত্রে আন্তর্জাতিক হকি খেলায় তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করেছে। ভারতের অগণিত জনগণ আজ মন্ট্রিলের অলিম্পিক হকির আসরের দিকে অধীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। সকলেরই একমাত্র কামনা হকির আসরে ভারতের স্বর্ণপদক জয় হোক।

কলকাতার প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা সুরু হয়েছে গত ২৪শে মে। খেলা এখনও তেমন জমেনি। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্স—এই প্রধান চারটি দল এ পর্যন্ত তিনটি করে ম্যাচ খেলেছে। এই চারটি দলের মধ্যে একমাত্র ইস্টবেঙ্গলই তাদের তিনটি খেলায় জিতেছে। বাকি মোহনবাগান, মহমেডান স্পোর্টিং এবং এরিয়ান্স একটা করে খেলা ড্র করে একটা করে পয়েন্ট নষ্ট করেছে। গত ছয় বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান (১৯৭০-৭৫) ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে পুলিশ, ৩-০ গোলে হাওড়া ইউনিয়ন এবং ৩-০ গোলে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে পরাজিত করেছে। বাটার বিপক্ষে মোহনবাগান তার প্রথম খেলাটি গোলশূন্য ড্র করে ৪-০ গোলে ক্যালকাটা জিমখানা এবং ২-০ গোলে নবাগত সালকিয়া ফ্রেন্ডসকে পরাজিত করে। মহমেডান স্পোর্টিংও তার প্রথম খেলায় জিততে পারেনি—ওয়াড়ির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। এরপর তারা চন্দ্র মেমোরিয়ালকে ২-০ এবং ভ্রাতৃসঙ্ঘকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। এরিয়ান্স তার প্রথম খেলায় টালী অগ্রগামীকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় খেলায় আর্টিলারী রেজিমেন্ট দলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে। তৃতীয় খেলায় তারা পোর্ট কমিশনার্সকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেয়।

আগামী নভেম্বর মাসে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল ভারত সফরে আসছে। তাদের ভারত সফরের তালিকা সংবাদপত্রে পড়ে ভারতের অগণিত ক্রিকেট অনুরাগী নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। তালিকায় এই তিনটি টেস্ট খেলার উল্লেখ ছিল : বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্ট, কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট এবং মাদ্রাজে তৃতীয় টেস্ট। কলকাতার নাম বাদ। তাজ্জব ব্যাপার। এ যে শিবহীন যজ্ঞ! পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা আরম্ভ করেছেন যাতে কলকাতায় নিউজিল্যান্ডের একটা টেস্ট খেলা পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর দলের পক্ষে ভারত সফরে অতিরিক্ত টেস্টম্যাচ খেলার অক্ষমতা জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ স্বরূপ তিনি বলেছেন স্বদেশ ও বিদেশের ক্রিকেট খেলা নিয়ে তাঁর দল খুবই বিব্রত। বাংলার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের গাফিলতির জন্যেই কলকাতায় নিউজিল্যান্ডের টেস্ট খেলা হল না। সি এ বি-র প্রেসিডেন্ট তাঁর ভুল স্বীকার করেছেন।

দলীপ সিংজী

ইংল্যান্ডের পক্ষে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিলেন যথাক্রমে নওনগরের জামসাহেব কে এস রঞ্জিৎ সিংজী এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দলীপ সিংজী। ইংল্যান্ডের জাতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলে রঞ্জিৎ সিংজীর স্থান পাওয়ার খবরে সারা ভারতে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার বন্যা বয়ে ছিল।

দলীপ সিংজীর জন্ম ১৯০৫ সালের ১৩ই জুন। ইংল্যান্ডে তিনি তাঁর স্কুল ও

দলীপ সিংজী

কলেজ জীবনের ক্রিকেট খেলায় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের সাসেকস কাউন্টি ক্রিকেট দলের খেলোয়াড় হিসাবে একাধিকবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলার ব্যাটিংয়ের গড় তালিকায় শীর্ষস্থান লাভ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ব্যাটিং গড়তালিকায় তিনি শীর্ষস্থান লাভ করেন এবং তাঁর ব্যাটিং পরিসংখ্যান দাঁড়ায়—ইনিংস ৩৬, মোট রান ২০২৮, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ২৪৬, সেঞ্চুরী ৭ এবং গড় ৫৬। ১৯২৯ সালের ক্রিকেট মরসুমে কেন্টের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১১৫ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৪৬ রান করার সূত্রে তিনি এক অসাধারণ ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দেন। কারণ তাঁর আগে প্রথম শ্রেণীর একটি ক্রিকেট খেলায় প্রথম ইনিংসে শতরান এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিশত রান করার নজির ছিল মাত্র চারবার। রঞ্জিৎ সিংজীর মতই দলীপ সিংজীর চক্ষুযুগল ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত এবং দুই হাতের কব্জী ছিল পরম নমনীয়। দলীপ সিংজী সাসেকস কাউন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে ইংল্যান্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের বিপক্ষে দলীপ সিংজী ইংল্যান্ডের পক্ষে চারটে টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন। লর্ডস মাঠে তিনি তাঁর প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭৩ রান করেন। তাঁর এই ১৭৩ রানই লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত টেস্ট খেলায় ইংল্যান্ডের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডে পরিণত হয়। দলীপ সিংজী ইংল্যান্ডের পক্ষে মোট ১২টা টেস্ট ম্যাচ খেলেছিলেন—অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৪ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৭ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১। টেস্টে তাঁর সেঞ্চুরী তিনটে—নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ২ এবং অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১।

দলীপ সিংজী তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে অকালে ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর ৫ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে দলীপ ট্রফি আঞ্চলিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা হয়েছে।

বঙ্গশ্রী হাওড়া
৪১/১, জি, টি, রোড, হাওড়া
• বেনারসী • জোড় • সিল্ক • তাঁত • মিল • পোষাক • সাটিং • সুটিং • ওয়ুলেন কাপড়

মাঠের নায়ক

ফুটবল, ফুটবল। গোটা পশ্চিম বাঙলা ফুটবলের জোয়ারে উত্তাল। জনমানসে ফুটবল সোনার রং তুলিতে আঁকা। আঁকা থাকবেই বা না কেন? ফুটবল যে বাঙলার বাঙালীর সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা, প্রাণের খেলা। শতবর্ষেরও আগে এই কলকাতার বুকেই ফুটবলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নগেন্দ্র সর্বাধিকারী। তিনিই বাঙলার ফুটবলের জনক। পরবর্তী পর্বে নানা কীর্তিধর পুরুষের পরিচর্যায় ফুটবলের বিবর্তন ঘটেছে। ঘটছে এখনও। ফুটবলে বাঙলা এক বিপুল বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী। এ যেন সেই ওয়াজেদ আলীর কথায় বললে বলতে হয়, সেই ট্র্যাডিসন সমানে চলেছে। বোধকরি চলবেও।

ফুটবলের ঐ ট্র্যাডিসনকে সামনে রেখে আবার সুরু হচ্ছে অমৃতের অন্যতম আকর্ষণ মাঠের নায়ক।

সুধীর কর্মকার

'মিথ্যে কথা বলবো না সেদিন একটু অভিমানই হয়েছিল। দাদা সুশীল স্কুল দলে চান্স পেয়ে গেলেন, আমি বাদ! রোখ্ চেপে গেল মাথায়। ঢাকার কট্টর বাঙাল তো? গোঁ বড় মারাত্মক। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম—ভাল করে খেলা শিখে ফুটবলের বড়ো আসরে নামবোই'।

সুধীর শৈশবের সেই প্রতিজ্ঞা যে নিঃসন্দেহে পালন করেছেন সে কথা আজ বলাই বাহুল্য। পশ্চিম বাংলার, সারা ভারতের সেরা রাইট ফুলব্যাক আজ সুধীর কর্মকার। ছোটখাট চেহারা কিন্তু ক্রীড়া-বিন্যাসে কি পরিপাটি! আত্মপ্রত্যয় কত গভীর। স্যুটিং, ট্যাকলিং, হেডিং এবং সর্বোপরি গেম সিচুয়েশন সম্পর্কে সুধীরের বুৎপত্তি অসাধারণ। অক্লান্ত পরিশ্রমী তিনি, আচরণ ক্ষুরধার বুদ্ধিদীপ্ত।

সুধীররা পাঁচ ভাই, এক বোন। সুধীর শ্রীমুকুন্দলাল কর্মকার ও শ্রীমতী সুভাষিণীর চতুর্থ সন্তান। দাদা সুশীল এবং অনুজ শ্যামও গড়ের মাঠে সিনিয়ার ডিভিসনে ফুটবল খেলেন এবং মোটামুটি ভালই খেলেন। ওঁদের আদি নিবাস ঢাকার নবাবগঞ্জে। দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ সালে মুকুন্দবাবু সপরিবারে ঢাকা থেকে চলে এলেন বাস্তুহারা হয়ে উত্তর কলকাতার টালায়। ঐ টালায়ই ১৯৫০ সালের ১০ মে সুধীরের জন্ম। লেখাপড়া পাইকপাড়া কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউসনে। শেষের দিকে পাইকপাড়ার স্কুল ছেড়ে ভর্তি হন দমদম আদর্শ বিদ্যাপীঠে। ওখান থেকেই হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছেন। ততদিনে রিষড়ায় বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে ওঁদের। ভর্তি হলেন রিষড়া বিধানচন্দ্র কলেজে। সুধীর বিবাহিত। স্ত্রীর নাম স্বপ্না। ছেলের নাম রাজু। ফুটবলে হাতেখড়ি টালা যুগের যাত্রী ক্লাবে নিশীথ ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে। যুগের যাত্রী তখন উত্তর কলকাতা লীগে খেলতো। ৫৯, ৬০ সালে আন্তঃ স্কুল আন্তঃ জেলা ফুটবলে খেলেছেন, খেলেছেন সুব্রত ট্রফিতে। কলকাতার মাঠে পদার্পণ ১৯৬৫ সালে এ্যালেন লীগে রেনাবো ক্লাবের জার্সি গায়ে দিয়ে। ৬৬ সালে দ্বিতীয় ডিভিসনে রবার্ট হাডসন ক্লাবে। সুধীর তখন স্টপার হিসেবে খেলতেন। ঐ বছরই জেলা ফুটবলে সুধীরের হুগলী জেলা চাম্পিয়ন হোল। ৬৭ সালে বালী প্রতিভা—অর্থাৎ সিনিয়ার ডিভিসনে প্রবেশ। ৬৮তে এরিয়ান্স। ৬৯ সালে ইস্টবেঙ্গলে এলেন সুধীর। অনেক প্রলোভন, অনেক প্ররোচনা সত্ত্বেও সুধীর লাল-হলুদ জামা আর ছাড়েন নি। এরিয়ান্সে থাকার সময় জব্বলপুরে জুনিয়ার বাংলার হয়ে খেলেছেন। খেলেছেন ডুরান্ড। ৬৯ সালে প্রথম সন্তোষ ট্রফি খেললেন সুধীর আসামের নওগাঁয়। এশীয় কাপ খেললেন তেহরাণে। ওটি তাঁর প্রথম বিদেশ সফর। ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৫ সালের সন্তোষ ট্রফির আসরে সুধীর ছিলেন বাংলার রক্ষণভাগের সবচেয়ে শক্ত খুঁটি। ৭৫ সালে দল নায়কও। মাঝখানে ৭২ ও ৭৪ সালে অসুস্থতার জন্য সন্তোষ ট্রফি খেলা সম্ভব হয় নি। ৭৫ সালে সুধীর সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সার্থক নায়ক (কালিকট)। ঐ আসরে সেরা ব্যাক হিসেবে বহু বাঞ্ছিত পদকটিও দুলেছে সুধীরের বুকে।

মারদেকা ফুটবল খেলেছেন ১৯৭০ সালে। ভারত সেবার তৃতীয় হয়েছিল। ব্যাংককে আয়োজিত এশীয় ক্রীড়ায়ও সুধীরপুষ্ট ভারতের স্থান ছিল তৃতীয়। ১৯৭১ সালে মারদেকা খেলার পর গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের হয়ে রাশিয়া সফরে। ১৯৭২ সালে প্রাক ওলিম্পিক খেলেছেন রেঙ্গুনে। ৭৩ সালে ইস্টবেঙ্গল-এর হয়ে গেছেন হংকং সফরে। ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে ভেটারেন্স ফুটবল ক্লাবের পক্ষ থেকে এবং ১৯৭০ সালে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার পক্ষ থেকে সুধীর সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পান। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে ইস্টবেঙ্গল কলকাতার ঘরোয়া লীগ আই এফ এ শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স ও বরদলুই ট্রফি লাভ করে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

রহস্য রোমাঞ্চ রমনীয় প্রেমের কাহিনী

৭৬'-এর শ্রেষ্ঠ মনোরঞ্জন

যে কোন বিদেশী প্রথম শ্রেণীর ছবির সঙ্গে তুলনীয়

ওরিয়েণ্ট - ম্যাজেষ্টিক - মুনলাইট - বসুশ্রী

বীণা - নবীনা - গণেশ - পূর্ণশ্রী - পাকশো

মঞ্জুশ্রী - রাধাশ্রী ও অন্যত্র

হারমোনিয়াম
আরতি ভট্টাচার্য/ছায়া দেবী

সিনেমাটিক

অভিমন্যু দাসের ঠোঁটে সেই রহস্যময় হাসি। যাকে আত্মবিশ্বাসের হাসি বলে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। সে বলল—এক্ষুনি হব। চিন্তা কী! মা নিজে আমায় বলে গেছেন, বন্দীদশার তে-রাত্তির পার আর তুইও খালাস.:....

দিনের শেষে জেলখানার কয়েদী গনতি হচ্ছে।

প্রত্যেক সেলের সামনে অফিসার আর প্রহরীরা মানুষ গুনে নিচ্ছে খাতায় লেখা হিসেবের সঙ্গে মিলিয়ে। একজন কম পড়লে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবার কথা। যেমন যেমন গনতি হচ্ছে—অমনি তাদের সেলে ঢুকিয়ে দরজায় তালা পড়ছে ঝন ঝনাৎ শব্দে। ব্যস, রাতের মত নিশ্চিন্ত। এই যে একবার গণতি করে ঢোকানো হল—আর কেউ বেরুতে পারবে না যতক্ষণ না দিনের আলো ফুটে পরিস্কার হচ্ছে। এমন কি স্বয়ং রাষ্ট্রপতির আদেশ হলেও। সেল থেকে বন্দীকে রাতে বের করার কোন কানুন নেই।

জীবন গুহ'র ভ্রু কুচকে ওঠে। —কী হে ঠাকুর?

অভিমন্যু হাসছে।

ক্রমে জীবন গুহ'র সেলে গণতি হল। সশব্দে তালাও বন্ধ হল।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে অভিমন্যুর দিকে এবার তাকাল জীবন গুহ—ব্যাটা বুজরুকী মারবার জায়গা পাওনি। এবার তোমায় কে রক্ষা করবে শুনি? একটা থার্ড ডিগ্রী ট্রিটমেন্ট তোমার ওপর চালু হয় যদি?

অভিমন্যুর মুখের হাসি হঠাৎ মিলিয়ে গেল। চোখে কেমন যেন অনিশ্চিত ভাব। —এ অসম্ভব। এ হতে পারে না। মা আমায় নিজে বলে গেছে যে মাওর তে-রাত্তিরের মেয়াদ...

জীবন গুহ রাগবে কি—এখন হেসেই কুটিপাটি—লোকটার অসহায় ভঙ্গী দেখে। হেঃ, কত দেখলাম এটুকু বয়সে, কত অন্যায় কত অবিচার, নিরীহ দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার, শালা বাপ হয়ে মেয়েকে পাপের পথে এগিয়ে দিয়ে নেশার খরচা তুলছে—কে এসবের প্রতিকার করছে? পৃথিবীর জ্যান্ত মানুষের ওপর স্বর্গের মহামানুষের কোন হাত আছে নাকি? বোগাস। এই যে ঠাকুর এখুনি তোমাকে ফেলে যে থার্ড ডিগ্রী মার মারা হবে, তোমার মা তোমায় বাঁচাবে ভেবেছ? পাগল পাগল, আস্ত পাগল তুমি অভিমন্যু ঠাকুর।

অভিমন্যু দাসের চোখে জল এসে গেছে। অভিমানে তার ঠোঁট জোড়া থর থর কাঁপছে। বিড় বিড় করে কি যেন বলছে সে। জীবন গুহ'র একটা কথাও তার কানে যাচ্ছে না।

দোতালায় গণতি শেষ। ঝন ঝন শব্দে সেখানে সেলের দরজায় তালা চাবি পড়ে গেল। তারপর তিনতালায়।

প্রহরীদের ভারি বুটের শব্দ সিঁড়ির ধাপে শোনা গেল। কাজ চুকিয়ে ওরা নেমে আসছে।

হঠাৎ গেটের দিক থেকে একটা চীৎকার। কে যেন ওখান থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে আর প্রাগপণে চীৎকার করছে—অভিমন্যু দাস—অভিমন্যু দাস—অভিমন্যু দাস—অভিমন্যু দাস

সাব-জেলার নিজে ছুটছে। তার হাতে একটা কাগজ। পেছনে ছুটছে দুজন রক্ষী।

ডাকটা প্রথমে শুনতে পেয়েছিলেন জীবন গুহ। চমকে উঠেছিলেন। জীবনে এভাবে আর কখনো চমকাননি তিনি।

কান পেতে ভাল করে শুনলেন—বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে ডাকটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে—অভিমন্যু দাস—অভিমন্যু দাস—অভিমন্যু দাস...

শুনেই অভিমন্যু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার চোখে সহসা যেন বিদ্যুৎ চমকালো। তারপরই সে শান্ত-নিরুদ্বিগ্ন। মুখে উত্তেজনার কোন লেশ নেই। শুধু দু'হাত জড় করে একবার ভক্তিভরে প্রণাম করলো অদৃশ্য কোন শক্তিকে।

সাব জেলার সেলের কাছে এসে হাঁকল—অভিমন্যু দাস কে আছে?

—এই যে আমি—

—এদিকে এসো—

দরজার ফোকর দিয়ে তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে অফিসার প্রহরীদের উদ্দেশ্যে বলল—দরজা খুলে দাও।

ঝন ঝন শব্দে তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে গেল। দিনের আলো তখনও পশ্চিম গগনে ছুঁই ছুঁই করে লেগে রয়েছে।

—অভিমন্যু দাস, তুমি বেরিয়ে এসো, তুমি খালাস!

জীবন গুহ'র গলাটা কেমন যেন ধরে গেল। ভাঙ্গা গলায় জিগেস করলেন—খালাস মানে?

'খালাস' শব্দটা কেমন যেন গম গম করে উঠল সমস্ত জেলে।

অফিসার হাসি হাসি মুখে বলল—খালাস মানে বুঝতে পারছেন না জীবনবাবু, কোর্ট অভিমন্যু দাসকে রিলিজ করে দিয়েছে। আসল কালপ্রিটরা ধরা পড়েছে। তাদের জবানবন্দীর ওপরই অভিমন্যু দাসের রিলিজ অর্ডার হয়ে গেল। গভর্ণমেন্ট নির্দোষ লোককে এক মুহূর্তের জন্যে জেলে রাখতে চান না.....

ফ্রিডম। ফ্রিডম। ফ্রিডম।

জীবন গুহ'র অন্তরাত্মা হাহাকার করে উঠল—ডিভাইন পাওয়ার, এ নিশ্চিতই ডিভাইন পাওয়ার—নইলে এই কাঁটা থেকে পাপ-পঙ্কিল মানুষকে আর কে উদ্ধার করে? অভিমন্যু দাস, ইউ আর গ্রেট ইউ আর গ্রেট...

জীবন হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে। অফিসার অবাক। অন্যান্য বিচারাধীন বন্দীরা হতভম্ভ।

অফিসার বলল—কার্ট থেকে বিকেলেই রিলিজ অর্ডার এসেছে। কাগজের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছিল, লাস্ট মোমেন্ট ভাগ্যিস খেয়াল হল...চল অভিমন্যু দাস—

অভিমন্যু দাস নীরবে জেলের দেওয়া কম্বল আর থালা ঘট হাতে নিয়ে সেল থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়াল।

—চলি জীবনবাবু...আমার সেই কথাটা যেন খেয়াল থাকে.....চলি—

সবার উদ্দেশ্যে করজোড়ে শেষের প্রণাম জানিয়ে অফিসারের পেছন পেছন অভিমন্যু দাস জেল গেটের দিকে এগিয়ে যায়। আর প্রহরী তৎক্ষণাৎ সেলে তালা লাগিয়ে দেয়।

জীবন গুহ'র হঠাৎ যেন খেয়াল হয় কথাটা। পাগলের মত চীৎকার তিনি করে ওঠেন—ঠাকুর ঠাকুর, তোমার কোথায় দেখা পাব?

যেতে যেতে অভিমন্যু দাস প্রত্যুত্তরে চেঁচিয়ে বলে ওঠে—আমি সব জায়গাতেই

সেই চোখ
শেলী পাল/সাবিত্রী চ্যাটার্জি

থাকি...কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, বনগাঁ, বারাসাত—যেখানে যাবে সেখানেই আমার দেখা পাবে.....

—তবু একটা ঠিকানা বল...দোহাই তোমার, জেলগেটে লিখে দিয়ে যেও। ঠাকুর, আমি পরে নিয়ে নেব...

অভিমন্যু দাস ততক্ষণে প্রায় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। সেখান থেকে সে হাত-পা নেড়ে কি যেন বলল—বোঝা গেল না।

শুধু প্রহরীর হুমকি শোনা গেল—অ্যাইও, গণ্ডগোল মৎ...

—শাট আপ—আরেকজন বন্দী সেই প্রহরীকে হঠাৎ সজোরে ধমকে উঠল।

জীবন গুহ কাঁদছেন। অঝোর ধারে। হাতের মুঠোয় সেই রুদ্রাক্ষ। অভিমন্যু দাস যেটা সযত্নে তাকে দিয়ে গেছে। চোখের সামনে মিরাকল ঘটে গেছে আজ। জীবনের সব বিশ্বাস আর অবিশ্বাস—একটা জায়গায় এসে যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জীবন গুহ কি করবেন—ভেবে উঠতে পারছিলেন না। এই অবস্থায় কেউ কী ভাবতে পারে?

স্টুডিওর মাথায় অন্ধকার আকাশ, প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম, গাছের একটা পাতাও আজ নড়ছে না।

অনিল চ্যাটার্জি নীরবে তাকিয়ে আছেন জীবন গুহর দিকে। আমরা যে যার জায়গায় স্থির হয়ে বসে।

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটার পর বললাম, —তারপর?

—তারপর অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে লাগল। আমি একটার পর একটা কেস করি আর রিলিজ পেয়ে যাই। সবাই অবাক। একদিন রাত্রে হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম...

বলেই জীবন গুহ হঠাৎ ব্রেক কষার মত থেমে গেলেন।

না, স্বপ্ন বৃত্তান্ত উনি আমাকে বলতে নারাজ। শুধু বললেন—এরপর এক বছরের মাথায় আমি সম্পূর্ণ রিলিজ হয়ে বেরিয়ে এলাম। বলতে পারেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে। জেলগেটে অনেকেই এসেছিল সেদিন। আমায় দেখে তারা কেমন যেন গুটিয়ে গিয়েছিল। একমুখ দাড়ি গোঁফের অন্তরালে ওরা ওদের সেই আকাঙ্খিত প্রতিহিংসাকামী মানুষটিকে আর খুঁজে বের করতে পারেনি। কেউ কেউ কথা বলারও চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমি আমল দিইনি।

ওরা শেষে হতাশ হয়ে চলে গিয়েছিল। আর ফিরে আসেনি।

জীবন গুহ এরপর সেই মানুষটিকে অনেক খুঁজে ফিরেছেন, কিন্তু দেখা পাননি। কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছেন কেউ সঠিক ঠিকানা দিতে পারেনি। অভিমন্যু দাস যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

এই মানুষটিকে আমি এখন চিনি। স্টুডিওতে যাওয়া-আসার ফাঁকে ওঁকে চোখে পড়ে। কখনও দু-দন্ড দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব হয়। ছবির কথা হয়। ওঁর কর্মস্থলে ইদানিং যে-সব গণ্ডগোল হচ্ছে—সে-সব নিয়ে কথা হয়। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর উনি হয়ত জোর করে টেনে নিয়ে যান কাছের কোন চায়ের দোকানে। চা খেতেই হবে।

একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—হ্যাঁ মশায় সেটা আছে এখনও?

—নাঃ।

—কী হল?

—রুদ্রাক্ষটা হারিয়ে গেছে। ঠিক যেদিন রিলিজ হলাম—সেদিনই। বাড়ী গিয়ে খোঁজ করে দেখি সেটা নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ, ভাগ্য একেই বলে। তবে তাতে আমার আর দুঃখ নেই। আসল জিনিসটা এবার খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি—

—কোন জিনিসটা?

—বিশ্বাস। ওটা আর হারাব না।

রঞ্জন মজুমদার

ফ্লোর থেকে বলছি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খবর পেয়ে সীমা খুশী। খুশী বন্ধু-বান্ধবেরাও। অমিত কিছু টাকা নিয়ে যথেচ্ছ খচ করে তার মনের উচ্ছ্বাস দেখাল। তারপর আবার যে-কে সেই। বাড়ী, অফিস অফিসের ইউনিয়ন, সীমার সঙ্গে প্রেম লেখাপড়া অমিত আমার পৃথিবীতেই হারিয়ে গেল। পৃথিবীতে শোষিত মানুষের সংখ্যাই বেশী। তাদের অনেক অভিযোগ, অনেক সমস্যা। একজন লেখক তার সারা-জীবনের চেষ্টাতেও এর সমস্তগুলো লিখে উঠতে পারবে না, ভেবেও কলকিনারা করতে পারেন না। অমিত তাই যেন দ্রুত লিখে যতটা পারা যায়—সে রেকর্ড করে রাখতে চায় এই সামাজিক অব্যবস্থার অবিচার এবং অন্যায়ের কথা।

এর মধ্যে একদিন প্রযোজক আমন্ত্রণ নিজের কাহিনীর চিত্ররূপ দেওয়ার কাজ দেখতে গিয়েছিল অমিত। সেখান থেকে সে বড় হতাশ হয়ে ফিরেছে। তার ছিল গ্রামীণ গল্প নায়িকার সাদামাটা আচরণ। গিয়ে দেখল নায়িকা চরিত্রে নন্দিনী নামে ডাকসাইটে গ্ল্যামারাস যে হিরোইন অভিনয় করছেন—তিনি শটের আগে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। ব্যস, অমিতের দফা যেন গয়া। সে পালিয়ে বাঁচল।

ইতিমধ্যে ছবি রিলিজ হয়েছে। সুপার হিট করল ছবি। তারপর ছবির সুবর্ণ জয়ন্তীও হল কালক্রমে। তখন এই

হরেনিয়াম
তপন সিংহের
হরেনিয়াম
মজার ছবি
হরেনিয়াম
জীবনের ছবি
হরেনিয়াম
গানের ছবি
হরেনিয়াম

প্রতাপ আগরওয়াল ও
আর. এ. জালান
প্রযোজিত

নীলকমল মুভিজের
নিবেদন

দেখুন

পূর্ণপ্রেক্ষাগৃহে
চলছে!
মিনার
বিজলী
ছবিঘর
ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

নন্দিতা
আরতি ভট্টাচার্য

ছবির মালিক হয়েছে অবিনাশের বদলে পুতিতুণ্ডি নামে জনৈক দুঃসাহসী প্রযোজক। ল্যাং খেয়ে অবিনাশ তখন পালিয়েছে। পুতিতুণ্ডি ছবির গোল্ডেন জুবিলী উপলক্ষে ছবির শিল্পী আর কলাকুশলীদের নানা জিনিষ উপহার দিল। আর লেখককে দিয়ে দিল নিজের বিলাসবহুল গাড়ীটি।

অমিত গাড়ী নিয়ে এলো নিজের বাড়ীতে।

আর এই গাড়ীই শেষ পর্যন্ত কাল হল অমিতের জীবনে। অমিত নিজের বৃত্ত থেকে অল্প অল্প সরে যেতে লাগল। একটা গল্পের সাকসেশ অন্যান্য প্রোডিউসারকে টেনে আনে লেখকের কাছে। অমিতের ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে লাগল। অমিত একটার পর একটা গল্প লিখছে আর সঙ্গে সঙ্গে হট কেকের মত চড়াদামে তা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে ফিল্ম লাইনে।

একদিন গাড়ীতে তেল ভরতে গিয়ে একটা পাম্পে সেই ফিল্ম অ্যাকট্রেস নন্দিনীর সঙ্গে হঠাৎ অমিতের দেখা। নন্দিনী অমিতের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত রকম মধুর ব্যবহার করল। আসলে লেখক মানুষটিকে নন্দিনীর নজরে ধরেছিল। এই থেকে দু'জনের মধ্যে অচিরাত প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল।

অমিত জানল, নন্দিনী এক ধরণের জীবন যন্ত্রণায় কাতর। এককালে তার বিয়ে হয়েছিল। স্বামী ছিল অধ্যাপক। জ্ঞানী গুণী মানুষ। কিন্তু সে মানুষকে দেখে আজ আর চেনা যাবে না। অ্যালকোহল তাকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। আর নন্দিনী ফিল্মে এসে কেরিয়ার তৈরী করেছে অতি কষ্টে। এই পুতিতুণ্ডিই তাকে সৌভাগ্যের শিখরে এনে পৌঁছে দিয়েছে। বিনিময়ে তাকে পুতিতুণ্ডিরই রক্ষিতার গ্লানীময় জীবন যাপন করতে হচ্ছে।

অমিতের গাড়ীটা এখন অমিতের স্টেটাস সিম্বল। সে এখন ফিল্মের বেস্ট সেলার রাইটার তার লেখা গল্পে পরের পর ছবি হিট করছে। ফলে অমিতের জীবনের সব দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গেছে। সে আর এখন অফিস তো দূরের কথা, গাড়ীতেও যায় না। মদ খাওয়াটাকে সে আজকাল আর 'ট্যাবু' মনে করে না। মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করাটুকু বাদ দিয়ে সে এই গ্ল্যামারের জগতের সব লিখিত এবং অলিখিত নিয়মকানুনের সঙ্গে রফা করে ফেলেছে।।

পুতিতুণ্ডি দেখল অমিত হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তাই সে তাড়াতাড়ি হোটেলে একটা সুইট ভাড়া করে তাতে অমিতকে এনে বসিয়ে দিল। বলল—এখন থেকে পার্মানেন্টলী আপনি এখানেই থাকবেন। আপনারা লেখক মানুষ। একটু নির্জন জায়গা, কমফোর্টেবল জায়গা না হলে কলমে গল্প আসবে কী করে?

—কিন্তু হোটেলের ভাড়া?

—ডোণ্ট ওয়ারি, আপনাদের সেবা করবার জন্যে আমি সর্বদা একপায়ে খাঁড়া। আপনারা সাহিত্যিক। দেশের ভবিষ্যৎ.....

নন্দিনী প্রায়ই এখানে আসে। সঙ্গ দেয় প্রেম হয়। মদ্যপান হয়। ওরা বেহেড মাতাল হয়ে যায়।

অমিত এখন আর সীমার কথা স্মরণই করতে পারে না। ছোটভাই মোহিত, বোন সর্বাণীর কথাও সে বিস্মরণ হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের সে চিনতে পারে না।

আর—আমার পৃথিবী? দ্যাট ইজ লং ফরগটেন।

এইই চলছে। এতেই মজে আছে অমিত চ্যাটার্জি।

কিন্তু একদিন থমকে দাঁড়াতে হয়। পুতিতুণ্ডি হোটেলের ঘরে মেয়েমানুষ সাপ্লাই দিতে আরম্ভ করে। যেটা অমিত আবার অগ্রাহ্য করে। এটা তার রুচিতে বাধে।

হঠাৎ একদিন হোটেলের বেয়ারা একটা চিঠি আনে।

লিখেছে মোহিত—দাদা, তোর সঙ্গে কয়েকদিন দেখা করবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু দেখা হ'ল না। ওরা আমাকে তোর সঙ্গে দেখা করতে দিল না। বাড়ীওয়ালা পাওনা টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে। বাড়ী ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তোর সঙ্গে আমাদের চলার পথ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল বহু আগেই। এবার মনে হচ্ছে আর কোনদিন দেখা সাক্ষাৎও হবে না। কারণ এ-বাড়ী ছেড়ে সর্বাণীকে নিয়ে আমাদের আর কোথাও ওঠার ঠাঁই নেই।

মুহূর্তে সমস্ত পরিবেশটা অমিতের চোখে ধূসর হয়ে ওঠে। তারপর তাসের প্রাসাদের মত ঝুর ঝুর করে ভেঙ্গে পড়তে থাকে। নিজের বৃত্ত থেকে তার কাছে আহবান এসেছে। একে উপেক্ষা করার ক্ষমতা যেন অমিত হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছে।

ছুটে সে হোটেল থেকে বেরিয় আসে।

তারপর গাড়ী বের করে ছুটতে থাকে এলোমেলো।

অমিত যেন দেখতে পায় সেই সব মানুষেরা আজ তাকে তাড়া করে আসছে যাদের নিয়ে সে এতদিন মহাকাব্য লেখায় সচেষ্ট ছিল। অন্ধকার ময়দানের এক-প্রান্তে এ এসে ব্রেক কষে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর গাড়ী থেকে নেমে ট্যাঙ্ক থেকে পেট্রল বের করে গাড়ীর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দেয় পাগলের মত। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয় গাড়ীতে। দাউ দাউ করে গাড়ী জ্বলে ওঠে।

চোখের সামনে স্টেটাস সিম্বল পুড়ে যাচ্ছে।

উত্তেজনায় হাঁফাচ্ছে অমিত। না, সে আর রেনিগেড নয়...দলত্যাগী নয়...সে সাধারণ মানুষেরই একজন।

গাড়ী থেকে ছিটকে পড়েছিল 'আমার পৃথিবীর' পান্ডুলিপি। হাওয়ায় উড়ছিল পাতাগুলি। অন্ধকারের মধ্যে বিধ্বংসী আগুনের আলোয় অমিত একে একে সেই পাতাগুলো জড় করে। তারপর সযত্নে সাজিয়ে রাখতে থাকে।

মিহির সেনের কাহিনীতে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন বিমল ভৌমিক। অভিনয় করছেন—অনিল চ্যাটার্জি, পার্থ মুখার্জি, সুমিত্রা মুখার্জি, আরতি ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, সন্তোষ দত্ত, স্বপন রায়, নির্মলকুমার, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিল্পী। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন—রূপনারায়ণ গোস্বামী।

মুসাফির

শতবর্ষের স্মরণায়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

নাটকার ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কী? অডিয়ান্স যে ক্ষেপে উঠেছে।

নাটকার জিজ্ঞাসা করলেন নাট্যাচার্য ঃ হু রানস দি সো?

নাটকার উত্তর দিলেন ঃ ইংরেজীতে ওই প্রশ্ন করতে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না কি জানতে চাইছেন?

শিশিরকুমার—কার অভিনয় দেখতে অডিয়ান্স আসে?

—আসে নরক দেখতে। কিন্তু দেখে আপনারই অভিনয়।

বিশু, শৈলেন মনে করে ওদেরই অভিনয় দেখতে আসে। তাই ওরাই খুশী করুক ওদেরকে। আমি আর নামবো না।'

কিন্তু তারা খুশী করতে পারবে কেন?

—নীচে গিয়ে কথাটি বুঝিয়ে দিন।

নাটকার বললেন ঃ আপনিই ওদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিন যে ওরা কেউ নয়—ইউ এ্যালোন রান দি হোল সো।'

—মানে?

—মানে ওরা কেউ এপিয়র করবে না। আপনিই কথক ঠাকুরের মত সবগুলি ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শকদের খুশী রাখবেন। চলুন। সুধীরবাবু জড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন ঃ সাধু, সাধু! শচীন উত্তম প্রস্তাব করেছে বড়বাবু। তুমি শুধু যুগাবতার অভিনেতা নও—দশাবতারও।

শিশিরকুমার আঘাতটি উপলব্ধি করলেন। শচীন সেনগুপ্তের মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললেন ঃ ইউ হ্যাভ এ প্রিটি ন্যাক টু টক হাউ। ক্ষিপ্র হাতে পরচুলটি টেবিল থেকে নিয়ে মাথায় দিতে দিতে নীচে নেমে গেলেন। হাঁক দিলেন ঃ কৈ ড্রপ কি উঠবে না?'

•

যথারীতি অভিনয় শুরু হলো। এই যে বলকসুলভ আত্মাভিমান—তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করার শক্তি কজনের আছে? সুদীর্ঘ পাঁচ বছর সিংহাসনচ্যুত সম্রাট বাংলা ও ভারতের বিভিন্নস্থান পরিভ্রমন করে বেরিয়েছেন ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় নিয়ে। দারিদ্র ও লাঞ্ছনা গঞ্জনার কত আঘাত বুকে পেতে নিয়েছেন তবুও অভিনয় জগত পরিত্যাগ করেন নি।

'রঙ্গভূমি ভালবাসি—
হৃদি সাধ রহি রহি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।'

শেষ পর্যন্ত সেই আশা তার পূর্ণ হয় শ্রীরঙ্গম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগ।

ইউরোপের সমরানল তড়িৎ গতিতে সমগ্র বিশ্বগ্রাসে লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত। বৃটিশ রাজশক্তি যুদ্ধের বিরাট সুধা মেটাতে ঠেলে দিতে চাইল ভারতকে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আসমুদ্র হিমাচল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্র বহির্বিশ্বে মেয়ে বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত হানার প্রস্তুতিতে। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে মরণজয়ী সৈনিকদের প্রস্তুতি চললো বৃটিশ রাজশক্তির মূলে চরম আঘাত হানার। সভাতার সাংকর্তের মধ্য দিয়ে কবিগুরু বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর সমপীড়ার কথা ব্যক্ত করে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ৭ আগষ্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ)—তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র ভারত শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লো। বাংলার নাট্যজগতেও দেখা দিল নানান পরিবর্তন। দেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামগ্রিকভবে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এড়ানো সম্ভব হলো না নাট্যজগতের পক্ষে। প্রতিটি মঞ্চ নানান পরিবর্তনের আবর্তে জড়িয়ে পড়লো। নাট্য নিকেতনের ভূতপূর্ব কর্তৃপক্ষের পক্ষে থিয়েটার পরিচালনা করা সম্ভবপর হলো না। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১২ জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিন্দী মঞ্চস্থ হয়। পরবর্তী নাটক সুধীর রাহার 'মহাশক্তি' পুজোর সময় মঞ্চস্থ হবার পরই অকটোবর মাসে রুদ্ধ হয়ে গেল নাট্য নিকেতনের দ্বার। সাম্রাজ্য হারা সম্রাট সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর উদ্ভ্রান্তের মত পরিভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলেন স্বীয় সাম্রাজ্যে। নাট্য নিকেতন সম্প্রদায় বিদায় নিলে শিশিরকুমার লীজ নিলেন নাট্যগৃহটি। 'শ্রীরঙ্গম' নতুন নামে নামায়িত করে নতুন নাটকের প্রস্তুতিতে আত্মমগ্ন হলেন। নাটকার নতুন শিল্পী সমবেশে নতুনই দেখা দিল বেশী। বাংলায় প্রবেশপত্র ছাপা হলো। সকলের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হলো শিশিরকুমার তথা শ্রীরঙ্গমকে ঘিরে।

২৮ নভেম্বর ১৯৪১ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় সসম্প্রদায় শিশিরকুমার তারকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন শ্রীরঙ্গমে। শিশিরকুমার নাট্যাচার্য অমরেশ চট্টোপাধ্যায় চরিত্রে অভিবাদন জানান। জীবেন বসু, মণি শ্রীমানি, সতেন গোস্বামী, গিরিজা সাধু, বিপিন মুখোপাধ্যায়, প্রকৃতি, বন্দনা, শ্রীমতী সন্ধ্যা প্রতিভা, শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী আরো অনেককেই দেখা গেল বিভিন্ন চরিত্রে। শম্ভু মিত্র ভবেশ চরিত্রে প্রথম অভিবাদন জানালেন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মধ্য দিয়ে।

নায়িকা রমা চরিত্র শ্রীমতী সন্ধ্যা ও প্রকৃতি ঘোষকে একসঙ্গে শিক্ষা দেন। শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি ঘোষই রমা চরিত্র অভিনয় করেন। সন্ধ্যা, প্রকৃতি ও বন্দনা নতুন নাটকে এই তিনটি মেয়েকে একসঙ্গে নির্বাচন করেন নাট্যাচার্য। রিহার্সলের সময় অনেক সময় পরিহাস করে বলতেন, নতুন তিনজনের নাম তিনটি ভারী সুন্দর। 'সন্ধ্যা বেলা প্রকৃতির বন্দনা।'

'জীবনরঙ্গ' মঞ্চস্থ হবার পূর্বে পুরোন নাটকগুলি অভিনীত হয়। শ্রীরঙ্গমের প্রতিষ্ঠা করেই ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রথম গিরিশ জন্মতিথি উদ্যাপন করে গিরিশ স্মৃতি পূজা করেন। জনাব এ কে ফজলুল হক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। জীবনরঙ্গের সময় একটা ঘটনা ঘটে। অভিনয় চলছে হঠাৎ একটি শিশুর কান্নায় সমস্ত নাট্যগৃহ মুখরিত হয়ে উঠলো। অভিনয় বন্ধ করে শিশিরকুমার মিষ্টি মিষ্টি হাসছিলেন।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১১ মার্চ সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হয় শ্রীরঙ্গমের নতুন নাটক উড়োচিঠি। নাটকটি রচনা করে নিতাই ভট্টাচার্য। শিশিরকুমার সুনীল চরিত্রে অভিনয় করেন। শম্ভু মিত্র ডাঃ দত্তের চরিত্রে অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কনু বন্দ্যো, জীবেন বসু, বাদলবাবু, রেব, রাজলক্ষ্মী সন্ধ্যা, গীতা দে প্রভৃতি এবং নায়িকা জয়ন্তী চরিত্র অভিনয় করেন উষা (পাগলী)।

১৬ মার্চ সন্ধ্যা ছয়টায় চন্দ্রগুপ্ত নাটকে শিশিরকুমার চাণক্য, শৈলেন চৌধুরী চন্দ্রগুপ্ত, জীবন গাঙ্গুলী সেলুকাস, অমর ভদুড়ী সেকেন্দর, কানু বন্দ্যো কাত্যায়ন। কেতকী ভিক্ষুককন্যা, প্রকৃতি হেলেন, রাজলক্ষ্মী (ছোট) ছায়া, নিভননী মুরা, তাছাড়া রণজিৎ রায় (বাচাল), গণেশ শর্মা প্রভৃতিরা বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন।

১৪ মার্চ বেলা ২-৩০টায় মঞ্চস্থ করেন খাসদখল। শিশিরকুমার নিতাই অর ঠাকুরদা চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন প্রবীন অভিনেতা কুঞ্জলাল চক্রবর্তী। ১৪ মার্চ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রফুল্ল নাটকের অভিনয়ে শিশিরকুমার —যোগেশ, শৈলেন চৌধুরী—রমেশ, জীবন গাঙ্গুলী—ভজহরি, কানু বন্দ্যো—মদন ঘোষ, রাজলক্ষ্মী (ছোট)—প্রফুল্ল, গীতা দে—জানদা, তাছাড়া রণজিৎ রায়, জীবেন বসু, মণি শ্রীমানি, নিভননী (উমাসুন্দরী), বিপিন মুখো নিভননী (উমাসুন্দরী), বিপিন মুখোপাধ্যায়, আদিত্য, গণেশ, ফিরোজা প্রভৃতি থাকেন বিভিন্ন চরিত্রে।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ১০ অকটোবর মঞ্চস্থ হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের দেশবন্ধু। শিশিরকুমার মূল দেশবন্ধু চরিত্রেই অভিনয় করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ জানুয়ারী মঞ্চস্থ হলো মায়া। শিশিরকুমার ও অন্যান্য শিল্পীরা যথারীতি আত্মপ্রকাশ করেন। মামলী গল্পকে নতুন রূপে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেলেও— এ নাটকখানিও ব্যর্থ হয়। শ্রীরঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিশিরকুমার নতুন নতুন নাট্যকার ও শিল্পীদেরই সুযোগ দিয়েছেন। লোকসান খেয়েছেন তবু দমে পড়েন নি।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

(ক্রমশঃ)

দিন আমাদের
রঞ্জিত মল্লিক/রীতা ভাদুড়ী

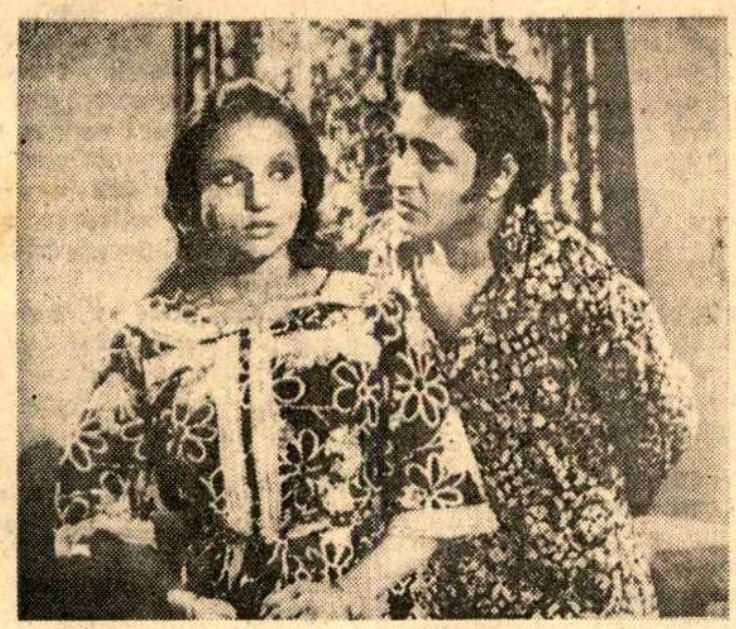

স্টুডিও সংবাদ

পিকক্ ফিল্মেসের ব্যানারে সম্প্রতি 'নানা রংয়ের দিনগুলি' ছবির চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে এই ছবি পরিচালনা করেছেন কনক মুখার্জি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপায়োপ করেছেন রঞ্জিৎ মল্লিক, সুমিত্রা মুখার্জি, শুভেন্দু চ্যাটার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, জহর রায়, দেবিকা দাস ও বোম্বের নায়িকা আশা সচদেব। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অমল মুখার্জি।

এই একই কোম্পানীর পতাকাতলে কনক মুখার্জি আর একটি নতুন ছবির কাজ আরম্ভ করেছেন। ছবির নামকরণ এখনও হয়নি। তবে প্রধান তিন শিল্পীর নাম ছবির কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন। এঁরা হচ্ছেন রঞ্জিৎ মল্লিক, তনুজা এবং ভানী। বোম্বেতে ইতিমধ্যেই এই ছবির গান রেকর্ডিং হয়েছে। মুকুল দত্তের লেখায় স্বপন-জগমোহনের সুরে গান গেয়েছেন কিশোরকুমার ও আশা ভোঁসলে।

গুরু বাগচী সম্প্রতি 'জয়' নামে একটি ছোটদের ছবির শুটিং আরম্ভ করেছেন। ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন আনন্দ মুখার্জি ইনি এই ছবির সুরকারও। গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জি, হৈমন্তী শুক্লা এবং শ্রাবন্তী মজুমদার। ছবিতে অভিনয় করছেন মাঃ পার্থ, সুলতা চৌধুরী, পদ্মা দেবী, বিকাশ রায়, গৌর শী, দিলীপ রায়।

'বনবাসর' নামে সুশীল রায়ের ছোটগল্পে নতুন একটি ছবি তোলার কাজ আরম্ভ করেছেন নবাগত পথিকৃৎ গোষ্ঠী। ছবিতে সুরারোপ করেছেন অধীর বাগচী। গেয়েছেন আরতি মুখার্জি ও সুরকার স্বয়ং।

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুর 'সূর্যতৃষ্ণা' কাহিনীর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সম্প্রতি ওই ছবির গান রেকর্ডিং হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন হেমন্ত মুখার্জি। গেয়েছেন সুরকার স্বয়ং—দুখানি গান। ছবির প্রধান নারী চরিত্রে রূপদান করবেন আরতি ভট্টাচার্য।

সম্প্রতি 'সোনার কাঠি রূপোর কাঠি' নামে এক শিশুচিত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। পরিচালনা করছেন শচীন সেনগুপ্ত। অভিনয় করছেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখার্জি, জোছন দস্তিদার, বঙ্কিম ঘোষ, মাঃ অরবিন্দ, সন্ধ্যারাণী, রঞ্জনা ঘোষ ও নবাগতা অঞ্জনা সেন।

স্বর্গত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-এর কাহিনীতে 'নন্দিতা' ছবির শুটিং এখন প্রায় শেষের দিকে। পরিচালনা করছেন স্বদেশ সরকার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান চরিত্রের শিল্পীদের মধ্যে আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আরতি ভট্টাচার্য, বিকাশ রায়, হারাধন বানার্জি, শম্ভু ভট্টাচার্য, সুব্রতা চ্যাটার্জি এবং দিলীপ রায়।

নিজের কাহিনী, চিত্রনাট্য অবলম্বনে 'নয়ন' নামে একটি ছবির পরিচালনার কাজে হাত দিয়েছেন সুখেন দাস। এতে অভিনয় করছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, নিমু ভৌমিক, সবিতাব্রত দত্ত রবীন মজুমদার মাঃ পার্থ ও সন্তু মুখার্জি। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন অজয় দাস।

মন্টাজ ফিল্মের ব্যানারে পার্থপ্রতিম চৌধুরী তাঁর 'নাগরিক' ছবির দ্বিতীয় দফা চিত্রগ্রহণের কাজ করেছেন ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত পরিচালনা পার্থপ্রতিমের নিজেরই। এতে অভিনয় করছেন ধৃতিমান চ্যাটার্জি, দেবীকা মুখার্জি, রবি ঘোষ, বসন্ত চৌধুরী, গীতা দে, সন্তোষ দত্ত ও সিদ্ধার্থ মজুমদার।

বিমল রায়ের পরিচালনায় 'সাধক রামপ্রসাদ' ছবির শুভ মহরৎ হয়েছে তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। অসীমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, দেবিকা দাস, দীপ্তি রায়, মলিনা দেবী, দিলীপ রায় প্রভৃতি শিল্পী এই ছবিতে অভিনয় করবেন।

'জয় মঙ্গল চন্ডীমা' নামে এক ধর্মমূলক ছবির শুভ মহরৎ হয়েছে সম্প্রতি। প্রভাত চক্রবর্তী স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্যে ছবিটি পরিচালনা করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। অভিনয় করবেন কমল মিত্র, গুরুদাস বানার্জি, অসিতবরণ, অসীমকুমার, পদ্মা দেবী, অনামিকা সাহা, রুমকী, মিতা বানার্জি প্রভৃতি শিল্পী।

মুশাফির

নাটমঞ্চ

সায়ক-এর 'ল্যাম্পপোষ্ট'

সায়ক গোষ্ঠীর ইতিপূর্বের নাটক 'অভিশপ্তা' দেখে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, এঁরা নিছকই আমোদ বিতরণের জন্য নাটক করায় প্রয়াসী হননি, এঁরা তার সঙ্গে একটা সামাজিক কর্তব্য পালন করার সম্পর্কেও সচেতন।

এ কথার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি এঁদের নবতম সংযোজন 'ল্যাম্প পোষ্ট' নাটকটি দেখে।

এই নাটকের কেন্দ্র চরিত্র একটি পুরনো আমলের অর্থাৎ যখন শহরের রাস্তায় গ্যাস লাইট ব্যবহৃত হোত সেই সময়কার একটি ল্যাম্পপোষ্ট। যে বহুকাল ধরে অনেক ঘটনা, অনেক সামাজিক ও অসামাজিক অন্তরালের কাহিনী, অনেক দুঃখ বেদনা প্রণয় বিচ্ছেদ ইত্যাদির নীরব সাক্ষী।

এ নাটকে অবশ্য ল্যাম্পপোষ্ট কথা বলেছে, ঘটনার পর ঘটনার যোগসূত্রে রচনা

করার জন্য। এবং অনেক ক্ষেত্রেই তিনি গানকে (অবশ্যই ব্যংগ রসাত্মক) তার মাধ্যম করেছেন। এ নাটকে ল্যাম্পপোষ্টকে পেছনে রেখে তার একটি সজীব প্রতিভূকে দর্শকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে, যে নাচ গান, হাল্কা ব্যংগ ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ঘটনার যোগসূত্র রক্ষা করেছে (গল্প সুশান্ত ব্যানার্জীর, নাট্যরূপ ও পরিচালনা শিশির বসুর)।

এ নাটকের মূল বক্তব্য শোষক ও শোষিতকে ঘিরে। বড় রাস্তার বাসিন্দা, কানা গলির জীবন এবং ল্যাম্পপোষ্টকে ঘিরে এসেছে আদর্শবান তরুণ প্রেমিক, কুচক্রী লম্পট বেআইনী ব্যবসাদার পিতার আদর্শবাদী কন্যা, চায়ের দোকানের সৎ মালিক, বস্তীর দরিদ্র জীবন, কিছু চরিত্রহীন মানুষ, লোভী পুলিশ, দুশ্চরিত্র বাড়িওয়ালা (ভদ্রলোকের লম্পট খল ও শয়তানের যে চরিত্রটি এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা বোধহয় এ যুগের দর্শকদের একটু অবাকই করবে), কিছু মস্তান ছেলে (কোলকাতার রাস্তায় যখন গ্যাস বাতি জ্বলত, তখন এদের অস্তিত্ব ছিল কি?) এবং সেই সংগে একটি টাইপ মারোয়াড়ী চরিত্রকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কাহিনী ছকে বাঁধা হলেও পরিবেশনের গুণে নাটকটি দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে।

ল্যাম্পপোষ্টের ভূমিকায় মেঘনাদ ভট্টাচার্য নাচে গানে অনেকটাই স্বাভাবিক। গানের সুরও (রতীন চক্রবর্তী) ভাল। তবে গানের প্রয়োগ এবং কণ্ঠদানের (অনুকরণের ঝোঁক না রেখে) অর্থাৎ গায়কী ঢঙের ব্যাপারে আর একটু সচেতন হবার অবকাশ ছিল। মা'র ভূমিকায় দিপালী চক্রবর্তী একটু উচ্চগ্রামে কথা বললেও চরিত্রটি বাস্তব রূপ নিয়েছে। হরিনারায়ণ রায়ের হারীন মুখার্জী সত্যি সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি, টাইপ চরিত্রে (ঝুনঝুনেওয়ালা) কল্লোল হোড়ও সুন্দর। সেই অনুপাতে বিশ্বনাথ দেওয়ানজীর বাড়িওলা অতি অভিনয়ে ক্লিষ্ট। সন্তোষ রায়চৌধুরীর মাতাল সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। বেবী মুখার্জীর মিতা ও শক্তি বসুর স্বার্থ আন্তরিক। দ্রিদীপ চ্যাটার্জী, মলয় দাস, গোপাল দে ও ক্ষিতীশ মজুমদারের মস্তান প্রায় বাস্তব। দীপ্তি দের ময়নাও সুন্দর।

সেই অনুপাতে অন্যান্য চরিত্রের অভিনয় বেশ দুর্বল। পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় শিশির বসু বেশ মর্যাদার সংগে অভিনয় করেছেন। অন্যান্য শিল্পীরা তাঁর সংগে সংগতি রেখে অভিনয় করলে নাটকটি আরও আকর্ষণীয় হোতো।

'শেষ থেকে শুরু'

শিল্পী পরিষদ (নর্থ) সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শেষ থেকে শুরু' নাটকটি।

অভিনয়ে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন সমীর হালদার, কুশল চক্রবর্তী, হরিপদ রায়চৌধুরী, স্বপন দে, দেবাশীষ চ্যাটার্জি, তাপস ভট্টাচার্য, নারায়ণ উপধ্যায়, তপন দে, মাঃ জমিদার, সমর দাস, দীপক দাস, তপন

শৈবরক্ষা।সুমিত্রা মুখার্জি অমৃত ফটো

ভট্টাচার্য, রবীন সরকার ও তপতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। নাটকটি পরিচালনা করেন অতনু দত্ত।

ভারত বার্তার নাট্যানুষ্ঠান

অষ্টম বার্ষিকী সম্মেলন উপলক্ষে এ'রা সম্প্রতি পরিবেশন করলেন শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল'।

অভিনয়ে ছিলেন রবীন মজুমদার, গীতশ্রী দেবী, জ্যোৎস্না দাস, সুপর্ণা চ্যাটার্জ, কল্পনা ব্যানার্জী, সাধন ব্যানার্জী, শিশির রায় ইত্যাদি।

নাটকটি পরিচালনা করেন বরুণ বসু।

ভারতীয় সমালোচক সংস্থা

সম্প্রতি অল ইণ্ডিয়া ক্রিটিকল আসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী পত্রপত্রিকার সমালোচকদের নিয়ে। এই সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ভারতের সমস্ত প্রদেশের সাংস্কৃতিক (যেমন চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রা বা ঐ জাতীয় আঞ্চলিক অনুষ্ঠান, সংগীত ইত্যাদি) অনুষ্ঠানকে উৎসাহ দান এবং ঐ সব বিষয়ের দুঃস্থ সমালোচকদের সাহায্যার্থ তহবিল গঠন।

এছাড়া এ'রা চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রা ইত্যাদি এবং সংগীতের ক্ষেত্রে প্রখ্যাত ও গুণী শিল্পীদের প্রতি বছর পুরস্কার দেবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর দ্বারা যেমন তাঁদের উৎসাহিত করা হবে তেমনি প্রত্যেক প্রদেশের মধ্যে একটা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনা করাও সম্ভব হবে।

এই নবগঠিত সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নয়াদিল্লির 'ইণ্ডিয়া টুডে' পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী উমা বাসুদেব। মাসিক মুখপাত্রের সম্পাদনায় আছেন শ্রীদিলীপ মৌলিক।

রংগরূপার 'ক্ষুধিত পাষাণ'

রবীন্দ্রনাথের নাটকের এমনিতেই একটা আকর্ষণ আছে এবং সেটা চিরকালীন। তার

মধ্যেও আবার এমন কিছু নাটক আছে যাকে যত রূপেই পরিবেশন করা থাক না কেন, তার আকর্ষণ প্রতিবারই দুর্বার।

ক্ষুধিত পাষাণ এমনি একটি নাটক। 'ক্ষুধিত পাষাণ'কে যতবারই নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করা হয়েছে (বস্তুত 'ক্ষুধিত পাষাণ' নৃত্যনাট্যের আকারেই বেশী সময় পরিবেশিত হয়েছে) ততবারই এর বিষয় বৈচিত্র দর্শকদের আকর্ষণ এবং মুগ্ধ করেছে। এর মূল কারণ অবশ্যই এর কাহিনী বৈচিত্র্য। মানুষ বোধহয় অবচেতন-ভাবে এমন কাহিনীই বেশী পছন্দ করে। এ কাহিনীর গভীরে না গিয়েও, আপাতেই এর এমন একটা চার্ম আছে যা দেখে দর্শক মুগ্ধ, চমকিত এবং রোমাঞ্চিত হয়। এমন আকর্ষণ বোধহয় আর কোন সৃষ্টির প্রতি নেই।

সেই কথাটা আবার প্রমাণিত হোলো সম্প্রতি রঙ্গরূপার অনুষ্ঠান দেখে। এরা স্বর্গত সাধন ভট্টাচার্য-কৃত 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মঞ্চরূপ যে রূপে পরিবেশন করলেন তা যেমন বর্ণাঢ্য, তেমনি আকর্ষণীয়। তাঁরা সেদিন দর্শকদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখে-ছিলেন।

ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে এরা নাটকটিকে পরিবেশন করেও ছোটখাটো একটু চমকের সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যতটা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হওয়া উচিৎ ততটা অবশ্য হয়নি, এসম্পর্কে আরো একটু সচেতনতার অবকাশ রয়েছে বলে মনে হয়)। এতে টেকনিক ছাড়াও দর্শককে বাস্তব থেকে অলৌকিক জগতে সহজেই পৌঁছে দিতে পেরেছেন।

এ নাটককে সজীব করে তোলার পক্ষে যেমন তাপস সেনের আলোক নির্দেশনা কাজ করেছে, তেমনি করেছে হীরক মুখো-পাধ্যায়ের মঞ্চ পরিকল্পনা। অপেশাদার নাটকে এমন মঞ্চ পরিকল্পনা দুর্লভ। হীরকবাবু যেন নাটককে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁর মঞ্চ-মুন্সিয়ানা দিয়ে।

এর পরেই প্রশংসা করতে হয় তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনার। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট আবহসঙ্গীত। যা নাটকের পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। অন্তরালের ঠুংরী চালের গানও সুন্দর (গেয়েছেন মঞ্জুলিকা বসু ও কাজল চৌধুরী) হয়েছে, তবে সেটা আরও একটু জোর হলে (অন্তত মাঝে মাঝে) নাটকের পরিবেশ সৃষ্টি যেন আরও রোমাঞ্চকর (?) হোতো।

নাচ এ নাটকের আর এক সম্পদ। নাচ এবং নর্তকীদের গতিবিধি, লুকোচুরি, তাঁদের স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি, আলো আঁধারিতে তাঁদের নাচ (শেষ অংশে তেমনি পরিপূর্ণ আলোতেও তাঁদের নাচ বড় সুন্দর), মূকাভিনয় দর্শকদের যেন মোহগ্রস্ত করে বসিয়ে রেখেছিল (নাচে অংশগ্রহণ করেছিলেন মালবিকা মুখো-পাধ্যায়, মনিদীপা রায়, শেলী গাঙ্গুলী, ইতি ভৌমিক ও তপতী দে। মালবিকা দেবীর নৃত্য পরিকল্পনা সার্থক।

অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় নায়কের চরিত্রাভিনেতা ধ্রুব মিত্রর। আগা-গোড়া তিনি চরিত্রটিকে বিশ্বাস্য রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। এমন একটি দুরূহ এবং আবেগ-তাড়িত চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা কম কৃতিত্বের কথা নয়। সেই অনুপাতে নিমাই বসুর করিম খাঁ আন্তরিক হয়েও যেন ঠিক মন ভরাতে পারেনি। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যর মেহের আলি সুন্দর। কিন্তু কোথায় যেন একটু ফাঁক থেকে গেছে। তাই তাঁর 'খুন হায়' এবং 'তফাৎ যাও' শুনে শরীর রোমাঞ্চিত হয়নি।

রমেন চক্রবর্তীর টাইপ চরিত্র সৃষ্টি দর্শকদের আনন্দ দিয়েছে। বৈদ্যনাথ সরকার ও গণদেব চট্টোপাধ্যায় যথাযথ।

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, পল্লব হালদার ও ভক্তিময় লাহিড়ীর দস্যু ভাল। বিশ্বজিৎ দে'র অভিনয়ও মন্দ নয়। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় শা মামুদ মেকআপ ও মূকাভিনয়ে সুন্দর লেগেছে।

অন্যান্য ভূমিকায় প্রশান্ত ঘোষ, গোপাল মুখোপাধ্যায়, গৌতম মল্লিক ও অরুণ ঘোষাল মানিয়ে গেছেন।

এমন একটি কঠিন নাটককে প্রাণবন্ত রূপদান যাঁর কঠিন পরিশ্রমে সার্থক হয়েছে, সবশেষে সেই নাট্যনির্দেশক সুব্রত মুখো-পাধ্যায়ের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করা কর্তব্য।

'পথের দাবী' অভিনয়

শরৎ জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে এবছর অনেক নাট্যদলই শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসের নাট্যরূপ পরিবেশন করতে ব্রতী হয়েছেন। তার মধ্যে 'পথের দাবী' পরিবেশনের ওপরই অনেক দলের ঝোঁক বেশী দেখা যাচ্ছে। এটা বলা বাহুল্য খুবই সুলক্ষণ। এর থেকে প্রমাণিত যে বাঙ্গালীরা সামাজিক দিক থেকে কত সচেতন। পথের দাবীর বিষয়বস্তু ও কাহিনীকে সুষ্ঠুভাবে রূপ দেওয়া রীতিমত দুরূহ ব্যাপার। এ নাটক যাঁরা পরিবেশন করেন তাঁরাই এর সত্যতা স্বীকার করবেন।

কিন্তু বলতে বাধা নেই সম্প্রতি বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীর কর্মী সংসদ অভিনীত 'পথের দাবী' দর্শকদের রীতিমত অবাক করেছে। এর জন্য অবশ্যই নাট্যরূপ-দাতা, পরিচালক শ্রীতরুণ তপন মিত্র বাহবা পাবেন।

এ নাটক দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে এর দলগত অভিনয়ের জন্যও। বিশেষ করে পরিচালক শ্রীমিত্র (সব্যসাচী) ও গৌতম মিত্র'র অভিনয় দর্শকদের বহুদিন মনে থাকবে।

এর পরেই নাম করতে হয় শৈবাল বসু, স্বপ্না দাশগুপ্ত, নমিতা মণ্ডল, শিবাজী গুপ্ত, সনৎ গাঙ্গুলী ও চন্দ্রকান্ত শ্রীমানির। এঁদের অভিনয় সত্যি সুন্দর।

অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মীরা বসু, উৎপল সান্যাল, প্রবীর ব্যানার্জি, অমিতাভ সেনগুপ্ত, রঞ্জিত ব্যানার্জি, অনিল সাহা, পার্থ গুপ্ত, উৎপল সান্যাল, মণীন্দ্র দাস, দীপক সেনগুপ্ত, সত্যেন মণ্ডল, নিশীথ দে, অরুণ রায়, বাবুল সেনগুপ্ত, নিমাই সরকার ও প্রবীর মিত্র।

লাইব্রেরীর তৃতীয় বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে এই নাটকটি সম্প্রতি রঙ্গনা মঞ্চে অভিনীত হয়।

বোম্বেতে চেতনা গোষ্ঠীর নাট্যানুষ্ঠান

কলকাতার সুপরিচিত নাট্যসংস্থা

সবসে বড়া রূপাইয়া

প্রযোজনা— বালাজী কলামন্দির

অমিত এক বিরাট বিত্তবান ব্যক্তির একমাত্র পুত্র, ওর বিরাট ব্যবসায়ে লাখ লাখ টাকা খাটানো হচ্ছে। এই বিরাট ফার্মের একমাত্র উত্তরাধিকারী অমিত এবং এই সংস্থার ম্যানেজার হলেন অমিতের বহু-দিনের বন্ধু নেকীরাম। টাকা পয়সা লেন-দেনের ব্যাপারে নেকীরাম ভীষণ কঠোর। উনি চান না অমিতের মতো দান-ধ্যান সেজন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সাহায্যের জন্যে এলে ওঁদের পত্রপাঠ বিদায় করেন। এইভাবে বেশ আনন্দের মধ্যে দিয়েই দিন কাটছিল। আচমকা অমিতের সঙ্গে আলাপ হোল অপর এক ধনী ব্যক্তি ধনরাজের সঙ্গে, ওর সুন্দরী মেয়ে সুনীতাকে অমিত ভালবেসে ফেললো। নেকীরাম সুনীতার সঙ্গে অমিতের ভালবাসাও ভাব বিনিময়কে পছন্দ করলেন না, বিশেষ করে সুনীতার পিতা ধনী ব্যবসায়ী হলেও একজন অসামাজিক ব্যক্তি। নেকীরাম অমিতের সমস্ত ব্যবসায় বেনামে কিনে নিলেন। এমনকি ওদের প্রাসাদতুল্য বসত বাড়ীকেও নিলামে তুলে দিলেন, তখন অমিতকে মাও বোনের হাত ধরে পথে এসে দাড়াতে হোল। এইভাবে নানা ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে নেকীরাম ও অমিতের পুনর্মিলন হোল, নেকীরাম বন্ধুকে তাঁর শত্রুদের মুখোস খুলে দেবার জন্যেই এই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। অমিত ও সনীতার মিলনের পথে আর কোন বাধা রইলো না।

যারা মুক্তি বা বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে একটি প্রমোদ চিত্র দেখতে চান, তাদের এ ছবি খুবই আনন্দ দেবে। পরিচালক এস রামনাথন কোন মুক্তির মধ্যে না গিয়ে অনাবিল আনন্দ দিয়েছেন। অভিনয়ে— অমিত (বিনোদ), সুনীতা (মৌসমী), নেকীরাম (মেহমুদ) বেশ সুন্দর অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় জীবন, সুলোচনা ফরিদা জালাল বেশ স্বাচ্ছন্দ্য। কলাকৌশলের কাজ বেশ উচ্চাঙ্গের। রামু মনোহর সঙ্গীত পরিচালনাও বেশ উপভোগ্য।

চিত্রদূত

ভোলানয়রা

লিলি চক্রবর্তী ও পরিচালক পীযূষ গাঙ্গুলী। অমৃত ফটো

গোষ্ঠী গত ২৭ ও ২৮ মে বোম্বের রবীন্দ্র নাট্যমন্দির মঞ্চে যথাক্রমে 'মারীচ সংবাদ' ও 'রামযাত্রা' অভিনয় করে বোম্বে প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রচুর আনন্দ দেন।

বালী সান্ধ্য সমাজ

বালী সান্ধ্য সমাজের ত্রয়োদশ বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি কোলকাতায় তাঁরা যে দুটি অনুষ্ঠান করেন তার মধ্যে একটি ছিল গুণীজন সম্বর্ধনা অন্যটি নাট্যানুষ্ঠান।

এরা অভিনয় করলেন স্বর্গীয় বরদা-প্রসন্ন দাশগুপ্তর বিখ্যাত নাটক 'মিশর কুমারী'।

অভিনয়ে মোটামুটি সব শিল্পীই দক্ষতার পরিচয় দেন। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তেয়াত্তোর বছর বয়স্ক তারাপদ সাউ-র আবনের ভূমিকায় অভিনয়।

অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেন গোপালচন্দ্র সাউ অমির মুখার্জি মোহনলাল চ্যাটার্জি সন্তোষ ব্যানার্জি দুলাল সাউ কৃষ্ণচন্দ্র সাউ শোভন সাউ গোবিন্দচন্দ্র সাউ পুলক দে নিশীথ রায় মন্দিরা দাশ জ্যোৎস্না নিয়োগী কৃষ্ণা সামন্ত অঞ্জলি ঘোষ প্রমুখ।

নাটকটি পরিচালনা করেন গোপালচন্দ্র সাউ ও সঙ্গীত পরিচালনায় বিষ্ণুচন্দ্র সাউ।

নাটকটি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে।

রূপকলুর 'অন্তরীণ'

রূপকথা নাট্যসংস্থা সম্প্রতি মিনার্ভা মঞ্চে পরিবেশন করলেন তাঁদের সাম্প্রতিক নাটক 'অন্তরীণ'। (নাটক বিজয় চট্টোপাধ্যায়) এ নাটকের বড় গুণ ছিল এঁদের দলগত অভিনয়। প্রায় প্রতিটি ভূমিকার শিল্পীরাই আন্তরিকভাবে নিজেদের চরিত্রে একাত্ম হবার চেষ্টা করেছেন।

নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন সরোজ ঘোষ।

বন্ধু মিলনের নাট্যানুষ্ঠান

'বন্ধু মিলন' নামক নাট্য সংস্থা পরিবেশন করলেন সম্প্রতি 'আমি বিয়ে করব' এবং সেই চোখ' উভয় নাটকেরই নাটকার সরকার ও পরিচালক জীতেন্দ্রনাথ হাজরা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটি নাটকই কম-বেশী দুর্বল কাহিনী সংলাপ ও অভিনয়ের দিকে। সেদিক নজর দিলে নাটক দুটি মোটামুটি হৃদয়গ্রাহীই হোতো।

উভয় নাটকের শিল্পীরা হলেন যথাক্রমে স্বপন ঘোষ সলিল পাল উৎপল বসু সমীর পাল অশোক কুণ্ডু রবি দাস অসীম কুণ্ডু নির্মলকুমার কিশোরকুমার সন্তোষ বিশ্বাস দেবাশীষ গাঙ্গুলী বনানী দে মুখ্যা দে মাঃ ভুলু ও নাটকার স্বয়ং।

নাট্য সমালোচক

বিবিধ সংবাদ

সংস্কৃতি সংবাদ

লক্ষ্ণৌতে বাঙালীদের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সৃজনী'র রবীন্দ্র-জয়ন্তী বিপুল সমারোহের মধ্যে উদ্যাপিত হয় স্থানীয় রবীন্দ্রালয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডঃ পুলিনবিহারী তারন। 'কবিপ্রণাম' দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তার পরে শ্রীমতী শিবানী পন্থ ও ডঃ চরণদাস চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিতর্পণ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সুর ও বাংলার লোকসঙ্গীতের সুর ও বাণী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে তা ধারাভাষ্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পরিবেশনা করা হয়। ধারাভাষ্য রচনা করেন ডঃ পুলিন-বিহারী তারন ভাষ্য পাঠে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন, অধ্যাপক সুদেব রায়চৌধুরী ও বীথি ঘোষ। সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন অরুন্ধতী গুপ্তশর্মা লিমা তারন ছন্দা ঘোষ রবীন্দ্রনাথ দাস ও চন্দন কর। অন্যান্য যারা অংশ গ্রহণ করেন তারা হলেন অনিমা কারকুন সুলেখা মৈত্র কাজলরেখা দাশগুপ্ত ইলা ভট্টাচার্য জয়া রায় সুভাষ মুখার্জী পীযূষ চক্রবর্তী ও মণি চ্যাটার্জী।

আকাশবাণী (সিভিল) কর্মীদের 'বৈশাখী' উৎসব : আকাশবাণী (সিভিল শাখা) কর্মীদের বৈশাখী অনুষ্ঠান হয় ১১ মে। অনুষ্ঠানে দীপিকা চক্রবর্তী শান্তশ্রী চক্রবর্তী মিনতি বন্দ্যোপাধ্যায় সুধা বসু ফাল্গুনী ভৌমিক সীমান্তিকা ও কাকলি মিশ্র হৈমন্তী শুক্লা সমর মিশ্র গোরাচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও শম্ভু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। সঙ্গীতে ছিলেন অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় নিখিল মিত্র ও আশীষ চক্রবর্তী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

লন্ডনে রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে আত্মপ্রকাশের প্রথম সুযোগ পেলেন। ইংলন্ডের সুধী সমাজ তাঁর গীতাঞ্জলির অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হন। ১৯১৩ সালে সেই গীতাঞ্জলির ওপর পেলেন নোবেল প্রাইজ। সে সময় পাশ্চাত্যে জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কবিগুরু তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তখন গান্ধীজিরও তিনি গুরুদেব ছিলেন। অথচ আশ্চর্য আজও পাশ্চাত্যে গান্ধীজীর প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথ সেখানে আর মানুষকে সাড়া জাগায় না। তার জন্যে প্রয়োজন রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ শুধু একখানা গীতাঞ্জলি লেখেন নি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অশেষ দান। তিনি দু' হাজারের ওপর ছবি এঁকেছেন। লন্ডনের মহাত্মা গান্ধী হলে সাগর পারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তীতে একথা বলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুরজিৎ সিংহ। তিনি আরও বলেন রবীন্দ্রনাথ আদর্শ শিক্ষক ছিলেন অল্প খরচে প্রকৃতির কোলে স্বাভাবিক পরিবেশে কি করে উচ্চশিক্ষা দেওয়া যায় তা তিনি দেখিয়ে গেছেন।

জার্টিংটন কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পিটার

ককস বলেন মিঃ লিওনার্ড এল এলমহার্স্ট ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় রবীন্দ্রনাথের সহযোগিতা করেছেন ১৯২৫ সালে ইংলন্ডে ফিরে এসে বিশ্বভারতীর অনুকরণে ডেভনের গ্রাম টটনেসে ডার্টিংটন হল প্রতিষ্ঠা করেন। সে কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। সেই উৎসবে ভারত থেকে শিল্পী ও সুধীজন এসেছেন। আজ দুই সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে।

মিঃ তাসন্দুক আহমেদ বলেন বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষার জন্যে প্রাণ দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে করেছে তাদের জাতীয় কবি। সেই রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে প্রয়োজন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ। রবীন্দ্রনাথ চিত্তরঞ্জন ফজলুল হক ও সুভাষ বোসের বাংলাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলেছে। তা ব্যর্থ হবে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হবেন।

সাগর পারের সম্পাদক হিরন্ময় ভট্টাচার্য অভ্যাগতদের স্বাগত জানান। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের ছোটখাট সরস ঘটনার উল্লেখ করে সকলকে আনন্দ দেন। আরও বলেন সাগর পারে ছ' বছর পূর্ণ হয়ে সাতে পা দিল, এর গৌরব সম্পাদকের প্রাপ্য নয় প্রাপ্য শুভানুধ্যায়ীর। বিদেশে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই প্রচেষ্টা। সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। ছ' বছর আগে লন্ডনে রবীন্দ্র জয়ন্তীর পাঠ ছিল না। এখন নানান প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ইংলন্ডের বিভিন্ন এলাকায় সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়। এ আনন্দের কথা। এ সাগর পারের গৌরবের কথা।

টেলিভিশন মানেই

"টেলিকিং"

অর্থাৎ

টি ভির রাজা।

আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও কিনে খুসী হোন।

এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড চেঞ্জার রেডিও, টেপ রেকর্ডার, মিটারওয়াম ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।

রেডিও এণ্ড ফটো স্টোরস্

৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩

ফোন : ২৮-৪৭৯৩

রক্ষা বন্ধন

প্রযোজনা—উষা প্রডাকসন্স

নাগরানীর আশীর্বাদ পেয়ে প্রৌঢ় দম্পতি মাধব এবং পার্বতী এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা সন্তান পেলেন। কিন্তু জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই কন্যা (আশা) পিতামাতাকে একই সঙ্গে চিরদিনের মত হারালো। কাকা ও কাকীমার কাছে থেকেই আশা প্রতিপালিত হচ্ছিল, কিন্তু কাকীমার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল। 'রক্ষা বন্ধনের' দিন নিজের কোন ভাই না থাকায় নাগ দেবতার কাছে প্রার্থনা করে এক নাগ (ধর্ম) ভাই পেল, সেই ভাইকেই 'রাখী' পরিয়ে দিল আশা। আর সেই নাগভাইও 'আশা'কে অখন্ড সৌভাগ্যবতী হবার আশীর্বাদ জানায়। শোনার বিয়েতে অমরের সঙ্গে আলাপ হোল আশার প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম। অমর এক মন্দিরে গিয়ে গোপনে আশাকে সিন্দুর পরিয়ে নিজের স্ত্রীর স্বীকৃতি দিল কিন্তু আশার কাকীমা যেমন এই বিবাহকে মেনে নিতে রাজী হলেন না, অন্য দিকে অমরের মা এই অঘোষিত বিবাহের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকার বরপণ চাইলেন। ধর্মভাই বোন আশার জন্যে সমস্ত টাকার ব্যবস্থা করে অমরের সঙ্গে আশার বিবাহ দিল। বিবাহের ছয় মাস অতিবাহিত হবার পর গুরুজীকে আশার হাত দেখানো হলে উনি আশাকে জানালেন আগামী ছয় মাসের মধ্যে অমর মারা যাবে। এর পর বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে নাগ ভাইয়ের সাহায্যে আশা মৃত্যুর হাত থেকে অমরকে ফিরিয়ে আনালো এবং মৃত নাগভাইকেও আবার জীবিত করল।

পন্ডিত আর প্রিয়দর্শীর কল্পনাপ্রবণ অবাস্তব কাহিনী ও দুর্বল চিত্রনাট্যের জন্যে এই ধর্মমূলক ছবিটি খুব সাফল্য লাভ করতে পারে নি। তবুও পরিচালক শান্তিলাল সোনীর পরিচালনা এবং সি অর্জুনের সঙ্গীত পরিচালনার জন্যে যাঁরা ভক্তিমূলক ছবি দেখতে ভালবাসেন তাঁদের ভালো লাগবে। অভিনয়ে—সারিকা (আশা) (অমর) ও সত্যজিৎ (নাগভাই)-এর অভিনয় বেশ সুন্দর। অন্যান্যরা নাজির হোসেন ললিতা পাওয়ার দলারী জালান আগা চিত্রনাট্যের দাবী মিটিয়েছেন। কলাকৌশলের কাজ পরিচ্ছন্ন।

চিত্রদূত

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরোধায় ছিলেন শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনিমাইচাঁদ বড়াল ও শ্রীগোরা সর্বাধিকারী। এই তিনজন যে কোন অনুষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য বিদেশী ছেলেমেয়েদের বাজান রবীন্দ্রসঙ্গীতের কনসার্ট। হেদার স্মিথ ক্লেয়া ফেন্টনওয়েল ফিলিপ গ্রীণ কারলাইন জোনস ও নীলাদ্রি ভট্টাচার্য রেকর্ডার গীটার ক্লারিয়নেট ফ্লুট ও ভায়োলিন সহযোগে বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তাছাড়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনান সুস্মিতা ভট্টাচার্য তৃপ্তি দাস আরতি ভট্টাচার্য ও বুলা মিত্র। নাচে অংশ গ্রহণ করেন মঞ্জু হাফিজ মানসী বড়ুয়া পুষ্পিতা চৌধুরী দীপা শিলা ও জিজি। ডেনট্রিলোকুইস্ট নীলাদ্রি ভট্টাচার্য হাস্যরস পরিবেশন করেন। বিদেশের বুকে এক অনিন্দ্য সুন্দর রবীন্দ্র জয়ন্তী শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

স্বপন বন্দনা

নট সম্রাট টবপনকুমারের অভিনয় জীবনের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ২ থেকে ৪ জুন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ পালাগুলির মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, স্ত্রী ও সপ্তপদী এই তিনটি পালা নিয়ে এক উৎসব হয়ে গেল। এই 'স্বপন বন্দনা'র উদ্যোক্তা ছিলেন স্বপনকুমারী।

তিনদিনের অনুষ্ঠানেই স্বপনকুমারের মূল ভূমিকার অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করে রাখে।

সঙ্গীতানুষ্ঠান

রঙমহলে তিন ঘন্টার মাতৃনাম গানের আসরে সেদিন (২৪শে মে) ছিলো সংখ্যাহীন গানের পসরা। শিল্পী ছিলেন অধীর বাগচী, গোরাচাঁদ মুখার্জি, জয়ন্তী সেন, হামু রায় (হ্যাপী চৌধুরী) কালোবরণ প্রমুখ। বাছাই করা বিভিন্ন অনুভবের গান, কোনো বাগাড়ম্বর নেই, ভনিতা নেই, সহজ সরল আত্মনিবেদনের আকুতি। কোথাও অন্য বক্তব্য—সবি দেবতা ও ভক্তের উদ্দেশে। ধরনটি যেমন নতুন তেমনি অন্তরস্পর্শী। গানগুলি সৌরেন গুপ্ত।

একটি মহৎ সঙ্গীতানুষ্ঠান

ভাইটি সরকারের প্রযোজনায় রবীন্দ্র সদনে একটি দুঃস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দৈন্য দূর করার মহৎ প্রচেষ্টায় সম্প্রতি এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে এবং আরতি মুখোপাধ্যায়।

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ এর পক্ষে শ্রীঅরুণপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 18th June, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে

17 JUN 1976

আমাদের (এন) কোন ব্র্যাণ্ড ও স্টক নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫

iaa/KCD-176

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২৫ জুন ১৯৭৬ ॥

মূল্য ৭৫ পয়সা
অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA UNIV.

বোরোলীন যার সহায়
সে তার ভয় কি?

যদিও নানা কাজে আপনাকে সারাদিন এই প্রকৃতির মধ্যে
নিজেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য
তাপে ঝলসে যাবে। দেহা দোষ ফোড়া ফুসকুড়ি ও আরও
অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব হতে পারে দুঃখের
হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বোরোলীন ঔষধিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার
কাটা-ছেঁড়া-ফাটা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

মশার দৌরাত্ম্যে প্রাণ যায়!

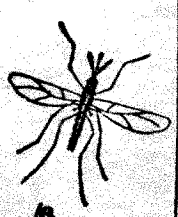

সবচেয়ে বেশী কার্যকরী মশা বিতাড়ক

তাহলে ব্যবহার করুন

ওডোমস

লক্ষ লক্ষ লোক এর ওপর নির্ভর করেন আর এটাই ব্যবহার করেন • শিশুদের পক্ষেও সম্পূর্ণ নিরাপদ

বালসারা
উন্নততর জীবনযাত্রার
আধুনিক সহায়ক
BALSARA বালসারা আণ্ড কোম্পানী (প্রা:) লি.
৪৩,নাগীনদাস মাষ্টার রোড়,বোম্বাই ৪০০ ০০১।

CHAITRA BLS 45 BEN

ভ্রমণ-সাহিত্যে অনন্য শঙ্কু মহারাজের সার্থকতম রচনা

মধু-বৃন্দাবনে (তিন পর্বে সম্পূর্ণ)

আলোক-চিত্র শোভিত, মধুময় বৃন্দাবনের পথপঞ্জীসহ উপন্যাস-রসসিক্ত অপূর্ব গ্রন্থ।

ব্রজপর্ব ১০৲ * বনপর্ব ১০৲ * মহাবন পর্ব ১২৲

এই লেখকের নবতম রচনা

মন-দ্বারকায় ১২৲

শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করছে

নিখিলচন্দ্র সরকারের অনন্য উপন্যাস

সজনে নির্জনে ১২৲

প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের

ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব ২৫৲

সুসাহিত্যিক নট রাজনের অনন্য গ্রন্থ

থানার মাটি নোনা ১৬৲

১৯৭৫ সালের সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত সুভাষ সমাজদারের

গঙ্গা থেকে কাস্পিয়ান ১৮৲

হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

দুঃসাহসী অভিযাত্রী ৭৲

দুটি নির্ভীক, অচঞ্চল বাঙালী তরুণের সাইকেলে বিশ্ব-পরিভ্রমণের রোমাঞ্চকর কাহিনী। অসংখ্য আলোকচিত্র-শোভিত। শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

ভালোবেসেছিলাম ৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস

একাল চিরকাল ১০৲

চিরঞ্জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা

বিশ্বকাপ ফুটবল ২৫৲

দৃষ্টিহীনের উপন্যাস

মঞ্চ ১০৲

নিমাই ভট্টাচার্যের উপন্যাস

অন্যদিন ৪৲

কল্‌হনের উপন্যাস

খবরে প্রকাশ ১০৲

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাস

অভয়ারণ্য ১৫৲

ব্রজমাধব ভট্টাচার্যের উপন্যাস

স্বর্ণভ্রমর ১৪৲

অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

সুবর্নশিরি ২০৲

নিগূঢ়ানন্দের উপন্যাস

হৃদয়ে নাবিক ৮৲

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

চাঁদের কাছাকাছি ৭৲

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর উপন্যাস

স্বাতীপ্রদীপ ১০৲

নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস

বিহঙ্গ বাসনা ১০৲

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস

থৈথৈহাহাকার ১৮৲

আবদুল জববারের

পল্লীর পদাবলী ১৬৲

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

নীলাঙ্গুরীয় ১২৲

শ্রীহংস-এর উপন্যাস

লাস্ট ওয়ার্ড ৮৲

রবীন্দ্র লাইব্রেরী ১৫/২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলিকাতা-১২ ॥ ফোন : ৩৪-৮৩৫৬

যেমন প্রচার তেমন বাজার

সব বাজারে যাবে কে ?
ডাকের চিঠি আবার কে !

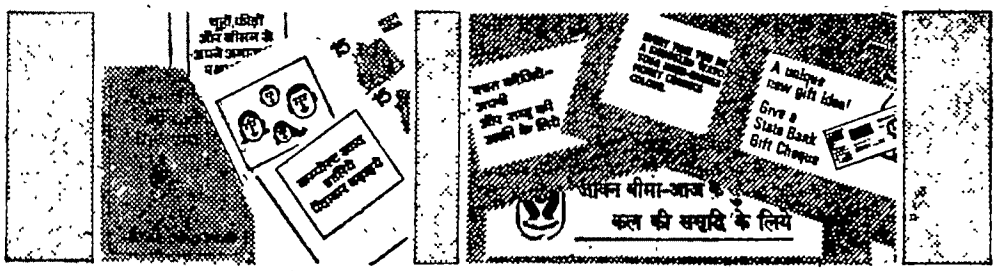

ডাকের চিঠি সবাই পান
সেই চিঠিতে বিজ্ঞাপন
আয় বাড়াবার আমন্ত্রণ

প্রতি দশ লাখের প্রচারমূল্য

মাধ্যম	পোস্টকার্ড	ইনল্যান্ড	এয়ারোগ্রাম
মাপ	3 সে.মী.× 2½ সে.মী.	9 সে.মী.× 2½ সে.মী.	5½ সে.মী.× 4½ সে.মী.
মূল্য	10,000 টাকা	20,000 টাকা	60,000 টাকা

প্রত্যেক বিজ্ঞাপনের জন্যে অন্ততঃ দশ লক্ষের অর্ডার দেওয়া চাই

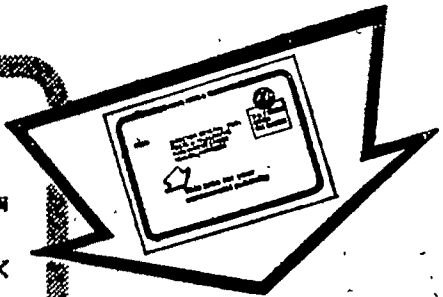

লিখুন ঃ
ডিরেক্টার (কমারশিয়াল পাবলিসিটি)
পোস্টস্ অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ্স্ বোর্ড,
পার্লামেন্ট স্ট্রীট,
নিউ দিল্লী-110001

davp-76/39

১৬ বর্ষ

অমৃত

৭ সংখ্যা

"ইন্ডিয়ান অ্যান্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday, 25th June, 1976 শুক্রবার, ১১ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৬	সম্পাদকীয়—	
৭	নেকু-পুষু মুমু (গল্প)	শ্রীবুদ্ধদেব গুহ
১০	কুচিলা খাঁই (গল্প)	ঐ
১৭	কথায় কথায়	শ্রীতারাপদ রায়
১৮	মনের অসুখ	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২১	গোধূলিয়া (উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৪	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা	শ্রীআনন্দ রায়
২৬	একালের চিত্রশিল্পী	শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
২৯	মোহিনী আটম (উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৩৪	এমন কোন গান নেই, এমন কোন বিরহ নেই (কবিতা)	দাউদ হায়দার
৩৪	সামনে জাগছে (কবিতা)	শ্রীশান্তিকুমার ঘোষ

প্রকাশিত হ'ল:—

নির্মল আচার্য-এর

তৃতীয় মেরু

দ্বিতীয় সং—মূল্য=১৭-০০

বাঙ্গালাদেশের একটি অজ্ঞাত অবহেলিত হিন্দু সমাজে ইহা একটি তথ্যপূর্ণ চিত্রণ—কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ধরিয়া দেওয়া—ইহাতেই গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্ব। ইহা একটি documentary গ্রন্থ। তথ্যপুস্তক যাহার একটি চিরন্তন মূল্য আছে। বাঙ্গালার ঋষি দাস বা হিন্দু মুচি সমাজের জীবন চর্য্যার অপূর্ব আলোকচিত্র। ভাষানুশীলকবিধায় আমি এখনই ইহাতে ব্যবহৃত ঋষিদাস সমাজের মধ্যে প্রচলিত শব্দ সম্ভারে সংগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা অভিধানের পরিপোষণের জন্য করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বাঙ্গালার মুচিদের জীবন নিয়ে—গ্রন্থকারের "তৃতীয় মেরু" বইখানি বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

জাতিয় অধ্যাপক স্বাঃ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রক্তস্বাক্ষর পাব্লিকেশন, ৭বি, ধীবেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান—দে বুক ষ্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী

কলেজ পাঠ্যপুস্তক

দর্শন (Philosophy)

ভারতীয় দর্শন—
১ম খণ্ড—৯ম সংস্করণ ১২-০০
ভারতীয় দর্শন—
২য় খণ্ড—৩য় সংস্করণ ৭-০০
ভারতীয় দর্শন—
৩য় খণ্ড (বেদ ও উপনিষদ) ৭-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শন—১১শ সংস্করণ ১২-০০
নীতিবিজ্ঞান—৭ম সংস্করণ ১২-০০
সমাজদর্শন—৯ম সংস্করণ ১২-০০
মনোবিদ্যা—৮ম সংস্করণ ২২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—
(বেকন-হিউম) ৩য় সংস্করণ ১২-০০
পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—কান্ট ১৮-০০
ধর্মদর্শন ২২-০০
সমাজ মনোবিজ্ঞান— ১০-০০
অধিবিদ্যার কয়েকটি সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ৬-০০

শিক্ষা (Education)

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় প্রণীত
শিক্ষাতত্ত্ব—৩য় সংস্করণ ১৪-০০
ভারতের শিক্ষা সমস্যা—
৩য় সংস্করণ ১৫-০০
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান—
৪র্থ সংস্করণ ২২-০০

শিক্ষক শিক্ষণ

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে পদ্ধতি ও পরিবেশ—
১৬-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও
পৌরবিজ্ঞান ১৪-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— ১৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষার ইতিহাস—১৬-০০
অধ্যাপক সেনগুপ্ত রায় ও ঘোষ প্রণীত
শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান—
২য় সংস্করণ ২৫-০০
শিক্ষণ প্রসঙ্গে শিক্ষাতত্ত্ব— ১৬-০০

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য

উচ্চ মাধ্যমিক দর্শন—
অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক মনোবিজ্ঞান—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও সেন
উচ্চ মাধ্যমিক সমাজবিদ্যা—
অধ্যাপক—চট্টোপাধ্যায় ও সেনগুপ্ত
উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা—
—অধ্যাপক সেনগুপ্ত, ঘোষ ও হালদার

BP, ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ কলেজ রো, পিন—৭০০০০৯
ফোন : ৩৪-৭২৩৪

আপনি কি জানেন ?

অবশ্য আপনি যদি বেতনভুক করদাতা হ'ন

আপনাকে স্বেচ্ছায় আয়ের বিবরণ দিতে হবে না

যদি .....

১৯৭৬-৭৭-এর (হিসাব) নিরূপণ বছর সংক্রান্ত হিসাব বছরে—

(ক) আপনার বেতন থেকে আয় (নগদ ব্যতিরেকে অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বাদ দিয়ে) মোট ১৮,০০০ টাকার বেশি না হয়.....;

(খ) আপনি কর্মচারী — অধিকর্তা ছিলেন না কিংবা কোম্পানীর কর্মচারী হিসেবে সাধারণ শেয়ারের মালিক হয়েও আপনার ২০ শতাংশ বা তার বেশির ভোটাধিকার ছিল না—

(গ) কৃষি, বাড়ী প্রভৃতি সম্পত্তি, মূলধনী লাভ, ব্যবসা অথবা অন্য পেশা থেকে কোনও আয় করেন নি—

(ঘ) আপনার লভ্যাংশ বা সুদ থেকে আয়, ধারা—৪০ 'এল' অনুসারে ৩,০০০ টাকার রেহাই-সীমা ছাড়ায় নি—

(ঙ) আয়ের সূত্র থেকেই বেতন বাবদ যে পরিমাণ কর কাটবার কথা তা কেটে নেওয়া হয়ে থাকে—

কর নিরূপণের জন্যে, আয়কর দপ্তরে আপনার যাওয়ার দরকার পড়বে না

যদি .....

(ক) আপনি আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নতুন রিটার্ণ ফর্ম **বেছে নেন**।

ফর্ম নং ২-এ হ'ল সেই সব সরকারী কর্মচারীর জন্যে যাঁদের ঘরবাড়ী, মূলধনী লাভ, কৃষি এবং ব্যবসা বা অন্য পেশা থেকে আয় নেই।

ফর্ম নং ৩ হ'ল সেই সব সরকারী কর্মচারীর জন্যে যাঁরা ব্যবসা বা অন্য কোনও পেশা থেকে আয় করেন না।

(খ) রিটার্ণ ফর্মের সব কটি 'কলাম' বা স্তম্ভ পুরোপুরি ও সঠিকভাবে ভরুন।

(গ) রিটার্ণের সঙ্গে এই কাগজগুলি পাঠান—

১ আয়ের সূত্রে কেটে নেওয়া করের প্রমাণপত্র।
২ ডিভিডেন্ট ওয়ারেন্টগুলি।
৩ স্ব-নির্ধারিত কর জমা করার রসিদ।
৪ বাধ্যতামূলক জমার রসিদ।
৫ ঘোষিত আয়, দাবীকৃত রেহাই এবং প্রদত্ত অগ্রিম করের সমর্থনে প্রামাণ্য জন্য যে কোনও কাগজপত্র।

মনে রাখবেন : আয়ের রিটার্ণ বা বিবরণ পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০-৬-৭৬। কিন্তু তিরিশে জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি? রিটার্ণ ভরে ঠিক সময়ে না পাঠালে শাস্তি হ'তে পারে।

ডিরেকটার অফ ইন্সপেকশান
(পাবলিকেশান্স অ্যান্ড পাবলিক রিলেশান্স)
আয়কর বিভাগ
ময়ূর ভবন, নিউদিল্লী

ডি এ ভি পি—৭৬।১৩৪

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়	লেখক
৩৪	বেলা শেষে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাই (কবিতা)	শ্রীবেলা সেন
৩৫	একালের গান	শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪১	অন্য শেষ রজনী (উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৪৩	নতুন বই	
৪৪	পুনশ্চ	ক্ষপণক
৪৫	ওখানে অমঙ্গল (গল্প)	শ্রীতারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৯	গোষ্ঠবাবু	শ্রীমোনা গুহ
৫২	মাঠ থেকে বলছি	শ্রীঅজয় বসু
৫৫	খেলাধুলো	দর্শক
৫৬	খেলার জগতে মেয়ে	তাময়
৫৭	মাঠের নায়ক	শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৮	প্রেক্ষাগৃহ	
৫৯	নেপথ্যে	নিরীক্ষিৎ
৬০	স্টুডিও সংবাদ	
৬২	চিত্র সমালোচনা	চিত্রবিদ
৬৩	শতবর্ষের স্মরণীয়	শ্রীবালীশ মুখোপাধ্যায়
৬৪	নাটগুরু	নাট্য সমালোচক

শৈব্যার জীবনী সিরিজ

প্রখ্যাত জীবনীকার মণি বাগচি দেশের সেরা মানুষদের জীবনীগুলি লিখছেন সুন্দর ঝকঝকে ভাষায়। ছোট-বড় সবার পাঠ্য। পরিবারে ও পাঠাগারে সংগ্রহ করে রাখার মতো বই। ছোটদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে। গল্পের মতো করে লেখা। মনোরম প্রচ্ছদ। প্রত্যেকটি ৫·০০ টাকা।

এখন বেরিয়েছে :

রামকৃষ্ণ
রামমোহন
শরৎচন্দ্র

শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলকাতা—১২

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা করে কাবার দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকএ মাছ মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা
রেডিমিক্সড কারি পাউডার
কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ
২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোস্ট বক্স নং ৬৭৭৪.
ফোন : ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-১৭০৮

PAM—KCD-74

সম্পাদকীয়

রসাল কথা

রসাল কথা, কিন্তু ঠিক সরস কিনা বলা শক্ত। কেননা সম্প্রতি এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে যাতে হরিষে-বিষাদ ঘটাও বিচিত্র নয়।

শোনা গেল, আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গীয় আমের প্রধান জোগান আসে যেখান থেকে সেই মালদহ জেলায় আমের ফলন এবার হতাশজনক।

অবশ্য সু-খবরও যে না আছে তা নয়। ভারত থেকে এ বছর বিদেশে আম চালান গেছে প্রায় ১০ কোটি টাকার মতো। অথচ গত বছর গেছে ৯ কোটি টাকার আম, এবং তার আগের বছর বেশ কিছু কম—সাড়ে ৭ কোটি টাকার মতো। খবরটি আরো উৎসাহদায়ক এইজন্যে যে, সারা পৃথিবীতে আমের যা ফলন তার শতকরা ৮০ ভাগই উৎপন্ন হয় ভারতে। এবং জানা গেল ভারতেও সমস্ত ধরনের উৎপন্ন ফলের মধ্যে ৬০ ভাগ পড়ে আমের ঘরানেদে। বিদেশে আম চালান যায় প্রধানত ব্রিটেন, কানাডা আমেরিকা, আরব দেশগুলিতে, এবং ইদানীং ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও সোভিয়েত দেশেও।

কথা উঠতে পারে, বিদেশী ফল 'আনানাস', যা পোর্তুগীজরা নাকি এদেশে এনেছিল তাকে যেমন ধ্বনিসাদৃশ্যে আনারস বলে ঘরোয়া করে নিয়েছি আমরা, সাহেবরাও সেইরকম আমের অনুরূপ কোনো শব্দ ব্যবহার না করে হঠাৎ ম্যাঙ্গো বলতে গেলেন কেন? না, তাঁদের কোনো ত্রুটি ঘটেনি। জেনে খুশি হবেন, ম্যাঙ্গো শব্দটি এনেছে দক্ষিণ ভারতেরই এক মুখ্য ভাষা তামিলের 'মঙ্গাই' থেকে—যার অর্থও আমই।

আমের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজা ও জমিদার-শ্রেণীর খানদানী মানুষ। অসীম যত্নে তাঁরা আম নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। স্বাভাবিক অবস্থায় যে ফলে হয়তো ছিল প্রচুর আঁশ ও অম্লের আধিক্য, তাকে স্বাদুতর করেছেন, নানা আকার ও গন্ধযুক্ত করেছেন, আঁশহীন করে আঁটিকে করে এনেছেন খর্বতর। এখন ল্যাংড়া, ফজলি, আলফাঁসো ও বেগুনফুলীর আকার ও খোসার রঙই শুধু আলাদা নয়, স্বাদ ও গন্ধের বৈচিত্র্যও মনে রাখবার মতো।

কিন্তু 'হুতোমপ্যাঁচার নকশা'য় ঠিকই বলা হয়েছে, নবাবী আমল যেন সূর্যাস্তের সোনা। দুই শতাব্দী না পেরোতেই—সারা ভারতে যতো উজ্জ্বল চিত্রই থাক—পশ্চিমবঙ্গে আমের ভবিষ্যতের উপর নেমে আসছে আসন্ন সন্ধ্যার ক্লান্ত যবনিকা।

মালদহের কথা হচ্ছিল, সেখানেই সব থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে আম বাগানগুলির ক্রম-বর্ধিষ্ণু দৈন্যদশা।

সমীক্ষার কচকচি অবশ্য ক্লান্তিকর। কিন্তু একনজরে দেখে নিতে গেলে বলতে হয়—১৯৬২ সালে মালদহ থেকে আম চালান গিয়েছিল ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ১৮ হাজারটিরও কিছু বেশি; কিন্তু গত বছরে অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে চালান গেছে মাত্র ১৪ লক্ষ ৪০ হাজার আম।

প্রাকৃতিক কারণ, যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে তার কথা বাদ দিলেও আজকের উন্নততর বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় ভালো ফলন যে অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে যাওয়া যায়, কৃষির ক্ষেত্রে তার গৌরবজনক প্রমাণ তো হাতের কাছেই আছে। যা ধানে হয়, তা আমেই বা না হবে কেন? বিশেষ করে একটি জেলারই ৪০ হাজার মানুষ যখন এরই মারফৎ জীবিকা নির্বাহ করে।

অস্বীকার করা যাবে না যে, সরকার এসব কথা মনে রেখেই, মালদহে একটি ম্যাঙ্গো রিসার্চ সেন্টার খুলেছেন, এবং সেন্টারের একটি আমবাগানে ৩৮০টি আম গাছও আছে। কিন্তু তা কি সারা জেলায় আমবাগানের যত্ন নিতে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ছড়িয়ে দিতে পেরেছে? ভালো জাতের কলম সরবরাহ করেছে? পুরনো আমবাগানের পাশে নতুন বাগান তৈরিতে উৎসাহিত করতে পেরেছে?

আর, সমস্যা তো মালদহেই শুধু নয়—আমের ফলন মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার কিছু অংশে, গোটা বারাসত মহকুমায়, এবং বসিরহাট, বারুইপুর আর হুগলী এবং বর্ধমানের কিছু অংশেও কম হয় না। সেসব জায়গাতেই বা নতুন বাগান তৈরির উৎসাহ দিয়ে ফলন বাড়ানোর কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

আম এখন মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা অর্জনের একটা বড় উপায়। এসব সমস্যার সমাধানও তাই আরো জরুরী। সরকার এখন নানাদিকেই লক্ষ্য দিচ্ছেন বলে তাঁদের কাছে প্রত্যাশাও আমাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু।

শুরুতে হরিষে-বিষাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করব, তা হবে নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী এবং আম্র প্রসঙ্গ অচিরেই হয়ে উঠবে সত্যিকারের একটি রসাল কথা।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

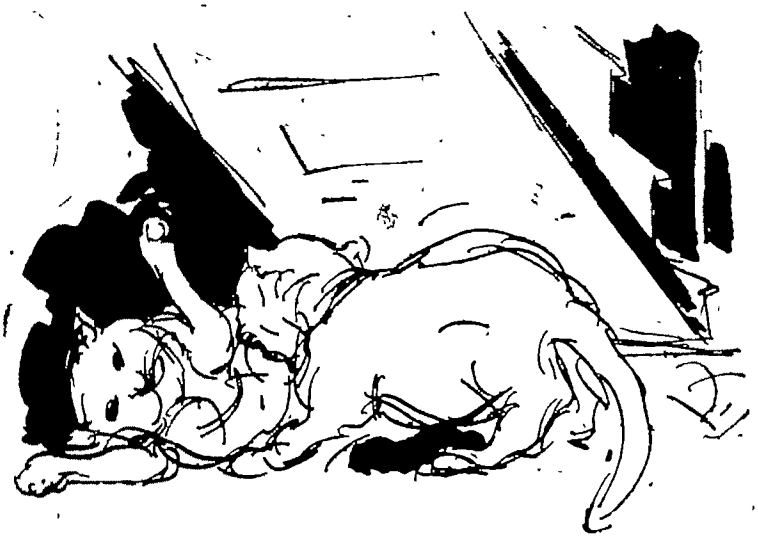

গাড়িটা মোড়টা ঘুরল। তোমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। দোতলার বারান্দা; মাধবীলতা।

ভাবলাম যাই-ই না একবার।

এরকম কতবারই তো কত রাগারাগি হয়েছে তারপর সবই মিটমাট হয়ে গেছে।

রাগারাগি বলাটা অবশ্য ঠিক নয়। রাগটা চিরদিনই একতরফাই ছিল। পাখির ফরফের। রাগ করেছে সে, আমি রাগ ভাঙিয়েছি। এইটেই নিয়ম হয়ে গেছিল। এই নিয়মের যে কোনো ব্যতিক্রম হবে, বা কখনও হতে পারে এমন ভাবার অবকাশ হয় নি। কখনোই না।

তাই-ই ভাবলাম; যাই-ই না একবার।

নিজেকে ছোট করা হবে? হলোই বা। কে আর কবে নিজেকে বড় করে কাউকে ভালোবাসতে পেরেছে বা বেসেছে? ভালোবাসলে তো ভালোবাসার জনের কাছে প্রতিনিয়ত ছোটই হতে হয়। ছোট হতে হতে যখন একেবারে নিজের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম ঘটে তখন এক একবার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নিজের কাছেই নিজেকে জাহির করে, প্রমাণ করতে হয় সে নিজের অস্তিত্বটা এখনও সম্পূর্ণতঃ পরনির্ভর হয়ে যায় নি। এখনও শুধুমাত্র নিজের কারণেই বেঁচে থাকা যেতে পারে—অন্য কারো ভালোবাসা ব্যতিরেকেও।

সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে তোমার দরজায় পৌঁছে গেছি নিজেই জানি না। সত্যি পাখি। নিজেই জানি না।

তুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পেতলের নব ব্রাসো দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছিলে।

আমাকে দেখে তাচ্ছিল্যের গলায় বললে হঠাৎ? কি মনে করে?

আমি বললাম কিছু মনে করে নয়। কাল থেকে তোমার কথা বড় মনে হচ্ছিল। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আসা—ইচ্ছা করলেই তো আর আসা যায় না। তবু এমন করে মনে পড়ল যে, না এসে পারলাম না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললাম, তুমি কি বিরক্ত হলে?

কাটা-কাটা গলায় তুমি বললে না, বিরক্ত হওয়ার কি আছে? তবে এ সময়ে আমার স্বামী বাড়ি থাকেন না, তাই এ সময়ে তুমি না এলেই ভাল হয়। আমার দশজনকে নিয়ে ঘর করতে হয় তো।

আমি থতমত খেয়ে বললাম অত ভেবে তো আসি নি। এদিকে একটা কাজ ছিল তোমার ব্যবসাদার স্বামী তো আমাদের মতো চাকরীর শিকলে বাঁধা জীব নয় যে, একটা বিশেষ সময়ে তাকে বেরোতে হয়। ভেবেছিলাম অশোককেও পাবো।

তারপর ভেবেছিলাম আগেও তো এমনি কতবার হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েছি আমাকে দেখে তো খুশীই হয়েছ; কখনও তো এমন বিরক্তি দেখাও নি।

ভেবেছিলে? বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পাখি আমার দিকে তাকাল।

তারপর বলল আমি চাই না যে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকুক। কারণ আমার সংসার করতে হয়। আফটার অল আই হ্যাভ আ হাজব্যান্ড। আমাকে অনেক বুঝে-সুঝে চলতে হয়; চলা উচিত। তুমি আমার কে? দেওয়ার মতো কি তুমি আমাকে দিয়েছ; দিতে পারো?

আমি বললাম তা তো নিশ্চয়ই। কিন্তু পনেরো বছরের সম্পর্কটা হঠাৎ মুছে ফেলতে চাইলেই কি মুছে ফেলা যায়? সম্পর্ক কি বালির উপর পায়ের দাগ যে, ইচ্ছে মতো রগড়ে দিলে আর ঘুছে গেলো?

অত জানি না। কিন্তু আমি পারি। আমার কিছুতেই আটকায় না। আমি সবই পারি। পাখি বলল।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, আমি পারি না।

নেকু-পুষু-মুনু

বুদ্ধদেব গুহ

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যে পারি সেইটেই আমার পক্ষে অনেক।

আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে ক্লান্ত শ্রান্ত দেখে বলবে, কিছু কি খাবে? এক কাপ চা? লেবু দিয়ে সরবৎ করে দেবো এক গ্লাস? অন্ততঃ কিছু একটা বলবে ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি কিছুই না বলে এমন একটা মুখ করে নিজের কাজ করতে লাগলে যে, মনে হল আমি তোমার কাছে টাকা বা কোনো করুণা ভিক্ষা করতে গিয়ে তোমার মুডের অপেক্ষায় বসে আছি।

আমি বললাম চান করেছ? এত বেলা হল চান করো নি এখনও?

নাঃ। কাটাভাবে জবাব দিলে তুমি।

চান করবে না?

সময় হলেই করব। রান্না-বান্না সেরে চান করব।

আমি বললাম, ও। রান্না করছ বলেই বুঝি চুলের এই অবস্থা।

তারপর পরিবেশটাকে লঘু করার জন্যে বললাম যে, যে বাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না?

পাখি বলল রাঁধে হয়তো তোমার মতো লোকের ভারসেটাইল বউরা। আমি সাধারণ মেয়ে আমাকে কি এত মানায়? রাঁধা এবং একই সঙ্গে চুল বাঁধা?

তোমার কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল। কিসের খোঁচা কেন খোঁচা তা আমি জানি, কিন্তু তোমাকে আমি কোনো দুঃখ দিইনি কখনও। যদি অন্য কারো হাতে দুঃখ পেয়ে থাকো তাহলে সেই দুঃখের দায়িত্বটা তুমি চিরদিনই পুরোপুরি আমার ঘাড়েই চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছ।

নিশ্চিন্ত হয়েছ কারণ তুমি জেনেছ যে তোমাকে উল্টে আঘাত করব না আমি কখনও। এই জানাটাকে ভর করে চিরদিনই তুমি যেমন খুশী তেমনভাবে আমাকে খুঁচিয়েছ বাথা দিয়েছ খাঁচায়-বন্ধ জানোয়ারের মতো।

আমি উত্তর না দিয়ে বসে পড়লাম, মোড়াটা টেনে নিয়ে।

তুমি আমাকে বসতেও বললে না!

হঠাৎ তুমি দরজা ছেড়ে ঘরের ভিতরে এসে বসলে আমার ঠিক সামনে। ফাঁসীর আসামীকে জেরা-করা উকিলের মতো মুখ করে। চান কবোনি তুমি, চুল উস্কো-খুস্কো বগলের কাছটা ঘামে ভিজে গেছে ভিতরের জামা পরোনি—কেমন একটা ঢিলে-ঢালা বিস্রস্ত হাল-ছাড়া ডোন্ট কেয়ার ভাব। যেন কিছুতেই তোমার আর কিছু এসে যায় না—সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধেই যেন তুমি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গেছ। আমার সম্বন্ধে তো পুরোপুরিই।

আমি যখন তোমার দিকে এসব ভাবছিলাম তুমি হঠাৎ বললে তোমার অফিস নেই?

আমি বললাম আছে। অফিসের কাজ নিয়েই এ-পাড়ায় এসেছিলাম—বললাম তো—অফিসের গাড়ি নীচে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু অফিস কেন? তোমার যেমন হাজব্যান্ড আছে আমারও ওয়াইফ আছে। সবই আছে তবুও শুধু তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছা করছিল বলেই এসেছিলাম।

তারপর হঠাৎ আমি বোকার মতো বললাম তোমার কখনও আমাকে দেখতে ইচ্ছা করে না—কোনোদিনও না? কবে নি?

তুমি হাতের লকেটটা কামড়ে ধরে বললে তোমার কি ধারণা যে, তুমি খুব হ্যান্ডসাম বা তুমি এমন কিছু যে তোমাকে দেখবার জন্যে আমি পাগল হয়ে থাকি, থাকব?

এসব কথার জবাব হয় না কোনো।

আজ পাখি আমাকে পদে-পদে অপমান করবে বলে মনস্থ করেছে। অপমানের জবাব অপমানই দেওয়া যায়—কিন্তু আমি যে ওকে ভালোবাসি—ও মনে দুঃখ পায় এমন কিছু করা বা বলা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি কখনও। হবেও না কোনোদিন।

কিছুই না বলে আমি চুপ করেই বসে রইলাম।

তোমার ঘরের জানালা খোলা ছিল। কিন্তু পাখি তোমার মনের জানালা বন্ধ ছিল। কবে যেন তুমি দড়াম শব্দে তা বন্ধ করে দিয়েছিলে অথচ আমার কানে সে শব্দ পৌঁছয় নি। বাইরে কা-কা করছিল বোদ। তাকানো যাচ্ছিল না সেদিকে। চোখের মধ্যে যতটুকু নরম আর্দ্র তা থাকে তার সবটুকু শুষে নিচ্ছিল সে কাক। কিন্তু আমার মনে হল তোমার চোখের কাক আজ বাইরের, বৈশাখী দুপুরের কাকের চেয়েও অনেক বেশী জ্বালা-ধরা। সেই কাক আমার চোখ পুড়তেই আমার চোখ জ্বালা করে উঠল।

হঠাৎ তুমি বললে তুমি কি চাও আমার কাছে? দয়া করে বলবে?

এই হঠাৎ প্রশ্নের কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। জবাবে হয়তো অনেক কিছু বলতে পারতাম কিন্তু কিভাবে গুছিয়ে বলব ভেবে পেলাম না।

কোনোদিনও ভাল কথা বলতে পারি না আমি। এমন অবস্থায় তো একেবারেই নয়।

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করলে আর মাড়ি মালিশ করলে মাড়ির গোলযোগ ও দাঁতের ক্ষয় রোধ করা যায়

নিয়মিত ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করেন এমন অনেকে অযাচিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে লিখেছেন ঃ

"...আমার স্ত্রী দাঁতের-গোলযোগে ভুগছিলেন... টুথপেষ্ট বদলে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে শুরু করলেন...এমন সুফল পেলেন, যে এখন অন্য কারো মাড়ির গোলযোগ হলেই উনি তাঁকে ফরহ্যান্স ব্যবহার করতে জোর করেন। আমার ভাই মিলি ইংল্যাণ্ডে, তিনিও ভারতে তৈরী ফরহ্যান্সের ৬টি টিউব পাঠানোর জন্যে পীড়াপীড়ি করে লিখেছেন।"

(স্বাঃ) ডি. জি. এম. ডি'সুজা
বম্বে

"মাজাসুদ্ধির এক ডেন্টিস্ট...দাঁত আর মাড়ির জন্যে আমাকে ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট ব্যবহার করতে বললেন। আমি অবিলম্বে ওঁর উপদেশ পালন করলাম, আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমার নিঃশ্বাস আর মাড়ি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো। সেই থেকে আমি ফরহ্যান্স ছাড়া আর কিছু জানি না। আমার সারা পরিবার (আমরা ৯ জন।) ফরহ্যান্স ব্যবহার করি, আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই অভ্যাস আর বিশ্বাস আমাদের পরিবারে পুরুষানুক্রমে চলবে।"

(স্বাঃ) পি. জে. লাজার
চিন্নালা, অন্ধ্র প্রদেশ

(এই প্রশংসাপত্রের প্রতিচ্ছবি (ফটোস্যাট) জেফি ম্যানার্স এণ্ড কোম্পানী লিঃ-এর যেকোনো অফিসে দেখতে পাবেন।)

দাঁতের সঠিক যত্ন নিতে হলে, রাত্রে আর সকালে জাপরার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করার জন্যে ফরহ্যান্স ব্যবহার করুন।

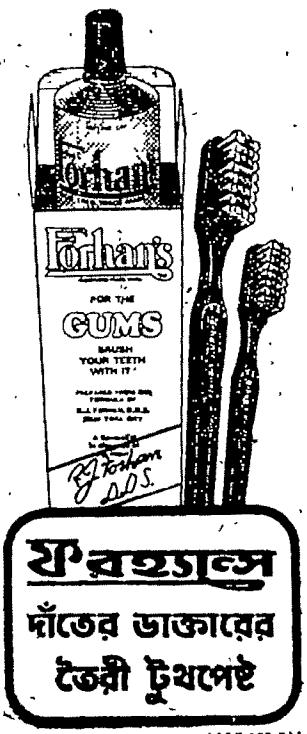

ফরহ্যান্স
দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

বিনামূল্যে! দাঁত আর মাড়ির যত্ন সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ রঙীন পুস্তিকা। অনুগ্রহ করে ডাক খরচ বাবদ ১৫ পয়সার ডাকটিকিট সমেত এই ঠিকানায় লিখুন : ফরহ্যান্স ডেন্টাল অ্যাডভাইসরী ব্যুরো, ডিপার্টমেন্ট নং T 129, বক্সটি আর ১১৪৬৩, বম্বে ৪০০ ০২৩। যে জায়গায় ফ্লুরাইড আছে।

PIN CODE FOR FAST MAIL

আমি তবুও চুপ করে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ভাবতে লাগলাম, দেখি! তুমি কত নিষ্ঠুর হতে পারো।

তুমি আবারও বললে। এবার কথা বলার সময়ে তোমার ঠোঁটের কোণে শ্লেষ্মার মতো বিনবিনে শ্লেষের ভাব ফুটে উঠল; তুমি বললে সব পুরুষই সব মেয়ের কাছে যা চায়, তাই-ই তো তুমি চাও? তাই-ই যদি চাও তাহলে এত কষ্ট পাও কেন? আমাকেই বা এত বিরক্ত করো কেন? অনেক সহজে অনেক কম কাঠ-খড়-কেরোসিন পুড়িয়ে তো তুমি আমার চেয়ে অনেক উজ্জ্বল আলো জ্বালতে পারো—নিজেকে সে আলোয় পোড়াতে পারো—ছাই করতে পারো—মরতে আমার কাছে আসো কেন? পুরোনো সেজ বাতিকে এবার বাতিল করো। ঝাড়লণ্ঠন জ্বালো এবার।

আমি তবুও চুপ করে রইলাম।

ভাবলাম, তুমি এত কথা শিখলে কোথায়? কে শেখালো?

তুমি বললে, জবাব দাও! চুপ করে রইলে কেন? তোমার জন্য আমার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমাকে নিয়ে তুমি গল্প লেখো, ঢাউস-ঢাউস উপন্যাস লেখো। তার জন্য কথা শুনতে হয় আমাকে, ছোট হতে হয় লোকের কাছে। কি চাও তুমি? আমাকে ছাড়া আর কাউকে নিয়ে কি লিখতে পারো না? এত বড় কলকাতা শহরে মেয়ের কি অভাব? —আমাকে মুক্তি দাও! তোমার অনুপ্রেরণার পিণ্ডি দিতে ইচ্ছে করে আমার

ফলে ফলে প্রতি ফলে খাবার বিস্কুট

ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট

যেমন হাল্কা তেমনি সহজপাচ্য

দিন শুরু করুন বেশ মচমচে আর তাজা ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট বিস্কুট দিয়ে। স্বাদেভরা এই বিস্কুট যেমন হাল্কা, তেমনি হজম করাও সহজ। দাদু থেকে নাতি—বাড়ীর সবার জন্যে। সকালে, কাজের অবসরে চায়ের সঙ্গে—যে কোনো সময়েই ব্রিটানিয়া থিন অ্যারারুট খেতে ভাল।

ব্রিটানিয়া
দেয় ভাল বিস্কুট—
৫০ বছরের অভিজ্ঞতায়

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবচেয়ে সেরা

লিবটাস-BBCAR.3.140 BG

গরাষ গিয়ে। দোহাই তোমার, তোমার কল্পনার কারাগার থেকে আমাকে মুক্তি দাও। তোমার এই কলম নিয়ে খেলার জন্যে আমাকে যা মূল্য দিতে হয় তা আমিই জানি। আমার স্বামী...

আমি ওকে থামিয়ে দিযে বললাম, তোমাব স্বামী কি বলে?

বলে, এসব বদমাইসী, নোংরামো; বলে, তোমার বিরুদ্ধে কোর্টে কেস আনবে। আমার আত্মীয়স্বজন, হিতাকাঙ্খী তারাও সবাই বলে।

আমি চুপ করে বসে ভাবছিলাম যে, পৃথিবীর সকলেই তোমার হিতাকাঙ্খী, এক আমি ছাড়া!

আমি হাসলাম, বললাম, স্বপ্নে তোমাকে আদব করার অপরাধ কি আদালতে টিকবে? যা সত্যি তা তো এইই—তোমার এই ব্যবহাব। এই সহানুভূতি। ইংরিজীতে একটা কথা আছে জানো তো? "ইয উইশেস ওয়্যার হর্সেস বেগারস উড হ্যাভ রোড দম। ইচ্ছা বা কল্পনা তো ঘোড়া নয় তা হলে আমিও দুরন্ত ঘোড়-সওয়ার হতে পারতাম।

পাখি বলল, তোমার ওসব ন্যাকা ন্যাকা কথা ভাল লগে না। আমরা মেয়েরা অনেক বেশী প্র্যাকটিক্যাল। স্বামী-ননদ-জা নিয়ে ঘর করি। ঐসব প্রেম-প্রেম খেলা আমাদের মানায় না। বিয়ের আগে ওসব চলে। তোমার এই কাব্যের অনুপ্রেরণা হয়ে যে যন্ত্রণা পাচ্ছি তাব চেয়ে স্বামীর আদর, হিন্দী ছবি, দহিকচুরী, ভেল-পুরী আমার কাছে অনেক বেশী সত্যি; স্পষ্ট। আবারও শুধোচ্ছি তোমায়, তুমি আমার জন্য কি করেছ? কী তুমি করতে পারো আমার জন্য? আমার যদি কিছুমাত্র হাবায়, ক্ষতি হয়, আমার সুনাম, চারিত্রিক যশ, তুমি কি দিযে তা পূরণ করবে? পারবে তা পূরণ করতে? কী আছে তোমার? কি ছাড়তে পারো তুমি আমার জন্য?

আমি খুব পিপাসায় ছিলাম। আলসের শঙকাকের মতো আমার টাগরা শুকিয়ে গেছিল। কাক হাঁ করলে তার মুখের মধ্যে যেমন বীভৎস লাল রং দেখা যায়, আমার বুকের মধ্যেটা তখন তেমনই লালিপপের মতো লাল হয়ে গেছিল। আমার খুব বলতে ইচ্ছা করছিল, পাখি, আমার নরম সাধের পাখি, এক গ্লাস জল দেবে?

কিন্তু পাখি আমাকে একটু জল চাইবাব অবকাশও দিল না। দু' হাত নিজের কাঁধের দুধারে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কি দিয়েছ তুমি আমাকে যন্ত্রণা ছাড়া? কি দিতে পারো তুমি? পরক্ষণেই বলল, তোমার লেখা সব ক'খানি বই দিয়ে আমি উনুন ধরাবো—ঘুটের কাজে লাগাবো। এতগুলো বই না লিখে দাঁতের মাজন ফেরি করাও তো ভাল ছিল।

আমি তবুও চুপ করে রইলাম।

তুমি এবার জেদ ধরলে জবাবের জন্যে।

বললে উত্তর তোমাকে দিতেই হবে। বলো তুমি, কি দিয়েছ আমাকে?

এবার আমি মুশ কিলালাম। তেষ্টায় আমার জিভ শুকিয়ে এসেছিল। যদিও তুমি মর্মান্ত বিস্রস্ত রাগী হয়েছিলে তবু তোমাকে দেখে, তোমার দিকে তাকিয়ে আমার বড় ভাল লাগছিল। বড় ভাল লাগে যে আমার। —চিরদিনই লেগেছে— তোমাকে যে আমি বড় ভালোবাসি পাখি—। মনে মনে বললাম—নিঃশব্দে বললাম—সব কথা মুখে বলা যায় না—বললাম, পাখি, কি দিয়েছি তা কি তুমি বোঝোনি জানোনি? আমি যা দিয়েছি, তা কি পৃথিবীর অন্য কোনো দ্বিতীয় পুরুষের কাছ থেকে তুমি পাবে? পেয়েছিলে কখনও?

তুমি তবু গর্জে উঠলে। বললে, কথা বলবে না তুমি?

আগের গল্প ॥ ১৯৬২ খৃঃ

কুচিলা খাঁই

জীপের স্টীয়ারিং ধরা বাঁ-হাতের কব্জির দিকে তাকালাম।

ঘড়ির রেডিয়ামে আড়াইটা চক্‌চক করছে। সেই দুপুর দুটোয় কটক শহর ছেড়েছি। তারপর মহানদী আর বিরূপার এ্যানিকাট পেরিয়ে ঢেনকানলের উপর দিযে এসে হিন্দোল পেরিয়ে অঙ্গুলে এসে পৌঁছেছি। সেখানে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার বওয়ানা হযে পুণার কোর্টের মোড়ে বাঁযে ঘুরেছি। তারপরও চলছি—পাহাড়-জঙ্গলে চড়াইয়ে উৎরাইযে। পথের বাঙ্গাধুলোয় গা-মাথা সব একাকার হয়ে গেছে। জার্কিনের জলপাই রংটার উপর ধুলোর আস্তরণ এমনভাবে পড়েছে যে, ড্যাশবোর্ডের মৃদু আলোয় রংটাকে খয়েরী বলে মনে হচ্ছে।

জীপের হেডলাইটে দেখলাম, সামনেই একটা শালের খুঁটির গায়ে সাদা একফালি তক্তার উপর কালোতে লেখা 'টুলকা ফরেস্ট রেস্টহাউস'।

একটি প্রায় সমকোণিক বাঁকে চাকা-গুলো আপত্তি জানিয়ে কিচ্‌কিচ্‌ করে উঠল—ঢুকে পড়লাম টুলকার বাংলোর হাতায়। সামনে পড়ে রইল হিমে ভেজা ভরাণ্ডির রাস্তা। গাঢ় অন্ধকারে একটা ফ্যাকাশে স্বপ্নের মতো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

ভোর হয়েছে।

কুচিলা-খাঁই ডাকছে পাহাড়ের উপরের কুচিলা গাছ থেকে। হ' ক'ক্ক হ' হ' ক'ক্ক, হ' ক'ক্ক হ্যাঁ ক হ্যায়। হ্যাক্ হ্যাক্।

দিল্ল ঘুমটার বাবাটা বাজিরে!

এমন অসভ্য অভদ্র পাখি ভারতবর্ষের পাহাড়-জঙ্গলে আর দুটি নেই। অন্য অনেক পাখি ডাকে বটে, তবে তাদের ডাক এমন শ্রুতিকটু কিম্বা অপ্রয়োজনীয় নয়। কোটরাব বাচ্চা যেমন বিনা কারণে লাফায়, এরা তেমনি বিনা কারণে ডাকে। সব সময যাই-যাই করছে, আর বিরাট বিরাট ডানা আর বিশ্বলোভী ঠোঁট দিযে যা পাচ্ছে তাই ঠোকরাচ্ছে। এমন লম্ফ-ঝম্ফমান পাখিব তেলে বাত সারবে না, তো বাত সারবে কিসে?

ভেবেছিলাম অনেকক্ষণ ঘুমুব। হলো না তা।

জানালা দিয়ে ডিসেম্বরের সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। এমন আশাবাদী আকাশ বহুদিন দেখিনি। ঝক্‌ঝকে রোদ্দুর হাওয়ায় উড়ছে-ছুটি—ছুটি—ছুটি। কম্বলটা সরিয়ে উঠে বসলাম চৌপায়াতে। উঠে বসতেই দেখলাম, বাংলোর পাশের ফাঁকা জায়গাটাতে, কুয়োতলার কাছে, কাপড় শুকোনোর দড়িতে কী একটা গোলাপী পদার্থ ঝুলছে।

চোখ কচ্‌লে ভাল করে দেখলাম। প্রথমে বিশ্বাস হলো না। ভাবলাম কাল রাতের নেশা কাটেনি। কিন্তু আবার ভাল করে চাইতেই ইচ্ছা না করলেও পদার্থটির উপস্থিতি বিশ্বাস কবতে হলো। একটি গোলাপী রঙ্গা নাইলন প্যান্টি। এই নিবিড় জংগলে, হাতি বাইসন বাঘ অধ্যুষিত পাহাড়ে এ কোন মেমসাহেব যে এই ভেঙেপড়া ছুঁচোয় ভরা বাংলোয় এসে রয়েছে?

ঘরের বাইরে যেতে সাহসে কুলালো না। ঘর থেকেই হাঁক দিলাম, চৌকিদার।

'কহন্তু আইজ্ঞা', বলে চৌকিদার এসে দাঁড়াল।

সে আমাকে আগেও দেখেছে অনেকবার। আঙ্গুলে দিয়ে রমণী বাসটি দেখাতেই, সে কাছে এসে বলল, ছিন্তিরা মেম্ব-

আমি এবার মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, না।

তোমার কিছু বলার নেই আমাকে?

তুমি আবারও বললে।

বললাম, নাঃ।

বলার কিছু থাকলে তো বলবে? ঘৃণার সঙ্গে বললে তুমি।

আবারও বললাম, না। বলার কিছুই নেই। তুমি আমাকে যা খুশী বলো কিন্তু আমার কিছু বলার নেই।

তারপর বললাম, হঠাৎই; আমি যাচ্ছি

তুমি আমাকে একটু বসতেও বললে না, এক গ্লাস জল খাওয়ালে না আমাকে। আমি যখন উঠলাম, দরজা পর্যন্ত এলে না তুমি এগিয়ে দিতে যেমন চিরদিন এসেছ। পাখী।

আমি সিঁড়ি বেয়ে নামছিলাম। প্রায় সিঁড়ির শেষে নেমে এসেছি, এমন সময় দেখি সিঁড়ির তলায় একটা নরম, আদুরে, দুধ-শাদা সুন্দরী বেড়ালনি শুয়ে আছে আর একটা হুলো বেড়াল—কালো, কুৎসিৎ, ঠিক দেখতে আমার মতো ঘাড়ের লোম ফুলিয়ে বেড়ালটির গায়ের গাছেক কাছে শুয়ে, এই গরমে; সিঁড়ির তলার ঠাণ্ডা, আর্দ্র ছায় যেরা জায়গাটুকুতে বেড়ালনির নরম লোমে কী আদরে জিভ দিয়ে চাটছে। বেড়ালনিটা আরামে, আবেশে, অশেষে চোখ দুটোকে আধো-বুজে আছে।

ওর ছোট্ট গোলগাল ফর্সা মুখটাতে চেয়েই আমার মনে হল পৃথিবীর সব সুখ যেন এই বেড়ালনিটার মুখে এসে ধর করেছে।

পাখি তোমার ফর্সা মুখটা একদিন ঠিক এরকম ছিল।

হঠাৎই আমার বড় রাগ হল। প্রচণ্ড রাগ। আমি হুলো বেড়ালটার পেটে কোঁৎ করে একটা লাথি মারলাম।

বললাম, ভাগ শালা। এখনও ভাগ। নইলে তোকেও আমারই মতো জবাবদিহি করতে হবে কোনো উৎস, প্রচণ্ড পিয়াসী দুপুরে, তোকেও কাঠের পুতুলের মতো সোজা বসে উত্তর দিতে হবে—না। উত্তর নয়, নিরুত্তরের অসহায়তার মধ্যে বসে থাকতে হবে—তোকেও প্রশ্ন করা হবে—তোর সাধের বেড়ালটিকে কি দিয়েছিস? কি দিয়েছিলি তুই?

লাথি খেয়ে হুলো বেড়ালটা একলাফে দরজার ছিটকিনিতে কটাং আওয়াজ করে ওর নির্লজ্জ লেজটাকে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো করে পাকিয়ে তুলে ধরে পালিয়ে গেল। ব্যাটা বদমাইস। হাঁদারাম।

কিন্তু বেড়ালনিটা তেমনই শুয়ে রইল, হাসি-হাসি মুখ করে।

ভাবলাম, হুলোটাকে না-মেরে মারা উচিৎ ছিল এটাকে। এটা তেমনি হাসি-মুখেই শুয়ে আছে। —শয়তানী, ভক্তে ভক্তে শুয়ে আছে কখন কোন জানলা দিয়ে কোন বাড়ির অন্য হুলো লাফিয় এসে, ওর কাছে এসে আবার ওর লোমে সুড়সুড়ি দেবে।

কুকুরীর বাচ্চাদের কী যেন একটা ইংরিজী নাম আছে?

কিন্তু বেড়ালনির ইংরিজী কি?

জানি না আমি।

এইরকম মেনি বেড়ালনিদের মেনি বেড়ালনি—মুনু-মুনু রাচ্চাদের ইংরিজীতে কি বলে?

নাঃ। ইংরিজীটা একেবরেই জানি না।

বাংলাটা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাংলাটা মনে পড়ছে; হঠাৎই মনে পড়ে গেল।

নেকু—পুষু—মুনু।

বুদ্ধদেব গুহ

সাহব। কাল রাত্তির আইলা আর মত্তে কহিলা সাতদিন রহিব।

মনে মনে ভাবলাম জ্বালালে দেখছি।

কোথায় একটু নিরিবিলি খেয়াল-খুশি মতো দিন কাটাব না কোত্থেকে ছিল্তিয়া মেম্বসাব এসে জুটল।

হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পরে বারান্দায় আসতেই দেখলাম, বারান্দার সামনে ঝাঁকড়া চেরীগাছটার পাশে, যেখানে অসম্ভব উদার একরাশ রোদ আর এক-ঝাঁক ছাতার পাখি লুটোপুটি করছে, ঠিক সেইখানটাতে বেতের চেয়ার পেতে একটি বিদেশী মেয়ে বসে আছে, বাংলোর সামনের পাহাড়টার দিকে চেয়ে। পাহাড়টি বলতে গেলে একেবারে বাংলোর গেটের গা-ঘেঁষে উঠেছে। অনেক-গুলো কুচিলা-খাই, হক্ক হক্ক করছে, কুচিলা গাছগুলোতে পাখা ঝাপটাচ্ছে, উড়ছে, বসছে, এক কথায় এই সুন্দর শান্ত শীতের সকালের সবটুকু সৌকুমার্য ওদের কদর্য সলজ্জতায়, চিরে ফালা-ফালা করে দিচ্ছে।

মেয়েটি কুচিলা খাইগুলোকে দেখছিলো; একদৃষ্টে চেয়েছিলো। আমি অনেক-ক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখলাম। ছিল্তিয়া মেমসাহেবকে দেখে নাস্তিকের মতিভ্রম হলো।

এমন স্নিগ্ধ শান্ত সমাহিত সৌন্দর্য আগে আমি আর দেখিনি। মেমসাহেবের যে এমন বাঙ্গালী মেয়ের ক্ষমতাময়তা থাকতে পারে, আমার ধারণার বাইরে ছিল। একটি কচি-কলাপাতা রংয়ের গরম পোশাকে সে বসেছিল। পায়ের উপর পা দিয়ে। তার গ্রীবাহেলনের মনোরম ভঙ্গী, তার বসার ভদ্রভাব তার আত্মতন্ময়তা সমস্ত মিলে-মিশে আমার একটি চমক লাগল। এই সুস্নাতা সুগন্ধি বিদেশী মেয়েটি প্রকৃতির অন্য অনেক সুন্দরী ফুলের মতো এখানে এই টুলকার জংগলে আমার চোখকে তৃপ্ত করবে বলে কাল রাতেও ভাবতে পারিনি।

ভাবলাম, ওকে 'ভোল্ট-কেরার' করে বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ি। আজকের খাওয়ার সংস্থান করতে হবে।

এই ভেবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চেরী গাছটাকে বাঁয়ে ফেলে হনহনিয়ে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু মেমসাহেব পেছন থেকেই সুপ্রভাত জানাল।

অতএব ভদ্রতার খাতিরে ফিরতে হলো।

মেমসাহেব অহেতুক ফর্মালিটি এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা ঐ যে পাখিগুলো চেঁচা-মেচি করছে, ওগুলোর নাম কী? চৌকিদার বলছিল 'কুলা-খাই।'

আমি হেসে বললাম, কুলা-খাই নয়, কুচিলা-খাই, বাংলায় আমরা বলি ধনেশ পাখি, ইংরিজি নাম দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান হর্ণবিল।'

'The Great Indian Hornbill!'

মেমসাহেব খুলে বলল,
They are a nnisance to this ser-enity-!'

তক্ষুণি বেরুনো হলো না।

ওখানে বসে আর একবার কফি খাওয়া হলো।

সীম্থিয়া জোন্স বলল, আমি এসে পড়াতে নাকি খুব ভাল হলো। এক ধরনের বিশেষ লতা সম্বন্ধে গবেষণা করছে ও।

আমি শিকারে প্রায়ই এখানে আসি শুনে ও বললে, তাহলে তো খুব ভালই হলো। আপনার এখানের জংগল পাহাড় সব চেনা আছে। তাছাড়া কালতো আমি বিকেলে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছি। শিকার তো প্রায়ই করেন, এবার একটু অবলার সহায় হোন। নইলে,

আমার শূন্য হাতে ফিরতে হবে। লতা সংগ্রহ হোক আর না হোক ভয়মুক্ত হয়ে জংগলে-পাহাড়ে বেরিয়ে বেড়ানোটাও তো একটা আনন্দের মতো আনন্দ।'

আমি বললাম, তথাস্তু। তবে একটু-আধটু শিকার তো করতেই হবে—পটহাণ্টিং নইলে খাবেন কি?

সীন্থিয়া বলল, 'কেন? টিনের খাবার সব সংগে আছে।'

আমি বললাম, 'টিনের খাবারে আমার অরুচি। এখন উঠি, গোটা দুই মুরগী মেরে আনি।'

কিন্তু তক্ষুণি ওঠা হলো না। সীন্থিয়া উঠতে দিল না—বলল, 'বসুন না একটু—এমন সুন্দর সকাল, গল্প করা যাক।'

সীন্থিয়া অনেক কথা জিজ্ঞেস করল. আমার নাম কী, কী পেশা, শিকার করতে ভালবাসি. কেন, আর কোনো নেশা আছে কিনা. কী কী জানোয়ার মেরেছি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচুর ছেলেমানুষী প্রশ্ন।

অন্য জায়গা এবং অন্য লোক হলে হয়তো সব কথার উত্তর দিতাম না—কিন্তু লোকে যখন আমার মতো ছুটি কাটাতেই আসে, তখন একটা অকেজো ছেলেমানুষীর রেশ মাখানো থাকে সেই সমস্ত ছুটিটাতে। বরঞ্চ এখন বুড়ো-মানুষী করতেই মন চায় না।

শেষকালে আড্ডার মায়া কাটিয়ে উঠলাম। বন্দুকটা নিয়ে বাংলোর হাতা পেরিয়ে পাহাড়ের নিচের সুঁড়ি পথে হারিয়ে গেলাম।

আসবার সময় সীন্থিয়া বলল, 'তাহলে মারবেনই মুরগী ছাড়বেন না?'

আমি বললাম, 'আগে মারিই।'

ও বলল, 'তবে মারুন, রান্না কিন্তু আমি করব।

ভাবলাম, আরে এ যে গৌরীপুরী বৌদি আমার। কোথায় কোন থালায় কার হাতে যে ভাত বাড়া থাকে তা কি কেউ জানতে পারে?

পরদিন বিকেলে চা খাওয়ার পর সীন্থিয়াকে বললাম 'চলুন মাছ ধরে আসি।'

'কোত্থেকে?'

কেন? ভবাণ্ডির পথে যে জলপ্রপাতটা আছে, সেখান থেকে।'

'আছে বুঝি জলপ্রপাত?'

নেই নাকি। দেখেননি এখনো?'

না তো।

চলুন নিয়ে যাচ্ছি। বাংলো থেকে বড় জোর দু-ফার্লং হবে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম লালমাটির রাস্তার উপরের সেই জল-প্রপাতে। বেশ উঁচু থেকে জল পড়ছে, ঝরঝরিয়ে। নিচে বেশ গভীর জল। একটা পুকুরের মতো হয়েছে সেখানে। সেখান থেকে জল তিনটি ধারায় বিভক্ত হয়ে চলে গেছে জংগলের গভীরে। জলটা উপর থেকে যেখানে পড়ছে, সেখানে হাজার হাজার শ্বেত সাপের মতো ফেনা কিলবিল করছে। আর বড় বড় মহাশোল মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে জলের স্বচ্ছ ধারায়।

সীন্থিয়া তো দেখে অবাক। বাংলোর এত কাছে এমন সুন্দর জায়গা অথচ আগে আসেনি।

আমি বললাম একা একা বেশি না আসাই ভাল। বলে ওকে সংগে করে, যেখানে ঝর্ণাটা বিভিন্ন ধারায় ভাগ হয়ে গড়িয়ে গেছে উপত্যকায়, সেখানে নিয়ে গিয়ে জলের ধারে শম্বরের পায়ের দাগের সংগে বাঘের পায়ের দাগও দেখালাম। সীন্থিয়া একটুও ভয় না পেয়ে বলল আমাকে একদিন বাঘ দেখাবেন?

হেসে বললাম, বাঘ দেখাবো কি না হলপ করে বলতে পারি না, তবে দেখতে চাইলে বাইসন-চরুয়া মাঠে নিয়ে গিয়ে বাইসন দেখাতে পারি।

বাচ্চা মেয়ের মতো ভুরু নাচিয়ে বলল, তবে তো আরো ভাল হয়।

আমি বললাম, বেশ তো দেখাবো বাইসন—পুরো দলটা—নিশ্চয় দেখাবো।

একটা বড় পাথরের উপর বসে আমরা ছিপ ফেলছিলাম। হাত ছিপ। তবে সুতো মজবুত। আস্তে আস্তে বেলা পড়ে আসছিল। শীতের বনে, জংগল-পাহাড়ে, আসন্ন সন্ধ্যার কী যে সে এক করুণ রাগিণী বাজতে থাকে তা কী বলব। ঘরের মানুষকে সে-সুর করে ডাকে প্রিয়জনকে সে সুর কাছে টানে, আর আমার মতো খোদার খাঁড়কে আরো বাউণ্ডুলে করে তোলে।

জলপ্রপাতের উপরের পাথরগুলো শুয়ে শুয়ে আদিবাসী ছেলের বুকের চেটোর মতো বুক চিতিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কখন সন্ধ্যাতারা উঠবে সেই ক্ষণ গুণছে। সেখানে থেকে একটি ময়ূর বার বার ডেকে উঠছে কেঁয়া, কেঁয়া। একটা কোটরা হরিণও জলপ্রপাতের ডানদিক থেকে ডাকছে, বব্বাক্, বব্বাক্ বব্বাক্। রাইফেলটাকে হাতের কাছে টেনে রাখলাম।

এই টানছে, টানছে, ফাৎনা ডুবলো—চেঁচিয়ে উঠল সীন্থিয়া।

আমি বললাম, টানো টানো—এক হ্যাঁচকা টান মারল সীন্থিয়া। মাছটা শেষ সূর্যের আলো আর জলপ্রপাতের জলের ছটায় মুক্তির জন্যে শেষবারের মতো ঝিকমিক করে উঠলো। তারপর সংগের বেতের ঝুড়িতে তাকে পুরে ফেলা হলো।

সীন্থিয়া আনন্দে লাফাচ্ছিল। একটা আকাশী নীল-রঙ্গা স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী হাতওয়ালা উলের সোয়েটার পরেছে ও। ওর নবম, স্বপ্নিল সোনালী চলে জলের গুঁড়ি হাওয়ায় এসে জমছে—তার উপর ক্লান্ত পৌষের বিষণ্ণ রোদের চুমু লেগেছে—মনে হচ্ছে সীন্থিয়া জোন্স নয়, যেন এক প্রাচীনা আরণ্যকন্যা তার উষ্ণতা কোমল গীরাঙ্গিতে এই জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেন জানি না আমার ওকে ভীষণ পেতে ইচ্ছে করল। ওর মতো সুগন্ধী, সুহাসিনী স্বচ্ছতোয়া নারী আমার জীবনে এলে ভাবলাম; হয়তো আমার ঐ রুক্ষ পৌরুষের দুর্গন্ধময় জ্বালা আর থাকবে না।

এই ভাবনাটা মনে ব্যাপ্ত হতে না হতে কোথা থেকে এক ঝাঁক ছাতার পাখি ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ করতে করতে কোণাকুণি মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল।

আমার ছিপেও একটা মাছ উঠল। বেশ বড় মাছ।

এদিকে সন্ধ্যা এসে জলপ্রপাতের মাথায় তার কালো চুল মেলে দাঁড়িয়েছে দেখলাম। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সন্ধ্যা তারাটি পিদিম হাতে পথ দেখাতে এলো।

আমি আর সীন্থিয়া বাংলোর দিকে চললাম।

চলতে চলতে সীন্থিয়া বলল, গোটা মাছ চল আমরা এখানে সাঁতার কাটব। আপত্তি আছে তোমার?

আমি বললাম—আপত্তি কিছু নেই। তবে সাঁতার কাটার চেয়ে শুধু স্নান করাটাই ভাল হবে। ওখানের পাথরগুলো ভারী অসমান আর জলের তলায় কোথায় যে উঁচু আর কোথায় নিচু তাতো তুমি দেখতে পাবে না। গতবার আমার এক পাইলট বন্ধু এইখানে এসে সাঁতার কাটতে গিয়ে কলারবোন ভেঙ্গে ফিরেছিল। বেচারার ক্যারিয়ারটাই খতম হয়েছিল একটু হলে।

সীন্থিয়া ওর ডান হাতের পাতায় আমার বাঁ-হাতের পাতাটি নিয়ে বলল—আমাকে ভয় দেখিও না—তা ছাড়া তুমি তো আছ। তুমি থাকতে আমার ভয় কী?'

এমনভাবে সীন্থিয়া কথাটা বলল—যেন আমার উপর ভরসা করেই এই অবলা নারী এইরকম জায়গায় লতা খুঁজতে এসেছিল। তবু যাকে ভাল লাগে যার সংগ ভাল লাগে যার হাতে হাত ছোঁয়ালে শিশু বয়সে মার স্তনে হাত ছোঁয়ানোর মতো আশ্বস্ত মনে হয় সে যদি এমন করে বলে যে আমি আছি জেনে সে নিশ্চিন্ত তবে তার চেয়ে বড় কিছু প্রাপ্তি আছে বলে তো আমি জানি না। যাকে ভাল লাগে কিংবা যাকে ভালবাসি তার সবটুকু বিশ্বাস যদি আমার উপর ন্যস্ত হয় তাহলে আমি তার জন্যে কি না করতে পারি। হয়তো প্রাণও দিতে পারি। তাছাড়া একটা প্রাণের জন্ম তো একটা জৈব দুর্ঘটনা বৈ নয় কিন্তু ভালবাসা তো দুর্ঘটনা নয় সে যে এক স্বেচ্ছাবোপিত বৃথার ফুল। যার অবয়ব নেই। তবু নড়লে-চড়লে সে ঝুমঝুমিয়ে বাজে।

সীন্থিয়াকে দেখে যে আমার ভারতীয় বলে মনে হয়েছিল তার কারণ ছিল। ওর মা ভারতীয়। বাবা ইতালীয়। পরে অবশ্য বিচ্ছেদ হয়েছিল দুজনের তার বেশী কথা ওর সম্বন্ধে জানতে পারিনি এবং জানতে

চাইওনি। তাছাড়া ও নিজের থেকে খুশি-মনে নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিল তাই শুনেছিলাম।

গতকাল সকালে ওর সঙ্গে পাহাড়ে গেছিলাম। এই পাহাড় জংগলে একা-একা ঘোরা ওর পক্ষে সত্যিই সম্ভব হতো না। হাতি প্রচুর আছে তাছাড়া বাইসন এবং ভাল্লুকও আছে। এদের থেকেই অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী। কালকে তো প্রায় আমাদের গায়ের উপর দিয়ে একটা ভাল্লুকের বাচ্চা ডিগবাজী খেয়ে চলে গেছিল। সীন্থিয়া খিলখিলিয়ে হেসে বলল—'দেখো দেখো একটা ভাল্লুক-খাই।

আমি ওর কথার ধরন দেখে হাসি চাপতে পারলাম না। কুচিলা-খাই নাম দেখে সব জানোয়ারের পেছনেই ও খাই বলতে শুরু করেছে।

জংগলে পাহাড়ে চৈতন্য হবার পর থেকেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। অনেক গাছ দেখছি অনেক লতা দেখছি অথচ তাদের সকলের বৈজ্ঞানিক নাম কখনো জানিনি। তাদের স্থানীয় নাম জেনেছি; তাদের ভালবেসেছি এই পর্যন্ত। এই যে জংগলে এতো আসন শাল পিয়াশাল সেগুন কুচিলা মহুয়া এবং নানারকম বাঁশে ভরা।

একরকম মোটা-সোটা গাট্টাগোট্টা বাঁশ দেখিয়ে সীন্থিয়া বলেছিল 'এদের নাম কি জানো? Bamboosa Robusta আর ঐটা কি বলতো? Bamboosa Aidensia যখনি ফুল ধরতে শুরু করবে, তখনি এদের মরবার পালা শুরু হবে।'

আমি বললাম বাঃ চমৎকার নিয়ম তো। মানুষদের জীবনেও এরকম হওয়া উচিত। ফুল ধরবার পরে বেঁচে থাকবার কি মানে হয় জানি না। মৃত্যু সার্থকতার অনুগামী হওয়াই উচিত। সার্থকতার পর বাঁচবার মতো কোনো যথেষ্ট অনুপ্রেরণা আমাদের নেই। সার্থক হবার চেষ্টাই তো জীবন। তুমি কি বল?'

সীন্থিয়া নীল-রঙা এক গুচ্ছ ফুল হাতে দোলাতে-দোলাতে বলল 'মানুষ যদি সার্থকতার অগ্রগামী হয় তাহলে?

আমি কিছু বলি না। আমি শুধু শুনি।

গাছ-পালার মসৃণ গা বেয়ে উদার সূর্যের সহস্র সোনালী আঙুল সমস্ত বনভূমির শরীরে আদর ছোঁওয়াচ্ছিল। আমরা হাঁটছিলাম। শিশিরভেজা ঘাস লতা-পাতা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোচ্ছিল। তার সঙ্গে কত শত নাম-না-জানা ফুলের গন্ধ মিশে মন্থর শীতার্ত হাওয়ায় রোদের আঙুলে কাঁপছিল। নানারকম হিবিস্‌কাসের মুখে সকালের মুখের ছবি দেখছিলাম। সীন্থিয়া আপনমনে এক-একটা বিরাট উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নাম বলছিল প্রায় স্বগতোক্তির মতো তার সেই নামের বহর শুনে সে লম্বা চওড়া ছোটখেলা থেকে দেখছি তাদের খুব হঠাৎ ভারী বলে মনে হচ্ছিল।

আমি বললাম 'Emerson -এর সেই কবিতাটা পড়েছ?'

'কোন্ কবিতা?' সীন্থিয়া বলল।

যতটুকু মনে ছিল আমি তাই আবৃত্তি করলাম—

"But these young scholars, who invade our hills Bold as the engineer who fells the wood, Love not the flower they pluck and know it not, And all their Botany Is latind names..."

সীন্থিয়া বলল, 'Superb! Superb! আচ্ছা গোটাকু তুমি এই জংগল-পাহাড়কে খুব ভালবাস, না? দি তোমার মতো করে ভালবাসতে পারতাম।'

আমি বললাম, তোমার ভালবাসা জংগল পাহাড়ের মতো নির্জীব বস্তুতে অপচয় করবে কেন? ভাল যদি বাসতে চাও তো তোমার কি পাত্রের অভাব?

সীন্থিয়া কথাগুলো শুনে কি ভাবলো কে জানে, একটু গম্ভীর হয়ে গেল এবং কেমন ব্যথিত ও চকিত হলো। আমার দিকে ওর নিভৃত চোখ দুটি চাইল।

আমার সীন্থিয়া মেয়েমানুষকে কবিতা ভাল লাগছিল। জীবনে যা যা আমি করবার স্বপ্ন করে এসেছি সবের যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালিয়েছি সেই নড়ি-বাঁধার মতো লম্বাকার ও স্থাবর মনোবৃত্তিটা অন্যায় মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। মনে মনে তাকে অনেকবার বন্দুক উঁচালাম কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পেলে না।

রাত আটটা হবে। বারান্দায় বসেছিলাম। বাংলোর সামনে কিছুই চোখে পড়ে না। জমাটবাঁধা কালো অন্ধকার চোখের সামনে জমাটবাঁধা ভাবনার মতো ভারী হয়ে আছে। পাহাড়টাই বেশী ভারী না অন্ধকারটাই বেশী ঠাহর করতে পারছি না। পাহাড়ে নিচের সেগুন গাছের জংগলে জোনাকী

প্রোটিনে ভরপুর দুধেভরা সয়াবীন নিন

পন্থনগরের দুধেভরা সয়াবীন পৃথিবীর এক আশ্চর্য বলকারক খাদ্যশস্য। এতে খাঁটি দুধের চেয়ে ১০ গুণের বেশী প্রোটিন আছে। সকলের পক্ষে এটা বিশেষভাবে জানা দরকার।

ডায়েবিটিস রোগীদের একান্ত নির্ভরযোগ্য পথ্য শিশু, বৃদ্ধ, সুস্থ ও রোগী সকলেরই পরম উপকারী। অতি সহজে দুধ, দই, ছানা, সন্দেশ, রসগোল্লা ইত্যাদি মিষ্টান্ন তৈরী করা যায়। এ ছাড়া চানাচুর, ঘুগনী, চপ, ফ্রাই, পকৌড়ি প্রভৃতি মুখরোচক খাবারও করা চলে।

মনে রাখবেন, পন্থনগরের এক কেজি দুধেভরা সয়াবীনে ছয় কেজি খাঁটি দুধ অথবা পরিমাণ মত উৎকৃষ্ট দই কিংবা ছানা তৈরী হয়। প্রোটিন জাতীয় যে কোন ফুড-এর চেয়ে দামও খুব কম। দুধেভরা এ রকম সয়াবীন বাজারে আর কোথাও নেই। প্রস্তুত প্রণালীসহ ৫০০ গ্রাম প্যাকেটে পাবেন। ডাক্তারখানা, ষ্টেশনারী, মুদিখানা প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীদের স্টকিস্ট করা হয়। ভেন্ডারগণ খোঁজ নিন। সস্তার প্রলোভনে নিম্নমানের সয়াবীন কিনে ঠকবেন না।

ডিসট্রিবিউটরস্ (সারা পশ্চিম বাংলা)

পশুপতি দাস এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

কৃষি বিভাগ

৩৭এ, ৪৩/২, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৪

টেলিফোন-২৪-৪৩৮১,৮২ টেলিগ্রাম-রাইসকিং

অফিস খোলা ঃ প্রত্যহ সকাল ১০টা হতে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ শনিবার বেলা ২-৩০ মিঃ পর্যন্ত। রবিবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

ঝাঁক জ্বলছে আর নিবছে। অমাবস্যার রাতের ঢেউয়ের বুকের ফসফরাসের মতো। এই ঘনান্ধকার ভবগর্ভ রাতের একটা সুপুরুষ ব্যক্তিত্ব আছে। এই অন্ধকার রাতে বন-পাহাড় যেমনভাবে অদৃশ্য ও অসাধারণভাবে ব্যক্ত হয় তেমন আর কোনো সময়ে নয়। প্রকৃতি বুকের কোরকে যে শক্তিমান পুরুষ বাস করেন সেই পুরুষ এই অন্ধকারে প্রতীয়মান হন। যাদের চোখ আছে তারাই তাঁকে দেখতে পায়।

বাংলোর পেছনের সারি-সারি আপলনা-দেওয়া ছোট-ছোট মেটে ঘর। ছোট উঠোন পাতকুয়ো দু-একটি শান্ত বিজ্ঞ গরু, গুটিকয় চঞ্চল পোষা মুরগী এবং অনেক নগ্ন অসুস্থ অথচ সদাহাস্যময় শিশু। এই নিয়ে টুলকা গ্রাম। এখন রাত নেমেছে। কালো কাপড়ের তুলির আঁচড়ে সব মুছে গেছে। নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। গ্রামের পেছনের ধানক্ষেতে হাতি নেমেছে। মাচায় বসে ক্যানেস্তারা বাজাচ্ছে ছেলেরা শীতের রাতে পায়ের নিচে সবার কাঠের আগুন নিয়ে। শালকাঠের মশাল করে তাতে আগুন জেবলে আন্দোলিত করছে। হাতির দল বৃংহন করতে-করতে আবার পাহাড়ে ফিরে যাচ্ছে।

সৌম্যিরা চৌকিদারের হাতে বাসনপত্র দিয়ে বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দায় এসে উঠল। বলল শীগ্‌গিরী শীগ্‌গিরী এসো সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

নড়বড়ে কাঠের টেবলে খাবার সাজিয়ে কম্পমান লণ্ঠনের আলোয় আমার উল্টো-দিকের চেয়ারে বসে আমার জঙ্গলের প্রেমিকা বলল 'খাও গোটাম শুরু করো।'

মুসুরীর ডালের সুপ ফ্রায়েড রাইস এবং মুরগীর রোস্ট। এ-জঙ্গলে রোজ রোজ এমন খাবার খাব আর শুধু তাই নয় এমনভাবে খাব কে ভেবেছিল? খেতে খেতে আমি বললাম তুমি আমার অভ্যেস খারাপ করে দিচ্ছ। আর চারদিন পরে যে চলে যাবে তখন কী খাবো?'

'সৌম্যিরা বলল কেন? এবেলা খিচুড়ি ওবেলা খিচুড়ি তাছাড়া তোমার ঘোড়ামার্কা বাম তো আছেই। তোমার মতো লোক মানুষ না হয়ে ঘোড়া হয়ে জন্মালেই পারত।' বলে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল। তারপরই গম্ভীর এবং নিচু গলায় আমাকে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল তুমি খুব মজার ছেলে। তোমার মধ্যে খুব প্রাণ আছে। যে মেয়ে তোমাকে বিয়ে করবে সে খুব সুখী হবে।'

মুরগীর ঠ্যাং চিবোতে-চিবোতে বললাম দেখো এই জ্ঞানের কথা লোকালয়ে ছেড়ে থাকি। জঙ্গলেও যদি জ্ঞান দাও, তো পালাবার জায়গা দেখি না।

সৌম্যিরা বলল, 'আমি ঠাট্টা করছি না যা বলছি সত্যি কি না দেখো।'

ভাবলাম এও তো আর এক জ্বালা। থাক মনে মনে ভাল লাগতে আরম্ভ করেছে তাকে প্রেয়সী বলে ভেবে আকাশকুসুম কল্পনা করছি সে হঠাৎ পিসীমা বনে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল। পড়াশুনাটা করলে কী করে কথা গুছিয়ে বলতে হয় তা লিখতে পারতাম। একে তো কাউকে আমার আদপে কিছু বলারই থাকে না যদি বা বলার মতো কোনো কথা জমে তাও মনে-মনে হাঁড়ির মধ্যে খিচুড়ির মতোটগবগ করে। তা বলা হয় না।

আমি কিছু বললাম না। উত্তরে চুপ করেই রইলাম। কারণ আমি জানতাম, বলার সময় এখনো আসেনি। জীবনে একটা ভীষন রকম প্রয়োজনীয় কথা বলবার জন্যে একটু মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন অন্ততঃ আমার পক্ষে।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছিলাম। সৌম্যিরা চামচে করে একটু একটু ফ্রায়েড রাইস আলতো করে মুখে তুলছিলো তারপর নিঃশব্দে চিবোচ্ছিল। ওর হাঁটার কথা বলায় চোখের চাউনিতে এমনকি খাওয়াতেও এমন একটা শান্ত শ্রী, এমন একটা সহজিয়া রেশ আছে যে ওকে দেখে আমার মনে হতো ওর জীবনে বোধহয় কোনোদিন ওকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে হয়নি। নিজে যা ভাল বলে মনে করেছে সেই শুভবুদ্ধি থেকে নড়তে হয়নি, তাই ও পাহাড় থেকে প্রথম-বেরুনো ঝর্ণার মতো পবিত্র ও স্বচ্ছতোয়া। কোনো বাঁধ বাঁধা হয়নি এ পর্যন্ত ওর ইচ্ছা বা রুচির বিরুদ্ধে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত ও যখন হাসত। প্রথমে চোখের তারার একটু বিদ্যুতের ছটা দেখা যেত তারপর সেই ছটা ছড়িয়ে যেত সমস্ত মুখময় পাতলা দুটি জিনিয়া ফুলের পাপড়ির মতো ঠোঁটে দুসারি সুচারু দাঁতে সুকুমারী চিবুকে।

আমি ভাবতাম এমন করেও কি কেউ হাসতে পারে—কিংবা কোনো মেয়ের হাসি এমনভাবে কোনোদিন দেখিনি বা দেখবার চেষ্টাও করিনি কোনোদিন হয়তো বা।

সৌম্যিরা যতক্ষণ আমার কাছে থাকত ততক্ষণ আমার সমস্ত সত্তা ঘিরে একটি সুগন্ধ উঠত অনুক্ষণ। ওর সান্নিধ্যে কোনো জ্বালা ছিল না কোনো কামনার ধামালো ছুরি আমাকে ফালা-ফালা করত না। ওর সান্নিধ্য আমার অনেক নৈরাশ্যের অতল গহ্বর আলোকিত করে রাখত আমার অনেক ভাল লাগাকে মৌসুমী ফুলের মতো সমস্ত সত্তা জুড়ে ফুটিয়ে তুলত। মনে মনে আমি নিজে যা নই তাই মনে হতো। মনে হতো আমিও ওর মতো শুচি পবিত্র ওর মতো সরল।' মাঝে মাঝে এমন হতো যে আমার ওকে নিয়ে নীড় বাঁধবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে এমন ধারণাও আমার মনের মধ্যে শিকড় গাড়বার চেষ্টা করত। তখন সত্যিকারের ভালবাসার সন্তান যে বিনয় সেই বিনয় এসে আমাকে তুড়ে বলত 'তুই একটা অপদার্থ।' অমনি 'মুই অতি ছার' ভাব নিয়ে নিজের নৈরাশ্যের খনির ভেজা-সিঁড়ি বেয়ে অন্ধকারে অনিশ্চয়তায় আবার নেমে যেতাম।

আর মাই হোক বোকা আমি কোনোদিনই ছিলাম না। আমি জানতাম, আমি বুঝতে পারতাম যে সৌম্যিরা যে-কোনো কারণেই হোক আমাকে পছন্দ করে। মানে নিছক পছন্দ করার জন্য নয়। আমাকে ওর বিশেষ একভাবে ভাল লাগে।

আমি বুঝতে পারতাম।

ওর চাউনি ওর কথার সুর আমার সামান্য সুখের জন্য ওর উৎকণ্ঠা এসবই বুঝতে পারতাম। বুঝতে পারতাম আর অবাক হয়ে যেতাম যে এই ছাত্রীটির পড়াশুনার চেয়ে আমার প্রতি আগ্রহ বেশী বলে। ওর মধ্যে কোনো সস্তা জিনিষ ছিল না, কোনো ন্যাকা-পনা ছিল না। আমার এই উদ্দাম জংলীপনা

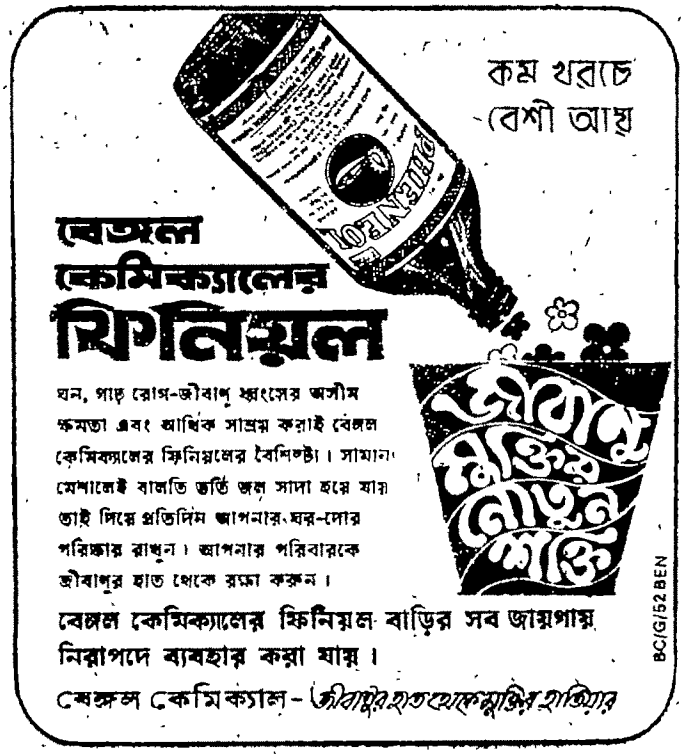

ওকে আকৃষ্ট করেছিল। ওর দুচোখে আমি আমার এই আলো-হাওয়া-বন-পাহাড়ের জীবনকে শুষে নেওয়ার আকুতি দেখতে পেতাম। ভারী ভাল লাগত। এত ভাল আমার কোনোদিন লাগেনি।

খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আর একটু গল্প করা হলো।

সীন্থিয়া বলল 'তুমি রোজ আমাকে ঠকাচ্ছ। কাল আমাকে চান করাতে নিয়ে যেতেই হবে সেই জলপ্রপাতে।'

আমি বললাম 'হবেখন রাত তো পোয়াক।'

তারপর যে যার ঘরে শুতে গেলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, সীন্থিয়া প্রায়ই আমাকে বলে You are a darling, you are so sweet, ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ এমন করে বলে যেন পাশের বাড়ির মহিলা তার পাশের বাড়ির মহিলার ছেলেকে বলছেন।

ওকে আমি বুঝতে পারি না। ওকে আমার ভীষন ভাল লাগে। বলতে গেলে পাগলের মতো ভাল লাগে। ওরও যে আমাকে ভাল লাগে তা বুঝতে পারি, অথচ কথা-বার্তায় এমন একটা সম্মানজনক ও সম্ভ্রান্ত দূরত্ব ও বজায় রাখতে চায় যে আমার ভালো লাগে না। ও বোধহয় ভয় পায়; পাছে এই জঙ্গল-পহাড়ে দুরন্ত বেপরোয়া ছেলে এমন কিছু আবদার করে বসে, যা ওর দেবার সাধ্য নেই। জানি না; কিছুই জানি না।

কুচিলা-খাঁই-এর ডাকের জন্যে কোনোদিন ভালো করে ঘুমুনোর জোটি নেই। রোজ সকালে শুধু সকালে কেন? সমস্ত সময়ই তো হ'ক হ'ক হ'ক হ্যাক হ্যাক করছে।

ঘুম থেকে উঠতেই সীন্থিয়া বাইরে থেকে আমায় ডেকে বলল গোটাম

You better shoot a couple of these noise filthy birds. They are telling on my nerves.

চৌপায়াতে বসে বসেই বললাম 'কেন? তোমার কি বাত হয়েছে নাকি?

সীন্থিয়া রেগে বলল 'না না সত্যি বলছি এই পাখিগুলোকে আমি আসা অবধি সহ্য করতে পারছি না।'

প্রাতঃরাশ খেয়ে সীন্থিয়ার সাদা স্ট্যান্ডার্ড-হেরোল্ডে চেপে আমরা ঝর্ণাটায় গিয়ে পৌঁছলাম।

তখনো জল বেশ ঠান্ডা। আমি বললাম 'আর একটু পরে নেমো অসুখ করে যাবে।'

সীন্থিয়া বলল বেশ তবে আগে চল জলপ্রপাতের মাথায় যে সুন্দর জায়গাটা দেখা যাচ্ছে সেখানে উঠি। জলটা কোথা থেকে আসছে দেখবে।

আমি বললাম 'চল ঝোঁক যখন হয়েছে তখন তো আর বাধা শুনবে না।'

জলপ্রপাতটা বেশ উঁচু মাথা থেকে নিচের পুকুর প্রায় একশো ফিট হবে। তবে সেখানে তিন-চারটে প্রপাত। কম-বেশী পনেরো-কুড়ি ফিট উঁচু একের মাথায় এক। পাকদন্ডী ঘুরে উপরে উঠতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। আমিও কোনোদিন উপরে উঠিনি। গভীর জঙ্গল আর লতাগুল্মের আড়াল থেকে চওড়া পাথরের খয়েরী আর কালো চাতাল বেয়ে জলধারা কুলকুল করে বেয়ে আসছে এসে শীতের সকালে ক্রীড়াচ্ছলে রামধনু চুল উড়িয়ে ঝাঁপ দিচ্ছে নিচে। উপরে দুধারে লতাপাতা ঝুঁকে পড়েছে। দুধারেই চমৎকার ছায়াশতীল। রোদে পাথর যতটুকু গরম হয়েছে তাতে তার উপর শুয়ে থাকতে ভারী আরাম। জলধারার দুধারে থোকা থোকা কী একটা জংলী লতায় ফিকে নীল ফুটে আছে। পাথরের কালোতে খয়েরীতে জলের ফেনিল সাদাতে আর নীল লতার নীলে এমন একটা অপার্থিব ছবি হয়েছে সে কি বলব। সীন্থিয়া লতাগুল্মের কাছে গেল তারপর বলল এগুলোর নাম কী জানো? প্যাশানফ্লাওয়ার। এগুলো জংলী লতা মোটেই নয়। নিশ্চয়ই কোনো সৌখীন লোক এখানে কোনোদিন লাগিয়ে গেছিল।

সেই জলধারা ধরে সামান্য এগোলেও বেশ গভীর দু তিনটি জায়গা আছে। সেখানে জল এক কোমর থেকে বুক অবধি। সবচেয়ে মজা হচ্ছে এখানে জল একেবারে স্ফটিক স্বচ্ছ। মন হারালে মন কুড়িয়ে নেওয়া যায়।

সীন্থিয়া ফ্লাস্কে করে কফি বানিয়ে এনেছিল। আমি বললাম, তুমি চান করো আমি কফি খাই।'

ও বলল 'তুমি চান করবে নাকি?'

আমি বললাম 'করব, জল একটু গরম হোক।'

হালকা গোলাপী রংয়ের একটা সাঁতারের পোশাক পরেছিল সীন্থিয়া। ঝকঝকে জলের মধ্যে একটা গোলাপী হাঁসের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। বাদামীতে শ্বেতাভে মেশানো ওর আশ্রয়াকুল হাত দুখানি জলের মধ্যে ফোয়ারা ওঠাচ্ছিল। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে বলছিল সব কফি খেও না কিন্তু?

আমি কফিতে চুমুক দিচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম এ কদিন শিকারে আমি প্রায় গেলামই না অথচ কী করে যে কটা দিন কেটে গেল টেরই পেলাম না। সীন্থিয়া তো আর দুদিন বাদেই চলে যাবে। তারপর সময়টা সকালবেলার কুয়াশার মতো একেবারে আমার

বাহির হইল ! নতুন বই !

নিজে পড়ুন, বাচ্চাদের পড়ান ও প্রিয়জনদের উপহার দিন। সংগ্রহে রাখার মত একটি ঐতিহাসিক প্রামাণিক দুর্লভ পুস্তক। এতে পাবেন ভারতের তেরটি ঐতিহাসিক বিচার।

চিরঞ্জীব সেনের

স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, গান্ধী হত্যা মামলা আলিপুর বোমা মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভগৎ সিং-এর বিচার, বাহাদুর শাহের বিচার প্রভৃতি তেরটি ঐতিহাসিক বিচার গ্রথিত করে এই বই প্রকাশিত হলো। ১৬৲ টাকা।

এই লেখকের আরেকটি অসাধারণ বই 'স্ক্যাণ্ডাল'

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ১৫বি টেমার লেন, কলিকাতা—৯

উপর চেপে বসবে। তবে বেশ কাটল এ কটা দিন। এত কাছে থেকে অত দূরে কি করে থাকতে হয় সীন্থিয়ার কাছে তা শেখার আছে। হঠাৎ আমাকে চমকে দিয়ে সীন্থিয়া চীৎকার করে উঠল 'হেল্‌প হেল্‌প!'

তাকিয়ে দেখি জলের তোড়ে সীন্থিয়া নিচে প্রপাতের দিকে ভেসে চলেছে, আর প্রাণপণে হাত-পা দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। সেখান থেকে প্রথম প্রপাতটি বড় জোর তিরিশ-চল্লিশ ফিট্ হবে।

কাণ্ডজ্ঞানরহিত হয়ে লাফিয়ে পড়লাম জলে। জল তো সেখানে সামান্য, হাঁটুও নয়; কিন্তু কী পিছল। লাফাবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচণ্ড আছাড় খেলাম। হাঁটুতে এমন একটা চোট লাগল পাথরের উপর পড়ে যে, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে যাবো। অজ্ঞান কেন হলাম না জানি না, কিন্তু সীন্থিয়া বেঁচে গেল, আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময়ে ওর হাত আমার হাতে লাগল, এবং আমি প্রায় শোওয়া অবস্থাতেই হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা বড় পাথরে দু'পাশে ভর রেখে ওকে আমার কাছে টেনে আনলাম। ভয়ে বেচারীর মুখ চোখ শুকিয়ে গেলেও, ওর ঠোঁটে সেই আশ্চর্য হাসিটি লেগে ছিল। কিছুটা অভাবনীয়তায়, কিছুটা প্রাণ-প্রাপ্তির আনন্দে ও অস্ফুটে কী যেন বলে উঠল, বুঝতে পারলাম না।

সীন্থিয়াকে বাঁচাতে পেরে যে আনন্দ না হলো তা নয়, কিন্তু হাঁটুটাকে বোধহয় আর কোনোদিন সোজা করতে পারব না।

আমরা দুজনে কোনোরকমে গড়িয়ে গড়িয়ে কিনারে এসে পৌঁছলাম, তারপর সীন্থিয়া নিজে প্রথমে উঠে, আমাকে উঠতে সাহায্য করল। কোনোরকমে পাথরে পৌঁছে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। হাঁটুটার মাংস একেবারে থেতলে গেছিল। তার ওপর রক্ত চোঁয়াতে শুরু করেছিল। সীন্থিয়া কী করবে বুঝতে পারছিল না। প্রথমে হাত দিয়ে রক্তটা মুছবার চেষ্টা করল তারপর হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার কপালে চুমু খেল। তারপর অনেকক্ষণ আমার ভিজে বুকে শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ওরকম চাপা মেয়ে যে কী করে এমন বেহিসাবী হলো, ভাবতে পারছিলাম না। আমি কনুইতে ভর দিয়ে উঠে বসার চেষ্টা করে বললাম, 'তুমি কি পাগল হলে বোকা মেয়ে, আমার কিছু হয়নি।'

ডাঃ স্নেহলতা বসু এম.বি.(ক্যাল) ডি.জি.ও.
ডাঃ এস এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও বহুচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মেডেল লাইব্রেরী ৩৫ এ, সুরেন্দ্র স্ট্রীট কলিকাতা-৯
অগ্রিম ৮৲ টাকা পাঠাইলে ডাকমাশুল ফ্রি

সীন্থিয়া তবু শুনলো না। আমার পাশে অসহায়ের মতো বসে, আমার দিকে চেয়ে থাকলো। সোনালী চুলে মোড়া ওর জল-ভেজা শ্বেতা গ্রীবার দিকে তাকিয়ে একটি রাজহাঁসের কথা আমার মনে হলো। যাকে আমি গুলি করেছিলাম, তারপর আমি বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।

ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। সকালের চা খাওয়া হয়ে গেছে। বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছি। হাঁটুতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে। লোকজন জোগাড় করে বাঁশ দিয়ে স্ট্রেচার বানিয়ে সীন্থিয়া ঝর্ণার ওপর থেকে আমাকে কাল নামিয়ে নিয়ে এসেছিল। নিজে গাড়ি চালিয়ে পূর্ণাকোট থেকে ডাক্তার এনেছিল। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে গেছেন আর বলেছেন যে হাড় ভাঙেনি, তবে বিশ্রামের প্রয়োজন।

সমস্ত বন-পাহাড় রোদে ঝলমল করছে। বারান্দার থামগুলোর ছায়ার সঙ্গে রোদটা কাটাকুটি খেলছে। সীন্থিয়া বাংলোর সামনের নুড়ি বিছানো ড্রাইভে পায়চারী করছে। প্রথম যেদিন আমরা ঝর্ণায় যাই মাছ ধরতে, সেদিনকার সেই পোশাকটি পরেছে সীন্থিয়া। ফিকে নীল স্কার্ট আর ফিকে গোলাপী সোয়েটার।

সীন্থিয়াকে দেখছি চুপ করে বসে। যেতে-আসতে চোখাচোখি হতেই ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছে। কী যে ভাবছে ও। বোধহয় কালকের কথা। বোধহয় ভেবে লজ্জা পাচ্ছে। আমিও ভাবছি। ভাবছি ওকে দু-একদিনের মধ্যেই বলব সেই কথাটা—বুলবুলি পাখির সঙ্গে বাসা বাঁধার কথা।

এমন সময় দুটো কুচিলা-খাঁই পাখি পাহাড় থেকে উড়ে এসে চেরী গাছটার ডালে বসে কুৎসিত গলায় ডাকতে লাগল, হ্যাঁক হ্যাঁক হ্যাঁক। সীন্থিয়া যেন ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। পাখি দুটো প্রকাণ্ড ঠোঁট দুটো দিয়ে ডালে ঘষতে লাগল আর বিরাট বিরাট ডানা দুটো ঝাপটাতে লাগল।

সীন্থিয়া দৌড়ে আমার ঘরে ঢুকে শটগানটা নিয়ে এসে বলল, 'মারো তো গোটাম, মারো তো। এগুলো সবসময় আমাকে ভয় দেখায়।'

ইজিচেয়ারে বসে বসেই গুলি করলাম। সঙ্গে সঙ্গে পাখি গাছের ডালেই লটকে রইল, মগডালে। অন্যটা হ্যাঁক হ্যাঁক করতে করতে উড়ে গেল।

কিছুক্ষণ আগে থেকে জংগলের মধ্যে একটা দূরাগত গাড়ির এঞ্জিনের গুন-গুনানি শুনতে পাচ্ছিলাম। এখন গাড়িটা দেখা যাচ্ছে। একটা কালো গাড়ি। কাছে এলো গাড়িটা। পূর্ণাকোটের দিক থেকে আসছে—তারপর বাংলোর হাতায় ঢুকে পড়ল। দেখলাম, একটা কালো রোলসরয়েস গাড়ি—সামনে কোনো দেশীয় রাজ্যের পতাকা উড়ছে পতপতিয়ে।

গাড়িটা এসে বাংলোর সামনে দাঁড়াল। উর্দিপরা সোফার এসে পেছনের দরজা খুলে ধরলো। একজন মোটাসোটা হোয়াইট ভদ্রলোক নামলেন—পরনে দামী সুট মাথায় স্টু হ্যাট—। বয়স কম করে পঞ্চাশ হবে।

হঠাৎ সীন্থিয়ার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

ওর চোখ দেখে মনে হলো, এ ওর চোখ নয়; ছুলোষা শিকারে তাড়া খেয়ে শিকারীর সামনে পড়া কোনো চিতল-হরিণীর চোখ। যার বাঁচা হলো না। হবে না।

লোকটি চিবিয়ে-চিবিয়ে সীন্থিয়াকে বলল,

'What's all these about? why am I paying that old bitch for?'

সীন্থিয়া চোখে আগুন ঝরিয়ে দু'হাত তুলে সমর্পণের ভঙ্গীতে বলল,

'All right! you have your way. Now for God's sake keep your bloody mouth shut.'

আমি কিছু বোঝা বা বলার আগেই, সীন্থিয়া প্রায় আমার হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিল, নিয়ে একবার লোকটার দিকে তুলল তারপর আমার ঘরে রেখে এলো।

রেখে এসে, আমার ইজিচেয়ারের পাশে আমার কাঁধে হাত রেখে, সীন্থিয়া বলল, 'গোটাম আমি যাচ্ছি।'

ওর হাত চেপে ধরে আমি বললাম, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ও বলল, 'আমার অতীতে ফিরে যাচ্ছি। আমি খারাপ, আমি খারাপ, আমি মিথ্যেবাদী, আমি খারাপ।'

ওকে কাছে টেনে আমি বললাম, 'তুমি ভাল, তুমি ভাল, তোমার অতীত নেই—তোমার কেবল ভবিষ্যৎ আছে।'

সীন্থিয়া আমার মুখের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত যেন কী ভাবল—তারপর লোকটার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, এটা আর একটা কুচিলা-খাঁই।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সীন্থিয়া বলল 'চললাম গোটাম—তোমাকে মনে থাকবে। —আমাকে ভুলে যেও।'

বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড়ে গাড়িতে উঠল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, সীন্থিয়া, সীন্থিয়া।'

কিন্তু উত্থান-শক্তি-রহিত আমার চীৎকার ডুবিয়ে দিয়ে মহারাজার গাড়ির আওয়াজ বাংলোর হাতা পেরিয়ে গেল।

পেছনে-পেছনে সোফার সীন্থিয়ার স্টাণ্ডার্ড-হেরাল্ড চালিয়ে নিয়ে গেল।

সেই ভাঙ্গা-সকালের রাঙা-আলোয় আমি একা-একা বসে রইলাম টুলকার বাংলোর বারান্দায়। হাওয়ার দোলায় মরা কুচিলা-খাঁই পাখিটার পালকগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। একবারের জোর হাওয়ায় মরা পাখিটা ধপ করে নিচে পড়ল।

পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার বড় কষ্ট হলো সীন্থিয়ার জন্যে। ওর জীবনমরই কুচিলা-খাঁই, কটা কুচিলা-খাঁই আর ও মারতে পারবে?

কথায় কথায়

চোর

চোরের অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

সেদিন ময়দানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, বেসকোর্সের পাশের রাস্তায় দেখি এক সহিস বিষণ্ণ মুখে গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। দেখেই বোঝা যায়, এর কোনো সর্বনাশ হয়েছে, সদ্য-সদ্যই হয়েছে। আমার কেমন যেন মায়া হলো, সহিস বেচারার পাশে গিয়ে বসলাম। জানতে চাইলাম তার বেদনার কারণ। দুবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে, তিনবার আর্তকণ্ঠে পরমেশ্বরের নাম উচ্চারণ করে বেচারা অবশেষে ভাঙ্গা গলায় সহিসী উর্দুতে যা নিবেদন করলো অনেক কষ্টে, সেটার অর্থ উদ্ধার করে বুঝতে পারলাম, কে বা কারা তার ঘোড়ার লেজের লোম চুরি করে কেটে নিয়েছে।

দৃশ্যের নমুনা দেখে আশঙ্কা হলো হয়তো এর প্রিয় অশ্বটি লেজের লোম কেটে নেওয়ার ফলে প্রাণত্যাগ করেছে। কিন্তু জানা গেলো তা নয়, ঘোড়ার লেজের লোম কেটে ফেললে ঘোড়ার কোনো ক্ষতি হয় না, বরং কেটে ফেলাই ঘোড়াদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

'তা হলে?' আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম।

আমার এই নির্বোধ প্রশ্নে সহিস বেচারা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। প্রত্যেক মাসে ঘোড়ার লেজের লোম বিক্রি করে ওর বিড়ির খরচা চলে যায়। এ মাসে কি হবে? ক্রন্দনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো সে।

আমি বিপদ বুঝে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কিন্তু ঘোড়ার লেজের লোম যে এত দামি জিনিস, এ আমি কখনোই কল্পনা করতে পারিনি। আর তাছাড়া এ জিনিস চুরি যেতে পারে, চুরি করার লোক আছে এই পৃথিবীতে, এ সব কল্পনা করাও কঠিন। এবং ঘোড়ার লেজ থেকে লোম কেটে চুরি করে নেওয়াও কম কঠিন কাজ নয়। ঘোড়ার পিছনের পা দুটো (যা দিয়ে সে প্রাণান্তক চাঁটি মারতে ওস্তাদ) সেই পা দুটি ঐ লেজের ঠিক নিচেই একথা ভুললে চলবে কেন?

এইসব ভাবতে-ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরে দেখি এক বিখ্যাত বিদেশী মাসিক পত্রিকায় এই সংখ্যায় রোম শহরের চোরের গল্প বেরিয়েছে। রোম নগরীর চোরেরা এমন সাংঘাতিক, তারা দ্রুতগামী মোটর সাইকেলে ফুটপাথ ঘেঁষে তীব্র-গতিতে ছুটে যায় আর যাওয়ার সময় অতর্কিতে পথচারীর গায়ের কোট, ওভার-কোট, ভদ্রমহিলাদের ফার কোট, মিঙ্ককোট এইসব একটানে খুলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। ফারকোট, মিঙ্ককোট এগুলি এমনিতেই খুব মূল্যবান, হাজার হাজার টাকা দামের জিনিস। তাছাড়া অপহৃতে কোটের পকেটে আরো কত কি থাকে। মানিব্যাগ থেকে সোনাদানা পর্যন্ত।

সুখের কথা, রোমনগরীর চোরেরা এখন পর্যন্ত কলকাতায় অনুপ্রবেশ করেনি। কিন্তু যে পত্রিকাটায় এই ঘটনাটি পড়লাম, সেটি বাইরের ঘরের টেবিলে রেখে কি একটা দরকারে বাড়ির ভিতরে একটু গিয়েছিলাম। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে দেখি বইটি উধাও। অনেক খুঁজেও কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। নিশ্চয়ই কেউ বাইরের জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে মুহূর্তের মধ্যে পত্রিকাটা তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

এ তো সামান্য চুরি।

আমার এক এখন-আর-তখো-বড়লোক-নন বন্ধু একটি প্রাগৈতিহাসিক মডেলের জার্মান গাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। সেই গাড়ির কোনো পার্টসই আজকের বাজারে পাওয়া যায় না। এক শনিবার তাঁর অফিসের সামনে থেকে সেই গাড়ির একটা ক্ষুদ্র অংশ বেপাত্তা হয়ে গেলো। আমার বন্ধু এই জিনিসটি আর পাওয়া যাবে না জেনেও কি ভেবে মল্লিকবাজারে খুঁজতে গেলেন। যদি লাগসই কিছু পাওয়া যায় এই আশায়। কি আশ্চর্য, প্রথম দোকানেই সাক্ষাৎ মিললো সেই সদ্য হারিয়ে যাওয়া জিনিসটির। এটা যে সেই জিনিস এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই কারণ এই গাড়ি কিংবা তার কোনো ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও কলকাতা শহরে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। পঁচিশ টাকা দিয়ে বন্ধুবর জিনিসটি উদ্ধার করলেন। কিন্তু পরের সপ্তাহে আবার শনি-বার দিন ঐ একই সময়ে একই জিনিস হারালো। এবং মল্লিকবাজারে একই দোকানে পঁচিশ টাকায় আবার সেটা ফেরত পাওয়া গেলো।

এইবার শুরু হলো লুকোচুরি খেলা। প্রতি শনিবার দুপুরে চুরি যেতে লাগলো এবং বিকেলে পঁচিশ টাকা বায়ে উদ্ধার হতে লাগলো জিনিসটি। এই রকম মাস তিনেক চলার পরে শেষে আর সহ্য করতে না পেরে এক শনিবার গাড়ি থেকে নেমে বন্ধুমহোদয় অফিস না গিয়ে সোজা ট্রামে চড়ে মল্লিকবাজারে সেই দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

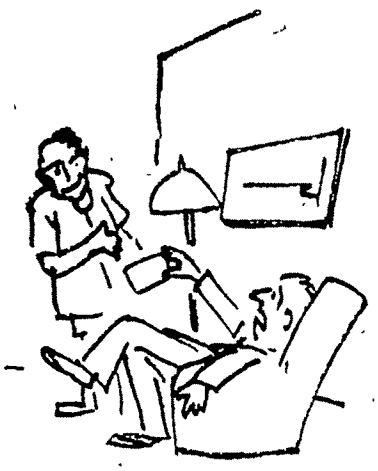

যা অনিবার্য তাই ঘটলো আধঘণ্টার মধ্যে। তাঁর সেই লুকোচুরি খেলার সঙ্গীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো মুখোমুখি। বাজারে ঢুকছে তস্করচন্দ্র, তার হাতে গাড়ির সেই প্রতি শনিবার হারানো অংশটুকু।

এর পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। আজ-কাল আর আমার বন্ধু কিংবা সেই তস্কর কাউকেই কষ্ট করে মল্লিকবাজার পর্যন্ত যেতে হয় না। প্রতি শনিবার অফিসের সময়ে গাড়ি রাখবার জায়গায় তস্করটি অপেক্ষা করে। আমার বন্ধু সরাসরি তার হাতে পঁচিশ টাকা গুঁজে দেন। সে বিনীত নমস্কার করে চলে যায়। আর চুরি হয় না।

ভারাপদ রায়

মনের অসুখ

[ছয়]

সরাসরি মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম : তুমি এরকম করলেতো পাড়ায় তিষ্ঠুতে পারবে না। বাড়ীওয়ালা বড়লোক, পাড়ার লোকেরা তার হাতধরা, তাকে চটিয়ে ও-বাড়ীতে থাকবে কি করে?

—আমি ও বাড়ীতে থাকতে চাই না; ওকেতো রোজ বলছি বাড়ী বদলাও, ও-আমার কথায় কান দিতে চায় না।

—চাইলেই কি আজকাল খুশীমত বাড়ী বদলানো যায়? তপন বলছিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ধার করে পাঁচশো টাকা অগ্রিম দিয়ে অনেক তদ্বিরতদারক করে বাড়ী পেয়েছে, এখনও ছ'মাস হয়নি, বাড়ী যদি ভাগ্যক্রমে কোথাও মিলেও যায়, অগ্রিম টাকাটাইতো জলে যাবে। কিছুদিন অন্তত মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাও।

মেয়েটি ফোঁস করে উঠল : ওরা আমাদের ঘরের দিকে ধোঁয়া পাঠাবে, আমার রান্নাঘরে নোংরা ফেলবে, আমাকে পাগল বলবে আর আমি মুখ বুজে চুপচাপ থেকে যাব? না—সে আমি পারব না, আপনি বললেও না। বড়লোক বলে যা খুশী করবে, যা ইচ্ছে বলবে? আমিও অমনি বাপের জলে ভেসে আসিনি, আমার মামাও একটা কম কেওকেটা নয়! হ্যাঁ—

ওর বামীর দিকে তাকাতেই সে বলল : ওদের রান্নাঘর দোতলায়, আমাদের ফ্ল্যাট একতলায়, ওদের ধোঁয়া আমাদের ঘরে কি করে আসবে বলনতো?

স্ত্রী মানে তপতী উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমার টেবিল থেকে একখানা মোটা বই তুলে উঁচু থেকে টেবিলের ওপর ফেলল টেবিলের আলোটা উল্টে গেল, ছাইদানিটা মেঝেতে ছিটকে পড়ল। তপন—ওর স্বামী দ্রুতপদে এসে ওর হাত চেপে ধরল, ও-বোধহয় আর একখানা বই তুলে নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব প্রমাণের চেষ্টায় ছিল। বাধা পেয়ে তপতী জোর করল না, নির্বিকার সরল মানুষের মত বইখানা যথাস্থানে রেখে নিজের চেয়ারে বসে আলোটা ঠিক করল, নীচু হয়ে মেঝে থেকে ছাইদানিটা তুলে রাখল। ঠান্ডা গলায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে পাখাটা আর একটু জোরে চালিয়ে দিতে বলল। আমার ইঙ্গিতে তপন পাখাটার গতিবেগ নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল।

—আচ্ছা তপতী, তুমি বইখানা অমনি করে তুলে ফেলে দিলে কেন? বইটার ওপর অত রাগ কেন?

—রাগ বই-এর ওপর কেন হতে যাবে? রাগ আমার বাড়ীওয়ালার ওপর। ওরা আমাদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার করে বাড়ী থেকে তুলে দিতে চায়, অগ্রিম টাকাটা মেরে দেবার মতলব। আমিও দেখতে চাই কিভাবে ওরা আমাদের বাড়ীছাড়া করে। ও-বলছিল পাড়ার লোকেরা বাড়ীওয়ালার হাতধরা,—তাই না? একেবারে বাজে কথা। ক্ষুদে, বেন্দা, সান্টু—পাড়ার ডাকসাইটে সব ছেলে কটাকে আমি হাত করেছি। তারা আমাকে এই কালই বলছিল, দাওনা দিদি ফিস্টিব জন্যে ক্লাবকে গোটা কুড়ি টাকা: ঐ ব্যাটাকে গপ্পা পার করে খড়দায় রেখে আসি। আমার স্বামী টাকা খরচ করতে চায় না, হাড়কিপটে। দেখুন না, আমার শাড়ীটার তিন জায়গায় রিপু করতে হয়েছে কিছুতেই শাড়ী কিনে দেবে না। বাচ্চাটার গরম জামা নেই, শীতে কুঁকড়ে থাকে। আমাকে নিয়ে ট্যাকসী করে কোলকাতায় আসতে বললে আঁতকে ওঠে; বলে—যাতায়াতে তিরিশ টাকা লেগে যাবে! খরচ যদি করতে পারবে না, তবে বিয়ে করেছিল কেন? বিয়ের আগে কত কথা, কত আশ্বাস, কত আদর কত ভালবাসা। আর এখন শুধু বকুনি আর গালাগালি; উঠতে বসতে শোনাবে যে আমার চিকিৎসায় ও-একেবারে ফতুর হয়ে গেল। চা ফুরোলে চা কিনবে না, বলবে—আমি একমাসের চা এক সপ্তাহে খরচ করেছি। চিনি ফুরোলে বলবে, আমি সান্টুকে শরবত করে দিয়েছি। তা ঐ ক্ষুদে বেন্দা সান্টুইতো আমার একমাত্র ভরসা এই শত্রুরপুরীতে ওরা ছাড়া আর আমার আপনার বলতে কে আছে বলুন? ওরা আছে বলেই বাড়ীওয়ালার গুন্ডারা আমাকে আর বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারছে না। ওরা যদি চায়, আমি কি না দিয়ে পারি? এক কাপ চা, এক গেলাস শরবৎ খাওয়ালে যদি তুমি ফতুর হয়ে যাও তবে বিয়ের আগে অত লম্বা লম্বা কথা বলেছিলে কেন?

—বিয়ের আগেতো ও জানত না যে তোমাকে বিয়ে করে ওকে বাড়ী ছাড়তে হবে, পরীক্ষা না দিয়ে চাকরীতে ঢুকতে হবে, দেড়খানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকতে হবে। ও ভাবতে পারেনি যে তোমার অসুখ করবে, ওষুধ ডাক্তারে মাসে মাসে অতগুলো করে টাকা বেরিয়ে যাবে—

তপতীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, গলার স্বরে অকৃত্রিম দরদ ফুটে উঠল।।

—ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয় ডাক্তারবাবু। সকাল আটটায় দুধ এনে বাজার করে, শুধু দুটো ভাত আর আলুসেদ্ধ মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে; আর রাত দশটায় বাড়ী ফেরে চাকরী টিউশানী সেরে। খাটতে খাটতে ওর প্রাণ বেরিয়ে গেল। আমাকে বিয়ে না করলে ও রাজার হালে থাকতে পারত।

—এর পর বাড়ী এসে যদি শোনে তোমার সঙ্গে বাড়ীওয়ালার ঝগড়া হয়েছে, তা হলে ওর কষ্ট আরো বেড়ে যায়—তাই নয় কি? যদি শোনে তুমি সারা দুপুর ঐসব বাজে ছেলেদের—

—বাড়ীওয়ালাদের ছেলেটা মিথ্যে করে লাগায়। ক্ষুদে সান্টুরা ভাল ছেলে, ওরা থিয়েটার করে, চাঁদা তুলে বস্তীর গরীবদের সাহায্য করে, আরো অনেক ভাল কাজ করে ওরা ভাল ছেলে।

—তোমার মত অল্পবয়সী মেয়ে রোজ যদি ছেলেছোকরাদের বাড়ী ডেকে এনে চা খাওয়ায়, গল্প করে; তাহলে লোকে সেটা ভাল চোখে দেখে না। আমিতো জানি তপন আমাকে বলেছে ওরা খুব ভাল ছেলে; কিন্তু তোমাদের ছোট শহরে ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা কেউই পছন্দ করে না। পাড়ার লোকেরা নিন্দে করে, তপনকে কথা শোনায়।

—পাড়ার লোকরা আমার দলে, যা কিছু কুচলিকাটবার সে ঐ বাড়িওয়ালার কাটে। যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। ওদের ভয়েইতো আমি ক্ষুদে বেন্দাদের ডেকে আনি। ওরা না থাকলে বাড়িওয়ালা ঠিক আমাদের ঘরে ঢুকে আমাকে অপমান করবে। ও বলে, দরোজা বন্ধ করে ঘুমোবে। আহা, নিজেদের হাতে তৈরী দরোজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকা ভারী যেন একটা শক্ত ব্যাপার! আমার ভয় করে বলেইতো ওদের ডাকি, ওদের ডাকি বলেইতো ওদের চা শরবত খাওয়াতে হয়।

—তপন পুলিশে ডায়েরী করে রেখেছে বাড়ীওয়ালা তোমাকে কিছু বলতে সাহস পাবে না। তুমি ছেলেগুলোকে আর ডেকে এনো না। কেমন?

—আপনি ঐ কোলকাতায় আমাদের একটা ঘর দেখে দিন, তাহলে আর আমার ভয় করবে না! বাধ্য হয়ে আশ্বাস দিতে হল, মেয়েটা কিছুটা আশ্বস্ত হল। কয়েকটা দিন আমার আশ্বাসের ফলেই হোক আর ওষুধের গুণেই হোক তপন-তপতী শান্তিতে দিন কাটাল। আবার দু'সপ্তাহের মধ্যে গোলমাল। স্বামীস্ত্রী

হাজির। একটুকরো কাগজে ঘটনার বিবরণ লিখে তপন আমার হাতে দিল।

কাল অফিস থেকে ফিরে বাড়ির গলিতে ঢুকতেই শোনে যে তপতী তার বাচ্চাটাকে নিয়ে দরোজায় তালা লাগিয়ে কোথায় যেন চলে গেছে। ভাবী বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটেছে দুপুরে। সান্টুর সঙ্গে লুডো খেলছিল তপতী এমনি সময় অন্য ক্লাবের ছেলেরা এসে হল্লা করে; সান্টু পাঁচিল টপকে পালাতে গিয়ে ওদের হাতে ধরা পড়ে বেদম প্রহার খায়। কোনোমতে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজেদের ক্লাবে খবর দিতেই ক্ষুদে বেন্দাব দল অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে. দুই ক্লাবের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে; ওদের বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। পুলিশ ভ্যান আসতে রণে ভঙ্গ দিয়ে যোদ্ধারা অন্তর্ধান করে। এবার শুধু বাড়িওয়ালা নয়, পাড়ার সকলেই প্রায় একবাক্যে রায় দিয়েছেন যে তপনকে দশ দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়তেই হবে; অন্যথায় তাঁরা যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

এদেব বিবাহপূর্ব ইতিহাস একেবারে মামুলি নয়। তপন অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে পাড়ার সরস্বতী পুজো, দুর্গাপুজোর পাণ্ডাগিরি করে, উদ্বৃত্ত চাঁদা দিয়ে গানের জলসা বসায় পাড়ার ক্লাবে, নাটকের রিহার্সাল চালায়। চালাক চতুর ভাল ছেলে বলে পাড়ায় সুনাম ছিল। তপতীরা উদ্বাস্তু। এ-পাড়ায় আসার পর থেকেই তপতীর দিকে পাড়ার তরুণদের নজর পড়ে। ওর চেহারা, চলাফেরা, কথাবার্তার মধ্যে পুরুষকে আকৃষ্ট করবার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকার দরুন শুধু ছেলেমহলে নয়, বুড়োদের মধ্যেও দস্তুরমত আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে তপতী। মফঃস্বলের ছোট শহরে কইয়ে-বলিয়ে মেয়ে খুব বেশি থাকে না। তার ওপর আবার যদি সে সুন্দরী হয় ও নাচতে জানে, তবে তাকে নিয়ে তরুণদের মধ্যে মুখরোচক জল্পনা-কল্পনা চলাই স্বাভাবিক। তপতী শহরের অনেক তরুণের ঘুম নষ্ট করল, অনেকের কবিতার উৎস হয়ে উঠল, অনেকে ওকে ভালবেসে ফেলল। বলা বাহুল্য তপন তাদের মধ্যে একজন। তপতীকে ঘিরে যে-স্তাবকের দল গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে সব দিক থেকেই তপনই শ্রেষ্ঠ। বড়ঘরের ছেলে, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, চেহারাও এমন কিছু খারাপ নয়। বহুমুখী প্রতি-যোগিতায় জয়ী হয়ে বরমাল্য গলায় পরার সম্ভাবনার আনন্দে যখন তপন মশগুল, তখন মায়ের মুখে বাড়ির অভিমত শুনল। চাল নেই, চুলো নেই; উদ্বাস্তু কলোনির অই পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে তার বাবা-কাকারা আদৌ রাজী নন। বিয়ে করলে বাড়ি ছাড়তে হবে। কোলকাতার বন্ধুদের উৎসাহে আর নিঃসন্তান মাসীমার অর্থ-সাহায্য পেয়ে বাড়ীর মতামত অগ্রাহ্য করে বেকার তপন তপতীকে বিয়ে করে বসল। বিয়ের পর বছরখানেক ঐ শহরেরই অন্যপ্রান্তে ঘর ভাড়া করে মাসীমার টাকায় নিজের আংটি ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রী করে বেপরোয়া আনন্দে দিন কাটাল স্বামীস্ত্রী। বন্ধুদের উৎসাহ ও মাসীমার সাহায্যস্রোতে ভাটা পড়তে শুরু করতেই দুজনের মধ্যে গোলযোগের সূত্রপাত। ছেলে পড়িয়ে সামান্য যা পেত তার সঙ্গে মা-মাসীর মাঝে মাঝে দেওয়া অর্থসাহায্য যোগ করেও আধুনিক ফ্ল্যাটের ভাড়া জোগানো সম্ভব হল না। এর মধ্যে একটা ছোট সওদাগরী আপিসে চাকরী মিলেছে, কিন্তু আবার মায়ের মৃত্যুতে ও-দিককার সাহায্য বন্ধ। একটি বাচ্চা হয়েছে তপতীর, সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে। বাবা-কাকার সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। কোনো দিক থেকে সাহায্য আসার সম্ভাবনা নেই। কাজেই ওরা অল্প ভাড়ার বাড়িতে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। তপতী অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছে; দারিদ্র্যকে সে ভয় পায়, ঘৃণা করে। অনেক প্রেমিকের মধ্যে তপনকে বাছাই করে নিয়েছিল তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতার কথা ভেবে। তপতী ভালভাবে বাঁচতে চায়। আগের মত বস্তী বাড়িতে থাকার কথা এখন সে ভাবতেও পারে না। তার মনে হতে লাগল যে তপন তাকে ঠকিয়েছে। আর তপনের প্রেমের নেশা অনেকদিন কেটে গেছে। আশা করেছিল, এম-এতে ভাল করবে, অন্তত বেসরকারী কলেজের মাস্টারী জুটিয়ে পড়াশুনা গবেষণায় মন বসাবে। প্রেমের প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হেরে যেতে সে চায়নি। প্রেমের জন্যে এত বেশি ত্যাগ করতে হবে জানলে সে বোধহয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামত না। আমাকে খোলাখুলি এত কথা সে বলেনি; কিন্তু আমি তার হাবভাব দেখে এইরকমই অনুমান করেছিলাম।

তপতীকে সে প্রায়ই বলত যে তাকে বিয়ে করে সে যে স্বার্থত্যাগ করেছে তপতী তার মূল্য বোঝে নি বুঝবেও না। তপতী ক্রমশ খিটখিটে বদমেজাজী হয়ে উঠতে লাগল। তপনকে মুখের ওপর কিছু বলত না বটে, কিন্তু তার রাগের ঝাঁঝ গিয়ে পড়ত ঠিকে ঝিয়ের ওপর। বিনা কারণে গালমন্দ কেন সহ্য করবে ঠিকে লোক? সেও সমানে উত্তর দিত। দুজনের চেঁচামেচিতে বাড়িওয়ালা-গিন্নী অতিষ্ঠ হয়ে দুচার কথা বলতে বাধ্য হতেন; আর তার পরই প্রকাশ পেত তপতীর রণচণ্ডী মূর্তি। ভয়ে বাড়িওয়ালা গিন্নী পাঁচিলের দরোজা বন্ধ করে দোতলায় উঠে শাসাতেন। তপতী মাঝে মাঝে বাচ্চাটাকে কোলে করে দরোজায় তালা ঝুলিয়ে নিজের মায়ের

শৈব্যার ছোটদের বই মানে সেরা লেখকের সেরা বই

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সুন্দরবনে সাত বছর

(দ্বিতীয় মুদ্রণ)

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

ঝাউবাংলোর রহস্য ২য় মুঃ ৫·

চারমূর্তি (তৃতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের

আমাজনের অরণ্যে ২য় মুঃ ৫·

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ঘনাদার জুড়ি নেই ৩য় মুঃ ৫·

মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা (তৃতীয় মুদ্রণ) ৫·০০

শৈব্যা পুস্তকালয়

৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

কাছে চলে যেত; কখনও বা ভাতের হাড়িতে জল ঢেলে, মেয়েটাকে কোলে নিয়ে হাউমাউ করে কাঁদত বসত। মাঝে মাঝে চাকরি থেকে ফিরে তপন বাড়িতে ঢুকতে পেত না—তালা বন্ধ। মাইল দুয়েক দূরে শ্বশুরবাড়ি থেকে তপতীকে নিয়ে আসতে হত। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকত। সে-রাত্রে দোকান থেকে পুরী কচুরি কিনে পেট ভরাতে হত। একদিন চরমপত্র জারি করল তপন। এবার যদি এসে সে তপতীকে বাড়িতে না পায়, তবে সে তপতীকে আর ঘরে ঢুকতে দেবে না, তাকে তার মায়ের কাছেই চিরকাল থাকতে হবে। তপতী ভয় পেয়ে দুপুরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া বন্ধ করল বটে, কিন্তু ঝগড়া বন্ধ করল না। রোজই ঝগড়া করত রোজই ভয় পেত। নিজের ঘরের দরজায় খিল দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারত না, বড় বড় দুটো টিনের বাকস টেনে এনে খিলকে জোরদার করত। এই অবস্থায় একদিন জানালার দিকে চোখ পড়তে দেখল সান্টু একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে; চোখাচোখি হতেই চট্ করে সরে গেল। দেয়ালে টাঙানো আর্শিতে নিজের ছায়ার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সান্টুর অমনি করে তাকিয়ে থাকার কারণ। তাড়াতাড়ি আলনা থেকে একটা ব্লাউজ টেনে নিয়ে গায়ে দিয়ে জানালাটা পুরো খুলে দিল। পরের দিনও সান্টুকে ঐ অবস্থায় দেখে ওর মনে হল বাড়িওয়ালার ভয় তাড়াবার উপায় পাওয়া গেছে। দুপুরে দরোজা বন্ধ করা ছেড়ে দিয়ে তখন থেকে সান্টু আর তার দুই বন্ধু ক্ষুদে বেন্দাকে মাঝে মাঝে ঘরে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে লুডো খেলা শুরু করে দিল। তারা চা-পানে পরম পরিতৃপ্ত হয়ে দিদিকে শোনাতে লাগল—দিদির জন্যে দরকার হলে তার জান দিতে রাজী। পাড়ায় এই নিয়ে প্রথমে গুঞ্জন, পরে, কলরব শোনা গেল। ছুটির দিনে তপনের আর বাইরে বেরুবার উপায় রইল না। যেখানে যায় সেখানেই শোনে এই কথা। দু'একদিন লক্ষ্য করল, তার উপস্থিতিতেই শুধু শাড়ী দিয়ে দেহ আবৃত করে—জানালা দিয়ে তপতী সান্টুর দলের সঙ্গে কথা বলছে। ধৈর্যধারণ করতে না পেরে এই সময় থেকে তপতীর গায়ে হাত তুলতে শুরু করল তপন। সান্টুর দলকে শাসিয়ে, স্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে এবং মারধোর করেও অবস্থার কোনো হেরফের হল না। সান্টুরা একদিন না এলে তপতী নিজে গিয়ে ওদের আড্ডায় হাজির হত।

এ খবর তপন পেল পাড়ার অন্য ছেলেদের কাছে। বেশির ভাগ সময়েই গায়ে কাপড় দিতে ভুলে যেত তপতী। খাওয়াদাওয়ার কথা মনে থাকত না, রাতের ঘুম বন্ধ। এতদিনে তপনের মনে হল তপতী বোধ হয় অসুস্থ, মানসিক রোগে ভুগছে।

তপনের লেখা আগের রাতের ঘটনা পড়ে আমি ওকে বাইরে যেতে বললাম। তপতী আগের দিনের মতই চঞ্চল অস্থির; একপাদা ছেঁড়া কাগজের প্যাকেট খুলে পড়ার ভঙ্গীতে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে। বারদুয়েক ডাকার পর সাড়া দিল।

—সান্টুকে তুমি ডেকে এনেছিলে? ছিঃ ছিঃ লোকে কি মনে করছে বলতো।

—সান্টু যদি দরজায় এসে ধাক্কা মারে কড়া নাড়ে, আমি খুলে না দিয়ে আর কি করতে পারি? খুলে না দিলে বাড়ীওয়ালা গিন্নী দেখতে পেত আর পাড়ার লোক ডেকে এনে দেখাত!

—দিনে দুপুরে ওর এত সাহস হল কি করে? তপন পুলিশের কাছে ডায়েরী করেছে, পাড়ার লোকরা ওদের ওপর নজর রেখেছে—

—আমার খুশী আমি ওকে ডেকে আনব। ওকে ডেকে না আনলে বাড়ীওয়ালারা সেদিন আমার ঘরে আগুন দিয়ে আমাকে পুড়িয়ে মারত। তিন লিটার পেট্রল কিনে ওদের রান্না ঘরে জমা করেছে, আমার নিজের চোখে দেখা। আপনি আমার বাবার মত আপনাকে আমি কত ভক্তি করি, কিন্তু আপনি কোনো কথা বিশ্বাস করেন না। জানেন ও আমাকে ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে। আপিসে ও বদলী হতে চাইছে; আন্দামানে বদলী হয়ে যাবে। বাচ্চাটাকে ওদের বাপের বাড়ীতে রেখে আমাকে একলা ফেলে চলে যাবে। সান্টু বলছিল যে পাগলাগারদেও পাঠাতে পারে। তাহলেই ও আর একটা বিয়ে করতে পারে। আমার শরীরে কিচ্ছু নেই, আমাকে ওর মনে ধরছে না আমাকে ও ভালবাসে না। একবারও আগের মত আদর করে বলে না—আমরা দুজন তপন-তপতী কপোত-কপোতী প্রায়/ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যাব চলে নিঃসীম নীলিমায়। আমি যে সুন্দর সে কথা বলতেও ওর আটকায়। সান্টু কিন্তু জানে আমি সুন্দর, হ্যাঁ সান্টু আমাকে বলেছে।

কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া কাগজের টুকরোগুলো ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে ও ডুকরে কেঁদে উঠল। পাশের ঘর থেকে তপন ছুটে এল। আমার কথায় তপনের সান্ত্বনায় কিছুটা শান্ত হয়ে দেওয়ালের পাশের সোফাটায় গিয়ে বসল, তখনও শিরা বের করা হাত দিয়ে চোখ মুছছে। একটু পরে সোফার শরীর এলিয়ে ও বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল।

তপনকে বললাম: তোমার কিছুদিন ছুটি নেওয়া দরকার। শৈশব থেকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে তোমার স্ত্রী। আসল ভয় ওর তোমাকে নিয়ে। ওকে বিয়ে করে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তোমাকে তাই ওর ধারণা হয়েছে তুমি ওকে সুযোগ পেলেই পরিত্যাগ করবে। তোমার দুঃখকষ্টের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে করছে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে; তার ফলে নিজের ওপরে অন্যায় ওপরে বেগে যাচ্ছে। তুমিও অর্থাভাব মেটাতে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছ, ওর মনে নিরাপত্তাবোধ জাগাতে পারছ না। মানুষ ডোবার আগে তৃণখণ্ড ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে; তপতীও ঐসব পাড়ার বকাটে ছেলেদের আশ্রয় করে সংসার সমুদ্রে কোনোমতে ভেসে থাকতে চাইছে। তোমাকে কে কি বুঝিয়েছে জানি না—তবে আমার মনে হয় না যে ঐসব ছেলেদের সঙ্গে ওর কোনো দৈহিক সম্পর্ক ঘটেছে। আমি মনে করিনা যে ও 'নিমফোমানিয়ায়' ভুগছে, আমি বিশ্বাস করি না যে 'মরবিড সেক্সুয়াল ডিজায়ার' ওকে সান্টু ক্ষুদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ও এক জায়গায় নোঙর ফেলে ঝড়ঝাপটা থেকে নিজেকে বাঁচাতে চায়। মনে মনে ও ভাবে ওর শীর্ণ দেহে পুরুষকে আকৃষ্ট করার মত কিছু নেই, তাইতেই আরো ভয় পেয়েছে আরো জোর করে তোমাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। বাড়ীওয়ালা ওর সাময়িক আশ্রয়নীড় ভেঙে দিয়ে ওকে নিরাশ্রয় করবে—এই ভয়ে ও অস্থির উন্মাদ হয়ে গেছে। তুমি ছুটি নাও, ওর কাছে কিছুদিন থাক। অন্য কাজ এখন মুলতুবি রাখ।

—কিন্তু আমারতো ছুটি পাওনা নেই। তাছাড়া যাদের পড়াই তাদের অনেকের পরীক্ষা এসে গেছে। ওষুধপত্তর দিয়ে যা হোক কিছু ব্যবস্থা করুন স্যার।

তপন আমার কথামত ব্যবস্থা করতে পারল না। কয়েকদিন পরে হন্তদন্ত হয়ে এসে জানাল যে আগের দিন তপতী বাচ্চাটাকে কোলে করে ওর অফিসে এসে হাজির হয় ও তখন অফিসের কাজে বাইরে ছিল। সেখানে সে আবোলতাবোল বকেছে; ওর পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মামাকে দিয়ে অফিসের সকলকে তপনকে ছুটি না দেবার জন্য জেল পাঠাবে বলে শাসিয়েছে। অফিসের বড়সাহেব ওকে হাসপাতালজাত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। সব দায়িত্ব তিনি নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। তপনকে একটু উদ্ভাসিত মনে হল। এতদিন পরে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে বোধহয়। চিকিৎসার সব খরচ অফিস থেকেই দেওয়া হবে। হাসপাতালে খাওয়াদাওয়া নিশ্চয়ই ভাল দেবে, ওর শরীরটা হয়ত সারবে। এই কথাগুলো বলে এই প্রথম তপনকে ঈষৎ হাসতে দেখলাম।

তপনের আশা কিন্তু পূর্ণ হল না। সেইদিনই বাড়ী গিয়ে দেখল বাড়ীর সামনে ছোটখাটো ভিড় জমে গেছে। ত্রস্তপদে বাড়ীতে ঢুকে দেখে বাথরুমের কাপড়জামা রাখার লোহার বড় শাড়ীগুলায় তপতীর দেহটা ঝুলছে। বড় সাহেব আর তপনের ইংরিজি কথাবার্তায় অর্থ ও বুঝতে পেরেছিল। এটা তার হাসপাতালে না যাবার শেষ চেষ্টা।

—ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

।। কুড়ি ।।

কল্পনাকে পড়াতে গেলে বোজ এক কাপ চা পাবই। মাঝে মাঝে চায়ের সঙ্গে আরো কিছু। কখনও কখনও ঐ আরো কিছুর পরিমাণ এমন হয় যে রাত্রে মেসে ফিরে আর কিছু খাই না। তবে নেমন্তন্ন একদিনও খাই নি। আজ রাত্রে কেন খেতে বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। আলপনা বা কল্পনার জন্মদিন নয় ত? নাকি ওদের বাবা বা মার জন্মদিন? অথবা অন্য কিছু? একবার ভাবলাম এক বাক্স সন্দেশ নিয়ে যাই। আবার মনে হল যদি মিষ্টি নিয়ে যাবার মত কারণ না হয়, তাহলে? শেষ পর্যন্ত কিছু না নিয়েই সওয়া ন'টা নাগাদ হাজির হলাম।

আমাকে দেখেই কল্পনা প্রায় চিৎকার করে উঠল মা, প্রদীপদা এসেছেন।

রান্নাঘর থেকেই ওর মা জবাব দিলেন উপরে নিয়ে যা।

দোতলার বারান্দার রেলিঙে দু' হাত রেখে মুখ নীচু করে আলপনা আমাকে বললো, দাঁড়িয়ে কেন? উপরে চলে আসুন।

এ বাড়াতে এতদিন আসা-যাওয়া করছি কিন্তু কোনদিন দোতলায় যাই নি। প্রয়োজনও হয় নি, অবকাশও হয় নি। একতলাতেই কল্পনার পড়ার ঘর। এছাড়া বসার ঘর, খাবার ঘর, রান্নাঘরও একতলায়। দোতলায় যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে বুঝলাম আজ আমি সত্যি একজন বিশিষ্ট অতিথি।

কল্পনা বললো আসুন।

আমি বললাম—তুমি চল। আমি তোমার পিছনেই আসছি।

কল্পনার পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বারান্দায় পা দেবার আগেই আলপনা বললো—আসুন, আসুন।

আমি বারান্দার এক পাশে চটি খুলে একটু এগুতেই আলপনা বললো—এই ঘরে আসুন।

ঘরখানিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে দুটি জিনিস স্পষ্ট বুঝলাম। এই ঘরখানি নিঃসন্দেহে আলপনার। ঘরের দেয়ালে ওর ছোট-বড় অজস্রখানেক ফটো দেখেই বললাম—এটা নিশ্চয়ই আপনার ঘর?

হ্যাঁ কিন্তু কি করে বুঝলেন?

আমি একটু হেসে বললাম—সে কথাও বলতে হবে?

কল্পনা বললো—জানেন প্রদীপদা, আমি বলি এটা দিদির স্টুডিও।

আমি হাসলাম।

আলপনা বললো—তুই চুপ কর।

এতদিন জানতাম এদের অবস্থা ভাল কিন্তু আজ শুধু এই আলপনার ঘরখানি দেখেই বুঝলাম এরা সত্যিই ধনী। ঘরের সব কিছুর মধ্যেই এদের আভিজাত ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বেশ সুস্পষ্ট।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ছবিগুলো দেখছিলাম। আলপনা বললো—আমি ফিল্ম স্টার না। আমার ছবি কি দেখবেন?

ঘরে ছবিগুলো যখন টাঙিয়েছেন তখন সেগুলো দেখার অধিকার বোধহয় আমার আছে।

তর্ক না করে বসুন। পরে দেখবেন।

তাতে আপত্তি নেই।

ঘরের এক পাশে ভিক্টোরিয়ান ডিজাইনের ডিভান। আমি তারই এক পাশে বসে বললাম—আপনারাও বসুন।

কল্পনা আমার পাশে বসলেও আলপনা সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বললো—আমি সন্ধ্যে থেকে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম। এখুনি আর বসতে ইচ্ছে করছে না।

আমি বসে আছি আর আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন সেটা কি ভাল দেখায়?

সব ব্যাপারে অত ভাল-মন্দ বিচার করবেন না ত।

করব না?

না।

আচ্ছা এবার আজকের নেমন্তন্নর কারণটা জানতে পারি?

আলপনা জবাব দেবার আগেই কল্পনা বললো—আজকে দিদির জন্মদিন। আপনি জানেন না?

শুনেই একটু বিরক্তবোধ করলাম। খালি হাতে জন্মদিনে নেমন্তন্ন খেতে আসা খুব সম্মানজনক নয়। আলপনা হয়ত আমার খরচ বাঁচাবার জন্যই খবরটা দেয়নি। আমি ধনী না হলেও আমি ফকির নই। আমার আত্মসম্মান বলে কি কিছু নেই? মনে মনে ভাবলাম, সাধারণ মানুষকে অনুকম্পা করাই বোধহয় মহত্ত্ব। আমি আলপনার দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হয়েই বললাম—এ খবরটা আমাকে জানালে বোধহয় আপনার কোন অন্যায় হতো না, তাই না?

আলপনা আমার কথার জবাব না দিয়ে কল্পনাকে বললো—দ্যাখ ত মার কত দেরী।

কল্পনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই আলপনা আমার দিকে দু-এক পা এগিয়ে এসে বললো আজ আমার জন্মদিন হলেও কোন উৎসব করার মত মন কারুরই নেই। শুধু মাকে খুশী করার জন্যই আপনাকে খেতে বলেছি।

আমি আপনাদের মনের অবস্থা বুঝতে পারি কিন্তু

আপনি বিশ্বাস করুন আমি মাকে পর্যন্ত কোন উপহার দিতে দিই নি। মাকে যখন কিছু দিতে দিলাম না তখন আপনার কাছ থেকে কিছু নেওয়াও বোধহয় ঠিক হতো না।

এ কথাগুলো ত আমাকে আগেও বলতে পারতেন?

তা পারতাম।

আর কিছু না আনি এক গোছা ফুল বা একখানা বই ত আনতে পারতাম?

ব্যস্ত কি? পরে দেবেন।

আজকের এই দিনটা ত আর পাব না।

আলপনা কিছু বলার আগেই বারান্দায় কল্পনা আর ওর মার গলা শুনলাম। আলপনা ডাকল মা এসো।

আলপনার মা ঘরে ঢুকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার খুব ক্ষিদে লেগেছে ত—

না, না এত তাড়াতাড়ি আমি খাই না।

উনি ডিভানের আরেক পাশে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি কখন খাও?

দশটার আগে খাই না।

মেসের রান্না বোজ বোজ খেতে ভাল লাগে?

খারাপ লাগে না। প্রায় এক নিশ্বাসেই বললাম— তাছাড়া মেসের সবাই আমাকে এত ভালবাসেন যে ওরা যা খেতে দেয় তাই আমার ভাল লাগে।

ঠিক বলেছ। হাসি মুখে, আন্তরিকতার সঙ্গে যদি কেউ কিছু করে তা ত ভাল লাগবেই।

এবার আমি একটু হেসে বললাম—আজ আপনার বড় মেয়ের জন্মদিন অথচ উনি আমাকে...

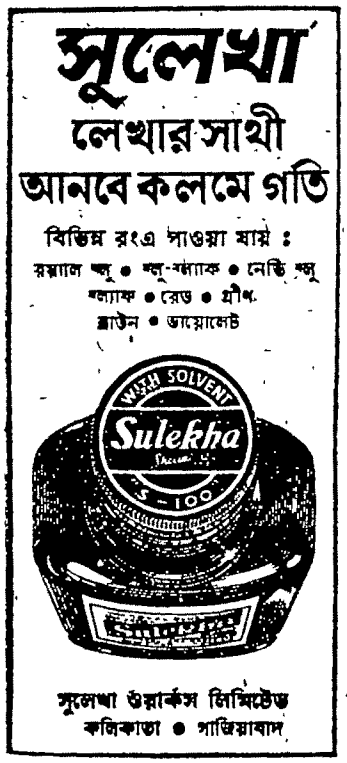

ও ঐ ধরণের। আমাকে পর্যন্ত কিছু করতে দিল না।

যখন কিছুই করতে দিলেন না তখন আমাকে খাওয়ান বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

তুমি কেন খাবে না? তোমাকে ত এর আগে একদিনও খেতে বলি নি।

তাতে ত আমার বিশেষ লোকসান হয়নি। প্রায় রোজই ত কিছু না কিছু পেয়েছি।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর আলপনা আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল—আপনি বেনারস যাচ্ছেন কবে?

ওর প্রশ্ন শুনে আমি অবাক কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আবার পিসীর ওখানে যাচ্ছো?

আমি বললাম—যেতে বললেই কি যাওয়া সম্ভব?

আলপনা গম্ভীর হয়ে বললো—ঐভাবে কেউ টাকা পাঠিয়ে যেতে বললে না যাওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়।

কিন্তু..

কিন্তু কিন্তু করবেন না। মানুষের স্নেহ-ভালবাসা ভক্তি-শ্রদ্ধার মর্যাদা দিতে শিখুন।

আলপনার মা একটু রাগ করেই ওকে বললেন—তুই এভাবে কথা বলছিস কেন?

মা মনি অর্ডার কুপনের দু লাইন লেখার মধ্যে কি গভীর আন্তরিকতা ছিল, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

ওর মা জিজ্ঞাসা করলেন—তুই পড়েছিস নাকি?

আমি চুপ করে মা-মেয়ের কথা শুনছি।

আলপনা বললো—উনি ঘরে ছিলেন না আমিই ত মনি অর্ডার ফর্ম নিয়ে বসেছিলাম।

ওর মা এবার আমাকে বললেন—যখন টাকা পাঠিয়ে ঐভাবে যেতে লিখেছেন তখন বরং কদিন ঘুরেই এসো।

এবার আমি বললাম—কিন্তু এভাবে ঘন ঘন কাশী গেলে আমাকে দিয়ে কে ছেলেমেয়ে পড়াবেন?

আলপনার মা আমাকে সমর্থন জানিয়ে বললেন—সে ত ঠিক।

আলপনা এ বিষয়ে আর কোন কথা বলল না। তবে ওর গাম্ভীর্য দেখেই বুঝলাম ও একটু অসন্তুষ্ট। খাবার সময় ও কথাবার্তা ঠিকই বললো কিন্তু শুধু আমিই বুঝতে পারলাম, এই কদিন ও যত সহজ হয়ে আমার সঙ্গে গল্পগুজব করেছে ঠিক সে রকম সহজ হতে পারছে না। আমি সবকিছু দেখলাম, বুঝলাম কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

সেদিন রাত্রে মেসে ফিরে এসেই দেবীকে চিঠি লিখলাম আমি জানতাম তুমি চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই টাকা পাঠাবে। মনে মনে একথাও জানতাম তুমি শুধু কার্তিকবাবুর টাকাই পাঠাবে না; নৃপতি যে কিছু পাবেই, তাও জানতাম। রেল ভাড়ার আশা না করলেও ফল-দুধ খাবার জন্য তুমি যে আমাকে কিছু না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না তাও জানতাম। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটালেও আজ পর্যন্ত কারুর কাছে কোন সাহায্য চাইনি। কাকাবাবু বা কাকিমা অনেক সময় প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন কখনও কখনও স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চেয়েছেন কিন্তু আমি নিতে পারিনি। এবার যখন প্রয়োজন দেখা দিল তখন তোমাকে চিঠি লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হলো না। পিয়ন যখন টাকাগুলো দিল তখন হাত পেতে নিতে কোন গ্লানি বোধ করলাম না। শুধু প্রয়োজনের জন্যই তোমার কাছে টাকা চাইনি, চেয়েছি তুমি আমার পরম আপনজন বলে। এই পৃথিবীতে আমার দু-একজন শুভাকাঙ্খী আছে কিন্তু তোমার মত আপনজন প্রাণের মানুষ ত আর কেউ নেই।

আর লিখলাম, ইদানীংকালে নানা কারণে আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ঠিক কর্তব্য পালন করতে পারি নি। এখন কাশী গেলে ওদের সবার কাছে আমি বড্ড ছোট হয়ে যাবো এবং ভবিষ্যতে কোনদিন ওদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। তাই এখুনি আসছি না। আমি জানি তুমি দুঃখ পেলেও আমার উপর রাগ করবে না।

সব শেষে লিখলাম আলপনা-কল্পনাদের বাড়ীতে থাকার ব্যাপারে তোমাকে সব কিছু জানিয়েছি। এ ব্যাপারে পত্র পাঠ তোমার মতামত জানাও।

পরের দিন সকালেই সামনের আমহার্স্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসের ডাকবাক্সে নিজের হাতে পোষ্ট করলাম। দুপুরবেলায় মেসে ফিরে এসেই দেখি চিঠি এসেছে। খামের ঠিকানা লেখা দেখেই বুঝলাম দেবীর চিঠি কিন্তু খাম খুলে দেখি পিসীর চিঠি। এই বাগবাজারের একটি পরিবারের সঙ্গে আমি কদিনের জন্য প্রয়াগে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই দেবীর কাছে তোর মারাত্মক

অসুস্থতার খবর শুনলাম। দেবী বললো তুই অমন পথ্য করেছিস ও বর্তমানে ভালই আছিস কিন্তু এত বড় অসুখের সময় তুই কিভাবে মেসবাড়ীতে থাকলি সেকথা ভাবতেই আমার চোখে জল আসছে। শুনেছি তোর মেসবাড়ীর লোকজন অত্যন্ত ভাল ও তারা সবাই তোকে অত্যন্ত সেবা-যত্ন করেছেন। বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে ওদের সবার মঙ্গল কামনা করি।

পিসীর চিঠি দীর্ঘ নয়। এরপর লিখেছেন আজ তোর বাবা বা সোনা বউ নেই। তাদের অবর্তমানে তোর প্রতি আমার কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তোর লেখা-পড়ার ক্ষতি হবে বলে আমি এতকাল জেনেশুনেও চুপ করে বসেছিলাম কিন্তু এবার তোকে স্পষ্ট জানাচ্ছি তুই আর এভাবে একলা কলকাতায় থাকতে পারবি না। এখানে চলে আয়। যদি ছাত্র পড়াতেই হয় তাহলে এখানেও তুই অনেক ছাত্র পাবি। তাছাড়া আমাকে এভাবে একলা একলা রেখে তোর কলকাতায় থাকতে ভাল লাগে? এই বুড়ো পিসীর প্রতি কি তার কোন দায়িত্ব নেই?

পিসীর চিঠিখানা তিন-চারবার পড়লাম। তারপর চিঠিখানা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে বসে নানা কথা ভাবছিলাম। কতক্ষণ ঐভাবে বসেছিলাম তা বলতে পারব না। হঠাৎ কার্তিকবাবুকে দেখে চমকে উঠলাম, আপনি?

কার চিঠি নিয়ে এত ভাবছ?

কাশী থেকে পিসীর চিঠি এসেছে।

পিসীর কি শরীর খারাপ হয়েছে?

না না পিসী ভালই আছেন।

তবে?

আমি চিঠিখানা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—পড়ুন।

তোমার চিঠি আমার পড়া ঠিক নয়।

আমি হেসে বললাম—তাতে কিছু হবে না। তাছাড়া আপনিও আমার একজন শুভাকাঙ্খী। এই চিঠিটা পড়ে আপনার মতামত বলুন।

কার্তিকবাবু আমার কাধে একটা হাত রেখে বললেন—নেহাত চাল-ডাল আলু-পটলের হিসেব করতে করতে চুলগুলো পাকিয়েছি। তাই বলে তোমার মত এম-এ পাশ ছেলেকে আমি কি মতামত দেব?

ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। আপনি চিঠিটা পড়ে আপনার মতামত বলুন।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উনি চিঠিটা হাতে নিতে নিতে বললেন—দাও। চিঠিটা হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়েই বললেন—পিসী ঠিক কথাই লিখেছেন। শুধু কটা ছাত্র পড়াবার জন্য তোমার কলকাতায় পড়ে থাকার কোন মানে হয় না।

আপনি আমাকে কাশী যেতে বলেন?

হাজার হোক এই পিসীর চাইতে কেউ তোমাকে বেশী ভালবাসেন না। তিনি যখন এমন আন্তরিকভাবে ডাকছেন তখন যাবে না কেন?

বুড়ী পিসীর উপর নির্ভর করে দিন কাটান কি ঠিক হবে?

কাশী গ্রাম না, সেখানেও তুমি নিশ্চয়ই দু-চারটে ছাত্র-ছাত্রী ঠিকই পেয়ে যাবে।

কিন্তু এদিকে কাকাবাবু এক ঝামেলা বাধিয়ে রেখেছেন তা জানেন ত?

কার্তিকবাবু ভ্রু কুঁচকে একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন—মাষ্টার মশাই তোমার পিতৃ বন্ধু। তিনি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন কিন্তু তবু বলব তিনি তোমাকে ঠিক পরামর্শ দেন নি। তোমার ছাত্রীর বাবা মারা গিয়েছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। তাই বলে তুমি এম-এ পাশ কি বড়লোকের বাড়ীর চৌকিদারী করবে?

কার্তিকবাবু এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে গেলেন। আমি বললাম—আপনার সব কথাই ঠিক কিন্তু কাকাবাবু কিছু বললে আমি না বলতে পারি না।

আমি চাল-ডাল আলু পটলের হিসেব করেই দিন কাটাই। মেসের কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি জড়াই না। তবে তুমি ছেলের বয়সী। তোমাকে ভালবাসি বলেই আবার বলছি ছাত্রীর বাড়ীতে থাকা তোমার ঠিক হবে না।

আমি একটু হেসে বললাম—এখন যদিও বাড়ীতে না থাকি তাহলে কাকাবাবুর কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না।

তোমার কাছে কাকাবাবু বড় নাকি পিসী?

নিঃসন্দেহে পিসী।

তাহলে আবার দ্বিধা কি? কার্তিকবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি চলে যাও। মাষ্টার মশাই এলে আমি বলে দেব হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেছে।

আমি এক মুহূর্তের জন্য একটু ভেবেই বললাম—ঠিক আছে তাই হবে। তবে এ মাস ত প্রায় শেষ হয়ে এলো। ও মাসের শুরুতে মাইনেগুলো পেয়েই কাশীবাসী হচ্ছি।

কার্তিকবাবু খুশীর হাসি হেসে বললেন—আমি বলছি পিসীর মত স্নেহ-শীলা মহিলার কাছে গেলে তোমার কোন অকল্যাণ হতে পারে না।

ঠিক বলেছেন।

কার্তিকবাবু আমার ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে বললেন—অনেক বেলা হয়ে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নাও।

হ্যাঁ আসছি।

(ক্রমশ)

প্রকাশিত হয়েছে

এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর

বিশ্ববন্দিত আরেকটি করুন প্রেমের উপন্যাস

তবুও বসন্ত

Heaven Has No Favourites

ভাষান্তর / দিবোন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬·০০

রেমার্ক-এর অন্যান্য উপন্যাস ঃ

প্রেম মৃত্যু ভালবাসা ১৪·০০

স্বপ্নের পাখিরা ১৬·০০

পত্রপুট/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট—১২

জব চার্নকের কলকাতা আর নেই— দিনকালের সঙ্গে সঙ্গে শহরের হালচালও আমূল বদলে গেছে

সি এম ডি-এ

সাধারণ মানুষদের নিয়েই আমাদের কাজ। জনসাধারণের উন্নতির জন্যই এই বিশাল কর্মযজ্ঞের আয়োজন। এর সার্থক রূপদানের জন্যে প্রয়োজন সময়ের। কোনো এলাকার উন্নতির জন্য, যেমন কোনো রাস্তা, সেতু কিংবা অন্যান্য জিনিস তৈরি করতে গিয়ে যে সময়ের প্রয়োজন, সেই সময়টুকুতে হয়তো সেই অঞ্চলের জনসাধারণের সাময়িক অসুবিধা হয়। কিন্তু একথা যেমনি সত্যি তার চেয়েও আরো সত্যি, এই কষ্টের বদলে দু বছর বা চার বছর পরে তাঁরাই কিন্তু আরো সুযোগ-সুবিধা লাভ করে উপকৃত হবেন। আখেরে তাঁদেরই ভালো হবে। এই জিনিসটাই আমরা জনসাধারণকে বোঝাতে চাই। তাঁদের সহযোগিতা শুভেচ্ছা ছাড়া আমরা এক পাও এগোতে পারবো না। আমাদের বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্যও তাই— আমাদের অগ্রগতির কাজ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা, ভবিষ্যতের উন্নতি সম্পর্কে তাঁদের বোঝানো।'

সপ্রতিভ গলায়, সুন্দরভাবে বোঝানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে গেলেন শ্রীসমর বসু। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভালপমেন্ট অথরিটির পাবলিক রিলেসনস অফিসার। এই ধরনের পদাধিকারী হওয়ার জন্য যেরকম স্মার্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশেষ এক ধরনের চেহারার দরকার আছে (অন্তত আমার ধারণায়), ঠিক সেই ধরনের গুণ রয়েছে শ্রীবসুর মধ্যে। তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটিও সুন্দর। নিজের প্রতিষ্ঠানের সাফল্য এবং ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে অনেক মানুষই যে কি চোখে দেখে, সে সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল এবং সেসব কথা কবুল করতেও তিনি পেছপা নন।

'জানেন, কত লোক আমাদের সম্পর্কে কত কিছু বলে! জনসংযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সর্বশেষ যে পথ আমরা বেছে নিয়েছি তা হলো—ডাইরেকট মেইল। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যেমন, হেডমাস্টার, লইয়ার, গেজেটেড অফিসার, সাধারণ চাকরিজীবী, রিপোর্টার প্রমুখ লোকদের বাড়িতে আমরা চিঠির মাধ্যমে আমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন রাখি। কেউ কেউ আমাদের প্রশংসা করে অভিনন্দন জানান, আবার কেউ কেউ আমাদের সমালোচনা করে গালাগাল দেন। আমরা স্বাগত জানাই তাঁদের, যাঁরা সমালোচনা করে আমাদের ভুল দেখিয়ে দেন, এবং আমরাও সেইসব চিঠির উত্তর আগে দিই।'

কথাগুলো বলেই সমরবাবু আমার দিকে ছাপানো একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথোপকথনের ভাষায় আত্মসমীক্ষামূলক ভঙ্গিতে লেখা এই চিঠি।

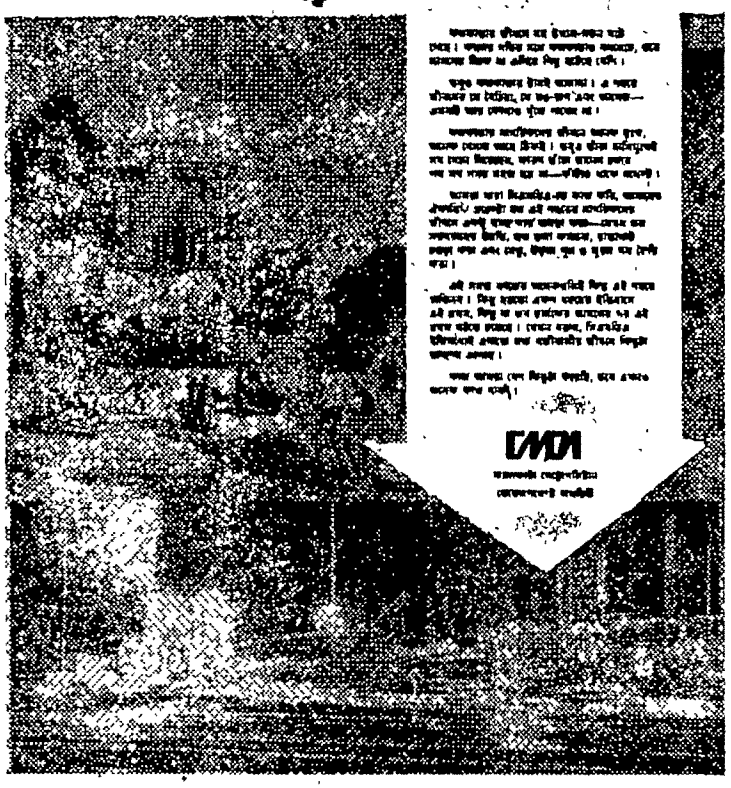

বিজ্ঞাপন ও বাণিজ্য

যেমন—যে কোনো নাগরিকের প্রশ্ন হয়ত এরকম—কলকাতা কি তিলোত্তমা হবে?

সি এম ডি এ-র চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনের উত্তর—তিলোত্তমাকে দেখিনি। কাজেই সঠিক বলতে পারবো না। তবে তিল তিল করে তাল হয়, কাজেই একটার পর একটা উন্নয়নের পর কলকাতা 'তালোত্তমা' হবে কিনা বলতে পারি না।'

'আমাদের এত প্রচেষ্টার মূলমন্ত্র কি জানেন? এই শহরটির প্রতি একটা মমত্ববোধ —যে মমতা নিয়ে এখানকার মানুষও ঠিক সমানভাবেই এই শহরটিকে ভালবাসেন। আমরা বিশ্বাস করি— এই রকম শহরে যেখানে মানুষ শহরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সেখানে উন্নতির পথে বাধা থাকতে পারে না। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করাও দরকার। আমরা সেই চেষ্টাও চালাচ্ছি।

—কিভাবে?

—প্রথমত আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, পোস্টার এবং ডাইরেকটর মেইল পদ্ধতিতেও প্রচার চালাচ্ছি। দ্বিতীয়ত বিশেষ করে নিরক্ষর লোকদের কথা মনে রেখে আমরা ফিল্ম-এর ব্যবস্থা করেছি, নানা প্রদর্শনীরও আয়োজন করে ছবির মারফৎ তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করেছি।

—অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়, গ্রুপ ডিসকাশন পদ্ধতিতে প্রযোগ কিংবা সেইসব এলাকায় গিয়ে প্রতিটি বাড়ি ধরে ধরে তাঁদের বোঝানো ইত্যাদি, এসব জিনিষ কি আপনারা ভেবে দেখেছেন?

আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শ্রীবসু বললেন—এটা করা উচিত। তবে এই ব্যাপারটা ঠিক আমার এক্তিয়ারে নয়। এটা করার জন্য আমাদের অন্য 'সোসিও-লজিক্যাল' বিভাগ আছে।

—আপনাদের এই কয়েক কোটি টাকার কর্মযজ্ঞের জন্য প্রচার-খাতে বরাদ্দ কত?

—বছরে মোটামুটি আট লাখ টাকার মত।

ইতিমধ্যে চা এসে যায়। চায়ের কাপে একবার চুমুক দিতেই প্রশ্নটা খেলে যায় আমার মাথায়।

—আচ্ছা মিস্টার বসু, কলকাতার এই উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে ভারতের অন্যান্য শহরগুলো কি চোখে দেখছে?

চটপট উত্তর দেন সমরবাবু—খুব ভালো প্রসঙ্গ। এই প্রসঙ্গেই আমি আসতে চাই-ছিলাম। আপনি বোধহয় জানেন, বিশ্বব্যাঙ্ক এই সর্বপ্রথম আরবান ডেভালাপমেন্টের জন্য এতগুলো টাকা ঢেলেছে এবং তার সর্বপ্রথম একসপেরিমেন্ট শুরু হয়েছে কলকাতার উপর। এটা ইউনিক ইন এ ওয়ে। এই পরীক্ষায় চূড়ান্ত সাফল্য লাভ সম্পর্কেও আমরা অন্যান্য শহরকে জানাতে চাই। কিছু দিনের মধ্যেই আমরা দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি শহরের কাগজে এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেবো। এই দেখুন তার বয়ান।'

বিজ্ঞাপনের বয়ান কিছুটা তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করি।

"Bombay be not Jealous!
Madras Mad or Delhi doubtful!
Because Calcutta is going the Calcutta way

Says who? Who else but the Calcuttan who knows that there is no city like his city? Who else but the Calcutta Metropolitan Development Authority which is giving Calcutta a new life; fulfilling the faith and confidence placed on it by our Prime Minister.

.....Calcutta has come a long way and has overcome a long list of deficiencies. No doubt the Calcutta way is a good way. Other cities can follow it!"

বিজ্ঞাপনটায় চোখ বুলিয়ে মুখ তুললাম আমি। আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে সমরবাবু বললেন—আমার তৈরি এই বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়ে নানা বিজ্ঞাপন সংস্থা কি বলেছে জানেন? এই বিজ্ঞাপন পড়ে অন্যান্য শহরগুলো কলকাতাকে প্যারোকিয়াল ভাববে না তো? প্রত্যুত্তরে আমি তাঁদের বলেছি—ইফ ক্যালকাটা ইজ প্যারোকিয়াল, লেট দেম সে সো।

অন্য আলোচনায় এলাম। বিজ্ঞাপনের সমস্যা, তার অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে। প্রশ্ন করেছিলাম—অন্যান্য দেশের প্রচার পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা কি?

সিগারেটে দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন—বেশ পিছিয়ে আছি আমরা। আমাদের দেশের মিডিয়া অফ পাবলিসিটি শুড বি মোর সায়েন্টিফিক।

সমস্যার কথাও তুললেন সমর বসু। —'এই দেখুন না, এতগুলো টাকা প্রচারে খরচ করি, অথচ তার সঠিক ফলাফলটা কি, সেটা এখনও পর্যন্ত জানতে পারলাম না। আমার ইচ্ছা, সাধারণ মানুষের উপর আমাব এই প্রচারেব প্রতিক্রিয়া কি, সে সম্পর্কে একটা সমীক্ষা নেওয়ার। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, যাকে দিয়ে সঠিকভাবে সার্ভে করালে আমি একটা সত্যিকারের ফলাফল জানতে পারবো, এরকম একটাও বিশ্বস্ত মিডিয়াম খুঁজে পাইনি।'

উঠে আসছি। দেখি, আনমনে সিগারেট টানতে টানতে উপরের দিকে মুখ তুলে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন সমরবাবু। কি যেন ভাবছেন। হয়তো সেই সমস্যার কথাই তাঁর মাথায় ঘুরছে। অন্তত আমার তাই মনে হলো।

আনন্দ রায়

দেখুন অমল পালেকর কি বলেন,
"ভিনকোলা-১২ আমার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিল!"

অমল পালেকর কত ক্লান্ত থাকতেন সারাদিন! কাজের নামেই বিরক্তি আসত।

অমল পালেকর প্রতিদিন ২ বার ক'রে ভিনকোলা-১২ খেতে শুরু করলেন। শীঘ্রই বুঝতে পারলেন তাঁর জীবনে এক পরিবর্তন আসছে।

আজ ওঁর মনে কত উৎসাহ। সারাদিন হাসিমুখে কত কাজ করেন।

কতনা শক্তি, কতনা উৎসাহ! খুশীতে অমল পালেকর বলেন, "ভিনকোলা-১২ আমার জীবনে এক পরিবর্তন এনে দিল"।

Shilpi SPL 5/78 Ben

ভিনকোলা-১২
ভিটামিন বি-১২ যুক্ত আয়রন টনিক

এখন এক নতুন আকর্ষণীয় প্যাকে!

Standard
স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাস্যুটিক্যালস্ লিঃ
কলিকাতা ৭০০ ০১৬
ভারতে পেনিসিলিন ও অন্যান্য আধুনিক ঔষধাদির অগ্রণী প্রস্তুতকর্তা। স্থাপিত ১৯৩৪ সাল।

চিন্তামণি কর

একালের চিত্রশিল্পী

আমাদের চিত্ত সত্তার দুই মেরু—একদিকে মর্তের মৃত্তিকার আলো ছায়ার কলগুঞ্জন, অন্যদিকে স্বপ্নাদৃষ্ট কল্পনাশ্রয়ী এক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব। এই উভয় জগতে মানুষের নিরন্তর বিচরণ। শিল্পী চিন্তামণি করের শিল্প নিদর্শন দেখে এ অনুভূতিই জাগে। ভাস্কর্য বা চিত্রকলার রূপ কখনও বা শিল্পীর ধ্যানলব্ধ, কখনও বা চিত্তলোক থেকে উদ্ভূত, আবার কখনও বা দূর কোন ধূসর অতীতের ছায়াময় পৌরাণিক কাহিনী আশ্রিত। এইসব মূর্তি বা চিত্রকলা যুক্তি বা বিচারের উপাদান দিয়ে সব সময় সজ্ঞান কল্পিত নয়। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতীক। প্রতীক অর্থে বিশেষ কোন ভাবনার চিত্রময় বর্ণনা নয়, বা কোন জটিল দার্শনিক তত্ত্বেরও ব্যাখ্যা নয়।

অন্ততঃ ১৯৩০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ নিরীক্ষণ করে এ ধারণা স্পষ্ট হয়। শিল্প পরিক্রমা করতে গিয়ে মন হারিয়ে যায় এক অজ্ঞাত ভাবলোকে। শিল্পীর আশৈশব শিল্পপ্রীতির প্রশংসনীয় নমুনা মেলে জল রঙে আঁকা এক ছ' বছরের মেয়ের প্রতিকৃতিতে। মাত্র পনের বছর বয়সে আঁকা এই প্রতিকৃতিতে অবয়ব অনুযায়ী বিভিন্ন জল রঙের বিন্যাসে শিশুর সহজ সৌন্দর্য ও সরল স্বচ্ছ দৃষ্টি এমন নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

শিল্পী জীবনের আরও কয়েক ধাপ পেছনে গেলে তাঁর প্রগাঢ় শিল্পপ্রীতির সুস্পষ্ট সৌরভ মেলে। প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব। কীট-পতঙ্গ দেখতেও ভাল লাগত। এদের নিয়েই কল্পনার পাখায় ভর করে শিশুমন পাড়ি দিত রূপকথার বর্ণহীন স্বপ্নলোকে। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাতের খাওয়া সেরে বাড়ীর সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন চিন্তামণি করের দু চোখ রূপকথার সিংহ দরজায়। কিছুতেই ঘুম আসত না। হ্যারিকেন জ্বেলে বসে বসে ছবি আঁকতেন। বাবা রেল কোম্পানীতে চাকরী করতেন। তিনিও প্রকৃতিকে ভালবাসতেন এবং ছবি আঁকতেন। ছেলেকেও এ ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। বলতেন—যত আঁকবে ততই আনন্দ পাবে।

ছবি আঁকার খবর স্কুলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে চিন্তামণিবাবু বললেন—এখনও মনে পড়ে স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রচন্দ্র দাসের কথা। এমন শিক্ষক জীবনে দেখিনি। আমাদের নিয়ে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। নিজের ছেলের অধিক স্নেহ করতেন। কোন ভিসিটর স্কুলে এলে ডেকে পাঠাতেন। বলতেন ছবি আঁকতে। আমি সেই ভয়ে পালিয়ে যেতাম। সকলের সামনে ছবি আঁকতে তখন কি রকম লজ্জা করত কি বলব।

আর এক মজার ঘটনা। গ্রামে রংপুরের এক কুমোর এলেন বারোয়ারী পুজোর প্রতিমা গড়তে। ক্ষুদে শিল্পী পলকহীন চোখে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে দেখতেন প্রতিমা তৈরী। একদিন কুমোর বললেন—ওহে খোকা ঠাকুরের আঙ্গুল বানাতে পারবে? চিন্তামণিবাবু ঘাড় নাড়লেন। তিনি খানিকটা মাটি এগিয়ে দিলেন। ক্ষুদে শিল্পী অসীম আগ্রহভরে বানালেন কয়েকটা আঙ্গুল। ভদ্রলোক দেখে খুশী। বললেন—তোমার হবে। কাজ করে যাও। তারপর এক-এক করে প্রতিমার হাতে জুড়ে দিলেন আঙ্গুলেগুলো। মূর্তি গড়ার কাজে এই প্রথম উৎসাহ ও স্বীকৃতি।

ছেলেবেলা থেকেই শিল্পের সঙ্গে ছিল সঙ্গীত আসক্তি। একটু বড় গাইয়ে বাজিয়েদের সান্নিধ্যে এসে চিন্তামণি কর খুব নামজাদা সঙ্গীতশিল্পী হতে চেয়েছিলেন। তখনকার দিনে আবার লোকেরা সঙ্গীত

শিল্পীদের দেখতেন অন্য চোখে। তাদের ধারণা, যার কিছু হয় না সে-ই গান-বাজনা শিখে উচ্ছন্নে যায়। এমন সামাজিক পরিবেশে বাড়ীর ভয় ভর্ৎসনা উপেক্ষা করে চিন্তামণিবাবু লুকিয়ে চুরিয়ে যেতেন গানের আসরে। মস্তান গামা (অনুপম ঘটকের গুরু), সত্যেন ঘোষাল, শৈলেন চ্যাটার্জি, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, এনায়েত খাঁ, মহারাষ্ট্রের পণ্ডিত মুলে প্রভৃতি সঙ্গীতশিল্পীর গান-বাজনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আসরে শুনেছেন চিন্তামণিবাবু বহুবার। কসবায় জোড়া শিব মন্দিরের পুরোহিত সাধক শিল্পী। বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ গাইতেন। শিরঠাকুরের আজ্ঞা না পেলে গাইতেন না। ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত পুরোহিতঠাকুর শিবলিঙ্গের সামনে চোখ বন্ধ করে ধীর স্থির হয়ে বসে থাকতেন। তারপর হঠাৎ এক সময়ে বিড়বিড় করে অনুচ্চকণ্ঠে বলতেন,—এই সন্ধ্যেবেলায় ভৈরো শুনতে চাইছো ঠাকুর? আচ্ছা তাই হবে শোন। বলে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরতেন। সঙ্গীত পাগল চিন্তামণিবাবু বহু দিন কাটিয়েছেন এই পাগল সঙ্গীত সাধকের গান শুনে।

সঙ্গীতশিল্পী হবার বাসনা যখন চিন্তামণিবাবুকে রীতিমত পেয়ে বসেছে তখন এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে মেটেবুরুজে তার গুরুর কাছে গেলেন সেতার শিখতে। তখন চিন্তামণিবাবুর বয়স ষোল-পনের বছর। বন্ধুটি ওস্তাদের সঙ্গে চিন্তামণিবাবুর আলাপ করিয়ে দিলেন। ওস্তাদজি তখন নেশায়বিভোর। হাতে সুরাপাত্র। সাকরেদরা গুরুর কৃপাভিক্ষার আশায় তাকে ঘিরে বসে। পরিচয়ের পালা শেষ হতে ওস্তাদজি চিন্তামণিবাবুকে হাতের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বললেন—লে বেটা পী লে। চিন্তামণিবাবু হতবাক। কারণ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। তিনি এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন হতভম্বের মত। সাকরেদদের মধ্যে দু-একজন চোখের ইশারায় চিন্তামণিবাবুকে মদের গ্লাসটি গ্রহণ করতে বললেন। বন্ধুটিও ফিসফিস করে কানে কানে বলল—তাড়াতাড়ি নিয়ে নে। তুই গুরুর কৃপা পেয়ে গেছিস। এ সৌভাগ্য কজনার ভাগ্যে জোটে। হতবাক চিন্তামণিবাবু কোনো কথা না বলে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে সোজা রাস্তায় পা বাড়ালেন। তারপর থেকেই তাঁর গান শেখার মেশা গেল কেটে।

কিন্তু তাই বলে তাঁর সঙ্গীতপ্রীতি এতটুকু কমেনি। বরং অনুরাগ অনেকখানি বেড়েছে। কারণ চিন্তামণিবাবুর মতে, গান মানুষকে এমনভাবে নাড়া দিতে পারে যা আর কিছু পারে না। গান মানুষের মনকে গলিয়ে তার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে। তাছাড়া সঙ্গীতের সঙ্গে শিল্পের যোগ অবিচ্ছিন্ন। মিউজিক ডাজ নট রিকোয়ার এ মিডিয়াম। মাধ্যম অবলম্বন না করেই চলতে পারে। কিন্তু ভিসুয়াল আর্টের বেলায় একটা মাধ্যমের মধ্যে পৌঁছে দিতে হয়। ছবিতে রং ও রেখার সমন্বয়। সঙ্গীতে ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার ঝঙ্কার। কিন্তু দুটোতেই সুর ও ছন্দ আছে। প্রত্যক্ষ না হলেও দুটোর মধ্যে একটা পরোক্ষ সম্পর্ক আছে।

যাই হোক মেটেবুরুজে গিয়ে চিন্তামণিবাবুর শিল্পী হবার স্বপ্ন গেল ভেঙে। বাবা শিল্প ভালবাসলেও ছেলেকে ডাক্তার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ছেলের ইচ্ছে চিত্রশিল্পী হবার। একগুঁয়ে ছেলে নাছোড়বান্দা। বাবা প্রমাদ গুণলেন। ছেলের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত তাকে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টসে ভর্তি করে দিলেন। সেটা ১৯৩০ সাল। তখন গিরিধারী মহাপাত্র আর্টসে ভাস্কর্যের শিক্ষক। অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় ভাবধারায় ভাস্কর্য শেখানোর জন্যেই গিরিধারী মহাপাত্রকে কলেজে এনেছিলেন। কারণ তৎকালীন ভারত শিল্পে বিদেশী প্রভাব, বিশেষতঃ ইতালীয় প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি কর ছাড়া আর কেউই গিরিধারীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি। যাই-হোক চিন্তামণি কর ভাস্কর্য শিক্ষার জন্যে প্রথমে গিয়েছিলেন গিরিধারী মহাপাত্রের কাছে। কিন্তু ভাস্কর্য শিক্ষা সময়সাপেক্ষ বলে তিনি চিত্রকলার দিকে ঝুঁকলেন। কারণ গিরিধারী মহাপাত্র শিল্পীকে বললেন ষোল সতের বছরের আগে তোমাকে মূর্তি বানাতে দেব না।

চিত্রকলায় হাতেখড়ি হয়েছিল ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করা যেতে পারে প্রায় বছর খানেক আগে ক্ষিতীনবাবু এলাহাবাদে সুদীর্ঘ রোগ ভোগের পর দেহত্যাগ করলেন। ইনি ছিলেন অবনীন্দ্র অনুসারীদের মধ্যে অন্যতম। যাই হোক ত্রিশ দশকের এই সময়ে চিন্তামণি করের চিত্রকল্পনায় ও রচনাশৈলীতে ক্ষিতীনবাবুর কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে 'কৃষ্ণ অ্যান্ড গোপিনী' চিত্রের অন্তরালে ছোট্ট ইতিহাস। শিল্পী চিন্তামণি কর এই ছবিটি এঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গুরুর কাছে। পরম বৈষ্ণব ক্ষিতীনবাবু ছবি দেখে বললেন—এমন সুন্দর কৃষ্ণ এই সব সাধারণ পার্থিব গোপিনীদের ননীচুরি করতে পারে না। তার চেয়ে এক কাজ কর। আমার কাছে একমাস কীর্তন শোন। তারপর কৃষ্ণলীলার ছবি এঁকো। তবে যদি কিছু হয়। একথা শুনে নিজের ভুল বুঝে শিল্পী শিষ্য গুরুর সামনেই স্কেড দিয়ে কেটে কৃষ্ণ ও গোপিনীদের আলাদা করে দিলেন। এই ছবিটি চিন্তামণিবাবুর সংগ্রহেই আছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে খালি চোখেই জোড়া অংশ চোখে পড়ে। ওনার মৃত্যুর পর উনি আবার কাটা ছবিকে জুড়েছেন। চিন্তামণিবাবুর শিল্পী জীবনের উষালগ্নে অঙ্কিত জলরঙের চিত্রাবলী ট্রাডিশনাল স্টাইলে আঁকা হলেও অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত নব্যবঙ্গীয় চিত্রশৈলীর প্রভাবও কম নয়। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তস্বরূপ হরগৌরী, প্রভা মেডেনস, সাগরিকা প্রভৃতি উল্লেখ্য। ভাবমাধুর্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে এসব চিত্র অসাধারণ। চিন্তামণি করের খ্যাতি সুনিপুণ ভাস্কর হিসেবে। কিন্তু চিত্রাঙ্কনে তাঁর দক্ষতা এখনও অপরসীম। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'কিন্নরী' চিত্রের নাম করা যায়। এটি ৫ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে আঁকা। রং-এর গভীরতায়, কণিকাভঙ্গে ও অভিব্যক্তিতে চিত্রটি অপরূপ।

আলেখ্য 'রচনাকে শিল্পকলার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র আনন্দদায়করূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। প্রতিকৃতি অঙ্কনেও চিন্তামণি করের মুন্সিয়ানা ষোল আনা। পি সি চৌধুরী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পেন্সিল স্কেচে ঐসব ব্যক্তিত্বের নিজস্ব ভাবভঙ্গী ও চেহারার শুদ্ধ অনুকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে হুবহু। এছাড়া আরও অনেক স্কেচ ও লিথোগ্রাফের কাজ রয়েছে যার মধ্যে শিল্পী চিন্তামণি করের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

মুন্সিয়ানা তবে চিন্তামণি করের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্যে। ভাস্কর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে

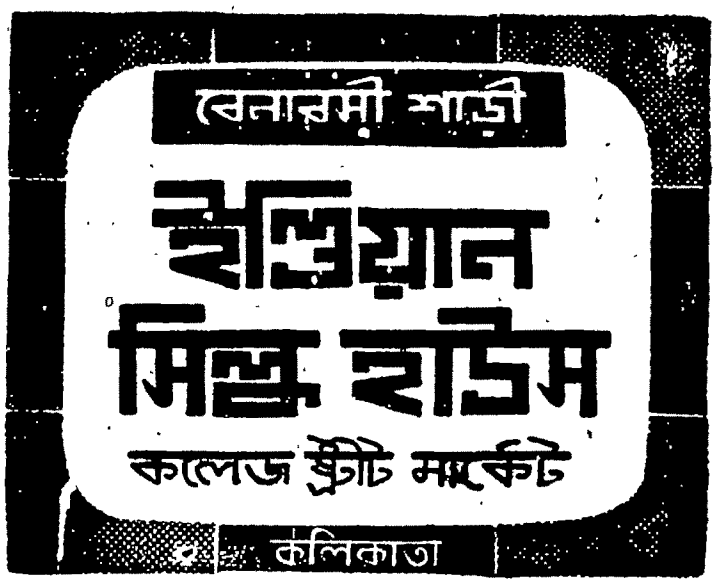

বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে শিল্পী যে বিচিত্র রস রচনা করেছেন তা খুব কম ভারতীয় ভাস্করের কাজে দেখা গেছে। প্রতিটি মিডিয়ামের বেলাতেই শিল্পী স্বকীয় মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন।

ত্রিশ দশকের শেষের দিকে (১৯৩৮-৩৯) অধিকাংশ ভাস্কর্য শিল্পীর শিক্ষা-লাভ ঘটে প্যারিসে। এই সময়ে চিন্তামণি বাবু ইতালীর ভিকটর জুভেনেল্লীর কাছে ভাস্কর্য শিক্ষার পাঠ নিলেও, সমকালীন অধিকাংশ কাজ রিয়ালিস্টিক ধরনের। এক লহমার শিল্পের যথার্থ প্রাণ বস্তুটিকে খুঁজে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না। উদাহরণ হিসেবে ট্রোসো, লা ফিই সুবিয়াঁ মাই ফাদার, ক্লাউড মেসেঞ্জার মাদার অ্যান্ড চাইল্ড প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু এই আঙ্গিকে বেশী দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। শুরু হল ভাংগাচোরা। খুঁজতে লাগলেন নতুন পথের সন্ধান। তখন পাশ্চাত্য শিল্পেও অস্থিরতা। ফর্ম ভাংগার জোয়ার বইছে। সেখানে তিনি অধ্যাপক হেলরীকের সংস্পর্শে এলেন। তারপর নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা ও সবীর শিল্পী সত্তার আত্মসমীক্ষার আলোকে খুঁজে পেলেন নিজেকে। মিলে গেল নতুন পথের সন্ধান। নতুন শিল্পশৈলীতে আত্মস্থ হলেন। তারপর হয়ে একের পর এক সৃষ্টি করলেন স্ক্যাটিং দি ট্যাগ, অপ্সরা, উষা ও সবিতা নটরাজ নটী, বুদ্ধ প্রভৃতি। এসব ভাস্কর্যের আকৃতি সম্পূর্ণ ভারত শৈলীর অনুকরণ নয়। শিল্পীর প্রাচ্য দেশীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার ফলে তিনি সেই বিশেষ ধারা অনুসরণ করেছেন কিছুটা। কিন্তু পুরোপুরি প্রযোগ করেন নি। উভয় ধারার সংগে স্বকীয়তার সংমিশ্রণ এক সামঞ্জস্যপূর্ণ অথচ সৌন্দর্যময় স্নিগ্ধ ভাব-ভংগিমার প্রবর্তন করেছেন। বহিরাগত আকৃতির রূপ আপাতঃ দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যধর্মী বলে মনে হলেও অন্তর্নিহিত ভাবটুকু সম্পূর্ণ ভারতীয়।

এ প্রসংগে শ্রীকর বলেন—'বাইরের চেহারাটা ভারতীয় দেখালেই ভারতীয় হয় না। এবং ভারতীয় চেহারায় বিদেশী পোশাক পরিয়ে দিলেই সেটা অভারতীয় হয় না দৃষ্টিভংগী যদি স্বচ্ছ হয়, তবে অনুভূতিকে প্রকাশ করার ভংগী যাই হোক না কেন তার দ্যোতনাটুকু যদি ঠিক থাকে তবে সেটাকে ছাপিয়ে ওঠা যায়। স্ক্যাটিং দি ট্যাগ যখন গড়ি তখন ভীষণ দ্রুতগতিসম্পন্ন যে মুড শূন্যে লাফ দিয়ে ভাসমান অবস্থায় মুহূর্তের সেই স্থিতিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। বিষয়টা পাশ্চাত্য, কিন্তু অভিব্যক্তি ভারতীয়। ভারতীয় শিল্প করতে গেলে যে ভারতীয় বিষয়বস্তুই নিতে হবে এমন নয়। অনুভূতি ও অভিব্যক্তিতে যদি ভারতীয় বৈশিষ্ট থাকে তবে তা ভারতীয়। বর্তমান যুগে এক নতুন আকর্ষণ এসেছে। অনেকেই অ্যাবসট্রাকসান করছেন। এটা যেন খানিকটা ফ্যাশানের মতন। ভাল মন্দ বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক যে প্রয়োজনের তাগিদেই এটা এসেছে। ভিত্তিটা কতটা গভীরে তার প্রমাণ হবে স্থায়িত্বে। রক্ষণশীল দলের সন্ত্রাসের কোন কারণ দেখি না। উদ্দেশ্যহীনভাবে যদি শিল্পীরা নিছক ফ্যাশনে গা ঢেলে দেন তো খারাপ। আর যদি সারবস্তু দেখে উৎসাহিত হয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছে বুকে নিয়ে করেন তবে কিছু হবে বলে আশা করা যায়।

আগেই বলেছি বিভিন্ন উপাদানে শিল্পীর ভাস্কর্য নির্মাণের দক্ষতা অপরিসীম। মার্বেলের অনেক কাজের মধ্যে ছোট কাজ লা ফিই ফুরিয়া-এর চোখের হাসি ও মুখের হাসি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিল্পীর এই প্রথম মার্বেল কাটা। সে এক ইতিহাস। ভাস্কর্যের পাঠ নেবার সময় শিল্পী অস্থির হয়ে উঠলেন পাথর কেটে মূর্তি করার জন্যে। একদিন গুরু জুভেনেল্লী শিষ্যের মনের কথা বুঝতে পেরে ছুঁড়ে দিলেন এক খণ্ড পাথর। শিল্পী অসীম আগ্রহভরে সযত্নে মার্বেল কাটলেন। কাজ দেখে জুভেনেল্লী মুগ্ধ হয়ে শিল্পীকে পাথর কাটবার ছাড়পত্র দিয়ে দিলেন। জুভেনেল্লী আজ আর জীবিত নেই। ১৯৪০ সালে দেহত্যাগ করেছেন। চিন্তামণিবাবুর অপর গুরু প্রখ্যাত ভাস্কর হেলরিক ইহলোক ছেড়ে চলে গিয়েছেন ১৯৪৩ সালে। ইনি ছিলেন বুর্দেলের ছাত্র। আর বুর্দেল হলেন রোঁদার অনুগামী। যাইহোক এই দুই গুরুর মৃত্যু সংবাদে চিন্তামণি কর রীতিমত ভেংগে পড়েছিলেন।

বিকাশোন্মুখ ওম্যান মার্বেল কাজের আর এক উল্লেখ্য নিদর্শন। এর কাজ সুরু করেছিলেন ১৯৪৪ সালে। নানা কারণে কাজে ছেদ পড়ে যায়। এটির কাজ শেষ করেছেন ১৯৭৫ সালে। ন্যুড স্টাডি টরসোতে কোন এক নারীর, নগ্ন অ্যানাটমি নিখুঁতভাবে ফুটেছে। পোর্ট্রেট স্টাডির মধ্যে সিলভিয়া ক্রিডা, স্যার উইলিয়াম বীচ ও মাই ফাদার প্রতিমূর্তি হিসেবে সার্থক ও শিল্পগুণ-সম্পন্ন।

কাঠের কাজের মধ্যে লক্ষ্মী, শক্তি, ওর্দালিসকে, সিরেন, নটী মাদার অ্যান্ড চাইল্ড রসোত্তীর্ণ। শিল্পী খুবই সাধারণ গাছের কাঠ দিয়ে ভাস্কর্য তৈরী করে প্রমাণ করে দিয়েছেন কোন কিছুই তুচ্ছ নয়। বকুল কাঠের তৈরী কেরিয়াটিড-এর স্নিগ্ধ সুঠাম রমণীয়। কাঁঠাল কাঠে বানানো গ্রোথ, শিরীষ কাঠের তৈরী মাদার অ্যান্ড চাইল্ড এবং সুচকুন্দ কাঠের সারস, উড কার্ভিং-এর উপাদানের ক্ষেত্রে সম্ভবত এক নতুন সংযোজন।

টেরাকোটা, ব্রোঞ্জ কিংবা অন্যান্য ধাতুর কাজেও শিল্পী সমান দক্ষ। টেরাকোটা কাজে রং-এর বৈচিত্র্য বিস্তার লক্ষ্য করার মত। কিস, মেডিটেসন, বুদ্ধ, দেবদাসীস, খুশী ডান্সার প্রভৃতি নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনিন্দ্য সুন্দর। এছাড়া টেরাকোটার ইকাবানা, পার্ক ফিগার, উষা অ্যান্ড সবিতা, ইকারাশ প্রভৃতি চিত্তহারী সৌন্দর্যে ও শৈলীর নিখুঁত বিন্যাসে ঐশ্বর্যশালী। বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং পৌরাণিক কাহিনীর সংগে শিল্পী মনের কল্পনা মাধুরী মিশিয়ে এক মায়াময় সৌন্দর্য রচনা করেছেন ঐসব ভাস্কর্য।

মিথ এবং রিয়্যালিটির অপূর্ব সংমিশ্রণ চিন্তামণি করের শিল্পী জীবনের জীবনবেদ। কখনও বা আলোছায়া সঘন বাস্তব অনুভূতির রূপান্তর ঘটিয়েছেন প্রতীকের আশ্রয়ে। আবার কখনও বা দেশী বিদেশী লিজেন্ডের কল্পনাশ্রয়ী অপরূপ রূপকথাকে রসায়িত করে তুলেছেন ভাস্কর্যে। আবার সময় সময় শিল্পীর প্রাথমিক জীবনের সংগীতপ্রীতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়েছে কিছু ছন্দোময় লীলায়িত কারুকর্মে।

চিন্তামণি করের জন্ম খড়গপুরে ১৯১৫ সালে। ১৯৩১ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্টস থেকে পাস করে বেরোন। ১৯৩৫-৩৭ পর্যন্ত দু বছর আর্ট-এর শিক্ষক পদে কাজ করেছেন টাকী সরকারী স্কুলে ও বীরভূম জেলা স্কুলে। এর পরে দিল্লী পলিটেকনিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বছর দুয়েক শিল্পের শিক্ষকতার নিযুক্ত ছিলেন। আর ১৯৫৬-৭৩ পর্যন্ত কলকাতা সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৪ সালে ভারত সরকার থেকে পদ্মভূষণে বিভূষিত হয়েছেন।

তরুণ শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে চিন্তামণিবাবু বললেন—অন্যান্য যে কোন রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবংগের তরুণ শিল্পীরা অনেক বেশী ভাল কাজ করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বেশ প্রতিশ্রুতিবান। তবে পৃথকভাবে কারও নাম করছি না। যথার্থ সুযোগ পেলে এরা আরও ভাল কাজের নমুনা দেখাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস। ছবির সমাদর শুধু মুখে বাহবা দিলে হবে না। শিল্পীর কাজকে ঘরে স্থান দিতে হবে। প্রকৃত পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ পেলে আরও অনেক প্রতিভার উন্মেষ ঘটবে নিশ্চয়ই।

আর স্মিত চিন্তামণিবাবুকে তাঁর নিজের কাজের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে স্মিত হেসে জবাব দেন—জীবন একটা পথ চলার মত। প্রতিনিয়ত অনেক জিনিস আমরা দেখি। তার মধ্যে কিছু কিছু মনে দাগ টানে। ঐ সুন্দর জিনিসটাকে ফের দেখার আকাঙ্ক্ষায় মন চিনে রেখে দিতে চায়। ঐটে হয় প্রতীক। ঐ প্রতীক থেকেই পরে অভিজ্ঞতার ফিরে যাওয়ার আনন্দ। আমার কোন কাজটা ভাল তার সঠিক বিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ দশ বছর আগে যে কাজ ভাল লাগত তা নেহাৎই সাধারণ বলে মনে হয়। মানুষের মন স্থিতিশীল নয়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার মত। তবে উঠছি কি নামছি জানি না। একই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দাপাদাপি করছি কিনা তাও জানি না। এর বিচার করবে রসিক, সমালোচক ও মহাকাল। আপনার প্রশ্নের জবাবটা এখানেই থাক। অনেক কথা বলেছি। আর নয়। আর যা বলার বইল তা আমার ভাস্কর্যই বলবে।

প্রশান্ত দাঁ

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কাঁটায় কাঁটায় তিনটে সুগন্ধনের মেয়ে কেনাগাম্মা এসে দরজার বাইরে দাঁড়াল।

ইন্দ্র চোখ তুলে তাকাতেই কেনাগাম্মা বলল, ছোট মেমসাহেব আপনাকে ডাকছেন।

ইন্দ্র তৈরী হয়েই ছিল বেরিয়ে পড়ল কেনাগাম্মাকে সঙ্গে নিয়ে। নারকেল বাগান পেরিয়ে রাস্তার কাছাকাছি এসে কেনাগাম্মা থেমে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল ইন্দ্র।

গাড়ীর স্টিয়ারিং এ গাল ঠেকিয়ে ইন্দ্রর দিকে চেয়েছিল সরিতা। ইন্দ্র কাছাকাছি যেতেই সোজা হয়ে বসল।

ইন্দ্র কাছে গিয়ে বলল, আপনি দারুণ পাংচুয়েল।

অপরাহ্নের রোদে সরিতার মুখে এক-রাশ জুই ফুল ফুটে উঠল।

সরিতা কিন্তু কোন কথা বলল না। ইন্দ্র বাঁ-দিকের দরজা খুলে ঢুকে বসল সরিতার পাশে। সরিতা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে পূর্ব উত্তর মুখের একটা পথ ধরল।

দুজনেই নীরব। সরিতা পথের দিকে সিধে চোখ রেখে গাড়ী চালাচ্ছে, আর ইন্দ্র আড়চোখে দেখছে সরিতাকে।

একেবারে টিপিক্যাল মালবালী, তরুণী। মসৃণ মাজা রং। ঘন চুলের রাশ। শেষ অংশটুকুতে সুন্দর একটুখানি সাদা ফুলের কাজ। সরিতা মুন্ডি পরেছে। সাদা কোচান লুঙ্গী। হাল্কা নীল রংয়ের জম্বরে বুক ঢাকা। তার ওপর দিয়ে স্রোচে আঁটা সোনালী পাড় একখানা সিল্কের সাদা নেরিয়ল প্রপাতের মত বুকের ওপর ঢেউ তুলে কোমর অব্দি নেমে এসে পাক খেয়ে দেহের গভীরে হারিয়ে গেছে।

ভারী মিষ্টি একটা গন্ধ ইন্দ্রের নাকে এসে লাগছে। ওটা সরিতার বিনুনীতে বাঁধা ফুলের গন্ধ, কি উর্ধবাস জম্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা ঘামের সঙ্গে মিশ্রিত কোন সৌগন্ধ তা ইন্দ্র অনুমান করতে পারল না।

সেই মুহূর্তে ইন্দ্রর কেন জানি না মনে হল সরিতা দ্রুত ধাবমান এক কস্তুরী মৃগ। আপন যৌবনের সুবাসে আপনি বিভোর।

ইন্দ্র বলল, আমরা এখন কোথায় চলেছি?

একটা গাড়ীকে স্পিডে ওভারটেক করে বেরিয়ে গিয়ে সরিতা বলল, জানি না।

ইন্দ্র বলল সে কি, নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই যাবার?

সরিতা গাড়ীর স্পিড কমিয়ে নিয়ে বলল, ইচ্ছে হলে এখনও আপনি ফিরে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল, তাই বুঝি আমি বলেছি।

সরিতার গাড়ীর পাশ দিয়ে পেছনের গাড়ীটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

সরিতা আবার স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। সামনের গাড়ীটার সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে আনতে আনতে বলল, হাতে স্টিয়ারিং যেখানে খুশী যাব।

ইন্দ্র আর কোন কথা বলল না। সে দেখল, সরিতা দুটো ঠোঁট এক সঙ্গে চেপে ধরে একাগ্র দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে ঝুঁকে পড়ে গাড়ী চালাচ্ছে।

আবার সরিতার গাড়ী প্রতিযোগিতায় জিতে গেল। এখন আরও স্পিডে বেশ কিছু দূর চলে এসে সরিতা অনেকটা স্বাভাবিক হল।

ইন্দ্র বলল, আপনার ভেতর একটা উত্তেজনা সব সময় কাজ করছে।

কি রকম?

ইন্দ্র বলল, এই যেমন লরীটাকে ওভার-টেক করা; হুট করে সামান্য পরিচিত একটি যুবকের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়া।

সরিতা বলল, কি বললেন আর একবার বলুন।

ইন্দ্র বলল, এইটুকু পরিচয়ে কাউকে কি সত্যিকারে চেনা যায়?

সরিতা বলল, চেনা গেলে ওতেই যায়, নইলে সারা জীবন চোখে চোখ পেতে বসে থাকলেও চেনা যায় না।

গাড়ী চলছে গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। মাখন রংয়ের গামপুতে আমের গাছ ভরে আছে। যেন কোন দক্ষ কারিগর ছোট ছোট মুক্তোর দানায় মুকুট তৈরী করে সাজিয়ে রেখেছে গাছের শাখায় শাখায়। পড়ন্ত বেলায় মেয়েরা জল নিতে এসেছে। কিনারের চার-পাশে বাবান বেদীতে কেউ বা ছড়িয়ে বসেছে, কেউ বা কুডমে ইতিমধ্যেই জল ভরে মাথায় তুলেছে। চলে যাবার আগে আলাপিনীদের সঙ্গে হয়ত দু' চারটে বাসকতার কথা বলছে। চেম্বু কুডম, পিওলকুডম, আর মান কুডমের ছড়াছড়ি দেখে মনে হচ্ছে তামা পেতল আর মাটির কলসীর যেন হাট বসেছে।

গাড়ীটা একটু থামাবেন বড্ড জল তেষ্টা পেয়েছে—শুকনো গলায় বলে উঠল ইন্দ্র।

—সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক কষে গাড়ী দাঁড় করাল সরিতা।

গাড়ী থেকে নেমে বলল, চলুন কিনারের ধারে। আঞ্জলা ভরে খেতে হবে কিন্তু।

ইন্দ্র আর সরিতা এগিয়ে গেল কুয়োর দিকে। আট দশটি মেয়ে তখন নির্বাক হয়ে ওদের দেখছে। যে মেয়েটি কিনার থেকে জল টেনে তুলছিল তার হাতের দড়ি হাতেই ধরা রইল। কুয়োর মাঝপথে ওরা বালতি দোল খেতে লাগল।

ইন্দ্র তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমার হাতে একটু জল ঢেলে দেবেন তেষ্টা পেয়েছে।

সব কটি চোখ একঝাঁক ভোমরার মত ইন্দ্রের দিকে ধেয়ে গেল।

যে মেয়েটির বালতি কুয়োর ভেতর দুলতে দুলতে থেমে গিয়েছিল সেই তরুণী মেয়েটি সিঁড়ির ওপর বাঁ পাখানা রেখে ডান হাতে দড়ি ধরে দ্রুতলয়ে টানতে টানতে বালতিটাকে তুলে আনল ওপরে।

নিজের পিওলকুডমে জলটুকু ভরে নিয়ে সেই কলসী ওপরে তুলে অনেক যত্ন করে ইন্দ্রের অঞ্জলি করা হাতের ভেতর ঢালতে লাগল।

ইন্দ্র সুটখানা বাঁচিয়ে ঠোঁট দুটো সরু করে জল খাচ্ছিল। কিছু পরে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল তৃষ্ণা তার মিটেছে। অমনি সরু জলধারাটি ইন্দ্রের হাত থেকে ম্যাজিক স্টিকের মত অদৃশ্য হয়ে গেল পিওল কুডমের ভেতর।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে সরিতা দেখছিল ইন্দ্র তার কাছে ফিরে এল। দুজনে মিলি করে হাসল মেয়েদের দিকে চেয়ে। ওরা কেউ কেউ হাসি দিয়ে প্রত্যুত্তর দিল ওদের।

একটি তরুণী মেয়ে সরস গলায় বলল কোথায় চলেছেন?

সরিতা যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল থেমে দাঁড়িয়ে মুখখানাকে কাৎ করে ফেরাল। চোখে মুখে খুশীর ঢেউ তুলে বলল এ দেশের আকাশ চাঁদ ডোবে না আর ফুলের থেকে মধু গড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। অমনি বলে উঠল, হানিমুনে যাচ্ছেন?

সরিতা পেছনে হাত নাড়তে নাড়তে গাড়ীর দিকে দ্রুতপায়ে চলল। আর মেয়েরা খিলখিল হাস্যে যেন তাদের ভরা কলসীর জল উজাড় করতে লাগল কুয়োর ভেতর।

ইন্দ্র কথাটা শুনতে পেয়েছিল, কিন্তু সে আগেই পা চালিয়ে চলে এসেছিল গাড়ীর কাছে। সরিতা এলে সে তার জায়গায় গিয়ে বসল। সরিতা গাড়ীতে স্টার্ট দিলে ইন্দ্র একবার মুখ বের করে হাত নাড়ল। অমনি একরাশ পাতা যেন চঞ্চল হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওদের অভিনন্দন জানাতে লাগল। যতক্ষণ ওদের দেখা গেল ততক্ষণ ওরা অক্লান্ত উৎসাহে হাত নেড়ে চলল।

এক সময় গাড়ী চালাতে চালাতে সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি দারুণ চুপকী লোক মশাই।

কি রকম?

ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে পারেন।

ইন্দ্র মাথা চুলকে বলল, আর একটু সহজ করে বলুন।

সরিতা বলল, এই যেমন ঠিক জায়গাটি বুঝে তেষ্টা পেয়ে গেল।

ইন্দ্র হেসে উঠে বলল, আমার জল-তেষ্টার ব্যাপারটা বিশ্বাস করলেন না।

আমার কথাটা কি অবিশ্বাসের মত শোনাচ্ছে?

ইন্দ্র বলল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব যেন আপনারও তেষ্টা পায়, আর সে সময় যেন একরাশ ছেলে রাস্তার ধারে কোকাকোলা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

সরিতা বলল, তেষ্টায় বুক ফেটে গেলেও আমি খাব না।

ইন্দ্র বলল, এ আপনার জেদের কথা।

সরিতা বলল তা বলতে পারেন এক রণের একগুঁয়েমি আছে আমার চরিত্রে।

গাড়ী এসে থামল একটা বাজারের কাছে। বাজারের মাঝখানের কানেল চলে গেছে। কানেলে অনেক নৌকো জড়ো হয়েছে। নারকেল দড়ি বোঝাই কোনটাতে, কোনটায় বা আস্ত নারকেল, তেলের ড্রাম, মশলাপাতির বস্তা নানান ওঠান চলছে।

ইন্দ্র বলল, গঞ্জের মাঝখানে গাড়ী থামালেন কেন?

সরিতা হেসে বলল, আপনি নারকেল কুঞ্জের মাঝে যদি গাড়ী থামিয়ে মেয়েদের কাছ থেকে জল চেয়ে খেতে পারেন, তাহলে আমিও গঞ্জের মাঝখানে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটু বীরত্ব দেখাই না কেন।

সরিতা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বলল, আসুন কোকাকোলা খাওয়া যাক।

ইন্দ্র চারদিকে একবার চেয়ে নিয়ে বলল, কই কোন মহিলা বিক্রেতাকে তো চোখে পড়ছে না।

সরিতা বলল, আপনি এত সিরিয়াস কেন? কখন একটা কথা বলেছি আর তাই মনে করে রেখে দিয়েছেন। বলেছি না, নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েছি সুতরাং আমাদের ভাবনারও কোন নিয়ম কানুন থাকবে না।

ওরা দুজনে সামনের দোকানে গিয়ে দুটো কোকাকোলা নিয়ে খেতে লাগল।

সরিতা স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে একটু একটু করে টানছিল আর চোখের তারা ভুরুর দিকে তুলে দেখছিল ইন্দ্রকে।

হঠাৎ খেয়াল চাপল মাথায়। অমনি বলে উঠল, একটু কাজু খেলে হয় না? স্পেশ্যাল ঐ দোকান থেকে যদি এক প্যাকেট...।

কথা শেষ হবার আগেই ইন্দ্র বলল, ও সিয়োর!

বলেই তাকাল দোকানটার দিকে। ওর আধ খাওয়া বোতলটা ডান হাতে ধরে নিল সরিতা।

বলল, আমার জিম্মায় রেখে যান, ফিরে এসে অক্ষতই পাবেন।

ইন্দ্র চলল কাজু কিনতে আর সেই মুহূর্তে সরিতার বুকের অনেক গভীর থেকে একটা ইচ্ছা শীতের সকালের শিরশিরে হাওয়ার মত প্রতিটা রোমকূপ কাঁপিয়ে উঠে এল।

ইন্দ্রের কোকাকোলার স্ট্রতে ঠোঁট ছুঁইয়ে খানিকটা টেনে নিল গলায়।

মুহূর্তে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বিবশ হয়ে গেল।

পরমুহূর্তেই একটা অপরাধ বোধ জাগল মনে। খেয়ালের খেলায় এমন একটা অন্যায় সে করে বসল কি করে! সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের দুঃখ তার এতদিনের মার্জিত মনটাকে পীড়িত করতে লাগল।

ইন্দ্র ফিরে এসে বলল, নিন আপনার কাজুর প্যাকেট। দিন আমার কোকাকোলার বোতল।

সরিতা ইতস্তত করতে লাগল বোতল দুটো হাতে নিয়ে। বলল, সরি মিঃ রায় দুটো মিশে গেছে।

ইন্দ্র অর্ধপূর্ণ চোখে সরিতার কাতর মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে বলল, ও কিচ্ছু হবে না, দিন চোখ বন্ধ করে যে কোন একটা হাত বাড়িয়ে। ওটাই ঠিক আমার বোতল হয়ে যাবে।

সরিতা বলল, ভুল যখন আমি করেছি প্রায়শ্চিত্ত আমার। আমিই দুটো শেষ করব। আপনি বরং দোকান থেকে আর একটা নিয়ে নিন।

ইন্দ্র বলল, ভুল করেছেন ঠিক কিন্তু ভুলটা দারুণ রকম মিষ্টি। আর আপনার যখন দুটো খেতে আপত্তি নেই, তখন আমারও যে কোন একটা খেতে আপত্তি থাকার কথা নয়।

সরিতা সংকোচ করছে দেখে ইন্দ্র একটা দশ পয়সা বের করে বলল, হেড না টেইল?

নাটক — নাটক

প্রকাশিত হোল :—

সুশীল মুখোপাধ্যায়ের

আশ্চর্য। মিলনমেলা

দুইটি সামাজিক নাটক একত্রে

গ্রন্থপীঠ

২০৯।১, বিধান সরণি, কলিকাতা ৬

শীঘ্রই বের হবে

বিজয় তেণ্ডুলকরের

মূল মারাঠি নাটকের বঙ্গানুবাদ

চোপ্ আদালত চলছে

শক্তিপদ রাজগুরুর

মেঘে ঢাকা তারা (৪র্থ মুদ্রণ)

সরিতা থমকে থেমে আছে দেখে ইন্দ্র বলল, বলুন বলুন বাঁ-হাতেরটা টেইল আর ডান হাতেরটা হেড।

সরিতা সহজ হল, হেড।

পড়ল হেড।

ইন্দ্র বলল, দেখলেন তো আপনার ইচ্ছার সঙ্গে ভাগ্যটাও কেমন মিলে গেল। ডান হাতেরটা আপনার না হয়েই যায় না। দিন আপনার বাঁ হাতের পানীয়টা আমাকে দিন।

হাসতে হাসতে সরিতা নিজের কোকা-কোলাটা ইন্দ্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, এখন থেকে কিন্তু এমনি লটারী করে আমাদের খুঁটিনাটি সব ডিসপিউটের সমাধান হবে।

ইন্দ্র বলল, আমি একশো একবার রাজি।

যে খেলাটা একটা গোপন উত্তেজনার ভেতর দিয়ে শুরু হয়েছিল সেটার এমন একটা মজার পরিণতিতে সরিতার মনটা খুশীতে ভরে উঠল।

ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চেয়ে কোকাকোলা খেতে লাগল। পানীয়টুকু এখন আর শুধু নিরীহ পানীয়ই রইল না, দারুণ একটা উত্তেজক ক্রিয়া শুরু করে দিল দেহের ভেতর গিয়ে।

গাড়ী ছুটে চলেছে। সরিতার মুখে কথা নেই। ইন্দ্র ভাবছে সবিতার কথা। প্রেমা আর সরিতার ভেতর স্বভাবে আর আদলে কত ফারাক। প্রেমার রংয়ে কাচা হলুদের জৌলুস আর সরিতার রংয়ে শ্যামল ছায়া মাখান। প্রেমার ফিগার নাচের জন্য পরিকল্পিত আর সরিতা সরল সবুজ একটা বৃক্ষের মত। নিপুণ ছন্দের লীলায় প্রেমা সাগরের মত উত্তাল আর সরিতা হাওয়ার বুকে দোল খাওয়া লতার মত ধরা অধরার খেলায় মাতোয়ারা। প্রেমা শিল্পী তার চলায়, বলায় ভাবনায়। সরিতা খেয়ালী, তার স্বভাবের রোদ-বৃষ্টির লীলায়। একজন ঘূর্ণির মত তার আবর্তন বিন্দুর দিকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ করে গুণমুগ্ধদের, অন্যজন ঝিরঝিরে এক পশলা বৃষ্টির মত পথচারীকে ভিজিয়ে দিয়েই খুশী।

এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে হৈ চৈ করতে করতে বেরিয়ে এলো একটা পাঠশালা থেকে। ছুটির খুশীতে তারা দিকহারা। পথের ওপর ছুঁড়ে দেওয়া এক মুঠো সাদা মার্বেলের মত ছড়িয়ে পড়েছে ইতস্তত।

হর্ণ বাজিয়ে চলেছে সরিতা, আর ওরাও হর্ণের অনুকরণ করে চলেছে মুখে মুখে।

একটু একটু করে গাড়ী এগোচ্ছে আর ছেলেগুলো ড্রাম বাজাচ্ছে গাড়ীর গায়ে।

হুট্ করে সরিতা গাড়ীর বকসটা খুলে বের করল একটা ছোট বল। লাল রংয়ের বলটা ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালে। তারপর ছুঁড়ে দিলে পথের ধারে নারকেল বাগানটা লক্ষ্য করে। আর যায় কোথা, বলটা ছুটে চলল লাফাতে লাফাতে। আর তার পেছনে ছেলের পাল ছুটল সমান পাল্লা দিয়ে। পথ একদম পরিষ্কার। অমনি হুস্ করে বেরিয়ে গেল সরিতার গাড়ী।

ভাবনার ভেতর ডুবে আছে সরিতা। চিন্তার সুতোটা হঠাৎ কেটে গিয়েছিল তাকে আবার জোড়া দিয়ে নিয়েছে সে।

ইন্দ্র বলল, কি ভাবছেন?

সরিতা একটুখানি চমকে উঠে বলল, ব্যক্তিগত ভাবনার কথা প্রকাশ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

অমনি ইন্দ্র পকেট থেকে পয়সা বের করতে যাচ্ছে দেখে সরিতা গাড়ী থামিয়ে দুটো হাত জোড় করে বলল, দোহাই আপনার, মনের কথা টেনে বার করতে আর টস করবেন না।

ইন্দ্র বলল, আমরা লটারীর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি হারলে, আপনাকে আর মনের কথা বলতে হবে না। বেকসুর খালাস।

সরিতা বলল, কিন্তু আপনি যদি জেতেন, তাহলে তো গেছি। মরে গেলেও বলতে পারব না।

ইন্দ্র বলল, বেশ, তাহলে ভেঙ্গে যাক্ আমাদের প্রতিশ্রুতি।

সরিতা গাড়ী থামিয়ে ফেলেছে। শেষ সূর্যের আলোটুকুর মত কবুণ করুণ মুখ করে বলল, আচ্ছা করুন তাহলে লটারী।

পয়সাটা ইন্দ্রের আঙ্গুলের টুসকীতে সার্কাসের ঝকমকে কিশোরী মেয়ের মত ডিগ্বাজী খেতে খেতে ওপরে উঠে গিয়ে আবার নেমে এল ওর হাতের পাতায়।

মুহূর্তে অন্য হাতে পয়সাটা চেপে ধরে ইন্দ্র বলল, বলুন হেড না টেল।

ভীতু ভীতু গলায় সরিতা বলল, টেল।

হাত সামনে এনে বলল, হেরেছেন। সববারে কি আর জেতা যায়।

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে চালাতে লাগল সরিতা। ইন্দ্র তাকে কোন প্রশ্নই আর করল না।

বেশ কিছু পথ গাড়ীটাকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে এক সময় সবিতা বলল কই জিজ্ঞেস করলেন না তো কি ভাবছিলাম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
হীরা মাণিক জ্বলে ৫৲
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সাঁঝের মল্লিকা ৫৲ বিদেশিনী ৪৲ কাঞ্চন রাগিনী ৮৲
বকুলবাসর ৫৲ বাজীকর (যন্ত্রস্থ)
আশাপূর্ণা দেবী
ঝিনুকে সেই তারা ৯৲ নীলপর্দা ৫৲
..... ওরা বড় হয়ে গেল ৫৲
কখনো দিন কখনো রাত ৩০৲
নীহাররঞ্জন গুপ্ত
সূর্য অপস্যা ১০৲ রাত্রি নিশীথে ৭॥ কনকপ্রদীপ ৬৲
মায়ামৃগ ৬৲ বাদশা ৫৲ ময়ূরমহল (নাটক) ৩৲
কিরীটী অমনিবাস (খন্ডে খন্ডে প্রকাশিত)
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
তিনে একে চার ২০৲ পাও নাই পরিচয় ৫৲
বহ্নি বাজে বাঁশী ৪৲ তিন সঙ্গিনী ৩॥
প্রবোধকুমার সান্যাল
তিন কন্যার ঘর ৭॥ অগ্নিকন্যা ৪৲ গঙ্গাপথে গঙ্গোত্রী ৩॥
বিমল মিত্র
বিষয় বিষ নয় ৭৲ আমি ১৬৲ পরস্ত্রী ২৫৲ তিন ছয় নয় ৮৲
অমর সাহিত্য প্রকাশন : ৭ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

আমি? জিতেছেন যখন, তখন বলতে আমি বাধ্য।

ইন্দ্র বলল, আমার জানা হয়ে গেছে।

সরিতা অবাক হয়ে বলল, আপনার জানা হয়ে গেছে কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আপনার ভাবনাগুলো যে পথের ইঁট পাটকেল কিংবা হোটেলের সুগন্ধনকে নিয়ে নয় তা হলপ করে বলতে পারি।

সরিতা স্পষ্ট করে বলল, আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আমি জানি।

সরিতার গাড়ীর স্পীড কমল। চোখ দুটো একবার ইন্দ্রের মুখের ওপর ফেলে বলল, এত অহংকার।

ইন্দ্র বলল, একটি যুবকের কাছে বসে যদি একটি মেয়ে বলে, আমি আমার পোষা বেড়ালটার কথা ভাবছিলাম, তাহলে ছেলেটির সেখান থেকে উঠে চলে যাওয়াই উচিত নয় কি? হর ইন্দ্র রায়ের কথা আপনি ভাবছিলেন, নয় ইন্দ্র রায় আপনার পাশে এই মুহূর্ত থেকে তার বসার অধিকার হারাল।

সরিতা বলল, বাব্বা আপনার বিশ্লেষণের বলিহারি। হার মানলাম আপনার কাছে।

ইন্দ্র বলল, উঁহু, শুধু শুধু হার মানলেই পার পাওয়া যাবে না, বলতে হবে কি ভাবছিলেন?

সরিতা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে ইন্দ্রের দিকে এক ঝলক চেয়ে নিয়ে বলল, ভাবছিলাম আপনি একটা বিচ্ছিরি ছেলে।

বলেই সিকসটি মাইল স্পীডে গাড়ীর কাঁটা তুলে সিধে রাস্তায় ঝড়ো হাওয়ার মত উড়ে চলল।

ওরা পাশাপাশি বসেছিল থঙ্গচেরি লাইট হাউসের কাছে একশো চুয়াল্লিশ ফিট উঁচু লাইট হাউসের মাথায় পাঁচ হাজার ওয়াটের বাল্ব থেকে আলো ছুটে চলেছে। আরব সাগরের বুকের জলযানগুলো আঠারো মাইল মাইল দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে ঐ একচক্ষু পলিফেমাসকে। অবশ্য ওডেসীর দৈত্যাকৃতি পলিফেমাস ছিল ক্রূর সংহারক, আর থঙ্গচেরির বাতিঘর ইউলিসিসদের অভয়দাতা।

সমুদ্রের চেস্ট সন্ধ্যার অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছিল।

সরিতা বলল, আপনি গাড়ী খারাপ হয়ে যাবার দিন রাতে যে ভূতের গল্পটা বলেছিলেন, তার শেষটুকু আর বলেননি।

ইন্দ্র বলল, কি রকম, আমার গল্পের তো ঐখানেই শেষ।

সরিতা বলল, আপনি তো দেখছি ভীষণ নিষ্ঠুর। দুটি ছেলেমেয়েকে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে রইলেন।

ইন্দ্র হেসে বলল, ওরা এখনও আরব সাগরের জলে সাঁতার কাটছে, কূলে উঠতে পারেনি।

সরিতা সন্দেহের চোখে তাকাল ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্রের মুখে দুষ্টুমির হাসি।

সরিতা ইন্দ্রের থাইএর ওপর একটা চাপড় মেরে বলল, আপনি ভীষণ বানিয়ে গল্প বলতে পারেন, আপনাকে একটুও বিশ্বাস নেই।

ইন্দ্র বলল, আস্থা রাখতে হয়, তাতে কর্মীদের কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় বেশী। মালিপক্ষ সন্দেহবাতিক হলেই মুশকিল।

সরিতা বলল, গল্পের শেষটা না বললেও আমার জানা।

ইন্দ্রের গলায় কৌতূহল, কিরকম বলুন তো? আমার সঙ্গে মেলে কিনা দেখি।

সরিতা বলল, আমি যতদূর জানি ওরা ঢেউএর ওপর ভাসতে ভাসতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দুজনের কারোরই আর ক্ষমতা ছিল না সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার।

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল একটা জেলে নৌকো ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওরা প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেদের ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করল জলের ওপর।

সরিতা একটু থেমে ইন্দ্রের দিকে চেয়ে বলল, মিলেছে আপনার গল্পের সঙ্গে?

ইন্দ্র হেসে বলল, মিল আছে বলেই তো মনে হচ্ছে।

সরিতা বলল, এবার তাহলে আপনি বলুন, আমি মিলিয়ে দেখি।

ইন্দ্র বলল, পালতোলা জেলে নৌকোটা এগিয়ে এল। তারা ওদের নৌকোয় তুলতে গিয়ে দেখল, একজনের বেশী হলে নৌকাটা ডুবে যাবে নির্ঘাৎ। তাই জেলেরা চেঁচিয়ে বলল, তোমাদের ভেতর শুধু একজনই আসতে পার। বল কে আসতে চাও?

ইন্দ্র সরিতার দিকে ফিরে বলল, বলুন, তো এবার, দুজনের ভেতর কে নৌকোয় উঠেছিল?

সরিতা বলল, আমি যতদূর জানি মেয়েটি ছেলেটিকে অনেক করে বোঝাল। বেঁচে থেকে তার কোন লাভ নেই। কারণ সমাজের সীমানা পেরিয়ে একবার চলে এলে মেয়েদের সমাজ কোনদিনই আর ফিরিয়ে নেবে না। কিন্তু সেদিক থেকে ছেলেদের কোন অসুবিধা নেই। তাদের সানন্দে সমাজ ঘরে তুলে নেবে। তারা সুখী সংসার রচনা করতে পারবে। তাই মিথ্যে ভাবালুতার ভেতর দুজনে সমুদ্রের তলায় তলিয়ে না গিয়ে একজনেরও অন্তত বাঁচতে হবে। আর তাছাড়া ছেলেটি বেঁচে থেকে চিরদিনই তাকে মনে করে রাখুক, এ ইচ্ছাটুকু জানাল মেয়েটি। তখন মেয়েটির অনুরোধে ক্লান্ত ছেলেটিকে ঢেউএর ওপর থেকে তুলে নিল জেলেরা। এখানেই আমার জানা গল্পের শেষ।

ইন্দ্র বলল, না আমার গল্পের শেষ এখানে নয়।

সরিতা বলল, কি রকম?

ইন্দ্র বলল, আমার জানা গল্পের শেষ হয়েছে একটা ঝড়ের ভেতর।

সরিতা বলল, ঝড়!

ইন্দ্র বলল, সারা আরব সাগর জুড়ে উঠল প্রচণ্ড ঝড়। মনে হল ঘূর্ণিপাকে সপ্ত সাগরই ঘুরছে। নৌকোটা কলার মোচার মত চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে নেমে চলল।

এদিকে মেয়েটি কিন্তু ঘূর্ণির বাইরে থেকে গেল, আর একটা প্রচণ্ড হাওয়া তীর-মুখী স্রোতের ওপর দিয়ে ওকে ঠেলতে ঠেলতে এন ফেলল একেবারে কেরালার কূলে। থঙ্গচেরি লাইট হাউসের পাশে

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান

প্রধান সম্পাদক : ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত । সম্পাদক : শ্রীঅঞ্জলি বসু / ঐতিহাসিক কাল থেকে ফেব্রুয়ারি ৭৬ পর্যন্ত বাঙলার সংস্কৃতি জগতের কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উল্লেখ্য দান আছে এমন প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঙালীর জীবনচরিত বোধ গবেষণা ও প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে, জন্মসূত্রে বাঙালী নন, তাঁদেরও জীবনী নিমবিষ্ট। ৬৪৮ পৃষ্ঠা, লাইনো হরফে ঝরঝরে ছাপা, মজবুত বাঁধাই। [মূল্য : টাঃ ৪০-০০]

স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক উক্ত বিষয়ের তথ্যসমৃদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা। [টাঃ ২০-০০]

প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য

অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রণীত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ। সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষার সাহিত্য বিশেষভাবে আলোচিত। [টাঃ ২৫-০০]

তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ

সম্পাদক : অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য। তারাশঙ্করের সমগ্র ছোটগল্প (প্রায় ২০০) কালানুক্রমিক সাজিয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। ১ম ও ২য় খণ্ড প্রকাশিত, ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ। [প্রতি খণ্ড টাঃ ৪০-০০, একত্রে অগ্রিম মূল্য টাঃ ৮০-০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা (৩৫-৭৬৬১)

সমুদ্রের বেলাভূমিতে ও যেন বালির বিছনার ওপর ঘুমিয়ে পড়ল।

সরিতা উৎসুক গলায় বলল, আর ছেলেটির কি হল?

ইন্দ্র বলল, সে স্বার্থপর ছেলেটা মেয়েটিকে একা জলে ফেলে নৌকোতে উঠে এসেছিল, তাই শাস্তিটাও তাকে পেতে হল চরম। তার নৌকো ঘূর্ণির পাকে ঘুরতে ঘুরতে একেবারে সমুদ্রের তলায় গিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল।

একটু থেমে ধীর গলায় ইন্দ্র বলল, এখন কেউ যদি সেই জলের তলায় গিয়ে নামে তাহলে দেখতে পাবে ছেলেটি ভাঙা নৌকোখানার ওপরে দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে শুয়ে আছে। সমুদ্র শৈবালের দল শব-দেহের পুষ্পসজ্জার মত জেগে রয়েছে তার চারিদিকে। আর একটি রুপোলী মাছ হাল্কা তরঙ্গের দোলায় দুলতে দুলতে ছেলেটির ভাসমান চুল ছুঁয়ে তার ঘুমন্ত মুখখানাতে চুম দিয়ে যাচ্ছে।

সরিতা বলল, আপনি কিচ্ছু জানেন না। সে মেয়েটি কূলে আছড়ে পড়ামাত্রেই তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে একটি রুপোলী মাছ হয়ে খুঁজতে গিয়েছিল সেই ছেলেটিকে সমুদ্রের তলায়।

ইন্দ্র বলল, তাহলে বলতে হয় মেয়েটি সত্যই ছেলেটিকে ভালবেসেছিল।

সরিতা জোরের সঙ্গে বলল, বেসে-ছিলই তো।

সময়ের হিসেব ছিল না ওদের। সমুদ্র সারাক্ষণ শব্দ করছিল। বাতিঘরের ছড়িয়ে পড়া অতি উজ্জ্বল হলুদ আলোটাকে অলৌকিক একটা কিছু বলে মনে হচ্ছিল। আরব্য রজনীর কোন কাহিনী শোনাবার জন্যে শাহরাজাদী যেন প্রস্তুত হচ্ছিল। বাদশা শাহবিয়ার গল্পের জাদুকী শাহরাজাদীর দিকে চেয়েছিল গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে।

সরিতা বলল, আমি একেবারে বানিয়ে কিছু বলতে পারিনে আপনার মত।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝি খুব বানিয়ে কথা বলি?

বলেনই তো।

আর বলব না।

অমনি রাগ হয়ে গেল মশাই এর। প্রশংসা করলেও বিপদ। গল্প যিনি বলতে পারেন তাঁকে তো সকলেই তোয়াজ করে জানি।

ইন্দ্র বলল, আমার গল্প শুনতে সত্যি আপনার ভাল লাগে?

প্রশংসা করবার শুনতে চান?

ইন্দ্র বলল, বিশেষ বিশেষ মুখে বারবার।

সরিতা বলল, আপনি তো দারুণ লোভী দেখছি। একটি বিশেষ মুখের প্রশংসাতে সন্তুষ্ট নন। বিশেষ বিশেষ মুখের প্রশংসা চাই।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল দেখে সরিতা বলল কি হল চুপচাপ যে?

ইন্দ্র চোখ তুলে বলল, বোবার শত্রু নেই তাই মৌনী অভ্যেস করছিলাম।

আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কটপট উঠে দাঁড়াল সরিতা। ইন্দ্রের হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, ওঠ ওঠ অনেক রাত হয়ে গেল।

তারপর হঠাৎ হাতটা ছেড়ে দিয়ে দুহাতে নিজের দুটো গাল চেপে ধরে বলল ইস আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেল।

কি হল?

আপনাকে 'ওঠ ওঠ' বলে ফেললাম।

ইন্দ্র বলল, বেশ করেছেন আরও একশোবার বলবেন।

সরিতা বলল বিশ্বাস করুন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ইন্দ্র বলল মন থেকে বেরোয়নি তাহলে?

সরিতা চুপ করে রইল।

ইন্দ্র আবার বলল, আপনি কি কথাটা বলে ফেলে নিজেকে খুব অপরাধী ভাবছেন?

সরিতা ভাঙা ভাঙা গলায় বলল আমি কি বলতে চাই, কি করতে চাই, তা নিজেও অনেক সময় বুঝতে পারি না। আমার এইসব টুকরো টুকরো ভুল-ভ্রান্তি হয়ত আরও কত ঘটবে তাই আগে থেকে মাফ চেয়ে নিচ্ছি।

ইন্দ্র বলল তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে উঠলে কেন সরিতা? এই তো আমি তোমার ভাষাতেই কথা বলছি।

সরিতা এখন নিজের স্বভাব ফিরে পেয়েছে। সে কলকল করে বলে উঠল, 'আমরা' তুমি বলব কি আপনি বলব সেটা টস্ করে ফয়সালা করে নিলে হয় না।

ইন্দ্র বলল পছন্দটা তোমার কোনটাতে বল তো সত্যি করে?

সরিতা সে কথার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বলল, থাক টস্, যদি আবার আপনি টাপনি উঠে যায় তাহলে তো গেছি।

ইন্দ্র বলল, টসের কথা যখন উঠেছে তখন টস্ হবেই। তাতে কপালে যা ওঠে উঠুক।

সরিতা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ও মনে হল রেজাল্টের কথা ভেবে ভয় পেয়ে গেছে।

ইন্দ্র পয়সাটা বের করে বলল হেড উই গেইন টেইল উই লুজ কি বল?

বলেই ও পয়সাটা ওপরে ছুঁড়ল। বালিতে পড়তে না পড়তেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সরিতা।

হাত দিয়ে পয়সাটা চেপে রেখে ইন্দ্রের দিকে মুখ তুলে করুণ গলায় বলল ভীষণ ভয় করছে, যদি টেইল পড়ে যায়।

ইন্দ্র হেসে ওর হাতের ওপর হাত রেখে বলল এসো তাহলে দুজনে মিলে একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যাক।

সরিতা তবুও করুণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে ওর দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস কর, একটুও সাহস পাচ্ছি না।

ইন্দ্র বলল, যা থাকে ভাগ্যে, তাবলে কথার খেলাপ তো আমরা করতে পারব না।

সরিতার হাত শিথিল হয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল। ও বলল, আমি দেখব না, আপনি দেখুন।

ইন্দ্র দেখে নিয়ে পকেটে পয়সাটা ফেলল।

সরিতা ইন্দ্রকে নির্বাক দেখে চমকে উঠে বলল কি হল?

ইন্দ্র নিরাসক্ত গলায় বলল আমাদের সম্মানীয় সম্বোধনে ফিরে যেতে হবে।

সরিতা গালের পাশ দিয়ে চুলের গুচ্ছ আঙুল চালিয়ে মুখখানা বিপুল বেগে নাড়তে নাড়তে বলল, সব দোষ আমার। এটা ঘটল আমারই দোষে।

ইন্দ্র বলল অত ভাবনার কি আছে আপনিটা আমাদের বাইরের পোষাক হয়েই থাক না।

সরিতা কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হয়ে গেল। ওর ভেতর মেঘ রোদ্দুরের খেলাটা খুব দ্রুত চলতে থাকে। তাই কোনটাই দীর্ঘ-স্থায়ী হয় না।

ও বলল, ভালই হল। কখন আবার প্রেমার কাছে আপনাকে তুমি বলে ডেকে বসতাম।

ইন্দ্র অমনি বলল দেখলেন তো ভগবান যা করেন মঙ্গলেরই জন্যে।

(ক্রমশঃ)

এমন কোন গান নেই,
এমন কোন বিরহ নেই ॥

দাউদ হায়দার

এমন কোন গান নেই, যা আমি গাইনে—
অর্থহীন বিদ্বেষ নয়, আমার স্ফুলিঙ্গ গর্ভে অভ্যাগতদের
অস্থির পদচারণা
—তুমি যাকে বিদারের ব্যাকুল আহ্বান বলো
রুদ্ধশ্বাস, ক্ষিপ্ত মহাদেশ
এমন কোন গান নেই, যা আমার বিপরীতে বিরহ নয়।

এমন কোন বিরহ নেই, যা কিম্বা বিস্তীর্ণ গানের সৌরভ—
রৌদ্রের মধ্যে কুয়াশা, সান্ধ্য আলোয় অস্পষ্ট গ্রাম
কল্পনার তুষারে জমে ওঠে প্রাচীন প্রাকার
আমি কোন সোনালী রাজ্যের সন্তান নেই যে মৃত্তিকার উদরে
কাটেনি আমার—
বরং নির্ভার জীবনে জলসেচ আর মৌসুমী হাওয়ার উৎসাহ নিয়ে
নির্মাণ করেছি মিনার
মিনারের উচ্চতম শিখরে আজ মড়ক লেগেছে ওই!
এমন কোন গান নেই, যা আমি গাইনে
এমন কোন বিরহ নেই, যা আমাকে অনিদ্র রাখেনা একদিন!

সামনে জাগছে ॥

শান্তিকুমার ঘোষ

তখন দুচোখে মিলন স্বপ্ন
উচলে কেবলই ওঠা,
আকাশ ক্রমশ উদার স্বচ্ছ
ঢাকেনি জটিল কেশে;
শান্ত হয়েছে ঘর্মের ঝড়
গুম্ফা-চূড়ার ধ্বজা;
বিমুখ হয়নি দেবতার মুখ
ঝরণা ছুঁয়েছে সানু।
সামনে জাগছে বিনিদ্র চটি
চিররহস্যে ঘেরা ঃ
এগিয়ে আসে কি লয়েল মুকুট
কামনার ধন রাঙা।
সমুদ্রে বাজে পথের মন্ত্র
পাহাড়ে প্রতিধ্বনি
আমরা চিনছি একে-অন্যকে
বিনি দেশ হারা কালে।।

বেলা শেষে একেবারে
নিঃস্ব হয়ে যাই ॥

বেলা সেন

আমি হৃদয় হাতড়ে বেড়াই,
যদি এমন কোনও শব্দ খুঁজে পাই—
সহজ, সরল, সবুজ আমলকীর মত,
আমার মন, যদি তোমাকে
বোঝাতে পারি।
না, এমন একটি কথাও মেলে না
যা দিয়ে একেবারে আয়নার মত
তুলে ধরতে পারি আমার শিরা-উপশিরায়।
তাই, গ্রন্থিমোচনে, গ্রন্থিমোচনে,
বেলা শেষে একেবারে
পশ্চিম দিগন্তের আকাশের মতো নিঃস্ব।

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

অদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ঘুমন্ত অমিয়র ঘরে বসেই লীলা তার নিজের বাড়ির ঘরখানা দেখছিল। দক্ষিণের দেওয়ালে দামী স্টিরিওর জোড়া অ্যামপ্লিফায়ার বসানো। টেবিলের নিচে মিস্ত্রি এসে দাগ দিয়ে গেছে। এয়ার-কুলার বসানো হবে। ভরত হলের শ্রীরাম উপ্টি তিন তিনটে মামলা ঠুকেছে। এগারো জায়গায় কলশোয়ের এ্যাডভান্স নেওয়া আছে। ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায় গাড়িতে। ফেরেও গাড়িতে। সুজাতার জনপ্রিয়তা দেখে নকল সুজাতা বেরিয়েছে বাজারে। নীলকমল যাত্রা পার্টির সুজাতা। মূল গল্পের লেখক হাজার এক টাকায় কপিরাইট বেচে দিয়েছিলেন। এখন তিনিও মামলার হুমকি দিচ্ছেন। বয়ালিটির জন্যে বড় ছেলেকে পাঠাচ্ছেন ঘন ঘন। অবস্থা এখন জয়ন্তর ঘোলাটে। তার মাঝে এই কান্ড।

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ অমিয় চোখ খুললো। লীলা চুপ করে টুলে বসে ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলবে?

তোমরা সবাই কেমন আছো?

আমাদের কথা আর ভেবো না। তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

আমার কি হয়েছে?

কিছু হয় নি।

অনু কোথায়? বিল্টু? ছোটোন?

তিনজনই স্কুলে।

ভালো করেছো। রুগীর পাশে বসে থাকলে মন খারাপ হোত। আজ কী বার বলতো।

বুধবার।

কাল তো সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় হাউসে শো আছে। আমার ডাবল্ যিনি তিনি তো স্টেজে উঠেই চিত্তির করবেন। কমলা-ঝরির এতদিনে ডায়ালগই মুখস্ত হল না।

তার আর দোষ কি বল। একবারও কি স্টেজে উঠছেন কমলবাবু! মিসেস দত্তর জায়গায় তবু নন্দনা চক্রবর্তী করেছে।

আমার অসুখটা কি? ডাক্তার কি বলছে।

অতশত জানি না। বলেছেন—কমপ্লিট রেস্ট। তাই নিতে হবে তোমার।

তাই এবার নেব লীলা। তুমি বলেছিলে—এ থিয়েটার নয়। সিকিউরিটি। আমি হাউসফুলের টিকিট বিক্রির টাকার লোভে এই অভিনয় করে চলেছি।

তাতো বলিনি।

তাই বলতে চেয়েছিলে। লজ্জায় বলতে পারোনি লীলা। তুমি হাঁ করলে আমি তোমার কথা বুঝি। কিছু অন্যায় বলোনি। দর্শকখনা হয়ে আমরা এখন বন্দী।

আর কথা বলো না।

জানি। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল লীলা। টাকার চিন্তায় আমার পিঠ বেঁকে গেছে। আমি যে কবে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো জানি না। সবাই চায়। কেউ দেয় না কিছু। প্রয়োজনের সতর্কগুলো ভবাট করতে রোজ আমি ঘুম থেকে উঠে খাটতে বেরোই। আমারও তো নিজের কিছু কিছু প্রয়োজন আছে। খানিকটা খোলা বাতাস। স্বস্তি। নতুন নাটক।

তাহলে 'সুজাতা' তুলে দাও। সম্রাট ধরো।

নাটকের মত্যু—নাটকের বকস অফিস।

তাইতো তোমরা চাও।

একবার সেখানে পৌঁছেই মত্যুর শুরু লীলা। সুজাতা আমাদের দেনাদায়িক মিটিয়েছে। মামলার উকিলের পয়সা দিচ্ছে। এতগুলো মানুষের সংসার চালু রেখেছে।

একসঙ্গে এত কথা বোলো না।

সম্রাট করতে হলে নতুন কসটিউম দরবার। পিরিয়ড ড্রামা। বলতে বলতে অমিয় আবার ঘুমিয়ে পড়ল। কাল রাত থেকেই কড়া সিডেটিভ দিয়ে রেখেছে ডাক্তার। আধো ঘুম আধো জাগরণে অমিয় দেখতে পেল কলমন্দিরে ভর্তি হলের সামনে তার 'সম্রাট' মঞ্চস্থ হবেছে। সম্রাটের ইচ্ছাই আদেশ। কবি, সেনাপতি, মন্ত্রী শ্রেষ্ঠী—সবাই তটস্থ। বিষপান মত্যুকে বরণ করার আদেশ মেনে নিতে সম্রাট এবার কাকে বাছাই করবেন কেউ বলতে পারে না। প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, গুপ্তপ্রেম, আত্ম-হত্যা সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক ব্যাপার। দরবারে নটীর আগমন। প্রতিটি দৃশ্য অমিয় দেখতে পাচ্ছিল। এক সময় সব ঝাপসা হয়ে গেল। সে তখন ঘুমের পূর্ণগ্রাসে।

লীলাকে এখন দিদিমনিদের অনেকেই হিংসে করে। কি ভাগ্য তার। হিপ্পির টিকার সুলতা একদিন জানতে চেয়েছিল, অত টাকা দিয়ে কী করেন লীলাদি?

চিবিয়ে খাই।

চিবিয়ে খাওয়ারই দশা। বেশ ছিলাম আগে। নিজেকেই বলল লীলা।

ডাক্তার যেমন বলেছিলেন—সে ধরনের রান্না পরদিন দুপুরে রজনীর বাড়ি থেকে ক্যাবিয়ারে এল। লীলা ভেবেছিল রাগবে না। কিন্তু রাগে তার সারা শরীর রি রি করতে লাগল। তবু সেই অবস্থাতেই রজনীর রান্না অমিয়কে বেড়ে দিতে হল। খেতে খেতে অমিয় প্রশংসা করায় লীলা পরিষ্কার বলল, আমার রান্না নয়।

সন্ধ্যা বেঁধেছে?

না। মিসেস দত্তর বাড়ি থেকে পাঠিয়েছেন।

অমিয় মুখ তুলে একবার লীলার মুখখানা দেখে নিয়ে আবার খেতে লাগল। এবার অমিয়র মুখে চাপা হাসি দেখে লীলা চুপ করে থাকতে পারলো না। ভাল লাগছে খেতে?

তা লাগছে।

লাগবেই তো।

শুধু শুধু রাগ কোরো না। তুমিও তো রাঁধতে পারো।

দরকার নেই আমার।

ভুলে যেও না। মিসেস দত্তই কিন্তু আমাকে অনেক কষ্টে বাড়ি এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে। এটুকুর জন্যেও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে পারো।

এর সে উপকার আমি ভুলবো না। কিন্তু আমার স্বামীর জন্যে আমি থাকতে রান্না করে পাঠানো। এ কি রকম আদিখ্যেতা। আমি কি বেঁচে নেই? তুমি বিপত্নীক?

এভাবে দেখছো কেন। ডাক্তারবাবুর কথামতো রান্না করে পাঠিয়ে একজন মানুষ আরাম পেলে তোমার আপত্তি কোথায়?

সে তুমি বুঝবে কোত্থেকে! এখন তোমার শরীর ভালো নয়। এ নিয়ে আর কথার দরকার নেই।

একজন যদি আমায় ভালোও বাসে তাতে তো তোমারই খুশি হওয়ার কথা।

আমি সাধু নই। আমার হিংসে আছে। রাগ আছে।

তাতে শুধু দুঃখই বাড়বে তোমার। আমার কিছু হবে না। রজনীরও নয়।

জানি। কান্না চাপতে পাশের ঘরে চলে গেল লীলা। সেখানে বিল্টু আর অনুকে দেখে করিডরে গিয়ে দাঁড়ালো। পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আঁচলে চোখ মুছে নিল।

ঠিক তখনই হাউস থেকে শংকর এসে হাজির। চণ্ডীবাবুও এসেছেন। করিডরে দাঁড়িয়েই ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল লীলা।

নন্দনার নাম শোনা যাচ্ছিল। কমলবাবুরও। রজনীরও।

অমিয়কে আস্তে কথা বলতে বলার জন্যে লীলাকে ওঘরে যেতে হল। শংকরের হাসি। চণ্ডীবাবুর নমস্কার। সব সামলে লীলা যখন অমিয়কে বলতে যাবে— একটু আস্তে কথা বল—শুয়ে শুয়ে বল—

ঠিক তখনই অমিয় গমগম করে বলে উঠলো, সুজাতা আমরা তুলে দেব।

শংকর অবাক। অবাক চণ্ডীবাবুও। কেন?

কারণ বলতে অনেকক্ষণ লাগবে। পঞ্চমুখের স্থায়ী সভাপতি হিসেবে এইটেই আমার মত।

চণ্ডীবাবু বললেন—তার মানে আদেশ। কিন্তু অমিয়—

অমিয় কোন কথা না শুনে 'না' বোঝাবার জন্যে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়াতে লাগল।

শংকর বলল—আমার একটা কথা আছে দাদা। অন্যের জানি না। আমার নিজের কথা কিছু বলতে চাই।

বল।

তুমি তো জানো দাদা—আমি ছোটবেলায় মা হারিয়ে সৎ মায়ের সংসারে টেনে আসছি। তারা আমায় ভীষণ ভালবাসে। ছোটবেলায় মুদিখানার দোকান করেছি। তখন আমাদের বাড়িতে ফি বেলায় আঠাশখানা পাত পড়ে। জ্যাঠা, কাকা, বাবা—তিনজনের সংসার একত্রে আছে। হপ্তার বেশন তুলতে ছিয়াশি টাকা লাগে। তাও তিনদিনে ফুরিয়ে যায়। জেঠিমা বেঁচে থাকতে এ সংসার থেকে আমি বেরিয়ে আসতে পারবো না।

আসতে বলেছে কে তোমাকে?

আমার জ্যাঠতুতো বড়দা বিয়ে করে আলাদা হতে চেয়েছিল। বলেছিলাম—যেতে পারো—তবে একটি শর্তে। আমার মৃত্যুর আগে ফিরে আসতে পারবে না।

এসব কথা আসছে কেন?

'ফেরিওলার মৃত্যু' হাউসফুল হতেই বন্ধ করে দিলে।

ভুল করেছি কি?

না। কিন্তু—

কিন্তু কি?

এবার যদি নাটক সেরকম না লাগে। তখন?

লাগবেই কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না। তবে আমরা সব শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবো।

করলে চেষ্টা। তাও যদি না লাগে তখন?

সেরকম অবস্থা কি নতুন আমাদের কাছে শংকর?

তাই বলছিলাম—এমন চালু জমাট নাটক—আরও হাজার নাইট চলে যাবে—তাই ফেলে দিয়ে নতুনে ঝাঁপ—

ঝাঁপ লোকে নতুনেই দেয় শংকর। অনেক তো নিশ্চিন্ত লাইন ছিল। তুমি কেন অভিনয়ে এলে? দুর্গাদাস হবে ভেবেছিলে?

লীলা এবার বাধা দিল। আমি আর একটাও কথা বলতে দেব না তোমায়।

আমরাই বলছি বৌদি। দাদা শুনুক। নন্দনা পাকাপাকি জয়েন করেছে যাত্রাদলে।

করুক। শীতে রোদে আগান-বাগান ঘুরে বেড়াক। আমাদের 'সুজাতা' নাটকের কয়েক হাজার টাকার পাবলিসিটি পেল কাগজে কাগজে। সেটা এবার ওর আখেরে কাজে দিল।

কিন্তু আমাদের অভিনয়ের স্টিলের নেগিটিভ নিয়ে গেছে। সেই ছবিই কাগজে বেরিয়েছে।

মামলা করবে? কী লাভ হবে শংকর!

আমরা কিন্তু ভালোবেসে ওর জন্যে অনেক করেছিলাম।

আরো অনেকের জন্যে আমরা করব ভবিষ্যতে। তারাও হয়ত একদিন চলে যাবে। তাতেই বা কি? তুমিও তো না বললে চলে যেতে পারো।

তা হয় জানি দাদা। কিন্তু আমি তা পারবো না।

এবার লীলা ওদের একরকম জোর করেই তুলে দিল। ওরা বেরোতেই এলো বিষ্ণু। তাকে অত সহজে তুলতে পারলো না লীলা।

সে নিজেই বলল—কথা বলব আমি। জবাবও দেব আমি। তোমরা দুজনে শুনবে শুধু।

অমিয় হেসে বলল—বেশ। শুরু কর। দেখি কেমন পারো।

হল তো অর্ধেক ফাঁকা। তোমাদের কমলবাবু ডেইলি ডোবাচ্ছেন। জীবনের বোলে ওকে ডবল সিলেকট করে এতদিন মাইনে গুণে গ্যাছো কোন আক্কেলে?

নিজেই জবাব দিল বিষ্ণু। সবাইকে পুষতে হয়। একটা নাটকের দলকে সব জায়গায় মাবসিলেস হলে চলে না।

তাতো বুঝলাম। নিজে তো পড়েছো অসুখে। ধর যদি খারাপ কিছু হয়। এই মহিলার জন্যে কিছু রেখেছো?

জবাব নিজেই দিল বিষ্ণু। না। নাটক করেছি শুধু। গ্রুপের জন্যে হাউস সারিয়েছি। আলো কিনেছি। ফ্রিজ কিনেছি। বাইরে যাবার গাড়ি কিনেছি।

ভালো-মন্দ হলে মহিলা এখন তিনটি বাচ্চা সমেত দাঁড়াবে কোথায়? একটা বাড়ি কিনেছো?

বিষ্ণুই গলা পালটে বলল—না। কিনিনি আমাদের অভিনয়ের দল। কখনো ভাগ্য ভাল। কখনো খারাপ। তাই এই একশো তিরিশ টাকার ফ্ল্যাটই ভালো।

অমিয় লীলা একটু সঙ্গে বিষ্ণুর এই নাটকে হো হো করে হেসে ফেললো।

তুমি এলে বড় ভালো লাগে বিষ্ণু।

তাতো লাগবেই। এখন কবে উঠে দাঁড়াবে বলতো?

সামনে অনেক গোলমাল আছে দাঁড়াতেই হবে।

বিষ্ণু যেতে যেতে বিকেল এসে গেল।

অনেকদিন পরে লীলা সারাদিন রাতের জন্যে অমিয়কে পেয়েছে। অনু বিল্টু ছোটোনেরও তাই। কিন্তু মানুষটা এমন অবস্থাতেই বাড়িতে ফিরে এল—যখন শুধু বিশ্রামই দরকার। তাই বাড়ির সবাই অমিয়কে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দেখে যায়। অমিয়র খারাপ লাগে। খারাপ লাগে ওদেরও। কিন্তু উপায় নেই কোন।

ক'দিন টানা ঘুমিয়ে অমিয় আয়নায় দেখলো, তার চোখের নিচের কালিপড়া ভাবটা আর নেই। লীলাকে ডেকে বলল—এবার আমার কম মেক-আপেও চলে যাবে। কোন ক্লান্তি নেই মুখে।

গোহালে ঢুকলে আবার দাগ পড়তে ক'দিন।

অমিয় অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো লীলার দিকে। এই লীলা প্রভিডেন্ট ফান্ড ভেঙ্গে তার নাটক দাঁড় করাতে চেয়েছে। আর এখন, সেই লীলাই বলছে গোহাল? এত রাগ?

মুখে বলল—রজনীকে একদিন খেতে বল আমাদের বাড়িতে। এত এত রান্না করে পাঠালো এতদিন। তোমার বিল্টুতো রজনীর রান্না সুপ পেলে আর কিছুই খেতে চাইবে না।

সে তো তোমার বেলাতেও খাটে।

আমি রুগী মানুষ। আমি তো সুপ খাবোই। কিন্তু বিল্টু?

নতুন রান্না হলেই যে কোন মানুষের গোড়ায় গোড়ায় ভাল লাগে।

অমিয় আর এগোলো না। ঈর্ষা মানুষকে অনেক সময় সুন্দর করে। এখন লীলাকে বেশ দেখতে লাগছে। রজনী আর আসেনি। সেদ্ধ সুপ নিয়মিত পাঠিয়ে যাচ্ছে। অমিয় বিছানায় বসেই হাউসের খবর নিচ্ছে। বিজ্ঞাপনের দুখানা কপি লিখে পাঠিয়েছে এরই ভেতর।

খাটে বসে বসে অমিয় ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। ক'দিনের দাড়ি গালে। একদম সম্রাটের মেকআপ নিয়ে খাটে বসে আছে মনে হবে। সম্রাট পিরিয়ড ড্রামা হলেও তাতে আসলে অমিয় যেকোন অন্ধকার যুগের কথা তুলে ধরেছে। যখন রাজশক্তি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে—তখনকার কথা। সম্রাট খামখেয়ালী। সম্রাট কবি। সম্রাট মৃত্যু দেখতে ভালবাসেন। ভালবাসেন—তাঁর ইচ্ছায় মন্ত্রিবর্গ এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকুক। সাম্রাজ্যের অবস্থা অনিশ্চিত। চারদিকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে। তাতে সম্রাটের কোন খেয়ালই নেই। আবার ভালো করে আয়নায় তাকালো অমিয়।

(ক্রমশঃ)

নতুন বই

ত্রিপুরা প্রসঙ্গ—জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার। ত্রিপুরা সরকার। দাম উল্লেখ নেই।

প্রাচীন ও গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আজ পর্যন্ত গভীরভাবে হয়েছে বলে মনে হয় না। অথচ পূর্বাঞ্চলের এই পার্বত্য রাজ্যটির সম্পর্কে বাঙালী মাত্রেই রয়েছে অসীম কৌতূহল। ত্রিপুরায় শিল্পসংস্কৃতির চর্চা শুরু হয়েছিল সুদীর্ঘকাল আগে। এবং তার সঙ্গে বাঙালীর চিন্তাধারার ছিল নিবিড় সংযোগ। স্বাধীনতালাভের পর অনেক গবেষকই বিক্ষিপ্তভাবে ত্রিপুরার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। তার মধ্যেই রয়েছে ত্রিপুরার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার উপাদান।

ত্রিপুরা জনসংযোগ ও পর্যটন বিভাগ ত্রিপুরা প্রসঙ্গ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে একটি মূল্যবান দায়িত্ব পালন করেছেন। বইটি ইতিহাস শিল্পসংস্কৃতি ও অর্থনীতি—এই তিনটি পর্বে বিভক্ত। ত্রিপুরার বাঙলাভাষা, প্রত্ন উপকরণ, ইতিহাস সিপাহী বিদ্রোহ রিয়াং বিদ্রোহ, বাংলা গদ্য, শিল্পকলা, নাট্যচর্চা চাকমাদের আদি বাসস্থান, বৌদ্ধ ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মণিপুরী নৃত্য, টেরাকোটা শিল্প, ভূমি সমস্যা উন্নয়ন সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন বিভিন্ন গবেষক। গ্রন্থে একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে সঙ্গীত ও রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। সংকলনটি অনুসন্ধিৎসু পাঠক মাত্রেরই সংগ্রহযোগ্য।

জন্ম যদি তব বঙ্গে (গল্প সংকলন)—শওকত ওসমান। প্রকাশক : মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ-ঢাকা—১। ছয় টাকা।

বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমানের এগারোটি গল্প নিয়ে তাঁর এই সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সব গল্প ১৯৭১-৭২ সালে লেখা। পটভূমিকা—বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। এই সংগ্রামের বিভিন্ন দিক বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের বাস্তব ও হৃদয়স্পর্শী চিত্রণ ঘটেছে গল্পগুলিতে। তৎকালীন বিদেশী শাসকদের অত্যাচার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মুক্তি-সংগ্রাম এই হল মুখ্য বিষয়। কিন্তু লেখক পাশাপাশিই এসবের ঊর্ধ্বেও যে দোষে-গুণে মেশানো মানুষ তার কথাও বলেছেন বেশ কিছুটা গুরুত্ব দিয়েই। বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত গল্প হল আলোক অন্বেষা, জন্ম যদি তব বঙ্গে, ওয়াগান ব্রেকার এইসব ধরনের গল্প। সোলেমান সাহেব; সয়ীদ ভূঁইয়া; ক্যাপ্টেন বশীর প্রভৃতি চরিত্র লেখকের সার্থক সৃষ্টি।

এখন কবিতা পড়ছেন : সম্পাদক সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। কণ্ঠস্বর প্রকাশনী; আইডিয়াল বুক এজেন্সী; ১১।২ টেমার লেন, কলকাতা-৯। চার টাকা।

সম্প্রতিকালের মোট এগারোজন তরুণ কবি—মৃদুল নিয়োগী অমরেন্দ্র সান্যাল রততী বিশ্বাস প্রণব বসু রায় সুব বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য চন্দন অম্বুজেন্দ্র ঘোষ তপন ঘোষ সুবেশ দাস গণেশ সেন সত্যরঞ্জন বিশ্বাস—এঁদের নির্বাচিত কবিতা নিয়েই কাব্য সংকলন—এখন কবিতা পড়ছেন। কোন কোন কবির ছন্দজ্ঞান নিখুঁত নয়, কোন কোন কবি বেশ কিছু কাঁচা কবিতা সংকলনভুক্ত করেছেন। প্রত্যেক কবিই বয়সে কুড়ি থেকে চল্লিশের মধ্যে।

নিজস্ব নির্জনে (গল্পসংগ্রহ) সমর দত্ত। কল্পক প্রকাশনী। ১৭ রামধন মিত্র লেন। কলকাতা—৪। ছ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভয়-ভাবনা ভালোবাসা ছিল লেখকের প্রথম গল্পগ্রন্থ নির্জনে নির্জনে দ্বিতীয়। এতে শ্রীদত্তকে অনেক পরিণত মনে হল। লেখার মধ্যে কোথাও আড়ষ্টতা নেই—রচনারীতিতেও বেশ পরিণতি এসেছে।

নরনারীর প্রেম রহস্যের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আশ্রয় করে গল্পগুলিতে শ্রীদত্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁর বক্তব্য রাখতে চেয়েছেন। আশা করা যায় গল্পগুলি পাঠকদের ভালো লাগবে।

ছায়া মাত্র দশ দিক : বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়। কবি ও কবিতা। ১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা ছয়। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি ভালো কবিতা আছে এই সংকলনটিতে। কলকাতার দুঃখগুলি বিনোদ নটের ঢোল, হাওয়ার অসুখ; পৃথিবীতে অচেনা দুপুর কবিতাগুলি মনে দাগ রাখে। কলকাতার সমস্ত দিনের অবসাদ/বাকসো প্যাটরা নিয়ে/নেমে গেল সন্ধ্যার বাড়িবাটীতে কিংবা চরাচরে স্তব্ধ বাতাস/করকার পুরোনো হুকোর গন্ধ। পাতার ঝুপড়ি-ঘরে নষ্ট গাছের/ভিজে ভিজে অশ্ব-গন্ধে ঠায় জেগে বিনোদ নটের বাঘ চোখ/মাথায় টলছে গ্রাম ...আন্ধার। দুলে উঠছে গাছপালা.. ইত্যাদি লাইনগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদ ভালো।

উত্তর তিরিশে এসে (কাব্য সংকলন)। অশোক চট্টোপাধ্যায় গোধূলি প্রকাশনী, গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলী। তিন টাকা।

কবি কাব্যচেতনায় কালোত্তীর্ণ হতে না পারলেও কবিতাগুলিতে কাল চেতনার প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি আছে ব্যক্তিক অনুভূতির আন্তরিক প্রকাশ—যা পাঠকদের বুঝতে অসুবিধা হবে না।

সুফী সাধিকা রাবেয়া : কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। সংহতি ২০৩।২ বিধান সরণি কলকাতা-৬। দু টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর সদ্য প্রকাশিত সুফী সাধিকা তাপসী রাবেয়া নামের গ্রন্থে বস্তুত সুফী ধর্মের মর্মমিয়া সাধনার দিকটিকেই স্পষ্টত তুলে ধরেছেন। লেখকের বলার ভঙ্গী সহজ সরল বলেই এমন ধর্মীয় আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয়টি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে।

সংশোধন

'অমৃত'-র বিগত সংখ্যায় কালিদাস কাঞ্জিলাল লিখিত বইটির নাম ভ্রান্তি বশতঃ 'পারসিলিটিং হিউমানিটি' ছাপা হয়েছে, হবে "পারসিং হিউমানিটি'।

নিবেদন

সাহিত্যের নেপথ্যে আগামী সংখ্যা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

১০টি ভাষায় কবিতা প্রণেতা অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় '১০টি ভাষায় রচিত কবিতা'

(১৫) পুস্তকের সব রচনার পরিকল্পনাকারী ও প্রণেতা। এ পুস্তকে আছে একটি বাংলা হাস্যরসী কাব্য, একটি হিন্দী হাস্যরসী কাব্য, অসমীয়া, ওড়িয়া, গুজরাতী, নেপালী, পঞ্জাবী, মরাঠী, সংস্কৃত, ইংরেজী কবিতাসমূহ, কয়েকটি বাংলা হাসির গল্প, শূন্য গণিতের সংখ্যা ইত্যাদি দিয়ে রচিত অক্ষর প্রয়োগবিহীন ছড়া, পৃথিবীর যে-কোন ভাষার বর্ণের মুদ্রাক্ষরমালা হ্রাসকরণ পদ্ধতি, বাঙ্গালাসহ সাতটি ভাষার, বর্ণমালা হ্রাসকরণ পদ্ধতি, এবং রহস্য ও প্রয়োজনীয় আরও অনেক কিছু।
ভি পি পি হবে না। ২২৭।এইচ-৫ মণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪।

পুনশ্চ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উল্লিখিত রেনেল সাহেবের মানচিত্রে, তৎকালের কলিকাতার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া একটি খাল বরাবর শিয়ালদহ পর্যন্ত গমন করিয়া লবণাক্ত হ্রদের সহিত মিশিয়াছে এরূ অঙ্কিত আছে, এবং বর্ত্তমান শিয়ালদহ হইতে বহুবাজার পর্যন্ত যে ঐ লবণাক্ত হ্রদ বিরাজ করিত, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ঐ খাল বা খাড়ী বহুকাল অবধিই প্রবাহিত ছিল; এমন কি ১৭৫৭ খৃঃ অব্দেও কলিকাতার চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, উহার দক্ষিণ সীমায় ঐ খাড়ীর নাম করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। ঐখানে ব্যাঙ্ক অফ বেংগলের নিকট দিয়া চাঁদপাল ঘাট হইতে চৌরঙ্গীর মধ্য দিয়া হ্রদে গিয়া মিশিয়াছিল। এক্ষণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীমন্ত তখনকার কালিকাতা হইয়া এই খাড়ীর ভিতর দিয়া বেলেঘাটায় উপস্থিত হন এবং তথা হইতে হ্রদের মধ্য দিয়া, অন্য এক স্রোত দিয়া গমন করিয়া আদিগঙ্গায় পড়িয়া কালীঘাটে উপনীত হইয়াছিলেন।

কালীক্ষেত্র বা কালীঘাটের প্রাচীনত্ব নির্ণয়, কলিকাতার প্রাচীনত্ব নির্ধারণের অন্যতম উপায়। কারণ কাহারও কাহারও মতে 'কলিকাতা' শব্দ কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ মাত্র। যৎকালে আধুনিক মহানগরী সামান্য গ্রামত্রয় মাত্রে সীমাবদ্ধ ছিল তখনও হিন্দু অধিবাসিগণ সমুদ্রযাত্রাকালে কালিকাদেবীর অর্চ্চনা করিয়া আদিগঙ্গা প্রবাহে অনন্তে বাণিজ্যতরী সঞ্চালিত করিতেন। এই স্থানের প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশ করা বহুল আয়াসসাধ্য—এমন কি, কোনও কোনও স্থানে একরূপ অসম্ভব বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আসলে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে পুরাণ ও তন্ত্রাদি অন্বেষণ করিতে হয়।

পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের মধ্যে কালিকা পুরাণই শক্তি উপাসকের প্রধান গ্রন্থ, শাক্তগণ এই গ্রন্থকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করেন। অতএব ঐ গ্রন্থ হইতে আমরা সাধারণতঃ পীঠমালার পূর্ণ তালিকা প্রাপ্ত হইবার আশা করি। এই গ্রন্থে কোন কোন স্থলে পীঠস্থানের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা সংখ্যায় অতি অল্প এবং তন্মধ্যে কালীঘাট পীঠের কোন উল্লেখ নাই। দেবী ভাগবতে ১০৮টি পীঠস্থানের কথা লিখিত আছে, কিন্তু তন্মধ্যেও ঐ স্থানের নাম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

তন্ত্রগ্রন্থ সকল পুরাণ হইতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক; সুতরাং এক্ষণে কালীঘাট-পীঠের প্রাচীনত্ব তাহারই উপর নির্ভর করে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র এই শ্রেণীর মধ্যে একরূপ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ইহাতে কালীঘাটের বিষয় কিছু লিখিত নাই। বৃহৎ বা মহানীল তন্ত্রে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'গুহ্য কালী' নামে উক্ত হইয়াছেন। আচার-নির্ণয় তন্ত্রে এই পীঠের নাম লিখিত আছে এবং নকুলেশ ভৈরবের নামও ঐ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্র এ স্থানের নাম উল্লেখ করেন; এবং তন্ত্র চূড়ামণির বর্ণিত ৫১ পীঠের মধ্যে কালীঘাটের নাম ও নকুলেশ্বর ভৈরবের নাম উক্ত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে, সতীর দক্ষিণ পদের অঙ্গুলি পতিত হওয়ায় এই স্থানে কালিকা দেবী ও রক্ষকরূপে নকুলেশ্বর ভৈরবের আবির্ভাব হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে কালীঘাটের নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইতে এই স্থান যে কোন্ সময়ে সাধারণ্যে পরিচিত হয় এবং কতকাল পূর্ব্বে যে কালীদেবীকে সকলে পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই। কারণ তন্ত্র ও পুরাণাদি গ্রন্থসকল যে কোন সময়ে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অবগত হওয়া যায় না; এ সম্বন্ধে একমাত্র অনুমান ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা আমাদিগের নাই।

কলিকাতার কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি * বলেন যে, আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য কোনও হিন্দু তীর্থস্থানের নামই পরিত্যক্ত হয় নাই। যে যে তীর্থের কিঞ্চিৎমাত্রও খ্যাতি তৎকালে ছিল, এ গ্রন্থে কোনও না কোনও স্থানে তাহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি সরকার সপ্তগ্রামের মধ্যে মহাকালীর নামও ঐ পুস্তকে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে পুস্তকেও যখন কালীঘাট সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পরিলক্ষিত হয় না, তখন তৎকালে কালীঘাটের নাম সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত ছিল, না বলিয়া অনুমিত হয়। তিনি আরও বলেন যে,যৎকালে মহারাজ মানসিংহ পাঠান কবল হইতে শ্রীক্ষেত্র উদ্ধার সাধন করিতে উড়িষ্যা গমন করেন এবং তৎপরে যখন আফগানদিগের পশ্চাদ্ধাবন-ক্রমে সসৈন্যে রাজমহালে শিবির স্থাপন করিয়া কিয়দ্দিবস অবস্থান করেন, তৎকালেও কালিকা দেবী দর্শনার্থে কালীঘাটে উপস্থিত হন নাই। এমন কি যাঁহার আন্তরিক ভক্তি-পরায়ণতা ও আকাঙ্ক্ষায় যশোরে যশোরেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত হইলেন, কালীঘাটস্থিত গুহ্য-কালীর বৃত্তান্ত সেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হওয়া সত্ত্বেও যে তিনি ইহার প্রচারকল্পে সচেষ্ট হন নাই, একথা কে বিশ্বাস করিতে পারে?

কিন্তু এসকল হইতে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুষ্কর; কারণ আইন-ই-আকবরী কালীঘাটের নাম উল্লেখ করেন নাই বা মহারাজ মানসিংহ দেবীদর্শনার্থে কালীঘাটে উপস্থিত হন নাই বলিয়াই যে তৎকালে কালীঘাট নামে যে কোনও স্থান ছিল না, তাহা প্রতায় করা যায় না।

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় (১৮৯১ খৃঃ) কালীঘাটবিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ স্থানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বক্ষ্যমাণ দু-একটি প্রমাণের মর্ম্ম প্রদান করিয়া পাঠকবর্গের উপর ঐ স্থানের প্রাচীনত্ব বিচারের ভার অর্পণ করাই আমরা এস্থলে সমীচীন বিবেচনা করি।

তন্ত্রচূড়ামণি গ্রন্থের পীঠমালায় যশোরেশ্বরীর নামোল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, সুতরাং ঐ গ্রন্থ যে আকবরের রাজত্বকালের পূর্ব্বে বিরচিত হয় নাই, সে সম্বন্ধে কোনও রূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অপরাপর প্রাচীনতর পুরাণতন্ত্রাদি গ্রন্থসকল পাঠে কালীঘাটের কোনও নামোল্লেখ দৃষ্ট না হওয়ায়, সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থেই যে কালিকাদেবীর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে; সুতরাং কালীক্ষেত্র যে ১৫৫৬ খৃঃ হইতে ১৬০৫ খৃঃ মধ্যে জনসাধারণে প্রচারিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম প্রণীত চণ্ডী-কাব্যের মধ্যে 'কালীঘাট' শব্দের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করা চলে না; কারণ, কলিকাতা বা কালীঘাট ব্যতীত অপরাপর যে সকল নগর ও গ্রাম অদ্যাপি ভাগীরথীর উভয় তীরে বিরাজিত, ঐ গ্রন্থে তাহাদের নামও যথাযথ উল্লিখিত আছে। সুতরাং যে সময় চণ্ডীকাব্য বিরচিত হয়, তৎকালে কালীঘাট যে সর্ব্বজনবিদিত স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা একরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে। এক্ষণে চণ্ডী-কাব্যের সাহায্যে কালীক্ষেত্রের নাম প্রসারণের কাল নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, বঙ্গসাহিত্যে ইহার উল্লেখ ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ এই যে, যে সময় বিপ্রদাস পিপলাই মনসামঙ্গল রচনা করেন (১৪৭৫ খৃঃ) তখন কালীঘাট সম্যক্‌রূপে লোকচক্ষুগোচর হয় নাই। কিন্তু গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে (এই গ্রন্থ আনুমানিক ১৭৪০ খৃঃ প্রকাশিত হয়) এই স্থানের বিস্তারিত বিবরণ দৃষ্ট হয় এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে ইহার সম্পূর্ণ উল্লেখ আছে (১৭৫২ খৃঃ) (ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

* সুতানুটী, গোবিন্দপুর, ও কলিকাতা

* বাবু গৌরদাস বসাক।

বাড়িটা দেখে প্রথমেই আমার বুকের ভেতর ভয়ের শব্দ বেজে উঠেছিল। দুটো পাথুরে ঢিবি দুদিক থেকে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই হাড়গোড় ভাঙা প্রাণীর মত বাড়িটা পড়ে আছে। রেলগাড়ি থেকে যখন নামি, তখনই বেলা গিয়েছে। এদিকে আমি একেবারেই নতুন, আগে আসিনি কখনো। কোথায় যাবো কোথায় থাকবো কিছুই ঠিক নেই। লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করে একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে তিন-চার দিনের জন্য। কাজেই স্টেশনের পাশে কয়েকটা ভাঙাচোরা রিকসা দেখতে পেলেও হেঁটে আসাই সমীচীন বলে মনে করেছি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে দেখতে শহর ফুরিয়ে গিয়ে আবার ঢেউখেলানো লালমাটির মাঠে পড়লাম। সেই মাঠেই পড়ন্ত আলোয় ধ্বংসস্তূপটা নজরে এলো। বিরাট বড় বাড়ি, কিন্তু প্রায় সবটাই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অর্ধেকটা কোনরকমে এখনো মাথা তুলে রয়েছে বটে, তবে দেখে আর বেশি দিন থাকবে বলে ভরসা হয় না। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমানায় ছোট্ট দেহাতী শহর। অর্থাৎ কিছুটা দেহাত এবং কিছুটা শহর। এখানে এত বড় বাড়ি কারা কি মনে করেছিলেন বোঝা মুস্কিল। বিষয়তা ও মানুষের সামাজিক দুর্ভেদ্য প্রতি মহাকালের উৎকট ব্যঙ্গের প্রতিমূর্তির মত বাড়িটা পড়ে আছে। কিন্তু এসব দেখে আমি ভয় পাইনি। ভাঙা ও পোড়ো বাড়ি তো জীবনে আরো কতই দেখেছি, তবু এটা যেন সবার থেকে আলাদা। তাকালে অকারণেই বুকের ভেতরে শিরশির করে ওঠে। যেন ওখানে অমঙ্গল, যেন ওখানে কি একটা হবে।

আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা মানুষের প্রয়োজনীয় নানারকম ভোগ্য-পণ্য তৈরি করে থাকে। আমার কাজ হল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ক্রেতাদের রুচি লক্ষ্য করে বেড়ানো। এবার আমাকে বিহার সার্কেলে পাঠানো হয়েছে এখানকার মফস্বলের ক্রেতারা কি কি সৌখীন জিনিস পছন্দ করে তাই দেখবার জন্য। আজ ট্রেন থেকে এখানে নামবার কথা নয়, পরের জংশন স্টেশন পর্যন্ত টিকিট করেছিলাম। কিন্তু ভাগ্য মানুষকে বোধ হয় অমোঘ আকর্ষণে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ট্রেন এখানে যখন থামল, বাইরের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে শেষবেলার মন-খারাপ করে দেওয়া রোদ্দুরে কিসের হাতছানি দেখেছিলাম জানি না, কিন্তু সুটকেশটা নিয়ে তক্ষুনি নির্জন প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে লাফিয়ে পড়লাম।

যদি না নামতাম, যদি চলেই যেতাম পঞ্চাশ মাইল দূরের জংশনে, তাহলে হয়ত আজ এ কাহিনী বলার কোনো প্রয়োজনই হত না। কিন্তু নিয়তি কেন বাধতে। আমি নামলাম।

শহর ফুরিয়ে গিয়েছে দেখে ওই পোড়ো বাড়িটার কাছ থেকে আবার ফিরলাম। আচ্ছা এখানকার লোকেরা সব মরে গেছে নাকি? রাস্তায় বিশেষ লোক নেই—বিকেল হয়েছে অথচ কেউ বেড়াতে বের হয়নি। বাচ্চারা রাস্তায় খেলছে না—বা কিনা বিহারের মফঃস্বলে একটি অতি সাধারণ দৃশ্য। সমস্ত কিছুই যেন কেমন থমকে আছে। ঘনবসতি নেই, ছাড়াছাড়া বাড়িগুলোতে কি উনুনে আঁচ দেয়নি? কোনো বাড়ির মাথায় ধোঁয়া দেখছি না। এরা কি রাস্তিরের রান্না সবাই ও-বেলা করে রাখে? ব্যাপার কি? যেন এক নির্দিষ্ট পুরীর ভেতর দিয়ে হাঁটছি কোন্ অজ্ঞাত গন্তব্যের দিকে।

বেশিদূরে যাবার আগেই ডানদিকে একটা দোতলা বাড়ি, বিহারী ছাঁদের। জানালা-দরজার বিশেষ বালাই নেই, একখানা দেয়াল যেন কে তুলে রেখেছে রাস্তার পাশে। তবে বিত্তবান লোকের বাড়ি নিঃসন্দেহে, কারণ এসব দেশে এমন দোতলা বাড়ি করবার মত মানুষ কম। বাড়ির সামনে কে একজন চাবপাই পেতে তার ওপরে বসে আছে মাথা নিচু করে। ঝিমোচ্ছে বোধ হয়। এ শহরের ঘুমন্ত মেজাজের মতই দেখাচ্ছে ওকে। এই কি একটা ঘুমোবার সময়? বিশাল বক্ষ-বর্দের মত বপুখানা, সামনে ঝুঁকে আছে, কাঁধের পেশীগুলো ফুলে আছে মোটা দড়ির মত। রাত নেমে আসছে, অন্য জায়গায় আর হাঁটাহাঁটি করতেও ভাল লাগছে না। হুট করে এখানে নেমে পড়ার জন্য এখন মনে একটু অনুতাপই হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—ভাইসাহাব!

প্রথমে কোন সাড়া নেই, তারপর লোকটা আস্তে আস্তে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। উঃ! কি কদাকার মুখ। আমরা ঠিক যে অর্থে বীভৎস বলি, তা নয়—গঠনের দিক দিয়ে তার মুখ হয়ত মোটা-মুটি চলনসই। কিন্তু সমস্ত চেহারায় তার যেন কি এক নোংরামী, শয়তানি আর কদর্যতা মাখানো। যেন এইমাত্র খুন করে এসে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলে সাধু সেজে বসেছে। ঈষৎ লাল দুই চোখ, সেদিকে তাকালে মনে হয় শুধু চোখ দিয়ে বুকের একেবারে ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

লোকটা কথা বলছে না, কেবল শীত-ঘুম-ভাঙ্গা সাপের মত ঠাণ্ডা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি। কি করা উচিত এখন? চলে যাব উত্তরের আশা না রেখে? কতক্ষণ এইভাবে চুপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়? লোকটা কি কালা? শুনতে পাচ্ছে না আমি কি বলছি?

অন্ধকার নেমে আসছে। অচেনা জায়গায় সন্ধ্যা বড় বিষণ্ণ লাগে। এখানে আশ্রয় যে পাবো না, লোকটার হাবভাব থেকে তা বুঝতে পারছি। তাহলে আর বৃথা কেন দাঁড়িয়ে থাকা? আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত। এ শহরও যেন কেমন অপার্থিব রহস্যের আবরণে মোড়া। থাকব না এমন জায়গায়, বরং স্টেশনে গিয়ে দেখি রাত্তিরে কোনো গাড়ি পাওয়া যায় কিনা জংশনের দিকে।

প্রকৃত অবস্থাটা অনুভব করলাম চলে আসতে গিয়ে।

আমি নড়তে পারছি না!

কে যেন আমার পা দুটো সজোরে চেপে ধরেছে মাটির সঙ্গে, তাদের ওপরে আর আমার কোনো কর্তৃত্বই নেই। হাতে-পায়েও যেন কেমন বল হারিয়ে ফেলেছি, কমে আসছে মনের জোর। কি হবে আজ আর অন্য কোন আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটোছুটি করে? খামোকা পণ্ডশ্রম। কেমন সুন্দর এই সন্ধ্যে, এই ছোট্ট শহর। কথা বলছে না বলেই কি ও খারাপ লোক? হয়ত বেচারী কানে শুনতে পায় না! মিছিমিছি ভয় পাচ্ছি আমি।

এই রকম ভাবছি, সেই সময় লোকটা কথা বলে উঠল—জী?

তাহলে ও কালা নয়, শুনতে পায়। কথাও বলতে পারে। তাহলে চুপ করে ছিল কেন?

বললাম—আমি বিদেশী, আজকের রাতটা এখানে থাকতে পাবো কি?

আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখে নিয়ে ঠোঁট চাটল লোকটা, লোভী জন্তুর মত, তারপর চারপাই ছেড়ে উঠে বলল—জরুর, আইয়ে।

অতবড় ষাঁড়ের মত চেহারার ভেতর থেকে মিহি খুনখুনে আওয়াজ বেরুচ্ছে! চোখ বুজে শুনলে মনে হবে বারো বছরের ছেলের গলা। শুনলেই কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ঠোঁট চাটল কেন লোকটা? রাত্তিরে কেটে খাবে নাকি আমাকে?

সে বলল—হমার নাম সুরযপ্রসাদ।

—বেশ নাম। আপনি কথা বলছিলেন না কেন?

—আপনাকে দেখছিলাম।

—আমাকে! আমার মধ্যে দেখবার কি আছে?

—আছে, আছে। মানুষকে দেখতে বড্ড ভাল। তাই দেখি।

বলে কি লোকটা? পাগল-টাগল নয় তো? এতক্ষণ চোখ দিয়ে দেখছে, এরপরে না কামড়ে চেখে দেখতে চায়! না, এ ভাল জায়গা নয়, আমি এখানে থাকব না।

সুরযপ্রসাদ আমাকে নিয়ে যাবে বলে বাড়িতে ঢোকবার পথে পা বাড়িয়েছিল, থেমে পড়ে বললাম—আমি যাবো না।

অবাক হয়ে সে বলল—কাহে?

—না, আমি চলে যাবো। আমার একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

সাপের মত হিস্ হিস্ শব্দ করে হাসতে লাগল সে, বলল—ডরিয়ে গেলেন? এ হেঃ, এ হেঃ—ডরাবার কুছ্ নাই।

পৌরুষে আঘাত লাগল, বললাম—ডরাবার কি আছে? সে সব কিছু না। ঠিক আছে, থাকবো আমি। বলুন কোথায় যেতে হবে।

হায়! তখনো যদি ফিরতাম! বোকার মত আত্মাভিমানের ঝোঁকে গোঁয়ার্তুমি না করতাম! কিন্তু ওই যে কথা বয়েছে, নিয়তি কেন বাধ্যতে! নিয়তিই টানলো আমাকে।

নির্জন বাড়ির সরু, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আমাকে দোতলায় নিয়ে এলো সুরযপ্রসাদ। একদিকে টানা বারান্দা, তার ধারেই সারি সারি সাত-আটখানা ঘর। কেউ আলো জ্বালেনি, সাঝের প্রদীপ দেখায় নি। বাড়িতে মেয়েরাও কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে। আমরা ওপরে এলাম, কিন্তু সচকিত হয়ে কেউ সরে গেল না দরজার পাশে, বেজে উঠল না হাতের চুড়ির সলজ্জ রিন্-ঝিন্ শব্দ। কোথাও কিছু নেই, কেবল বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুময় তামসী রাত্রির ছায়া। আচমকাই যেন আশ্চর্য একটা দমবন্ধ করা অনুভূতি গলার কাছে চেপে ধরল। সম্ভব হলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড় দিতাম, কিন্তু পৌরুষের প্রশ্ন!

বারান্দার একেবারে অপর প্রান্তের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে শেকল নামিয়ে দরজা খুলল সুরযপ্রসাদ, বলল—চলুন ভেতরে।

ভেতরে ভয়াবহ অন্ধকার! বললাম—আলো জ্বালেন নি কেন? আপনার পরিবারের অন্যেরাই বা কোথায়?

আবার সেই অমানুষিক শব্দহীন হাসি হাসলো সুরযপ্রসাদ—বাত্তি দে রহা হুঁ।

—তা তো দেবেন, বাড়ির লোক?

—আয়গা কাঁহাসে? সাদি নেহি কিয়া, বালবাচ্চা নেহি হ্যায়—

অত্যন্ত যুক্তিসম্মত কথা। বিয়ে না হলে বাচ্চা আসবে কোথা থেকে? জিজ্ঞাসা করলাম—একদম একা থাকেন? ঘাবাপ লাগে না?

—মুঝে আদত হো গয়া হ্যায়। চলিয়ে অন্দর।

ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা মোম-বাতি বের করে জ্বালালো সে। ম্লান হলুদ আলোয় ফুটে উঠল একটা বাজে ছুতোরের তৈরি জগদ্দল পাথরের মত ভারি খাট, তার ওপরে ময়লা বিছানা। মোটা মোটা পায়া-ওয়ালা একখানা টেবিল, একদিকে একটা আলনা। ব্যাস্, আর কিছু নেই ঘরে। ভেতরে পাক খাচ্ছে শুধু একটা ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ—বহু দিন বন্ধ থাকার পরে কোনো ঘর খুললে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়।

টেবিলের ওপরে মোম গলিয়ে ফেলে বাতি আটকাবার চেষ্টা করছে সুরযপ্রসাদ। বললাম—শহর ছাড়িয়ে টিলার ধারে একটা বড় ভাঙ্গা বাড়ি দেখলাম। ও রকম জায়গায় অতবড় বাড়ি কার?

—আমার।

—আপনার! ভাঙ্গা পড়ে আছে কেন?

—ও আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি, ঠাকুরদার ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন। এখন কেউ থাকে না, তাই ভেঙ্গে পড়ে আছে।

—থাকে না কেন?

—কে থাকবে? মানুষ তো আমি একা। অতবড় বাড়িতে আমার কোন দরকার নেই যে আবার সারিয়ে নেবো। তাছাড়া ও-বাড়ির সবটা আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। বিরাট বাড়ি ওটা। উপরসে মালুম পাওয়া যায় না, মাটির নিচে ভি বহোৎ কামরা আছে।

—মাটির নিচের ঘর দিয়ে কি হোত?

—ভগবান মালুম, পুরানা জমানামে লোকের সখই এ রকম ছিল। বাড়ির ওপরটা ভেঙ্গে গেলেও মাটির নিচের ঘরগুলো ঠিকই আছে। তবে তা দিয়ে আর কার কি কাম হবে?

আমাকে বিশ্রাম করতে বলে সুরযপ্রসাদ চলে গেল। সে বিদায় নিতেই কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল মনে। জামাকাপড় বদলে নোংরা বিছানার চাদরটা সরিয়ে তোষকের ওপরেই একটু গা এলিয়ে দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ কানে এল একটা আওয়াজ। কিচকিচ্ করে কি একটা জন্তু যেন কোথায় ডাকছে। মনে হল পাশের ঘর থেকে আসছে শব্দটা।

গৃহস্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করা ঠিক নয়, কিন্তু শব্দটার উৎস জানবার জন্য মনে ভয়ানক কৌতূহল জাগল। টেবিল থেকে মোমটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

হাঁ, নিঃসন্দেহে এই ঘরের ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে শেকল নামিয়ে দরজা খুললাম।

ভেবেছিলাম না জানি কি জিনিসই চোখে পড়বে। কিন্তু হ ওরি! এ যে দেখি একটা গলায় চেন বাঁধা বাঁদর বসে কি ফল খাচ্ছে আর ওই রকম আওয়াজ করছে। একা মানুষ সুরযপ্রসাদ—অবিবাহিত। সঙ্গী হিসেবে এইটাকে পুষেছে আর কি!

শেকল তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

সময় যায়।

রাত দশটা।

এই সময় এসে খেতে ডাকল সুরযপ্রসাদ। একতলার বারান্দায় মোটা দুখানা আসন বিছিয়ে খাবার জায়গা হয়েছে। না, আতিথ্য ভাল লোকটার। হাতেগড়া মোটা-মোটা আটার রুটি, ঝিঙ্গের তরকারী, আলুর ভাজি আর খাটি দুধের ঘন ক্ষীর। পরিতৃপ্তি করে খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—কাউকে তো দেখছি না কাজের লোক। এত রান্না বলো কে?

—আমি নিজেই করেছি, লোক কি দরকার?

—আপনি একটা বাঁদর পুষেছেন দেখলাম, পশুপাখির সখ আছে নাকি?

—জী। একা থাকি, কোনো একটা চিড়িয়া থাকেল ভাল লাগে।

খাওয়া হয়ে গেলে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সুরযপ্রসাদ নতুন একটা মোমবাতি দিয়েছে। সেটা না ধরিয়ে রেখে দিয়েছি টেবিলে। রাতে লাগতে পারে। এটা তো ফুরিয়ে এসেছে।

বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে মনে হল— ঐ যাঃ! ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু খিল লাগাই নি। একবার ভাবলাম— যাই, উঠে খিলটা লাগিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু সমস্ত শরীরে সারা দিনের ক্লান্তি নেমে এসেছে বন্যার ঢলের মত। কে আবার উঠে দুজরায় খিল দেয়? দূর! তাছাড়া চোর যদি আসেই, আমার নেবেটা কি: পয়সা-কড়িও বিশেষ কিছু নেই সঙ্গে। আচ্ছা, সুরযপ্রসাদ লোকটা বোধ হয় সত্যি খারাপ নয়। হাবভাব একটু কেমন কেমন বটে, তা সে অনেকের অমন বেয়াক্কেলে ব্যবহার হয়—আমি দেখেছি। মানুষ তো ভালই, বেশ যত্ন করে খাইয়েছে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আচমকাই জেগে গেলাম। রাত কত হয়েছে কে জানে! মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে নিভে গেছে। গাঢ় অমাবস্যার মত অন্ধকার চারদিকে। হাতঘড়িটা যে দেখব তারও উপায় নেই। একবার ভুল করে পুরীতে হাতঘড়ি বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে স্নান করতে নেমে পড়েছিলাম, নোনা জল ঢুকে ডায়ালের লুমিনাস পেন্ট নষ্ট করে দিয়েছে, নইলে অন্ধকারেও দেখা যেত।

অন্ধকার যেন ছুরি দিয়ে কাটা যায়। আলকাতরার মত গায়ে লেগে গিয়ে যেন চটচট করছে, পাথরের মত বুকে চাপ দিচ্ছে অন্ধকার। তাকিয়ে থাকলে আরো কষ্ট, যদিও এই নিবিড় আলোকহীনতায় তাকানো বা চোখ বুজে থাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবু চোখ বন্ধ করে থাকলে খানিকাক্ষণ আলো দেখতে পাবো'—এইরকম একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় মনে।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করবো, এমন সময় একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনলাম —ক্যাচ্।

কিসের শব্দ ওটা? প্রথমে বুঝতে পারলাম না, তারপরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই বুক হিম হয়ে এল।

বিকেলে সুরযপ্রসাদ যখন আমাকে ওপরে নিয়ে এল, তখনই লক্ষ্য করেছিলাম এ ঘরের দরজাটা খোলবার সময়ে ক্যাচ্ করে শব্দ করে। কব্জায় তেল না দেবার ফল। তাহলে এই অন্ধকারে আমাকে ঘুমন্ত ভেবে কেউ কি দরজা ঠেলে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে? যদি তাই হয়, তবে আমার রাতের অজানা অতিথি খুব চালাক—একেবারে অনেকখানি খুলে ফেলছে না। প্রথমতঃ, তাতে যদি আমি জেগে থাকি, উঠে বাধা দিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, যদি জেগে না থাকি, তবে জেগে যেতে পারি। একটু একটু করে পাল্লা ফাঁক করছে সে। অনেকক্ষণ ধরে জেগে জেগে শুনলাম মাঝে মাঝেই ক্যাচ্ ক্যাচ্ কর শব্দ হচ্ছে।

বিকেলের মত সেই শারীরিক অনড়তা হঠাৎ যেন আবার ফিরে এল। একটু চেষ্টা করলেই টেবিলের ওপর থেকে মোমবাতি আর দেশলাই নিয়ে আলো জ্বালানো যায়— কিন্তু কাজটা করে কে? শরীরে কে যেন ভারহীন চাপ দিয়ে আমাকে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে। দূর থেকে কেউ কি সম্মোহন করছে নাকি আমাকে? নইলে আমার নিজেরই হাত-পায়ের ওপরে আমার জোর নেই কেন?

শব্দটা আর হচ্ছে না। তার মানে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে এবং যে খুলছিল সম্ভবতঃ সে এখন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ভয়াবহ অনুভূতি! আমি চিৎ হয়ে দু হাত দিয়ে দু পাশে বিছানা আঁকড়ে ধরে অন্ধকারেই, চোখ মেলে শুয়ে রয়েছি। আর ঘরের মধ্যে এক অজানা এবং অদেখা উপস্থিতি!

যে এসেছে সে কি করছে এতক্ষণ? আক্রমণ করার হলে তো করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র বাধা দেবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বোধ জেগে উঠল। কেন জাগল বলতে পারি না। মনে হল যে এসেছে সে এই অন্ধকারেও আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু সে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টির অস্ত্রে আমার শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করে ভেতরের যন্ত্রপাতি অবধি দেখে নিচ্ছে।

আমি যেন বেঁচে নেই, আমি যেন মৌলিক উপাদানে বিভক্ত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছি কবেই। কেবল আমার চেতনাটা শুয়ে আছে অজানা এক শহরে অজানা মানুষের অচেনা বিছানায়, আর শূন্যপথে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে সহস্র সহস্র অমঙ্গলপূর্ণ দৃষ্টির ছুঁচ। কে এসেছে ঘরে? কে?

এবার খুব অস্পষ্ট হলেও নির্ভুলভাবে শুনতে পেলাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ঘড় হাঁড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলে নিজের কানে যেমন শোনা যায়, তেমনি। তাহলে ভ্রম নয়, মায়া নয়, আমার ভীতিকাতর মনের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ নয়—সত্যি কেউ এসেছে ঘরে। ঐ শব্দই তার অমোঘ প্রমাণ। যেন মানুষ নয়, বিশাল দেহ কোন জন্তুর শ্বাস টানার আওয়াজ।

শব্দটার মধ্যে কেমন একটা পশুবিকৃতি লুকিয়ে আছে। বোঝানো যায় না, কিন্তু বোঝা যায়।

অন্তহীন অন্ধকারের কেন্দ্রের সম্পীহায়া আমি ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠছি। একি মর্মান্তিক অস্বস্তি, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ সে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ঘরের এক-কোণে টিপ্‌টিপ্ করে একটা ছোট্ট নীল আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল। জ্বলছে-নিভছে। নতুনতর কোন বিভীষিকা ভেবে আমার হৃৎপিণ্ড প্রথমে লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছিল। তারপরেই চিনতে পারলাম জিনিসটাকে।

একটা জোনাকি।

হে ঈশ্বর! সামান্য একটা জোনাকি কি আশারই না সঞ্চার করলো আমার মনে! হোক না তুচ্ছ পতঙ্গ, তবু এই মুহূর্তে ও জীবিত প্রাণীদের জগৎ থেকে আমার কাছে একমাত্র প্রতিনিধি। প্রাণপণে চোখ ঠিকরে জোনাকিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ওটাই এখন যেন আমার একমাত্র ভরসা।

উড়তে উড়তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে পোকাটা, টিপটিপ্ করে জ্বলছে মৃদু ও স্নিগ্ধ নীল আলো। আমি চোখ রেখেছি ওর ওপরে। হঠাৎ ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা।

বাঁদিকে সরে আসতে আসতে জোনাকির আলোটা হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, চার কি পাঁচ সেকেন্ড হবে বোধ হয়, আরো খানিকটা বাঁদিকে আবার জ্বলে উঠল জোনাকির আলোকিত পুচ্ছ। মানে মাঝখানে তার গতি-পথের কিছুটা আমি দেখতে পাই নি।

কেন?

দুটো কারণ হতে পারে। এক, জোনাকির আলো মাঝে মাঝে সামান্য সময়ের জন্য নিভে যায়, তারপর ফের টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলতে-নিভতে থাকে। এটা সে রকম কিছু হতে পারে। আর নয়তো—

নয়তো ওই জায়গাটাতেই সে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার আড়াল দিয়ে যাবার সময়েই জোনাকিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যাক, যদি দ্বিতীয়-টাও সত্যি হয়, তবু একটা সান্ত্বনা পাচ্ছি যে, সে অলৌকিক বা অপার্থিব কিছু নয়। তার বাস্তব কায়া আছে।

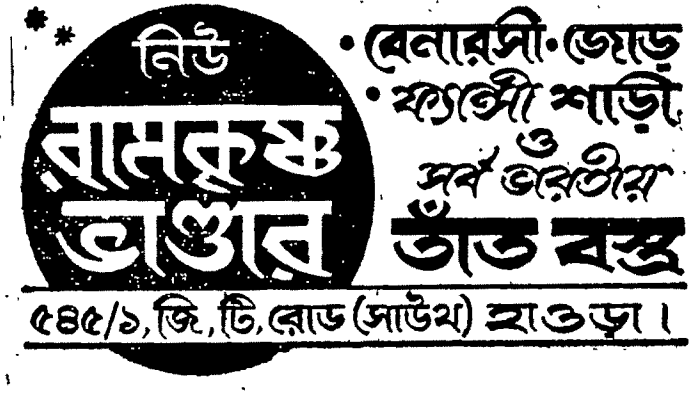

জোর করে মনকে ব্যাপৃত করলাম অন্য চিন্তায়। অবস্থার ওপরে কর্তৃত্ব করতে হবে আমাকে—তাছাড়া কোন পন্থা নেই। যে-ই ঘরে এসে থাকুক না কেন, এতক্ষণ যখন আমাকে আক্রমণ করেনি, তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে আমার কোন ক্ষতি করবার ইচ্ছে অন্ততঃ এই মুহূর্তে তার নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কি একটা কবিতা আবৃত্তি করে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে মজার দিনগুলো মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এদিকে সমস্ত শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে।

কখন ঘরের মধ্যে থেমে গিয়েছে সেই পাশবিক নিঃশ্বাসের শব্দ, মনের ওপর থেকে নেমে গিয়েছে পাথরের গুরুভার। ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি, ঘরে সে আর নেই। আপাততঃ আমি বিপন্মুক্ত।

সমস্ত দেহে মনে মুক্তির নির্মল নিঃশ্বাস! শুধু শুয়ে শুয়েই একজন মানুষ এত ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে, তা কে জানতো! আস্তে আস্তে আমার চেতনা ঢলে পড়ল নিদ্রার কোলে।

কখন সকাল হয়েছে; কখন দেখি সুরেশ-প্রসাদ এসে ডাকছে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—বাবুজী, উঠিয়ে। চায় নহি পিয়েঙ্গে?

ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়ে গতরাত্রের অমানুষী অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এখন সকালের আলোয় ভয়ের একটা টুকরো পড়ে নেই কোথাও। কেবল সুরেশপ্রসাদের দুই চোখে যেন কি শয়তানি হাসি! অথবা হয়ত আমার মনের ভুল।

যাক, আমার তাতে কি? আমি এখনই জামাকাপড় পরে সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ছেন ধরে দু' ঘন্টার মধ্যে চলে যাবো পরের বড় শহরে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই কোলকাতায়। সিনেমা—হোটেল-বন্ধুবান্ধব, কোথায় তখন থাকবে গতকাল রাত্তিরের স্মৃতি? হাসলে গে সুরেশপ্রসাদ।

দন্দেড এই। বাঁকুড়া

ও নিজেই চা এনেছিল বড় কাচের গ্লাসে। চা খেয়ে শার্ট পড়ছি সুরেশপ্রসাদ বলল—এখুনি যাচ্ছেন নাকি?

—হাঁ সকালে কোনো ট্রেন নেই?

—আছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যাওয়ার আগে আপনাকে আমাদের আদি বাড়িটার ভেতরে একবার ঘুরিয়ে দেখাব। পুরানো জিনিস দেখতে ভালো লাগে না আপনার? যাবেন?

লোভ হল। যে যুগ চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছে আর ফিরে আসবে না তার ফেল যাওয়া নিদর্শন দেখতে বড় ভাল লাগে। কলেজে পড়বার সময় বন্ধুরা মিলে কত ঘুরেছি গৌড় শুশুনিয়া চন্দ্রকেতুগড়ে। একবার গেলে মন্দ হয় না। এই দিনের আলোয় সুরেশপ্রসাদ আমার কি করবে? ওর স্বাস্থ্য অবশ্য খুবই ভাল তবে আমিও নিতান্ত দুর্বল নই। তাছাড়া গতকাল রাত্তিরে যখন সম্পূর্ণ অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করবার সুযোগ ছিল সে সময়ে না করে এখন উজ্জ্বল দিবালোকে তা করবার কোনো অর্থ হয় না। যাব নিশ্চয় যাবো ওর সঙ্গে।

বললাম—চলুন যাবো।

বেরুলাম। পাথুরে দশ সূর্য উঠতে না উঠতেই পাথর তেতে উঠেছে। মাটি থেকে ঝাঁঝ ভেসে আসছে। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি শহরের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে। সুরেশ-প্রসাদ তাদের বংশের অতীত গৌরবের গল্প করতে করতে চলেছে। তার বলার ভঙ্গি একঘেয়ে শুনতে শুনতে বিরক্তি আসে।

বাইরে থেকে সুরেশপ্রসাদের পৈতৃক বাড়ি যতখানি ধ্বংসস্তূপে পরিণত বলে মনে হয় ব্যাপার আসলে অতদূর নয়। বাইরের দিকে সবগুলো ভেঙ্গে গেলেও ভেতরমহলের কয়েকখানা বড় ঘর এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক খসে পড়া কড়িবরগা ইট-চুন-বালি পেরিয়ে সেখানে পৌঁছলাম। বার বাড়ির ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে এখানে-ওখানে মাথা তুলছে বট-অশ্বত্থের চারা। হস্তপদভগ্ন পাথরের বিবসনা নারী মূর্তি হাতে ধরা পাথরের ঝারি দিয়ে এখনো যে কাকে জল দেবার ভঙ্গি করছে কে জানে! সমস্ত পরিবেশটা থেকে যেন একটা চল যাওয়া দিনের দীর্ঘশ্বাস ভেসে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস গরম হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখছি গরম হাওয়া এসে লাগছে গায়ে। সুরেশপ্রসাদ একঘেয়ে বকবক করে আমাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে কোনটা তাদের বৈঠকখানা ছিল, কোনখানে হত বাঈজীর নাচ আর কোনটাই বা ছিল তার বাগী প্রপিতামহের গোসল-খানা। ওর কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগছে না কারণ আমি এসব ওদের বংশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে দেখছি না। জায়গাটার প্রাচীনত্ব—এখানে যে একদিন মানুষ সুখে-দুঃখে কাটিয়ে গিয়েছে সেই কথা ভেবে আমার ভাল লাগছে।

ট্রেণ ধরতে হবে। ফিরবো ফিরবো করছি এমন সময় সুরেশপ্রসাদ বলল—চলুন এবার আপনাকে মাটির নিচের ঘরগুলো দেখাই।

—সেখানে কি?

—কিছু না। এখানে ছিল আমাদের তোষাখানা। একবার দেখে যাবেন না? চলুন—

ভাঙ্গা ইট-কাঠ-বরগা পেরিয়ে অন্দর-মহলের অটুট ঘরগুলো পেরিয়ে কোথা কোথা দিয়ে আমাকে নিয়ে বলল—সুরেশপ্রসাদ। এক জায়গায় একসার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচের দিকে সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল—এখান দিয়ে নামতে হবে।

ও-ই আগে নামলো। আমি পেছনে। একতলা সমান নামবার পর একটা পাথরের চওড়া বারান্দায় এসে সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকার ঘিরে আছে জায়গাটাকে এই দিনের বেলাতেও। চোখে অন্ধকার সয়ে গেলে তাকিয়ে দেখলাম এটা বারান্দা নয় একটা পাথরের গোল চাতাল। চারদিকে খুপরির মত, অনেক ঘরা মোটা মোটা গরাদ দিয়ে তৈরি তাদের দরজা। ঘরগুলোর ভেতরে নিবিড় অন্ধকার।

সুরেশপ্রসাদ বলল—এই হচ্ছে তোষা-খানা। ওই সব ঘরে থাকত মোহরের কলসী টাকার থলে আরো কত কিছু। এসব শ'-দেড়শ বছর আগেকার কথা। আজ আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই। দেখেন কখনো তোষাখানার ভেতর দেখতে কেমন হয়?

—না তো।

—যান তাহলে একটায় ঢুকুন।

ভেতরে বড় অন্ধকার। সুটকেশে টর্চ ছিল বের করে হাতে নিলাম তারপর ঢুকে পড়লাম একটা কুঠুরীতে।

পেছনে ঝনাৎ করে লোহার দরজা বন্ধ হবার শব্দ। তালা বন্ধ করার শব্দ।

এক সেকেন্ড লাগল প্রকৃত অবস্থা বুঝতে। পাক খেয়ে ফিরে এসে আছড়ে পড়লাম লোহার গরাদের ওপরে। বন্ধ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই দরজা। পাগলের মত টানতে লাগলাম গরাদ ধরে—খুলে দে শয়তান খুলে দে! খুলে দে!

বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দন্তুর হাসি হাসছে সুরেশপ্রসাদ।

—বহুৎ চিড়িয়া পুষেছি মানুষ পুষিনি কখনো। বড্ড সখ ছিল। তো ভগওয়ান আজ মিলিয়ে দিলেন। ইঃ হিঃ হিঃ চিল্লাও—বহোৎ চিল্লাও। ইধার কি আদমী আছে যে শুনবে?

গরাদে মাথা ঠুকছি খাপার মত চিৎকার করছি যা মুখে আসছে তাই বলে শালাশালে দিচ্ছি সুরেশপ্রসাদকে। সে শান্ত হয়ে শুনছে। বলছে—বাঃ! তেজী চিড়িয়া তুই। খুব লড়াকু! লড়ে যা লড়ে যা! চিল্লাবি ততই তো মজা। মুর্দা পুষে কি লাভ

রাগে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি। কিন্তু কিছু করবার নেই। নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তার পোষা জানোয়ার খেপিয়ে মজা দেখছে সুরেশপ্রসাদ।

অনেকক্ষণ মজা দেখে চলে গেল সে।

এ ঘরে একটা ধুলোধুলি আছে। সম্ভবত বাড়ির পেছনদিকে মাঠে জমি বরাবর রয়েছে সেটা। নোট বইয়ের পাতায় এই ঘটনা লিখছি শেষে ভরে সেটা দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছি আমি। যদি কেউ কুড়িয়ে পাও, তবে পুলিশ এনে আমাকে উদ্ধার কোরো। নইলে এই শেষ। বিদায়!

হতভাগ্য
প্রকাশ সোম

সন্ধ্যা। সুরেশপ্রসাদ সিদ্ধি খচ্ছে বসে। ঘরে ঢুকলো কুদর্শন একজন লোক। সুরেশ-প্রসাদ বলল—কি খবর বংশী?

বংশী একটা সাদা খাম এগিয়ে দিল। সুরেশপ্রসাদ হাতে নিয়ে খুলল সেটা। ভেতরে দশ-বারোটা নোটবইয়ের পাতায় লেখা।

—ওর ঘরের ধুলোধুলির বাইরে পেলি? পড়েছিস?

—হাঁ কর্তা। একটু-আধটু বাংলা জানি।

শান্তমুখে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজগুলো উড়িয়ে দিলো সুরেশপ্রসাদ। সিদ্ধির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল—দানাপানি ঠিকঠাক দিয়ে যাস। ভারি লড়াকু চিড়িয়া। বহোৎ লড়ে যাবে।।

গোষ্ঠ বাবু

সে অনেক দিন আগের কথা। ১৯২৯ থেকে ১৯৩২ -এর ভেতরে সামান্য কয়েক দিনই গোষ্ঠবাবুর পিছনে গোলে খেলার সৌভাগ্য আমার জীবনে এসেছিল। সে আজ থেকে প্রায় ৪০।৫০ বছর আগের কথা। অনেক কথার ভেতরেও দু-তিনটে টুকরো টুকরো স্মৃতি কয়েক দিন ধরেই মনের পর্দায় বেশ স্পষ্ট হয়েই ভেসে উঠছে।

আজকালকার মোহনবাগান-ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠ, সেকেলের ক্যালকাটা মাঠ ছিল। ইংরেজ রাজত্বে ক্যাপিটাল দিল্লিতে চলে গেলেও, সেকালের রাজত্ব ডালহৌসি স্কোয়ারের মার্কেন্টাইল ফার্মগুলিই চালাত। বিলাতের ভাল উঠতি ফুটবলারদের নিজেদের কোম্পানীতে চাকুরী দিয়ে, তারা বরাবরই ভাল টিম তৈরী করত। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বরাবরই আই এফ এ-রও প্রেসিডেন্ট হতেন। ওরা যে তখন খুবই ভাল টিম ছিল তা পুরোনো আই এফএ শীল্ড ও লীগ বিজয়ীদের তালিকা দেখলেই বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না।

ক্যালকাটা ক্লাবের গ্রাউন্ড ম্যানেজার ছিলেন ক্লেটন সাহেব। খুব ভাল রেফারী ছিলেন—সত্যিই ভাল।

ক্যালকাটা মাঠে মোহনবাগান-ক্যালকাটার মধ্যে লীগ ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে—তখনও খেলা বোধ হয় আট-দশ মিনিট বাকি ছিল—আকাশ ভয়ানক কালো মেঘে ঢেকে গেছে। প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। গ্যালারীতে দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বলছে। টুকরো খবরের কাগজও পুড়ছে। আগুনের লাল আলো দেখা যাচ্ছে ঐ অবস্থায় খেলা বন্ধ হয়ে যাবারই কথা, কিন্তু ক্লেটনসাহেব কিছুতেই খেলা বন্ধ করছেন না। যদি অন্ধকারের সুযোগে ক্যালকাটা একটা গোল দিয়ে দিতে পারে। সবাই খুব বিরক্ত কিন্তু রেফারী বাঁশী না বাজালে তো খেলা বন্ধ হবে না। হঠাৎ ক্যালকাটার নামকর বাক বেনেট সাহেব খুব জোরে একটা সট করলেন। গোষ্ঠবাবু আমাদের পেনাল্টি লাইনের ৫।৭ হাত সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মাথার বেশ উপর দিয়ে বলটা আমার গোলের ভিতরেই আসছিল। হঠাৎ গোষ্ঠবাবু লোজা লাফ দিয়ে ওপরে উঠে বলটা দু'হাতে ধরে ফেললেন আর বলটাকে ঠিক তার পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। ক্লেটন সাহেব হ্যাণ্ডবল দিলেন—আমাদের সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধের দেওয়াল তৈরী করলাম। গোল হল না।

সেটা ইংরাজ রাজত্ব—মানে 'ইংলিশম্যানে' 'স্টেটসম্যান'-এর রাজত্ব। সাংবাদিকরা এসে গোষ্ঠবাবুকে ধরলেন—কেন এমন আনস্পোর্টিং ব্যবহার? সেকালে আনস্পোর্টিং কথাটার অনেক দাম ছিল—আজকাল অনেক ফিকে হয়ে গেছে।

পরের দিন ইংরাজী কাগজে হৈ-হৈ ব্যাপার 'আনস্পোর্টিং গোষ্ঠপাল'—এমন ভাব যেন উপায় করতে পারলে গোষ্ঠবাবুকে ফাঁসী দেওয়া দরকার। তখনকার দেশী কাগজের মধ্যে 'অ্যাডভান্স' ছিল নামকরা কাগজ। পঙ্কজ গুপ্ত (কুটুদা) ছিলেন ক্রীড়াসম্পাদক। গোষ্ঠবাবু বললেন, 'আমার সন্দেহ হচ্ছিল যে রেফারী হয়ত চোখে কম দেখে, নইলে এমন অন্ধকার তাও দেখতে পাচ্ছে না— তাই যাচাই করার জন্য বলটা ধরেছিলাম—কিন্তু রেফারী ঠিকই হ্যাণ্ডবল দেখতে পেয়েছিল আর ফ্রি-সটও দিয়েছিল। রেফারী চোখে ঠিকই দেখত, চশমাও ছিল না—তবে অত অন্ধকার কেন দেখতে পাচ্ছিল না, এই সমস্যাটারই সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম'।

মোনা গুহ

একদিন ক্যালকাটা মাঠে বোধ হয় কুচবিহার কাপ বা ঐ রকম কোনও একটা খেলা। সমস্ত দিন বৃষ্টি হয়েছে। মাঠের কোথাও কোথাও সামান্য জলও জমেছিল। সেটা সম্ভবত ক্যালকাটা মাঠের ভিতরে পাইপলাইন বসার ঠিক আগেই। মোহনবাগানের সঙ্গে একটা মিলিটারী দলের খেলা—বোধ হয় সেমিফাইন্যাল খেলা হবে। মিলিটারী দলের নাম মনে করতে পারছি না। বোধ হয় 'কিং ওন ইয়র্কশায়ার লাইট ইনফ্যান্ট্রি দল'। ওরা সবাই বুটপায়ে আর আমরা সবাই খালিপায়ে। প্রথমার্ধের শেষের দিকে একটা বল খুব জোরে গোলপোস্টের ডান দিকে (আমরা হাইকোর্ট প্রান্তে খেলছিলাম) মেরেছিল। আমি শুয়ে পড়ে বলটি ধরে ফেলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওদের একজন ফরোয়ার্ড আমাকে খুব জোরে একটা লাথি মারে। বলটা আমার হাতের থেকে বেরিয়ে যায় কিন্তু ১০।১২ ফুটের ভিতরেই এদের আর একজন বলটাকে গোলে বেশ কিছুটা উপর দিক দিয়ে মারে। আমি কি করে নিজেই বলতে পারব না— বোধ হয় অনুপ্রাণিত হয়ে প্রাণপণে ওঠবার চেষ্টা করি কিন্তু কিছুটা উঠতেই বলটা এসে পড়ে ও একটা প্রচণ্ড চেষ্টায় আমার ডান হাতটা বলটায় ছোঁয়াতে পারি—বলটা কর্ণার হয়ে যায়। গোষ্ঠবাবু আমার কাছে এসে একবার আস্তে বললেন কি রে খুব লাগছে।

মাঠের উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ওদের কেউ কর্ণার সট নিচ্ছিল। কর্ণার সটের সময় সাধারণতঃ গোলকীপার গোলের পেছনের পোস্টের কাছেই দাঁড়ায়। আমিও দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু গোষ্ঠবাবু আমাকে বললেন, 'তুই সামনের পোস্টে যা' আর নিজেই পিছনের পোস্টে দাঁড়ালেন। কর্ণার সট হোল, বেশ ভাল সট—গোলের মাঝামাঝি নাগাদ—গোল এরিয়ার লাইন বরাবর মানে ৮।১০ ফুট দূরে এসে পড়েছিল। আমি পিছিয়ে এসেছি—৩।৪ জন হেড নেবার জন্য লাফিয়েছে। আমিও লাফিয়েছিলাম কিন্তু ঐ ৩।৪ জনের জন্য বলের লাইনে পৌঁছাতে পারি নি। ভেবেছিলাম কেউ হেড করলে, হাতের কাছে থাকলে হয়ত বলটা ধরবার সুযোগ পাব। যারা লাফিয়েছিল তারা কেউই বলটা মাথায় নিতে পারলো না। বলটা আমার গোলের সামনে বাঁ ধারে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এর ভিতরে কি যে হল কেউ জানে না রেফারীও না। আমিও না। বোধ হয় কোন কাছাকাছির খেলোয়াড়ও নয়। তাকিয়ে দেখি একজন মিলিটারী ফরোয়ার্ড মাটিতে পড়ে আছে। তার কলার বোন ভেঙ্গে গেছে। তাকে সবাই ধরে ওঠালো। স্ট্রেচার এলো। খেলা বন্ধ। আহত খেলোয়াড় স্ট্রেচারে করে মাঠের বাইরে চলে গেল। রেফারী বলটা নিয়ে পেনাল্টি এরিয়ার বাঁ দিকের কোণার ফ্লপ দিয়ে খেলা নতুন করে আরম্ভ করল। কেউ কিছুই দেখেনি, একটা ফাউল অবধি হয়নি। শুনলাম কলার বোন সামান্যতেই ভেঙ্গে যায়। ও যে ভাবেই হোক পড়ে কলার বোন ভেঙ্গেছে। খেলা চলতে লাগল।

'আমার মনের খোঁকা কিছুতেই গেল না। কেন গোষ্ঠবাবু আমাকে পেছনের পোস্ট ছাড়িয়ে আগের পোস্টে পাঠালেন? খেলা চলতে চলতেই গোষ্ঠবাবু একটা গোল কিক নেবেন—আমি বলটা ঠিক মতন প্লেস করে

দিচ্ছি। গোষ্ঠবাবু সটটা নিয়েই আমার একটু কাছে এসে বললেন, 'কি রে ঐ লোকটাই ত তোবে মারছিল?' আমি বললাম —'হ্যা, ঐ লোকটাই।'

আমি আজও জানি না কি হয়েছিল, আমি কিছুই দেখিনি— মাঠের খেলোয়াড়, দর্শক, রেফারী কেউই কিছুই দেখেনি। কিন্তু আমার মনে হয় কর্ণার কিক নেবার পরেই গোষ্ঠবাবু সেই লোকটার পাশে চলে গিয়েছিলেন আর মুহূর্তের মধ্যে হেড করবার জন্য একটু আগেই লাফিয়েছিলেন। ঐ লোকটা ঠিক সময়েই লাফিয়েছিল কাজেই গোষ্ঠবাবু যখন নামছেন, লোকটি তখন উঠছে। এর ভিতরে কনুই আর কলার বোনের চোট মারাত্মক হবারই কথা।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে একদিন মোহন-বাগান-ডালহৌসি লীগের খেলা। সন্তোষ দত্ত মোহনবাগানের গোলকীপার। দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিকে একটা জোরালো সট সন্তোষদা ধরেছেন প্রায় গোল লাইনের ওপরেই। এমন সময় ডালহৌসীর একজন ফরওয়ার্ড সন্তোষদাকে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল আর তার ঠিক আগেই সন্তোষদা বলটা গোলের বাইরে ফেলে দিয়েছেন। সন্তোষদা ভাল বকসার ছিলেন। এক প্রচণ্ড ঘুষিতে বেচারার দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেল। খেলা বন্ধ হয়ে গেল। ফারপোতে আই এফ এর এমারজেন্সী মিটিং। সন্তোষদা এক বছর সাসপেন্ডেড। স্কোলে বল হাতে থাকলেও গোলকীপারকে চার্জ করা যেত—কিন্তু সেত চার্জ নয়, লাথি মারা—আর বল হাতে থাকলে ঘুষিই বা মারা যায় কি করে? কিন্তু এটা ঘটেছিল।

গোষ্ঠবাবুর মত অমন ধীরস্থির অমন উপস্থিত বুদ্ধি আমি কখনও দেখিনি।

আরও একটা ঘটনা। সেদিন কি তার কিছু-দিনের মধ্যেই ঠিক মনে নেই। কালকাটা মাঠে মোহনবাগান ও মিলিটারী টিমের খেলা। লীগের খেলা কিনা তাও ঠিক মনে নেই। ভিজে মাঠ। বলের ওজন ভগবান জানেন কতো হবে। ৫।৭ কিলো হবে হয়তো। একই ব্যাপার। আবার আমাকেই অন্যায় আক্রমণ। গোষ্ঠববুকেও লাথি মারার চেষ্টা। দ্বিতীয়ার্ধের শেষের দিক। বলটা ওদের ব্যাক খুব জোরে থ্রু পাস করেছে। বলটা গোষ্ঠবাবু পেনাল্টি এরিয়ার ১০ ফুট মতন ভিতরে থামিয়েছেন। ওদের দুজন ফরোয়ার্ড দৌড়ে আসছে। কিন্তু গোষ্ঠবাবু নির্বিকার নিশ্চল ধীর স্থির দাঁড়িয়ে আছেন বল নিয়ে। ওদের ফরোয়ার্ড—যে আগে আসছিল বোধহয় সে তখন গোষ্ঠবাবুর ১০।১২ ফুট দূরে ছিল। গোষ্ঠবাবু পায়ের টোকা দিয়ে বলটা একটু উঠিয়ে সট করলেন। ওদের ফরোয়ার্ড যে কাছে এসেছিল তার তলপেটে লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে মরার মতন দুহাত ছড়িয়ে পড়ে গেল। বলটা রি-বাউন্ড করে আসতেই গোষ্ঠবাবু আবার বলটাকে ধরে আমাদের লেফট আউটের দিকে একটা লঙ সট করে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু যে পড়েছে সে তো আর ওঠে না। দম বন্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছিল। ২।৩ মিনিট বাদে আবার স্ট্রেচার—খেলা বন্ধ—আবার রেফারী বল ড্রপ করালেন। লোকটা ১০।১২ মিনিট বাদে মাঠে ফিবে এসেছিল। হাসপাতাল যেতে হয়নি। এই হল গোষ্ঠবাবু—'দি চাইনিজ ওয়াল'।

আরও একদিনের খেলা আমার খুব মনে পড়ে। লীগ খেলা ডালহৌসির সঙ্গে ক্যালকাটা মাঠে। সেকালে গোলে দাঁড়িয়ে একটা মজার দৃশ্য চোখে পড়ত। আজকাল আর তা নেই—বিশেষ করে ক্যালকাটা মাঠ। যখন ফোর্টের দিকের গোলপোস্টে দাঁড়াতাম তখন আমার বাঁদিকে মানে ক্যাল-কাটা ডালহৌসি গ্যালারীতে লাল মুখ ও সাদা চেহারা মাথা প্রায় সোনালী। আর ডান দিকে মানে পাবলিক গ্যালারীতে সব কালোর কালো। সাদা কালোর কনট্রাস্ট একটা দেখবার মতন ব্যাপার ছিল।

সেদিনও খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে খুবই ভিজে মাঠ। আমি মফঃস্বলের লোক—কলকাতায় খেলবার আগে বোধহয় কখনও কোনো বুটপায়ে খেলোয়াড়ের বিপরীতে খেলিনি। আমাদের সম্পূর্ণ দল। ডালহৌসীর বিপরীতে গুরুত্বপূর্ণ খেলা। খুবই গুরুতর খেলা হবে মনে হয়েছিল। আমরা ৫ গোল খেয়েছিলাম। মোহনবাগান বোধহয় জীবনে কখনও ডালহৌসির বিরুদ্ধে ৫ গোল খায়নি। যা ভয়ানক ভেজা মাঠ। আমাদের জেতা মুস্কিল। কিন্তু ৫ গোলে হারা কল্পনারও অতীত। ৫টার ভিতরে ২টি গোলের জন্য আমাকে ঠিক দায়ী করা যায় না। ভালই গোল হয়েছিল। কিন্তু অন্য তিনটি গোল স্রেফ আমার জন্যই হয়েছিল—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্য দুটো গোল আমার দোষে না হলেও আমার বাঁচানো উচিত ছিল।

ডালহৌসির ট্রাংগো; হাওয়ার্ড; হেগী বিল—লেফট ইন; সেন্টার ফরোয়ার্ড; বাইট ইন পজিসনে খুব নামকরা খেলোয়াড় ছিল বিলাতী মিলিটারী দলের বাছাই খেলোয়াড়-দের ৫ বছরের চুক্তি শেষ হতেই ডালহৌসি ক্লাব মানে কলকাতার সমস্ত জুট মিলস্কে তখন ওদের তাতে ১০০০/১২০০ টাকা মাইনে দিয়ে ওদের দল বানাতো।

সেদিন আমাকে ভূতে পেয়েছিল। ভিজে মাঠ ভিজে বল। দু তিনটে গোল ওদের রাইট ইন করেছিল। আমার কেমন মনে হচ্ছিল বলটা মাটিতে গড়িয়ে আসবে। সেই ধারণায় আমি মাটিতে বসে পড়ে বল ধরবার চেষ্টা করি কিন্তু তিনটের প্রত্যেকটা বলই আমার মাথার উপর দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। আমি দাঁড়িয়ে থাকলে কিছুতেই ঐ তিনটি গোল হত না। আমার হাতেই বল এসে যেত এর একটা কারণ ছিল—দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই আমি ফোর্টের দিকের বাঁ গোল পোস্টের সামনে একটা বল ধরেছিলাম ভাল-ভাবেই কোলের ভিতর চেপে। কিন্তু ওদের একজন আমাকে এমন ধাক্কা মেরেছিল যে বাঁদিকের পোস্টে লেগে আমার বাঁ পায়ের উরুতে খুব চোট পাই। যদিও বলটি ছাড়িনি বাঁচিয়েছিলাম। কিন্তু ৫।৭ মিনিটের ভিতরেই আমার বাঁ পায়ের থাইটা ফুলে ওঠে ও আজ পর্যন্তও সে ফোলা পায়ের ভিতরে রয়ে গেছে।

কিন্তু এটা আমার ঐরকম তিনটে গোল খাওয়ার কোনো অজুহাতই হতে পারে না এর কারণ ছিল সম্ভবতঃ নার্ভাসনেস। আমার খুব লজ্জা হচ্ছিল দুঃখও। জলের ভিতর থেকে বল আনবার সময় গোষ্ঠবাবু একবার বললেন 'হিটকাও কিয়েবে' (হাসছো কেন?) লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এরপর আর মাঠে দাঁড়িয়ে থাকতেও লজ্জা লাগছিল তার ২।৩ মিনিটের ভিতরেই খেলা শেষ হয়ে গেল। র‍্যামপার্ট আর গ্যালারী থেকে লোকেরা সবাই আমাকে খুবই গালাগালি করছিল—করবারই কথা। সমাপ্তির বাঁশি বাজতেই আমি গ্যালারীর স্ট্রাসি খুলে ফেললাম দলের সঙ্গে ক্যালকাটা টেন্টের সবাই যখন লেমনেড খাচ্ছে আমি কালকাটা ক্লাবের গ্যালারীর পেছনের মিলিটারী গেটের দরজা দিয়ে খালি গায়ে দৌড়ে আমাদের টেন্টে পৌঁছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাপড়জামা পাল্টিয়ে বাস আগেই ভিড়ের ভিতর মিশে গেলাম। আমার চারদিকে শতশত লোকে

শরৎ অমৃতের বাঙ্গিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক মুজিবুর—আবেদকুমার ঘোষ-১০৲ মহাজীবন—আবেদকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫ ০১৩৬

জেনানা ফুটবল জর্মেনি

সাধ থেকে বলছি

জেনানা ফুটবল জমাতে পারলো না। যে গুণের পরিচয়ে ফুটবলের মতো এক সাধারণ অথচ উত্তেজক ও আকর্ষণীয় খেলাকে জমিয়ে তুলতে পারা যায়, সেই গুণাবলী আয়ত্তে ছিল না ভারতীয় খেলোয়াড়দের। কাজেই কদিন আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারত বনাম থাইল্যাণ্ডের মহিলা দলের ফুটবল খেলাটি মাঠেই মারা গেছে।

মেয়েদের খেলা মেয়েদের মতোই হয়েছে। খেলোয়াড়দের তরফ থেকে উৎসাহ, উদ্দীপনার এবং সাধ্যমতো চেষ্টায় কামাই পড়ে নি। ইচ্ছে করে কেউ মেহনতে ফাঁকি দিয়েছেন, তাও বলছি না। কিন্তু পরিশ্রমের ক্ষমতা অতি সীমিত বলেই সাধ থাকলেও খেলার প্রয়োজনে যথাযথ পরিশ্রম করার সাধ্য ছিল না অনেকেরই। এক কথায় বলা যায় যে এই ফুটবলের চেহারা ছিল হালকা, ঠুনকো। আসল ফুটবলের মেজাজ ফুটিয়ে তুলতে, তার চরিত্র চিত্রণে যে শারীরিক সামর্থ্য, গতিবেগ, ক্রীড়াকৃতি এবং নিঃশঙ্ক মনোভাবের দরকার পড়ে, সে সব সম্পত্তি ভারতীয় তথা থাই মহিলা খেলোয়াড়দের যোগাড়ে ছিল না। তাই দু পক্ষে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খেলা নিছকই ছেলেখেলায় পর্যবসিত হয়েছিল। জেনানা ফুটবলের গোঁড়া সমর্থকেরা হয়তো এই উপলব্ধির কথা শুনে কুপিত হবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে এ ছাড়া অন্য কিছু বলার উপায় সত্যিই নেই।

থাই তরুণীরা তবু যা হোক ছোটা-ছুটি করেছেন। মাঝেসাঝে জোরালো কিকের এক এক ধাক্কায় বলটিকে দূরে অড়িয়েও নিয়ে গেছেন। কিন্তু ভারতীয় ললনারা সেটুকুও করতে পারেন নি। তাঁরা বল সট করার তাগিদে হাঁটু বা সিনবোন দিয়ে বলে ধাক্কা কষিয়েছেন এবং পায়ের চেটো বা আউট স্টেপে সট করে বলটিকে গজ দশেক দূরে ঠেলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। ঊর্ধ্বগতিতে দৌড়ানো সোল্ডার চার্জ সঠিক ট্যাকলিং হেডিং এসব ব্যাপার না হয় উহাই রইল, সাধারণ পরিস্থিতিতে ঠিকমতো সট নেওয়ার মতো ফুটবলের অতি সাধারণ বিদ্যাও ভারতীয় মহিলা খেলোয়াড়দের অধিগত ছিল না। কাজেই খেলা কেমন হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

খেলা দেখতে সেদিন মাঠে ভিড় মন্দ হয় নি। যাঁরা মাঠে হাজিরা দিয়েছিলেন, জাত ফুটবল দেখতে পাওয়ার প্রত্যাশা তাঁদের ছিল না। ছিল কৌতূহল মেটানো। এই অবকাশে সেই কৌতূহল নিশ্চয়ই মিটেছে। তবে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের অবকাশে তাঁরা যে কৌতুক করার কিছু রসদও খুঁজে পেয়েছিলেন, সে কথাও বড়ি অনস্বীকার্য। এই কৌতুক চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয় যখন এক বেতার ভাষ্যকার ও পরিচিত ফুটবল প্রশিক্ষক মাইকের সামনে বলতে থাকেন 'খেলা দেখিয়ে মেয়েরা আজ অনেক ছেলেকে লজ্জায় ফেলে দিচ্ছেন!" সোচ্চার অভিমত তাঁর। কথাটি কানে গিয়েছিল গ্যালারির মানুষদের। অজান্তে শুনে ফেলে তাঁরা তখন হাসিটি চেপে রাখতে পারেন নি। কেউ কেউ বলেও ফেলেন, বলতে হয় তাই বলা। সাজিয়ে গুছিয়ে এমন করে মিথ্যে বেসাতি করা! ভাষ্যকারের অভিমত শুনে আমাদেরই যে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসছে!

কলকাতার আসরে ভারত নামমাত্র এক গোলে হেরেছে। আগের কটি খেলার ফলাফল হয়েছিল অন্যরকম—সে সব ক্ষেত্রে দু থেকে পাঁচ গোলে ব্যবধান ছিল সীমিত। সবকটিতেই জিতেছিল থাইল্যাণ্ড। কলকাতাতেও হয়তো তেমনি বড়সড় ব্যবধানে থাই-ভারতের শেষ খেলার হারজিতের ফয়সালা হোত যদি না থাই খেলোয়াড়েরা গোলের সুযোগ সৃষ্টির পর সেগুলিকে দরাজ মেজাজে উড়িয়ে ছড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতেন। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে থাই দলকে একটির বেশি গোল না করতে দেওয়ার জন্যে বিশেষ কোনো কৃতিত্বের দাবী ভারতীয় দলের ছিল না। যেহেতু বেশি গোল হয় নি থাই খেলোয়াড়দের তাৎক্ষণিক অকৃতকার্যতায়। অনেক ক্ষেত্রেই গোলের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে থেকেছিল। সেই রাস্তা পরিক্রমণে লক্ষ্যের শেষ প্রান্তে থাই দল পৌঁছতে পারে নি। ক্ষীণতম ব্যবধানে খেলাটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার মূল কারণ এইটিই। ভারতীয় খেলোয়াড়েরা সেন্টার লাইন অতিক্রম করতে পেরেছিলেন কদাচিৎ। থাই দলের পেনাল্টি সীমানায় ঢুকতে পেরেছিলেন কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। থাই গোলরক্ষককে বল ধরতে হয়েছে বার দুয়েক।

'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে

Weight when Packed 135 gm net

Supreme det

detergent washing cake

for whiteness that 'Glows'

সুপ্রীম ডেট ডিটারজেন্ট কাপড় ধোয়ার কেক

নতুন উন্নততর ডেট কেক বাজারের সেরা ডিটারজেন্ট কেক।

এতো পরিষ্কার করার ক্ষমতা, এতো ফেনা ও সুগন্ধকে হার মানায়,কাপড় ধোয়ার এমন কোন কেক আর নেই।

ব্যবহার করে দেখুন। তক্ষাৎ বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, 'উজ্জ্বল' শুভ্রতার জন্যে সুপ্রীম ডেট কেক।

ধবধবে সাদা, ডেটের সাদা

Shilpi DM 7A/76 Ben

"দর্শকদের দরবারে আমার একটি বিনম্র প্রশ্ন : কেন তাঁরা বোঝেন না যে খেলোয়াড়রাও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তাঁদেরও সুখ-দুঃখ আছে, সংসারের চিন্তা-ভাবনা আছে, আছে দৈনন্দিন নানা সমস্যা। ঐ সমস্যার চাপে একদিন যদি খারাপই খেলে ফেলি তাহলে সবাই সমস্বরে ধিক্কার তুলে বেচারী ফুটবল খেলোয়াড়কে নাজেহাল করেন কেন?"

সুব্রত ভট্টাচার্য

'শ্যামনগরের ছেলে আমি কোনদিন ভাবিই নি যে গড়ের মাঠে বড়ো ক্লাবে ফুটবল খেলবো। কলকাতার পথ দেখালেন মুরারিদা। মুরারি সুর—আমার প্রথম জীবনের কোচ্। ছোটবেলায় খেলতাম যুগের প্রতীক ক্লাবে (কে পাল অশোক ব্যানার্জি প্রশান্ত মিত্ররাও একদা যুগের প্রতীক ছিলেন)। মুরারিদা বললেন : 'চল্ কোলকাতার মাঠে খেল্‌বি। আরে গড়ের মাঠ না খেললে ফুটবল খেলাই হয় না! কত ধুমধাম, কত রং কত রেশনাই দেখবি চল। আমি চলে এলাম। গড়ের মাঠ দেখলাম চিনলাম ভালবাসলাম এবং নিজের অজ্ঞাতেই এখানে আটকে গেলাম।'

সুব্রতর সঙ্গে কথা বলছিলাম সেন্ট্রাল কসাইজের ষ্ট্যান্ড রোড সদর দপ্তরে বসে। দিনই বিকেলে মোহনবাগানের সঙ্গে কলকাতা জিমখানার খেলা। এক দঙ্গল লোক ওঁকে 'ডে স্লিপের' জন্য ঘিরে ধরেছে। সুব্রত অর্থাৎ মোহনবাগানের স্টপার সুব্রত ভট্টাচার্যের কিন্তু কোন বিরক্তি নেই। কাউকে বলছেন গেটে থেকো নিয়ে যাবো কাউকে বলছেন অন্য কথা। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। সারা দেহে বাড়তি মেদের নাম গন্ধ নেই। লম্বা টিকোলো নাক বড়ো বড়ো দুটি চোখ বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। সব মিলিয়ে শ্যামনগরের সুব্রত সুপুরুষ সপ্রতিভ। কথাবার্তায় নম্র সংযত এবং লাজুক। নিজেকে যেন গুটিয়ে রাখতে চান। মাঠে অবশ্য সুব্রতর ভিন্ন রূপ অন্য রূপ। সেখানে সুব্রত চঞ্চল দুর্বার দুর্নিবার। ট্যাকলিং লিফ হেডিং চমৎকার পজিশন জ্ঞান প্রায় ত্রুটিহীন। ত্রুটি এখনও যা রয়েছে তা হোল ডিস্ট্রিবিউসনে। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলে সতীর্থ ফরওয়ার্ডদের আক্রমণের পেছনে যতটা মদত দেওয়া প্রয়োজন—সুব্রত এখনও পুরোপুরি তা দিতে পারছেন না। তবে অনুশীলন এবং নিষ্ঠায় অবিচল থাকলে পাকা কোচ প্রদীপের পরিচর্যায় ঐ ত্রুটিটুকুও সুব্রত নিঃসন্দেহে শুধরে নিতে পারবেন বলে মনে হয়।

সুব্রতর জন্ম ১৯৫৩ সালের ১ মার্চ শ্যামনগরের গান্ধীনগর পল্লীতে। বাবা জয়গোপাল ভট্টাচার্য ও মা লতিকা ভট্টাচার্যের পঞ্চম সন্তান সুব্রত। ওঁরা চার ভাই দু বোন। অর্থাৎ সংসারটি বেশ বড়ো। বাবা কাজ করেন শ্যামনগর নিকুঞ্জ কোম্পানীতে। রিটায়ারের সময় হয়ে এলো বলে। দাদা এবং ছোটভাই এখনও বেকার। তাই সংসারের বড় বোঝাটা সুব্রতকেই কাঁধ পেতে নিতে হয়েছে। এত বড় সংসার তাই চিন্তা ভাবনা দায়-দায়িত্ব অনেক সমস্যা অনেক! তবু সবকিছু বজায় রেখে এরই মধ্যে ফুটবল খেলতে হয় চাকরী করতে হয় প্রাকটিস করতে হয়। আউৎপুর স্কুল থেকে সুব্রত স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন ১৯৬৯-এ। প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করেছেন ব্যারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে। ফুটবল সুরু ১৯৬৬ সালে যুগের প্রতীকে। ১৯৬৮ সালে গড়ের মাঠ প্রশান্ত মিত্রর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন ইষ্টবেঙ্গল জুনিয়ার কলেজ লীগ খেললেন খেললেন ইলিয়ট শীল্ডে সুরেন্দ্রনাথের হয়ে। রেলে চাকরী করার জন্য সুব্রত অবশ্য আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের আসরে নামতে পারেন নি, কেননা তখন নিয়ম অন্য রকম ছিল। ১৯৭০-৭১ সালে সিনিয়ার লীগে খেলছেন বালী প্রতিভার সাদা সবুজ জার্সি চড়িয়ে। '৭১ সালেই চাকরী পেয়ে গেলেন বি এন আর-এ। '৭১ থেকে '৭৩ পর্যন্ত রেলেই কাটলো। রেলে চাকরী করার সময় জাতীয় ফুটবলে সর্বভারতীয় রেলওয়ে দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সুব্রত। '৭৩ সালে এর্নাকুলামে জাতীয় ফুটবলের সেমি-ফাইনালে সুব্রতর রেল দল বাংলাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। ফাইনাল অবশ্য কেরালার হাতে রেলের হার হয়েছিল ৩—২ গোলে। '৭৪ সালে সুব্রতর শরীর ভাল ছিল না। সন্তোষ ট্রফিতে খেলাও তাই হয় নি। '৭৫-এ কালিকটে বাংলার (চ্যাম্পিয়ন) হয়ে সন্তোষ ট্রফি খেলেছেন সুনামের সঙ্গে।

'৭৪ সালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন মারদেকায়। ভারত সে বছর প্রতিযোগিতায় একদম ভাল খেলতে পারে নি। স্থান হয়েছিল পাঁচটি দেশের নীচে। মারদেকার ঐ স্মৃতি সুব্রত ভুলে যেতে চান। চান সমস্ত ব্যর্থতাকে ভুলে গিয়ে সার্থকতা আর সাফল্যের আলোর মধ্যে দাঁড়াতে।

বিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়

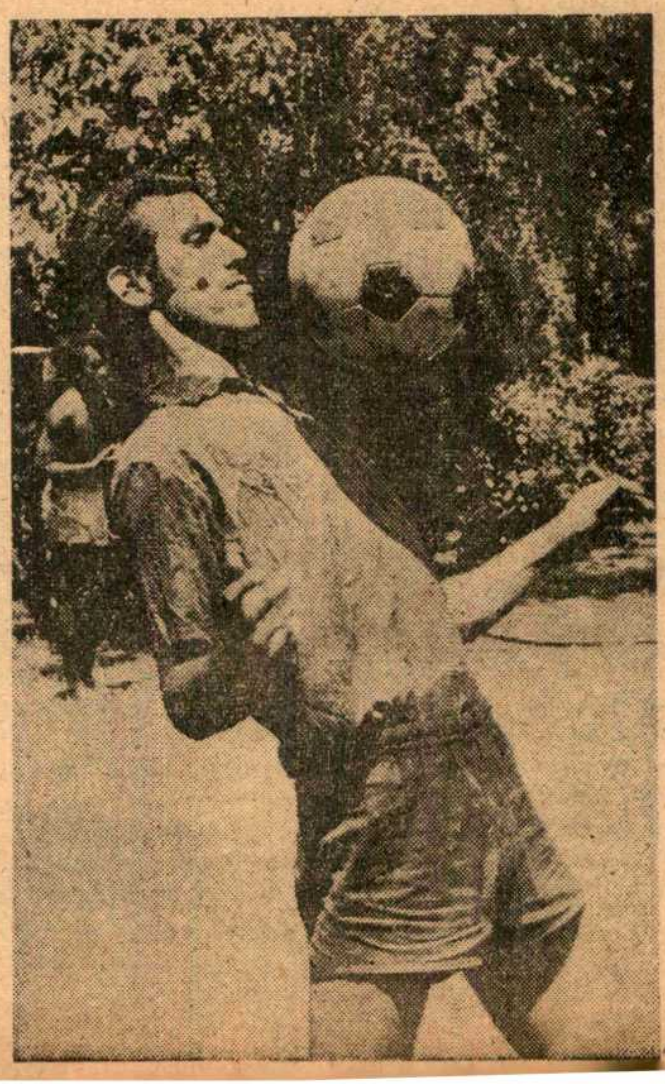

রাইচাঁদ বড়ালকে মানপত্র দিচ্ছেন শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র

বি-এফ-জে-এ পুরস্কার বিতরণী উৎসব

রবীন্দ্র সদন। ৯ জুন সন্ধ্যা। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সংস্থা ৩৯তম পুরস্কার বিতরণী উৎসব শুরু হতে চলেছে। পরিচালক তপন সিংহ এলেন কাঁটায় কাঁটায় ছটায়। হলে ঢুকে বললেন—'কি ব্যাপার এখনও শুরু হয়নি অনুষ্ঠান?' অনুষ্ঠান শুরু হোল আরও মিনিট কুড়ি বাদে।

গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা একটি গানের সুরারোপ করে উদ্বোধনী সঙ্গীতটি গাইলেন প্রবীর মজুমদার ও আরও কয়েকজন।

●

পরবর্তী অনুষ্ঠান ছিল আনন্দশংকরের অডিওভিসুয়াল অর্কেস্ট্রা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের মিলনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। সুর আর নৃত্যের ছন্দে হিল্লোলিত হয়েছিল ঐ শুভ সন্ধ্যাটি। তনুশ্রী ও মমতা শংকরের সাবলীল নৃত্য-কুশলতা এবং আনন্দ শংকরের সঙ্গীতচিন্তার অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে এই নৃত্য-গীত-চিত্রমালায়।

●

অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলি অর্থাৎ অতিথি-অভ্যাগতদের মাল্যদান, সভাপতির (প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র), প্রধান অতিথির (উপাচার্য সত্যেন সেন) ভাষণাদির পর শুরু হোল পুরস্কার বিতরণ। বাংলা তথা ভারতীয় সংগীত পরিচালকদের পথিকৃৎ রাইচাঁদ বড়ালকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হোল। প্রশস্তিমুখর একটি মানপত্র শ্রীবড়ালের হাতে তুলে দিলেন বিচারপতি শ্রীমিত্র। সম্মানিত সংগীতকার আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন—'এই সম্মানে আমি হর্ষিত আনন্দিত।'

●

সাংবাদিকদের ভোটে নির্বাচিত গত বছরের সেরা শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে যাঁরা পুরস্কার নিলেন তাঁরা হচ্ছেন তরুণ মজুমদার, জাজেন তরফদার, সুধীন দাশগুপ্ত রবি চ্যাটার্জী, কে এ রেজা, তপন চক্রবর্তী, রবিন দাস, আরতি মুখার্জী, সৌমিত্র চ্যাটার্জী, আরতি ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা রায় প্রমুখ। বম্বে থেকে এসেছিলেন বিমল রায়, ভিসম বিজখানী, বিজু তেন্ডুলকর ও শ্যাম বেনেগাল।

●

পুরস্কার বিতরণ পদ্ধতিতে এবার কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। স্থানীয় কলা-কুশলী ও শিল্পীদের হাত দিয়েই পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছিল এ-বছর। রাইচাঁদ বড়াল, তপন সিংহ, বসন্ত চৌধুরী, অজয় কর, চন্দ্রাবতী দেবী ও যমুনা বড়ুয়া একে একে পুরস্কারগুলি তুলে দিয়েছিলেন পুরস্কৃতদের হাতে। কে এ রেজা অজয় করের হাত থেকে পুরস্কারটি নিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে ভোলেননি। রাইচাঁদ বড়াল সুধীন দাশগুপ্তকে পুরস্কার দেবার সময় স্নেহ আদরে বুকে টেনে নিয়েছিলেন।

ওপরে—সন্ধ্যা রায়; মধ্যে—তরুণ মজুমদার এবং নিচে—শ্যাম বেনেগাল

সঙ্কোচিত ভঙ্গিতে সৌমিত্র চ্যাটার্জি বসন্ত চৌধুরীর হাত থেকে পুরস্কার নেবার সময় দুজনার চোখে মুখে যে আনন্দের ছাপ ছিল তা খুব একটা চোখে পড়ে না। আরতি ভট্টাচার্যতো মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দের আতিশয্যে তেমন কিছু বলতেই পারলেন না!

আর একটি দর্শনীয় দৃশ্য ছিল তরুণ মজুমদারের হাতে তপন সিংহের পুরস্কার তুলে দেওয়া। ধীর শান্ত পদক্ষেপে হাসি-মুখে এগিয়ে এলেন তরুণবাবু। তপন সিংহ অনেকটা সামরিক কায়দাতেই বেশ জোর দিয়েই করমর্দন করলেন তরুণবাবুর সঙ্গে। দুজনেই হাসলেন সশব্দে। ডানদিকে দাঁড়িয়ে থাকা ডজনখানেক ফটোগ্রাফারের ফ্ল্যাশ বাল্‌ব জ্বলে উঠল। পুরস্কার হাতে দেবার সময় আর এক প্রস্থ আলোর ঝলকানি।

রবীন্দ্র সদনের অনুষ্ঠান শেষ হোল সাড়ে আটটায়। আবার রাত নটায় পার্ক হোটেলে এক হার্দ্য পরিবেশে পুরস্কৃত শিল্পী কলাকুশলীদের সঙ্গে নৈশভোজে মিলিত হয়েছিলেন সংস্থার সভ্যরা। ওখানেই জানা গেল শ্যাম বেনিগাল নতুন ছবির পেপারওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত এখন। খ্যাতনামা বিজয় তেন্ডুলকর আরও দু-একদিন কলকাতায় কটাবেন এখানকার কিছু নাট্যরসিকদের সঙ্গে। তিনি বললেন—'কলকাতা তো নাটকের শহর!'

নেপথ্যে

বিভিন্ন সরকারী বিভাগে অযোগ্য ব্যক্তিদের অধিষ্ঠান এমনতরো অভিযোগ শোনা যায় মাঝে মাঝে, চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিভাগও এমন অভিযোগ যে নেই তা নয়। তবে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সর (সংক্ষেপে সিন সেন্সর বোর্ড) এর কলকাতা শাখার চেয়ারম্যান সম্পর্কে অন্ততঃ এই অভিযোগটি তোলা যাবে না।

পাকা ফিল্ম লাইনের একবারে পাকা লোক এই চেয়ারম্যান মহোদয়, নাম তাঁর ধীরেশ ঘোষ। কলকাতায় বেশীদিন আসেননি সম্ভবতঃ গত বছর এপ্রিলে। তার আগে পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটে পরিচালনা বিভাগের অধ্যাপক হয়ে কাজ করেছেন প্রায় সাত বছর।

চট্টগ্রাম থেকে বি-এ পাশ করে ১৯৩৯ সালে শ্রী ঘোষ এসেছিলেন কলকাতায় পড়াশুনো করতে। এম-এতে ক্লাসও করেছেন দেড় বছর। হঠাৎ কি হোল পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে সহকারী হয়ে চলে গেলেন টালিগঞ্জ পাড়ায়। ছোটবেলা থেকেই যাত্রা থিয়েটারের শখ ছিল সুতরাং সে অভিজ্ঞতা কাজ লাগাতে কসুর করতেন না।

আর একটি অভ্যেস তখন থেকেই তাঁর হয়েছিল। নিয়মিত আমেরিকান সিনেমাটোগ্রাফার পত্রিকা দেখা আর পদ্দুভকিনের বিখ্যাত বই ফিল্ম টেকনিক এন্ড আকটর প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছেন। প্রফুল্ল রায় থেকে যান বীরেন লাহিড়ী, তারপরই নিজের ছবি শুরু হোল ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ নাগাদ, প্রথম ছবি 'জননী' দ্বিতীয় ছবি মানু সেনের সঙ্গে যুগ্ম পরিচালনায় নাম—'এইতো জীবন'। দ্বিতীয় ছবি মহাকাল (হিন্দী বাংলা দুটোই) নাকি সুপার হিট।

এরপর ইনফরমেশন ফিল্ম অফ ইণ্ডিয়ার (আজকের ফিল্ম ডিভিশন) হয়ে দুখানি ডকুমেন্টারী করলেন। ফিচার ফিল্ম দুখানা শুরু করেও শেষ করতে পারেন নি।

ধীরেশ ঘোষ

১৯৫৫'য় দেশ ছেড়ে চলে গেলেন জার্কাতায়। কিন্তু ছবি তৈরীর কাজে ভাটা পড়ল না। ওখানে ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় ছবি করেছেন দুখানা। তারপর আবার জার্কাতা ছেড়ে সিঙ্গাপুর আর কুয়ালালামপুরে পাড়ি দিয়েছেন। দীর্ঘ এগার বছর থাকাকালীন ঐ দু জায়গায় তিনি আঠারোখানি ছবি করেছেন। বললাম—প্রযোজক কে?

: দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার চলচ্চিত্র জগতে প্রায় একচ্ছত্রাধিপতি রান রান শ কোম্পানীর হয়েই ছবিগুলো করেছি—জানালেন শ্রীঘোষ। স্বভাবতই ছবিগুলি মালয়ি ভাষায়। প্রথমে ইংরেজীতে স্ক্রিপ্ট লিখতেন তারপর অনুবাদ করা হতো স্থানীয় ভাষায়।

ছবিগুলি নিশ্চয়ই হিট করেছিল নইলে একজন পরিচালককে দিয়ে একাধিকক্রমে আঠারোখানি ছবি করা কম কথা নয়। এমন কি রান রান শ কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে টোকিওর অনুষ্ঠিত সাউথ-ইষ্ট এশিয়ান ফেস্টিভালে যোগ দিয়েছিলেন একবার। উৎসবে ওঁর ছবিটির নাম ছিল 'ডান ডান স্টিয়া' (ব্যাক ডটার)।

দীর্ঘদিন দেশ ছাড়া হওয়ায় আকর্ষণ বুঝিবা বেড়েছিল দেশের প্রতি। তাই ১৯৬৮তে পুণার ইনস্টিটিউট অধ্যাপনার কাজটি পেতেই চলে এসেছিলেন স্বদেশে। ফিল্ম করার অভিজ্ঞতাকে ছাত্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন।

এখন কলকাতায়। ফিল্ম জগতের দন্ড-মুণ্ডের কর্তা বলা যায়। কিন্তু এই সদাহাস্যময় প্রৌঢ় ধীরেশবাবুর কথা মাত্র অহমিকা নেই। ইন্ডাস্ট্রির প্রতিটি লোকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তাই মধুর। ছবি কাটা-ছেঁড়া করতে গিয়ে পুরোন কোনো বন্ধুর সঙ্গে মতভেদ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন—'তা হবেন হবে ছবির ক্ষতি করতে কখনই আমি চাই না। তবে আইনের মধ্যে যখন আছি আইনকে বাঁচানোর দায়িত্ব তো আমারই।'

আইষটি থেকে ছবি করা ছেড়ে দিলেও ইনস্টিটিউটে থাকাকালীন 'বিজলী' নামে একখানি শর্ট ফিচার ফিল্ম করেছিলেন। এখনও মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে আবার ছবির লাইনে ফিরে যাবার।

নিরীক্ষক

ওপরে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
নিচে—আরতি ভট্টাচার্য

চরণ :: হেমা মালিনী : ধর্মেন্দ্র

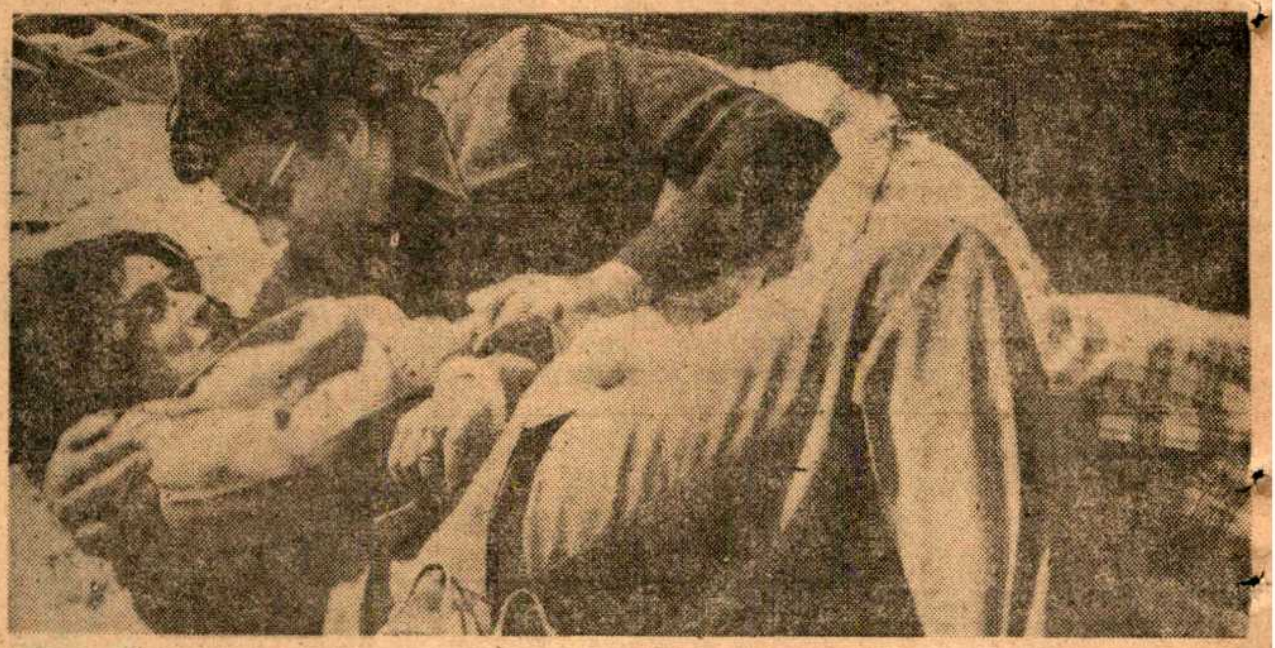

ষ্টুডিও সংবাদ

জানেন, ক'দিন এমন বেয়াড়া গরম পড়েছে যে, আউটডোর শুটিংয়ে আর্টিস্ট-দের পটাপট গোফ খুলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন অজিতেশবাবুর—মেক-আপ করে ক্যাম্প থেকে যেই শুটিং স্পটের দিকে পা বাড়ালেন, তখন ওঁর ঠোঁটে পুরুষ্ট গোঁফ-জোড়া ছিল কিন্তু স্পটে দেখলাম সেটা নেই। ওঁর হাতে গোঁফজোড়া শোভা পাচ্ছে। মেক-আপম্যান মুন্সীরাম শর্মা মহা অপ্রস্তুত। বলল—দেখলেন দিশী আঠার কাণ্ড! ধক বলে নেই—

অথচ দিশী গরমের ধক এত নির্ভেজাল যে, দিনের বেলায় ঘণ্টা দয়েক স্পটে দাঁড়িয়ে শুটিং করলেই কেমন আইনস্টাইন সায়েবের থিয়োরী অফ রিলেটিভিটির কথা মনে পড়ে যায়। যেন কত কত ঘণ্টা জুড়ে শুটিং চলছে এই চড়ারোদের ঘেরাটোপে। এমন কি স্পটে দাঁড়িয়ে সুন্দরী নায়িকার সঙ্গে গল্প-গুজব করা সত্ত্বেও।

ছবির নাম 'প্রতিশ্রুতি', চল্লিশের দশকে এই গল্পে একবার শরৎ একটা ছবি হয়েছিল। আর, এই আরেকবার হচ্ছে প্রযোজক পিনাকী মুখার্জির পরিচালনায়। তবে এবার গল্পকে নতুন ঢং-এ সাজানো হয়েছে। খবর পেয়ে পুলকে প্রায় গদ গদ হয়ে লোকেশানে গিয়েছিলাম—অমৃত-র কাভারেজের জন্যে—গিয়েই আমার পরিগ্রাহি অবস্থা—ওঃ, কী অসহ্য গরম!

পিনাকী মুখার্জি বললেন, আমি মশাই নিরুপায়। অনেক কষ্ট করে ছবিটা করছি। তাই শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা—এ-সবই সমান আমার কাছে। এ-ক'দিন শুটিং আমায় করতেই হবে।

লোকেশানে আর্টিস্ট মজুত ছিলেন ঢের, মহুয়া রায়চৌধুরী, সন্তু মুখার্জি (এ ডিসেন্ট গুড বয়), ছায়া দেবী, অজিতেশ বানার্জি, বঙ্কিম ঘোষ, অর্ধেন্দু মুখার্জি, গীতা প্রধান, পরিতোষ রায়, তপন দত্ত, মাঃ মনোজ ভট্টাচার্য, ছাড়া আরও অনেকে।

চমৎকার লোকেশান বেছেছেন পিনাকী মুখার্জি। গ্রামের নাম বাওয়ালী—ওখান-কার সাবেক জমিদার অরুণ মণ্ডল ইউনিটকে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ীটি ছেড়ে দিয়েছিলেন ক্যাম্প করবার জন্যে। অরুণ-বাবুর সঙ্গে আলাপ হল। চমৎকার মিশুকে অমায়িক মানুষ। প্রধানতঃ তাঁর চেষ্টাতেই গ্রামের সর্বত্র নির্বিঘ্নে শুটিং হচ্ছিল। ভিড় যথেষ্ট হয়েছে কিন্তু তাবলে শুটিংয়ে কোথাও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি। গ্রামের মানুষেরা অভূতপূর্ব সহযোগিতা করেছেন পিনাকীবাবুর সঙ্গে।

আমি স্পটে গিয়ে দেখলাম একটা নাটকীয় দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ হচ্ছে। নীলাম্বরের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে বিপিনের যে খিটিমিটি অনেকদিন ধরেই চলছিল, এই দৃশ্যে তারই জের টানা হচ্ছে। নীলাম্বরের (অজিতেশ) ধারণা বিপিন (অর্ধেন্দু মুখার্জি) তাকে ঠকিয়ে নিচ্ছে। আর বিপিনের বক্তব্য হতভাগা নেশা করে জমি-জমা বেচে দিয়ে বৌ-মেয়েকে যাতে পথে না বসাতে পারে সেজন্যেই ওর জমি আটকাচ্ছি।

নীলাম্বর ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মেয়ে শান্তি (মহুয়া)-কে ঠেঙাচ্ছিল আর বলছিল, —হতচ্ছাড়ি, তোকে না একশোবার মানা করেছি—ও-বাড়ি যাবি না—কেন গিয়েছিলি বল—কেন গিয়েছিলি? আর শান্তি পরি-ত্রাহি চেঁচাচ্ছে—ও জ্যাঠামশাই আমাকে বাঁচাও। বিপিন শশব্যস্তে ছুটে এসে সেই মেয়েকে আগলেছে, অমনি নীলাম্বরের হুঙ্কার—খবদ্দার, ওকে আজ আমি খুন করব—ছেড়ে দাও—

বিপিন তখন গলা চড়িয়ে—বদমাস তুই মেয়ের গায়ে হাত তুলিস—তোর এত বড় সাহস?

—বেশ করেছি—ওকে আজ আমি শেষ করব

—কী এতবড় কথা! রেলেসছায় পড়ে পড়ে মরছিলি না খেয়ে, আমি তোকে এই গাঁয়ে নিয়ে এসে বসত করালাম—জমি দিলাম—আর সেই তুই কিনা কথায় কথায় আমায় অপমান করিস? গাল দিস?

নীলাম্বর তড়িৎ করে বলে ওঠে—তুমি আর মুখ নেড়ো না। দশজনের রক্ত-জল হচ্ছে তোমার আসল ব্যবসা। তোমার স্বরূপ জানতে আর আমার বাকি নেই—

শুনে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পড়ে বিপিন—কী বললি—আমি রক্তচোষা? বলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ওর গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়ে দিয়ে।

অরুণ (সন্তু মুখার্জি) পাশে এতক্ষণ বিব্রতভাবে দাঁড়িয়েছিল। সে চমকে ওঠে। ওদিকে চড় মেরেই বিপিন বুকে হাত চেপে

পুণা ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ছাত্রদের তৈরী কয়েকটি পরীক্ষামূলক ছবি

সম্প্রতি কলকাতার সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে পুণার ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের তৈরী হিন্দী ভাষায় কয়েকটি পরীক্ষামূলক ছবি প্রদর্শিত হয়। **দি হিরো**—ইসমৎ চুগতাইয়ের উর্দু ছোট গল্প অবলম্বনে এ ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিকল্পনা শ্যাম বেনেগালের। বাড়ীর সামান্য একজন চাকর বাড়ীর একমাত্র কর্ত্রীর চোখে তার নায়ক প্রতিপন্ন করার কল্পনা। ঘটনাচক্রে দেখা গেল, প্রয়োজনের বেশী একটুও সহানুভূতি বাড়ীর কর্ত্রীর কাছ থেকে সে পায় নি। বাধ্য হয়ে সে বাড়ী ছেড়ে চলে যায় চিরদিনের মতো। শ্যাম বেনেগালের ঋজু পরিচালনা, আশিষ্ক এবং নাসিরুদ্দিন শাহের ও রামেশ্বরীর অপূর্ব অভিনয় এ ছবির অন্যতম সম্পদ। **কাজললতা**—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **পুঁইমাচা** গল্প অবলম্বনে রচিত এবং অরবিন্দ দত্তরায় পরিচালিত ছবিতে কাজললতার অকালমৃত্যুতে ওঁদের পরিবারে ট্রাজিক দিক দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। মনে হয় পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের **পথের পাঁচালী** ছবির দুর্গা এবং ওঁর মার চরিত্র থেকেই প্রেরণা নিয়ে কাজললতা ও ওঁর মায়ের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। নাম ভূমিকায় রামেশ্বরী, মায়ের ভূমিকায় হৈমন্তী এবং বাবার ভূমিকায় অজিত পতিতুণ্ডীর অভিনয় চরিত্রানুগ এবং কলাকৌশল, আঙ্গিক এক-কথায় অপূর্ব। **ঘেড়ে** কী সুন্দর ছন্দিতা মুখার্জি পরিচালিত এ ছবিতে শিশুদের মানসিকতাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। ছবিটিতে মৌলিকত্ব এবং বিশেষত্বের ছাপ সর্বত্র। ছোটদের অভিনয় এবং আঙ্গিকের ব্যবহার চমৎকার। **অলীবদা** ছবিতে এক আলোকচিত্র গ্রাহক এবং তাঁর দুই মডেলের প্রেম ও প্রণয়কে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝির চিত্রণ ঘটেছে।

অবশেষে—পরিচালক এক বৃশ্চার এক কিন্তু চলচ্চিত্রের বিভিন্ন আঙ্গিক ও চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন। বিশেষ করে বৃশ্চার নিরিবিলি মুহূর্তে তার নাতির সমবেদনামূলক আচরণে পরিচালকের সৃজনক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। লাভেরা ছবিতে এক আধুনিকা তরুণীর নায়িকা হবার স্বপ্ন বিভিন্ন মন্তাজের মাধ্যমে যে আলোকচিত্র গ্রাহক ওঁর ছবি তুলেছিলেন তাঁকেই নায়ক করে হিন্দী ছবির অনুকরণে তোলা ছবিতে পরিচালকের রসবোধের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। **অশ্বমেধ** ছবিতে ব্যাংক ডাকাতি, থ্রি পাওয়ার টু ইনকাইনিটি, এ ওয়াক থ্রু ডার্ক, এবং **আনটাইটেল্ড** ছবিতে নকশাল তরুণদের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে চড়া সুরে দেখানো হয়েছে। পরিশেষে উপরোক্ত ছাত্রদের ছবিগুলি সম্পর্কে বলা যায় কাহিনী খুবই দুর্বল এবং আঙ্গিক বিদেশ থেকে নেওয়া।

অশোক মজুমদার

ধরে। অসহ্য যন্ত্রণা। তারপর থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বিপিন পড়ে যাচ্ছে দেখে অরুণ তাড়াতাড়ি তার বাবাকে ধরে ফেলে। শান্তি ছুটে এসে তার প্রিয় জ্যাঠাকে হাউমাউ করে জড়িয়ে ধরে। ততক্ষণে বিপিনের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এসেছে। যন্ত্রণা-বিকৃত গলায় বিপিন নীলাম্বরকে বলে—ওরে তুই আর আমার সঙ্গে বিবাদ করতে পারবিনে নীলাম্বর, আর বিবাদ করতে পারবিনে—পিনাকী মুখার্জি বললেন—বিপিনের এটা তৃতীয় হার্ট অ্যাটাক।

রাতে ইউনিটের সঙ্গেই ক্যাম্পে রয়ে গেলাম। কথা সামান্যই হল। কারণ সারাদিনের ওই অমানুষিক পরিশ্রমের পর কার আর কথা বলার শক্তি থাকে! পিনাকীবাবু রাত্রে স্নান করে এসেই সহকারীকে নিয়ে হ্যাজাকের আলোয় স্ক্রীপ্ট খুলে কাজে বসে পড়লেন—পরদিনের শুটিং প্রোগ্রাম স্থির করবার জন্যে।

মহুয়া এ-ছবিতে একটা চমৎকার গ্রাম্য তরুণীর ভূমিকায় রূপদান করছে। গল্পের প্রথম পর্বে সে যেমন অশান্ত দামাল গেছোড়ে—দ্বিতীয় পর্বে ঠিক তার বিপরীত। মানে ওর বয়ঃসন্ধিক্ষণের একটা সুক্ষ্ম ব্যাপার দেখেছেন পরিচালক। আমি প্রথম পর্বের সাক্ষী। দেখলাম ছেলেদের সঙ্গে দলবেঁধে কখনো ড্যাংগুলি খেলছে, কখনও ওর ছায়াসঙ্গী ভোলাকে নিয়ে টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে এক ভণ্ড সাধুকে তাড়া করে ফিরছে—গুলতি ছুঁড়ছে, স্কুলে যাবার পথে বইখাতা ঝোপে লুকিয়ে রেখে সারা গ্রাম টহল মেরে ফিরছে, তারপর কখনো বা সদলবলে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে—এই করতে করতে হঠাৎ একসময় স্থির। নায়ক যেই কলকাতায় পড়তে গেল, অমনি যৌবন এসে ওর মনের দুয়ারে আঘাত করল—শান্তি আমি এসে গেছি...আমি এসে গেছি...

মহুয়া এই চরিত্র পেয়ে খুব খুশী।

বললে—অনেক এলেবেলে পার্ট করেছি কিন্তু এতদিন পরে এই প্রথম এক মনের মত চরিত্র পেলাম দাদা। পার্ট করতে আমার ভীষণ ভাল লাগছে।

মহুয়ার এই চরিত্রে কোন জড়তা নেই। সারাক্ষণ একটা ছটফটানী আর খুনসুটি। ওর যত ল্যাগ সবই অবশ্য অরুণদাকে ঘিরে। অরুণদা কলেজ পালিয়ে কোথায় ফুটবল খেলতে যাবে। আদেশ হল, এই শান্তি আমার ঘর থেকে মা-কে লুকিয়ে আমার জার্সি, বুট-টুটগুলো এনে দিবি তো—অমনি শান্তি মহা উৎসাহে সে-কাজে লেগে পড়ল। ছায়াসঙ্গী ভোলা তো আছেই।

জিনিসপত্রগুলো নিয়ে প্রথমে নজরবন্দীর আশ্রমে, যে পার্টটি করছেন আবার সবিতাব্রত দত্ত, উঁহু বাবু এখানে আসেনি, তাহলে নিশ্চয় চাটুজ্যেদের বাগানে। সেই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অরুণের গাঁট্টা খেতে খেতে হল শান্তিকে। শান্তির চোখে জল এসে যাবার উপক্রম। এই পুরস্কার? দাঁড়াও দেখাচ্ছি তোমার মজা। শুটিং দেখতে দেখতে দশকরাই শান্তির কাণ্ড দেখে হেসে আকুল। আচ্ছা ডানপিটে মেয়ে তো বাপু! ইস এইভাবে প্রতিশোধ নিল। অরুণের বইগুলো নিয়ে গিয়ে সোজা জ্যাঠামশাইকে দিয়ে বলতে পারবে—চাটুজ্যেদের বাগানে কুড়িয়ে পেলাম জ্যাঠামশাই, ছাগলে খাচ্ছিল...?

সন্তু মুখার্জি হালিয়ে [illegible] তে

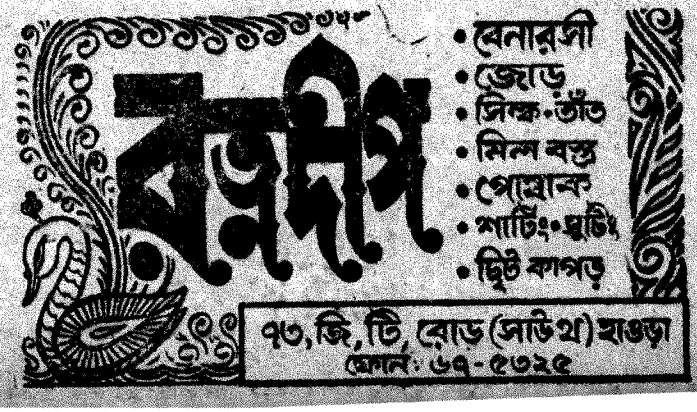

শতবর্ষের স্মরণায়

শিশিরকুমার ভাদুড়ী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এপ্রিল ১৯৪৩-এ মঞ্চস্থ হলো মাইকেল মধুসূদন। ইতিপূর্বে রঙমহলে মঞ্চস্থ মাইকেল জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থান অধিকার করলেও সুধী নাট্যসমাজকে খুশী করতে পারে নি। কবি মাইকেলকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। নাটকটি রচনা করেন মহেন্দ্র গুপ্ত। শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করলেন নিতাই ভট্টাচার্য রচিত মাইকেল মধুসূদন। বলতে গেলে নাটকটি তাঁরই নির্দেশে লিখিত এবং অভিনয়ের সময় প্রয়োজনবোধে আবৃত্তি অংশের পরিবর্তন ও পরিবর্জন করতেন মাইকেল চরিত্রে শিশিরকুমার দেখা দিলেন তাঁর পরিণত প্রতিভার পূর্ণ রূপ নিয়ে। বিস্মিত ও মুগ্ধ হলেন সুধীজন থেকে সর্বসাধারণ। শৈলেন চৌধুরী বিদ্যাসাগর চরিত্রে অভূতপূর্ব। হেনরিয়েটা চরিত্রে নবাগতা বিদুষী অভিনেত্রী সুরুচি দেবীর মার্জিত উচ্চারণ মুগ্ধ করলো সকলকে। মাইকেলের রিহার্সল দেখবার যাদের সুযোগ হয়ছিল —তারা কোনদিনই তা ভুলতে পারবেন না। ভুলতে পারবেন না প্রথম রজনীর অভিনয় শেষে শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে সকলের আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তির কথা। সংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। শিশিরকুমারের কাছে আমার সাংবাদিকের পরিচয় ছিল না—ছিল অনুরাগী ভক্তের। যদিও আমার সাংবাদিক সত্তাও তাঁর কাছ পেয়েছিল চরম স্বীকৃতি। নাট্যকার শচীন গুপ্তও ছিলেন। আমি আর তিনি একই সঙ্গে ঢুকেছিলুম।

সুনীতিবাবু, শ্রীকুমারবাবু, পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রী আরো অনেকে ছিলেন। সনৎ মুখোপাধ্যায়ের ভাগনে বন্ধুবর অজিত ব্যানার্জিদের পরিবারের সঙ্গে ভাদুড়ী পরিবারের ছিল অসীম অন্তরঙ্গতা। শিশিরকুমারের অনুমোদনেই অজিতবাবুকে আমি সহকারী করে নেই পরবর্তীকালে। বন্ধুবর অশোক ভাদুড়ী, তারাকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি গোপাল ভৌমিক এবং আরো অনেকে শিশিরকুমারকে কেন্দ্র করে পৃথক এক গোষ্ঠী মিতাইদা, বিশ্বনাথবাবু প্রভৃতিদের সঙ্গে আমার পৃথক এক সত্তা ছিল।

মাইকেল মধুসূদনের সময় মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চস্থ করেন 'ভিখারীর মেয়ে'। আরব্যোপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের দরদী নাটক নিয়েই গড়ে ওঠে নাটকটি। হুল্লোড় নৃত্য গীত বহুল নাটক। রণজিৎ রায়, শৈলেন চৌধুরী, কানু বন্দ্যো, জীবেন বসু, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতিরা ছিলেন অভিনয়াংশে। সুর ও নৃত্য পরিচালনায় রণজিৎ রায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। মঞ্চ সংগীতে এই নাটকেই প্রথম 'পিয়ানো'-র সংযোজনা বলে অনেকে মনে করেন।

বৃহস্পতিবার ২৫ নভেম্বর ১৯৪৩ সন্ধ্যা ছয়টায় বিপ্রদাসের প্রথমাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। নাট্যরূপ দেন বিধায়ক ভট্টাচার্য। বিপ্রদাস, দ্বিজদাস, বন্দনা ও সতী চরিত্রে যথাক্রমে বিশ্বনাথ, মিহির ভট্টাচার্য, মলিনা দেবী এবং রাজলক্ষ্মী (ছোট) অপূর্ব অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। শৈলেন চৌধুরী, রণজিৎ রায়, নিভাননী, আশা দেবী প্রভৃতিরাও সুন্দর অভিনয় করেন। বিপ্রদাস উল্লেখযোগ্য নাট্য সৃষ্টি হিসেবে কীর্তিত হয়। বিপ্রদাস মঞ্চস্থ হবার পর শিশিরকুমার দেওঘরে তাঁর বন্ধু মণীন্দ্র ব্যানার্জির বিপিন কুটিরে গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। পরে দেওঘর ভাল লাগাতে হেমচন্দ্র নস্করদের নস্করভিলা ভাড়া নেন এবং মাঝে মাঝে প্রায়ই কলকাতা থেকে এখানে আসতেন।

বিপ্রদাসের উদ্বোধন রজনীতে শিশির কুমার যে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন—হুবহু আমি তা লিপিবদ্ধ করে প্রকাশ করি এবং দেওঘরে 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকার উক্ত সংখ্যা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বক্তৃতাটি পড়ে শিশিরকুমার উপস্থিত সকলকে বলেন, 'গুড রিপোর্টেড স্পীচ। কিন্তু অমাকে সম্পাদক যে একেবারে সত্তরের কোঠায় ফেলেন'। বলেই ঘরের ভিতর গিয়ে একখানি আয়না এনে সকলের সামনে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে বলেন, 'তু আই লুক লাইক সেভেনটি?' মুদ্রিত বক্তৃতাংশে মাত্র একটি ভুলই ছিল। শিশিরকুমার তখন পঞ্চাশের কোঠায়। মন্ত্রির হয়েছিল 'সত্তরের কোঠায়'। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে মঞ্চস্থ হয় বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো'। অভিনয়ে বিশ্বনাথ, শৈলেন চৌধুরী, রণজিত রায়, জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য মলিনা দেবী, রেবা দেবী, নিভাননী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতিরা ছিলেন।

নায়কোত্তমের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়দীপ্ত সর্বোত্তম ছবি...

উত্তম · সুপ্রিয়া · সুব্রতা · অনাদি · নন্দিতা · ছায়া · গীতা · দিলীপ · মা · অর্ঘ্য · অনিল

।। কাহিনী ঃ মহাশ্বেতা দেবী • প্রধান সম্পাদক ঃ অর্ধেন্দু চ্যাটার্জি ।।
• কণ্ঠসঙ্গীতে ঃ আরতি মুখার্জি উৎপলা সেন, সুপর্ণা ঘোষ •
উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জ্বলা ঃ প্রভাশ্রী ঃ ইলোরা
নেত্র - জয়া - নারায়ণী - মীনা - পার্বতী - অলকা - মায়া - গৌরী - উদয়ন
কল্যাণী (নৈহাটি) - স্বপ্না (চন্দননগর) - মিলন - লীলা (বারাইপুর)
• প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৯-৪৫ বিবিধ ভারতীতে বিশেষ অনুষ্ঠান •

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

আরও বিচিত্র কাহিনী বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13
Gram : AMRITA Calcutta-700003

AMRITA

Friday 25th June, 1976
Phone 55-5231 (14 lines)

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

আমাদের
এলা কোন ব্র্যাণ্ড
ও
ব্রাণ্ড নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :—বড়বাজার ৬৮৮৫

IAA/KCD-176

মহো-থকসো : এন, কে, গোয়েন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

অমৃত

সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ /

২ জুলাই ১৯৭৬

মূল্য ৭৫ পয়সা

অতিরিক্ত বিমান মাশুল ৭ পয়সা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বোরোলীন যার সহায়
গ্রীষ্মে তার ভয় কি?

যদিও মানুষ কাজে আপনাকে সারাদিন এই অকৃপণ সূর্যের নিচেই চলতে ফিরতে হবে। শরীরের উন্মুক্ত অংশগুলো সূর্য তাপে ঝলসে যাবে। দেখা দেবে ফোড়া, ফুসকুড়ি ও ঘামের অন্যান্য অস্বাচ্ছন্দ্য। অনেক সময় এই সব ক্ষতজ্বালা দুষিত হ'য়ে ওঠে বাইরের ধুলো-ধোঁয়া বা রোদ-জলে।

বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আপনার ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে কাটা-ছেঁড়া-ক্ষতা অংশগুলোকে নিরাপদ রাখে।

১টা.৫০প. বাঁচান!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি®

২টি ৪০০ গ্রা. প্যাক একসঙ্গে কিনে!

গ্ল্যাক্সোজ-ডি। চনমনে তাজাকরা শক্তিদায়ক! কয়েক মিনিটেই আপনার ক্লান্তি দূর করে দেয়! একসঙ্গে ২টি ৪০০ গ্রা. প্যাক কিনে ১ টা. ৫০ প. বাঁচান, আজই।

তাড়াতাড়ি করুন! এ সুযোগ পাবেন ৩১শে জুলাই ১৯৭৬ বা স্টক শেষ না হওয়া পর্যন্ত! তবে বাধ্যতামূলক নয়।

কুপনটি কেটে ভরে নিয়ে, আপনার বিক্রেতার কাছে নিয়ে যান।

(গোটা অক্ষরে লিখুন)

গ্রাহকের নাম ও ঠিকানা .....

.....

বিক্রেতার নাম.....শহর.....

প্রিয় বিক্রেতা মহাশয়,

এই কুপনটি দিলে গ্রাহক ১ টা. ৫০ প. কম দিয়ে ২টি ৪০০ গ্রা. গ্ল্যাক্সোজ-ডি প্যাক কিনতে পারেন,অবশ্য যদি ওপরে দেওয়া বিস্তারিত বিবরণগুলি সঠিক ও স্পষ্টভাবে ভরে দিয়ে থাকেন।

যে প্যাক দুটি আপনি বিক্রী করবেন তা থেকে ফুটো করা লাইন ধরে গ্ল্যাক্সোজ-ডি নাম লেখা ওপরের ফ্ল্যাপ ছিঁড়ে নিন, এবং কুপনের সঙ্গে জুড়ে তা আমাদের বিক্রয়-প্রতিনিধির কাছে দিয়ে দিন। তার বদলে আমরা আপনাকে একটি ১০০ গ্রা. গ্ল্যাক্সোজ-ডি প্যাক দিয়ে পুষিয়ে দেব।

ফ্যামিলী প্রডাক্টস ডিভিশন
গ্ল্যাক্সো ল্যাবরেটরীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

13

daCunha/GL/38a Ben.

কয়েকটি পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থরাজিঃ—

লীলা মজুমদারের
আর কোনোখানে ১০৲

শঙ্কু মহারাজের
গহন গিরি কন্দরে ১০৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
লালুভুলু ৭৲

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরণ্যক ১৮৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
কলকাতার কাছেই ১৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর
বকুল কথা ২৫৲

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের
দাদামহাশয়ের থলে ৯৲

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (১ম) ১৮৲

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের পথে পথে ১৬৲ গঙ্গাবতরণ ৮৲ কাবেরী কাহিনী ১০৲

মহাজীবনের মহাউদ্গাতা
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের সর্বশেষ অবদান
ঋষি অরবিন্দের পুণ্যজীবনী
ভূমাপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ
প্রকাশিত হইয়াছে — দশ টাকা
শ্রীঅরবিন্দের রহস্যময় পুণ্যজীবনের এক আশ্চর্য ভাষ্য। অদ্যাবধি এমন জীবনী লেখা হয়নি।

বিমল মিত্রের
যে অঙ্ক মেলেনি ১২৲ নফর সংকীর্তন ৭৲

সমরেশ বসুর
সূর্যতৃষ্ণা ৯৲ অবরোধ ১০৲

আশাপূর্ণা দেবীর
পলাতক সৈনিক ৭৷৷০ যার যা দাম ৭৲

সুমথনাথ ঘোষের
বনরাজিনীলা ১০৲ মরণের পরে ৩৲

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের
আকাশের সীমা নাই ৫৲ হায়নার দাঁত ৬৲

বিভূতি রচনাবলী
৮ম খণ্ড পুনর্মুদ্রণ বেরিয়েছে—২৫৲
দশম খণ্ড যন্ত্রস্থ

প্রমথনাথ বিশীর
রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ ১৭৲
রবীন্দ্র সরনী ১৫৲
রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ১০৲
মাইকেল মধুসূদন ৮৲

সুমথনাথ ঘোষের
ছোটদের মনের মতো বই
কিশোর গ্রন্থাবলী ১০৲
দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
আরণ্যক
ছাত্র-পাঠ্য সংস্করণ—সাত টাকা

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলি ১২ ৩৪-৩৪৯২
৮৬।১, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ ৩৪-৮৭৯১

মাত্র একটি চেক
আপনার মাইনে দেবার
দিনের চেহারাই পাল্টে দিতে পারে

কর্মচারীদের মাইনে দেবার কাজ সহজ করে তোলার জন্যে আমাদের ৫,৬০০টিরও বেশী শাখা আপনার সেবায় হাজির আছে।

এখন, যখন বেশীর ভাগ কর্মচারীর মাইনেই চেকে দেওয়া যায়, আমরা চাই মাইনে দেওয়ার কাজটা আপনি যথাসম্ভব সহজ করে তুলুন। এই কাজের জন্যে স্টেট ব্যাঙ্কের সবকটি শাখা আপনাকে সাহায্য করতে উন্মুখ। ব্যাঙ্কই মাইনে দেওয়ার সঠিক বন্দোবস্ত করে দেবে। আপনার অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের ওপর চাপও অনেকটা কমবে।

আর আপনার কর্মচারীরা যদি স্টেট ব্যাঙ্কেই অ্যাকাউন্ট খোলেন তো তাঁদের আর একটি নতুন লাভ হবে—সঞ্চয়ের অভ্যেস। কি করে? তখন আর পুরো মাইনেটা একসাথে তোলার দরকার হবেনা, প্রয়োজনানুসারে টাকা তুলবেন, বাকী টাকা সঞ্চিত হবে। শুধু এই নয়, আরও সুবিধে হবে। তাঁর দেশের বাড়ীতে টাকা পাঠাতে হলে, বাড়ীর কাছাকাছি স্টেট ব্যাঙ্কের শাখায় সরাসরি "ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার" করে দিতে পারেন।

এই জন্যে, আগামী মাইনের দিন আসার আগেই, স্টেট ব্যাঙ্ক বা তার সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

PIN CODE FOR FAST MAIL

স্টেট ব্যাঙ্ক

SBI-10-254-BN-E

১৬ বর্ষ

অমৃত

৮ সংখ্যা

"ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির সদস্য"

Friday 2nd July 1976 শুক্রবার, ১৮ আষাঢ়, ১৩৮৩

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৬	সম্পাদকীয়		
৭	ক্লান্তিবিনিয়োগ	(গল্প)	শ্রীমতি নন্দী
১২	বেহুলার ভেলা	(গল্প)	ঐ
২০	কথায় কথায়		শ্রীতারাপদ রায়
২১	বিজ্ঞাপন বিচিত্রা		শ্রীআনন্দ রায়
২২	চিঠিপত্র		
২৩	গোধূলিয়া	(উপন্যাস)	শ্রীনিমাই ভট্টাচার্য
২৫	রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা		শ্রীসুশান্তকুমার মিত্র
২৯	মনের অসুখ		শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
৩২	নতুন বই		
৩৩	সাহিত্যের নেপথ্যে		শার্দ্দিল্য চতুর্বেদী
৩৬	বাতিদান	কবিতা)	শ্রীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশিত হ'ল :—

নির্মল আচার্য-এর

তৃতীয় মেরু

দ্বিতীয় সং—মূল্য=১৭-০০

বাঙ্গালাদেশের একটি অজ্ঞাত অবহেলিত হিন্দু সমাজে ইহা একটি তথ্যপূর্ণ চিত্রণ—কথাসাহিত্যের মাধ্যমে ধরিয়া দেওয়া—ইহাতেই গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্ব। ইহা একটি documentary গ্রন্থ। তথ্যপুস্তক যাহার একটি চিরন্তন মূল্য আছে। বাঙ্গালার ঋষি দাস বা হিন্দু মুচি সমাজের জীবন চর্য্যার অপূর্ব আলোকচিত্র। ভাষানুশীলকবিধায় আমি এখনই ইহাতে ব্যবহৃত ঋষিদাস সমাজের মধ্যে প্রচলিত শব্দ সম্ভারে সংগ্রহ সম্পূর্ণাঙ্গ বাঙ্গালা অভিধানের পরিপোষণের জন্য করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। বাঙ্গালার মুচিদের জীবন নিয়ে—গ্রন্থকারের "তৃতীয় মেরু" বইখানি বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস।

জাতির অধ্যাপক স্বাঃ—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রক্তস্বাক্ষর পাব্লিকেশন, ৭বি, ধীরেন ধর সরণী, কলিকাতা-১২

প্রাপ্তিস্থান—দে বুক ষ্টোর, নাথ ব্রাদার্স, কথা ও কাহিনী

লীলা মজুমদার রচনাবলী

আনুমানিক ৪ খণ্ডে বের হবে। প্রতি খণ্ডের গ্রাহক মূল্য ১৫৲। প্রথম খণ্ড জুলাইতে বেরুচ্ছে

॥ প্রথম খণ্ডের সম্ভাব্য সূচী ॥

পদিপিসির বর্মীবাক্স। বক-বধ-পালা। হলদে পাখির পালক। গুপির গুপ্ত খাতা। এই যা দেখা। বাঘের চোখ। দিন দুপুরে। ও অন্যান্য

হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫৲, ২য় খণ্ড ২৫৲

উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র রচনাবলী

১ম খণ্ড ৩০৲, ২য় খণ্ড ৩০৲

সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী

১ম খণ্ড ২৫৲, ২য় খণ্ড ৩৫৲

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

লুইস ক্যারল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

গ্রিম ভাইদের সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ২৫৲

এডওয়ার্ড লিয়ারের রচনাবলী ১২৲

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি

কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-৭

নিয়মাবলী

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখকদের প্রতি

১। অমৃতে প্রকাশের জন্য প্রেরিত সমস্ত রচনার নকল রাখা পাঠানো। প্রবন্ধাদির নামের ধরন ও প্রসঙ্গ সংক্ষেপে জানান দরকার। অমনোনীত রচনা ফেরতের জন্য ডাকটিকিট পাঠানো না।

২। পেন্সিলে রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা প্রবন্ধাদির জন্য দায়ী হব না।

৩। সঠিক নাম ও ঠিকানা না থাকলে অমৃতে প্রকাশের জন্য গৃহীত হয় না।

এজেন্টদের প্রতি

এজেন্সীর নিয়মাবলী এবং সে সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য 'অমৃত' কার্যালয়ে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য।

গ্রাহকদের প্রতি

১। গ্রাহকের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য অন্তত ১৫ দিন আগে অমৃত কার্যালয়ে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।

২। ভি পি-তে পত্রিকা পাঠানো হয় না। গ্রাহকের চাঁদা নিম্নলিখিত যে কোন উপায়ে মণি অর্ডারযোগে 'অমৃত' কার্যালয়ে পাঠানো আবশ্যক।

সংশোধিত চাঁদার হার

	কলিকাতা	মফঃস্বল
বার্ষিক	টাকা ৩৮-০০	টাকা ৪৪-০০
ষাণ্মাসিক	টাকা ১৯-৫০	টাকা ২২-৫০
ত্রৈমাসিক	টাকা ১০-০০	টাকা ১১-৫০

'অমৃত' কার্যালয়
১১/১ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
কলিকাতা—৩
ফোন : ৫৫-৫২৩১ (১৪ লাইন)

ভারতীয় ভাষায় সর্বপ্রথম সমগ্র স্তালিন রচনাবলী প্রকাশ করে আমরা আনন্দিত, গর্বিত ও ধন্য।

স্তালিন

গ্রাহকদের সানন্দে জানাই যে, আমাদের প্রতিশ্রুতিমত স্তালিন রচনাবলীর ত্রয়োদশ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচনাবলী প্রকাশের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

চতুর্দশ খণ্ড স্তালিন জীবনী আগামী ২১শে ডিসেম্বর স্তালিনের জন্মদিনে প্রকাশিত হবে।

ত্রয়োদশ খণ্ড গ্রাহকগণকে সরবরাহ করা হচ্ছে। আগামী ৫ই জুলাই, ১৯৭৬-এর মধ্যে উক্ত খণ্ডটি গ্রাহকগণকে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। বিলম্বে বর্ধিত মূল্য দিতে হবে।

ডাকযোগে বই সংগ্রহ কারী সহ যে সমস্ত গ্রাহক এখনও বই সংগ্রহ করেন নি বা পান নি ৩১শে জুলাই ১৯৭৬ এর মধ্যে যোগাযোগ না করলে গ্রাহক হিসাবে তাঁদের কোন অধিকার থাকবে না।

বিঃ দ্রঃ—যাঁরা রচনাবলীর ৫ম খণ্ড পান নি তাঁরা যদি আগামী ৩১শে জুলাই, ১৯৭৬-এর মধ্যে ৫ম খণ্ডের জন্য অগ্রিম ১০-০০ (দশ টাকা) টাকা জমা দেন তাহলে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন। অন্যথায় বর্ধিত মূল্য দিতে হবে।

নবজাতক প্রকাশন। এ৬৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-৭

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ কর্তৃক গ্রন্থিত

শ্রীঅমিয়নিমাই চরিত (১ম—৬ষ্ঠ খণ্ড)
প্রতি সেট—মূল্য ২৪-০০

কালাচাঁদ গীতা
প্রতি কপি—মূল্য ১-৫০

নরোত্তম চরিত
প্রতি কপি—২-০০

LORD GOURANGA (vol. 2)
Per Vol. Rs. 6.00

LIFE OF SISIR KUMAR GHOSH
Per Copy Rs. 6.50

প্রাপ্তিস্থান :
পত্রিকা হাউস (হিসাব বিভাগ)
১৪ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা	বিষয়		লেখক
৩৬	এখানে যদিও সমুদ্র নেই	(কবিতা)	শ্রীঅসিতরঞ্জন দাশ
৩৬	তীর্থপথ	(কবিতা)	শ্রীফণী বসু
৩৭	মোহিনী আটম	(উপন্যাস)	শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি
৪২	একালের চিত্রশিল্পী		শ্রীপ্রশান্ত দাঁ
৪৫	একালের গান		শ্রীসন্ধ্যা সেন
৪৯	অন্য শেষ রজনী	(উপন্যাস)	শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
৫১	পুনশ্চ		ক্ষপণক
৫২	বিজ্ঞানের কথা		অনুস্কান্ত
৫৩	মাঠ থেকে বলছি		শ্রীঅজয় বসু
৫৬	মাঠের নায়ক		দর্শক
৫৫	খেলাধুলো		শ্রীবিপুল বন্দ্যোপাধ্যায়
৫৭	সিনেমাটিক টক		শ্রীরঞ্জন মজুমদার
৫৮	কয়েকজন		নিবীক্ষিৎ
৬২	নাটমঞ্চ		শাবচ
৬৩	বিদেশী ছবি		

প্রচ্ছদ : শ্রীসোমা চৌধুরী

গত সংখ্যার প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রীমানব বড়ুয়া

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

যুগাচার্য—সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত গ্রন্থখানি সর্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। অষ্টম মুদ্রণ চলিতেছে

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত। সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

ষষ্ঠবার মুদ্রিত হইয়াছে—৮৲

দুর্গামা

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনকথা শ্রীসরযূতাপুরী দেবী রচিত।

বেতার জগৎ:—অপরূপ তাঁর জীবনালেখ্য অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা।

সাধনা

বসুমতী:—এমন মনোরম স্তোত্রগীতি-পুস্তক বাঙ্গলায় আর দেখি নাই।।

পরিবর্ধিত ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬৲

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪

বিখ্যাত ডাটা গুঁড়ো মশলার প্রস্তুতকারক কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ এখন আপনাদের দিচ্ছেন একটি নতুন অতি সুদৃশ্য টিনের কৌটায় সবরকম গুঁড়ো মশলার অপূর্ব সংমিশ্রণ

এক কৌটা ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাক কিনলে আর কোনরকম মশলা এমন কি পেঁয়াজ, আদা, রসুন প্রভৃতি আলাদা কোন জায়গা দিতে হয় না। ডাটা রেডিমিক্সড কিচেন কুইন প্যাকের মাছ, মাংস, ডিম ও সবরকম মুখরোচক তরিতরকারি অল্প সময়ে চটপট রান্না করা যায়। আপনার সবরকম রান্নায় আজই ডাটা রেডিমিক্সড কারি পাউডার (কিচেন কুইন প্যাক) ব্যবহার করুন।

ডাটা

রেডিমিক্সড কারি পাউডার

কিচেন কুইন প্যাক

প্রস্তুতকারক : কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭, পোষ্ট বক্স নং ৬৭৭৪.

ফোন: ৩৩-১৩৩৭, ৩৪-৯৭০৮

PAM—KCD-74

অমৃত, সম্পাদকীয়

অশ্রু মোচনের দায়

এমন এক-একটা বিপদ আসে যখন কলম ধরে লেখার চেয়ে কাজে নেমে পড়া অনেক বেশি জরুরি। ঠিক তেমন ঘটনাই ঘটছে এখন প্রতিবেশী রাজ্য আসামের কাছাড়, ক্কাজিরাঙা, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায়। সকলেই অনুমান করতে পারছেন, প্রসঙ্গটি—বন্যা। কিন্তু সরকারী উদ্যোগে ত্রাণের কাজ সে সব অঞ্চলে ব্যাপক হলেও—উদ্ধারের কাজে এমন কি সেনাবাহিনীকেও নিয়োগ করেছেন সরকার—কিন্তু আমরা, অর্থাৎ সাধারণ নাগরিক কি সে ব্যাপারে খুব একটা সক্রিয়তা দেখাতে পেরেছি।

বিদেশী শাসনের আমলে তো ঘটেই এমন কি স্বাধীনতার পরেও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বেশ তৎপরতা দেখা যেত এ ধরনের প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার খবর এলে। এ বছর, অন্তত এই নিবন্ধ রচনার সময় পর্যন্তও, সে রকম কোনো উদ্যোগ না দেখে হতাশ বোধ করা অনিবার্য হয়ে উঠছে।

ভারত এক এবং অবিভাজ্য—আমাদের কর্মে ও চিন্তায় এ চেতনা সর্বদা জাগ্রত। কিন্তু সেই একত্বের মধ্যে বৈচিত্র্যেরও স্থান আছে এ কথাও উচ্চ-নীচ অভেদে সর্বজনস্বীকৃত। তাছাড়া মাতৃভাষার বন্ধনও একেবারে নাড়ির সম্পর্কের মতোই অচ্ছেদ্য। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, আসামের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সব থেকে বেশি কাছাড় অঞ্চলই। ঐ জেলাটির প্রায় অর্ধেকই বন্যাপ্লাবিত। পরিস্থিতি হল, সেখানকার দশটি মহকুমার সাতটিই জলের নিচে, এবং এর মধ্যেই বিপন্ন হয়ে পড়েছে দশ হাজার পরিবার। কাছাড়ে এ পর্যন্ত বন্যাকবলিত অঞ্চলে মৃতের সংখ্যা যদিও দশ, কিন্তু এই সংখ্যা যে বাড়বে না তা নিশ্চয় করে বলা কঠিন। প্রতিদিনের খবর সংবাদপত্রেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে যা মনে করিয়ে দেবার তা এই যে, যেসব অঞ্চলের কথা বলা হল তার জনসংখ্যার একটা বড় অংশই বাঙালি, এবং পশ্চিমবঙ্গের মূল ভূখণ্ড থেকে ভৌগোলিক দিক থেকে তাঁরা দূরে থাকেন বলে তাঁদের অনেকের মধ্যেই এক ধরনের বেদনাবোধ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। এই পটভূমিতে আমাদের কি উচিত ছিল না, আরো একটু সক্রিয় সাহায্যের জন্যে তৎপর হওয়া? আমরা তা হতে পেরেছি কি? প্রধানমন্ত্রী ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর একটি ত্রাণ তহবিল আছে। সেই ভাণ্ডারে কি সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করার মতো কোনো সাহায্যের টাকা জমা পড়েছে? তা যদি ঘটত তবে অন্তত কিছুটা মানসিক সাহায্যও পেতে পারতেন আমাদের আত্মার সোদর সেই দূর-দূরান্তের বিপন্ন মানুষগুলি।

না, এ-কোনোরকম ভাষান্ধতার কথা নয়। কেননা, তাকে প্রশ্রয় দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের পক্ষে। এ রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ, এবং ভারতের বাইরেরও বিভিন্ন জাতির অধিবাসীরা এতকাল ধরে এমন পরম মিত্রতার সঙ্গে বাস করছেন যা নিয়ে সত্যিই আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। এবং সেই জন্যেই একই সঙ্গে বিচলিত বোধ করছি আমরা অরুণাচল এবং গুজরাটের জন্যেও। হ্যাঁ, গুজরাটেরও একটি অঞ্চল এখন বন্যা-প্লাবিত!

শ্রীজগজীবন রাম অবশ্য গত মাসেই একটি জাতীয় বন্যা কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেছেন। কী করে বন্যা থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে, সেটাই হবে ঐ কমিশনের বিচার্য।

অবশ্য সকলেই জানেন, বন্যা বা যে কোনো ধরনের প্রবল আকারের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে একেবারে নিরস্ত করা দুঃসাধ্য। তবে চেষ্টা করলে তার ভয়াবহতা অনেকটাই কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, ইতিমধ্যেই এ তথ্য আমাদের আয়ত্তের মধ্যে যে, পাহাড় থেকে বৃষ্টির জল যে সব অঞ্চল দিয়ে তীব্র বেগে নদীর দিকে ধাবিত হয়, সেই সব ক্যাচমেন্ট এলাকায় বনাঞ্চল তৈরি করলে বেগের প্রবলতা কমে যায়। এবং নদীর উজানে কিছু ক্যানেল তৈরি করে বন্যার জলকে অন্য নানা খাতে বইয়েও দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া সেই মহেঞ্জোদারো সময় থেকে যা নাকি আমরা করে আসছি সেই বাঁধের ব্যবস্থা তো আছেই।

জাতীয় বন্যা কমিশন নিশ্চয়ই আরো অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা জানাতে পারবেন। সকলেই প্রতীক্ষা করবেন সেজন্যে সাগ্রহে। কেননা খবরে দেখা যাচ্ছে গত দুই দশকে ভারতের বন্যাকবলিত অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৭০ কোটি টাকা থেকে দাঁড়িয়েছে এখন ৫৭০ কোটি টাকাতে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সময়োচিত তৎপরতায় এ ধরনের দুর্ভোগ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে, আজকের এই উন্নততর প্রযুক্তিবিদ্যার দিনে এ বিশ্বাস খুবই স্বাভাবিক।

একই লেখক

দুই গল্প : দুই সময়

ক্লান্তি বিনিয়োগ

মতি নন্দী

সিঁড়িতে দুজন উঠছে। শব্দের প্রকারে বোঝা যায় প্রতিযোগিতা হচ্ছে আগে ওঠার। তিন তলার ল্যান্ডিংয়ে একজন প্রেমে খিলখিল হেসে চার তলার সিঁড়ি ধরল। পিছনে তাকিয়ে উঠছেন দুহাতে আঁচলটাকে বুকে চেপে। তবু বাম বাহু উপচে আঁচল লুটোচ্ছে। উত্তেজনার ঝাপটে মুখ রক্তিম। চারতলায় পৌঁছবার মুখে সামনে তাকিয়ে দেখলেন পাশের ফ্ল্যাটের নির্মলবাবু সঙ্গে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক ওর দিকেই তাকিয়ে চোখে কৌতূহল। সেই সময় সিঁড়ি থেকে অপর প্রতিযোগী হাঁসফাঁস করে বললেন 'রানু আস্তে। তোর হার্টের ট্রাবলটা কাল রাতেও.....এভাবে তোমার .....কিন্তু।' উনি পিছনে তাকিয়ে শেষ ধাপ অতিক্রম করে পা বাথতেই আঁচলে জড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

নির্মল এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই মহিলা চটপট উঠে লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় দুমদুম কিল বসালেন।

রানু কোথায় লাগল?' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওর স্বামী উঠে এলেন। প্রথমেই নজরে আসে মাথাজোড়া টাক ও দেহের হৃষ্টপুষ্ট আয়তন। বেড়িয়ে ফিরছেন তাই পরণে হাফপ্যান্ট স্পোর্টস গেঞ্জী ও কেডস।

'ডাক্তারের বারণ তবুও তুমি' উবু হয়ে তিনি স্ত্রীর গোড়ালিতে হাত বাথলেন।

'কিছু হয়নি কিছু হয়নি।' আরও কয়েকটা অধৈর্য কিল দরজায় পড়ল। এর মধ্যেই চাপা গলায় একবার বললেন, 'পা ছাড়ো।'

ওরা দরজা বন্ধ করার পর নির্মল বলল 'আমার প্রতিবেশী। বেশ সুখেই আছে।'

অনন্তর স্ত্রী বলল 'দুজনের মধ্যে কিন্তু বয়সের তফাৎ অনেক।

নির্মল জানাল 'প্রায় আঠারো বছরের। মিস্টার গুহ নিজেই বলেছেন উনি এখন পঞ্চান্ন স্ত্রী আটত্রিশ। বিয়ে হয়েছে প্রায় ষোল বছর।

স্বামীকে লক্ষ্য করে অনন্তর স্ত্রী বলল 'কি রকম ভাইবোনের মত ভাবসাব না?'

অনন্ত এতক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ছিল। স্ত্রীর কথায় বর্ণপাত না করে নির্মলকে বলল, 'ওকে কিন্তু চেনাচেনা লাগল, নাম কি রে?'

'কার?'

'মহিলাটির।'

'মালতী গুহ।'

অনন্ত যেরকম মুখভঙ্গী করল তাতে যেন একটা রহস্য চুকে গেল। 'সুখে থাকলেই ভালো। এবার তাহলে চলি। তুই। কিন্তু বুধবার অবশ্যই যাবি, কেমন।'

নির্মল ঘাড় নাড়ল। স্ত্রীকে নিয়ে অনন্ত সিঁড়ি ধরল। কয়েক ধাপ নেমেই হঠাৎ ফিরল। নির্মল তখনো দাঁড়িয়ে। বালবটা কম পাওয়ারের। দেয়াল বিবর্ণ। জানলা দিয়ে রাস্তার গাছগুলো দেখা যায়। এতবড় ফ্ল্যাট বাড়িটায় কোন সাড়াশব্দ নেই। অনন্তর মনটা ছমছম করে উঠল।

'তোর ভয় করে না একা থাকতে? হেসে নির্মল মাথা নাড়ল। অনন্ত নেমে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে। নিভিয়ে দুটো টেবল ল্যাম্পই নির্মল জ্বালল। লম্বা টেবল। অভিধানগুলো সার দিয়ে হেলিয়ে রাখা। পাতাগুলো মৃতের চোখের মত খোলা। ল্যাম্প দুটো বইগুলোর মাঝে ঘাড় নুইয়ে। ঘরের অধিকাংশই চাপা অন্ধকার জাওয়া। দেয়াল ঘড়িটা টকটক শব্দ করে চলেছে। অতি ধীরে মাথার উপরে পাখা ঘুরছে। জানলা দিয়ে হাওয়া এলে পর্দাটা ফুলে ওঠে থরথর করে কাঁপে। নির্মল তখন সন্তর্পণে তাকায়। স্টীলের আলমারিটা অন্ধকারের কোণায় ঠায় যেন অপেক্ষা করছে।

দেয়ালজোড়া বইয়ের শেলফ্। তখন সে কলম রেখে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাইরের দরজায় খুটখুট শব্দ হয়। গয়ারাম দরজা খুলে দিল।

'নির্মলবাবু কি কাজে বসে গেছেন।' বলতে বলতে পাঞ্জাবী-পাতলুন পরা গুহ ঘরে ঢুকলেন। নির্মল কুঁজো হয়ে বসেছিল। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

'তখন দেখলেন তো কি জোরে পড়ল,' চেয়ার টেনে গুহ শুরু করলেন, 'এই নিয়ে একচোট হয়ে গেল।'

'আপনাদের তো রোজই একচোট হয়।'

'কথা তো শুনবে না। ডক্টর সেনগুপ্ত তো বলেই দিয়েছেন পরিশ্রম একদম চলবে না কমপ্লিট রেস্ট। অথচ দেখলেন তো কিভাবে দৌড়ে উঠল।'

গুহ সুগন্ধি রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। নির্মল কলমটা টেবলে ঠুকল।

'আপনার এই ঘরটা কিরকম স্যাঁতসেঁতে লাগে বোধহয় অন্ধকার অন্ধকার বলেই না?'

'আপনি প্রত্যেকদিনই একথা বলেন।'

'প্রত্যেক দিনই যে এইরকম মনে হয় একিরকম। হঠাৎ টেবলের দিকে ঝুঁকে গুহ বললেন, 'কদ্দুর এগোলেন।' একটুখানি উঠে টেবলে রাখা পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে 'ওরে বাবা, ডেথ-এ পৌঁছে গেছেন। অ্যাঁ এখুনি ডেথ, মৃত্যু? নাউন বিশেষ্য। মরণ জীবনাবসান; হত; ধ্বংসকারী শক্তি. অধ্যাত্ম জীবনের অভাব.....এটার মানে কী?'

'কিসের?'

'এই অধ্যাত্মজীবনের অভাব?'

চেয়ারে মাথা এলিয়ে নির্মল বলল, 'মানে আর কি, এমনিই।'

'বাঃ অভিধানে কি এমনি এমনি কোন কথা থাকে।'

'থাকে না? সব কথাই কি আমরা ব্যবহার করি!'

নির্মলের মনে হল, কথা বলতে শুরু করলে এ লোকটা জমিয়ে বসবে। এমনিতেই ক্লান্ত লাগে, তারউপর বোকার মত প্রশ্ন করে যাবে। কাল বলেছিল আপনি বিয়ে করেননি কেন?

'শব্দ গুনে গুনেই তো পাবলিশার টাকা দেয়, তাই একটু বাড়িয়ে দিলাম।'

গুহ দুই হাঁটু নাড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটা যেন এখন বুঝে ফেলেছেন। ফাঁকি দিয়ে লাভ করছেন তাই অধ্যাত্ম-

ডঃ হেমেন্দ্র বসু এম.বি.বি.এস.
ডঃ এস.এন পাণ্ডে এম.বি.বি.এস
যৌবনের রহস্য
অবিবাহিতদের জন্য • মূল্য-৮৲
যৌনবিজ্ঞানের রঙীন ও সচিত্রে চিত্রিত অতি আধুনিক সংস্করণ।
মোহন লাইব্রেরী
৪৩ কলেজ স্ট্রীট
মাত্র ৮৲ টাকা পাঠালেই ডাকমাশুল ফ্রি

জীবনের অভাব।' কপালে মুখে পর পর ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গেল।

'আচ্ছা মিস্টার গুহ' নির্মল কলম দিয়ে টেবলে টোকা দিতে শুরু করল। গুহ হাঁটু নাড়ান বন্ধ করলেন।

'কি বলছিলেন বলুন।'

'আচ্ছা আপনার কথনো কি মৃত্যু-ইচ্ছা হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে গুহ সিধে হয়ে বসলেন। ব্যগ্র হয়ে বললেন, 'কেন কেন একথা বলার অর্থ?'

'অভিধানে কথাটা আছে তো তাই বললাম।' নির্মল সন্তর্পণে কলমে ঢাকনা পরালো। ধীরে ধীরে ঘুরে বসল। টেবল ল্যাম্প ঘুরিয়ে দিল গুহর দিকে। অস্বস্তিতে চোখ পিটপিট করল গুহ।

'দেয়ালের আলোটা জ্বাললে হয় না?'

নির্মল যেন শুনতেই পেল না। বারান্দার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলল, 'একদিন তো মরতেই হবে আমাকে আপনাকে আপনার স্ত্রীকে সবাইকেই। সেকথাটা কি ভেবে দেখেছেন? নিশ্চয় ভেবেছেন, কিম্বা কোন না কোন দিন ভাববেনই। তখন কি মনে হবে?'

'আলোটা একটু ঘুরিয়ে দিন না।'

নির্মল একদৃষ্টে গুহর দিকে তাকিয়ে রইল। গুহ হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা সরিয়ে দিতে গেল। নির্মল ওর নাগালের বাইরে টেনে নিল।

'মনে হবে ভীষণ একা। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারই নিরর্থক। যে দৃশ্যকে তারিফ করছি, যে নারীকে ভালবাসছি। যে সন্তানের মঙ্গলকামনা করছি, এসবই ক্ষণস্থায়ী। এর পিছনেই ওৎ পেতে রয়েছে ধ্বংস। তাই না?'

নির্মলের কণ্ঠস্বর ঢ্যাপঢ্যাপে শোনাল। গুহ সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছে অস্ফুটে বললেন, 'আজ কেমন যেন গরম পড়েছে।'

'হ্যাঁ পাখাটা বাড়িয়ে দিন না।'

গুহ রেগুলেটর টেনে পাখার বেগ বাড়িয়ে এলেন।

'আপনার ঘরে বাইরের হাওয়াও আসে, না?'

'হ্যাঁ।' নির্মল আলোটা ঘুরিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে গুহ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

'কিসব আজেবাজে কথা যে বলেন। সবই যদি নিরর্থক তাহলে এতসব কিছু গড়ে উঠত না।'

নির্মল চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ক্লান্তভাবে বসে রইল। গুহ আর একটু উৎসাহভরে বললেন 'আপনার মত করে যদি সবাই ভাবতো, তাহলে এর কিছুই হত না।'

'কি হত না?'

'এই বাড়িঘর রাস্তাঘাট ছেলেপুলে।'

গুহর গাল ভর্তি হয়ে গেছে কথার প্রাচুর্যে. বার কয়েক ঢোক গিলে আবার বললেন 'আসল কি জানেন দিনরাত কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে এই একঘেঁয়ে কাজ করেন বাইরে তো আমাদের মত বেরোন না তাই। একটা কিছু করুন. যাতে সুখ শান্তি পাবেন।'

'সুখী লোকেরাই তো মৃত্যু ইচ্ছার শিকার হয়। আপনারও হয়।'

গুহ যেন ছুরিকাহত হলেন। 'কি বলছেন, আমি।'

'নিশ্চয় আপনি সুখী একথা অস্বীকার করবেন?'

নির্মল ঝুঁকে পড়ল। যেন ভূপতিত শিকারকে পর্যবেক্ষণ করছে। 'আপনি সুখী নন? আপনার স্ত্রী সুখী নন?'

'নিশ্চয়।' গুহ শেষ চেষ্টার মত প্রায় চীৎকার করে উঠলেন। 'কেন সুখী হওয়াটা কি দোষের?'

'সুখ নিয়ে আপনারা কি করেন? সর্বদাই তো ব্যস্ত সুখকে আগলে রাখতে। এতে কি ক্লান্তি আসে না? তখন কি মনে হয় না আরো বড় সুখ যাতে ক্লান্তি নেই উদ্বেগ নেই, তার আশ্রয় নেওয়াই ভালো?'

হটাশ করে চেয়ার ঠেলে গুহ উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মল দেয়ালঘড়ি দেখল। আজ ওকে বিদায় করতে বেশী সময় লাগে নি। লেখার মাঝে এইভাবে এসে লোকটা সব গুলিয়ে দিয়ে যায়। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন। নির্মল কলম খুলে লেখার দিকে তাকাল। ডেথ শব্দটির সঠিক ব্যবহার কিভাবে হয় উদাহরণ দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে।

বইয়ের তাকগুলোর দিকে সে তাকাল। যে কোন একটা বই খুললে একটি বাক্য পাওয়া যাবেই। উঠে নামিয়ে আনতে হবে। খুঁজে বার করে লিখতে হবে অনুবাদ করতে হবে। এর থেকে বরং বানিয়ে একটা বাক্য রচনা করে ফেলা যায়। কিন্তু ব্যাকরণ শেষে ব্রাকেটে কোন বড় লেখকের নাম দেওয়া যাবে না। লোকের ধারণা বড় লেখকরাই শুধু শব্দের যথাযথ ব্যবহার জানে। উজবুক আর কাকে বলে। একটা চমৎকার বাক্য লিখে পাশে যদি শেকসপীয়রের নাম বসিয়ে দিই। চিটিং ঠকানো হবে? কাকে?

শেকসপীয়র, না এই অভিধানের পাঠককে। লোকটা তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে. মানহানির মামলা করতে আসবে না।

নির্মল হাসলো। বানিয়ে লিখলে মন্দ হয় না। অন্যায় হবে বটে, নিজের লেখা অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়ায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি? এতে আমারই সুবিধে কষ্ট করে উঠে তাক থেকে বই আনতে হবে না।

উঠতে হবে না। এই ভেবেই নির্মল আরাম বোধ করল। একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। একটু পরে গেলেও চলবে। দুটো পা তুলে দিল যে চেয়ারে গুহ বসছিলেন। শব্দ করে আঙ্গুল মটকালো। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময়ে চোখ বুজল।

হঠাৎ চটক ভাঙ্গল প্রচন্ড শব্দে। একটা জেট বিমান নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে। পিছনে যেন বিরাট পাথরের চাঙ্গড় বাঁধা। তারই ধাক্কায় বিশ্ব চরাচর চরমার করতে করতে বিমানটি চলে গেল। সিধে হয়ে বসতে গিয়ে নির্মল টের পায় স্নায়ুকোষের প্রাচীরগুলো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। বুকের মধ্যে দপদপ করছে।

কিছুক্ষণ পরেই এই বিধ্বস্তভাব কেটে গেল। ঘড়িটা টকটক করছে। দূরের কোন বাড়িতে নাছোড়বান্দা বেহালা বাদকটি আজও সাধনা শুরু করেছে। এই দুটি শব্দ উদ্ধারকারীর মত নির্মলকে টেনে তুলল। চোখে মুখে জল দেবার জন্য সে বাথরুমে এল।

দুটি ফ্ল্যাটের বাথরুম পাশাপাশি। এ বাড়ীর প্রতিতলাতেই তাই। বাথরুমের জানলায় গরাদ নেই, পাল্লায় ঘষা কাচ লাগানো। জানলা খোলা দেখে নির্মল বিব্রত হল। পাশের ফ্ল্যাটে চোর ঢুকলে এই জানলা গলে কার্নিশে নামতে পারে। ড্রেন পাইপ ধরে ওপাশে হাত বাড়ালেই পাশের বাথরুমের জানলায় পৌঁছন যায়। গয়ারামকে জাগিয়ে তুলে বকুনি দেবার ইচ্ছাটি মুলতুবী রেখে সে জানলা বন্ধ করল। চৌবাচ্চায় মুখ ডুবিয়ে দিল।

জলে সন্তর্পণে নির্মল চোখ খুলল। ঘোলাটে আবছা। চৌবাচ্চার তলায় কালো কালো কি সব, সম্ভবত শ্যাওলা। ডান হাতটা নাড়তেই পর্দার মত কালো কালো শ্যাওলা দুলতে থাকল। মুখ তুলে নিল সে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

হাওয়ার জন্য নির্মল রাস্তার ধুলো বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সারি-দেওয়া গাছের ডালপালা রাস্তার আলোকে চেপে ধরেছে ভূপৃষ্ঠে। ভারী ক্লান্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে কেউ চলেছে। ঝুঁকে দেখল পা টেনে টেনে একটা ষাঁড়। অজস্র নক্ষত্র। কেউ যেন একটাব পব একটা সিগারেট খেয়ে আকাশে চেপে নিভিয়েছে। নির্মল ঠাণ্ডা রেলিংয়ে কপাল ঠেকাল। এই গভীর রাত্রে নিঃসঙ্গতা প্রকট হয় অতি ধীরে।

গুহদের ফ্ল্যাটে নীল আলো জ্বলছে। প্রতিটি ঘরে দালানেও। মিসেস গুহর ভূতের ভয়। রাত্রে ওর নাকি মনে হয় কে এসে গলা টিপে দেবে। মাস দুয়েক আগে ঠিক এই-ভাবেই নির্মল দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন মিসেস গুহ। নির্মল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে যায়। গুহর টর্চের আলোয় বারান্দাটা তোলপাড় হয়। পরদিন তিনি জানান কেউ যেন বাবান্দা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বলে ওর স্ত্রীর মনে হয়েছিল। নির্মল বলেছিল উনি কি রাত্রে জেগে থাকেন এইসব দেখার জন্য? গুহ বলেন প্রতি রাত্রেই ওর ঘুম ভেঙে যায়।

একটা কুকুর তারস্বরে চীৎকার করতেই নির্মল শুতে গেল। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল। গয়ারাম তুলে দিল ভোরবেলাতেই। প্রকাশক এসেছে। দশ মিনিটেই কথা সেরে নির্মল আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এ লোকটিকে আরও একটি প্রি-ইউনিভার্সিটির নোট লিখে দিতে হবে।

বুধবার অনন্তর বড়ছেলের উপনয়ন। পরিচিত একজনকে মাত্র নির্মল দেখতে পেল। সুধাংশু ষোল বছর কলেজে পড়াচ্ছে। পাঞ্জাবীর গলার বোতাম আঁটা, কাঁধে পাটকরা চাদর।

আমাদের আর থাকা না থাকা।

নির্মলের প্রশ্নের জবাবে সে বলল তুমি কলেজ ছাড়লে কেন?

'এমনি। রোজ একঘেয়ে বকতে ভাল লাগছিল না।'

'বইগুলো তো বেশ ভালোই চলছে।'

নির্মল হাসল। প্রায় চার বছর পরে দেখা।

'ছেলেপুলে কটি?'

নির্মল হেসে মাথা নাড়ল।

'একটিও না।' এবং সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জিজ্ঞাসা 'শুনছিলাম একটা টিউটোরিয়াল করেছ?'

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

'কিরকম রোজগার হচ্ছে।'

'বড্ড খাটুনির কাজ। দুজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে রেখেছি। আমার বউও পড়ায়। অঙ্কটা ভালই পারে। বি-এতে তো অনার্স ছিল।'

সুধাংশুর স্তিমিত চোখে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে। নির্মল মুখ ফিরিয়ে ঘরের আর এক কোনের আলোচনায় মন দিল। হাসির কথা হচ্ছে।

'অসীমকে তো বললুম এবার তোব বউকে বেস্ট দে; তা হতচ্ছাড়া বলল.....

'বস্তা নিচু স্বরে কিছু বলল হৈচৈ করে উঠল বাকিরা।

'ওকে তো দেখি সন্ধ্যের পর চৌরঙ্গিতে ঘুরঘুর করে। বউ তো অনেকদিন শয্যা-শায়ী।'

অনন্ত ভিতর থেকে এল। ঘামে টসটস করছে। গল্পগুজবের মাঝখানে বসল।

নির্মল মাথা হেলিয়ে সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করল 'সারা দিনে কি কর?'

কথাটা মাথায় ঢুকল না। সুধাংশু তাকাল অবাক হয়ে 'কি করি মানে?'

'টাকা রোজগার ছাড়া?'

'আবার কি করব।'

হঠাৎ অনন্ত চীৎকার করল, 'এই নির্মল শুনে যা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার তোর প্রতিবেশিনী সম্পর্কে।'

চমকে উঠল নির্মল। এরকম আসরে মিসেস গুহর কথা উঠল কি করে। হেসে বলল 'তুই তো আমার প্রতিবেশিনীকে সেদিন এক মিনিট মাত্র দেখলি।'

'আমাদের আগের পাড়ায় ওরা যে ভাড়া থাকত। বেশ অবস্থাপন্ন, বাপ কোলিয়ারির ম্যানেজার।'

বাহির হইল ! নতুন বই !

নিজে পড়ুন, বাচ্চাদের ও প্রিয়জনদের পড়ান উপহার দিন। সংগ্রহে রাখার মত একটি ঐতিহাসিক প্রামাণিক দুর্লভ পুস্তক। এতে পাবেন ভারতের তেরটি ঐতিহাসিক বিচার।

চিরঞ্জীব সেনের

স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার
স্মরণীয় বিচার

আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার, গান্ধী হত্যা মামলা, আলিপুর বোমা মামলা, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা, ভগৎ সিং-এর বিচার, বাহাদুর শাহের বিচার প্রভৃতি তেরটি ঐতিহাসিক বিচার গ্রথিত করে এই বই প্রকাশিত হলো। ১৬ টাকা।

এই লেখকের আরেকটি অসাধারণ বই 'স্ক্যাণ্ডাল'

মৌসুমী সাহিত্য মন্দির ১৫বি স্টেমার লেন কলিকাতা—৯

অনন্তর বন্ধু বলাই যোগ করল 'ওর বড় ভাই তখন বিলেতে গেছে ডাক্তারী পড়তে।'

'তখন ও মালতী দত্ত। অনন্ত শুরু করল 'এখন যেরকম দেখতে তখনও ঠিক হুবহু তাই ছিল। প্রায় কুড়ি বছর তো হোল। চেহারা কিন্তু একটুও বদলায়নি। ইন্টারমিডিয়েট পড়ত, ভবদেব নামে একটা ছেলে তখন এম-এ পড়ছে ওকে পড়াত। ছাত্র ভাল। ম্যাট্রিক থেকে স্কলারশিপের টাকায় পড়ছে।'

'দেখতেও সুন্দর ছিল।' বলাই যোগ করল।

'তারপর যা হয় প্রেমে পড়ল দুজনেই। জানতে পেরে ধানবাদ থেকে বাপ ছুটে এল। ভবদেবের চাকরী গেল। কলেজে গিয়ে দেখা করত সে। মালতীকে তখন পাটনায় পিসীর কাছে পাঠান হল। সেখান থেকে একদিন ভবদেবের সঙ্গে সটকান দিল।

'এই তোর গপ্পো! দ্যাখ, ওদিকে কন্দর্প নটা বেজে গেল।' বক্তা হাতঘড়ি দেখল। অন্যান্যরাও ব্যস্ততা দেখাল। এইভাবে থামিয়ে দেওয়ায় অনন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। এদের খেতে বসানোর উদ্যোগ করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মল ঠিক করে ফেলল, বলাইয়ের পাশে বসে খেতে খেতে বাকিটুকু জেনে নেবে।

ফিরতে রাত হল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই নির্মল টের পেল গুহদের ফ্ল্যাটে গ্রামোফোন বাজছে। ওদের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল বাচ্চা চাকরটা।

'সায়েব আছে?'

নেই শুনে নির্মল ভাবল মালতী গুহর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবে কিনা। অনন্তর বাড়ি থেকে এতটা পথ হেঁটে এসে ফুরফুরে লাগছে। গ্রামোফোন বন্ধ হল। খসখস চটির শব্দ। মিসেস গুহ এলেন।

'কি ব্যাপার, উনি তো এখনো আসেনি। অফিসে মিটিং আছে অফিসারদের।'

নির্মল এই প্রথম লক্ষ্য করল, মালতী গুহ বাড়িতেও ঠোঁটে রং ব্যবহার করেন।

'না, খুব কিছু দরকার নয়। সেদিন আপনার পায়ে লাগল, কেমন আছে?'

'কোথায় লাগল!' মালতী গুহ বিস্মিত হলেন। নির্মল লক্ষ্য করল, উনি ভ্রূতে পেন্সিল ব্যবহার করেন।

'ওঁর কথা আর বলবেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি, ভেতরে আসুন।'

নির্মল দেখল, বসবার ঘরে আগেরবার আসবাবের অবস্থান যে রকম দেখেছিল, এখন আর তা নেই।

'দেখছি, অন্য রকম করে সাজিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, এক রকম দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়। নতুন করে অ্যারেঞ্জ করলে হয়কি, নিজেকেই নতুন লাগে, তাই না?'

জবাব না দিয়ে নির্মল ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

'মিস্টার গুহর শিকারের শখটখ এখন আর নেই বোধহয়।

মালতী গুহও ছবিটার দিকে তাকালেন। বন্দুক হাতে বীরোচিত ভঙ্গিতে তার স্বামী একটা মৃত চিতার মাথায় পা দিয়ে। লক্ষ্য করার বিষয়। গুহর মাথা তখন চুলে ভরা।

"আমিই ওর শখটা ছাড়িয়েছি। আপনিই বলুন বিশ্রী নয় কি, এই অর্থহীন হত্যা?"

'অর্থহীন বলছেন কেন, ওরা তো হিংস্র।'

'ওটা একটা অজুহাত মাত্র। বিবেককে স্বান্তনা দেওয়া।'

উনি মিটমিট করে হাসছেন। বারান্দা থেকে নিখিল এক সন্ধ্যায় দেখেছিল, গুহ শোবার ঘরের মেঝেয় বাধ হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন। খাটে দাঁড়িয়ে মালতী গুহ বন্দুকের মত ছড়িটাকে বাগিয়ে দুম করলেন। গুহ গুহ লুটিয়ে পড়লেন।

খাওয়াটা ভরপেট হয়ে গেছে।

এখন বিবেক-টিবেক নিয়ে তর্ক পোষায় না। ওটা তো আর বাইরের জিনিষ নয় যে মাথায় হাত বুলিয়ে স্বান্তনা দেওয়া চলে।

'বুঝলেন, মিস্টার গুহ, আমার ওপর খুব চটেছেন।

'কেন?'

'ওঁকে বলেছিলাম মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সময়ে মরতে চায়। বিশেষত যারা সুখী। তাইতেই উনি চটেমটে বেরিয়ে গেলেন।'

'ওর কথা আর বলবেন না।'

মালতী গুহ উঠে গেলেন ঘরের কোনে টেবলে রাখা মাছের কাঁচের আসবাব গুহের কাছে। ঝুঁকে রঙীন মাছগুলিকে দেখতে থাকলেন। নিখিলের মনে হল, স্বামীর কথায় যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন।

'তখন কি রেকর্ড বাজছিলেন? আমি অবশ্য ক্ল্যাসিক গানের কিছুই বুঝি না।'

'আবদুল করিমের ঠুমরী।'

উনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ দেহ, ঋজু। পাতলা বাদামী চামড়া। দুটি হাত যেন রাজহাঁসের গলা। কুড়ি বছর আগে এই মহিলাটি কতটা আকর্ষণীয় ছিলেন, নির্মল সে কথা ভাবল। ভবদেবকে দোষ দিলে অন্যায় হবে। ওর জন্যে এখনো মৃতেও চোখ খুলবে, কাপুরুষেও আত্মহননের সামর্থ্য দেখাবে।

নির্মলকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে মালতী গুহ আঁচলটাকে বুকে আরো জড়িয়ে বাম বাহু পর্যন্ত টেনে নিলেন। চাবুক খেল নির্মল।—কুঁকড়ে গেল সে। সন্দেহ নেই, উনি ভেবেছেন, এই লোকটা কলুষ চিন্তা করছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভারী ভিজে কাঁথায় সে জড়িয়ে গেল। প্রাণপণে তা টেনে ফেলার চেষ্টায় বলল, 'আপনার মত আমার এক বোন ছিল। মারা গেছে।'

'আহ্!'

মালতী গুহ যেন আঘাত পেলেন। 'কি হয়েছিল?'

'নিউমোনিয়া। তখন আঠারো উনিশ বয়স। কলেজে পড়ল।'

'ভারী দুঃখের কথা। কেউ মারা গেছে শুনলে এত কষ্ট হয়।'

উনি আলতোভাবে সোফায় বসলেন। চোখে স্নিগ্ধ সহানুভূতি।

'আপনাকে দেখলেই ওর কথা মনে পড়ে। ওর মরার মুহূর্তে আমি পাশে ছিলাম।'

নির্মলের দম বন্ধ হয়ে আসছে। উনি কি বুঝতে পারছেন তার সামনে একটা লোক ভরপেট খেয়ে এসে ডাহা মিথ্যা বলে যাচ্ছে। প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, সে সচ্চরিত্র।

'আপনাকে খুব ভালবাসতো?'

'হ্যাঁ।'

'এখন কত বয়স হত'

'আপনারই বয়সী। ঠিক আপনার মতই লম্বা, গলার স্বর, কথাবলার ভঙ্গিটাও। যখন ওখানে ঝুঁকে মাছ দেখছিলেন, চমকে উঠেছিলাম। মনে হল ও এসে যেন দাঁড়িয়েছে। ভীষণ ভয় লেগেছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে শেষ দেখেছি।'

নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে যেন আরো জড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে বানিয়ে বানিয়ে এক ঘন্টা ধরেও বলা যায়। কিন্তু কেন, তা বলতে হবে। নির্মল নিজের ওপর রাগতে শুরু করল। এ ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কৈফিয়তের মত এত কথা বলতে হচ্ছে কেন?

'আপনার বোনের নাম কি ছিল?'

'মিনু, মৃন্ময়ী।'

'অসুখ হল কেন?'

যেসবে হয়, ঠাণ্ডা লেগে। রাগ করে সারা রাত ছাদে শুয়েছিল। ঝগড়াটা হয়েছিল আমার সঙ্গেই, একটা গল্পের বই নিয়ে।'

'খুব অভিমানী ছিল?'

'হ্যাঁ, জেদীও।'

'নিশ্চয় খুব আদর পেত।'

'বাড়ীর একমাত্র মেয়ে ছিল।'

বলেই নির্মল উঠে দাঁড়াল একটা পচা টক গন্ধ পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

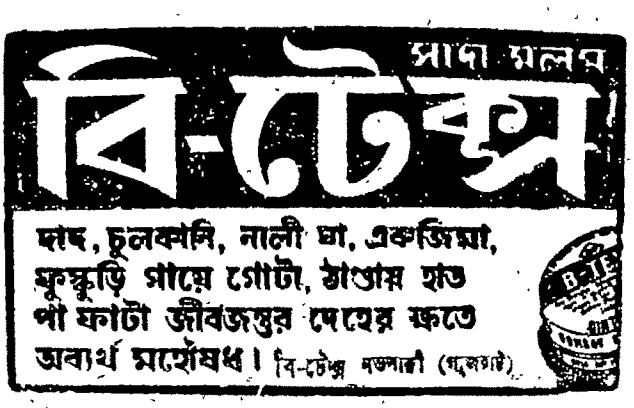

'যাচ্ছেন।'

মালতী গুহও উঠে দাঁড়ালেন। নির্মল অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওর কাঁধ রাজহাঁসের গলার মত। তবে এখন তাকালে নিশ্চয় ভাববেন না যে, লোকটার দৃষ্টিতে নোংরামি আছে। বরং ভাববেন আহা, মৃত বোনকেই দেখছে। এই দেখায় সাহায্য করে নিশ্চয় খুশিও বোধ করবেন।

'হ্যাঁ যাই।'

'চা-ও দেওয়া হল না।'

'তাতে কি হয়েছে। তাছাড়া এইমাত্র একটা নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।

মালতী গুহ দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'মাঝে মাঝে তো আসতেই পারেন।'

নির্মল হাসল মাত্র।

গয়ারাম দরজা খুলে দিল। নির্মল ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে অন্ধকার হাতড়ে টেবল ল্যাম্প জ্বালল। ড্রয়ার থেকে নীল প্যাড আর লাল কালির কলম বার করল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বাঁ হাতে ধরে ধরে কয়েকটা কথা লিখল মালতী, শান্তি পাচ্ছি না কেন। বার বার তোমাকেই শুধু মনে পড়ে। ভবদেব।

শুধু এই কটি কথা। লেখাটার দিকে তাকিয়ে নির্মল হাসছে। কুড়ি বছর আগে ভবদেব আত্মহত্যা করে মরেছে। নারীহরণ মামলার আসামী হতে না চেয়ে। মালতী এ চিঠি পাওয়া মাত্রই জানবে, অন্য কেউ লিখেছে। অভিধানের খোলা পাতায় চোখ পড়তেই থেমে গেল। দ্রুত বইগুলো বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হল, কেউ যখন দেখতে পাচ্ছে না, তখন ভয় পাওয়াটা অহেতুক।

সকালে গুহ এলেন। ভারী চিন্তিত।

'টুরে যেতে হবে। কিন্তু কি মুশকিলে পড়লুম বলুন তো! রাণু কান্নাকাটি শুরু করেছে।

'কেন এর আগেও তো গেছেন।'

'তাই তো বললুম। কিন্তু কি যে হয়েছে, কিছুতেই যেতে দেবে না। খুব জরুরী ব্যাপার, জেনারেল ম্যানেজার নিজে কাল বাড়িত ডেকে পাঠিয়ে বললেন।'

গুহ শিশুর মত তাকিয়ে রইলেন। রাগ চড়তে শুরু করেছে নির্মলের। কিন্তু হেসে বলল,

'কারণটা কি?'

'কি জানি। এরকম মাঝে মাঝে একগুঁয়ে হয়ে যায়।

কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না। তাছাড়া জানেনই তো ভূতের ভয় আছে। প্রত্যেক রাতেই চমকে চমকে ওঠে।'

'নির্দিষ্ট কারণ যখন নেই, এক্ষেত্রে আমিই বা আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি।'

গুহ চলে গেলেন। নির্মল ড্রয়ার তন্ন তন্ন করেও একটা খাম পেল না। নীল চিঠিটা নিয়ে সে বেরোল ডাকঘরের দিকে।

ডাকপিওন সকাল দশটা নাগাদ এ বাড়িতে চিঠি বিলি করতে আসে। পরদিন সাড়ে নটা থেকে নির্মল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। রাত্রে চমৎকার ঘুম হয়েছে। সকালটাও ঝরঝরে। তাছাড়া এইমাত্র স্কুলের একটা বাস গেল। ফুটফুটে একটা ছেলে তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে গেছে।

পিওন আসছে। এ বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত নির্মল বারান্দায় রইল, তারপরই ছুটে এসে দরজাটা প্রায় সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে অপেক্ষা করতে লাগল। গুহদের দরজায় লেটার বকসটা দেখা যাচ্ছে।

দোতলায় কলিংবেলের শব্দ হচ্ছে। সায়গলদের চিঠি, ডেকে দিতে হয়। হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই নির্মল চমকে সরে গেল। গুহ অফিস যাচ্ছেন।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নির্মল আবার দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। তবে এই উপস্থিতি বাইরে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

মালতী গুহ দাঁড়িয়ে। খসখস শব্দটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নির্মল পিওনের জুতোর শব্দের অপেক্ষার থেকে বুঝল এতক্ষণে তার ওপরে আসা উচিত ছিল। হতাশ হয়ে সরে আসামাত্র রাস্তা থেকে গুহর চীৎকার শুনল। পা টিপে বারান্দায় এসে নির্মল উঁকি দিল। পিওন চলে যাচ্ছে। গুহর হাতে একটা খাম।

"তোমার চিঠি।"

গুহ খামটা মাথায় তুলে নাড়ল। মিসেস গুহ বারান্দায়। নির্মল ভিতরে সরে এল। একটা বহুবুশ শিবাগুলোর মধ্যে ঘষে যাচ্ছে। ময়লা পলি সাফ হয়ে যাওয়ায় রক্তের ছোটাছুটি বেড়ে গেছে, তাই ঠক ঠক করে তার হাত পা কেঁপে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে, কাঁপাগলায় আর এক কাপ গরম চা দেবার জন্য গয়ারামকে হুকুম দিল।

গুহ আবার এলেন সন্ধ্যাবেলায়। খুব ব্যস্ত।

"আপনার ওডিকোলন আছে? দুপুর থেকেই রাণুর ভীষণ মাথা ধরেছে। উঠতে পারছে না।"

"না নেই।"

গুহ দ্রুত চলে গেলেন। নির্মল মুচড়ে পাক দিয়ে টেবলের উপর মুখ গুঁজরে পড়ল। কাকপক্ষীতেও ওর হাসি টের পেল না। ঘড়িতে সাতটা বাজল। নির্মল খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতাটা খুটিয়ে দেখতে থাকল। আধ ঘণ্টা পর শিষ দিতে দিতে সে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল।

ফিরল প্রায় বারোটায়। রাস্তা থেকেই দেখল গুহদের শোবার ঘরে সাদা আলো জ্বলছে। বোধহয় মাথাধরাটা সারেনি। সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে উঠল। টের পেলেই গুহ হয়তো মাথাধরা সারানোর পরামর্শ চাইতে বেরিয়ে আসবে। নির্মল ওদের লেটার বকসটায় আস্তে একটা টোকা মারল।

শুতে যাবার আগে সে নীল প্যাড আর লাল কলম নিয়ে বসল। আটটি খাম কিনেছিল, সাতটা রয়েছে। বাঁ হাতে ধরে ধরে সাতটি চিঠি লিখল। প্রতিটিতে একই কথা। দুদিন অন্তর একটি করে ডাকে ফেললেই দু সপ্তাহ কেটে যাবে। নির্মল একটি ব্যাপারে ফাঁপরে পড়ল। গুহ ফ্ল্যাটে থাকাকালীন যদি দেখেন দুদিন অন্তর বৌয়ের নামে চিঠি আসছে, তাহলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন, নিশ্চয় কৌতূহলী হয়ে লুকিয়ে পড়বার চেষ্টা করবেন। নির্মলের তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। দুপুরের শেষে একবার পিওন আসে। সেই ডাকটাকে

প্রকাশিত হয়েছে

এরিখ মারিয়া রেমার্ক-এর

বিশ্ববন্দিত আরেকটি করুন প্রেমের উপন্যাস

তবুও বসন্ত

Heaven Has No Favourites

ভাষান্তর / দিবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬·০০

রেমার্ক-এর অন্যান্য উপন্যাস :

প্রেম মৃত্যু ভালবাসা ১৪·০০

স্বপ্নের পাখিরা ১৬·০০

পত্রপত্রিকা/পরিবেশক—কথা ও কাহিনী ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট—১২

কাজে লাগাতে হলে কোন সময়ে চিঠি ফেলা দরকার, সেটা আবিষ্কার করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে নির্মল এই সমস্যাটার কথা ভাবছিল, তখন খুব শব্দ করে একটা জেটবিমান উড়ে গেল। বহুক্ষণ ধরে বেহালার যে ক্যানক্যানে সুরটা আসছে, তার অবশ্য কোন হেরফের ঘটল না।

এরপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে পিওন আসার সময় হলেই নির্মল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দরজাটা সামান্য ফাঁক করে চোখ পেতে দেয়। পিওন বাক্সে চিঠিটা ফেলে যায়। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে। ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী শুরু করে। আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাক্সের পাল্লায় চৌকো একটা কাঁচ লাগানো। ফিকে নীল খামটা রয়েছে বোঝা যায়। নির্মলের তখন ইচ্ছে করে ওদের দরজায় টোকা দিয়ে বলে আসে, আপনাদের একটা চিঠি এসেছে। কিংবা একটু পরেই হাজির হয়ে বলে এই যে এলাম। না এসে থাকতে পারি না। আপনাকে হুবহু আমার বোনের মত দেখতে।

এর মধ্যে একদিন সে লক্ষ্য করল, মিসেস গুহ দুপুর থেকে তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। স্নান করেন নি। চুলে জট। মুখে প্রসাধনের স্পর্শ নেই। দেহটি নুয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে চোখ সরু করে রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত দেখছেন। চোখের কোলে অনিদ্রার কালি। রোদ্রে পুড়তে পুড়তে তিনি কয়েকবার চোখ বুজলেন।

নির্মলের মনে হল, মালতী গুহের অজস্র বয়স। যেন পোকা লেগেছে। ভেতরটা ফোঁপরা হলেও কোনরকমে খাস রয়েছেন। কিন্তু টের পেয়ে গেছেন আর প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে চলে যাবার তোড়জোড় চোখের চাউনিতে।

নির্মল ওর অবয়বটিকে চোখে ধরে রয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ফ্যাকাশে হয়ে আছে ওর মুখ। চোখ দুটি অনুসরণ করছে ক্রমশ এগিয়ে আসা মানুষটিকে। নির্মল বুঝল ডাকপিওন। চতুর্থ চিঠিটি নিয়ে আসছে। প্রবলভাবে বেলিংটা আঁকড়ে ধরেছেন। মাথাটা একটু একটু করে ঘুরে হেঁট হচ্ছে।

তারপর অনেকক্ষণ মিসেস গুহ মাথা তুললেন না। নির্মল স্পষ্ট দেখল, হাঁপাচ্ছেন। একটু পরে দু-হাতে বুক চেপে টলতে টলতে ঘরে চলে গেলেন। নির্মল বারান্দায় এসে পিওনকে বাড়ী থেকে বেরোতে দেখল।

পরদিন দুপুরে গুহ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। নির্মল তখন বেরোচ্ছিল।

"কি ব্যাপার আপনি এখন?"

'ডকটর সেনগুপ্তকে কল দিয়ে অফিস থেকে চলে এলাম। রাণুর হার্টের ট্রাবলটা আবার.. ..

লাফাতে লাফাতে গুহ উঠে গেলেন।

ট্রাম স্টপ থেকে নির্মল ফিরে এল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থেকে ঠিক করল, কয়েকদিন একদম কাজে বসা হয়নি, শুরু করা যাক। বইগুলো বন্ধ। প্রতিটির পাতা উল্টিয়ে খুঁজে খুঁজে ডেথ বার করল। উদাহরণ সহ প্রয়োগ দেখান হয়নি। উঠে গিয়ে খুঁজে খুঁজে শেকসপীয়র বার করল। চেয়ারে বসে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল, বোধহয় আমার জন্যই মিসেস গুহ অসুস্থ হয়েছেন। কুঁজো হয়ে বসেছিল, মাথাটা টেবলে ঠেকাল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন রাত প্রায় একটা। দরজায় করাঘাতে নির্মলের ঘুম ভাঙ্গল। খুলে দেখে গুহ।

'কি রকম যেন কচ্ছে।'

নির্মলের চোখে তখনো ঘুম। গুহর টাকটাকে তার টুপির মত মনে হল। বুকপিঠে লোমগুলো যেন আঠা দিয়ে আঁটা।

'এখন কি করি?

ডাক্তারকে কল দিন।"

দুপুরে গিয়েছিলাম, পাইনি। সকালেই রুগী দেখতে পাটনা চলে গেছেন'

আরো তো ডাক্তার আছে। আমাদের এই রাস্তাতেই তো গোটা পাঁচছয় বাড়ির পর একজন আছে। চটপট ডেকে আনুন।

নির্মল ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিল।

রাতটা তো কাটুক। কালকে স্পেশালিষ্ট আনবেন।

ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে। কলের পুতুলের মত গুহ গড় গড় করে নেমে

আগের গল্প ॥

বেহুলার ভেলা

অমিয়া বলল, "পয়সা কি কামড়াচ্ছিল। কয়লাওলার কাছে এখনো দুমণের দাম বাকি। তাছাড়া, ওই কটা আলুতে কি হবে, ঘরে যা আছে তাও দিতে হবে দেখছি। এরপর সে বললে, টাটকা খুব চর্বিও কম দিয়েছে। পুতুল বলল, রোববার কোর্মা রেঁধেছিল তৃপ্তির নতুন বৌদি। খুব বেশি ঘি দিয়েছিল, তাই ক্যাটক্যাটানি শুরু করেছিল শাশুড়ি। এই নিয়ে সে কি ঝগড়া মায়েতে ছেলেতে। তারপর সে বলল, আমি কিন্তু রাঁধব বলে দিলুম। বাবুদা বলছিল পাঞ্জাবি হোটেলে নাকি দারুণ রাঁধে, আজ আসুক না একবার দেখিয়ে দেবোখন।

চাঁদু বলল, আগে জানলে জোলাপ নিয়ে পেটটাকে রবারের করে রাখতুম। খানিকটা কাল সকালের জন্যে তুলে রেখো, চায়ে বাসি রুটি ভিজিয়ে খেতে খেতে তো জিভে চড়া পড়ে গেল। শেষকালে সে বলল, যেই রাঁধো বাবা, জবাফুলের রসের মতো রং হওয়া চাই কিন্তু।

রাধু এখন বাড়ি নেই। পাঁচ বছরের খোকন শুনে শুনে কথা শেখে, সেও প্রমথর হাঁটু জড়িয়ে বলল বাবা আমি খাব মাংস।

ওরা যাই বলুক প্রমথ লক্ষ্য করছিল চোখগুলো। ঝিকোচ্ছে বরফ-কুচির মতো। ওরা খুশি হয়েছে। ব্যস, এইটুকুই তো সে চেয়েছিল, তা না হলে মাসের শেষ শনিবারে একদম পকেট খালি করে ফেলার মতো সে করতে যাবে কেন।

অফিস থেকে বাড়ির ফেরার পথটা আরো ছোট হয়ে যায় শোভাবাজারের মধ্যে দিয়ে গেলে। বিয়ের পর কয়েকটা বছর বাজারের মধ্যে দিয়েই অফিস থেকে ফিরত, সেও প্রায় বাইশ বছর আগের কথা। তারপর বাবা মারা গেলেন, দাদারা আলাদা হলেন, প্রমথও এখনকার বাড়িটায় উঠে এল। উঠে আসার তারিখটা পাওয়া যাবে ভব শ্রীমানির খাতায়। সেই মাস থেকেই অমিয়া মাসকাবারি সওদা বন্ধ করল, ওতে বেশি বেশি খরচ হয়। তারপর কালেভদ্রে দরকার পড়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার। আজ গরমটা যেন অন্যদিনের থেকে বেশি চড়ে উঠেছে, জুতোর তলায় পিচ আটকে যাচ্ছে, কোনোরকমে বাড়ি ফিরলে বাঁচা যায়।

ডাব বোঝাই একটা ঠেলাগাড়ি পথ জুড়ে মাল খালাস করছে, চারধারে যেন কাটামুণ্ডুর ছড়াছড়ি। তার ওপর বাজারের আস্তাকুড়টাও জিনিসপত্রের দামের মতো বেড়ে এসেছে গেট পর্যন্ত। পুব দিকের গেট দিয়েই বেরোনো ঠিক করল প্রমথ। দুটো রকের মাঝখানের পথটায় থৈ-থৈ করছে জল। চাপা-কল থেকে জল এনে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে দুটো লোক। ঝাঁটার জল যেন কাপড়ে না লাগে সেই দিকে নজর ছিল।

আর দুপা গেলেই মাছের বাজারটা শেষ হয়, তখুনি আচমকা জল ছুঁড়ল লোকটা। কাপড়ে লাগে নি, কিন্তু লাগতে তো পারত। বিরক্ত হয়েই সে পিছন ফিরেছিল, আর অবাক হল পিছন ফিরে।

বাজারের শেষ মাথায় দাঁড়িয়েছিল প্রমথ, যতদূর দেখা যায় প্রায় শেষ পর্যন্ত এখন চোখ চলে। ফাঁকা, খাঁ-খাঁ করছে; অদ্ভুত লাগল তার কাছে।

সকালে মাছির মতো বিজবিজ করে, তখন বাজারটা হয়ে যায় কাঁঠালের ভুতি। সিনিমিন করে চলতে ফিরতে। আর এখন, চোখটা শুধু যা টক্কর খেল কচ্ছপের মতো চটমোড়া আনাজের ঢিপিতে। নয় তো সিঙ্গে মাছের বাজার থেকে ফলের দোকানগুলো, দোকান ঝোলানো আপেলগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আপেল না হবে ন্যাসপাতিও হতে পারে কিন্তু লক্ষ্মীপুজোর দিনটায় একবার ওদিক মাড়াতে হয়। ফুল পাতা ওই দিকটাতেই পাওয়া যায়, আর তখনই চোখে পড়ে ঝোলানো আপেল, সর্বারি কলার ছড়া, আনারস আর শীতের সময় চুড়োকপি কমলা লেবু। শীতের কথা মনে পড়লেই কাঁপুর কথা মনে আসে, আগেকার দিনে সের দরে

গেলেন। ওদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। নীল আলোগুলো জ্বলছে। সিঁধে দালানটা অন্ধকার প্রায়। শোবার ঘর থেকে জানালার পর্দা ছেঁকে সাদা আলোর তলানি দালানে পড়েছে। নির্মলকে পিছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে কেউ গুহদের ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিল।

পর্দার নীচে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। পর্দা সরিয়েই দেখা যেত, তা না করে সে উবু হয়ে বসল। খাটটা জানলা থেকে দূরে। বালিশে হেলান দিয়ে মালতী গুহ আধশোয়া। চোখ বন্ধ। দুহাত বুকে জড়ো করা। মাথা নামানো।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার দরকার বোধ করল নির্মল। বদলে ঢোক গিলল। মুখ বিকৃতি করে বুক চেপে মালতী গুহ কাত হলেন। অস্ফুট কয়েকটা শব্দ হল। শরীরটা ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে কাঁপছে।

নির্মল অকারণে নিজের পিছন দিকে তাকাল। মনে হয়েছিল কেউ যেন পিছনে। খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওখানকার আলো ম্লান।

আর একবার কাতরালেন মালতী গুহ। নির্মল শিউরে উঠল। হঠাৎ ওর মনে হল, যদি মারা যায়! ভাবামাত্রই সে অবশ হতে শুরু করল। শিরাগুলোকে বেছে বেছে আঁটি বেঁধে রাখা হয়েছে। হাড় আর মাংসের স্তূপ এখন সে। এখন যদি ওঁকে জানিয়ে দিই, নির্মল ভাবল, আসলে চিঠি-গুলো পাশের ফ্ল্যাটের নির্মলবাবুর লেখা। বিশ্বাস না হয়, ওর যাঁ হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাবেন। ওর ড্রয়ার খুঁজলে নীল প্যাড আর লাল কালির কলম পাওয়া যাবে। এখনো তিনটে চিঠি ওর তোষকের নীচে ডাকে দেবার জন্য রয়েছে। তাতে মালতী গুহের নাম লেখা। এই তথ্যগুলো জানালে কি ওর অসুখ সেরে যাবে?

নির্মল বুঝতে চেষ্টা করল, মারা যাচ্ছেন কিনা। এত বোকা হয় মানুষ, একটু বুঝল না এ চিঠি কোন নষ্ট ভ্রষ্ট জীবিতের লেখা!

"শুনছেন।"

নির্মল আস্তে করে তাকাল। মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে কারা উঠে আসছে। দর-জার দিকে তাকাল। করিডরে ম্লান আলো, বিবর্ণ দেয়াল। সারা বাড়িটা নিঝুম।

"শুনছেন, আমি নির্মল পাশের ফ্ল্যাটের।"

এবার আর একটু জোরে বলল। বলার সময় মাথাটা দুই গরাদের ফাঁকে চেপে ধরল।

"কে, কে?"

উঠে বসেছেন মালতী গুহ। বিস্ফারিত চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে। বাহিনীর অগ্রবর্তী ড্রামবাদকের মত পদধ্বনি সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। উত্তেজিত গুহর কণ্ঠস্বর চেনা যায়।

মালতীর চোখ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে আসছে। ঝিমোবার মত হয়ে মাথাটা নেমে এল বুকের দিকে। খুঁজে খুঁজে হাত বাড়িয়ে বালিশটাকে কোলের উপর রেখে কুঁজো হয়ে রইলেন।

"আমি নির্মল। আমিই—আমিই।"

'না।' মালতী মুখ তুললেন। আমি বড় ক্লান্ত, ভবদেব। আমি অনেকদিন আগলে রেখেছি তোমায়, আর পারছি না।'

মাথাটা আবার বালিশে নামিয়ে তিনি নাড়তে থাকলেন। নির্মল ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ডাক্তারকে নিয়ে গুহ ফ্ল্যাটে ঢুকছে।

সেই রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নির্মল দেখল, প্রায় ষাট ফুট গভীর অন্ধকার খাদ বারান্দা থেকে রাস্তা পর্যন্ত নেমে গেছে। লাফিয়ে পড়ার কি কোন যুক্তি আছে? নির্মল বহুক্ষণ ভেবেও বুঝে উঠতে পারল না, সে নিশ্চিত-নির্বিঘ্ন সুখের আশ্রয় নেবার মত আদৌ ক্লান্ত কিনা!

মতি নন্দী

রূপি বিক্রি হত না। নাকের সামনে বাঁধাকপি লোফালুফি করতে করতে সন্ন্যেসীচরণ হাঁক ছাড়ত, খোকাবাবু এই চলল পাঁচ নম্বরী ফুটবল, ছোকা রেঁধে খাও গোস্টো পালের মতো সট হবে। সন্ন্যেসীটা যেন কি করে জেনে ফেলেছিল স্কুল টিমে প্রমথ ব্যাক খেলে, আর গোষ্ঠ পালকে তো সে পুজো করত মনে মনে। আজকাল অনেকেই নাম করেছে, চাঁদুর মুখে কত নতুন নতুন নাম শোনা যায়। ওই শোনা পর্যন্ত। মাঠে যেতে আর ইচ্ছে করে না। সন্ন্যেসী একদিন ফুট-পাথে মরে পড়ে রইল। আজেবাজে জায়গা থেকে রোগ বাধিয়ে শেষকালে বাজারের গেটে বসে ভিক্ষে করত। সন্ন্যেসীর সঙ্গে সঙ্গে কুলদাকে মনে পড়ল প্রমথর, চেহারা কি! যাত্রাদলের বদমাইসের পার্ট করত। বাজারে, শিবরাত্তিরে যাত্রা শুনতে আসার আগে হিসেব করে আসতে হত বাবার কাছ থেকে কতগুলো চড় পাওনা হবে। কুলদার হাতে আড়াইসেরী রুইগুলোকে পুঁটি বলে মনে হত। ওর মতো ছড়া কাটতে এখন আর কেউ পারে না। আজকাল যেন কি হয়েছে, সেদিন আর নেই। গুইরাম মরে গেছে, ওর ছেলে বসে এখন। ছেলেটা বখা। অথচ গুইরামের পানে, পোকা হাজা কিংবা গোবের মধ্যে ছোট পান ঢোকানো থাকত, কেউ বলতে পারত না সে কথা। গুইরামের দোকানের পাশে এখন একটা খোট্টানি বসে পাতিলেবু নিয়ে। অমিয়ার জন্য রোজ লেবুর দরকার, একদিন ওর কাছ থেকে লেবু কিনেছিল প্রমথ। মাস ছয়েকের একটা বাচ্চা, বয়স দেখে মনে হয় ওইটেই প্রথম, কোলের ওপর হামলা-হামলি করছিল, বুকের কাপড়ের দিকে নজর নেই। ওর কাছ থেকে আর কোনোদিন লেবু কেনেনি সে। দুনিয়াসুদ্ধ মানুষের যেন হজমের গোলমাল শুরু হয়েছে আর লেবুও যেন এতবড়ো বাজারটায় ওই এক জায়গাতেই পাওয়া যায়। দিন দিন যেন কি হয়ে উঠেছে। বুড়োধাড়ীদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল, কিন্তু কচিকাচারাও তো বাজারে আসে, বাজার পাঁচটা লোকের জায়গা।

প্রমথর বেশ লাগছে এখন বাজারটার দিকে তাকিয়ে থাকতে। ছোটবেলার অনেক কথা টুকটাক মনে পড়ছে। পেঙ্কাপাখানার সামনে চুনো মাছ নিয়ে বসে একটা বুড়ী, ওকে দেখলেই আবছা মনে পড়ে মাকে। বোকার মতো হাসে, আর পায়ের আঙুল-গুলো বাঁকা। ওখানটায় এখন থৈ-থৈ করছে চাপা-কলের জল। মাকে পুড়িয়ে গঙ্গায় চান করেছিল সে, সেই প্রথম গঙ্গায় চান করা। তখন কত ছোটই না ছিল, স্টীমারের ভোঁ শুনে জলে নামতে ভয় করেছিল তার। মাসের শেষে বাজারের ওইদিকটায় আর যাওয়া হয় না। আসু, পান আর দু-একটা আনাজ কিনেই বাজার সারতে হয়। চাঁদুটাই শুধু গাইগুই করে, কেমন যেন বাঙ্গালে স্বভাব ওর, মাছ না পেলেই পাতে ভাত পড়ে থাকে। খিটিমিটি লাগে তখন অমিয়ার সঙ্গে। চালের সের দশ আনা পাতে ভাত ফেলা কেউ বা সহ্য করতে পারে, পয়সা রোজগার করতে না শিখলে চাঁদুটা আর শোধরাবে না। রাধু একটা টিউশনি পেয়েছে। তবে আই. এ-টা পাস করলে অন্তত গোটাকুড়ি টাকা মাইনে হত। ওর কিংবা পুতুলের খাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই, অমিয়ারও না। পাতে যা পড়ে থাকে অমিয়া পুতুলকে তুলে দেয়, বাড়ের সময় মেয়েদের খিদেটা বাড়ে। শিগগিরই আর একটা দায় আসবে। পুতুলের বিয়ে। মুখটা মিষ্টি, রংটা মাজা, খাটতে পারে, দেখেশুনে একটা ভালো ছেলের হাতে দিতে হবে।

হটিয়ে বাবুজী।

এবার এইধারটা ঘোষা হবে, পিছিয়ে এল প্রমথ। সেই জায়গাটা দেখা যাচ্ছে। একটা বুড়ো বসত ওখানে। পেয়ারা, আমড়া, কদ-বেল ছোট্ট ঝুড়িতে সাজিয়ে বুড়োটা দুপুরে বসে বসে ঝিমোত। সে কি আজকের কথা! বাবা মারা যাবার অনেক আগে, বড়দার তখন থার্ড ক্লাস, যুদ্ধ তখন পুরোদমে চলছে। সরু চালের দর এগারো টাকা, কাপড়ের জোড়া বোধহয় আট টাকার উঠেছিল, সে আজ চল্লিশ বছর হয়ে গেল। স্কুলের টিফিনে একটা আধলা নিয়ে তিন-চারজন তারা আসত, পয়সায় আটটা কাঁচা আম। আর

এ বছর দশ পয়সা জোড়া দিয়ে একদিন মাত্র সে কাঁচা আম কিনেছে, তাও কুসিকুসি। আহা, সে কি দিন ছিল। প্রমথর ইচ্ছে করে বুড়ো যেখানটায় বসত সেখানে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। ওখানে তখন রক ছিল না, দেয়ালের খানিকটা বালি-খসা ছিল। দুটো ইঁটের ফাঁকে গর্তটায় দোক্তা রাখত বুড়োটা। গর্তটা এখনো আছে কিনা দেখতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছেটা খুব ছেলেমানুষের মতো। এত বছর পরেও কি আর গর্তটা থাকতে পারে, ইতিমধ্যে কতই তো ওলট-পালট হয়ে গেছে, ভেঙেছে, বেড়েছে, কমেনি কিছুই। তবু এই দুপুরের বাজারের চেহারাটা একরকমই আছে। ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে, বুকটা টনটন করছে, তবু ঝরঝরে লাগছে গা-হাত পা।

এই যে আসুন বাবু।

প্রমথ পিছন ফিরল; গোডার দোকানটা লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এল। সদ্য ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়েছে। পাতলা সিলকের শাড়ি-জড়ানো শরীরের মতো পেশীর ভাঁজগুলোকে রাক্ষুসে চোখে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

কত করে দর যাচ্ছে।

তিন টাকা।

ভাবলে অবাক লাগে। চাঁদুর মতো বয়সে ছ-আনা সের মাংস এই বাজার থেকেই সে কিনেছে। তখন প্রায় সবই ছিল মুসলমান কসাই। ছেচল্লিশ সালের পর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল।

এক সের দি?

উৎসুক হয়ে উঠেছে লোকটার চোখ আর ছুরি। এর মতো মুন্নাও হাসত, তার একটা দাঁত ছিল সোনার, তবে মুন্নাকে কিছু বলার দরকার হত না, গর্দান থেকে আড়াই সের ওজন করে দিত। সেই মুন্না বুড়ো হল, তার ছেলে দোকানে বসল। তখন সংসার আলাদা হয়ে গেছে। দেড় সের নিত তখন প্রমথ। ঘেন্নাটে চোখে তাকাত বুড়ো মুন্না, চোখাচোখি হলে হাসত, চোখ ঝিকিয়ে উঠত। রায়টের সময় মুন্নাকে কারা যেন মেরে ফেলল।

এক সের দি বাবু?

না তিন পো, গর্দান থেকে দাও।

ওজন দেখল প্রমথ, যেন সোনা ওজন করছে। পাসানটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল। থাকগে ওরা লোক চেনে। তিনটে টাকা পকেটে ছিল। বাকি বারো আনা থেকে আলু, পেঁয়াজ কিনতে হবে। মাইনে হতে এখনো ছ-সাত দিন বাকি। ট্রামভাড়ার পয়সাও রাখতে হবে। মাংসের ঠোঙ্গাটা তুলে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল প্রমথ।

মেটুলি দিলে না যে তিন টাকা দর নিচ্ছ, আমরা কি মাংস কিনি না জেবেছ।

লোকটা এক টুকরো মেটুলি কেটে দিল। অনেখানি দিয়েছে, অমিয়া দেখে নিশ্চয় খুশি হবে।

রাস্তায় পড়েই প্রমথর আবার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। বাবার সঙ্গে তার জ্যাঠা হরি শ্রীমানির দোকানে এসেছিল এক সন্ধ্যায়। পাশেই ছিল মাটির খুরি-গেলাসের দোকান। তখন বিয়ের সরশুম, এক হাজার খুরি-গেলাস কিনল কারা যেন। এক হাজার লোক খাওয়ানোর কথা তো এখন ভাবাই যায় না। স্বদেশ কনফার্ম্ড হবার পর বিয়ে করল। বরযাত্রী হয়েছিল আত্মীয়স্বজন, অফিসের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মিলিয়ে তিরিশ। বন্যাপক্ষ মাংস খাইয়েছিল। কায়দা করে বাধলে মাছের থেকে সস্তা হয়। স্বদেশের বিয়েও সাত মাস হয়ে গেল। ছেলেও নাকি হবে। তবু তো সে সাত মাস আগে মাংস খেয়েছে। কিন্তু বাড়ির ওরা, অমিয়া, পুতুল! বাধ্য হয়ে যে চাকরি খুঁজছে, একটা পয়সাও বাজে খরচ করে না। চাঁদু ভালো ফুটবল খেলে, হয়তো বন্ধুরা খাওয়ায়ও। ছেলেটা ভালোমন্দ খেতে ভালোবাসে, আর খেতেও পারে। এইটেই তো খাওয়ার বয়স। অমিয়ার খুড়তুতো বোনের মেয়ে শিলুর বিয়ের কথা শুনে কি লাফালাফিটাই জুড়েছিল। নেমন্তন্নে অবশ্য যাওয়া হয়নি। অন্তত একটা সিঁদুর-কৌটোও তো দিতে হত। চাঁদুটা আজ খুব খুশি হবে, ওরা সবলেই খুশি হবে।

বড় রাস্তার ঠিক মধ্যিখানেই কালীমন্দির। হাতে মাংসের ঠোঙ্গা। চোখ বন্ধ করে মাথা ঝুঁকিয়ে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে প্রমথ রাস্তা পার হল। পর্দা ফেলা রিকশা থেকে গলা বার করে দুটি বৌ প্রমথর পাশ দিয়ে চলে গেল।

সিনেমা হলগুলো আজকাল এয়ারকন্ডিশন করা হয়েছে। প্রমথ ভাবতে শুরু করল, তা না হলে এই অসহ্য দুপুরে পারে কেউ বন্ধ ঘরে বসে থাকতে। তবু শখ যাদের আছে তারা ঠিক যাবেই, অমিয়ার কোনো কিছুতেই যেন শখ নেই আজকাল। অথচ মেজবৌদি, তার আপন মেজদা যিনি ডাক্তার হয়েই আলাদা হয়ে গেছেন, তার বৌ এখনো নাকি এমন সাজে যে ছেলের জন্যে পাত্রী দেখতে গেলে, মেয়ে-বাড়ির সকলে গা টেপাটেপি শুরু করেছিল। মেয়েকে ফিরে সাজতে হয়েছিল ওর পাশে মানাবার জন্যে। এ-খবর অমিয়াই তাকে দিয়েছিল। ওর শখ এখন এইসব খবর যোগাড় করাতে এসে ঠেকেছে। অথচ সাজলে এখনো হয়তো পুতুলকে হার মানাতে পারে।

গলিটা এবার দেখা যাচ্ছে, ওখানে ছায়া আছে। এইটুকু পথ জোরে পা চালাল প্রমথ।

ভাবনারও একটা মাথামুণ্ডু আছে। অমিয়া যতই সাজগোজ করুক পুতুলের বয়সটা তো আর পাবে না। সতেরো বছরের একটা আলাদা জেল্লা আছে, দেখতে ভালো লাগে। অমিয়ার বিয়ে হয়েছিল সতেরো বছরে, সেও পুতুলের মতো লাজুক আর ছটফটে ছিল।

হাড়গোড়সার ছেলের হাত-পায়ের মতোই ন্যাতানো গলিটা। হালকা বাতাস পর্যন্ত সাঁতসেঁতিয়ে যায়। এ গলিতে ঢুকলে গায়ে চিটচিটে ঘাম হয়। কোঁচাটা পকেটে থাকছে না আলু আর পেঁয়াজের জন্যে। পেটের কাপড়ে গুঁজে দিতে একটুক্ষণ দাঁড়াল প্রমথ। ওপর থেকে উকিলবাবুর বিধবা বোন দেখছে। প্রমথ ঠোঙ্গার দিকে তাকাল। হ্যাঁ, ওপর থেকেও বোঝা যায় এর মধ্যে মাংস আছে। নন্দীবাড়ির সঙ্গে ওর খুব ভাব। ছোট মেয়ের শ্বশুর বুঝি কোন এক উপমন্ত্রীর বন্ধু। তাই নন্দীগিন্নি ধরাকে সরা দেখে, অকিষা দু-চক্ষে দেখতে পারে না। এই মানুষগুলোকে। উকিলবাবুর বোনের দেখা মানেই পাড়ার সব বাড়ির দেখা। খবরটা শুনলে অমিয়া নিশ্চয় খুশি হবে।

বাড়ি ঢোকার মুখে দোতলার মিহিরবাবুর সঙ্গে দেখা হল প্রমথর। এ বাড়িতে অল্প দিন এসেছে। মুখচোরা, বৌয়ের মতোই মেশে না কারুর সঙ্গে। শুধু কবিতা আর রাজনীতির কথায় মুখে খই ফোটে।

দেখেছেন তো আবার স্ট্রাইক কল করেছে, বেস্পতিবার।

শুনেছি বটে, আপিসে বলছিল সবাই, যা মাগগীগণ্ডার বাজার আগের বার এগারো সিকে ছিল, এখন তিন টাকা।

ঠোঙ্গা-ধরা হাতটা দোলাল প্রমথ। কিন্তু মিহিরবাবু নজর তাতে আটকালো না।

এখন তবু তিন টাকা। এক-একটা ফাইভ ইয়ার যাবে আর দেখবেন দামও পাঁচগুণ চড়বে।

অন্য সময় হলে মিহিরবাবুর সঙ্গে একমত হত প্রমথ। কিন্তু সে যা চাইছিল তার ধার দিয়েও গেল না কথাগুলো। রোববার মিহিরবাবুদের মাংস রান্না হয়েছিল। গরম মসলা গুঁড়োবার জন্যে হামানদিস্তেটা নিয়েছিল। এখনো ফেরত দেয়নি। বোধহয় ভেবেছে, ওদের আর কিসে দরকার লাগবে, যখন হোক ফিরিয়ে দিলেই হবে। মিহিরবাবু লোক ভালো। তবু প্রমথর মেজাজ তেতে উঠল রুমাল।

আরে মশাই স্ট্রাইক-ফ্রাইক করে হবেটা কি, তাতে পাঁচ টাকার জিনিস এক টাকায় বিকুবে?

কিছুটা তো কমবে।

আপনাদের ওই এক কথা।

প্রমথ উঠোনের কোণে রান্নাঘরের সামনের রকে ঠোঙ্গাটা নামিয়ে রাখল। গলার আওয়াজে অমিয়া বেরিয়ে এল। তার পিছনে পুতুল আর চাঁদু। মিহিরবাবু ওপরে উঠে গেলেন। তারপর ওরা কথা বলল। ওদের চোখগুলো বরফ-কুচির মতো ঝিকিয়ে জুড়িয়ে দিল প্রমথকে।

এইটুকুই সে চেয়েছিল। খুশি হোক অন্তত আজকের দিনটায়। জিনিসের দাম বাড়ছে, স্ট্রাইক হবে, মিছিল বেরোবে, ঘেরাও হবে, পুলিশ আসবে, রক্তগঙ্গা বইবে, এ তো হামেশাই হচ্ছে। মানুষকে যেন একটা কামার তাতিয়ে তাতিয়ে ক্রমাগত পিটিয়ে চলেছে। বিরাট একটা ভাবী হাতুড়ি দিয়ে। সুখ নেই, স্বস্তি নেই, হাসি নেই খুশি নেই।

ওসব ভাবনা আজ থাক। খোকনকে কোলে নিয়ে হাসতে শুধু করল প্রমথ ওদের দিকে তাকিয়ে।

বোদের কটকটে জ্বলুনি এখন আর নেই। বেলা গড়িয়ে এল। অমিয়া তাড়া দিচ্ছে দোকানে যাবার জন্যে। ঘরে আদা নেই। বঁটি সরিয়ে উঠল প্রমথ। এতক্ষণ তার মাংস কোটা দেখছিল খোকন। চাঁদু বিকেলের শুরুতেই বেরিয়েছে। কোথায় ওর ফুটবল ম্যাচ আছে। বাটনা বাটতে বাটতে পুতুল খোঁজ নিচ্ছে চৌবাচ্চার। বেলি হলে বালতিতে শ্যাওলা সুদ্ধু উঠে আসে।

পাড়ার মুদীর দোকানে আদা পাওয়া গেল না। তাই দূরে যেতে হল প্রমথকে। ফেরার সময় খোকনকে দেখল রাস্তায় খেলছে। ওর সঙ্গীদের মধ্যে ভুবন গয়লার নাতিকে দেখে ডেকে নেবার ইচ্ছে হল। তারপরেই ভাবল, থাক, এখন বাড়ি গিয়েই বা করবে কি। তাছাড়া, ঘুপচি ঘরের মধ্যে আটকা থাকতেই বা চাইবে কেন। খোকনকে ভালো জামা-প্যান্ট কিনে দিতে হবে, উকিলবাবুর ছেলেদের কাছাকাছি যাতে আসতে পারে। উকিলবাবুর ছেলেরা বাসে স্কুল যায়, বেশ ইংরিজি বলতে পারে এই বাচ্চা বয়সে।

মাংসে বাটা-মসলা মাখাচ্ছিল অমিয়া। প্রমথকে দেখা মাত্রই ঝেঁঝে উঠল।

এত দেরি করে ফিরলে, এখন বাটবে কে।

কেন, পুতুল কোথায়?

বিকেল হয়েছে, তার কি আর টিকি দেখার জো আছে। সেজেগুজে বিবিটি হয়ে আড্ডা দিতে গেছে।

আচ্ছা, আমিই নয় বাটছি।

বঁটি পাতল প্রমথ আদার খোসা ছাড়াবার জন্যে। অনেকখানি শাঁস উঠে এল খোসার সঙ্গে। সাবধানে বঁটির ধার পরীক্ষা করল, ভোঁতা। তাহলে অত পাতলা করে খোসা ছাড়ায় কি করে অমিয়া, অভ্যাসে! অভ্যাস থাকা ভালো, তাহলে সময় কেমন করে যেন কেটে যায়। অবশ্য আলু বা আদার খোসা ছাড়িয়ে কতক্ষণ সময়ই বা কাটে। তবু ঘর-সংসার, রান্নাবান্না, ছেলেপুলে মানুষ করা, এটাও তো একরকমের অভ্যাসেই করে যায় মেয়েরা, নাকি স্বভাবে করে। অমন স্বভাব যদি তার থাকত, প্রমথ ভাবল, তাহলে বাঁচা যায়। জীবনটা যেন ডালভাত হয়ে গেছে। ওঠানামা নেই, স্বাদগন্ধ নেই, কিছু নেই, কিছু নেই, তবু কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। আশ্চর্য এই ভোঁতাব মতো বেঁচে থাকাটাও একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বদ অভ্যাস।

থাক, তোমাব আর কাজ দেখাতে হবে না।

অমিযাব হাতে মসলা লেগে, হাত ধুয়ে জলভবা বাটিটা রেখে দিল সে। শিলের ধারে আদাগুলো ঘষে, নিয়ে বাটতে শুধু করল। কত সহজে কাজটা করে ফেলল ও, প্রমথ ভাবল, এটাও এসেছে ওই অভ্যাস থেকে। হাত-ধোযা জলটুকু অমিয়া তো নর্দমাতেও ফেলতে পাবত।

বাড়িতেই বসে থাকবে নাকি, বেরোবে না?

কোনো কথা বলল না প্রমথ। অমিয়া মুখ ফিবিয়ে তাকাল তাব দিকে।

খোকনের একটা ভালো নাম ঠিক করতে হবে।

করো না।

উলিবাবুব ছেলেদেব নামগুলো বেশ।

ওরা সাহেবি স্কুলে পড়ে শুনেছি, ছোটটা তো খোকনেব বযসী।

হ্যাঁ, বড়োটা শুনেছি ইংরিজিতে কথা বলতে পারে।

রামগতিব পাঠশালায় খোকনকে ভর্তি করে দিও, দুপুবে বড্ডো জ্বালায়।

উঠে পড়ল প্রমথ। ভেবেছিল আজ আর বাড়ি থেকে বেরোবে না। মাংস ফুটবে, ছেলেমেয়েরা কাছাকাছি জড়ো হবে, গল্প হবে এটা সেটার, আসন পেতে থালা সাজিয়ে দেবে অমিয়া, একসঙ্গে সকলে খেতে বসবে গরম ভাত, গরম মাংস। অমিয়া তাকিয়ে আছে। গলায় চটের মতো ঘামাচি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল প্রমথ।

উকিলবাবুর রকে বসে ছিলেন গৌর দত্ত। প্রমথকে দেখে কাছে ডেকে বললেন, দেখেছ কেমন গরম পড়েছে। এবার জোর কলেরা লাগবে।

নড়েচড়ে বসলেন গৌর দত্ত। প্রমথ ও'র পাশে বসল।

শুধু কলেরা, আবার ইনফ্লুয়েঞ্জাও শুরু হয়েছে।

লক্ষ্য করে দেখলুম জানো—

গৌর দত্ত প্রমথব গা ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে প্রায় যে-সুরে অনিল কুণ্ডুকে তার সংসার থেকে বিধবা ভাজকে আলাদা করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই সুবে বললেন, লক্ষ্য করে দেখলুম জানো বোমাটা ফাটার পরই এই ইনফ্লুয়েঞ্জা শুরু হয়েছে, গরমও পড়েছে, ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, গরমটা এবারে তিন্টোতে দিচ্ছে না।

লক্ষ্য করেছ যত বোমা সব জাপানের কাছাকাছি ফাটাচ্ছে। তার মানে কি? ইন্ডাস্ট্রিতে খুব ফরোয়ার্ড বলেই তো ওদের এত রাগ। আমাদের পুলুর আপিসে একটা জাপানি আসে, ভালো ইংরিজি জানে না, কথা বলতে খুব অসুবিধে হয় পুলুব ওতো ফার্স্ট ডিভিশনে বি, এ, পাস করা। তা জিজ্ঞেস করেছিল নেতাজীর কথা। ওরা আবার আমাদের চেয়েও শ্রদ্ধাভক্তি করে। কি উত্তর দিলে জানো? বোসের মতো বেউ থাকলে তোমাদের ফাইভ ইয়ার প্ল্যানগুলোয় চুরি হত না। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।

হ্যাঁ জিনিসপত্তব যা আকা হচ্ছে দিনকে দিন। মাংস তিন টাকায় উঠেছে।

এনেছ বুঝি আজ?

সামনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলেন গৌর দত্ত। অন্যমনস্কের মতো লাঠিটা ঘোবোতে ঘোরাতে আবার বললেন, কি গবম পড়েছে, টিকে নিয়েছ? খাওয়া-দাওযা সাবধানে করো। ছেলেপুলের সংসার বলা যায় না কখন কি হয়।

হলে আর কি করা যাবে, সাবধানে থেকেও তো লোকে রোগে পড়ে।

ওই তো ভুল করো। আজ তোমাব যদি, ভগবান না করুন, ভালো মন্দ কিছু একটা হয, তখন সংসাবের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছ?

অস্বস্তিতে ছটফট করে উঠল প্রমথ। এসব কথা এখন ভালো লাগছে না। বোধ-হয সংসাবে গৌব দত্তব আর কিছু দেবাব বা নেবার নেই। চাগিয়ে তোলা দরকার, আহা বুড়ো মানুষ।

একটু চাখবেন নাকি?

কি এনেছ, খাসি? রাং না সিনা?

গর্দান।

এ হে, খাসিব বাং দাবুণ জিনিস।

গৌব দত্তর গালে যেন পিপাড়ে কামড়াল। চুলকোতে চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

বুঝলে আগে খুব খেতুম। সামনে জ্যান্ত পাঁঠা বেঁধে রেখেই হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিতে পাবতুম। এখন ছেলেবা লায়েক হয়েছে, রোজগার করছে, বৌদের হাতে সংসার। পুলুটা হয়েছে বৌ-ন্যাওটা বুড়ো বাপের যত্ন-আত্তির দিকে নজর নেই। তোমার বৌদি বেঁচে থাকলে এ অবস্থাটা হত না।

টিকিট কাটার সঙ্গে সঙ্গে বাস বিকল হলে যাত্রীদের মনের অবস্থার মতো আস্তে আস্তে থেমে গেলেন গৌর দত্ত।

দুঃখ হচ্ছে প্রমথর। বুড়ো মানুষটার নিজের বলতে আর কিছু নেই। এখন কোন রকমে টেনেটুনে চিতায় ওঠাব অপেক্ষা। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন জীবনটা ধুক-পুক করবে, সাধ-ইচ্ছে তৈরি হবে, পূরণ করতে চাইবে, অথচ পারবে না। এমন বাঁচার থেকে মরা ভালো। আহা বুড়ো মানুষটা মববেই বা কেন।

চলুন গৌরদা, আজ একটু বেড়িয়ে আসা যাক গঙ্গার ধার থেকে।

সে বড় দূর ভাই, তার চেয়ে পার্কে বরং গোটা কতক চক্কর দিয়ে আসি।

দুজনে উঠে দাঁড়াল। রাধু বাড়ি ফিবছে। প্রমথ তাকিয়ে থাকল তার দিকে। জড়োসড়ো ভঙ্গিতে ওদের পাশ দিয়ে রাধু চলে গেল।

তোমার বড় ছেলে ভালো।

হাসল প্রমথ।

হাঁটতে হাঁটতে গৌর দত্ত বললেন, ওরা আবার খুঁজবে ঘুষতো।

পার্কে ঢুকেই অনেক কথার জের টেনে তিনি বললেন, খুঁজলে আব কি হবে, নিজেরাই গপ্পোটপ্পো করবে। আশুর মেয়েকে নাকি মারধোর করেছে শাশুড়ি, আজ ওর যাবার-কথা ছিল, কি ফয়সালা হল কে জানে। আমি তো বলেছিলুম হাতে-পায়ে ধরে মিটিয়ে আসতে। খাট-বিছানা টাকা তো এজন্মে দেবার ক্ষমতা হবে না আশুব।

প্রমথর এসব কথায় কান নেই, সে তখন ভাবছে পুতুল এতক্ষণে ফিরেছে ওব বন্ধুর বাড়ি থেকে। উনুন ধরিয়েছে। অমিযা ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে কেমন করে খুন্তি ধরলে মাংস কষতে সুবিধে হয়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে মেয়েটোব কপালে, নাকের ডগায়। ঠোঁটদুটো শক্ত করে টিপে ধবেছে। চুড়ি-গুলো টেনে তুলেছে। দপদপে স্বাস্থ্য, বেশিদূর উঠবে না। পাতলা ভাপ উঠছে হাঁড়ি থেকে। না, এখনই কি উঠবে। এখনো তো জলই বেবোয নি। আগে তো কথলো বাঁধে নি, নিশ্চয় বুক দুবদুব করছে আব আড়চোখে তাকাচ্ছে অমিয়াব দিকে। অমিযা কি করছে? গালে হাত দিবে পিঁড়িতে বসে দেখছে। কি দেখছে, পুতুলকে? তাই হবে। হযতো খুব মিষ্টি দেখাচ্ছে ওর কচি মুখটা আব ভাবছে হয়তো যে-কটা গয়না আছে ভেঙে কি কি গড়াবে ওব বিযের জন্যে। এতক্ষণে গমগম-ম করছে বাড়িটা। খোকন নাক কুঁচকে শুঁকছে। ভালো লাগছে গন্ধটা তাই মিটিমিটি হাসছে আর হাঁড়ির কাছে আসার

তাল খুঁজছে। পারবে না, অমিয়ার নজর বড় কড়া।

দুচার দিন হয়তো বলাবলি করবে, বলবে গল্পে লোক ছিল, বেশ জমিয়ে রাখত সন্ধেটা। তারপর এক্সময় ভুলে যাবে। যেমন নিমলদা কি নীলুকাকা মরে যাবার পর আর এখন কেউ নামই করে না। তোমরাও তেমনি ভুলে যাবে আমাকে।

দগদগে লাল হয়ে আছে কেন্টচুড়ো গাছের চিমসে ডালগুলো। ওদের ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে কেমন অন্য রকম লাগে যেন। লাগে চোখ নয় মনটা। রাধু টিউশনিতে যাবার আগে নিশ্চয় দেখেছে। দেখে কিছু বলেছে কি? বড় কম কথা বলে ছেলেটা। তেইশ বছরেই বুড়িয়ে গেছে ওর শরীর-মন। ওকে দেখলে অস্বস্তি হয়। মনে হয় হাসি-খুশি আনন্দ যেন কিছুই নয়। জীবনটা শুধু দুখু, দুখু আর দুখু কাটানোর চেষ্টাতেই ভরা। অথচ ওর বয়স তেইশ। ওর বয়সটা যেন চিমসে-কাঠি ডালে ফুল ফোটার মতো। বয়সের ফাঁকি-ফোকর দিয়ে যৌবনটাকে কেমন বুড়োটে দেখায়।

রকে বসে থাকলে এতক্ষণে আরো পাঁচজন জুটে যেত। তখন শুধু আমাকে নয় চক্ষুলজ্জার খাতিরে ওদেরও বলতে হত। তার চেয়ে এই বরং ভালো হয়েছে, বেমালুম খিদেটাও বেশ চনচনে হল।

কি তখন থেকে ভ্যাজর ভ্যাজর করছে বুড়োটা। বয়স বাড়লে হ্যাংলামোও বাড়ে। আঃ, কি হুড়োচাল্লি শুরু করেছে ছেলে-গুলো, মানুষ দেখে ছুটবে তো। লাগল হয়তো বুড়ো মানুষটার। আহা ছেলেবেলা যত্ন করে না। ফাঁসির আসামীও তো শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগ পায়, অথচ মুখ ফুটে ওর ইচ্ছার কথা বলতে পারবে না কাউকে। গুমরে মনের মধ্যে গুমোট তৈরি করবে। এবারের গরমটা অসহ্য, তবু নাকি বেতিয়াফেত মানুষগুলো হাওড়া-ময়দানে ভাজাভাজা হচ্ছে। বাইরে-ভেতরে সবখানেই অসহ্য হয়ে উঠেছে মানুষ। এই যে সকলে পার্কে বেড়াতে এসেছে, সেও তো গুমোট কাটাতেই। অমিয়াও আসতে পারে। কি এমন কাজ তার, ওইটুকু তো সংসার। না, এখন সংসারের কথা থাক, তার চেয়ে বরং ওই গাছটার দিকে তাকানো যায়। রাধাচূড়ো। একটাও ফুল নেই গাছে। থাকা উচিত ছিল। কেননা কেন্টচুড়োয় ফুল ধরেছে। এই হয়, একটা আছে তো আর একটা নেই, সুখে জোড় বাধে না কোনো কিছুই। এখন তর খুশি থাকতে ইচ্ছে করছে। অথচ অমিয়া কি জানি এখন হয়তো পুতুলকে বকছে দু'পলা তেল বেশি দিয়ে ফেলেছে বলে।

চলুন গৌরদা, এবার ফেরা যাক।

এর মধ্যে? রান্না হয়ে গেছে কি!

রান্নার দেরি আছে। আপনাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো চাঁদুকে দিয়ে।

তাই দিও, আমি বরং একটু ঘুরি, আর শোনো, চাঁদুকে বোলো আমার হাতে ছাড়া কাউকে যেন না দেয়, কেমন।

প্রথম কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটতে দেখেছে এই সেদিন, অনেকের সঙ্গে সেও রুদ্ধশ্বাসে ছুটেছে, ঘোড়সোয়ার পুলিশের নাগাল ছাড়িয়েও ছুটেছে। তাই সে বোঝে অমিয়ার অবস্থাটা যখন উনুনে আগুন পড়ে। কোথায় পালাবে সে ওইটুকু বাড়ির চৌহদ্দি ছাড়িয়ে? যেখানেই যাক না ধোঁয়া খেতে হবেই ওই সময়টায় সকলেই উনুন ধরায়। ছাদে যে উঠবে তারও ফুরসত নেই। ঘরে বিকেলে কেউ থাকে না। ভাড়াটে বাড়ির একতলা সদর দরজা সব সময় হাট করা, মুহূর্তের জন্যেও ঘর ছাড়ার উপায় নেই।

আজও সেই রোজকার অবস্থা, তবু রক্ষে উনুন প্রায় ধরে গেছে। নিজের মনে গজগজ করছে অমিয়া আর হাওয়া দিচ্ছে। সাহায্য করতে গেল প্রমথ। তিড়বিড়িয়ে জ্বলে উঠল অমিয়া।

থাক আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।

অমিয়া চুল বেঁধেছে, পা ধুয়েছে, শাড়িটাও পরিষ্কার। প্রমথ বলল, তুমি পুতুলকে ডেকে আনো, ততক্ষণ আমি হাওয়া দিচ্ছি।

পাখাটা নামিয়ে দম-কাটা স্প্রিঙের মতো উঠে দাঁড়াল অমিয়া।

দাঁড়াও, মেয়ের আড্ডা শেষ হোক তবে তো ঘরের কথা মনে পড়বে। আসুক আজ, ওর আড্ডা ঘোচাচ্ছি।

তরতর করে ছাদে উঠে গেল অমিয়া। সেখান থেকে একটু গলা তুলে ডাকলে তৃপ্তিদের বাড়ি থেকে শোনা যায়। ছাদ থেকে অমিয়া নামল আর সদর ঠেলে পুতুলও বাড়ি ঢুকল প্রায় একই সঙ্গে। একটুও আভাস না দিয়ে অমিয়া এলো-পাথাড়ি কতগুলো চড় বসিয়ে দিল পুতুলের গালে, মাথায়, পিঠে।

পইপই করে বলি সন্ধে হলেই বাড়ি ফিরবি, সেকথা গ্রাহ্যই হয় না মেয়ের। কি এত কথা ফিসফিস, গুজগুজ, তৃপ্তির মাস্টারের সঙ্গে হাসাহাসি কেউ যেন আর দেখতে পায় না, না?

বারে, আমি হাসাহাসি করেছি নাকি?

যেই করুক, তুই ওখানে থাকিস কেন, ঘরে আমি একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে সে খেয়াল থাকে না কেন? হাঁড়িটা উনুনে বসা।

অমিয়া ঘরে চলে গেল। উঠোনে গোঁজ হয়ে আঁচলটা মুঠোয় পাকাতে থাকল পুতুল। খামোকা মার খেল মেয়েটা। এইটুকু তো বয়েস, খাঁচার মতো ঘরে কতক্ষণ আর আটকা থাকতে মন চায়। উঠে এল প্রমথ রান্নাঘর থেকে।

মা যা বলল তাই কর।

ওর পিঠে হাত রেখে আস্তে ঠেলে দিল প্রমথ। পিঠটা বেঁকিয়ে ঠেলাটা ফিরিয়ে দিল পুতুল। গঙ্গাজলের ছড়া দিতে দিতে ওদের দেখে গেল অমিয়া।

রাগ করতে হবে না আর, কি এমন অন্যায় বলেছে? আজ বাদে কাল বিয়ে হবে, হাসাহাসি না করলেই তো হয়।

আমি মোটেই হাসাহাসি করি নি তবে মিছিমিছি—

ওর পিঠে হাতটা রেখে দিয়েছিল প্রমথ, তাই আঙুল বেয়ে উঠে এল বাকি কথা-গুলো। থরথরিয়ে পুতুল কাঁপছে।

বিয়ের পর যত পারিস হাসিস, কেউ বারণ করবে না। বড় হয়েছিস, বুদ্ধি হয়েছে তোর, তৃপ্তিদের যা মানায় আমাদের কি তা সাজে?

শাঁখ বাজাচ্ছে অমিয়া। পুতুলের কাঁপুনি যেন বেড়ে গেল। বিশ্রী শাঁখের আওয়াজটা। শুভকাজে শঙ্খধ্বনি দেওয়া হয়, অথচ এখন মনে হচ্ছে মাটি টলছে, ভূমিকম্পে, তাই মেয়েটা কাঁপছে। মৃদু ঠেলা দিল প্রমথ। এক-পা এগিয়ে তারপর ঘরে ছুটে গেল পুতুল।

দাও আরো আদর। দিন দিন যে বাঁদরী তৈরি হচ্ছে। অনেক দুখু আছে ওর কপালে, বলে রাখলুম।

হাঁড়ি নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে অমিয়া প্রমথ নরম সুরে বলল, আজকে না বকলেই হত।

কেন, আজ রথ না দোল যে বকব না।

শোবার ঘরে এল প্রমথ। পুতুল ফোঁপাচ্ছে স্তূপ করা বিছানায় মুখ গুঁজে। শব্দটা সর্দি ঝাড়ার মতো শোনাচ্ছে। তার ওপর প্যাচপেচে গরম।

লক্ষ্মী মা আমার ওঠ, যা রান্নাটা শিখে নে। আরে বোকা শ্বশুরবাড়িতে যখন রাঁধতে বলবে তখন যে লজ্জায় পড়বি, আমাদেরও নিন্দে হবে।

পুতুলের ফোঁপানি থামল। একটা চোখ বার করে, স্বরটাকে নামিয়ে বলল, বিয়ে করলে তো।

হেসে উঠল প্রমথ, পুতুল মুখ লুকোল।

তোর মাও বিয়ের আগে ঠিক অমন কথা বলত।

পুতুল আবার মুখ তুলল। চোখের কাজল ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। আহা, মেয়েটা কেঁদেছে।

তুমি কি করে জানলে, মা বুঝি বলেছিল?

একই সঙ্গে দুজনে দরজার দিকে তাকাল। না অমিয়া নয়, খোকন এল।

চোখাচোখি হল পুতুল আর প্রমথর, হাসল দুজনেই। মেয়েটা দারুণ ভীতু হয়েছে। ওর মাও অমন ছিল, খালি দরজার দিকে তাকাত। রাত্রে ছাতে উঠত, তাও কত ভয়ে ভয়ে।

বলো না, মা বুঝি সেসব গপ্পো করেছিল?

হেসে খোকনের চুলে বিলি কাটল প্রমথ। সেসব গল্প কবে করেছিল অমিয়া, তা কি এখনো মনে আছে। চেষ্টা করলে টুকরো টুকরো হয়তো মনে পড়বে। কিন্তু সেকথা কি মেয়েকে বলা যায়। একদিন গলি দিয়ে গিয়েছিল একটা বেলফুল-ওয়ালা, কত কাণ্ড করে মালা কেনা হয়েছিল। আর-একদিন, ছাদের উত্তর-পুব কোণায় তুলসীগাছের টবটার পাশে একটু ছোট্ট পৈঠে ছিল, একজন মাত্র বসতে পারে। গাছে বাবার ঘুম ভেঙে যায় তাই চুড়ি-

গুলোকে হাতে চেপে বসিয়ে, পা টিপেটিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ছুট দিয়েছিল অমিয়া রকটা লক্ষ্য করে। আচারের শিশি বিকেলে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, ছাদের মধ্যিখানেই পড়ে ছিল সেগুলো। তারপর সে কি কলেঙ্কারি। বড়বৌদি ছাদে উঠে এসেছিল, আর অমিয়া পাঁচিল ঘেঁষে বসে পড়েছিল দুহাতে মুখ লুকিয়ে।

হাসছ কেন।

এমনি। একটা কথা মনে পড়ল তাই।

অমন করে হাসলে কিন্তু তোমায় কেমন কেমন যেন দেখায়। বেশ লাগে দেখতে।

চোখ নামিয়ে হাসল প্রমথ। খোকন চলে গেল রান্নাঘরে। খুন্তি নাড়ার শব্দ আসছে, গন্ধও আসছে কষা মাংসের, রান্নাঘরে অমিয়ার কাছে এখন কেউ নেই। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমছে গালে, কপালে, নাকের ডগায়। বার বার কাঁধে গাল ঘষার জন্যে ঘোমটা খুলে গেছে। দুহাত সকড়ি ঘোমটা তুলে দেবার কেউ নেই কাছে।

বসেই থাকবি নাকি রান্নাঘরে যাবি।

না, আমি শিখব না।

তোর মার কাছে শেখার জন্যে পাড়ার মেয়েরা আসত, বাটি বাটি মাংস যেত এবাড়ি ওবাড়ি।

অবস্থা ভালো ছিল তাই না শিখতে পেরেছিল, আমি তো কোনোদিন রাঁধলুমই না।

ওর বয়সেই মেয়েরা বিয়ের কথা ভাবে। অমিয়া বলেছিল, সেও ভাবত, আর ভাবে বলেই একতলার ঘুপচি ঘরে জীবনটা সহনীয় হতে পারে। সচ্ছল ঘরে পুতুলকে দেওয়া যাবে না, টাকা কোথায়। মেয়েটা সেকথা ভেবেও হয়তো ভয় পায়। অসলে ভয় তো সকলেই পাচ্ছে, পুরুষ মেয়ে সকলে। নতুন বৌ অমিয়ার সময় মাংসের সের ছিল ছ আনা আট আনা, পুতুলের সময় তিন টাকা। জিনিস-পত্তরের দাম বাড়ার জন্যে স্ট্রাইক হবে হোক। মিহিরবাবু কবিতা লিখলেও বাজে কথা বলে না। খুন্তির শব্দ আসছে, কষা-মাংসের গন্ধ আসছে, মেয়েটার মুখ শুকনো। অসহ্য লাগছে এই ঘরটা।

পুতুল আর প্রমথকে দেখে গম্ভীর হয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসল অমিয়া। আলুর খোলা নিয়ে খেলা করছিল খোকন। পুতুল তাড়াতাড়ি কেড়ে নিয়ে কুটনোর ঝুড়িতে রেখে দিল, খোসা-চচ্চড়ি হবে।

গন্ধ উঠছে। এমন গন্ধ অমিয়ার হাতেই খোলে। ফুসফুস ভরিয়ে ফেলল প্রমথ। অমিয়ার গা ঘেঁষে পুতুল বলল, দাও না আমাকে।

উত্তর না দিয়ে অমিয়া শুধু খুন্তিটা নাকের কাছে ধরল। গনগনে আঁচ। একটুক্ষণ খুন্তি-নাড়া থামলেই তলা ধরে যাবে। পুতুলের কথায় কান দেবার ফুরসতও নেই। পুতুল করুণ চোখে তাকাল প্রমথর দিকে।

দাও না ওকে, যখন রাঁধতে চাইছেই।

সবই যখন করলুম তখন বাকিটুকুও করুক পরুক। খোকনের ঘুম পেয়েছে শুইয়ে দে।

সত্যিই তো? এখন আর করার আছে কি। জলভরা কাসিটা হাঁড়ির মুখে চাপা দেওয়া ছাড়া। মাংসের জল বেরোলে, কাঁসির উষ্ণ জলটা ঢেলে দেওয়া, সে তো একটা আনাড়িতেও পারে। তারপর সেদ্ধ হলে আলু, নুন আর ঘিয়ে রসুন জেঁকে সাঁতলানো, ব্যস। হতাশ হয়ে তাকাল প্রমথ। হনুর গড়নের জন্যে এমনিতেই পুতুলের গাল দুটো ফুলো দেখায়, এখন যেন আরো টেবো দেখাচ্ছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, তৃপ্তিকে ওর বৌদি নিজে থেকে রান্না শিখিয়েছে, গোটা ইলিশ কাটা শিখিয়েছে এবার ওদের মাংস এলে তৃপ্তি রাঁধবে সেদিন আমায় খাওয়াবে বলেছে।

তাহলে তো তোকেও একদিন খাওয়াতে হয়।

হয়ই তো, আজকেই তো ওকে বললুম আমাদের মাংস এসেছে, মা বলেছে আমি রাঁধব।

অমিয়ার দিকে চোখ রেখে এরপর পুতুল কিন্তু কিন্তু করে বলল, ওকে আমার রান্না খাওয়াব বলেছি।

গৌরদাও আজ বলল, দিওহে বৌমার হাতের রান্না। অনেক দিন খাই নি, কোত্থেকে শুনল কে জানে, বললুম দেব পাঠিয়ে। আহা বুড়ো মানুষটার যা কষ্ট, ছেলেবৌরা তো একটুও যত্ন করে না।

হ্যাঁ, পুলুদার বৌ কি ভীষণ চালবাজ, একদিন গেছলুম সে কি কথাবার্তা, যেন কত বি-এ, এম-এ পাস। কারুর আর জানতে যেন বাকি নেই দু-দুবার আই, এ-ফেল, তবু বলে বেড়ায় পাস করেছে। আর রাস্তা দিয়ে হাঁটে যখন, তুমি দেখেছ বাবা যেন, সুচিত্রা সেন চলেছে।

বোকার মতো হেসে প্রমথ বলল, কে বলবে তোকে।

তৃপ্তি। ও তো ভীষণ বায়স্কোপ দ্যাখে, তবে হিন্দী বই দ্যাখে না, খুব অসভ্য নাকি, মাস্টারমশাইও দ্যাখে না।

এমনি শুনে শুনেই মেয়েটা বায়স্কোপের খবর নেয়। মনে পড়ছে না কোনো দিন বায়স্কোপে যাব বলে বায়না ধরেছে। বাপের অবস্থা বুঝে সাধ-আহ্লাদগুলো চেপে রাখে বাবা-মাকে লজ্জায় ফেলে না। এ একমাত্র মেয়েরাই পারে, পুতুলের মতো মেয়েরা। চাঁদুটা সামান্য হুজুগ উঠলেই পয়সা পয়সা করে ছিঁড়ে খেত, এখন আর পয়সা চায় না। টাকা নিয়ে এখানে ওখানে খেলে খেলে বেড়ায়। ভাড়া খাটলে মানসম্ভ্রম থাকে না, কিন্তু কি করবে, উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে কখনো ফাঁকা পকেটে থাকতে পারে? রাধুর মতো ছেলে আর কটা হয়, পানটুকু পর্যন্ত খায় না। ভালো ওরা সবাই ভালো, আহা বেঁচেবর্তে থেকে মানুষ হোক।

একদিন তোর মাকে নিয়ে যাস না বায়স্কোপে।

খোকনকে কোলে নিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এসে গলা চেপে পুতুল বলল, হ্যাঁ, মা আবার যাবে। বলে, কতদিন সাধলুম চলো চলো, সকলেই তো যায়। তা নয়, মার সব তাতেই বাড়াবাড়ি। এক মিনিট বাড়ি না থাকলে সে কি ডাকাডাকি যেন পালিয়ে গেছি এমন বিচ্ছিরি লাগে, সবাই হাসাহাসি করে। বাবুদার সামনেও মা অমন করে।

ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলেও অমন ডাকাডাকি সবাই করে, তোর মেয়ে থাকলে তুইও করতিস।

প্রমথ হাসল। তিতকুটে গলায় পুতুল বলল, তা বলে দিনরাত ঘরে বসে থাকব? বেরোতে ইচ্ছে করে না আমার? ধনকমার কাজ সব সময় ভালো লাগে? তুমি হলে পারতে?

শেষ দিকে সপসপ করে উঠল পুতুলের গলা। খোকনকে নিয়ে সে ঘরে চলে গেল। রকে পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। একতলাটা শান্ত। দোতলায় সামান্য খুটখাট, তিনতলায় ছাদ, বলা যায় বাড়িটা চুপচাপ। শুধু গোলমাল করছে পাশের বাড়ির স্কুল। ফাইনাল ফেলকরা ছেলেটা।

ঘরে থাকতে ভালো লাগে না মেয়েব, বাইরেই বা যাবে কোথায়, গিয়ে করবেই বা কি। এবাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আর আজেবাজে কথা বলা—এতে লাভ কি? দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রমথ ঘাড়ের জড় ভাঙার জন্যে মাথা পিছনে হেলাল। ক্ষতিই বা কি, এমনি

করেই তো বাকি জীবনটা কেটে যাবে। মেঘের নামগন্ধ নেই, শুধু ঝকঝক করছে গুচ্ছেরখানেক তারা। অসহ্য গরম, অসহ্য।

হঠাৎ একদমক হাওয়া পেরেকে ঝোলানো বাসনমোছা ন্যাতাটা ফেলে দিল। হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে গা এলিয়ে দিল প্রমথ। ছটফটে গরমের মধ্যে একটুখানি হাওয়া বড় মিষ্টি লাগে। খোশবাই গন্ধ আসছে, হাঁড়ির ঢাকনাটা বোধহয় খুলল অমিয়া।

ঝিমুনি এসেছিল প্রমথর, ভেঙে গেল সদর দরজা খোলার শব্দে। চাঁদু এল। অমিয়ার সঙ্গে কথা হচ্ছে ওর, রাত্রে কিছু খাবে না বলছে। উঠে এল প্রমথ।

খাবি না কেন?

খাইয়ে দিল ওরা রেস্টুরেন্টে, সেমি-ফাইনালের দিনও খাওয়াবে। দুটো গোল হয়েছে, দুটোই আমার সেন্টার থেকে।

ভালোই হল, কাল তো বাজার আসবে না।

অমিয়া কালকের জন্যে চাঁদুর ভাগটুকু সরিয়ে রাখল। আড্ডা দিতে বেরুচ্ছিল চাঁদু, ডেকে ফেরাল প্রমথ।

তোর গৌর জ্যাঠাকে খানিকটা দিয়ে আয়।

কেন?

বিরক্তি, তাচ্ছিল্য আর প্রশ্ন, একসঙ্গে তিনটিকে অমিয়ার মুখে ফুটতে দেখে দমে গেল প্রমথ।

ওকে যে বলেছি, পাঠিয়ে দেব।

দেব বললেই কি দেওয়া যায়, অমন কথা মানুষ দিনে হাজারবার দেয়। এইটুকু তো মাংস। একে তাকে খযরাত করলে থাকবে কি, কাল বাজার হবে না, খাবে কি কাল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবার দরকার কি, বলে দিও নয় ভুলে গেছলুম।

অমিয়া আর চাঁদুর মুখের দিকে তাকাল প্রমথ। একরকমের হয়ে গেছে ওদের মুখ দুটো। ওরা খুশি হয় নি।

কিন্তু বুড়ো মানুষটা যে আশা করে বসে থাকবে।

কথাটা বলে চাঁদু দাঁড়াল না। অমিয়া চুপ করে আছে। তার মানে, ওইটে তারও জবাব। আবার পা ঝুলিয়ে বসল প্রমথ। আকাশে গুচ্ছেরখানেক তারা। আচমকা তখন হাওয়াটা এসে পড়েছিল, আর আসছে না। পুতুল চুপি চুপি পাশে এসে বলল, দিলে না তো। জানি, দেবে না। তখন মিথ্যে বলেছিলুম, তৃপ্তিকে মোটেই বলিনি যে মাংস খাওয়াব।

বেড়ালের মতো পুতুল ফিরে গেল। হয়তো তাই, বোকামি হয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা বসে থাকবে, বসেই থাকবে। ঝিমুনি আসছে আবার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে গা এলিয়ে দিল প্রমথ।

সদর দরজায় আবার শব্দ হতে প্রমথর মনে হল গৌরদা বুঝি। ফিটফাট, ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবু সটান রান্নাঘরের দরজায় এসে চাঁদুর খোঁজ করল, তারপর নাক কুঁচকে গন্ধ টেনে বলল, ফাস্‌ক্লাস গন্ধ বেরোচ্ছে কাকিমা।

আঁচল দিয়ে শরীরটাকে মুড়ে পুতুল যেন ভেসে এল।

চেখে যাবেন কিন্তু।

তারপরই তাকাল অমিয়ার দিকে ভয়ে ভয়ে।

বাবারে বাবা, মেয়ের যেন তর সইছে না। খালি বলছে, বাবুদা কখন আসবে, ওকে দিয়ে চাখাব। নিজে রেঁধেছে কিনা।

যে কেউ এখন দেখলে বলবে অমিয়া হাসছে। কিন্তু প্রমথর মনে হচ্ছে ও হাসছে না। হাসলে অত কুচ্ছিত দেখায় কাউকে? নাকি তার নিজের দেখার ভুল! প্রমথ তাকাল বাবুর দিকে। চৌকো করে কামানো ঘাড়, চুড়ো সাজানো রুক্ষ চুল। বুক, কোমর, পাছা সমান। চোপ্পার মতো আঁটসাঁট প্যান্ট, উল্টে দিলেই গুলতির বাঁট হয়ে যাবে চেহারাটা, ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু হাসল না প্রমথ, ছেলেটা শ-দেড়েক টাকার মতো চাকরি করে।

মুখে আঁচল চেপে হাসছে পুতুল। অমিয়া জিজ্ঞাসা করল, কেমন হয়েছে।

ফড়ুত করে হাড়ের মজ্জা টেনে বাবু বলল, গন্ধ শুঁকেই তো বলেছিলুম ফাস ক্লাস!

অমিয়া ওর খাওয়া দেখতে দেখতে জিজ্ঞাসা করল, চাঁদুর সেই কাজের কি হল?

বাবুর জিভ বাটিতে আটকে রইল কিছুক্ষণ, তারপরই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, সে আর মনে করিয়ে দিতে হবে না। তবে বুঝলেন তো, স্কুল ফাইনালটাও যদি পাস করত তাহলে ভাবনা ছিল না। আজকাল বেয়ারার চাকরির জন্যে আই, এ পাস ছেলেরাও লাইন লাগায়। তবে আমিও এ'টুলির মতো লেগে আছি সুপারভাইজারের সঙ্গে, বোজ ত্যালাচ্ছি।

চাঁদু না হয়, রাধুর জন্যে দ্যাখো।

না কাকিমা। রাধুটা আজকাল যেন কেমন হয়ে গেছে, চাকরিতে ঢুকে শেষকালে ইউনিয়নে ভিড়ুক আর আমায় নিয়ে টানা-টানি শুরু করবে তখন। এর ওপর আবার ঘা গরম বাজার চলছে।

হ্যাঁ, মিহিরকাকু বলছিলেন বেস্পতিবার নাকি স্ট্রাইক হবে।

আরে ও তো খুচরো স্ট্রাইক। বেশ বড়োসড়ো অল ইণ্ডিয়া স্ট্রাইকের কথাবার্তা হচ্ছে নাকি।

হলে হয় একবার, ব্যাটা সুপারভাইজার-টাকে বাগে পেলে আচ্ছাসে ধোলাই দিয়ে দেব। মেজাজ কি ব্যাটার, যেন মাইনে বাড়ানোর কথা বললে ওকেই গাঁটি থেকে টাকাটা দিতে হবে। পাবলিকের টাকা পাবলিক নেবে, তাতে ক্ষতিটা কি হয়?

খালি বাটিটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল বাবু, পুতুল টেনে নিল হাত বাড়িয়ে, জলের গ্লাসটাও এগিয়ে দিল সে। রুমালে ঠোঁট মুছে বাবু জিজ্ঞেস করল, চাঁদুটা গেল কোথায়, একটা কার্ড ছিল একস্ট্রা।

কার্ড কিসের, আপনাদের সেই অফিসের থিয়েটারের?

উঁহু, যুবে উৎসব। বলেছিলুম না আমার এক বন্ধু গল্প-টল্প লেখে, এর মধ্যে আছে, সে-ই জোগাড় করে দিল কার্ডটা। চাঁদু বলেছিল সতীনাথের গানের দিন যাবে, তা সেদিন আর জোগাড় হয়ে উঠল না।

কোন গানটা গাইল? 'সোনার হাতে'টা গেয়েছে?

ওটা, তারপর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে'টাও নাকি গেয়েছে।

আপনাকে তো সেধে-সেধে মুখ ব্যথা হয়ে গেল, তবু গানটা লিখে দিলেন না।

বেশ চলো, এখুনি লিখে দিচ্ছি। কয়লা দিয়ে উনুনে হাওয়া করছে অমিয়া। পুতুল আর বাবু যেন ভাসতে ভাসতে ঘরে চলে গেল। প্রমথর গা ঘেঁষেই প্রায়।

চটপটে চালাকচতুর ছেলে। ও কি বিয়ে করবে পুতুলকে? ছেলেমানুষ, বলার সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাবে তার থেকে ওর বাবাকে গিয়ে ধরতে হবে। মুশকিল বাধবে জাত আর দেনা-পাওনা নিয়ে। বাপের মুখের ওপর ওর কথা বলার সাহস হবে না।

তুমি এখানে বসে রইলে কেন, ঘরে ওরা একা রয়েছে না?

প্রমথ তাকিয়ে রইল অমিয়ার দিকে। কত সাবধানে আঙুলের ফাঁক দিয়ে চাল-ধোয়া জলটা ফেলছে। অমন করে মনের কুৎসিত সন্দেহগুলোকেও তো ছেঁকে ফেলে দিতে পারে। থাকলই বা ওরা একসঙ্গে একটুক্ষণ, ক্ষতিটা কি তাতে।

ঘরে নয়, ছাদে যাবে বলে উঠে দাঁড়াল প্রমথ। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে থামল। ঘরে ওরা হাসাহাসি করছে, ছাদে গেলে অমিয়া রাগ করবে নিশ্চয়। আজ ওকে রাগাতে ইচ্ছে করছে না। রান্নাঘরে গিয়ে গল্প করলে কেমন হয়, আগডুম-বাগডুম ঘা খুশি। মেজবৌদিকে সেদিন দেখলুম ধর্মতলায় গাড়ি থেকে নামছে, এখনও পেট-কাটা জামা পরে; কিংবা, দক্ষিণাবাবু কি সব ওষুধ খাইয়ে বৌকে প্রায় মেরে ফেলার জোগাড় করেছিল। তবে কাজ ঠিকই হাসিল হয়েছে। পেটেরটা বাঁচেনি। কিংবা, একটা দিন দেখে গুরুঠাকুরের কাছে গিয়ে মন্তর নেবার কথাটা পাড়লে হয়, ভাবছিল প্রমথ। পুতুল ঘর থেকে বেরিয়ে তার কাছে এল।

ছোড়দা তো নেই, কার্ডটা নষ্ট হবে, ওর বদলে আমি যাব? বাবুদা বলছে এমন উৎসব নাকি এর আগে হয় নি, দেখলে জীবনে আর দেখা হবে না, নাচ, গান, সিনেমা থিয়েটার সব নাকি দেখা যাবে, যাব?

গেলে ফিরবি কখন?

কত আর দেরি হবে, ঘন্টাখানেক দেখেই চলে আসব।

কচি শশার মতো কবজিটা যেন মুট করে ভেঙে ফেলবে পুতুল আঙুলের চাপে। এইটুকু কথা বলেই ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

তোর মাকে একবার বলে যা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে কোনোরকমে পুতুল বলল, ছোড়দা তো নেই। তাই আমিই যাচ্ছি তাড়াতাড়ি ফিরব।

একটা কাঁচা কয়লা বিরক্ত করে নাবছে। সেটাকে তুলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টাতে অমিয়া ব্যস্ত। প্রমথ কৈফিয়ত দেবার সুরে

বলল, বাড়ি থেকে বেরোয়-টেরোয় না তো ঘ্যাক ঘুরে আসুক।

কে?

সাঁড়াশিতে চেপে ধরে কয়লাটাকে উনুন থেকে বার করে আনতে আনতে অমিয়া বলল, কে, পুতুল?

হ্যাঁ, কি যেন উৎসব হচ্ছে বলল।

চলে গেছে?

না, কেন।

রান্নাঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছিল অমিয়া। পথ আটকে দাঁড়াল প্রমথ।

কেন আবার, রাত্তিরে মেয়েকে ছেড়ে দেবে একটা ছেলের সঙ্গে!

দিলেই বা কি দোষ হবে। হাঁপিয়ে ওঠে না ঘরে বাস থাকতে? শুধু ছাদ আর গল্প করা। এছাড়াও তো অনেক কিছু আছে। মারধোর করলেই কি মেয়ে ভালো হবে।

প্রমথ চুপ করল বুক ভরে বাতাস টেনে। দাঁত চেপে কথা বলতে বেশ কষ্ট হয় কিন্তু উপায়ই বা কি ওঘরে পুতুল আর বাবু রয়েছে। থমথম করছে অমিয়ার মুখ। ঘাম নামছে থুতনি বেয়ে কিলবিলে পোকার মতো ফরসা গালে সেঁটে বসা উড়ো চুলকে চুনে মাটির ফাটা দাগের মতো দেখাচ্ছে। সত্যিই ফেটে পড়ল অমিয়া।

আমি যখন পারি ও পারবে না কেন কেন পারবে না। শুধু ওর কথাই ভাবছ, কেন ভাবার আর কিছু নেই তোমার? বলে দিচ্ছি ওর যাওয়া হবে না।

চুপ আস্তে দোহাই আজ আর চেঁচিও না।

আঙুল বাঁকিয়ে দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল প্রমথ। দপদপ করছে তার রগের পেশী। পিছু হটে এল অমিয়া। প্রমথর নখের ডগাগুলো ভীষন সরু।

চুপ করব কেন। আমি অন্যায় কথা বলেছি? মেয়েকে কেন তুমি ছেড়ে দিতে চাও একটা ছেলের সঙ্গে তা কি বুঝি না ভেবেছ।

চোখে চোখ রেখে ওরা তাকাল। অমিয়ার চাউনি কসাইয়ের ছুরির মত শান দিচ্ছে। মাংসের খোলা হাঁড়িতে চোখ পড়ল প্রমথর থকথক করছে যেন রক্ত।

কি বুঝেছ তুমি বলো কি বুঝেছ?

দুহাতে অমিয়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিল প্রমথ। খোঁপাটা খুলে পড়ল চোখদুটো মরা পাঁঠার মতো ঘোলাটে হয়ে এল ঠোঁট কাঁপিয়ে অমিয়া বলল তুমি আমার গায়ে হাত তুললে!

অন্ধকার উঠোনে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে পুতুল আর বাবু। কোনো সাড় নেই যেন ইন্দ্রিয়গুলোর। তবু ছাদে যাবার সময় প্রমথর নাকে চড়াভাবে লাগল পাউডারের গন্ধ। মেয়েটা সেজেগুজে অপেক্ষা করছে করুক। মাথা নিচু করে প্রমথ ওদের পাশ দিয়েই ছাদে যাবার সিঁড়ি ধরল।

ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। রাধু ডেকে তুলল প্রমথকে। থালার সামনে বসে আছে অমিয়া। ঠান্ডা ভাত আর মাংস। ছেলে-মেয়েরা শুয়ে পড়েছে।

পুতুল শুয়ে পড়ল যে এর মধ্যে।

শরীর খারাপ কিছু খায়নি।

কথাদুটো শুকনো কড়কড়ে। খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত আর কেউ উচ্চবাচ্য করল না। মাংসের সবটুকুই ঠেলে প্রমথ। শুধু মেটুলির টুকরোগুলো ছাড়া। মেটুলি ভীষন ভালো-বাসে অমিয়া অথচ সবটুকুই সে প্রমথকে দিয়ে দেবে। প্রমথও না খেয়ে বাটিতে রেখে দেবে। তখন মিষ্টি ঝগড়া ভালো লাগত আর মাংসও আসত নিয়মিত। আজকেও প্রমথ মেটুলি রেখে উঠে পড়ল। কলতলায় অনেকক্ষণ ধরে কষের দাঁত থেকে মাংসের আঁশ টেনে বের করল। ভিজে গামছা দিয়ে গা-মুছে যখন সে শুয়ে পড়ল তখনও অমিয়ার রান্নাঘর ধোয়া শেষ হয়নি।

অনেক রাতে উঠোনে বেরিয়ে এল প্রমথ। ঘরের মধ্যে যেন চিতা জ্বলছে। একটুও হাওয়া নেই ঘুম নেই মেঘও নেই। পায়চারি শুরু করল সে রকের এমাথা ওমাথা। একটা এরোপ্লেন উড়ে গেল। মুখ তুলে তাকাল প্রমথ। একটুখানি দেখা গেল লাল আর সাদা আলোটা পালটা-পালটি করে জ্বলছে আর নিভছে। মাত্র কতকগুলো তারা দেখা যায় উঠোন থেকে। ছাদে উঠলে আরো দেখা যাবে। দেখেই বা কি হবে। ওরাও তো দেখল আজ মাংস এসেছে অনেক দিন পর কিন্তু তাতে হল কি। পাতে মেটুলি রেখে সে উঠে পড়ল আর নির্বিকার হয়ে শুধু তাকিয়ে রইল অমিয়া। এখন মনে হচ্ছে অমিয়া যন্ত্রের মতো তাকিয়ে ছিল। কিন্তু সেও তো যন্ত্রের মতোই শুধু অভ্যাস মেনে মেটুলিগুলো পাতে রেখে দিয়েছিল। পায়চারি থামাল প্রমথ। অমিয়াও উঠে এসেছে।

ঘুম আসছে না বুঝি?

না ভয়ানক গরম লাগছে।

পিঠের কতকগুলো ঘামাচি মাবল অমিয়া। দু-একটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল প্রমথ।

ছাদে যাবে?

কেন এই তো বেশ।

বরাববই তোমার কিন্তু ঘামাচি হয়।

অমিয়া পিঠের উপর কাপড় টেনে দিল।

বসবে?

পাশাপাশি বসল দুজনায়।

পুতুলের জন্যে ছেলে দ্যাখো এবার।

হ্যাঁ, দেখব।

চাঁদটাকে একটা যা হোক কাজেকর্মে ঢুকিয়ে দাও, কদ্দিন আর টোটো করে কাটাবে।

হ্যাঁ চেষ্টা করতে হবে।

রাধু বলছিল আই-এ পরীক্ষাটা দেবে সামনের বছর।

ভালোই তো।

শান্ত রাত্রির মাঝে ওদের আলাপটা কল থেকে একটানা জল পড়ার মতো শোনাল। ওরা অনেকক্ষণ বসে রইল চুপচাপ, পাশা-পাশি। কেউ কারুর দিকে তাকাচ্ছে না। দুজনের চোখ সামনের শ্যাওলা-ধরা দেয়ালটাকে লক্ষ্য করছে।

কি দরকার ছিল মাংস আনার।

অমিয়ার স্বরে ক্ষোভ নেই তাপ নেই অনুমোদন নেই। শুধু যেন একটু কৌতূহল। তাও ঘামাচি মারার মতো নিস্পৃহ। মুখ না ফিরিয়ে প্রমথ বলল, কি জানি। তখন কেমন ভালো লাগল অনেক কথা মনে পড়ল মনটাও খুশি হল। ভাবলুম আজ সবাই মিলে একটু আনন্দ করব।

চুপ করে রইল প্রমথ। মুখ ফিরিয়ে একবার তাকাল। অমিয়াও তার দিকে তাকিয়ে।

আজ পুতুলকে দেখে বারবার তোমায় কথা মনে পড়ছিল। কত মিষ্টি ছিলে চঞ্চল ছিলে ছটফটে ছিলেন। আর ওকে কাঁদিও না।

মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল প্রমথ তারা জ্বলছে। একটা কামার মানুষকে তাতিয়ে বিরাট এক হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলেছে তারই ফুলকিগুলো ছিটকে উঠেছে আকাশে। ছাদে উঠলে আরো অনেক দেখা যাবে। অমিয়ার পিঠে হাত রাখল প্রমথ। থরথর করে কাঁপছে ওর পিঠটা।

জানো অমি, মনে হচ্ছে আমি আর ভালোবাসি না বোধহয় তুমিও বাস না। তা না হলে তোমার মনে হবে কেন আমি তোমার গায়ে হাততুলতে পারি। অথচ সত্যি সত্যি তখন ইচ্ছে হয়েছিল তোমার গলা টিপে ধরি। অমি, এখন একটা মড়া আগলে বসে থাকা আর আমাদের কাজ নেই।

অমিয়ার পিঠে হাত বোলাল প্রমথ। খসখসে চামড়া মাংসগুলো ঝুলে পড়ছে আলগা হয়ে মেরুদন্ডের গিঁটগুলো হাতে আটকাচ্ছে। মুখ তুলল প্রমথ, যে-ক-টা তারা দেখা যায় সেদিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল কেঁদো না মরে গেলেই মানুষ ভাবে আমি কি মরে গেছি।

তারপর ওরা বসে রইল অনেকক্ষণ কথা না বলে।

নিউ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার
• বেনারসী • জেড়
• ফ্যান্সী শাড়ী
ও
সর্ব ভারতীয়
তাঁত বস্ত্র
৫৪৫/১, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া।

কথায় কথায়

ভিখারি

আমরা যে বাসায় থাকি সেটা একেবারে সদর রাস্তার ওপর বসানো। একটা গবুতর বাঁকে এমন কোণাকোণিভাবে বাড়িটা রয়েছে যে সতত সন্তবমান ভিখারিকুলকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এই সামান্য স্থানটি এবং যেহেতু আমি একতলায় এবং বাড়ির সামনের অংশে থাকি এই বিপুল সাহায্যপ্রার্থী জনতাকে আমাকেই ক্রমাগত ঠেকাতে হয়।

আমার যাঁরা পরিচিত অনেকেই জানতে চান আমি কিভাবে ঠেকাই? ঠেকাতে পারি কি না? পারলেই বা কি রকম না পারলেই বা কি রকম? উত্তরে আমি জানাই এর আবার রকমসকম কি? প্রতিটি আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা কায়দা ব্যবহার করি।

যেমন ধরা যাক আমাদের প্রতিবেশী সাবানের কারখানায় প্রাচীন কালের পেটা ঘড়িতে রাত বারোটা বেজে ওঠার অব্যবহিত পরেই আবির্ভূত হন এক বন্যা প্রপীড়িত পরিবার স্বামী স্ত্রী দুই পুত্র তিন কন্যা মাদুর লণ্ঠন এমনকি একটি লেজ কাটা কুকুর শুদ্ধ। এই ভরা জ্যৈষ্ঠ মাসে এমন প্রলয়ঙ্করী বন্যা কোথা থেকে যে এই সম্পূর্ণ পরিবারটিকে দেশান্তরী করেছে। এই বিষয়ে শততম চিন্তাটি গুছিয়ে ওঠার আগেই তাঁরা এসে উপস্থিত হন আমার বাইরের দরজার নিচের সিঁড়িতে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন আমি অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকি কেন?

অবশ্যই এই পরিবারটিকে স্বাগত জানাবার জন্যই জেগে থাকি। অন্যথায় এঁরাই আমার কাঁচা ঘুম চটিয়ে সমস্বরে এবং কাংস্য কণ্ঠে বাসি রুটির আবেদন জানাতে থাকবেন। এঁদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে একদিন ঘুম জড়ানো গলায় বলেছিলাম রাত মাত্র বারোটা বাজে রুটি এখানো বাসি হয়নি। এই পরিহাস শুনে পরিবারের কর্তা ও গিন্নী এবং তৎসহ পোষা লেজ কাটা কুকুরটা এমন করুণ আর্তনাদ করতে লাগলো যে পাড়ার লোকেরা আচমকা ঘুম থেকে জেগে উঠে বিনা বাক্যব্যয়ে মনস্থির করে ফেললো আমি কোনো গভীর অন্যায় করেছি। কোথাও থেকে এঁদের ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে দাঁটি বাঁটি কেড়ে নিয়েছি। সেদিন নগদ এক টাকা সত্তর পয়সা তিন কেজি আটা একটা পুরনো কলাইকরা থালা একটা টিনের মগ এবং একটা ছেঁড়া মশারি এঁদের উপহার দিয়ে কোনো রকমে প্রাণ রক্ষা করি।

এরপর থেকে সাবধান হয়ে গেছি। আসলে এঁদের সঙ্গে আমার একটা বফা হয়েছে। এরা আমার বাড়িতে এসে পৌঁছালেই আমি দরজা খুলে সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আধঘণ্টা সময় মানে রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সাম্প্রতিকতম হিন্দী সিনেমা নিয়ে আলোচনা করি। পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা কুকুরটি ছাড়া এই পরিবারের প্রত্যেকে এই আলোচনায় পরম উৎসাহ ও উত্তেজনা সহকারে যোগদান করে। আলোচনা অন্তে ভিক্ষা নেওয়ার কথা মোটেই মনে থাকে না। এমনিতেই প্রসন্ন চিত্তে চলে যায়। মধ্য থেকে আমার সাপ্তাহিক এক টাকা সত্তর পয়সা বরবাদ হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একটি হিন্দী ছবি দেখতে হচ্ছে।

সে যা হোক এখন অন্যান্য ভিক্ষুকদের কথা বলি। যাঁরা ভিখারি, ভাবলেই মনে করেন শৃঙ্খলাহীন অরাজকতার সমাজের কথা তাঁরা একবার এসে অন্তত সাতদিনের জন্যে থেকে যেতে পারতেন আমার বাসায়। প্রতিটি ভিখারিই একটি নির্দিষ্ট ছকে শৃঙ্খলা পরায়ণ জীবনযাপন করে। যে গড়িয়াহাট মোড়ের ডানদিকে দাঁড়ায় তাকে গুলি করে মেরে ফেললেও বাঁদিকের মোড়ে দাঁড় করানো যাবে না। তেমনি বাজারের ভিখারি বা স্টেশনের ভিখারি কোনো দিনে মোড়ে দাঁড়াবে না।

কিন্তু পাড়ার ভিক্ষুক একেবারে অন্য জাতের। যে দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে পাড়ার মধ্যে ঘোরে সে আবার কিছুতেই বাজার স্টেশনে বা মোড়ে যাবে না। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের মতো একটি নিয়মিত চক্রাবর্তনের মধ্যে সে দোলায়িত। একটা নিয়ম সে অনবরত মেনে চলেছে। হয় একই বাড়িতে সে সপ্তাহে একবারের বেশি আসবে না না হলে দিনে একবারের বেশি আসবে না। আর খুব বেশি হলে প্রতি বেলায় একবারের বেশি আসবে না। অর্থাৎ সকাল দুপুর বিকেল এবং রাত এই চার বেলায় চারবার। যে সাপ্তাহিক আসে সে সপ্তাহান্তেই আসবে যে দৈনিক আসে সেও ঠিকই আসবে আর যে প্রতি বেলায় আসে সেও চারবার ভিক্ষা চাইতে আসবে প্রতিদিনই।

উত্থানপন থেকে শুরু করে মধ্য রাত পর্যন্ত ভিখারি ঘুম পড়ে যায় আমার দরজার সামনে। অনেক সময় একাধিক ভিখারির মধ্যে মারামারি বেধে যায়। সে মারামারি থামাতে হয় আমাকেই। যাকে কিছু দিই সে দু মিনিট চেঁচায় যাকে দিই না সে দশ মিনিট চেঁচায়।

এইভাবে চলছিলো গত সাত বছর।

সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে পরশু দিন থেকে। আমার ছেলেটির গরমের ছুটি হয়েছে। তাকে একটা বাঁধানো খাতা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি সদর দরজার পাশের জানলায়। যে ভিখারিই আসে তাকে সে প্রশ্ন করে তার নামধাম বয়েস ঠিকানা কতদিন ভিক্ষা করছে আর কতদিন করবে দৈনিক কত আয় হয় বংশে আর কেউ ভিক্ষুক আছে কিনা ইত্যাদি বহুবিধ সরল বিষয়ে। উত্তরের বিনিময়ে প্রতি ভিক্ষুক পাবে একটি করে দশ পয়সা বলা উচিত এই দুর্দিনে একটি দশ পয়সাও ব্যয় করতে হয়নি। খাতা-কলম প্রশ্নের বহর দেখে ভিখারিরা এখন পণ্ডিতিয়া থেকে পলাতক।

তারাপদ রায়

CALCUTTA UNIVERSITY

বিজ্ঞাপন বিচিত্রা

পর্যটন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ইদানীং কতকগুলো নামকরা বেড়ানোর জায়গার বিজ্ঞাপন আর চোখে পড়ে না কেন? সরাসরি প্রশ্ন রাখি।

প্রশ্নটা শুনে একটু সোজা হয়ে বসলেন পর্যটন বিভাগের অধিকর্তা শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ রায়। তারপর হাসতে হাসতে বললেন—আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন আমাদের কতগুলো ট্যুরিস্ট স্পটে এমনিতেই ভ্রমণার্থীর সংখ্যা আশাতিরিক্ত। সুতরাং সেসব জায়গার জন্য নিশ্চয়ই আর নতুন করে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দরকার নেই। যেমন ধরুন দার্জিলিংয়ের কথা। দার্জিলিংয়ে লাস্ট সিজনে ট্যুরিস্টের সংখ্যা যা দাঁড়িয়েছিল তাই সারপ্লাস।'

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে এসে উপস্থিত হলেন জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীপ্রভাত কর। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনিও যোগ দিলেন আমাদের আলোচনায়।

—তাহলে এখন আপনাদের বিজ্ঞাপনের ধরণটা কি?

—আমরা এখন একটু নতুন ধরনের এক্সপেরিমেন্টে চালাচ্ছি। যেমন ধরুন এই দার্জিলিঙেই আমরা লক্ষ করে দেখেছি অফ সিজনে ভ্রমণার্থীর সংখ্যা কম হয়।

শ্রীবাবুর মুখের কথাটা শেষ না হতেই প্রভাতবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—এর অবশ্য কতগুলো অমূলক কারণও আছে। লোকে ভাবে অকটোবর নভেম্বরে দার্জিলিংয়ে গেলে নাকি ঠাণ্ডায় নিউমোনিয়া হতে পারে ধস নামতে পারে ইত্যাদি। এইসব অকারণ ভীতি দূর করে এই ধরনের স্থানগুলোতে যাতে অফ সিজনেও লোককে আকৃষ্ট করা যায় আমরা সেই ধরনের বিজ্ঞাপনের কথাই ভাবছি। আমরা লিখছি—

—'এই সময়ে দার্জিলিং আসুন। অকটোবর নভেম্বরে আপনি আকাশ আরো ভালো পাবেন ঝকঝকে রোদে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং কাঞ্চনজঙ্ঘাও আরো ভালোভাবে দেখতে পাবেন।' অন্যান্য জায়গার উপরেও আমরা ঠিক এই ধরনের পরীক্ষা চালাচ্ছি। বিষ্ণুপুরের কথাই ধরুন। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং ওখানকার স্থানীয় লোকদের সঙ্গেও আলোচনা করে বুঝেছি ঠিক বর্ষার শান্তিনিকেতনের মতোই বর্ষার বিষ্ণুপুরও বড় মনোরম সুন্দর জায়গা। অথচ সাধারণ ভ্রমণার্থীরা ভাবেন একমাত্র শীতকালেই বুঝি কাঁকুড়া বিষ্ণুপুর বেড়াবার জায়গা। আমরা তাই বর্ষাতেও বিষ্ণুপুর ভ্রমণের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি।

—ভ্রমণ-প্রিয় মানুষদের আকৃষ্ট করার জন্য আপনারা কি কি করেন?

—প্রথমেই ধরুন বিভিন্ন কাগজে বিজ্ঞাপনের কথা। দ্বিতীয়ত আমরা নানা প্রদর্শনীতে স্টল খুলি। এছাড়াও রয়েছে ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র টেলিভিশন পিকচার পোস্টকার্ড ছাপানো নানা পুস্তিকা ইত্যাদি।

—গ্রামের মানুষ অর্থাৎ যাঁরা এই আধুনিক এবং লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত প্রচার পদ্ধতির আওতা থেকে বাইরে অথচ যাদের বেড়াবার মতন পয়সা এবং সাধ দুটোই আছে—সেইসব গ্রামের মানুষগুলোর জন্য আপনারা কি করছেন? তাঁদের মধ্যে ভ্রমণস্পৃহা বাড়ানোর জন্য কি আপনারা ইউনিট নিয়ে বার যেভাবেই হোক কোনো প্রচার চালিয়েছেন?

আমার প্রশ্নে শ্রীরায় এবং শ্রীকর দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালেন। মুখ ঘুরিয়ে সমীরেন্দ্রবাবু বললেন—না, সেরকম কোনো ব্যবস্থা অবশ্য আমরা নিইনি। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখনও পর্যন্ত মূলত শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী যাঁরা—অর্থাৎ আগামী দিনের নাগরিক হবেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে ভ্রমণস্পৃহা বাড়ানোর জন্য প্রতি বছর আমরা বিভিন্ন স্কুল কলেজগুলোকে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দিই।

দেশীয় মানুষদের থেকে এবার বিদেশী পর্যটকদের প্রসঙ্গে গেলাম আমরা। ততক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলোর উপর পরিচিতিসম্বলিত বিভিন্ন আকর্ষণীয় 'বুকলেট' আমার দিকে এগিয়ে দিলেন প্রভাতবাবু। পুস্তিকাগুলোতে চোখ বুলোতে বুলোতে প্রশ্ন করি—এছাড়াও বিদেশী পর্যটকদের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কি করা হয়?

প্রভাত কর বললেন—নানা বিদেশী পত্রপত্রিকায় আমাদের লেখা প্রকাশিত হয়। সেইসব রচনার মধ্যে এখানকার আকর্ষণীয় স্থানগুলোকে তুলে ধরা হয়। নানা এয়ারপোর্টে হোর্ডিং দেওয়ার চেষ্টা চলছে। দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ বিমানবন্দরে চেষ্টা করেছি। কিন্তু নানা অসুবিধা থাকায় এখনও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি। দমদম বিমানবন্দরে হোর্ডিং ছিল সম্প্রতি ঝড়ে পড়ে গেছে। আবার লাগাবার ব্যবস্থা করছি।

—বছরে প্রচারের জন্য মোটামুটি খরচ কত?

—প্রায় দুলক্ষ টাকা। এছাড়াও আমাদের অন্যান্য খরচ আছে, যেমন—নানা ভ্রমণস্থানে 'ট্যুরিস্ট লজ' তৈরি।

—প্রচারের ব্যাপারে কি কোনোরূপ সমস্যা দেখা দেয়? নাকি যা ব্যবস্থা আছে তাতেই ভালো কাজ হচ্ছে বলে মনে করেন?

—সরকারী সবরকম সাহায্যই আমরা পাই। এখনও পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো সমস্যা আমাদের সামনে আসে নি।

—পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমাদের আনন্দের এবং গর্বের কথা আমাদের পর্যটন বিভাগের বিভিন্ন প্রচার পদ্ধতি নানা সময়ে দেশবিদেশের নানা প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা থেকে বিভিন্ন পুরস্কার এবং সম্মান লাভ করেছে। ১৯৬৮ সালে সুইজারল্যান্ডে বিশ্ব প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত 'ক্যালকাটা উইনডো' স্টল বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। ১৯৬৯ সালে আন্তর্জাতিক পর্যটন বছরে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন বিভাগের স্টল প্রথম পুরস্কার পায়। ভারত সরকার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় 'কালকাটা' শীর্ষক পোস্টার লাভ করে প্রথম পুরস্কারের সম্মান এবং 'গৌড়' শীর্ষক প্রচারপত্র পায় সার্টিফিকেট অফ মেরিট। এটা আমাদের গৌরবের কথা।

আনন্দ রায়

একালের গান

অমৃতের ৫ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীসুধীর দাসের চিঠি প্রসঙ্গে জানাই 'সুরের আগুন' প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তা খুব কম করে বললেও অত্যন্ত অসময়োচিত হয়েছে। ঐ ফিচার শুরু হয়েছিল এক বছরেরও কিছু আগে। তখন অবশ্যই তিনি তাঁর মত জানাতে পারতেন। এতদিন নীরব থেকে এখন তিনি যা বলেছেন তা নিষ্প্রয়োজন। শুধু প্রসঙ্গত জানানো দরকার আমরা দেখেছি শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষের সাক্ষাৎকার ঐ ফিচারেই প্রকাশিত হয়েছে এবং ঐ রবেন্দ্য শিল্পীরা সাগ্রহে অমৃতের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন—তাও দেখা গিয়েছে।

আসলে শ্রীদাসের মূল বক্তব্য কিশোরকুমারকে নিয়ে। তিনি যা বলেছেন তার মধ্যে একটা চাপা বিক্ষোভের সুর অস্পষ্ট থাকে নি। অমৃতের এই ফিচার এবং অন্যান্য ফিচারের ধরন দেখে আমার কিন্তু মনে হয়েছে 'অমৃত' ঠিক বয়স ধরে ফিচারগুলি শুরু করছেন না। সম্ভবত তাঁরা চাইছেন জনপ্রিয় শিল্পী দিয়ে শুরু করা। স্বীকার করতেই হবে জনপ্রিয়তা একটা অস্পষ্ট সংজ্ঞা, একজনের কাছে যিনি জনপ্রিয় অন্যজনের কাছে তিনি জনপ্রিয় নাও হতে পারেন কিংবা একসময় যিনি জনপ্রিয় অন্যসময় তিনি জনপ্রিয় নাও থাকতে পারেন অথচ সকলেই বরেণ্য শিল্পী।

আশাকরি শ্রীসুধীর দাস কিশোরকুমারের পরে আর যাঁদের সম্বন্ধে 'একালের গান'-এ লেখা হয়েছে লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই তিনি তাঁর পছন্দসই শিল্পীদের দেখতে পাবেন। তা যদি না হয় তবেই 'অমৃত'কে দোষ দেওয়া যাবে। তার আগে অপেক্ষা করাই ভালো না কি?

অশেষ গুপ্ত
কলকাতা—২৯

'সাহিত্যের নেপথ্য' বিষয়ে

গত ২৬ চৈত্র সংখ্যা অমৃতে সাহিত্যের নেপথ্যে বিভাগে বেঙ্গল পাবলিশার্সের গোড়ার কথা সম্পর্কে শ্রীমুখ বসু যা বলেছেন সেখানে বাকসাহিত্যে ও প্রকাশ ভবনের পরিচালক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কোন নামোল্লেখ পর্যন্ত নেই। অথচ পরবর্তী ৩রা বৈশাখ সংখ্যা অমৃতে শ্রীমুখোপাধ্যায় বেঙ্গল সুরু করার সন তারিখ থেকে তাঁর সমান ভাগের অংশীদার শ্রীমনোজ বসুর সঙ্গে ২২ বছর পরে আলাদা হ'য়ে যাওয়ার কারণ পর্যন্ত দর্শিয়েছেন। উৎসাহী পাঠক মহলে ও লেখককুলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বলা কথাগুলিই বহুকাল ধরে জানা আছে। তা হলে কি ধরে নিতে হয় মুখুযেবাবুর বেঙ্গলের গোড়ার দিককার ও পরবর্তী ২২ বছরের ব্যবসা সক্রান্ত কোন কথাই জানা ছিল না। এই বিভ্রান্তির কারণ কী?

শঙ্খ মুখোপাধ্যায়
খালিগঞ্জ কলকাতা-১৯

একই লেখক : দুই লেখা, দুই সময়

আপনাদের সাপ্তাহিক 'অমৃতে' 'একই লেখক : দুই লেখা দুই সময়' নামের ফিচারটির জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ফিচারটি পূর্ববর্তী দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বিষয় ও উপস্থাপনা নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার একটি বক্তব্য নিবেদন করি। যে লেখকের বর্তমান ও অতীত দুটি কালের লেখা ছাপছেন, তাঁর অতীতে প্রকাশিত রচনাটির রচনাকাল বা প্রকাশকাল, সেই সঙ্গে কোন গ্রন্থে বা কোন পত্রিকায় ছাপা ছিল তা যদি উল্লেখ করেন—তা উৎসাহী পাঠক ও গবেষকদের যথোচিত কাজে লাগবে। আমার বিশ্বাস দুই রচনার দুই কালের ব্যবধানের কারণে বিচিত্র রসাস্বাদ আনন্দ দেবে।

বীরেন্দ্র দত্ত
কলকাতা-৬
২৮।৫।৭৬

[সহযোগিতার জন্যে পত্রলেখককে ধন্যবাদ। এ-সপ্তাহ থেকেই 'আগের গল্প' প্রকাশের তারিখ দেওয়া হচ্ছে। অঃ সঃ]

উপন্যাস

গোধূলিয়া

নিমাই ভট্টাচার্য

।।একুশ।।

সেদিন সন্ধ্যায় ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়েই মেসে ফিরলাম না। ইচ্ছা করল না। কিছুক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলাম। বেশীক্ষণ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগল না। ক্লান্ত বোধ করলাম। একটু বসব বলে কলেজ স্কোয়ারে গেলাম কিন্তু ভীড় দেখে বেরিয়ে এলাম। ট্রাম রাস্তা পার হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের গেট দিয়ে সোজা বেকার ল্যাবরেটরীর মাঠে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

আজ কি তিথি জানি না। দূরের আকাশে অনেক তারা। এক কোণায় এক টুকরো চাঁদ। শুয়ে শুয়ে ওদের দেখছিলাম আর ভাবছিলাম নিজের কথা। নানা কথা। আমি জানি পিসীর চাইতে আমাকে কেউ বেশী ভালবাসে না। পিসীর ডাক আমি অগ্রাহ্য করতে পারব না। আমি যাব। নিশ্চয়ই যাব। কিন্তু...

বেকার ল্যাবরেটরীর মাঠে শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মুহূর্তের জন্য চাঁদ-তারা আমার দৃষ্টির বাইরে লুকিয়ে পড়ল। মনে পড়ল দেবীর কথা। আমি পিসীর কাছে থাকলে ও যে কি অসম্ভব খুশী হবে তা আমি জানি। জানি ভালবাসায় ও আমাকে ভরিয়ে দেবে কিন্তু...

ভাবতে গিয়েই থমকে দাঁড়াই। ভাবি আমি ওকে কি দেব? শুধু নীরব ভালবাসা? এক ফোঁটা চোখের জল? একটু সান্নিধ্য? কিন্তু তাতে কি ওর মন ভরবে? ওর প্রাণের শান্তি হবে? ওর মনের আগুন দেহের অতৃপ্তি দূর হবে?

না, হ'তে পারে না। অসম্ভব। সমাজ সংসারের অনুশাসনকে ভুলে ও যদি ধাপে ধাপে আমার কাছে এগিয়ে আসে? অথবা আমিই যদি ওর বৈধবের কারাগার ভেঙ্গে...

ভাবতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে উঠল। চোখে অন্ধকার দেখলাম। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করেই শুয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ মনে হল দেবী যদি বিদ্রোহ করতে চায়? যদি বলে দীপ চলো আমরা বাঙ্গালী-টোলার এই অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে পড়ি। যদি প্রশ্ন করে আচ্ছা দীপ মানুষ বড় নাকি সংস্কার বড়? মানুষের জন্য সমাজ নাকি সমাজের জন্য মানুষ? আমি কি উত্তর দেব? আমি কি বলতে পারব দেবী মানুষের চাইতে বড় কিছু নেই। আগে মানুষ তারপর সমাজ সংসার। আমি কি ঐ জমাট বাধা অন্ধকার আর কুসংস্কার থেকে ওকে টেনে এনে আনন্দময় জীবনের রূপ দেখাতে পারব? নাকি আমি আমার বাবা-জ্যাঠার মত অচলায়তনের নির্মম অনুশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে আত্ম-প্রসাদ লাভ করব?

হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টুকরো টুকরো কালো মেঘ আনাগোনা শুরু করেছে। কখনো চাঁদ কখনো কিছু তারা কালো মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে। দু-এক মিনিটের মধ্যেই একটা দমকা হাওয়া এলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসতেই দেখি আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় মানুষ ছুটাছুটি শুরু করেছে। আমিও আর বসে রইলাম না। মেসের দিকে পা বাড়ালাম।

মেসে ঢুকতেই কার্তিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন আজ এত দেরী করলে?

একটু কাজ ছিল।

তোমার কাকাবাবু এসেছিলেন।

কিছু বলে গিয়েছেন?

না।

আমি আর দাঁড়ালাম না। নিজের ঘরে গেলাম। একটু বিশ্রাম করেই বাথরুম গেলাম। তারপর খেয়ে নিলাম। নিজের ঘরে এলাম কিন্তু শুয়ে পড়লাম না। চিঠি লিখতে বসলাম। পিসীকে লিখলাম কাকা-বাবুর জন্য একটা বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি কিন্তু তোমাকে দুঃখ দিয়ে কাকাবাবুকে খুশী করা সম্ভব হয়। আমাদের মেসের কার্তিকবাবুও বললেন তোমার কাছে চলে যেতে। তাই ঠিক করেছি তোমার কাছেই থাকব। আর এভাবে একলা একলা থাকতে সত্যি ভাল লাগছে না। সামনের মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহেই আসছি। আসার আগে চিঠি দেব। দিদি আর দেবীকেও আমার আসার খবর জানিও।

পরের দিন সকালে সামনের আমহার্স্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাফিসে চিঠিটা পোষ্ট করার পরই মনে হল এই বয়সে বুড়ী পিসীর গলগ্রহ হবো? পিসী হাসি মুখে খুশী মনেই আমাকে দুবেলা অন্ন দেবে ঠিকই কিন্তু পিসীর প্রতি আমারও ত কিছু কর্তব্য আছে। মনে হল একটা চাকরি পেলে বড় ভাল হতো। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে কত দরখাস্ত পাঠালাম কয়েকটা জায়গায় ইন্টারভিউও দিলাম কিন্তু এমনই কপাল যে এখনও পর্যন্ত একটা চাকরি পেলাম না। চাকরি পেলে কাকাবাবুকে বলতে পারতাম কাকাবাবু যখন চাকরি পেয়ে গেছি তখন আর পরের বাড়ী থাকব না। সারা জীবন পরের বাড়ীতে কাটিয়ে আর পরের বাড়ীতে থাকতে মন চায় না। কাকাবাবু কিছু বললেই বলতাম তাছাড়া আমি আর ছাত্র-ছাত্রী পড়াব না। আমি একা মানুষ। আমার ত বেশী টাকার দরকার নেই। চাকরি করে যা পাব তা দিয়ে আমার বেশ ভালভাবেই চলে যাবে।

দিন দুই পরে দুপুরে মেসে ফিরতেই কার্তিকবাবু বললেন—তোমার একটা রেজেষ্ট্রী চিঠি এসেছে।

রেজেষ্ট্রী চিঠি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

নিশ্চিত তোমার ঘরে রেখে এসেছে।

প্রায় লাফ দিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে ঘরে এসে দেখি ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের চাকরির এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছে। আনন্দের আতিশয্যে পুরো চিঠিটা পড়ার আগেই দৌড়ে নীচে গিয়ে কার্তিকবাবুকে বললাম—চাকরি পেয়েছি।

কোথায়?

ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের..

কলকাতাতেই?

দাঁড়ান দাঁড়ান পড়ছি।

এখনও পুরো চিঠিটা পড়নি?

না পড়ছি।

ঝড়ের বেগে চিঠিটার উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললাম—ওরা পাটনায় নতুন অফিস করছেন। আমাকে পাটনাতেই কাজ করতে হবে। মাইনে তিন শ' পঁচিশ।

খুব আনন্দের কথা। কবে জয়েন করতে হবে?

সামনের মাসের ষোলই পাটনা অফিসের এরিয়া ম্যানেজারের কাছে হাজিরা দিতে হবে।

কার্তিকবাবু টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা পোস্টকার্ড বের করে আমার দিকে এগিয়ে ধরে বললেন— এক্ষুনি পিসীকে খবরটা জানিয়ে দাও। তিনি খুব খুশী হবেন।

আপনি পোস্টকার্ড রেখে দিন। আমি এখনই পোস্ট অফিসে যাচ্ছি।

পোস্ট অফিসে গিয়ে শুধু পিসীকে নয় দিদি আর দেবীকেও চাকরি পাবার খবর জানিয়ে দিলাম। তিনটে চিঠি ডাক বাকসে ফেলে রাস্তায় পা দিতেই মনে হল আমি যেন হাওয়ায় উড়ছি। সেই ভোরবেলায় দুখানা টোস্ট আর চা খেয়ে ছাত্রছাত্রী পড়াতে বেরিয়েছি আর এখন সওয়া বারোটা বাজে কিন্তু তবু মনে হচ্ছে না ক্ষিদে পেয়েছে। মনে হচ্ছে না আমি আর কারুর ব্যক্তিগত কৃপা চাইছি। মনে হচ্ছে আজ আমিও অন্য দশজনের একজন। রাস্তা পার হতে গিয়েই পান-সিগারেটের দোকানটা নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা টাকা বের করে পাঁচটা দামী সিগারেট কিনে একটা ধরালাম। ঐ দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই পর পর দু-চারটে টান দিয়ে আস্তে আস্তে মেসের দিকে পা বড়ালাম।

মেসে ফিরে এসেও সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম গেলাম না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ঐ চিঠিটা তিন-চারবার পড়লাম। তারপর আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিতেই হাসতে হাসতে নৃপতি ঘরে ঢুকল।

কিরে হাসছিস কেন?

নৃপতি হাসতে হাসতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করল আজ খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

ঘড়ি

ও

গ্যারান্টিসহ ঘড়ি মেরামত

রায় কাজিন এণ্ড কোং

জুয়েলার্স এণ্ড ওয়াচ মেকার্স

৪, বি, বি, ডি'বাগ, কলি-১

ওমেগা ও টিসট্ ঘড়ির

অফিসিয়াল এজেন্টস্

আজ সত্যি ক্ষিদে পাচ্ছে না।

অনেক বেলা হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে নিন।

এই সিগারেটটা খেয়েই উঠছি।

সত্যি সিগারেটটা খেয়েই উঠে পড়লাম। স্নান করলাম খেয়ে নিলাম। রোজ দুপুরে এই সময় খবরের কাগজ পড়তে পড়তে একটু ঘুমোই। আজ কিছুতেই ঘুম এলো না। একবার মনে হলো কাকাবাবুকে খবরটা দিয়ে আসি কিন্তু দুপুরে বোদ্দুরে কিছুতেই বেরুতে ইচ্ছা করল না। শুয়ে শুয়ে চাকরির কথাই ভাবছিলাম। পাটনা যাবার আগে গোটা দুই পাণ্ট-বুশ সার্ট তৈরী করতে হবে। বোধহয় একটা বড় সুটকেশও কিনতে হবে। বিছানার জন্য একটা হোল্ডলও কিনব। মনে মনে ঠিক করলাম সামনের মাসের এক তারিখ থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান বন্ধ করব। তারপর তিন-চার তারিখে কাশী চলে যাব। দিন দশেক ওখানে কাটিয়ে পাটনা। পাটনা থেকে মোগলসরাই বোধহয় তিন-চার ঘন্টার রাস্তা। মোগলসরাই থেকে ঘন্টা খানেকের মধ্যেই গোধূলিয়ার মোড়ে পৌঁছে যাব। দুদিন ছুটি পেলেই কাশী ছুটব।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা টের পাইনি। নৃপতি চা এনে যখন ডেকে দিল তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। বেরুতে ইচ্ছা করছিল না কিন্তু তবু বেরুতেই হলো। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম আর ত মাত্র চার-পাঁচ দিন। পটুয়া-টোলার হাতকে পড়িয়ে কল্পনার ওখানে পৌঁছতে একটু দেরীই হয়ে গেল। ঠিক করেছিলাম ওকে পড়াবার পর ওর মাকে পাটনা চলে যাবার খবর দেব কিন্তু তা হলো না। বারান্দা পার হয়ে পড়ার ঘরে ঢোকার পথেই আলপনা হাসতে হাসতে বললো—আপনার দেরী দেখে ভাবলাম বোধ-হয় বেনারস চলে গিয়েছেন।

না যাই নি তবে কদিন পরেই যাবো।

কবে যাচ্ছেন?

বোধহয় তিন-চার তারিখে।

কবে আবার ফিরবেন?

কলকাতা ফিরব না। ওখান থেকে পাটনা চলে যাবো।

পাটনা?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি পাটনায় চাকরি পেয়েছি।

তাই নাকি?

কল্পনা পাশেই দাঁড়িয়েছিল। ও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল মা প্রদীপদা পাটনায় চাকরি পেয়েছেন।

আমি কল্পনার গাল টিপে আদর করে বললাম—তোমার মাকে চিৎকার করে বলার মত চাকরি আমি পাই নি।

আলপনা বললো—আজকালকার দিনে চাকরি পাওয়াই বড় কথা।

আমি জবাব দেবার আগেই ওদের মা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন তুমি চাকরি পেয়েছ?

হ্যাঁ।

পাটনায়?

হ্যাঁ।

খুব ভাল চাকরি বুঝি?

আমি হেসে বললাম—আজকালকার দিনে মাইনে পেলে সব চাকরিই ভাল।

তবুও কলকাতা ছেড়ে যখন যাবে তখন নিশ্চয়ই...

আমি ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে বললাম—ন্যাশনাল কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিপো ম্যানেজারের কাজ পেয়েছি।

তাহলে ত নিশ্চয়ই পাঁচ-ছ'শ মাইনে হবে।

আমি একটু জোরে হেসে উঠে বললাম—ওর প্রায় অর্ধেক। এখন তিনশ' পঁচিশ পাবো।

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন—মোটে তিনশ পঁচিশ?

মোটে বলছেন কেন? ঐ টাকায় ত আমি রাজার হালে থাকব।

কিন্তু আজ বাদে কাল যখন বিয়ে করবে? দু-এক বছর পরে যখন একটি বাচ্চা..

আমি লজ্জায় মুখ নীচু করেই মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম— বিয়ে করব না।

এবার উনি হেসে বললেন—আজ না করলেও কাল ত বিয়ে করবে।

এবার আলপনা ওর মাকে বললো তুমি কি এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওর বিয়ে দেবে?

ওর মা বললেন—দ্যাখো প্রদীপ এই সামান্য মাইনের চাকরির জন্য তুমি কলকাতা ছেড়ে যেও না। তুমি যদি আমাদের বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্ম দেখাশুনা করো তাহলে আমিই তোমাকে এর চাইতে বেশী মাইনে দেব।

কথাটা শুনেই আমার সারা শরীর জ্বলে উঠল। খুব সংযত হয়ে শুধু বললাম—আমি ওদের চিঠি দিয়ে দিয়েছি।

সে না হয় আরেকটা চিঠি দিয়ে দেবে।

আলপনা হঠাৎ বলে উঠল তুমি কি ভেবেছ বলো ত মা! একজন এম-এ পাশ যুবক তোমার বাড়ীর গোমস্তার কাজ করবে?

ওর মা বেশ রাগ করেই বললেন—তুই চুপ কর। সব ব্যাপারে পাকামী করবি না।

আমি কল্পনাকে বললাম—পড়তে বসো। আমি আসছি। আমি এবার ওর মাকে বললাম—কল্পনার জন্য একজন নতুন মাষ্টার মশাই ঠিক করবেন। আমি পয়লা তারিখ থেকে আর আসতে পারব না।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা

সুশান্তকুমার মিত্র

যেটা আদৌ রবীন্দ্রনাথের লেখা নয় সেটাই ভুল করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। প্রখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক সমালোচক এমন কি স্বনামধন্য রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরাও এই একই ভুল করে আসছেন গত চার দশক ধরে। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই বিভ্রান্তির অঙ্কুরোদ্গম, আজ তা রবীন্দ্র সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত।

অথচ প্রকৃতপক্ষে যেটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা সেটি পুরনো ফাইলের পাতায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে!

আমার উদ্দেশ্য অতি সরল। রবীন্দ্র গদ্য গঙ্গোত্রীর কুয়াসাচ্ছন্ন আবহাওয়ার মধ্যে থেকে প্রকৃত ধারাটিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা এবং সেই পবিত্র ধারাস্পর্শে বন্দীবদ্ধ প্রকৃত সত্যকে মুক্তি দেওয়া। কিন্তু কাজটি সহজ নয়। কারণ মিথ্যা যেখানে রাজ-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তাকে এককথায় 'ললাটে বর্জনের টীকা' দেওয়া সহজসাধ্য নয়। আবার অবরুদ্ধ সত্যকে মুক্তি দিয়ে তাকে রবীন্দ্ররচনারূপে নিশ্চিত প্রমাণ করা এবং রবীন্দ্রগদ্য ধারার উৎসমুখ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা আরো কঠিন ব্যাপার।

রবীন্দ্র সাহিত্যে এমন অনেক গান বা কবিতা আছে যা রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি, অথচ সেগুলি রবীন্দ্ররচনাবলীর মধ্যে স্থান পেয়েছে সযত্নে, রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। সেগুলি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু আমার আলোচ্য বিষয়টিকে ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে ভুল করা হবে। কারণ যেটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে চলে আসছে সেই রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন রচনা বলে স্বীকৃতি দেননি। বরং তিনি যা বলতে চেয়েছেন সমালোচকেরা তা ভুল বুঝেছেন। এই ভুলের পথ ধরেই পরবর্তীকালের পণ্ডিত-সমালোচক-রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে গেছেন, মিথ্যাকে সত্যের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। একবারও পরখ করে দেখেননি। যাচাই করবার প্রয়োজন বোধ করেননি। করলে দেখতে পেতেন, প্রথম গদ্য রচনার ঐতিহাসিক নজির আজও বাস্তুচ্যুত হয়ে আছে।

মূল কথায় আসা যাক। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনামে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র' নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে চলে আসছে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি যে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেননি এবং স্বীকৃতি দেননি, তার স্বপক্ষে বহু প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে জ্যোতিষ-বিষয়ক আর রচনা যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের কিছুকাল পরে অনামে ছাপা হয়েছিল, সেটিই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা। নাম গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি। (*) এই প্রবন্ধ দুটির তুলনামূলক আলোচনা, প্রবন্ধ দুটির রচনা ও প্রকাশকালের সাল-তারিখের কার্য-কারণ, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রথম প্রবন্ধ আবিষ্কর্তার মন্তব্য, পুরনো তত্ত্ববোধিনীর ফাইল বাস্তব কারণ ইত্যাদি বিষয় যাচাই করে দেখলে বোঝা যাবে মিথ্যা কীভাবে সত্যকে বঞ্চিত করেছে এবং এতকাল বিভ্রান্ত হয়েছেন রবীন্দ্র-গবেষক ও পাঠকবর্গ।

কিন্তু সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার আগে কীভাবে সমস্যাটির উদ্ভব হল, কীভাবে ভুল তথ্য পরিবেশন করে রবীন্দ্রনাথকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, কীভাবে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও মন্তব্যকে খেয়ালখুসি মত ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পরবর্তীকালের সমালোচক-পণ্ডিত-রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞরা তার শিকার হয়েছেন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের রচনা প্রকাশ অধ্যায়ে প্রথম গদ্য রচনার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন—

> প্রথম যে গদ্য প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। তাহা গ্রন্থ-সমালোচনা। ভুবনমোহিনীপ্রতিভা দুঃখ-সঙ্গিনী ও অবসর সরোজিনী বই তিনখানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাঙ্কুরে এক সমালোচনা লিখিলাম" (৭৪—৭৫ পাতা)।

প্রকাশিত এই রচনাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম গদ্য রচনা বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃত-পক্ষে এটি তাঁর প্রথম গদ্য রচনা নয়, সেকথা তিনি ঐ জীবনস্মৃতিরই হিমালয় যাত্রা অধ্যায়ে স্বীকার করেছেন।—

> তিনি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) প্রক্টরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন; আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।"

সুতরাং জ্যোতিষবিষয়ক প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, দ্বিমত নেই।

জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধটির কথা জীবন-স্মৃতিরও পূর্বে বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছিল। এই গ্রন্থের সম্পাদক হরিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

> এই সময় পিতা দেবেন্দ্রনাথ, পুত্র রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্র-নাথ প্রক্টরের রচিত সহজ পাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষ গ্রন্থের সহজ অংশ-গুলি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাঁহার বাঙ্গালা গদ্য রচনার সূত্রপাত" (৯৮৫ পাতা)।

আপন জীবনবৃত্তান্তের এই উপকরণ জুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। সুতরাং বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের সম্পাদকের এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের পরোক্ষ উক্তি বলে ধরা যেতে পারে। আবার জীবনের অন্তিমপর্বে রচিত বিশ্ব পরিচয় গ্রন্থের ভূমিকাতেও (উৎসর্গপত্রে) রবীন্দ্রনাথ এই জ্যোতিষ প্রবন্ধের কথা বলেছেন—

> বয়স যখন হয়তো বারো হবে, পিতৃ-দেবের সঙ্গে গিয়েছিলুম ডালহৌসি পাহাড়ে। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন, গ্রহ চিনিয়ে দিতেন।.. তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা বড়ো প্রবন্ধ লিখেছি।"

সুতরাং বঙ্গভাষার লেখক (১৯০৪), জীবন-স্মৃতি (১৯১১—১২) ও বিশ্বপরিচয় (১৯৩৭) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নিজেই দ্বিধা-হীনভাবে স্বীকার করে গেছেন জ্যোতিষ বিষয়ে রচিত প্রবন্ধই তাঁর প্রথম গদ্য রচনা। বলাবাহুল্য এ সম্পর্কে সমালোচকদের মধ্যেও দ্বিমত নেই।

দ্বিমত নেই রচনাটি তত্ত্ববোধিনী

(*) জীবনস্মৃতির তথ্যপঞ্জীতে এই প্রবন্ধটির নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু সম্ভবত জীবনস্মৃতির সম্পাদকও এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত হতে পারেননি। তাই প্রবন্ধ নামের সঙ্গে একটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি পরে আলোচনা করছি।

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া সম্পর্কেও। রবীন্দ্রনাথ লিখিতভাবে স্বীকার করে গেছেন, রচনাটি সে যুগের তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা হচ্ছে জ্যোতিষ বিষয়ক, এবং তা প্রকাশিত হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ থেকে আধুনিক সমালোচক-গবেষক পর্যন্ত কারোর মনেই কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সন্দেহ নেই।

কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কোন রচনাটি রবীন্দ্রনাথের সেটাই আমার প্রশ্ন। তত্ত্ববোধিনীতে যে জ্যোতিষ বিষয়ে অতি অল্পকালের ব্যবধানে দুটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে অধিকাংশ সমালোচকেরাই আজও উদাসীন। তাঁদের ভ্রান্ত বিশ্বাসের আদি পথ-প্রদর্শক ছিলেন সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনার জট ছাড়াতে গিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশন করে সমস্যাটিকে অত্যন্ত জটিল করে ফেলেছেন।

ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ জীবিত। সজনীবাবু ও ব্রজেন-বাবু রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছেন। শনিবারের চিঠিতে লিখছেন—

> দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় লিখিত রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম রচনার কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার ধারণা, ঐ প্রবন্ধ সেই সময়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সময়ের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ঘাঁটিয়া দেখিতেছি, ১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' নামক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ নাই।...সুতরাং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে এই সুবৃহৎ প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথ-লিখিত প্রথম গদ্য প্রবন্ধ" (কার্তিক ১৩৪৬ সন—অকটোবর ১৯৩৯ পাতা ১৪৭—৪৮)।

রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসের সন্ধান পেয়ে সজনীবাবু তত্ত্ববোধিনী থেকে যা আবিষ্কার করলেন এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে যা চিহ্নিত করলেন তা শুধু মারাত্মক ভুলই নয়, বিভ্রান্তিকর। কারণ সজনীবাবু ভাল করে অনুসন্ধান না করেই রবীন্দ্রনাথকে বললেন ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধ ছাড়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম নয় কল্পে জ্যোতিষ বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ নাই।"

তত্ত্ববোধিনীর নয় কল্প পর্যন্তও যাবার প্রয়োজন নেই। ৮ কল্প ৩ ভাগে বেরিয়েছিল ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র, আর ৮ কল্প ৪ ভাগে গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি নামে জ্যোতিষ বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ। সেটিই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা। কিন্তু সজনীবাবু বা ব্রজেনবাবু সেটি খুঁজে পাননি। মাসিক তত্ত্ববোধিনীর মাত্র ঐ কটি পাতা ভাল করে দেখেননি বলেই খুঁজে পাননি এবং সেই অসাবধানতার পরিণাম-স্বরূপ আজ রবীন্দ্রসাহিত্যের সূচনাপর্বে এক বিরাট বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে এবং রবীন্দ্রসাহিত্যের বিদগ্ধ গ্রন্থগুলিতে মিথ্যার জট বটের ঝুরির মতই আজ ব্যাপক হয়েছে। দ্বিতীয়ত '১৭৯৫ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে"—এ কথার মধ্যেও তথ্যগত ভুল আছে। প্রবন্ধটি 'জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে পরবর্তী ছয় সংখ্যায়" নয়, পাঁচটি সংখ্যায় এবং তা পরপর নয়, আট মাসের মধ্যে পাঁচটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল। (জ্যৈষ্ঠের পর আষাঢ় আশ্বিন কার্তিক পৌষ ও মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়)।

যাই হোক শনিবারের চিঠির এই ভুল তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেই হোক অথবা রবীন্দ্রনাথকে লেখা স্বতন্ত্র কোন চিঠির উত্তরেই হোক, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই সজনীকান্ত দাসকে এ সম্পর্কে তাঁর মতামত লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন ১৫ অকটোবর ১৯৩৯ সালের এক পত্রে। কিন্তু সে চিঠি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে ছাপা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার দু মাস পরে শনি-বারের চিঠির এক প্রবন্ধে (কার্তিক ১৩৪৮ সন—অকটোবর ১৯৪১, পাতা ১৩—১৪) রবীন্দ্রনাথের সেই চিঠি ছাপিয়ে সিদ্ধান্ত টানা হয়, এটি নিঃসংশয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে এই জাতীয় বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হত অঙ্কুরেই। হয়তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার প্রতিবাদ করতেন অথবা কেউ না কেউ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর যে দাবী সজনীবাবু তুলেছেন তার সত্যাসত্য নির্ণয় করবার জন্যে তেমন-ভাবে কেউই এগিয়ে এলেন না।

সবচেয়ে রহস্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনাকে কেন্দ্র করে সজনীবাবুর লেখা দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল দু বছরের ব্যবধানে। প্রথমটি রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে কার্তিক ১৩৪৬ সনে এবং দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু মাস পর কার্তিক ১৩৪৮ সনে। দুটি প্রবন্ধের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে সজনী-বাবু লিখেছিলেন, ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের রচনা কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সজনীবাবুর ভাষায় বলি—'প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহা ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোন বিচক্ষণ লোকের লেখা বলিয়া বোধ হয়।' সজনীবাবু সিদ্ধান্ত টানলেন—'এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না" (১৪৮ পাতা)। অথচ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেই সজনীবাবু দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দু'বছর আগে লেখা পুরনো চিঠি ছাপিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত টানলেন—'আমাদের মনে হয় ইহার পর আর কাহারও মনে এ বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না" (১৯৭ পাতা)।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, সেই চিঠির মধ্যে কোথাও রবীন্দ্রনাথ একবারও বলেননি যে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁর রচনা। সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের পত্রের মনগড়া সিদ্ধান্ত টেনেছেন। সন্দেহ নিরসনের জন্যে সজনী-বাবু রবীন্দ্রনাথের চিঠির যেটুকু অংশ (শেষাংশ) উদ্ধৃত করেছেন তা তুলে দিচ্ছি।—

> পিতৃদেবের মুখ থেকে জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম সেটা তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে এই অদ্ভুত ধারণা আজ পর্যন্ত আমার মনে ছিল। এর দুটো কারণ থাকতে পারে। এক এই যে, সম্পাদক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ছাপানো হবে বলে বালককে আশ্বাস দিয়েছিলেন, বালক শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করেনি। আর একটা কারণ এই হতে পারে যে, অন্য কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন। শেষোক্ত কারণটি সঙ্গত বলে মনে হয়। এই উপায়ে আমার মন তৃপ্ত হয়েছিল এবং কোনো লেখকেরই নাম না থাকাতে এতে কোন অন্যায় করা হয়নি। এ না হলে এমন দৃঢ়বদ্ধমূল সংস্কার আমার মনে থাকতে পারত না। ইতি ১৫-১০-৩৯

এই চিঠির অংশ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটিকে তাঁর রচনা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন? বরং 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের কথা জানবার পরও তিনি সুস্পষ্ট-ভাবে একথাই বলেছেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁর জ্যোতিষ বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়ে-ছিলেন। চিঠির এই অংশটুকুর মধ্যে 'হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে'র ব্যঞ্জনার সুর সুস্পষ্ট। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি ছাড়া জ্যোতিষ বিষয়ে অন্য কোন প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়নি, সজনী-বাবুর এই বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনের পরও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এতটুকু বিচ্যুত হননি।

॥ 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি আদৌ রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়॥

এই প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গদ্য রচনা তো দূরের কথা, প্রবন্ধটি যে আদৌ বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় তার সপক্ষে বহু প্রমাণ আছে।

১। রবীন্দ্রনাথের পত্র থেকে প্রমাণ :

(ক) সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকা-শিত 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি

তাঁর রচনা কিনা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ এক বারও বলেন নি এটি তাঁর রচনা।

(খ) প্রকৃত সত্য রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপটে সুস্পষ্ট ছিল। তবে দীর্ঘকালের ব্যবধানে হয়তো তা কিছুটা ম্লান হয়েছিল। প্রথম হিমালয় ভ্রমণ, জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা ও তত্ত্ববোধিনীতে তার প্রকাশের স্মৃতি বিস্মৃত হবার নয়। রবীন্দ্রনাথও বিস্মৃত হননি। তিনি বারবার বলেছেন— আলোচ্য পত্রেও বলছেন 'সেটা তখনকার কালের তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছে।' ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধটি তিনি নিশ্চয়ই পড়বার সুযোগ পাননি। তাঁর চিঠির বক্তব্য ও লেখবার ভঙ্গি দেখে তাই মনে হয়। পড়লে এ লেখাকে তিনি নাবচ করতেন, কারণ, এতে প্রকটরের 'প'-টুকুও নেই। সম্ভবত তিনি নামটুকু দেখে ও বক্তব্যটুকু শুনে স্মরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৭৪ সালে 'গ্রহগণ জীবের আবাসভূমি' নামে অন্য যে প্রবন্ধটি তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হয়েছিল, ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ ৬৫ বছর পর তাঁকে প্রশ্ন করা হলে সেই রচনাটির কথা তিনি ঠিক স্মরণে আনতে পারেননি। তার ওপর সজনীবাবুর ভুল তথ্যে কিছুটা বিভ্রান্ত রবীন্দ্রনাথ। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা অনেকটা 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে।' অথচ প্রকৃত সত্যের স্মরণীয় স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনে বিস্মৃতির মর্মে বসে তাঁর রক্তে দিয়েছে দোলা। তাই রবীন্দ্রনাথের পত্রের উদ্ধৃত অংশের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বজড়িত আর এক রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট। সেখানে সজনীবাবুর প্রশ্নের সঠিক জবাব নেই। মূল প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে মনের দৃঢ় বদ্ধমূল বিশ্বাসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রবণতা আছে। অনেকটা যেন 'পরশ তারে যাস্ না করা, সকল দেহে দিলেম ধরা'র মনোভাব। সুতরাং আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্র-মানসিকতার দিক থেকেও ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবন্ধকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দেননি।

(গ) আলোচ্য পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— জ্যোতিষের যে বিদ্যাটুকু সংগ্রহ করে নিজের ভাষায় লিখে নিয়েছিলুম...। পত্রের এই অংশটুকু বিচার বিশ্লেষণ করলে মূল্যবান দুটি তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—(১) যে বালকের বারো বছরও পূর্ণ হয়নি সেই অপরিণত বালক জ্যোতিষের কতটুকু বিদ্যা সংগ্রহ করতে পারে এবং (২) এই বয়সে গদ্যের হাতেখড়ির যুগে বালকের নিজের ভাষা কী হতে পারে।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, সাহিত্য বা বিজ্ঞানের যে কোন শাখারই জ্ঞান ও বিদ্যাকে গভীরভাবে আয়ত্ত ও আত্মসাৎ করবার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের অতি ছেলেবেলা থেকেই। জীবনস্মৃতিতে একথার যথেষ্ট সমর্থন আছে। হিমালয় ভ্রমণকালে জ্যোতিষবিদ্যা আয়ত্ত করে রবীন্দ্রনাথ যে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন সজনীবাবুকে লেখা মহর্ষির ২৭ জুন ১৮৭৩ তারিখের পত্র থেকে তা জানা যায়। বারো বছর বয়সে গ্রহ-নক্ষত্র মহাকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যশাস্ত্রের ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিক দিক বিজ্ঞান ও গণিতে অতি সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধকে যাঁরা এতকাল বারো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা বলে এসেছেন তাঁরা হয় প্রবন্ধটি পড়েন নি অথবা সম্ভাব্যতার এই দিকটি একবারও তলিয়ে দেখেন নি।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধটির মধ্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ও উন্নত গদ্যরীতির পরিচয় আছে। এই অগাধ পাণ্ডিত্যের একটু নমুনা দিচ্ছি। এই নমুনা দেখলে সাধারণ পাঠকেরাও বুঝতে পারবেন ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র কখনো কোনো অবস্থাতেই বারো বছরের বালকের রচনা হতে পারে না।

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় : এই প্রবন্ধের জ্যেষ্ঠ সংখ্যায় আছে—প্রাচীনকালের জ্যোতিষশাস্ত্র তার ধর্ম-দর্শন-অধ্যাত্মিক দিক পাদটীকায় বেদ-বেদাঙ্গের নির্দেশ গণিতের সিদ্ধান্ত। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ও ভারতীয় মতে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনত্ব। কাসিনি বেলি লেলফেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত নাপ্লাস ও ডি ল্যাম্বার প্রভৃতি বিখ্যাত জ্যোতির্বিদদের মত বেন্টলি সাহেবের আর্যদের পক্ষে মত ঐতিহাসিক এলফিনিষ্টোনের মত গ্রীসের পূর্বেই ভারতে জ্যোতিষ চর্চার শুরু ইত্যাদি বিষয়। আষাঢ় সংখ্যায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষশাস্ত্রের সঠিক জন্মলগ্ন ও বিকাশ ইত্যাদি আলোচনা। আশ্বিন সংখ্যায় কোলব্রুক সাহেবের মত আরবী গ্রন্থ আয়ুনুল অম্বা কি তবকাতুল অম্বা'-তে এ দেশীয় পণ্ডিতদের মতামতের উল্লেখ ভাস্করাচার্যের মত সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতি দুর্বোধ্য বিষয়কে সর্বসাধারণের বোধগম্য করাবেন বলে লেখক ভাস্কবাচার্যকৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থের অনুবাদ এবং পরে সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের অনুবাদের সাহায্য গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পাদটীকায় লেখা হয়েছে— বারাণসী সংস্কৃত কলেজের বর্তমান গণিতাধ্যাপক সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাপুদের শাস্ত্রী ও ভূতপূর্ব ইউরোপীয় পণ্ডিত লানসিনট উইলকিনসন সাহেব একত্রে গোলাধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ ও টীকা করেছেন। এই টীকা আমাদের প্রধান অবলম্বন। কার্তিক সংখ্যায় ভাস্কবাচার্যের মত ও পৌরাণিক মত ২১ থেকে ৪৩ সংখ্যক শ্লোকের জল ও স্থলের বিভাগ আলোচনা ইত্যাদি। পৌষ সংখ্যায় অর্ধগোলাকার বৃত্তের ছবি এঁকে ও অঙ্ক কষে জটিল বিষয়কে বোঝাবার প্রচেষ্টা। মাঘ সংখ্যায় সূর্য সিদ্ধান্ত গ্রন্থের আলোচনা। এই সংখ্যায় প্রবন্ধের শেষে 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' থাকলেও প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

যদি ধরিনি এই প্রবন্ধ বালক রবীন্দ্রনাথ হিমালয় ভ্রমণকালে বক্রোটাশিখরে রচনা করেছিলেন তবে রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন বারো বছরও পূর্ণ হয় নি। কোন্ দেশে কোন্ কালে বারো বছরের বালকের পক্ষে এ জাতীয় জটিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুর্বোধ্য বিষয়কে আয়ত্ত করে সহজ করে লেখবার নজির আছে জানি না। প্রতিভা যতই থাকুক না কেন জ্ঞান বুদ্ধি পাণ্ডিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে বয়সের কিছুটা সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

কিন্তু যখন দেখি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী প্রথম খণ্ডের ৪২ পাতায় এই রচনাটিকে বারো বছরের রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে আলোচনা করেন যখন দেখি ডঃ অমিয়-কুমার মজুমদারের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-সম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' গ্রন্থের পাঁচের পাতায় বিশেষত শেষাংশের 'পরিশিষ্টে' 'রবীন্দ্রনাথ রচিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী'র তালিকার মধ্যে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রবন্ধকেই সুস্পষ্টভাবে বালক রবীন্দ্রনাথের রচনা বলেন তখন আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই।

অথচ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন—'সম্প্রতি প্রকটরের গ্রন্থ হইতে গ্রহ-তারা সম্বন্ধে অল্প যে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম...' (প্রত্যাবর্তন ৫৮ পাতা)। তাহলে কি রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের বিবেচনায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র' প্রবন্ধে 'অল্প একটু জ্ঞানলাভে'র পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে?

—এতক্ষণ রবীন্দ্র-পত্রের যে লেখাংশটুকু সজনীবাবু শনিবারের চিঠিতে ছাপিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছি ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র রবীন্দ্রনাথের রচনা নয়। এবার ঐ চিঠিরই যে প্রথমাংশটুকু সজনীবাবু ছাপান নি সেটুকু উদ্ধৃত করে দেখাচ্ছি সেখানেও আমার এই সিদ্ধান্তেরই পূর্ণ সমর্থন মিলবে আরো সুস্পষ্ট জোরালোভাবে। কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধ সম্পর্কে সজনীবাবু জানতে চাইলেন সেগুলি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন কিনা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তুমি আমাকে মুস্কিলে ফেললে। তোমার পঞ্জীতে যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করেছ তার অধিকাংশ মনে আনতে পারছি নে। অর্থাৎ এদের পক্ষে বা বিপক্ষে হলফ পড়ে সাক্ষ্য দেবার মত স্পষ্ট ধারণা আমার নেই। অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পঞ্জীতে এদের যদি স্থান দেও উচ্ছেদ করবার মতো জোর আমার নেই। বাল্য-লীলায় এ রকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

এর ঠিক পরবর্তী অংশে লর্ড লিটনের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে রচিত কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং কাসিস্ব 'রাণী ও সান্ত্বনা প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলেছেন

কিছু মনে নেই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র তাঁর রচনা কিনা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কখন কোথায় কোন অবস্থাতে জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন তা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র' তাঁর রচনা একথা তিনি কখনো বলেন নি।

তবে এই চিঠির একটি লাইন—'অতএব তোমাদের তরফ থেকে আমার পক্ষীতে এদের যদি স্থান দেও উচ্ছেদ করবার মতো জোর আমার নেই'—একথাকে রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞরা যদি রবীন্দ্র স্বীকৃতির ছাড়পত্র বলে মনে করেন তবে তাঁদের দৃষ্টি পরের লাইনটিতে পড়বে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— 'বাল্য-লীলায় এ রকম প্রলাপোক্তিকে স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিতে হবে।' 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের' বক্তব্য কি 'বাল্য-লীলার' 'প্রলাপোক্তি'? সুতরাং রবীন্দ্র পঞ্জীতে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র কখনই স্থান পেতে পারে না।

২। আবিষ্কর্তার মনেই সন্দেহ :

ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রকে রবীন্দ্র বাল্য রচনারূপে যিনি আবিষ্কার করেছিলেন সেই সজনীবাবুর মনেই ছিল দ্বিধাবদ্ধ সন্দেহ। যে প্রবন্ধে সজনীবাবু ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধকে রবীন্দ্র রচনা বলেছেন ঠিক সেই প্রবন্ধেই তিনি এ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। এই মন্তব্য-গুলিই তার প্রমাণ—(১) 'এই প্রবন্ধ রচনায় রবীন্দ্রনাথের কোন হাত থাকিলে..'। (২) 'প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার মনে হইয়াছিল উহা ভারতীয় জ্যোতিষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কোনও বিচক্ষণ লোকের লেখা।' (৩) 'আমি প্রবন্ধটি সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি নাই।' (৪) পূর্বের প্রবন্ধেও সজনীবাবু বলেছিলেন— 'এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ নহি বলিয়া নমুনা দিলাম না।' সুতরাং সন্দেহের মধ্যেই যে ভূত ছিল একথা রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিতদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

৩। 'ভারতবর্ষীয় ...জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধে প্রকটরের প্রভাব নেই :

রবীন্দ্রনাথ প্রকটরের বই অবলম্বনে জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জীবনস্মৃতির ৫১ পাতায় আছে—'তিনি (মহর্ষি) প্রকটরের লিখিত সরল পাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে অনেক বিষয় মুখে মুখে আমাকে বুঝাইয়া দিতেন, আমি তাহা বাংলায় লিখিতাম।' কিন্তু ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধে প্রকটরের প্রভাব তো দূরের কথা এই প্রবন্ধ রচনার পূর্বে প্রকাশিত প্রকটরের যাবতীয় গ্রন্থের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে কোন মিলই নেই।

৪। বিষয়বস্তুর বিচারে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' রবীন্দ্র রচনা নয় :

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পিতার কাছে প্রকটরের গ্রন্থ থেকে গ্রহ-তারা সম্পর্কে তিনি জ্ঞানলাভ করে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র' প্রবন্ধে গ্রহ-তারা সম্পর্কে কোন আলোচনাই নেই। প্রবন্ধের এক জায়গায় বলা হয়েছে : জ্যোতিষ 'দু' প্রকারের—(১) প্রাকৃত জ্যোতিষ অর্থাৎ গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র তাদের গতি পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয়। এবং (২) সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ অর্থাৎ পূর্বকালে প্রাচীন ভারতের সূর্যসিদ্ধান্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রভৃতি অষ্টাদশ খন্ডের বর্ণিত আলোচ্য বিষয়গুলি। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি কেবল শেষোক্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত। কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের জ্যোতিষ প্রবন্ধ প্রথমোক্ত বিষয় কেন্দ্রিক। তাহলে বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধটি কোনো মতেই রবীন্দ্রনাথের রচনা হতে পারে না।

৫। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধে কাঁচা হাতের ছাপ নেই :

রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছিলেন—'তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছি।' সজনীবাবুকে লেখা চিঠিতেও বলেছিলেন 'কোন যোগ্য লেখক সেটাকে প্রকাশযোগ্যরূপে পূরণ করে দিয়েছিলেন।' কিন্তু ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধের মধ্যে কাঁচা হাতের ছাপ নেই, আছে পাকা হাত ও পাকা মনের ছাপ। অথচ ডঃ অমিয়কুমার মজুমদার তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস' গ্রন্থের পাঁচের পাতায় বিশ্ব পরিচয়ের উপরিউক্ত অংশটি উদ্ধৃত করেও 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধকেই বালক রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। আর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী' প্রথম খন্ডের ৪২ পাতার চার নম্বর পাদটীকায় বলেছেন—'জ্যোতিষ সম্বন্ধে এই বালকোচিত রচনা..'। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবু অমিয়বাবু প্রমুখ ব্যক্তিদের সজনীবাবুর পরিবেশিত তথ্যের ওপর নির্ভর না করে আলোচ্য প্রবন্ধটি পড়ে তাঁদের মূল্যবান মতামত জানাতে অনুরোধ করি।

৬। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের গদ্য রচনারীতি ও চিন্তাভাবনা রবীন্দ্রানুসারী নয়। সমগ্র প্রবন্ধটির মধ্যে রবীন্দ্র-সুলভ কবি কল্পনার স্পর্শ মাত্র নেই :

আমার এইসব যুক্তি তথ্যের পরেও যদি কারোর মনে এখনও সন্দেহের বিন্দুমাত্র কণা থেকে থাকে তবে তাঁদের প্রতি নিবেদন—

৭। 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল আগে রচনা করা হয়েছিল তার পরে (!!)

সাল-তারিখ মিলিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটা ঠিক তাই দাঁড়াচ্ছে। হিমালয়ের বক্রোটা শিখরে বসে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। রচনার দিনক্ষণ মহর্ষির লেখা পত্র থেকে পাওয়া যাবে। ১৪ বৈশাখ ১৭৯৫ শকাব্দে মহর্ষি রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখেছেন 'বক্রোটাশিখরে আসিয়া পহুঁছিয়াছি (দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী—৭৬)। বক্রোটায় রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন এবং এখানেই গদ্য রচনার হাতে খড়ি হয়। মহর্ষির পত্রাবলী (৭৭) থেকে জানা যায় ১৪ আষাঢ় ১৭৯৫ শকের আগেই রবীন্দ্রনাথ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাহলে জ্যোতিষ প্রবন্ধের রচনাকাল দাঁড়াচ্ছে ১৪ বৈশাখের পর থেকে ১৪ আষাঢ় ১৭৯৫ শকাব্দের মধ্যবর্তী কোন এক সময়।

কিন্তু ইতিমধ্যে কলকাতায়-১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৫ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে। তাহলে অঙ্কের হিসেবে বক্রোটা শিখরে পৌঁছনোর আঠারো দিনের মাথায় ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। তাহলে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিষ পাঠ নিলেনই বা কবে; সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেনই বা কবে; কলকাতায় লেখা পাঠালেনই বা কিভাবে; আর তত্ত্ববোধিনীতে তা ছাপা হলই বা কি করে? সুতরাং সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধ রবীন্দ্র-নাথের রচনা হতে পারে না।

৮। সে যুগের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও বাদ যাবে 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধের বিপক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন— 'বক্রোটা আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিল। যদিও তখন বৈশাখ মাস কিন্তু শীত অত্যন্ত প্রবল।... সেখানে তখনও বরফ গলে নাই' (জীবন স্মৃতি ৫২ পাতা)। ৭৮১৯ ফুট উঁচু বক্রোটা। সেখানে চারদিকে বরফ জমে আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় সেখান থেকে ডাকযোগে লেখা পাঠালে তত্ত্ববোধিনীর দপ্তরে তা আসতে সময় লাগতো এক মাসেরও বেশি। এ ক্ষেত্রে কতদিন লাগবে তা সহজেই অনুমেয়। অথবা এই অবস্থায় আদৌ ডাক যেত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ। তাছাড়া সে যুগে (১৮৭৩ সালে) বিমান ছিল না, ডাক ব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত। সুতরাং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশকালের সঙ্গে রচনাকালের কোনো সামঞ্জস্যই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার ওপর আছে তত্ত্ববোধিনীর কমিটির অনুমোদন মুদ্রণ ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট সময়। আবার অপর দিক থেকে বলা যায় ভোর চারটে থেকে উঠে যাঁকে সংস্কৃত উপক্রমণিকা ঋজু পাঠ বেনজামিন ফ্রাংকলিনের জীবন বৃত্তান্ত ইত্যাদি থেকে শিক্ষালাভ করতে হত তাঁর পক্ষে রাতারাতি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখবার সময় কোথায়?

সুতরাং সব মিলিয়ে বিচার করলে ব্যাপারটা ঠিক রাম না-হতে বামায়ণের মতোই দাঁড়াচ্ছে। অর্থাৎ প্রকাশকাল আগে রচনাকাল পরে। সুতরাং 'ভারতবর্ষীয় জ্যোতিষশাস্ত্র' প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় আশা করি এর পর আর কেউ দ্বিমত করবেন না।

(পরের সংখ্যায় শেষ হবে)

(আগামী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত প্রথম গদ্য রচনা ও তার স্বপক্ষে প্রমাণসহ আলোচনা থাকবে।)

মনের অসুখ

(সাত)

—না ডাক্তারবাবু, আমি যাব না, আপনার এখানে থাকব, আপনি আমায় বাবার মত—আমাকে যেতে বলবেন না।

—আহা, তোমাকে তো শ্বশুরবাড়ী যেতে হচ্ছে না, মাসীমার কাছে থাকবে, ভয় কি?

—না ডাক্তারবাবু, আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না, আমি এখেনে থাকব। আপনার মেয়ের সঙ্গে শোবো, আমি আপনার সব কথা শুনব—আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

আমার হাত ধরে প্রায় ঝুলে পড়ল মেয়েটি। বড় বড় চোখ দুটো তুলে আমার দিকে ভয়ার্ত শিশুর মত তাকিয়ে আমার কাছে আশ্রয় চাইল সাতাশ বছরের মেয়ে অনীতা।

অতি কষ্টে, অনেক বুঝিয়ে-শুঝিয়ে সেদিনকার মত মাসীমার সঙ্গে বাড়ী পাঠালাম। মেসোমশাইকে থাকতে বললাম আলোচনার জন্য।

ওরা বেরিয়ে যেতে মেসোমশাই সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। বকম-সকম দেখে ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন: সারবে তো ডাক্তারবাবু?

—সারবে বলেই তো মনে হয়। আচ্ছা একবার গোড়া থেকে ব্যাপারটা বলুন তো! কতদিন বিয়ে হয়েছে? ঠিক কবে শ্বশুর-বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে?

মনে মনে হিসেব করে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ঠিক ছত্রিশ দিন হল বিয়ে হয়েছে। ফুলশয্যার পর আসতে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন লাগল ওরা লোক কেমন, বরকে পছন্দ হয়েছে কিনা—যেমন সবাই করে। তখন অপছন্দ হয়েছে একবারও বলেনি। তারপর কিছুদিন আমাদের কাছ থেকে বরের সঙ্গে চলে গেল তাদের বাড়ী। যাবার সময় নাকি খুবই কান্নাকাটি করেছিল, তা সে তো সব মেয়েই করে থাকে। আমাদের কোনো সময়েই মনে হয়নি যে, ও তিনদিনের মধ্যে শ্বশুরবাড়ী থেকে একলা পালিয়ে আসবে। এসে অবধি ঐ অবস্থা। কোনো সময় কবিতা বলছে কোনো সময় নাটক করছে কোনো সময় ছড়া কাটছে। ওর মাসী তো কেঁদেকেটে অস্থির। দিনরাত খালি কথা বলছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই। পাড়ার ডাক্তার এসে ইঞ্জেকশন দিলেন ঘন্টা দুয়েক ঘুমুল। পরের দিন মানে গতকালও ঐ অবস্থা। একদণ্ড এক জায়গায় দাঁড়াবে না, বসবে না। খালি পায়চারী আর বকবক। ভাল কথা বলে দেখলাম, ধমকধামক দিয়ে দেখলাম—কিছুতেই থামানো গেল না। কাল রাতে ইঞ্জেকশন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। সেই ঘন্টা দুয়েক মাত্র বিছানায় শুয়েছিল। নিজে তো ঘুমুবেই না, ওর মাসীকেও ঘুমুতে দেবে না। আমিও দু-রাত জেগে কাটিয়েছি।

—তাহলে তিনদিন আগে শ্বশুরবাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে। ওর শ্বশুরবাড়ী থেকে খোঁজখবর করছে না?

—সেইদিনই ওরা ফোন করে জানতে পারে—আমার কাছে এসেছে। ওদের ওখেনে থাকতে পাগলামি করেছে বলে মনে হল না। ওদের বলে এসেছে যে, মেসো-মশায়ের, মানে আমার ব্যাঙ্কে গিয়ে এক-বার দেখা করে চলে আসবে। কাল ওর স্বামী এসে ওর অবস্থা দেখে অবাক। নিয়ে গিয়ে ওদের চেনা ডাক্তার দেখাতে চাইল, আমার স্ত্রী রাজী হলেন না।

—সম্বন্ধ করে বিয়ে, তাই না? সম্বন্ধটা কে এনেছিল?

—আমার ব্যাঙ্কের এক সহকর্মী। তিনি ওদের অনেকদিন ধরেই চেনেন, একই গ্রামের বাসিন্দা। আমিও ছেলে দেখেছি, ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার বেশ ভালই লেগেছে। আমাদের ব্যাঙ্ক থেকেই টাকা নিয়ে একটা প্রেস করেছে, ভালই চলছে। বড় ভাই বাইরে থাকেন। মা আর ছেলে নিয়ে সংসার। অনীতা সুখেই থাকবে ভেবেছিলাম।

—আপনারাই ওকে মানুষ করেছেন? বাবা-মায়ের মৃত্যু হয়েছে কতদিন?

—ওর তখন তিন বছর বয়স। দুর্ঘটনায় একসঙ্গে দুজনের মৃত্যু হয়। ওদের ট্যাক্সির সঙ্গে একটা বাসের ধাক্কা লেগে ট্যাক্সিটা গুঁড়িয়ে যায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওঁরা মারা যান। আশ্চর্যভাবে অনীতা বেঁচে যায়। সেই থেকে আমাদের কাছেই মানুষ। আমাদের মেয়ে নেই, ওই আমাদের মেয়ে। বছর পাঁচেক আগে প্রাইভেটে বাংলায় এম-এ পাশ করেছে, সেই থেকে আমরা বিয়ের চেষ্টা করছি। এতদিনে যদিওবা বিয়ে দিতে পারলাম, কিন্তু ওকে সুখী করতে পারলাম না।

—আপনি ঠিক জানেন—ওর আগে কোনোদিন এই ধরনের অসুখ হয়নি?

—আপনার কাছে গোপন করতে যাব কেন? ওদের মাতৃকুল-পিতৃকুলেও কারুর মনের রোগের কোনো ইতিহাস নেই। তিন বছর থেকে আমরা মানুষ করছি, আমরা ঠিকই জানি, কস্মিনকালেও ওর এরম অসুখ হয়নি। আপনি কি বুঝলেন? সারবে তো? শ্বশুরবাড়ী পাঠানো যাবে তো?

—এখনও বিশেষ কিছু বুঝিনি। ওর এখন যা অবস্থা তাতে ওর কাছ থেকে কোনো কিছু জানা যাবে না। ওষুধগুলো ঠিকমত খাইয়ে যান, দিন সাতেক পরে নিয়ে আসবেন।

সাতদিন পরে অনীতাকে একটু শান্ত মনে হল। চোখ দুটোতে তখনও কিন্তু ভয়ার্ত ভাব।

—একদম ঘুম হচ্ছে না। ওরা নিতে এসেছিল, আমি যাইনি। আপনার কাছে আমাকে থাকতে দিন ডাক্তারবাবু—নিচু হয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরতে চাইল।

কোনোক্রমে শান্ত করে একথা-সেকথার পর ওর মুখ থেকে যা শুনলাম, তার সঙ্গে আমার ধারণা কিছুটা মিলল। স্বামীর সঙ্গে দৈহিক মিলনের ভয় ওকে অস্থির করেছে। কিছু কিছু মেয়ের মধ্যে এই ভয় অতিমাত্রায় থাকে। আমাদের দেশে 'ডেটিং' জাতীয় প্রথা এখনও চালু হয়নি। খুব কম মেয়েরই বিয়ের আগে যৌন মিলনের অভিজ্ঞতা থাকে। অনীতা ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ পায়নি। অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞ মেয়ে বন্ধুও ওর কেউ নেই। প্রথমে বিয়েতে মত ছিল না, মেসো-মশায়ের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে রাজী হয়, বিয়ের আগে স্বামীকে একবার দেখেছিল—পছন্দ হয়নি, কিন্তু সে-কথা লজ্জায় মাসীমার কাছে বলতে পারেনি। ওর মেসোমশায়-মাসীমা নিজের মেয়ের মত আদরযত্নে মানুষ করলেও ওর বাবা-মায়ের অভাব ঠিকমত মেটাতে পারেন নি। ওদের কাছে না চাইতেই যা পেয়েছে, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল। আবদার করে কোনো

দিন কোনো কিছু চায়নি. অভিমান বা রাগ করার কোনো উপলক্ষই ঘটেনি। ওর কথা থেকে বোঝা গেল—মেসো-মাসীকে ও ঠিক নিজের বাপ-মায়ের মত কোনোদিনই মনে করতে পারেনি। কয়েক বছর আগেও রোজ রাত্তিরে ও বালিশে মুখ গুঁজে মা-বাবার কথা ভেবে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে। শৈশবের ছোটখাটো স্মৃতির টুকরোগুলো সযত্নে অন্তরের গোপনতম প্রদেশে সুরক্ষিত রেখেছে। ফুলশয্যার দিন অনেক চেষ্টা করেও স্বামী ওর মুখ খোলাতে পারেনি। কিছুটা বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কয়েক বছর পরে সেই রাত্রে আবার ও অঝোরে কেঁদেছে। নিজেকে কেন জানি সে-রাত্রে নিঃসঙ্গ অসহায় মনে হয়েছে। জানালা দিয়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে ছোটবেলার মত বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে যে, মা আর বাবা সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে তাঁদের অনুর দিকে ম্লান দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ইচ্ছে সত্ত্বেও ওর কাছে আসতে পারছেন না, ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না। তবুও অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসে ও'বা অসহায়—ইচ্ছে সত্ত্বেও আসতে পারছেন না জেনেও রাগ হয়। আবার বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কাঁদতে থাকে।

সেবারে স্বামী বোধহয় কিছুটা অনুকম্পাভরে আর বেশিদূর অগ্রসর হননি। দ্বিতীয়বার তিনি জোরজবরদস্তি করবেন ভেবে ও ভয়ে শ্বশুরবাড়ী যেতে চায়নি. এই বোধহয় প্রথম মাসীমার কাছে আবদার করে আধো কিছুদিন থাকতে চায়। কিন্তু ওর কান্নাকাটিতে কোনো ফল হল না। গাড়ীতেই স্বামীর কাছে তিনদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে। স্বামী প্রার্থনা মঞ্জুর করায় কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে যায়। অনেক চেষ্টা করে স্বামীর মাকে 'মা' বলে ডাকে, তিনদিনের মধ্যে সেবাযত্ন করে তাঁর হৃদয় জয় করে। তৃতীয় দিনে কাজে বেরুবার আগে স্বামী ওকে মনে করিয়ে দিল যে, সেই রাত্রে ওদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে দেহের মিলন ওদের মনের মিলনকে মধুময় করে তুলবে। আতঙ্কে অন্তরাত্মা শিউরে উঠলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে অনীতা সম্মতি জানায়। তারপর মেসোমশাই-এর সঙ্গে দেখা করার কথা বলে. শাশুড়ীর খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলেই ও বেরিয়ে পড়ে। ট্রেনের মধ্যেই ওর কেমন যেন লাগতে থাকে। ভয়ের পাশাপাশি বুকের মধ্যে আনন্দেরও সাড়া জাগে। কোথায় যেন একটা আনন্দের ঝরণার. অনেক দিনের বন্ধ মুখ খুলে গেছে মনে হয়। প্রথমে গুণ-গুণ করে, তারপর একটু উঁচু গলাতেই গান ধরে. আশেপাশের লোকজন ওর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনে হয়। ও গ্রাহ্য করে না. আরো উঁচু গলায় গান ধরে। শিয়ালদা স্টেশনে ওকে গিরে ছোট-খাটো একটা ভিড় জমে যায়। ও বেগে গিয়ে তাদের যা-তা বলে তিরস্কার করে। এমনি সময় মেসোমশায়ের এক বন্ধু ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে ওকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করেন, সব কথা ওর মনে নেই। তারপর তিনি অনেক কষ্টে পুলিশের সাহায্য নিয়ে একটা ট্যাসি জোগাড় করে ওকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছিলেন, এইটুকু শুধু ওর মনে আছে।

—তুমি স্বামীকে ভয় পাচ্ছ কেন? যত-দূর শুনলাম সেতো খুবই বিবেচক। তোমার সঙ্গে এপর্যন্ত কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। বিয়ে যেকালে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ী যেতেই তো হবে।

—না, আমার ভয় করে। আমি আপনার বাড়ীতে থাকব। রান্নাবান্না করব, বাসন মাজব, আপনার সব কথা শুনব। আপনার পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমাকে থাকতে দিন। আপনাকে অনেকটা আমার বাবার মত দেখতে।

—তোমার স্বামীর মত না নিয়ে তো তোমাকে রাখা যায় না; সেটা বে-আইনী হবে। সে আমার নামে মামলা ঠুকে দিতে পারে.....

—সে কিছু বলবে না, সে খুব ভাল মানুষ। আর তার সঙ্গে তো আমার আসল বিয়ে এখনো হয়নি। আমি ওদের বাড়ী গেলে মরে যাব। আমার ঘুম হবে না, খিদে হবে না, আমি কাজ করতে পারব না; তখন ওরা আমায় বকবে, মারবে মেরে ফেলবে।

—এখনই তো আর যেতে বলছি না। কাল তোমার স্বামী আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাকে বলে দেব যে দু'-সপ্তাহ পরে তুমি ওদের ওখানে যাবে। এর মধ্যে তোমার ঘুম হবে, খিদে হবে শরীর ভাল হয়ে যাবে। তুমি সুস্থ না হলে তো আর তোমাকে যেতে বলছি না।

—না আমি কোনোদিন সুস্থ হব না। মেসোমশাই জোর করে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দেবেন। সেখানে ওরা আমাকে যন্ত্রণা দেবে, আমাকে সিঁড়ির ঘরে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখবে। ওরা ভাবছে আমাকে ভূতে পেয়েছে। রোজা ডেকে আমাকে কাঁটাতারের বেত দিয়ে মারবে। আমার খুব লাগবে। না, আমি যাব না—বলে কেঁদে উঠল অনীতা।

পাশের ঘরে মেসোমশাই আর মাসীমা ছিলেন। মাসীমার জিম্মায় অনীতাকে বাইরে পাঠিয়ে দিলাম। মাসীমাকে বেশ ভয় পায় মনে হল। তিনি ডাকতেই একবার করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে গেল।

মেসোমশায় চিন্তান্বিত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : খুব মুস্কিল হয়েছে ডাক্তারবাবু। কাল জামাইবাবাজী বেশ মেজাজ দেখিয়ে গেলেন।

—কি বলছে? অসুখ সারলেও ওকে গ্রহণ করবে না।

—শুধু তাই নয়। আমার নামে মামলা করবে বলে শাসিয়ে গেছে। আমি নাকি জেনেশুনে একটা উচ্ছিষ্ট মেয়েকে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি।

—উচ্ছিষ্ট? ওঃ। ওর বুঝি ধারণা হয়েছে যে অনীতা অন্য কাউকে ভালবাসে বলে শ্বশুর ঘর করতে চাইছে না।

—হ্যাঁ, আর এই ধারণা মেয়েটাই কাল দুপুরে ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

—প্রেমিকের পরিচয় কিছু পেয়েছেন?

—না, ওর মাসী অনেক চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে কোনো কথা বের করতে পারেন নি। তবে স্বীকার করেছে যে সে ঐ ধরনের কথা জামাইকে বলেছে। আচ্ছা, এ নিয়ে কি মামলা হয়

—উকিলরা বলতে পারে। তবে আমি ওর কথার কোনো মূল্য দিতে রাজী নই। মনে হয়, ও স্বামী-সঙ্গ এড়াবার জন্যে গরিষা হয়ে তাকে একটা কাহিনী তৈরী করে শুনিয়েছে।

—স্বামী কি বাঘ না ভাল্লুক যে তার সঙ্গ এড়াবার জন্য নিজের নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটাতে যাবে! আপনি কি মনে করছেন বলুন। ও-কিন্তু আপনাকেও অনেক মিথ্যে কথা বলছে। ওর মাসী বলছেন, ওর ঘুম হচ্ছে; খাওয়া-দাওয়াও করছে; অথচ ও আপনার কাছে বলে চলেছে যে ওর ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না। আমার মনে হয়; ও অসুখের ভান করছে।

—ভান করে ওর লাভ?

—সেইটেই তো ঠিক বুঝতে পারছি না। এক লাভ; এখানে থাকলে যাকে ও ভালবাসে, তাকে দেখতে পাবে। কিন্তু এই কেলেঙ্কারীর পর ওকে আমরা এ-বাড়ীতে কি করে রাখব ভেবে পাচ্ছি না। কি মুস্কিলেই যে পড়েছি।...

—আচ্ছা ও যদি প্রেমটেম সত্যিই করে থাকে, আপনারা কিছুই বুঝতে পারলেন না; জানতে পারলেন না;—এ কি হয়? প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেখেন নি, কোনোদিন কারুর কাছে ওর নামে গুজব শোনেননি; রাত করে কোনোদিন বাড়ীতে ফেরেনি;—এসব কথাতো আপনিই বলেছেন। ঠিক কিনা?

শরৎ জন্মশত বার্ষিকীতে বহু তথ্যসমৃদ্ধ সুলভ অর্ঘ্য—
শরৎচন্দ্র—মণি বাগচি—১৮৲
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম • কাজী নজরুল ইসলাম • ২০৲
দেশবন্ধু • মণি বাগচি • ২০৲
মহানায়ক সুভাষ—অরুণকুমার ঘোষ-১৫৲ মহাজীবন—অরুণকুমার ঘোষ-২০৲
মোহন লাইব্রেরী : ৩৫ এ, সূর্যসেন স্ট্রীট • কলিকাতা ৯
ফোন : ৩৫ ০৬৩৩

একটু চিন্তা করে ভদ্রলোক মুখ নীচু করলেন; একটু লজ্জা পেয়েছেন মনে হল। তারপর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বাঁচালেন ডাক্তারবাবু। নিজের মেয়েকে—ওকে নিজের মেয়ে মনে করেই এসেছি আমরা; খারাপ ভাবতে গিয়ে বুক ফেটে যাচ্ছিল। বিপদে পড়লে মানুষের মতিচ্ছন্ন হয়। না; চব্বিশ বছর ধরে ওকে দেখছি; ও-নিজের মুখে বললেও ঐ কথা আমার বিশ্বাস হয় না। বুঝতে পারছি আপনার কথাই ঠিক। ও প্রলাপ বকছে। আচ্ছা; এ রোগটা কি ডাক্তারবাবু?

—রোগটা এক ধরনের পাগলামি। ডাক্তাররা নাম দিয়েছেন—"হানিমুন সাইকোসিস।" 'হানিমুন'কে বাংলায় যেন কি বলে? মধুচন্দ্রিমা তাই না? আর 'সাইকোসিস' মানে উন্মত্ততা; পাগলামি। আপনা থেকেই বেশিরভাগ রোগী ভাল হয়ে যায়। তবে আপনাদের অনীতার অসুখের মধ্যে বোধহয় আরো একটু জটিলতা আছে। ও স্বামীকে যে কাহিনী শুনিয়েছে, সেটাকে একটু বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। দেখতে হবে কাহিনীটা নিছক স্বামীকে তাড়াবার মতলবে ওর মাথায় গজিয়েছে। না কল্পিত কাহিনীটি ওর ভ্রান্তি এবং অমূলদর্শনের (delusion and hallucination) নিদর্শন। ওকে বিদায় নিয়ে অনীতাকে ডাকলাম। তাকে বললাম,—তুমি আমাকে বাবার মত মনে কর; অথচ স্বামীকে যা বলেছ আমার কাছে সেকথা গোপন করেছ। তুমি বিষে ভেঙে দিতে চাও বুঝলাম। কিন্তু নিজের মাথায় মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা না চাপিয়েও তো স্বামীর থেকে আলাদা হতে পারতে। অনীতা একটুও সঙ্কুচিত না হয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলল : মিথ্যে কেন হবে? আমি যা বলেছি তা সত্যি। জল্পেশদাকে আমি ভালবাসি। তিনিও আমাকে ভালবাসেন। তিনি কত সুন্দর কত ভাল। আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসতে পারব না।

—একথা বিয়ের আগে মাসীমা-মেসোমশাইকে বলনি কেন? তাহলে তাঁরা তার সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতেন, এই বিয়েটা ঘটত না। আমার কাছে একবারও ঐ জল্পেশদার নাম করোনি। কেন?

—আপনারা গুরুজন। গুরুজনের কাছে কি এসব কথা বলা যায়? তাছাড়া জল্পেশদার সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে? তাঁর অনেকদিন আগে বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর মেয়ে এবার হায়ার সেকেন্ডারী দিচ্ছে।

—তুমি এসব জেনেশুনে তাকে ভালবেসছ, না তিনি খবরগুলো গোপন করেছিলেন। তার সঙ্গে দেখা হল কোথায়? আলাপ হল কি করে?

—তিনি গোপন করার মত মানুষ নন। আমি সব জানতাম তিনিই আমাকে বলেছেন। তাঁর বাড়ির কথা মেয়ের কথা তার ছোটবেলার কথা। আলাপ হয়েছে তার দোকানে উল কিনতে গিয়ে। চুলের ফিতে সেফটিপিন উল পাউডার তেল সাবানের মস্তবড় দোকান আছে তাঁর। দোকানে ঢুকলেই ভারী সুন্দর একটা গন্ধ পেতাম, আমার খুব ভাল লাগত। যেমন সুন্দর জল্পেশদা তেমনি সুন্দর তাঁর দোকানের গন্ধ। শুধু দামী পাউডার সেন্ট মিশুলেই আপনি ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারবেন না। সবাই ঐ গন্ধ তৈরী করতে পারে না। আরো কত সেন্ট পাউডারের দোকান আছে তো ষ্টেশনের ধারে; কোথাও ঐ গন্ধ আপনি পাবেন না। ঐ গন্ধ প্রথম যেদিন নাকে যায় সেইদিনই মনে হল এ গন্ধ আমার চেনা খুব চেনা। আমার মায়ের ড্রেসিং টেবিলের ধারে গেলে ছোটবেলায় ঐ গন্ধ পেতাম। যেদিন আমরা গাড়ী করে বিয়েবাড়ী যাচ্ছিলাম যেদিন বাসের ধাক্কায় আমাদের গাড়ীটা চুরমার হয়ে যায়; সেদিন মায়ের গায়ে আমার ফ্রকে ঐ সেন্ট ঐ পাউডারের গন্ধ ছিল। জল্পেশদার দোকানে ঐ গন্ধ পাবার পর রোজ একবার করে তাঁর দোকানে যেতাম ঐ গন্ধ শুঁকতে। দুপুরবেলায় মাসী ঘুমিয়ে পড়ত। আমি খিড়কির দরজা দিয়ে জল্পেশদার দোকানে যেতাম। তখন খদ্দের থাকত না। শুধু আমি আর জল্পেশদা। কত আদর করতেন আমাকে জল্পেশদা। লজেন্স দিতেন টফি দিতেন তাঁর বাবা-মার গল্প করতেন। ওঁরও খুব অল্পবয়সে মা-বাবা একসঙ্গে মারা যায়। আমরা দুজনে একইরকম; একই গন্ধ ভালবাসি, একই গান ভালবাসি একই বই ভালবাসি...এসব কথার একটাও মিথ্যে নয়। আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি, দারুণ ভালবাসি। আমি কি আর কাউকে ভালবাসতে পারি।.....আমাকে আপনি আপনার বাড়ীতে থাকতে দেবেন তো? জল্পেশদা বেঁচে থাকলে কি আপনাকে এত বলতাম। আপনি আমার বাবার মত, আমি আপনার সব কাজ করব; আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

সব শুনতে মেসোমশায়ের মনে পড়ল জল্পেশদার কথা। ওঁর বাড়ীর উল্টোদিকে একটা ছোট ষ্টেশনারী দোকানের মালিক জল্পেশদার দোকানে সত্যিই অনীতা রোজই গিয়ে গল্প করত, তাঁর কাছ থেকে লজেন্স বিস্কুট আদায় করত। ওর যখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়স। সেই সময়ই জল্পেশবাবুর মৃত্যু হয়। দোকানটাও উঠে যায়। তখন জল্পেশদার বয়স ছিল চল্লিশের বেশি।

অনীতার স্বামী লোক ভাল। তাকে সব বুঝিয়ে দিতে খুব বেগ পেতে হয়নি। জল্পেশদার কাহিনী শোনার দিন পনেরোর মধ্যে অনীতার ভ্রান্তি কেটে যায়। স্বামীর ঘরে যেতে তখন আর আপত্তি হল না তার।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

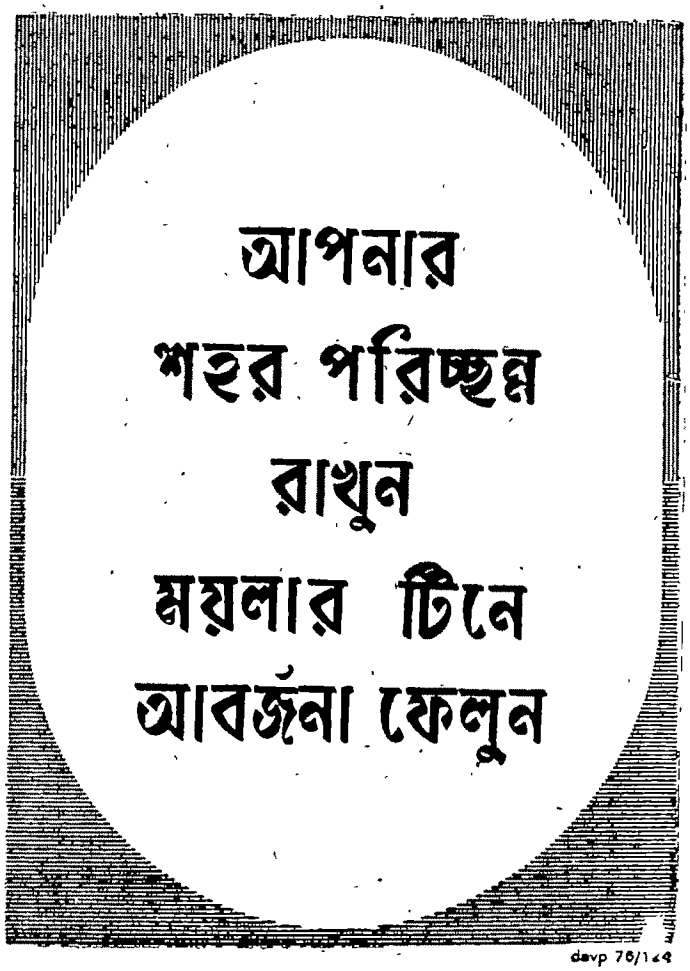

নতুন বই

তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে (উপন্যাস) : সন্তোষ মিত্র। প্রফুল্ল গ্রন্থাগার। ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। পাঁচ টাকা।

লেখকের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে পথের মধ্যে কুড়িয়ে পাওয়া ছেঁড়া, পোকায় খাওয়া ডায়েরীর একগুচ্ছ পৃষ্ঠা থেকেই পাওয়া গেছে এই উপন্যাসের কাহিনী-সূত্র। অনেকটা আত্মকথার ঢঙে লেখা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মনোজ, অমলেন্দু শম্পা সুহাস বৌদি আর ভানু-মামা। সুহাস-বৌদির চরিত্রটি আকর্ষণীয় ও মনোজ্ঞ। তাঁর করুণ জীবন-পরিণতি যে কোন পাঠক-পাঠিকাকেই অভিভূত করবে। ছিন্ন বাধা, প্রেম-বুভুক্ষু অমলেন্দু ত্রিভুজটিও ট্রাজেডির নায়ক। নারী-সান্নিধ্যে তার তৃষ্ণাই শুধু বেড়েছে। সারাজীবন সে নিজে জ্বলেছে। সেই প্রেম হুতাশনে পুড়ে মরেছে শম্পা আর সুহাস। তবে কাহিনী-বিন্যাসে লেখক যেন কিঞ্চিৎ অনামনস্ক; তাই দেখি কাহিনীটি কখনও মনোজের আবার কখনও অমলেন্দুর জবানীতে কথিত। তাছাড়া অমলেন্দু যদি 'ইমপোটেন্ট'-ই হয় তবে বলাৎকারের পর শম্পা গর্ভবতী হল কি করে? অথচ ঐ অভাবের জন্যেই তো সুহাসের জীবনে ঘটলো ট্রাজেডি। ব্যাপারটা অস্পষ্ট থেকে গেছে। উপন্যাসের পরিণতি প্রায় রোমাঞ্চকর কাহিনীর মত। ঐ অংশের স্বাদ আলাদা। বইটির মধ্যে 'অস্তি' (অস্থি) 'সত্বা' (সত্তা) প্রভৃতি কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়লো।

• সবকুমার গরাই রচিত নাটক •

কামধেনু — সমকালের ১ সেট; ৩-৫০

অন্তরালে — কাম্যাহাসির ২ স্ত্রী; ৩-০০

লালবাঁধ — বা লালবাঈ ২ স্ত্রী; ৫-০০

জিন্দের বন্দী — উত্তেজনাভরা ২ স্ত্রী; ৫-০০

প্রাপ্তিস্থান : ভট্টাচার্য বুক হাউস ৭৫।১।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিঃ-৯

হাত নেই (উপন্যাস)। চন্ডী মন্ডল। কবিপত্র প্রকাশ ভবন ২২বি প্রতাপাদিত্য রোড কলকাতা—২৬। পাঁচ টাকা।

চন্ডী মন্ডলের লেখা হাত নেই উপন্যাস নায়ক স্বপ্নেশ। অস্থির চিত্ত এই নায়ক আধুনিক মনের অধিকারী। আধুনিক অর্থে বর্তমান সংসার সমাজ জীবনের পট-ভূমিতে একটি মানুষ একা হয়ে যে সমস্ত আচ্ছন্নতার দুঃখে ভোগে যে ধরণের অসহায়তায় তার দিন কাটে এবং যে জাতীয় চিন্তায় সে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকে মনের গভীরে স্বপ্নেশ সে সবের অধিকারী। স্বপ্নেশের প্রেমিকা রেবা। স্বপ্নেশ প্রেম ও প্রেমিকাকে মেনে নিলেও তার মধ্যে দুটি জগতের স্বপ্ন তৈরী হয়। পার্থিব জগত আর তার স্বপ্নের জগত। বৈপরীত্য তাকে ঘিরে ধরে। অফিসের কেরাণী স্বপ্নের কোন কিছুর সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। সাধারণ মানুষের পক্ষে সে উন্মাদ। কিন্তু তার সুস্থতা তখনকার সচেতন যুবক-দের মত প্রচলিত নিয়ম মেনে নেওয়া নয় বরং এক বিচ্ছিন্নতার অসুখে পর্যুদস্ত হতে হতে সে এক পরম সুস্থতার অনুসন্ধানী। চন্ডী মন্ডলের উপন্যাসটি আধুনিক যুব জীবনের ও মনের ছাপেই তৈরি। তাঁর গদ্যও তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য প্রকাশের পক্ষে যথোচিত।

মহাপন্ডিত গোপীনাথ ও পরলোকে

কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

ভারততত্ত্ব ও প্রাচ্য বিদ্যার মহাপন্ডিত মহামহোপাধ্যায় ডকটর গোপীনাথ কবিরাজ সম্প্রতি বারাণসীতে পরলোকগমন করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। কাশীর সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীয়ান এবং পরে সেখানকার অধ্যক্ষ হন তিনি। অবসর গ্রহণের পর সাধন পথে নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন এই সময় আনন্দময়ী মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শেষ জীবন তিনি কাশীর আনন্দময়ী মার আশ্রমেই কাটান।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এই মহাপন্ডিতকে ডি-লিট দিয়ে সম্মানিত করেন। ভারত সরকার সম্মান জানান পদ্মবিভূষণ উপাধি দিয়ে। সাহিত্য বাচস্পতি উপাধি দিয়ে শ্রদ্ধা জানান উত্তর প্রদেশ সরকার। বিশ্বভারতী ওদেশি-কোত্তম উপাধিতে এই বরেণ্য পুরুষকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারত এক মহাপন্ডিতকে হারাল।

কেন জন্ম কেন নির্যাতন এর কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় হৃদরোগের আক্রমণে পরলোকগমন করেছেন। পঞ্চাশের দশকের একজন শক্তিমান কবি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় সদ্য রচনাতেও শক্ত হাতে কলম ধরতে পারতেন। জন্মে জয় নামের আড়ালে দীর্ঘকাল তাঁর লেখা পাঠকের মন কেড়েছে। পঞ্চাশের কবিদের কবিতা সংকলন এ দশকের কবিতা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে-ছিল। সত্যিকারের সাহিত্য প্রেমী লোকটি অমৃত পত্রিকার বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং আমাদের পত্রিকায় তাঁর বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশের নামী নামী কাগজ ছাড়াও অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখা। দিন আমাদের নামে মুক্তি প্রতীক্ষিত ছায়াছবিটি তাঁরই কাহিনী অবলম্বনে। অমৃতের এই সংখ্যাতেই অনন্ত শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের অমৃতে পাঠানো শেষ লেখাটি দেখা যাবে।

চার্বাক

টাটা স্কলারশিপ

লেডি মেহেরবাই দোরাবজী টাটার মৃত্যুবার্ষিকীতে লেডি টাটা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ১৯৭৬-৭৭ সালের জন্য প্রায় বার হাজার পাউন্ড স্টার্লিং অন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। পুরস্কারের মধ্যে আছে ফেলোশীপ, স্কলারশীপ এবং রক্ত সম্পর্কে বিশেষ করে লিউকোমিয়ার ওপর গবেষণার জন্য পুরস্কার। এবছরের জন্য পুরস্কৃতদের মধ্যে আছেন ডঃ আর দা এন বাস্তস্ (ব্রেজিল), ডঃ এস এম কাসিঅন ও ডঃ এন এস গুটম্যান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র). ডঃ পি মিগনোত্তি (ইতালি) এবং ডঃ পি স্ট্রাইকমানস (বেলজিয়াম)। এছাড়া দেশের মধ্যে মানব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালাবার জন্য) ট্রাস্ট পাঁচটি মাসিক ছয়শত টাকার সিনিঅর স্কলারশিপ এবং পাঁচটি মাসিক চারশত টাকার জুনিঅর স্কলারশিপ দেবে। সিনিঅর স্কলারশিপ পেয়েছেন মিস্ বি বসু, মিঃ এস বিসাতি, মিসেস ইউ গোয়লে, মিঃ এম এন খান এবং মিস পি এন পন্ডরি। জুনিঅর স্কলারশিপ পেয়েছেন মিস এম এস বর্মজি, মিঃ এ গোমেজ, মিঃ এম ইসাক, মিস এ জি খাবে এবং মিস এম এইচ দো রেগো। স্কলারশিপ প্রাপ্তদের আলীগড়, বোম্বে, কলকাতা এবং হায়দ্রাবাদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। ১৯০২ খৃঃ লেডি টাটা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা করেন স্যর দোরবজী টাটা তাঁর স্মৃতির স্মৃতিরক্ষার জন্য। উদ্দেশ্য ভারত ও বিদেশী প্রধানত রক্ত সম্পর্কে গবেষণায় সাহায্য করা।

মহেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্য সংসদ এবং শিশু সাহিত্য সংসদ

ছোটদের আমি যা বই ছাপাই তা প্রায় সবই অফসেটে ফলে ব্যাপক আকারেই তা প্রকাশ করতে হয়। এবং সেই মান-এ, যে মান একমাত্র বিদেশে সম্ভব; আর এরকম রঙচঙে ছবিঅলা বই না হলে ছেলেদের মন ভরে না। — তাদের কাছে টানা যায় না। একে একে বাঙলা ভাষায় আমি সব বের করবো, এমনকি রূপকথা অব্দি।

●

একজন ৭৭।৭৮ বছরের বৃদ্ধ মানুষের রোজ কাটে কি করে? সকাল বিকেল যে কোনো পার্কে গিয়ে কোণার বেঞ্চিগুলোতে একটু আড়ি পাতলেই দেখবেন টালা থেকে টালিগঞ্জের সেই এক শুরু এক শেষের বয়ান—দিনগত পাপক্ষয়ের ডাইরী। সেই বৌ ছেলে মেয়ে অভিযোগের সংসারের ধারা-বিবরণী। এভাবেই চলতে চলতে কে কখন টুপ করে খসে পড়েন সবার অজান্তে। বেঞ্চিতে একটা জায়গা ফাঁকা হয়। আবার একজন এসে জুড়ে বসেন। শেষ জীবনের নিরানন্দটুই ভাগ দাদুর এই-এ ট্রাজেডী।

কিন্তু আপনি যদি শোনেন ৭৭ বছরের একজন যুবক শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, আমার আপনার যখন শেষ ঘুম, মানে সেই ভোর সাড়ে চারটেয় বিছানা ছেড়ে, ঝপাঝপ ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম সেরে, সাড়ে ছটার মধ্যে পার্ক থেকে কয়েক চক্কর মেরে সকাল সাতটার মধ্যে পুরো ফিট। তারপর ম্যাসাজ নেওয়া, দলাইমালাই, খবরের কাগজ চা। সাড়ে নটা দশটায় লাঞ্চ.....

তারপর?.....

—তারপর ঘুম!

ঘুম? সে কি? তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কি, হতাশ হলুম।—হ্যাঁ ঘুম তবে ঘন্টাখানেক। তারপর এই শিশুসাহিত্য সংসদ। তারপর সন্ধ্যেয় ফিরে ক্লাবে তাস গুটা খেলা চাই-ই। মদ, ভাং, গাঁজা মেয়ে মানুষ, কোন নেশা বলতে কিছু নেই এক-কালের স্বাধীনতাসংগ্রামী 'যুগান্তর গোষ্ঠীর' বরিশালের কাশীপুর গ্রামের এই মানুষটির মনে প্রাণে একজন বাঙ্গালী সংগ্রামের সে বিশ্বাস এখনো অটুট। একদিন গ্রামে ঘামে নিজে হাতে কম্পোজ করে গ্যালী মাথায় করে নিয়ে গিয়ে ছেপেছেন। সে গল্প শুনতে হলে আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হয় সেই ১৯২৩-এ।

২২ বছর বয়সে বরিশালে ইউনিয়ন জ্যাক পোড়াবার দায়ে ইংরেজ সরকার তো জেলে পুরে দিল। তা প্রায় দেড় বছর জেলের ঘানি টেনে কলকাতায় এসে মিললেন—'যুগান্তর'-এর অরুণচন্দ্র গুহ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ততদিনে ওঁরা ভাবছেন—শেয়ালদার এই সরস্বতী লাইব্রেরীর জায়গায় একটা প্রেস করলে কেমন হয়। ছোটখাটো একটা প্রেস হলো। নাম দেওয়া হলো—সরস্বতী প্রেস। জেলফেরত দলের কর্মী মহেন্দ্রনাথ দত্ত লেগে গেলেন একজন কর্মচারী হিসেবে; অরুণবাবু বললেন—দ্যাখো, আমরা তো আবার জেলে যাব নির্ঘাৎ। তুমি আবার আমাদের পিছু নিও না, তাহলে প্রেস বন্ধ। আর প্রেস বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের রাজ-নৈতিক হাতিয়ারগুলোও বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধ হয়ে যাবে **সারথী, শ্রমিক, যুগবাণী**। তাই হোলো। কথাটথাগুলো হয়েছিল আগস্ট মাসে। ১৯২৪এর জানুয়ারী মাস নাগাদ গ্রেপ্তার হলেন অরুণবাবু। ১৯৩১এ মনোরঞ্জনবাবু। প্রেসে তখন মনপ্রাণ সঁপে দিলেন মহেন্দ্রবাবু। একদিকে কম্পোজিটার, কুলি, মেশিনম্যান, প্রুফরিডার, ম্যানেজার সবকিছু। মূলধন তিন হাজার টাকা। আজ যার বাণিং ক্যাপিটাল কম করে পঁচিশ লাখ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

পাঠক হয়তো প্রশ্ন করবেন—মশাই, বলতে যাচ্ছেন তো 'শিশু সাহিত্য সংসদ'এর কথা এর মধ্যে আবার সরস্বতী প্রেসের কথা আসে কি করে। আসে। সরস্বতী প্রেস না থাকলে হয়তো এ সংসদ সেভাবে গড়ে উঠতো না। একটার সঙ্গে আরকটার নাড়ির টান, তাই একটাকে বাদ দিয়ে আরেকটার কথা ভাবা যায় না। বিশাল মাইনে, প্রায় অর্ধেক শেয়ার, প্রচণ্ড পরিশ্রম, সব থাকা সত্ত্বেও 'শিশু সাহিত্য সংসদ' গড়তে হোলো কেন? কেন না সব কেন-র পেছনে আরেকটা কেন থাকে। কারণ ঘটনার পেছনে যে ঘটনা, সেটাই হলো আসল ঘটনা।

সেই ঘটনাটা হোলো—তখন যত রূপকথা ছোটদের বং-বেরং-এর বইগুলো বেশীর ভাগই ইংরেজী ভাষায়, লেআউটে ঝকঝকে হয়ে বেরুচ্ছে। মহেন্দ্রবাবু বই-গুলো কিনে ছেলেদের হাতে তুলে দেন। ওরা ছবিটবি দেখে তুলে রেখে দেয়, আর যাবাকে তাগিদ দেয় গল্প বলার জন্যে। গল্প শোনে! আবার আব্দার।

প্ল্যানটা তখনই মাথায় এলো। জন্ম হলো 'শিশু সাহিত্য সংসদ'। 'সাহিত্য সংসদ তো ছিলই। এখন যোগ হলো —শিশু। প্রথম যখন হোলো তখন মূলধন ছিল এই ৫।৭ হাজার টাকার। ডিরেকটার বোর্ডে রইলেন—সরস্বতী প্রেসের শৈলেন গুহরায়, অরুণ গুহ, জীব-প্রিয় গুহ, আর ননীবালা গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মহেন্দ্রবাবুর কন্যা শ্রীমতী অঞ্জলী বসু। পুরোপুরি অফসেট মেশিনে ছেপে সরস্বতী প্রেস থেকে বের হোলো

সাহিত্যের নেপথ্যে

ছড়ার ছবি। সবাই চমকে গেল। এভাবে এর আগে কখনো বাংলাদেশে ছোটদের বই বেরোয় নি। বেরুলো ছড়ার ছবি ১, ২, ৩ ৪। পাতায় পাতায় বঙ্গিন ছবি ছোটদের এক নিমেষে চোখ টেনে নেয়, ছবিতে ছবিতে কখন যেন ছোটরা পড়ার রাজ্যে চলে আসে। হাজার হাজার কপি বিক্রি হোলো। এইবার অক্ষর। ক, খ। সূর্য রায় আঁকলেন।—ছড়ার ছবিতে পাখি, জানোয়ার। ছবি আঁকলেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছড়ার বই দু-তিনটে হওয়ার পর বাংলার বাইরে থেকে সুখলতা রাও চিঠি লিখলেন —আপনি এইসব বই বের করছেন, আমাদের কাজে লাগান না কেন? মহেন্দ্রবাবু প্রথম এবার কিন্ডার গার্ডেনের মানানুযায়ী বই প্রকাশ করলেন—ইনডাইরেকট মেথডে, 'নিজে পড়'। খুব চললো। ক্লাশ ওয়ান, টু-এর জন্যে এ বি সি মিলিয়ে ছড়া আর ছড়ায় ছড়ায় অঙ্ক। ৬৫ হাজার রানিং ক্যাপিটাল হোলো। পাশাপাশি চললো সাহিত্য সংসদের নানা ডিকসেনারী থেকে শুরু করে গিরিশ রচনাবলী থেকে মধুসূদন, রমেশ, বঙ্কিম, দীনবন্ধু রচনাবলী। নব নব অল্পসজ্জায় তত্ত্বে তথ্যে মহেন্দ্রনাবুকে ঘিরে রইলো অমূল্য সৃষ্টি আর রচনাসম্ভার।

নাঃ, একসঙ্গে দুটো সম্ভব নয়, সরস্বতী প্রেসের অমানুষিক কাজ তার সঙ্গে প্রকাশনী। কি করা যায়। সরস্বতী প্রেস থেকে সরে এলেন। ভাবা যায়? ৭২ বছরের একজন মানুষ, যিনি সারা জীবন সমস্ত এনার্জি দিয়ে তিল তিল করে সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা অমানুষিক পরিশ্রম করে সাফল্যের শীর্ষে এনে তুললেন। যাঁর বছরে আয় তখন ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। জীবনসায়াহ্নে যখন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম গা এলিয়ে দেওয়ার কথা, তখন মহেন্দ্রবাবু ভাবছেন—ছেড়ে দেবো। এবং ছেড়ে দিলেন। শুধু ছাড়লেন না। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের ১ লাখ আর গ্র্যাচুয়িটির ৬৫ হাজার কুড়িয়ে-কাড়িয়ে ঢাললেন প্রকাশনীতে। শেয়ালদার সরস্বতী প্রেসের পাশেই ছোট দোতলায় আবার নতুন করে কাজ চললো। ১৩/১৪জন কর্মচারী। রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে গুদাম। শিশু সাহিত্যকে নতুন নতুন পরিকল্পনায় অলঙ্কৃত করার প্রয়াসে মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন। সরস্বতী প্রেসের মুদ্রণের নানা দিকে ভাব দিয়ে এলেন তাঁরই একান্ত কাছের মানুষ মুদ্রণ বিশেষজ্ঞ জীবপ্রিয় গুহকে এবং হাতে-কলমে কাজ শেখানো উদ্যমী উজ্জ্বল তরুণ একজিকিউটিভ মিহির দাস আর মিহির মজুমদারকে।

যদি কখনো আপনারা কেউ 'শিশু সাহিত্য সংসদ'-এ যান আর আপনার সামনের টেবিলে যদি প্রকাশিত বইগুলি ছড়িয়ে রাখা হয় তাহলে আপনি দেখবেন আপনি এক চোখধাঁধানো রঙের রাজ্যে বসে আছেন, ভাবতেই পারবেন না সবকটা বই কলকাতার কোনো এক প্রেস থেকে ছেপে বেরিয়েছে। অন্ততঃ আমি তো অবাকই হয়ে গেছি। আর প্রচণ্ড আফশোষ হয়েছে। আমার সময় এ বইগুলো বের হয়নি। সেদিক থেকে নিশ্চয়ই আজকের বাচ্চারা ভাগ্যবান।

আরেক অর্থে তারা ভাগ্যবান, তাদের সময়ে 'আমার শৈশব' নামে বইটা বেরিয়েছে বলে। বইটা এখনো বাজারে চাউর হয়নি। বাজারে মুখে মুখে ছড়িয়ে গেলে এ বই লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হবে। ব্যাপারটা তাহলে একটু খুলেই বলি—

ঃ আমরা সবাই সেই শৈশবকে ফিরে পেতে চাই। শৈশবের রঙিন আকাশ স্নেহ ভালবাসা মুহূর্তে সবকিছুই বাস্তবের কঠিন আঘাতে ধূসর হতে হতে কখন ধূসরতর হয়ে যায়। ছবিগুলো হয়ে ওঠে অস্পষ্টতর। দুচারটে ঘটনা হয়তো কখনো ঠাকমা দিদিমা কখনো তাঁদের বয়সী কেউ গল্প করে বলেন, দুচারটে ছবি হয়তো অ্যালবাম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো। এই আমাদের শৈশব। 'আমার শৈশব' সেই মূল্যবান এ্যালবাম, যাতে তার বাবা-মা খোপে খোপে টুকে রাখতে পারেন শিশুর জন্মদিন থেকে সাতবছর বয়স পর্যন্ত প্রতিটি অনুষ্ঠানের ছবি। সে ব্যবস্থা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বার্থ সার্টিফিকেট; কোষ্ঠী; ঠিকুজী; মুখে ভাতে কে কি দিয়েছিলেন; কি কি নাম থেকে কোন নাম শেষপর্যন্ত এলো। কোন গান গেয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো হোতো। জন্মদিন অন্নপ্রাশনে কে কে দেখতে এসেছিলেন। খেলাধুলো, তার আবার ফটো। লেখাপড়া; সাংস্কৃতিক চর্চা; স্বাস্থ্যরক্ষার ইঙ্গিত। কি নেই! সে এক এলাহী ব্যাপার! আকর্ষণীয় অফসেটে ছাপানো রঙিন অ্যালবাম। দেখতে দেখতে আমিও যেন কখন শিশু হয়ে যাচ্ছিলুম। আধুনিক প্রত্যেক বাবা-মার কাছে এ এ্যালবামটা একটা এ্যাসেট। পরিকল্পনা সেই মহেন্দ্রনাথ দত্ত; ছবি এঁকেছেন সমর দে। সমর দের কথা মনে হতেই আরেকটা কথা মনে পড়ে গেল। শিল্পীরা অন্ততঃ যে শিল্পীরা শুধুমাত্র শিল্পকেই উপজীব্য করে বেঁচে আছেন তাঁদের অর্থকরী ব্যাপারে অসুবিধে হয় দেখেছি। মহেন্দ্রবাবু লেখকদের সঙ্গে প্রতিটি বইয়ে তাঁদেরও রয়ালটি দেবার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। যা একেবারে অবিশ্বাস্য এবং বাংলা প্রকাশনা জগতে প্রথম এবং শেষ। ফলে তাঁর প্রকাশনীর শিল্পীরা প্রতি বছরে শুধু রয়ালটি বাবদই পান ৬ থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত। অন্ততঃ না শুনলে হয়তো আমিই বিশ্বাস করতুম না।

আমরা শিশু সাহিত্য সম্রাট যোগীন্দ্র সরকারকে প্রায় ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম। হাসিখুশি; ছোটদের রামায়ণ আবার নতুন করে নতুন সাজে বের হোলো। শৈলেন গুহ-রায়ের কাছ থেকে বই পেয়ে—সম্পাদক প্রীতুষারকান্তি ঘোষ একটা চিঠিতে লিখলেনঃ যোগীন সরকারের নাম আমরা প্রায় ভুলেই গেছিলাম। আপনারা তাকে বাজারে চালু করেছেন। এটা আমাদের বিশেষ দরকার

কেন্দ্রীয় সিভিল পেন্সনারগণ লক্ষ্য করুন

নিম্নোক্ত শহরগুলিতে পাব্লিক সেক্টর ব্যাঙ্কের সকল শাখা (স্টেট ব্যাঙ্ক ও ইহার সহায়কগণসহ) আপনাদের পেন্সন দেওয়ার জন্য অনুমোদিত হইতেছে ঃ

দিল্লী/নয়া দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, হায়দ্রাবাদ, বাঙ্গালোর ও লখনউ।

কোন বিল দাখিল করার দরকার নাই। আপনাদের সেভিংস ব্যাঙ্ক/কারেন্ট অ্যাকাউন্টে পেন্সনের টাকা স্বাভাবিকভাবেই ক্রেডিট হইয়া যাইবে।

১ জুলাই, ১৯৭৬ তাং বা তৎপরে ট্রেজারি অফিসারের নিকট নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়া স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ স্বিপ্রস্থে দরখাস্ত করিতে পারেন।

নাম ও ঠিকানা ঃ
পিপিও নং
যেখানে পেমেন্ট পাইতে ইচ্ছুক,
সেই পাব্লিক সেক্টর ব্যাঙ্ক ও ইহার শাখার নাম—
উক্ত শাখায় সেভিংস/কারেন্ট
অ্যাকাউন্ট নং
নমুনা স্বাক্ষর

জুলাই এবং না-লওয়া বকেয়া, কিছু থাকিলে, পেন্সন আদায়দান পাব্লিক সেক্টর ব্যাঙ্ক করিবে।

অর্থ মন্ত্রক,
অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তর,
ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত

ছিল। আশাকরি অন্যান্য বইগুলিও আপনারা ছাপার ব্যবস্থা করবেন।' এরপর থেকে বই বেরুলেই এককপি পত্রিকা ভবনে চলে যায়। শুধু কি যোগীন্দ্র সরকার? সুকুমার রায়ের আবোল তাবোল; খাগড়াই; পূর্ণ চক্রবর্তীর ছবিতে রামায়ণ, মহাভারত; তারাশঙ্করের ভূতপুরাণ; স্বপনবুড়োর খেলার সাথী, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক যে ছিল শেয়াল; ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের ছুটির দিনে মেঘের গল্প; মহেন্দ্রনাথ দত্ত আর প্রভাত বসুর সম্পাদনায় আদ্যিকাল থেকে আধুনিক কালের ছড়া সঙ্কলন। মানে বলতে গেলে শিশুদের একটা রত্নভাণ্ডার।

পাশাপাশি সংসদ থেকে প্রকাশিত স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন; স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল; 5000 Indian Designs & Motifs, 'Aurobindo and Jugantar' থেকে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা; কালিকট থেকে পলাশী; বাঁকুড়ার মন্দির; বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া থেকে শুরু করে উপনিষদের কথা; সংস্কৃত নাটকের গল্প; প্রাচীন বিশ্ব সাহিত্য পর্যন্ত সুমুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে।

বেরিয়েছে 'সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান' বাঙ্গালীদের কৃষ্টি বাঙ্গালীরাই ভুলে যাচ্ছে কারণ কত বাঙ্গালী নানাদিকে তাদের উত্তরণ ঘটিয়েছেন তাঁদের কতটুই বা আমরা জানি। সম্ভবও নয়, কারণ সবার কখনো ইতিহাস হয় না। 'সংসদ' একটা অকল্পনীয় কাজ করলেন। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরলোকগত বিশিষ্ট- বাঙালীদের নিয়ে গবেষণামূলক একটা বিরাট বই বের করলেন। প্রধান সম্পাদক ছিলেন সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত আর সম্পাদনায় অঞ্জলি বসু। বইটা প্রায় প্রতিটি বাঙালীর ঘরে থাকা উচিত। কারণ আমরা নিজেরা ইতিহাস হতে ভালবাসি ইতিহাসকে মনে রাখি না। এই বইয়েতে আছে ঐতিহাসিক কাল থেকে ১৯৭৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেইসব তথ্যসমৃদ্ধ জীবনচরিত। আজকের ছাত্র থেকে শুরু করে গবেষক পর্যন্ত যার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন এ বই সেই বই। লাইব্রেরী তাকে যে বই সোনার জলে নাম লিখে বাঁধিয়ে রাখা উচিত। অথচ আমি এই কদিনে অন্ততঃ দশটা লাইব্রেরীতে গিয়ে বুক লিস্টে দেখেছি এ বইয়ের নাম নেই। অর্ধেক হোলো সেই আদ্যিকালের মানসিকতার বস্তাপচা উপন্যাসের ভিড়।

মহেন্দ্রবাবু পুরস্কৃত হয়েছেন বহুবার।

মানে তার বই আকর্ষণীয় ছাপার জন্যে কতগুলো পুরস্কার এনেছে শুনলে অবাক হয়ে যাবেন। যেমন ঃ ভারত সরকার প্রথম পুরস্কার দিয়েছেন— ছড়ার ছবি-৩ (১৯৫৫) নিজে পড় (১৯৫৬); ছবি আঁকা—খ (১৯৭৫) ছবিতে পৃথিবীর (১৯৬১) দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ছুটির দিনে মেঘের গল্প (১৯৫৫) ছোটদের বাল্মিকী রামায়ণ (১৯৫৮) জীবনের ঝরাপাতা (১৯৫৮) নবীন রবির আলো (১৯৬১) ঈশপের গল্প (১৯৬৪) এছাড়া ছ-ছটা বই একই সঙ্গে প্রশংসাপত্র নিয়ে এসেছে।

—এই বিশাল পরিকল্পনা একা চালাচ্ছেন মহেন্দ্রবাবু; আপনার পর এই ভার কাকে দিয়ে যাবেন ভেবেছেন?

ঃ সে এক সমস্যা। ধরো—বড় ছেলে সে তো পড়াশোনা নিয়েই আছে, তার এসব পছন্দ নয়। মেজো ছেলে চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট, সেও আসতে রাজী নয়। কি করি কি করি ভেবে ছোট ছেলে দেবজ্যোতি ইঞ্জিনীয়ার তাকেই বুঝিয়ে দিচ্ছি। সামনের মাস থেকে ও-ই দেখবে প্রোডাকশন অ্যাডমিনেস্ট্রেশন আর এডিটোরিয়াল দিকটা দেখবে আমার মেয়ে অঞ্জলি।

—নাঃ নোবেল-টোবেল গল্প ছাপবো না ভাবছি এখন বুপকথার কথা। তাছাড়া যে পরিমাণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে তাতে নতুনভাবে ইংরেজী বইয়ের কথা ভাবতে হচ্ছে।

আবার ফিরে যাই সেই পুরনো দিনে। বরিশাল জেলার কাশীপুর গ্রাম বাংলার স্নেহচ্ছায়ায় রামায়ণ মহাভারত লক্ষীর পাঁচালী শুনে যে ছেলেটি পড়তে পড়তে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল স্বদেশী আন্দোলনে। কপালের ঘাম মুছে প্রেসের কালিকুলিতে যার কর্ম জীবন সুরু আজকের কলকাতার রাস্তায় হু হু করে বেরিয়ে যাওয়া এয়ার বাসাডের কোনে বসা সেই মনস্বীটিকে চিনে নিতে আমার একটুও অসুবিধে হয় না। আশি বছর আগে একটা বই সম্পাদনা করতে গিয়ে সরস্বতী প্রেসে ওঁকে যে চেহারা যে টিফিন খেতে দেখেছিলুম আজও ঠিক সেই জামাকাপড়ে ঠিক একইভাবে বসে ৭৭ বছরের যুবককে দেখে একটুও অবাক হইনি।

আসল খাঁটি মানুষ পালটায় না।

শান্ডিল্য চতুর্বেদী

বাতিদান ॥

শংকর চট্টোপাধ্যায়

ঠিক মানুষের মত মৃত বাতিদান।
নিরালম্ব
বায়ুভূক অথচ মায়াবী।

শ্মশানবন্ধুরা শুধু গিয়েছে হারায়ে
শকুনের ছায়াখানি লম্বালম্বি ঢেকেছে চৌকাঠ
বস্তুত নীলামদার প্রাণের সুষমাটুকু হেঁকেছে চারগুণে
ক্রেতারা কৌতুক করে দাম ফেলে এক কাহন কড়ি।

অনেক মৃত্যুর কথা ভুলে গেছি
শুধু বাতিদান—স্মৃতির ভেতর থেকে গহীন লতার মত ঝুঁকে
রয়েছে নিভৃতে একা ধূ ধূ।

শুধু
অন্ধকারে হাওয়া লেগে মাঝে মাঝে কেঁপে ওঠে জন্ম রাজবাড়ি
সলতের বোঁটায় পাংশু বাতিদান
ক্রমাগত লালরেখা মৃত্যুরও কটাক্ষ মুছে দেয়।

এখানে যদিও সমুদ্র নেই ॥

অসিতরঞ্জন দাশ

এইসব বিস্রস্ত চেতনার কূলে লোনাগন্ধ সাগরের স্বাদ।
এখানে যেহেতু সমুদ্র নেই শুধু প্রতীক্ষা ঝড়ের
নিঃসংগ নক্ষত্রের মত
স্বরচিত আর্তি নিয়ে হরত খুঁজেছ কখনও
জীবনের আতপ্ত আঘ্রাণ।
তুমি তাই বহুবার ফিরে আস
দুর্মর আকাংক্ষা বুকে সাগর-পাখির মত
আর্তি নিয়ে ফের।

এখানে সমুদ্র নেই শুধু অনুভব।
এখানে সমুদ্র নেই শুধু একমুঠো বিস্ময়।

তীর্থপথ ॥

ফণী বসু

স্তব্ধ অন্ধ গলি
দূরের মন্দির
পরিশ্রান্ত পা দুখানি
ভঙ্গুর শরীর
তীর্থে পদধ্বনি তবু
প্রত্যয় গভীর

পিচ্ছল হাতল
ব্যগ্র দুটি হাত
ব্যগ্র দুই মুঠি আর
পাথুরে আঘাত
বস্ত্রান্ত গোধূলি
ভাঙা হাতিয়ার
ঝরা ক্ষুব্ধ ধূলি, আর—
নিষ্পিষ্ট সেতার

তৃষ্ণার্ত দুচোখ
ভিতরে আরতি
তীক্ষ্ণ মধ্যরাত
পরিশ্রান্ত পা দুখানি
ব্যগ্র দুই হাত
পূজারী দৃষ্টির তৃষা
মুমূর্ষু প্রভাত।

উপন্যাস

মোহিনী আট্টম

চিত্তরঞ্জন মাইতি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইন্দ্র গাড়ী চালাবার কথা পাড়তেই সরিতা বলল, আপত্তি কিছু নেই, তবে রাতে অচেনা পথে ড্রাইভ করতে গেলেই অসুবিধেয় পড়তে হবে। তার চেয়ে আমি যেমন হাল ধরেছিলাম তেমনি ধরে থাকি আজ রাত্তিরটা। ফেরার পথে আপনিই না হয় কাণ্ডারী হবেন।

ইন্দ্র বলল, তথাস্তু। কিন্তু সারারাত ধরেই কি গাড়ী চালাবেন নাকি?

গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সরিতা বলল, ক্ষতি কি। আপনার বুঝি খুব ঘুম পেয়ে যাবে?

ইন্দ্র বলল, আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পথে চালাতে গিয়ে আপনারই স্টেইন হবে বেশী। ঘুম পেলে আপনারই পাবে। আমি তো আরামে পাশে বসে অন্ধকারের রূপ দেখতে দেখতে চলব।

সরিতা বাঁকের মুখে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, চুপচাপ বসে থেকে ঝিরঝিরে হাওয়ায় গা জুড়োবেন, তারপর রাতের আকাশে তারা দেখবেন, এরপর স্বপ্নের পরীরা আপনাকে ছেড়ে দেবে ভাবছেন?

ইন্দ্র বলল, তাহলে গাড়ী চালাতে চালাতে আর একটি কাজ করতে হবে আপনাকে।

কি কাজ?

গান। গান গেয়ে পাশের মানুষটিকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

সরিতা বলল, আপনার বাদশাহ নাতি হয়ে জন্মান উচিত ছিল। পাশে সারাক্ষণ থাকত ইয়ার দোস্তের দল। সরাব খেয়ে ঝুমুর। হারেমের নর্তকীরা নাচ দেখিয়ে কেড়ে নিত চোখের ঘুম। আঁখির ইসারায় ঝড় তুলত বুকে।

হঠাৎ একটুখানি থেমে একেবারে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে চলে গেল সরিতা, আচ্ছা কেমন লাগল সেদিন প্রেমার নাচ?

ইন্দ্র বলল, বুকে ঝড় তোলার মত।

সবিতা অমনি বলল, তার মানে আপনি বলতে চান প্রেমা হারেমের নটী!

ইন্দ্র বলল, আমি কি দশানন যে ঘাড়ের ওপর বসানো দশ-দশটা মাথার নটা খসালেও একটা অন্তত আস্ত থাকবে।

সরিতা এবার টেনে টেনে বলতে লাগল, বলুন না সত্যি করে, সেদিন কেমন লাগল প্রেমাকে?

ইন্দ্র বলল, প্রেমাকে না তার নাচকে?

সরিতা গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ী চালাতে চালাতে আর কথা বলল না।

ইন্দ্র সবিতার দিকে চেয়ে চেয়ে দারুণ মজা পাচ্ছিল।

সে আবার রাগিয়ে দেবার চেষ্টা করল, সত্যি সরিতা, সেদিন প্রেমার নাচ দেখে সারা গন্ধমাদনপুরম প্যালেসের এমন দর্শক ছিল না, যে না প্রেমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

সবিতা চেঁচিয়ে উঠল, তুমিও।

পরক্ষণেই বলল, সরি, একসট্রিমলি সরি, আপনিও?

ইন্দ্র বলল, ক্ষেপেছেন, মালিকের সঙ্গে প্রেম। তাহলে প্রেম আর চাকরী দুটোই খোয়াতে হবে।

সরিতা সামনের আলো ঝলমল পথের দিকে চেয়ে গাড়ী চালাতে চালাতে বলল, আপনি তো চাকরীর ভারী পরোয়া করেন।

ইন্দ্র করুণ গলা করে বলল, বিশ্বাস করুন, চাকরী হারালে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। ঐ দুর্বল জায়গাটায় দয়া করে আঘাত করবেন না।

কিছু পথ ড্রাইভ করে এসে সরিতা গাড়ী থামাল এক আলো ঝলমল বাড়ীর সামনে।

ইন্দ্র বলল, এ কোথায় এলাম?

সবিতা বলল, এ, বি, সি, তে।

ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল, হেঁয়ালিটা তো বুঝতে পারছি না।

সরিতা বলল, জলের মত তরল। অষ্ট-মুদ্রী বোট ক্লাব। সংক্ষেপে সবাই একে এ, বি, সি, বলে থাকে।

ওরা নামল গাড়ী থেকে। ভেতরে গিয়ে সরিতা একটা স্পেশাল ব্যবস্থা করে নিল। বোট ক্লাব থেকে ভাড়া করল একখানা বোট। সন্ধ্যায় কিছু সময় ওরা ঘুরে বেড়াবে অষ্ট-মুদ্রী লেকের জলে।

ক্লাব সেক্রেটারী বললেন, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠে গেছে। তবে এখনও নারকেল গাছের জটলার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। তারপর চাঁদের আলোয় বোটে বেড়াতে ভালই লাগবে।

সেক্রেটারীর পরামর্শমত ওরা এই সময়টুকু ক্লাবের ভেতর টেবল টেনিস বোর্ডেই কাটিয়ে দিতে মনস্থ করল।

ইন্দ্র বলল, কবে কলেজের বোর্ডে খেলেছি, তারপর এই ব্যাট ধরছি। আপনার হাতে হার আমার নিশ্চিত।

সবিতা বলল, আপনার মত বিনয় আমি করব না। রোজ কলেজের বোর্ডে একবার

কাল আমি আর মীনাক্ষী প্র্যাকটিশ করি। তবে প্রতিপক্ষের হাতের মার না দেখলে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে কিছু আঁচ করা যাবে না।

খেলা শুরু হয়ে গেল। সবিতা সার্ভিস পেল। তিন তিনটে সার্ভিসে ইন্দ্র প্রায় ব্যাট ছোঁয়াতেই পারল না। দারুণ স্পিন সবিতার সার্ভিসে। চতুর্থ সার্ভিসের পর থেকেই খেলার মোড় ফিরল। স্ম্যাশ আর প্লেসিং-এর কৌশলে ইন্দ্র পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে লাগল।

জমে উঠল খেলা। ইন্দ্র ধীরে ধীরে আত্ম-বিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে। সবিতার হাতে স্পিন আছে, স্ম্যাশও আছে। সবচেয়ে সবকাবী যা আছে তা হল ওর বিদ্যুৎ গতিতে সঞ্চরণের ক্ষমতা।

অনেকগুলো দর্শনীয় র‍্যালি করল ওরা। কয়েকজন ক্লাব মেম্বার ওদের খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকে পড়ল সবিতার দিকে। ও পয়েন্ট পেলে উল্লাসে ফেটে পড়তে লাগল তারা, আবার পয়েন্ট হারালে ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক করে জিভ দিয়ে হাওয়া বের করে একটা দুঃখের শব্দ তুলতে লাগল। কিন্তু গেম দুই আর একে ছিনিয়ে নিল ইন্দ্র।

সবিতা খেলার শেষে প্রতিপক্ষের হ্যাণ্ড-শেক করতে এসে ইন্দ্রর দিকে চেয়ে কেমন এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। ইন্দ্রকে তার এই মুহূর্তে কেন জানি না অনেক বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হল।

ইন্দ্র উজ্জ্বল আলোয় দেখল, সবিতার সারা মুখ ঘামের জলে নেয়ে আশ্চর্য মসৃণ আর লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। মুখে পরাজয়ের চিহ্নমাত্র নেই, বরং একটা পরিতৃপ্তি সারা চোখেমুখে খেলা করছে।

ক্লাব সেক্রেটারী মনে করিয়ে দিলেন চাঁদ এখন নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে বেশ খানিক ওপরে উঠে গেছে।

ইন্দ্র আর সবিতা জেটি থেকে একটা বোটে উঠে বসল। চালক বোট চালিয়ে নিয়ে চলল অষ্টমুদী লেকের তীর ঘেঁষে। চাঁদের আলো জলের বুকে ছোট ছোট ঢেউগুলোর গায়ে রুপোলী পালিশ লাগাচ্ছিল। নৌকোর তলায় জলের ধাক্কায় একটা সুখকর শব্দ উঠছিল। গান গাইছিল সবিতা। ইন্দ্র ওর উচ্চগ্রামী গলার কাজ দেখে মনে মনে তারিফ করছিল। সম্ভবত লোকসংগীত, হয়ত বা কোন সিনেমার গান। যা হোক, এই পরিবেশে গানের সুরে একটা যাদুর খেলা চলছিল।

গান থামলে ইন্দ্র বলল, হোটেলের কোন ঘরে বসে গানটা গাইলে আপনি দারুণ প্রশংসা পেতেন।

সবিতা অবাক হয়ে বলল, তার মানে এই পরিবেশে গানটা আপনার ভাল লাগেনি।

ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে বলল, ঠিক তার উল্টো। বরং এই পরিবেশে এত ভাল লেগেছে যে প্রশংসার ভাষা এখানে অচল। শুধু কান পেতে শোনা আর হৃদয় ভরে অনুভব করা।

সবিতা বলল, সুরটা কার দেওয়া বলুন তো?

ইন্দ্র বলল, মালয়ালম কোন লোকসংগীত বলে মনে হয়। আমি তো মালয়ালী সুর-কারদের চিনি না।

সবিতা বলল, এইখানেই জিতে গেলেন সুরকার। আসলে এ গানের সুর যিনি দিয়েছেন তিনি কেরালার লোকই নন।

ইন্দ্র বলল, কি রকম?

সবিতা বলল, অনুমান করুন।

তাহলে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়তে হবে,— বলল ইন্দ্র।

সবিতা বলল, অনুমান করুন। আপনার দেশের মানুষ।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রের, সলিল চৌধুরী?

সবিতা বলল, তবু শেষরক্ষা করলেন। সলিল চৌধুরীর সুর কেরালার মানুষদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ইন্দ্র বলল, ওঁর সুর কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজে। জল, মাটি, আকাশ আর আলোর সঙ্গে ওঁর সুরের আশ্চর্য মিতালী।

আরও দুখানা গান গাইল সবিতা। দক্ষিণী সুরের অদ্ভুত গলার কাজ। মনে হচ্ছিল লেকের জলে বৃষ্টির ছোট বড় ফোঁটা দ্রুত জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে।

জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া রুপোলী পরাগে লেকের জল রহস্যময়। নারকেলের পাতায় আলো পড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মনে হচ্ছিল। যেখানে বন নিবিড় সেখানে অন্ধকার জমে আছে।

হঠাৎ ইন্দ্রের চোখে পড়ল অন্ধকার বনের ঘন পল্লবের ভেতর থেকে আলোর ফুলকি উড়িয়ে জোনাকিরা বেরিয়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গী। এমন সহস্র সহস্র জোনাকীর নাচ এর আগে কখনও দেখেনি ইন্দ্র। জ্যোৎস্নার আলোয় বেরিয়ে এসেই ওরা কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

আটটি বাঁক নিয়েছে, তাই নাম তার অষ্ট-মুদী। কুইলন জেলার বিখ্যাত কায়েল এটি। নদীরা জন্ম নিচ্ছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায়। ভূজঙ্গ ভঙ্গিমায় নেমে আসছে পাহাড়ী পথে সমভূমির ওপর। পশ্চিমঘাট থেকে আরব সাগরের দূরত্ব বা কতটুকু। তারই ভেতর নদীরা সৃষ্টি করেছে স্বাভাবিক জলা-ধার। নীল রুপোয় মেশান জল ঝলমল করছে। নদী, ক্যানেল, লেগুন, ব্যাকওয়াটারে দেশটা যেন রুপোলী জালে ঢাকা। ত্রিবান্দ্রম থেকে তিরুর অব্দি প্রায় সোয়া দুশো মাইল পথ এই ব্যাকওয়াটারে যাওয়া যায়। সবুজ ক্ষেত, হায়াথন নারিকেল বীথি, লাল টালির ছাওয়া কোনা উঁচু ঘর, হঠাৎ জেগে ওঠা গীর্জার মাথা দেখতে দেখতে সূর্য আর চন্দ্রের উদয় অস্তকাল যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তার ঠিক নেই। ব্যাকওয়াটার আর নীল আরবসাগরের মাঝে ছোট পরিসরের যে জমিটুকু বরাবর উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে, তার বুকে জেগে আছে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ। চোখ জুড়িয়ে যাবে, যদি কেউ এই সবুজ সমারোহের ভেতর দিয়ে দিনের পর দিন একটি চুরুলন ভাল্লমে চেপে ব্যাক-ওয়াটারের জল কেটে কেটে বেড়িয়ে বেড়ায়। এখানকার জ্যোৎস্নায় আরব্য রজনীর রহস্য-পরাগ ওড়ে। এখানকার বনে দারুচিনি বনের গন্ধ ভেসে আসে। এখানকার তেরামালা পাখির উড়ে চলায় সারা আরব সাগরের উচ্ছ্বাস।

কথাগুলো বলছিল সবিতা। ইন্দ্র শুনে-ছিল ভাল্লমে বসে। অষ্টমুদী লেকের জল, তীরের আলো আঁধারি বনভূমি, পুত্তরীদের উড়ে চলা রুপোলী জলপ্রবাহের মত জ্যোৎস্নার ঝরে পড়া, ভাল্লমের তলায় নিরন্তর ছলছলানি গান, তরুণ-তরুণীর মুখোমুখি বসে থাকা সব মিলিয়ে এই মুহূর্তগুলোকে অনন্ত কোন কাল প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারা বলে মনে হয়। খণ্ডকালের পাত্র উপচে যেন গড়িয়ে পড়ছে নিত্যকালের সুধা।

ইন্দ্র বলল, আমরা কোন একদিন বেরিয়ে পড়ব একখানা ভালাপপরায় চেপে এই আশ্চর্য দেশটাকে আবিষ্কার করতে। বোম্বেরে পড়ব, জ্যোৎস্নায় ভিজব কায়েলের জলে পানকৌড়ির মত ডুব দিয়ে উঠব। নিভৃত নারিকেল বনের আলোছায়ার তলায় পা ছড়িয়ে বসে অনেক অনেক পুরোনো বিস্মৃত দিনের গল্প বলে যাব।

সবিতা বলল, আপনার এ চাকরী নেওয়া ঠিক হয়নি, আপনি দারুণ রকম রোম্যান্টিক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেই আপনাকে মানাত ভাল।

ইন্দ্র হাত পেতে বলল, বসন্ত দিন ম্যাডাম আমি এখনি চাকরী ছেড়ে বিশ্ব ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি।

সবিতা হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। দুটো হাত পেছনের চুলের ভেতর চালিয়ে গলায় বাঁধা স্বর্ণসূত্রটা খুলে ফেলল। তার-পর বুকের জম্পরের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল লকেট সমেত হারটা। চাঁদের আলোতেও দামী হীরেগুলো ঝলমল করছিল।

বলল, আপনার হাতখানা দিন তো দেখি।

ইন্দ্র বলল, কেন?

সবিতা বলল, এত প্রশ্ন করছেন কেন, দিন না। ভয় নেই, চিরদিন ধরে রাখব না।

ইন্দ্র বলল, আমি তাই বলেছি বুঝি।

ইন্দ্র হাতখানা সবিতার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সবিতা ইন্দ্রের মণিবন্ধে তার হার-খানা জড়িয়ে বেঁধে দিতে দিতে বলল, আমি যে দিতে পারি, এই সামান্য হারটুকুতেই তার সূচনা হোক।

ইন্দ্র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হারটা হাত থেকে খুলে ফেলে বলল, কি পাগলামো করছেন। এই দামী হার নিয়ে আমি করব কি?

সবিতা বলল, নিশ্চয়ই পরার জন্যে দিইনি। বিক্রি করে যে টাকা পাবেন তাতে কাছে-পিঠে কোন জায়গায় যাবার টিকিটের দামটা হয়ত মিলে যেতে পারে।

ইন্দ্র বলল, পায়ে চষে বেড়াব, চাই কি বাঁবিনসন ক্রুশোর মত কাঠ জুড়ে ভেলা বানিয়ে ভাসব তবু আপনার ঐ সুন্দর গলা থেকে হারখানাকে ছিনিয়ে নেব না।

সবিতা হাত বাড়িয়ে বলল, দিন, ফিরিয়ে

দিন আমার হার। ভুল করেই আপনাকে দিয়েছিলাম।

ইন্দ্র বলল, আপনি নিশ্চয় ফিরিয়ে নেবার জন্যে দেননি। একেবারে দান করেই দিয়েছেন।

সরিতা চুপচাপ বসে রইল ইন্দ্রের দিকে চেয়ে। যে পাওকায়ম, ভাল্লমটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সে বলল, এখানে বসার একটা ভাল জায়গা আছে। আপনারা ইচ্ছে করলে ডাংগায় উঠে বসতে পারেন।

ইন্দ্রের মনে হল লোকটি রসিক। একটুখানি নিভৃতে কথা বলার সুযোগ করে দিতে চায়।

ইন্দ্র অমনি বলল, সিগারেট পাওয়া যাবে কাছেপিঠে কোথাও

লোকটা একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, মিনিট পনের বসুন ওখানে। আমি ভাল্লম নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। কিছুদূরে দোকান আছে, এনে দিচ্ছি।

ওরা উঠে বসল, নারকেল গাছের তলায় একটা সুন্দর বাঁধান সিমেন্টের বেদীর ওপর। লোকটি তিবতিব করে ভাল্লমটা বেয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

পাশাপাশি বসেছিল ওরা। ভাল্লমের জল কেটে চলে যাবার সময় ভেঙে ধবধবে জ্যোৎস্না ইতস্তত ছড়ান হয়ে ঝিলমিল করে উঠল। এই মুহূর্তে কাউকে কিছু বলা ইন্দ্র বুঝতে পারছিল না।

একটা ঢিঢ়ের দিকে চেয়ে হাসল।

সরিতা বলল, আপনাকে প্রিয়জন বলে ভাবতে পারি, এ স্পর্ধাটুকু কি আপনি সহ্য করেন?

সরিতা মিষ্টি হেসে বলল, এতদিন তাহলে আপনি কি আমাকে অপ্রিয় বলে ভেবে এসেছেন?

ইন্দ্র বলল, পদ্মনাভপুরম প্যালেস থেকে নাচ দেখে ফেরার দিন বিকল গাড়ীর ভেতর বসে অন্ধকারের বোরখা ঢাকা একখানা মুখকে আমার বুকের ভেতর ধরে রেখেছিলাম—এ ঘটনাটাকে আমার আজও দারুণরকম অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়।

সরিতা ইন্দ্রের একখানা হাত তুলে নিয়ে তার সাবা মুখে ছুঁইয়ে আবার কোলের ওপব রেখে দিয়ে বলল, আমাকে স্পর্শ করেও কি আপনার বিশ্বাসটুকু ফিরে আসছে না?

ইন্দ্র বলল, সবিতা লোভ দেখাবেন না আমি তো মানুষ হয়ত আপনার সম্মান রাখতে পারব না। চপলতা ঘটে যেতে কতক্ষণ! তখন বিবেকটাকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অবাধ আবেগের স্রোত।

সবিতা বলল, চাবদিকে লক্ষ্য নজর রেখে ভেবে চিন্তে কেউ কোনদিন কাউকে ভালবেসেছে, এমন নজির একটা দেখাতে পারেন?

ইন্দ্র বলল, এতদিনে আশ্বস্ত হলাম। আমার পাশে বসে যে মেয়েটি তার কোলের ওপব আমাব হাতখানাকে তুলে নিয়েছে, সে একেবারে চন্দ্র সূর্যের মতই সত্যি। আর সে আমার মত একটি অতি সাধারণ ছেলেকে ভালবাসে।

সরিতা তার কোলের ওপর রাখা ইন্দ্রের হাতটা নিজের দু হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, বাসেই তো। অসাধারণ কিছু সে নিজেও নয় তাই অসাধারণ কাউকে ভালবাসার ইচ্ছেও তার নেই।

ইন্দ্র বলল, আমার হাতে তোমার গলার মালা। এ মালায় তোমাব অযাচিত দানের স্পর্শ মাখান। দরিদ্র আমি, তাই সেই মালাটাই তোমাকে পরিয়ে দিয়ে আজ প্রিয়জনকে কিছু দেবার আনন্দটুকু পেতে চাই।

ইন্দ্র মালার দু প্রান্ত ধরে যত্ন করে পবিয়ে দিল সরিতাব গলায়।

চুপচাপ জলের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল সরিতা। পরে ইন্দ্রের হাতেব পাতায় নিজের মুখখানাকে ঢেকে ফেলল।

ইন্দ্র বলল, আমি বুঝতে পারছি না সরিতা এই আশ্চর্য মুহূর্তটা, আমাদেব ভাগ্যে কি লেখা লিখে দিয়ে গেল। সে বিধাতা পুরুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুঃখ সুখ দুটোই তাঁর হাতে। নিঃশব্দে এসে কখন কি তিনি দিয়ে যাবেন তা আমাদেব অজানা। শুধু হাত পেতে নিতে হবে।

সরিতা ইন্দ্রেব হাতখানা কোলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, তাই মেনে নেব। সুখ আমরা নিশ্চয় চাইব, কিন্তু দুঃখকে দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব না।

ইন্দ্র বলল, তোমাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে সরিতা।

সরিতা বলল, উঁহু আগে ভুলটা শুধরে নিন, তারপব প্রশ্রয় দেবার কথা ভাবা যাবে।

ইন্দ্র পকেট থেকে লটারীর সেই দশ পয়সাটা বের করে কায়েলের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, আমাদেব সেই লটারীব ভূতটা এতক্ষণে অগাধ জলেব তলায় ডুবে মরেছে। আর আমরা তাকে কোন মতেই বাঁচিয়ে তুলব না।

কথা শেষ করেই বুকের কাছে সরিতাব মাথাটাকে টেনে এনে ইন্দ্র বলল, কখনো কি কোন প্রেমিক প্রেমিকাকে কেউ বলতে শুনেছে, 'আপনাকে একটু আদর করতে ইচ্ছে করছে আমাব।'

বলেই ইন্দ্র নিজেব মুখখানাকে সরিতাব মুখের কাছে নামিয়ে আনল।

সরিতা বাঁ হাতেব তিনটে আঙুলে ইন্দ্রেব নেমে আসা মুখের সামনে একটা দুর্বল প্রতিরোধের বেড়া গড়ে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু ভেঙে গেল সব প্রতিরোধ। ইন্দ্রের বলিষ্ঠ ঠোঁটের পেষণে সরিতার কাঠালী চাঁপার মত দুটি ঠোঁটে বন্যার একটা ঢেউ উঠল।

সরিতা নিজেকে যখন মুক্ত করে নিল ইন্দ্রেব বুকের বাঁধন থেকে তখন দুজনেই লজ্জা পেল কায়েলের দিকে তাকিয়ে।

এলোমেলো পাথর ফেলা সিঁড়ির তলায় কখন নিঃশব্দে এসে ভিড়েছে ভাল্লমখানা। নৌকোর ওপর সিলুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে পাওকায়ম। ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চাঁদ দেখছে।

সরিতা উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত ঘুরিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিল। ইন্দ্র চুপি চুপি বলল, লোকটার কথা বেমালুম ভুলে বসেছিলাম।

সরিতাব গলায় মৃদু তিরস্কার বেজে উঠল, ভুলে যাওয়াই তো তোমাদের স্বভাব।

ওদের গাড়ী যখন এসে পৌঁছল কারুনাগপল্লীতে তখন ঘড়িব কাঁটা দশটার ঘর ছুঁই ছুঁই। একটা পড়ো জমির আগাছা ভবা অস্পষ্ট পথের ওপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে সবিতাব গাড়ী এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল কটা লম্বা ইউক্যালিপটাস গাছের তলায়।

ইন্দ্র দেখল, সামনে একখানা পুরোণো দিনেব ভগ্নপ্রায় পেল্লাই বাড়ী। পেছনে নারকেল বাগান। টগরফুলের মত জ্যোৎস্না ফুটে আছে চবাচরে।

গাড়ী থেকে নেমে পুরোনো পরিত্যক্ত প্রায় কেটেডমের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল সরিতা। পাশে এসে দাঁড়াল ইন্দ্র। সে শুধু সরিতার সঙ্গী। এই রহস্যপুরী সম্বন্ধে সে একেবারে অনভিজ্ঞ।

সরিতা কোন কথা বলছে না কোন রহস্যের আবরণ সবাচ্ছে না কেবল এক একবার বাঁ হাতের ঘড়িখানা চোখের সামনে তুলে ধরে চাঁদের আলোয় সময় দেখছে।

একটা দবজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। পবক্ষণেই এক বৃদ্ধের গলা বেজে উঠল।

'আহারম্ করিষ্যাতর উদ্ভাগিল ওয়ারিকা।'

তিন বার এমনি করে হাঁক দিল বৃদ্ধ।

'এমন কে আছ, যার আহার হয় নি এখনও, চলে এসো।'

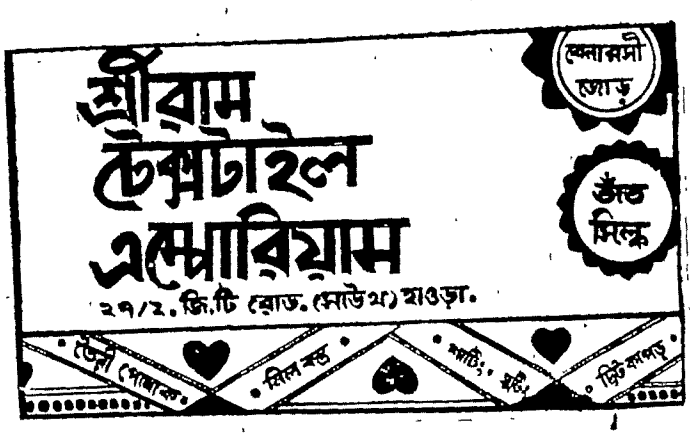

বৃদ্ধের গলা থেমে গেলে সবিতা দ্রুত পা চালিয়ে ঐদিকে যেতে যেতে বলল, এসো।

ইন্দ্রও তাকে অনুসরণ করল।

বৃদ্ধ জীর্ণ বিবাট দরজাটা ভেজিয়ে দেবার জন্যে ভেতর থেকে উদ্যোগ করছিলেন, সবিতা তাঁর সামনে গিয়ে জানু ছুঁয়ে নমস্কার করল।

কে!

আমি তোমার ডাক শুনে এলাম আম্মাওয়ন।

কে, কে তুই সবিতা! —বৃদ্ধের গলা আবেগে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন সবিতাকে।

ইতিমধ্যে হাতে নিলা ভিলাক্কু নিয়ে একটি মেয়ে ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। প্রদীপের আলোয় মেয়েটিকে মনে হচ্ছিল একটি গন্ধরাজ ফুল। ধবধবে সাদা কাপড়ে আশ্চর্য লাবণ্যে ভরা একটি মূর্তি। বয়সে প্রেমাকেই মনে করিয়ে দেয়।

সবিতা! —মেয়েটির গলায় বিস্ময় বেজে উঠল।

ইন্দ্র বুঝল, সবিতার সঙ্গে এই পরিবারটির নিবিড় ঘনিষ্ঠতা।

মেয়েটি ইন্দ্রের দিকে চেয়ে মুখ নীচু করতেই সবিতা বৃদ্ধকে বলল, আমাদের

বৃদ্ধ হাত তুললেন। ইন্দ্র এতক্ষণে পরিবারের একটি বন্ধু সঙ্গে রয়েছেন। বুঝতে পারল বৃদ্ধ ভদ্রলোক অন্ধ। ইন্দ্র এগিয়ে গিয়ে নত হয়ে নমস্কার করে বলল, আমার নাম ইন্দ্র, ইন্দ্র রায়।

বৃদ্ধ বললেন, মনে হচ্ছে বাঙালী।

সবিতা উত্তর দিল, হাঁ আম্মাওয়ন উনি বাঙালী।

বৃদ্ধ হঠাৎ বললেন, আসুন আপনি আজ আমার বিশেষ অতিথি। বাঙালীদের আম ভালবাসি। দেহ আর মনের দিক থেকে আমরা অনেক কাছাকাছি।

ইন্দ্র বলল, আমারও তাই মনে হয়। বিশেষ করে এই দুটি জাতির মানুষরা একটু বেশী রকমের ইমোশনাল। জানি না এটা খারাপ কি ভাল।

বৃদ্ধের মুখ ঐ নিলা ভিলাক্কুর স্বল্প আলোয় উজ্জ্বল দেখাল। বললেন—

'Emotion is not something shameful, subordinate secondrate, it is so supremely valid phase of humanity at its noblest and most mature.'

কথা কটি বলেই কিন্তু বৃদ্ধ আন্দাজে ইন্দ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরলেন।

ধরেই বললেন রাত হয়ে গেছে কথা বাড়াব না। চলুন যা আছে ভাগ করে খাওয়া যাক।

সবিতার হাত ধরে মেয়েটি প্রদীপ নিয়ে এগিয়ে চলল। বৃদ্ধ লাঠি একখানা ঠুকতে ঠুকতে অভ্যস্ত পথে তাদের অনুসরন করে চললেন। ইন্দ্র চলল সবার পেছনে।

খাবার আসনে বসেই ইন্দ্র কথায় কথায় অনেক খবর জানতে পারল। গোবিন্দন পিল্লাই একসময় গৃহশিক্ষক ছিলেন সবিতাদের। তখন করুণাকর ব্যবসায়ের ব্যাপারে এত ব্যস্ত ছিলেন যে মেয়েদের দিকে ঠিকমত নজর দেবার অবকাশ ছিল না তাঁর। সে সময় গোবিন্দন পিল্লাই চাকরী করতেন ঐ অঞ্চলে। পরিচয় হয় করুণাকরের সঙ্গে। ধীরে ধীরে যাওয়া আসা হতে লাগল দুই পরিবারের ভেতর। করুণাকর যখন বাইরে যেতেন তখন গোবিন্দন দেখাশোনা করতেন করুণাকরের মেয়েদের। গোবিন্দনের স্ত্রী তখন বেঁচে। তিনি মাতৃহীন দুটি মেয়েকে প্রায়ই নিজের কাছে ডেকে আনতেন। নিজের একটি মাত্র মেয়ে ললিতার সঙ্গে মিলেমিশে থাকত ওরা। শেষে ওদের লেখাপড়ার ভার পুরোপুরি করুণাকর দিয়ে দিলেন গোবিন্দন পিল্লাই এর হাতে।

স্ত্রী মারা যাবার পর গোবিন্দন মেয়ে ললিতাকে নিয়ে বদলী হয়ে আসেন কাবুনাগ পল্লীতে। তখনও সময় সুযোগ পেলে উৎসবে অনুষ্ঠানে দুটি পরিবারের ভেতর আসা যাওয়া চলত। আকস্মিকভাবে চোখের দৃষ্টি হারিয়ে বড় বেশী স্থবির আর গৃহাশ্রয়ী হয়ে পড়েছেন গোবিন্দন। পাঁচ ছ'বছরে যোগাযোগটা অনেকখানে ছিন্ন হয়ে গেছে তাই।

গোবিন্দন একসময় বললেন—জানেন মিঃ রায় মাধবী আম্মার কাছে প্রেমা নাচ শিখতে যেত তখন সবিতা চুপচাপ একটা গল্পের বই নিয়ে বসে থাকত আমার পাশের চেয়ারে। অফিসের সবাই ভেবে নিয়েছিল ও আমারই মেয়ে। অফিস থেকে ফেরার সময় ও নিজের ঘরে না গিয়ে ললিতার মায়ের কাছেই চলে আসত।

সবিতা বলল—ললিতার কিন্তু আমার সঙ্গেই ভাব ছিল বেশী। যদিও দিদির বয়সী ও।

ললিতা বলল—আমরা যত প্ল্যান করতাম তার সবটাই প্রায় গোপন করে রাখতাম প্রেমার কাছ থেকে।

গোবিন্দন হঠাৎ বলে উঠলেন—প্রেমা এল না কেন সবিতা?

সবিতা বলল—কেন আমি একা আসাতে মন ভরল না আম্মাওয়ন?

তুই চিরকাল ঝগড়াটে রয়ে গেছিস কুট্টি।

সবিতা বলল—প্রেমা নাচে বেশ নাম করেছে আম্মাওয়ন। ও গভর্ণমেন্টের ডাকে কদিন ওদের গেস্ট হয়ে আছে। নাচ দেখাতে হবে সরকারী ভি আই পি—মিডল ইস্টের কোন এক সফররত বাদশাকে।

গোবিন্দন বললেন—আমি জানি প্রেমা দারুন রকম টালেন্টেড।

সবিতা অমনি ফোঁস করে উঠল আর আমি বুঝি একেবারেই ফালনা?

অন্ধ গোবিন্দন আন্দাজে বাঁ-হাতটা তুললেন চাটি মারার ভঙ্গীতে কিন্তু সবিতা ততক্ষণে ছেলেমানুষের মত মাথাটা নীচু করে নিয়েছে।

ইন্দ্রের মনে হল এ খেলাটা অনেকদিনের পুরোনো। সেই পড়ানোর সময় হয়ত গোবিন্দন সবিতাকে শাসনের অভিনয় করতেন এমনি করে আর দুষ্টু সবিতাও ঠিক এমনিভাবে মাথাটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।

এখনও সবিতার ভেতর সেই কিশোরীটি বয়ে গেছে দেখে ইন্দ্রের ভীষণ ভাল লাগল।

খাওয়ার শেষে বৃদ্ধ গিয়ে বসলেন জ্যোৎস্না ধোয়া উঠোনের মাঝখানে একখানা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে। পাশের একখানা চেয়ারে বসল ইন্দ্র। দুটি বান্ধবী অনেকদিনের পরে একসঙ্গে হয়েছে তাই উঠে গেল ছাদের ওপর। সম্ভবতঃ ঘুমের আগে কিছুক্ষণ মনের কথা বলবে দুজনে।

গোবিন্দন বললেন—দুটো গপপে একসঙ্গে মিলেছে কখন নামে দেখুন। আপনি বরং ওঁর কথা না ভেবে বিছানায় চলে যেতে পারেন।

ইন্দ্র বলল—ওরা আমাকে শোবার জায়গাটা দেখিয়েই দিয়ে গেছে। কিন্তু কেন জানিনা রাত হলেও ঘুম আসছে না চোখে।

গোবিন্দন বলেন—ঘুম আমারও নেই মিঃ রায়। আজ চার-পাঁচ বছর রাতগুলো আমার কাছে বিভীষিকা।

গোবিন্দন পিল্লাই কথাগুলো দীর্ঘশ্বাসের মত শোনাল।

একটু থেমে আবার

নাতনি আছে আমার সে পাশে—একটা থাকে গলা জড়িয়ে। তাকে গল্প শুনে পাড়াতে হয়। ও ঘুমোলে প্রায় ঘুম রাত আমি জেগে কাটাই। ঘুম আসে না।

ইন্দ্র বলল—ডাক্তার কি বলেন?

গোবিন্দন বললেন—এ ডাক্তারের কে নয় মিঃ রায়। আমার ভাগ্য আমাকে নিয়ে খেলা করছে।

ইন্দ্র বৃদ্ধের কথার রহস্য ভেদ করতে পারল না। কিছু জিজ্ঞেস করা সমীচীন নয় ভেবে চুপচাপ বসে রইল।

গোবিন্দন নিজেই আবার কথা শুরু করলেন বেশ কেটে যাচ্ছে। বিধাতা চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিয়ে নতুন একটা জগতের দরজা খুলে দিয়েছেন সেখানে দিনে রাতে অনেকটা সময়ই নিজের সঙ্গে কথা বলি। অন্ধকার জগতটার আনাচে-কানাচে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াই।

ইন্দ্র অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল আজ আমরা যখন এখানে এলাম তখন আপনি অভ্যস্ত মানুষদের খাবার জন্যে ডাক দিচ্ছিলেন। ব্যাপারটা আমার কাছে বেশ নতুন বলে মনে হয়েছে।

বৃদ্ধ গোবিন্দন বললেন—এ আমার নতুন কিছু সৃষ্টি নয় কেরালার প্রাচীনপন্থী পরিবারে এই রীতি আজও চলে আসছে। আমার বাপ-ঠাকুর্দা এমনি করে রাতে খাবার আগে অভুক্তদের ডাক দিতেন আমিও তাই করি অতিথি আসুক আর না আসুক। ঠিক দশটা বাজলেই অতিথিদের ডাক দিই আমি।

ইন্দ্র বলল—অতিথি সেবার চলন ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ছিল কিন্তু এমন করে আজ আর বোধহয় ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ অতিথিদের ডাক দিয়ে ঘরে আনে না।

গোবিন্দন বললেন—সমাজ বদলাচ্ছে অনেক উন্নত প্রথা পদ্ধতির চলনও হচ্ছে কিন্তু লোপ পাচ্ছে এমন সব আচার-আচরণ যা ছিল আমাদের দেশের একেবারে হৃদয়ের জিনিস!

ইন্দ্র বলল—আমি একেবারে এ যুগের ছেলে হয়েও কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের সবকিছুকে ভুলতে পারি না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই হেসে বললেন—তাহলে তো আপনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেলেন এ যুগের চোখে।

ইন্দ্র বলল—আমাকে আপনি বলে ডাকলে দুঃখ পাব যদি তুমি বলে ডাকেন তাহলে খুশী হব অনেক বেশী।

গোবিন্দন তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র অন্ধ গোবিন্দনের হাত নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে রাখল।

গোবিন্দন বললেন—তুমি আমাকে বড় বেশী বিচলিত করে তুললে বাবা। আজ তোমার হাতে হাত রেখে একটা শোকের ঢেউ বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইছে।

ইন্দ্র বুঝল বৃদ্ধ গোবিন্দনের কোন কোমল জায়গায় আঘাত সে অন্তরঙ্গতার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—আপনাকে দেখে আমার বাবার মুখখানা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবাও অপরিচিতকে খুব তাড়াতাড়ি আপনার করে নিতে পারেন। আপনার মতই উনি একটু বেশী রকমের সেন্টিমেন্টাল।

গোবিন্দন কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। একসময় নিজের ভেতরের আবেগটুকু সামলে নিয়ে বললেন—বিরাট একটা পাথরের স্তূপ আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এমন কাউকে কাছে পাই না যাকে বুকের ভেতর জমে থাকা কথা-গুলো বলে একটু হালকা হতে পারি।

এবার ইন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই কান পেতে কোন কিছু শোনার চেষ্টা করলেন।

ওরা দু বান্ধবীতে গান গাইছিল ছাদের ওপর বসে। বোধহয় ছাদের অন্য প্রান্তে বসে গাইছিল তাই গানের কথা বা সুর স্পষ্ট হয়ে বাজছিল না।

গোবিন্দন বললেন—কোন কিছুর তোয়াক্কা করতাম না ইন্দ্র ভেবেছিলাম লোহা পিটিয়ে যেমন অস্ত্র বানায় তেমনি করে ভাগ্যকে গড়েপিটে আমি নিজের খুশী মত পথ তৈরী করে নেব। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল দেখলাম ভাগ্যই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের সবটুকু শক্তি জড়ো করে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে চাইলাম কিন্তু একটা লোহার ফ্রেমে আটকে দিয়ে ভাগ্য আমার সকল শক্তি কেড়ে নিল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। অন্ধ গোবিন্দনের নিজস্ব জগতে একটা কিছু আলোড়ন চলছে। ওদিকে দুটি কণ্ঠ এক হয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে সুর। দমকা হাওয়ায় এলোমেলো বৃষ্টিধারার মত সুর-গুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে।

গোবিন্দন বললেন—তোমার মত একটি ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বেশ প্রমিশিং বলে আমার মনে হয়েছিল। সবে ডাক্তারী পাশ করেছে। সার্জারীতে হাত ভাল দেখে ওকে ফরেনে পাঠানোই স্থির করলাম। একটিমাত্র মেয়ে আমার। কার জন্যে আর সঞ্চয় করব। ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলাম বিলেতে।

কিছুকাল নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল তারপর ওদিক থেকে খবর আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ললিতার মানসিক অবস্থা যে কি তা তুমি অনুমান করতে পার। সে তখন মা হতে চলেছে। যেদিন আমার নাতনী তাঁর ভূমিষ্ঠ হল তার ঠিক সাতদিন পরে এল এক টেলিগ্রাম আকস্মিক দুর্ঘটনায় ললিতার স্বামী মারা গেছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তার কোন এক বন্ধু।

ইন্দ্র একটা দুঃখের শব্দ তুলে বলল—মারা গেলেন।

বৃদ্ধ গোবিন্দন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এক সময় বললেন—ললিতা অন্তত তাই জানে। তাছাড়া আমার পরিচিত জনেরাও একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—মারা গেছেন এতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন কি! আমি ভাবতেও পারছি না এত অল্প বয়সে ললিতা তাঁর স্বামীকে হারালেন।

গোবিন্দন বললেন—স্বামীকে হারিয়েছে ঠিক কিন্তু সে ছেলেটি মারা যায়নি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে জার্মানীতেই সেটল করেছে। লন্ডনেই ওদের পরিচয় হয়েছিল তার পরিণতি ঘটল জার্মানীতে গিয়ে।

ইন্দ্র বলল—আপনার সংগ্রহ করা খবরটা কি সঠিক?

গোবিন্দন বললেন—আমার পরিচিত এক বন্ধু জার্মানীতে দীর্ঘদিন রয়েছে সে ওর ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—আপনি চিঠি দেননি?

গোবিন্দন হাসলেন। জ্যোৎস্নার রহস্যময় আলোয় সে হাসির অর্থ ভেদ করতে পারল না ইন্দ্র।

একসময় গোবিন্দন কথা বললেন—কি হবে চিঠি দিয়ে বল? যে নিজেকে চোরা পথে চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে আমার মেয়ের স্বামী বলে ভাবব! তার চেয়ে সে মারা গেছে একথা ভাবা অনেক বেশী শান্তি আর সম্মানের নয় কি?

ইন্দ্র বলল—ললিতাকে এই আসল খবরটা জানাননি কেন?

গোবিন্দন বললেন—সে সইতে পারবে না বলে। ওর মনটা ওর মায়ের মতই নরম। আমার মত মানসিক শক্তি ও পায়নি।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। গোবিন্দন বললেন— সবচেয়ে ট্রাজেডি হল ললিতা তার ঘরে ঐ প্রতারক ছেলেটার একখানা বড় ফটো টাঙ্গিয়ে রেখেছে। রোজ ফুলের মালা পরায়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়! মৃত্যুর দিনটিতে অভুক্ত থেকে পুজোআচ্চা করে মা আর মেয়েতে প্রার্থনা গীত গায়।

ইন্দ্র বলল—আশ্চর্য।

গোবিন্দন বলল—সবকিছু জেনে শুনেও আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর পাশে। গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকি এই প্রতারকটার মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে। ললিতার কান্নাভরা মুখখানা বুকের ভেতর চেপে ধরে সান্ত্বনা দিই।

ইন্দ্র বলল—একটা চরম মিথ্যেকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করতে হচ্ছে। এর চেয়ে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে।

গোবিন্দন বললেন—ইন্দ্র আমি অন্ধ হয়ে বেঁচেছি। যদি স্বাভাবিক চোখ নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতাম তাহলে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে পারত না। তাতে ওর বুকের যন্ত্রণাই বেড়ে যেত। এখন ও ইচ্ছে মত কেঁদে বাঁচে আর ওর কান্নাভরা মুখ দেখতে হয় না বলে আমিও বাঁচি।

ইন্দ্র খোঁজ নেয় ললিতার মেয়েটির বয়েস এখন কত?

গোবিন্দন বললেন—তা বছর পাঁচেক হল। ওই এখন ললিতার সান্ত্বনা তার ভরসা যাই বল।

(ক্রমশঃ)

সুনীল পাল

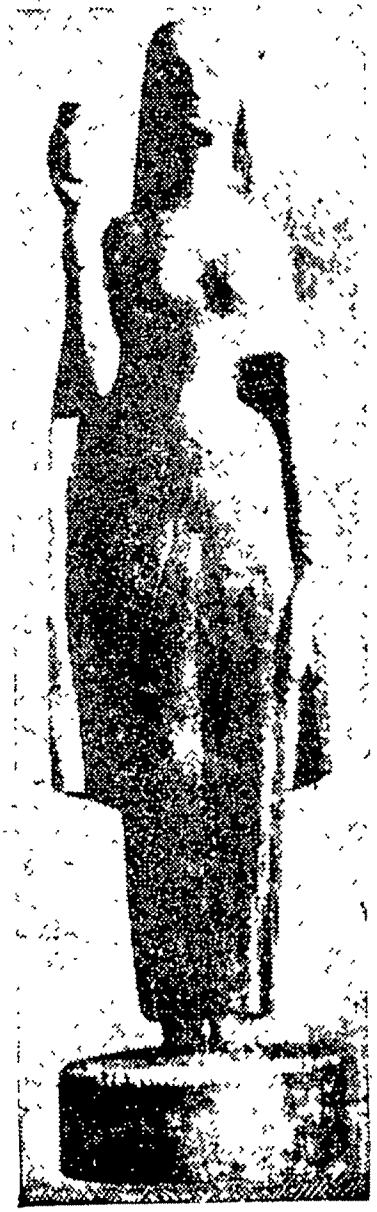

ওপরে শিল্পী—নীচে তাঁর একটি শিল্পকর্ম

আজকের সমস্যা-জর্জরিত জটিল অভাব-অভিযোগের দিনে অনেকে শিল্প-সংস্কৃতিকে অবাস্তব বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। মনে করেন জীবনের লড়াইয়ে যখন অস্তিত্ব রাখা দায় তখন আর শিল্প-টিল্প নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়?

কিন্তু শিল্পী সুনীল পালের ধারণা—যেমন উভয় পাখায় ভর করে পাখী উড়তে পারে, তেমনি আমাদের জীবনেও অর্থ-নীতি ও সংস্কৃতি দুয়েরই প্রয়োজন। অন্ন-বস্ত্রের অভাবে যেমন জীবন বাঁচে না, তেমনি সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বও বাঁচে না। একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

একালের শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে নানান কথা বলছিলেন শিল্পী সুনীল পাল। এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তারই কটি জোরালো অথচ অভিমানসূচক লাইন তুলে দিচ্ছি—বিষয়বস্তু, আঙ্গিক সকল বিষয়েই বেশীর ভাগ শিল্পী শিল্পের সকল নিয়ম, সকল ডিসিপ্লিন অবজ্ঞা করছেন। যার যা খুশী করেছেন। এ-উচ্ছৃঙ্খলতায় শিল্পের সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরছে। এইসব শিল্পীরাই আজ শিল্পকে খুঁচিয়ে হত্যা করছে। শিল্পের এ বীভৎস সৃষ্টিকে সাধারণ মানুষ আপন বলে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে। অনাস্থায় দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে রসিক এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছে। আর শিল্পীরা নিজেদের গ্রেট ইনটেলেকচুয়াল ভেবে একা একাই গৌরব-বোধ করছেন। এইভাবে শিল্পীরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। আজ উল্টোপথে সহজকে জটিল করে হেঁয়ালী করে; দুর্বোধ্য কবে স্রষ্টারা ভাবছেন অ্যাবসট্রাকট করছি। কিন্তু তাঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলা বুদ্ধিরই অপবিচ্ছন্নতা। এই অস্বচ্ছ ঘোলা দৃষ্টি নিয়ে অধিকাংশ শিল্পী আজ বীর্যবত্তার সঙ্গে কিছু সৃষ্টি করতে পারছেন না। বাস্তবিক এর চেয়ে পরিতাপের আর কি থাকতে পারে?

অধুনা সুনিপুণ ভাস্কর হিসেবে সুনীল পালের সমধিক খ্যাতি হলেও, এক সময়ে চিত্রকর হিসেবেও তাঁর নামডাক কম ছিল না। ভাবতীয় ভাবধারায় ছবি আঁকতেন। তাঁর বেশ কিছু ছবি দেখার সুযোগ ঘটেছিল, আমার শৈশবে। সেদিন শিল্পীর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, দু'-একটি ছাড়া তার সবই বেহাত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে?

শিল্পীর আঁকা প্রথম ছবি দেখি ছেলেবেলায় (আমরা তখন স্কুলের ছাত্র) হাতে লেখা পত্রিকা প্রগতির দৌলতে। চিত্রটির নাম শ্রীমতী। গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে কল্পিত দীপশিখা হাতে এক নারী। যেন 'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে' হুবহু রূপ নিয়েছিল চিত্রলেখায়।

কথায় কথায় শ্রীপাল আরও বললেন—আমার জীবনের প্রথম বড় কাজ নেপালের মহারাজা ত্রিভুবনের মূর্তি। আর শিল্পী হিসেবে জীবনে প্রথম স্বীকৃতি ও সম্বর্ধনা তোমাদের 'প্রগতি' পত্রিকার শনিবারের বৈঠকের সভ্যদের কাছে নেপাল যাবার আগে। সেসব দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। চিরকাল সজীব হয়ে থাকবে।

শিল্পীর জন্ম ১৯২০ সালে কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে। কিন্তু আস্তার জায়গা ছিল শোভাবাজার আর কুমারটুলী অঞ্চল। পড়তেন সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশনে। ছুটির দিন কিংবা স্কুলের শেষে কুমারটুলীতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতেন মূর্তি গড়া। বাড়িতে বাবা অল্পস্বল্প ছবি আঁকতেন। বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁর অসম্পূর্ণ ছবির কাজ সম্পূর্ণ করতেন। দাদামশায়ের ছিল ফটোগ্রাফের নেশা এবং পেশা। বাড়তি উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই তবে সুনীল পালের শিল্পানুরাগ মূলতঃ লালিত-পালিত হয়েছে স্নেহময়ী মায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। কারণ, স্কুলের চৌকাঠ পেরোবার পর আর্ট স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বাদ সাধলেন বাবা। বললেন—সখ করে

ইন্দ্র বলল—অতিথি সেবার চলন ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই ছিল কিন্তু এমন করে আজ আর বোধহয় ভারতের কোন অঞ্চলের মানুষ অতিথিদের ডাক দিয়ে ঘরে আনে না।

গোবিন্দন বললেন—সমাজ বদলাচ্ছে অনেক উন্নত প্রথা পদ্ধতির চলনও হচ্ছে কিন্তু লোপ পাচ্ছে এমন সব আচার-আচরণ যা ছিল আমাদের দেশের একেবারে হৃদয়ের জিনিস।

ইন্দ্র বলল—আমি একেবারে এ যুগের ছেলে হয়েও কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যের সবকিছুকে ভুলতে পারি না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই হেসে বললেন—তাহলে তো আপনি ব্যাকডেটেড হয়ে গেলেন এ যুগের চোখে।

ইন্দ্র বলল—আমাকে আপনি বলে ডাকলে দুঃখ পাব যদি তুমি বলে ডাকেন তাহলে খুশী হব অনেক বেশী।

গোবিন্দন তাঁর হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন ইন্দ্রের দিকে। ইন্দ্র অন্ধ গোবিন্দনের হাত নিজের দুটো হাতের ভেতর ধরে রাখল।

গোবিন্দন বললেন—তুমি আমাকে বড় বেশী বিচলিত করে তুললে বাবা। আজ তোমার হাতে হাত রেখে একটা শোকের ঢেউ বুকের ভেতর থেকে উঠে আসতে চাইছে।

ইন্দ্র বুঝল বৃদ্ধ গোবিন্দনের কোন কোমল জায়গায় আঘাত সে অন্তরঙ্গতার হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—আপনাকে দেখে আমার বাবার মুখখানা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে। বাবাও অপরিচিতকে খুব তাড়াতাড়ি আপনার করে নিতে পারেন। আপনার মতই উনি একটু বেশী রকমের সেন্টিমেন্টাল।

গোবিন্দন কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না। একসময় নিজের ভেতরের আবেগটুকু সামলে নিয়ে বললেন—বিরাট একটা পাথরের স্তূপ আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। এমন কাউকে কাছে পাই না যাকে বুকের ভেতর জমে থাকা কথাগুলো বলে একটু হালকা হতে পারি।

এবার ইন্দ্রের চুপ করে বসে থাকা ছাড়া করণীয় কিছু ছিল না।

বৃদ্ধ গোবিন্দন পিল্লাই কান পেতে কোন কিছু শোনার চেষ্টা করলেন।

ওরা দু বান্ধবীতে গান গাইছিল ছাদের ওপর বসে। বোধহয় ছাদের অন্য প্রান্তে বসে গাইছিল তাই গানের কথা বা সুর স্পষ্ট হয়ে বাজছিল না।

গোবিন্দন বললেন—কোন কিছুর তোয়াক্কা করতাম না ইন্দ্র ভেবেছিলাম লোহা পিটিয়ে যেমন অস্ত্র বানায় তেমনি করে ভাগ্যকে গড়েপিটে আমি নিজের খুশী মত পথ তৈরী করে নেব। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল দেখলাম ভাগ্যই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মনের সবটুকু শক্তি জড়ো করে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে চাইলাম কিন্তু একটা লোহার ফ্রেমে আটকে দিয়ে ভাগ্য আমার সকল শক্তি কেড়ে নিল।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। অন্ধ গোবিন্দনের নিজস্ব জগতে একটা কিছু আলোড়ন চলছে। ওদিকে দুটি কণ্ঠ এক হয়ে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে সুর। দমকা হাওয়ায় এলোমেলো বৃষ্টিধারার মত সুরগুলো ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে।

গোবিন্দন বললেন—তোমার মত একটি ছেলের সঙ্গে ললিতার বিয়ে দিয়েছিলাম। ছেলেটি বেশ প্রমিসিং বলে আমার মনে হয়েছিল। সবে ডাক্তারী পাশ করেছে। সার্জারীতে হাত ভাল দেখে ওকে ফরেনে পাঠানোই স্থির করলাম। একটিমাত্র মেয়ে আমার। কার জন্যে আর সঞ্চয় করব। ছেলেটিকে পাঠিয়ে দিলাম বিলেতে।

কিছুকাল নিয়মিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলেছিল তারপর ওদিক থেকে খবর আসা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

ললিতার মানসিক অবস্থা যে কি তা তুমি অনুমান করতে পার। সে তখন মা হতে চলেছে। যেদিন আমার নাতনী ভূমিষ্ঠ হল তার ঠিক সাতদিন পরে এল এক টেলিগ্রাম আকস্মিক দুর্ঘটনায় ললিতার স্বামী মারা গেছে। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল তার কোন এক বন্ধু।

ইন্দ্র একটা দুঃখের শব্দ তুলে বলল—মারা গেলেন।

বৃদ্ধ গোবিন্দন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এক সময় বললেন—ললিতা অন্তত তাই জানে। তাছাড়া আমার পরিচিত জনেরাও একথা বিশ্বাস করে নিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—মারা গেছেন এতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন কি! আমি ভাবতেও পারছি না এত অল্প বয়েসে ললিতা তার স্বামীকে হারালেন।

গোবিন্দন বললেন—স্বামীকে হারিয়েছে ঠিক কিন্তু সে ছেলেটি মারা যায়নি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে জার্মানীতেই সেটল্ড করেছে। লন্ডনেই ওদের পরিচয় হয়েছিল তার পরিণতি ঘটল জার্মানীতে গিয়ে।

ইন্দ্র বলল—আপনার সংগ্রহ করা খবরটা কি সঠিক?

গোবিন্দন বললেন—আমার পরিচিত এক বন্ধু জার্মানীতে দীর্ঘদিন রয়েছে সে ওর ঠিকানা পর্যন্ত আমাকে জানিয়েছে।

ইন্দ্র বলল—আপনি চিঠি দেননি?

গোবিন্দন হাসলেন। জ্যোৎস্নার রহস্যময় আলোয় সে হাসির অর্থ ভেদ করতে পারল না ইন্দ্র।

একসময় গোবিন্দন কথা বললেন—কি হবে চিঠি দিয়ে বল? যে নিজেকে চোরা পথে চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়ায় তাকে আমার মেয়ের স্বামী বলে ভাবব! তার চেয়ে সে মারা গেছে একথা ভাবা অনেক বেশী শান্তি আর সম্মানের নয় কি?

ইন্দ্র বলল—ললিতাকে এই আসল খবরটা জানাননি কেন?

গোবিন্দন বললেন—সে সইতে পারবে না বলে। ওর মনটা ওর মায়ের মতই নরম। আমার মত মানসিক শক্তি ও পায়নি।

ইন্দ্র চুপ করে রইল। গোবিন্দন বললেন— সবচেয়ে ট্রাজেডি হল ললিতা তার ঘরে ঐ প্রতারক ছেলেটার একখানা বড় ফটো টাঙ্গিয়ে রেখেছে। রোজ ফুলের মালা পরায়। ধূপ আর প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। মৃত্যুর দিনটিতে অভুক্ত থেকে পুজোআচ্চা করে মা আর মেয়েতে প্রার্থনা গীত গায়।

ইন্দ্র বলল—আশ্চর্য।

গোবিন্দন বলল—সবকিছু জেনে শুনেও আমাকে দাঁড়াতে হয় ওর পাশে। গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকি এই প্রতারকটার মৃত্যু বার্ষিকীর দিনে। ললিতার কান্নাভরা মুখখানা বুকের ভেতর চেপে ধরে সান্ত্বনা দিই।

ইন্দ্র বলল—একটা চরম মিথ্যেকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করতে হচ্ছে। এর চেয়ে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে।

গোবিন্দন বললেন—ইন্দ্র আমি অন্ধ হয়ে বেঁচেছি। যদি স্বাভাবিক চোখ নিয়ে ওর সামনে দাঁড়াতাম তাহলে ও আমার মুখের দিকে চেয়ে কাঁদতে পারত না। তাতে ওর বুকের যন্ত্রণাই বেড়ে যেত। এখন ও ইচ্ছে মত কেঁদে বাঁচে আর ওর কান্নাভরা মুখ দেখতে হয় না বলে আমিও বাঁচি।

ইন্দ্র খোঁজ নেয় ললিতার মেয়েটির বয়েস এখন কত?

গোবিন্দন বললেন—তা বছর পাঁচেক হল। ওই এখন ললিতার সান্ত্বনা তার ভরসা যাই বল।

(ক্রমশঃ)

সুনীল পাল

আজকের সমস্যা-জর্জরিত জটিল অভাব-অভিযোগের দিনে অনেকে শিল্প-সংস্কৃতিকে অবাস্তব বা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। মনে করেন জীবনের লড়াইয়ে যখন অস্তিত্ব বাঁচা দায় তখন আর শিল্প-টিল্প নিয়ে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়?

কিন্তু শিল্পী সুনীল পালের ধারণা—যেমন উভয় পাখায় ভর করে পাখী উড়তে পারে, তেমনি আমাদের জীবনেও অর্থ-নীতি ও সংস্কৃতি দুয়েরই প্রয়োজন। অন্ন-বস্ত্রের অভাবে যেমন জীবন বাঁচে না, তেমনি সংস্কৃতির অভাবে মনুষ্যত্বও বাঁচে না। একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

একালের শিল্প ও শিল্পী সম্পর্কে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে নানান কথা বলছিলেন শিল্পী সুনীল পাল। এই সংক্ষিপ্ত রচনায় তারই কটি জোরালো অথচ অভিমানসূচক লাইন তুলে দিচ্ছি—বিষয়বস্তু, আঙ্গিক সকল বিষয়েই বেশীর ভাগ শিল্পী শিল্পের সকল নিয়ম, সকল ডিসিপ্লিন অবজ্ঞা করছেন। যার যা খুশী করেছেন। এ-উচ্ছৃংখলতায় শিল্পের সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত ঝরছে। এইসব শিল্পীরাই আজ শিল্পকে খুঁচিয়ে হত্যা করছে। শিল্পের এ বীভৎস সৃষ্টিকে সাধারণ মানুষ আপন বলে স্বীকার করতে ভয় পাচ্ছে। অনাস্থায় দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে রসিক এবং শিল্পীর মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃই বড় হয়ে উঠছে। আর শিল্পীরা নিজেদের গ্রেট ইনটেলেকচুয়াল ভেবে একা একাই গৌরব-বোধ করছেন। এইভাবে শিল্পীরা ধীরে ধীরে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন। আজ উল্টোপথে সহজকে জটিল করে হেঁয়ালী করে, দুর্বোধ্য করে স্রষ্টারা ভাবছেন অ্যাবসট্রাক্ট করছি। কিন্তু তাঁরা বোধহয় ভুলে গেছেন বক্তব্যকে গুলিয়ে ফেলা বুদ্ধিরই অপরিচ্ছন্নতা। এই অস্বচ্ছ ঘোলা দৃষ্টি নিয়ে অধিকাংশ শিল্পী আজ বীর্যবত্তার সঙ্গে কিছু সৃষ্টি করতে পারছেন না। বাস্তবিক এর চেয়ে পরিতাপের আর কি থাকতে পারে?

অধুনা সুনিপুণ ভাস্কর হিসেবে সুনীল পালের সমধিক খ্যাতি হলেও, এক সময়ে চিত্রকর হিসেবেও তাঁর নামডাক কম ছিল না। ভারতীয় ভাবধারায় ছবি আঁকতেন। তাঁর বেশ কিছু ছবি দেখার সুযোগ ঘটেছিল, আমার শৈশবে। সেদিন শিল্পীর বাড়ি গিয়ে দেখলাম, দু'-একটি ছাড়া তার সবই বেহাত হয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে?

শিল্পীর আঁকা প্রথম ছবি দেখি ছেলেবেলায় (আমরা তখন স্কুলের ছাত্র) হাতে লেখা পত্রিকা প্রগতির দৌলতে। চিত্রটির নাম শ্রীমতী। গৌতম বুদ্ধের মূর্তির সামনে কল্পিত দীপশিখা হাতে এক নারী। যেন 'একলা পথে কে তুমি যাও ধীরে আঁচল আড়ে প্রদীপখানি ঢেকে' হুবহু রূপ নিয়েছিল চিত্রলেখায়।

কথায় কথায় শ্রীপাল আরও বললেন—আমার জীবনের প্রথম বড় কাজ নেপালের মহারাজা ত্রিভুবনের মূর্তি। আর শিল্পী হিসেবে জীবনে প্রথম স্বীকৃতি ও সম্বর্ধনা তোমাদের 'প্রগতি' পত্রিকার শনিবারের বৈঠকের সভ্যদের কাছে নেপাল যাবার আগে। সেসব দিনের ঘটনা আমার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। চিরকাল সজীব হয়ে থাকবে।

শিল্পীর জন্ম ১৯২০ সালে কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে। কিন্তু আস্তার জায়গা ছিল শোভাবাজার আর কুমারটুলী অঞ্চল। পড়তেন সাবদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশনে। ছুটির দিন কিংবা স্কুলের শেষে কুমারটুলীতে গিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখতেন মূর্তি গড়া। বাড়িতে বাবা অল্পস্বল্প ছবি আঁকতেন। বাবার অনুপস্থিতিতে তাঁর অসম্পূর্ণ ছবির কাজ সম্পূর্ণ করতেন। দাদামশায়ের ছিল ফটোগ্রাফের নেশা এবং পেশা। বাড়তি উৎসাহ পেয়েছিলেন তাঁর কাছ থেকেই তবে সুনীল পালের শিল্পানুরাগ মূলতঃ লালিত-পালিত হয়েছে স্নেহময়ী মায়ের পৃষ্ঠপোষকতায়। কারণ, স্কুলের চৌকাঠ পেরোবার পর আর্ট স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বাদ সাধলেন বাবা। বললেন—সখ করে

ওপরে শিল্পী—নীচে তাঁর একটি শিল্পকর্ম

একালের চিত্রশিল্পী

ছবি আঁকো একরকম। কিন্তু তাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া আর একরকম। শেষ পর্যন্ত বাপ-ছেলের মতবিরোধের নিষ্পত্তি হল দাদামশাই ও মায়ের হস্তক্ষেপে। শিল্পী ভর্তি হলেন কলকাতার সরকারী আর্ট কলেজে। সেটা ১৯৩৫ সাল।

মুকুল দে তখন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। কলেজ জীবনে মণি গুপ্ত ও রাজেন চক্রবর্তীর দ্বারা শিল্প রচনায় উৎসাহিত হলেও, বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মুকুল দে ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে।

শিল্প-স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সুনীল পাল বললেন—তখন রবীন্দ্রনাথ সবে দেহ রেখেছেন। তারই অল্প কদিন পরে, অবনীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল আমাদের আর্ট স্কুলে। শ্রীযুক্ত মুকুল দে মহাশয়ের আমলে। পরিপাটি করে সাজিয়ে আমরা সারারাত ধরে মঞ্চ ও সিংহাসন রচনা করলাম, সভায় এসে তিনি বসবেন বলে। কিন্তু তিনি বসলেন না। একবার আসনটির দিকে তাকিয়ে তারই সামনে মাটিতে বসলেন। কারুর কথাই শুনলেন না। বললেন—'এ-আসনে যে বসতে পারে সে চলে গেছে।' এর কিছুদিন পরে তাঁকে একবার হঠাৎ দেখলাম প্রিন্সিপ্যাল মুকুল দে মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের মডেলিং ক্লাসে। এলেন বাগানের দিককার দরজা দিয়ে। রোদার অনুসরণে একটা মূর্তি গড়ছিলাম। তিনি দেখলেন। প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়কে বললেন—'হাত পেকেছে হে।' আমার করা আর একটা হেড স্টাডি দেখালাম। তিনি খুশী হয়ে হাত বুলিয়ে দেখলেন। উৎসাহিত হয়ে আরও একটা মূর্তি দেখালাম। ভাবলাম এবার সবচেয়ে খুশী হবেন। মূর্তির আইডিয়া বলতে গেলাম। তিনি মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় বললেন—'এসব বুঝিটুঝি না।

পরবর্তীকালে সুনীল পাল বহুবার অবন ঠাকুরের সংস্পর্শে এসেছেন। সে-বিষয়ে শিল্পীর মুখে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনার কথা বলি। একদা 'রূপম্বানী' নামে শিল্পীদের একটি সংঘ গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালে এই সংঘ অবনীন্দ্রনাথের গুপ্ত নিবাসে (বাসভবনে) তাঁর উদ্দেশ্যে একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিল। বাংলাদেশের বহু শিল্পী ও অবনীন্দ্রনাথের বহু গুণগ্রাহীর সমাবেশ ঘটেছিল এই উৎসবে। মনে আছে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের কয়েকটি লাইন—'আমি কি করেছি, যে তোমরা এত করছো?' আরও বলেছিলেন—'ইণ্ডিয়ান আর্ট, ওয়েস্টার্ন আর্টের বিভেদ আর রেখো না। ওরিয়েন্টাল আর্ট নিয়ে আমিও মাতামাতি করেছি এক সময়ে। তখন তার পুরস্কারও ছিল। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, একও ভাল। সন্দেশও ভাল।'। এই অনুষ্ঠানে যামিনী রায় মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। স্নেহভরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন—'তুমিও এসেছ'।

এসব ঘটনার কিছুকাল পর সুনীল পাল সিটিং নিয়ে অবন ঠাকুরের হেড স্টাডি করেছেন। শেষ দিন চেয়ারে বসার আগে অবন ঠাকুর মূর্তিটি দেখে নিলেন। মাথার মাঝখানে টাক। টাকের দুপাশে কেয়ারি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিল্পী তখনও স্টাডি করে চলেছেন। এক সময় অবন ঠাকুর বললেন—আর কত করবে? শিল্পী ভাবলেন—তিনি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন। আর বসতে রাজি নন। তাই তাড়াতাড়ি বললেন—হয়ে এসেছে, এইবার ফিনিশ করব।

তিনি শিল্পীকে বললেন—না না, ফিনিশ কোর না। ফিনিশ করলে ত ফিনিশ হয়েই গেল। এই বেশ। পরে বললেন—'আমার আসল মুখ কোনটে। জন্মালুম একরকম। বড় হলুম আর একরকম। আজ একরকম। যদি আরও বাঁচি ত আর একরকম। এখানেই শেষ কর। আরও বাঁচলে আরও হোত। কোথায় থামতে হবে এ শুধু বড়— আর্টিস্টরাই জানেন। এই বলে তিনি সুনীল পালকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আজকাল আর কেউ আমাদের মত করে আঁকে না। যাই হোক আমরা আমাদের মত করে এঁকেছি, তোমরা তোমাদের মত করে আঁকবে।'

যাই হোক শিল্পীজীবনের গোড়ার কথায় ফিরে আসি। ১৯৪০ সালে সরকারী আর্ট কলেজ থেকে ভাল রেজাল্ট করে পাশ করে আর্ট টীচারশিপ কোর্সে ভর্তি হলেন। কোর্স শেষ হল না। ডাক এল নেপাল থেকে। রাজা বীর বিক্রম ত্রিভুবন ও প্রধানমন্ত্রী জুধো সামসেরের মূর্তি গড়তে হবে। তখন শিল্পীর বয়স মাত্র ছাব্বিশ। আর্ট কলেজ থেকে দু বছর আগে পাশ করে বেরিয়েছেন। অল্প বয়সে এত বড় কাজের ভার পেয়ে আনন্দে আতঙ্কে তখন তাঁর মনে সংশয়ের কালো মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের সোনালী আলো উঁকিঝুঁকি মারছিল। ১৯৪২ সালে সাহসে ভর করে চলে গেলেন সুদূর নেপালে। বানালেন রাজা ও মন্ত্রীর মূর্তি। লাইফ সাইজ। দু বছর পরে দেশে ফিরে এলেন অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির বোঝা বুকে নিয়ে। এ-কাজ দুটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ত্রিভুবনের মূর্তিটি বসানো আছে ত্রিপুরেশ্বরের চৌরাস্তার মাঝখানে। হোয়াইট সিমেন্টের এই পূর্ণাবয়ব ভাস্কর্যটি চোখ মেলে দেখার মত। রাজবেশে সজ্জিত দর্পিত সুপুরুষ চেহারায় বীর্যবত্তার ভাবটি সুস্পষ্ট। জুধো সামসেরের ভাস্কর্যেও আসল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব হুবহু আরোপিত। শিল্পনৈপুণ্য দেখে মনে হয় না আর্ট কলেজ থেকে সদ্য পাস-করা কোন তরুণ শিল্পীর কাজ। নেপালের মিউজিয়ামেও শিল্পীর বেশ কয়েকটি শিল্প-নিদর্শন দেখেছি। যা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। পার্বত্য উপত্যকা কাঠমণ্ডুতে ঘুরে ঘুরে বেশ কিছু স্কেচ ও জলরঙের ছবি এঁকেছেন। শিল্পীর বাড়িতে বসে কতিপয় দেখলাম। প্রকৃতি ও জীবনকে একই সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছেন চিত্রকর্মে। এই পর্যায়ের একটি কাজ—'বুল ফাইট'-এর আলোকচিত্র দেখলাম। অসাধারণ কাজ। মূল ছবিটি কিনেছিলেন শিল্পরসিক মিসেস কে সি। এছাড়া কয়েকটি পোট্রেট স্টাডি এবং রাতের কাঠমণ্ডু ও নেপাল ভ্যালী পর্যায়ের

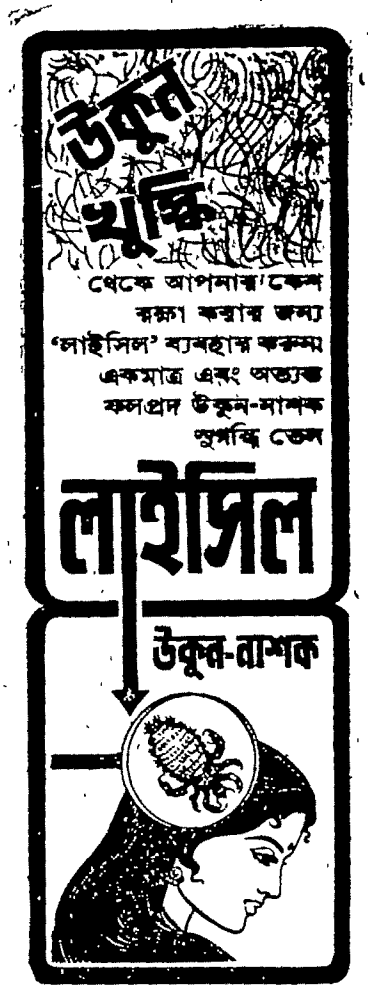

সুজানিল কেমো ইণ্ডাস্ট্রিজ
গণেশনগর, চিঞ্চওয়াড,
পুণা-১৯
EXPRESSO/686 B

নিদর্শনগুলো নিরীক্ষণ করে চিত্রকর সুনীল পালকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

দু বছর পরে ১৯৪২ সালে দেশে ফিরে এলেন নতুন শিল্পবোধে দীক্ষিত হয়ে। হাতে কোন কাজ নেই। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা।' স্টুডিও বানালেন। চিৎপুরের জয় মিত্র স্ট্রীটে। তারপর ১৯৪৬ সালে অ্যাকাদেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে 'মেঘদূত' ভাস্কর্যের জন্যে পেলেন গভর্নরের সোনার পদক। বলাই বাহুল্য, কর্তৃপক্ষের বিচারে এই প্রদর্শনীতে এটাই ছিল ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দুঃখের বিষয় পাক্কা চার ভরির এই সোনার মেডেলটি শিল্পীর বাড়ি থেকে চুরি হয়ে গেছে। এরপর ১৯৫০ সালে 'অল ইন্ডিয়া ফাইন আর্টস এ্যান্ড ক্রাফট্স সোসাইটি' আয়োজিত দিল্লির প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যের জন্যে পুরস্কার লাভ সুনীল পালের শিল্পীজীবনের আর এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

পরবর্তীকালে কর্মব্যস্ত জীবনে এত অসংখ্য কাজ করেছেন ও মূর্তি গড়েছেন যে, শিল্পী নিজেই তার কোন সঠিক হিসেব দিতে পারেন না। তবে তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরোজিনী নাইডু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, গিরীশ ঘোষ, বিবেকানন্দ অমল হোম, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখ্য।

একালের অন্যতম শক্তিশালী ভাস্কর সুনীল পালকে কোন এক বিশেষ শিল্প-ঘরানার অনুসারী বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, পৃথিবীর নানা দেশের অতীত ও আধুনিক শিল্পকলা তাঁর শিল্প-চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানাভাবে। রিয়ালিস্টিক, আইডিয়ালিস্টিক, ডেকরেটিভ প্রভৃতি শিল্পশৈলীর বৈচিত্র্যে বৈচিত্র্যময়। যেমন রাজা ত্রিভুবন ও জুধো সামসেরের ভাস্কর্য দুটি চরম বাস্তবানুগ কাজের নিদর্শন। ইউরেকা ভাস্কর্যে রোঁদার প্রভাব চোখে পড়ে। প্রথম জীবনে রোঁদার দ্বারা অনুপ্রাণিতও হয়েছিলেন অনেকখানি। দুই নারীতে ইজিপ্টের গন্ধ পাওয়া যায়। আবার 'মেঘদূত' ও কিছু দেবদেবীর মূর্তিতে ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আছে। বাংলাদেশের সনাতন লোকশিল্পের প্রভাবও দুর্লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ বিবিধ শিল্প-শৈলীর সমারেশে সুনীল পালের শিল্পকলা হয়ে উঠেছে মহামিলন ক্ষেত্র। তবে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হল ছন্দময় মাধুর্য ও স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল স্নিগ্ধতা। কিন্তু তাঁর শিল্পের যথার্থ প্রাণবস্তুর রহস্যের আড়ালে মুখ্যতঃ ভারত শিল্পধারার একটা মৃদু স্পর্শই বড় হয়ে উঠেছে।

বর্তমান শিল্পের ভাঙাগড়ার যুগে তিনি নতুন কিংবা পুরাতন কোন ধারার অনুগামী জিজ্ঞেস করলে মুখে স্বভাবসুলভ হাসির রেখা টেনে উত্তর দেন—নতুনও নয়, পুরাতনও নয়। যা ক্লাসিক আমি তারই ভক্ত। চির-পুরাতনের মধ্যেই নিহিত থাকে চিরনতুনের প্রাণ। পুনরাবৃত্তিতে লাভ নেই যদি তাতে প্রাণ যুক্ত থাকে। নতুন পুরাতনের চলমান স্বরূপকে শিল্পীরা আজও বুঝতে চাইছে না। আমাদের ক্ষুধার অন্নকে আমরা সৃষ্টিকাল থেকে আজও আঁকড়ে ধরে আছি। সে-অন্ন যখন একঘেয়ে বলে মনে হয়। যখন নতুন আগ্রহ আর জাগে না। তখন বুঝতে হবে দেহে রোগ সঞ্চার হয়েছে। দোষ অন্নের নয়। দেহের। শিল্পীদের আজ নিজেদের শিল্পে অরুচি ধরেছে। সাহেবীখানার নেশায় আধুনিকতার নামে ইউরোপের দিকে কাঙাল চোখে তাকিয়ে আছে।

প্রয়োজন ও বিষয়বস্তুর তারতম্য অনুযায়ী শিল্প নিজেই তার প্রকাশভঙ্গী ও মাধ্যম ঠিক করে নেয়। সুনীল পালের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উড, মার্বেল, ব্রোঞ্জ, প্লাসটার, ক্লে, সিমেন্ট প্রভৃতি বিভিন্ন মিডিয়ামে তাঁর কাজের অবিরাম বৈচিত্র্য বিস্তার দেখে বিস্মিত হতে হয়।

রিলিফ কাজের মধ্যে ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাটের কাজগুলোতে বৃটিশ আমলের অত্যাচার, অনাচার, শোষণ, নির্যাতনের কাহিনীকে রূপায়িত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়েছে ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল। এক সময় এ-কাজ সম্পর্কে অনেক কথা উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিল্পী জানালেন—শিল্পের মাধ্যমে অত্যাচারের এত নির্মম কাহিনী হয়ত রাশিয়াতেও নেই। কেউই আগ্রহভরে আমার কাজ ফিরে দেখল না যে ওর মধ্যে কি আছে! আমি কতটা পারিনি তা ত আছেই। কিন্তু প্রাণভরে কতটা শক্তি দিয়ে কাজ করেছি তার বিচার ত হল না!

গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের অধ্যাপক সুনীল পালের শিল্প-চেতনায় নতুনত্ব আছে। তিনি সায়েন্টিফিক লিভিং-এর সঙ্গে আর্ট অফ লাইফকে একসঙ্গে চালিত করতে চান। কেননা, তিনি বিশ্বাস করেন, জীবনের সবকিছুতেই যেমন ধর্ম, বিজ্ঞান, তেমনি সবকিছুতেই শিল্প থাকবে। তাই তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানকেই শিল্পের অলঙ্করণে সুশোভিত করে থাকেন। এমনকি আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রেও বাদ যাননি। আলিপুর-দুয়ারের কালজানি সেতু, আরামবাগে শ্রীরামকৃষ্ণ সেতু ও জলপাইগুড়ির তিস্তা ব্রীজ শিল্পী সুনিপুণ শিল্পসজ্জায় সমৃদ্ধ করেছেন।

বিদায় নেওয়ার আগে শিল্পীর কাছে জানতে চেয়েছি আজকের শিল্পভাবনা সম্পর্কে। নিরহঙ্কার, সদাহাস্যময় শিল্পী দার্শনিকের মত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে জবাব দিলেন—শিল্প আমার কাছে নেশা, পেশা, বিলাস, সাধনা যাই বল না কেন! বিলাস বলতে আকাশকুসুম নয়। শিল্প হাওয়ায় হেলান দিয়ে চলতে পারে না। আমার মতে শিল্পের জন্ম বুঢ় বিয়ালিজম থেকে। বর্তমানে আদানপ্রদানের যোগাযোগে সমাজ পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। সকল দেশের শিল্পের বার্তা সকল দেশে পৌঁছেছে। নিজের কাজের ভালমন্দ অপরের সঙ্গে যাচাই করে গ্রহণ বর্জনের সুযোগ এসেছে। তাই সব দেশের ভালই ভালো। কিন্তু সবচেয়ে ভাল নিজের দেশের ভালো। ভালোর বিচারে ইন্টারন্যাশনাল হতে পারা উদারতা ও রসগ্রাহিতার লক্ষণ। কিন্তু এ-উদারতা নিজের দেশকে ক্ষুণ্ণ করে নয়। উজ্জ্বল করে। কোন বাঙালীর ভাল লাগবে বলে সেক্সপীয়ার কাব্য রচনা করেননি। কোন ইংরেজের প্রশংসার প্রত্যাশায় কালিদাস লিখে রেখে যাননি। কিন্তু তাঁদের কলাসৃষ্টি এতই বৃহৎ যে, অনায়াসে দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। একদা মাইকেল মধুসূদন চেয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল হতে। বাংলাকে অবহেলা করে অতৃপ্ত নেশায় ইংরেজীতে কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু সে আজ কোথায়! আমাদের ভাগ্য ভাল, তিনিই জানিয়ে দিয়ে গেলেন 'মাতৃক্রোড়ে রতনের রাজি'।

প্রশান্ত দী

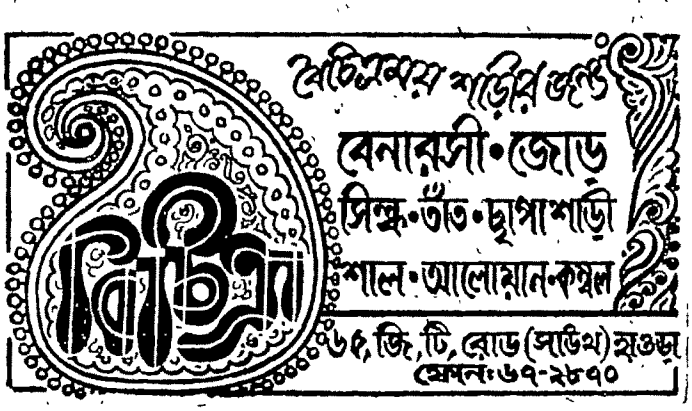

উৎপলা সেন

"গান বেছে নেওয়া আমার কাছে মনে হয় যেন ফুলের বাগানে ঘোরা। নামী ফুলের গন্ধ কে না ভালোবাসে? কিন্তু অনেক সময় নাম-না-জানা ফুলের গন্ধই আমায় বেশী টানে? আর এ ফুল আবিষ্কারের আনন্দে রোমাঞ্চ লাগে।"

একালের গান

বোধহয় বছর দুই আগে। ইনফরমেশন বুরোয় কোনো এক সাহিত্য পত্রিকার তরফ থেকে নানান ক্ষেত্রের কৃতী মহিলাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উৎপলা সেনকে দেখলাম। সংবর্ধনা শেষে গানও শোনালেন 'তোমার **কবিতা শেষ করে দাও**"—সেই পরিচিত গান, যে গান জনপ্রিয় বাংলা গানের অন্যতম। সুরকারের (নির্মল ভট্টাচার্য) সুর, গীতিকারের কথা (অনিল ভট্টাচার্য) এবং শিল্পীর মধুর কণ্ঠ ও অনুভবের গভীরতায় হৃদয়-ছোঁওয়া। শুধু ঐ গানটি তার নিজের যুগেই সীমাবদ্ধ নয়। যুগোত্তীর্ণ আবেদন নিয়ে এ গান বেঁচে থাকবে যেমন থাকবে তার 'প্রান্তরের গান আমার' বেদনার মত কি আছে মধুর', 'আমি তোমায় ছাড়া'—আরও কত গান সে আলোচনায় পরে আসছি)। বাংলা গানের অন্তহীন মাধুর্যকে যেসব শিল্পী কালজয়ী করে রেখেছেন ইনি তাঁদেরই একজন।

সেদিন ওঁকে দেখে কত কথা মনে পড়ছিলো। উৎপলা সেনের গানের সংগে পরিচয় স্কুলজীবনেই। কিন্তু 'উৎপলাদির' সংগে পরিচয় তারও অনেক পরে, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাশে পড়ার সময়। আলাপ হয়েছিলো বোধহয় ইউনিভার্সিটিরই একটা অনুষ্ঠানে যখন তিনি খ্যাতির এককেবারে মাঝ আকাশে।

বিবাট, বিরাট হলে গান সুরু করতে না করতেই নেমে আসে নিবিড় স্তব্ধতা, আর বুপোলী ঝর্ণার মত সুরের ধারা। ছড়িয়ে পড়ে সংগীত রসিকের প্রাণে।

দীর্ঘ তিনদশক ধরে শিল্পী গাইছেন, কিন্তু ওঁর গানের রং এতটুকুও ফিকে হয়নি তো? এই তো সেদিনই শুনলাম পরশু বৈশাখের একটি অনুষ্ঠানে। সজল করুণ অশ্রুগলানো যেমন উচ্ছল তার 'মনের বর্ষা এলো নয়নে' তেমনই প্রাণরসে টই-টুম্বুর 'পাখীদের এই পাঠশালাতে'। আর সেই কাহিনী গানটি? "ছোট্ট একটি মিষ্টি মেয়ে নামটি সোনালী—যা শুনে শিশুর দলও 'আবার, আবলি করে চেঁচিয়ে উঠলো? আধুনিক গানের ক্ষেত্রে, এত দীর্ঘকাল ধরে আর কোনো মহিলাশিল্পী গাননি, আর এমন করে শ্রোতাদের চিত্তকেও টেনে রাখেন নি। কারণ? সেই কারণটাই খুঁজছিলাম, সেদিন ওঁর সান্নিধ্যে আনে আনন্দভরা মুহূর্ত দিয়ে স্মৃতির মালা গাঁথতে গাঁথতে। উৎপলা সেন গানের ক্ষেত্রে গভীর ভাবের ভাবুক হলেও, ওঁর অন্তরঙ্গ মহলে চলতি-বাংলায় যাকে বলে হুড়ে মেয়ে। প্রাণের রসে প্রাণ চঞ্চল। আর সেখানেই তিনি যান এক মুহূর্তে অন্তরংগ হয়ে উঠতে পারেন —কারণ তিনি অন্তরংগ পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে জানেন। তাই কোথাও সে গানের সভাই হোক কি, উৎসব সভাই হোক, যাবার সংগে সংগেই উৎপলা সেন যেন আনন্দের মতই ছড়িয়ে পড়েন হাসিতে, কৌতুকে, খুনসুটিতে কাড়াকাড়ি করে খাওয়াতেও। —যেন পাঁচ বছরের মেয়ে। যেমন দেখেছি দশ বছর আগে। এখনও ঠিক সেইরকম। বয়সের সংগে সংগে অনেক কিছুরই হয়তো পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু ওঁর সেই শিশুমন আজও তেমনই তেমনই রয়ে গেছে।

এই সবুজ মনের রং লেগেছে ওঁর গানে। তাই কি সে গান আজও এমন লাবণ্যলীলায় ভরা?

গতবারই 'একালের গান'-এর ইন্টার-ভ্যুর সময় উৎপলাদি বলছিলেন 'একদিন পঙ্কজবাবু, বড়দি (সুপ্রভা সরকার) শচীন-কর্তা তারপরে হেমন্ত ধনঞ্জয় এঁদেরও পরে শ্যামল আলপনা গায়ত্রী এঁদের সংগে গেয়েছি। আজ গাইছি বনশ্রী পিন্টু হৈমন্তী দের সংগে এক আসরে। ভিন্ন যুগ, ভিন্ন ধারা ভিন্ন রুচি। তবু ভালো লাগে।

কারণ যুগবৈচিত্র্যেও তারুণ্যের সেই উতলা আবেগ? সে ত কই হারায়নি? তফাৎ শুধু বাইরের রূপ ও প্রকৃতিতে।'

এই রূপ ও প্রকৃতির গতি পরিবর্তনের কাহিনীটি শোনার লোভেই ত এসেছি। বলুন না।'

"ওরে বাবাঃ। ওসব জানতে হলে সংগীত বিদের কাছে যাও। আমি ত ভাই পণ্ডিত নই। গান মিশে আছে রক্তে। না গেয়ে উপায় নেই। তাই গাই। অত সব বড় বড় কথা কি বলতে পারি?

"বড় কথা ত চাইছি না। চাইছি বড় অনুভবের খবর। আপনি এতদিনের গায়িকা এবং আজও 'এ্যাক্ট্রাকটিভ পারফরমিং আর্টিস্ট'। তিনটি যুগের বিচিত্র ভাবের ঢেউএ ঢেউএ যার গানের তরণী বয়ে চলেছে। সুরের ওঠাপড়ায় কাহিনী বলবার অধিকার ত তারই।'

এবার শিল্পীর মন টলল। ও'রই স্মরণ-চারণের পথে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে গেলাম ও'র শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলিতে যে দিনগুলি শুধু আনন্দ উজ্জ্বলই নয় শুধু নয় অশ্রুসজলও।

'আমার গানের প্রেরণা হলেন মা। একম এবং অদ্বিতীয়ম্। এ কথায় এতটুকুও ভুল নেই। আজ এ কথাটা শুনলে অনেকেই অবিশ্বাস করবে যে আমার মা তাঁর ফুল-শয্যার রাতে পঁয়ত্রিশখানা গান গেয়ে ঢাকার বিখ্যাত গুণীদের মুগ্ধ করেছিলেন। ওঃ। বলতে ভুলে গেছি আমার পিত্রালয় এবং শ্বশুরালয়ও ঢাকাতেই। আমাদের বাড়ী ছিলো ঢাকার নামকরা বিদগ্ধ পরিবার। ঠাকুর্দা রায়বাহাদুর যোগেশ ঘোষ ছিলেন মস্তবড় ডাক্তার। জনপ্রিয় ছিলেন শুধু সু-চিকিৎসার কারণেই নয়। সুরসিক শিল্প-প্রেমিক এবং খোলামেলা উদার প্রকৃতির জন্যও। তখনকার দিনে ঠাকুর্দা আমার ঠাকুমাকে নিয়ে বিলেত গিয়েছিলেন। ভাবতে পার?

আমার বাবা ছিলেন ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার। সংগীতপ্রিয় আনন্দময় মানুষ। আমার মার গান বাজনা শুনেই ঠাকুর্দা মাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেছিলেন। মা শুধু গানই গাইতেন না। বাঁশী ঢোল এক-তারা বাজনাতেও রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন।

আমি যখন চার বছরের, সেই সময়ই মা আমার ছোট একটি হারমোনিয়ম কিনে দিয়ে-ছিলেন। তিনিই সারেগামার পর্দা চিনিয়ে দিলেন। দি নেই, দুপুর নেই, সবসময় প্যাঁ প্যাঁ করে ঐ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে বাড়িসুদ্ধু সকলের কান ঝালাপালা করে তুলতাম। মা কিন্তু একটুও বিরক্ত হতেন না। খুব খুশী হতেন—আমি হার্মো-নিয়মটা ভেঙ্গে না ফেলে বাজাচ্ছি বলে।

একটু বড় হতে না হতেই মা ঢাকার সুখ্যাত সংগীতগুরু ভবেশ চক্রবর্তীর কাছে আমায় দিলেন ক্লাসিক্যাল গান শিখতে। ও'র কাছে কয়েকমাস শেখার পর ঢাকা ইন্টারকলেজ কম্পিটিশনে ফার্স্ট হলাম। এখনও মনে আছে 'বাগেশ্রী' গেয়েছিলাম।

স্কুলের ফাংশনেও অভিনয়, গানে খুব নাম করেছি। ধ্রুব-প্রহ্লাদের চরিত্র রূপায়ণ থেকে কৌতুকনকসা অবধি কোনোটাই বাদ যেতোনা। টেলিফোনবিভ্রাট কমিক দেখিয়ে প্রাইজও পেয়েছিলাম।

তারপর ঢাকার নতুন রেডিও ষ্টেশন খুলল। দাদা আমায় সেখানে নিয়ে গেলেন। আমার বয়স তখন আট কি নয়। নৃপেন মজুমদার ছিলেন আর্টিষ্ট সিলেকশন বোর্ডে। আমার "বেহাগ" শুনে বললেন ও খেয়ালই গাইবে। আর এক ডিপার্টমেন্টে একজন বললেন "একটা কবিতা আবৃত্তি কর ত? করলাম। বললেন তুমি এ আসরে কবিতা পাঠ করবে। আর এক বিভাগে স্বামী-স্ত্রী অভিনয় হচ্ছিলো। সেখানে স্ত্রীর সংলাপ আমায় পড়তে বলে দুমে করে স্ত্রীর পার্ট দিয়ে দিলো। তখন রেডিও সবে গড়ে উঠছে। আর্টিষ্ট কম। কিন্তু প্রোগ্রাম ত থেমে থাকতে পারে না। একটু গান, বাজনা কিংবা আবৃত্তিতে দখল থাকলেই হোলো ব্যস্ রেডিওতে প্রোগ্রাম বাঁধা। নানা বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যেই ঢাকাতে খুব নামডাক হয়ে গেলো।

কিন্তু এত নামেও মন ভরলো না। সব-সময় কিসের যেন একটা অভাব মনকে পীড়া দিতো। গানের কাছে যা খুঁজছি ঠিক যেন পাচ্ছিনা।

অস্থিরতা যখন চরমে উঠলো, ঠিক সেই সময় ঢাকায় এলেন সুধীরলাল। রেডিওতে তিনি বাংলা গানের ট্রেনার হলেন। তাঁর কাছে শিখতে গিয়েই বুঝলাম সুর কাকে বলে, গান কি বস্তু আর বাংলা গানের রূপ কি অপরূপ হতে পারে। তাঁর কাছে শিখেই আমার হৃদয়বাসনা পূর্ণ হোলো। তখন আমার বয়স চোদ্দ।

সুধীরলালের কাছে কিছুদিন শেখার পর আমার গানের চেহারাই পালটে গেলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে বলতো—বেলুনের (ও'র ডাক নাম) গলা রবারের মিষ্টি কিন্তু গানে এত রস, ভাব এসব ত আগে ছিলো না?

অথচ সুধীরলাল যে আমায় গলা সাধা, কিংবা গাইবার কোনো টেকনিক শেখাতেন তা নয়। ও'র সুর রচনার মধ্যে, গাওয়ার মধ্যেই যেন অলক্ষ্য নির্দেশ থাকতো কোন্ পথে গেলে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছনো যাবে। উদাসী, ভাবুক প্রকৃতির মানুষ তিনি। অর্থ যশ প্রতিষ্ঠা এসব সম্বন্ধে কোনো হুঁশ ছিলোনা। সারাদিন ধরে হার্মোনিয়মটি হাতে নিয়ে চোখ বুঁজে শুধু যেন সুরই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গাওয়া, শেখানো কোনোটাতেই ক্লান্তি নেই। ও'র কাছে শিখতে উচ্চারণ সুর, এসব সম্বন্ধে অনেক ধারণা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো।

বছরখানেক এইভাবে শেখার পর কোল-কাতায় এসে প্রথম রেকর্ড করলাম হিন্দুস্থান কোম্পানীতে সুধীরলালের সুর ও ট্রেনিং-এ "এক হাতে মোর পূজার থালা" উল্টোদিকে "বনতুল জাগ"।

'বাস আর বলতে হবে না। তখন খু ছোটো হলেও এ-গানের রি-এ্যাকশন আজও ভুলিনি। এ গান রিলিজ হবার সংগে সংগে উৎপলা ঘোষ বসিকচিত্তে স্থান করে নিলো আপন শক্তিতেই। স্কুলে, কলেজে খেলার মাঠে বাড়ীতে—অক্ষম, অপটু সুরেও ও গান একবারও গাইতে চেষ্টা করেনি সেযুগে এমন কোনো গান পাগল ছিলোনা। মনে আছে একদিন স্কুল থেকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার সময় বিকসাওয়ালাও গাইছিলো 'তুমার মুন যা চাহে লাও"। —শুনে আমি কি হাসি যে হেসেছিলাম।'

উৎপলাদিও হাসলেন। 'সবি ফর ডিস-টার্বিং ইউ —তারপর?'

'তারপর আর কি? একে একে রেকর্ড হোলো (ঐ হিন্দুস্থান লেবেলেই) সিরিয়ালি বলতে পারব না।' যেভাবে মনে আসছে বলছি "শুকতারাগো নিওনা বিদায় (সুর—নিমাই ঘোষ, কথা—অনিল ভট্টাচার্য) "তুমি যে ভালোবেসেছিলে" (কথা—অনিল ভট্টাচার্য সুর—নির্মল ভট্টাচার্য) "গানের বলাকা" (সুর—নির্মল ভট্টাচার্য কথা—অনিল ভট্টা-চার্য)।

তারপর গ্রামোফোন কোম্পানীতে এলাম। একে একে রেকর্ড হোলো "বেদনার মত কি আছে মধুর" (সুর—সতীনাথ কথা—গৌরী-প্রসন্ন) ঝিকমিক জোনাকীর (সুর—সতী-নাথ) "দোলা দিয়ে যায় কে" (সুর : সতী-নাথ) "যে ছিলো সাথে কিশোরবেলায়" মহুয়াপংখী ভেসে যায়, পাখী আজ কোন সুরে গায়, ঝুমকো লতার বনে কথা দিয়ে-ছিলে হায়, আমি তোমায় ছাড়া (সুর : সতীনাথ)। "রাতের কবিতা" (সুর ও কথা --নির্মল ও অনিল ভট্টাচার্য), "প্রান্তরের গান আমার" (সলিল চৌধুরী), "পথের ধারে মুক্তো আমি" (সুর : সুধীন দাস-গুপ্ত) 'এ গান আমার যেন' 'সপ্তরঙের খেলা' 'রাঙ্গা মাটির পাহাড়' 'ঘুম ঘুম এই রাত' (সুর : শ্যামল মিত্র)। আকাশ ছেয়েছে কাজল মেঘে জোনাকী দীপ জ্বালা আলো (নচিকেতা ঘোষ) এত মেঘ, এত যে আলো চাঁদ কি ঘুমিয়ে পড়েছে (অভিজিৎ) এই মনটাই করে যত (সুর : অনিল চ্যাটার্জি) "যে সুর বাজাতে চাই" (সুর : রবীন চ্যাটার্জি)।

এরই ফাঁকে ফাঁকে অনেক ফিল্মেও গেয়েছি। নিউ থিয়েটার্সের পঙ্কজ মল্লিকের পরিচালনায় যত হিন্দী ছবি। মাই সিস্টার উঁচুনীচু ওয়াসিতনামা জ্বলজ্বল..সব মনে নেই। বাংলা? কিছু কিছু মনে আছে যেমন পথের দাবী বাবলা আমবিবী বাত্রির তপস্যা' 'দানের মর্যাদা' 'দসুমোহন জয়দেব' 'হিমালয়ে জীবন্ত মানুষ' 'রাখী' বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' 'হরিলক্ষ্মী' 'মা ও মমতা' বিচারক জীবনতৃষ্ণা অতিথি এক টুকরো আগুন', 'মায়াবিনী লেন' উলটা বুঝলি রাম' 'বনপলাশীর পদাবলী' 'মোম-বাতি' মহাকবি গিরিশচন্দ্র।

এরপর মেগাফোন কোম্পানীর অধ্যায়। এখানে অধিকাংশ গানই গেয়েছি সতীনাথের

সুরে—যেমন 'মনরে বর্ষা এলো নয়নে' 'তুমি কত সহজে' 'পথের প্রান্তে তুমি রয়েছ'। এ ছাড়া হেমন্তর সুরে গেয়েছি 'ওগো রাত তুমি কাছে ডেকে নাও' 'কিংশুক ফুল'। নচিদার সুরে ঃ 'পাখীদের এই পাঠশালাতে' (অলোক দের সুরে), 'আমি তোমার কাছে' (রতু সেনের সুরে) 'নাহয় আমায় ভুলে যেও' (শ্যামল মিত্র)।

এর বাইরে নানান জলসা ছাড়াও অনেক কল্যাণমূলক অনুষ্ঠানে গেয়ে আনন্দ পেয়েছি। দার্জিলিং-এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে প্রসূতি সদনের সাহায্যে তখনকার রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের আহবানে রাজভবনে যে অনুষ্ঠান হয়েছিলো সেখানেও উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমি ছিলাম। আর একবার রাজভবনে 'স্টারস্ অফ ইন্ডিয়া' নামে যে সাহায্যানুষ্ঠান হয়েছিলো সেখানেও উদ্যোক্তা ও শিল্পী উভয় ভূমিকাতেই অংশগ্রহণ করেছি। তিনদিনের অনুষ্ঠানে বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব, লতা মঙ্গেশকার আলি আকবর রবিশঙ্কর থেকে শুরু করে যত শিল্পী দ্বিতীয় দিনে চিত্রাঙ্গদা; সাঁওতালী নৃত্য; তৃতীয় দিনে বোম্বে ও বাংলার যত চিত্রতারকা।

'স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় ডাকলেন রিফিউজী কলোনীতে গান শেখাতে; কাঁচরাপাড়া টি-বি হাসপাতালে; অন্ধ বিদ্যালয়ে। আদ্যাপীঠের মন্দির নির্মাণের জন্য গান গেয়েছি উনিশবার।...আর আজও তরী বেয়ে যাই। আমার কথাটি ফুরালো। এতক্ষণ তো গোবেচারী সেজে চুপচাপ শুনলে? এবার ধর নিজমূর্তি। হানো তোমার প্রশ্নবাণ।'

আপনি পঙ্কজ মল্লিক রাইবাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে রবীন চ্যাটার্জি কমল দাশগুপ্ত নির্মল ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে নচিকেতা ঘোষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায় শ্যামল মিত্র অবধি সকলের সুরে গান গেয়েছেন। বাংলা গানে কথা সুর ও শিল্পীদের প্রকাশভঙ্গীর ক্রম-পরিবর্তনের ধারাটি আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে? আপনার চিন্তার আলোয় এ দিকটা একবার আলোকিত করুন না?'

'আহা! কি ভালোমানুষ রে? ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। প্রশ্ন করার কায়দাকে তারিফ করেই বলছি আগেকার গীতিকার সুরকার এবং শিল্পীরা গানের রূপ দিতেন পরস্পরের দরদী সহযোগিতায়। একজন মালা গাঁথতে বসলেন ত অপরজন তাঁর হাতে এক একটি ফুল তুলে দিলেন। আর সুতোয় গাঁথবার আগে দুটি হৃদয় চার চোখের দৃষ্টি যেন এক হয়ে দেখে নিতো কোন্ ফুলের সঙ্গে কোনটি মানাচ্ছে এবং কিভাবে কোন্ ফুলটি মালার কোনখানে রাখলে তার রূপ খোলে। আর শিল্পী? তিনি সে মালা পরবার আগে অতি সন্তর্পণে দুটি হাতের আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে ছুঁয়ে তাকে গ্রহণ করেন। যেন স্থূলস্পর্শে অতিকোমল স্পর্শকাতর পাপড়িগুলি ঝরে না পড়ে। প্রতিটি কথা ও সুর উচ্চারণের স্পষ্টতায় কণ্ঠস্বরের শুদ্ধ স্পর্শে কি করে সুন্দর রূপ দেবেন সেই চিন্তাই তাঁদের কাছে ধ্যান হয়ে উঠতো। সে গান তো 'গান-করা' নয়, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর পূজা করা। এখন জনরুচির পছন্দের মাপে তৈরী করা কথা ও সুরের ফ্রেমে সে আবেগ ফুটতে পারে? গানরচনার সময় এবং গাইবার সময়ও আমরা ভুলে যাই জনরুচিকে উন্নত করার দায়িত্ব পালন না করে আমরা আরো বিকৃত করছি। এবং জনরুচির দোহাই দিয়ে নিজেদের বিকৃত রুচিকেই বড় করে তুলছি। যে বছর পুজোয় সবচেয়ে বেশী পাশ্চাত্যঘেঁষা বাংলা সুরের ডামাডোল—সেই বছরই আমার গাওয়া 'মনরে বর্ষা এলো নয়নে' কিংবা সতীনাথের 'জানি একদিন'; হেমন্তর 'একটি রজনীগন্ধা'—লোক শুধু আগ্রহ করে শোনেনই নি, পয়সা দিয়ে কিনেছেন। আমরা নিজেরা এখন গানের এস্থেটিকস নিয়ে ভাবি না—শ্রোতাদের দোষ দিয়ে লাভ কি?'

'আপনার গানের প্রথম যুগের সুরকারদের সুর রচনার মেজাজের বৈশিষ্ট্য ঠিক কি ছিলো?'

'নানাজনের প্রকাশভঙ্গিতে স্বাতন্ত্র্য নিশ্চয়ই ছিলো। কিন্তু মূল-উৎস ছিলো এক—স্বপ্নকে সুন্দর করে রূপ দেওয়া। যেমন ধর রাইবাবুর কথা। এঁর গানে ছন্দবৈচিত্র্য ছিলো একটা বিশেষ চরিত্রের মত। সুরটা কতরকম ছন্দের ভেতর দিয়ে যেতে পারে আর প্রতিটি ছন্দ এক একটি চরিত্র হয়ে উঠে, কেমন ড্রামা সৃষ্টি করে তারই পরিচয় পাওয়া যেত। উনি যে একজন বড় তবলাবাজিয়ে ওঁর রচিত সুরই সেই কথাটি জানিয়ে দিতো।

পঙ্কজবাবু খুব অনুভূতিশীল শিল্পী। তাই মাধুর্যের সঙ্গে স্তব্ধতার রেশ মিশে তাঁর গানে একটা দারুণ গমগমে ভাব সৃষ্টি হোতো। উনি কথার ড্রামাকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন—প্রতিটি কথার ওজন যেন হৃদয়ে আঘাত করতো।

সুধীরলাল ছিলেন ঠুংরী খেয়ালে গিরিজাবাবুর ছাত্র। এই ঠুংরী ও খেয়ালের নির্যাসটুকু নিয়েই ইনি বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। যেমন 'ভুলেছি তোমার অনেক বেদনা সয়ে'—এখানে 'ভু-উলেছি'র সূক্ষ্ম পরিস্কার হয় নি মীড়ের আঁচড়টি লক্ষ্য করেছ? দ্যাখো খেয়াল বা ঠুংরীর আঙ্গিক এখানে গানের ভার বা শৃঙ্খল হয়ে ওঠেনি, আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে বলেই এ গান সকল শ্রেণীর মানুষের মনে এমন দোলা দেয়।

রবীন চ্যাটার্জি গজল দাদরা নিয়ে অনেক স্টাডি করেছেন—সেই ইমোশনই ওঁর গানকে এমন প্রাণময় করতো। এইরকম—সকল সুরকারেরই একটা মৌলিকত্ব ছিলো কারণ তাঁদের একটা স্কুলিং ছিলো।

এখন গাইয়ে অনেক হচ্ছে কিন্তু সেই তুলনায় শিল্পী তৈরী হচ্ছে কম। কারণ তখনকার দিনে যাঁরা পরিমত মান প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ছিলেন তাঁরা ভাবীকালের শিল্পী-গোষ্ঠি গড়ে তোলায় আগ্রহী ছিলেন। নতুন যারা গাইতে আসতেন তাদের উৎসাহ দিতেন, ভুল হলে দেখিয়ে দিতেন। মনে কর 'মাই সিস্টার'—কথাচিত্রে সায়গল গেয়েছিলেন পুরুষকণ্ঠের গান, আমি হিরোইনের গান। উনি অতবড় আর্টিস্ট, আমি সামান্য একজন উঠতি গায়িকা। বয়সও অল্প। কিন্তু সায়গল সাহেবের সেই স্নেহের আশ্বাস প্রতি পদে আমায় ভরসা দিতো 'তোমার বহুত মিঠা আওয়াজ ভাই। কোই বাত্ নেই প্রেমসে গাও।' আর উনি নিজেও পঙ্কজবাবুর কাছে শিখতেন যেন শিশুটি হয়ে। ভুল হলে জিভ কেটে নিজের দুকান দুহাতে মুলতে দেখেছি। তখনকার কি স্টুডিও, কি রেকর্ডের রিহার্শাল রুম তার আবহাওয়াই ছিলো আলাদা। কোনো গান রেকর্ড হবার আগে দশদিন ধরে রিহার্সাল চলতো। আর সে রিহার্সালে সংগীত পরিচালক শিল্পী এমনকি গীতিকারেরও ছিলো সমান ভূমিকা।

এখন? দ্রুতলয়ের জীবনধারায় সবাই ব্যস্ত। কারো সময় নেই। কোনো গানের উপলব্ধিকে মনে নিয়ে সেইভাবে ভাবিত হয়ে গান গাইবার মত অবকাশ কই? কোনো-রকমে সুরটা তুলে নিয়ে চটকদার অর্কেস্ট্রার বাহারে গানকে উতরে দেবার প্রবণতাই যেন বড় হয়ে উঠছে। তার ফলে শিল্পীর ওজন কমে যাচ্ছে। বড় হয়ে উঠছে মিউজিক।

এই প্রসঙ্গেই একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার 'হরিনাম লিখে দিও অঙ্গে'—ভক্তিভাবের গান হলেও কিরকম পপুলার হয়েছিলো জানো ত? ঐ গানটি রেকর্ডিং-এর আগের দিন সিনেমা গেছি 'স্নেক পিট'। দেখে এসে রাত্রে শুয়েছি। সকালবেলা ঘুম আর ভাঙ্গে না। বাড়ীতে যারা কাজ করতো দরজা ঠেলে ঘুম ভাঙ্গাতে পারে না। হঠাৎ দেখে জানালার শিক ভাঙ্গা। ওরা জানলা দিয়ে ঢুকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গালো। জানা গেলো রাত্রে কে বা কাহারা ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে ঘরের আলমারী ভেঙ্গে শাড়ী গয়না যথাসর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে। তখন আমার মাত্র ষোলোবছর বয়স। শাড়ী গয়না যাওয়ার শোক মনকে কতখানি উতল করতে পারে অনুমান করতে পার নিশ্চয়?

'সেইসময় হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে ফোন এলো 'আজ কি রেকর্ড করতে পারবেন?'—মুখ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো 'আজই ত ও গান রেকর্ড করবার উপযুক্ত দিন।' হোলো রেকর্ড। বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই লুফে নিলো। তারপর থেকে ভক্তিমূলক গানের ক্ষেত্রেও আমার একটা চাহিদা সৃষ্টি হোলো। ঈশ্বরের আশীর্বাদ কখন কিভাবে নেমে এসে জীবনকে ফলেফুলে ভরিয়ে দেয় স্থূল কথা কেউ বলতে পারে না। ঐ রেকর্ডের সেল্

দেখে ও'রা আরো দুটি ভক্তিমূলক গান রেকর্ড করলেন 'আত্মসমর্পণে কোরো মৃত্যুপণ' ও 'জাগোরে জাগোরে মন ঘুমায়ে থেকো না।'

সেসব দিন আজ যেন স্বপ্ন মনে হয়। .....সুধীরলালজীর অন্তর্ধানের পর গানের ক্ষেত্রে নিজেকে বড় অসহায় মনে হোলো। সে সুর সংগীত রস অনুভব যেন তার সঙ্গেই চলে গেলো। সেই অনন্য গানের স্বাদ কোথায় পাই?

এইসময় সতীনাথ খুব নাম করেছে ও তখন আধুনিক গানের অন্যতম নায়ক। ওর গান টেম্পারামেন্টের মধ্যে পেলাম যা খুঁজছিলাম। সুধীরলাল ও সতীনাথের গান ও শিক্ষাপদ্ধতি যেন একই জাতের। তাই ওর ট্রেনিং খুব মনে লেগে গেলো। গ্রামোফোন কোম্পানী এবং মেগাফোনেও অধিকাংশ গানই ওর সুরে করেছি এবং প্রত্যেকটি রেকর্ড হিট করেছিলো।

আমি সবসময় খুঁজি কথা ও সুরের যথার্থ মিলনজাত সত্যিকারের গান। সে নামী লোকেরই হোক কি অনামী লোকেরই হোক। নামের চেয়ে গানটাই আমার কাছে বড়। এবার পুজোয় কি গান করব কি গান করব ভাবছিলাম। হঠাৎ সতীনাথের ছাত্র জটিলেশ্বর মুখার্জির লেখা একটি গান হাতে এলো

'আমার দুই নয়নের একটি নয়ন
রূপের নেশায় মগন
আর একটি হায় আকাশে বাতাসে
খোঁজে অরূপরতন।

শুনে এত ভালো লেগে গেলো। ভগবান কাকে দিয়ে কখন যে কি করান।

'আমার মন দোতারার একটি তার
বাজে বসন্তবাহারে
আর একটি তারে শুনি সেই চেনাসুর
দিন ত গেলো, সন্ধ্যা হোলো
পার কর আমারে'—

সুন্দর নয়?'

'বেশ সুন্দর।'

'সতীনাথ সুরও দিয়েছে তেমনই।'

'আর একটি গান?'

'পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছে
চাঁপা বলে গোলাপের
বড্ড বাড় বেড়েছে।'

'বেশ মজার ত? একটু গেয়ে শোনাস না?'

শুনলাম দুটি গান, দুটি মুডের। নতুন করে অনুভব করলাম ওঁর গান আজও কেন সকলের এত ভালো লাগে।

শিল্পী তখন আত্মবিভোর হয়ে বলে চলেছেন জানিস সন্ধ্যা গান বেছে নেওয়া আমার কাছে মনে হয় যেন ঠিক ফুলের বাগানে ঘোরা। নামী ফুলের গন্ধ কে না ভালোবাসে। কিন্তু অনেক সময় নাম-না-জানা ফুলের গন্ধই আমায় বেশী টানে। আর এ ফুল আবিষ্কারের আনন্দে রোমাঞ্চ লাগে।'

'আজকাল একটা কথা প্রায়ই শুনি সিনেমায় প্লে-ব্যাকের চান্স না পেলে কোনো শিল্পীর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হওয়া মুস্কিল' এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?'

'শিল্পীর জনপ্রিয়তা সৃষ্টিতে প্লে-ব্যাকের অনস্বীকার্য ভূমিকা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সিনেমার মাধ্যমে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি এবং সহজে নাম করা যায়। কারণ অধিকাংশ লোকই সিনেমা দেখে। সেখানে সিচুয়েশান নাটকীয় পরিবেশ এই-সবের কারণে গান সহজেই মনে দাগ কাটে। কোনো গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা দেখা শ্রোতার চোখের সামনে যেই একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে এই গানের সময় উত্তমকুমার অমুক সীনে এইভাবে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবা সুচিত্রা সেন এই মুডে ছিলেন—তখন গানের আকর্ষণ অনেক বেশী বেড়ে যায়। এখানে মেমোরি অফ এ্যাসোসিয়েশন গানকে পপুলার হতে খুবই সাহায্য করে।

কিন্তু নন-ফিল্ম রেকর্ড দিয়ে শ্রোতাদের মনে অত সহজে দাগ কাটা যায় না। কারণ এখানে শুধু সুকণ্ঠটাই বড় নয়, শিল্পীর ব্যক্তিত্ব একসপ্রেসিভ ক্ষমতা এখানে মস্তবড় ফ্যাকটর। প্রথমতঃ সুর না লাগাতে পারলে সে গান কানের বাইরেই ঘোরাফেরা করে। কানের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছয় না। দ্বিতীয়তঃ প্রকাশভঙ্গীর এমন একটা ক্যারেকটর থাকা চাই যা শ্রোতাদের আকৃষ্ট করবে। সতীনাথ সেই স্বরূপ কয়েকজন আর্টিস্টের অন্যতম, নন-ফিল্ম গান গেয়েই সে নিজের জায়গা করে নিতে পেরেছে।

খুব সহজ সুরেই লোকের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করার প্রসঙ্গে সবচেয়ে আগে মনে আসে কমল দাশগুপ্তর নাম। অমন সুরকার 'কোটিতে গোটিক মেলে'। এক-নিঃশ্বাসে দুটি নাম উচ্চারণ করছি না কিন্তু নিজের লোক বলেই একজনের নাম উল্লেখ না করাটা অন্যায় হবে। তাই বলছি সুরের মায়া সৃষ্টি করবার ক্ষমতা সতীনাথেরও অসাধারণ। শ্যামলের দেওয়া সুরও আমার খুব ভালো লাগে।

কথা ও সুরের ওজন সমান না হলে সত্যিকারের গান সৃষ্টি হয় না। অনেক সময় দেখা গেলো বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ভালো গান হোলো না। আবার হঠাৎ কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাপদগ্ধ পৃথিবীতে এক পশলা বৃষ্টির মতই একটা সুন্দর গান বেরিয়ে এলো। রাগ-রসুই-পাগড়ী কিছু কিছু বন যাতা—বলে না? আধুনিক গানের ক্ষেত্রে সিম্পল গান সুন্দর কি রাগধেঁষা বেশী রসোত্তীর্ণ এ-প্রশ্ন অবান্তর, কারণ গানের সার্থকতা নির্ভর করে পরিবেশনার শিল্প-কৃতির ওপর।'

শিল্পী থামলেন আমার মনে পড়ে গেলো একটি ঘটনা। সেটা ছিলো ওঁদের (উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়) বিবাহের বছর। উৎপলাদি পাঁচ বছরের খুকীর মত ওঁর নিজস্ব ঢঙে ঠোঁট ফুলিয়ে হেমন্ত মুখার্জির কাছে আব্দার করলেন 'আমাদের বিয়েতে তুমি কিছু উপহার দেবে না?'

'কি গাও বল?'

'তুমি সেদিন গাইছিলে 'ওগো রাত তুমি কাছে ডেকে নাও আমি যেন বড় ক্লান্ত' ঐ গানটা আমায় দাও না? রেকর্ড করব (মেগাফোনে যোগ দেবার দ্বিতীয় বর্ষে)। কথা : গৌরীপ্রসন্ন, সুর : হেমন্ত।

'তথাস্তু'। এই হলেন উৎপলা সেন। কলোচ্ছলা শিশু কিন্তু সকল কোলাহল স্তব্ধ হলে যখন রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে'—সেই মুহূর্তে রাত্রির গভীর তপস্যার সুরে সুর মেলাতে চায় তার শিল্পীচিত্ত।

সন্ধ্যা সেন

উপন্যাস

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

আদ্য শেষ রজনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অয়নায় অমিয় তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে খাটের ওপরকার অমিয়কে পরিষ্কার বলল—আপনি তো আজকাল গাড়ির পেছনের সিটে বসেন?

সামনে বসলে গরম লাগে।

সেকথা বলছি না পায়ে হাঁটেন কতক্ষণ?

এই খাওয়া-দাওয়ার পর হাউসের গ্রিন-রুমে যতটা পারি পায়চারি করি।

সেকথা বলছি না। ট্রামে-বাসে ওঠা হয় কি আজকাল?

না। একদম না। সময় কোথায়?

ফুটপাথ ধরে হাঁটা হয়?

সময় কোথায়? কলশো। হাউসের শো মাসে অন্তত কুড়িটা।

আপনার নাটক কাদের জন্যে?

আমার আপনার মত সাধারণ মানুষের জন্যে।

আপনি আমি সাধারণ মানুষ নই। যারা ডেলিপ্যাসেঞ্জার, ছোট ব্যবসায়ী, টিচার, চাকুরে ছাত্র—তাদের সঙ্গে আপনার আজকাল যোগাযোগ কোথায়? আপনি তো গাড়ি চড়ে হুস করে চলে যান। এদের কার সঙ্গে মেশেন আপনি?

তা অবশ্য হয় না। খাটের অমিয় আমতা আমতা করে আয়নায় অমিয়কে বলল। তবে যেকোন শিল্পী একটা সুদূর বোধ দিয়ে সবকিছু ধরে নিতে পারে।

তা হয় না অমিয়। জীবনযাপনের পদ্ধতিই মানুষের শিল্পে উঠে আসে। শিল্পের জন্য জীবনে শরীরের এক ইঞ্চি পোড়ালে তাই ছাইটুকু শিল্পে উঠে আসে: এখানে সুদূরে বোধি—কিংবা রিমোট সেন্সের কোন দাম নেই অমিয়।

তুমি কে?

আয়নায় অমিয় বলল—আমি তোমার আগেকার আমি।

তাহলে আমি কে?

তুমি হলে গিয়ে এখনকার আমি। তুমি পথভ্রান্ত পথিক।

দুই সময়কার অমিয় এসে এখনকার অমিয়র মাথার ভেতরটা গুলিয়ে দিল। অনেকক্ষণ সিধে হয়ে বসে ছিল বিছানায়। শুয়ে শুয়েই ডাকলো লীলা—আমার দাড়ি কামাবার সেটটা দিও। ডেরবা থেকে ফেরার পর অনেকদিন দাড়ি কামানো হয়নি। অমিয়র বিশ্বাস হল দাড়ি কামালেই সে আগেকার অমিয় হয়ে যাবে।

।।ষোল।।

কিছুকাল হল বিক্কুর দিদি নাগপুর থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় এসেছে। আসলে জামাইবাবু বদলি হয়ে এসেছেন। কিন্তু সংসারে দিদিরই দাপট বেশি। তাই বিক্কু বলে, দিদি বদলি হয়ে এসেছে। অনেক বছর পর। একটি মাত্র মেয়ে দিদির। তারও বিয়ে হয়ে গেছে। দিদির নেশা গান, পান আর মাঝে-মধ্যে ছোট এক বোতল রাম কিংবা হুইস্কি। তৎসহযোগে হারমোনিয়াম বাগিয়ে এক পা ছড়িয়ে দিয়ে ঠুংরি। জামাইবাবু ভারত সরকারের, সবচেয়ে বড় এক প্রতিষ্ঠানের নাম্বার টু। আসলে নামবার ওয়ান চলে গিয়ে বিক্কুর দিদি। বাড়িতে তিরিশ বছরের ওপর ক্ল্যাসিকালে রেওয়াজ।

বিক্কু দুপুরের দিকে দুটি ছোট বোতল নিয়ে গিয়ে হাজির। ভাইবোনে ভাগ করে খেল। বিক্কুর সমঝদারি পেয়ে তার দিদি অগুন্তি গান গাইল। জমাট ভরাট গলা। বেলভেডিয়ারের ফাঁকা ফ্ল্যাটে ভাইবোনের অন্ত আসর।

দিদি তুই রেডিওতে গাইবি?

ভাগ্। ও বাজে জিনিস। দু লাইন গাইবে তার আবার নাম, দিনক্ষণ ছাপা হয়।

তবে কনফারেন্সে গাও। এতদিন পরে কলকাতায় এলে।

তুই আবার গানের বুঝিস কি। কোথায় গাইবো সে আমি ঠিক করবো। দে আরেক পেগ দে।

তোমার পাইট শেষ। তবে নাও আমার থেকে। এইটুকুই আছে। সবটুকু নিও না। আমার জন্যে রেখো একটু।

তুই কি বলবি ছেলেমানুষ। দাঁড়া। একখানা দাদরার কাজ শোন।

বিক্কুর গান শোনা কার। সে বুঝলো, আজকের এই ফাঁকা ফ্ল্যাটের আসরে সে অসম্ভব ভালো গান শুনছে। তার দিদি আজ মেজাজে আছে।

এক সময় ড্রাইভার এসে সেলাম দিল। জামাইবাবু দিদিকে গঙ্গার হাওয়া খাওয়াবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেয় রোজ বিকেলে। দিদি ঘুরে ফিরে সন্ধ্যের দিকে জামাইবাবুকে নিয়ে ফেরে। জামাইবাবুর যা কিছু নেশা—ওই দিদি আর মোটারগাড়ি। আর মাঝে মাঝে দিল্লি যায় বড় বড় চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে বসতে।

সন্ধ্যের দিকে গাইতে গাইতে দিদির চোখে জল এসে গেল। কেন জল—ভাই-বোনের কেউ জানে না। দিদি কোন গান ভালো করে গাইতে গাইতে কেঁদে ফেলে এক-এক সময়।

বিক্কু বলল, চল দিদি। গঙ্গার ঘাট থেকে ঘুরে আসি।

দুজনে ঘুরতে ঘুরতে সন্ধ্যে করে ফেলল। বঙ্গোপসাগর থেকে উঠে আসা বিখ্যাত হাওয়া তখন ময়দান চষে ফেলছে। দিদি গাড়ির পেছনের সিটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বিক্কু আমার পেট ব্যথা করছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। দরজা দুটো ড্রাইভারকে খুলে রাখতে বল। গায়ে বাতাস লাগুক।

কেন যে ড্রিংকসের সঙ্গে অতটা জর্দা-পান খাও? আজ তোমার শরীর ভাল থাকলে রাণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতাম। কী সুন্দর টপ্পা গায়।

বিক্কুর দিদি কোন জবাব দিল না। কথা বলার অবস্থা ছিল না তার। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। সেই সঙ্গে গাইবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু উপায় নেই। শরীর বিকল। উপরন্তু খোলা জায়গা। আজ রামটা খুব খাঁটি ছিল। বিক্কুর জামাইবাবু মাসাবারি বাজারের সঙ্গে তার দিদির জন্য তিনটে বড় বোতল রাম এনে থাকেন।

গঙ্গার গা ঘেষে খোলা হাওয়া খাচ্ছে অনেকে। ইভনিং ওয়াকের কিছু বৃদ্ধও আছে। আর আছে পান, ভেলপুরি, আইস-ক্রিম, মালাইয়ের মোবাইল ফিরিওয়লা। সঙ্গে তাদের গ্যাসের চুপি। সেই আলো ঘিরে অনেক কালো কালো মাথা।

ডিমসেদ্ধর আশায় বিক্কু বেরিয়ে পড়ল।

মালাইয়ের বড় বড় হাড়ির পাশে ডিমের তোলা উনুন খুঁজতে এসে বিক্কু মালাইয়ের বিখ্যাত খদ্দের অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে পেল। সঙ্গে রজনী দত্ত।

আবার মালাই খাচ্ছো? মালাই না তোমার বারণ অমিয়।

দ্যাখোতো বিক্কু। আমিও বারণ করেছি।

বিক্কু রজনীকে দেখল। সাধারণ বেশ হালকা পোশাক। আইকিম, মালাই চিংড়ি, মাংস—এসব দেখলে অমিয়র জ্ঞান থাকে

না। বেশি খাওয়ার কথা তুললে বলবে—ভাই আমাব ইঞ্জিনটা তোমাদের চেয়ে কত বড়। তার কয়লাও তো বেশি লাগবে।

অমিয় চোখ না তুলে গম্ভীরগলায় বলল, ক'টা খাবে? এখানে তো ডিমসেদ্ধ পাওয়া যায় না। বলতে বলতে আমি পকেট থেকে টাকা বেব করল। টাকা মানে দশ টাকাব নোটের পিন-করা গোছা।

সোজা হাউস থেকে এসেছো।

হুঁ। বুঝলে কি করে?

নোটের গোছা দেখলেই বোঝা যায়।

আবার হাউসফুল যাচ্ছে।

তুমি জয়েন করলে এ আর নতুন কথা কি!

দোকানী দুটো মালাই শালপাতায় গুছিয়ে দিচ্ছিল। বিষ্ণু দত্ত হা হা করে উঠলো। দুটোয় তো হবে না।

রজনী হাসলো। তুমিও মালাই দেখলে মাথা ঠিক রাখতে পারো না!

সঙ্গে আমার দিদি আছেন। তার জন্যে দুটো দাও।

দিদি? রজনী অবাক হয়ে তাকালো।

হ্যাঁ। কমাস হল বদলি হযে এসেছেন জামাইবাবু। কিন্তু দিদি এখন উঠে বসতে পারবে কিনা জানি না।

অমিয়, রজনী দুজনই একসঙ্গে বলে উঠলো, তোমার যে দিদি আছেন—সেকথা তো কোন দিন বলনি।

দিদি আছেন মানে! রীতিমত দাপটে আছেন। দেখলেই বুঝেব। গাড়ির কাছে হেঁটে যেতে যেতে বিষ্ণু দিদির কথা সবিস্তাবে বলল। কিন্তু গাড়িতে পৌঁছে দিদিব ঘুম ভাঙাতে পারলো না। অগত্যা—চারটি মালাই একাই খেতে হল বিষ্ণুকে।

যাবার সময় রজনী বলল, আহারে! এত ভাল গান করেন। আলাপ হল না।

বিষ্ণু সাবধানে পেছনের দুই দরজা বন্ধ করে ড্রাইভারের পাশে বসলো। সাহেবেব অফিসে চল।

সাজানো গঙ্গার ঘাটে তখন রজনী আর অমিয এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে এগোচ্ছে। বিষ্ণু মনে মনে বলল, আবার হাউসফুল। আবার ভারত হলেব সামনে ভিড়। টিকিট ব্ল্যাক। সোডার বোতল ছোঁড়াছুড়ি। অমিয় ফিবে এসেছে।

দিনে কলকাতা গবমে চিড়বিড় করে। সেই কলকাতাই রাতে আরামেব চোহারা নেয়। মারকাবি ল্যাম্পের দিনেব মত আলো। গঙ্গায় আলো-আঁধারিতে নৌকোব সংসাবে মাল্লারা রান্না চাপিয়েছে। ওপাড়ে হাওড়া। অমিয় আস্তে রজনীব হাতে হাত রাখলো। এ হাত তার কাছে নতুন নয়। সপ্তাহে পাঁচটি শো দর্শক সাক্ষী বেখে এ হাত তাকে ধবতে হয়। এ শরীব তাকে জড়াতে হয। একবাব রজনীকে ঠাট্টা করে অমিয় সিগারেট অফাব করেছিল। রজনী হেসে বলেছিল, আজ তো নয়।

কেন?

বেস্পতি, শনি, ববিবার শুধু সিগারেট খাই।

হো হো করে হেসে উঠেছিল সবাই। ওই তিন দিন পাঁচটি শোযে রজনীকে স্টেজের ওপর বসে সিগারেট ধরাতে হয়। সুজাতা হিসাবে সিগারেট ধরায় রজনী। তখন জীবন হিসেবে অমিয় মদের গ্লাস নিয়ে স্টেজে বসে।

জানো রজনী। আজকাল আমাকে গ্রুপ থিয়েটারের লোকজনেরা আউটকাস্ট বানিয়েছে।

বানাবেই। কারণ, পঞ্চমুখের যে সব নাইট হাউসফুল যায। সকল হলেই আমাদের দেশে ফেউ লাগে।

আমাদের নাটক অশ্লীল। এইটেই আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় শ্লোগান।

অশ্লীল হলে অডিয়েন্স হিন্দী ছবির মত আমাদের নাটক দেখে সিটি দেয় না কেন? নাটকের শেষে গম্ভীব হয়ে যায় কেন? বউকে নিযে কোন দর্শক তো অশ্লীলতা দেখতে আসবে না। তা আসে কেন?

সবকিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় রজনী। হুইসপাব ক্যাম্পেনের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায না।

আমাদের নাটক তো হাজার রজনীও চলতে পাবে।

তাব চেযে বেশিও চলতে পাবে।

বাইরে কলশোয়ে সারা রাত ধরে দশ-বিশ হাজার মানুষ চুপ করে আমাদের নাটক দেখে। সে কি অশ্লীলতার জন্যে?

সে কথা কাকে বলবো রজনীশ।

সামনে গঙ্গার কাল জল অন্ধকারে আরও কাল হয়ে পড়ে আছে।

অমিয় বলতে লাগল, দেশের মানুষ আগে বিচার করতো। মন্দ হলে নিন্দা। ভালো হলে প্রশংসা। এখন সবাই চুপ করে লক্ষ্য করে। খারাপ করে দেওযার সুযোগ খোঁজে।

আমরা কিন্তু কারো ক্ষতি চাইনি অমিয়। সেইটেই আমাদের দোষ।

রজনী, আবো একটা দোষ করেছি আমরা। তুমি আর আমি।

রজনী তাকিয়ে উঠতে অমিয় বলল, আমাদের কারোরই বিযে করা ঠিক হয়নি।

তুমি একথা বলছো কেন অমিয়? তোমার তো সুখের সংসার।

সুখ এক সময় কাঁটা হযে দাঁড়ায় আমরা অন্য বাতেব পাখি। অন্য দিনেব পাখি।

তুমিই তো বলে থাকো, অমিয়—পূর্ণ মানুষের মত জীবনেব সব অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে না গেলে অভিনয় পুবোপুবি জানা যায় না। জীবন সবচেয়ে বড মাস্টারমশাই।

তাইতো এতদিন জানতাম।

খানিকক্ষণ দুজনের কেউই কথা বলতে পারলো না। যেমন এলোমেলো পায়ে ওবা গঙ্গাব গাযে গিয়ে দাঁড়িযছিল—তেমনি পাযেই ক্যালকাটা বিউটিফিকেশনেব ধাঁধানো আলোব ভেতর দিযে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলো।

স্টিয়ারিংয়ে বসেই অমিয় অল্প সময়ের ভেতর ডায়মণ্ডহাববার বোড ধরে ফেলল।

এ আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?

কোন জবাব দিল না অমিয়। জ্যোৎস্নার মায়ামে রাস্তাটা পেছল হয়েই ছিল। তারপর অমিয়র হাতে পড়ে গাড়িটা ফাঁকা রাস্তা গিলতে গিলতে একদম ডায়মণ্ডহারবার টুরিস্ট লজে গিয়ে হাজির হল।

এ কি করলে অমিয়। লীলা ভাববে।

তোমার জন্যে কেউ ভাববে না!

আমার ছেলেমেয়েবা ছাড়া আর কে ভাববে বল।

কেন? শশাংকবাবু?

সে তো কবে থেকে উধাও। মাঝে মধ্যে আসে শুনেছি। আমার সঙ্গে আর দেখা হয় না।

স্বামীস্ত্রীর পরিচয়ে লজে ঘর পাওযা গেল। একদম নদীর মুখোমুখি। ক্যান্টিনে খাবার বলতে কিছু মাছভাজা ছিল। তাই সই। বার বন্ধ। এক বোতল বিয়ারও পাওযা গেল না। লজ এক রকম ফাঁকা। প্রায় ভুতুড়ে বাড়ির চেহারা।

অমিয় বলল, মনে কর আমাদের অখণ্ড দুটি। কোন মামলা নেই ঘাড়ে। রিহার্সেল নেই। আমরা নীলগিবিতে বেড়াতে এসেছি—

এত মনে করার দরকার নেই। আমি তোমায একখানা গান দিতে পাবি অমিয়।

বাঃ! সুন্দর কথাটা বলেছো। গান দিতে পারো। একখানা গান। আচ্ছা? বিষ্ণু খুব গান ভালবাসে তাই না?

ভীষণ।

তোমার গলায ও বার বার 'কবিয়ালের' গান শুনতে চায়। আর শুনতে চায় টপ্পা।

টপ্পা আমি বেশি জানি না। অল্পদিন শিখেছিলাম।

খোলা কবিডরে বসে উল্টোদিকের নদীর প্রায মাঝ বরাবর দেখা যাচ্ছিল। বাকিটা জ্যোৎস্না না কুযাশায় ঢাকা পড়ে আছে তা এখান থেকে বোঝাব কোন উপায় নেই।

রজনী! তুমি একখানা গান দিতে চেয়েছিলে। আজ তুমি তোমাকে দাও।

কোন কথা না বলে রজনী গুণ গুণ করে সুর তুলে নিল গলায়। ফাঁকা করিডর সে-সুরে ভবে গেল। তাবপর রজনী তাতে সুবিধামত কথা বসাতে লাগলো। নিশ্চয় আগেকার কোন নাটকের গান। কী সুন্দর বাণী। গানও লিখে গেছে বাঙালীরা। গিবীশ, ক্ষীবোদ, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ—

খোলা গলাব গানে সাবাটা ব্রজ গমগম করছিল। অন্ধকার ক্যান্টিন থেকে একটা পোষা বেড়াল বেরিয়ে এসে চুপ কবে ওদের দেখছিল।

গান থামতেই অমিয় বলল, আমি আমার ছেলেমেয়েদেব ভালবাসি। রবিবাব সকালে ওদের নিয়ে কাটাই। তখন কেউ ফোন করলে আমাব ভীষণ বিরক্ত লাগে।

আমাব ছেলেমেযেবা আজকাল আমার দিকে এমন করে তাকায—আমি ওদের চোখে প্রশ্ন দেখতে পাই।

(ক্রমশ)

পুনশ্চ

। প্রাচীন কলিকাতা ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রায় চারি শতাব্দী পূর্ব্বে সরস্বতী নদী ও তৎসহ বঙ্গের প্রধান বন্দর ও বাণিজ্যস্থান সপ্তগ্রামের অধঃপতনের সময়, একটি সেট ও চারটি বসাক পরিবার সপ্তগ্রাম হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহাদের কলিকাতা আগমনের সময় যে গোবিন্দপুরে কালীকাদেবীর মন্দির ছিল, তাহা তাঁহাদের পারিবারিক প্রসঙ্গ হইতে অবগত হওয়া যায়।...

কালীকাদেবীর আবিষ্কার প্রতিষ্ঠাতা জঙ্গলগিরি চৌরঙ্গীর (যাঁহার নামানুসারে ঐস্থান অদ্যাপিও চৌরঙ্গী নামে অভিহিত) বিবরণ হট-প্রদীপ নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থানুসারে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে বা ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে গোবিন্দপুর (তৎকালিক কালী ঘাটে) কালীকাদেবীর অর্চ্চনা আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বেহালা নিবাসী লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের (সাবর্ণ চৌধুরী সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কালীকাদেবী গোবিন্দপুরে অবস্থিত ছিলেন। পরে ঐ স্থানে প্রাচীন দুর্গ ফোর্ট উইলিয়ম বিরাজিত ছিল; সুতরাং প্রাচীন দুর্গ-নির্ম্মাণের প্রারম্ভ এবং সাবর্ণ চৌধুরীর জীবদ্দশা, এই সময়ের মধ্যেই যে কালীকাদেবী গোবিন্দপুর হইতে বর্ত্তমান কালীঘাটে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অনেকের বিবেচনায় কলিকাতা শব্দ কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ মাত্র। কেহ কেহ বলেন, কলিকাতার প্রান্তদেশে 'মহাবাহু খাদ' খোদিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই কলিকাতা তাহার নাম লাভ করিয়াছে 'খাল কাটা'। আবার কাহারও কাহারও মতে এতদুভয় শব্দের কোনটি হইতেই ইহা উৎপন্ন নহে। 'কোল্‌কা হোতা', অর্থাৎ কোলদিগের আড্ডা বা বাজার এই বাক্য হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। কলিকাতার নামকরণ সম্বন্ধে লেখক নিম্নলিখিত একটি গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন—

একদা জনৈক শ্রমজীবী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় জনৈক ইংরাজ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিল। শ্রমজীবী ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং ইংরাজটিও এতদ্দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তিহীন। সুতরাং সাহেবের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ঐ শ্রমজীবী বিবেচনা করিল, সাহেব বুঝি জঙ্গল কবে পরিষ্কার করা হইল, তাহাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে। অতএব সে সাহেবের প্রশ্নে 'কাল কাটা', অর্থাৎ গতকল্য কর্ত্তন করিয়াছি, এই উত্তর করিল। নবাগত ইংরাজও ঐ উত্তরকে ঐ স্থানের নাম বিবেচনা করিয়া তাহাকে (ক্যালকাটা) কলিকাতা নামে অভিহিত করিল।

এ সম্বন্ধে এত বিভিন্ন গল্প প্রচলিত আছে যে, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় অতীব দুরূহ ব্যাপার। তবে সাধারণতঃ কলিকাতা শব্দে কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু এ বিষয় অবলম্বনে অনর্থক কালক্ষেপ অনাবশ্যক।

প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজদিগের কলিকাতা স্থাপন করা পর্য্যন্ত এই সময় 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়ীভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সুতরাং ইংরাজদিগের বাণিজ্যব্যপদেশে ভারত আগমন ও কলিকাতার স্থাপনা—এইটি এস্থলে আলোচনা করিয়া 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধ সমাপন করিব।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সরস্বতী নদীর বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালিক বঙ্গের প্রধান বন্দর সপ্তগ্রামেরও বিলোপ প্রাপ্তি ঘটিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে অর্ণবপোত সকল সপ্তগ্রাম বন্দর পর্য্যন্ত অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত, কিন্তু ১৯৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ঐ স্থানে পোত সকলের গমনাগমন কষ্টে সমাধা হইতে লাগিল ও ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ১৫৩০ খৃঃ অব্দ হইতে বঙ্গদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই ইংরাজ বণিকগণ সর্ব্বপ্রথম ভাগীরথী নদী ও তত্ত্বীরস্থ বাণিজ্য প্রধান স্থান সকলের সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হন।

সরস্বতী নদীর অধঃপতনের সহিত সপ্তগ্রাম বন্দরের অধঃপতন সংসাধিত হইল। বৈদেশিক পোতসকল আর বন্দর পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সলীলবহন স্থানে অবস্থান করিয়া তরণীযোগে পণ্যদ্রব্য সপ্তগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিল। কিন্তু সরস্বতীর অবস্থা এতই মন্দ হইয়া পড়িল যে, দেশীয় বণিকগণ সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া হুগলী, সুতানটী প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করিলেন। পর্ত্তুগীজগণ যেস্থানে তাঁহাদের পোত সকল নঙ্গর করিতেন, সেই স্থান এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান এক্ষণে গার্ডেনরীচ নামে পরিচিত। এইস্থানের পর পরেই (ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে) বেতড়। তথায় বেতাই চণ্ডীকার মন্দির থাকা নিবন্ধন, বহু লোকের সমাগম হইত। সপ্তগ্রামের অধঃপতনকালে, কয়েকজন বণিক বাণিজ্য প্রত্যাশায় গার্ডেনরীচের কিঞ্চিৎ উত্তরে আদিগঙ্গা ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের পৈতৃক বিগ্রহ গোবিন্দজীর নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর নির্দ্দেশ করেন। অল্পকালের মধ্যেই গোবিন্দপুরবাসী বণিকগণ ঐ স্থানের উত্তরে বস্ত্র বিক্রয়ের নিমিত্ত এক হাট স্থাপন করিলেন; পরে এই হাটই সুতানটী হাট নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ওলন্দাজদিগের এই স্থানে অবস্থান, বেতড়চণ্ডী দেবী দর্শন উপলক্ষে জনসমাগম ও নবাগত বণিকগণের গোবিন্দপুরে অবস্থান হেতু বেতড়ের বাণিজ্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং কালে এই লোক সকল বেতড় পরিত্যাগ করিয়া সুতানটী ও গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল ও বেতড়ের বাণিজ্য সুতানটীতে পরিবর্ত্তিত হইল। সুতরাং ধারাবাহিকভাবে নিরীক্ষণ করিলে কলিকাতার উন্নতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত চারিটি কারণ আমরা অবগত হই।

১। পর্ত্তুগীজগণের গার্ডেনরীচে অবস্থান।

২। বেতড়ে পর্ত্তুগীজগণ কর্ত্তৃক বণিক কেন্দ্র স্থাপন।

৩। সপ্তগ্রামের অধঃপতন ও গোবিন্দপুরে কয়েকজন খ্যাতনামা বণিকের বাসস্থান স্থাপন।

৪। ইংরাজদিগের কলিকাতায় প্রধান কুঠি স্থাপন।

উল্লিখিত কারণ চতুষ্টয়ের ফলে সুতানটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের চতুর্দ্দিকস্থ স্থানসমূহ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল।

সুবিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামার উত্তমাসা অন্তরীপ এবং তৎপার প্রবাহিত সমুদ্র-পথে ভারতের পথ আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপীয়গণের মধ্যে একমাত্র পর্ত্তুগীজ জলপথে ভারতে আগমন করিয়া বাণিজ্য দ্বারা স্বীয় মাতৃভূমিকে ভারতের পণ্যে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রায় এক শতাব্দী কাল অবধি ভারতীয় বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল।

এই জলপথে আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় শিল্পজাতপণ্য গ্রীক, রোমীয় ও তুরস্কের অধিবাসীবৃন্দের দ্বারা পাশ্চাত্য বিধীকায় নীত হইয়া অন্য দেশবাসীদিগের প্রভূত বিস্ময় উৎপন্ন করাইয়া তাহাদিগের অর্থাগমে বিশেষ রূপ সাহায্য করিত। এই সময়ে ইংলণ্ডের সকল স্থানেই বাণিজ্যের উৎসাহ পরিদৃষ্ট হইত। রাজ্ঞী এলিজাবেথের সুখশান্তিপূর্ণ রাজ্যে এ উৎসাহ বৃথা হয় নাই। তৎকালে উন্নতির যে উষালোক পাশ্চাত্যে প্রতিভাত হইয়াছিল, সে সুবিমল রশ্মির কিয়দংশ ইংলণ্ডে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহাদিগকেও প্রবুদ্ধ করিয়াছিল। ইংরাজের এই সময়ে পর্ত্তুগীজের ভারত বাণিজ্য ইংরাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

(ক্রমশঃ)

ক্ষপণক

বিজ্ঞানের কথা

বিদ্যুৎ ও বজ্র সম্পর্কে

বিদ্যুৎ চমকালে বা বাজ পড়লে এখনো ঘরে ঘরে শাঁখ বেজে ওঠে। এটা পুরনো প্রথার জের। এক সময়ে মানুষ যখন প্রকৃতি-জগৎ সম্পর্কে কিছুই জানত না বা বুঝত না তখন স্বগত কারণেই ভয় ও আতঙ্ক নিয়ে ভাবত দেবতা রুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁর সন্তোষবিধানের জন্য পূজা-অর্চনা করত। এখন বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ জেনে গিয়েছে আকাশে মেঘ থাকলে কেন বিদ্যুৎ কেন বজ্র। তাই ভয় ও আতঙ্ক আর নেই তবে পুরনো প্রথা সহজে যাবার নয়। তার চেয়েও বড়ো কথা মাটির সঙ্গে সংযুক্ত ত্রিশূলের মতো একটি তার ছাদের ওপরে খাড়া করে কিভাবে বজ্রকেও বন্দী করা যায় তাও মানুষ জেনে গিয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ কখন চমকায় বজ্রপাত কিভাবে ঘটে এ-সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা অস্পষ্ট। তাই বিষয়টি নিয়ে সাধারণভাবে কিছু আলোচনা তুলতে চাই।

মোটামুটি কথাটা এই যে বিদ্যুৎ চমকাতে হলে বা বাজ পড়তে হলে আকাশে বিদ্যুৎ-ভরা মেঘ থাকা চাই। শুধু তাই নয় মেঘের ভিতরকার সেই বিদ্যুতের নিষ্ক্রান্ত হবার অবস্থা ও পথ তৈরি হওয়া চাই। তা যদি না হয় তাহলে আকাশে মেঘ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ চমকায় না বা বাজ পড়ে না। আর বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়াটা নিতান্তই গুজব কথা। বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে তড়িতাবিষ্ট মেঘ থাকে ৫ কিলোমিটার উচ্চতায়। এই মেঘের নিচের অংশটি হয় নেগেটিভ ওপরের অংশ পজিটিভ। নেগেটিভ অংশের আকার হয় ১০ কিলোমিটার ব্যাসের ও ২ কিলোমিটার পুরু একটি চাকতির মতো। দেখা গিয়েছে এই চাকতির এলাকায় তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নিচে ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। শূন্য ডিগ্রীতে জল জমে বরফ হয়। একথা মনে রাখলে ধরে নিতে হয় একখণ্ড মেঘের তড়িতাবিষ্ট হওয়ার সঙ্গে জলের কণার জমাট বাধার এবং বরফের অস্তিত্ব থাকার সম্পর্ক আছে। লক্ষ্য করার বিষয় বিদ্যুৎ ও বজ্রের প্রাবল্য ঘটে বিশেষ করে কালবৈশাখীর মেঘে ও বর্ষার মেঘে শরতের হাল্কা মেঘে নয়।

আকাশে একখণ্ড তড়িতাবিষ্ট মেঘ থাকলেই কি বজ্রপাত ঘটে? সবসময়ে নয়। অথচ মেঘের নেগেটিভ আবেশ বা চার্জ ও মাটির মধ্যে আবেশগত মাত্রার তারতম্যের (পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স) পরিমাপ অতি বিপুল—প্রায় ৩০ কোটি ভোল্ট। আসলে বজ্রপাতের ব্যাপারটা কী? আকাশের মেঘ ও মাটির মধ্যে বিদ্যুতের একটি ঝলক যা ডিসচার্জ। মাঝখানের একটুখানি ফাঁক পেরিয়ে যদি ডিসচার্জ ঘটে তাহলে তার রূপ হয় ঝলক বা স্পার্ক। এমনকি আমাদের ঘরের ইলেকট্রিক বাতির সুইচের স্পর্শে যদি ফাঁক থেকে যায় তাহলে সেখানেও স্পার্ক হতে থাকে (যা ফলে সুইচ গরম হয়ে ওঠে) বজ্রপাত হচ্ছে আকাশের মেঘ ও পৃথিবীর মাটির মধ্যে বিরাট একটি স্পার্ক। কিন্তু আকাশের মেঘে বিদ্যুৎ জমা হলেই সঙ্গে সঙ্গে স্পার্ক হয়ে যায়—তাও নয়। সেজন্য পর পর আরো কতকগুলো অবস্থা তৈরি হওয়া চাই। সেগুলো কী?

প্রথম ধাপটি এইরকম : জলের কণায় যেসব মুক্ত ইলেকট্রন থাকে সেগুলো বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের (মেঘের বিদ্যুৎ এই ক্ষেত্রটি সৃষ্টি করে) দ্বারা ত্বরণযুক্ত হয়। ত্বরণযুক্ত ইলেকট্রন এসে ঘা দেয় সন্নিহিত স্তরে বাতাসের অণুকে। তখন সেই অণু থেকেও ইলেকট্রন মুক্ত হয়ে পড়ে। পালাক্রমে এই দ্বিতীয় পর্যায়ের মুক্ত ইলেকট্রন তার সন্নিহিত স্তরের বাতাসের অণুকে ঘা দিয়ে একইভাবে ইলেকট্রন মুক্ত করে। বাতাসের স্তরের পর স্তরে এই ব্যাপারটি চলতে থাকে। অর্থাৎ স্তরের পর স্তর বাতাস আয়নিত হয়ে যায় (বৈদ্যুতিক চার্জবিশিষ্ট পরমাণুকে বা পরমাণুর সমষ্টিকে বলা হয় আয়ন। এমনিতে পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ, কিন্তু একটি ইলেকট্রনও যদি সেই পরমাণু থেকে খসে পড়ে তখন সেটি হয়ে ওঠে পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট অর্থাৎ আয়ন। এক্ষেত্রে এমনিভাবে স্তরের পর স্তর বাতাস আয়নিত হয়েছে।) আয়নিত হওয়া মানেই বিদ্যুৎ-পরিবাহী হওয়া বা ডিসচার্জের পথ তৈরি হওয়া। তারপরে বাতাসের স্তর আয়নিত হতে হতে শেষপর্যন্ত যখন মাটির কাছাকাছি পৌঁছে যায় তখনই একটি ব্যাপার ঘটে। মেঘ থেকে বিদ্যুতের চার্জ পথ পেয়ে যাবার পরে যেই-না মাটির কাছাকাছি পৌঁছেছে মাটি ও চার্জের মধ্যে আবেশগত মাত্রার তারতম্য আরো বেড়ে বেড়ে গিয়েছে ফলে মাটির ওপরে সবচেয়ে উঁচু হয়ে আছে যে বস্তু তা থেকে স্পার্ক ওঠে। এই স্পার্ক নিচে নেমে আসা চার্জের সঙ্গে মিলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় একটানা একটি ঝলক বিদ্যুতের এক বিপুল প্রবাহ। এই হল গিয়ে মোক্ষণের পথ। এই পথটি তৈরি হতে সময় লাগে ২০ মিলিসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের একভাগ হচ্ছে এক-মিলিসেকেন্ড)।

সাধারণত দেখা যায় ঝলক ওঠে মাত্র একটি নয় তিনটি কিংবা চারটি কিংবা তারও বেশি। তবে প্রথম ঝলকটিই সবচেয়ে জোরালো।

তারপরে আরো একটি ব্যাপার ঘটে। বজ্রের সৃষ্টিতে এতক্ষণ পর্যন্ত ভূমিকা ছিল শুধু মেঘের নিচের দিকের নেগেটিভ অংশের। এরপর মেঘের ওপরের দিকের পজিটিভ অংশও এই সৃষ্টিতে যোগ দেয়। পথটি আগেই তৈরি হয়ে রয়েছে। তাই সময় লাগে আরও কম। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এই যে, মেঘের একটি অংশ থেকে ডিসচার্জের শুরু থেকেই মেঘের অন্যান্য অংশ থেকেও ডিসচার্জের সূত্রপাত। অনেকটা পর-পর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো। মেঘের এক অংশ থেকে ডিসচার্জ মাটিতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই অপর অংশ থেকে পুনরায় ডিসচার্জ, সেটির পরে পুনরায় আরো এক পুনরায় পুনরায়।

একই ভাবে স্পার্ক বা ঝলকের আকারে ডিসচার্জ হতে পারে দুটি মেঘের মধ্যেও। তখন দেখতে পাই বিদ্যুতের চমক। প্রক্রিয়াটি একই স্তরের পর স্তর বাতাস আয়নিত হতে হতে এক মেঘ থেকে অপর মেঘ পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ তৈরি হওয়া।

কিন্তু বিদ্যুৎ-চমক বা বজ্রপাত তো শুধুই স্পার্ক বা ঝলক নয়, সেই সঙ্গে থাকে প্রচণ্ড একটি নির্ঘোষ। প্রশ্ন উঠতে পারে, বিদ্যুৎ চমকালে বা বাজ পড়লে কান-ফাটানো এই আওয়াজ সৃষ্টি হয় কি-ভাবে? সাধারণ-ভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে বিষয়টিকে এইভাবে বলা চলে :

বিদ্যুতের যে পথটি তৈরি হল সেখানে থাকে বিদ্যুতের একটি প্রবল প্রবাহ। তার ফলে এই পথের উত্তাপ ও চাপ বেড়ে যায়। উত্তাপ বাড়তে পারে ৩০,০০০ ডিগ্রী সেন্টি-গ্রেড পর্যন্ত, চাপ বায়ুমণ্ডলীয় চাপের ১০০ গুণ পর্যন্ত। উত্তাপ ও চাপ বেড়ে যাবার ফলে বিশেষ ধরনের তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গ চারিপাশের বাতাসকে চেপে ধরে ও উত্তপ্ত করে তোলে। তরঙ্গের শক্তির ৯৯ শতাংশ ব্যয় হয়ে যায় এইভাবেই, বাকি এক শতাংশ থেকে সৃষ্টি হয় শব্দ-তরঙ্গ। বিদ্যুৎ চমকালে বা বাজ পড়লে যে প্রচণ্ড আওয়াজ আমরা পাই তা এই এক-শতাংশ তরঙ্গ থেকে। আর শ্রোতার অবস্থান ভেদে গোলটে যায় তার ধরন—কখনো কড়াৎ-কড়াৎ, কখনো গুম-গুম, কখনো কিছুই না।

অয়স্কান্ত

পাশ থেকে বলছি

স্মৃতি দিতে ঘেরা

স্মৃতি দিয়ে ঘেরা—কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের আত্মকথা। একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি সম্প্রতি কলকাতা বেতার যোগে প্রচারিত হয়েছে। চোখের আড়ালে চলে গেছেন যাঁরা তাঁদের আবার জনসাধারণের দৃষ্টির সামনে আনায় এ এক নিশ্চিত আয়োজন। কারণ যাঁরা স্মৃতিচারণ করলেন তাঁরা সবাই বিগতকালের খেলোয়াড়। সময় সংক্ষেপিত। নির্দিষ্ট। তাই অনেক কথাই উহ্য থেকে গেছে। তবে পেছনের দিকে তাকিয়ে স্মৃতির পাতা হাতড়ে স্বল্প কিছু যা তাঁরা উজাড় করে দিয়েছেন তা ক্রীড়ানুরাগী শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় বৈকি। তাঁদের কল্যাণে কিছু কিছু নেপথ্য কাহিনী বাইরে বেরিয়ে এসে জানাজানির পথকে করেছে প্রশস্ত।

এই অনুষ্ঠানের মূল চরিত্র ও কথক খেলোয়াড়েরা। প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে ফাঁকেই তাঁরা আত্মকথা শুনিয়েছেন। সবই যে খেলার কথা তা নয়। কিছু মজাদার ঘটনা এই উপলক্ষে আমরা জানবার সুযোগ পেয়েছি।

অনুষ্ঠানটি অভিনব। আমাদের দেশে এতকাল বেতারে সাক্ষাৎকার করা হয়েছে নট-নটী শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে। কিন্তু কথায় কথায় খেলোয়াড়দের জীবন বৃত্তান্ত জেনে নেওয়ার পরিকল্পনা বোধহয় এই প্রথম। অনুষ্ঠানটি জনপ্রিয় হয়েছে বলে শুনেছি। তাই আশা করা যায় যে বিগত কালের নায়কদের অনুসরণে ভবিষ্যতে কোনোদিন বর্তমানের চেনা চরিত্ররাও বেতার কথোপকথনের সূত্রে শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে এসে হাজির হবেন।

এই আসরে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন শৈলেন মান্না। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের ভারতীয় ফুটবলে যিনি ছিলেন অবিসম্বাদী নায়ক সেই শৈলেন মান্নার খেলা যাঁরা দেখেন নি একালের সেই দর্শকদেরও বোধকরি মান্নাকে চিনিয়ে দিতে হবে না। কারণ মান্না শুধু নিছকই এক ফুটবলার নন, চরিত্রগুণে আদর্শ খেলোয়াড়। কীর্তি কৃতিত্বের মূল্যায়নে তিনি এক ইতিহাস।

গোষ্ঠ পাল সামাদ কুমার ছোনা মজুমদারেরা হলেন কলকাতার ফুটবলে কিংবদন্তী। উত্তর প্রজন্মে আর কেউ যদি ওঁদের ছায়ার পাশে মানানসই হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে তাঁরই নাম শৈলেন মান্না।

মোহনবাগানের মান্না সারা ভারতেরই মান্না। রক্ষণব্যূহের শক্ত খুঁটি। নিজের ঘর আগলাতে অতন্দ্র প্রহরী। ১৯৪৮-এ লন্ডন অলিম্পিক ক্রীড়ায় ভারতীয় ফুটবল দলের নেতৃত্ব করেন টি আও। তার পরবর্তী যুগে জাতীয় দলের নেতৃপদে থিতু হয়েছিলেন ওই মান্নাই। চল্লিশের দশকের শেষপর্ব থেকে মাঠকে নমস্কার জানিয়ে সরে দাঁড়ানোর সময় পর্যন্ত জাতীয় ফুটবল দলের নেতৃপদ মান্না ছাড়া আর কারুরই অধিকারে আসে নি। এশীয় ক্রীড়াভূমিতে দূরপ্রাচ্য সফরে অলিম্পিক আসরে সর্বত্রই তিনি দলনেতা সেই যুগে ভারতীয় ফুটবলের প্রথম পুরুষ তিনিই— একমেবাদ্বিতীয়ম। যতোদিন খেলেছেন ততোদিনই ফুটবল মাঠে এই দীর্ঘকায় খেলোয়াড়টির প্রতিচ্ছবির ছায়া দিনে দিনে দীর্ঘতর হয়েছে।

নেহাৎ কম দিন খেলেননি। কথকতার অবকাশে মান্না স্মৃতি থেকে বলছিলেন:

নয় নয় করে বছর উনিশ হাফ প্যান্ট এঁটে মাঠে ময়দানে দৌড়দৌড়ি করেছি। ছেলেবেলায় পাড়ার ক্লাবে। পরে হাওড়া ইউনিয়নে। এবং সবশেষে মোহনবাগানে আসতে ফুটবল খেলোয়াড়ের প্রতিষ্ঠা পাই। মোহনবাগানে আসি চল্লিশের দশকের গোড়ার পর্বে। নামধাম হয় ১৯৪৪-এ মহামেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে খেলার পর। মহামেডান তখনও দুর্ধর্ষ দল। জিততে পারলে মোহনবাগান লীগ পাবে। এই পরিস্থিতিতে খেলা ভাঙার মিনিট দশেক আগে আমার ফ্রি কিকেই মহামেডানকে হারতে হয়। আর মোহনবাগানও সেই প্রথম লীগ জয় করে।

ফ্রি কিক করায় মান্না যে রীতিমতো ওস্তাদ এই তত্ত্বটি সেই থেকেই লোকমুখে ছড়াতে আরম্ভ করে। পরের যুগে সরাসরি ফ্রি-কিকে মান্না আরও যে কতো গোল করেছেন তার ঠিক ঠিকানা কী! এমনি একটি ফ্রি-কিকের ছবি আজও সেকালের দর্শকদের স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সেদিন শীল্ড ফাইনালে রাজস্থানের সঙ্গে খেলা ভাঙতে

UNIVERSITY OF CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

শৈলেন মান্না

মিনিট কয়েক বাকী। এমন সময় মোহন-বাগান পেল ফ্রি-কিক পেনাল্টি সীমানার বাইরে। রাজস্থানের খেলোয়াড়রা গায়ে গা লাগিয়ে পাঁচিল গড়লেন। কিন্তু সব বাঁধ ভেঙে দিল মান্নার সাড়া জাগানো এক ফ্রিকিক। তাতেই গোল শোধ আর রাজস্থানের শীল্ড জয়ের প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে ওঠা।

এক একটি ফ্রি-কিকে মান্না কতোবার যে এমনি করে অপরের মুখের গ্রাসটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এ হেন মান্না লণ্ডন ওলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেন নি কেন? গোল লাইন থেকে পেনাল্টি স্পটের দূরত্ব মাত্র বারো গজ। আর মান্না তো পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূর থেকে হামেশাই ফ্রি-কিকে গোল করেছেন। তবে লণ্ডনে অমন অঘটন ঘটলো কেন?

কেন যে এমন অঘটন তা সেদিন মান্না ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। বোধহয় আজও এই ঘটনার সঠিক জবাব তাঁর জানা নেই। পেনাল্টি অপচয়ের হেতু বর্ণনা করতে গিয়ে তাই আমতা আমতা করে বলছিলেনঃ

কি যে হয়েছিল সেদিন কে জানে! তখনকার দিনে বলে ফিতে বাঁধা থাকতো। ফিতে বাঁধা বলের মুখ ছিল আমার দিকে ফেরানো। ফলে বলের ভারসাম্য হয়তো এলোমেলো হয়ে যায়। ব্যাপারটা তখন আমলে আনি নি। পরের যুগে বুদ্ধিমান হতে চেয়ে বরাবর বলের ফিতে বাঁধা দিকটা গোলরক্ষকের দিকে ফিরিয়ে তবেই সট নিয়েছি। সেদিন লণ্ডনে অতো বাছবিচার না করে সজোরে পেনাল্টি কিক করতেই বলটি শূন্যে উড়ে গিয়ে আমাদের কপাল গুঁড়িয়ে দিল। তাছাড়া সট নেবার আগে বোধহয় মনে মনে কিছুটা 'টেনস' হয়েও পড়েছিলাম। নার্ভাসনেস? তা ঠিক বলবো না। তবে মনের ওপর চাপ পড়েছিল বেশ। সাথসওগণ্ ভাজ মহম্মদ চোট পেয়েছিলেন। আমাকে একাই অনেক কিছু সামলাতে হচ্ছিল। বাড়তি খাটুনির চাপ যাবে কোথায়! সব মিশিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে যেতে আমি বেশ কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারি নি। আমার জন্যেই ভারত হেরে গেল। এ দুঃখ কি সহজে যাবার!

এ আফশোষ স্বাভাবিক। সঙ্গত। তবে ভারতের হারের জন্যে শুধু এই ঘটনাই তো দায়ী ছিল না। ওই আসরে ফ্রান্সের সঙ্গে খেলায় ভারতীয় হাফ-ব্যাক মহাবীরও একটি পেনাল্টি কিক নষ্ট করেন এবং দু দুটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ নষ্টের পর ভারতকে হেরে যেতে হয় ১—২ গোলের ব্যবধানে।

লণ্ডন ওলিম্পিক ফুটবলে ভারত হেরে গেলেও দর্শককুলের সহানুভূতি আদায় করতে পেরেছিল। পণ্ডিতেরা পর্যন্ত ভারতীয়দের ক্রীড়াকৌশলের প্রশংসা করে বলেছিলেন এই দল সত্যিকারের বল-প্লেয়ার আছেন।

সহানুভূতি আদায়ের মূল কারণ ভারতীয়দের নয়নপদ ক্রীড়ারীতি। মান্না বলছিলেনঃ খালি পায়ে যে ফুটবল খেলা যায় তা ওদেশের লোকেরা গোড়ায় বিশ্বাস করতে চাননি। পরে মাঝ মাঠে আমাদের দেখে তাঁদের চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটলেও বিস্ময়ের ঘোর কখনো কাটেনি। আমরা খালি পায়ে লম্বা লম্বা কিক করতাম আর ও'রা গ্যালারিতে বসে 'ওঃ মাই ফুট!' বলে চীৎকার জুড়ে দিতেন। যেন বলের ধাক্কাতে ওঁদেরই পায়ের চামড়া ফুটিফাটা হয়ে গেল! তাছাড়া বাকিংহাম রাজপ্রসাদে পার্টিতে গেছি কি স্টেডিয়ামে বসে টটেনহাম হটস্পার বনাম চেলসির খেলা দেখছি অমনি কৌতূহলী কজন ইংরাজ আমাদের পাশে বসে চুপি চুপি হাত দিয়ে আমাদের পাগুলি টিপে টিপে পরখ করতে শুরু করলেন। ভাবখানা এই খালি পায়ে বল পেটাচ্ছি; অতএব আমাদের পাগুলি বুঝি হাড়-মাংসের বদলে লোহার মতো শক্ত কোনো ধাতু দিয়ে গড়া! ওঁদের ছেলেমানুষি দেখে সেদিন হাসি চেপে রাখাই ছিল দায়!

মান্নার কালে কলকাতার মাঠে অনেক জাত খেলোয়াড়ের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের প্রসঙ্গে এসেই মান্না বলেন কতো জনের নামই বা করি। নাম করতে গেলে একখানা মহাভারত হয়ে পড়বে। তবে একজনের নামোচ্চারণ না করলে আমি নিজের কাছেই অপরাধী থেকে যাবো। ওর নাম শরৎ দাস। ব্যাক হিসেবে আমার সিনিয়ার পার্টনার। ছোটখাটো আকৃতি হলে কি হবে একা শরৎদা মাঠের অনেকখানি জুড়ে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতো। যেমন সাহস তেমনি বুদ্ধি। এবং খেলার গতিবিধি আন্দাজে নির্ভুল প্রায়। শরৎদার জুটি হিসেবে খেলতে খেলতে আমি শিখেছি অনেক। আর সেই শিক্ষা আমার খেলোয়াড় জীবনে যথেষ্ট কাজে লেগেছে।

ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার স্মৃতি মান্নার মন থেকে এখনও মুছে যায় নি। তাঁর যৌবনের উত্তাপের মতো সেই সব খেলার উত্তেজনা ক্রমশই জুড়িয়ে আসছে বলে টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলি যেন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তবে ফিরে ফিরে তাকালে হারানো স্মৃতিগুলি আবার যেন তাজা হয়ে ওঠে। বলছিলেন মান্না ঃ

আমাদের সময়ে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ড লাইন ছিল জবরদস্ত। ভেংকাটেশ আপ্পারাও ধনরাজ আমেদ সালকে নিয়ে গড়া ও ফরোয়ার্ড লাইনই ছিল ইস্টবেঙ্গলের সমস্ত শক্তির উৎস। আর এই ফরোয়ার্ড লাইনের মুখোমুখি হওয়াই ছিল আমার কাজ। সে কাজ কখনো সুসম্পন্ন করেছি। কখনো ওরা আমাকে ঠকিয়েছে। হার মেনে দুঃখ পেয়েছি। আবার মনে মনে ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডদের প্রশস্তিও গেয়েছি। আর ওদের যখন রুখতে পেরেছি তখন আত্মপ্রসাদও কম পাইনি। ওদের কাছে হেরেছি কখনো। আবার ওদের হারিয়েছিও বহুবার। ইস্টবেঙ্গলের পাঁচ ফরোয়ার্ডের মধ্যে দুষ্টু বুদ্ধির গোকা আমেদ আর ধনরাজের মাথায় যেন গিজগিজ করতো। যেমন খেলতো তেমনি চতুর ওরা। খেলার মধ্যে প্রায় নিজেদের মধ্যে দক্ষিণী ভাষায় কি সব বলাবলি করতো। বুঝতে পারতাম না। পরে ওদেরই জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে আমার সঙ্গে খুনসুটি বাধাতে দুজনেই দুজনকে পরামর্শ দিতো। যাতে আমার মনঃসংযোগ শিথিল হয়ে যায়। তখনও মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে চুলোচুলি লড়াই বাধতো। এ লড়াই ছিল প্রেস্টিজের লড়াই। তবে মাঠের ভেতরে আমরা যতোই কেন না পরস্পরের শত্রুতা করি বাইরে কিন্তু আমেদ ধনরাজ আমি সবাই ছিলাম বন্ধু আপনজন। হাসিঠাট্টা গালগল্পে কোনোদিন কামাই পড়েনি।

যখন খেলতেন তখন একদিনের জন্যেও মান্নাকে দল সমর্থকদের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়নি। সেদিক থেকে তিনি রীতি-মতো ভাগ্যবান। নিজের এই ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে মান্না বলেন ঃ

আমিও তো কতোদিন খারাপ খেলেছি। আমার দোষে দলকে গোল খেতেও হয়েছে। সবদিন তো আর সমান যায় নি। কিন্তু কই তেমন উগ্র সমালোচনার মুখে কেউ তো আমায় ঠেলে দেয় নি? সেদিনের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির কতো তফাৎ। দল জিততে না পারলেই আজকাল খেলোয়াড়দের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। বিক্ষোভ অশালীন ব্যবহার নির্যাতন সব কিছুই চলছে সমানে। এমন বিক্ষোভ জানাতে থাকলে কি খেলোয়াড়েরা ভাল খেলতে পারেন? তাঁরা সহানুভূতি সুবিচারের প্রত্যাশী। তাঁদের দিকটি না দেখে শুধু দলের জিৎ কামনা করলে কখনোই ব্যাপারটার সুরাহা হবে না। সত্যি বলতে কি ফুটবল মাঠে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে আজ সকলেরই চিন্তা করা দরকার। এই চিন্তার তাগিদ ঐতিহাসিক। তাই সকলের কাছেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন বর্ষীয়ান খেলোয়াড় শ্রীশৈলেন মান্না গোষ্ঠ পালের পর যিনি হলেন একমাত্র ফুটবল খেলোয়াড় রাষ্ট্রীয় সম্মান পদ্মশ্রীতে যাঁকে সম্মানিত করা হয়েছে। আশা করি এই সম্মানিত ক্রীড়াবিদের আবেদন বৃথায় যাবে না। না গেলেই পরিস্থিতি হবে সুখকর।

অজয় বসু

খেলাধূলা

দর্শক

অলিম্পিক ফুটবল

কানাডার মন্ট্রিল শহরে আগামী জুলাই ১৭ তারিখে আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের ২১তম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হবে। এবারের অলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান তালিকায় ফুটবল নিয়ে একুশ রকমের খেলা স্থান পেয়েছে। ইংরেজদের জাতীয় খেলা এই ফুটবল জনপ্রিয়তা এবং উৎকর্ষতার সংবাদে আজ অনেক ভিন দেশেরই জাতীয় খেলায় পরিণত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার আসরে ইংল্যাণ্ডের ফুটবল খেলা নিয়ে ইংরেজদের বড়াই করার মত আর সে মুখ নেই। ইংরেজদের এখন হাতির খাদে পড়ার মত অবস্থা। অলিম্পিক ফুটবল এক বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে ইংল্যাণ্ড কোনদিনই বিরাট কিছু করতে পারেনি। এ পর্যন্ত অলিম্পিক ফুটবল খেলার তেরটি আসরে ইংল্যাণ্ডের স্বর্ণ পদক জয় মাত্র দুবার, সেই ১৯০৮ ও ১৯১২ সালে। তারপর অপর কোন পদকই (রৌপ্য বা ব্রোঞ্জ) ইংল্যাণ্ডের কপালে জুটেনি। এর মধ্যে একবার চতুর্থ স্থান পেয়েছে ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক গেমসের ফুটবল খেলার আসরে। বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে ইংল্যাণ্ডর ফুটবল দল মাত্র একবার ফাইন্যালে খেলে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে ১৯৬৬ সালে। অপরদিকে ইংল্যাণ্ডের তুলনায় ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য অনেক বেশী। অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে ১৯৫২ সাল থেকে উপর্যুপরি ৬ বার সমাজতান্ত্রিক দেশ স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে—হাঙ্গেরী ৩ বার (১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮) এবং একবার করে রাশিয়া (১৯৫৬ সালে), যুগোশ্লাভিয়া (১৯৬০ সালে) এবং পোল্যাণ্ড (১৯৭২ সালে)। গত সাতবারের অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে সমাজতান্ত্রিক দেশ রৌপ্য পদক জয়ী হয়েছে ৬ বার—যুগোশ্লাভিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬) এবং একবার করে চেকোশ্লোভাকিয়া (১৯৬৪), বুলগেরিয়া (১৯৬৮) এবং হাঙ্গেরী (১৯৭২)। একই বছরের অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ—এই তিনটি পদকই সমাজতান্ত্রিক দেশের গলায় শোভা পেয়েছে তিনবার (১) ১৯৫৬ সালে স্বর্ণ রাশিয়া, রৌপ্য যুগোশ্লাভিয়া ও ব্রোঞ্জ বুলগেরিয়া (২) ১৯৬৪ সালে স্বর্ণ হাঙ্গেরী, রৌপ্য চেকোশ্লোভাকিয়া ও ব্রোঞ্জ পূর্ব জার্মানী এবং ১৯৭২ সালে স্বর্ণ পোল্যাণ্ড, রৌপ্য হাঙ্গেরী এবং ব্রোঞ্জ পূর্ব জার্মানী। অলিম্পিক ফুটবল খেলার ইতিহাসে সর্বাধিক তিনবার স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ডও সমাজতান্ত্রিক দেশ হাঙ্গেরীর (১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮)। ১৯৪৮ সালে সুইডেনের স্বর্ণ পদক জয়ের পরই সমাজতান্ত্রিক দেশের জয়যাত্রা অব্যাহত-গতিতে চলেছে।

আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের সূচনা ১৮৯৬ সালে। আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন বছরে অনুষ্ঠানের বিষয় তালিকায় ফুটবল খেলা স্থান পায়নি। ১৯০০ এবং ১৯০৪ সালের অলিম্পিক গেমসের তালিকায় প্রদর্শনী খেলা হিসাবে ফুটবল স্থান পেয়েছিল। অলিম্পিক গেমসের তালিকায় ফুটবল খেলা প্রথম সরকারীভাবে স্থান পায় ১৯০৮ সালে। ১৯৩২ সালের ১০ম অলিম্পিক গেমসের তালিকায় ফুটবল খেলা বাদ পড়েছিল। দুটি বিশ্ব যুদ্ধের দরুন তিনবার অলিম্পিক গেমসের আসর বসেনি। এ পর্যন্ত অলিম্পিক গেমসের আসর বসেছে মোট সত্তেরবার এবং অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসর তের বার। অলিম্পিক ফুটবল খেলার এই তেরবারের আসরে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে এই ৯টি দেশ—হাঙ্গেরী ৩ বার (১৯৫২, ১৯৬৪ ও ১৯৬৮ সালে), ইংল্যাণ্ড ২ বার (১৯০৮ ও ১৯১২ সালে), উরুগুয়ে ২ বার (১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে) এবং একবার করে বেলজিয়াম (১৯২০), ইতালী (১৯৩৬), সুইডেন (১৯৪৮), রাশিয়া (১৯৫৬), যুগোশ্লাভিয়া (১৯৬০) এবং পোল্যাণ্ড (১৯৭২)। এই অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণ পদক বিজয়ী ৯টি দেশের মধ্যে ইউরোপেরই ৮টি দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকার একটি—উরুগুয়ে। অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণ পদক বিজয়ী ইউরোপের আটটি দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশই চারটি হাঙ্গেরী, রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং পোল্যাণ্ড।

অলিম্পিক ফুটবলের রৌপ্য পদক জয়ের তালিকায় আছে ৮টি দেশ—ইউরোপের ৭টি এবং দক্ষিণ আমেরিকার একটি (১৯২৮ সালে আর্জেণ্টিনা)। ইউরোপ থেকে রৌপ্য পদক জয়ী হয়েছে ডেনমার্ক ৩ বার (১৯০৮, ১৯১২ ও ১৯৬০), যুগোশ্লাভিয়া উপর্যুপরি ৩ বার (১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬), চেকোশ্লোভাকিয়া ২ বার (১৯২০ ও ১৯৬৪) এবং একবার করে সুইজারল্যাণ্ড (১৯২৪), অস্ট্রিয়া (১৯৩৬), বুলগেরিয়া (১৯৬৮) এবং হাঙ্গেরী (১৯৭২)।

অলিম্পিক ফুটবলের ব্রোঞ্জ পদক জয়ের তালিকায় আছে ৯টি দেশ—ইউরোপের ৮টি এবং এশিয়ার একটি (১৯৬৮ সালে জাপান)। ইউরোপের আটটি দেশ এইভাবে ব্রোঞ্জ পদক জয়ী হয়েছে—হল্যাণ্ড ২ বার (১৯০৮ ও ১৯১২), সুইডেন ২ বার (১৯২৪ ও ১৯৫২), ইতালী ২ বার (১৯২৮ ও ১৯৬০), পূর্ব জার্মানী ২ বার (১৯৬৪ ও ১৯৭২) এবং একবার করে স্পেন (১৯২০), নরওয়ে (১৯৩৬), ডেনমার্ক (১৯৪৮), বুলগেরিয়া (১৯৫৬) এবং রাশিয়া ১ (১৯৭২ সালে যুগ্মভাবে)।

অলিম্পিক ফুটবলের পদক জয়ের তালিকায় ইউরোপেরই জয় জয়কার। ইউরোপের ১৭টি দেশ মোট ৩৬টি পদক পেয়েছে—স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ১২ এবং ব্রোঞ্জ ১৩। বাকি চারটি পদক ভাগাভাগি করে পেয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে (স্বর্ণ ২) ও আর্জেণ্টিনা (রৌপ্য ১) এবং এশিয়ার জাপান (ব্রোঞ্জ ১)।

এ পর্যন্ত মাত্র এই তিনটি দেশ অলিম্পিক ফুটবল এবং বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে—ইংল্যাণ্ড, ইতালী এবং উরুগুয়ে। অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে ইংল্যাণ্ড ১৯০৮ ও ১৯১২ সালে, ইতালী ১৯৩৬ সালে এবং উরুগুয়ে ১৯২৪ ও ১৯২৮ সালে। অপর দিকে বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে স্বর্ণ পদক জয়ী ইংল্যাণ্ড ১৯৬৬ সালে, ইতালী ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালে এবং উরুগুয়ে ১৯৩০ ও ১৯৫০ সালে। এই তিনটি দেশের মধ্যে উরুগুয়ের কৃতিত্ব বেশী উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, সে দুবার করে অলিম্পিক ফুটবল এবং বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে স্বর্ণ পদক জয়ী হয়েছে। বিশ্ব ফুটবল খেলার আসরে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল তিনবার জুল রীমে কাপ জয়ী হয়েও অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে কোন পদক জয় দূরের কথা চতুর্থ স্থান পর্যন্ত পারেনি। আসন্ন ২১তম অলিম্পিক গেমসের ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রেজিলের অলিম্পিক স্বর্ণ পদক জয়ের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন কি সফল হবে? এবার প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলায় ব্রেজিলকে খেলতে হবে স্পেন এবং ১৯৬৪ ও ১৯৭২ সালের রৌপ্য পদক জয়ী পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে। সি গ্রুপের লীগে গতবারের চ্যাম্পিয়ান পোল্যাণ্ড, উরুগুয়ে, ইরান এবং নাইজেরিয়ার খেলা পড়েছে। সম্প্রতি উরুগুয়ে প্রতিযোগিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাদের শূন্য স্থানে খেলতে পারে দক্ষিণ আমেরিকান জোনের ৩য় স্থান অধিকারী আর্জেণ্টিনা অথবা ৪র্থ স্থান

অধিকারী কলম্বিয়া। বি গ্রুপে খেলবে এই চারটি দেশ—রাশিয়া, কানাডা, উত্তর কোরিয়া এবং ঘানা।

১৯৭৬ সালের অলিম্পিক ফুটবল খেলায় কোন দেশ শেষ পর্যন্ত স্বর্ণপদক পাবে? অলিম্পিক গেমসের আসর বড় শক্ত ঠাঁই। কোন দেশ সম্পর্কে নিশ্চয় করে তা বলা যায় না। অলিম্পিক গেমসের আসরে বিস্তর অঘটন ঘটনার নজির আছে। তবে কোন কোন মহলের ধারণা এবারও অলিম্পিক ফুটবলের স্বর্ণপদকটি ইউরোপেরই কোন দেশের গলায় শোভা পাবে। ইউরোপের কোন সমাজতান্ত্রিক দেশের এই স্বর্ণপদক জয় অসম্ভব নয়। গত ছ'বছর তারাই তো অলিম্পিক ফুটবলের আসর জাঁকিয়ে বসে আছে।

অলিম্পিক ফুটবল খেলার আসরে এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রথম যোগদান করে জাপান এবং চীন ১৯৩৬ সালে। এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রথম অলিম্পিক ফুটবলের পদক জয় করে জাপান।

মাঠের নায়ক

'কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা, নম্রতা আর মূল্যবোধ আমাদের মন থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে। অতীতকে ভুলে, বর্তমানের বর্ণচ্ছটায় গা ভাসানো ইদানীং কালের একটি ফ্যাসান। কিন্তু আমি বোধহয় একটু সেকেলে। এবং সেজন্যই ব্যাংককের মাঠে পোল করার পরমুহূর্তে বারবার আমার খোকনদাকে মনে পড়ছিল'।

সত্যজিৎ মিত্র

মাস কয়েক আগেকার ঘটনা। স্থান ব্যাংকক। এশীয় যুব ফুটবলের আসর। খেলা ভাঙ্গার তখন মিনিট পাঁচেক বাকী। দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ভারত ০—১ গোলে পিছিয়ে। দর্শকরা গ্রাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের ওপরের ঘড়িটার দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন শেষ মুহূর্তটির সঙ্কেত শোনার জন্য। ঠিক এমন সময় ভারত ফ্রি-কিক্ পেল। এগিয়ে গেলেন শ্রান্ত ক্লান্ত এক ভারতীয় খেলোয়াড়। বল বসালেন। লক্ষ্য স্থির রেখে সট্ নিলেন। বুলেটের মত বেরিয়ে গেল বলটা। গোলরক্ষকের প্রসারিত হাত দুটির নাগাল এড়িয়ে বল ঢুকলো জালে। খেলাও শেষ। ফলাফল : দক্ষিণ কোরিয়া (১) : ভারত (১)। নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেল ভারত।

ভারতের পরিত্রাতা সেদিন বাংলার ছেলে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ মিত্র। ইষ্টবেঙ্গলের লেফট ব্যাক। দশাসই গড়ন, রং ধবধবে ফর্সা, মাথার চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। কথা-বার্তায় শান্ত, ধীর, নম্র এবং বিনয়ী। ট্যাকিলিং চমৎকার, স্যুটিং ভাল, জায়গা আগলানোর ব্যাপারে অতি সতর্ক। ফরওয়ার্ড লাইনকে সক্রিয় রাখতে সত্যজিৎ একজন নিরলস কর্মী। ঘাটতি যেটুকু আছে তা হোল স্পীড। অনুশীলনে অনুশীলনে ঐ ঘাটতিটুকুও দূর হয়ে যাবে। অন্ততঃ সত্যজিতের তাই বিশ্বাস।

'ভাল ফুটবল খেলতে হলে শারীরিক সক্ষমতাও যেমন চাই, তেমনি চাই সনিষ্ঠ অনুশীলন, পরিভাষায় আমরা যাকে বলি প্র্যাকটিশ। প্র্যাকটিশে স্পীড বাড়ে, ষ্ট্রেংথ বাড়ে, বাড়ে ষ্ট্যামিনা। আর জানেনই তো, ঐ তিনটি বস্তুর যে কোন একটিতে ঘাটতি থাকলে আর সার্থক ফুটবলার হওয়া যায় না'। সত্যজিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুর ভেতরে বসে। বেলা তখন ন'টা। সবে ও'দের প্রাতঃকালীন অনুশীলন পর্ব শেষ হয়েছে।

সত্যজিৎ খাস কলকাতার ছেলে। নিবাস কালীঘাট অঞ্চলে নেপাল ভট্টাচার্য ষ্ট্রীটে। জন্ম—ওখানেই ১৯৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর। বাবা দুর্গাদাস মিত্র ভারত সরকারের অবসর প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসার। মা লক্ষ্মীরাণী মিত্র কিছুদিন আগে দেহ রেখেছেন। সত্যজিতেরা পাঁচ ভাই, দু' বোন। সত্যজিৎ সর্ব কনিষ্ঠ বলে বাড়ীর সবচেয়ে আদরের। লেখাপড়া সুরু করেছিলেন পাড়ারই কালীঘাট হাইস্কুলে। ওখান থেকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছেন ১৯৭৩ সালে। কলেজচারুচন্দ্র। ওখান থেকে পার্ট টু দেবেন সত্যজিৎ।

ফুটবলের দীক্ষা নিয়েশিলেন সত্যজিৎকে সাদার্ণ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের খোকনদা যাঁকে ব্যাংককে বারবার সত্যজিতের মনে পড়ছিল। জীবনে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক ফুটবল খেলতে নামেন ১৯৭১ সালে বাংলা স্কুল দলের হয়ে। আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবলে ভাল খেলার সুত্রেই অবশ্য রাজ্য দলে স্থান হয়েছিল তাঁর। জেলা স্কুল ফুটবলে সত্যজিৎ খেলেছেন পরপর তিন বছর। ১৯৭১ সালে অধিনায়কও ছিলেন দলের (বাংলা ঐ ১৯৭১ সালে মণিপুরে আয়োজিত জাতীয় স্কুল ক্রীড়ায় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল)।

সাদার্ণ স্পোর্টিস এসোসিয়েশন থেকে এরিয়ান্সে যোগ দেন ১৯৭২ সালে। ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত এরিয়ান্সের নন্টু মিত্তির, শচীন হালদার, বীরেন গুহর পরিচর্যায় কেটেছে। সাদামাটা ফুটবলের সংস্কার ঘটেছে। উৎসাহ, অনুপ্রেরণা মিলেছে। ১৯৭৩ সালে সত্যজিৎ খেলেন আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে (রায়পুর)। ১৯৭৪ সালে খেলেছেন কোয়েম্বাটুরে জাতীয় জুনিয়ার ফুটবল। বাংলাই সেবার চ্যাম্পিয়ন। তারপর জুনিয়ারদের আসর থেকে সিনিয়ারদের আসরে ১৯৭৫ সালে সন্তোষ ট্রফিতে (কালীকট)। প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সর্বভারতীয় রেল দলের! সত্যজিৎ অবশ্য এখন আর রেলে নেই। বর্তমানের চাকরী ফুড কর্পোরেশনে। পদ? আপাততঃ ক্লার্ক। বি এ পাশ করতে পারলেই প্রমোশন। সেদিনের অপেক্ষাতেই আছেন সত্যজিৎ।

উত্তমকুলি
রবি ঘোষ, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, উত্তমকুমার, মন্টু ব্যানার্জি ও দিলীপ রায়। অমৃত ফটো।

সিনেমাটিক

আমি ভেবেছিলাম একশবিশ জর্দাপান মুখে সূর্য মানে আর্ট-ডিরেকটর সূর্য চ্যাটার্জি তম্বি করেছে; কিন্তু সেটে ঢুকে আমি থ-। কম দিন তো হল না ফিল্ম লাইনে আমার, জীবনে অনেক ভড়কির মুখোমুখী হয়েছি, কিন্তু সেটে দাঁড়িয়ে বুঝলাম সূর্য এক বর্ণ বাড়িয়ে বলেনি। মনে হল হিমালয়ের সেই জনবিরল এলাকা থেকে ও যেন বাস্তবিক সেই ছোট্ট চার্চটি তুলে নিয়ে এসে সটান স্টুডিওর ফ্লোরের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি একশ বিশ ধারে কাছে নেই। জয়ন্ত মুচকি হেসে বলল—সে সূর্যিদা? টেকনিশিয়ান্সে গিয়ে দেখগে এখন হাতে তিন করছে..

অর্থাৎ সেট তৈরী করতে গেছে। সূর্যিটা বড় বেখেয়াল। হুট কর চলে গেল কি বলে?

সেটে এ-দিন বড্ড ভীড়। একপাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে কিচির-মিচির করছে। টেকনিশিয়ানদের কান ঝালাপালা। একজন ছুটল বেণুদির (সুপ্রিয়া দেবী) খবর নিতে: বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়েছেন কিনা। ছবির ডিরেকটার শান্ত-শিষ্ট মানুষ। যত গণ্ডগোল জয়ন্তর। নাটাঝামটা খেয়ে সে অস্থির। আর এরই মধ্যে সূর্যি বেঁ করে কেটে গেছে কখন যেন।

কালার ছবির সেট। আলোয় আলোয় ছয়লাপ হয়ে আছে। কালারে যত বেশী আলো তত খোলে রং। ক্যামেরাম্যান তাই ঠেঁশে আলো ঢুকিয়েছে সেটে। আমি ওই হট্টগোলের মধ্যে চার্চের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে—

দেখি, স্বয়ং যিশু মাথায় কাঁটার মুকুট পরে ক্রুশবিদ্ধ, রক্তাক্ত, অপার ক্ষমাসুন্দর চোখে দাঁড়িয়ে। চারিদিকে রূপোর বাতিদান, মোমের আলো জ্বলছে। মূর্তিটি নিশ্চয়ই কোন খ্যাতনামা ভাস্করের কাজ।

যিশুর চোখের সামনে বায়োস্কোপের মানুষেরা দিনের কাজ শুরুর তোড়জোড় করছে। বাচ্চাগুলি এসে কৌতূহলী চোখে ওঁকে দেখছে। তারপর নীচুগলায় নিজেদের মধ্যে কি যেন সব বলাবলি করছে। কেউ কেউ তো জীবনে এই প্রথম চার্চে এল।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল। কয়েক-দিন আগে খবরের কাগজে পাতায় একটা সংবাদ ছেপে বেরিয়েছিল। জেরুজালেমে ইদানিং 'দি পাস ওভার প্লট' নামে একটা ছবি রিলিজ হয়েছে। আর তা নিয়ে সারা পৃথিবীতে বেধে গেছে তুমুল তর্ক। বলা হয়েছে যেসাশ ক্রাইস্ট ধর্মগুরু ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা। 'দি পাস ওভার প্লট' কথার অর্থ হচ্ছে 'প্রস্থানের ষড়যন্ত্র'। অর্থাৎ যেসাশ ক্রাইস্ট তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটি নাকি সুপরিকল্পিত ভাবেই করেছিলেন। এখন থেকে দশ বছর আগে জে, স্কনফিলড নামক জনৈক ইংরেজ লেখক বইটি লিখেছিলেন। প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে চারিদিকে প্রচণ্ড প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। স্বয়ং পোপ এবং ভাটিকানের অন্যান্যরা এই বইয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বইটির লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে

যায়। লেখক বলেছেন, যিশু যেভাবে মারা গেছেনবলে দাবী করা হয়েছে—উনি সেভাবে মারা যাননি। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী উনি এমন এক ধরনের ওষুধ খেয়েছিলেন যা তাঁকে খাওয়ানো হয়েছিল যাতে উনি দীর্ঘ সময় অচৈতন্য হয়েছিলেন। একদল ইহুদি তাঁকে কবর দেয়। কিন্তু কবর দিলে কি হবে, আসলে তিনি তো মরেননি। পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে। তারপর কুসংস্কার-সম্পন্ন গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে তিনি কবর থেকে উঠে আসেন। এই ঘটনাকে ঐশ্বরিক মহিমা দেবার জন্য গ্রামবাসীদের নাকি বলা হয় যে যিশুর পুনরুত্থান ঘটেছে। সরল গ্রামবাসীরা এটাকে একটা বিরাট অলৌকিক ঘটনা করে দারুণ অভিভূত হয়ে পড়ে।

স্কনফিল্ড নিউ টেস্টামেন্টের বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করেছেন। উল্টে বলেছেন, যিশু ছিলেন জুডিয়ার রোমান দখলদারদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের জনৈক নেতা। তাঁর গ্রেপ্তার এবং মৃত্যুর সব ঘটনাই মনগড়া এবং আগে থেকে বেশ কায়দা করে সাজানো। আসলে একজজন রোমান সৈনিকের অস্ত্রের আঘাতেই তাঁর প্রকৃত মৃত্যু হয়।

এই উপন্যাস এখন চলচ্চিত্রে রূপ পেয়েছে। জেরুজালেমেই ছবির শুটিং হয়েছে। রিলিজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। 'দি পাস ওভার প্লট' এখন এক সুপারহিট ফিল্ম।

চার্চের সেটের একপাশে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম—এটা কি সত্য?

ওই যে রক্তাক্ত দেহে অপার ক্ষমাসুন্দর চোখে মাটি গড়া যে মূর্তিটি আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাঁর পটভূমি কি সত্যিই কোন এক যুগের পশ্চিম রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট? উহুঁ বিশ্বাস করতে মন সায় দেয় না।

ফ্লোরের শোরগোল ক্রমেই বাড়ছে। শুটিং আরম্ভ হতে চলেছে। সুপ্রিয়া দেবী সিস্টারের রূপসজ্জায় ফ্লোরে এসে গেছেন। প্লে-ব্যাক মেশিনে গান বাজতে আরম্ভ করেছে। সলিল চৌধুরীর সুরে একদল শিশু প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়েছে। গান শুনে আমার মনে হল—অসাধারণ ছবিতে প্রায় একই সিচুয়েশনে একটা গান গেয়েছেন হেমন্ত মুখার্জি, যাতে আবার লিপ দিয়েছেন উত্তমকুমার; সে গান সুপার্ব। সেখানেও চার্চ, সেখানেও যিশু-বন্দনা। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতি। এখানে আমরা দেখছি একদল অনাথ শিশুকে নিয়ে হিমালয়ের গভীরে এক সহৃদয় ধর্মপ্রাণ ইংরেজ একটি অনাথ আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মারা গেছেন। আর এই অনাথ আশ্রমের সব দায়িত্ব তুলে দিয়ে গেছেন এই ভাগ্যবিড়ম্বিতা বাঙ্গালী সিস্টারের হাতে। এই ফুলের মত নিষ্পাপ পাহাড়ী শিশুরা সিস্টারকে আঁকড়ে ধরে মানুষ হয়ে উঠছিল। তারপর হঠাৎ সেখানে বিপর্যয় ঘটল। রক্তাক্ত সব

মৌসম

প্রযোজনা : সুনন্দিনী পিকচার্স (মাদ্রাজ)

অমরনাথ গিল বিশ বছর ব্যবধানে দার্জিলিং এলেন, কিছু দিন বিশ্রাম নেবার জন্যে। মেডিসিন ফ্যাকটরীর দায়িত্ব এসে পড়ায়, আসা সম্ভব হয় নি। অথচ বিশ বছর আগে এখানেই কলেজ জীবনে আলাপ হয়েছিল, স্থানীয় কবিরাজের অপূর্ব সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। আলাপ থেকে ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেম কিন্তু অমরনাথ চন্দ্রাকে কথা দিলেও ওকে বিবাহ করতে পারেন নি, আচমকাই একদিন ওকে দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। সুতরাং ওখানে গিয়ে অমরনাথের প্রধান কাজ হল চন্দ্রার খোঁজখবর নেওয়া, অনেক চেষ্টা করেও অমরনাথ চন্দ্রাকে পেল না, পেল না তাঁর মৃত্যুর খবর, এবং চন্দ্রার একমাত্র কন্যা কাজলীর অধঃপতনের কাহিনী।

অমরনাথ ওকে নিজের মেয়ের মত মনে করে, ওর পতিতা জীবন থেকে উদ্ধার করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেন এবং এ জন্যে ওর ব্যবসায়ের প্রচুর টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু কাজলী ওর মার সঙ্গে অমরনাথের পূর্ব সম্পর্ক জানতে পেরে ওর কাছে আশ্রয় নিতে দ্বিধা বোধ করলেও পরে তার ভুল বুঝতে পেরে অমরনাথের পিতৃত্ব এবং স্নেহের কাছে হেরে গেল।

কমলেশ্বরের লেখা কাহিনীতে বাস্তবের নাটকীয়তা আছে। পরিচালক গুলজারের সংলাপ রচনা এবং পরিচালনা ছবিকে আরও মর্যাদা দিয়েছে, হিন্দী ছবির কাহিনীতে নতুন কিছু পরিবেশনা করবার জন্যে। অবশ্য দু-একটি দৃশ্যে সুইডিস পরিচালক ইংগ্মার বার্জম্যানের 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ'র এবং ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণ রেখা' ছবির সাদৃশ্য আছে। উনি ইচ্ছা করলে এ জাতীয় দৃশ্য পরিহার করে দৃশ্যাবলীকে আরও বাস্তবসম্মত ও চিত্র-কল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। অভিনয় এবং আঙ্গিক এ ছবির প্রধান সম্পদ। অভিনয় — অমরনাথের চরিত্রে সঞ্জীবকুমার এবং চন্দা ও কাজলীর দ্বৈত চরিত্রে শর্মিলা ঠাকুর অপূর্ব অভিনয় করেছেন, অন্যান্য ভূমিকায় ওম প্রকাশ দীনা পাঠক, আগা, সতোর কাপুর ও সুঅভিনয় করেছেন। কে বৈকুণ্ঠের ক্যামেরা ও মদন মেহেরার সঙ্গীত সুন্দর।

চিত্রদূত

নাটকীয় কাহিনী। বেণুদি দারুন করছেন। অনেক দিন পর বেণুদি মনের মত চরিত্র পেয়েছেন। এমনিতে অভিনয়ের রেঞ্জ অনেক বড়, তার এই ধরনের চরিত্র।

কাঠের তক্তা মেরে সূর্য চার্চের অ এই সেট সাজিয়েছে। নিখুঁত সাজি আমায় বলেছিল, ভাই দিনের পর দি চার্চে হাঁটাহাঁটি করেছি। একজন পা ওকে ভালবেসে প্রায় দীক্ষা দেবার করেছিলেন। সূর্য বলল, শেষে ভাই বের করে দেখাতে হল। সাহেব আ হিন্দুবাড়ীর ছেলে...

সেদিন লাঞ্চের সময় সূর্যর দেখা গেল। মুখোমুখী হতেই চোখ কায়দা মেরে বলল—কেমন দেখলে সে

—বেশ সুন্দর হয়েছে।

—উঃ যা মেহনত গেছে কটা দি বলব। ডিরেকটারকে খুব কায়দা করে দেখিয়েছিলাম। উনি বললেন ঠিক তুমি সেট খাড়া করে দাওগে। বাস, ইয়ে নিলাম আর কি। পাহাড়ী লোকে সেট কলকাতার স্টুডিও ফ্লোরে সাজা চাট্টিখানি কথা! বাপের নাম খগেন গিয়েছিল আরেটু হলে।

ফিল্মে আসার উদ্দেশ্য ছিল করবে। যাত্রায় বাণীর পার্ট বাঁধা সূর্যের। তখন সব ব্যাপারেই ওর মে পনা চোখে পড়ত আমাদের। তারপর পানী না পেয়ে শেষে পার্ট ছেড়ে ধরল সূর্য—তখনকার বিখ্যাত ডিরেকটার বটু সেনের সহকারী হি ইদানিং দেখছি সূর্যর পার্ট করার গেছে। কিন্তু একটা সময় ছিল যে টুকটাক পার্ট করবেই সে-ছবিতে ছবিতে যখন আর্ট ডিরেকটারের কাজ তপন সিংহ সূর্যকে বড় ভালবাসেন তপনদার প্রায় ছবিতেই সূর্যকে এট করতে দেখা যেত। স্মরণ হচ্ছে ত কোন একটা ছবিতে যাত্রার দৃশ্য (অতিথি?), তাতে সূর্য ঠোঁটে লি ঘষে রানী সেজেছিল, বেনারসী শাড়ী তখন ওর সবে বিয়ে হয়েছে।

একদিন ধরা হল।—কী ভাবছ? এ-ছবি দেখবে না?

—দেখবে। আমিই টিকিট কেটে

—এ্যাঁ!...সে কিহে, তোমার থাকবে?

সূর্য শ্লাঘা প্রকাশ করে জাবব বাড়বে। বৌ বুঝুক যে ঢং আমিও জানি না।

শুনে সবার কি হাসি সেদিন।

সূর্য এমনিতে দারুন রোম ফিল্মের মেয়েদের পটাতে দুর্দান্ত শুনেছি মেয়েরা ওর সঙ্গে নাকি পরামর্শও করে। কার সঙ্গে কার প্রে প্রেম সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন বড় রকম হবে, আমি নিশ্চিত, সূর্য সেখানে অ উঁকিল! ঠিক একটা ভুজুং দিয়ে কেস ফেভারে আনবেই। তারপর লক্ষ্য কর যখন যে ডিরেকটারের সঙ্গে কাজ

ার মত সে'টে যাচ্ছে সেখানে। সূর্য
া বাক্য নেই। কি করে যে এত ম্যানেজ
চলে—ঈশ্বর জানেন। এক সঙ্গে দুটো
টে ছবির সেট তৈরী করছে, কোথায়
ন আর্টিস্টের বার্থ-ডে, সূর্য অমনি
কজন চলল তার বাড়ী ডেকরেশান করতে,
যেন একটা ফাংশন হবে কোথায়—
র্ণ কলকাতার মার্কেটের শোলা প্রায় সবই
নে ঘরে তুলছে, কোথায় রামমোহন মঞ্চে
কা গুণ্ডা ফাটাচ্ছে—সূর্য গিয়ে সেট
জাইন করছে রাত জেগে। চলল হিমালয়ে
তৈরী করতে। দুদিন পর সকালের
নে ফিরে এসে রিপোর্ট দিল—নাঃ,
লিতে এত জোর হাওয়া যে সেট খাড়া
র রাখা যাচ্ছে না দাদা। ওটা আপনি
ডোরে ম্যানেজ করুন। তারই মধ্যে কখন
ন এক ফাঁকে মুখে রং মেখে ক্যামেরার
মনে দাঁড়িয়ে পড়েছে ডায়লগ বলতে
তে।

সূর্য ক্রমেই একটা ক্যারেকটার হয়ে
ছে। ওর কথা উঠলেই সবাই ফিক-ফিক
হাসতে আরম্ভ করে আজকাল। তবে
ভাগ্য যে ওকে পাগল বলে না কেউ।
জের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। একশ বিশ
জর্ণা একগাল ঠোঁশে নিয়ে সূর্য
ানে কিন্তু রীতিমত ফিল্ডমার্শাল।

ইদানিং একটা ছবিতে ও একটি সেট
ছিল—দারুন। উত্তমকুমার খুব তারিফ
রছিলেন। জেমস বন্ড স্টাইলের সেট।
রা গ্যাজেটে ভর্তি। তার ওপর রিভলবিং।
ম তখন অন্য শুটিং করছিলাম। সূর্য
য়ে হামলা করল—চল দেখে আসবে।
দেখে আসতেই হল।

আরম্ভ গায়ত্রী মুখার্জি । রাকেশ পান্ডে । এম এল দাগা।

ছবির আর্ট ডিরেক্টার ইমাজিনেটিভ না হলে নাটক পড়ে মার খায়। আমাকে কয়েক দিন আগে একটা মস্তবড় ছবি দেখাল। যিসাস ক্রাইস্ট তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে খেতে বসেছেন—সেই বিখ্যাত 'লাস্ট সাপার' ছবিরই রি-প্রোডাকশন।

আমি তো অবাক।—এ ছবি দিয়ে কী করবে?

—সেটে লাগাব।

বলেই ও যোগ করল—কাহিনীর এই জায়গায় আছে—এরা পরদিন ইন্ডিয়ান আর্মির গুলিতে একে একে মারা যাবে। সেটা এরা কেউ জানে না। রাতে মহানন্দে খেতে বসেছি। মুর্গীর ঠ্যাং চিবুচ্ছে। মদ খাচ্ছে। হুল্লোড় করছে। আশ্রমের অল্প বয়সী মেয়েদের শ্লীলতাহানি করছে, কিন্তু ওদিকে যে মৃত্যু ওৎ পেতে বসে আছে সে খেয়াল নেই...। আমি ঘটনার আইরণী হিসাবে এই ছবিটাকে তাই সেটে রাখতে চাই। কী, ভাল হবে না?

—পরিচালক অ্যাপ্রুভ করেছেন?

—না, আমি এখনও পীযূষদাকে কিছু বলিনি। শুটিং-এর দিন সেটে টাঙ্গিয়ে দেব। দেখা যাক, উনি কী মন্তব্য করেন...

কেন জানি না বাংলা ছবিতে আর্ট ডিরেকশন এখনও পর্যন্ত এক ধরনের অবহেলা, তাচ্ছিল্যের ব্যাপার হয়ে আছে। বেশীর ভাগ পরিচালক এ নিয়ে মাথা ঘামান না। মোটামুটী একটা সেট পেলেই শুটিং করে যান। কি ভাবে সেটকে যে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা যায়—এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই।

সূর্য দুঃখ করল। দুঃখ আমারও। আসলে অর্থনৈতিক দৈন্যের ফলে এটা বেশী করে হয়েছে। নামজাদা শিল্পী যখন ক্যামেরার সামনে রয়েছেন তখন সেটের টুকিটাকি নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়—ভাবখানা এই রকম। একজন ছিলেন—বংশী চন্দ্রগুপ্ত—সত্যজিৎ রায়ের আর্ট-ডিরেক্টার। এমন অসাধারণ মানুষ কদাচিৎ বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প দেখেছে। মজা, উনি বাঙ্গালী নন—কাশ্মীরের মানুষ। বাড়ী থেকে পালিয়ে ছবি আঁকা শিখতে এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে। তারপর কলকাতায় হঠাৎ ওঁর যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। জেন রাখুন, তাও একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন ছবির শুটিং উপলক্ষ্যে। সিগারেটের বিজ্ঞাপন। যেটি প্রযোজনা করেছিলেন হরিসাধন দাশগুপ্ত, পরিচালনা করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, চিত্রগ্রহণ করেছিলেন অজয় কর আর শিল্প নির্দেশনা করেছিলেন বংশী চন্দ্রগুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

রঞ্জন মজুমদার

বন্দী বিধাতা

পরিচালনা ঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায়

বন্দী-বিধাতা বাংলা ছবির বর্তমান
র্দশার কথাই মনে করিয়ে দেয়। চিত্রনাট্য
রচালনা কলাকৌশলগত কাজ ইত্যাদি
ন দিকেই উন্নতির তেমন কোনো চিহ্ন
ই। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে নির্মিত
বগুলিও এর থেকে বোধহয় অনেক ভাল
ল। যুক্তি-তর্ক চিন্তা-ভাবনা ইত্যাদি
র্জন দিলে হয়ত এ ছবি ভাল লাগতে
রে।

রামগোপালের সংসারে হঠাৎ নাটকীয়
পর্যয়। একই সঙ্গে ছেলে বোমা বাঁধতে
য়ে পা হারায় মেজ মেয়ে বম্বে পালায়
মেয়ে এ্যাকসিডেন্ট পড়ে আর ছোট
য়ে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়। এই
রুস্থায় দেবদূতের মতই রঞ্জন এসে
গোপালের সব সমস্যার সমাধান করতে
। কিন্তু বীণাকে ভালবাসতে গিয়ে
হয়ে সে প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে।
রামগোপালের সংসারকে সে এমনভাবে
কুকর্মে জড়িয়ে ফেলে যে রামগোপাল
তাকে খুন করতে বাধ্য হয়। অবাস্তব অতি-রঞ্জিত কাহিনীটির কোন বাঁধন না থাকায় ছবিটি দুর্বল হয়ে পড়ে। চরিত্রগুলিও দুর্বল—যে ভাল তো খুব ভাল আর যে খারাপ সে ভীষন খারাপ। ছবির শেষ দৃশ্যে অদালত প্রাঙ্গণে রামগোপাল এক দীর্ঘ বক্তৃতায় সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে যেভাবে খুনী সাব্যস্ত করে তা হাস্যাস্পদ। ফিল্ম কোম্পানীর প্রহসন, মীনার প্রতি অত্যাচারের দৃশ্য এবং ক্যাবারে নাচ ও সেই সঙ্গে গানও একেবারে অসহ্য। ছবির গানগুলিও কেমন যেন নিষ্প্রাণ। অভিনয়ের দিক থেকে অনিল চট্টোপাধ্যায়, তরুণ ঘোষ ও মৃণাল মুখোপাধ্যায় কিছুটা ভাল অভিনয় করার চেষ্টা করেন। নতুনদের মধ্যে কেবল শ্রাবণী বন্দ্যোপাধ্যায়কেই ভাল লাগে। সোমা দে ও কণিকা মজুমদার কোনোরকমে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছেন।

চিত্রবিদ

অজিত বসু

বিজ্ঞান ভবনে জাতীয় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতিরূপে অজিত বসু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভাষণদানরত তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ।

কয়েকজন

স্থান উজ্জ্বলা সিনেমা। ১৯৪৭ সাল। তারিখ পয়লা মার্চ। স্বাধীনতার সূর্য তখন উঠি-উঠি করছে। ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভয়ানক ব্যস্ত সভা-সমিতি নিয়ে। সেই কর্মবহুল ব্যস্ততার মধ্যেও আবুল কালাম আজাদ এসেছেন কলকাতায়। কারণ দক্ষিণ কলকাতার যে প্রেক্ষাগৃহটিতে এতদিন যাবৎ বিদেশী ছবির প্রদর্শনী চলতো, সেদিনই তারা প্রথম বাংলা ছবি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছে।

উজ্জ্বলা সিনেমায় যেমন এটি প্রথম প্রদর্শিত বাংলা ছবি, তেমনি এই 'পথের সাথী' ছবিখানি প্রযোজক অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের তৎকালীন কর্ণধার অজিত বসুরও প্রথম ছবি।

এই সিনেমার উদ্বোধন করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় আবুল কালাম আজাদ নাকি বলেছিলেন বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সকলেই অবহিত। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের অভাবে ব্যাপক প্রদর্শনী হচ্ছে না। এই প্রেক্ষাগৃহে এখন থেকে নিয়মিত বাংলা ছবি দেখানো হবে—এটা কম আশার কথা নয়। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মত বিদেশী ছবি থেকে চোখ ঘুরিয়ে স্বদেশী ভাষার ছবিকে স্বাগত জানাতে সেদিন তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সবাইকে।

তাঁর সেই ভাষণ শুনে তরুণ প্রযোজক অজিত বসু মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন মৌলানা আজাদের উক্তির সারসত্য। তার প্রমাণ পাওয়া যাবে অজিত বসুর গোটা জীবনেই।

বাংলা ছবির উন্নতিতে এবং এই শিল্প মাধ্যমটির চর্চায় তিনি সারাটি জীবন ব্যয় করেছেন। এখনও এই নিয়েই আছেন। শুরু হয়েছিল অবশ্য আরও বছর আস্টেক আগে। বাবা অনাদি বসুর হাত ধরে তাঁরই সহকারী হয়ে এসেছিলেন অরোরা স্টুডিওয়। স্টুডিও আর প্রোডাকশন ছাড়া পাবনা-ফরিদপুর-মেদিনীপুর-খড়গপুরে তখন চার-চারটে অরোরা টকীজ চলছে। এসব কিছুরই অনেকটা দায়িত্ব পড়েছিল তরুণ অজিতবাবুর ওপর। পূর্ণ দক্ষতায়, পিতার আস্থা অর্জন করেছিলেন তিনি অল্প সময়েই।

হঠাৎ কি খেয়াল হতে ডিরেকশনের দিকে ঝুঁকলেন। ১৯৪২ সালে নিজেদের প্রোডাকশন 'পতিব্রতা'-য় পরিচালক জগদীশ চক্রবর্তীর সহকারী হয়ে কাজ করলেন। ব্যবসাপত্রের জটিল কাজকর্মে অভিজ্ঞ অজিত বসুর ভালো লাগলো না পরিচালনার কাজ। কয়েক গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছবি তৈরি দেখতে তাঁর বেশ থি লাগত।

সুতরাং ফিরে এলেন প্রোডাকশনে

১৯৪৬ সাল। অরোরার প্রতিষ্ঠ অনাদি বসু মারা গেছেন। স্বাভাবিকভা অরোরা সব দায়িত্ব এসে পড়ল এই জে পুত্রের ওপর। শিল্পচর্চা ছেড়ে শিল্প চর্চা শুরু হোল অজিতবাবুর। প্রথম ছ 'পথের সাথী' দিয়েই সেই চর্চার শুরু

নবীন-প্রবীণ-তরুণ পরিচালকদের দি ছবি করানো শুরু হোল অরোরা সুকুমার দাশগুপ্তকে দিয়ে করা পরিশোধ, মহানিশা, সদানন্দের মেলা, থাকে ওধারে। ফণি বর্মণ করলেন প্র এবং জয়দেবের মত জনপ্রিয় ভক্তিম পৌরাণিক ছবি।

১৯৫২ সাল নাগাদ এলো সত্যি রায়ের পথের পাঁচালী। যুগান্তকারী ছ অরোরার পরিবেশনায় ছবিখানি ম পেলো শহরে। জনপ্রিয় ছবির নিবে প্রযোজক অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ছবি দিয়ে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করে শিল্পধর্মী ছবির উৎসাহদাতা হিসা পর পর কবছরে এলো অপরাজিত, পর পাথর, জলসাঘর। সবকটিই সত্যি

সদানন্দের মেলা চিত্রে পদ্মা দেব

বায়ের ছবি। পরিবেশক অরোরা। বাংলা ছবির জগতে ইতিহাস সৃষ্টি হোল।

আর্থিক সাফল্যের সঙ্গে এলো খ্যাতি-সম্মান আর পুরস্কার। অরোরার এই খ্যাতির সিংহভাগটুকুর দাবিদার অবশ্যই অজিত বসু। বাংলা চলচ্চিত্র জগতে তত-দিনে তিনি একজন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ই আই এস পি এ-র প্রযোজক শাখার সভাপতি হয়েছেন বহু-বার। ১৯৬০ আর ৬৫-তে দুবার ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র কল-কাতাতেই নয়, প্রযোজক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সারা ভারতব্যাপী। ১৯৬০ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি ছিলেন সভা-পতি।

এমনতরো বহু অনুষ্ঠান অজিত বসু অলঙ্কৃত করেছেন একাধিকবার। অরোরার ঐতিহ্য তিনি উত্তরোত্তর বাড়িয়েছেন বলা যায়।

অরোরার ইতিহাস বলতে গিয়ে অজিত বসু বললেন—'নিজের মুখে নিজের প্রতিষ্ঠানের সুনাম করাটা উচিত নয়। তবুও যখন জানতে চাইছেন বলছি। নতুন গুণী শিল্পীদের খোঁজ আমরা চিরদিই করি। পরিচালনার ক্ষেত্রে যেমন পুরোন দিনে ফণি বর্মা, সুকুমার দাশগুপ্ত প্রমুখকে দিয়ে ছবি করিয়েছি, তেমনি তরুণ সংগীত পরিচালক আবিষ্কারের দিকেও আমাদের ঝোঁক ছিল। রবীন চট্টোপাধ্যায়, রণজিৎ রায়, অনুপম ঘটকের প্রতিষ্ঠার মূলে অরোরার কন্ট্রিবিউশন কেউই বোধহয় অস্বীকার করবে না।'

আজ অবশ্য অরোরা ফিল্ম কর্পো-রেশনের আর সেই সুদিন নেই। বিশেষ করে প্রযোজনার কাজে এখন তাঁরা প্রায় নীরব। অজিতবাবুকে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায় বললেন—'প্রোডাকশন বন্ধ করিনি এখনও। তবে আপাততঃ স্থগিত আছে। ছবি করব, নিশ্চয়ই করব। পরিবেশনার কাজেই এখন বেশী ব্যস্ত তাঁরা।

কাবেরী বসু, সন্ধ্যারাণী, জহর গাঙ্গুলীর জনপ্রিয়তার মূলে কিন্তু এই অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন—অর্থাৎ অজিত বসু।

যতদূর শুনেছি অজিত বসুর ছেলে অজীন বসু এখন ডকুমেণ্টারী ছবি করছেন। হয়তোবা ছেলেকে দিয়েই নতুন ছবি করাবেন।

প্রায় চল্লিশ বছরে এই চলচ্চিত্র জীবনে অজিতবাবুর উত্থান আছে, দুর্দিনও কম যায়নি। বাংলা চলচ্চিত্রেরই তো সেই ইতিহাস। স্বাধীনতার আগে এপার-ওপার বাংলায় বাংলা ছবির রমরমা অবস্থা তিনি দেখেছেন। দেশ-বিভাগের পর সংকুচিত বাজারে বাংলা ছবির শ্বাসরুদ্ধকারী অবস্থাও তিনি দেখেছেন, দেখছেন।

অবশ্যই তিনি শুধু নীরব দর্শক নন। ই আই এস পি এ-র ভেতরে-বাইরে দুদিক থেকেই চেষ্টা করেছেন দুর্নীতি দমনের

বকুল চিত্রে অরুন্ধতী দেবী ও বিভু

জন্য। এইতো ক'বছর আগে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির অন্যতম নেতা হিসাবে প্রদর্শকদের সঙ্গে এক ভদ্রলোকী সম-ঝোতায় এসেছিলেন বাংলা ছবি রিলিজের ব্যাপারে। কিন্তু কিছু করা গেল না।

ও'র কথায়—'কিছু করা গেল না। আসলে আমাদের মধ্যেই ইউনিটি ছিল না। সংরক্ষণ সমিতি যেসব টার্মস অ্যাণ্ড কণ্ডিশন প্রদর্শকদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছিলেন, তা কার্যকর করা কোনো ছবির ব্যবসার চেহারাটাই হয়তো পাল্টে যেত।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললেন—'হোল না কিছু।'

সরকারী প্রচেষ্টা সম্পর্কে অজিতবাবু অবশ্য খুবই আশাবাদী। তিনি বললেন—সত্যি সত্যিই আমাদের মন্ত্রী সুব্রত মুখো-পাধ্যায় চেষ্টা করছেন, এটা স্বীকার করতেই হবে। ছবি করার জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে, বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনীর ব্যাপারে অর্ডিন্যান্স হতে চলেছে—এসব কাজ কম কিসে!

তবে প্রযোজক-পরিবেশক প্রদর্শনের সম্পর্কের উন্নতি না হলে সর্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা খুবই কম। অজিতবাবুর মতে ফিল্ম একটা কালেকটিভ আর্ট, ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিটাও একটা কম্পোজিট স্ট্রাকচার বলতে পারো। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগাযোগ এখানে প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং এক্ষেত্রে পারস্পরিক কো-অর্ডিনেশন না থাকলে কিছু করা মুশকিল। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার সেটাই হচ্ছে না। পরস্পরের কালেকটিভ একজিসটেন্সের যদি লক্ষ্য না থাকে, তাহলে তো ইণ্ডাস্ট্রি বাঁচবে না। এক পক্ষ শুধুমাত্র নিজের লাভের কথাটাই ভাববেন, অপরের ক্ষতিটা মুহূর্তের জন্যও মনে আনবেন না—এই ধরনের অ্যাটিচুড থাকলে তো চলে না।' অজিতবাবু আশা করছেন—'এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হবে। এ-অবস্থা কি চিরদিন চলতে পারে নাকি?'

অবস্থার পরিবর্তন হলে অবশ্যই অরোরা আর বসে থাকবে না। যে প্রতিষ্ঠান একদিন একাধিক প্রতিভাধর শিল্পীকে স্বীকৃতির পথে নিয়ে এসেছে, তার পক্ষে নীরব দর্শক হওয়া সম্ভব নয়। 'পরিচালক বিজয় বসু, রাজা রামমোহন, ভগিনী নিবেদিতা, আরোগ্য নিকেতন ছবি করে আজ খ্যাতি-মান হয়েছেন। তরুণ পরিচালক পূর্ণেন্দু

পত্নীর প্রথম পরীক্ষামূলক দুঃসাহসিক ছবি 'স্বপ্ন নিয়ে'-কে দর্শকদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন এই অজিতবাবুই। অরোরা ছিল ছবিখানির পরিবেশক। ছবিখানি দর্শকদের কাছে কি রিসেপশন পেয়েছে সেটা আসল কথা নয়। আসল ব্যাপার হোল ছবিখানি মুক্তি পেয়েছিল। অরোরার অজিত বসু না থাকলে এ-ছবি হয়তোবা বাকসবন্দীই থাকতো।

তাঁর চেষ্টায় ও নেতৃত্বে অরোরা আজ একটি রুচি ও শিল্পসম্মত ছবি তৈরীর প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের সেবায় উৎসর্গিত প্রাণ অজিত বসুকে প্রথমবার দেখলে কখনই ফিল্মের লোক বলে মনে হয় না। ব্যবসায়ী গোলকধাঁধার অন্য আর পাঁচটা মানুষের মত বাকচাতুর্য নেই তাঁর। সরল, সাদাসিধে মানুষ।

নিজেদের প্রোডাকশন রিভাইভ করার কথা বলতে তিনি বললেন—'সে-ছবি কি আর আমি দেখে যেতে পারবো?'

—কেন এ-কথা বলছেন?

—আমাদের বাড়িতে খুব বেশিদিন কেউ বাঁচে না। বয়স তো হোল! হাসতে হাসতে বললেন বিজয়বাবু।

বললাম—'ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চয়ই বাঁচবেন।' ও'র বাবার বয়স হিসেব করে মিলিয়ে বললাম—আপনার বাবার বয়সে পৌঁছতে এখনও প্রায় পাঁচ বছর বাকি। পাঁচ বছর তো বটেই, পঁচিশ বছরই বা নয় কেন!

অরোরাও বেঁচে থাকবে স্বমহিমায়, মাথা উঁচু করে।

নিরীক্ষিত

নাটমঞ্চ

পরিবর্তন

প্রবর্ধনা : রঞ্জিতমল কাঙ্কারিয়া। নাটক, পরিচালনা ও গীত রচনা : মনোরঞ্জন ঘোষ। সুর—শচীন বসু। মঞ্চ—সন্তোষ সরকার। শব্দ—প্রভাত হাজরা। আলো—বঙ্কিম দাস। অভিনয়ে : মনোরঞ্জন ঘোষ, করুণ ব্যানার্জি, সুশীল বসু, গৌর মালাকার, রাজর্ষি রায়, বিদ্যুৎ বসু, সুরেন কাঙ্কারিয়া, অনল চক্রবর্তী, কাজি কামাল নাসির, প্রকাশ মণ্ডল, পরেশ মণ্ডল, রাজা, পার্থপ্রতিম, প্রিয়া, রাখী প্রভৃতি। পশ্চিম বাংলার ঐতিহ্যবাহী নাট্যশালা শ্রীরণজিৎমল কাঙ্কারিয়ার স্বত্বাধিকারিত্বে বিগত কয়েক বছর ধরে শিশু নাটক নিয়ে নানান নিরীক্ষা পরীক্ষায় রত আছে। বিগত ১৮ এপ্রিল, ১৯৭৬ সকাল ১০টায় আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে এরা মঞ্চস্থ করেছেন শিশু নাটক পরিবর্তন। প্রতি রবিবার এবং ছুটির দিন নাটকটি নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। ইতিপূর্বে চিত্রায়িত রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত 'পরিবর্তন' ছবির কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে বর্তমান নাটক। নাটক রচনা ও পরিচালনা তাছাড়া প্রধান একটি অংশে আত্মপ্রকাশ করেছেন মূল কাহিনীকার মনোরঞ্জন ঘোষ। তিনটি অঙ্কে বিভক্ত পরিবর্তনে মোট ষোলটি দৃশ্য আছে।

পিতৃহীন অজয় তার দুষ্টুমিতে সারা গ্রাম মাতিয়ে নেয়। পড়াশুনায় মন নেই তার দুষ্টুমির; অত্যাচারে সবাই উত্যক্ত বৃদ্ধ জ্যেঠামশায় এবং বিধবা মা অজয়ের ভবিষ্যত চিন্তা করে তাকে সহরে হোস্টেলে রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করেন কিন্তু এখানে এসেও তার পরিবর্তন হয় না। স্কুলের এবং হোস্টেলের ছাত্রদের নিয়ে নানান দুষ্কর্মে মেতে ওঠে। শিক্ষক এবং সুপারিনটেনডেন্ট সবাই অজয়কে শুধু তাড়নাই করেন। এরই মধ্যে শক্তি নামে একটা ছেলের সঙ্গে অজয়ের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। শক্তি খোঁড়া। কিন্তু পড়াশুনা ও সর্ববিষয়ে আদর্শ স্থানীয়। শক্তি নানান ভাবে অজয়কে বোঝায়। কিন্তু সে কোন বুঝ মানে না। অজয়ের চক্রান্তে পুরোন সুপারিনটেনডেন্ট বিদায় নেন। তার স্থানে আসেন শিশিরবাবু নতুন শিক্ষক। নতুন প্রধান শিক্ষকের পরামর্শে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি ছাত্রদের শিক্ষা দিতে থাকেন চিরাচরিত পদ্ধতি ত্যাগ করে স্নেহ ও ভালবাসায় ছাত্রদের অন্তর জয় করেন। কিন্তু অজয়কে তবু বাগে আনতে পারেন না। শক্তিও নানাভাবে বোঝায়। শেষ পর্যন্ত শিশিরবাবুর নির্দেশে সমস্ত ছাত্ররা অজয়ের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে। এমনকি শক্তিও। প্রিয় বন্ধু শক্তিও যখন বয়কট করলো, তখন হোস্টেল থেকে অভিমানে দুঃখে অজয় রাস্তার দিকে ছুটে যায় হোস্টেলে আর ফিরবে না বলে। খোঁড়া পা নিয়ে শক্তি অজয়কে ফিরিয়ে আনতে ছুটতে থাকে—পেছন থেকে একটা গাড়ী এসে শক্তিকে ধাক্কা দেয়। শক্তি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। শিশিরবাবু প্রধান শিক্ষক এবং ছাত্ররা নানান চেষ্টা করেও শক্তিকে বাঁচাতে পারে না। শক্তির মৃতদেহের সামনে অজয় প্রতিজ্ঞা করে—সে ভাল হবে। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। শিশিরবাবুর অধিনায়কত্বে নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিতে অজয় স্কুলের সেরা ছাত্রে পরিণত হয়। শেষপর্যন্ত শিশিরবাবু সরকার দ্বারা অন্যত্র উচ্চপদে নিয়োজিত হন—তার বিদায় দিনে অজয় এবং অন্যান্য ছাত্রদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধুর ও করুণ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাটকটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

শক্তির বন্ধুত্ব এবং আদর্শবাদী শিক্ষক শিশিরবাবুর ভালবাসা ও নতুন শিক্ষা-পদ্ধতি কীভাবে দুষ্টু ছেলে অজয়ের জীবনে আমূল পরিবর্তন আনলো, পরিবর্তন নাটক সেই বক্তব্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। অভিনয় ও সার্বিক উপস্থাপনায় নাটকটি একটি সার্থক শিশু নাটক হিসেবে শুধু শিশুদেরই নয়—বয়স্কদেরও আনন্দ দেবে।

অভিনয়ে দুষ্টু ছেলে অজয়ের এবং ভাল ছেলে শক্তির ভূমিকায় প্রথমেই বলতে হয় শ্রীমান অনল চক্রবর্তী ও কাজি কামাল নাসিরের কথা। রূপ চরিত্রে সবচেয়ে ছোট ছেলে পরেশ মণ্ডলের ক্ষিপ্রতা যেকোন

শুভাগমন শুক্রবার
এক সাহসী যুবকের দুর্ধর্ষ অনুসন্ধানের চাঞ্চল্যকর কাহিনী, যার জীবনের ব্রত ছিল দেশের সামনে প্রত্যেক আইনভঙ্গকারীকে তুলে ধরা।
সুনীল দত্ত • সায়রা বানু • বিনোদ খান্না • প্রেমনাথ
নয়া দিল্লী
ইস্টম্যানকালারে
পরিচালনা
রাজ খোসলা
সংগীত
আর. ডি. বর্মণ
ওরিয়েন্ট : গ্রেস : মেনকা : খান্না : রূপালী : ইন্টালী
তসবীর মহল : বান্টি ও অন্যান্য বহু প্রেক্ষাগৃহে।
— কেবলমাত্র নূন শো —
গ্লোব ও মিত্রা

ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। অন্যান্য
ের মধ্যে প্রকাশ মণ্ডল, রতন ঘোষাল
শিশু রাখী বসুর কথাও উল্লেখ-
। বড়দের মধ্যে নাট্যকার পরিচালক
রঞ্জন ঘোষ, সুশীল বসুর হেডমাস্টার,
। ব্যানার্জি, বিদ্যুৎ বসু, রাজর্ষি রায়ের
নয়ও প্রশংসনীয়। গৌর মালাকার এবং
প্রিয় প্রথম সুপারিনটেনডেন্ট ও মালী
ত্র খুব হাসির খোরাক জুগিয়েছেন।
স্টার থিয়েটার পরিবর্তন মঞ্চস্থ করে
ত দেশবাসীরাই ধন্যবাদার্হ হবেন সন্দেহ
। বিশেষভাবে নাটকটির জন্য আমরা
ংসা করবো না—বর্তমান নাটকে যেসব
রা অভিনয় করেছে, তাদের সকলকেই
ভিনন্দন জানাবো। সঙ্গীতাংশের প্রতি
ষ্ট দেওয়া উচিত ছিল। যে দুটি গান
বেশিত হয়েছে তার রচনা প্রশংসনীয়
। মনোরঞ্জনবাবু এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কোন
ব বা গীতিকারের সাহায্য নিলে ভাল
তেন। পরিবর্তনের সঙ্গীতাংশের
বর্তন এখনও করা সম্ভব। আবার
লকেই আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

স্টার থিয়েটার হিন্দি নাটক
যোজনায়ও হস্তক্ষেপ করেছেন।
ণজিৎমল কাংকারিয়ার প্রযোজনায় স্নেহ
া রচিত এবং ত্রিলোচন ঝা পরিচালিত
মোরধ্বজ' নাটকের মহলা ইতিমধ্যেই
হয়েছে। প্রতি মঙ্গল, বুধ এবং
পতিবার ম্যাটিনীতে নাটকটি মঞ্চস্থ
।

শীলভদ্র

বিদেশী ছবি

'অল দি প্রেসিডেন্টস মেন'

কয়েক সংখ্যা আগে অমৃতের পৃষ্ঠায় য চাঞ্চল্যকর ছবিটির বিষয় উল্লেখ করা য়েছিল, সেই ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ওপর ভিত্তি করে তোলা ছবি 'অল দি প্রসিডেন্টস মেন' এখন আমেরিকার াইরেও রিলিজ হবার পর প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

লণ্ডনে ছবিটি মুক্তিলাভ করার পরই মন প্রচণ্ড দর্শক টানছে যা রীতিমত অবাক করার মত। তাই সেই ভীড় দেখে ক সপ্তাহের মধ্যেই লণ্ডনের সহরতলীর াটটি চিত্রগৃহে বইটি রিলিজ করতে য়েছে।

এর আগে ওয়াইল্ড উড এন্টারপ্রাইজেস প্রোডাকশনের 'দি একজরসিস্ট' ছবিটি ছাড়া সম্প্রতি আর কোন ছবিতে এমন প্রচণ্ড ভীড় দেখা যায় নি।

স্মরণ থাকতে পারে যে ওয়াশিংটন াস্টের কার্ল বার্নস্টেন ও বব উডওয়ার্ড মে দুজন রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হওয়া ংবাদিকদের বেস্ট সেলার বই অবলম্বনে ই ছবিটি তোলা। ছবিটি পরিচালনা রেছেন এলান জে পাকুলা এবং প্রধান দুই ূমিকায় অভিনয় করেছেন রবার্ট রেডফোর্ড ডাস্টিন হফম্যান।

পরীক্ষামূলক মার্কিন ছবি

ইউসিসের তরফ থেকে সম্প্রতি কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘের পরীক্ষামূলক ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাদের অডিটো-রিয়ামে। সবচেয়ে কম প্রদর্শন সময় দু' মিনিট থেকে সর্বোচ্চ ১৯ মিনিট পর্যন্ত টুকরো টুকরো ছবি দেখানো হোলো।

ছবিগুলির নাম যথাক্রমে প্যাণ্ডোরাস বকস (সাড়ে সাত মিনিট।) হে ড্যাড! (১১ মিনিট।) আইজেল অফ জয় (সাড়ে ছ' মিনিট), ডোন্ট (১৯ মিনিট), দি গ্যালাকসী (৮ মিনিট), সাইকেলস (১১ মিনিট) ও কেমিক্যাল ম্যান (৮ মিনিট)। সব ছবিগুলিই রঙ্গীন।

বিচিত্র সব বিষয়। পরিবেশনও লক্ষ্য করার মত। কীট পতঙ্গ ফুল ফল সংক্রান্ত বিষয়, রসায়ন-শাস্ত্র, অনেক কিছু নিয়েই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এই সব টুকরো ছবিতে। যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি শিক্ষণীয়ও।

আমাদের এদেশে যাঁরা, অর্থাৎ চলচ্চিত্রে, এই সব বিষয়ে, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও চলচ্চিত্রায়নে আগ্রহী এবং সেই সঙ্গে যাঁরা গবেষণায় উৎসাহী তাঁদের ছবিগুলি নিশ্চিত ভাল লাগবে।

দি ডে দি ওয়ার্লড এণ্ডেড

ভূমিকম্পের ওপর তোলা ছবি 'লাস্ট ডেজ অফ পম্পেই' এক সময় সমগ্র বিশ্বেই সাড়া জাগিয়ে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। পরবর্তীকালে ভূমিকম্পকে বিষয়বস্তু করে বা ভূমিকম্পকে প্রধান ভূমিকায় রেখে একাধিক ছবি তোলা হয়েছে। কিন্তু পম্পেইকে বোধহয় কোন ছবিই টেক্কা দিয়ে যেতে পারেনি।

বর্তমানে তেমনি একটি বড় ক্যানভাসের ছবি তৈরী হতে চলেছে। এ ছবির পটভূমি একটি দ্বীপ। যেখানে ভূমিকম্প হওয়ার ফলে পৃথিবীর সর্বত্রই তার শব্দ শোনা গিয়েছিল বলে বলা হয়েছে।

ছবিটি তুলছেন 'টাওয়ারিং ইনফার্ণো' ছবির প্রযোজক-পরিচালক আরউইন এ্যালেন। চিত্রনাট্য লিখছেন অতীতের আর এক বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'ব্রিজ অন দি রিভার কোয়াই'এর চিত্রনাট্যকার কার্ল ফোরম্যান।

বর্তমান ছবির নাম 'দি ডে ওয়ার্লড এণ্ডেড'। আশাকরা যায় দুজন বিশ্ব-বিখ্যাত স্রষ্টার হাতের যাদু স্পর্শে এ ছবিটিও একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলে বিবেচিত হবে।

ছবিটি ওয়ানার ব্রাদার্সের পক্ষে তোলা হবে।

একাডেমি পুরস্কার বিজয়ী আরউইন এ্যালেন উপরোক্ত ছবিটি ছাড়াও তার বিখ্যাত ছবি 'পসেডন এ্যাডভেঞ্চারে'র (যে ছবিটি কিছুকাল পূর্বে অর্থাৎ 'টাওয়ারিং ইনফার্ণো' (তারই ছবি) চলার সময়ে শোবে দেখানো হয়েছিল এবং প্রচুর সাড়াও জাগিয়েছিল কলকাতায়।) দ্বিতীয় পর্ব তুলবেন ঠিক করেছেন। এই পর্বের নাম-করণ করা হয়েছে 'রিয়ণ্ড দি পসিডন অ্যাডভেঞ্চার'। এর কাহিনী লিখে দিয়েছেন পল গ্যালিকো।

অ্যালেন বর্তমানে তার আরেক ছবি 'ডিভা নীভেল' নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এছবিটি যেমন প্রচুর খরচ করে তোলা হচ্ছে, তেমনি এতে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করছেন নামী নামী সব শিল্পীরা।

শা, র, চ

শিশু সাহিত্যে, সদ্য প্রকাশিত রঙ্গীন ছবিতে (প্রাইজের) ছড়ার বই।

লালু ভুলু—ধীরেন করগুপ্ত

ডি, এম, লাইব্রেরী—৪২, বিধান সরণী, কলি—৬

তেপান্তর-৭, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ ৯

RUNING PACKED HOUSE

CROWN — GRACE
12, 3, 6, 9 — 11.30, 2.30, 5.30, 8.30

NAAZ — DARPANA
12, 3, 6, 9 — 2.15, 5.15, 8.30

LIBERTY — SREE
2.30, 5.30, 8.30 — (Noon-12)

KALIKA — RUPALI

BHAWANI

and OTHERS

বেনারসী • সিল্ক • তাঁত • ছিট কাপড় • পোষাক

হাওড়া বেঙ্গল কোঅপারেটিভ

৫৪৫, জি, টি, রোড, হাওড়া • ৬৭-৪৪৪৭

বিবিধ সংবাদ

উত্তরণ গোষ্ঠীর কবি প্রণাম

উত্তরণ গোষ্ঠী সম্প্রতি তাদের চতুর্থ বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করেন কবি প্রণামের মাধ্যমে। উন্মুক্ত এবং মনোরম এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের সমাবেশে অনুষ্ঠানটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রসংগীত পিপাসুদের কাছে। এই সর্বাঙ্গীণ সুন্দর অনুষ্ঠানটির জন্য সংস্থার উদ্যোক্তারা নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। অনুষ্ঠানে শিল্পীরা ছিলেন সুবিনয় রায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন, প্রদীপ ঘোষ, মৃদুলা মজুমদার, মানিক আইচ, তপন গঙ্গোপাধ্যায় ও নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

বারুইপুর দত্তপাড়ায় আজাদ হিন্দ মণিমেলার বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ২১, ২২ ও ২৩ মে। ২৩ তারিখ রবীন্দ্রগীতিনাট্য বাল্মীকি প্রতিভা পরিবেশিত হয় গীতশ্রী রায়চৌধুরীর নৃত্য পরিচালনায় এবং সুশান্ত চক্রবর্তীর সঙ্গীত পরিচালনায়। গীতিনাট্যটি পরিচালনা করেন শৈলেন পাইক। অংশ গ্রহণ করেন মমতা বাগচী, প্রতিমা দত্ত, অতসী সরকার, উমা দাস, স্বাতী নন্দী, সুপ্রিয়া সেন, শুভ্রা সেন, জলি ভদ্র, কাবেরী ভট্টাচার্য, মিলি ভদ্র, স্বপ্না দাস, বেবী বন্দী, প্রণতি দাস এবং শিউলি মিত্র।

টেলিভিশন মানেই
"টেলিকিং"
অর্থাৎ
টি ভির রাজা।
আজই আসুন, দেখুন, শুনুন ও
কিনে খুসী হোন।
এ-ছাড়া আমাদের রয়েছে রকমারি রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, রেকর্ড, ট্রান্সস্টার রেডিও, টেপ্ রেকর্ডার, ষ্টীরওগ্রাম ইত্যাদি ইত্যাদি।
মেরামতের সুবন্দোবস্ত তো আছেই।
রেডিও এণ্ড ফটো ষ্টোরস্
৬৫নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিঃ-১৩
ফোন : ২৪-৪৭৯৩

জয় মঙ্গলচণ্ডী মা
রুমকী

ইয়ুথ কোরাল গ্রুপের উপভোগ্য অনুষ্ঠান

ন্যাশানাল ফোরাম অফ উইমেন-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত উৎসবে ইণ্ডিয়ান ইয়ুথ কোরাল গ্রুপ গত ১ জুন হিন্দী হাইস্কুলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীত, গণসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের এক চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করে দর্শক ও শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছেন।

অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নিখিল ভারত কংগ্রেস প্রচার সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীযশপাল কাপুর এম পি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এছাড়া বক্তৃতা করেন শ্রীমতী মায়া রায়, এম পি ও ডঃ ফ গুহ।

বাংলা, আসাম, নাগাভূমি, উত্তর কেরালা, সিন্ধ, মহারাষ্ট্র, রোটাক, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যের লোক ও লোকনৃত্যের অনুষ্ঠানগুলি খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে। গণসঙ্গীতের মধ্যে এম মুন্সি সুরারোপিত নব সূর্য ও মোর ভারতবর্ষ পরমহর্ষে সুনি কণ্ঠস্বরের সমাহারে অনির্বচনীয় রচনা করেছিল। তাছাড়া ইকবালের জাঁহামে আচ্ছা অতুলপ্রসাদের ওঠো ভারতলক্ষ্মী, প্রেম ধাওয়ানের এ কি আওয়াজ হ্যায় মিলকে চলো গণসঙ্গীতগুলি শ্রোতাদের আকৃষ্ট রাখে। অনুষ্ঠানের গানের দিকটি ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন কালিদাস নাগ, ঠাকুর, র‍্যালি সিনহা, অধিরাজ দত্ত, চট্টোপাধ্যায় ও হাসু রায়। নৃত্য পরি করেন রামগোপাল ভট্টাচার্য ও এণাক্ষী এণাক্ষী বসু, স্বর্ণালী বন্দোপাধ্যায়, মৌ দে, ধূর্জটি সেন ও সুনীত বসুর প্রশংসিত হয়। আবহসঙ্গীত পরি করেন ওয়াই এস মুন্সি।

অনুষ্ঠানের শেষে ইয়ুথ কো গ্রুপের উপভোগ্য অনুষ্ঠান ও বিশেষ এণাক্ষী বসুর নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে মুখ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও শ্রীযশপাল ক উপস্থিত দর্শকবৃন্দের কাছে ভূয়সী প্র করেন।

ছুটির পুনর্মুক্তি

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত আবার মুক্তি পাচ্ছে রাধা, পূর্ণ ও প্রা ২ জুলাই থেকে। এক সময় ছবিটি ব জনসমাদর লাভ করে। রূপায়ণে ত নন্দিনী মালিয়া, মৃণাল মুখোপ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অ

বেনারসী
জোড়
সিল্ক-তাঁত
মিল বস্ত্র
গেঞ্জীক
শার্টিং-সুটিং
ড্রিউ কাপড়
বসুন্ধরা
৭৩, জি, টি, রোড (সাউথ) হাওড়া
ফোন: ৬৭-৫৩২৫

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ-এর পক্ষে শ্রীসুপ্রিয় সরকার কর্তৃক পত্রিকা প্রেস ১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১১।১, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলিকাতা-৩ হইতে প্রকাশিত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের নতুন বই

চিত্র বিচিত্র

একাল-সেকালের বিচিত্র কথা ও রসমধুর কাহিনী-সমারোহ দাম ঃ সাত টাকা

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

১৩৮১ সালের মৌচাক পত্রিকা কর্তৃক
সুধীরচন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত
শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ রচিত
ছোট বড় সকলের মনের মত
বাংলা সাহিত্যের দু'খানি আশ্চর্য বই

বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(সপ্তম সংস্করণ চলছে)

ছোটদের উপযোগী সরস রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী লেখা হয় নি। বিশেষ করে নানাবিষয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে ছোটদের মনের মত বিচিত্র রোমাঞ্চকর লেখা খুব সহজ নয়। 'বিচিত্র কাহিনী'তে লেখক সত্য ঘটনাগুলিকে নিজের সরস মুন্সিয়ানা দিয়ে এমন জীবন্ত আর আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি রচনাই অনবদ্য রস ও রোমাঞ্চে টইটম্বুর। মোট পনেরোটি কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন রসের ফল্গুধারায় সিক্ত, বর্ণনায় মনোমুগ্ধকর।

আরও বিচিত্র কাহিনী

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

মূল্য ঃ—চার টাকা

(চতুর্থ সংস্করণ চলছে)

'আরও বিচিত্র কাহিনী' বইটি কিশোর ও বয়স্কদের জন্য সমভাবে রচিত। লেখক শুধু ছোটদের জন্যই রস পরিবেশন করেননি, বড়রাও এই অমৃত আস্বাদন করে পুলকিত হবেন। অনবদ্য রস রচনাশৈলী এবং প্রতিটি কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ চুম্বকের মত পাঠককে টেনে নিয়ে যাবে। এই বইটিতে দশটি বিভিন্ন রসের কাহিনী রয়েছে এবং লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি এমন সুন্দরভাবে রসযুক্ত করে উপস্থিত করেছেন যে পাঠককে বিমুগ্ধ করবে।

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ঃ ফোন ৩৪-১৭৮২

Regd. No. WB/NC-13 30 JUN 1976 AMRITA Friday 2nd July,
Gram : AMRITA Calcutta-700003 Phone 55-5231 (14 li

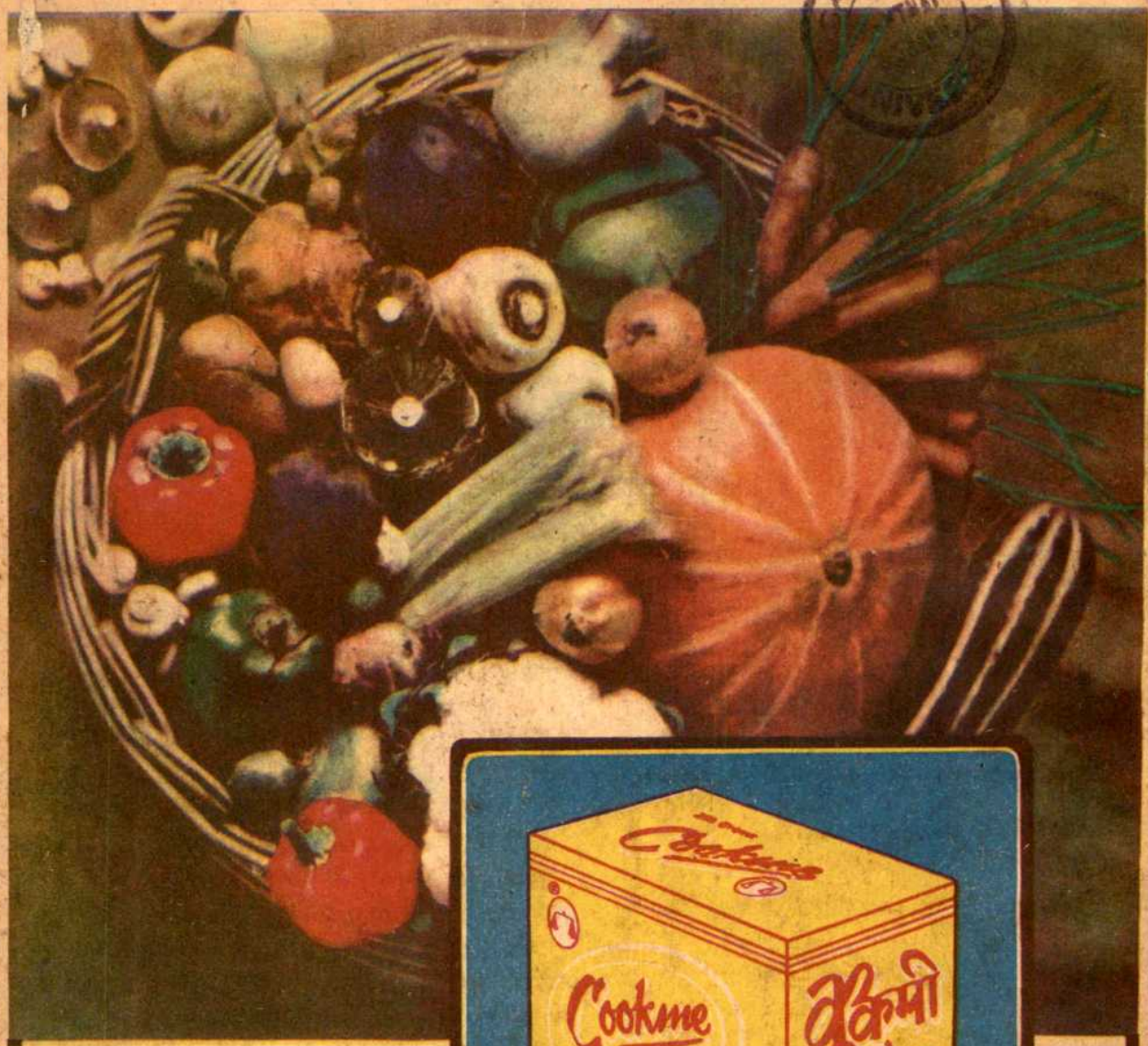

১২৭ বছরের অভিজ্ঞতায়
কুকমী গুঁড়ো মশলা
জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ
শিখরে

30 JUN 1976

আমাদের (এন) কোন ব্র্যাণ্ড ও নাম্বও নেই

কুকমী
গুঁড়ো মশলা

প্রস্তুতকারক :
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
(স্পাইস পাউডার ডিভিশন)
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা- ৭০০০৭০
পোষ্ট বক্স নং :— বড়বাজার ৬৮৮৫

ফটো-অফসেট : এন, কে, প্রোসেস এণ্ড কো: প্রাইভেট লি